যুবমানস
মার্চ, ১৯৮১

রাজ্য সরকার আয়োজিত বিশ্ব প্রতিবন্ধী বর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবে গণসংগীত গাইছেন পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল সাধন গুপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
মার্চ, '৮১
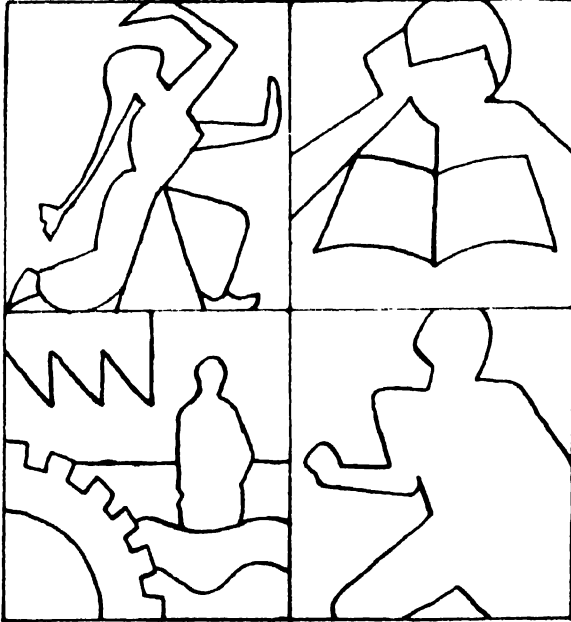
উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি এবং পত্রিকা সম্পাদক : কান্তি বিশ্বাস

প্রচ্ছদ : কেয়া সিংহ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি বা. দী বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা-৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—চল্লিশ পয়সা

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

আলোচনা

প্রতিবেদন

গল্প

কবিতা

শিল্প-সংস্কৃতি

লোক চিত্রকলা

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

বইপত্র

বিভাগীয় সংবাদ

পাঠকের ভাবনা

সম্পাদকীয়

দেশবাসীর প্রায় অর্ধেক এখনও দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করেন। ভূমিহীন কৃষি-মজুরের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন শতকরা পাঁচশ'-এ দাঁড়িয়েছে। জাতীয় সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে জমা হচ্ছে। ১৯৭৫-৭৬ সালের হিসাব অনুযায়ী সমাজের উপরতলার শতকরা পাঁচ জন মানুষের দখলে আছে শতকরা ২২ ৬ ভাগ সম্পদ। কুড়ি কোটি বা তার অধিক আর্থিক সম্পদের মালিক পরিবারের সংখ্যা ১৯৬৪ ৬৫ সালে ছিল ৪২টি সেই সংখ্যা ১৯৭৬ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০১টিতে। কথাগুলি কোন বামপন্থী দলপতির নয়, কংগ্রেস(ই)-বিরোধী কোন নেতারও নয়, ক্ষোভের সাথে উক্ত মন্তব্য করেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডী গত ১৪ই মার্চ তারিখে দিল্লীতে রাজ্যপালদের সম্মেলনে। স্বাধীনতালাভের চৌত্রিশ বছর পর যে কথা রাষ্ট্রপতি বলেছেন সে-কথা শুধু বেদনাদায়ক নয় রীতিমত উদ্বেগজনক। ভারতের মত প্রাকৃতিক সম্পদ পৃথিবীর ক'টি দেশে আছে? চাষযোগ্য জমি, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, নদী, জলবায়ু প্রভৃতি অতুলনীয় সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আজ দেশের এ কি চেহারা হয়েছে যা দেখে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে হয়। কোটি কোটি বেকার যুবক-যুবতী বেকারিত্বের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। তাদের সংখ্যা নিয়মিতভাবে বাড়ছে। বাসগৃহ, চিকিৎসা, পানীয় জল, শিক্ষা প্রভৃতি মানুষের প্রাথমিক চাহিদাগুলি এখনও বিরাট অংশের মানুষের নাগালের বাইরে। এ ব্যবস্থার জন্য দায়ী কে?

প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও রাজ্যে রাজ্যে বাৎসরিক ব্যয়-বরাদ্দের জন্য রাজ্য বিধানসভাগুলিতে প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছে। ব্যয়-বরাদ্দের দাবী উত্থাপিত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা সংসদেও। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণাও করেছেন। কিন্তু মানুষের এই সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট নিরসনের জন্য কি ইতিবাচক কোন ব্যবস্থার ইঙ্গিত এর মধ্যে আছে? রাজ্য সরকারগুলির বাজেটের মধ্যে এমন কিছু করা সম্ভব নয় যার দ্বারা মানুষের জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান হতে পারে। কেননা, ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা নামে যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও মূলতঃ এককেন্দ্রিক। ফলে, রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে রাজ্যের জনগণের জন্য মৌলিক কিছু করা আদৌ সম্ভব নয়। সেইজন্য অসীম ক্ষমতার মালিক কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির উপরেই নির্ভর করে দেশের মানুষের ভবিষ্যৎ।

পেট্রোল, ডিজেল, সার ইত্যাদির মত মৌল দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত বারশ' কোটি টাকার কর আরোপ করে এই মানুষের কি কোন উপকার করা যাবে? রেলের মাশুল ও ভাড়া বাড়িয়ে অতিরিক্ত তিনশ' ছাপ্পান্ন কোটি টাকা আদায় করে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষকে কিভাবে সাহায্য করবেন? কয়লা, লৌহ ও ইস্পাতের উপরে বাড়তি কর চাপিয়ে আরও কয়েক শ' কোটি টাকা আদায় করার ফলে মানুষের অসুবিধাগুলি কি বাড়বে না কমবে? কর ফাঁকি দিয়ে সরকারী আইনকে বৃদ্ধ অংগুলি দেখিয়ে কয়েক হাজার কোটি কালো টাকা বে-আইনিভাবে যাঁরা রোজগার করেছেন, বিশেষ বেয়ারার বন্ড চালু করে শাস্তির পরিবর্তে তাঁদের ভজনা করে দেশজোড়া কোটি কোটি হতভাগ্য মানুষের কোন্ কল্যাণ সাধন কেন্দ্রীয় সরকার করতে পারবেন? দেড় হাজার কোটি টাকা ঘাটতি বাজেট হাজির করে ফাঁপাই নোট বাজারে ছেড়ে সেই ঘাটতি পূরণ করার যে ইঙ্গিত কেন্দ্রীয় বাজেট দিয়েছে তার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে জিনিসপত্রের দাম যে আর এক প্রস্থ বেড়ে যাবে এবং তার দুর্ভোগ সাধারণ মানুষেরই পোহাতে হবে এ-কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার আগের চারটি বাজেটের মত এই বাজেটেও এমন কোন পণ্যের উপর কর বসায় নি যাতে সাধারণ মানুষের অসুবিধাগুলি বাড়তে পারে। বছরের পর বছর ধরে কৃষকের উপরে জমে ওঠা প্রায় চল্লিশ কোটি টাকার সরকারী কৃষি-ঋণ মকুবের সিদ্ধান্ত নিয়ে এই রাজ্যের

সরকার নিশ্চিতভাবে বহু কৃষকের আশীর্বাদধন্য হয়েছে। সমবায় সমিতিগুলি থেকে যাঁরা ঋণ নিয়েছেন তাঁদের এক বৃহৎ অংশের সুদের টাকা সরকারী তহবিল থেকে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে ঋণভারে জর্জরিত মানুষের এক অংশের দুঃখের কিছুটা লাঘব করেছে। সবচেয়ে বেশী দরকারী যে নাইট্রোজেন সার তার উপর কেন্দ্রীয় সরকার ঊনচল্লিশ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি করার ফলে কৃষকেরা যে অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন তা লাঘবের জন্য সমবায় সমিতি বা ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের সাহায্যে ক্রয় করা নাইট্রোজেন সারের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পঁচিশ থেকে সাড়ে তেত্রিশ শতাংশ ভর্তুকী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজ্য সরকারের এই ব্যবস্থাগুলি নিঃসন্দেহে গোটা দেশের কৃষক সমাজের কাছে এক উৎসাহজনক ঘটনা এবং রাজ্য সরকারের সাধ্যের মধ্যে এ এক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত; কিন্তু মানুষের সামগ্রিক দুঃখ-কষ্ট সমাধানের এই ব্যবস্থা কতটুকু কার্যকরী হতে পারে?

রাষ্ট্রপতির ক্ষোভের মধ্যে যে ইংগিত নিহিত তার অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা কি অন্যায় হবে? কেন্দ্রীয় সরকারের কর-নীতি, ভূমি-নীতি, শিল্প ও বাণিজ্য-নীতির উপর রাষ্ট্রপতির উদ্বেগ কমবে কি কমবে না তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। যদি কেন্দ্রীয় সবকারের এই নীতিগুলির খোল নলচে বদলান না হয়, তাহলে তার বাজেটের চরিত্রে কোন পবিবর্তন আসবে না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-গুলিতে যে বৈশিষ্টাগুলি আগেও ছিল এবং চলতি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে বৈশিষ্টা-গুলি আছে তার কোন পরিবর্তন হবে না। অনাহার, বিনা-চিকিৎসার মত ব্যাধিগুলি বাড়তে থাকবে। জিনিসপত্রের দামের ঊর্ধ্বগতি চলতে থাকবে, বেকাব যুবক-যুবতীর লাইন বাড়তে থাকবে, আর তার পাশাপাশি মুষ্টিমেয় মানুষেব সম্পদের পরিমাণও বেশী বেশী করে জমা হতে থাকবে। এর চূড়ান্ত পরিণাম হিসাবে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। এই সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষ একদিন বাঁচবার তাগিদেই বুখে দাঁড়াবে। সেই সংগ্রামী মানুষের পাশে গতিশীল যুবসমাজ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে এসে দাঁড়াবে-- এইটাই ইতিহাসের শিক্ষা। যে কোন বিবেকবান মানুষ আশা করবে এই অব্যবস্থাব অবসান হোক। এই ধন-বৈষম্যের প্রক্রিয়া বন্ধ হোক। এখনও যাঁরা এই চবম সত্যকে গ্রহণ করতে পাবেন নি আশাকরি বাষ্ট্রপতিব এই ক্ষোভ প্রকাশের পব তাঁরা বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

২৮শে মার্চ ঃ বেকারী বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহাসিক দিন

অমিতাভ বসু

বেকারী বিরোধী আন্দোলনের বৈজ্ঞানিক কর্মসূচি, নির্দিষ্ট লক্ষ্যই যুবসমাজকে বর্তমান সময়ে সজাগ করে তুলছে। যুবসমাজকে আন্দোলন, সংগ্রামের পথে এগিয়ে দিয়েছে। ২৮শে মার্চ সেই বেকারী বিরোধী আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক দিন, অবিস্মরণীয় দিন। প্রতি বছর এই দিনটি নতুন নতুন শক্তিকে সমবেত করে সরব হয়ে ওঠে। আহ্বান জানায় আগামীদিনে বৃহত্তর সমাবেশ, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে এগিয়ে আসতে। সেই আহ্বান আজ ব্যাপ্তি লাভ করেছে গোটা দেশে। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এ বছর থেকে গোটা দেশে রাজ্যে রাজ্যে এই দিনটি পালন করা হবে ভবিষ্যতে বেকারী বিরোধী আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে।

পশ্চিমবাংলার ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি যখন এক অপরাজেয় ভূমিকায়, সেই শক্তির সক্রিয় শরিক হিসাবে এ রাজ্যের এক বিশেষ পটভূমিকায় বেকারী বিরোধী আন্দোলন এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়। এর একটা অতীত আছে। বামপন্থী যুবসংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে 'সমস্ত বেকার যুবকদের কাজ কাজ সাপেক্ষে বেকার ভাতা'-র দাবীতে আন্দোলন করে আসছিলেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে যুবসমাজের অভিজ্ঞতা, চেতনার ক্রমবিকাশ ব্যাপক যুবসমাজকে উত্তরোত্তর এই সংগ্রামী শিবিরে সমবেত হতে সাহায্য করে।

আজকের দিনের আন্দোলন, সংগ্রামগুলির লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে অন্ধ আবেগ বা 'বিলাসিতার' মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যুবসমাজ আন্দোলনে সামীল হয় না। যুক্তি, বুদ্ধি দিয়েই তারা আন্দোলনের পথ বেছে নেয়। যুবসমাজ লক্ষ্য করেছে দেশে পাঁচ-পাঁচটা বড় বড় পরিকল্পনার বছর পার হয়ে গেছে। শুনেছে 'গরিবী হটাও', 'সমাজবাদের' হুঙ্কার শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে। শুনেছে বেকারী দূর করার কথা। সমগ্রের যোগফল বেকারী, দারিদ্র, জনজীবনে দুরবস্থা আরো বেড়েছে। পাশাপাশি তারা লক্ষ্য করেছে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের পরিকল্পনা। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ, সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম পরিকল্পনা। ১৯২৮ সালে প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা সোভিয়েত রাশিয়ায় গৃহীত হলো। ১৯৩২ সাল—চার বৎসরের মধ্যেই গড়পড়তা ৯৩ ভাগ পরিকল্পনার সাফল্য অর্জিত হলো। ১৯২৮ সালে শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৯৫ লক্ষ, ১৯৩২-এ এসে দাঁড়াল ১ কোটি ৩৮ লক্ষে। এর মধ্যে বড় বড় কল-কারখানায় ১৮ লক্ষ, কৃষি কার্যে ১১ লক্ষ এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ৪·৫ লক্ষ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যেই বেকার সমস্যা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হলো। ওদেশেই বা কি করে এমন হলো? আর এদেশেই বা কেন এমন হয়ে চলেছে? যুবসমাজের যুক্তি এবং বুদ্ধির জোর যুবসমাজকে ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে প্রতিনিয়ত প্রকৃত সত্যের সামনে উপস্থিত করে দিচ্ছে। সে সত্য হচ্ছে জগৎজুড়ে দুটো নীতি চলছে। একটি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক নীতি, যে নীতির মূল কথা শোষণহীন সমাজ। দেশের সম্পদ সর্বসাধারণের স্বার্থে নিয়োজিত হবে। আর একটি পুঁজিবাদী নীতি, যে নীতির মূল কথা শোষণকে বেশী বেশী করে জনজীবনে কায়েম করা। দেশের সম্পদকে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে নিয়োজিত করা।

আমাদের দেশের শাসকশ্রেণী জনজীবনে সমস্যার মৌলিক সমাধানের দিকটিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে চলেছেন। অবহেলা করে চলেছেন দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি এবং জোতদার-জমিদারদের স্বার্থে। তাই দেশের অর্থনীতিতে সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। সংকটের বোঝা জনগণের উপর চাপানো হচ্ছে। এই সংকটের প্রধান ক্ষত বেকারী। বেকারীর লাইন ক্রমবর্ধমান। গ্রাম শহরে কোটি কোটি যুবক বেকার। দেশের প্রধান সম্পদ, শ্রমশক্তির নিদারুণ অপচয় দেশের অগ্রগতিকে ব্যহত করে চলেছে। গোটা সমাজজীবনে বিপর্যয় ডেকে আনছে। জনজীবনে দারিদ্র, দুঃস্থতা, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস, কৃষকের ভূমিহীন হওয়ার প্রক্রিয়া, ছাঁটাই, লে-অফ, লক্-আউট ক্রমবর্ধমান। এরই বিরুদ্ধে সমস্ত অংশের মানুষের দুর্বার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। শাসকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, গণসমাবেশকে চিরদিনই ভয় পায়। তাই নেমে এলো এক নূতন ধরনের আক্রমণ।

১৯৭২ সাল। সাজানো সংসদীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলায় সংসদীয় গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করার পথ সূচিত হলো। গণআন্দোলন, সমাবেশ, সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকার, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের উপর এই ধরনের আক্রমণকে তীব্রতর করা হলো। পুলিশরাজ এবং গুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠা হলো। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী ও নেতাদের হত্যা করা শুরু হলো। হাজার হাজার পরিবারকে ঘরছাড়া করা হলো। পশ্চিমবাংলায় সে এক অন্ধকার যুগ। বিভীষিকার রাজত্ব। পশ্চিমবাংলার সচেতন, সংগ্রামী শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব, মহিলা নতজানু হয়ে, হাত জোড় করে আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী পশ্চিমবাংলার সরকারের সামনে বসে থাকে নি। ৪ঠা অক্টোবর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হাজারে হাজারে মানুষ আক্রমণ, সন্ত্রাসের মোকাবিলা করে জমায়েত হয়েছেন ময়দানে। পাশাপাশি শাসকশ্রেণী যুবকদের মোহগ্রস্ত করে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে চাকরি দেওয়ার স্লোগান তুলেছে। অপরদিকে সরকারী এবং প্রাইমারী স্কুলে শূন্যস্থান পূরণের কোন ব্যবস্থা হয় নি। চাকরিতে নিয়োগের সমস্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, রীতি-নীতি ভঙ্গ করে দলীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গণতন্ত্রের

ঘাতকবাহিনীদের কিছু নিয়োগের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বেকারদের কাজ দেওয়ার সমস্ত প্রতিশ্রুতি ফানুসে পরিণত হয়েছে। দিশেহারা বেকার যুবক।

এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব, মহিলা, শিক্ষকদের ২৬টি গণসংগঠন মিলিত হয়ে ২৬শে নভেম্বর শহীদ মিনার ময়দানে বেকারীর বিরুদ্ধে সমাবেশের আহ্বান জানালেন। এই জমায়েতে সামিল হওয়ার পথে ট্রেনে, বাসে, পথে, স্টেশনে পুলিশ, সি. আর. পি এবং গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে যুবকদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করা হলো। সেই আক্রমণকে মোকাবিলা করে, নানা কৌশলে হাজারে হাজারে যুবক রক্তাক্ত দেহে ময়দানে সমবেত হলেন। অন্যান্য বামপন্থী নেতৃবৃন্দের সংগে আজকের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সেদিন ঘোষণা করলেন, "একটিমাত্র দাবীর ভিত্তিতে এমন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অতীতে আর কখনও গড়ে ওঠে নি। সর্বশক্তি দিয়ে একে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে হবে। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে এই দাবীর ভিত্তিতে রাজ্য কন্‌ভেনশন সফল করে তুলতে হবে।" ১৯৭৩ সালে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ত্যাগরাজ হলে অনুষ্ঠিত হলো ২৬টি গণসংগঠনের মিলিত উদ্যোগে রাজ্য কন্‌ভেনশন। এই রাজ্য কন্‌ভেনশনের প্রাক্ প্রস্তুতি হিসাবে প্রায় আড়াই মাস ধরে চলল অঞ্চল, থানা, মহকুমা এবং জেলা ভিত্তিতে যুব কন্‌ভেনশন। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৭১৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হলেন। দাবী উত্থাপিত হলো—সমস্ত বেকার যুবকদের কাজ চাই, কাজের অধিকারকে সংবিধানের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, কাজ সাপেক্ষে বেকার ভাতা দিতে হবে। এই দাবীগুলির ভিত্তিতে আশু আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হলো —২৮শে মার্চ ২৬টি সংগঠনের উদ্যোগে ১২ ঘণ্টা অবস্থান। অবস্থানে নেতৃত্ব দেবেন বামপন্থী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

২৮শে মার্চ, ১৯৭৩। চৈত্রের খরতপ্ত গনগনে দিন। স্থির লক্ষ্যে শহীদদের রক্ত আর শত শত মা-বোনেদের আগুন-ঝরা, অশ্রুভেজা পথ বেয়ে সেদিন যৌবনের ঢল নামলো। এসপ্লানেড ইস্ট ছাপিয়ে গেল। গলিত পিচ্ স্পর্ধা হারালো যৌবনের দৃপ্ত পদভারে। প্রতিটি নিশ্বাসের সংগে যুবাদের কণ্ঠ দাবীতে সোচ্চারিত হয়ে তেজদীপ্ত সূর্যকে করলো স্তম্ভিত। তাই ২৮শে মার্চ, শাসকশ্রেণীর হিংস্র আক্রমণকে মোকাবিলা করে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতির স্বরূপকে উন্মোচিত করে ঐক্যবদ্ধ বেকারী বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে যুবকদের বলিষ্ঠ ভূমিকায় ভাস্বর।

এবারের ২৮শে মার্চ গোটা দেশ এবং রাজ্য রাজনীতির এক নূতন পরিস্থিতিতে উপস্থিত হতে চলেছে। এ রাজ্যের যুবসমাজ তথা জনগণের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকার যুবসমাজের সামনে কোনো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় নি। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন থেকেই ৩৬ দফা কর্মসূচির প্রতিশ্রুতি জনগণের সামনে উপস্থিত করেছে। এই সরকারের প্রায় চার বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই ২৭ দফা কর্মসূচি কার্যকরী করা হয়ে গেছে। পুঁজিবাদী সামন্ত-তান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান কোনোমতেই সম্ভব নয় এই বিশ্বাসে দৃঢ় থেকেই বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত বেকার যুবকদের কাজ দেওয়ার কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ৩৬ দফা কর্মসূচির মধ্যে উপস্থিত করেনি। কিন্তু এই সমস্যার কিছুটা লাঘব করার লক্ষ্য নিয়েই নূতন শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য যোজনা এবং প্রকল্প সম্পর্কিত প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপস্থিত করা হয়েছিলো। কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রস্তাবের প্রায় সবটাই প্রত্যাখ্যান করেছেন। বেকারভাতা বাবদ আর্থিক সাহায্য দেওয়ার বিষয়টিও কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকার করেছেন। ভারতের গণ-তান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হান্নান মোল্লা সহ অন্যান্য সরকার বিরোধী দলগুলি 'কাজের অধিকারকে সংবিধানের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি'র দাবী লোকসভায় উত্থাপন করেন। এ দাবীও সরকার পক্ষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়।

এই নূতন পরিস্থিতিতে তাই যুবসমাজের সামনে আগামী ২৮শে মার্চ নূতন শপথের বাণী বহন করে আনছে।

রাষ্ট্রপতি-ভিত্তিক শাসন সম্পর্কে

অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণী নিজের মতো করে সরকার গঠন করে।

যেখানে বুর্জোয়ারা শাসক, সেখানে তারা প্রজাতন্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের শাসন অব্যাহত রাখতে পারে। কিন্তু মাঝে মাঝে এই বুর্জোয়ারা একটা আড়াল চায়। তখনই এরা আড়াল চায়, যখন শ্রেণীদ্বন্দ্ব চরমে ওঠে এবং নিপীড়িত জনগণ ক্রমশই শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে নামে। সেই আড়াল বহু রকমের হতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে বুর্জোয়ারা তৃতীয় নেপোলিয়নের হাতে ১৮৫১ সালে শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল। না দিয়ে উপায় ছিল না, কেননা ১৮৪৮ সালের জুন মাসের বিপ্লবে এদের হৃৎকম্প সুরু হয়েছিল।

বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থাগুলির মধ্যে প্রজাতন্ত্রই শ্রমিক ও অন্যান্য উৎপাদক শ্রেণীর পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক। কেননা শত্রুকে মুখোমুখি দেখলেই তার সঙ্গে লড়াই করা সোজা হয়ে যায়। এবং প্রজাতন্ত্রেই বুর্জোয়ারা কোন রকম মুখোশ না পরেই রাজ্যশাসন করে। এই জন্যই "মার্কস্‌বাদ এবং শোধনবাদ" নামক গ্রন্থে লেনিন বলেছেন সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় শোষক ও শোষিতের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান শ্রমজীবী জনসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয় এবং এই অর্থনৈতিক ব্যবধান আরও সঙ্কটজনক পর্যায়ে পৌঁছোয়। তিনি আরও বলেছেন সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মাধ্যমেই জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা সম্পূর্ণতর হয় এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বর্ধিত হয়।

বুর্জোয়ারাও অত্যন্ত সচেতন শ্রেণী এবং সেই জন্যই সামাজিক সঙ্কটের সময় এই শ্রেণী সংসদীয় প্রথা ভেঙ্গে দিতে ইতস্ততঃ করে না। এই বিংশ শতাব্দীরই প্রথমার্ধে জার্মানিতে ফ্যাসিস্তরা সংসদীয় প্রথার বিলোপ সাধন করে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ঐ সময় একমাত্র ইংলন্ড ছাড়া সারা ইউরোপেই একনায়কত্ব বিভিন্ন আকারে দেখা দিয়েছিল।

একনায়কত্ব শ্রমজীবী জনসাধারণের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের একটা অস্ত্র। সাম্রাজ্যবাদীর কাছ থেকে স্বাধীনতা পাবার পর অনেক এশীয় ও আফ্রিকার দেশে নবজাত বুর্জোয়া শ্রেণী সামরিক শাসনের মারফৎ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। এই যুগ হল পুঁজিবাদের সংকটের যুগ—কাজেই ইউরোপে নবোন্মেষিত বুর্জোয়া-শ্রেণী সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য এবং লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে সামন্ততন্ত্রের অবশেষটুকু নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পুঁজিবাদের সংকটের যুগে নবজাত বুর্জোয়ারা এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে ঐ ঝুঁকি নিতে পারে নি, কেননা তারা জানে যে, "…..Parliamentarism does not make for the elimination of crises and political revolutions, but for the maximum intensification of civil war during such revolutions" (লেনিন গ্রন্থাবলীর ১৫শ খণ্ডে ২৯-৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ভারতবর্ষেও পুঁজিবাদের সংকট ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই যে, এইখানে সেজন্যই রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করার কথা অনেকেই বলছেন। যাঁরা এ-কথা বলছেন তাঁরা বুর্জোয়া শ্রেণীরই প্রবক্তা এবং রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থার পক্ষে ওকালতি তাঁরা এই শ্রেণীর স্বার্থেই করছেন।

আমাদের সংবিধানে রাজ্যের উপর রাষ্ট্রপতির শাসন চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে (সংবিধানের ৩৫৬ ধারা দ্রষ্টব্য)। পশ্চিম বাংলা ও কেরালার জনগণ তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় জেনেছেন যে, বামপন্থী মোর্চা জয়ী হয়ে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করলেই কেন্দ্রীয় সরকার বিচলিত হয়ে পড়েন—এবং একাধিক বার এই দুই রাজ্যের নির্বাচিত সরকার বাতিল করে দিয়ে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত করা হয়েছে।

কিন্তু সংবিধানে কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করার কোন বিধান বা পদ্ধতি নেই। শাসকশ্রেণী এর অভাবে এখন অস্বস্তি-বোধ করছেন। লোকসভা ও রাজ্যসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর সব সময় আস্থা রাখা যায় না। এ'রা এক পার্টির লোক হলেও বিপদ থেকে যায়। এই বিপদের আশঙ্কা করেই ১৯৭৫ সালের জুন মাসে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার ঘোষণা করেছিলেন। কে না জানেন যে, সেই সময় জরুরী অবস্থা ঘোষণার অন্যতম কারণ ছিল লোকসভার কংগ্রেসী সদস্যদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব।

সংবিধানগত প্রশ্নগুলির মধ্যে প্রধানতম হল জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব। সরকার গঠিত হয় জনসাধারণের স্বার্থে এবং সরকারের কার্যাবলীর প্রধান উদ্দেশ্য জনসাধারণের কল্যাণ। কিন্তু এই কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ না থাকলে একনায়কত্বের উদ্ভব হয়। একনায়ক এবং স্বৈরতন্ত্রী শাসকরা সব সময় এ-কথাই বলে থাকে যে, জনসাধারণের কল্যাণের জন্যই তারা সমস্ত ক্ষমতা তাদের হাতে নিয়েছে। এ সমস্তের একটাই প্রতিকার রয়েছে। জনসাধারণকে তার কল্যাণের ভার নিজেই গ্রহণ করতে হবে। এবং সংবিধান নির্মাণ এমনভাবে করতে হবে যাতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ বাধামুক্ত হয়। সমস্ত সংবিধান রচনার এটাই মূল কথা।

কোন সংবিধান রচনার কথা ভাবতে গেলে বা সংবিধান সংশোধনের কথা উঠলে আমাদের এই প্রশ্নটাই সর্বাকছুর সামনে রাখতে হবে যে, প্রস্তাবিত সংবিধান বা প্রস্তাবিত সংশোধন জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের সমস্যার সঠিক মীমাংসা দিচ্ছে কি না।

১৮৭১ সালে প্যারী কমিউনের পতনের পর মার্কস্‌ ইউরোপ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম আন্তর্জাতিক সদস্যদের সামনে যে ভাষণ রেখেছিলেন, সেখানে তিনি শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব ও কি শাসনব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের কর্তৃত্ব থাকে সে সম্বন্ধে মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, সেই শাসনব্যবস্থাই সবচেয়ে কল্যাণকর যে ব্যবস্থায় শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রতিনিধিরা একাধারে আইন প্রণয়ন করবেন এবং সেই আইন কার্যকর করার দায়িত্বও গ্রহণ করবেন। একই সঙ্গে এই প্রতিনিধিরা প্রশাসক ও আইন প্রণেতা। মার্কসের এই বৈশ্লেষণিক প্রস্তাব সুদূরপ্রসারী ও বৈপ্লবিক। যে কোন বুর্জোয়া সাংবিধানিক এই প্রস্তাবে বিচলিত বোধ করবেন, কেন না বুর্জোয়া সংবিধানগুলিতে প্রশাসনকে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে জনসাধারণের প্রতিনিধি বা সংসদ ও আইনসভার আওতার বাইরে রেখে দেওয়া হয়। বুর্জোয়ারা কি আইন হল বা না হল এই ব্যাপারে যতটা না আগ্রহী, আইনের সম্পাদন ও কার্যকরীকরণের উপর তাদের আগ্রহ অনেক বেশী। এ-কথা কে না জানেন যে, আমলাতন্ত্রকে কাজে লাগাতে বুর্জোয়ারা ওস্তাদ। আমলাতন্ত্রের উপর তারা প্রভাব বিস্তার

করে থাকে শুধুমাত্র ঘুষ বা উৎকোচ দিয়ে নয়। একটা বিশেষ শ্রেণীর আমলা (ভারতবর্ষে যেমন আই.এ.এস.) তারা তৈরী করায় এবং এই শ্রেণীর আমলাদের বিশেষ ধরনের শিক্ষা দিয়ে তাদের মনেপ্রাণে বুর্জোয়াদের বশংবদ করে তোলে। প্রত্যক্ষ প্রভাবের বদলে এই রকম পরোক্ষ প্রভাবের উপর জোর বেশী করে দিয়ে বুর্জোয়ারা প্রশাসকমণ্ডলীকে তাদের সংগে অদৃশ্যবন্ধনে বেঁধে রাখে। কাজেই বুর্জোয়া সাংবিধানিক পণ্ডিতেরা জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা দিতে নারাজ। তা হলে ত' বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসনের ভিত্তি টলে উঠবে।

মার্কসের বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত বুর্জোয়া সমাজে মেনে নেবে না। সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠিত হলেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সোভিয়েতগুলো মার্কস কথিত একাধারে আইন প্রণেতা ও প্রশাসক। সোভিয়েত সদস্যরা প্রশাসনিক কর্মচারীদের ঘাড় ধরে কাজ করিয়ে নেন। ভারতবর্ষে বা অন্যান্য বুর্জোয়া দেশগুলিতে সংসদ সদস্যরা প্রশাসনে এই রকম বা কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। প্রশাসনকে একমাত্র এক উপায়েই সংসদ প্রতিনিধিরা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন—বিভাগীয় মন্ত্রীদের প্রশ্ন করে। কিন্তু প্রতিদিন এক ঘণ্টার প্রশ্নোত্তরে কি বা হতে পারে!

কিন্তু এটুকু নিয়ন্ত্রণও থাকবে না, যদি রাষ্ট্রপতিভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রপতি-শাসনব্যবস্থার আদর্শ দেশ হল যুক্তরাষ্ট্র। ছোট্ট কথায় সেই দেশের শাসনব্যবস্থার কথা বলি। সেখানে প্রতিনিধি সভা ও সেনেট দুটি নিয়ে কংগ্রেস। প্রতিনিধি সভার নির্বাচন নির্দিষ্ট সময়সীমার পরেই হয় এবং ঐ নির্বাচনের আগেই প্রতিনিধি সভা বাতিল করে দেওয়া হয়। সেনেট হল এক স্থায়ী সভা এবং আমাদের রাজ্যসভার মত নির্দিষ্ট সময়ের পর ঐ সভার একটি অংশমাত্র অবসর গ্রহণ করে থাকেন এবং তাঁদের বদলে নতুন নির্বাচন হয়ে থাকে। কংগ্রেসের ক্ষমতা শুধু আইন প্রণয়নের, প্রশাসনের উপর কোন ক্ষমতা নেই। প্রশাসনের শীর্ষে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন একটা জটিল পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা না করে এইটুকু বলা যায় যে, এই নির্বাচন পরোক্ষ। ভোটদাতাগণ তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করবেন, ঐ প্রতিনিধিরা আবার তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত একটা ৪৮০ বা ৫০০ জনের একটি প্রতিনিধি সভা বিবদমান দুই বা ততোধিক প্রার্থীদের মধ্যে কে রাষ্ট্রপতি হবেন ভোট দিয়ে ঠিক করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যদের মনোনীত করেন। এই সব মন্ত্রীরা কংগ্রেসের সভ্য নন এবং কংগ্রেসের আস্থার উপর নির্ভর করেন না। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে কংগ্রেস এই সব মন্ত্রীদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে পারেন না। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে এই নিয়ন্ত্রণের কোন উপায় রাখা হয় নি। শুধুমাত্র কংগ্রেসে কয়েকটি কমিটি এই সব মন্ত্রীদের তলব করে তাঁদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানকার্য চালাতে পারেন। প্রথম নিয়োগের পরও এই রকম কমিটি নিযুক্ত মন্ত্রীদের তলব করে তাঁদের নানারকম প্রশ্ন করে যাচাই করে নিতে পারেন। যেমন, কয়েকদিন আগে সেনাপতি হেগকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত করার পর কংগ্রেসের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটি বহুদিন ধরে তাঁকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছিলেন। আমরা দেখেছি যে সেনাপতি হেগ তাঁর উত্তরে ঐ কমিটিকে প্রায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রে প্রশাসনের উপর কংগ্রেসের যেটুকু নিয়ন্ত্রণ অধিকার আছে, তা সামান্য এবং ফলপ্রসূ নয়।

তুলনা করলে দেখা যাবে যে, সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রশাসনের উপর সংসদ বা সংসদ-সদস্যদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অনেক বেশী। প্যারী কমিউন নির্দেশিত প্রথায় সংসদ স্বয়ং প্রশাসন পরিচালিত করে না। কিন্তু সংসদ নানাভাবে প্রশাসনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। নিয়ন্ত্রণের একটা উপায় ইতিপূর্বেই দেখিয়েছি—সংসদে অধিবেশন চলাকালে প্রতিদিন প্রশ্নের মাধ্যমে। প্রশ্নের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব কেন না বিভাগীয় মন্ত্রীরা সংসদের সদস্য হতে বাধ্য। এবং সংসদের সদস্যদের উপর সংসদের কর্তৃত্ব অনস্বীকার্য। কড়া সমালোচনা ত আছেই—সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়ে একগুঁয়ে সংসদ-অবজ্ঞাকারী যে কোন বিভাগীয় মন্ত্রীকে অপসারণ করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিভাগীয় মন্ত্রীদের (যুক্তরাষ্ট্রে এ'দের Secretary বা সম্পাদক বলে আখ্যা দেওয়া হয়) উপর এই রকম ক্ষমতা প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই।

স্যর ওয়াল্‌টার বেজট ইংরেজদের সংবিধান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ইংরেজদের মন্ত্রীসভা যেন দুটি বাক্যের মধ্যে একটি "হাইফেনে"র মতো—অর্থাৎ মন্ত্রীসভা, আইনসভা ও প্রশাসনের মাঝখানে একটি সেতুর কাজ করছে। সেই সেতুর উপর দিয়ে সংসদ প্রশাসনের দুর্গে হানা দিয়ে থাকে।

যদি আমরা প্রশাসনের উপর জনসাধারণ বা জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ চাই, তাহলে বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থাগুলির মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রকে বেছে নেব। বুর্জোয়ারা আধুনিক সমস্ত সংবিধানে ক্ষমতার বিভাগীকরণের উপর জোর দিচ্ছে—অর্থাৎ আইনসভা আইন প্রণয়ন করবে, প্রশাসন শাসন করবে এবং বিচারক-মণ্ডলী আইনের ব্যাখ্যা করে নানাভাবে উদ্ভূত বিরোধের মীমাংসা করবে। বিভাগীকরণ বুর্জোয়াদের স্বার্থে—এ-কথা স্পষ্ট। জন-সাধারণের প্রতিনিধিরা যদি ঐ শ্রেণীর স্বার্থবিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করেন তাহলে অন্ততঃ দুটো বাধা রইল। প্রশাসন ঐ আইন কার্যকরী করবার ব্যাপারে অনীহা দেখাতে পারে এবং উচ্চ আদালতগুলি ঐ সমস্ত আইন নানা কারণে নাকচ করে দিতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সেজন্য বিভাগীকরণের কোন তাগিদ না থাকায় ক্ষমতা বিভাজনের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই। একই সংস্থা, সোভিয়েতমণ্ডলী আইনও প্রণয়ন করেন এবং ডিক্রী, অধিনিয়ম ইত্যাদি চালু করে প্রশাসনের কাজও করেন। বিচার বিভাগ শুধু বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এবং ঐ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজন হলে আইনের ব্যাখ্যা করতে পারবে, কিন্তু কোনো আইন সংবিধানবহির্ভূত বলে তাকে বাতিল করে দিতে পারে না। এ ক্ষমতা ইংলন্ডের বিচারালয়েরও নেই। পার্লামেন্টে পাশ কোন আইনকে ইংলন্ডের বিচারালয় নাকচ করে দিতে পারে না। প্রবাদে আছে, ইংলন্ডের পার্লামেন্ট এত ক্ষমতাশালী যে সেখানে নারীকে পুরুষ এবং পুরুষকে নারী করা যায়।

ভারতবর্ষে ইংলন্ডের মডেলে সংসদীয় গণতন্ত্র বর্তমান। ক্ষমতার বিভাজন যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে করা হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্রে সেভাবে ক্ষমতা-বিভাজনের ব্যবস্থা নেই। জনসাধারণের স্বার্থে এই ব্যবস্থাই বর্তমান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্রপতিভিত্তিক শাসন প্রশাসনকে আইনসভার নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে গিয়ে জনসাধারণের স্বার্থের হানি করবে।

রাষ্ট্রপতিভিত্তিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সেই জন্য জনমত জাগ্রত করার প্রয়োজন আছে এবং এই ব্যবস্থা যাতে কোনোমতে না চালু হয় তার জন্য সচেষ্ট ও সজাগ থাকতে হবে।

মেঠো পথের ডাক্তারবাবু

ডঃ অশোক মিত্র

ভারতীয় চিকিৎসক সংস্থার অবজ্ঞা এবং কলকাতা নগরীর পেশাদার ও নামীদামী চিকিৎসকদের আশংকা উপেক্ষা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার অভিনন্দনযোগ্য। শুরুতে রাজ্য সরকার তিনটি জেলাকেন্দ্রে চিকিৎসা-বিদ্যা ও শল্য-চিকিৎসার উপর তিন বছরের এক স্বল্পকালীন শিক্ষাক্রমের সূচনা করেছেন। এ ব্যাপারে বিশেষ করে বলার মত হলো স্থানীয় যুবক-যুবতীদের জন্য এই পাঠক্রমে ভর্তি হওয়ার অগ্রাধিকার ঘোষণা। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে যদি বর্তমান সরকার এই সংস্কারের সূচনা ঘটাবার সুবুদ্ধি দেখাতেন তাহলে এতদিনে এর সুফল তাঁরা ঘরে তুলতে পারতেন।

বহুদিন ধরেই এই ধরনের একটি দৃঢ় সিদ্ধান্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও নেওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছে। তা না করে সরকার যুবক-যুবতীদের কাছে কোনকিছু পাওয়ার আশা নস্যাৎ করে বেকারভাতা বাবদ প্রচুর টাকা অপচয় করছেন। পরিস্থিতি কি পরিমাণ দুঃখজনক বোঝা যায় যখন দেখি ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে যেখানে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে দ্বিতীয় স্থানে ছিল, ১৯৭১ সালে তার স্থান হয় দ্বাদশতম এবং মহিলা শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে আরো পিছিয়ে অষ্টাদশ-এ পেঁছোয়। এভাবে পিছিয়ে পড়লে ১৯৮১'তে সবার শেষে স্থান পাওয়াই স্বাভাবিক। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের পরামর্শদাতাদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাপ্রসারে পিছিয়ে পড়া রাজ্য হিসাবেই পরিচিত।

১৯৪০ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও বর্তমান বাঙলাদেশের জেলায় যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা সহজেই স্বীকার করবেন যে গ্রামে-গঞ্জে হাজারপ্রতি চিকিৎসা লাভের সুযোগ ১৯৮০ সালের চেয়ে সেই সময় বা তারও আগে অনেক বেশি ভাল ছিল। স্মরণ করা যেতে পারে যে তখনকার জেলাকেন্দ্রিক গ্রামীণ চিকিৎসা ব্যবস্থা মুখ্যত তদানীন্তন এল.এম.এফ./ এল.এম.এস.-দের দ্বারাই পরিচালিত হতো। উল্লেখ করার বিষয় হলো তখনকার গ্রামীণ চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ডাক্তারবাবুরা জটিল রোগের জন্য মহকুমা ও সদর শহরের হাসপাতালে যুক্ত বা প্রাইভেট এম.বি.বি.এস. চিকিৎসকদের কাছে যে নির্দেশ পাঠাতেন তা খুবই বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচিত হতো এবং মোটামুটি তার ভিত্তিতেই তাঁরাও পরের উন্নতমানের চিকিৎসালাভের জন্য কলকাতায় অনুরূপ নির্দেশ পাঠাতেন।

নিজেই দেখেছি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গ্রামে-গঞ্জে ঘোরার সময় মাঝে মাঝে তাঁর কাছে এল.এম.এফ/এল.এম.এস ডাক্তারদের পাঠানো জটিল কেস পরীক্ষা করে দেখতেন। এইসব গ্রামের ডাক্তারবাবুদের গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার মত লোভনীয় কিছু বা বিদেশ পাড়ি দেওয়ার প্রশ্নও ছিল না। অন্যদিকে গ্রাম্য পরিবেশের স্বচ্ছন্দ আত্মীয়তা ও প্রয়োজনীয় রোজগার যা হোত তা থেকে তাঁরা মোটামুটি ভালভাবেই দিনযাপন করতেন।

গত ১৫ বছরে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের ফলে দেশে এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে অন্ততপক্ষে দু'তিনজন মাধ্যমিক বা হাইস্কুল পাস যুবক-যুবতীর সন্ধান পাওয়া যায় না। তাদের দেবার মত কাজ না থাকায় তারাও বেকার হয়ে থাকলো। শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকের প্রতি হাস্যকর অগ্রাধিকার জগদ্দল পাথরের মত ঘাড়ে চেপে থাকায় বেশির ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিক্ষক পাওয়া গেল না—এই অবস্থায় স্থানীয় শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের একাজের অঙ্গীভূত করা হলে ফল ভালই হোত।

বিদ্যালয় শিক্ষক, জনস্বাস্থ্যকর্মী, অচিকিৎসক পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ ও পরিবারকল্যাণকর্মী নিয়োগের ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণকে বিবেচনা না করা খুবই দুঃখজনক ও ক্ষতিকর। অথচ একটি সুচারু প্রশিক্ষণবিধি প্রণয়ন করে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দিলে অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামের যুবক-যুবতীদের মধ্য থেকে দায়িত্বপূর্ণ শিক্ষক, জনস্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণকর্মী তৈরী করা সম্ভব হোত। এবং তাদের সাহায্য করার জন্য জনকল্যাণকারী বিজ্ঞদের গ্রামীণ অজ্ঞতা দূরীকরণে সামিল করলে ফল আজ সুদূরপ্রসারী হতে পারতো।

অভিজ্ঞতার আলোকে বার বার প্রতিফলিত হওয়া সত্ত্বেও একটা জিনিস আমরা বুঝতে চাই না যে, স্থানীয় মানুষের হাতে সেই এলাকার ভালমন্দের দায়িত্ব দিলে বাইরের একজন কেবলমাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তির চেয়ে কর্মপরিচালনায় তাদের দরদ, দায়িত্ব ও সতর্কতাবোধ বেশি হোত। কারণ অঘটনের জন্য অভিজ্ঞ বিদেশী অপেক্ষা কৈফিয়তের দায়িত্ব তাদেরই বেশি।

স্থানীয় নিয়োগ

একজন ভাড়াটে আমলা এবং একজন ভাল সপ্রাণ কর্মীর মধ্যে পার্থক্যই হ'লো নিজেদের মানুষের কাছে তাদের কৃতকর্মের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকা। এছাড়া স্থানীয় কর্মীরা পরিবেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে গভীরভাবে সংপৃক্ত। এবং স্থানীয় জনসাধারণও ভেবে আশ্বস্ত হতে পারেন যে তাঁদের মধ্যে থেকে যা সর্বোত্তম সেই ব্যবস্থার সুযোগই তাঁরা পাচ্ছেন। প্রচলিত বিধিব্যবস্থা বহিরাগত সাহায্যের উপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল অথচ আশু প্রয়োজন স্বনির্ভরতা ও নতুন কর্মী সংযোজন।

আশ্চর্য যে, এই প্রণালীর বিরুদ্ধাচরণ করছেন নামকরা পেশাদাররাই। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন-এর প্রসারে সুযোগ-সুবিধা বাড়ছে সত্য কিন্তু প্রয়োজনে স্ব-স্বার্থে শিক্ষক, চিকিৎসক, জনস্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণকর্মী ইত্যাদিরা একত্রিত হয়ে জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে কাম্য রোজগারের সমতা রক্ষা নীতি এবং এমন কি অধিক উৎপাদনে বাধা দিয়েও নিজেদের কোলে ঝোল টানতে ব্যস্ত।

যে সব দেশ পশ্চিম ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যেখানকার নিয়মবিধিতে নগরকেন্দ্রিক সুবিধাবাদীরাই সুযোগের সিংহভাগ ভোগ করতেন তাঁদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই ধরনের শাসনযন্ত্রের প্রধান লক্ষ্যই ছিল এমন নিয়মতন্ত্র তৈরী করা যাতে (নেহাৎ প্রয়োজন না হলে) করে দূর থেকে আমলাদের দমনমূলক শাসনব্যবস্থায় কাজ চালানো যায়। যদিও বর্তমান প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ৬

সপ্তাহ থেকে ৩ বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় জনস্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণকর্মী তৈরী করা সম্ভব তা সত্ত্বেও অনুন্নত দেশের পেশাদার ও প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকরা পাঁচ বছরের প্রচলিত ব্যয়বহুল ও বাদশাহী চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে অন্য ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারেন নি।

এর পরিষ্কার অর্থ সামান্য কিছু মানুষের একচেটিয়া আধিপত্য যারা (ক) প্রায় বিনা খরচে এবং বিপুল সরকারী ব্যয়ে শিক্ষা পায়, (খ) বছর ১০।১২-র মধ্যে নিজেদের অর্থলোভী পিশাচে পরিণত করে এবং (গ) উপযুক্ত সময়ে অর্থের মোহে বিদেশ পাড়ি দেয়। স্বভাবতই বোঝা দুষ্কর নীচের ছত্রটি কাদের উদ্দেশ্যে লেখা, কেনই বা আগেকার এল. এম. এফ/এল. এম. এস. শিক্ষাক্রম পুনঃ প্রবর্তনে বাধাদান এবং কাদের লক্ষ্য করে এই বিরত থাকার সতর্কবাণী।

গ্রামীণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে

"চিকিৎসা বিদ্যার সময় কতটা কমানো যায় সেই সমস্যা নিয়ে আলোচনাকালে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ বর্তমানে অর্থহীন। যেমন গ্রামের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ডাক্তার তৈরী করার সঙ্গে এগুলিকে যুক্ত করা অনাবশ্যক। গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস-কারী ডাক্তার পাওয়ার ব্যাপারে বিপুল আর্থ-সামাজিক বিষয়সমূহ জড়িত। একদিকে যেমন এইসব বিষয়গুলি উপযুক্তভাবে বিচার বিবেচনা করে তার সমাধান করা দরকার তেমনি সময় কমালেই সুফল পাওয়া যাবে এটা ভাবাও অলসচিন্তা মাত্র। সেই রকম আগেকার এল. এম. এফ. ইত্যাদি শিক্ষাক্রম পুনঃপ্রবর্তন করে গ্রামীণ সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে এ ভাবনাও অসঙ্গতিপূর্ণ। জনস্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর যে প্রস্তাব আমরা দিয়েছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দাবী হ'লো সবার জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তার, হাতুড়ে নয়। সর্বদিক বিবেচনা করে আমরা দ্ব্যর্থ-হীনভাবে এই অভিমত পোষণ করি যে গ্রাম ও শহরের জন্য উত্তম চিকিৎসক তৈরীর বর্তমান ব্যবস্থাই বজায় রাখা উচিত। কম খরচে সম্ভব এই যুক্তির ভিত্তিতে চিকিৎসা বিদ্যার তত্ত্বগত ও গুণগত দিকগুলিকে উপেক্ষা করা কোনমতেই ঠিক নয়। তা করলে এই অর্থহীন মূঢ়তার জন্য পরিশেষে চরম মূল্য দিতে হবে।"

উপরের উধৃতিটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক কর্তৃক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা ও সহযোগী বিদ্যা প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়ের উপর ১৯৭৫ সালে গঠিত পরিষদমন্ডলীর অবশ্যকরণীয় কর্মপন্থা হিসাবে অনুমোদন প্রাপ্ত। এর চেয়ে বিভ্রান্তিকর যুক্তি এবং উপরতলার (সুবিধাভোগী) মানুষের স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা ভাবা যায় না। অথচ বেশ কয়েক বৎসর থেকেই দেশের আপামর জনসাধারণ এই সব রথী-মহারথীদের কাছ থেকেই নগ্নপদ চিকিৎসক, স্বনির্ভরতা এবং প্রত্যেকের জন্য সুচিকিৎসা ইত্যাদির উপর সীমাহীন প্রশংসাবাণী শুনে এসেছেন।

ডঃ অশোক মিত্র বর্তমানে দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংখ্যা শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক। একসময়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার হিসাবে জেলা প্রশাসন সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত।

(প্রবন্ধটি 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত)

প্রতিবন্ধী: মূক বধিরদের সম্পর্কে

ডাঃ আবিরলাল মুখার্জী

বিশ্ব প্রতিবন্ধী বর্ষে একটা স্লোগান কানে এল—'সক্ষম আমরাও বৃহত্তর কাজে,/সমতার দাবি রাখি আমরা সমাজে।' বধিরতা ও তার সঙ্গে মূক হয়ে থাকার জন্য যে প্রতিবন্ধীরা রয়েছেন, আজকের সমাজে তাদের সমস্যা একটা বিরাট আকারের। যে কোন সমস্যারই ব্যাপ্তি বুঝতে গেলে কিছু পরিসংখ্যানভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজন হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকের দিনে পশ্চিমবঙ্গে কত মূক-বধির রয়েছেন সে সম্পর্কে কোন পরিসংখ্যানভিত্তিক তথ্য নেই।

১৯৪১ সালের এক হিসাবে ১৪,০০০এর মত মূক-বধিরদের খবর পাওয়া গেছিল। তারপর দীর্ঘ ৪০ বছর কেটে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে গাণিতিক নিয়মে এদের সংখ্যাও নিশ্চয়ই বেড়েছে এবং স্বভাবতঃই এই সমস্যার গুরুত্ব বেড়েছে। সমস্যাটা যে কত প্রকট তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যখন দেখি মূক-বধির শিশুদের অসংখ্য পিতামাতা প্রতি বছর ঐ শিশুদের Deaf and Dumb স্কুল বা ঐ জাতীয় অন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। সামান্য যে ক'টি মেডিকেল কলেজ বা অনুরূপ হাসপাতালে ঐ শিশুদের জন্য বিশেষ ক্লিনিক আছে, সেখানেও প্রতিদিন ডাক্তার এবং Speech Therapist গণ সংখ্যাধিক্যের চাপে হিমসিম খাচ্ছেন। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে মূক-বধিরদের শিক্ষা যা বর্তমান ব্যবস্থায় রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। শুধু সংখ্যার দিক দিয়েই নয়, সংগঠনের দিক থেকেও বর্তমান ব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে পশ্চিমবাংলায় সবচেয়ে প্রাচীন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থা Calcutta Deaf and Dumb School -এ ও সাত-আট বছরের আগে ছাত্রভর্তি হবার ব্যবস্থা নেই। অথচ এটা প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য যে মূক-বধির শিশুদের শিক্ষা দেবার সবচাইতে প্রকৃষ্ট সময় ১ থেকে ৫ বছর বয়সের মধ্যে। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষা শুরু করলে শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের কথা শেখানো সম্ভব। বেশী দেরী করে সাত-আট বছর বয়স হয়ে গেলে তাদের ভাষা শেখানো শক্ত এবং প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তারা কথা না শিখলে আকারে ইঙ্গিতে হাতমুখ নেড়েও নিজেদের ভাব প্রকাশ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধরনের Sign language-এর সাহায্যে হয়ত তারা ভাব প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু ঐ পদ্ধতিতে যারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাদের পক্ষে কেবল নিজেদের সীমিত গোষ্ঠীর মধ্যেই ভাব প্রকাশ করা সম্ভব। যারা কথা বলতে পারে তাদের সমাজ থেকে এরা তখন একটা বিচ্ছিন্ন অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পারিপার্শ্বিক জীবনের সঙ্গে একটা অসহনীয় সংযোগহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়। অথচ কথা শিখলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমাজে তাদেরও সমতা আসে। যারা কানে না শোনার জন্য মূক তাদের অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ মানুষের চেয়ে কম নয়। তবে কেন তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে? এইসব শিশুদের অল্প বয়সে শিক্ষা শুরু করে তাদের মুখে কথা ফোটাতে পারলে তারাও ভবিষ্যত জীবনে অন্যান্য সাধারণ মানুষের মত কাজকর্মের মাধ্যমে সামাজিক কাজে লাগতে পারে এবং সাধারণ মানুষের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ভাগীদার হতে পারে, পারে সমতার তাৎপর্যের অধিকারী হতে।

এখন এদের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। এই শিক্ষা পদ্ধতিকে শুরু করতে হবে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ সাধারণ শিশুদের নার্সারী স্কুলের বয়সের চেয়েও অল্প বয়স থেকে। নিঃসন্দেহে এই সব শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের। এখানেও আবার সমস্যা আছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে এইসব বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা অতি নগণ্য। সত্যি কথা বলতে কি Calcutta Deaf and Dumb School-ই পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে বছরে জনাদশেক শিক্ষক এই বিশেষ শিক্ষার ডিপ্লোমার জন্য ভর্তি হন। সেখানেও অনেক প্রার্থীকে বিমুখ হয়ে ফিরে যেতে হয় প্রতি বছর। কর্ণাটকের All India Institute ভারতবর্ষের একমাত্র সুগঠিত প্রতিষ্ঠান যেখানে বধিরদের শিক্ষক তৈরী হচ্ছে। অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যেও ছোটখাট প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু শিক্ষক তৈরী করছেন। কিন্তু সব মিলিয়ে একথা বলা যায় মূক-বধিরদের শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে না পারলে এই গুরুতর সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না।

শুনেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছেন এবং যাতে আরও অধিক সংখ্যক মূক-বধিরদের শিক্ষক তৈরী করা যায় তার জন্য প্রকল্প রূপায়ণ করছেন। এ বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যকর পরিকল্পনা যত তাড়াতাড়ি নেওয়া যায় ততই মঙ্গল।

যেখানে শিক্ষকদের সংখ্যা কম সেখানে মূক-বধির শিশুদের সংখ্যা তো কম নয়। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে মূক-বধিরদের সংখ্যা কমানোর কথা ভাবতে হবে। যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে জন্ম বা জন্মের অব্যবহিত পরেই অসুস্থতাজনিত বধিরদের সংখ্যা কমিয়ে আনা যায়। এক্ষেত্রে বধিরতার কারণ হিসাবে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে কেবল একটা কথা জোর দিয়ে বলা যায় গর্ভাবস্থায় মায়ের অসুস্থতা বা প্রসবকালীন অস্বাভাবিকতা অথবা প্রথম শৈশবে কতকগুলি বিশেষ অসুস্থতা থেকেই অধিকাংশ বধির শিশুর বধিরতার শুরু। কাজেই দেশের মানুষের মধ্যে সচেতনতা আনা উচিত যাতে গর্ভবতী মা চিকিৎসা বিদ্যার যথাযথ সাহায্য নেবেন এবং প্রসবকালে যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য সম্যক চিকিৎসাগত ব্যবস্থা নেবেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই যে সমস্ত রোগ থেকে শিশু বধির হয়ে যেতে পারে তার প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। এখনও গ্রামাঞ্চলে এবং অনেক ক্ষেত্রে কলকাতা শহরের মত জায়গাতেও অজ্ঞানতাবশতঃ গর্ভবতী মায়েরা ডাক্তার দেখাতে লজ্জা বোধ করেন এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সমস্ত বিষয়টি প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনেন। এই কুসংস্কারজনিত লজ্জা ও অনীহা সম্বন্ধে মায়েদের সচেতন করে তুলতে পারলে হয়ত সুফল ফলতে পারে। এখানে আর একটা প্রাসঙ্গিক কথা হ'ল অর্থনৈতিক কারণে বহু প্রসূতি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে উঠতে পারে না। এ বিষয়ে অবশ্যই সরকারী ও শুভানুধ্যায়ী বেসরকারী সংস্থাগুলির দায়িত্ব রয়েছে। আরও বহু সংখ্যক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যাতে গ্রামে ও শহরে গর্ভবতী মায়েরা চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারেন। প্রসূতি মায়েদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য আরও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বহুবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এর পরেও যে সমস্ত শিশু বধির হয়ে জন্মাবে তার সমস্যা

থেকেই যাবে। আগেই বলা হয়েছে যত অল্প বয়সে শিশুর বধিরতা ধরা পড়বে এবং যত শীঘ্র তাকে কথা শেখানো শুরু করা যাবে তার উপর নির্ভর করছে শিশুর কথা বলতে শেখার ভবিষ্যত। সেজন্য যে সব শিশুর মায়ের গর্ভকালীন অসুস্থতা ছিল বা জন্মের অব্যবহিত পরে যারা অসুস্থ হয়েছিল অথবা বংশগত কারণে যাদের বধির হবার আশঙ্কা রয়েছে (Risk Baby) তাদের উপর বিশেষ নজর রাখা দরকার।

এখন কি করে বোঝা যাবে শিশু বধির? একটা কথা প্রমাণিত সত্য যে, বধির শিশুদের মধ্যে প্রায় সকলেরই সামান্য কিছু শোনার ক্ষমতা থাকে। ভবিষ্যতে এই সামান্য ক্ষমতাটুকু কাজে লাগিয়ে তাদের ভাষা শেখানো সম্ভব।

স্বাভাবিক শিশু ও বধির শিশু উভয়ক্ষেত্রেই প্রথম ছ'-সাত মাস পর্যন্ত প্রচণ্ড শব্দ হলে চমকে উঠবে। কিন্তু ছ'-সাত মাসের পর যে শিশু শুনতে পায় সে শব্দের তাৎপর্য বুঝতে পারবে এবং একটি শব্দ থেকে অন্য শব্দের পার্থক্য তার কাছে অর্থবহ হয়ে উঠবে। যেমন ধরুন, দরজা বন্ধ করার শব্দে সে দরজার দিকে তাকাবার বা ঘাড় ঘোরানোর চেষ্টা করবে। ঝিনুক-বাটির শব্দ শুনে শিশু ইঙ্গিতে আনন্দ পাবার আভাস দেবে। প্রকট শব্দ যে শিশু শুনতে পায় সে হয়ত চমকে উঠবে না। কিন্তু ন'মাস বয়সের পরেও যে শিশু প্রতিবারেই চমকে উঠবে সেই শিশুতে বধিরতা আছে বলে সন্দেহ করতে হবে। এই সব লক্ষণ সাধারণতঃ শিশুর মায়ের চোখে পড়ে। মা তখন সন্দেহ করতে পারেন শিশু বধির। এখানে একটা কথা বলা দরকার, এই সব লক্ষণগুলি মায়েদের সন্দেহ যেমন হয় তেমনি ডাক্তারদের অভিজ্ঞতা মা যখন সন্দেহ করেন শিশু কানে কম শুনছে তখন দেখা যায় শতকরা নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই মায়ের সন্দেহ অমূলক নয়। এই শিশুদের তখন বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং বধিরতা নির্ণয় হয়। সঙ্গে সঙ্গেই কথা শেখানোর চিকিৎসা শুরু করা দরকার এবং এর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই Hearing Aid পরিয়ে শিশুকে দিনের মধ্যে যতক্ষণ সম্ভব কথা শোনাতে হয়। এ বিষয়ে মায়ের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী কেননা মা প্রায় সব সময়ে শিশুর কাছে থাকেন। তিনি কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে শিশুকে কথা শোনাবেন অথবা Hearing Aid-এর সাহায্য নেবেন; মা ইশারা করবেন না এবং কথা বলার সময় শিশুকে ঠোঁট নাড়া শিখতে দিবেন। Hearing Aid -এর মাধ্যমে কথা শুনে এবং ঠোঁট নড়া দেখে শিশু কথা শেখার তাৎপর্য বুঝবে। তাতে করে শিশুর কথা বলতে শেখার ভিত্তি তৈরী হবে। শিশু আর একটু বড় হলে অর্থাৎ এক বা দু' বছর হলে তাকে নানান ছবি দেখিয়ে, গাছপালা পশুপাখি দেখিয়ে, তাদের নাম শুনিয়ে কথা শেখানোর চেষ্টা করতে হবে। কোন একটা কথা বলতে শিখলে সেই কথাটা বারবার বাক্যে ব্যবহার করে শিশুর মনে সেই কথাটির তাৎপর্য গেঁথে দিতে হবে এবং কিছু কথা শিখলে তাকে স্বাভাবিক শিশুদের স্কুলে ভর্তি করে দিতে হবে। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বাভাবিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই সমস্ত শিশুদের স্কুলে নিতে চান না। মূক-বধিরদের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে নজর রেখে এই সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সচেতন করতে হবে। এই শিশুদের বাঙ্ময় করে তোলার ক্ষেত্রে এটা একটা জরুরী পদ্ধতি এবং সাধারণ স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও এ বিষয়ে দায়িত্ব রয়েছে। এই শিশুদের কথা শেখানোর পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ এবং মা ও অন্যান্য পরিজন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা যাঁরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের প্রচুর ধৈর্যের প্রয়োজন। অনেক মা আছেন যাঁরা মনে করেন শিশু বোধহয় Hearing Aid পরলেই তার পরের দিন থেকে কথা বলতে শুরু করবে এবং দু'চারদিন দেখেই হতাশ হয়ে Hearing Aid খুলে রেখে দেন। এইসব মায়েদের সচেতন হতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে শিশুকে Hearing Aid পরিয়ে রাখতে হবে এবং দিনের চব্বিশ ঘণ্টার বেশীর ভাগ সময়ে শিশু Hearing Aid -এর সাহায্যে শব্দ শুনতে পেলে নিজেই আগ্রহান্বিত হবে এবং Hearing Aid পরে থাকতে চাইবে। এখানে আর একটা কথা বলা দরকার অনেক মা আছেন যাঁরা শিশুর বধিরতাকে লুকিয়ে রাখতে চান এবং Hearing Aid পরে থাকলে অন্য লোকে শিশু যে বধির একথা জানতে পারার আশঙ্কায় শিশুকে Hearing Aid পরতে দেন না। এই ধরনের লজ্জা বা কুসংস্কার শিশুর পক্ষে যে ক্ষতিকর এ কথাও বধির শিশুর মায়েদের জানা উচিত।

এরপর আসা যাক যে সব শিশু হয়ত অল্প বয়সে অর্থাৎ প্রকৃষ্ট সময়ে (১-৫ বছর) শিক্ষার সুযোগ লাভ করেনি এবং যাদের বয়স বেড়ে গেছে তাদের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে। এদের শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ তাদের ভবিষ্যৎ পুনঃ প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দেওয়া। এই অংশের শিক্ষানীতি প্রধানতঃ তিনভাবে চিন্তা করা হয়ে থাকে। এক, শিক্ষামূলক—যাতে করে পড়া, লিখা এবং অঙ্ক কষা এই তিন বিষয়ে শিশু শিক্ষিত হতে পারে। এদের জন্য বিশেষ স্কুল দরকার। যেমন Calcutta Deaf and Dumb School রয়েছে। প্রধানতঃ দৃষ্টিশক্তি, স্পর্শশক্তি এবং শ্রবণশক্তির অবশিষ্টাংশ– এই তিন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। সঙ্গে কিছু কারিগরী শিক্ষা, কিছু শিল্প শিক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে এদের শিক্ষিত করা হয়ে থাকে। এক কথায়, বলতে সহজ হলেও কার্যক্ষেত্রে এই শিক্ষা দিতে হলে বিশেষ এবং কঠিন শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ করতে হয় এবং এখানে বিশেষ শিক্ষকদের প্রয়োজন। সাধারণ স্কুলের ছাত্রদের মত বেশী সংখ্যক ছাত্র নিয়ে এ শিক্ষা দেওয়া দুঃসাধ্য। একজন শিক্ষকের সঙ্গে ছয় থেকে আটজনের অধিক ছাত্র পড়ানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। দুঃখের বিষয় শিক্ষকের অভাবে, ছাত্রসংখ্যার আধিক্যে এবং বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থার অভাবে পশ্চিমবঙ্গে এটা একটা বিরাট সমস্যা হয়ে রয়েছে। এ সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই বোঝার উপর আরেক শাকের আঁটি রয়েছে। সাধারণ স্কুলে শিক্ষার সময় দশ বৎসর। প্রথম চার বছর মূক-বধিরদের স্কুলে তাদের শুধু কথা বলতে শেখান হয়। তারপর সর্বসাকুল্যে দশ বছরের বাকী ছ'বছর তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা। স্বভাবতঃই সেজন্য Deaf and Dumb School-এর ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার স্তর ষষ্ঠ শ্রেণীতে এসে থেমে যায়। অর্থাৎ লেখাপড়া শেখার ক্ষেত্রে তারা সাধারণ স্কুলের থেকে চার বছরের পেছিয়ে রইল। এই ব্যবস্থার অবশ্যই প্রতিবিধান করতে হবে অর্থাৎ Deaf and Dumb School -এর শিক্ষাক্রম ন্যূনপক্ষে আরও চার বছর বাড়িয়ে দিতে হবে। এ বিষয়ে সরকারের কাছে আবেদন রাখছি।

মূক-বধিরদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজ পর্যন্ত এমন কোন ওষুধ বা অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা নেই যাতে জন্ম বধিরদের শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে আনা যায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শৈশবের অসুখগুলির প্রতিষেধক আছে এবং কিছু রোগের শল্যচিকিৎসা সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, শৈশবের কান পাকা রোগ ওষুধের সাহায্যে Aderoid গ্রন্থি অপারেশন ইত্যাদি সাধারণ অস্ত্রোপচারের সাহায্যে কানকে বাঁচান যায়। কিছু শিশু বাইরের কান (External Ear) বা মাঝের কান (Middle Ear)-এর জন্ম-

[শেষাংশ ১৪ পৃষ্ঠায়]

পশ্চিমবাংলার শিল্প ঃ কিছু তথ্য, কিছু সংবাদ

অমিতাভ রায়

(শেষাংশ)

তবুও প্রশ্ন ওঠে; অভিযোগ আসে; তৈরী হয় সংবাদপত্রের শিরোনাম। মাঝে মাঝেই আলোচিত হয়। বারে বারেই পশ্চিমবাংলার শিল্প হয় বিচার্য বিষয়, এবং থেকে থেকেই মন্তব্য করা হয়—"পশ্চিমবাংলা শিল্পে পেছিয়ে পড়ছে"। মন্তব্যটি কিন্তু অত্যন্ত হাল্কা। কারণ, পেছিয়ে পড়া ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। হয় বলা উচিত অন্যান্য রাজ্যে শিল্প উৎপাদনের হার বেড়ে গেছে অথবা বলা উচিত এ রাজ্যের আগের শিল্প উৎপাদন বেশী ছিল, বর্তমানে কমে গেছে। বাস্তব ঘটনা হল.—অন্যান্য রাজ্যের শিল্প উৎপাদনের হার ক্রমশঃই পশ্চিমবাংলার শিল্প উৎপাদনের চেয়ে বেড়ে যাচ্ছে। কেন?

জবাবে বহু উদাহরণ সহযোগে বিভিন্ন কারণকে প্রতিষ্ঠিত করা গেলেও, যে কারণটি মূল কারণ হিসেবে হাজির হয় তাকে বিশ্লেষণ করাই বাঞ্ছনীয়। ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে। অতএব এ দেশের সমস্ত প্রকার নীতি-প্রকল্প-পরিকল্পনা এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই প্রস্তুত হয়। শিল্পনীতিও এর বহির্ভূত হতে পারে না। সুতরাং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন অবস্থার সাথে সমতা রাখার জন্য শিল্পনীতির রূপান্তর ঘটানো হয়। প্রসঙ্গটি কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার.—যে কোন দেশেই উৎপাদন ব্যবস্থা সেই দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালক শ্রেণী বিশেষের স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়। চিরকাল এই ঘটনা ঘটেছে। এবং এটাই ঐতিহাসিক সত্য।

ব্রিটিশ শাসনমুক্ত ভারতে প্রথম শিল্পনীতি ঘোষিত হয় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই নীতি অনুযায়ী সবরকমের শিল্পকে পরিষ্কার চারটি ভাগে ভাগ করা হয়।

১। প্রতিরক্ষা, রেল পথ ও আণবিক শক্তি সংক্রান্ত শিল্প—এগুলি সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হবে।

২। কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতি কিছু ক্ষেত্রে নূতন শিল্প সরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠবে।

৩। যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ী, সুতি ও পশমের কাপড়, চিনি, কাগজ, সিমেন্ট, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যপ্রকার আঠারটি শিল্প সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হবে না ঘোষণা করা হল। কিন্তু এই ধরনের সমস্ত শিল্পের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের হাতে রেখে দেওয়া হল।

৪। বাদবাকী সমস্ত শিল্প এই শ্রেণীতে রেখে দেওয়া হল। কিন্তু এই সমস্ত শিল্পেও সরকারী হস্তক্ষেপের সুযোগ রাখা হল।

এই শিল্পনীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে পাশ করান হল "শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন" এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে নতুন ও অতিরিক্ত বিনিয়োগের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা হল।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার এক নতুন শিল্পনীতি চালু হল। এই শিল্পনীতি অনুযায়ী যাবতীয় শিল্পকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়।

১। প্রতিরক্ষা সামগ্রী, আণবিক শক্তি, রেলপথ, বিমান পরিবহণ, লোহা ও ইস্পাত, ভারী যন্ত্রপাতি, বিমান ও জাহাজ নির্মাণ, কয়লা, খনিজ তৈল, অন্যান্য প্রধান ধাতু, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার এবং বিদ্যুৎ প্রভৃতি ১৭টি শিল্পের প্রথম চারটিকে পুরোপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে। বাকী ১৩টিতে প্রয়োজনবোধে বেসরকারী উদ্যোগের সুযোগ রাখা হয়।

২। মিশ্রধাতু, যন্ত্রপাতি, ঔষধ, রাসায়নিক সার, কৃত্রিম রবার, সড়ক ও জাহাজী পরিবহণ সহ ১২টি শিল্পে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং বেসরকারী উদ্যোগকে সুবিধাদানের সুযোগ রাখা হয়।

৩। বাদবাকী সমস্ত শিল্পকে বেসরকারী ক্ষেত্রে রাখা হল, কিন্তু এদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি, পরিকল্পনার কাঠামোর বাইরে করার সুযোগ থাকল না।

তারপর আরও ২৪ বছর চলে গেছে। ১৯৫৬ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত এই ২৪ বছরে শিল্পনীতি একই খাতে বয়ে গেছে। পরিণাম সবার জানা। ধনের অসম বণ্টন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি বেড়েছে শিল্পের অসম বিকাশ। দেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ-বিন্দু যখন একটি নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত তখন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার বাইরে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো অসম্ভব। আবার পরিকল্পনা রচনাকারীদের মূল লক্ষ্য যখন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করা তখন শিল্পের সুষম প্রসারের চিন্তা বাতুলতামাত্র। প্রচারের দাপটে যেমন পরিকল্পনার অভিমুখ পাল্টায় না তেমনি বারে বারে শিল্পনীতিকে সংশোধন করলেও সারা দেশে সুষ্ঠভাবে শিল্প বিকাশ হয় না। শিল্প প্রসারের মূলে লক্ষ্য যদি মুনাফা অর্জন হয় তা হলে পরিকল্পনায় বহু বিশেষ বিষয়ের ব্যাপারে কোন চিন্তারই সুযোগ থাকে না। যেমন ধরা যাক জনসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের কথা। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে এবং পরে সর্বদাই আরও বেশী বেশী মুনাফা অর্জনের জন্যই শিল্পগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। কখনই চিন্তা করা হয় নি এমন শিল্পনীতির কথা যার ফলে দেশের মানুষের সবচেয়ে বেশী নিয়োগের সুযোগ থাকে। অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ১৯৮০-র ২৩শে জুলাই আরেক দফা শিল্পনীতি ঘোষিত হয়েছে। বলবার ভাষায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তন এলেও সুর অপরিবর্তিত। এবং এরকমই চলবে। বরং যতই অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পাবে, বাড়বে শিল্পনীতির পরিবর্তনের হার। বারংবার সংশোধন ও পরিবর্তন করে রক্ষা করা হবে মুনাফা অর্জনের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় পশ্চিমবাংলা অন্য রাজ্যের চেয়ে শিল্প উৎপাদনে পিছিয়ে পড়ছে। সরাসরি বলতে গেলে ব্যাপারটা আসলে হল—পশ্চিমবাংলার চেয়ে অন্য রাজ্যে শিল্পের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের সুযোগ অনেক বেশী।

পশ্চিমবাংলার শিল্প সংক্রান্ত তথ্য ও তার তাৎপর্যকে খোলা মন নিয়ে বিচার করলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়—তাতে হতাশ হবার কিছু নেই, সুযোগ নেই নিরাশ হবার। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অব্যর্থ নিয়মেই পশ্চিমবাংলা শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যর তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। সুযোগ-সুবিধা এখানে আগের মতই বর্তমান—শুধু দরকার প্রকৃত জনমুখী শিল্পনীতি, যা এই অর্থনৈতিক কাঠামোয় একেবারেই অসম্ভব।

(শেষ)

প্রবাদ-সাহিত্যে প্রতিবাদ প্রবণতা

ডঃ মানস মজুমদার

ইদানীং লোকসাহিত্যের নানামুখী বিশ্লেষণে লোকসমাজ ও লোকসাহিত্যের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। আমাদের মনে হয়, লোকসাহিত্যের মধ্যে যে প্রতিবাদ প্রবণতা রয়েছে তাও গুরুত্ব পাওয়া উচিত। দেশের সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত যে মানুষগুলিকে আমরা প্রায়শই উপেক্ষা করে থাকি, তাদের মধ্যেও যে ন্যায়-নীতি-মঙ্গল-কল্যাণের শাশ্বত আদর্শ রয়েছে, সেকথা আমরা ভুলে যাই। তাদের সুখ-দুঃখ, সাধ-স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সত্যিই কি আমাদের কোনো মমতা আছে? এ সমস্ত প্রতিবাদ কি আমাদের চোখে পড়ে? কানে আসে? সাধারণ মানুষ দুর্বল, অসহায়। প্রাত্যাহিক জীবনে নানা ধরনের অন্যায় অবিচার উৎপীড়ন তাদের সহ্য করতে হয়। এর জন্য প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা যেমন কিছু পরিমাণে দায়ী, তেমনি অভিজাত সমাজ ও শাসককুলের দায়িত্বও কম নয়।

সে যাই হোক, অন্যায়-অবিচারে লোকসাধারণের মনে ক্ষোভ আর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। প্রতিবাদের পথ খোঁজে তারা। লোকসাহিত্য প্রতিবাদের একটা অন্যতম মাধ্যম। নিছক আনন্দদানেই এর আবেদন নিঃশেষ নয়। পৃথিবীর সব দেশের লোকসাহিত্যেই প্রতিবাদ প্রবণতা দৃশ্যগোচর। বাংলার লোকসাহিত্য তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলার লোকসাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই এই প্রতিবাদ প্রবণতার পরিচয় লভ্য। বর্তমান আলোচনাটি অবশ্য প্রবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

লোকসমাজে ব্যবহৃত বহু প্রবাদই প্রতিবাদের অস্ত্রে পরিণত। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের নানাবিধ অন্যায়, অবিচার ও অসংগতির প্রতিবাদে এ সমস্ত প্রবাদ উচ্চকণ্ঠ।

প্রথমত, পারিবারিক জীবনের দিকেই তাকানো যাক। আমাদের পারিবারিক জীবনে শাশুড়ী-বধূর সম্পর্কটি প্রায়শই অপ্রীতিকর। শাশুড়ী-বধূর সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্বেষতিক্ত। বধূর আবির্ভাবে সংসারের কর্তৃত্ব হারানোর আশংকা এবং বধূর প্রতি পুত্রের প্রীতিপক্ষপাতের আশংকা থেকেই শাশুড়ীর বধূবিদ্বেষের উদ্ভব। পুত্রের অসংগত আচরণ এই বিদ্বেষ-অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয়। দায়িত্ব-কর্তব্য-বিমুখ পুত্র যখন জননীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পত্নীর সেবাপরিচর্যাতেই নিঃশেষে নিমগ্ন হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ জননী-কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে ওঠে - 'মায়ের পেটে ভাত নেই, বউয়ের গলায় চন্দ্রহার।' সংসারের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে জননী লাভ করে সেই সত্যদৃষ্টি— 'যতক্ষণ দুধ, ততক্ষণ পুত।' শাশুড়ী-বধূর মনোমালিন্য প্রাবল্যে সংসারে ভাঙন ধরে। বধূ স্বতন্ত্র সংসার-সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হয়। আপন সন্তান পর হয়ে যায়। সুগভীর মর্মবেদনা নিয়ে বধূকে ধিক্কার দেয় শাশুড়ী—'কলির বউ ঘর ভাঙানী।' এও প্রতিবাদ; বধূর আচরণের বিরুদ্ধে। এ প্রতিবাদ ক্ষোভ ও জ্বালা সঞ্জাত।

শাশুড়ীতন্ত্রের বিরুদ্ধে বধূসমাজও প্রতিবাদে মুখর। বধূ-নির্যাতনকারীণী শাশুড়ীর বিরুদ্ধেই বধূর প্রতিবাদ। শাশুড়ীর বধূ-বিদ্বেষ বধূর শাশুড়ী-বিদ্বেষের হেতু। বধূ দেখে, তার সামান্য ত্রুটি শাশুড়ীর প্রচারনৈপুণ্যে বহুজনগোচর হয়, অথচ শাশুড়ীর মারাত্মক অপরাধও চাপা পড়ে। বধূ তাই প্রতিবাদ জানায়—'বউ ভাঙলো শরা। গেল পাড়া পাড়া॥ গিন্নী ভাঙলো নাদা। ও কিছু নয় দাদা॥'

আমাদের পারিবারিক জীবনে বধূর আর একটি দুর্ভাবনাস্থল ননদ। বধূর প্রতি ননদের আচরণও তিক্ততাপূর্ণ। স্বভাবতই ননদের প্রতি বধূর মনোভাব তাই অবজ্ঞার। ননদতন্ত্রের বিরুদ্ধে বধূসমাজের প্রতিবাদ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে চরম সত্যটি—'ননদেরও ননদ আছে।'

অধিকার-সচেতন অথচ দায়িত্বহীন স্বামীর আচরণের প্রতিবাদও প্রবাদে লভ্য—'ভাত দেবার নাম নেই, কিল মারবার গোঁসাই।' বোনের ভালোবাসার তুলনায় ভাইয়ের ভালোবাসা অপ্রতুল। বোনের তুলনায় শ্যালিকার প্রতিই তার অধিকতর মনোযোগ। ভাইয়ের এ আচরণ যে অত্যন্ত গর্হিত প্রবাদ তা প্রতিবাদ সহায়তায় প্রকাশ করেছে—'আপন বোন ভাত পায় না, শালীর তরে মোণ্ডা।' ব্যঙ্গ এখানে তীক্ষ্ন, ধিক্কার এখানে সোচ্চার। ভাইয়ের কাছে বোন অবাঞ্ছিত। ভাইয়ের সম্পদ-প্রাচুর্যে বোনের অধিকার নেই—'ভাই রাজা তো বোনের কি?' বস্তুতপক্ষে এ প্রতিবাদ ভাইয়ের স্নেহ-হীনতার বিরুদ্ধেই।

প্রতিবেশীর কাছে আমাদের কিছু স্বাভাবিক প্রত্যাশা আছে। বিপদে-আপদে প্রতিবেশীর সাহায্য আমাদের কাঙ্ক্ষিত। তার অভাব ঘটলে মন ক্ষুব্ধ হয়, প্রতিবেশীর অনুচিত আচরণের প্রতিবাদ জানায়—'এক ঝিকরে মাছ বেঁধে না, সেই বা কেমন পড়শী। এক ডাকেতে সাড়া দেয় না, সেইবা কেমন পড়শী।'

দ্বিতীয়ত, সমাজ-জীবনের নানাবিধ অন্যায়-অসংগতির বিরুদ্ধে প্রবাদ প্রতিবাদ-মুখর। যেমন, পণ প্রথার হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা প্রবাদে প্রতিফলিত। প্রবাদ দেখতে পায়—'কনের বাপ ব'সে ব'সে চোখের জলে ভাসে। বরের বাপ ব'সে আছে পাঁচশ টাকার আশে।' বরের অর্থলোলুপ পিতা এখানে ধিকৃত।

জীবিত অবস্থায় যার প্রয়োজনীয় আহার্য জোটেনি, জোটেনি পরিধেয় বস্ত্র, মৃত্যুর পর তার দানসাগর শ্রাদ্ধ হলে স্বাভাবিক-ভাবেই সমাজ-মন বিচলিত হয়। সমাজ এই জাঁক-জমক ও আড়ম্বরের বিরুদ্ধে সবিদ্রূপ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে—'বাঁচতে পায় না ভাত-কাপড়। মরতে হল দানদাগর॥'

প্রতিদিনের জীবনে পদে পদে কত অন্যায়, কত অসংগতি। লোকচিত্তে তার প্রতিফলন ঘটে। কোনো কোনো প্রবাদে লোক সমাজের প্রতিক্রিয়াটি প্রকাশ পায়। ব্যক্তিনামের অসংগতি নিয়ে

যে উপহাস—'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন',—তা তো আসলে প্রতিবাদেরই নামান্তর!

বয়সে যে সুবৃদ্ধ, মৃত্যু যার আসন্ন, সে যখন বিবাহেচ্ছু হয়, লোকসমাজের প্রতিবাদী বিবেকটি তখন আত্মপ্রকাশ করে—'এককালে ঠেকেছে তিনকাল গিয়ে। তবু আবার করবে বিয়ে॥' সমাজে যার নেতৃত্ব গ্রাহ্য নয়, যথার্থ নেতা হওয়ার যোগ্যতা যার নেই, সে যখন নেতৃত্বের আস্ফালন করে, বিরক্ত লোকসমাজ তখন প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়। 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' প্রবাদটি এসূত্রে স্মরণযোগ্য।

সমাজে এমন লোক তো সংখ্যায় প্রচুর, দোষ-ত্রুটি দুর্বলতার যাদের অন্ত নেই, অথচ অপরের দোষ-ত্রুটি দুর্বলতা সম্বন্ধে যারা সোচ্চার। প্রবাদ তাদের সতর্ক করে দেয়—'আপনি বড়ো ভালো, তাই পরকে বলে কালো।'

সমাজে রয়েছে বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ। এদের কেউ কেউ প্রবাদের লক্ষ্য। প্রবাদ এদের সমালোচক। ডাক্তারের কথাই ধরা যাক। চিকিৎসা একটি মহৎ বৃত্তি। কিন্তু চিকিৎসকের ফাঁকিটুকু লোকসাধারণের অজ্ঞাত নয়। 'জল, জোলাপ, জোচ্চোরি, এই তিন নিয়ে ডাক্তারী।'—প্রবাদে সেই মনোভাবের প্রতিফলন। আর মূর্খ বৈদ্য? বেইমানের তুল্য সে! তার মূর্খতাহেতু রোগীর প্রাণনাশ ঘটে। প্রবাদ তাই বলে—'মূর্খ বৈদ্য বেইমান দুই ঠিক যমের সমান।'

ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ, সমাজ-শিরোমণি। একদা উন্নততর শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় সমাজে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে। ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ চরিত্র-মাহাত্ম্যে হয়েছে শ্রদ্ধেয়, পূজনীয়। কিন্তু কালের কুটিল-প্রবাহে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দিয়েছে আদর্শচ্যুতি, চারিত্রিক অবনতি। ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের স্খলন-পতন, লোভ-লালসা ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ের কাছে হয়েছে উপহাসিত। একাধিক প্রবাদ যার দৃষ্টান্ত—(ক) 'কলিকালের ব্রাহ্মণ যেচে লয় দান। আপনি ত মজে আর মজায় যজমান॥' (খ) 'কানা গরু বামুনকে দান। বামুন বলে আন আন॥' (গ) 'কলির বামুন ঢোড়া সাপ। যে না মারে তার পাপ॥'

সমাজে বৈষ্ণবের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু 'তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা'—বৈষ্ণবের এই আদর্শ যথাযথভাবে জীবনে ও কর্মে প্রতিফলিত, এমন বৈষ্ণবের সংখ্যা খুব বেশি নয়। বৈষ্ণবের ভেক গ্রহণ করলেই বৈষ্ণব হয় না। লোকসমাজ এই সহজ সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। বলেছে—'তেলক কাটলেই বৈষ্ণব হয় না' অথবা—'মালা ঘোরালেই বৈরাগী হয় না।' বস্তুতপক্ষে, ধর্মের নামে ভণ্ডামি লোকসমাজে প্রশ্রয় পায় নি। লোকসমাজের অজানা নেই যে—'ভক্তিহীন ভজন, লবণহীন ব্যঞ্জন।' তাই যার 'জপের সঙ্গে খোঁজ নেই, কপালজোড়া ফোঁটা' তার প্রতি লোকসমাজের শ্রদ্ধা নেই, রয়েছে প্রবল অবজ্ঞা। ভণ্ড সন্ন্যাসীর প্রতিও সমান অবজ্ঞা—'গাঁজা গেরুয়া গোঁফ দাড়ি। এই তিনে সাধু ভারী॥'

মোল্লাতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে যে সংকীর্ণতা, প্রভুত্ব গর্ব, সে সম্পর্কে লোকসমাজ সম্যক অবহিত। 'মোল্লার দৌড় মসজিদ তক' কিংবা 'মোল্লার বাড়ির বিড়ালও মোল্লা' যার দৃষ্টান্ত।

তৃতীয়ত, আইন ও শাসনব্যবস্থায় যে ফাঁক ও ফাঁকি রয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আইন যে বহু ক্ষেত্রেই প্রহসনমাত্র লোক-সাধারণ সে বিষয়ে সচেতন। 'আগে ফাঁসি পরে বিচার'—প্রবাদবাক্যে সেই সচেতনতার পরিচয়। প্রবাদ দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবল প্রতিবাদী। 'ঘুষ পেলে আমলা তুষ্ট'—প্রবাদবাক্যে লোক-সাধারণের অভিজ্ঞতার নগ্ন প্রকাশ।

সন্দেহ নেই, প্রবাদ-সাহিত্য লোক-প্রতিবাদের এক শক্তিশালী মাধ্যম।

[প্রতিবন্ধী মূক-বধিরদের সম্পর্কে : ১১ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

গত অগঠিত অবস্থা নিয়ে জন্মায়। এক্ষেত্রেও বিশেষ ধরনের অস্ত্রোপচারের সাহায্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কানের পুনর্গঠন সম্ভব। শিশু জন্মের পর কানে পুঁজ হওয়ার অসুখ হলে বা আপাতদৃষ্ট কানের বাইরের অংশে কোন অসংগতি থাকলে যথাযথ ডাক্তারী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ হাতে কলমে কাজ শেখানোর মাধ্যমে মূক-বধিরদের কর্মক্ষম করে সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত করে সক্ষম করে তোলা যায়। কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা মূক-বধির বিদ্যালয়গুলিতে রাখা যেতে পারে অথবা পলিটেকনিক বিদ্যালয়গুলিতে কিছু কিছু মূক-বধিরদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, চাহিদা অনুযায়ী এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা পশ্চিমবঙ্গে আজ নিতান্তই অল্প, সরকারের এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

পরিশেষে বলি, বর্তমান দায়িত্ব-সচেতন সরকারকে কতকগুলি ব্যবস্থা নেওয়ার দিকে অগ্রণী হতে হবেঃ

(১) মূক-বধির শিশুদের শিক্ষার জন্য অল্প বয়সের নার্সারী বিভাগ থেকে শুরু করে তাদের ভাষা শিক্ষা, লেখাপড়া এবং কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে হবে অল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে।

(২) মূক-বধির শিশুদের শিক্ষা দিতে পারেন এমন উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা তৈরী করতে হবে এবং তার জন্য শিক্ষকশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা দরকার। এই সব শিক্ষকদের যথাযোগ্য শিক্ষকের বর্তমান অপ্রতুলতার কথা বিশেষভাবে ভাবতে হবে।

(৩) অল্প মূল্যে উচ্চমানের Hearing Aid যাতে এই শিশুরা অতি সহজেই পেতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। সরকার ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে Hearing Aid তৈরীর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা ভাবতে পারেন। এতে কিছু কারিগরী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ যেমন বাড়বে তেমনি সুলভ মূল্যে ও ক্ষেত্রবিশেষে বিনামূল্যে ভাল Hearing Aid পাওয়া সম্ভব হবে।

(৪) রেডিও, টি.ভি. ফিল্ম, সংবাদপত্র, পোস্টার-প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে এই সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে যাতে করে প্রসূতি মা চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতন হন, শিশুর চিকিৎসার অবহেলা না হয় এবং অহেতুক লজ্জাভীতি বা কুসংস্কার জনিত চিন্তাধারার প্রভাবে এই সব শিশুদের চিকিৎসা ও শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত থাকতে না হয়। বিশ্ব প্রতিবন্ধী বর্ষে সমস্ত মানুষের দায়িত্ব মূক-বধির মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। তাঁদের প্রতি করুণা নয়, প্রয়োজন তাঁদের সমতার স্বীকৃতি।

জমি থেকে আসা যুবক ও তার ভাবনা

দীনেশ ডাকুয়া

যদিও একথা একবাক্যে বলা চলে না যে জোতদার-জমিদারদের বংশের ছেলেরা সবসময়েই জোত-জমি রক্ষা করে কৃষকবিরোধী তথা প্রগতিবিরোধী ভূমিকা পালন করে এসেছে। তবুও, শ্রেণী-চ্যুত কয়েকজনের কথা বাদ দিলে, সাধারণভাবে তারা ভুল করেই হোক আর শুদ্ধ করেই হোক, জোতদারী-জমিদারী রক্ষার পক্ষেই থেকে এসেছে এবং এ নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে তাদের লাঠালাঠি লেগেই আছে। আসল কথা, জমিই হলো ইতিহাসে উৎপাদনের প্রথম সূত্র, সুতরাং শোষণেরও প্রথম সূত্র। যে লোক জমিতে খাটে, অবশ্যই সে তার নিজস্ব নির্বাহ ও বংশ রক্ষার নিম্নতম প্রয়োজনীয় যেটুকু পাওনা তার চেয়ে বেশী উৎপাদন করে এবং এই 'বেশীটুকু' চলে গেল ইতিহাসের ঘোরপাকের মধ্য দিয়ে যিনি জমির মালিক বলে গণ্য হয়ে আসছেন তার ভাঁড়ারে। তিনি হলেন সামন্ত প্রভু অথবা জমিদার, জোতদার। আর যে গতর খাটিয়ে উৎপাদন করল সে হল কৃষক। এখন যদি ধরা যায় যে আজকে যাদের জমির মালিক (জোতদার বা ছোট মালিক) দেখছি তারা অনেকেই তো পয়সা দিয়ে জমি কিনে নিয়েছেন অর্থাৎ মূলধন প্রয়োগ করেছেন জমি কেনার জন্য। কথাটা কোনও কোনও সময়ে সত্য হলেও সব সময়েই নয়। রবি ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি'ই তার প্রমাণ। সে যাই হোক, মূলধনের প্রশ্নটা বড় বিবেচ্য নয়। মূলধন প্রয়োগ করে যে কোনও ব্যবসা (যেমন নিষিদ্ধ এলাকায় মদের ব্যবসা) ফাঁদলেই সমাজ তার গ্যারান্টি দিতে বাধ্য নয়। সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনে যা রাখার রাখা হবে, যা তুলে দেবার তুলে দেওয়া হবে। এইটাই মূল নিয়ম। এবং যুগ যুগ ধরে তাই হয়ে এসেছে।

এখন জোত-জমি থেকে আসা ছেলেরা যে ব্যক্তিগতভাবে সকলেই প্রগতিবিরোধী তা ঠিক নয় বরং স্কুল কলেজে পড়ার সময় অনেকেই সমাজতন্ত্রবাদে দীক্ষা নিয়েও থাকে। তবে দেশে ফিরে গিয়ে ঘর গেরস্তী করার সময় জমির আন্দোলনের আওয়াজ শুনে তাদের মধ্যেই আবার অনেকেরই বুকের ভেতরটা যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও টনটন করে ওঠে। বিশেষ করে জোত-জমি ছাড়া অর্থাৎ 'শোষণ' ছাড়া যাদের বাঁচার আর পথ খোলা নেই।

প্রশ্নটাকে সোজাসুজিই রাখা ভাল। ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করুক আর নাই করুক, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ যারা করতে বাধ্য হচ্ছে এরকম ঘরের ছেলেরা আজ কোথায় দাঁড়াবে? ধরে নিলাম তারা জোতদারী-জমিদারী রক্ষার পক্ষে এবং দরকার হলে তা রক্ষার জন্য লড়াই করতেও প্রস্তুত। কিন্তু তাদের সামনে আদর্শ কি? কোন্ দল, বা কোন্ নেতা আজ পর্যন্ত উঁচু গলায় বলেছেন যে কৃষকের হাতে জমি দেওয়া হবে না? কোন দলের ঘোষণায় খোলাখুলি বলা হয়েছে যে জোতদার-জমিদারদের হাতেই জমি রাখা হবে? কোথাও না। যারা গোপনে এইসব ছেলেদের সাথে বা তাদের বাবাদের সাথে সলা পরামর্শ করে আইন ফাঁকি দিয়ে জমি রক্ষার নানা কায়দা কৌশল শেখান, তারাও মাইকের সামনে কিন্তু সে কথাটা বলতে পারছেন না। আসলে জোতদারী-জমিদারী তুলে না দেওয়া পর্যন্ত ভাগের মা গঙ্গা পাচ্ছে না—না জোতদার, না ভাগচাষী বা ক্ষেতমজুর, কেউই ভাল করে মন দিচ্ছে না। ফসলও বাড়ছে না। সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদনই অন্যান্য দেশের কাছাকাছি যাচ্ছে না। ফলে জোতদাররা অনেক চাষীর কাছ থেকে পেয়ে নিজেদের কোনও মতে পুষিয়ে নিলেও, অধিকার বা ক্ষেতমজুরদের ভাগে যা পড়ল তা দিয়ে তাদের 'ভাত'ই জোটে না সারা বছর, 'কাপড়' তো দূরের কথা। অর্থাৎ জোতদারী প্রথার ফলে দেশের বেশীর ভাগ মানুষ—এই ভূমিহীন ভাগচাষী ও ক্ষেত-মজুররা—আজ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। তারা শিল্পজাত কাপড় বা অন্য কোনও মালপত্র কিনতে পারছে না। বাজারের অভাবে ছোট বড় সব শিল্পেই মন্দা এসে যাচ্ছে, অবিক্রীত মাল গুদামে পড়ে রয়েছে, নতুন মাল তৈরীর প্রয়োজন নেই, কল কারখানায় ছাঁটাই চলছে, নতুন চাকরীর প্রশ্নই ওঠে না। জোত-দারের ঘরের উঠতি যুবকরা চাকরী পাচ্ছে না। কারণ, তাদের গ্রামেরই গরীব কৃষক/ক্ষেতমজুররা কাপড় কিনতে পারছে না, নুন তেল কিনতে পারছে না, কোদাল কিনতে পারছে না। সোজা কথায় জোত-জমি থেকে আসা ছেলেরাই কৃষক আন্দোলনে বাধা দিয়ে, কৃষকদের তীব্র অভাব-অনটনের মধ্যে রেখে, নিজেদের ও তাদের শহুরে বন্ধুবান্ধবদের চাকরীর পথ আটকে রেখেছেন।

ঘটনাটা তারা জানে কি? জানলেও এবং বুঝলেও এক্ষুনি তাদের করার কি আছে? জমিগুলি এক্ষুনি কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দিলে এক্ষুনি কি তাদের কাপড়ের আর কোদালের কারখানায় চাকরী হয়ে যাবে? না। তা হবে না। কিন্তু চাকরী হওয়ার পথ খুলবে।

পুঁজিতান্ত্রিক কলকারখানার উন্নতি মানে অবশ্যই পুঁজিবাদের অগ্রগতি, তবুও উৎপাদন ও সম্ভোগ যে ব্যবস্থার মধ্যে বাড়ে, যে ব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ বেকার ছেলে কাজ পায়, সে ব্যবস্থাই অপেক্ষা-কৃত ভাল। পুঁজিপতিদের উপর হিংসে করে লাভ নেই। মনে রাখতে হবে, এক সময় দাস মালিকদের চেয়ে সামন্তপ্রভুরা (জোতদার/জমিদাররা) সমাজের উৎপাদন ও সম্ভোগের পক্ষে অধিকতর শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। আবার এই অধিক উৎপাদন ও অধিক সম্ভোগের প্রয়োজনেই শিল্প বিপ্লবের পর থেকে জমিদারী প্রথাই উৎপাদনের চাকা টেনে ধরছে, পুঁজিবাদ উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করছে। সুতরাং জমি থেকে আসা ছেলে-দের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, অধিক উৎপাদন ও অধিক সম্ভোগ চাইছে জোতদারী জমিদারী উঠে যাক, আপাততঃ

[শেষাংশ ২৩ পৃষ্ঠায়]

মেডেল

আশুতোষ দেবনাথ

'অন্ধকে দয়া করে রাস্তাটা যদি পার করে দেন।'—কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তার আগে লাল বাতিটা নিভে গেছে। হলুদ বতিটাও দপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল। ট্রাফিকে সবুজ সংকেত। পথ চলতি ব্যস্ততায় হঠাৎ স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার সামনে পিছনে, ডাইনে বায়ে অসংখ্য নির্বাক নিশ্চল মূর্তি।

ঠিক চিত্তরঞ্জন এ্যাভিন্যুর মুখটায়। এসপ্ল্যানেড এর ক্রসিং-এ দাঁড়িয়ে মনে হলো গলার স্বরটা—

এই অন্ধ বুড়োকে দয়া করে রাস্তাটা যদি পার করে দেন, দু'হাত ছড়িয়ে শরীরটা কাঁপাতে কাঁপাতে যে মানুষটা এগিয়ে এলো সে আমার পরিচিত ব্যানার্জীবাবু। লোকটার চেহারা ঠিক আগের মত নেই। মুখভরা দাড়ি গোঁফ। গায়ে ছেঁড়া তালিমারা সার্ট। একটা ময়লা পাজামা পরনে। রোগা চেহারা। চোখে একেবারে দেখতে পায় না। হাত বাড়িয়ে তার হাতখানা ধরতেই সে যেন খানিকটা নিরাপত্তা বোধ করল। বলল, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

আমি উত্তর দিলাম না। রাস্তায় অসংখ্য চলমান যান। ট্রাফিক সংকেতে লাল বাতিটা মাঝে মাঝে দপ করে জ্বলে উঠছে। রাস্তাটা পার হ'লাম।

বছর দুয়েক আগে, আমি তখন গোয়েংকা কলেজে সন্ধ্যায় ক্লাশ করি। দিনে, একটা প্রেসে কম্পোজিং। লোনাধরা পাঁচিল, স্যাতস্যাতে মেঝে। ষাট পাওয়ারের ম্লান আলো জীবনটাকে নিভিয়ে দিতে চাচ্ছিল। আমরা ছিলাম ছাপাখানার ভূত। শিষের টাইপ, লেড রক্তে বিষক্রিয়া ঘটছে।

আমাদের ফ্যান লাইটে যান্ত্রিক গোলযোগ হ'লে খবর দেয়া হ'তো তাকে। খবর দেওয়ার কিছু সময়ের মধ্যে এসে যেত এই অদ্ভূত মানুষটা। হাতে চাড়মার ব্যাগ। মুখ ভর্তি লম্বা দাড়ি। সুতীর জামা গায়, পাজামা পরা। কাজ করতে এসে ব্যানার্জী আমাদের মজার মজার গল্প শোনাত। মানুষটাও ছিল বেশ মজার। হঠাৎ হঠাৎ সে কলকাতা ছেড়ে উধাও হয়ে যেত। আমাদের ফ্যান লাইট অকেজো হয়ে পড়ে থাকতো। আবার হঠাৎ-ই একদিন যন্ত্রপাতির ব্যাগ হাতে ঢুকত লোকটা। আমরা আনন্দে হৈ হৈ করে উঠ্‌তাম, ওই যে ব্যানার্জীবাবু এসছেন!

জিজ্ঞেস করতাম, ব্যানার্জীবাবু এতদিন কোথায় ছিলেন?

মালিক বলতেন, কি যে আপনি করেন ব্যানার্জীবাবু।

ব্যানার্জীর চোখে-মুখে দেখা দিত এক রহস্যের হাসি। ধীরে ধীরে সে হাসি সারা মুখে উচ্চগ্রামে ছড়িয়ে পড়ত।...আমার কথা আর বলেন কেন? একা মানুষ! ভাবনা কি। তাই বেরিয়ে পড়ি 'তারা মা' যখন যেখানে ডাকে।...মা তারাই তো ভরসা। কখনও ভেংচি কাটতো, নাক সিটকাতো। বুঝতাম না কোনটা তার হাসি, কোনটা তার কান্না, আর কোনটা স্রেফ ভন্ডামির ইঙ্গিত। বুঝতাম না, সে কি বলতে চায় আর কি বলতে চায় না।

আপনার কেউ নেই? জিজ্ঞেস করতাম।

না।

ছেলে, মেয়ে, বৌ?

আছে আবার নেই। মা তারা, তারা মা-ই আমার সব। শেষে যন্ত্রপাতি বের করে কাজ করতে করতে বলত, এবার গেছিলাম, সুন্দরবন—আমার মেয়ের বাড়ী।

মেয়ে! এই বললেন কেউ নেই!

ধর্ম মেয়ে। জামাই ফরেস্ট-এ চাকরি করে। আরে বাপ! সে কি খাওয়া—মাছ, মাংস, দুধ, ঘি, মাখন।...কাজ করতে করতে ব্যানার্জী বলে যেত, বাঘ, হরিণ, কুমির সুন্দরবনের গল্প।

আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনতাম। মানুষটার গল্প বলার ক্ষমতাও ছিল। কাজ শেষ হয়ে গেলে যন্ত্রপাতি গোটাতে লাগলে আমরা ফের তাগাদা মারতাম, ব্যানার্জীবাবু আরেকটা গল্প বলুন আরেকটা...ব্যানার্জী হাসত। গর্বের হাসি, সুখের হাসি তৃপ্তির হাসি। ব্যানার্জী যন্ত্রপাতি গোটাতে লাগলে আমরা কোনদিন তার স্ক্রু-ড্রাইভার, প্লাস সরিয়ে রাখতাম, দু'তিন দিন বাদে ব্যানার্জী সেগুলো ফেরৎ চাইতে এলে আমরা তার কাছ থেকে আরেকটা গল্প শুনে নিতাম।

এক সময়ে দেখা গেল ব্যানার্জীর ইলেকট্রিসিয়ান বিদ্যা ধোপে টিকছে না। আজ মেরামতির কাজ করে দিয়ে গেলে কাল আবার বিগড়ে যেতে লাগল লাইট-ফ্যান।

মালিক বললেন, ওসব হাতুড়ে মিস্ত্রি দিয়ে কাজ হবে না। ব্যানার্জী চোখে দেখে না। বুড়ো অথর্ব কত আর পারে! তারপর নতুন ইলেকট্রিসিয়ান এলো।

পরপর ব্যানার্জীও দু'-তিন দিন ঘুরে গেল। আমাদের লাইট জ্বলছে, ফ্যান ঘুরছে। ব্যাপারটি ব্যানার্জী বুঝতে পারল। প্রথম-দিন সে এককাপ চা খেয়ে চলে গেল। পরের দিন দুটো হাসি ঠাট্টায় বিদায়। তারপর ব্যানার্জী যথারীতি যন্ত্রপাতির ব্যাগ হাতে ঢুকে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে কারু সঙ্গে কোন কথা না বলে নিঃশব্দে ধীর পায়ে চলে গেল। যাবার সময় চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে নিজেকে সামলে নিল। আর আমাদের মধ্যে থেকে কে যেন মন্তব্য করল, ব্যাটা বাতেলাবাজ, গুল্‌ফে।

রাস্তা পেরিয়ে কার্জন পার্কের ধারে চলে এস্‌ছি। খেয়াল নেই ব্যানার্জী তখনও আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলছে আর ভিখ্‌ মাঙ্‌ছে। পথচলতি মানুষজন দশ পাঁচ পয়সা দিচ্ছে।

ব্যানার্জী যে ভিখ্ মাঙছে সেটা খেয়াল করতে পারিনি। ব্যানার্জীবাবু বলে ডাকতেই ব্যানার্জী কেঁপে উঠল। আমার গলা শুনে চিনতে পারল। হাত থেকে খুচরো পয়সাগুলো পড়ে গেল ঝনঝনিয়ে। কথাটা বলেই আমারও চমক ভাঙল। ব্যানার্জী হেসে উঠে বলল, তাপসবাবু, আপনি! চাকরি পেয়েছেন, লিখছেন?

আমি নীচু হয়ে পয়সাগুলো কুড়িয়ে তুলে ব্যানার্জীর পকেটে দিলাম। কার্জন পার্কে ঢুকে দু'জনে পাশাপাশি বসলাম। এ কথায় সে কথায় বললাম, চাকরি একটা পেয়েছি যেমন তেমন—তার চেয়ে বড় কথা গল্প লিখে মেডেল পেয়েছি, সোনার মেডেল।

তাই নাকি তাপসবাবু, কি গল্প, কোথায় লিখেছেন বৃত্তান্ত জানতে চাইলো।

আমি বললাম গল্পটা আপনার মুখেই শোনা। সেই যে একটা ট্রেন ডাকাতির গল্প বলেছিলেন।

সাব্বাস তাপসবাবু। ব্যানার্জী আমার পিঠ চাপড়ে হেসে উঠল। হো হো হো, তাপসবাবু। তবে কি জানেন ওটা মিথ্যে গল্প। আপনাদের যা বলেছি সব মিথ্যে।

আৎকে উঠলাম। মানুষটা পাগল হয়ে যায় নি তো'

ব্যানার্জী হাসি থামিয়ে চুপ হয়ে গেল। ফুটো বেলুনের মত আমার ভেতরের সমস্ত উদ্দম উৎসাহ নিভে গেল।

দুপুরের রোদ পড়ে গেছে। পার্কে ভীড় জমেছে। বাচ্চারা ছুটছে। বাদামওয়ালা, ফলওয়ালা হাকাহাকি করে যাচ্ছে। ব্যানার্জী মনমরা চুপচাপ।

হঠাৎ সে বলে উঠলো, সত্যি গল্পটা শুনুন তা হ'লে। গল্প বলার আগ্রহে বুড়োর চোখমুখ ঝিকমিকিয়ে উঠলো।

আমার ইচ্ছে নেই। তবু না করতে পারলাম না। ব্যানার্জী কি মনে করেন। বরং আমার জানতে ইচ্ছে করছিল ব্যানার্জী এখন কোথায় থাকে, ধর্মমেয়ের কাছে গেলে তারা কি একটু জায়গা দিত না। সে-কথা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। গল্প বলার তাগাদায় বুড়োর তখন চোখমুখে হাসি আনন্দ ঝিকমিকিয়ে উঠছে। আচ্ছা বলুন সত্যি গল্পটা আপনার মুখে শুনি।

ব্যানার্জীবাবু এবার দমে গেলেন, বললেন, কি-ই বা বলব বলুন, আপনারা আজকাল গল্প লিখে মেডেল পান। তবে আমারও একটা সোনার মেডেল পাবার কথা ছিল।

দারুন ইন্টারেস্টিং। গল্প শোনার জন্য তৈরী হতে থাকি। ব্যানার্জীকে ফের বার দু'য়েক তাগাদাও মারি।

শুনবেন ...। হো হো হো করে হেসে উঠলো ব্যানার্জী। ব্যানার্জী হাসে আমার গা কাঁপে, ভয় ভয় করে। এই মানুষটা এমন-ভাবে হাসতে পারে! শেষে হাসি থামিয়ে বলল, সে দারুন গল্প।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। গল্প বলার পূর্বমুহূর্তে ব্যানার্জী কেমন যেন হয়ে যায়। আমিও ভুলে যাই কলকাতার এই পার্কে বসে আছি। এক রহস্যঘন আবরণের আচ্ছাদন ঢেকে দিল আমাদের।

ব্যানার্জী বলতে শুরু করলঃ

আজ থেকে বারো বছর আগের কথা। আমি তখন একটা প্রাইভেট ফার্মে ইলেকট্রিসিয়ানের কাজ করি। বিয়ে করেছি। একটা ছেলেও হয়েছে। আমি কলকাতায় থাকি। বৌ-ছেলেমেয়ে গাঁয়ের বাড়িতে মা-বাবার কাছে। হুগলী জেলায় আমাদের বাড়ি। তা-সেবার বৌ এসেছিল কলকাতায় দুর্গাপুজো দেখতে। কলকাতায় ঠাকুর দেখে, আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে বিজয়ার প্রণাম সেরে কোজাগরী পূর্ণিমার আগের দিন বাড়ি ফিরে যাচ্ছি লাস্ট ট্রেনে। বলে থামলো ব্যানার্জী।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমি অপেক্ষা করে থাকি। ব্যানার্জী কিছুক্ষণ দম নিতে লাগলো। কাশলো থক্‌থক্ করে। শেষে ফের বলতে লাগলোঃ

তখন সবে ইলেকট্রিক ট্রেন চলতে শুরু করেছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন। খুব বেশী একটা ভীড় নেই। ছেলেমেয়ে বৌ নিয়ে আমার মত আরো অনেকে চলেছে দেশের বাড়িতে। বাইরে ধবধবে জ্যোৎস্না। কখনো ধানের ক্ষেতে, কখনো মাঠ বিলে দিব্যি দিনের মতো চাঁদের আলো। ট্রেন ছুটছে মাঠ বিল আর শহর গ্রামের বুক চিরে। হঠাৎ প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে থেকে চার-পাঁচটি ছেলে উঠে দাঁড়াল। মুখে কাপড় বাঁধা চোখের পলকে ভোজালি, ছুরি, পিস্তল বের করে ধরল। কামরার যাত্রীদের উদ্দেশ্যে হুকুম করল, যার যা আছে - ঘড়ি, আংটি, গলার হার, বালা-চুড়ি, টাকা পয়সা দিয়ে দাও। মোটেই দেরী করবে না।

জোয়ান বয়স স্বাস্থ্যবান যুবক আমি। উঠে দাঁড়ালাম। তাকিয়ে দেখি গোটা কামরাটা ভয়ে কাঁপছে। বাচ্চারা চীৎকার করছে, মেয়েরা কাঁদছে, ট্রেন চলছে। যে যার ঘড়ি আংটি খুলছে, টাকা পয়সা বের করছে—।

আমার দিকে ছুরি হাতে ছেলেটি এগিয়ে আসে। দেরী হচ্ছে কেন? শীগ্‌গীর খুলে দাও।

খুলে দিতে হবে কেন?

ছুরির ধারালো ফলাটা এগিয়ে এলো আমার গলার কাছে। ঘড়িটা না খুলে হাতটা বাড়িয়ে ধরলাম। বৌ তো ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করেছে।

হঠাৎ কি যেন হলো আমার বুঝতে পারলাম না। একটা পা দিলাম চালিয়ে। ছুরি হাতে ছোড়াটা পড়ে গেল। অস্ত্রটা ছিটকে গেল দূরে। পিস্তলটা ছিল খেলনা পিস্তল। চীৎকার করে বললাম মারো, মারো, ধরো সব। ধস্তাধস্তি হুড়োহুড়ি। ট্রেনটা থেমে যাচ্ছে। আমার মাথায় কে যেন মারল। আমিও কষে ঝাড়লাম তিন-চারটে লাথি। তারপর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম।—বলে থামলো ব্যানার্জী।

পলকহীন চোখে নির্বাক হয়ে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ হাঁফিয়ে দম নিয়ে ব্যানার্জী বলল, আমার জ্ঞান ফিরিল হাসপাতালে—তিন-চার দিন পরে। মাথায় সেলাই পড়েছে চার-পাঁচটা। পেটে সেলাই। ব্লিডিং হয়েছে। স্যালাইন দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার বলছেন রিস্ক্ আছে। যমে-মানুষে টানাটানি চলল কিছুদিন। কোথাও কোথাও খবর রটে গেল আমার মৃত্যু হয়েছে - ডাকাতের সঙ্গে সংঘর্ষে। ডাকাতও মরেছে তিনজন। কিন্তু আমি আর সেরে উঠতে পারলাম না। শিরদাড়া ভেঙ্গেছে। মাথায় চোট লেগেছে, চোখে কম দেখি। বাড়ি পৌঁছে খবর পেলাম বৌ-ছেলে নেই—তারাও সেদিন ট্রেনের কামরায় শেষ। পঙ্গু অথর্ব হয়ে গেলাম। চাকরিতে ফিরে যেতে পারলাম না। অসুস্থ বলে আগেই বরখাস্ত হয়েছি।—তারপর কয়েক বছর ধরে শুনলাম আমার বীরত্বের কাহিনী। ডাকাত পিটিয়ে মেরেছি। শুনলাম নাগরিক কমিটির তরফ থেকে আমাকে সম্বর্ধনা জানানো হবে—বুঝলেন তাপসবাবু। বলা শেষ করে হাসলো ব্যানার্জী।

কিছু সময় চুপচাপ বসে থাকলাম। শেষে জিজ্ঞেস করলাম, মেডেলটা কি করেছেন?

হারিয়ে গেছে। সেটাই তো এখন খুঁজে বেড়াচ্ছি। বলে উঠে চলে গেল ব্যানার্জীবাবু। কিছুদূর গিয়ে হাত বাড়িয়ে বলতে লাগল, অন্ধ, বুড়ো লাচারকে দু' চার পয়সা সাহায্য দেবেন বাবু।

চটকল মজদুর

মহঃ আমিন

দুখের চিত্র, আতুর প্রাণ মজদুর আমি মূর্ত দুর্দশার;
মানুষ-মারা সে মিলে মজদুর জুটমিল মানে চটকল নাম যার।

ভোর না হতেই ঘুমঘোরে উঠি চমকে হঠাৎ সিটির তীক্ষ্ম রবে;
বুক ধড়ফড়, চলে না যে পাও, গেট খুলে দেয় দিনের সুরুতে যবে।
ঝঙ্কার তুলি বীণার তারে পারি যেই মত, সে গান বেসুরো বাজে;
উড়তে সাহস না-পাওয়া পাখির মত পড়ে রই বিকল এ জগতমাঝে।

যুগযুগ ধ'রে আমার এ সফর, এখনো রয়েছে দূর পথ পারাপার;
দুখের চিত্র, আতুর প্রাণ মজদুর আমি মূর্ত দুর্দশার।

মানুষের খুনলালসায় লোল ডাইনীর মত দাঁড়িয়ে চিমনিগুলি
মুখোদ্গীর্ণ কালচে ধোঁয়ায় বিলোতে দুঃখ দৈন্যের ভরা ঝুলি।
আশাভরসার গাছটি মুড়োতে দু' পায়ে মাড়ায় শ্রমের মর্যাদাকে;
কারখানা নয়, কয়েদখানা এ আমরণ সাজা ভোগাতে জীবনটাকে।

নির্বাসন আর হতাশার ঘনারণ্য যে মিল মজদুর আমি তার;
দুখের চিত্র, আতুর প্রাণ মজদুর আমি মূর্ত দুর্দশার।

বিষাদের ছায়া নামে চোখেমুখে, হিমেল নিশাস ঝরাই সন্ধ্যাযামী;
ওঠার শক্তি নেই দেহে আর, দুষি আপনার অদৃষ্টেরেই আমি।
মরণভাবনে জীবন যাপন, রাত কেটে যায় এপাশ ওপাশ করে;
বাঁচার মরার দ্বন্দ্বে সদাই, দুখের জোয়ারে চোখে জল ভরে।

স্বর্ণ পূজার খুনী মন্দিরে আমি নিরুপায়ে প্রাণ সঁপি আপনার;
দুখের চিত্র, আতুর প্রাণ মজদুর আমি মূর্ত দুর্দশার।

মনে পড়ে সেই অতীতের কথা ছিলাম যখন চিন্তভাবনাহীন;
আবেগোল্লাসে ছিল ভরপুর দেহমনপ্রাণ, হাসিঝলমল দিন।
স্পন্দিত বুকে ছিল চঞ্চল উতলা আকল কামনামদির প্রাণ;
মিলের বাহিরে বন্ধুমহলে সুখ্যাত ছিল আমার এ দীপ্ত প্রাণ।

এ কারখানায় আসার পরেতে ঘেরাও নিত্য নতুন সমস্যার;
দুখের চিত্র, আতুর প্রাণ মজদুর আমি মূর্ত দুর্দশার।

এদেশে যখন ভিনদেশী রাজ, পথের হদিস ছিল না বাড়বো আগে;
শুনতুম কথা দেশনেতাদের, প্রাণের কি হাল জানাবো আর সে কাকে।
সুর মিলায়েছি জাতির সুরে, নিজেদের শ্রেণী সঙ্গীত ছিল মানা;
সার বেঁধে সবে দেশনেতাদের লড়বো তারও কায়দা ছিল না জানা।

রাজ বদলেছে, তাজ বদলেছে, তবু আগেকার তল্পি বাহি যে তার;
দুখের চিত্র, আতুর প্রাণ মজদুর আমি মূর্ত দুর্দশার।

ফাঁকা বুলি সব দেশনেতাদের, যেমন বস্তি তেমনি আমার ঘর;
বনিয়াদ গড়ে আমার বস্তি, মহল সাজায় মালিকেরা তার পর।
ওদের ঘরেতে ধনভাণ্ডার, আমি মেতে রই দৈন্যের মদিরায়;
যত গড়ি হাতে সেই অনুপাতে আমার হাতের পুঁজিও ফুরিয়ে যায়।

কি যে হারালাম, কিই বা পেলাম পারবো না আজ বলতে সে কথা আর;
দুখের চিত্র, আতুর প্রাণ মজদুর আমি মূর্ত দুর্দশার।

ছেলেপিলেদের মুখের হাসি ফুটাতে চালাই দু-দুটো মেশিন আমি;
ঘরের লোকের বসন জোগাতে রক্তে আগুন জ্বালাই দিবস যামী।
কানুনরূপী এ লুটের কাহিনী শোনাই, তোমরা অবাক মানবে শুনে;
মাসান্তে শুধু ক'টি কাগজের টুকরো কামাই শ্রমের মূল্য গুনে।

খাটার পরেতে খাটাই রীতি, ব্যাখ্যা দেব কি সংশোধনের তার;
দুখের চিত্র, আতুর প্রাণ মজদুর আমি মূর্ত দুর্দশার।

দানবাকৃতি মেশিন ঘোরে যে যৌবন ক্ষয় ক'রে যাই তার পায়;
সকাল সন্ধ্যা যুঝি তার সনে, পাট ছুঁয়ে সোনা গড়ি সে কারখানায়।
পাটঘর থেকে সেলাই বাঁধাই মিলের সকল মেশিন চালাই আমি;
কলজের খুনে মেশিনগুলির রোজ বেড়ে-যাওয়া পিয়াস মিটাই আমি।

আমি সে প্রেমিক বিশ্বরূপের কায়শ্রম হ'রে নিল আজীবন যার;
দুখের চিত্র, আতুর প্রাণ মজদুর আমি মূর্ত দুর্দশার।

তিমির রাত্রি, দুর্গম পথ, উচ্চে আরও মশাল জ্বালিয়ে চলো;
কেউ না ক্লান্ত পিছে পড়ে রয়, সারিগান গেয়ে চলো।
শহর গাঁয়ের ডাকো জনে জনে, মেহনতী সব মানুষ জাগিয়ে চলো;
পথের দু'ধারে দৈন্য পীড়িত দেখবে যাদের হাত ধ'রে নিয়ে চলো।

জীবনের গতি চলে দ্রুততর, কর্মোল্লাসে ভরপুর আমি আজ;
থাকনা হাজারো দুঃখ ভাবনা, দৃঢ়নিষ্ঠার মজদুর আমি আজ।

পূবের আকাশে তাকিয়ে সবাই আমার ঊষার উদয় প্রতীক্ষায়;
য়ুসুফের লাগি এদেশে আবার সাজবে জুলেখা যৌবনসজ্জায়।
অত্যাচারী বা অত্যাচারিত থাকবে না কেউ সেদিনের গাই গান।
জমানা পালটে আসবে যেদিন নতুন সমাজ আমি উদ্বেলপ্রাণ;

অত্যাচারী বা অত্যাচারিত থাকবে না কেউ সেদিনের গাই গান।
আসবে সেদিন আসবে আমার এ দেশে।

মূল কবিতাটি উর্দুভাষায় রচিত। রচনাকাল—১৯৫২।
অনুবাদ : সুনীলবরণ রায়।

প্রিয়তমেষু

মিলনেন্দু জানা

প্রিয়তমেষু,
কাঁচের প্রচ্ছদ ভেঙে, তোমার সৌন্দর্য নেয়া—শাসনের
কঠিন নিষেধ :
হৃদয় তবুও জানে, আমার সর্বস্ব ধন তোমারই রক্তের নীচে।

সব খেলা থেমে গেলে, সব পাখি ফিরে গেলে গোপন আড্ডায়—
দু'চোখ উন্মুক্ত রাখি, উত্তপ্ত দু'বাহু খুলি সময়ের কাছে :
হয়তো তোমার শব্দ এইমাত্র পেয়ে যাবো বিজয়ী গৌরবে।

দাসত্ব, বঞ্চনা যত, অত্যাচার পীড়নের পাথুরে প্রত্যয়—
একদিন জানি ঠিক পরাজয় মেনে নেবে সংগ্রামের তূণে।
রক্তের যা কিছু মূল্য, রক্ত ঠিক খুঁজে নেবে ইতিহাস ঘেঁটে—
আশ্চর্য! তখনো তুমি এমনি জিজ্ঞাসু রবে পৃথিবীর প্রতি?

যুগ থেকে যুগে হাঁটি, কদাচিৎ দেখা হয় কাঁচের আড়ালে—
হয় যা সামান্য অতি, প্রাণে সব ভরা থাকে কথার বারুদ,
অনন্ত জীবন ধরে, ওরাই জাগ্রত রবে—মাটি আর মানুষের
মুক্তির প্রাসাদে।

সামান্য শরীর বেঁধে - ওরা ভাবে খুব জয়ী : জয়টীকা দেখি আমি
তোমার শৃঙ্খলে
প্রেমের অমর দীপ—'মুক্তি'তে ভাস্বর হোক সময়ের
চাবিকাঠি হাতে॥**

** দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথিতযশা মুক্তিযোদ্ধা নেলসন ম্যান্ডেলা দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে শাসকগোষ্ঠীর হাতে বন্দী। সরকারী মধ্যস্থতায় কাঁচের দেয়ালঘেরা ঘরে ফোন মারফৎ শ্রীমতী ম্যান্ডেলা মাসে একটিবার মাত্র এক ঘণ্টার জন্য কথা বলতে পারেন বন্দী স্বামীর সঙ্গে। সঙ্গে ঘণ্টাখানেক চোখের দেখাও। স্পর্শ করার উপায় নেই। এই পটভূমিকায় 'প্রিয়তমেষু'র জন্ম।

ভারতবর্ষ

শ্যামলকুমার সরকার

এক রঙ এক জাতি পরম আত্মীয়
বসে আছো আজন্ম পিঠে পিঠ রেখে
উন্মত্ত ব্রহ্মপুত্রে
কতবার হাতে হাতে দিয়েছিলে বাঁধ
কাঁধে দিয়ে কাঁধ গড়েছিলে
জীবন-বসতি
বুক ছুঁয়ে বল দেখি তবে
এক দেহে এক অঙ্গ ভারতীয় যদি
অন্য অঙ্গ কোন মন্ত্রে বিজাতীয় হয়?

লজ্জিত চেরাপুঞ্জির মেঘ
মাথা নীচু করে আছে দিক চক্রবালে
ভারতীয় রক্তবাষ্পে লাল
ভারতের স্বাধীন আকাশ

কেন তবে নিজগৃহে জতুগৃহ গড়
কুচক্রীর মন্ত্রে কেন পরিপুষ্ট হও, কেন তবে
বাজাও দুন্দুভি
কেন চাও ভারতবর্ষ হোক খান খান?

এখনও সময় কিছু আছে
ফিরে এসো আপনার মনে
বিভ্রান্ত ভারতবর্ষ হয়েছে চঞ্চল
আবার যে বন্যা এলো হাতে হাত দাও।

ক্রমশ

উৎপল মুখোপাধ্যায়

রাস্তা পেরিয়েই আমার এই উঠোন
এই উঠোনই আমার স্বপ্ন,—
আমার দাঁড়াবার ঠাঁই
আমার গ্রামের মাটি,
আমার আপনজন দুঃখব্যথার সান্ত্বনা
কলমি লতার দিঘল দীঘি
সুখদুঃখের ধুলোয় ভরা দিন রাত্তির।

আমার আকাশ, আমার নদী
দু'চোখে পড়ন্ত রোদ
তেলহীন প্রদীপের কাঁপা আগুন
আমার অবাক করা অস্তিত্ব।

নাড়ীর মধ্যে হাজার পাকে
দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ক্ষুধার দৈত্যগুলো
আহা আমার স্বপ্ন
পিতৃদত্ত শ্যামল বাগানখানা আহা।

এবার উঠোন ছেড়ে রাজপথে
ফুটপাত আর কানাগলিতে
অনেক মানুষের সাথে অভিষেকে
ধোঁয়ার মধ্যে সূর্যের মুখ দেখেছি
আমার অবৈভব ভূখণ্ডে এখন বুক চিতিয়ে দাঁড়াবার
সাহসে জেগেছি
রক্তের আবর্তে আবদ্ধ সংস্কার থেকে আমি ক্রমশ মুক্ত হচ্ছি
ক্রমশই......

শিল্প-সংস্কৃতি

ইদানিংকালের কয়েকটি ভাল ছবি

হীরক রাজার দেশে—যক্ষপুরীর বাসিন্দারা

সত্যাজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৬৯ সালে, সেই গুপী-বাঘাকে নিয়ে তোলা ছবি 'হীরক রাজার দেশে' মুক্তি পেল ১৯৮০ সালের শেষাশেষি। মাঝে এক দশকের ফারাক। সময়টা কম নয়। তবে এই সময়ের দরকার ছিল। এই সময়ের মধ্যে মানুষের পূর্বের অনেক ভুল ভেঙেছে, অনেক ভাঙা চিন্তা জোড়া লেগেছে, অনেক জোড়া লাগা বিশ্বাস স্থিতধীপ্রাপ্ত হয়েছে। সত্যজিৎবাবুও এর ব্যতিক্রম নন। তাই 'গু-গা-বা-বা'তে যারা ছিল মূল চরিত্র, 'হীরক রাজার দেশে' তারা পার্শ্বচরিত্রে অবতীর্ণ। বলা বাহুল্য, 'গু-গা-বা-বা'-এর সঙ্গে 'হীরক রাজার দেশে'-র যা-কিছু মিল তা ওই শুধুমাত্র গুপী ও বাঘা। 'গু-গা-বা-বা'-তে ভবঘুরে গুপী-বাঘার অতিপ্রাকৃত কান্ড-কারখানার মাধ্যমে একটা অ্যান্টি-ওয়ার মিল পাওয়া গিয়েছিল, এবার তার পরিবর্তে দেখা গেল একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ প্রবণতা। সত্যজিৎবাবু এই ছবিতে ফ্যানটাসি ও কমেডির সঙ্গে একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শোষণের বিরুদ্ধে চিরকাল তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন, 'মুক্তধারা' নাটকে এই প্রতিবাদ যন্ত্রের বিরুদ্ধে আর 'রক্তকরবী' নাটকে এই প্রতিবাদ পুঞ্জীভূত ধনের বিরুদ্ধে। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে সমগ্র বিশ্বজগতে যন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ হচ্ছে, যে শক্তিমদমত্ত শোষক প্রাণের রস নিংড়ে নিয়ে মানুষকে অমানুষে পরিণত করছে, সেই শোষকের শক্তিদম্ভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তবেই মুক্তি অর্জন করতে হবে এবং ওই বিপ্লবের সাহায্যেই জীবনের হারানো সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে—'রক্তকরবী' নাটকের মূলে রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসই কাজ করেছে। যদি বলি, সত্যজিৎবাবুকে 'হীরক রাজার দেশে' তৈরীর পেছনে এই বিশ্বাসই প্রেরণা জুগিয়েছে, তবে কি ভুল করব? শোষণযুক্ত সভ্যতায় কি করে মানুষ শোষণে পীড়নে লাঞ্ছিত হয়, শোষকশ্রেণী কিভাবে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে এবং শোষকের পরাজয়ের ফলে মানবতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, এই চলচ্চিত্রে তো তারই প্রকাশ লক্ষ্য করি। একথা ঠিক, 'হীরক রাজার দেশে' সংগ্রাম কিংবা আন্দোলনের কোন চিহ্ন নেই, কিন্তু একনায়কতন্ত্রকে ধ্বংস করার প্রতিবাদী মানসিকতা (হীরক রাজার সৈন্যদের বস্তি ভাঙার ঘটনা, বই পোড়ানো, পাঠশালার পণ্ডিতের নির্বাসন) আমরা দেখি, তা তো অস্বীকার করা যায় না।

শোষণের প্রতীক হলেন 'রক্তকরবী'র রাজা। তিনি অমিত শক্তির অধিকারী। যান্ত্রিক শক্তিতে শক্তিমান। তাঁর স্বর্ণলঙ্কা থেকে হীরক রাজার হীরের খনি কি আলাদা কিছু? হীরক রাজার রাজ-ধর্ম, প্রজাশোষণ, দুর্দম অর্থলোভ বার বার 'রক্তকরবী'র রাজাকেই মনে করিয়ে দেয়, জীবনের প্রকাশ যেমন 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরীতে পাই না, তেমনি 'হীরক রাজার দেশে'ও জীবনের অভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত। 'রক্তকরবী'তে এই জীবনের প্রকাশ কোনদিনই ঘটত না, যদি না নন্দিনী যক্ষপুরীতে আসত। এই নন্দিনী 'হীরক রাজার দেশে' নেই, তবে তার জায়গা খালি পড়ে নেই, উদয়ন এসেছেন নন্দিনীর ভূমিকা পালন করতে। উদয়ন একজন সামান্য অধ্যাপক হয়েও রুখে দাঁড়িয়েছেন অশুভ শক্তিধর রাজার বিরুদ্ধে, ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন রাজার স্বৈরাচারিতাকে, একনায়ক-তন্ত্রের কাঠামোকে। 'হীরক রাজার দেশে' যদি কোন চরিত্র বিপ্লবীর ভূমিকা নিয়ে থাকে, তবে এই উদয়ন। এই ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় মনে রাখার মতো। যক্ষপুরীর নিয়ম কিশোরের মনকে যেমন বাঁধতে পারে নি, তেমনি হীরক রাজার আইনও গুরুমশায়ের ছাত্ররা মেনে নেয় নি কোনদিন। এই নিয়ম বাঁধতে পারে নি চরণদাসকেও। সে মুক্ত পুরুষ। চরণদাস তো সম্পূর্ণভাবেই বিশু চরিত্রের কাঠামোয় তৈরী। ধনদানব হীরক রাজা, ক্ষমতাসম্পন্ন সর্দারেরা উদয়ন, চরণদাস, পাঠশালার ছাত্রদের প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে (যেমনভাবে নন্দিনীর প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল রক্ত-করবীর রাজা ও সর্দারেরা)। কিন্তু পারে নি। তাই 'রক্তকরবী' নাটকের মতো 'হীরক রাজার দেশে'তে দেখি শেষকালে রাজাও জনগণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন অশুভ শক্তির বিনাশকল্পে।

এই ছবির একটি বড় আকর্ষণ সংলাপ। যা সারা ছবিতে একটি আলাদা মেজাজ আনতে সক্ষম হয়েছে। টেকনিক্যাল কাজ ও রঙের ব্যবহারে সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় আছে ছবিতে। অবশ্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সত্যজিৎবাবু এখানে 'গু-গা-বা-বা'রই অনুসারী। সৌমেন্দু রায়ের কালার ফটোগ্রাফি, এককথায়, চমৎকার। শিল্পীদের অভিনয় যথাযথ, স্বাভাবিক। শেষ কথা, 'হীরক রাজার দেশে'-র মগজ ধোলাই কি শুধুই হীরক রাজার? আর কারও নয়? এই উদয়ন কে? একি কেবল নন্দিনীরই অপর সত্তা? যিনি হীরক রাজার দেশে নতুন আলো—নতুন জীবনের সন্ধান দিলেন, নেপথ্যে থেকে সত্যজিতের চিত্রনাট্য রচনায় সহায়তা করলেন তিনি কে?

শোধ—জীবনের যন্ত্রণা, যন্ত্রণার উপশম নয়

চলচ্চিত্রের নাম 'শোধ'। শব্দটি উর্দু। ইংরাজিতে যার অর্থ করা হয়েছে search, বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায় সন্ধান। ছবির শুরু এক অদ্ভুত সাসপেন্সের মধ্যে দিয়ে। পর্দার অন্ধকার এরোপ্লেনের শব্দের সঙ্গে (এই শব্দ একাধিকবার শোনা গেছে, এর তাৎপর্য পরিষ্কার নয়) মিশে ছবির নামকরণকে রহস্যময় করে তোলে। এক সময় শব্দ মিলিয়ে যায়, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক অন্ধকারের বুক চিরে নিস্তব্ধতা রচনা করতে থাকে। পরিচালক বুঝি প্রথম থেকেই

দর্শকদের সচেতন করে দিতে চান, আমরা যেন কোনরকম শব্দ না করি, তাহলে যাকে খুঁজে পেতে চাই সেই পাওয়াটাই যে মাটি হবে! ক্রমশঃ জোনাকির মতো কিছু আলো দূরে দেখা যায়। ঐ আলো...আলো হাতে কয়েকটি লোক এগিয়ে আসে। এক হাতে জ্বলন্ত হারিকেন, অন্য হাতে লাঠি। এত রাত্রে জঙ্গলে এরা কেন? এরা কারা? এর উত্তর অবশ্য কাহিনীকার (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) ও পরিচালক (বিপ্লব রায়চৌধুরী) আমাদের দিয়েছেন। তবুও প্রশ্ন জাগে যার সন্ধানে এই সুরিন্দর ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ঘুরে বেড়াচ্ছে রাতের পর রাত, সে কি ভূত? উত্তরটা পরিষ্কারভাবে পরিচালক আমাদের দেন নি। তবে এই ভূত-খোঁজার পেছনে সোনাগাঁও গ্রামের মানুষের একমুঠো ভাতের জন্য যে নীল যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণায় ছটফট করে কিছু হলুদ ভালবাসা, কয়েকটি সবুজ সন্তান, তার নির্মম রূপ সার্থকভাবে পরিচালক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। একদিকে দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর যন্ত্রণা, অন্যদিকে অভাবের অন্তহীন চিৎকার। সেই নিষ্ঠুর যন্ত্রণার শিকার বাসু, নিবারণ, সনাতন মহাদেবের মতো পরিবার। তাঁরা খুঁজে বেড়ায় একমুঠো ভাত—গরম ভাত। তাদের সামান্য আশা—তারা খেয়ে পরে বাঁচতে চায়। যে অশুভ শক্তি তাদের এই পথের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াতে চায়, তাকে তারা খুঁজে বার করবেই, তাই কি তারা রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটায়? কিন্তু যে অশুভ শক্তির ইঙ্গিত দিনের আলোতেই স্পষ্ট (গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং যার প্রমাণ), তাকে পরিচালক ভালভাবে কাজে লাগালেন না কেন? এই অশুভ শক্তির বিনাশ একজনই ঘটাতে পারত—সে সুরিন্দর। যে অন্যায়, অত্যাচার বাল্যকালে সুরিন্দরকে গ্রাম ছাড়া করেছে, যে অত্যাচারের শিকার তার বাবা, মা, নিবারণের পরিবার, সনাতনের মেয়ে গীতা (একমুঠো ভাতের জন্য যে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে), সর্বানন্দের পুত্রবধু শান্তি (যে দুশ্চরিত্র শ্বশুরের শিকার হয়), গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষ, সেই অন্যায় অত্যাচার নামক আগাছাগুলোকে গ্রাম-বৃক্ষ থেকে ছেঁটে ফেলার চেষ্টা তো পরিচালক তাকে দিয়ে করালেন না অথচ ঐ অনুন্নত অঞ্চলের পরিবর্তন একমাত্র সুরিন্দরকে দিয়েই ঘটানো যেতে পারত। সুরিন্দরের কাছ থেকে বিপ্লব না হলেও অন্ততঃ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কিছু লক্ষণ তো আশা করতে পারতাম। গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ তাকে দেখাই গেল না। গ্রামবাসীর মনে সুরিন্দর বেঁচে ওঠার যে প্রেরণা জাগাতে চেষ্টা করে, তা কার কতটা কাজে লাগে, তা তো পরিষ্কার হল না। অবশ্য সুরিন্দর শান্তিকে তার শ্বশুরের নির্দয় অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করে। গীতার গ্রাম ছাড়ার ঘটনা শুনে রাগে ফেটে পড়ে। এই দুটি ঘটনাই সুরিন্দরকে আমাদের বড়ো কাছে টেনে আনে। অন্যত্র সুরিন্দরের ভূমিকা স্পষ্ট নয়। তার নিজের ভাতের অভাব না থাকলেও, দারিদ্র্যের যন্ত্রণা থেকে গ্রাম-বাসীদের মুক্তি দেবার জন্য সে যে প্রচেষ্টা শুরু করে, সেই কাজে তার নিজের কতখানি আস্থা ছিল, আদৌ ছিল কিনা, বোঝা গেল না। ভূত বলতে পরিচালক যদি সমাজের ক্ষতকে (যে ক্ষতের চিহ্ন গ্রামের মিটিং-এ সামান্য হলেও লক্ষ্য করা গেছে) বুঝিয়ে থাকেন, তবে সেই ক্ষতের মলমের খোঁজ তিনি পান নি। সব থেকে আশ্চর্য লাগে, যখন অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ সাতজন মানুষকে সুরিন্দরকে ভূত বলতে শুনি, যারা তার পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে গাছতলায় হাঁড়ি থেকে চুরি করে ভাত খাচ্ছিল। যাই হোক বক্তব্যের দিক থেকে 'শোধ' নিটোল না হলেও এ ছবিতে পরিচালকের ট্রিটমেন্ট স্মরণীয়। বিভিন্ন কাটশটের মধ্যে দিয়ে পরিচালক অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক সংকটের নির্মম চিত্রকে তুলে ধরেছেন (গভীর রাতে জঙ্গলে মহাদেবের স্ত্রীর ভূত খুঁজতে যাওয়া, শান্তির শরীর থেকে ভূত তাড়ানো, নিবারণের পিতাকে খুন করতে যাওয়া প্রভৃতি)।

চলচ্চিত্রের ভাষা হিন্দী। এখানকার সংলাপ (হৃদয়েশ পাণ্ডে কৃত) এতই সহজ, সরল, মাটিঘেঁষা যে, চরিত্রগুলোর যন্ত্রণা একে-বারে শিরদাঁড়ায় গিয়ে আঘাত করে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের (বিশেষভাবে সুরিন্দররূপী ওমপুরীর) সমবেত সাবলীল অভিনয় (ভালো গ্রুপ থিয়েটারের কর্মীদের মতো), পরিপাটি চিত্রনাট্য, পরিচ্ছন্ন এডিটিং (বিপ্লব রায়চৌধুরী) এবং সঙ্গীত (শান্তনু মহাপাত্র) ও পরিবেশের হরিহর সম্মিলন ছবিটিকে একটি সৎ চলচ্চিত্রের স্তরে উন্নীত করেছে। ক্যামেরার কাজ (রাজন কিনাজি) এতই উন্নত, মার্জিত যে প্রত্যেকটি শটকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। তবে ছবিটি শেষ পর্যন্ত এই শোধেই শেষ হয়েছে, এর থেকে উত্তরণ ঘটে নি। তাই চরিত্রগুলোর যা কিছু যন্ত্রণা—শুধু দেখতেই ভালো লাগে, তা নিয়ে ভাবতে নয়।

অ্যালবার্ট পিন্টো—একটি শাণিত প্রতিবাদ

ইদানিংকালের সৎ ছবির তালিকায় 'অ্যালবারট পিন্টো কো গুস্সা কিঁউ আতা হ্যায়' একটি উজ্জ্বল সংযোজন।

অ্যালবারট পিন্টো এমন একটি ব্যক্তিত্ব যার সান্নিধ্য—নিজেদের দুর্বলতা, ভীরুতাকে খুঁচিয়ে তোলে। অ্যালবারটের যন্ত্রণা আমাদের মনের কোথায় যেন আঘাত করে, নিজের ওপরই তখন রাগ হতে থাকে। সৈদ মির্জা একটি ভিন্ন জাতের, ভিন্ন স্বাদের ছবি করেছেন যাতে খ্রীষ্টান সমাজের মানুষদের মানসিক গঠন ও ভাবনাচিন্তার পরিচয় সুব্যক্ত। কথাবার্তায় ও আচরণে চরিত্রগুলোকে মাটির কাছাকাছি মনে হয়। চার্চের সংস্কার অ্যালবার্টের সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। প্রেমের ক্ষেত্রেও অ্যালবার্ট সচেতন, প্রেম যেখানে কোন বাধা মানতে চায় না, সেখানেও তার মার্জিত আচরণ আমাদের অবাক করে। ভায়ের মস্তান বন্ধুদের সঙ্গে তার সংঘাত, ভদ্র ব্যবহার অ্যালবার্টকে মানুষ হিসেবে যেমন বিশেষভাবে চিহ্নিত করে, তেমনি এক্ষেত্রে পরিচালকের সংযমবোধও লক্ষ্য করার মতো। পরিচালক অ্যালবার্টকে কখনও কোন অবস্থাতেই তার শান্ত অথচ দৃঢ় সত্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি, সারা ছবিতে অ্যালবার্টের স্বভাবের মধ্যে যে চাপা আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে দেখা গেছে, তাই ছবির শেষে মশাল নামক প্রতিবাদে রূপান্তরিত।

একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের অস্পষ্ট যন্ত্রণা কিংবা দেশের বৃহত্তর জীবনপ্রবাহের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের বিযুক্ত বা যুক্ত থাকার জটিল সমস্যা ছবিতে তির্যক ভঙ্গিতে প্রকাশিত। চরিত্র বিশ্লেষণ এমন-ভাবে গভীরে গিয়ে পৌঁছেছে যেখানে একটা গোটা সম্প্রদায়ের অনিশ্চিত অস্তিত্বের হদিশ পাওয়া যায়। চিত্রনাট্য রচনায় পরিচালক নতুনত্ব ও নিজস্বতা বজায় রেখেছেন, ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি ঐকতান সৃষ্টি করেছে। সর্বোপরি 'অ্যালবারট পিন্টো কো গুস্সা কিঁউ আতা হ্যায়' ছবিতে বাস্তব-চেতনায় শাণিত একটি ছবি দেখার সুখ অনুভব করা যায়। অ্যালবার্টের গুস্সার পেছনে যে মনস্তত্ব কাজ করেছে তা আমাদের ভাবায়, যন্ত্রণা দেয়। এই ছবি দেখা সম্পূর্ণ এক নতুন অভিজ্ঞতা, দর্শক হিসেবে নিজের চিত্তশুদ্ধি ঘটানো। শেষের মশালটি অ্যালবার্টের প্রতিবাদে প্রজ্জ্বলিত প্রতিধ্বনিত।

অ্যালবার্টের ভূমিকায় নাসিরুদ্দিন শাহর অভিনয় অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং উচ্চমানের। অ্যালবার্টের বোনের ভূমিকায় স্মিতা

পাতিল ও প্রেমিকার ভূমিকায় শাবানা আজমীর অভিনয় সাবলীল, সহজ। সঙ্গীতের ভূমিকা এই ছবিতে গৌণ নয়, এক্ষেত্রে সঙ্গীত পরিচালক মানস মুখোপাধ্যায় কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। সব শেষে সৈদ মির্জাকে অভিনন্দন জানাই 'অ্যালবারট পিন্টো...'র মতো একটি মার্জিত, শক্তিশালী ছবি আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য।

আক্রোশ—প্রতিবাদের ভাষা

লহন্যা ভিকু এক বলিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। তাই আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো সেও খেয়ে-পরে (যতখানি পারা যায়) দিন কাটাতে চেয়েছিল। এই চাওয়াটা তো অন্যায় নয়। তবে লহন্যা ভিকু সেই পাওয়া থেকে বঞ্চিত হল কেন? কেন অকালে তাকে তার বৌ-এর চিতায় আগুন দিতে হল? শুধু তাই নয়, সে জানল তার বৌকে খুন করেছে সে-ই। কারণ দারিদ্র্য, অভাবের যন্ত্রণা। কিন্তু এ যে মিথ্যে, ভুল, ষড়যন্ত্র। এই ভুল প্রমাণ করতেই একদিন এগিয়ে এলেন সরকারী উকিল ভাস্কর (নাসিরুদ্দিন শাহ)। তিনি লহন্যার কাছে জানতে চাইলেন তার স্ত্রীকে সত্যি সে খুন করেছে কিনা। লহন্যা এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় নি। দিনের পর দিন নানাভাবে একই প্রশ্ন করেও ভাস্কর লহন্যার মুখ থেকে কোন-রকম উত্তর পেলেন না। আমরা পাথর হয়ে থাকলাম এক টুকরো উত্তরের আশায়। পরিচালক গোবিন্দ নিহালনির এ এক অসাধারণ ট্রিটমেন্ট। তিনি প্রতিটি মুহূর্তকে মিতব্যয়ী দৃশ্য, ঘনপিনদ্ধ ঘটনার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। সমাজের মাথাওয়ালা কিছু মানুষের অসামাজিক দিকটা তুলে ধরে পরিচালক লহন্যার বিচারের মাধ্যমে একটা জীবন্ত সমাজের চিত্র এ'কেছেন তাঁর এই প্রথম এবং অনন্যসাধারণ ছবিতে।

ছবির সূচনায় পরিচালক যে সংলাপবিহীন দৃশ্যটিকে উপস্থিত করেছেন তা আমাদের অভিভূত করে। এমন নির্বাক মুহূর্তে ক্যামেরা যে কতখানি গতিসম্পন্ন হতে পারে, চলচ্চিত্রের মুখে জোরালো ভাষা জোগাতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। গোটা ছবিতে লহন্যা (ওমপুরী) নির্বাক। তার চরিত্রের নীরবতা এক ধরনের ক্রোধকে প্রকাশ করেছে। এই আক্রোশের সূত্র সমাজের প্রভাবশালী, সুবিধাভোগী কিছু শাসক-শোষক শ্রেণীর লোক, যারা নির্দ্বিধায় লহন্যার মতো মানুষদের স্ত্রীদের ওপর অত্যাচার করে সেই অত্যাচারের বোঝা স্বামীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ গোবিন্দ নিহালনির 'আক্রোশ'। আসামী লহন্যা যে বোবা ও অপ্রকৃতিস্থ নয়, শেষ দৃশ্যে তার প্রমাণ পাই। ছবির শেষ মুহূর্তে বন্দী অবস্থায় বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় তাকে নিয়ে আসা হলে সে হঠাৎ ক্ষেপে উঠে বোনের মাথায় কুড়ুলের এক প্রচণ্ড কোপ বসিয়ে তাকে হত্যা করে এবং এক মর্মভেদী চিৎকারের মধ্যে দিয়ে তার আক্রোশ প্রকাশ করে। তার বোনকে হত্যা করার কারণ, যাতে সেও ভদ্র অপরাধীর দ্বারা ধর্ষিতা না হয়, যেমন হয়েছিল তার স্ত্রী। লহন্যার আক্রোশ সমস্ত অবহেলিত মানুষের প্রতিবাদের ভাষা। বক্তব্যকে প্রকাশ করার মধ্যে পরিচালকের যে কৌশল, শিল্পবোধ ও পরিমিতিজ্ঞান তা সত্যিই দেখবার মতো। বিজয় তেণ্ডুলকারের অসামান্য চিত্রনাট্য, পরি-চালকের নিজের আশ্চর্য সুন্দর ফটোগ্রাফি, নাসিরুদ্দিন শাহর স্বাভাবিক অভিনয়, আবহসঙ্গীতের সুষ্ঠু প্রয়োগ, সর্বোপরি ওমপুরীর সারা শরীর দিয়ে অভিনয় 'আক্রোশ'কে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

হীরালাল

[জমি থেকে আসা যুবক ও তার ভাবনা : ১৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

পুঁজিবাদ এগিয়ে যাক। আবার বিশেষ অবস্থায় শোষিত শ্রমিক-শ্রেণী যখন দেখবে যে উৎপাদন ও বণ্টনের স্বার্থেই শ্রমিক-মালিক পুঁজিবাদী সম্পর্কটা পালটে সামাজিক মালিকানার ও সামাজিক শ্রমের সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কটাই একান্ত আবশ্যক, তখন সমাজবাদ পুঁজিবাদের জায়গা দখল করে নেবে। আমাদের দেশে জমিদারী পুরোপুরি উঠে যাওয়ার আগেই পুঁজিবাদ চালু হয়েছে, ফলে একদিকে জমিদারী-জোতদারীর বিরুদ্ধে যেমন চলছে কৃষকের লড়াই, তেমনি পাশাপাশি চলছে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই। শেষ গন্তব্যস্থল সমাজতন্ত্র, যে ব্যবস্থায় জমিদার-কৃষক সম্পর্ক থাকবে না, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক থাকবে না। সমস্ত উৎপাদনের সমস্ত সূত্রগুলি যথা—জমি, জল, কল-কারখানা, ব্যাঙ্ক, পুঁজি, সবকিছুই হবে সকলের অর্থাৎ গোটা সমাজের, আর যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবে সকলেই অর্থাৎ গোটা সমাজই।

ছেলে মরলে মা কাঁদে, তাকে ছাড়তে ইচ্ছে করে না, একথা যেমন ঠিক, তেমনি সব মাই জানেন, মরা ছেলেকে বেশীক্ষণ রাখা যাবে না সদ্‌গতি করতেই হবে। বরং ফেলে রেখে মায়া না বাড়িয়ে, সদ্‌গতির ব্যবস্থাই তাড়াতাড়ি দরকার। তেমনি সমাজের দ্বারা ঘোষিত মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত জমিদারী/জোতদারী যে আর বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যাবে না, এমন কি তারা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও না, সেকথা জমি থেকে আসা ছেলেরা জানে। প্রসূতির জ্বালা যন্ত্রণা তীব্র থেকে তীব্রতর হলেও যত তাড়াতাড়ি নব-জাতকের আবির্ভাব হয়, ততই মঙ্গল। ঠিক তেমনি ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার দুর্বলতা ও নিরাপত্তা-হীনতার যন্ত্রণাকে জয় করে যত শীঘ্র বর্তমান অস্বস্তিকর সমাজব্যবস্থার স্থলে নব-জাতক সমাজব্যবস্থার আবির্ভাব হয় ততই মঙ্গল। এই নতুন সমাজব্যবস্থার অভ্যর্থনায় জমি থেকে আসা ছেলেরাও সমস্ত দুর্বলতা জয় করে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করে এই পৃথিবীটাকে বাসযোগ্য করে গড়ে তুলবার শপথ নেবে আশাকরি।

লোক চিত্রকলা

শিল্পী ঃ বিকাশ দাস

ইউরেনিয়াম ঃ কিছু সংবাদ

ইউরেনিয়াম। সংবাদপত্রের দৌলতে শব্দটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ইউরেনিয়াম দেবে কি দেবে না, প্রাপ্য ইউরেনিয়াম কতখানি কার্যকরী ইত্যপ্রকার গবেষণা ইদানীং প্রায়শঃই শোনা যায়। কিন্তু বস্তুটি সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য ঐ সমস্ত ঘটনার থেকে জানা যায় না। এই সুযোগে ইউরেনিয়াম সম্পর্কে কিঞ্চিৎ খোঁজখবর নিলে মন্দ হয় না।

দেখতে দেখতে প্রায় দু'শ বছর হতে চলল। মানবসমাজের সাথে ইউরেনিয়াম নামক মৌলটির প্রথম পরিচয় ঘটান বার্লিনের রসায়নবিদ্ মার্টিন হাইনরিখ ক্লাপরথ। সেটা ছিল ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর। তারপর থেকে ইউরেনিয়াম নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। এবং সবশেষে বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম-এর খোঁজ পাওয়া যায় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। ফরাসী রসায়নবিদ্ আঁরি ময়াসাঁ বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম-এর আবিষ্কর্তা।

ইউরেনিয়াম-এর এত নামডাক কেন? অথবা বলা যায় কেন এই বিশেষ মৌলটির বাজার এত রমরমা। উত্তর অতি সহজ—কারণ ইউরেনিয়াম এক নতুন শক্তির উৎস। কোন্ শক্তি? আণবিক শক্তি।

আজকের পৃথিবীতে বছরে ৪০ হাজার টনেরও বেশী ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়। এ খবরে আনন্দিত হবার কারণ নেই। কারণ, উৎপন্ন ইউরেনিয়ামের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ কাজে লাগে। বাদবাকী সবটাই ফেলা যায়।

ইউরেনিয়াম কোন্ কম্মে আসে। সত্যি বলছি এটা এমন এক মৌল যা হোমেও লাগে আবার যজ্ঞেও লাগে। কি রকম?

একটু আগে বলেছি ইউরেনিয়াম নতুন শক্তি উৎসের সন্ধান দিয়েছে। ইউরেনিয়াম-এর বিশেষ আইসোটোপ ইউরেনিয়াম-২৩৫ হল আণবিক বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের জ্বালানীর প্রধান উপকরণ। আর বিশেষজ্ঞদের আগামী দিনের একমাত্র ভরসাস্থল হল আণবিক শক্তি। সুতরাং ইউরেনিয়াম-এর বাজার গরম হতে বাধ্য।

গাছপালার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ইউরেনিয়াম-এর বিশেষ প্রয়োজন। গাজর, বীট প্রভৃতি জাতীয় ফসলে গ্লুকোজ-এর পরিমাণ-এর হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে মাটিতে ইউরেনিয়াম-এর অবস্থিতির পরিমাণের উপর।

অনুমান করা হচ্ছে ঠিকমত ইউরেনিয়াম প্রাণীদেহে নিয়মিত প্রয়োগ করা হলে প্রাণীদেহের ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও ইউরেনিয়াম-এর ব্যবহার আছে।

ইস্পাত থেকে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয় ফেরোইউরেনিয়াম, যা আদলে লোহা আর ইউরেনিয়াম-এর একটি মিশ্রণ। ইউরেনিয়াম ও নিকেল যে ইস্পাতে থাকে সেই ইস্পাত হল সবচেয়ে কঠিন পদার্থ।

বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম ও যৌগ বহুল ব্যবহৃত।

মানুষ কিন্তু প্রথম ইউরেনিয়াম ব্যবহার করেছিল, মৌলটি সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধানের অনেক আগে। প্রাচীন রোমের নেসলস্ নগরে এক বিশেষ ধরনের কাঁচ ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কাঁচের রাসায়নিক পরীক্ষার পর জানা গেল ঐ কাঁচে ইউরেনিয়াম ব্যবহৃত হয়েছিল।

এ হেন মৌলটির ব্যবহার ক্রমশঃই যে বাড়বে এ আর নতুন কথা কি?

ক্যাম্পাস

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের মুখপত্র, ডিসেম্বর, ১৯৮০
সম্পাদক—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অপসংস্কৃতির বেনো জলে গা ভাসিয়ে যুবসমাজের একটা অংশ অপচয়-অবক্ষয়ে-অপব্যয়ে শেষ হয়ে যেতে বসেছিল এই দশকের গোড়ার দিকে। যুব তথা ছাত্রসমাজের বাকী বিরাট অংশটা সেই বেনো জলকে রুখবার দুর্জয় শপথে নতুন সংস্কৃতি রচনায় তৎপর হয়েছে। একথা বারে বারে শুনেছি বর্তমান সরকারের মুখে, শুনেছি বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনগুলির দৃপ্ত ঘোষণায়। এটা যে কথার কথা থাকেনি, একে বাস্তবে রূপ দেবার আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাত্র-যুব সমাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছে তার প্রমাণ আর একবার পেলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ প্রকাশিত 'ক্যাম্পাস' পত্রিকায়।

পত্রিকাটি পড়তে পড়তে বিস্মিত হয়েছি। বিস্ময়ের কারণ '৭২ সাল থেকে '৭৭ সাল অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সেখানকার যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল দেখেছি, আজকের এই পত্রিকার চেহারা, মেজাজ তার ঠিক বিপরীত। ভাবতে ভাল লাগছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে হারিয়ে যেতে দেয়নি। হাত ধরে টেনে তুলেছে বিবরের বিষবাষ্প থেকে।

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'শিক্ষা কোন পণ্য নয়, শিক্ষা একটি হাতিয়ার' এবং একজন সমাজতত্ত্বের ছাত্রের লেখা প্রবন্ধ 'কাদের জন্য গ্রামোন্নয়ন?' বিশ্লেষণধর্মী এবং তথ্যসমৃদ্ধ দু'টি মূল্যবান লেখা। লেখকদ্বয়ের নিষ্ঠা এখানে পরিস্ফুট। ফাঁকিবাজী নয়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট চর্চার পরিচয় পাওয়া যায় লেখা দু'টিতে। সাদামাটা ভাষা—যা এই ধরনের লেখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। মলয় ঘোষের কবিতা লেখার হাত বেশ পাকা। কবিতাটি পড়ে ভাল লাগল। 'স্মরণে' নামক বিশেষ রচনাগুলি বড় এলোমেলো। অনেক ক্ষেত্রে লেখকরা কি বলতে চেয়েছেন বোঝা যায় না। দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের গল্প কোন একটি সাহিত্য পত্রিকার (!) আঁতলেমি হয়ে গেছে। গল্পের আইডিয়া বোঝা গেল না। বরং লেখক বোধহয় ফর্মের দিকে একটু বেশী মনোযোগী। চিন্ময় গুহ সুন্দর আলোচনা করেছেন 'গ্যালিলিও' নাটকের। পত্রিকার অন্য বিভাগগুলি যথাযথ। বৈচিত্র্য অবশ্যই চোখে পড়ার মত।

সম্পাদকের নামে আর একটু ছোট টাইপ ব্যবহার করলে ভাল হয়। অঙ্গসজ্জা আরও গুছিয়ে করা যেতে পারে। প্রুফ দেখার ক্ষেত্রে ফাঁকিবাজী একেবারেই অসহ্য। এ ব্যাপারে সম্পাদকও নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে একমত হবেন।

গল্পগুচ্ছ

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৮৭
সম্পাদক—অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

এখন তো এ কথা আমরা সকলেই টের পাই যে, প্রাতিষ্ঠানিক শাসনের পাশাপাশি সাহিত্যের যে খোলা জানলা-কপাট, যা দিয়ে অঢেল স্বাধীন হাওয়া-বাতাস সাবলীল খেলা করে বেড়ায়, যাতে থাকে এক অমোঘ শক্তি যার অপর নাম জীবন, যা সাহিত্যের ন্যুব্জ মেরুদণ্ডকে, খয়া খর্বুটে প্রবাহকে টানটান এবং গতিশীল রাখতে সতত সচেষ্ট, যা পেটমোটা বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলির কাছে দুর্বিনীত চ্যালেঞ্জের মতো—সেইসব দৃপ্ত অশ্বারোহীদের সগৌরব, তেজী পদচারণা স্বভাবতই আমাদের আগ্রহ জাগিয়ে রাখে আদ্যোপান্ত।

বাংলা সাহিত্যের দু'টি ধারা এখন খুব স্পষ্টভাবেই চিহ্নিত হ'য়ে গেছে—'আমি'-সর্বস্ব মোহগ্রস্ততার, কলা-কৈবল্যের সাহিত্য এবং মানুষের তথা জীবনের সপক্ষে সাহিত্য। বস্তুত আফিম-সাহিত্যের পাশাপাশি মানুষের বাঁচার সংগ্রাম, সত্তা, সময় এবং বৃহত্তর সমাজ বিষয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি—এসব খুব স্বাভাবিক কারণেই এখন সাহিত্যের আঙিনায় জোরালো প্রবেশাধিকার নিয়ে নিয়েছে, নিচ্ছে। দরবারী সাহিত্যের দিন যে ফুরিয়েছে, এ-কথা এখন আর লেখার অপেক্ষা রাখে না।

কখনো কখনো এমনকিছু পত্র-পত্রিকা আমাদের কাছে আসে যাতে প্রগতি সাহিত্যের ধারাটির শক্তিশালিতা বিষয়ে যথেষ্ট আশান্বিত হওয়া যায়। সেইরকম দু'টি পত্রিকা গল্পগুচ্ছ এবং ক্রান্তিক, যা পাঠান্তে পাঠক সাহিত্যের নতুন প্রজন্ম বিষয়ে উৎসাহিত হতে পারে।

গল্পগুচ্ছ পত্রিকাটির বয়েস মাত্র চার বছর (না, 'মাত্র' শব্দটা ভুল প্রয়োগ হয়ে গেল, একটি অবাণিজ্যিক লিটল্ সংখ্যার চার বছর আয়ুকাল যথেষ্ট প্রাণশক্তির পরিচায়ক, সন্দেহ নেই—বিশেষত নানা প্রতিকূলতার সাথে লড়াই ক'রে সব ছোট পত্রিকাই যেখানে ক্ষীণজীবী)। এই চার বছরেই পত্রিকাটি একটি বিশেষ চরিত্র গড়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। শুধু ছোটগল্প-কেন্দ্রিক পত্রিকা বাংলা-সাহিত্যে প্রায় নেই বললেই হয়। সেই হিসেবে পত্রিকাটির একটা স্বতন্ত্র মূল্য থাকেই। এই পত্রিকার ১৩৮৭-এর প্রথম সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে শীতকালীন সংকলনরূপে। অমিয় চৌধুরী, অমল চক্রবর্তী, প্রভাতকুমার গোস্বামী, রামশংকর চৌধুরী, রাসবিহারী দত্ত, সমীরণ দাস, মোজাম্মেল সিদ্দিক—প্রমুখের সাতটি তরতাজা, ছিলাটান করা গল্প এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ,

যার প্রত্যেকটিতেই সময়ের অমোঘ চাহিদা, জীবনের জটিলতা এবং বলিষ্ঠ জীবনবোধের অনুপম শৈল্পিক উদাহরণ বিস্তৃত। এর মধ্যেও আলাদাভাবে সনাক্ত করা যায় রাসবিহারী দত্ত, অমল চক্রবর্তী এবং সমীরণ দাসকে। তবে, সমীরণ দাসের বিষয়বস্তুর প্রতি অখণ্ড আন্তরিকতা থাকা সত্বেও 'যে', 'যা', 'যার' ইত্যাদি সর্বনাম-যুক্ত বাক্যের বহুল, পাশাপাশি প্রয়োগ আমাদের পাঠাভ্যাসকে হোঁচট খাওয়ায়। ভাষা এখনো তাঁর মনস্কতা দাবি করে। 'পূর্ব-সূরীদের গল্প'-পর্যায়ে জগদীশ গুপ্তের 'চার পয়সায় এক আনা'-শীর্ষক গল্পটি পাঠ করা একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতা বিশেষ। এই অপ্রচারিত, স্বেচ্ছানির্বাসিত গল্পকার তাঁর অশেষ কব্জির জোর এবং লড়াকু মানসিকতা সত্বেও বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে প্রায় অপরিচিত থেকে গেছেন, এটা আমাদেরই লজ্জার ব্যাপার। একটা তুচ্ছ কুড়িয়ে পাওয়া এক আনা পয়সাকে কেন্দ্র করে তিনি যেভাবে দারিদ্র্যের সর্বগ্রাসী চেহারাটিকে আমাদের সামনে উন্মোচিত করে দেন, তাতে আমাদের বোধ এবং বিবেক যেন সহসা ঘুম ভেঙে জেগে বসে। গল্পটি ব্যাপক আলোচনা দাবি করে। এছাড়া প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের 'শারদসাহিত্য : ছোটগল্পের দুই শিবির'-শীর্ষক আলোচনাটি একটি সাহসিক চ্যালেঞ্জ বিশেষ। 'গল্পগুচ্ছ' আয়োজিত গল্প-সেমিনারের প্রতিবেদনটি অনিরুদ্ধ মৈত্র টেপ-রেকর্ডারের ক্যাসেট থেকে কাগজে তুলে এনেছেন, যাতে লেখকের নিজস্ব কৃতিত্বের কিছু থাকে না। এমন কি পরিকল্পনাটিও কিছু অভিনব নয়। সাম্প্রতিককালে 'কৌরব' পত্রিকায় এইরূপ একটি প্রতিবেদন, যা আরো কৌতুহলপ্রদীপক, পড়বার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়। প্রচ্ছদ এঁকেছেন অনির্বাণ দত্ত। প্রচ্ছদ স্বল্প কলাকৌশলেই মোহন, নয়নসুখকর। পত্রিকাটি আদ্যোপান্ত ছাপা অতীব ঝরঝরে, সুনসান, পাঠ-ক্লেশহীন—যা যে কোন ছোট পত্রিকার কাছে ঈর্ষণীয় ব্যাপার। তবে লেখাপত্রের শিরোনাম, লেখকের নাম, মেকাপ—ইত্যাদি বিষয়ে অন্যকিছু ভাবা যেতে পারে।

ক্রান্তিক

অষ্টম বর্ষ, শীত সংখ্যা, ১৩৮৭
সম্পাদক—রাসবিহারী দত্ত ও বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রান্তিক পত্রিকাটির বয়স দেখছি আরো বেশি—আট বছর—ভাবা যায় না! গত শীতে বেরিয়েছে তারও সাম্প্রতিক সংখ্যা। তবে, বয়সের তুলনায় পত্রিকাটি ঈষৎ নাবালক। এতে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, বিজ্ঞান, সমাজ, সবই আছে, এক মলাটের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে। যা নেই তা হল প্রকাশনা-সৌকর্য। পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গির সততাই সব নয়, সুস্বাস্থ্যের দাবিও একটা থাকেই। অবশ্য, এখানে পয়সা-কড়ি একটা বড় ব্যাপার। তবু লড়াই যখন হচ্ছে, তাতে খুঁত থাকলে চলবে কেন? পত্রিকাটির ছাপা, লে-আউট, মেকাপ—সবই ভীষণ বিবর্ণ।

তবে উৎসাহী পাঠক সেই আপাত-বাধা সরিয়ে পত্রিকার গভীরে ডুব দিলে অবশ্যই তুলে আনতে পারবে কিছু দুর্লভ মণিমুক্তো। বিশেষত নামব্রুদ্রিপাদের ভাষাবিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধ, শরৎ-সাহিত্য বিষয়ে রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সিথ্‌ভাঙা মতামত, যা শরৎ-প্রেমিক আমাদের মা-কাকিমা-মাসিমা-পিসিমা-জ্যাঠামশাই-বাবা-কাকা বা বাংলার মাস্টারমশাইদের কাছে লেখককে শত্রু করে তুলবেই। এছাড়া মণি মুখোপাধ্যায়, কেয়া চট্টোপাধ্যায়-এর গল্প; সাগর চক্রবর্তী, গৌতম দে, অমিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতা এই পত্রিকার বিশেষ উপহার। কেয়া চট্টোপাধ্যায়ের গল্পটি ভালোই, তবে অত ইংরেজি শব্দ ইংরেজি হরফে দেখতে কি ভালো লাগে বাংলা লেখায়? মণি মুখোপাধ্যায়ের 'রাক্ষস' গল্পটি আমাদের অস্তিত্বের সংকটের তীব্রতাকে আয়নার মতো তুলে দেখায়। মণির কলম দীর্ঘজীবী হোক।

পত্রিকাটিতে একটা পাঁচমিশেলি প্রবণতা আছে। ছোট পত্রিকাকে তার ক্ষীণ কলেবরের কারণেই কোন একটি বিশেষ মাধ্যমকে বেছে নিতে হয়—নইলে চরিত্র গঠন ঈষৎ দুরূহ হয়ে পড়ে। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন রাসবিহারী দত্ত এবং বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদকদ্বয়ের আরো নিষ্ঠুর হওয়া প্রয়োজন। বিশেষত, কবিতার চাষ বঙ্গদেশে কিছু বেশি হয়। তাই সম্পাদককে কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনে রাখতেই হয় জীবনানন্দের সেই ধ্রুব আপ্ত-বাক্য—সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। সম্পাদকেরা তা মনে রাখেন নি। এমনকি, স্বয়ং সম্পাদক রাসবিহারী দত্তের মাতৃভাষাও যে কবিতা নয়, তার প্রমাণও এই পত্রিকায় আছে। পত্রিকার প্রায় পাতায় ছাপার অশেষ ভুল। সম্পাদক, প্রেসকে বকে দেবেন। সূচিপত্রে প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই। তা বোধ হয় এ কারণে যে, প্রচ্ছদচিত্রটি আমাদের খাজনা আদায়ের কাছাড়ী' নামে সেই বিখ্যাত চীনা ছবির বইয়ের কোন ছবির প্রভাবের কথা মনে করায়।

উপল উপাধ্যায়

ব্লক যুব আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ শিবির

গত ডিসেম্বর মাসে দমদম বিমান বন্দর সংলগ্ন গঙ্গানগরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের নব নিযুক্ত ব্লক যুব আধিকারিকদের সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ ডিসেম্বর এই প্রশিক্ষণ শিবির উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং ২০ ডিসেম্বর সমাপ্তি দিবসে ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস যুব কল্যাণ বিভাগের দায়দায়িত্ব ব্যাখ্যা করে ব্লক যুব আধিকারিকদের কর্তব্য নির্ণয় করেন।

পশ্চিমবাংলায় বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় মাত্র ৪০টি ব্লকে যুবকরণ চালু ছিল। বর্তমানে ৩২৭টি ব্লকে যুবকরণ খোলা সম্ভব হয়েছে। সীমিত ক্ষমতা নিয়েও যুব জীবনের নিদারুণ সংকট ও যন্ত্রণার কথা স্মরণ রেখেই বর্তমান সরকার যুব কল্যাণ বিভাগের কাজকর্মকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সম্ভবত সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গ-ই প্রথম রাজ্যের সমস্ত ব্লকেই যুব সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা পূরণে কার্যালয় স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু ব্লক স্তরেই নয়, জেলা স্তরেও যুব কল্যাণ বিভাগের কার্যালয় চালু হয়েছে।

গঙ্গানগরে ৮৫ জন নবনিযুক্ত ব্লক যুব আধিকারিককে সরকারী নীতি আদর্শ এবং কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পশুপালন ও দুগ্ধ সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীঅমৃতেন্দু মুখার্জী, যুবকল্যাণ মন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস, হুগলী জিলা পরিষদের সভাধিপতি শিবপদ মুখার্জী এবং রাজ্যসরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, যুব কল্যাণ দপ্তরের কর্মীদের গ্রামবাংলায় যুবকদের জীবন্ত সংগঠন হিসাবে কাজ করতে হবে। ব্লক যুব আধিকারিকদের যুব সমাজের মানসিকতা বুঝতে হবে, তাদের চাহিদা কি তা অনুভব করতে হবে। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে যে সব কর্মসূচী হাজির করছি তা নিষ্ঠার সঙ্গে কার্যকরী করতে হবে, পাশাপাশি গ্রামীণ যুবকদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলে তাদের মনের কথাও আমাদের জানাতে হবে।

যুব সমাজ ও আন্দোলন প্রসঙ্গে দীর্ঘ বক্তব্য রেখে তিনি বলেন, আমরা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে চলেছি। যতক্ষণ আমাদের সরকার আছে ততক্ষণ আপনাদের কাজ হবে ৩৬ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের স্বার্থে কাজ করা। অন্য সরকার যদি কখনও আসে তাহলে তাদের কর্মসূচী রূপায়ণে আপনাদের ব্রতী হতে হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, যুব সমাজ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। আমাদের দেশেও এই বিশ্বাসহীনতার সংকট দেখা যাচ্ছে। কুড়ি বাইশ বছরের যুবক-যুবতীরা অনেকে এখন আর দেশের সামাজিক অর্থ-নৈতিক বিষয়ের খবর পড়তেও উৎসাহ বোধ করেন না। কেউ কেউ বলেন কি হবে ওসব পড়ে, বরং ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়ব। ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়া দোষের কিছু নয়, কিন্তু সংবাদটাও পড়ব না? কেন এমন হচ্ছে? যুব সমাজের মধ্যে এই সংকট সমাজ ব্যবস্থারই সংকট বলে বুঝতে হবে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যুব সমাজকে সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত কিভাবে করা যায়, তা না করতে পারলে দেশ গঠনের কাজ এগোবে না।

সমাজ গঠনে যুব সমাজের ভূমিকার প্রসঙ্গে বহু দার্শনিক তত্ত্ব আছে বলে তা উল্লেখ করে শ্রীভট্টাচার্য বলেন, সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার যুব সমাজের প্রকৃত চিত্র অনুসন্ধান করে গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে দিতে হবে। কোন মতবাদ প্রচার করতে হবে না, আপনারা শুধু সঠিক চিত্রটি তুলে ধরে দেখিয়ে দিন কোন্ ব্যবস্থায় যুব সমাজ কি অবস্থায় আছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজ গঠনে, সভ্যতার বিকাশে যুবকদের যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়। আর ধন-তান্ত্রিক দেশে যুবকরা বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। তাই সমাজ-তন্ত্র চাই না এ কথা কোন রাষ্ট্রনেতাও বলেন না। এমন কি মার্কিন প্রেসিডেন্টও বলেন না।

সম্প্রতি মস্কো সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজতন্ত্র এক নতুন মানবিকতার জন্ম দিয়েছে। সেখানে যুবকরা মূল্যবোধ, আদর্শনিষ্ঠা ও উচ্চ নৈতিক চেতনার পরিচয় দিচ্ছে। দেখে এলাম কোন পাহারাদার দরকার হয় না। সবাই নিজের উদ্যোগে টিকিট কাটে। দোকান থেকেও নিজেরা জিনিস কিনে দাম দেয়। কাউকে চাইতে হয় না। নৈতিক মূল্যবোধ কোন্ পর্যায়ে উঠলে এ জিনিস হয় তা কল্পনা করতে পারেন? আর মার্কিন মুলুকে? প্রতি তিন মিনিটে একটা খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, আত্ম-হত্যা, পকেটমারী হবেই হবে। এটা কোন দেশের সমস্যা নয়। সমস্যাটি ব্যবস্থার।

তথ্য মন্ত্রী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, আমাদের স্বাধীনতার স্বাদ দু-এক বছরেই মিটে গেছে। কোন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে নি, হতাশা দারিদ্র্য বেড়েছে। কারণ কৃষি অর্থনীতির পরিবর্তন হলেও কৃষকের স্বার্থে ভূমি সংস্কার করার মৌলিক কাজ আমাদের দেশে করা হয় নি। সেই মূল কাজটি করতেই হবে। বুঝতে হবে পর পর পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা হলেও বেকারী, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা সব বেড়েছে। ধ্বংস ও পচনের পথে যুব সমাজের মানসিকতা, তাই তারা 'ভোলে বাবা পার করে গা' বলে তারকেশ্বর ছুটছে, লটারীর টিকিট কেটে ব্যক্তিগত পরিত্রাণের পথ খুঁজছে। তাই ব্লক যুব আধিকারিকদের সরকারী কর্মসূচী রূপায়ণ করার সাথে সাথে

দেশের প্রচলিত ব্যবস্থার গলদটাও গ্রাম-বাংলার যুব সমাজের সামনে তুলে ধরতে হবে।

সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গ তুলে শ্রীভট্টাচার্য বলেন, সব কাজ হয়ত এই মুহূর্তে ইচ্ছা থাকলেও করতে পারবেন না। কিন্তু যেটুকু টাকা পাবেন, সুযোগ পাবেন তা যুবকদের কাছে পৌঁছে দেবেন। আপনাদের কাছে অনেক ক্লাব যুব প্রতিষ্ঠান অনেক দাবি নিয়ে আসবে। তাদের সকলের দাবি পূরণ করতে না পারলেও কাউকে হতাশ করবেন না, ফিরিয়ে দেবেন না, কেন আপনারা দাবি পূরণ করতে পারছেন না, সীমাবদ্ধতা কোথায় তা খুলে বলবেন। দেখবেন তারা দূরে সরে যায় নি, আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসছে।

দুগ্ধ ও পশুপালন মন্ত্রী শ্রীঅমৃতেন্দু মুখার্জী ১৬ ডিসেম্বর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে যখন অংশগ্রহণ করি তখন যৌবনের স্বপ্ন ছিল বিরাট। যুবমানসে ছিল স্বাধীন ভারতের উজ্জ্বল স্বপ্ন। কিন্তু স্বাধীনতার পর সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা হতাশ হই নি। আমরা মার্কসবাদী। আমরা জানি সমাজ বদল ভিন্ন যৌবনের স্বপ্ন সফল হতে পারে না। পুঁজিবাদী জমিদারী শোষণ থাকবে আর দেশ জাতি সমাজ এগিয়ে যাবে তা হতে পারে না। শ্রীমুখার্জী বলেন, যুবসমাজ বর্তমানে সমাজ ব্যবস্থায় নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার শিকার। কোন ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না। বেকারীত্ব, দারিদ্র্য, শিক্ষার সংকুচিত সুযোগ, সংস্কৃতি চর্চার অপ্রতুলতা প্রতি মুহূর্তে যুব জীবনকে বিদ্ধ করছে। অথচ যুবসমাজের মধ্যে আছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি, যৌবনের তেজ ও ত্যাগের মহান আদর্শ। সমাজের এই চঞ্চল অংশ নিয়ে ব্লক যুব আধিকারিকদের কাজ করতে হবে। আপনারা যখন গ্রাম বাংলায় যাবেন তখন এর করুণ চেহারা দেখে, এর হতশ্রী অবস্থা দেখে আপনাদের শহুরে মানসিক গঠন ধাক্কা খাবে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসলে চলবে না। মনে রাখবেন এরাই দেশের গরিষ্ঠ-সংখ্যক মানুষ।

শ্রীমুখার্জী বলেন, চাই ত্যাগ, মমতা, আদর্শ দেশপ্রেম ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী। ব্লক যুব আধিকারিকরা যৌবনের বদ্ধ জলাভূমিতে যে সামান্য জলসিঞ্চন করতে পারবেন তাই ওদের জীবনে অনেক।

শ্রীমুখার্জী আরও বলেন, মনে করবেন না চাকরী করতে এসেছি, মনে রাখবেন দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত, আপনারা কিছু বাড়তি সুযোগ পেয়েছেন মাত্র। চাকুরীর সমস্যা আছে, তার জন্য আপনারা সংঘবদ্ধ হবেন ঠিক তেমনি ওদের চোখের সামনে যে কালো পরদা রয়েছে তা অপসারিত করতে সাহায্য করবেন। কোন মতবাদ প্রচারের প্রয়োজন নেই শুধু বলুন ব্যবস্থার গলদটা কোথায়? তাহলেই দেখবেন একজন সুযোগ্য কর্মচারী শুধু নন, আপনি ওদের প্রিয়পাত্র হয়ে যাবেন।

হুগলী জিলা পরিষদের সভাধিপতি শিবপদ মুখার্জী বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ব্লকে যুব আধিকারিকদের পঞ্চায়েৎ প্রতিনিধিদের পরামর্শ নিয়ে চলতে হবে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা গ্রাম বাংলার মানুষ ও পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। গ্রাম বাংলায় যুবকদের অনেক কিছু দিতে পারে যুব কল্যাণ দপ্তর। হতাশা ও বিশ্বাসহীনতা রয়েছে যুবসমাজের সর্বস্তরে। পিছিয়ে পড়া মানুষ পেছনে থাকবেন আর দেশ এগিয়ে যাবে তা হয় না। আপনারা লক্ষ্য রাখবেন যে সামান্য সাহায্য করার সুযোগ রয়েছে তা যেন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের খপ্পরে না পড়ে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে দেখবেন শুধু চকচকে ধোপধুরস্ত বাবু ঘরের সন্তান যেন আপনার লক্ষ্য না হয়। উপজাতি ও তফসীলজাতির ঘরের ছেলে-মেয়েরাও উপযুক্ত সুযোগ পেলে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেন। পঞ্চায়েৎ এ ব্যাপারে ব্লক যুব আধিকারিকদের সাহায্য করতে পারে, তবে পঞ্চায়েৎ সম্পর্কে তাদেরও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। শ্রীমুখার্জী গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের আস্থা, বিশ্বাস অর্জনের জন্য নিরলস প্রয়াস চালাতে যুব আধিকারিকদের আহ্বান জানান।

সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি দিবসে যুব কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পরেও কোন যুব নীতি ঘোষণা করতে পারে নি। জাতীয় স্তরে কোন যুব নীতি না থাকায় কোন স্বতন্ত্র যুব দপ্তরও খোলা হয় নি। পশ্চিমবঙ্গে যুব সমাজের চাহিদা পূরণ করতে রাজ্যের প্রায় সমস্ত ব্লকে যুব কার্যালয় চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, যুব সমাজ সমাজের সবচেয়ে সৃজনশীল ভাবপ্রবণ এবং চিন্তাশীল অংশ। প্রকৃতপক্ষে সমাজের এক-তৃতীয়াংশই যুবসমাজ। আমাদের দেশে প্রায় ২২/২৩ কোটি যুবক-যুবতী আছেন। তাঁদের সামনে সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশের কোন পথ নেই। পরিকল্পনা রচনা করার সময়ও যুব-সমাজের বেকারী ও সাংস্কৃতিক জীবনের কথা সঠিকভাবে ভাবা হয় না।

যুবকল্যাণমন্ত্রী আরও বলেন, পুঁজিবাদী দুনিয়ায় যুবসমাজ ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে প্রতিদিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স সর্বত্র বেকারী বাড়ছে, বাড়ছে দারিদ্র্যও। আমাদের দেশ ভারতবর্ষেও পুঁজিবাদী আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অনিবার্য ফল হিসাবে দিন দিন বেকারী বাড়ছে। ফলে হতাশা, ক্রোধ, ক্ষোভ যুবমানসে দ্রুত বাড়ছে। যুবসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। নানা ক্ষেত্রে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ বিকশিত হচ্ছে। বিক্ষোভ ও অসন্তোষ বিপথে পরিচালিত করে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও প্রাদেশিকতার পথে ঠেলে দিচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। শ্রীবিশ্বাস আরও বলেন, যুবকল্যাণ আধিকারিকদের যুবসমাজের সঙ্গে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে সুকুমার গুণাবলী যাতে ধ্বংস না হয় তা দেখতে হবে। খেলার মাঠে যুবকদের পাগলের মত ছুটে যেতে দেখে অনেক প্রবীণ ব্যক্তি বলেন যুবকরা উচ্ছৃংখল হয়ে গেছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? স্পন্দনশীল যুবকরা যদি প্রকাশের মাধ্যম খুঁজে না পায় তাহলে তারা কি করবে? তাদের সৃজন প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ করার সুযোগ কোথায়?

ব্লক যুব আধিকারিকদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করে সমস্যার মৌলিক সমাধান করা যাবে না ঠিক। কিন্তু আপনারা যুব বিক্ষোভ ও অসন্তোষ একটু প্রশমিত করতে পারেন। সরকারী সুযোগ-গুলি যথাযথভাবে গরীব বঞ্চিত যুবকদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাদের জীবনকে অর্থময় করে তুলতে হবে; এই কাজের সাফল্য আপনাদের নিজস্ব উদ্যোগ ও প্রয়াসের ওপর নির্ভরশীল। মন্ত্রী-মহোদয় কয়েক বছরের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে বলেন, কাজ করার সময় অনেক সীমাবদ্ধতা থাকবে। টাকা পয়সার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অপ্রতুলতা রয়েছে। বেশী টাকা আমরা দিতে পারব না এটা বাস্তব সত্য, আর্থিক ক্ষমতা এই সরকারের খুবই সীমিত। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগ, নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টা থাকলে যুবসমাজের মধ্যে অনেক কাজ করতে পারবেন। সংকট-জর্জর যুবমানস বুঝতে পারবে যে তারাও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যুবসমাজের আস্থা ও ভালোবাসা আমাদের ব্লক যুবকরণের চলার দুর্গম পথকে কিছুটা বন্ধুরতামুক্ত করবে এ বিশ্বাস আমার রয়েছে।

[শেষাংশ ৩২ পৃষ্ঠায়]

পাঠকের ভাবনা

প্রার্থিত রুমাল

ডিসেম্বর, '৮০ সংখ্যায় কল্যাণী মহাপাত্রের 'বিনপুরের আদিম পট'-শীর্ষক রচনাটি আপনাদের পত্রিকার একটি বিশিষ্ট সংযোজন রূপে বিবেচিত হতে পারে নিঃসন্দেহে। লেখিকা যেভাবে লোক-শিল্পের সরল সাবলীলতার অন্তস্তলে আন্তরিক হাত ডুবিয়ে তুলে এনেছেন প্রার্থিত রুমাল, তা আমাদের কাছে একটি অমূল্য উপহার-স্বরূপ। এবং সে কারণে লেখিকা অবশ্যই ধন্যবদার্হ।

যে লোক-শিল্পসংস্কৃতি অশিক্ষিত সার্থকতায় আমাদের উন্নাসিক বাবুসংস্কৃতির কাছে একটি বিনয়ী চপেটাঘাতের মতো, তা আজ নানা সামাজিক অবক্ষয়তার কারণে হারিয়ে যেতে বসেছে। আমাদের তথাকথিত সংস্কৃতি-মনস্কতা ওই শিল্প-প্রয়াসকে কখনোই ততো সঠিক প্রযত্ন দেয় নি। আমরা কেউ-কেউ কোন গ্রাম্য মেলা থেকে কিছু সুভেনির কিনে এনে ড্রয়িং-রুম সুসজ্জিত করেছি, ব্যস্‌ ওই পর্যন্ত, তার বেশি কিছু নয়। এবং যেহেতু যে-কোন শিল্প-প্রয়াসই পেশার সাথে যুক্ত না হলে খুব স্বাভাবিক কারণেই এক সময় বিলীন হ'য়ে যায়, যেহেতু স্বতোস্ফূর্ত শিল্প-চর্চা এ যুগে নিছক সোনার পিতলমূর্তি ছাড়া আর কিছু নয়; সেহেতু আমাদের অনেক গ্রাম্য শিল্পীই আজ মুমূর্ষু অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। তাই বাউলেরা আজ হিন্দী সিনেমার সুরে গান গায়, সাঁওতাল যুবক তার নিজস্ব যুবতীকে শহরের রঙীন স্বপ্ন দেখায়, পটুয়ারা কারখানায় লোহা পিটতে ছোটে। এই রুগ্ন লোক-শিল্পকে শুশ্রূষার স্পর্শ দেবে কে?

আদিম পটচিত্র আমাদের অনুপ্রেরণার বিষয়। শিল্প চিরদিনই গ্রহণ-বর্জনের অনিবার্য ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্যবান হয়েছে। লেখিকা প্রসঙ্গত শুধু পিকাসোর ঐতিহ্য-মনস্কতার কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও পটচিত্রের সার্থক উত্তরাধিকার রূপে লেখিকার ঈষৎ অমনস্কতায় তাঁর লক্ষ্যগোচর হয় নি ভারতীয় চিত্রকলার প্রবাদ পুরুষ যামিনী রায়ের শিল্পকাজ। যে-কোন অসতর্ক ছবি-দর্শকও কিন্তু জানেন যে, যামিনী রায়ের রেখা-ভিত্তিক ছবির সাথে বাংলার লৌকিক পটচিত্রের একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। এমন কি, অনুগ্র অথচ উজ্জ্বল রং ব্যবহারেও যামিনী রায়ের ছবি পটচিত্রের একান্ত সহোদরা। এবং সমকালে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রকলার আদিম সারল্যের সাথে যাঁরা পরিচিত তাঁরাও শিল্পীর তুলিতে লোকশিল্প-প্রক্রিয়াকে সার্থক আত্মসাৎ এবং তাকে নতুন মাত্রা দান করা ইত্যাদি আবিষ্কার করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের ছবিতেও যে শিশুর মতো টলমলে পা ফেলার চিহ্ন লেগে থাকে, তাও যেন এই পটচিত্রেরই একান্নবর্তী। লেখিকা এ বিষয়ে আলো ফেললে আরো আনন্দিত হওয়া যেত।

শেষত, পাঠক হিসেবে সম্পাদককে অনুরোধ, এই লেখিকার ঝুলি থেকে আরো কিছু লেখাপত্র ছাপুন। আমরা প্রতীক্ষায় রইলাম।

গৌতম ঘোষ দস্তিদার
রিজেন্ট পার্ক, রহড়া,
২৪-পরগণা

আপনি মোড়ল

জানুয়ারী, '৮১ সংখ্যায় চাঁদ পাঠকের চিঠিটি পড়লাম। পত্র-লেখক ভাষা প্রশ্নে তার মতামত লিখতে গিয়ে সুন্দর বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজস্ব ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন! শুধু একটি দিক অনুক্ত থেকে গেছে। অথবা তিনি নিজেই সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন। অথচ বিষয়টি পাঠকদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমের প্রশ্নে সরকারের বিরোধী পক্ষের ওপরওয়ালারা কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক এবং অহং সুলভ কথা বলছেন। তাঁরা বলেছেন প্রাথমিক স্তরের সিলেবাস কমিটিতে যাঁরা আছেন তাঁরা নাকি কেউ কিস্সু জানেন না। যাঁরা নতুন সিলেবাসের পক্ষে বলছেন তাঁদের কেউই বুদ্ধিজীবী নন, কারণ তারা 'কে ক'পাতা লিখেছেন'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, মধ্য-শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি—এ'দের শিক্ষাগত যোগ্যতা অত্যন্ত সাধারণ মানের। চীনে প্রাথমিক স্তরে অনেকগুলো ভাষা পড়ান হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব প্রশ্ন তুলে ওঁরা সাধারণ মানুষকে বোকা বানাতে চাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা কি? সে কি স্বনির্বাচিত? এবং গুটিকয়েক মানুষই কি পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধি-বৃত্তির জগতের ইজারা নিয়ে বসে আছেন?

তা যদি না হয় এত অহংবোধ কিসের? শিক্ষক এবং শিক্ষানু-রাগী তথা বিরাট অংশের সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞা করার এই অধিকারই বা ওই গুটিকয়েক বুদ্ধিজীবীদের (স্বনির্বাচিত) মোড়লদের কে দিল?

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, মন্মথ রায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নেপাল মজুমদার, অরুণ মিত্র, হরেন ঘটক, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ক্ষুদিরাম দাস—এ'দের সবার স্ব স্ব ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য সম্পর্কে পশ্চিমবাংলার মানুষ অবহিত। এ'দের "কে ক'পাতা লিখেছেন" তা বুদ্ধিজীবী (স্বনির্বাচিত)-রা না জানতে পারেন সাধারণ মানুষ কিন্তু ভাল করেই জানেন।

সিলেবাস কমিটিতে প্রাথমিক স্কুলের মাস্টারমশাইরা ছিলেন,

শিশুদের শিক্ষা দিতে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা যাঁরা সঞ্চয় করেছেন। তাঁরা কেউ কিস্সু জানেন না? এত ঔদ্ধত্যের কথা ঐ আপনি মোড়লদের মুখেই বোধহয় সাজে। কারণ তাঁরা নিজেরা যাও বা জানতেন এতদিনে বোধহয় সব ভুলতে বসেছেন। তা নইলে চীনের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে চীন সম্পর্কে পড়াশুনো না হোক অন্ততঃ খোঁজখবরটুকু রাখতে পারতেন।

আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা! যাঁরা বলছেন তাঁদের সার্টিফিকেটগুলোর সঙ্গে এটাকে আপনাদের বহুল প্রচারিত মুখপত্রে ছাপিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তা হ'লে আমরা যারা একআধটুকু লেখাপড়া জানি বুঝতে পারব ফারাকটা।

মাননীয় বুদ্ধিজীবীগণ! স্বনির্বাচিত হতে গিয়ে দেখবেন যেন স্বনির্বাসনে না চলে যান। কারণ পশ্চিমবঙ্গের জাগ্রত জনগণ অন্যায় আবদারকে কোনদিন প্রশ্রয় দেয় নি একথা আপনাদের অনেকেই বোধহয় (ভুল করে) ইতিহাসে লিখে ফেলেছেন।

সুদীপ্ত শাহীন
কলকাতা-১৬

আমাদেরও সমর্থন আছে

বিশেষ ভাষা সংখ্যা 'যুবমানস' বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। যে ক'টি প্রবন্ধ ছেপেছেন প্রতিটি আমরা পড়েছি এবং উচ্চাঙ্গের মনে হয়েছে। যাই হোক পরবর্তী বিভিন্ন সংখ্যায় সর্বজনীন শিক্ষা প্রসারের স্বার্থে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের আবেদনে যাঁরা সাড়া দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের স্ব স্ব লেখা দেখতে চাই এবং পড়তে চাই। আশা করি পরবর্তী সংখ্যাগুলি সেইভাবেই সংকলিত হবে। পরিশেষে জানাই এই ব্যাপারে আমাদেরও সমর্থন আছে। আপনারা যদি লিটল ম্যাগাজিন যাঁরা করেন তাঁদের কাছে যেতেন তাহলে আরো ভালো হত।

জীবন সরকার
সহ-সভাপতি, উত্তরবঙ্গ লেখক-সমিতি

পাক্ষিক হোক

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের মাসিক পত্রিকা 'যুবমানস' প্রতিটি সংখ্যা আমাকে খুব খুশী করে তুলেছে. সম্পাদনার সুষ্ঠু আঙ্গিক দেখে, সেই জন্য পত্রিকাটি মাসিক-এর পরিবর্তে পাক্ষিক হোক এটাই আমার বিশেষ অনুরোধ!

সাম্প্রতিককালে এত সুন্দর মুদ্রণে পত্রিকা সম্পাদনা সত্যি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমার মনে হয়, অন্যান্য সমস্ত পত্র-পত্রিকার ভিড়ে 'যুবমানস' শাশ্বত বাণী হয়ে যুবক-যুবতীদের কাছে থাকবে।

যোগ্য এবং নিরপেক্ষ সম্পাদনায় ভবিষ্যতে ব্যাপক প্রচার হোক. স্বাস্থ্য উজ্জ্বল হোক।

ধীরাজকুমার দে
সম্পাদক : আগন্তুক পত্রিকা
৯/১, কে পি. নায়ার লেন, বরানগর, কলি-৩৬

অগ্রগতি আবেগ-নির্ভর নয়

আপনার পত্রিকায় ডিসেম্বর '৮০ সংখ্যায় প্রকাশিত "জাতীয় সংহতি সাধনে শিল্প-সংস্কৃতির ভূমিকা" এই প্রবন্ধে লেখক বহু সমালোচনামূলক মন্তব্য করেছেন। এই মন্তব্যগুলি বিভ্রান্তিকর এবং সমস্যা সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার পক্ষে ক্ষতিকারক। যাই হোক, লেখক এক জায়গায় বলেছেন, "...শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পথে যদি আমরা ভারতের জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষার চেষ্টায় ব্রতী হই, তাহলে তার ফল বাইরের জগতের নানাবিধ বহিরঙ্গ চেষ্টার ফল অপেক্ষা অনেক বেশী স্থায়ী, অনেক বেশী মজবুত হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং এখন থেকে সেই পথেই আমাদের এগোনোর প্রযত্ন করা সমীচীন।" কিন্তু বহু প্রাজ্ঞ সমাজবিজ্ঞানী বহু যুক্তি এবং বহু বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে রাজনীতি এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি হচ্ছে তৎকালীন সামাজিক অর্থনীতির একটি উপরি কাঠামো (Superstructure)। অর্থাৎ কোনও যুগে সামাজিক অর্থনীতি যে চরিত্রের হবে রাজনীতি এবং সংস্কৃতিও সেই যুগে সেই চরিত্রের হবে। এটা একটা সার্বজনীন সত্য। এই কথাটা কিন্তু লেখকও ভাষা প্রসঙ্গে ঐ প্রবন্ধেই অন্য এক জায়গায় বলেছেন। তিনি বলেছেন, "ভারতের বিভিন্ন ভাষাগুলির অগ্রগতির গতিতে তারতম্য আছে সন্দেহ নেই, কোনটি এগিয়ে আছে কোনটি পিছিয়ে আছে, কিন্তু সেটা এইজন্য নয় যে, কোন ভাষা সহজাতভাবেই দুর্বল আর কোন ভাষা সহজাতভাবেই বলশালী—উৎকর্ষ-অনুৎকর্ষের মূলে নিহিত আছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির বাস্তব অবস্থার মধ্যে। অর্থনীতি এই বাস্তব অবস্থার প্রধান গণনীয় দিক।" কেবলমাত্র ভাষার ক্ষেত্রেই অর্থনীতি "প্রধান গণনীয় দিক" নয়। এটা রাজনীতি এবং শিল্প-সাহিত্য তথা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। জাতীয় সংহতি সমস্যার কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে অঞ্চলভেদে অর্থনীতির অসম বিকাশ। অর্থনীতির অসম বিকাশকে যদি প্রতিরোধ করা যায় তবে শিল্প-সাহিত্যেরও অসম বিকাশকে প্রতিরোধ করা যাবে এবং জাতীয় সংহতি স্থাপন করা সম্ভব হবে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনেক সংস্কৃতিগত মিল আছে। তবুও আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে ওঠার প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক বিভিন্নতা।

কাজেই অর্থনীতিকে পাশ কাটিয়ে যতই আমরা "আঞ্চলিক আবেগকে মর্যাদা" দিই না কেন তাতে "আন্তঃ রাজ্য ও আন্তঃ প্রাদেশিক সংঘাতের আয়তন সংকুচিত হবে" না। কারণ, সামাজিক অগ্রগতি কখনও আবেগের উপর নির্ভরশীল নয়। সবশেষে বলি, ভারতবর্ষে বর্তমানে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেই ব্যবস্থা প্রাদেশিকতা, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির জন্ম দিতে বাধ্য।

সম্পাদকের কাছে অনুরোধ করছি চিঠিটা পত্রিকায় প্রকাশ করবার যোগ্য মনে করলে প্রকাশ করবেন। ইতি—

স্বপন মুখার্জী
কলিকাতা-১

[ব্লক যুব আধিকারীকদের প্রশিক্ষণ শিবির : ২৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে নবনিযুক্ত ব্লক যুব আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ শিবির সমাপ্ত হয়। সাতদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন ভারত স্কাউটস ও গাইড্স। তাদের আতিথেয়তা ও আপ্যায়ন সকল কর্মী ও আধিকারিকদের মুগ্ধ করেছে।

গঙ্গানগরের প্রশিক্ষণ শিবিরে শুধুমাত্র নবনিযুক্ত আধিকারিকদের যোগ দিতে বলা হয়েছিল। এ ছাড়াও তিনটি ভাগে শিলিগুড়ি, বর্ধমান ও কলকাতা পুরাতন ব্লক যুব আধিকারিকদের সঙ্গে বিভাগীয় মন্ত্রী, সচিব ও পদস্থ আধিকারিকদের পরস্পর মতামত বিনিময়ের আয়োজন করা হয়। ব্লক যুব আধিকারিকরা চাকুরীর সমস্যাবলী এবং কাজের অভিজ্ঞতা ও সমস্যা তুলে ধরেন। বিভাগীয় প্রধানরা সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করেন এবং যুক্তিনির্ভর বক্তব্য তুলে ধরেন।

সৌমিত্র লাহিড়ী

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি।

পত্রিকার নাম	—	যুবমানস
প্রকাশের সময় ব্যবধান	—	মাসিক
মুদ্রক	—	শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন) কলকাতা-৯
প্রকাশক	—	শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় যুগ্ম-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার ৩২/১, বিবাদী বাগ (দক্ষিণ) কলকাতা-১
সম্পাদক	—	শ্রীকান্তি বিশ্বাস ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী যুবকল্যাণ ও স্বরাষ্ট্র (ছাড়পত্র) বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সত্ত্বাধিকারী	—	পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আমি, শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায়, ঘোষণা করছি, উপরে দেওয়া তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ
শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায়

০১.০.৮১

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

গ্রাহক হতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৭ টাকা। ষাণ্মাসিক চাঁদা সডাক ৩·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যার দাম ৪০ পয়সা।

বিশেষ সংখ্যার জন্য কোন অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না। পত্রিকা প্রেরণের জন্য ডাক ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করবে।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

সহ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ০০১।

এজেন্সি নিতে হ'লে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০%
১৫০০-এর উর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০%
৫০০০-এর উর্ধ্বে	৪০%

১০টি সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

সহ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০ ০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবি করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিক-গুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য বিজনেস ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

Reg. No. 32875/78 Postal Reg. No. WB/CC-15

রাজ্য সরকার আয়োজিত বিশ্ব প্রতিবন্ধী বর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিং জনৈক প্রতিবন্ধী শিল্পীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন।

যুবমানস
মাতৃভাষাই

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ এসপ্লানেডইস্টে সর্বজনীন শিক্ষা এবং সর্বস্তরে আঞ্চলিক ভাষায় কাজকর্মের দাবীতে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীমন্মথ রায়। মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেন ঘটক ও শ্রীজীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

যুবমানস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
ফেব্রুয়ারী, '৮১

বিশেষ ভাষা সংখ্যা
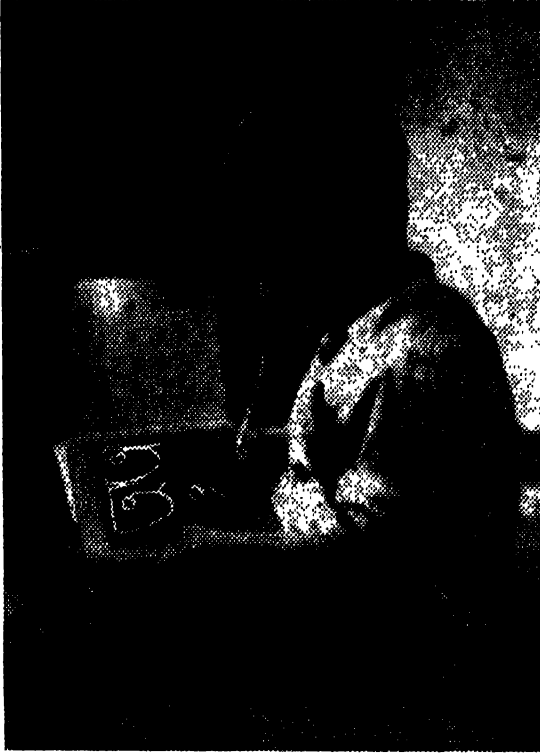
উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি এবং পত্রিকা সম্পাদক : কান্তি বিশ্বাস

প্রচ্ছদ : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎকুমা মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা-৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—চাল্লিশ পয়সা

সূচীপত্র

প্রতিবেদন

আবেদন

অভিনন্দনপত্র

প্রবন্ধ

সম্পাদকীয়

অনেক দিন ধরে এই রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী থেকে মাতৃ-ভষা ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে ইংরাজী ভাষাকেও শিক্ষা দেওয়ার প্রথা চালু আছে। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ইংরাজী ভাষাকে তৃতীয় শ্রেণীর পরিবর্তে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে গিয়ে কারণ হিসাবে কিছু যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে। যুক্তিগুলি হোল, শিশুকে তিন বছর পরে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া শুরু করলে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্য দুর্দান্ত গতিতে বেড়ে যাবে। বিজ্ঞানচর্চা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। দেশ-বিদেশের জ্ঞান আহরণ স্তব্ধ হয়ে যাবে। উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুযোগ সঙ্কুচিত হবে। পিওন-আর্দালী থেকে শুরু করে উচ্চ চাকুরীতে সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়েদের প্রবেশ বাধাপ্রাপ্ত হবে। সর্ব-ভারতীয় প্রতিযোগিতায় সর্ব বিষয়ে এই রাজ্যের যুবক-যুবতী পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হবে। এককথায় তৃতীয় শ্রেণীর পরিবর্তে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের মধ্যে ঐসব যুক্তির সৃষ্টিকারিরা রাজ্যের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মৃত্যু-ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। তার মধ্যে কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন এই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দেশের ও এ রাজ্যের শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে কেন আলোচনা করা হোল না। কেউ কেউ আবার বোধ করি অসতর্ক মুহূর্তে বলে ফেলেছেন সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে কোন আপত্তি নেই যদি ইংরাজী মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার যে সকল ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-মালিকানাধীন বিদ্যালয়গুলি রয়ে গেছে সেগুলিকেও আইন করে এই ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয়।

বিষয়টি যখন শিশুর শিক্ষার সাথে একান্তভাবে যুক্ত তখন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং এর প্রভাব সুদূর-প্রসারী। সে জন্য কোন মান-অপমানের ব্যাপার নয়, কোন ক্ষোভ বিক্ষোভের বিষয় নয়। দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদ্‌গণের অভিমত, এ বিষয়ে যে সমস্ত গবেষণাগুলি হয়েছে তার ফলাফল, যে সকল শিক্ষা কমিশনগুলি এ বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছে তার পর্যালোচনা—এসবগুলির ওপর যথাযথ গুরুত্ব দিয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত—সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সাথে আমরাও এই মত পোষণ করি। এ ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে তার পূর্বে এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যথোচিতভাবে বিবেচনা করা হয়েছে কি হয় নি, এর শিক্ষাগত ও মনস্তাত্বিক দিকটি কি, দেশের অন্য রাজ্যগুলিতে এবং বিদেশে এর অভিজ্ঞতা কি, বাস্তব জগতে ও কর্মক্ষেত্রে এর প্রভাব কি ধরনের হবে—এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যব্যাপী ব্যাপক আলোচনা চলছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে মাঠ-ময়দান, কল-কারখানা, অফিস-আদালতে পর্যন্ত এ আলোচনার ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে। শত শত ব্যক্তি এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ গভীর আগ্রহ নিয়ে এই আলোচনা শুনছেন—এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। এই সর্বব্যাপী আলোচনা-সমালোচনার ভেতর দিয়ে সচেতন জনমত তৈরি হবে, জাগ্রত লোক-মত সু-প্রতিষ্ঠিত হবে—এ দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে। প্রাথমিক স্তরে ভাষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনকে সামনে রেখে এত বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা ভারতের কোন রাজ্যের ক্ষেত্রে হয় নি যদিও এই একই ধরনের সিদ্ধান্ত একটি রাজ্য ছাড়া তাবত ভারতের সকল রাজ্যে এমন কি কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত এলাকায় ইতিপূর্বেই গৃহীত হয়েছে। আজকে ভাবতে গর্ব বোধ হয় এই দুর্লভ স্থান অনুমান করি রাজ্যের জনগণ দেশের মধ্যে সৃষ্টি করে নিতে পেরেছেন। বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাষা শিক্ষা সম্পর্কিত—সেইজন্যই কি বর্বরতম অত্যাচার ও বল্গাহীন নির্যাতনের সাহায্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিলেন তার জীবন্ত সাক্ষী এখনও যে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে আছে, সেখানে গিয়ে সম্প্রতি মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা ও ভাষার ওপর তাঁর মতামত ব্যক্ত করার সময় বলেছেন যাদেরই সুযোগ আছে তাদেরই চেষ্টা করা উচিত তাদের সন্তানদের ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া। আবার তার পর মুহূর্তে হাওয়াই জাহাজ থেকে দিল্লীতে নেমে মন্তব্য করেছেন মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিশুকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া তার কয়েকদিন পরে আরও খোলাখুলিভাবে নিজের দলের আইন-ব্যবসায়ী সংসদ সদস্যদের এক সভায় উক্তি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'অতীত'কে মুছে ফেলার কাজে নেমে পড়েছে।

আমরা শুধু চাই এই অজস্র উক্তি-কুটুক্তি, অসংখ্য প্রশ্ন, বহু কৌতুহলী জিজ্ঞাসা নিয়ে

আলোচনার পরিসর আরও প্রসারিত হোক, আলোচনা আরও ব্যাপক হোক। ইংরাজী তুলে দেওয়া হয় নি, ইংরাজী শিক্ষা শুরু মাত্র তিন বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে—তাতে কি সত্যিসত্যিই শিক্ষা-ক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্য বেড়ে যাবে? ইংরাজ রাজত্বে প্রথম শ্রেণী থেকে যখন ইংরাজী পড়ার রেওয়াজ ছিল তখন কি দেশে কোন শ্রেণী বৈষম্য ছিল না? যে নাগাল্যান্ডে নীচু শ্রেণী থেকে ইংরাজী পড়ানোর ব্যবস্থা আছে সেখানে কি শ্রেণীহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে? সমাজ যখন শ্রেণী বিভক্ত তখন শিক্ষার সুযোগ ও পরিবেশ বিভিন্ন শ্রেণীর কাছে ভিন্ন হতে বাধ্য। দেশের লাখপতি-কোটিপতির সন্তানেরা যে পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরাজী চালু থাকলে দুখিরাম মুণ্ডারী, পরান বাগ্দী, কালু শেখের মত দেশের সত্তর ভাগ গরীব মানুষের সন্তানদের কাছে শিক্ষার সেই একই সুযোগ এসে কি হাজির হবে? ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে সাধারণভাবে ইংরাজী শিক্ষা শুরু করলে বিজ্ঞান চর্চার পথ সি সত্যসত্যই রুদ্ধ হয়ে যাবে? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানাচার্য মেঘনাথ সাহা, সত্যেন বসু তাহলে কি অবিজ্ঞান সুলভ আবেদন দেশবাসীকে শুনিয়েছেন? যে দেশে ইংরাজী ঔৎসুক্যবশতঃ মুষ্টিমেয় মানুষ পড়ে সেই ফরাসী, চীন, রাশিয়া, জার্মান প্রভৃতি দেশ কি বিজ্ঞানের আসরে হরিজন হয়ে রয়েছে? ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশ বছর ধরে ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব অর্জন ক'রে কোন প্রতিভাবান ছাত্র যদি উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাত কিংবা মার্কিন মুল্লুকে যেতে চান—ইংরাজী ভাষায় তথাকথিত জ্ঞানের অভাব তার পথে কি বাধা হয়ে দাঁড়াবে? জীবনে যারা কোনদিন ফরাসী কিংবা জার্মানী ভাষা শেখেন নি উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য, গবেষণার জন্য মাত্র কয়েক মাসে উক্ত ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে ঐসকল দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ পদবীতে ভূষিত হতে আমাদের দেশের অগণিত ছাত্র-ছাত্রীকে তো আমরা দেখেছি। তাহলে এই অভিযোগ কেন আসছে—বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পথ বন্ধ হয় যাবে? দার্জিলিঙে নেপালী ভাষা এবং রাজ্যের অন্য সব জায়গায় বাংলা ভাষায় সরকারী যাবতীয় কাজকর্ম ব্যাপকভাবে চালু করার ব্যবস্থা যখন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে তখন তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী না পড়লে চাকুরী পাওয়া যাবে না—কোন্ উর্বর মস্তিষ্ক থেকে এ চিন্তা আসে? প্রাথমিক স্তরে যখন ইংরাজী এই রাজ্যের বাইরে প্রায় সর্বত্র তুলে দেয়া হয়েছে তখন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় বঙ্গসন্তানেরা ব্যর্থ হবে—এই আর্তনাদ করার যুক্তি কোথায়?

প্রয়াত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ এবং রাশিয়া, ইংল্যান্ড, কানাডা প্রভৃতি দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ্-দের নিয়ে যে কমিশন গঠন করেছিলেন ডি, এস্, কোঠারীর সভাপতিত্বে, তাঁরাও ভাষা শিক্ষার বিষয়ে এই সুপারিশ করেছিলেন। অনেক বিলম্বের পর রাজ্যের বর্তমান সরকার তাকে কার্যকরী করার সিদ্ধান্তে কারোর কারোর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে কেন তা ভেবে দেখা দরকার। রাজ্যের সকল শিক্ষক সংগঠন, শিক্ষাবিদ্, বিভিন্ন রাজ্যের অভিজ্ঞতা এমনকি বিদেশ ও জাতি সংঘের অধীন শিক্ষা ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদনের মতামতকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে হয়ত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। "সেন্ট্রাল ইন্স্টিটিউট্ অব ইণ্ডিয়ান ল্যাংগোয়েজ"-এর অধিকর্তা ডাঃ ডি, পি, পট্টনায়ক মহোদয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এক পত্রে এই বলিষ্ঠ ও অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তের জন্য আবেগজড়িত কণ্ঠে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিলাতের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডেভিড্ সেলবোর্ন তাঁর ক্ষুরধার যুক্তির সাহায্যে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে এর সমালোচকদের তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। রাজ্যের সাহিত্যিক, সাহিত্য সমালোচক, নাট্যকার, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছেন। যে কয়েকজন পরিচিত বুদ্ধিজীবী আজকে এই ভাষানীতির কঠোর সমালোচক—তাঁদের অনেকের নিকট রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রী বিনীতভাবে চিঠি লিখেছিলেন। আহ্বান করেছিলেন তাঁদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য। অত্যন্ত অমর্যাদাকর ভাষায় তাঁরা আলোচনার এই প্রস্তাবকে খারিজ করে দিয়ে রাজপথে নেমে আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করে রাজনৈতিক কারণে যারা এই সরকারের চব্বিশ ঘণ্টা ধরে মুণ্ডুপাত করেন তাদের প্রশংসাধন্য হয়েছেন, আশীর্বাদ লাভ করেছেন।

আমরা চাই আলোচনার অঙ্গন আরও প্রসারিত হোক। বস্তুত একটি সরকারের ভাষানীতি তার সামগ্রিক শিক্ষানীতির নিরিখে ঠিক হয়। আবার শিক্ষানীতি তার সার্বিক নীতি ও দৃষ্টি-ভঙ্গির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেইজন্য এই সরকারের ভাষানীতি, শিক্ষার ক্ষেত্রে তার মনোভাব, সরকার পরিচালনায় মূলনীতির আলোচনার দর্পণে সকলের আসল চেহারা পরিস্ফুট হবে সেই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এই আলোচনাকে অভিনন্দন জানাই।

প্রতিবেদন

"আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীরা যে শিক্ষানীতি চেয়েছিলেন তাকে কার্যকরী করতে যে সরকারই এগিয়ে আসবেন, প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য তাকে সমর্থন জানানো।"

—এসপ্লানেড ইস্টের সমাবেশে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী, 'প্রাথমিক স্তরে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র মাতৃভাষা শিক্ষার সমর্থনে এবং পশ্চিম বাঙলায় বাঙলা/নেপালী/সাঁওতালী ভাষায় কাজকর্মের দাবিতে' সর্বস্তরের লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্য সমালোচক নেপাল মজুমদার। সভার শুরুতে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পবিত্র সরকার। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন—মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ভবেশ মৈত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার, বর্ষীয়ান নাট্যকার মন্মথ রায়, নাট্যকার ও অভিনেতা উৎপল দত্ত, প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সত্যযুগ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীজীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট কবি কৃষ্ণ ধর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, প্রবীন নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশু সাহিত্যিক হরেন ঘটক, প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সমালোচক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শিল্পী ডঃ কল্যাণ গাঙ্গুলী, বিশিষ্ট গণসংগীত শিল্পী অজিত পাণ্ডে, ডঃ পবিত্র সরকার, কবি মণীন্দ্র রায়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ, বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী এবং উক্ত সমাবেশের সভাপতি নেপাল মজুমদার।

সভার মূল প্রস্তাবে বলা হয়েছে—আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীরা যে শিক্ষানীতি চেয়েছিলেন আজকে বামফ্রন্ট সরকার তাকে কার্যকরী করতে চলেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের এই দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে অসংখ্য সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েদের শিক্ষালাভের সুযোগ আরও প্রসারিত হবে। এই শিক্ষানীতির সমর্থনে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

ভবেশ মৈত্র

গণশিক্ষা প্রসারের জন্যে বামফ্রন্ট সরকার যেসব কাজ করছেন তাকে সমর্থন জানানোর জন্য আমরা এখানে জড় হয়েছি। যে সমস্ত গণতান্ত্রিক দাবি অন্য দেশে চালু হয়ে গেছে তা যখন এখানে সরকার চালু করতে চাইছে তখন মুষ্টিময় কিছু লোক এর জীবনপণ বিরোধিতা করছে বলেই আমাদের এখানে সমবেত হতে হয়েছে। যখন বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে ওঁরা নেমে পড়েছেন তখন আমাদের সমবেতভাবে প্রতিকার করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

প্রধান বাধা অশিক্ষা—তাকে দূর করতে হবে। ১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৬৪-৬৬ সালের কমিশন ও কমিটিগুলি বারবার শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের জন্য বলেছেন। ভারত সরকার, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ সবাই মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা বলেছেন। জ্ঞানের দরজায় সকলের অধিকার অথচ শতকরা সত্তর জন এর মধ্যে ঢুকতে পারে নি। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার শুধু শুরুটা করেছেন। ৩৪০০ বিদ্যালয়হীন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪০০০ নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ, ১৩,৮০০ নতুন প্রাথমিক শিক্ষক, ৩১ লক্ষ শিশুর জন্য বিদ্যালয়ে খাদ্য, সমস্ত শিশুর জন্য সব ভাষায় বিনামূল্যে বই, খাতা, শ্লেট, মেয়েদের জন্য পোষাক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার প্রসার—এ-সব হয়েছে। শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন পাবার ব্যবস্থাও হয়েছে। মোট কথা পঠন-পাঠনের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরী হয়েছে। বহু আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষাসংক্রান্ত আইনগুলি পাশ হচ্ছে, অথচ ওরা বিরোধিতা করছে। স্বাধীনতার পরে কেন এই আইনগুলি পাশ হয় নি এ-কথা আপনারা ওদের জিজ্ঞেস করুন।

ধাপে ধাপে সকল শিক্ষক সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করে সরকার এগুচ্ছেন। শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে সিলেবাস কমিটি তৈরী হয়েছে। সাঁওতালী লিপি তৈরী এবং নেপালীদের ভাষাকেও উন্নত করবার জন্য এই সরকার যা যা করেছেন পূর্বে কোন সরকার তা করেন নি। সুতরাং এ-সব কিছু বুঝে সংঘবদ্ধভাবে ওঁদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আজকে প্রয়োজন আছে—যাতে করে ওঁরা মানুষকে বিভ্রান্তির পথে না নিয়ে যেতে পারে।

ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার

এ রকম একটা সভা আজ করতে হচ্ছে এটা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। পাশ্চাত্য দেশগুলির কোন লোককে যদি জিজ্ঞেস করেন তাঁরা কোন্ ভাষায় লেখাপড়া শেখেন, তাহলে তাঁরা অবাক হবেন। কেননা সব দেশেই মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

ইংরাজী তো মাত্র এক'শ বছর ধরে চলছে। ফার্সি, সংস্কৃত এ-সব ভাষা তো হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে রাজকার্য

চালানোর মাধ্যমে। সাধারণ মানুষ এই রাজভাষার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে পারে নি। কোঠারী কমিশন ও আমাদের দেশের বড় মানুষেরা যা যা বলে গেছেন সে-সব প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখছি কিছু বুদ্ধিজীবী এর বিরোধিতা করছে। গেলিলিও ও মাইকেলের জীবন নিয়ে দুটি নাটক সম্প্রতি চলছে। দেখবেন গেলিলিও সাধারণের ভাষা ইতালীয় ভাষায় না লিখে যদি ল্যাতিনে লিখতেন তাহলে হয়তো তাঁকে এত বাধা পেতে হতো না। মাইকেল তো ইংরেজী ছেড়ে বাংলায় এসেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র বারবার ইংরাজীর বাধার কথা উল্লেখ করেছেন।

আজ কিছু বুদ্ধিজীবী ইতিহাসের গতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। অনুরোধ করব আমাদের মনীষীদের কথা পড়ুন বুঝুন—ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে যাবেন না।

মন্মথ রায়

৮২ বছর বয়সে এখানে আসতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। এত লোক দেখে আনন্দ হচ্ছে। স্বাধীনতার ৩৩ বছরে যা সম্ভব হয় নি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষায় শুধু মাতৃভাষা চালু করেছেন সেজন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু আমার মত বয়সের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা আইন অমান্য পর্যন্ত করবেন বলে ভয় দেখাচ্ছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা।

অনেকে অনেক কথা বলছেন, সেদিকে না গিয়ে আজকের আনন্দবাজারের সংবাদ প্রসঙ্গে দু'একটা কথা বলতে চাই। গতকাল শিক্ষা সংকোচন বিরোধী ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটি সাংবাদিক সম্মেলনে নীহার রায় বলেছেন যে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী তুলে দেওয়ার কোন যুক্তি নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যুক্তি আছে। "আমি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলাম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রকৃতি বিজ্ঞান আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলা ভাষা মাতৃভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধুভাষার কৌলিন্য ঘোষণা করতে।...আমার বার বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজী বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল।...নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না।..অন্তত আমাব এগার বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংলা ভাষার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।" রবীন্দ্রনাথ একথা লেখার পরেও বর্তমান রাজ্য সরকারের শিক্ষা নীতির সমর্থনে আর কিছু কি বলার থাকে? এ'রা কিসের বিরুদ্ধে আইন অমান্য করছেন? শুধু কি ছায়ার বিরুদ্ধে!

উৎপল দত্ত

খুব সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে পন্ডিতরা এখানে জড় হয়েছেন। এই নিয়ে যে কোন বিতর্ক হতে পারে ভাবা যায় না। তবু হচ্ছে। এটা পরম দুঃখের। আমরা প্রথম থেকে মাতৃভাষা ভাল করে শিখি নি বলে ইংরেজীতে একটা আস্ত বাক্য রচনা করতে পারি না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তনে এসে বলেছিলেন—এখানে শুধু কেরাণী বানানো হচ্ছে, শিক্ষা হচ্ছে না। যাঁরা আজকে সমালোচনার ঝড় তুলেছেন তাঁরা কিন্তু যখন রবীন্দ্রনাথের মুন্ডচ্ছেদ করা হচ্ছিল তখন টুঁ শব্দটি করেন নি।

বর্তমান সরকার বার ক্লাস পর্যন্ত বিনা পয়সায় পড়ানোর ব্যবস্থা করলো। সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েরা যাতে বেশী করে লেখাপড়া শিখতে পারে তার জন্য শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের কথা বললো। তখন কিন্তু ঐসব সমালোচকের দল সরকারকে অভিনন্দন জানানোর কথা ভাবলেন না।

জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের আজকে ঠিক করতে হবে যাঁরা পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তাঁরা ঠিক না যাঁরা সমালোচনা করছেন তাঁরা ঠিক? কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী বলছেন ওঁরা কারাগারে যাবেন। কিন্তু ওঁরা তো দেশের সমস্ত মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কারাগারেই আছেন। আবার কোন্ কারাগারে তাঁরা যাবেন?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাঁওতালী ভাষাকে মর্যাদা দিয়েছেন। সাঁওতালী লিপি তৈরির ব্যবস্থা হয়েছে। ওঁদের কোন আশীর্বাদ কি সরকার পেয়েছে? রবীন্দ্রনাথ থাকলে কিন্তু এই সরকারকে আশীর্বাদ করতেন।

গাছের ভাষা জানতে হলে পড়তে হবে। কিন্তু ইংরেজীর মাধ্যমে শিখতে গিয়ে যদি প্রাণ যায় তবে গাছের প্রাণ আছে কি নেই কবে জানব!

ভিয়েৎনামের মানুষ যদি মাতৃভাষায় সব শিখে মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদকে পরাস্ত করতে পারে তবে আমরা কেন শুধু মাতৃভাষাকে অবলম্বন করতে পারব না।

কৃষ্ণ ধর

ক'বছর আগে বাংলা ভাষার জন্য আমাদের পাশের দেশ কত রক্তই না দিয়েছে। অথচ আমাদের দেশে বর্তমান রাজ্য সরকার যখন শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে তখন কিছু মানুষ বিরোধিতা করছে, এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী আবদুস সালাম সেদিন বলে গেলেন—মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারলে তবেই দ্রুত বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করা সম্ভব। সত্যেন বসুও বার বার একই কথা বলেছেন। আমাদের তো এ'দের কথার মূল্য দিতে হবে।

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস

সরকারের ভাষানীতির বিরোধিতা করে যাঁরা হৈচৈ আরম্ভ করেছেন ওঁরা যুক্তিহীন। নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলেই ওঁরা হৈচৈ করেন। ওঁদের গন্ডীর বাইরে যে অগনিত জনসাধারণ আছেন তাঁদের কথা ভাববার কোন প্রয়োজন ওঁরা বোধ করে না। ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শেখানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই বা এটা হবে না কেন। ওঁরা চান রাইটার্স বিল্ডিং-এর ফাইল রাস্তায় নিয়ে আসতে। কিন্তু এ তো সম্ভব নয়। ওঁরা বলেছেন সিলেবাস যাঁরা তৈরী করছেন তাঁদের নাকি অভ্যাস, অধিকার, অভিজ্ঞতা এসব কিছু নেই। আমরা তো জানি শিশুদের শিক্ষার সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের নিয়েই সিলেবাস কমিটি। তাঁরাই তো শিশুদের মানসিকতা ভাল করে বুঝবেন। সুতরাং সরকার তো ঠিকই করেছেন। তাহলে এত চেঁচামেচি কেন? আমি নিজে মফঃস্বলের অনেক মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা তো সরকারী প্রচেষ্টাকে খুবই আন্তরিক-ভাবে স্বাগত জানিয়েছেন।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইউরোপ বা আমেরিকায় মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা শেখানোর আবশ্যিক নিয়ম নেই। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ থেকে

সত্যেন বসু—সবাই তো মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানোর কথা বলেছেন।

নিজের জীবনের দিকে তাকিয়ে একটা কথা মনে হয় যে ইংরেজী ভাষা প্রথম থেকে পড়লে অসুবিধে হয়। আমার তো যতদূর মনে পড়ে আমরা প্রথমে ইংরেজী পড়ি নি—পণ্ডিতমশাইরা বাংলা ভাষাই পড়াতেন। বাংলার ভিত্তি, পাটীগণিতের ভিত্তি, সেখান থেকেই শক্ত হয়ে যায়। পরে ক্লাস সেভেন-এইটে এসে ইংরেজী আর কঠিন মনে হয় নি। বছর খানেকের মধ্যেই ইংরেজী আয়ত্বে এসেছিল।

ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে পড়ানোর সময় সাহিত্যিক সোমেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলতেন বাংলা ভাল করে না জেনে ইংরাজী শেখা যায় না। বড় হয়ে সে-কথার প্রকৃত অর্থ বুঝেছি। রুদ্রপ্রসাদের দাদা Mathew Arnold -এর পত্রসাহিত্যের উপর ডক্টরেট হয়েছিলেন। তার সংগে আলোচনা প্রসংগে শুনেছি তিনি বলেন, "চাকুরীর জন্য ইংরেজী শিখেছি"—ওদেশে থেকেও বাংলা শিখেছি। বাংলায় বড় বড় উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বাংলার মাধ্যমে সাহিত্যের রস যা পাই অন্য ভাষায় তা সম্ভব নয়। ইংরাজীর অধ্যাপকরা বাংলার বিভাগকে অবজ্ঞা করে। নিজের ছেলে যখন একথা বলে তখন বলেছি ওরা বাংলাও শেখে নি ইংরাজীও শেখে নি। তুমি বাংলা তো ভালো করে শিখছো। মেকলে সাহেব আমাদের যা তৈরী করতে চেয়েছেন ওরা তাই হয়েছে। মাতৃস্তন সম বাংলাভাষার ওরা বিরোধিতা করছে। Establishment -এর পিছনের লোকেরা নিজেদের স্থানচ্যুতির ভয়ে এসব করছেন। নভেম্বর বিপ্লবের পর লেনিনকে জিজ্ঞাসা করলে লেনিন বলেছিলেন যে, অতীতের সব গৌরবান্বিত জিনিস নিয়ে নয়া সংস্কৃতি তৈরী করতে হবে। বামফ্রন্টের অত দূরে যাবার সাধ্য নেই। সব কাঠামো যখন ভেংগে পড়ছে তখন বামফ্রন্ট যদি সামান্য কিছু করে যেতে পারে আমাদের তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সামান্য একটু কাজ করার জন্য আজ Lenin, Marx কে নিয়ে কটূক্তি পর্যন্ত করা হচ্ছে। অথচ ওরা জানে না সেই মহামানবরা কি বলে গেছেন। সুবিধাভোগীরা নিজেদের পায়ের তলার মাটি চলে যেতে দেখে জেগে উঠেছেন। ইংরেজের শাসন এর চাইতে ভাল ছিল—তাদের কিছু বংশধর একথা তো বলে যাবেনই। নিয়ন লাইটের নীচে বন্ধ ঘরে যাঁরা থাকবেন তাঁরা একাজ করবেনই। যে সব বুদ্ধিজীবীরা বিরোধিতা করছেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা সমাজকে সাহিত্য প্রভৃতি দিয়েছেন তাদের সে দান স্বীকার করে নিয়েও বলতে হবে এর সংগে রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে।

ডঃ কল্যাণকুমার গাংগুলী

শিল্পকলার সংগে আমার জীবন অংগাংগীভাবে জড়িত। শিক্ষানীতি সম্পর্কে যখন মতানৈক্য বেধেছে তখন সরকারের শিক্ষা-নীতির যাঁরা বিরোধী তাঁদের অনেকে আমার শিক্ষকস্থানীয় হলেও আমাকে তাঁদের বিরুদ্ধেই মত দিতে হচ্ছে। কারণ, আমি প্রাথমিক স্তরে শুধুমাত্র মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে। ইংরেজী শিশুদের কাছে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়; তাই শতকরা ষাটভাগ ছাত্র প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষার সংগে সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়, বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। শুধুমাত্র মাতৃভাষা শিক্ষা দিলে ছাত্রদের এভাবে চলে যেতে হবে না, ওরা পড়তে পারবে। তাই প্রাথমিক স্তরে শুধুমাত্র মাতৃ-ভাষাই পাঠ্য থাক, এটাই আমি আন্তরিকভাবে কামনা করি।

হরেন ঘটক

দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনের ফলে ইংগবংগ কালচার তৈরী হয়েছে। যাঁরা আজকে প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী রাখার পক্ষে ওকালতি করছেন তাঁরাই ওইসব কালচারের ধারকবাহক। তাই বামফ্রন্ট সরকার যখন গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে গণমুখী করতে চায় তখন তো এ'রা এরকম ভূমিকা নেবেই! যাঁরা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন সেই শ্রমিক-কৃষকের ছেলেমেয়েরা যদি একটুখানি লেখা-পড়া করার সুযোগ পায় তবে তো ওঁদের গাত্রদাহ হবেই!

দেড় বছরের শিশুকে মা ছড়া শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। দু'বছর পর সেই শিশু একটা পুতুলকে কাঁথা জড়িয়ে সেই ছড়াই বলছে। ওরা অনুকরণ প্রিয়। যা প্রতিনিয়ত শুনবে তাই সে শিখবে। ইংরাজী ভাষায় তো আমরা প্রতিনিয়ত কথাবার্তা বলি না। শিশু-কালে মস্তিষ্কে যে স্মৃতিভাণ্ডার গড়ে ওঠে তা অনবরত পরিবর্তিত হতে হতে বার-তের বছর বয়সে গিয়ে স্থিতিলাভ করে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরাজী পড়লেও ইংরাজী ভাল করে শেখা যায়।

যাঁরা সমালোচনা করছেন তাঁরা অনেকে অহেতুক মার্কসবাদ এবং রাশিয়াকে নিয়ে টানাটানি শুরু করেছেন। এতে করে এ'দের আসল উদ্দেশ্য ভালরকম বোঝা যায়।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শিক্ষা এবং ভাষানীতি নিয়ে এই সমাবেশে এত মানুষ ধৈর্যের সংগে আমাদের কথা শুনছেন দেখে ভীষণ ভাল লাগছে। আজকে যাঁরা রাজ্য সরকারের ভাষানীতির বিপক্ষে বলছেন তাঁদের প্রায় সবাই আমার বন্ধুস্থানীয়। তবুও জীবনের শেষ দিনগুলিতে এসে তাঁদের সংগে একমত হতে পারছি না।

ইংরাজী না শিখলে ছেলেমেয়েরা গরু হয়ে যাবে—এরকম কথাও একজন বলেছেন। মানুষ সম্পর্কে এত অশ্রদ্ধা। অথচ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত বিদগ্ধজনেরা তো বলেছিলেন—মাতৃভাষায় যাঁরা পড়বে জ্ঞানবিজ্ঞানের সব খবর কি সে মাতৃভাষায় পাবে না? আমরা বলি অবশ্যই পাবে। আর পাবে বলেই বামফ্রন্ট সরকার সেই প্রচেষ্টা শুরু করেছেন। শুরুটা যখন হচ্ছে তখন একদল বিরোধিতায় নামলেন। ওঁরা যে ঠিক কথা বলছেন না মানুষকে তা জানাতেই আজ আমাদের মত বুড়োদেরও রাস্তায় নামতে হল। রাস্তায় আমরা নেমেছি, অসংখ্য সাধারণ মানুষ আপনারা ওদের বিরুদ্ধে প্রচার করুন, আমরা পাশে থাকব এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

গ্রামে দেখেছি এখনও সামান্য একখানা চিঠি পড়ে দেবার জন্য নিরক্ষর মানুষকে কোথায় কে পড়তে জানে তাদের সাহায্য নিতে হয়। এ জিনিস আর কদ্দিন চলবে? যাঁরা অশিক্ষিত তাঁরা কি চিরদিনই তাই থাকবে?

আমি ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে কিছুদিন ছিলাম। আমার সামনে একজন বিশিষ্ট শিল্পীকে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন, "বাঙলাও ভুলে গেলি, ইংরাজীও জানিস না, এরপর কথা বলবি কি করে? দেখ্ নল দিয়েও খাওয়া যায়, তবে খাওয়ার আনন্দ পাওয়া যায় না।"

পবিত্র সরকার

কিছু পণ্ডিতব্যক্তি প্রাথমিক স্তরে দু'টি ভাষা পড়ানোর পক্ষে বলছেন। কিন্তু আমাদের দেশের অসংখ্য অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষার দ্বার খুলে দিতে প্রাথমিক স্তরে শুধুমাত্র মাতৃভাষাই শিক্ষা দেওয়া উচিত। দেশ বিদেশের বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিকগণ সেকথাই বলেছেন।

'স্টেটসম্যান' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে একটি শিশুকে অন্য ভাষাভাষি শিশুদের মধ্যে ছেড়ে দিলে সে সহজে অন্য ভাষা আয়ত্ব করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল কোন্ ভাষা?

তার আশেপাশে যে পরিবেশ যে ভাষা রয়েছে সে ভাষাই তো সে শিখবে। এখানে কি ওই যুক্তি প্রযোজ্য?

আজকে যে সমস্ত কবি সাহিত্যিক শুধু মাতৃভাষা শিক্ষার বিরোধিতা করছেন একসময় তাঁরাই কিন্তু শুধু মাতৃভাষার পক্ষে লিখেছেন!

মণীন্দ্র রায়

বহু আলোচিত বিষয়টি নিয়ে আমাদের আবার বলতে হচ্ছে কারণ অবস্থা যেখানে গেছে আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। ভাবতে অবাক লাগে একদিন যাঁরা মাতৃভাষায় সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা করে আজকে নাম করেছেন তাঁদের কেউ কেউ সরকারের ভাষা নীতির বিরোধিতা করছেন।

আমরা সবাই এখনও শুদ্ধ বাঙলা বলতে পারি না! ইংরাজী এসে যায়। সাম্রাজ্যবাদ তো বিদায় হয়েছে তবু এখনও গোলামীর মানসিকতা নিয়ে থাকতে হবে? সরকার যখন শিক্ষার সুযোগ সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চাইছেন তখন তাকে বাধা দেবার অর্থ কায়েমী স্বার্থের হাতকে শক্ত করা।

ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ

বামফ্রন্ট সরকারের ভাষানীতি নিয়ে বিরোধিতার নামে যা হচ্ছে তা শুধু অ্যাকাডেমিক ব্যাপার নয়, আরো কিছু। সার্বজনীন শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করার প্রয়াসে যাঁরা বাধা দিচ্ছেন তাঁরা সব সময়েই মুষ্টিমেয়র হয়ে কথা বলেছেন, আজও বলছেন। কিন্তু তাঁদের বাইরে যে অসংখ্য সাধারণ মানুষ আছেন আমাদের তাঁদের কাছে যেতে হবে, বামফ্রন্ট সরকারের ভাষানীতি সম্পর্কে তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে এবং সমালোচকদের আসল স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দিতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার বিভিন্ন জায়গায় মাতৃভাষা শিক্ষার কথা বলেছেন এবং আজকে বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে ভাষানীতি প্রয়োগ করার কথা ভাবছেন, রবীন্দ্রনাথও ঠিক সেইভাবেই ভেবেছিলেন। সে প্রমাণ রবীন্দ্র রচনার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা অবশ্যই পাবেন।

পরাধীন ভারতে আমরা ইংরাজী শিখতে বাধ্য হয়েছিলাম। আজকেও কি সে প্রয়োজনীয়তা আছে? যদিও আমাদের মনীষীরা মাতৃভাষার ওপর জোর দিয়েছিলেন, কিন্তু হয় নি। আজকে হ'তে বাধা কোথায়?

আজকে যাঁরা বিরোধিতা করছেন তাঁরা বলছেন আমরা মুষ্টি-মেয়র শিক্ষার কথা বলছি না, আমরা প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী রাখতে বলছি। কিন্তু ওঁরাও এটা ভাল করে জানেন যে ইংরাজীর বাড়তি বোঝা বইতে অক্ষম অধিকাংশ শিশু বিদ্যালয় ছেড়ে দেবে। শেষ পর্যন্ত শিক্ষা পাবে মুষ্টিমেয় ছাত্র-ছাত্রী। আর তাতেই ওঁদের লাভ!

নারায়ণ চৌধুরী

আমাদের দেশে যখন মোঘলরা রাজত্ব করত তখন আমাদের পূর্ব-পুরুষদের ফারসী শিখতে হয়েছিল। আর ইংরেজরা যখন শাসন করতে এল তখন ইংরাজী ভাষাকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল। দেশ স্বাধীন হওয়ার তো তেত্রিশ বছর হয়ে গেল এখনও কি সেই রকমই চলবে? ইংরাজীকে ধরে রাখার জন্য আজ নির্লজ্জের মত ওকালতি করা হচ্ছে! আসলে দীর্ঘদিনের দাসত্বের অভ্যাস এ'রা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। সাধারণ মানুষের সাথে এ'দের কোন যোগ নেই। শুধু নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই গ্রামের অসংখ্য দরিদ্র মানুষের কথা ভাববার এ'রা প্রয়োজন বোধ করেন না। তাই বলে ওঁদের খুসি করার জন্য শিক্ষানীতিকে বৈজ্ঞানিক না করে সরকার চুপ করে বসে থাকবে এটা হতে পারে না।

বামফ্রন্ট সরকার আজকে যে শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে তা দীর্ঘ-দিনের অভিজ্ঞতার ফল। শিক্ষার সঙ্গে জড়িত যাঁরা তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেই এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার তাঁর এক আত্মীয়ের ইংরাজীতে লেখা চিঠি ফেরত পাঠিয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ইংরাজীর মাধ্যমে ভাষণ দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বিরোধীরা কোঠারী কমিশনের বক্তব্যকে বিকৃত পর্যন্ত করছেন। কোঠারী কমিশন নাকি পাশাপাশি ইংরাজী চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে। এটা ডাহা মিথ্যা কথা। সেখানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে—পঞ্চম শ্রেণী অবধি মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শেখালে তা শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

বামফ্রন্ট সরকার যে সঠিক ভাষা ও শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছেন কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর শত বিরোধিতা সত্ত্বেও তার প্রয়োগ হবে কারণ অগণিত সাধারণ মানুষ গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র এই নীতির পক্ষে এগিয়ে এসেছেন।

নেপাল মজুমদার

বামফ্রন্ট সরকার যে সঠিক ভাষা ও শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছেন তাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে যে বিরোধিতা হচ্ছে তা যে সঠিক নয়—বিকৃত, সাধারণ মানুষকে সে-কথা বোঝানোর সূচনা আমরা এই সমাবেশের মাধ্যমে করলাম। বহু জায়গায় আমরা আরও অনেক সভা সমাবেশ করব। আপনারাও প্রচার করবেন। কারণ বাজারী কাগজগুলো এই সভার কথা সঠিকভাবে ছাপাবে না, এটা আমরা জানি।

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আলোচনা বিতর্ক ইত্যাদি চলুক এটা আমরা চাই। একটা সঠিক শিক্ষানীতিকে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে এটা যেমন একটা দিক, তেমনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীগণ এই শিক্ষানীতির সমর্থনে তাঁদের বক্তব্য রাখছেন, বিতর্কে অংশ নিচ্ছেন, সরকারের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন।

আমরা আজকে এখানে যে প্রস্তাব রেখেছি তা সমর্থিত হয়েছে। সেই প্রস্তাবের কথা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে। এই সভায় উপস্থিত সকলের এ-বিষয়ে সমান দায়িত্ব রয়েছে।

'বিদেশী ভাষাই আমাদের দেশের সাক্ষরের সংখ্যাবৃদ্ধির অন্তরায়।'

—ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু

('বিজ্ঞানের সংকট')

সর্বজনীন শিক্ষা প্রসারের স্বার্থে ভাষা ও শিক্ষানীতির যৌক্তিকতার সমর্থনে ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে কাজকর্মের দাবিতে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের আবেদন

সম্প্রতি রাজ্য সরকারের ভাষা ও শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সংগে কয়েক-জন পরিচিত বুদ্ধিজীবী মিলিত হয়ে বলছেন এই ভাষা ও শিক্ষানীতি নাকি দেশবাসীর পক্ষে ক্ষতিকর। তাঁরা বর্তমান শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সরকারী কাজকর্মে কোন সদর্থক দিকই লক্ষ্য করছেন না। যেহেতু অভিযোগটা গুরুতর এবং কয়েকজন পরিচিত বুদ্ধিজীবী এর সংগে কণ্ঠ মিলিয়েছেন সেহেতু বিষয়টি ব্যাপক জনগণের স্বার্থে গুরুত্বসহকারে সকলেরই বিচার বিবেচনা করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

ভারতের সংবিধানে শিক্ষার সর্বজনীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং স্বাধীন ভারতের উপযোগী করে শিক্ষার সংস্কার সাধনের জন্য বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশনও ইতিপূর্বে কাজ করেছেন এবং তাঁদের প্রতিবেদনও আমাদের সামনে আছে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি বিগত তিরিশ বছরে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে এ রাজ্যে কোন নীতি নির্ধারণ ও কার্যকর হয় নি। বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্বভাবে আর্থিক দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। সেই সংগে তাঁরা তিন দশক ধরে স্থগিত থাকা শিক্ষানীতিকে শিশু ও কিশোর-দের সার্বিক প্রয়োজনের সংগে বিকাশশীল সমাজের চাহিদাকে সমন্বিত করে নতুনভাবে নির্ধারণ করার কাজ শুরু করেছেন। আমরা জানি যে কোন পরিবর্তনই পুরানো ও নতুনের মধ্যে বিতর্কের অবতারণা করে। একদল সবসময়েই থাকেন যাঁরা স্থিতি-শীলতার পক্ষে, এমন কি অনেক সময় আরও পিছনের দিকেও ফিরে যেতে চান।

বর্তমানে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু প্রাথমিক স্তরে একমাত্র মাতৃ-ভাষা শিক্ষা নিয়ে। বিগত সরকারের আমলে গঠিত ও বর্তমান সরকারের সময় পুনর্গঠিত বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ শিক্ষাবিদ্ হিমাংশুবিমল মজুমদারের সভাপতিত্বে প্রাথমিক শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ একটি কমিটি দীর্ঘ আড়াই বছরের পরিশ্রমে যে প্রতিবেদন দিয়েছেন তারই ভিত্তিতে এই প্রাথমিক শিক্ষানীতি কার্যকরী হচ্ছে। এই কমিটির প্রতিবেদনে ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত মুদালিয়র, কোঠারি প্রভৃতি কমিশন ছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সুপারিশসমূহও গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে একটি ভাষা—মাতৃভাষা

নতুন শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাকেই একমাত্র ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে লক্ষ লক্ষ সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়ের কাঁধে বিদেশী ভাষাসহ একাধিক ভাষার বোঝা প্রাথমিক স্তরে চাপিয়ে দেওয়া সংগত নয়। একটি শিশু ইংরেজী শেখার জন্য মাতৃভাষা, গণিত ও প্রকৃতি-পরিবেশ সম্পর্কিত পাঠ নেবার সময় সংক্ষেপ করবে এবং তার নিজস্ব পরিবেশে ইংরেজী ভাষা শেখার অনুষংগ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সেই ভাষায় অকৃতকার্য হবে এবং শিশুর সামগ্রিক বিকাশ বিঘ্নিত হবে। এটা হওয়া উচিত নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাও অবশ্য এই যুক্তির সপক্ষে।

একথা ঠিকই অল্প বয়সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশু সেই ভাষাই শিখতে পারে যে ভাষায় সে শুনবার বলবার ও বুঝবার সুযোগ পায়। স্বভাবতই সে ভাষা হল মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় কিছুটা দখল জন্মানোর পর মাতৃভাষার সাহায্যেই ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা শ্রেয়। তাই জাতীয় অপচয় রোধ করার জন্য প্রাথমিক স্তরের পর থেকেই দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী শেখানো শুরু করা উচিত। দীর্ঘ দুশো বছরের ইংরেজ শাসনের ফলে যে সংস্কার গড়ে উঠেছে তার বশবর্তী হয়ে একদল বলছেন প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী ভাষা না শেখালে নাকি শিশুদের উচ্চশিক্ষা ও উন্নত চিন্তাভাবনার চর্চার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং ইংরেজী জানা ও না-জানা দুই শ্রেণীর নাগরিক সৃষ্টি করা হবে। এ আশংকা অমূলক। কেন না ইংরেজী তো উঠে যাচ্ছে না। যেহেতু এখনও আমাদের সামাজিক জীবনে ইংরেজীর কিছুটা প্রয়োজন আছে তা ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে পড়ানো হবে এবং এর ফলে শিশু ইংরেজী ও মাতৃভাষা দুটোই ভালভাবে শিখবে।

অন্যান্য রাজ্যের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে অন্ধ্র, বিহার, গুজরাট, হরিয়ানা, জম্মু-কাশ্মীর, কর্নাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী প্রভৃতি রাজ্যে ৫ম বা ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজী পড়ান হয়। এখন প্রশ্ন হল, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর থেকে ইংরেজী শিখলে শিশুর বিকাশ খর্বিত হবে, না অবাধ হবে? ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা চিন্তাবিদ্ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেও বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত মাতৃভাষাতেই শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং তারপর থেকেই ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষা করে কী সুফল লাভ করেছিলেন তা নিজেই ব্যক্ত করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলাম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রকৃতি-বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলা ভাষা মাতৃভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধুভাষার কৌলিন্য ঘোষণা করত।...আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজী-বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল।...নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি, মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তারপরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না, ইংরেজীর অতিপ্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলী সাবধানে সেলাই করে করে কাঁথা বুনতে হয় না। অন্ততঃ আমার এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংলা ভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।"

প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী না শিখলে কি উচ্চশিক্ষা ব্যাহত হবে?

প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী না পড়লে বিজ্ঞান কারিগরি বা উচ্চ-শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হবে বলে যে অভিযোগ উঠেছে সে সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "বিদ্যাবিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমত মন দিয়ে দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজী। ...আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলা

ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে। ওজর এই যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর। কঠিন বৈকি। সেই জন্যই কঠোর সংকল্প চাই...মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালীকে দণ্ড দিতেই হইবে?"

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।" একই অভিমত পোষণ করেছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, "বিজ্ঞানের শিক্ষা স্বয়ং প্রকৃতির নিকট হইতেই শিক্ষালাভ, উহা মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত। একটি বিদেশী ভাষার কবলে উহাকে আবদ্ধ রাখা উচিত নহে।" বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা এবং বিজ্ঞানের পরিভাষা সৃষ্টিতে যাঁর অবদান অপরিমেয় সেই বিজ্ঞান-শিক্ষক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, "আমাদের বাংলা ভাষা বর্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞান বিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য, তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি।" বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান জানেন না।"

যাঁরা বলছেন ইংরেজী ভাষাচর্চা কম সময় ধরে হলে বাঙালীর জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা খর্বিত হবে তাঁদের সংকীর্ণ স্বার্থের মুখোশ খুলে দিয়ে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন, "যাঁরা বলেন যে ইংরেজী যদি কম শেখানো হয় তাহলে আমাদের দেশের জানালা বন্ধ করে দেওয়া হবে—যার মধ্য দিয়ে আসে জ্ঞানের আলোক ও স্বাধীনতার বাতাস, তাঁরা মনে করছেন যে চিরকাল ভারতবর্ষের চতুর্দিকে কারাগারের উঁচু পাঁচিল থাকবে এবং আলো আসবে উপর থেকে, সেটা কেবলমাত্র উপরতলার শিক্ষিত লোকের কাছে পৌঁছবে এবং সেটা তাঁরা যেমন বুঝবেন সেই রকম নীচের অজ্ঞ লোকদের কাছে পৌঁছে দেবেন। এইভাবে দেশের উন্নতি করা কষ্টদায়ক। তাছাড়া, নিজেদের সকলের দায়িত্ব অল্পসংখ্যক একটি শ্রেণীর কাঁধে চাপানো চিরকাল উচিত নয়। দেশের লোকের উচিত নিজেদের বোঝা নিজেদের বওয়া।" মনীষীদের এই সব বাণী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা কি তা অনুসরণ করব না?

শিক্ষার সর্বজনীন প্রসারই লক্ষ্য

স্বয়ং গান্ধীজী বলেছিলেন "মাতৃভাষার প্রতি অবহেলার অর্থ হল জাতিগতভাবে আত্মহত্যা।" আমরা কি সেই আত্মহত্যার পথ নেব? আমাদের মাতৃভাষা কি এতই দীন? এ রাজ্যের শতকরা সত্তর ভাগ নিরক্ষর মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে অন্ততঃ মাতৃভাষাটুকু তাদের শেখানোর দায়িত্ব কি আজও আমরা গ্রহণ করব না? রবীন্দ্রনাথ বড় আশা করে বলেছিলেন, "শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলাম, আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজী-শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অগ্রাহ্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে। আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ স্বভাবতই সমাজের মনে কাজ করে, এটা তার সুস্থচিত্তের লক্ষণ।" আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে যে সহজ কথাটি রবীন্দ্রনাথ বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন আজও কয়েকজন বুদ্ধিজীবী তা বুঝতে চাইছেন না বরং পৃথিবীর সমস্ত বিশেষজ্ঞদের মতামতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রাথমিক স্তরে বিদেশী ভাষার হয়ে ওকালতি করছেন এবং এর জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আইন অমান্য করছেন। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি হতে পারে!

পরাধীন ভারতে দেশের স্বাধীনতার জন্য এই সব বুদ্ধিজীবীর কতজন কারাবরণ করেছিলেন? আর আজ তাঁরা বিদেশী ভাষার জন্য আইন ভাঙছেন। অন্ধ বামফ্রন্টবিরোধী বিদ্বেষ থেকে এঁরা জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পথে নেমেছেন। হায়রে বুদ্ধিজীবী! "ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক না, কিন্তু গরীবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?" (রবীন্দ্রনাথ)

গরীবের ছেলেকে মাতৃস্তন্যপুষ্ট করে তুলতে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার গোড়াপত্তন যদি আজ মাতৃভাষার মাধ্যমে করতে কোন সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাহলে তাকে সমর্থন জানাতে আমরা কেন কুণ্ঠিত হব? সামান্য শিক্ষার সুযোগ আমরা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ পেয়েছি, আমাদের ভাগে কম পড়ে যাবে এই ভয়েই কি আমরা এর বিরোধিতা করব? আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীরা যে শিক্ষা-নীতি চেয়েছিলেন তাকে কার্যকরী করতে যে সরকারই এগিয়ে আসবেন প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য তাকে সমর্থন জানানো। পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করছি শিক্ষাক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ আবার ফিরে এসেছে, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে কয়েক হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কয়েক লক্ষ শিশুকে দুপুরে সরকারী ব্যয়ে খাবার ও পোষাক দেওয়া হচ্ছে, কলেজ স্তর পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার বেতন দেওয়ার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছেন, ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পুস্তক দেওয়া হচ্ছে। এক কথায় শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে আন্তরিক ও ব্যাপক কর্মকাণ্ড দেখা যাচ্ছে। এটা আশার কথা, গৌরবের বিষয়। এই সাফল্য প্রয়োজনের তুলনায় যত পরিমিতই হোক আমরা দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাই দেশের নিরক্ষর মানুষের মধ্যে শিক্ষার সুযোগকে পৌঁছে দিতে এই অভূতপূর্ব শুভ প্রয়াসের পক্ষে সমবেত হোন এবং সফল করতে এগিয়ে আসুন।

কিন্তু একাজ সহজসাধ্য নয় বিশেষ করে দু'শো বছরের বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত অসম ব্যবস্থার একটি সমাজে। তাই এ-কাজে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করারও প্রয়োজন আছে। বিদ্যা ও কর্মক্ষেত্রের সকল পর্যায়েই মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক সমস্ত প্রধান ভাষার গুরুত্ব সুপরিকল্পিতভাবে প্রসারিত করতে হবে, না হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন ব্যবস্থাজনিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অমূলক ভয় থেকে যেতে পারে। সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত এবং শুভ প্রয়াসকে সফল করার জন্য আরও কিছু বাস্তব ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। তাই আমাদের দাবীঃ

(১) প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে এবং শহরের অনুন্নত অঞ্চল থেকে সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্র আরও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(২) উচ্চতম শিক্ষাস্তর পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা শুধু নীতি হিসেবে নিলেই হবে না তার জন্য উপযুক্ত মানের গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ নিতে হবে।

(৩) মাতৃভাষায় বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা ও কারিগরি বিদ্যার গ্রন্থ রচনায় বিশেষজ্ঞদের সরকারী ভাণ্ডার থেকে অর্থ দিয়ে উৎসাহদান করতে হবে।

(৪) ইংরেজীসহ অন্যান্য উন্নত বিদেশী ভাষা থেকে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ সরকারী উদ্যোগে মাতৃভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) স্কুল, কলেজ, পৌরসংস্থাসহ সমস্ত সরকারী আধাসরকারী দপ্তরের কাজ রাজ্যের প্রধান ভাষা বাংলা ও নেপালী প্রভৃতি ভাষায় অবিলম্বে চালু করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যায় বাংলা,

নেপালী প্রভৃতি ভাষায় টাইপযন্ত্র সরকারী ব্যয়ে সরবরাহ করতে হবে।

(৬) সর্বভারতীয় নিয়োগ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রশাসনিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, আঞ্চলিক ভাষায় পরীক্ষার্থীর স্বার্থ সুরক্ষিত করার সমস্ত ব্যবস্থা অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

নিবেদক

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রবোধচন্দ্র সেন
মন্মথ রায়
তিমিরবরণ
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
দক্ষিণারঞ্জন বসু
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
রাধারমণ মিত্র
ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার (উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী (উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যায়)
ডঃ জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য
ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা
নারায়ণ চৌধুরী
ডঃ কল্যাণকুমার গাঙ্গুলী (প্রাক্তন বাগীশ্বরী অধ্যাপক)
ডঃ ক্ষুদিরাম দাস (রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
অরুণ মিত্র
শঙ্খ ঘোষ
রাম বসু
মণীন্দ্র রায়
উৎপল দত্ত
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
ভবানী মুখোপাধ্যায়
ডঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (সভাপতি, কলেজ সার্ভিস কমিশন)
ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (পাভলভ ইনস্টিটিউট)
চিন্মোহন সেহানবীশ
অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
গৌতম চট্টোপাধ্যায়
সুধী প্রধান
দেবেশ রায় (সম্পাদক, পরিচয়)
কৃষ্ণ ধর
সন্তোষকুমার বসু (বিশ্বভারতী)
অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)
হরেন ঘটক
চিন্তামণি কর
ও. সি. গাঙ্গুলী
পরিতোষ সেন
প্রভাস সেন

রথীন মৈত্র
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
সুনীল পাল
পূর্ণেন্দু পত্রী
সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য
কল্পতরু সেনগুপ্ত
জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক, সত্যযুগ)
প্রশান্ত সরকার (সম্পাদক, বসুমতী)
ডঃ প্রভাত গোস্বামী
সন্তোষ মিত্র
ভবেশ মৈত্র (সভাপতি, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ)
অনিলা দেবী
রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেব
কপিল ভট্টাচার্য
ডঃ বরুণ দে
ডঃ পবিত্র সরকার (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
সলিল চৌধুরী
তারাপদ মুখোপাধ্যায়
রামশঙ্কর চৌধুরী
গিরীন্দ্র চক্রবর্তী
সাধন গুপ্ত
নেপাল মজুমদার
গণেশ ঘোষ
নিমাই চক্রবর্তী (প্রধান শিক্ষক, হেয়ার স্কুল)
পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (প্রধান শিক্ষক, হিন্দু স্কুল)
শ্রীমতী অনিমা মুখোপাধ্যায় (প্রধান শিক্ষিকা, বাগবাজার মাল্টিপারপাস গার্লস হাই স্কুল)
গোলকপতি রায়
আশু সেন
প্রশান্ত বসু
অমিতাভ সেন

শিক্ষাবিদ্

ডঃ জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ সুখেন্দুবিকাশ চক্রবর্তী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ নবকুমার নন্দী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ আশিষ রায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দেব (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

তপোব্রত ঘোষ (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ দেবেশ চক্রবর্তী (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ সত্যবতী গিরি (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ বিভূতি রায় (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ স্বপন মজুমদার (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ কৃষ্ণপ্রসন্ন মজুমদার (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ অশোককুমার ঘোষ (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যায়)
ডঃ চিত্তরঞ্জন ঘোষ (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ মিহির ভট্টাচার্য (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ শিবপদ চক্রবর্তী (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ অরুণকুমার বসু (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ বিশ্বনাথ সেন (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ সুনীল সেন (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ নির্মল দাস (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ মঞ্জু দত্তগুপ্ত (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ রামকুমার সেন (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ অসিতানন্দ রায় (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ সুনীল দত্ত (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ তৃপ্তি চৌধুরী (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ দর্শন চৌধুরী (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ কল্যাণীশঙ্কর ঘটক (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

ডঃ রাখালচন্দ্র নাথ (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ শমিতা সিংহ (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ অভিজিৎ মিত্র (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ শংকর চট্টোপাধ্যায় (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ তাপস চট্টোপাধ্যায় (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ পুলিন দাস (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ সরোজমোহন মিত্র
ডঃ শিবজেন্দ্রলাল নাথ
ডঃ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক পঞ্চানন সাহা
অধ্যাপক দিগ্বিজয় দে সরকার
ডঃ বিজনবিহারী পুরকায়স্থ (অধ্যক্ষ)
অধ্যাপক বিমানেন্দ্র সেনগুপ্ত
ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী (অধ্যক্ষ)
বিষ্ণু বেরা (অধ্যক্ষ)
সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (অধ্যক্ষ)
অধ্যাপক সুধীর রায়
অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ বসু
অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী
অধ্যাপক অনিল ভট্টাচার্য
অধ্যাপিকা কনক মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক রামকুমার গুছাইত
ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত
অধ্যাপক অসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত
অধ্যাপক হরিদাস গুণ
অধ্যাপক মানিক বল
অধ্যাপক মিহির দেববর্মন
অধ্যাপক অরুণ চৌধুরী
অধ্যাপক গোপাল সরকার
অধ্যাপক দেবজ্যোতি দাস
অধ্যাপক শৈলজা বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক বিশ্বনাথ সাঁতরা
অধ্যাপক জগদিন্দু ভট্টাচার্য
অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক দীপেশ ঘোষ
অধ্যাপক সোমনাথ ভাদুড়ি
অধ্যাপক মৃণালকান্তি চক্রবর্তী
অধ্যাপক সুধাংশু পাল
অধ্যাপক সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী
অধ্যাপক শুভঙ্কর ঘোষ
অধ্যাপক সুনির্মল মৈত্র
অধ্যাপক সঞ্জয় সরকার
অধ্যাপক নন্দদুলাল দাস
অধ্যাপক অধীর রায়
অধ্যাপক সতীশ মহাপাত্র

অধ্যাপক শংকর দাশগুপ্ত
অধ্যাপক দেবকুমার রায়
অধ্যাপক কেশব মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক ভবানীশঙ্কর জোয়ারদার
অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বসাক
অধ্যাপক মৃণালকান্তি চক্রবর্তী
অধ্যাপক হারীত ভট্টাচার্য
অধ্যাপক অমল সরকার
অধ্যাপক অমলেন্দু ঘোষ
অধ্যাপক মন্মথ বসু
অধ্যাপক সতীনাথ চক্রবর্তী
অধ্যাপক কানাইলাল চক্রবর্তী
অধ্যাপক শ্যামাপদ পাল
অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী
ডঃ সলিল ঘোষ
অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত পাল
অধ্যাপক মোহিনীমোহিত মান্না
অধ্যাপক উপানন্দ রায়
অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র দাস
অধ্যাপক মুকুল রায়
অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মিত্র
অধ্যাপক অনন্তকুমার চক্রবর্তী
অধ্যাপক কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক মধুসূদন চক্রবর্তী
অধ্যাপক সত্যজীবন চক্রবর্তী
অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপিকা বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য
অধ্যাপক সুধীন ভৌমিক
অধ্যাপক গৌরাঙ্গ সাহা
অধ্যাপক দীপক নাগ
অধ্যাপক নবকুমার নন্দী
অধ্যাপক দুর্গারতন ঘোষ
ডঃ চারু দত্ত
অধ্যাপক প্রশান্তকুমার ঘোষ
অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী
অধ্যাপক সুদর্শন রায়চৌধুরী
অধ্যাপক অরুণ সেন
অধ্যাপক জ্যোতির্ময় বিশ্বাস
অধ্যাপক অনিল বসাক
অধ্যাপক দীপেন ঘোষ
অধ্যাপক বিশ্বজীবন মজুমদার
অধ্যাপক দুলাল বিশ্বাস
অধ্যাপক জ্যোতির্ময় বন্দোপাধ্যায়
অধ্যাপক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক মৃণালকান্তি দাসগুপ্ত
অধ্যাপক তপেশ্বর বসু
অধ্যাপক দেববীর দাসগুপ্ত
অধ্যাপক অংশুতোষ খান
অধ্যাপক রণজিৎ চক্রবর্তী
অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
অ্যাপক অশোক মুস্তাফী
প্রাণগোপাল নাথ (প্রধান শিক্ষক)
নন্দদুলাল গোস্বামী (ঐ)
বিদ্যুৎ রায় (শিক্ষক)
গীতা পোদ্দার (শিক্ষিকা)
সুবোধ রায়চৌধুরী (শিক্ষক)
অমলেন্দু মিত্র (ঐ)
হরিপদ ঘোষ (ঐ)
শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (ঐ)
বসন্ত চট্টোপাধ্যায় (ঐ)
লীলা পুরকায়স্থ (শিক্ষিকা)
রবি দত্ত (শিক্ষক)

মৃণাল রায় (শিক্ষক)
সুধা মুখোপাধ্যায়
রেবা রায়
নমিতা ঘোষ
শিবদাস ভট্টাচার্য
জিতেন চক্রবর্তী
শিশির ভট্টাচার্য
অপর্ণা ভৌমিক
অশোকা নাগ চৌধুরী
ডঃ পতিত বন্দ্যোপাধ্যায়
সমর বসু
ডাঃ শিবময় দাস
(ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ)
ডাঃ অশোক নন্দী
ডাঃ সতীশচন্দ্র দে

সাহিত্যিক

সিদ্ধেশ্বর সেন
কিরণশংকর সেনগুপ্ত
অমিতাভ দাশগুপ্ত
ধনঞ্জয় দাস
পবিত্র মুখোপাধ্যায়
ডঃ শুভেন্দশেখর মুখোপাধ্যায়
(সম্পাদক, সাহিত্য আকাদেমী, পূর্বাঞ্চল)
কাজী রেজাউল করিম
(সম্পাদক নজরুল একাডেমী)
তুলসী মুখোপাধ্যায়
বার্ণিক রায়
কল্যাণ দত্ত
অনুনয় চট্টোপাধ্যায়
নিরঞ্জন সেনগুপ্ত
রঞ্জিত দাসগুপ্ত
ছবি বসু
অপর্ণা পালচৌধুরী
সুপ্রিয়া আচার্য
মণিভূষণ ভট্টাচার্য
মিহির আচার্য
গৌরাঙ্গ ভৌমিক
সমীর রক্ষিত
মনোরঞ্জন বড়াল
বৃন্দাবন বাগচি
মনোরঞ্জন হাজরা
অরুণ চৌধুরী
কেদার ভট্টাচার্য
তপোবিজয় ঘোষ
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
শ্যামসুন্দর দে
প্রণব চট্টোপাধ্যায়
কালিদাস রক্ষিত
অমল চক্রবর্তী
অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়
কৃষ্ণ চক্রবর্তী
কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়
মণি মুখোপাধ্যায়
চিত্ত ঘোষাল
রঞ্জিতকুমার সেন
রামরমণ ভট্টাচার্য
শ্যামল সেন
গোপীনাথ দে
অশোক বটব্যাল
ভাস্কর মুখোপাধ্যায়
শশাংক গঙ্গোপাধ্যায়
শ্যামল মৈত্র
তপন চক্রবর্তী
রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক
শতদ্রু চাকী
শৈবাল মিত্র
মধু গোস্বামী
সাধন চট্টোপাধ্যায়
জিয়াদ আলী
রাসবিহারী দত্ত
দেবু গোস্বামী
ইরা সরকার
অনুশীলা দাশগুপ্ত
রমলা বড়াল
বরুণ সরকার
নিমাই মান্না
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
মৃণাল করগুপ্ত
সমীর গোস্বামী
নির্মল ঘোষ
উজ্জ্বল চক্রবর্তী
অনিল আচার্য
দেবদত্ত রায়
পুষ্পজিৎ রায়
অমিয় চৌধুরী
দীপংকর চক্রবর্তী
আশীষ মজুমদার
শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য
জয়ন্তকুমার ভাদুড়ি
চিন্ময় মজুমদার
দেবাশিষ চৌধুরী
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
(সম্পাদক, নাবিক সংগ্রাম)
শালেখ লক্ষৌডি
বিমল বর্মা
অবোধ নারায়ণ সিং
শ্রীহর্ষ
অক্ষয়
সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শচীন সরকার
জীবন গঙ্গোপাধ্যায়
সমর ঘোষ
অনির্বাণ দত্ত
অরুণ চক্রবর্তী
অরুণ মজুমদার
বীরেশ ঘটক
নীতীশ বিশ্বাস
ঋতীশ চক্রবর্তী
আনন্দময় রায়
শান্তিময় গুহ
তুষার পাল
অনিরুদ্ধ মৈত্র
সুধীর ঘোষ

সাংবাদিক

অরুণ রায়
শৈলেন দাশগুপ্ত (সত্যযুগ)
কুমুদ দাশগুপ্ত (ঐ)
নিতাই মুখোপাধ্যায় (ঐ)
পরিতোষ পাল (ঐ)
অঞ্জন বসু (ঐ)
তপনায়ন ঘোষ (ঐ)
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)
তরুণ সেনগুপ্ত (ঐ)
চিত্ত দেবনাথ (ঐ)
চিত্ত মণ্ডল (ঐ)
চন্দ্রশেখর ভড় (ঐ)
সমীর গোস্বামী (ঐ)
রথীন চক্রবর্তী (ঐ)
রণব্রত মুখার্জী (ঐ)
সুধীন সেন
কানাই পাকড়াশি
পরিমল ভট্টাচার্য
সুবোধ বসু (যুগান্তর)
সুধাংশু দে (বসুমতী)

নাট্যকার, অভিনেতা, শিল্পী

অনুপ কুমার
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
দিলীপ রায়
সীতা মুখোপাধ্যায়
মঞ্জু দে
শোভা সেন
সজল রায়চৌধুরী
শিশির সেন
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
যোগেশ দত্ত
সুরেশ দত্ত
সন্ধ্যা রায়
রেবা রায়চৌধুরী
দীপ্তি পাল
দিলীপ পাল
নিরঞ্জন রায়
হীরেন ভট্টাচার্য
মোহিত চট্টোপাধ্যায়
সঞ্জীব সেন
কৃষ্ণ কুণ্ডু
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়
জোছন দস্তিদার (চার্বাক)
নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত
(থিয়েটার কমিউন)
দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় (শূদ্রক)
অশোক মুখোপাধ্যায়
(থিয়েটার ওয়ার্কশপ)
বিভাস চক্রবর্তী (থিয়েটার ওয়ার্কশপ)
অরুণ মুখোপাধ্যায় (চেতনা)
চিররঞ্জন দাস (সীমান্তিক)
সলিল চট্টোপাধ্যায় (মৌসুমী গ্রুপ)
বিদ্যুৎ নাগ (প্রয়াস)
অজিত সান্যাল (লাইম লাইট)
রমেন সরকার (ক্লাস থিয়েটার)
কমল রায় (রূপান্তরী)
বরুণ কাবাসী (ওয়ার্কার্স থিয়েটার)
চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় (একটি দল)
জয় সেনগুপ্ত (প্রত্যয়)
কর্ণ সেন (গণশিল্পী সংসদ)
শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (অরিন্দম সম্প্রদায়)
চন্দন সেন
কণিষ্ক সেন
মেঘনাদ ভট্টাচার্য (সায়ক)
অলোক রায়চৌধুরী (চারণ দল)
আশীষ দত্ত (প্রোফাইল)

প্রণব বসু (রঙগন)
প্রদীপ ভট্টাচার্য (শিলিগুড়ি)
বাসুদেব বসু
বাবলু দাশগুপ্ত
রবীন্দ্র ভট্টাচার্য
বারীন রায়
চন্দন চক্রবর্তী
সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য
শিব শর্মা
সনৎ বসু
শ্রীজীব গোস্বামী
রত্না ভট্টাচার্য
দিলীপ ঘোষাল
শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
নির্মল মুখোপাধ্যায়
শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়
সোমেন পাল
শঙ্কর মুখার্জী

সঙ্গীত শিল্পী ও আবৃত্তিকার

নিবারণ পণ্ডিত
দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সবিতা চৌধুরী
নির্মলেন্দু চৌধুরী
ডঃ ভুপেন হাজারিকা
ডাঃ শৈলেন দাস
অজিত পাণ্ডে
দিলীপ সেনগুপ্ত
নরেন মুখোপাধ্যায়
সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়
অমর পাল
সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক্যালকাটা পিপলস্ কয়্যার)
স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়
মিন্টু ঘোষ
রবীন ঘোষ
বিমল মজুমদার
দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রজত বন্দ্যোপাধ্যায়
স্নেহাশীষ ভৌমিক

চিত্রশিল্পী

বিজন চৌধুরী
নন্দদুলাল ভট্টাচার্য
অশেষ মিত্র
নির্মাল্য নাগ
সজল রায়
অমর দে
বিশ্বনাথ দাস
চিত্র সেন
কুণাল কর
রবীন দত্ত
মধুসূদন রায়

চলচ্চিত্র পরিচালক ও কলাকুশলী

শংকর ভট্টাচার্য
অজয় দে (ফেডারেশন অফ্ ফিল্ম সোসাইটিজ)
অলোকচন্দ্র চন্দ্র (সাধারণ সম্পাদক, সিনে সেন্ট্রাল)
বিমান বসু (সিনে সেন্ট্রাল)
সাধন চক্রবর্তী (সিনে সেন্ট্রাল)
অমল সরকার
বিদেশ সরকার
উৎপলেন্দু চক্রবর্তী
অজিত লাহিড়ী
সরোজ দে
অজয় কর
নীহার দাশগুপ্ত
সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
গৌতম গুপ্ত
সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাধারণ সম্পাদক, নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি)
প্রদোষ মিত্র (নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি)

এবং

ভবতোষ রায়
নরেশ দাস
অসীম চ্যাটার্জী
মুরারি নাগচৌধুরী
মনোজয় ঘাঁটি
রানু সরকার
তুলসীদাস সাধু
সুপ্রিয় গুপ্ত
অশোক চক্রবর্তী
রামেন্দ্রনারায়ণ দাস
বিশ্বনাথ দে
অমিয়াংশু দেব
বিজন দেব
অরুণ চট্টোপাধ্যায়
অশোক দাস
সুখেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ধীমান নাথ
সজল বন্দ্যোপাধ্যায়
সুভাষ দত্ত
অলোককুমার রায়

সর্বজনীন শিক্ষা এবং সর্বস্তরে আঞ্চলিক ভাষায় কাজকর্মের দাবীতে লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ মঞ্চে ভাষণরত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার। অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ, ডঃ পবিত্র সরকার, শ্রীনেপাল মজুমদার, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীউৎপল দত্ত, শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমণীন্দ্র রায়, ডঃ কল্যাণ গাঙ্গুলী ও অনুনয় চট্টোপাধ্যায়।

অভিনন্দন পত্র

রাজ্যের ভাষানীতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন

১৯৮১ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে লেখা এক পত্রে ভারত সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন মহীশূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ভাষা পর্ষদের অধিকর্তা ডঃ ডি. পি. পট্টনায়ক পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজী তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ় মনোভাব অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে, ইংরাজীর পরিবর্তে প্রাথমিক স্তরে কেবলমাত্র মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য প্রথমেই আপনাকে অভিনন্দন জানাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং পরবর্তী পর্যায়ে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলে ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা বর্তমানের অনভিজ্ঞ শিক্ষক, অনুন্নত শিক্ষা সামগ্রী এবং নিম্নমানের শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে যা হয় তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল হবে।

জনশিক্ষার প্রসারে কয়েকটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

ভবেশ মৈত্র

সভাপতি, পঃ বঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

সৃষ্টির শুরু থেকে এ জগৎ পরিবর্তিত ও বিকশিত হচ্ছে। মানব সমাজের বিকাশও অবিরাম গতিতে অব্যাহত। এই জাগতিক ও সামাজিক বিকাশধারায় মানুষ একদিকে যেমন প্রভাবিত হয় তেমনি প্রভাবিত করেও। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে শিক্ষিত করে, নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করার জন্য এবং পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে আনার জন্য যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণও করে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সমাজে নিজস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সমাজের পরিবর্তন ও বিকাশের সাথে সাথে শিক্ষা-ব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম তা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না। কিন্তু সমাজের বিশেষ করে শিক্ষাজগতের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কিছু লোককে অতীতে কোন পরিবর্তনের প্রস্তাব এমনভাবে আলোড়িত করতে পারে নি, যে আলোড়ন বর্তমানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাবিত পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাপক অংশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এত আগ্রহের প্রকাশও অতীতে দেখা গেছে বলে মনে হয় না।

কাগজে পড়ছি, দেওয়ালে দেখছি; বলা হচ্ছে—'রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতি ভ্রান্ত'। বলা হচ্ছে, 'রাজ্য সরকার তার শিক্ষানীতিকে কার্যকর করার জন্য যে ব্যবস্থা নিয়েছে তা শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সাহায্য করা তো দূরের কথা বরং শিক্ষার সুযোগকে আরও সংকুচিত করবে'। অপরদিকে রাজ্য সরকার ও এই শিক্ষানীতির সমর্থকেরা দাবী করছেন, 'এই নতুন শিক্ষানীতির মূল কথাই হল শিক্ষার প্রসার ঘটানো ও উন্নতি সাধন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সকল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসারিত করা।' অবশ্য এই দুয়ের মধ্যে এক অংশের মানুষ আছেন যাঁদের কাছে কিছু কিছু বিষয় এখনও খুব স্পষ্ট নয়। তাই তাঁরা জানতে চাইছেন, বুঝতে চাইছেন কেন একদল লোক বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব ব্যবস্থা নিয়েছেন তাকে শিক্ষা প্রসারের পরিপন্থী বলে মনে করছেন। তাঁদের নিজেদের অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতার সাথে সমস্ত বিষয়গুলিকে মিলিয়ে সত্যাসত্য নির্ধারণের চেষ্টা করছেন।

তাঁদের অনেকের কাছেই প্রশ্ন, বার ক্লাশ পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করার ফলে শিক্ষা প্রসারের পথ যে সুগম হয়েছে এ সম্পর্কে কারও মনে কোন সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে কি? এখন থেকে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা তাদের লেখাপড়া শেখার ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য বিদ্যালয়ে যাবে তাদের নিজ অধিকারে—পয়সা দিয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রবেশপত্র আর কিনতে হবে না, এ কি একটা সামান্য ঘটনা? এই পশ্চিমবাংলায় অষ্টম শ্রেণী পযন্ত অবৈতনিক শিক্ষার দাবী ত্রিশ বছর ধরে উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ বর্তমান রাজ্য সরকার তার অতি সীমাবদ্ধ আর্থিক ও সাংবিধানিক ক্ষমতা নিয়ে এই অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েদের বার ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষালাভের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। বেতন না দিতে পারার জন্য, পিতামাতার দৈন্যের জন্য বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নাম কেটে দিয়ে বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হবে না; বেতন পরিশোধ করতে না পারার জন্য বার্ষিক পরীক্ষার ফল অপ্রকাশিত রাখার চরম পীড়াদায়ক ও অমানবিক ঘটনা আর পশ্চিমবাংলার মাটিতে ঘটবে না এবং এর ফলে শিক্ষাজগতে যে নতুন পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হচ্ছে, শিক্ষালাভেচ্ছু মানুষের মধ্যে যে উৎসাহ জাগছে এর তাৎপর্য শহরের কিছু উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চবিত্তসম্পন্ন মানুষের উপলব্ধির সীমানাতে আঘাত করতে না পারলে দুঃখ বোধ করা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে? সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা ও অনীহা এবং রক্ষণশীলতার প্রাচীরঘেরা তথাকথিত সুনিশ্চিত জীবনই তাঁদের এই নতুন ব্যবস্থার তাৎপর্য বুঝতে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু তাঁরা সাধারণ মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁদের কল্পনালোকে বাস করে যাই ভাবুন সাধারণ মানুষ তাঁদের এই বাস্তববর্জিত ভাবনাকে কখনই গুরুত্ব দিতে পারেন না।

শিক্ষালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকতা তাঁদের বৃত্তি ও জীবিকা। অভিভাবকেরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের তাঁদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। নিরক্ষর ও অল্পশিক্ষিত পিতামাতার তো এ ছাড়া কোন উপায়ও নেই। তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়দের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। শিক্ষক মশায়রাও সাধ্যমত চেষ্টা করেন তাঁদের প্রিয় শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভে সাহায্য করতে। এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাঁরা করতেন তাঁদের অনেকের ক্ষেত্রেই (বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে) বেতনের দায়িত্ব সরকার নিতেন না ফলে এ রাজ্যের জুনিয়ার হাই স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এবং হাই স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এক বিরাট অংশ তাঁদের পূর্ণ বেতন পেতেন না। আর নিয়মিত বেতন পাওয়া তো এ রাজ্যের কোন স্তরের শিক্ষকদের ভাগ্যেই জুটত না। কলেজের শিক্ষকরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছেন, বিগত সরকারের কাছে বারবার দাবী করেছেন প্রতি মাসে এককালীন বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য, কিন্তু সেই সামান্য দাবীও পূরণ হয় নি। দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব যাঁদের হাতে তাঁদের জীবিকা সম্পর্কে, মাসিক বেতন সম্পর্কে যদি এ রকম অব্যবস্থা থাকে তাহলে শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার কি করে সম্ভব তা সহজেই অনুমান করা যায়। বর্তমান রাজ্য সরকার এ-কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সমস্ত শিক্ষা ও শিক্ষাকর্মীকে মাসান্তে পূর্ণ বেতন দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে শুধুমাত্র শিক্ষক

ও শিক্ষাকর্মীদের জীবনে স্বস্তি এনেছেন তাই নয়—বিদ্যালয়ের জীবনে নতুন পরিবেশ সৃষ্টির বাস্তব ভিত্তি রচনা করেছেন। ফলে রাজ্য সরকার শুধুমাত্র শিক্ষক সমাজের কাছে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন তাই নয়—তাঁরা অগণিত অভিভাবককে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তবে যাঁরা সরকারের অনুদানের উপর নির্ভর না করে অনেক টাকা বেতন নিয়ে পরিচালিত স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়াতে সক্ষম ও আগ্রহী বা যাঁরা চান সরকারের যতটুকু সামর্থ্য আছে তার সিংহভাগই তাঁদের ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্যই ব্যয়িত হোক এবং অগণিত মানুষের শিক্ষা চিরদিন থাকুক অবহেলিত অথবা যাঁদের দৃষ্টি শুধুমাত্র সমাজের উচ্চকোটির মুষ্টিমেয় পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাঁরা কি করে উপলব্ধি করবেন সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত শিক্ষা ও শিক্ষাকর্মীদের মাসান্তে পূর্ণ বেতন দেওয়ার দায়িত্ব নেওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য। তাই এরা যখন গ্রামের মানুষের শিক্ষার জন্য কুম্ভীরাশ্রু ফেলেন বা মায়াকান্না শুরু করেন তখন সাধারণ মানুষের মনে কোন দাগ কাটে না।

আমাদের দেশে যেমন অগণিত লোক দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে তেমনি অসংখ্য মানুষ নিরক্ষর। দারিদ্র শিক্ষালাভের সুযোগ ভোগ করার পথে এক বিরাট বাধা। খাবার নেই, পোষাক নেই, বই, শ্লেট কেনবার পয়সা নেই এ রকম লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে কি করে লেখাপড়া শিখবে? তবে বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে এদের সবাই সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে না পারলেও অধিকাংশ ছেলেমেয়ে অন্তত পাঁচ বছরের শিক্ষা সম্পূর্ণ করবে এ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে আর কতদিন অপেক্ষা করা চলে? নিজ মাতৃভাষায় লিখতে পড়তে অক্ষম মানুষগুলি ভাব-ভাবনা ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে কত পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে এ সম্পর্কে বিশেষ ব্যাখ্যার নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন নেই। শিক্ষা-লাভের সার্বজনীন অধিকার সর্বজন স্বীকৃত। আমাদের সংবিধান শাসকদের নির্দেশ দিয়েছিল ১৯৬০ সালের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক, আবশ্যিক সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। আমাদের দেশের শাসকেরা এই নির্দেশ পালন না করে সংবিধানকে লংঘন করেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। এই অবস্থায় দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েরা যাতে অন্ততপক্ষে পাঁচ বছরের শিক্ষা শেষ করে তাদের জীবনে লাভবান হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই সরকার কতকগুলি ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে আমরা জানি। যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের টিফিন, বই-শ্লেট, খাতা, পোষাক ও উৎসাহবর্ধক ভাতা প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা। ১৯৭৭ সালে যেখানে কেবলমাত্র দেড় লক্ষ ছেলেমেয়েকে টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল বর্তমানে সেখানে ত্রিশ লক্ষ ছেলেমেয়েকে টিফিন দেওয়া হচ্ছে। যে সমস্ত ছেলেমেয়ে পোষাকের অভাবে বিদ্যালয়ে আসতে পারে না তাদের পোষাক দেওয়া এবং আদিবাসী ছেলে-মেয়েরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হলে তাদের প্রত্যেককে মাসে কুড়ি টাকা করে উৎসাহবর্ধক ভাতা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

এই সময়ের মধ্যে ৩৪০০ বিদ্যালয়হীন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, ৪০০০ নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ এবং ১৩,৮০০ নতুন প্রাথমিক শিক্ষকের পদ সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া কয়েক শত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ২৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গৃহ সম্প্রসারণ করার জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছে। প্রায় দশ হাজার নতুন মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে সরকার সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী-দের বেতনের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে নিয়মিত বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃংখলা দূর হয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। নিয়মিত পরীক্ষা হচ্ছে। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হচ্ছে। পরীক্ষা ও পড়াশোনা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিকতার উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিক্ষক মশায়রাও আগের চাইতে অনেক সুষ্ঠুভাবে তাঁদের পাঠদানের সুযোগ পাচ্ছেন। সব মিলিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে এসেছে একটা স্বস্তির ভাব। শিক্ষার সংগে সংশ্লিষ্ট সকলের ইচ্ছা এবং সক্রিয় সহযোগিতাতেই এ-কাজ সম্পন্ন হতে পেরেছে। অথচ সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকে এই সাফল্যকে মসীলিপ্ত করার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে আবার অরাজকতা সৃষ্টির অপচেষ্টা শুরু হয়েছে।

শিক্ষার সুযোগকে শিক্ষা বঞ্চিত ঘরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রসারিত করতে হলে, শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে হলে, একটি গণ-তান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করতে হলে, ন্যূনতম যে ব্যবস্থাগুলি অনেকদিন আগেই নেওয়া উচিত ছিল তা কার্যকর করার চেষ্টাই প্রকাশ পেয়েছে উপরের লিখিত কাজগুলির মধ্য দিয়ে। গণতান্ত্রিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষাকে সার্বজনীন করা। সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক, জীবনমুখী ও বাস্তবানুগ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী। রাজ্য সরকার এক্ষেত্রেও যথেষ্ট বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার সাথে এগিয়েছেন। ১৯৭৪ সালের গঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সিলেবাস কমিটি নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত অকেজো হয়ে পড়েছিল, তাকে সক্রিয় না করে ফেলে রাখা হয়েছিল। বর্তমান সরকার এই কমিটিকে সম্প্রসারিত করে সক্রিয় করে তোলেন।

শিক্ষার ব্যবস্থা ও শিক্ষা বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত বিভিন্ন মহলের প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। প্রাধান্য পান প্রাথমিক শিক্ষার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌গণ। তাঁরা দীর্ঘ দু' বছর ধরে বিভিন্ন মহলের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাঁদের মতামত গ্রহণ করেন। দেশ-বিদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার, ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে গঠিত শিক্ষাবিষয়ক কমিশন ও কমিটির সুপারিশ এবং দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদ্‌দের মতামত পর্যালোচনা করে নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী রচনা করেন। এই পাঠক্রম রচনায় শিশুর সঠিক বিকাশের প্রয়োজনের সংগে বিকাশশীল সমাজের চাহিদাকে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া সমাজের সকল অংশের ৬-১১ বছর বয়সের শিশুদের, বিশেষ করে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর শিশুদের প্রয়োজনকে স্মরণ রাখা হয়েছে। লক্ষ্য রাখা হয়েছে যাতে এই পাঠক্রম পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োগসাধ্য হয়। পাঠক্রম রচনায় সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা ও আধুনিকীকরণের নীতি যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।

এই কমিটি অন্যান্য বিভিন্ন সুপারিশের মধ্যে ভাষাশিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। তাতে বলা হয় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা অন্যান্য বিষয়ের সাথে শুধুমাত্র মাতৃ-ভাষা লিখতে পড়তে শিখবে। এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। চিরাচরিত ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাসের সাথে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার মিল না থাকায় শিক্ষিত মানুষের এক অংশের মধ্যে এর সুফল সম্পর্কে কিছু সংশয় দ্বিধা থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সব চাইতে দুঃখের ও লজ্জার কথা এই যে এক শ্রেণীর মানুষ এই সংশয়কে মূলধন করে নিকৃষ্ট ধরনের সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির খেলায় নেমেছেন। মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য একটি অপরিচিত ভাষা ভালভাবে শেখার উপযুক্ত সময় ও পূর্বশর্ত এবং অগণিত মানুষের মধ্যে শিক্ষার সুযোগকে প্রসারিত করার সহায়ক কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌, চিন্তানায়ক ও কমিশন-কমিটির বক্তব্যকে উপেক্ষা করে বা তাকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে নতুন ব্যবস্থা চালু হলে শহরের

ধনী ঘরের ছেলেমেয়েরা ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সকলকে প্রতিযোগিতায় হটিয়ে দেবে এবং দেশে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি হবে। কিন্তু সুচতুরভাবে একটি কথা গোপন রাখছেন যে, ইংরেজী মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলি নতুন চালু হয় নি। আজ যাঁরা শ্রেণীহীন শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য এত উদ্বিগ্ন কই অতীতে তাঁদের একজনকেও তো এ-বিষয়ে একটি কথাও বলতে শোনা যায় নি? ভারতবর্ষের ভয়াবহ নিরক্ষরতার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে মরণপণ সংগ্রাম তো দূরের কথা সাধারণ সভা-মিছিল করতেও আমরা দেখি নি এ'দের। কোটি কোটি মানুষ লিখতে পড়তে জানার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকলে এ'দের কিছু এসে যায় না কারণ দেশ বলতে এ'রা বোঝেন মুষ্টিমেয় মানুষকে।

বাস্তব ঘটনা প্রমাণ করে যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে যারা মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করছে তাদের অনেকেই পরীক্ষায় বেশ ভাল ফল করছে এবং উচ্চশিক্ষার স্তরেও তাদের ফলাফল বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক। এ সমস্ত ছেলেমেয়েদের কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে কোন অসুবিধে হয়েছে বলে শোনা যায় নি। তা সত্ত্বেও কোন কোন অভিভাবক মনে করেন ইংরেজীর মাধ্যমে লেখাপড়া শেখালে তাঁরা লাভবান হবেন। এ মানসিকতা ব্যক্তিবিশেষের ব্যাপার। এ মানসিকতার পিছনে নানা রকম সামাজিক অর্থনৈতিক কারণ থাকতে পারে। তবে মূল কথা হল, মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত হতে পারে না এবং বিদ্যার আত্মীকরণ মাতৃভাষায় শিক্ষা-লাভের মাধ্যমেই সম্ভব।

ভাষা শুধু ভাববিনিময়েরই মাধ্যম নয়; ভাষা চিন্তন ও মননের বাহন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহক। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জন-সমষ্টির চিন্তা ও ভাবনা, ভাব ও আবেগের প্রকাশ স্বাভাবিক-ভাবেই তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষাকে আশ্রয় করে বিকশিত ও গতিশীল হয়। মানসিক বিকল্পের ক্রমিক ধারা হল—অভিজ্ঞতা অর্জন ও ধারণ; চিন্তা ও ভাবনার মাধ্যমে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণের মাধ্যমে নবতর জ্ঞানের উন্মেষসাধন এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ। উপরে বর্ণিত প্রতিটি পর্যায়ে মাতৃভাষার ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বলা হয়ে থাকে শিক্ষার আদর্শ মাধ্যম ও বাহন হিসাবে মাতৃভাষার কোন বিকল্প নেই। বিশেষ করে শিক্ষার অধিকারকে যদি আমরা মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সর্বজনের মধ্যে প্রসারিত করতে চাই তবে শিক্ষার সর্বস্তরে প্রত্যেকের মাতৃভাষায় শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শিক্ষাকে পোষক হিসাবে না দেখে, বিদ্যারূপ শক্তি হিসাবে যদি আমরা আয়ত্ত করতে চাই তা হলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা এবং মাতৃভাষায় উন্নততর যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগসহ একটি জনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এর পর আসা যাক দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে। দ্বিতীয় একটি ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। প্রস্তাবিত ভাষাশিক্ষা পরিকল্পনায় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাজী ভাষাকে আবশ্যিক রাখা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা শেখা শুরুর পক্ষে প্রধান যুক্তি হল দ্বিতীয় ভাষা শেখা শুরুর আগে মাতৃভাষার ভিতটি দৃঢ় করে গড়ে তোলার জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট সময় ও সুযোগ দেওয়া উচিত। আখ চিবিয়ে রসাস্বাদন করতে হলে প্রস্তুতির প্রয়োজন, মাড়ি ও দাঁতকে পুষ্ট হতে কিছু সময় দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—"ভালো করে বাংলা শেখায় দ্বারাই ভালো করে ইংরেজী শেখার সহায়তা হতে পারে।" তিনি বিশ্বাস করতেন, "মাতৃভাষায় রচনায় অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তারপরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না।" ভালো করে মাতৃভাষা শেখার পর ইংরেজী বা অন্য কোন দ্বিতীয় ভাষা শেখার ব্যবস্থাপনাই যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা।

লেখাপড়া শেখার শুরুতে ছেলেমেয়েদের ইংরেজী শিখতে বাধ্য করলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ শৈশবে ভাষাশিক্ষা মূলত পরিবেশনির্ভর। শৈশবে তারা যে ভাষা লিখতে পড়তে শিখবে সে ভাষা যদি তাদের পরিবেশ ও জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত না থাকে, প্রতি মুহূর্তের সমস্যা সমাধানের জন্য সে ভাষায় ভাব বিনিময় করতে তারা যদি বাধ্য না হয়, তবে সে ভাষায় দক্ষতা অর্জন যে কোন শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। এই ব্যবস্থা মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনের পথেও বাধা সৃষ্টি করে। ফলে অধিকাংশ ছেলেমেয়েই না পারছে ভাল করে মাতৃভাষা শিখতে, না পারছে ইংরেজী শিখতে। আর এই অসাফল্য তাদের মধ্যে সৃষ্টি করছে লেখাপড়া সম্পর্কে ভীতি এবং নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে অনাস্থা। আর সাধারণভাবে গড়ে উঠছে নিজেদের সম্পর্কে হীনমন্য মানসিকতা যা শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। শিক্ষার অধিকার বহুর মধ্যে প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টির জন্যই বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী ভাষানীতির প্রবর্তন প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মাতৃভাষা শেখার উদ্দেশ্য এবং একটি দ্বিতীয় ভাষা শেখার উদ্দেশ্য কখনই এক নয়। দ্বিতীয় ভাষা প্রধানত শেখান হয় সহযোগী ভাষা হিসাবে। ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনের এবং গ্রন্থাগারের ভাষা হিসাবে ইংরেজী আমাদের ছেলেমেয়েরা শিখবে যাতে প্রয়োজনে যথাযথভাবে এই ভাষাকে তারা ব্যবহার করতে পারে।

মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনের পর, বয়সের অপেক্ষাকৃত পরিণত অবস্থায় দ্বিতীয় ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা নিয়ে দ্বিতীয় ভাষা শেখা শুরু করে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী শিখলে ছেলেমেয়েরা দুটি ভাষাই ভাল শিখবে এবং বহু ছেলেমেয়েই লেখাপড়ায় আগ্রহী হবে। সামগ্রিক-ভাবে শিক্ষার প্রসার ও উন্নতিতে সাহায্য করবে। এর সপক্ষে অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যায়।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল দৈহিক, মানসিক ও আবেগ-অনুভূতির সুষম বিকাশ সাধনে সাহায্য করা। শিক্ষা মানুষের কর্মশক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতাকে উন্নত করে এবং সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শিক্ষার এই লক্ষ্য ও ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। এই সাধারণ নীতিকে রূপদান করাই ছিল আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু বিগত ত্রিশ বছরে অনেক স্কুল কলেজ তৈরী হলেও, শিক্ষা-কাঠামোর অনেক রকম অদল-বদল হলেও শিক্ষাকে জীবনমুখী ও জনমুখী করার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল তা করা হয় নি। বর্তমানে সেদিকেই কিছু কিছু চেষ্টা চলছে। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির নববিন্যাস করা হয়েছে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে। যদি সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলের সমর্থন ও সহযোগিতা এই কর্মসূচি রূপায়ণে সংগঠিত করা যায় তবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা জগতে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে—জনশিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

শিক্ষার বারোটা, না, প্রত্যুষ?

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস

প্রধান, আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রঙ্গমঞ্চে যুক্তিহীন রাজনীতিবাজির যে ক'টি কুৎসিত দৃশ্য সৎ ও নিরপেক্ষ সাধারণ মানুষের চোখে পড়েছে এবং দেশের ভবিষ্যৎ বিষয়ে তাদের হতাশ ও আতঙ্কিত করে তুলেছে তার মধ্যে কলকাতার রাস্তায় সম্প্রতি অভিনীত বৃদ্ধ নট-নটীদের আচরণ অন্যতম। গত তিরিশ বছর ধরে দেশে শিক্ষার কি গতি হচ্ছে, রাশি রাশি ছাত্র-ছাত্রী ফেল করছে কেন, উচ্চমানের মেধার সৃষ্টি হচ্ছে না কেন, শিক্ষকেরা পড়াচ্ছেন না বা ছাত্রেরা পড়ছে না কেন, সিলেবাসে ত্রুটি কোথায় হচ্ছে—এ-সব বিষয়ে যাদের কিছুমাত্র ঔৎসুক্য ছিল না তারা আজ হঠাৎ কোঁচাকাছা গুঁজে রাস্তায় নেমে মারমুখী হয়ে স্লোগান দিতে লাগলেন, শেষে বিনম্র পুলিশী আতিথ্যে অভিষিক্ত হয়ে ঘরে ফিরে বৈঠকখানায় বসে প্রচুর বাহবা অর্জন করলেন, এ একটা দেখার মত দৃশ্য বটে! এখনকার ভারতমাতার প্রিয় সন্তানদের কি এমন হল, যাতে পথের ধুলো পায়ে লাগার অপরিসীম দুঃখ সহ্য করতে হল, সেই আগেকার দিনের শহীদদের অভিনয়ও করতে হল নোতুন চালে, আরও বুক ফুলিয়ে। খুচরো কোনো খবর নেই, কোথায় কতটুকু তুলে দেওয়া হচ্ছে, কি কারণে হচ্ছে, তাতে আখেরে ক্ষতি না লাভেরই সম্ভাবনা, যথার্থ স্বাধীন অবস্থায় শিক্ষার পরিস্থিতি কি হওয়া উচিত, আগেকার সরকারের উদ্যোগ কি ছিল এ-সব খতিয়ে না দেখে কেবল রব হচ্ছে গেল, গেল। তুলে দিলে, ইংরিজি বাংলা সব তুলে দিলে। আমাদের ছেলেদের কাস্তে হাতুড়ি পেটাইয়ের দলে নিয়ে যাচ্ছে। রক্ষে চাই। এ জমানার বদল চাই। ফলে শিক্ষিত অথচ দলমত-নিরপেক্ষ মানুষ সন্দেহ করছে বুঝি বা শেষ কথাটাই আসল কথা, একটা ইস্যু খাড়া করে লাগাতার আন্দোলন করে বর্তমান সরকারকে খতম করো।

দলবাজি রাজনীতিতে যে যাকে পারে খতম করতে থাকুক, আর আমরাও মাথায় হাত চাপড়াতে চাপড়াতে হাজার বছর পরেকার স্বপ্ন দেখে ইহলীলা সাঙ্গ করতে থাকি, ইতিমধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন্ কোন্ সংস্কার করলেন, তার আবশ্যকতা কি পরিমাণ ছিল, আর তার ফলাফলই বা কি হতে পারে সে সব বিষয় একবার চিন্তা করে নেওয়া যেতে পারে। ব্যাপারটি আনুপূর্বিক অনুসরণ করা যাক।

১৯৭৯ খ্রীঃ থেকে মাধ্যমিকে সংস্কৃত বিকল্প বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হল। এই বিবেচনায় বিকল্প করা হল যে, এক সঙ্গে তিনটি ভাষা আবশ্যিকভাবে শিখতে গিয়ে ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা মনোযোগ দিতে পারছে না, ইংরেজি এমন কি মাতৃভাষাতেও ফেলের সংখ্যা বাড়ছে। সংস্কৃতে নাগরী হরফ, শেয়াল গাধার গল্প, বাস্তব থেকে দূরবর্তী পৌরাণিক কাহিনী, গুরু-ব্রহ্মার স্তব স্তোত্র, এমন কি মনুর হাঁচি থেকে ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়—এ রকম আজগুবি ব্যাপার এমনই সন্ধি-সমাস লুঙ্-লিট্ কর্মবাচ্য-ভাববাচ্য প্রভৃতি সহযোগে কণ্টকিত করে পরিবেশন করা হত আর ছাত্র-ছাত্রীরা তা নিয়ে এমন কসরৎ করত যে বাবা-জেঠাদের স্বীকার না করে উপায় ছিল না যে শ্রীমান্ ইস্কুলে খুব বিদ্যা অর্জন করছে। সংস্কৃতের প্রারম্ভিক পাঠে অক্ষর-পরিচয়ের পরেই গৌঃ গচ্ছতি না দিয়ে পণ্ডিতমশায় দিলেন গৌর্গচ্ছতি। ঐ রকম আর একটি পাঠ দিয়েই যোজনা করলেন গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ ইত্যাদি। সন্ধিসহ উচ্চারণ যদি বা চড় মেরে মেরে অধিগত করানো হল, ব্রহ্মা মহেশ্বর তত্ত্বে একেবারে ধরাশায়ী করে দেওয়া হল। যেন ছাত্রকে যত ধরাশায়ী করা যায় এবং পৌরাণিক যুগে নিয়ে যাওয়া যায় ততই শিক্ষার উৎকর্ষ! ব্যক্তিগতভাবে আমি সংস্কৃত-ঘেঁষা ছাত্র, সংস্কৃত ভালো জানি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে করি, ঐ রকম কটুকাটব্য আর অবাস্তব বিষয়ের সন্নিবেশ করে পণ্ডিতমশায়েরা যতই দেবভাষার মাহাত্ম্য দেখান না কেন, ছাত্রদের কাছ থেকে তা ততই দূরে সরে গেছে। আমার মনে পড়ে, আমার এক পুত্র বছর আষ্টেক আগে এগারো শ্রেণীতে সংস্কৃত পড়ত। একদিন আমার কাছে একটি ছোট পাঠ বুঝে নিতে এল। পড়ে দেখি, কি সাংঘাতিক! সন্ধি সমাস-কণ্টকিত একটি মাত্র শব্দ দু' লাইন ধরে চলেছে, বাক্যটি শেষ হচ্ছে ঐ রকম লাইনের চার লাইনে। গুরুতর জটিল বাক্য। এ নিজে যদিও বুঝলাম, কর্মবাচ্যের গঠনে নিয়ন্ত্রিত বাক্যটি পুত্রকে কোনো মতেই অধিগত করাতে পারলাম না। মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে জিজ্ঞাসা করলে পর্ষদ নিশ্চয়ই বলত, আমরা কি করব, বাছাই করা অধ্যাপকেরা পাঠ প্রস্তুত করে থাকেন। ঠিক কথা, কিন্তু তাহলে দেখা যাচ্ছে সংস্কৃতের পণ্ডিতমশায়দের শিক্ষায় মনোযোগ নেই, আছে সংস্কৃতের মহিমা প্রদর্শনে। অথবা, এমনই কি সত্য হবে যে পাঠ যত শক্ত করা হবে, ততই নোটবই বিক্রীর সুবিধা হবে? সংস্কৃতের এই জোরকরা কৃত্রিম কটুকাটব্যের বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মন্তব্য শুনুন—"বাপরে, সে কি ধুম! দশ পাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে—'রাজা আসীৎ'!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ও-সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল!" আমাদের দেশে সংস্কৃত শেখার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমার কোনো দ্বিমত নেই। আমি মনে করি কালিদাস ভবভূতি জয়দেবের সাহিত্য অমূল্য সম্পদ, সংস্কৃতে নিবন্ধ ন্যায়-বেদান্ত দর্শনের তুলনা নেই। উপনিষদ্ আমাদের গৌরব, ভাষা-বৈজ্ঞানিক হিসেবে পাণিনির তুলনা পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু সে সব জায়গায় তো ঐ রকম প্যাঁচ-দেওয়া ভাষা নেই। প্যাঁচের সৃষ্টি করেছেন টীকা-টীপ্পনীকারেরা, অর্থাৎ নোট-মেকারেরা, আর তাকেই যথাযথ বলে মেনে নিয়ে পণ্ডিতমশায়েরা, যাঁদের মৌলিক কিছু বলার ক্ষমতাই নেই তাঁরা শিশুদের সামনে ঐ রীতির পাঠ বিন্যাস করে খুবই গর্ব অনুভব করেছেন।

আমি তো মনে করি, সংস্কৃত বিকল্প হওয়ার কারণ, পণ্ডিত-মশায়েরা নিজে। তাঁরা যে শাখা নির্ভর করে আছেন, অনর্থক জটিলতা সৃষ্টি করে এবং অবাস্তব কাহিনী পরিবেশন করে তাঁরা সেই শাখা ছেদন করেছেন। সংস্কৃতকে আগেই বিদায় দিয়েছেন, সরকার এবং পর্ষদ উপলক্ষ্যমাত্র। প্রচলিত আধুনিক সাহিত্যে ছাত্র-দের কাছে পরিবেশনযোগ্য গল্পের অভাব নেই। তার অনুবাদের মত কিছু করে দিলে কি সংগত হত না? তাঁরা ইচ্ছে করলে মনোজ্ঞ সংস্কৃত শ্লোকও দু-চারটে রচনা করতে পারেন। সে দুঃখের কথা তুলে আর লাভ নেই। কিন্তু তবু সরকার ও পর্ষদকে এজন্য ধন্যবাদই দিতে হয় যে সংস্কৃত পড়তে যারা ইচ্ছুক সে সব ছাত্র-

ছাত্রীদের জন্য বাধার সৃষ্টি করা হয় নি। তা ছাড়া ওদিকে টোলেও সংস্কৃত শেখা যায় এবং উপাধিও পাওয়া যায়। যাঁরা অনার্স এবং এম.এ.তে সংস্কৃত নিতে চায় তাঁরা নিক। কিন্তু ঐ রকম সংস্কৃতকে আবশ্যিক বিহিত করে শতকরা নব্বই জন ছাত্র-ছাত্রীকে অনর্থক ভারগ্রস্ত করার কোনো অর্থই হয় না। আর এতে করে দেশ থেকে এবং উচ্চতর শিক্ষা থেকে সংস্কৃত উঠে যাওয়ার মত কিছুই হল না। কেবল এইটুকু হল যে সংস্কৃত আবশ্যিক থাকলে বই লিখে, নোট লিখে, পরীক্ষার কাজ করে যাঁরা কিছু অর্থ পেতেন তাঁদের একটু কষ্ট হল। পরিবর্তে ছাত্র-ছাত্রীদের তিন-চারটে ভাষা শিখে সময় ও শক্তি ব্যয় করে গোমূর্খ হয়ে থাকতে হল না।

সরকারের অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়-প্রযুক্ত দ্বিতীয় সংস্কার হল স্নাতক পরীক্ষায় ইংরেজি ও বাঙ্‌লাকে আবশ্যিকতা থেকে প্রায় অপসারিত করা। বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন-ক্রমে হায়ার সেকেন্ডারির পর ইংরেজি বাঙ্‌লা আবশ্যিকভাবে শেখার আর প্রয়োজনীয়তা নেই এটি প্রথমে স্থির হয়। কিন্তু বাইরে এই নিয়ে আন্দোলন চলতে থাকলে পর সরকার থেকে একটা মাঝামাঝি নীতি নেওয়া হয়। ঠিক হয় এক একটা পত্র অতিরিক্ত অথচ আবশ্যিক হিসেবে থাকবে, কেবল ভাষাটা ব্যবহার করার ক্ষমতা পরীক্ষিত হবে আর পাস করা যাবে শতকরা কুড়ি নম্বর পেলেই। এইভাবে বি-এ, বি-এস-সি'তে ভাষা শেখার গুরুত্ব যতদূর পারা যায় কমানো হয়েছে, আর সেই সঙ্গে ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি ভালোভাবে আয়ত্ত করার পথ পরিষ্কার করা হয়েছে। বস্তুতঃ আগাগোড়া কেবল ভাষা-সাহিত্য শেখানোর জন্য আমাদের দেশে যে ধরনের ব্যাপক আয়োজন ছিল অন্য কোথাও তা নেই। এখন অন্যান্য বিষয় অধিগত করার বেশি শক্তি পাওয়া যাবে। অথচ, এই ব্যবস্থায় বাঙ্‌লা ও ইংরাজির বিশেষ শিক্ষার আয়োজন রোধ করা হয় নি। যারা অনার্স ও এম-এ'তে ইংরাজি কি বাঙ্‌লা নিতে চায় তাদের পথ রইল মুক্ত।

ইংরাজি ও বাঙ্‌লাকে আধা অপসারিত করার পেছনে যুক্তি কি? প্রথমত মাতৃভাষার কথা। ধরা যেতে পারে মাতৃভাষার শিক্ষা চলেছে ছ' বৎসর থেকে সতেরো-আঠারো বৎসর পর্যন্ত। এগারো-বারো বৎসরের মাতৃভাষা-প্রশিক্ষণ ভাষা ও সাহিত্যে সাধারণ অধিকার লাভের বিষয়ে একটা সুস্থমনের ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে পর্যাপ্ত হওয়া উচিত। এতে করে বলায়, লেখায় ও সাহিত্যের বই পড়ে বোঝার ব্যাপারে তাদের কোনো অসুবিধার কথা নয়। যাদের আরও গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন তারা অনার্স পড়ুক। সাহিত্য-সমালোচনা, তত্ত্ব-বিচার প্রভৃতি অনার্স নিয়ে আয়ত্ত করতে শিখুক। যাঁরা মনে করেন, বাঙ্‌লায় বি-এ পাস ছেলেমেয়েরা কিছু সাহিত্য না পড়লে তাদের চিত্তদৈন্য থেকে যাবে, তাঁদের এই কথা বলা যায় যে বয়সে সাবালক হবার পর ইচ্ছে থাকলেই চিত্তদৈন্য নিবৃত্তি করা যায়, দেশে নাটক উপন্যাস কাব্য-কবিতার তো অভাব নেই, তা ছাড়া রেডিও সিনেমা আছে, যাত্রাগান আছে। মধ্যযুগে তো বাঙ্‌লা শেখানোর কোনো স্কুলই ছিল না। এত সাহিত্য ও সাহিত্যিক জন্মাল কি করে? সাহিত্যের ব্যাপার কাউকে গিলিয়ে শিখিয়ে দেওয়া যায় না। ও যার হয়, অল্পসল্প শেখার পর আপনা থেকেই হয়। অনার্স পড়েও শুধু তত্ত্ব সমালোচনা শেখা যায়। তা শিখে যে সব ছাত্র-ছাত্রী বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে চায়, গবেষণা করতে চায়, অধ্যাপনা করতে চায় ভবিষ্যতে তাদের পথ তো খোলাই থাকছে। আমার তো মনে হয় যাঁরা বি-এ'তে বাঙ্‌লার গুরুভার অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার্থীর উপর চাপাতে চান তাঁরা বিশেষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাধাই সৃষ্টি করতে চান। নতুবা কিছু নোটবই তৈরি করা যেত, কিছু পরীক্ষার টাকা হাতে আসত—এ-সবের জন্যেই আগ্রহ প্রকাশ করতে চান। এই প্রসঙ্গে কেউ হয়ত বলছেন যে ইস্কুলগুলোতে তেমন কিছু পড়াশুনো হয় না বলেই বি-এ'তে মাতৃভাষার সাধারণ শিক্ষার আয়োজন থাকা ভালো, তাঁদের এ রকম যুক্তি অসার। হয়ত আজ হচ্ছে না, কাল হবে। তা ছাড়া সর্বত্রই কি পড়াশুনো হয় না? নানা কারণে ছাত্রেরা যদি আশি বৎসরে সাবালক হব এই মনে করে তাহলে ততদিন পর্যন্ত কি তাদের জন্য শিক্ষালয় খোলা রাখতে হবে? বিজ্ঞান-পড়া ছাত্রদের জন্য অবশ্য মাতৃভাষার সঙ্গে পরিচিতি রাখার জন্য একটি পত্র রাখা প্রয়োজন এবং তা বিহিত হয়েছেও। কারণ, ভাবী জীবনের কাজেকর্মে বিজ্ঞানের বিষয় ছাত্রদের মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করতে হবে। আর বি-এ'র ছাত্রদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থার তেমন প্রয়োজন নেই, কারণ, ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় তারা তো বাঙ্‌লাতেই পড়তে অভ্যস্ত হচ্ছে। বি-এ'র জন্য ভাষাশিক্ষার যে পত্রটি মাতৃভাষায় বিহিত হয়েছে, তা উচ্চমান মাধ্যমিক থেকে কোনো অংশে পৃথক নয়। পিষ্টপেষণে কাজ কি? ওটি তুলে দেওয়াই উচিত।

এবার ইংরেজি। এ বিষয়ে প্রথমেই ভেবে নেওয়া প্রয়োজন যে, ইংরেজি কেন শিখব। এর সুনিশ্চিত উত্তর এই যে, ভারতবর্ষ বহুভাষী দেশ। এর অফিসের কাজকর্ম এখনও বহুদিন ইংরেজিতেই চলবে, এজন্য ইংরেজি কোনো প্রকারে রাখতেই হবে। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক প্রয়োজন তো আছেই। কিন্তু তার জন্য আবশ্যিক দু' তিনটি পত্রে বিন্যস্ত শেক্‌স্‌পীয়র-মিলটন কার্লাইল-রাস্কিন পড়ার কোনো প্রয়োজন আছে কি? সাধারণ বুদ্ধি-বিচার বলবে, না, তা নেই। ভাষাশিক্ষার একটা পত্র হলেই চলবে, কিন্তু তারও তো প্রয়োজন নেই, কারণ, মাধ্যমিকের ছ' বছরে ভাষাশিক্ষা তো সাধারণভাবে হয়ে যাওয়ার কথা। মাধ্যমিকে ভালোভাবে হচ্ছে না বলে বি-এ'তে রাখতে হবে, এ ছেলেমানুষি আবদার। অনেকে মনে করেন ইংরেজি সাহিত্যে মূল্যবান সম্পদ রয়েছে, সাহিত্যিক বিষয় না পড়ালে ইংরেজির সম্পদ থেকে আমরা বঞ্চিত হব, এই সম্পদের অধিকার থেকেই তো আজকের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি। এ রকম যুক্তির উত্তরে এই বলা যায় যে, সে সমৃদ্ধি আমরা অর্জন করে ফেলেছি, নোতুন করে অর্জন করার আর কি আছে? তা ছাড়া ইংরেজি সহ অন্যান্য বিদেশী ভাষার স্মরণীয় লেখা যা-কিছু তা অনূদিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। বাঙ্‌লা ভাষার যে এত সম্পদ তা জানতে বুঝতে ইংরেজদের যদি স্কুল-কলেজে বাঙ্‌লা শেখার দরকার না হয়, আমাদেরই বা কেন হবে। আসলে বিদেশী ভাষা যদি শিখতে হয়, প্রয়োজনের জন্যই শিখতে হবে, এই নীতি সর্বত্র। তার বেশি কোনো দাবি বিদেশী ভাষার ক্ষেত্রে কোথাও নেই, এখানেও থাকা উচিত নয়। ইংরেজরা আমাদের থেকে ভালো, অতএব সর্বাংশে তার অনুকরণ করাই দরকার, এ রকম কথা বনিয়াদি দাসত্বের। আজও কি তা চলবে? ইংরেজি আরও আরও জানা হয়ত সেই মুষ্টিমেয় কতিপয়েরই প্রয়োজন যাঁরা বাল্যকাল থেকে সন্তানদের বিলেত পাঠাবার জন্য তৈরি করতে থাকেন। পাঠান তাঁরা, কিন্তু তার জন্য শতকরা আটানব্বইকে সে বিষম শিক্ষা নিতে বাধ্য করানো কেন হবে। আমরা জানি এ পরিবর্তনে দেশের সাধারণ মানুষ ও ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দিতই হয়েছে। কতিপয় ধনমানমদান্বিত ব্যক্তিই অসুখী হয়েছে আর কলকাতায় যে সব আন্দোলন হচ্ছে তার অনেকটাই রাজনৈতিক। বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করাই আসল অভিপ্রায়। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাক না থাক, কিন্তু অযৌক্তিক মিথ্যাচারের দ্বারা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সংস্কার রুদ্ধ করে তা যদি করা হয় তাহলে নিজের পায়েই কুঠারাঘাত হয় না কি? আমি সৎ ছাত্রদের এ রকম আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত হবার অনুরোধ জানাই।

পরিশেষে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিক্ষণ বিষয়ের পুনর্বিন্যাস,

মাতৃভাষা শিক্ষায় বই হিসেবে 'সহজ পাঠে'র স্থানে বিশেষজ্ঞ কমিটির স্বারা নির্মিত নোতুন রীডারে প্রচলনের উদ্‌যোগ এবং ইংরেজিকে প্রাথমিক স্তর থেকে সরিয়ে নিয়ে মাধ্যমিকে সন্নিবেশ, এই দুটি বিষয় নিয়ে হৈ-চৈ খুবই হল। এমন কি কারাবরণেরও অভিনয় হল। যেহেতু বোধ হয় সি-পি-এম মন্ত্রীর উদ্‌যোগেই বিশেষভাবে এই সংস্কার দুটি করা হয়েছে বলে। এ বিষয়ে আমাদের পক্ষপাতহীন বিচার জানাচ্ছি, যাতে যুবসমাজ বিভ্রান্ত না হয়।

প্রথমত 'সহজ পাঠ'। এটি শিক্ষাবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে লিখিত পুস্তক নয়। এতে বানান শেখানো, লেখানো আঁকানোর কোনো আয়োজন নেই। এর ছবিগুলি পাঠের সঙ্গে মেলে না, তা ছাড়া বড় বেশি সাংকেতিক। এর পাঠগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে সাজানোও নয়। এতে কবিত্ব ও কাল্পনিকতার পরিসর বেশি, বাস্তব-জ্ঞান-সংসর্গ প্রত্যাশিত পরিমাণে নেই। ইত্যাদি আরও কিছু। এমন অবস্থায় একটি ভালো পাঠ্যপুস্তক খুবই প্রয়োজন ছিল। সে উদ্‌যোগ আগেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যের ব্যাপার কি ঐ একটা? এখন যে-হেতু হচ্ছে আর শ্রেণীবিশেষের কাছে সবচেয়ে ভীতিপ্রদ সি-পি-এম মন্ত্রীর হাতেই হচ্ছে, অতএব কোমর বাঁধো, লাগাও আন্দোলন। কেন 'সহজ পাঠ' বদলানোর দরকার। নতুন রীডারে কি কি পাঠ কিভাবে থাকছে তা জানারও প্রয়োজন নাই, সারস্বত বিচারেরও দরকার নাই—প্রচার করা হল যে, এইবার শ্রেণীসংগ্রাম শেখানোর আয়োজন হচ্ছে, ওঠো জাগো সব স্বজন ভাইয়েরা, হাতিয়ারে শান দাও। শিক্ষার ব্যাপার যেহেতু, সেইহেতু সামনে লাগাও কিছু জরাগ্রস্ত বাছাই করা রক্ষণশীল মুনিঋষি। কাগজগুলো তাদের বাহবা দিতে থাকুক। হরিধ্বনি দিয়ে সি-পি-এম'এর কুশপুত্তলিকা পোড়াও। বলা বাহুল্য, কলকাতায় এসব নোংরামিতে মফস্বলের মানুষের কিছুই আসে যায় নি, তারা বরং সত্যটাকে ধরেছে বলেই মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই ভাবছে, কলকাত্তাই বাবুরা জমিয়েছে খুব—! সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, যে সব তথাকথিত পণ্ডিতেরা প্রাথমিক শিক্ষার কিছুই জানেন না, বা খবর রাখেন না তাঁরাই আন্দোলনে বিশেষভাবে নেমে পড়েছেন।

দেশ এখন স্পষ্ট দুটো শ্রেণীতে ভাগ হয়ে পড়েছে। এক শ্রেণী মুষ্টিমেয় এবং প্রচণ্ড সুবিধাবাদী অর্থাৎ শ্রেণীস্বার্থপরায়ণ। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাটে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের রূপ নিয়ে এটা প্রকাশ পাচ্ছে। "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ"ও প্রায় তাই, তবে এখানে অর্থনীতিক শ্রেণী-পার্থক্যের রূপেই বেশি। আর যেহেতু অর্থনৈতিক সুবিধাটা উচ্চবর্ণেরই ভোগে, সেইহেতু বিষয়টাকে ঐভাবে দেখা যেতে পারে। যাই হোক, এই সুবিধাভোগীর দল ইংরেজ আমলে খয়ের-খাঁ হয়ে কাজ গুছিয়ে নিয়েছেন। জমিদারি করেছেন, অন্ততঃ জোতদারি অথবা উঁচুপদের টাই-বাঁধা অফিসার। এদের স্বভাব এই যে, যে-যে কারণে যা-যা উপভোগ করেছি, আজও সেই সেই কারণ দেশে থাকা দরকার। যে-যে উপায়ে জনসমাজের উপর টেক্কা দিয়ে থেকেছি, আজও সেই-সেই উপায় অটুট থাকার দরকার। কিন্তু অগণিত রামা-শ্যামা পরাণ মোড়লের কি হবে? তার উত্তর—ওরা ঐভাবেই বাঁচবে, যা তাদের ভাগ্য! কেন্দ্রে এবং রাজ্যে পার্টিগত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকায় বর্তমানে কেন্দ্রই ওদের পরম আশ্বাস ও আশ্রয়ের স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যবসায়ীর দিকে পক্ষপাতী কেন্দ্র এদের রক্ষার আশ্বাসও দিচ্ছে।

প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি সরিয়ে দেওয়ার জন্য এ'রাই আহত বোধ করছেন বেশি। ইংরেজিকে মাতৃভাষার সমান অধিকার দিতে হবে, মাতৃভাষার মত একেবারে কচিবয়স থেকে শেখাতে হবে এই তাঁদের দাবি। ধরা যাক, এ'রা যেহেতু ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতে বিলেত পাঠাবেন তার জন্যে ইংরেজিটাকেই প্রথম ভাষার মত করে শেখানো এ'দের দরকার। কিন্তু যারা বিলেতের স্বপ্ন দেখে না, সর্বগ্রাসী ইন্ডাস্ট্রির শরিক হবারও কোনো আশা যাদের নেই তারা কেন ইংরেজিটাকে মাতৃভাষার মত জোর দিয়ে শিখতে যাবে? কিন্তু সে কথা নয়, আমাদের শ্রেণীস্বার্থটাই কায়েমি রাখা হোক, তার গায়ে হাত দেওয়া চলবে না। বামফ্রন্ট থাক না থাক, এরকম জবরদস্তি কোন বিবেকী সরকার সহ্য করতে পারে?

এ'রা সাহেব ব'নে থাকতে চান, অন্তত দেশী সাহেব, কিন্তু জিজ্ঞাসা করা যায়, এ'রা কতদূর শুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ করতে ও লিখতে পারেন? এ'রা কি কাল্‌চারের দিক থেকে চিরকাল ইংরেজদের ঘৃণিত নন? সাম্রাজ্যবাদের ধারাবাহী ধনতন্ত্রের চরিত্র-হীন দাসত্ব করার জন্য এ'রা কি উদ্‌যোগী নন? এ'রা বা এ'দের নিয়োজিত তথাকথিত পণ্ডিতেরা যখন ঘন ঘন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, গীতার বাণী উচ্চারণ করতে থাকেন তখন এগুলো চাপা দেন কেন, যে খাস গীতাতেই মানুষের শোষকদের, অন্যায়ের স্বারা যারা অর্থসঞ্চয় এবং ভোগ করতে চায়, তাদের বারংবার অসুর, পিশাচ বলা হয়েছে এবং তাদের পৃথিবী থেকে উৎসাদন কামনা করা হয়েছে? ইংরেজিকে প্রাথমিক থেকে সরিয়ে দেওয়ায় যাঁরা কেন্দ্রের কাছে ধরনা দিচ্ছেন তাঁরা কি জানেন না যে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র, হরিয়ানাতে আগেই ইংরেজিকে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? বিদেশী ভাষাকে আর কোন্ লজ্জায়, কোন্ ছেলেমানুষি আবদারে মাতৃভাষার সমান করা হতে পারে? আর যারা মাতৃভাষাই ভালো করে বলতে কইতে শিখলে না তারা বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করতে থাকুক এটা কী ধরনের বিবেকহীন চরিত্রের পরিচয়? কোন্ যুক্তিতে রাষ্ট্র প'চানব্বই আটানব্বইকে বাদ দিয়ে দুজনের দিকে পক্ষপাত দেখাবে? অতএব যা হচ্ছে ঠিকই হচ্ছে। আরও সংস্কারের ও জন-উন্নয়নের প্রয়োজন ছিল, তা হচ্ছে না ব'লে বরং আমরা রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছি।

ইংরেজি সরানোর বিরুদ্ধে আনীত দুটি ব্যাপারের যৌক্তিকতা আংশিকভাবে স্বীকার করা যায়। একটি হ'ল রাজ্যের সরকারি কাজে, অর্ডারে, চিঠিতে ও ফাইলে ইংরেজির এখনও অনুসরণ। আর দ্বিতীয়টি হ'ল ইংরেজি-মিডিয়মের স্কুল পাশাপাশি চলতে থাকা। এর প্রথমটি সম্পর্কে বলা যেতে পারে রাজ্য সরকারের উচিত সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ত্বরান্বিত করা। ইংরেজির অনুবাদ ক'রে চিঠি লেখানোতে নয়, চিঠি বা অর্ডারের যা বক্তব্য, অনুবাদের মধ্যে না গিয়ে স্বচ্ছন্দে সহজে তা নিজ বুঝমত নিজ ভাষায় প্রকাশ করা। সরকারের এ সমালোচনায় তেমন কোনো জবাব নেই। ইংরেজি-মিডিয়াম বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, সরকারের অভিপ্রেত না হলেও কেন্দ্রের সমর্থন ব্যতীত রাজ্য সরকার ওগুলিকে তুলতে পারছেন না। তাঁরা আইন দেখাবেন। তবে বলা যায়, ধীরে ধীরে ওগুলিকে ওঠানোর ব্যবস্থায় এবার উদ্‌যোগী হওয়া দরকার।

পরিশেষে উগ্রস্বার্থপরায়ণদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাই—এ ধরনের আন্দোলনে দেশটাকে পরিস্ফুট দুটো ভাগে বিভক্ত করবেন না। এতে আপনাদেরও কল্যাণের আশা নেই।

জীবনমুখী শিক্ষা ও ভাষানীতি

মৃণালিনী দাশগুপ্তা

অধ্যক্ষা, বেলতলা নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা

গত কয়েকমাস ধরে খবরের কাগজে, পথে ঘাটে, এসপ্ল্যানেডে, মহাকরণের সামনে দেওয়াল লিখনে,—এককথায় এই মহানগরীর বুকে সর্বত্র, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, যা নাকি সাধারণ ঘরের ৬ থেকে ১১ বছরের শিশুদের জন্য শিক্ষার বিষয়, তাই নিয়ে প্রচণ্ডরকমভাবে এক আলোড়নের ঢেউ পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেন এই আলোড়ন, কেন এই 'শিক্ষা গেল' 'শিক্ষা গেল রব',—এ এক বিস্ময়ের ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, ডাক্তারী বা ইঞ্জিনীয়ারিং মহাবিদ্যালয়, বা কারিগরী বিদ্যালয় নয়, এমন কি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যাপারও নয়, ব্যাপারটি হল শুধুমাত্র প্রথম পাঁচটি শ্রেণীর শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপার, শিক্ষার প্রথম পাঁচ বছর দেশের সাধারণ পরিবারের শিশুরা কি শিখবে, কি জানবে, কিভাবে জানবে এই সব বিষয়—এককথায় শিশুশিক্ষার শিক্ষাক্রম। এও তো এক অবাক কাণ্ড, এই অতি সাধারণ ব্যাপারটি নিয়ে সুধীসজ্জন, বিদ্বদ্‌জন, খ্যাতনামা জ্ঞানীজন, বিদুষী মহিলা সকলে এত চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন? কেউ বা অতিবৃদ্ধ বয়সেও দূরদর্শনে প্রকাশ হলেন, কেউ প্রকাশ হলেন মহানগরীর রাজপথের ওপর আন্দোলনের চেয়ারে উপবিষ্ট হয়ে, কেউ সভামঞ্চে, কেউ প্রকাশিত দৈনিক পত্রপত্রিকায়, কেউ কেঁদে ফেললেন রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠের জন্য, কেউ বা ইংরাজী ভাষা আর শেখা হবে না বলে শোকে মুহ্যমান। তাঁদের ঠাণ্ডা করার জন্য যতই বলা হচ্ছে না না রবীন্দ্রনাথ কখনও তাঁর মহান আসন থেকে নামতে পারেন না, তাঁর মহামানবতা আপনাদের মতন ঠুনকো নয়। আর ইংরাজীর জন্য কেন দুঃখ—ডন বসকো, লা মার্টিনীয়ার, সাউথ পয়েন্ট, পাঠভবন, গোখেল, সেন্ট লরেন্স এ'রা হয়তো আরও ২/৪টি সেকশন আপনাদের জন্য বাড়িয়ে দিতে পারেন—খুব বেশী মাহিনার সেকশন, একটু বেশী মাহিনার সেকশন এরকম নানা ব্যবস্থা হতে পারে। এসব বোঝাবার পরেও তাঁরা শান্ত হচ্ছেন না—বলছেন, না না আমরা চোখের জল ফেলছি দরিদ্র কৃষক শ্রমিক ঘরের অবোধ শিশুরা ইংরাজি শিখতে পাবে না, বড় চাকরী করতে পাবে না, বিদেশে যেতে পারবে না যে ইংরাজী না শিখলে। এই উত্তরটা কেমন গোলমেলে ঠেকছে। তারা তো মোটেই কিছু শেখে না, তাদের তো না আছে বাসস্থান, না আছে খাদ্য, না আছে বস্ত্র। তারা তো শুদ্ধ মাতৃভাষাই ভাল জানে না বোঝে না, বোঝাতেও পারে না, মাতৃভাষা লিখতেও পারে না, পড়তেও পারে না। এরা ইংরাজী শিখল না শিখল আপনাদের কি যায় আসে? আর সারা দেশে নাম সই মাত্র করতে পারে ৩০ ভাগ মানুষ, আবার মেয়েদের মধ্যে মাত্র ২২ ভাগ পারে। এই ৩০ ভাগের মধ্যে হয়তো ১৫ জন মাত্র কিছু পড়ে বুঝতে ও বোঝাতে পারে বা লিখতে পারে। এই কারণে আপনারাই বা এত বিচলিত কেন তা বোঝা যাচ্ছে না। বোঝা যাবে কি করে, ব্যাপারটা তো খুব সহজ নয় কেন কিছু বুদ্ধিজীবী মানুষ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে এত চিন্তিত। তবে এই যে শিক্ষাক্রমটি রচিত হল বর্তমানে তার গোড়ার খবর থেকে শুরু করে ভবিষ্যতে কি হতে পারে এ কথা ভাবলে দেখা যাবে সত্যিই যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর জোরে ক্ষমতাসীন হয়ে আছেন এবং যাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধররাও থাকবেন আশা রাখেন তাঁদের কাছে নূতন শিক্ষাক্রম সত্যিই ভাবনার বিষয়। ভাবনা কেন? ভাবনা এই কারণে যে শিক্ষাক্রমটি নূতন রচিত হল বামফ্রন্ট সরকারের হাতে, সেটিতে আছে জীবনমুখী শিক্ষার স্বাক্ষর, আর আছে সর্বজনের নিকট আকর্ষণীয় একটি ধারাবাহিক পাঠ, মননশীলতা, চিন্তাগামিনতা, আবেগ ও সৌন্দর্যানুভূতিপূর্ণ এক জীবন বিকাশের ইঙ্গিত। সর্বজনের নিকট যদি এই জীবনের মূল্যবোধ, সমাজসচেতনতা ও মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের বাণী পৌঁছে যায় তাহলে তো তাঁরা নিশ্চয়ই ভয় পাবেন। ভয় পাবেন এই মনে করে যে এ'দের হাত থেকে শিক্ষা কেনাবেচার ক্ষমতা, সমাজে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা, মানুষের উপর প্রভুত্ব করার ক্ষমতা সবই যে চলে যাবে। কুলি, মুটে, মজুর, শ্রমিক, কৃষক, মধ্য ও নিম্নবিত্ত সকলেই হয়তো সত্যিই একদিন সমাজের সবকিছু গোপনীয় খবর জেনে ফেলবে বই পড়ে, দেশ-বিদেশের মানুষকে দেখে নিজেদের সঙ্গে তুলনা করে সব জেনে যাবে, অচলায়তনের উত্তর দিকের বিরাট পাহাড়টার দিকেও তাকিয়ে ফেলবে ভয় না পেয়ে। ঘটা করে পাড়াতে শীতলা পুজো করবে না আর, ছেলেরা, মেয়েরা করবে না সন্তোষী মায়ের ব্রত। শ্রাদ্ধ-বিবাহ ঘটা করে পুরোহিত ডেকে আর হবে না—তাতেও কি বুদ্ধিজীবী সমাজ ভয় পাবেন না? তা তো সম্ভব নয়। এতক্ষণে বোঝা গেল ভয় কোথায়। এখন তাহলে প্রাথমিক শিক্ষা ও তার শিক্ষাক্রম সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে ভাবা দরকার, বর্তমান সরকার কেন এভাবে কিছু অংশ বুদ্ধিজীবীদের ভয় দেখালেন।

দোষটা সম্পূর্ণ বামফ্রন্টের নয় কিন্তু। প্রাথমিক শিক্ষার একটি পাঠক্রম সুরচিত করার জন্য এক সিলেবাস কমিটি গঠন করেন পূর্বের সরকার। এই কমিটি কাজ করার সুযোগই পাননি দু-তিন বছর ধরে। বামফ্রন্ট সরকার কাজ শুরু করার গোড়াতেই শিক্ষার কথা চিন্তা করেছেন, চিন্তা করেছেন আরও বেশী করে যে শিক্ষাধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন প্রয়োজন। কারণ ৩০ বছরে তো সমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কাজেই শিক্ষাও স্থিতিশীল থাকতে পারে না। কিন্তু এই পরিবর্তন হঠাৎ মাঝপথে করলে ঠিক কাজ হবে না, কারণ স্বাধীনতালাভের পরে মাধ্যমিকস্তরে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করা হয়। বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় আর তার যা ফলশ্রুতি তা কারোর কাছেই অবিদিত নয়; পরীক্ষায় গণটোকাটুকি, পরীক্ষায় না লিখে বা দেখে লিখে পাশ...ইত্যাদি। পূর্বের সরকার হয়তো সর্বশ্রেণীর সার্বজনীন শিক্ষার পরিবর্তন চাননি, চেয়েছিলেন মাধ্যমিকে যে ছেলেমেয়েরা এসে পৌঁছতে পারবে তাদেরই জন্য শুধু শিক্ষাব্যবস্থা। তাদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষায় সুবিধাভোগী ঘরের সন্তান যাদের বেশীর ভাগ প্রথম সাক্ষর প্রজন্ম হয়। আর যারা প্রথম সাক্ষর প্রজন্ম হতে চেয়ে প্রথম শ্রেণীর দরজায় সেদিন ভিড় জমাল, তাদের মধ্যে শতকরা ২০/২৫ ভাগ মাত্র চতুর্থ শ্রেণী পাশ করবে এমনই পাঠক্রম, পরীক্ষাব্যবস্থায়, শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। বাকি ৭৫/৮০ ভাগের কথা ভাবা হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা চিরদিন উপেক্ষিত অবহেলিত এবং তা বেশ সুপরিকল্পিতভাবেই ঘটে। তেত্রিশ বছর স্বাধীনতা লাভের পরও

তাই দেখি দেশে ৭০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর। শিক্ষা ব্যবস্থা আছে ৩০ ভাগের জন্য। এরা কারা? এদের অধিকাংশ বাস করে শহরে এবং গ্রামের ধনী এলাকায়। শহরের বস্তি ও গ্রামের খেতমজুর দরিদ্র চাষী, নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আলো গিয়ে পৌঁছায়নি এঁদের চেষ্টায়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে প্রাথমিক সিলেবাস কমিটি পুনর্গঠন করলেন, আগের সকল সদস্য ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক শিক্ষক সংস্থা, প্রাথমিক শিক্ষক সংস্থা, প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ, অধ্যাপিকা সকলকে নিয়ে, সর্বস্তরের শিক্ষাবিদদের নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে ঢেলে সাজাবার উদ্দেশ্যে এক সিলেবাস কমিটি গড়ে তুললেন। বাস্তবিক পক্ষেই যে কোনও শিক্ষা-বিজ্ঞানীই বলবেন শিক্ষাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে শিশুর কাছে উপস্থাপন করা যায় না—শিশুর ক্রমবিকাশের পথে শিক্ষা এক ছেদবিহীন প্রক্রিয়া। তার উদ্দেশ্য শিশুকে ভাবীকালের উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তোলা—তাকে সমাজে উৎপাদনে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলা, তার চারিধারে ছড়ানো পরিবেশকে চিনতে জানতে বুঝতে সাহায্য করা, গতিশীল সমাজে নিজের স্থান ও পরিবারের সম্পর্ক, সমাজধর্ম, সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা গঠন করা। —এক কথায় সমাজ সচেতনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এবং এমন একটি জীবনমুখী এবং গণমুখী শিক্ষাক্রম তার জন্য প্রয়োজন যা তাকে রক্ষা করতে শেখাবে অন্যায় অবিচারের হাত হতে, শাসন ও শোষণের হাত হতে, শুধু নিজেকে নয় তার শ্রেণীকে। শ্রেণীসচেতন এবং সমাজ-সচেতন মানুষ সৃষ্টি না হলে এই গতিশীল সমাজের পরিবর্তিত চিন্তাধারার সঙ্গে মিল রেখে চলতে পারবে কি করে। এই শ্রেণীসচেতন সমাজ-সচেতন মানুষ তৈরি করতে হলে কাজ শুরু করতে হবে সর্বনিম্নস্তর হতে যেখানে সকল মানুষের ঘরের ছেলে-মেয়ে এসে উপস্থিত হয়, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব ছয় বছরের মানবশিশুকে খুঁজে পাওয়া যায়—সেই প্রাথমিক স্তর হতে।

দুবছর ধরে তৈরি হল প্রাথমিক সিলেবাস। তাতে বলা হল ৬ হতে ১১ বছরের শিশুদের পাঠভারে ভারাক্রান্ত করে তোলা হবে না। শিক্ষাক্রমে শিশুর স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষাই স্থান পেয়েছে সর্ব-প্রথমে, সেজন্য বলা আছে শিশু খেলবে, ছুটবে, স্বাস্থ্য ও দেহচর্চা করবে, বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর আহার গ্রহণ করবে সরকারী ব্যবস্থায়। তারপর আসে তার আনন্দবিকাশের প্রশ্ন—ভালো লাগলে তবে তো ছেলে আসবে পড়তে না হলে দুদিন পরেই ছেড়ে দেবে—এর জন্য ব্যবস্থা আছে শিক্ষাক্রমে সৃজন ও উৎপাদনমূলক কাজের। তারপর ছেলে জানবে, চিনবে, বুঝবে, দেখবে প্রকৃতিকে। পৃথিবীর মাটি, আকাশ, জল, বাতাস, গাছকে চিনবে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বইয়ের মধ্যে দিয়ে নয়। বইয়ের মাধ্যমে মানুষের সুখদুঃখের সাথে পরিচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মেলে তাকিয়ে তার আসে-পাশের মানুষকে যাতে সে চেনে দেখে বোঝে সেজন্য শিক্ষার্থীদল নিয়ে শিক্ষক কাছা-কাছি জায়গা দেখাতে নিয়ে যাবেন—এ ব্যবস্থাও আছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক পাঠের কথায়। এই শিক্ষাক্ষেত্রটি শিক্ষাক্রমে একটি সম্পূর্ণ নূতন সংযোজন—যেখানে বলা হয়েছে শিশু পুঁথিলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব ঘটনাকে মিলিয়ে দেখবে। আবার ঘরে এবং বিদ্যালয়ের বাইরের পরিবেশে যা ঘটনা ঘটেছে তার কার্যকারণ সম্পর্ক ও তথ্য বিদ্যালয়ে এসে জানবে। যেমন হয়তো বিদ্যালয় হতে শিখে এসেছে 'জল ফুটিয়ে খেতে হবে'—বাড়িতে এসে মাকে জানাবে সে কথা। জল ফোটাতে বলবে, যাতে পরদিন বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষক-মশাইকে বলতে পারবে সে বাড়িতে ঠিকভাবেই পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা ঘরে গিয়ে পৌঁছল। বিদ্যালয়ে আসার পথে দেখে এসেছে শিউলীফুলে পথ ঢাকা পড়ে গেছে,—বিদ্যালয়ে এসে সেই ফুলের কথা বা অন্যান্য ফুল-ফলের—এসবের আলোচনা হবে। এই সবই তো আছে নূতন পাঠক্রমে।

সবার শেষে আছে পঠনপাঠন নির্ভর বিষয়সমূহ—মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি(ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান)। নূতন শিক্ষাক্রমে ৬—১১ বছরে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। মাতৃভাষার ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। মাতৃভাষা প্রাথমিক স্তরে ভাল করে শিখতে পারলে তবেই অন্যান্য ভাষা শিশু মাধ্যমিক স্তরে সঠিকভাবে শিখতে সক্ষম হয়—এই হ'ল ভাষাবিজ্ঞানীদের মত। রবীন্দ্রনাথও এই বিধিতে বিশ্বাসী ছিলেন। নূতন শিক্ষাক্রমের এই ভাষানীতিটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ বিষয়ে যথা-স্থানে আলোচনা হবে।

গণিত বিষয়টিকে শিশুর জীবনের সমস্যা সমাধানের মাঝ দিয়ে শেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। গাণিতিক প্রক্রিয়াগুলির অনুশীলন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ শিক্ষার্থীর সমাজজীবন হতে সংগ্রহ করার কথা বলা হয়েছে।—যেমন শতকরা হিসাবে শিক্ষার্থী সমাধান করবে গ্রামে নিরক্ষরতার শতকরা হিসাবের অংক। গ্রামে নলকূপ বসাবার আগে ও পরে শতকরা কত কম মানুষ কলেরা রোগাক্রান্ত হচ্ছে। এই ধরনের অংক হবে শ্রেণীতে।

লাভক্ষতির সমাধানকল্পে শিক্ষার্থী বুঝতে চেষ্টা করছে গ্রামের সুদখোর মহাজনের কাছে তার পিতা টাকা ধার করবেন না সমবায় ভান্ডার হতে নেবেন। এই হল জীবনমুখী গণিত।

ইতিহাস পড়বে শিশু—তবে সে রাজাবাদশার কীর্তিকাহিনী নয়। মানুষের, অতি সাধারণ মানুষের কীর্তি। কর্ম উদ্যোগ, শ্রম, উৎপাদন, শ্রমের মজুরী, মুনাফা ইত্যাদি কি ভাবে ধীরে ধীরে মানুষের সমাজজীবনে এল। তারও আগে মানুষ কিভাবে আবিষ্কার করতে শিখেছিল—আগুন, লোহা, তামা ইত্যাদি। পৃথিবীর সকল সভ্যতা, সকল বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মূলে হোতা মানুষ ও তার বুদ্ধি, মানুষ ও তার শ্রম ও উৎপাদনক্ষমতা। গ্রাম, তার নিজের গ্রাম, শহর, গ্রামের মানুষের শহর যাত্রা এই সব বিচিত্র জীবনধর্মী কাহিনী যা মানুষকে গণমুখী ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখাবে—এইগুলিই লিখিত আছে নূতন শিক্ষাক্রমের পাঠসূচিতে।

এখন দেখা যাক এখানে অন্যায় কথা কি আছে এই পাঠসূচিতে যা বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে বিচলিত করল। দেওয়াল লিখন ও পত্রপত্রিকার লেখা দেখে মনে হয় তাঁদের আক্রোশ ইংরেজী ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে।

যে কোনও শিক্ষাবিজ্ঞানী জানেন, পৃথিবীর সর্বত্র প্রাথমিক স্তরে শিশু একটিমাত্র ভাষা শেখে সেটি তার মাতৃভাষা। কেন? শিশু জন্মে যে পরিবেশে থাকে তার পরিবারের মানুষরা যে ভাষাতে আলাপ করে, শিশুকে আদর করে, ডাকে, যে ভাষায় তার সঙ্গে খেলা করে—শিশু ঐ পরিবারের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, জীবনধারণ সম্পর্কিত সেই ভাষাটিই প্রথম শেখে—সেটি তার মাতৃভাষা। এই ভাষার সঙ্গেই মুকুলিত হতে থাকে তার শিশুবয়সের কামনা-বাসনা প্রথম চাওয়া পাওয়ার ইতিহাস, আনন্দ-বেদনার প্রকাশ—সবই প্রথম হয় তার মাতৃভাষার মাধ্যমে। তাই মাতৃভাষা শিশুর কাছে শুধু একটি ভাষামাত্র নয়—তার চিন্তাশক্তি, ধীশক্তি, কল্পনা শক্তি, মনন-শক্তি এসব কিছু বিকাশের মূল আধার। ভাষাবিজ্ঞানী, শিক্ষা-বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানীরা আরও বলেন এই মাতৃভাষা ভালভাবে না শিখতে পারলে পরবর্তী যে কোনও ভাষাশিক্ষা শিশুর কাছে দুরূহ হয়ে পড়ে। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ আমাদের দেশের ৯০ ভাগ মাধ্যমিক পাস করা ছেলেমেয়েরা যারা দশ বছর ভাষা শিক্ষার পর

মাতৃভাষা বা ইংরাজি ভাষা কোনটিই ভালভাবে লিখতে পড়তে বলতে বুঝতে বা বোঝাতে পারে না। অপর পক্ষে দেখা যায় ইংরেজী-ভাষায় যাদের দখল আছে এমন জ্ঞানীগুণীজন ডাক্তার বিজ্ঞানী এ'রা মাতৃভাষার মাধ্যমে একটি প্রবন্ধ ভাল করে লিখতে পারেন না। অনুরোধ উপরোধ করলে কষ্টপ্রসূত যে লেখা বেরিয়ে এল তাতে বানানভুল এবং ব্যাকরণের অসঙ্গতি প্রকাশ পাচ্ছে। ইংরেজী ভাষায় লেখা প্রবন্ধ—আমরা যারা প্রায় চারপ্রজন্ম ইংরেজী শিখেছি তাদের মধ্যে কজন সঠিকভাবে বুঝতে বা বোঝাতে পারি? তাহলে দেখা যাচ্ছে ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত জ্ঞানীগুণীজন যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন আছেন তাঁরাও জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন, এবং যেহেতু ভাষাই ভাবপ্রকাশের বাহন সেজন্য ইংরাজী জানা লোকের কাছে ইংরাজী না জানা মানুষ অজ্ঞ বলেই পরিচিত। বিপরীতভাবে অপর দলের কাছেও পূর্বদলটি একই কারণে 'অজ্ঞ'(?) যেহেতু এ'দের জ্ঞানের কোনও প্রকাশ বা আদান-প্রদান দুই দলে হচ্ছে না। মনে হল ধন্য ঔপনিবেশিক ইংরাজ! কি যাদুই তুমি জানতে, সমগ্র দেশের মানুষকে এমনই দুভাগে ভাগ করে গেলে তোমার ভাষানীতির সাহায্যে যে দেশের একদল মানুষ আচার-বিচার জীবনযাত্রায় অপর দলের কাছে বিদেশী।

ইংরাজের এক নিকৃষ্টতর নকল মানুষগুলিকে তৈরি করতে হাজার হাজার টাকা খরচ হল, যে টাকা অনেক গরীব মানুষের উপর পরোক্ষ করের বোঝা চাপিয়ে আদায় করা হল। কি উদ্দেশ্যে? ঐ হাজার হাজার গরীব মানুষের কোনও উপকার সাধনের জন্য? না, কারণ ঐ ইংরাজী জানা বিদেশী নকলনবীশদের কোনও জ্ঞান, ডাক্তারী ইঞ্জিনীয়ারিং বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস বা সাহিত্যে—এদের জীবনযাত্রার মানউন্নয়নের কাজে বা শিক্ষার কাজে ব্যয়িত হবে না। সেদিন আমাদের মহাকরণে শিক্ষা অধিকর্তার কার্যালয়ের দেওয়ালে টাঙ্গানো একশত বৎসরের পূর্বসূরী ইংরাজ শিক্ষা অধিকর্তাদের প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল—আমাদের এই ইংরাজি-ভাষার প্রতি অতি মমত্বের মূর্খামি দেখে ব্যঙ্গ করছে। ছবিগুলি আজও আছে সুসজ্জিত ভাবে দেওয়ালে টাঙ্গানো। তাঁরা থাকুন যথাস্থানে কিন্তু আমরা কি আজও পৃথিবীর সভ্যদেশের দিকে তাকিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের উপদেশমতন আমাদের দেশের শিশুদের মাতৃভাষায় প্রথম পাঁচ বছর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করব না? তারা যাতে শিক্ষায় চিরদিন প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর চৌকাঠ না পেরোতে পারে ইংরাজীর বাধা টপকে সেই ব্যবস্থা কায়েম করব, আর বলব এরই নাম গণতান্ত্রিক শিক্ষা—সমাজতান্ত্রিকতার ধাঁচের শিক্ষা? এই প্রতারণা আর কতদিন সমাজে চলবে? রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ গেল গেল, বিদ্যাসাগর গেল গেল বলে আন্দোলনে নামলেই কি জন-সাধারণকে ভুল বোঝান কাজটি সহজ হয়ে যাবে? জনসাধারণের মুখে যদি ভাষা থাকত তারা কি বলত না, যখন রবীন্দ্রনাথ বিদ্যা-সাগরের মূর্তি ভাঙ্গা হচ্ছিল, তখন তোমরা ছিলে কোথায় হে রবীন্দ্র বিদ্যাসাগর দরদী বন্ধুরা? তারা কি বলত না— আজ 'শিক্ষা গেল' আন্দোলন যারা করছ তাদের এই আন্দোলন বা খবরের কাগজে কলম খোঁচা তো প্রকাশ পায়নি 'গণটোকাটুকি বন্ধ করা', 'শিক্ষক হত্যা বন্ধ করা' বা 'শিক্ষক ছাত্র বন্ধুভাব ফিরিয়ে আনার' জন্য? স্বাধিকার রক্ষা কমিটি কি স্বাধিকার রক্ষা বলতে বোঝেন শিক্ষাজগতে নিজেদের কায়েমী স্বার্থরক্ষা এবং শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার স্বাধিকার রক্ষা? না কোঠারী কমিশন রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্য, ইউ এন ও শিক্ষা রিপোর্ট learning to be-তে প্রকাশিত, জাকির হোসেন সাহেবের নেতৃত্বে প্রকাশিত রিপোর্টের 'মানুষ তার মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষাই প্রথম পাঁচ বছর শিখবে না' এবং 'শিক্ষা হবে সার্বজনীন অবৈতনিক'—এই তত্ত্বগুলিতে বিশ্বাসী? রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন 'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা', 'মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ', গান্ধীজী বলেছেন, 'প্রথম সাত বছর শিশু মাতৃভাষা পড়বে, ইংরাজী পড়বে না'...তবে কি মনে করব ঐসব বুদ্ধিজীবীগণ রবীন্দ্রনাথকে গান্ধীজীকে উপেক্ষা করছেন? আর মুখে বলছেন তাঁরা রবীন্দ্রদরদী গান্ধীদরদী? তাই কি তাঁরা এই ভাষানীতির বিরোধিতা করছেন? সিলেবাস কমিটিকে গালি-গালাজ করছেন পথে-ঘাটে?...না বোধহয় এই সিলেবাস কমিটি এমনই পাঠসূচি তৈরি করেছেন যাতে তাঁদের মনে হচ্ছে এবার সত্যিকারের সার্বজনীন শিক্ষার দিকেই আমরা চলেছি—হয়তো সত্যিই আগামীদিনের শিশু ১৬ বছর বয়সে এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, সমাজসচেতন, বলিষ্ঠ কর্মী হয়ে গড়ে উঠবে। নিজেকে, শ্রমকে, মানুষকে ভালবাসবে, শ্রমিক কৃষক, ক্ষেতমজুর, নিম্নবিত্ত সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে আর ভালবাসবে দেশকে, সমাজকে নিজের গ্রামকে। যদি আমাদের এই বুদ্ধিজীবীদের আশংকাই সত্যি হয় তবে তো বলতে হবে—আমাদের সংবিধান অনুযায়ী ১৯৬০ সালের প্রতিশ্রুতির পথেই এই শিক্ষাক্রম চলেছে। যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার কথা সকলে ভুলে গেছলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এই বুদ্ধিজীবীর দল কেবলমাত্র সহ্য করতে পারছেন না নূতন পাঠসূচির দৃষ্টিভঙ্গীকে—এইখানেই মূলগত তফাৎ। যে শিক্ষাক্রম ভারতীয় সংবিধানের প্রতিশ্রুতি রক্ষার কাজে এগিয়ে এসেছে সর্বজনের গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার নির্দেশিকা হিসাবে আমরা তাকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের সকল প্রাথমিক শিক্ষকবন্ধু যুববন্ধুদের আহ্বান জানাই, আসুন আমরা সকলে শপথ গ্রহণ করি—এই শিক্ষাক্রমকে সফল করবই। সামনের পাঁচ বছর আমাদের শিক্ষা নিয়ে সংগ্রামে নামতেই হবে, যত বাধা আসবে এই শিক্ষাক্রমকে প্রতিরোধ করার জন্য ততই আমরা এগিয়ে যাব সঠিক শিক্ষাক্রমে সার্থকভাবে সর্বসাধারণের শিক্ষার কাজে লাগাতে। নূতন শিক্ষাক্রম সার্থক হক সবার চেষ্টায়। প্রাথমিক শিক্ষাক্রমকে অভি-নন্দিত করি, অভিনন্দিত করি এর ভাষানীতিকে এবং জীবনমুখী গণশিক্ষাকে।

'ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।'

—রবীন্দ্রনাথ ('শিক্ষার বিকিরণ')

আধিপত্যের ভাষা না ভাষার আধিপত্য?

শুভংকর চক্রবর্তী

অধ্যক্ষ, আশুতোষ কলেজ, কলকাতা

কোন্‌টা চাই? কয়েকজন মানুষকে ভাষা শিখবার সুযোগ করে দেওয়া যাতে তারা দেশের সমস্ত মানুষের ওপর আধিপত্য করতে পারে? না দেশের সকল মানুষকে ভাষা শিখবার সুযোগ করে দেওয়া যাতে তারা প্রকৃতির শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে, প্রয়োজনীয় বস্তুমূল্য সৃষ্টি করতে পারে, সমাজের উৎপাদন ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত হতে পারে? কোন্‌টা?

বৈদিক যুগে, ব্রাহ্মণ্য যুগে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষিত একটা ক্ষুদ্র অংশ প্রাকৃতজনের ওপর আধিপত্য করেছে। প্রাকৃতজন ছিল যোজন যোজনব্যাপী অন্ধকারে ডুবে। ফারসী শিক্ষিত ক্ষুদ্র অংশটি দীর্ঘকাল দেশের বৃহৎ অংশের ওপর আধিপত্য করেছে। ইংরেজি শিক্ষিত ক্ষুদ্র অংশটিও শিক্ষাবঞ্চিত দেশবাসীর ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে। আজও শিক্ষিত লোক মানেই ইংরেজী শিক্ষিত লোক। তারাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "মান পেলে, অর্থ পেলে, তারাই হল এন্‌লাইটেন্ড্‌, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ।"

ইংরেজ শাসনের উদ্দেশ্যও ছিল এই মানী, অর্থবান, আলোকিত একটা শ্রেণী তৈরি করা আর সারা দেশকে শিক্ষার অনশনে রাখা। সারা দেশ শিক্ষিত হলে বিপদ আছে, কিন্তু এই শ্রেণীটি তৈরি হলে লাভ আছে। কারণ ইংরেজের যে লক্ষ্য ছিল ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহের একটি উত্তম দেশ করে গড়ে তোলা; সে পথ সুগম হবে বিশ্বস্ত ও দক্ষ কর্মচারীর এই শ্রেণীটি তৈরি করতে পারলে। ইংরেজ শাসন তার ভাষা ও শিক্ষানীতি বিন্যস্ত করল এই বশম্বদ ও স্নেহান্বিত শ্রেণীটি তৈরি করতে। মেকলে, বেন্টিঙ্ক, অকল্যান্ড, হার্ডিঞ্জ সকলে চেয়েছিলেন এই নতুন সৃষ্ট শ্রেণীটা ইংরেজী ভাষা শিখে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সেতুর কাজ করবে। মেকলের মিনিটে বলা হল, "We must at present do our best to form a class who may be interpreter between us and the millions whom we govern." এর জন্য তারা অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করে নি। ১৮৩৫, ৭ মার্চ, সরকারী শিক্ষানীতি ঘোষণা করল, "All the funds, . . . be henceforth employed in imparting to the native population a knowledge of English Literature and Science through the medium of the English Language." বিশ্বস্ত ও দক্ষ কর্মচারী হতে এমন ঠেলাঠেলি পড়েছিল যে ১৮৪২-এ একটা বছরে ৪১০০ বাঙালী ইংরেজী শিখতে ভীড় করেছিল। ১৮৫৪-এ শিক্ষাসংক্রান্ত প্রথম দলিল চার্লস উডের যে 'ডিসপ্যাচ' প্রকাশিত হল সেখানেও এই বিশ্বস্ত ও দক্ষ ভারতীয় কর্মচারী শ্রেণী তৈরি করতে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হল। এই শ্রেণীটার বাবুরাই জন্ম নিয়ে ইংরেজ প্রভুর বিশ্বস্ত সেবা করল, আর ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জোরে দেশের মানুষের ওপর হম্বিতম্বি আধিপত্য করতে লাগল। এদের দাপটে অস্থির হয়ে সারা দেশের শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হনুমব্বাবু সংবাদের হনুমান তার লেজের পেঁচ এদের গলায় কষে দিয়ে শিক্ষা দিল যে মাতৃভাষার বিকল্প হয় না, ইংরেজী বোলচালের আধিপত্যে দেশের মানুষকে উপেক্ষা করা দাস্য মনোভাবের নীচতা। আর এই শ্রেণীটার মধ্যে ব্যতায় হলেন বঙ্কিম প্রমুখ একটা অংশ যাঁরা ইংরেজের হাতে জন্ম নিয়ে ইংরেজ শাসনের কবরের পথ খুঁড়তে ইতিহাসের নির্জ্ঞাত সাধনীর (Unconscious Tool of History) কাজ করেছিলেন, যাঁরা আধিপত্যের ভাষার ছড়ি ঘোরাবার জন্য তৈরি হয়েও ভাষার আধিপত্যে সারা দেশকে জাগাতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন।

মাতৃভাষাকে অগ্রাহ্য ও বর্জন করে ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করবার যে নীতি প্রথম দিকে ইংরেজ গ্রহণ করেছিল, পরের দিকে কিছু বড় ইংরেজের ও দেশহিতৈষীদের চেষ্টায় মাতৃভাষাকে তারা অগ্রাহ্য করতে পারল না। ১৮৫৩-এ কোম্পানীর সনদ নবীকরণের পর থেকেই, বিশেষ করে উডের 'ডিসপ্যাচে' মাতৃভাষাকে তারা অগ্রাহ্য করল না। 'ডিসপ্যাচে' মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী ও মাতৃভাষা এবং প্রাথমিক ও দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষাকে মাধ্যমরূপে গণ্য করার কথা সুপারিশ করা হল। কিন্তু কার্যত দেখা গেল এই শ্রেণীটির মাধ্যমে মাতৃভাষায় সকলের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সুপারিশকে কার্যকর করা তো হলই না, বরং বাধা দেওয়া হল। কারণ শাসকশ্রেণীর ভয় ছিল শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে জাগরণ ঘটলে সিংহাসনের বিপদ আছে। আর এই শ্রেণীটার ভয় হল মান পেতে, অর্থ পেতে, প্রতিষ্ঠা পেতে যদি ভাগীদার বাড়ে। শিক্ষাকে চড়া দামে যদি কিনবার সামগ্রী করে রাখা যায় তবেই অনেকে কিনতে না পেরে সরে থাকবে। আর যদি সকলেই শিক্ষাকে পেড়ে নিতে পারে তা হলে তো সব সমান হবে। আধিপত্যে বাধা ঘটবে। যে অল্প কয়েকজন ভাষার ছড়ি ঘুরিয়ে সমস্তের ওপর আধিপত্য করতে পারছে তারা সইবে কেন? গোখলে যখন সার্বজনীন শিক্ষার প্রস্তাব রাখেন এবং এ নিয়ে লড়েন তখন তিনি এই শ্রেণীটার কাছ থেকেই সবচেয়ে বাধা পেয়েছিলেন। এবং সে বাধা সবচেয়ে বেশি এসেছিল বাংলা প্রদেশের এই শ্রেণীটার কাছ থেকে। কারণ এ প্রদেশে এই শ্রেণীটা বেশ সমৃদ্ধ ছিল। এদের মূর্তির আড়ালে থেকেই শাসকশ্রেণী শিক্ষা সম্বন্ধে তাদের কথা বলে এসেছে। অথচ বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রমুখ দেশহিতৈষীরা বারংবার মাতৃভাষায় শিক্ষার সীমানার মধ্যে সারা দেশকে আনার জন্য কতই না চেষ্টা করেছেন। স্বাধীনতার পরেও মাতৃভাষার পথে শিক্ষার অবাধ চলাফেরার পথ খোলসা করতে এইভাবেই বাধা এল। **সেই বাধারই চরম ধূর্ত চাল হল এদেশে প্রাথমিক স্তরে দুই ভাষা শিক্ষা দেবার ভাষানীতি। দুই ভাষানীতি মূলত এক নিষ্ঠুর ঝাড়াই নীতি। সমস্তকে ঝাড়াই করে কয়েকজনকে রেখে দেবার এক নীতি।** কিরকমে ঝাড়াই করে? প্রাথমিক স্তরে গ্রামশহরের সাধারণ ঘরের শিশুছাত্র পরিবেশবিযুক্ত ইংরেজী ভাষা শিখতে গিয়ে না শেখে ইংরেজী না শেখে বাংলা, না শেখে বিষয়। শিক্ষার সীমার মধ্যে এসেও তারা শিক্ষায় প্রতিবন্ধী হয়ে থাকে। আর ভাগ্যবন্তরা যারা পরিবারে, ইংরেজী শিক্ষার পরিবেশ পায় তারা ওদের থেকে এগিয়ে থাকে। সাধারণ ঘরের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাশের একটা ঘণ্টার ইংরেজী শিক্ষার বাইরে পরিবারে ও চারপাশে কোথাও ইংরেজী শিক্ষার পরিবেশ পায় না। হাটে বাজারে যায় ইংরেজী নেই, তাদের খেলার

মাঠে ইংরেজী নেই, দাদু-ঠাকুরমা'র আদরে, মা-বাবার স্নেহে-তিরস্কারে ইংরেজী নেই। তাদের স্বপ্নে, সুখদুঃখের গোপন অন্তরকোঠায় ইংরেজীর প্রবেশ নেই। মাতৃভাষার চরাচরব্যাপ্ত বাতাসের মধ্যে নিশ্বাস নিয়ে তাকে অতিক্রম করতে হবে এই অনায়ত্ত বায়ুস্তর। পরীক্ষায় তাকে ইংরেজীতে পাশ করতেই হবে। সুতরাং ওই ইংরেজীর লোহা-কাঠের নৌকাটাকে পরীক্ষার চড়ায় টেনে তুলতে গিয়ে শিশুছাত্র মাতৃভাষা থেকে সময় কেটে নেয়। মাতৃভাষার নৌকাটি কাৎ হয়ে পড়ে। অঙ্ক ও অন্যান্য পাঠ্যবিষয় যা তাকে পড়তেই হবে এবং পড়া উচিত তাদের থেকে সময় কেটে নেয়। সেই নৌকাগুলিও হেলে পড়ে। এই সব সময় দিয়েও ইংরেজী ভাষার নৌকাকে পরীক্ষার চড়ায় টেনে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করে শিশুছাত্রের ঘাম ঝরে, অশ্রু ঝরে, পিতার রুষ্টমুখের ভয়ে মরে, মায়ের বিষণ্ন মুখের ব্যথায় সজল হয়, নতুন ক্লাশে উঠতে না পারার লজ্জা-দুঃখ-আশঙ্কায় অস্থির হয়। কিন্তু অকরুণ ইংরেজীর নৌকা চড়ায় ওঠে না। সভয়ে তাকিয়ে দেখে বাংলার নৌকা, বিষয়শিক্ষার নৌকাগুলিও কাৎ হয়েই আছে। বিদ্যালয় থেকে গভীর বিতৃষ্ণা নিয়ে সে বেরিয়ে আসে। এবং এক সময় ভেগে যায়। কিন্তু এই অশ্রুপাত করতে হয় না তাদের যাদের পরীক্ষার চড়ায় নৌকা টেনে তুলতে বাবা-মা, পরিবার-পরিবেশ, অর্থ-সামর্থ্য সাহায্য করে। এরাই কয়েকজন বাঙালী হয়ে সমস্ত বাঙালীর চোখের ওপর দিয়ে দুই ভাষার ঝাড়াই যন্ত্রে থেকে যায়, ঝাড়াই ঘরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে এবং সাফল্যের ভবন-শিখরে দাঁড়িয়ে আধিপত্য করে।

প্রশ্ন করা হতে পারে এই দুই ভাষা শিক্ষানীতিতে গ্রাম-শহরের দুঃস্থ ঘরের ছেলেমেয়েও জ্ঞানীগুণী হয়েছে, শিল্পী রাজনীতি-বিদ্, শিক্ষক-সাংবাদিক হয়েছে, এমন তো ঘটছে। দুই ভাষার পক্ষে যাঁরা, সেই জ্ঞানীব্যক্তিরা এমন প্রশ্ন তুলেছেন। এটা ঠিকই এমন দু'-একজন হয়েছেন। কিন্তু এই ব্যত্যয়কে দুই ভাষা রাখার পক্ষে যুক্তি বলে চালানো কি উচিত হবে? শিক্ষার একটা সামাজিক দিক আছে, লক্ষ্য আছে। সে লক্ষ্য কয়েকজন জ্ঞানীগুণী তৈরি করা নয়, দেশের সমস্ত মানুষকে শিক্ষার সীমার মধ্যে নিয়ে আসা, জাগিয়ে তোলা। তাতে জ্ঞানীগুণী সৃষ্টি তো বন্ধ হয় না। যে সব দেশ প্রাথমিক স্তরে কেবল মাতৃভাষা শিক্ষা দিয়ে সকলকে শিক্ষার মধ্যে এনেছে সে সব দেশে কি জ্ঞানীগুণী সৃষ্টি বন্ধ হয়েছে? বরং তথ্য-বলে প্রাথমিক স্তরে কেবল মাতৃভাষা শিক্ষার সুফল দেখে বিশ্বের দু-চারটি দেশ বাদে সব দেশ প্রাথমিক স্তরে এক ভাষা শিক্ষার নীতি গ্রহণ করেছে। আমাদের ভারতবর্ষেও তো দু'একটি রাজ্য ছাড়া বাকী সব রাজ্য প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী শিক্ষা বাতিল করে দিয়েছে। ওসব রাজ্যের পণ্ডিতরা বাধা দেন নি কারণ তাঁরা দুই ভাষাশিক্ষার এই কুফল এবং দুই ভাষা শিক্ষানীতি বর্জন করে বিশ্বের উন্নত দেশগুলির উন্নতি লক্ষ্য করেছেন। অথচ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একদল পণ্ডিত বাধা দিতে কি মরণপণই না করছেন! সারা দেশের শিক্ষালাভে ইচ্ছুক শিশুছাত্ররা কলহাস্যে বিদ্যালয়-ভবন মুখর করে পড়তে এসে ক' বছর না যেতেই অপচয়ে অনুন্নয়নে বিতৃষ্ণায় হেজে পচে উঠে বেরিয়ে যাচ্ছে—এই বাস্তব সত্যটা দেখেও তা দূর করবার শুভ উদ্যোগ নেওয়া চলবে না? রবীন্দ্রনাথ পরাধীন দেশে ভাষা শিক্ষার এই ঝাড়াই নীতি লক্ষ্য করে উৎকণ্ঠা ও ক্ষোভ নিয়ে বলেছিলেন, **"সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়েকজন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল?"** [শিক্ষার বাহন]

এ প্রশ্নের উত্তর সহজ। প্রাথমিক স্তরে দুই ভাষা শিক্ষা দেবার রীতি যতদিন বহাল থাকবে, ততদিন সমস্তের প্রতি কয়েকজনের এই আধিপত্য চলবেই। **ভাষাশিক্ষার রীতির বদলই পারে নতুন রায় দিতে।**

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্য সরকার এই অসমতার রায়টা বহাল না রাখতে ভাষাশিক্ষার রীতিটার বদল ঘটাবার কথা বলেছেন। এ-কথা নতুন কিছু নয়। ভাষাশিক্ষার সর্বকালের সকল সভ্য সমাজের দাবী হল সকল শ্রেণীর মানুষকে ভাষার আধিপত্যে জাগিয়ে তোলা। "ভাষা কখনই কোনো একটি বিশেষ শ্রেণী সৃষ্টি করে নি, বরং ভাষা হল গোটা সমাজের সৃষ্টি, সমাজের সকল শ্রেণীর সৃষ্টি, শত শত বংশ পরম্পরার চেষ্টার ফল। সমাজের একটিমাত্র শ্রেণীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভাষার সৃষ্টি হয় নি, গোটা সমাজের জন্য, সমাজের সমস্ত শ্রেণীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য সৃষ্টি হয়েছে।" [মার্কসবাদ ও ভাষা সমস্যা, জে. ভি. স্তালিন]

তবে ভাষা কেন একটা শ্রেণীর আধিপত্যের ভাষা হবে? কেন ভাষার আধিপত্যে সকল শ্রেণী জাগ্রত হবে না? ভাষার ইতিহাস ভাষার আধিপত্যেরই পক্ষে, **আধিপত্যের কোনো ভাষার ঘোর বিপক্ষে।**

এইজনাই আমরা চাই আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের পরিপূর্ণ প্রয়োজন মেটাক। আবার নিঃসন্দেহে এ-ও চাই যে যেহেতু ইংরেজী ভাষার বিকল্প এখনও দাঁড়ায় নি, অথচ ইংরেজী আজও শিল্প ও বাণিজ্যের ভাষা, তখন ইংরেজী ভাষাও দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের পরিপূর্ণ প্রয়োজন মেটাক। **ভাষা শিক্ষার রায় হবে দেশের সকল মানুষের পরিপূর্ণ প্রয়োজন মেটাবার রায়।** বর্তমান রাজ্য সরকারের ভাষা-নীতি এই লক্ষ্যেই বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথমত তাঁরা বলছেন, তাঁদের লক্ষ্য দেশের মানুষ মাতৃভাষার পরিপূর্ণ সেবা পাক। দেশের সব মানুষ চাকরি করবে না। কিন্তু সব মানুষকে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় পড়তে ও লিখতে শেখাতেই হবে। সে-শিক্ষার পথে যেন ইংরেজী ভাষা তাকে স্কুল থেকে ভাগিয়ে না দেয়। কারণ এই মাতৃ-ভাষায় বিদ্যাবিস্তার দেশের মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু হবে। তাদের অন্ধ চক্ষে আলোর উদ্ভাস ঘটবে, তাদের বিচ্ছেদ দূর হবে, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, তারা শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করতে পারবে, তারা সমাজ পরিবর্তনে ও সমাজ গঠনের কাজে নিজেদের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবে, তারা দেশের দায়িত্বশীল সচেতন নাগরিক হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত বলছেন, মাতৃভাষা শিখে যারা মাধ্যমিক শিক্ষার সীমায় আসবে তারা ইংরেজী ভাষার পরিপূর্ণ সেবা পাক। ভাষা শিখবার এই নীতিই মাধ্যমিক স্তরে দ্বিতীয় ভাষা শিখবার আদর্শ নীতি বলে বিশেষজ্ঞরা সমর্থন করেছেন। তাঁরা বলেন প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার পরিপূর্ণ সেবা যে পেয়েছে তার পক্ষে মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শেখা কোনো অসুবিধার হবে না। বরং মাতৃভাষার আয়ত্তেই ইংরেজী ভাষা শিক্ষা পাকা হয়। গ্রামের পাশ দিয়ে যে নদীটি চলে সে দু' পাশের ভাগ্যমন্তের ফালি ফালি জমিই উর্বর করে চলে। কিন্তু যদি আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নামে? গ্রাম জুড়ে সকলের জমি উর্বর করে। আবার বৃষ্টির জলেই নদীর স্থায়িত্ব হয়, নদীর বেগ বাড়ে। মাতৃভাষা শিক্ষায় বৃষ্টির মত, তাতে ইংরেজী ভাষাশিক্ষার স্থায়িত্ব আসে, বেগ বাড়ে।

প্রাথমিক স্তরে দুই ভাষা শিক্ষা দিলে শিশুছাত্রের স্ফুরণপর্বে যে কি নিদারুণ ক্ষতি হয় সে-কথা বিশেষজ্ঞরা বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ভাষা বিশেষজ্ঞ Otto Jesperson তাঁর Language [Oxford University Press, ১৯২২] গ্রন্থে বলেছেন প্রাথমিক স্তরে দুটো ভাষা পড়লে শিশুর অবশ্য পাঠ্য অন্যান্য বিষয় শিক্ষার দক্ষতায় খামতি ঘটে "Two languages

instead of one decreases the child's capacity to learn other subjects which might and ought to be learnt."
অথচ এই বিষয়শিক্ষার দক্ষতাই তো শিশুকে একদিন শিক্ষায় বড় হতে, প্রতিযোগিতায় নামতে, চাকরি করতে, জীবনযুদ্ধে শক্ত মাটিতে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। প্রাথমিক স্তরে ভাষার বাধায় সে যে প্রতিবন্ধী অক্ষম হয়ে পড়বে। Stockhalm বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের Stan Dornic সতর্ক করে বলেছেন, দ্বিভাষা শিক্ষানীতি শিশুর নিজপায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা, অর্থোদ্ধার মর্মোদ্ধারের দক্ষতাকে নষ্ট করে, তার স্মৃতিশক্তিকে খর্ব করে। সুতরাং ভবিষ্যৎ জীবনে সে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে। Dornic-এর Language dominance, spare capacity and perceive-effect in Bilinguals এই সতর্কবাণীতে স্মরণীয়। Macnamara তাঁর Bilingualism and Primary Educations পুস্তকে বহু গবেষণার লব্ধ ফল উল্লেখ করে সতর্ক করে দিয়েছেন—

১। প্রাথমিক স্তরে দুটি ভাষা যারা পড়ে তারা, যারা একটা ভাষা পড়ে তাদের চেয়ে বেশি সংখ্যায় ব্যাকরণ ভুল করে।

২। দ্বিভাষিকরা দুটি ভাষার কোনোটিরই শব্দভাণ্ডার একভাষিকদের মত ভালো করে আয়ত্ত করতে পারে না। তারা ভাষাগত দক্ষতায় নিম্নমানের।

৩। যারা একটা ভাষা পড়ে তারা দ্বিভাষীর তুলনায় বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষায় যেমন, সাধারণ পাঠ পরীক্ষায়, পাঠ উপলোব্ধিতে, নির্ভুলতায় উন্নত।

এর পরও কোন্ অভিভাবক চাইবেন প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজী পড়িয়ে তার সন্তানকে পরীক্ষার ক্ষেত্রে, উপলব্ধিতে, ভাষাজ্ঞান অর্জনে, সার্বিক দক্ষতায় নিকৃষ্ট মানের সঙ্গে যুক্ত করতে? অথচ প্রাথমিক স্তরে দুটি ভাষা পঠনের সেই অনাকাঙ্ক্ষিত, অবৈজ্ঞানিক ভাষানীতি বহাল রেখে দেশের সন্তানদের নিকৃষ্ট মানের দিকে ঠেলে দিতে একদল মানুষ উঠে পড়ে লেগেছেন। সম্ভাবনাময় সমস্তকে ঠেলে সরিয়ে সম্ভাবনাময় কয়েকজনকে আধিপত্য করাতে উদ্‌গ্রীব হয়েছেন।

গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, রাধাকৃষ্ণন্ কমিশন, কোঠারী কমিশন বারংবার করে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের রায়ই দিয়ে এসেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা এই অঙ্গীকার বারংবার করেছেন। সেই অসমাপ্ত কাজ ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি সম্পন্ন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার সেই অবশ্যকরণীয় সাধারণ কাজটিই করতে চলেছেন। ভালো করে বাংলা শেখাতে চাইছেন, ভালো করে ইংরেজী শেখাতে চাইছেন। ভাষার আধিপত্যে সকলকে জাগাতে চাইছেন। এই শুভ উদ্যোগে বাধা কেন? তবে কি আজও "সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়েকজন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই বহাল" থাকবে? রবীন্দ্রনাথের এই ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা দূর করবার যে ভাষানীতি রাজ্য সরকার রূপ দিতে চলেছেন তা বিশেষজ্ঞ, মনীষীদের আকাঙ্ক্ষাপুষ্ট বলেই এবং সমস্তের দাবীতে জোরালো বলেই ঐ অসমতার ক্ষতিকর রায় আর বহাল থাকবে না। সকল শ্রেণীর মানুষই ভাষার পরিপূর্ণ সেবায় পরিপুষ্ট হবেন, সকল শ্রেণীর মানুষেরই ভাষার প্রয়োজন পরিপূর্ণ মিটবে। ভাষার আধিপত্যে বৃষ্টিধারায় ফসলের মতই সারা দেশের সকল মানুষ জেগে উঠবেন।

'সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিনকালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না। যে কথা দেশের লোক বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।'

—বঙ্কিমচন্দ্র ('বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা')

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে·

জ্যোতির্ময় ঘোষ

প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

"কিন্তু সে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছজাতি, 'সাধারণে'র (অর্থাৎ দ্রোণাচার্যের শিষ্যসাধারণের, এখানে অভিজাত বংশোদ্ভূত কৌরব ও পান্ডব রাজপুত্র-শিষ্য-সাধারণের!) সতীর্থ (একই গুরুর সমকালীন শিষ্য) ও সমতুল্য হয়, ইহা নিতান্ত অনভিপ্রেত, এই বিবেচনা করিয়া দ্রোণ তাহাকে ধনুর্বেদে দীক্ষিত করিলেন না"—বেদব্যাস-বিরচিত মহাভারতের কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত এই অংশটি আদিপর্বের অন্তর্গত।

'একলব্যের অলৌকিক গুরুভক্তি' উপাখ্যানটি সর্বজনবিদিত হলেও প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সংক্ষেপে স্মরণ করা যেতে পারে। দ্রোণাচার্য কর্তৃক এইভাবে প্রত্যাখ্যাত নিষাদযুবক একলব্য অতঃপর কী করলেন? তিনি বিষাদমগ্ন হয়েও দ্রোণকে প্রণাম নিবেদন করে অরণ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে মৃণ্ময় এক দ্রোণ-মূর্তি স্থাপন করে, সেই মূর্তিকেই আচার্যজ্ঞানে বরণ করে অস্ত্র-শিক্ষায় মনঃসংযোগ করলেন। অল্পদিনেই একলব্য অস্ত্রপ্রয়োগ, সংহার ও সন্ধানবিষয়ে অসাধারণ পটুত্ব অর্জন করলেন। পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের ফলে তিনি মহাধনুর্ধর হয়ে উঠলেন।

একদিন কৌরব ও পান্ডব রাজভ্রাতারা মৃগয়ার উদ্দেশ্যে অরণ্যে প্রবেশ করেন। তাঁদের সঙ্গে কুকুরসহ অনুচরও ছিল। কুকুরটি মৃগের অনুসরণক্রমে অরণ্যের গভীরে সহসা মলিনকলেবর জটাধারী নিষাদযুবক একলব্যকে দেখে চীৎকার করতে থাকে। একলব্য নিজের অস্ত্রপ্রয়োগের কুশলতা পরীক্ষার জন্য কুকুরটির মুখ-বিবরে এককালে সাতটি শর নিক্ষেপ করেন। কিছুক্ষণ পরে কুকুরটিকে দেখে পান্ডবেরা চমৎকৃত হয়ে বুঝতে পারেন, এ এক অসাধারণ নৈপুণ্য, যা তাঁদের আয়ত্তাতীত। তাঁরা হীনমন্যতা-বোধে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হন। পান্ডবেরা অতঃপর নিরবচ্ছিন্ন শর-বর্ষণরত একলব্যকে দেখতে পান এবং অনুসন্ধানের উত্তরে জানতে পারেন যে, 'আমি নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণের শিষ্য, এই আশ্রমে একাকী ধনুর্বেদ অনুশীলন করছি!'

পান্ডবেরা দ্রোণকে গিয়ে সব কথা জানালেন। অর্জুন দ্রোণকে নির্জনে জানালেন, দ্রোণ তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে, অর্জুনের চেয়ে তাঁর কোনো শিষ্যই অধিকতর নিপুণ হবেন না—"কিন্তু এক্ষণে তাহার অন্যথা দেখা যাইতেছে। নিষাদাধিপতির পুত্র মহাবল একলব্য আপনার এক শিষ্য, সে ধনুর্বেদে আমা অপেক্ষাও সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।"

বিভ্রান্ত ও বিচলিত দ্রোণ অর্জুনসহ অরণ্যে প্রবেশ করে বারংবার শরবর্ষণরত একলব্যের সম্মুখীন হলেন। সহসা সমাগত দ্রোণকে দেখে তাঁর পাদবন্দনা করে একলব্য নিজেকে তাঁর শিষ্য-রূপে পরিচয় দিয়ে বিধিমতো দ্রোণের পূজা ও উপবেশনের জন্য আসন প্রদান করে জোড়হস্তে গুরুর সামনে দাঁড়ালেন। দ্রোণ তখন বললেন, 'হে বীর, যদি তুমি সত্যিই আমার শিষ্য হও, তবে এবার গুরুদক্ষিণা প্রদান কর!'

সরল ও বীর নিষাদযুবক একলব্য একথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন, গুরুকে অদেয় তাঁর কিছুই থাকতে পারে না! দ্রোণ কী দক্ষিণা চান, তা-ই একলব্য তাঁকে দেবেন। দ্রোণ শুধু আদেশ করলেই হয়।

তখন দ্রোণাচার্য যা বলেছিলেন, সর্বদেশে-কালে শিক্ষক বা শিক্ষকস্থানীয় কোনো ব্যক্তির পক্ষে সেই মানবতাবিরোধী চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতার কল্পনা পর্যন্ত অসম্ভব। মূল মহাভারতের অনুবাদ থেকেই পরবর্তী অংশটি উদ্ধৃত করছি—

"তখন দ্রোণ কহিলেন, 'হে বীর! যদি সম্মত হইয়া থাক তবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া দক্ষিণাস্বরূপে আমাকে সম্প্রদান কর।'—সত্যবাক্ একলব্য দ্রোণের এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও আপনার প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনার্থ প্রফুল্লমনে ও হৃষ্টবদনে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিল।"

উদ্ধৃতি এখানেই শেষ করা যাচ্ছে না। মূল মহাভারতের অনুবাদ থেকে আর তিনটি মাত্র বাক্য উদ্ধার করলেই উপাখ্যানটির সম্পূর্ণ তাৎপর্য পরিস্ফুট হবে। গুরুদক্ষিণা প্রদানের পরই একলব্যের প্রথমেই মনে হয়েছিল, তাঁর শরবর্ষণনৈপুণ্যের কতটা ক্ষতি হলো? মহাভারত-রচয়িতার এই সুগভীর মানব-মনস্তত্ত্ব-সচেতনতা শ্রেষ্ঠ আধুনিক উপন্যাসিকেরও ঈর্ষাস্থল। মহাভারতে বিশ্লেষণ ও বিস্তার নেই বললেই চলে। ন্যূনতম ও অত্যাবশ্যকের বাইরে মহাকবি পদসঞ্চার করেন না। একলব্য গুরুদক্ষিণা প্রদান করলেন—

"তৎপরে অপর অঙ্গুলিদ্বারা শরক্ষেপ করিয়া দেখিল, পূর্বাপেক্ষা শরের লঘুতা (অর্থাৎ ক্ষিপ্রকারিতা তথা মুহুর্মুহু নিক্ষেপশক্তি) হ্রাস পাইয়াছে।" অর্জুনের প্রতিক্রিয়াও লক্ষণীয়। অর্জুন কি একলব্যের এই অসামান্য গুরুভক্তি দেখে আরো একবার আত্মপক্ষে হীনম্মন্যতাবোধে জর্জরিত হয়েছিলেন? অর্জুন কি গভীর সমবেদনায় মর্মাহত হয়ে একবারও একজন সাধারণ মানুষের মতো ভেবেছিলেন, থাক! এই অমানবিক নিষ্ঠুরতার পর কাজ নেই আর দ্বিতীয়রহিত ধনুর্ধর হয়ে? এই জাতীয় অন্তত তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াও স্বাভাবিক ও মানবিক হতো!

মহাভারতকার অকম্পিত হস্তে যা লিখেছিলেন, তা থেকে শুধু এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো চলে যে, আধুনিক সব নিষ্ঠুরতা সব লোভ, সব অবিবেচনা, কান্ডজ্ঞানবর্জিত সব উচ্চাশারই সুপ্রাচীন দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে! মূল মহাভারতে অর্জুনের প্রতিক্রিয়া এই রকম—

"অর্জুন এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন তাঁহার অপকর্ষবিষয়ক আশঙ্কা তিরোহিত হইল; এই ধরাধামে অর্জুনকে কেহই পরাভব করিতে পারিবে না, দ্রোণাচার্যের এই অঙ্গীকারবাক্যও রক্ষা হইল।"

॥ দুই ॥

সকলেই জানেন, মহাভারত ধর্মগ্রন্থ বা তথাকথিত গল্পগ্রন্থ নয়। মহাভারতকে প্রাচীন যুগের সাহিত্যতত্ত্ববিদ্‌গণ তথা সাহিত্য-

সমালোচকেরাও সঠিকভাবেই ইতিহাস বলেই চিহ্নিত করে গেছেন। অসংখ্য বিচিত্র গল্পের কারুকার্যে সুসজ্জিত ও অলংকৃত এই তুলনারহিত গ্রন্থ তদানীন্তন সমাজজীবনের যাবতীয় তথ্য ও অন্তর্নিহিত সত্যসমৃদ্ধ এক অসামান্য ইতিহাস।

রামায়ণও ইতিহাস। সেখানেই শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ শূদ্রের অধিকারবহির্ভূত ছিল বলে জানা যায়। শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের অপরাধে শূদ্রের মস্তকচ্ছেদনে তাই রামকে তৎপর হতে হয়েছিল!

মহাভারতের অর্জুনাদি রাজপুত্র এবং রামায়ণের রাজা রামের যে-সব আচার-আচরণ আধুনিক দৃষ্টিতে 'অসঙ্গতি'রূপে বিবেচিত হয়, সেগুলিকে অসঙ্গতিরূপে ধরে নেওয়ার কারণ এই যে, অর্জুনাদি ও রাম প্রভৃতিকে অতিমানব বা অবতাররূপে দেখার সংস্কার বহুকালাবধি সযত্নে লালিত হয়ে এসেছে। এবং এ সবই উদ্দেশ্যমূলক। তথ্য ও যুক্তিবর্জিত অন্ধভক্তি ও কুসংস্কারের ক্ষতিকর প্রভাবে রামায়ণ-মহাভারতের মতো অসামান্য সাহিত্যগুণ-সমৃদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থাদিকে আমরা বিকৃত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে হয় অলৌকিক ধর্মীয় মাহাত্ম্যপূর্ণ নয় নিছক শ্রুতিসুখকর কাহিনী-মালায় পর্যবসিত করেছি। একলব্য তাঁর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করলে অর্জুনের 'অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন' হয়ে ওঠার কারণ 'তাঁহার (অর্থাৎ অর্জুনের) অপকর্ষবিষয়ক আশঙ্কা তিরোহিত হইল' এবং শূদ্রবধে রামের আত্মতৃপ্তির অবকাশ এখানেই যে, রাম শূদ্রের তথা অন্ত্যজ অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষের গ্রন্থপাঠের তদানীন্তন সমাজানুমোদিত শাস্তিপ্রদান করে 'রাজকর্তব্য' সমাধা করতে পারলেন!

মনে রাখতে হবে, মহাভারতকার স্পষ্টই লিখেছেন, 'অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছজাতি' অভিজাতবংশীয় রাজপুত্রগণের 'সতীর্থ ও সমতুল্য হয়, ইহা নিতান্ত অনভিপ্রেত'! শূদ্রজাতি গ্রন্থাদি পাঠের জ্ঞান আহরণ করবে, রামায়ণ-এ দেখা যাচ্ছে, তা-ও 'নিতান্ত অনভিপ্রেত'!

সুতরাং একালের পাঠকের চোখে রাম ও অর্জুনাদির আচার-আচরণ অসঙ্গত, অন্যায়, এমন কি মনুষ্যত্বদ্বেষী বলে মনে হলেও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ তদানীন্তন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পটভূমিকায় এবং শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীস্বার্থরক্ষার দিক থেকে দেখলে একলব্যকে তাঁর সাধনালব্ধ ধনুর্বিদ্যা থেকে বঞ্চিত ও অক্ষম করে অর্জুনের 'প্রীতি' 'প্রসন্নতা' এবং কষ্টার্জিত গ্রন্থপাঠক্ষমতার 'অপরাধে' শূদ্রকে হত্যা করে রামের 'আত্মতৃপ্তি' আদৌ অপ্রত্যাশিত ও অসম্ভব বলে মনে করা যায় না!

দ্রোণাচার্যের আচরণকে মানবতাবিরোধী চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা বলে চিহ্নিত করতেই হবে কিন্তু তাঁর আচরণও উপরি-উক্ত কারণে অপ্রত্যাশিত ও অসম্ভব নয়। চরিত্রের বিচারেও এতে কোনো অসঙ্গতি খুঁজে লাভ নেই।

একজন প্রকৃত শিক্ষক তথা গুরুর এই মনুষ্যত্বদ্বেষী নিষ্ঠুরতা কল্পনা করাও কঠিন বটে, তবু বাস্তব সত্য অতিশয় নির্মম!

দ্রোণাচার্য কে?

তিনি শিক্ষক তথা আচার্য। এই তাঁর বৃত্তি ও জীবিকা।

শ্রেণীচরিত্রের বিশ্লেষণে তিনি বুদ্ধিজীবী। বিদ্যাবুদ্ধির ব্যবহার তথা বিক্রয় দ্বারাই তাঁর জীবনযাপন। তিনি কৌরব ও পাণ্ডব রাজভ্রাতাদের শিক্ষাদানকার্যের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই কার্যের বিনিময়ে দ্রোণ বেতনস্বরূপ কী পেতেন, মূল মহাভারতের অনুবাদ থেকেই দেখা যেতে পারে—"ভীষ্মদেব প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রচুর অর্থের সহিত পৌত্রদিগকে শিষ্যরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত পরিচ্ছন্ন ও ধনধান্যসম্পন্ন এক গৃহ নির্দেশ করিয়া দিলেন।"

এই বেতনের বিনিময়ে দ্রোণ কুরুপাণ্ডব রাজপুত্রদের শিক্ষাগুরুরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রথমাবধি তিনি অর্জুনের প্রতি অধিকতর অনুকূল ছিলেন। খুব সঙ্গত বাস্তব কারণেই তাই দ্রোণ 'অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছজাতি'ভুক্ত একলব্যকে কুরুপাণ্ডব রাজপুত্রদের 'সতীর্থ ও সমতুল্য'রূপে গ্রহণ ও শিক্ষাদান করতে পারেন না। একলব্যকে যে দ্রোণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তার কারণ তাঁর শ্রেণী-চেতনাজনিত বিমুখতা ও অস্পৃশ্যতা নিশ্চয়ই। শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীস্বার্থকে যদি তিনি অস্বীকার করতেও চাইতেন এবং একলব্যকে অভিজাত রাজপুত্রদের 'সতীর্থ ও সমতুল্য' স্থানে শিক্ষাদান করতেন —তাহলে রাজ-পরিবারের ঐ লোভনীয় বেতন ও সুখ সুবিধার শিক্ষক-পদটি থেকে দ্রোণ নিশ্চিত বিতাড়িত হতেন। তাঁকে পুনরায় কর্মচ্যুত হতে হতো। তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ ও নিরাপত্তা তাতে বিনষ্ট হতো। চাকরি-খোয়ানোর ভয় সেকালেও বুদ্ধিজীবী দ্রোণের এক তিল কম ছিল না। বাঁধা বেতনের উপরেও বুদ্ধিমান ভীষ্ম তাঁকে 'কুরুদিগে'র 'যাবতীয় ধন ও রাজ্য'-ভোগের আশ্বাসও দিয়ে রেখে-ছিলেন। মহাভারতের পাঠকমাত্রই জানেন, এই নবলব্ধ পদটি লাভের পূর্বে কী ভাবে দ্রোণ দ্রুপদরাজের দ্বারা অপমানিত হয়েছিলেন। সুতরাং দ্রোণ নিষাদাধিপতির পুত্র অস্পৃশ্য অন্ত্যজ একলব্যকে কুরুপাণ্ডব রাজপুত্রদের সঙ্গে শিষ্যরূপে স্বতন্ত্রভাবে বা একাসনে গ্রহণ করতেই পারেন না। সেটা হতো তাঁর পক্ষে বিলাসিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা। অগ্রিম এককালীন প্রচুর অর্থ (অ্যাডভান্স), সুরম্য সুসজ্জিত ভবন (ওয়েল-ফারনিশড কোয়ার্টার), সেই ভবন আবার ধনধান্যসম্পন্ন এবং তদুপরি 'কুরুদিগের' 'যাবতীয় ধন ও রাজ্য-ভোগের' আশ্বাসের লোভ পরিত্যাগ করে দ্রোণের মতো অদ্বিতীয় আচার্যও কোনো দিন স্বাধীনচিত্ত, ন্যায়নীতিসঙ্গত, মানবিকবিচারবোধ-সমন্বিত কার্য-ধারার পরিচয় দিতে পারেন নি—এটা মনে রাখতে হবে। একই কারণে পরে দ্রোণকে অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুর আচরণে প্রবৃত্ত হতে দেখি। শ্রেণীচরিত্র, অর্জুনের প্রতি স্নেহাধিক্য এবং ব্যক্তিগত ঈর্ষাও ঐ আচরণের কারণ। ঘটনাটা কী? দ্রোণকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েও তো একলব্য শুধু তাঁর ব্যক্তিগত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের জোরেই দ্রোণাচার্যের চেয়েও ধনুর্বেদে অনেক, অনেক বেশি নিপুণ হয়ে উঠেছিলেন? শুধু অর্জুনের আত্মাভিমানই নয়, দ্রোণের আত্মাভি-মানও এইভাবে আহত হয়েছিল নিষাদযুবক একলব্যের অসামান্য দক্ষতা-অর্জনের ফলে। তাই, একলব্যকে তাঁর সরলতা, নির্ভীকতা ও গুরুভক্তির দণ্ড দিতে হলো এইভাবে। অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ যুবক একলব্য শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধররূপে পরিকীর্তিত হবেন, এটা অর্জুন-দ্রোণদের শ্রেণীস্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। বুদ্ধিজীবী দ্রোণাচার্য যখনই দেখলেন, তাঁর ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত প্রাধান্য ও গুণপনা ঐ অন্ত্যজ অস্পৃশ্য নিষাদযুবক একলব্যের সাধনায় খর্ব হয়ে গেছে, তখনই তিনি চূড়ান্ত মানবতাবিরোধী একটি পাপ-কার্যে প্রবৃত্ত হলেন। একলব্যের সরলতা ও শ্রদ্ধার সুযোগ নিয়ে তাঁর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠটি গুরুদক্ষিণারূপে দাবি করে বসলেন!

বুদ্ধিজীবী বলেই কি এই হীনতা ও নিষ্ঠুরতা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল? তা নিশ্চয়ই নয়। তবে যত বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীই হন না কেন যখন তিনি দ্রোণাচার্যের মতো আত্মবিক্রয় করে বসেন, তখনই এই জাতীয় বিবেকবর্জিত নিষ্ঠুরতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। বুদ্ধিজীবী যদি বুদ্ধিযোগীও হন, তা হলে এই বিবেকবর্জিত আবরণ থেকে আত্মরক্ষা অসম্ভব নয়। বুদ্ধিযোগী অর্থাৎ বুদ্ধির সাত্ত্বিক সাধনায় যিনি প্রবৃত্ত হন এবং পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা ও সত্যসন্ধানের ব্যাকুলতা যাঁর নিরন্তর—তিনিই তামসিক আত্মমোহ ও আত্মখণ্ডন থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন। বুদ্ধি শুধু

জীবিকা-অর্জনের মাধ্যম হতে পারে না, বুদ্ধি-যোগে মানুষ তার পারিপার্শ্বিকতার বোধ ও সমাজচেতনার শুদ্ধ স্তরেও উপনীত হয়। তখনই একজন বুদ্ধিজীবীকে বুদ্ধিযোগীও বলি। অর্থাৎ সত্যের সাধনায় যিনি অক্লান্ত, সেই বুদ্ধিযোগীকেই প্রকৃত বুদ্ধিজীবী বলা যায়।

॥ তিন ॥

তা হলে বুদ্ধিজীবী হলেই তিনি বিভ্রান্ত বা বিচারবিবেক-বর্জিত হবেনই, এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু বুদ্ধিজীবীও বিভ্রান্ত এবং বিচারবিবেকবর্জিত হতে পারেন। প্রকৃত বুদ্ধিজীবী এই অর্থেই বুদ্ধিযোগী বা বুদ্ধির সাধক, সাধনা ও সন্ধানের সততায় যার বুদ্ধি শুদ্ধ ও নির্মোহ। শুদ্ধ ও নির্মোহ বুদ্ধি থেকেই নির্মোহ দৃষ্টি অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টির অধিকার জন্মায়। নিরাসক্ত দৃষ্টি তথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিও বলা যেতে পারে একে। এই দৃষ্টি ইতিহাসসচেতন। এই দৃষ্টি গতিশীল। সে-গতি সম্মুখবর্তী, সে-গতি পশ্চাদ্‌গতি নয়!

নৃপতি রাম ও রাজপুত্রদের শিক্ষক দ্রোণ বিদ্যাবুদ্ধির শুধু অধিকারীই ছিলেন না, তাঁরা নিজের-নিজের বিষয়ে পারদর্শী, সুপণ্ডিত ও প্রায় অদ্বিতীয় গুণী পুরুষ ছিলেন। বুদ্ধিজীবী-রূপে তাঁরা ছিলেন তাঁদের সমকালে সর্বাগ্রগণ্য। তবু, তাঁরা মানবতা-বিরোধী, নৃশংস কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কারণ, তাঁদের বুদ্ধি ও দৃষ্টি বিশুদ্ধ অর্থাৎ নির্মোহ অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ সম্মুখগতি তথা প্রগতিশীল ছিল না। রাম তো তাঁর ব্যক্তিজীবনে প্রচলিত কুসংস্কারের দাসত্ববন্ধনে নিত্যজর্জরিত ছিলেন। অশেষ গুণপনা সত্ত্বেও তিনি নিরপরাধ নারী, তাঁর পত্নীর অমানুষিক লাঞ্ছনায় যন্ত্র-রূপে নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিয়েছিলেন। তাই মাইকেল যখন বলেন, তিনি রামকে ঘৃণা করেন, তখন সেই মন্তব্যের তাৎপর্য এই-ভাবেই দেখতে হয়।

সুতরাং নিজের-নিজের বিষয়ে অসীম জ্ঞান ও পারদর্শিতা, তীক্ষ্ন বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবীরা কায়েমী স্বার্থের পরিপোষক ও প্রতিক্রিয়াশীলরূপে চিরকালই ব্যবহৃত হয়ে এসেছেন। বুদ্ধি ও দৃষ্টি নির্মোহ ও প্রগতিশীল না-হলে এ-রকমটা অনিবার্য বলেই মনে হয়।

তাই যাকে আমরা সাধারণতঃ ব্যক্তিগত চরিত্রের অসঙ্গতি ও জটিলতারূপে নির্দেশ করে থাকি, তার মূলে নিহিত আসলে ব্যক্তি-বিশেষের শ্রেণীচরিত্র ও শ্রেণীস্বার্থরক্ষার সচেতন বা অনতিসচেতন বা আপাত-দুর্বোধ্য প্রয়াসের গভীরে!

লেখক-শিল্পী-সাংবাদিক-শিক্ষক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী তো সমাজবিচ্ছিন্ন নন। তাঁদেরও অন্নবস্ত্রের সংস্থানের কথা ভাবতে হয়। স্বভাবতই তাঁদের ক্ষেত্রেও চিন্তা ও বুদ্ধির স্বাধীনতা রক্ষা একটি সুকঠিন কাজ। অর্থ-সম্মান-প্রতিষ্ঠা ও পদমর্যাদা লাভ ও বুদ্ধির দিকে বুদ্ধিজীবীরা যদি ঝুঁকে পড়েন, তা হলে ক্রমশঃ দেশ ও সমাজের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলির ইচ্ছাপূরণের যন্ত্রে তাঁদের পর্যবসিত হতেই হয়। লেখকদের প্রসঙ্গে উচ্চারিত মনীষী মার্কসের সতর্কবাণীটি তাই সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীগণের পক্ষেও প্রযোজ্য—'The writer, of course, must earn in order to be able to live and write, but he must by no means live and write to earn'.—Marx-Engels: On Literature and Art., পৃষ্ঠা ১৪৭।

রাম স্বয়ং প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন, কিন্তু সাধ্বী স্ত্রীর চরিত্রে ভিত্তিহীন সংশয় তাঁর নিজেরও জেগেছিল এবং তিনি নারীর ব্যক্তিত্ব ও নারী-স্বাধীনতার প্রতি তদানীন্তন সমাজ-মানসিকতার দ্বারাই চালিত হয়ে সমাজের কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূরূপেই যা করার, তাই করেছিলেন, তিনি প্রজানুরঞ্জক সম্ভবতঃ ছিলেন না, কারণ তা হলে তিনি শাস্ত্রগ্রন্থপাঠের অপরাধে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য তাঁরই প্রজাকে হত্যা করতে পারতেন না, কিন্তু তিনি যে কায়েমী স্বার্থের একনিষ্ঠ রক্ষক ছিলেন, রামায়ণ-এর নির্মোহ পাঠকের সে-বিষয়ে কোনো সংশয়ই থাকতে পারে না।

॥ চার ॥

রামায়ণ-মহাভারতের দৃষ্টান্ত নিয়েই এই বাগ্‌বিস্তার কেন অত্যাবশ্যক বলে মনে করেছি, এই প্রবন্ধের যে-কোনো মনোযোগী পাঠকই তা' অনুভব করবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের প্রধান সামাজিক ব্যাধিটির নাম স্থবিরতা। এস. ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ' রচনার সেই মন্তব্যটি সত্যিই প্রবাদপ্রতিম—'সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে'! রামায়ণ-মহাভারতের মতো ক্লাসিক গ্রন্থাদির প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গের ব্যবহার এমনিতেই প্রত্যাশিত। তদুপরি, স্থবিরতাই আমাদের 'অপরিত্যাজ্য ধর্ম' হয়ে উঠেছে। নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমেই, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে সময়ের বিচারে বহু দূরে চলে আসার পরেও আমাদের চলমান জীবনে না হলেও আমাদের মানসিকতায় একটি দুর্বোধ্য ও দুর্ভেদ্য রক্ষণশীলতাই সতত সক্রিয়। তাই আমাদের রাষ্ট্রচিন্তার পরাকাষ্ঠা রামরাজত্বের কল্পনা-বিলাসে এবং আমাদের অগ্রণী কিছু বুদ্ধিজীবীও সর্বকালের দ্রোণাচার্যের পদাঙ্ক-অনুসরণে চরিতার্থ। রামায়ণ-মহাভারতের কাল থেকেই দুর্ভাগ্যজনক হলেও একটি নির্মম সত্য প্রতিভাত হয়ে এসেছে। একলব্যের শোচনীয় পরিণাম এবং গ্রন্থপাঠের অপরাধে রামায়ণে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের মস্তকচ্ছেদন যে-কারণে ঘটেছিল, পরাধীন ভারতবর্ষে বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীও সেই একই কারণে এই বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যর্থ নমস্কার লাভ করেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। সেই একই কারণে আজ পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের প্রস্তাবিত ও প্রবর্তিত পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা-নীতি দুশ্যাত বিরোধিতার সম্মুখীন!

সেই কারণটি কী? রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যার তীব্রতা এতটুকু হ্রাস পায় নি? সময় বদলাচ্ছে, যুগের অবসান ঘটছে, তবু প্রতিক্রিয়া ও কায়েমীস্বার্থের পরিপোষক একটা অদ্ভুত ও অসত্য দৃষ্টিভঙ্গি অটল প্রতিষ্ঠিত থেকে যাচ্ছে এ দেশে সর্বকালেই—এই অবিশ্বাস্য রহস্যের মূল কোথায় নিহিত?

খুব সংক্ষেপে, এক কথায় এর জবাব দিতে হলে বলা যায়—মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী অভিজাত একটি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যই, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকেই যখনই জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিকিরণের সুযোগ ও সম্ভাবনাসৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে, তখনই ঐ মুষ্টিমেয় শ্রেণী এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত, পুষ্ট ও আশ্রিত কিছু গণ্যমান্য মানুষ সেই চেষ্টার মূলে নির্মম কুঠারাঘাত করেছেন।

সেই প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞানালোকের উৎস শিক্ষা মুষ্টিমেয় মানুষের করতলগত থেকে গেছে। ঐ কৃপণ মুঠি খুলবার চেষ্টা যখনই হয়েছে, যখনই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা হয়েছে, লোকশিক্ষা বা জনশিক্ষা বা গণশিক্ষার প্রস্তাব ও পরি-কল্পনা যখনই উত্থাপিত ও গৃহীত হয়েছে, তখনই ঐ মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী মানুষের শ্রেণী সর্বতোভাবে তাতে বাধাদানে প্রবৃত্ত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে, শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রেণীস্বার্থের এই তত্ত্বটিকে তথ্য ও যুক্তির জোরেই অস্বীকার করার কোনো উপায়ই আর থাকে না।

আমি সেইজন্যই রামায়ণ-মহাভারত থেকে প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ আহরণ করে নবপ্রবর্তিত ভাষানীতি বিষয়ে আলোচনা করে থাকি। এই প্রবন্ধে আমি প্রধানত এই দিকটিতেই জোর দিতে চেয়েছি। নবপ্রবর্তিত ভাষানীতির সপক্ষে কে কী বলেছেন এবং এই ভাষা-নীতির অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দিক নিয়ে অনেক বলেছি ও একাধিক প্রবন্ধ লিখেছি। এই প্রবন্ধে আমি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বজনীন শিক্ষার বিরোধীদের বিরোধিতার স্বরূপ উন্মোচনে ও বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি। আলোচনার প্রথমার্ধে তাই আমার প্রধান জিজ্ঞাসা হচ্ছে সমাজের গণ্যমান্য বুদ্ধিজীবীরাও কেন সহজ সরল বিষয়ে অদ্ভুত ও জটিল মনোভঙ্গির অবতারণা করেন? যা' সর্বজন-বোধ্য ও সর্বজনস্বীকৃত তাও যখন তাঁদের বোধগম্য হয় না, তখন বিস্ময় ও ক্ষোভের সঞ্চার যদিও স্বাভাবিক, তবু ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের অগ্রণী বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রমের কারণটি বুঝে নিতে হবে। কেন না সকলেই জেনে-শুনে সর্বজনীন শিক্ষার বিরোধিতা করছেন, তা' না-ও হতে পারে। সকলেই বস্তুনিষ্ঠভাবে শিক্ষা নিয়েই ভাবিত, তা-ও না হতে পারে। অনেকেই রাজনৈতিকভাবে বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করছেন, এই সত্যটি অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেশের স্বার্থে, জনস্বার্থে দলীয় রাজ-নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করা যখন অত্যাবশ্যক, তখনই তাঁরা সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য জনস্বার্থকেই বলিদান করবেন, এই শোচনীয় দুর্ভাগ্যের সীমা কোথায়?

রবীন্দ্রনাথ পৌষ ১৩২২ বঙ্গাব্দে রচিত 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে স্পষ্টই লিখেছিলেন, 'এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গোখলে এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি, দেশের মধ্যে বাংলাদেশের কাছ হইতেই তিনি সবচেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলাদেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে।'

সেদিনের সেই বাধাও তো সমস্ত দেশের লোক এক হয়ে দেয় নি। সেই বাধাও এসেছিল মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীর পক্ষ থেকে। তাঁরাও ছিলেন সেকালের গণ্যমান্য মানুষ।

আগেই বলেছি, প্রাচীনকাল থেকেই কথাটা সত্য, গণ্যমান্য ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষেরা অনেক সময়েই জীবন ও জীবিকার বৈশিষ্ট্য অনুসারে সংকীর্ণ বুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে থাকেন। এটা দুঃখ ও দুর্ভাগ্যজনক হলেও শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণে আদৌ বিস্ময়কর নয়।

বিশেষ করে আধুনিক কালে পাশ্চাত্য বিদ্যার যে চর্চা আমরা করেছি, প্রথমাবধি এবং মূলত তা অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ একটি শিক্ষা। এই শিক্ষা নিতান্ত মুষ্টিমেয় মানুষকেই—না, আলোকিত করে নি—গভীরতর বিচ্ছিন্নতার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করেছে—সেই বিচ্ছেদ কী নিদারুণরূপে ভয়ংকর, তা ওঁদের আত্ম-কেন্দ্রিকতা থেকেই চিরকাল প্রতিভাত হয়ে এসেছে। এই ইংরেজি শিক্ষার স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে নগ্ন করে দেখিয়েছেন, তাতেই তার সীমাবদ্ধতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে—'শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হলো এনলাইটেন্‌ড্, আলোকিত সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ।'—এই আলো যে গভীরতর অন্ধকার-ময় এক বিচ্ছিন্নতা, তার পরিচয় অকুণ্ঠিত লেখনীতে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন এইভাবে—'ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন (লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি বিদ্যা 'আত্মস্থ' করার কথা বললেন না, আমাদের ইংরেজি-পড়া বিদ্বানরা ইংরেজি পড়া 'মুখস্থ'ই করলেন, রবীন্দ্রনাথের এই নির্মোহ বিশ্লেষণ কী নির্মম!—লেখক।) শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় (কী শিক্ষাই তাঁরা পেলেন! শিক্ষাদীপ্ত 'দৃষ্টি'ও তা হলে 'অন্ধ' হতে পারে? রবীন্দ্রনাথের এই 'সত্যদর্শন নির্মম হলেও সত্য।—লেখক) তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিতসমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত।'—শিক্ষার বিকিরণ॥ শিক্ষা॥ ফেব্রুয়ারি ১৩৩৩।

'ইংরেজি-পড়া বিদ্বানরা' তা-হ'লে 'দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিতসমাজ'? অর্থাৎ, দেশ বলতে তাঁরা বুঝলেন শুধু নিজেদের শ্রেণীকেই? একেই বলেছি, গভীরতর অন্ধকারময় এক বিচ্ছিন্নতা! আমাদের অগ্রণী বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই কী সেকালে, কী একালে, এই বিচ্ছিন্নতার যূপকাষ্ঠেই আত্মহত্যা করেছেন! তাঁরা নিজের-নিজের বিষয়ে অসামান্য পারদর্শী! জ্ঞানিগুণী এই সব বুদ্ধিজীবী কিন্তু জনজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন! পুঁথিগত ব্যাখ্যায়-বিশ্লেষণে এ'রা নিপুণ; এমন-কি তত্ত্বগতভাবে কেউ-কেউ জনজীবনের ইতিহাস রচনায় পথিকৃৎ, কিন্তু হায়, জীবনাচরণে এ'দের আত্মকেন্দ্রিকতা অপরিসীম! রবীন্দ্রনাথ তাই এ'দের স্তরের মানুষের সীমাবদ্ধতার সূত্রটি এইভাবে পরিস্ফুট করে গেছেন—'ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে, সকলের চেয়ে বড়ো মতভেদ এই-খানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা'—শিক্ষার বিকিরণ॥ শিক্ষা॥ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩।

॥ পাঁচ ॥

'শিক্ষাবিধি' প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আধুনিক বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথকে তাই গভীর দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে এই নিদারুণ আত্মকেন্দ্রিকতা ও রক্ষণশীলতার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করতে হয়েছিল 'যে দেশে সামাজিক শিক্ষাশালায় বাঁধা প্রথা হইতে এক চুল সরিয়া গেলে জাত হারাইতে হয় সে দেশে মানুষ হইবার পক্ষে গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড বাধা।' --শিক্ষাবিধি॥ শিক্ষা॥ ৩১ শ্রাবণ ১৩১৯ বঙ্গাব্দে লিখিত।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাঁধা প্রথা থেকে এক চুল সরতে গেলেই জাত হারাতে হয়, রক্ষণশীলতা ও স্থবিরতা এ দেশে এতই প্রবল। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দেও রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা ছিল এই। অথচ, তখনকার য়ুরোপীয় শিক্ষাবিধির বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ একই লেখায় মন্তব্য করেছিলেন—'য়ুরোপে ছেলেদের মানুষ করিবার পন্থা আপনা-আপনি পরিবর্তিত হইতেছে। ইহাদের চিত্ত যতই নানা ভাবের জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সংস্রবে সচেতন হইয়া উঠিতেছে ততই ইহাদের পথের পরিবর্তন দ্রুত হইতেছে।'—এই অবস্থায়, লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ—'অতএব, চিত্তের গতি-অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয়।'

কিন্তু, চিত্তের গতিনির্ণয় সহজ কাজ নয়। তাই, 'নানা লোকের নানা চেষ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অঙ্কিত হইতে থাকে। এইজন্য সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ-আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা।'

কিন্তু, যেখানে বাঁধা প্রথা থেকে এক চুল সরতে গেলেই জাত হারাতে হয়, সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে গেলেই 'গেল' 'গেল' রব উঠতে থাকে! এ দেশের এই দুর্ভাগ্যজনক স্থানুস্বভাব রবীন্দ্রনাথকেও ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করেছিল।

আজ যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক স্তরে একটি নতুন পাঠ্যক্রম ও শিক্ষানীতি তথা ভাষানীতি প্রবর্তনে অগ্রসর হয়েছেন, তখনই এই সরকারের জাত-কুল-শীল-মান সমস্তই আক্রান্ত

হয়েছে। এমন-কি, সে-সবের চেয়েও বেশি, এই নবপ্রবর্তিত পাঠ্যক্রম ও শিক্ষানীতির বিরোধিতায় যে স্বল্পসংখ্যক মানুষ প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁরা এই পাঠ্যক্রম ও শিক্ষানীতি প্রবর্তনের অপরাধে এই সরকারের অস্তিত্বের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করে দিয়েছেন।

যে-কোনো মানুষ, যদি তিনি তাঁর বুদ্ধির অবমাননা করতে না চান, এই সব দেখে স্বভাবতই প্রশ্ন করবেন—তা' হলে প্রকৃত সত্যটা কী? নবপ্রবর্তিত পাঠ্যক্রম ও শিক্ষানীতি তথা ভাষানীতি মনঃপূত নয় বলেই কি একেবারে রাজ্য সরকারকেই পতনযোগ্য বলে মনে হচ্ছে, না কি, এই রাজ্য সরকারই 'নিতান্ত অনভিপ্রেত' বলেই সেই সরকারের প্রবর্তিত অন্যান্য সব কিছুর মতোই তাঁদের প্রবর্তিত পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা তথা ভাষানীতিও অতি অবশ্যই বিরোধিতার যোগ্য?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক স্তরের জন্য পাঠ্যক্রম ও ভাষানীতিবিষয়ক যে-পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, তা মুদ্রিত গ্রন্থাকারে বিনামূল্যে আগ্রহী জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। মোট এক শত সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠার 'প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি' শীর্ষক বইটি অন্যান্য অনেকের মতোই আমার হাতেও এসেছে। যে-কেউ ইচ্ছা করলে এই বইটি সংগ্রহ করতে পারেন। বইটির প্রকাশকাল ১৯৭৯। বইটিতে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারিত পরিকল্পনা, পাঠ্যসূচি, ভাষানীতি প্রভৃতি মুদ্রিত। অক্টোবর ১৯৮০ থেকে চলতি মার্চ ১৯৮১ পর্যন্ত বিগত ছ'মাস যাবৎ প্রথমে প্রস্তাবিত ও এখন প্রবর্তিত এই পাঠ্যক্রম ও শিক্ষানীতি বিষয়ে যত রকম আপত্তি-অভিযোগ-ক্ষোভ-ক্রোধ-অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে তার কেন্দ্রবিন্দু দু'টি। প্রবর্তিত পাঠ্যক্রম ও শিক্ষানীতির বিরোধীরা বলছেন—

এক॥ 'সহজ পাঠ' ভাষাশিক্ষার বই হিসেবে প্রাথমিক স্তরে রাখতেই হবে।

দুই॥ প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক রাখতেই হবে।

একটু আগেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচারিত যে-বইটির কথা বলেছি, তার একশত সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠার মধ্যে কোথাও 'সহজ পাঠ' প্রসঙ্গে কিছু খুঁজে পাই নি। প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয় ভাষা, বিশেষতঃ এক্ষেত্রে, বিদেশী ভাষা ইংরেজি কেন শিক্ষণীয় নয়, সে সম্বন্ধে এই বইটিতে যুক্তিপূর্ণ একটি প্রতিবেদন চোখে পড়েছে।

এই প্রবন্ধে 'সহজ পাঠ' প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হব না। কারণ, 'সহজ পাঠ' কেন ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক বই হতে পারে না, তা' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সভা-সমাবেশে এবং প্রবন্ধাদিতে ইতঃপূর্বেই হয়ে গেছে। তা' ছাড়া, প্রস্তাবিত নতুন বইটির সঙ্গে 'সহজ পাঠ'-ও থাকছে বলে জানা গেছে। তবু, প্রাসঙ্গিক বোধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে নবপ্রবর্তিত পাঠ্যক্রমে কী আছে না আছে, তা' না-দেখেই বিরোধীরা কেন 'সহজ পাঠ' নিয়ে 'গেল' 'গেল' রবে দিকদিগন্ত মুখরিত করে তুলেছিলেন? তাঁরা কেউ এই পাঠ্যক্রমের কোথাও 'সহজ পাঠ' বিষয়ক কোনো সংবাদই পেতেই পারেন না। সকলেই স্বীকার করবেন, প্রাথমিক পাঠ্যক্রম 'সহজ পাঠ'-বর্জিত হলেই 'জনবিরোধী' হয়ে যেতে পারত না! সমগ্র পাঠ্যক্রমের মধ্যে একটি বই থাকা বা না-থাকায় সমগ্র পাঠ্যক্রমটি 'জনবিরোধী বা গণমুখী' হয়ে উঠবে, 'সহজ পাঠ' তেমন বই নয়! একটি বিশেষ বই ভাষাশিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য হলে সে-বই ভাষাশিক্ষার জন্য রাখতেই হয় আর অপরিহার্য না-হলে সে-বই রেখে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। এতো সহজ কথা।

প্রশ্ন এটা নয় যে, 'সহজ পাঠ' কাব্যসুরভিত, সাহিত্যগুণে-সমন্বিত কী-না। কারণ, সে-প্রশ্নই বাতুলতা। 'সহজ পাঠ' যে মহাকবির সৃষ্টিশীল প্রতিভার একটি চমৎকার নিদর্শন, তা' নিয়ে প্রশ্ন তোলারই স্পর্ধা কার হতে পারে, ভাবতে পারি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' বা 'কল্পনা' আরো অনেক বেশি কাব্য-সুরভিত, কল্পনাময় ও সাহিত্যগুণান্বিত হলেও কেউ কি 'সোনার তরী' বা 'কল্পনা' কাব্য প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে অনুমোদন করতে সম্মত হবেন? সুতরাং, 'সহজ পাঠ'-এর কবিত্ব গুণ প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে বিচার্য বিষয়ই হতে পারে না।

কিন্তু, পাঠ্যক্রমকে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে অন্বিত, অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতেই হবে, দেশবিদেশের সব শিক্ষাবিদ্, মনীষী এবং এ-দেশের শিক্ষা কমিশনগুলি সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর 'শিক্ষাবিধি' প্রবন্ধে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যক্রম ও সমগ্র শিক্ষাক্রম রচনার অমূল্য পরামর্শ দিয়ে গেছেন—'সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছেই এবং ঘটিবেই, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না, অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করিয়া রাখিলে মানুষের পক্ষে তেমন দুর্গতির কারণ আর-কিছুই হইতে পারে না। এ কেমনতরো?'

'সহজ পাঠ' বইটির কবিত্ব-অংশ চিরকালীন। কিন্তু তার মধ্যে যে-সামাজিক পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত বর্ণিত হয়েছে, সঙ্গত-কারণেই তা 'সহজ পাঠ' রচনার সমকালীন। 'সহজ পাঠ' বিশেষ 'মান'-এর ছেলেমেয়েদের জন্য পাঠ্যপুস্তকরূপে রচিত, 'সহজ পাঠ' রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন সৃষ্টিশীল রচনা নয় তাঁর গল্প-উপন্যাস-কবিতার মতো। সুতরাং 'সহজ পাঠ'-এর কবিত্ব প্রত্যাশিতভাবেই তদানীন্তন সমাজ-পরিবেশের দ্বারা বহুলাংশেই নিয়ন্ত্রিত। তাই 'সহজ পাঠ' বহুলাংশে আজ আর প্রাসঙ্গিক নয়। অথচ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী শিশুদের তাদের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার অনিবার্য প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। তা' ছাড়া মনে রাখা জরুরি, 'সহজ পাঠ'-এর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে এটা প্রমাণিত যে, বইটি লিখিত হয়েছিল বিশেষভাবে শান্তি-নিকেতনের তদানীন্তন ছাত্রদের জন্য—এবং তা'ও পরীক্ষামূলকভাবে।

এই সহজবোধ্য কারণেই 'সহজ পাঠ' চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই ভাষাশিক্ষার বই হিসেবে বর্জন করলে কিছুমাত্র সর্বনাশ ঘটতো বলে মনে করি না।

॥ ছয় ॥

প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক রাখতেই হবে—এই স্লোগান এক কথায় সম্পূর্ণতঃ জনবিরোধী। জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রাঙ্গণে আহ্বানের কিছুমাত্র সদিচ্ছা আছে, এমন কোনো সুস্থ চিন্তার মানুষের পক্ষে এই প্রায় শতাব্দীকালের ধিক্কৃত স্লোগানটিকে গৌণভাবে মৌনভাবেও সমর্থন করা আদৌ সম্ভব বলে বিশ্বাস করি না। যাঁরা এই পঙ্গু, বিকৃত, হাস্যকর ও অনিষ্টকর স্লোগানটিকে সোচ্চারে সমর্থন করেছেন ও এখনও করে চলেছেন, তাঁরা কেউ বস্তুনিষ্ঠ ও নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে বিষয়টিকে সৎ ও শুদ্ধ শিক্ষাগত বিচারবিশ্লেষণের দিক থেকে দেখেছেন বলেও বিশ্বাস করার কোনো কারণ পাই নি।

আমাদের অগ্রণী বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের অন্ধ বিরোধী কিছু লোকজনের দ্বারা প্ররোচিত, প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত হয়েছেন বলে মনে হয়। কিছু

শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষের অন্ধ অভ্যাসে হঠাৎ ঘা' লাগায় যে সাময়িক সংবেদনার সৃষ্টি হয়েছে, তাঁদের সেই দুর্বল স্থানে বিরোধী রাজনীতির লোকজনেরা ধারাবাহিক প্রচার চালিয়ে একটি স্থায়ী ক্ষত নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শহুরে অভিজাত ও ইংরেজি-পড়া-মুখস্থ-করা সমাজের মুষ্টিমেয় লোকজনেরা যে বিচলিত বোধ করেছেন, তা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক হয়েছে।

লোকশিক্ষার জন্য চাই বিদ্যাবিস্তার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধেই বলেছেন, 'বিদ্যাবিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি।'

কেউ-কেউ আবার এই রবীন্দ্রবাণীর বিকৃত ব্যাখ্যা করে বলাবলি করেছেন যে, এখানে বাহন অর্থে মাধ্যমের কথাই বলা হয়েছে। এখানে যে মাধ্যমের কথা হচ্ছে না, তা প্রবন্ধটির এই উদ্ধৃত অংশের পরেই স্পষ্টতর হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে প্রবেশ করার পূর্বে আরো পূর্ববর্তী একটি বাক্য পরীক্ষা করলেই প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি বর্জনের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের আরো একটি স্পষ্টোক্তি পাওয়া যাবে—'দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশি হয় তখন এই পর্যন্ত বলিঃ আচ্ছা বেশ, খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলাভাষায় দেওয়া চলিবে, কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে 'গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্'।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কী করতে চাইছেন?

'খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা (অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাটা—লেখক), বাংলাভাষায় দেওয়া' হোক! এই তো? কিন্তু নবপ্রবর্তিত শিক্ষানীতির বিরোধীরা পৌষ ১৩২২ বঙ্গাব্দে লিখিত 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে সর্বজনীন শিক্ষার তদানীন্তন বিরোধীদের উল্লিখিত দাক্ষিণ্যটুকুরও অধিকারী নন। আজকের বিরোধীদের সংকীর্ণতা ও বিরুদ্ধতার সীমানাটা কোথায়?

এই প্রবন্ধে এর পরেই রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তাতে স্পষ্ট হয় যে, শুধু প্রাথমিক স্তরে নয়, সর্বস্তরেই তিনি ইংরেজিবর্জিত মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার পক্ষেই ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

১। ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে?

২। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

৩। ওজর এই যে, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর। কঠিন বৈকি। সেইজন্যেই কঠোর সংকল্প চাই।

৪। বলা বাহুল্য, ইংরেজি আমাদের শেখা চাই-ই, শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন, ফরাসি জর্মন শিখিলে আরো ভালো। সেই সঙ্গে একথা বলাও বাহুল্য, অধিকাংশ বাঙালী ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন্ মুখে বলা যায়?

৫। বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি, একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু।

৬। গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না।

৭। ভালোমত ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?

৮। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক-না, কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?

৯। দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে।

১০। বাঙালি যারা বাংলাভাষাই জানে শিক্ষিতসমাজে তারা কি চিরদিন অন্ত্যজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকবে?—শিক্ষার বিকিরণ ॥ শিক্ষা ॥ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩।

॥ সাত ॥

'বাঙালি যারা বাংলাভাষাই জানে শিক্ষিতসমাজে তারা কি চিরদিন অন্ত্যজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকবে?'—এই ব্যথিত-বিস্মিত উত্তরগর্ভ প্রশ্নটি রবীন্দ্রনাথের। এই প্রশ্নের কোন্ উত্তর দেবেন নবপ্রবর্তিত শিক্ষা তথা ভাষানীতির বিরোধীরা, আমার জানা নেই। তাঁরা নিজেরাও কি সত্যি জানেন?

যে-কোনো সরকার প্রাথমিক স্তরে ইংরেজিবর্জিত শিক্ষার প্রবর্তন করলে আমার মতো অধিকাংশ মানুষেরই দ্বিধাহীন অভিনন্দন লাভ করতেন বলে আমার গভীর বিশ্বাস। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারকে এই প্রসঙ্গে তাই দ্বিধাহীন সমর্থন ও অভিনন্দন জানাতে চাই।' জীবনমুখী পাঠ্যক্রম ও ইংরেজিবর্জিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে রাজ্য সরকার 'বহুশতাব্দীনির্মিত মূঢ়তার দুর্গভিত্তিমূলে' প্রয়োজনীয় প্রথম আঘাতটি হেনেছেন।

কিন্তু এ শুধু প্রথম পদক্ষেপ।

দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে, বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক, খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহের প্রয়াসও চলছে—এ সমস্তই অভিনন্দনযোগ্য পদক্ষেপ, সন্দেহ নেই। এই সব কিছুরই উদ্দেশ্য, অর্থে-সামর্থ্যে সর্বতোভাবে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য ব্যাপক জনসাধারণকে শিক্ষার প্রাঙ্গণে সাদরে অভিষেক করা! কিন্তু উচ্চশিক্ষাকেও সর্বজনীন করতে হলে পরবর্তী পর্যায়ে মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজিকে এখনই বর্জন করতে না পারলেও ঐচ্ছিক বিষয়রূপে চিহ্নিত করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীরা যেন ঐচ্ছিক হিসেবে ইংরেজি, ফরাসি, জর্মন, রুশ প্রভৃতি যে-কোনো একটি বিদেশী ভাষা এবং দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে যে-কোনো একটি প্রধান ভারতীয় ভাষা (আমার মতে, আমাদের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী) পড়ার সুযোগ পায়, তার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা করতে হবে। হিন্দী সম্পর্কে বহু শিক্ষিত বাঙালির এ্যালার্জি আমার অজানা নয়। কিন্তু যাঁরা সর্বভারতীয় পরীক্ষায় পিছিয়ে যাবেন বলে কল্পিত আশংকায় অকারণে ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাঁরা ছেলেমেয়েদের ভালো করে হিন্দী শেখালে শংকামুক্ত হতে পারবেন। বিদেশের সঙ্গে যোগ? যিনি যে-দেশে যখন যাবেন, তার আগের ক'মাস তিনি সযত্নে সেই ভাষাটি শিক্ষা করে নেবেন। বিদেশে যাবেন যাঁরা, তাঁরা তো নির্বাচিত, মুষ্টিমেয়, দীপ্তিমান যুবক। তাঁদের ভয় কিসের?

কিন্তু আজকের ভাবনা, দেশের অগণিত দরিদ্র, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্যদের নিয়েই। ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকুন তাঁরাই। তাঁরা সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত, অচরিতার্থ। কখনও রাজা ও শাসকেরা তাঁদের বিদ্যানুশীলনে বিচলিত হয়ে তাঁদের মস্তক ছেদন করেছেন, কখনও শাসকগোষ্ঠীর বেতনভুক গুরুমশাইরা তাঁদের বিদ্যা-আহরণের নৈপুণ্যে চমৎকৃত ও সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁদের সরল ভক্তির সুযোগে তাঁদের দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠটি ছিন্ন করতে বাধ্য করেছেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ, শক্তিশালী, কল্পনাশীল ও কর্মযোগী হলেও শিক্ষার হাতিয়ার না থাকায় এঁরা নিষ্ফলতায় চিরজর্জরিত। আজ

একলব্যদের অক্ষত হাতে আধুনিক যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটিকে যদি তুলে দেওয়া যায়, তাঁরা সেই নতুন ভারতবর্ষ সৃষ্টি করবেন, যার স্বপ্ন দেখেছিলেন বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ!

তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও অন্ত্যজ অস্পৃশ্য শ্রেণী—উভয় পক্ষের শ্রেণীচরিত্র বিবেকানন্দ চমকপ্রদভাবে নির্ণয় করেছিলেন এবং নতুন ভারত তথা ভবিষ্যতের ভারত কোন্ শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করবেন, সে-সম্পর্কে তাঁর সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত বজ্রবৎ কণ্ঠে ও ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন—'আর্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' ব'লে তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্ছ তোমরা।...হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নি। এখন ইংরেজ রাজ্যে—অবাধ বিদ্যা-চর্চার দিনে (প্রাচীন কালের তুলনায় অবাধ বটে, বিদ্যাচর্চা করলে অঙ্গুষ্ঠ বা মস্তক ছেদনের আশংকা অন্তত বিবেকানন্দর সমকালে ইংরেজ রাজত্বে আর ছিল না!—লেখক) উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও (ইংরেজ রাজত্বেও উচ্চবর্ণের প্রতি বিবেকানন্দের এই আহ্বানে সাড়া জাগে নি!—লেখক)। তোমরা শূন্যে বিলীন হও। 'আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে! বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত থেকে।...এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিক্যের আংটি, (বিবেকানন্দ এখানে শিক্ষা তথা জ্ঞানভাণ্ডারের কথা বলছেন। —লেখক) ফেলে দাও এদের মধ্যে। যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও।'—**পরিব্রাজক** ॥ পৃষ্ঠা ৪২-৪৪।

রবীন্দ্রনাথও কল্পনার বিহ্বল কবিস্বলোক থেকে কর্মচঞ্চল সংসারের তীরে 'এবার ফিরাও মোরে' এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় 'মূঢ় ম্লান মূক' মুখগুলিতে প্রতিবাদের-প্রতিরোধের-সংগ্রামের ভাষা দিতে চাইলেন—সর্বপ্রকার অন্যায়-অবিচার-লাঞ্ছনা-বঞ্চনার বিরুদ্ধে অগণ্য অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য-ম্লেচ্ছ মানবশ্রেণীকে তিনি জাগ্রত-উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন, তাঁদের আশা-ভরসা দিতে হবে, কিন্তু সর্বাগ্রে চাই ভাষা আর সে-ভাষা সর্বাগ্রগণ্য তথা একমাত্র মাতৃভাষা—কারণ এই ভাষাই চেতনা সঞ্চার করবে, প্রতিবাদে মুখর, প্রতিরোধে কঠিন এবং সংগ্রামে দুর্বার করবে—

'...এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।'...

'আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলা ভাষায় শিক্ষা স্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন; দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে তা বেঁচে উঠুক; পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক...।'

—রবীন্দ্রনাথ ('শিক্ষার সাঙ্গীকরণ')

ভাষা প্রসঙ্গে স্তালিনের শিক্ষার আলোকে

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিবিদ জোসেফ স্তালিনের প্রতিভার আলোকসামান্যতা সমকালের বহুক্ষেত্রেই সপ্রমাণিত। ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কেও তাঁর বিস্ময়কর জ্ঞান পঞ্চাশের দশকে দেশ-বিদেশের ভাষাবিজ্ঞানীদের সচকিত করেছিল। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসে সুগভীর প্রজ্ঞা আঁরি বারবুস, বার্ণাড শ,' এইচ. জি. ওয়েলস, রোঁম্যা রোঁলা, এমিলি লুডউইগ প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত বুদ্ধিজীবীদের মুগ্ধ করেছিল। লেনিনের অকাল বিয়োগের পর বিশ্বের প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রকে গড়ে তোলা এবং ভিতর ও বাইরের শত্রুর নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ থেকে কঠিন হাতে রক্ষা করাই নয় প্রতিটি তাত্ত্বিক প্রশ্নে মার্কসবাদের আলোকে রুশ পার্টিকে তথা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে অনিবার্য পথ দেখানোর কাজ স্তালিন সাফল্যের সঙ্গেই সম্পন্ন করেছিলেন।

স্তালিনের উপযুক্ত তাত্ত্বিক শিক্ষায় তৎকালীন রুশ সংস্কৃতি সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের বিরুদ্ধে সমস্ত চক্রান্তকে পরাজিত করার অন্যতম হাতিয়ার এবং সর্বহারা শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক চেতনা গড়ে তোলার উপাদান হিসাবে গড়ে ওঠে। স্তালিনের নেতৃত্ব শুধু রুশ দেশের অগ্রগতির পথে পথপ্রদর্শক ছিল তাই নয় দেশে দেশে শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগগত নির্দেশও এসেছিল সেখান থেকে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সমাজতন্ত্রের উপযোগী সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি যেমন তৎকালে গড়ে উঠেছিল তেমনি দেশে দেশে সংগ্রামরত প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি কর্মীর কাছে শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছিল।

জীবৎকালে স্তালিন দেশের সংস্কৃতি আন্দোলনের সামনে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যায় হস্তক্ষেপ করে সমাধান দিয়েছেন এবং এর মধ্য দিয়ে বহু মৌলিক প্রশ্নের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। কাব্য, নাটক, চলচ্চিত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে যখনই বিতর্ক উঠেছে সেই বিতর্কের ঢেউ যেমন লেখক শিল্পী মহলকে আলোড়িত করেছে তেমনি স্তালিনের মত ব্যস্ত নেতাকেও স্পর্শ করেছে। অজস্র কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি বিতর্কিত কাব্য, চলচ্চিত্র-নাটকের বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। কাব চোকনের কাব্য বা 'তার বিপদের দিনগুলি' নাটক নিয়ে যে ঝড় উঠেছিল তার চমৎকার সমাধান স্তালিন যেভাবে দিয়েছিলেন তা শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক মৌলিক শিক্ষারূপে পরিগণিত হয়ে আছে।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় ভাষার শব্দ ভাণ্ডার, ব্যাকরণ রীতি, গঠন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে কালোপযোগী পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে রুশ ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। একদল বলতে চাইছিলেন রুশিয়ার সমাজকাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক উপরিসৌধ বদলের যেমন প্রচেষ্টা চলছে তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। ভাষাকে উপরিকাঠামোর বিষয় বলে গণ্য করে বদলের অবৈজ্ঞানিক দাবী উঠতে থাকে। স্বভাবতই স্তালিনকে অবশেষে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে তরুণ কমরেডদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্মত হয়ে বিনয়ের সঙ্গে বলেন, "ভাষাবিজ্ঞানে আমি বিশেষজ্ঞ নই এবং স্বভাবতই আমি কমরেডদের অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে পারব না। তবে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই ভাষাবিজ্ঞানে মার্কসবাদ এমন কিছু যা প্রত্যক্ষভাবে আমার চৌহদ্দির মধ্যেই পড়ে।" মূল বিতর্কের অবসান করে তিনি বলেন ভাষাভিত্তি উপরকার সৌধ নয়, বিপ্লবের দরুন ভিত্তি বদলালে ভাষা বদলায় না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সৌধ ও উপরিসৌধের সম্পর্ক ও চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "সামাজিক ভিত্তি হল সমাজবিকাশের কোন এক বিশেষ স্তরে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো; আর উপরিসৌধ হল সমাজের রাজনৈতিক, আইনী, ধর্মীয়, শিল্পকলাগত ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাজনৈতিক, আইনী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি ভিত্তিরই তার নিজস্ব উপরিসৌধ থাকে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তির নিজস্ব উপরিসৌধ আছে, আছে নিজস্ব রাজনৈতিক, আইনী ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং তারই সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। যুক্তিবাদী ভিত্তিরও নিজস্ব উপরিসৌধ আছে। তেমনি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিরও নিজস্ব উপরিসৌধ রয়েছে। যদি ভিত্তি বদলে যায় বা তাকে উচ্ছেদ করা হয় তবে তার পিছনে পিছনে তার উপরিসৌধও বদলে যায় বা তাকে উচ্ছেদ করা হয়। যদি একটি নতুন ভিত্তির উদয় হয়, তবে তাকে অনুসরণ করে তার উপযুক্ত উপরিসৌধ গড়ে ওঠে।"

সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেরও গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায়। কিন্তু কোন একটি জাতিগোষ্ঠীর ভাষার গুণগত কোন পরিবর্তন হয় না। কেননা ভাষা হল সমাজের ইতিহাসের সমগ্র গতিপথের ও বহু শতাব্দীর ভিত্তিসমূহের ইতিহাসের ফল। ভাষা কোন একটি বিশেষ শ্রেণীদ্বারা সৃষ্টি হয় নি বরং ভাষা হল গোটা সমাজের সৃষ্টি, সমাজের সকল শ্রেণীর সৃষ্টি শত শত বংশপরম্পরার প্রচেষ্টার ফল। ভাষা সকল শ্রেণীর মানুষেরই প্রয়োজনের। ভাষা ও সংস্কৃতি দুটি আলাদা বস্তু যদিও ভাষা সংস্কৃতির বাহন। সংস্কৃতি বুর্জোয়া বা সমাজতান্ত্রিক হতে পারে কিন্তু ভাবের আদান-প্রদানের উপায়স্বরূপ ভাষা সব সময়ই সমস্ত জনসাধারণের সর্বজনীন ভাষা। এই ভাষা বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক উভয় সংস্কৃতিরই সেবা করতে পারে।

মানুষের জীবনে ভাষার ভূমিকা নির্ণয় করে স্তালিন বলছেন, "ভাষা হল একমি মাধ্যম, একটি হাতিয়ার যার সাহায্যে জনসাধারণ একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, ভাব বিনিময় করে এবং একে অপরকে বুঝতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে চিন্তার সঙ্গে যুক্ত থাকায় ভাষা, শব্দ ও শব্দসম্বলিত বাক্যের দ্বারা চিন্তা প্রক্রিয়ার ফলাফল ও মানুষের জ্ঞানকর্মের সাহায্যে অর্জিত বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করে এবং এইভাবে মানবসমাজে ভাব বিনিময় সম্ভব করে তোলে।

"ভাবের আদান-প্রদান একটি অবিরাম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। কেননা এ ছাড়া প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং প্রয়োজনীয় বস্তুমূল্য সৃষ্টির সংগ্রামে মানুষের সম্মিলিত কাজ-কর্মকে সুসংবদ্ধ করা অসম্ভব, এ ছাড়া সমাজের উৎপাদন ক্রিয়া-কাণ্ডের সাফল্য সুনিশ্চিত করা অসম্ভব। এর ফলে সামাজিক উৎপাদনের অস্তিত্বই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফলতঃ সমাজের বোধ-গম্য ও তার সকল সভ্যের জন্য সাধারণ একটি ভাষা না থাকলে, সেই সমাজকে উৎপাদন কর্ম ছেড়ে দিতে হবেই, তা ভেঙে টুকরো টুকরো হতে বাধ্য ও সমাজ হিসেবে তার অস্তিত্ব লোপ পেতে বাধ্য। এই অর্থে ভাষা যেমন ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম, একই সঙ্গে তেমনি তা হল সমাজবিকাশের ও সংগ্রামের হাতিয়ার।"

'ভাষা সমাজবিকাশের ও সংগ্রামের হাতিয়ার' স্তালিনের এই মূল্যবান কথাটি আজ আমাদের দেশীয় পরিপ্রেক্ষিতে বারবার স্মরণে আসে। নিজস্ব ভাষায় একটি জাতি যদি ভাবের আদান-প্রদান, শিক্ষা ও কাজকর্ম চালাতে না পারে তাহলে সেই জাতির বিকাশ সম্ভব নয়। এমনকি তার শোষণমুক্তির সংগ্রামও ব্যাহত হয়। ১৯৫০ সালে ঘোষিত ভারতের সংবিধানে ভারতের মত বহুজাতিক দেশের ভাষা সমস্যার সমাধান হয় নি। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজী ভাষার আধিপত্য এখনও রয়েছে বহাল তবিয়তে। উর্দু, নেপালী প্রভৃতি ভাষা সংবিধানের স্বীকৃতি পায় নি। যে সব আঞ্চলিক ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে সেগুলিও তার মর্যাদার আসনে এখনও অধি-ষ্ঠিত হয় নি। স্বাধীনতার ৩৩ বছর পরেও কেন্দ্রের শাসকগোষ্ঠী এমন এক সুষ্ঠুনীতি গ্রহণ করতে পারে নি যার ফলে প্রতিটি জাতির মাতৃভাষা মর্যাদা পেতে পারে এবং তার মধ্য দিয়ে জাতীয় সংহতি গড়ে উঠতে পারে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পরস্পরের মধ্যে অসূয়া ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিন্দীর আধিপত্য যেমন অনেকের পক্ষে অসহনীয় তেমনি ইংরেজীয়ানাও জাতির চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপন্ন নয়। ভারতীয় সমাজকে অগ্রগতির পথে, সংগ্রামের পথে এগিয়ে নিতে হলে প্রত্যেককে তার নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা ও কাজকর্মের সুযোগ দিতে হবে। মাতৃভাষায় কথা বলার স্বাভাবিক অধিকারটুকু ছাড়া এখনও প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ মাতৃভাষায় স্বাক্ষর পর্যন্ত করতে জানে না। আর এই নিরক্ষর মানুষের উপর শ্রেণীশোষণের পাথর চাপিয়ে রাখা সহজ হয়।

লেনিন বলেছেন, "ভাষা হল মানুষের ভাবের আদান-প্রদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আধুনিক পুঁজিবাদের উপযোগী প্রকৃত অবাধ ও ব্যাপক বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের জন্য এবং জন-সংখ্যাকে তার সকল পৃথক শ্রেণীতে স্বাধীনভাবে ও স্পষ্টভাবে সংগঠিত করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহের অন্যতম হল ভাষার ঐক্য ও তার অব্যাহত বিকাশ।" শ্রেণীবিভক্ত সমাজে দুটি পরস্পরবিরোধী স্বার্থবাহী সংস্কৃতি থাকা সম্ভব কিন্তু ভাষাগত ঐক্যবিধান অবশ্যই প্রয়োজন নাহলে পুঁজিবাদী বিকাশও সম্ভব নয়। জাপান তার নিজের অগ্রগতির প্রয়োজনে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও সর্বস্তরে কাজকর্ম প্রচলন করেছে। তার ফলে সেখানে এক বিস্ময়কর পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটেছে। আর ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতিকে একটি সুসমন্বিত নীতির ভিত্তিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয় নি। ১৯৫১ সালে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনও বিজ্ঞানসম্মতভাবে হয় নি।

'ভাষা হলো চিন্তার সাক্ষাৎ বাস্তবতা', বলেছেন কার্লমার্কস। সুতরাং মানুষ যদি তার উদ্ভাবনাময় চিন্তাধারাকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করার স্বাধীনতা না পায় তাহলে তার সৃষ্টিশক্তি খর্ব হতে বাধ্য। বিদেশী বা অন্য কোন চাপিয়ে দেওয়া ভাষায় সাধারণ মানুষের চিন্তার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটা সম্ভব নয়। দুশো বছরের ইংরেজ-শাসন শুধু ভারতকে শোষণ করেছে তাই নয় তার ভাষাগুলি বিকাশের পথেও বাধা সৃষ্টি করেছে। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডারের দরজা আমাদের সামনে খুলে গেছে সত্য কিন্তু এর সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র জাতীয় ভাষাগুলির বিকাশ ও ব্যবহার খর্ব করেছে। কিন্তু একটি বিদেশী ভাষা যত শক্তিশালী ও উন্নতই হোক না কেন মাতৃভাষার কোন বিকল্প নেই। বিদেশী ভাষার আধিপত্য কাটিয়ে মাতৃভাষা তার স্বাতন্ত্র্য ও অনিবার্যতা প্রকাশ করবেই। এ প্রসঙ্গে স্তালিন নিজের দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছেন, "তুর্কী আক্রমণকারীরা শত শত বৎসর ধরে চলমান ভাষাগুলিকে বিকলাঙ্গ ও টুকরো টুকরো করে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছিল। ঐ সময়ে বলকান ভাষাগুলির শব্দ তালিকার প্রভূত পরিবর্তন হয়েছিল, বেশ কিছু তুর্কী শব্দ ও বাচনভঙ্গি গৃহীত হয়েছিল এবং সমকেন্দ্রিকতা ও বিকিরণ ঘটে-ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলকান ভাষাগুলি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল ও বিপদ কাটিয়ে উঠেছিল।"

এটাই স্বাভাবিক। দেশীয় ভাষা তার দাবী প্রতিষ্ঠা করবেই। কেননা, মাতৃভাষা হলো মাতৃদুগ্ধ। মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করে শিশুর বিকাশ যেমন সম্ভব নয় তেমনি মাতৃভাষায় শিক্ষা ও কাজ-কর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কোন জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই দাবী উঠেছে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক ভাববিনিময়ের সাথে সাথে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জনগণ তাদের প্রয়োজনের সবচেয়ে উপযুক্ত যোগাযোগের ভাষা বাস্তবক্ষেত্রে উদ্ভব করবে। প্রশাসন, আইন-প্রণয়ন, বিচার-কার্য, শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরাজীর ব্যবহার বর্জন করা হবে, ইংরাজীর পরিবর্তে জাতীয় ভাষাগুলির ব্যবহার করা হবে। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় জনগণের শিক্ষালাভের অধিকার; সমস্ত বেসরকারী ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ভাষারূপে নির্দিষ্ট ভাষাভাষী রাজ্যের জাতীয় ভাষার ব্যবহার এবং রাজ্যের উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যমরূপে তার ব্যবহার, রাজ্যের ভাষার সাথে প্রয়োজনীয় স্থলে এক বা একাধিক সংখ্যালঘু জন-গণের অথবা একটি অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারের ব্যবস্থা কাজে পরিণত করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যে অনুরূপ এক ভাষা ও শিক্ষানীতি গ্রহণ করে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও তৎপর সেই ভাষার মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজকর্মের নীতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ পথেও বাধা এসেছে বিরোধী কয়েকটি দল ও তাদের সমর্থন-পুষ্ট কতিপয় বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে। দুশো বছরের পরাধীনতার সংস্কার তাঁরা ভুলতে পারছেন না। তাঁদের মন ও চিন্তায় এখনও ইংরেজীর প্রভাব সমধিক বিরাজিত। স্পষ্টতই শ্রেণীস্বার্থে তাঁরা চান না যে মাতৃভাষাকে সম্যকরূপে ব্যবহার করে সাধারণ বঞ্চিত অবহেলিত মানুষ চিন্তার জগতে প্রতিষ্ঠা পাক। স্তালিন বলেছেন, "জনসাধারণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের উপায় হিসাবে ভাষার কার্যকরী ভূমিকা কখনই এমন হতে পারে না যে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর ক্ষতি করে তা একটিমাত্র শ্রেণীর সেবা করবে বরং তা গোটা সমাজকে, সমাজের সকল শ্রেণীকে সমানভাবে সেবা করবে।" কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাহী সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রতিনিধি এই সব বুদ্ধিজীবী চাইছেন ভাষার অধিকারটুকু সবটাই তাঁরা ভোগ করবেন।

স্তালিন আরও বলেছেন, "যদি কোন ভাষা সমস্ত জনগণের সর্বজনীন ভাষা হওয়ার এই অধিকার থেকে বিচ্যুত হয়, যদি এ সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠীর ক্ষতি করে কেবলমাত্র কোন একটি

সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও সমর্থন দেখায় সেক্ষেত্রে ভাষা তার নিজস্ব ধর্ম হারায়। সমাজের জনগণের ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমরূপে তার ভূমিকা শেষ হয়ে যায়। এটা তখন কোন একটি সামাজিক গোষ্ঠীর দুর্বোধ্য ভাষায় পরিণত হয় এবং অধঃ-পতিত হয়ে অবশেষে লোপ পেতে বাধ্য হয়।" পশ্চিমবঙ্গে আজ শতকরা প্রায় সত্তরভাগ মানুষ নিরক্ষর। তারা নিজের চিন্তাভাবনা মাতৃভাষাতেও লিখিতভাবে প্রকাশ করতে পারে না। আর সাধারণ মানুষের মাতৃভাষা চর্চার পথে এই বাধা মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত মানুষের মনে এক অহমিকা এনে দিয়েছে। এই অহমিকার ফলে তাঁদের বৃহত্তর সামাজিক দৃষ্টি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাঁরা জন-গণের উপযোগী শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি রচনা করতে তো পারছেনই না উপরন্তু জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, সুস্থ সংস্কৃতির সংগ্রামে বিরোধিতার ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

এভাবে দীর্ঘদিন চললে ভাষা শক্তিহীন হয়, সংস্কৃতি দুর্বল হয়ে অপসংস্কৃতির কবলে নিক্ষিপ্ত হয়, চিন্তা চেতনায় জাতীয় ঐতিহ্য-বাহী সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির পরিবর্তে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পরগাছা সংস্কৃতির উৎপাত উৎকটভাবে বৃদ্ধি পায়। আজ তাই হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে। বিপ্লবের পরে লেনিন-স্তালিন রুশ যুক্তরাষ্ট্রের জাতিগুলির জন্য যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তাতে প্রত্যেক জাতিকে নিজের ভাষায় সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ও নিজের সংস্কৃতি নির্ভেজালভাবে চর্চা করার অবাধ সুযোগ করে দিয়েছিলেন। পশ্চাদপদ জাতিগুলির বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। ফলে রুশ ভাষার আধিপত্য নিয়ে সেখানে জাতীয় সংহতি বিঘ্নিত নয়। সবার সমান অধিকার। কিন্তু ভারতে ভিন্ন চিত্র। কারণ এখানকার সমাজব্যবস্থা পুঁজিবাদী-জমিদার নিয়ন্ত্রিত। অসাম্য বজায় রাখা, কখনও উগ্রজাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি নীতি অনুসরণ করেই এখানকার শাসকশ্রেণী চলতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপক জনগণের স্বার্থে ভাষা ও শিক্ষানীতিকে কার্যকরী করতে চাইছেন, শিক্ষার রুদ্ধ দ্বার সর্বজনের জন্য উন্মুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছেন—এতে আপত্তি—শুধু আপত্তি নয় কায়েমী স্বার্থ পথে নেমেছেন বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য। পশ্চিমবঙ্গের জাগ্রত জনগণ এর উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্যও প্রস্তুত।

'বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষা শিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি বা তারা কোনোমতে এন্ট্রেন্সের দেউড়িটা তরিয়া যায় উপরের সিঁড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিত্ হইয়া পড়ে।

'এমনতরো দুর্গতির অনেকগুলি কারণ আছে। এক তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর নাই।...তারপরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শেখার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না।'

—রবীন্দ্রনাথ ('শিক্ষার সাঙ্গীকরণ')

"যে ভাষায় প্রথম মা বলিতে শিখিয়াছি, যে ভাষা দিয়া প্রথম এটা, ওটা, সেটা চিনিয়াছি, যে ভাষায় প্রথমে কেন প্রশ্ন করিতে শিখিয়াছি সেই ভাষার সাহায্য ভিন্ন ভাবুক, চিন্তাশীল কর্ম্মী হইবার আশা করা আর পাগলামী করা এক। তাই যে কথা পূর্বে বলিয়াছি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি, পরভাষায় যত বড় দখলই থাক, তাহাতে ঐ চলা-বলা-খাওয়া, নিমন্ত্রণ রক্ষা, টাকা রোজগার পর্যন্ত হয়, এর বেশী হয় না, হইতে পারে না।"

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মাতৃভাষা ও সাহিত্য)

"তাই আজ আমি এই কথাটাই আপনাদিগকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইতে চাই যে স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার সাক্ষাৎ মাতৃভাষা ভিন্ন ঘটে না, যথার্থ বড় চিন্তার ফল সংগ্রহ করিবার পথ মাতৃগৃহদ্বারের ভিতর দিয়াই, বাঙালী যখন বাঙালী, সে যখন সাহেব নয় তখন, বিলাতি ভাষার মস্তবড় ফটকের সম্মুখে যুগ-যুগান্তর দাঁড়াইয়াও কোনদিনই সে পথের সন্ধান পাইবে না। এ কথা শুধু ইতিহাসের দিক দিয়াই সত্য নহে, মনোবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানের দিক দিয়াও সত্য।"

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মাতৃভাষা ও সাহিত্য)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

গ্রাহক হতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৭ টাকা। ষাণ্মাসিক চাঁদা সডাক ৩·৫০। প্রতি সংখ্যার দাম ৪০ পয়সা।

বিশেষ সংখ্যার জন্য কোন অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না। পত্রিকা প্রেরণের জন্য ডাক ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করবে।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

সহ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০ ০০১।

এজেন্সি নিতে হ'লে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে নেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০%
১৫০০-এর ঊর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০%
৫০০০-এর ঊর্ধ্বে	৪০%

১০টি সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানা :

সহ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০ ০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবি করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিক-গুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য বিজনেস ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

Reg. No. 32875/78

Postal Reg. WB/CC-15

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ এসপ্লানেড ইস্টে সার্বজনীন শিক্ষা এবং সর্বস্তরে আঞ্চলিক ভাষায় কাজকর্মের দাবীতে লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীউৎপল দত্ত। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন শ্রীনেপাল মজুমদার, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেন ঘটক, শ্রীজীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ কল্যাণ গাঙ্গুলী, শ্রীমনীন্দ্র রায় ও শ্রীকৃষ্ণ ধর।

এপ্রিল, ১৯৮২

৩রা এপ্রিল বাঙ্‌লা বন্ধের নামে
পৈশাচিক উন্মত্ততার কয়েকটি
বীভৎস নিদর্শন

কার হাত অনায়াসে শিশু কণ্ঠে হেনে যায় ছুরি?
কোন্‌ সভ্যতার?

শ্রমিকের রক্তপাতে পান-পাত্র রেঙে ওঠে কার?
কোন সভ্যতার?

যুবমানস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
এপ্রিল, '৮১

**উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি এবং পত্রিকা সম্পাদক :
কান্তি বিশ্বাস**

প্রচ্ছদ : পুনর্মুদ্রিত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা-৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—চল্লিশ পয়সা

সম্পাদকীয়

মালিকের হাত হইতে পাওনা-গণ্ডা আদায় করিবার জন্য সকল প্রকার আবেদন-নিবেদন যখন ব্যর্থ হয় তখন শ্রমিকশ্রেণী মিলিতভাবে চাপ সৃষ্টি করিবার জন্য কাজ বন্ধ করিয়া দেন—ধর্মঘট শুরু করেন। শেষ উপায় হিসাবে তাঁহারা বাধ্য হইয়া এই পথে পা দেন। জনসাধারণ ও শাসকের নিকট বিভিন্ন সময় তাঁহারা বিভিন্ন প্রকার দাবী লইয়া হাজির হন। আলাপ-আলোচনা, যুক্তি-তর্ক সবই যখন নিষ্ফল হয় তখন নিরুপায় হইয়া ঐক্যবদ্ধ ভাবে তাহারা হরতাল বা বন্ধ্ পালন করেন। শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য কিংবা কর্তৃপক্ষের কাজের প্রতিবাদ করিবার জন্য আপামর জনসাধারণ এই অস্ত্রকে প্রয়োগ করেন। দাবী সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা এবং দাবী আদায় করিবার জন্য আগ্রহের উপরই বস্তুতঃ এই হরতাল বা বন্ধ্-এ মানুষের অংশগ্রহণের ব্যাপকতা নির্ভর করে—এই আন্দোলনের সাফল্য নির্ধারিত হয়।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার এই গণতান্ত্রিক কৌশল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় মানুষ ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের দেশেও স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত অসংখ্যবার মানুষ এই প্রকার আন্দোলনে সামিল হইয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পরে এই রাজ্য পশ্চিমবাংলার অগণিত মানুষ বহুবার বন্ধ্ পালন করিয়াছেন। বে-আইনী আইনের সাহায্যে অন্যায়ভাবে বিনা বিচারে কারাগারে আটক রাখা রাজবন্দীদের মুক্ত করার জন্য, জঠরের ক্ষুধা নিবারণের জন্য, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী, জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে অতিষ্ঠ জনজীবনকে একটু স্বস্তি দেওয়ার দাবীতে বন্ধ্ পালিত হইয়াছে। ভাষার দাবীতে, সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের প্রতিবাদে, কখনও বা শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের সমর্থনে অথবা গণতান্ত্রিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে বারে বারে মানুষ এই প্রকার আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিয়াছেন। ইতিহাসের পাতায় এই ধরনের বহু নজীর জ্বলজ্বল করিতেছে।

এই রাজ্যে কংগ্রেসী জামানায় ৩৯ বার বন্ধ্ পালিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ১৯৫১ ও ১৯৬০ সালে আসামে 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের প্রতিবাদে যে দুইটি বন্ধ্ হয় ঐ দুইটিকে বাদ দেওয়া হইলে প্রতিবার কংগ্রেসী সরকার প্রচণ্ড চণ্ড নীতিকে হাতিয়ার করিয়া দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বন্ধ্‌কে ব্যর্থ করিবার জন্য মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিয়াছেন। লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, গুলি, গ্রেপ্তার হইতে শুরু করিয়া সকল প্রকার নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা, বন্ধ্ আহ্বানকারী রাজনৈতিক দলসমূহের দায়িত্বশীল নেতৃত্ব, কর্মীদের উন্নতমানের নীতি ও শৃঙ্খলাবোধ প্রতিবারেই এই আন্দোলনকে সমস্ত ভয়-ভীতি, ঝুঁকি ও সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করিয়া সফলতার স্তরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। গোটা দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাকে আরও গতিশীল আরও উজ্জ্বল করিয়াছে।

আবার রাজ্য সরকারের দায়িত্বে থাকিয়া পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলগুলি ১৯৬৭ সালে ২৪শে আগষ্ট তারিখে তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের প্রতিবাদে এবং ১৯৬৯ সালে ১০ই এপ্রিল তারিখে কাশীপুরে বন্দুক ও গোলাবারুদের কারখানায় শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে বন্ধ্ পালন করার সময় যে পরিপক্ক নেতৃত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণে অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ রাজনৈতিক কর্মীরা যে সহনশীলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার ছাপ রাখিয়াছিলেন তাহা সন্দেহাতীতভাবে প্রশংসনীয়। ১৯৮০ সালে ১৭ই মে ও ২৭শে নভেম্বর তারিখে যথাক্রমে আসামের ঘটনাবলী সম্পর্কে জনমত তৈরী করা ও রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য বামফ্রন্টের শরিক দল-গুলির পক্ষ হইতে যৌথভাবে বন্ধ্ ডাকা হয়। এই দলগুলির নেতৃবৃন্দ ও হাজার হাজার কর্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বেশ সময় ধরিয়া সমগ্র রাজ্যের গ্রাম-নগর, কল-কারখানা প্রভৃতি সমস্ত জায়গায় বন্ধ্-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। মানুষ বুঝিয়াছিলেন কেন রাজ্যের শাসক দল হইয়াও ইঁহারা বন্ধ্ ডাকিতে বাধ্য হইতেছেন। ফলে বন্ধ্-এর দিনে কোন প্রকার অনুরোধ-উপরোধের প্রয়োজন হয় নাই—সচেতন জনগণ রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ন রাখিয়া নিজ নিজ দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই আহ্বানে অভূতপূর্বভাবে সাড়া দিয়াছিলেন। বহু আন্দোলনের পুণ্যভূমি বাংলায় শান্ত অথচ বজ্রকঠোর আন্দোলনের আর এক গৌরবময় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এই সকল আন্দোলনের সাথে রাজ্যের কংগ্রেস (ইন্দিরা)-এর পক্ষ হইতে ডাকা গত ৩রা এপ্রিলের বন্ধ্-এর কি কোন তিল পরিমাণ মিল আছে? যে সমস্ত বিষয়গুলিকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহারা এই আন্দোলনের ডাক দিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে এতটুকু সত্যতা বা সারবস্তুর কি কোন চিহ্ন পাওয়া যায়?

তাঁহারা বলিয়াছিলেন রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা কিছুই নাই। কেহই অস্বীকার করিবেন না যে এই রাজ্যেও চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই ইত্যাদি অপরাধগুলি কখনও কখনও সংগঠিত হয়। মাঝে-মধ্যে খুনের ঘটনাও ঘটে। বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতে কোথাও কোথাও অবস্থা গরম হইয়া উঠে—হয়ত সংঘর্ষও হয়। অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির অমোঘ নিয়মে দুনিয়ার সকল পুঁজিবাদী দেশের সমস্ত এলাকাতেই এই ধরনের সমাজবিরোধী বা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলি ঘটে। কোন কোন এলাকায় ইহা হইতে শতগুণ বেশি হইয়াও ঘটে। এই ক্ষেত্রে মানুষের প্রধান বিচারের বিষয় হয়—প্রশাসন বা সরকার কি ভূমিকা পালন করিতেছে। সাধারণ রীতি অনুসারে এই সকল অপরাধের ঘটনার সাথে সাথেই ইহারা তৎপর হইবেন অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য। আইনানুগ পদ্ধতিতে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নিরপেক্ষ ও সক্রিয়ভাবে সরকারী যন্ত্র এই কাজে ব্যবহৃত হইবে। গত ৪৫ মাসে একটি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ কি কংগ্রেস (ই) দেখাইতে পারিয়াছেন যেখানে সরকার তার দায়িত্ব পালনে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই? আর এই আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন যাহাদের মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতেছে তাহারা ঢাকিবার চেষ্টা করিলেও মানুষ ভুলিয়া যায় নাই ১৯৭১ সাল হইতে ১৯৭৭ সালের সেই বীভৎস অন্ধকারের দিনগুলির কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হইতে শুরু করিয়া শিক্ষক-ছাত্র-মহিলা-যুব ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ১১০০-এরও বেশি বুদ্ধিজীবী, জননেতা ও কর্মী সরকারী দলের ঠাণ্ডা মাথার পরিকল্পনা অনুসারে ঘাতকের নির্মম ছুরিকাঘাতে নৃশংসভাবে খুন হইয়াছিলেন। গোটা প্রশাসনকে সম্পূর্ণভাবে দলীয় কাজে ব্যবহার করা হইয়াছিল। একটা খুনের কোন কিনারা হয় নাই এমন কি কোন তদন্ত কিংবা মোকদ্দমা পর্যন্ত রুজু করা হয় নাই। জোর করিয়া ৩০০ ট্রেড ইউনিয়ন অফিস দখল করিয়া, ২৫,০০০ মানুষকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া, কয়েক হাজার শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষককে জবরদস্তিমূলকভাবে কর্মচ্যুত করিয়া গণতন্ত্র ও আইন-শৃঙ্খলার শ্মশানযাত্রার যে কুৎসিত মহড়া তাঁহারা দেখাইয়াছিলেন—জনরোষে ভীত শঙ্কুচিত সেই বীরপুঙ্গবের দল এখন চীৎকার শুরু করিয়াছেন। এই অবিমৃষ্যকারিগণ কাকের মত নিজের চক্ষু বন্ধ করিয়া মনে করেন দুনিয়াশুদ্ধ লোক তাহাদের মতই কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। খোদ রাজধানী দিল্লীতে সন্ধ্যার পর কোন মহিলা মস্তানদের অবাধ দৌরাত্ম্যে রাস্তায় বাহির হইতে পারেন না অথচ প্রধানমন্ত্রীর সুবিবেচনা ও সহানুভূতির জন্য পরিচালিত অন্ধ মানুষের মিছিল তাঁহার বাসগৃহের অদূরেই পুলিশের দ্বারা আক্রান্ত হয়। অন্ধজনের রক্তে রাজধানীর রাস্তাকে লাল করিয়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট হাজির হওয়ার দুঃসাহস দেখাইবার পাপের তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। উহারা মনে করেন লোকে ইহা দেখিতে পায় নাই। যাহাদের রাজত্বে সমাজের দুর্বলতর অংশের মানুষ হরিজন ও আদিবাসীদেব উপর বর্বরোচিত অত্যাচারের পরিমাণ গত এক বৎসরে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া আটষট্টি কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষের সভ্যতার-ভব্যতার মুখে পুরু করিয়া চুনকালি মাখিয়া দিয়াছে, সেই নির্লজ্জের দল কোন্ মুখে আইন-শৃঙ্খলার কথা বলে কেহই তাহা বুঝিতে পারে না। মহারাষ্ট্র হইতে শুরু করিয়া কর্ণাটক পর্যন্ত কৃষক আন্দোলন দমন করিবার জন্য যথেচ্ছ পুলিশী অত্যাচার ও গুলি, মধ্যপ্রদেশের জয়পুরে আদালতের মধ্যে আইনজীবীদের উপর পুলিশের বেপরোয়া লাঠি চার্জ, অথচ মোরাদাবাদ, আগ্রা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি শহরে মাসের পর মাস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষত-বিক্ষত শাসন-ব্যবস্থা সহাবস্থান করিয়া চলিয়াছে উহাদেরই রাজত্বে—তাহাতে উহাদের বিন্দুমাত্র সরম হয় না। এই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার পূজারীদের (?) উপ-দলগুলির মধ্যে সংঘর্ষের জন্য কোথায় কাহাদের দ্বারা কখন কে খতম হইয়াছেন তাহার এক লম্বা ফিরিস্তি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গত ২৯শে নভেম্বর তারিখে যুগপৎ প্রধানমন্ত্রী ও দলনেত্রীর নিকট তাহার অবগতির জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের মধ্যে কোর্ট চলাকালীন একই 'যুগ যুগ জিও' মন্ত্রে দীক্ষিত দুই উপ-দলের নিষ্ঠাবানদের মধ্যে ক্ষুর চালাচালি হইল—অঝোরে রক্ত ঝরিল। বিচারক, ব্যারিস্টার, কর্মচারী, সাধারণ মানুষ কেহ বা বিহ্বল কেহ বা ভীত হইল—আর আইন-শৃঙ্খলার প্রতি উহাদের দরদের আর এক নমুনা মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

শিক্ষা সম্পর্কে উক্ত ভদ্র মহাশয়গণের অভিযোগ সম্পর্কে গত ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় আমরা আলোচনা করিয়াছি আজ আর তাহার পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন।

৩০শে মার্চের 'পুলিশী অত্যাচারের' কথাও ঐ বন্ধ্‌ওয়ালারা উল্লেখ করিয়াছেন। আইন অমান্য নয়—শান্তিপূর্ণভাবে শুধু জমায়েত কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া ব্যারিস্টার ও প্রাক্তন মন্ত্রী মহোদয়গণ রজনীগন্ধার মোটা মালা গলায় পরিধান করিয়া এস্‌প্লানেডে পুলিশী বেষ্টনী

বীরত্বের সাথে ভঙ্গ করিয়া লাফ দিয়া পুলিশের গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন। তাহাদের প্রসাদ প্রার্থী কয়েক হাজার সেবক ইট, ডাবের খোলা, সোডার বোতল ইত্যাদি শান্তি মিছিলের উপকরণগুলি লইয়া উহাদের নেতাদের কথায় বিশ্বাসী হতবাক পুলিশবাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কসরৎ দেখাইতে শুরু করিলেন। পুলিশ আহত হইল, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়িল, লাঠি মারিল, গুলিও করিল। ইহার মধ্যে দুঃখজনকভাবে তিন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিল। অতএব প্রতিবাদস্বরূপ দুদিন পরেই বন্ধ্ পালন করার ঘোষণা হইল।

বন্ধ্ পালন করার কারণগুলি জনগণের নিকট ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নাই, কোন সভা-সমিতির প্রয়োজন নাই, নাই বন্ধ্‌কে সফল করিয়া মানুষের সমর্থনকে আরও সুসংহত করিবার জন্য সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনীকে সংগঠিত করার কোন প্রয়াস। বন্ধ্-এর পূর্ব সন্ধ্যা হইতে যানবাহনের উপর শুরু হইল বোমাবর্ষণ। চেষ্টা হইল সমাজবিরোধী শক্তিগুলিকে কিভাবে সংঘ-বদ্ধ করিয়া ৭০ দশকে রপ্তকরা কৌশলগুলি প্রয়োগ করিয়া মানুষকে আতঙ্কিত করিয়া ঘরের বাহিরে না আসিতে বাধ্য করা যায় তাহার জন্য।

যাহা হইবার তাহাই হইল। নজীরবিহীন বোমাবৃষ্টিতে দেড়শ ট্রাম-বাস প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। নরকের কীটদের আগুনে বোমায় বাসের মধ্যে দগ্ধ হইয়া গর্ভবতী মহিলাসহ নারী-পুরুষ ছয় জন শান্তি শৃঙ্খলার নামের আড়ালে এই চক্রান্তকারীদের প্রতি শেষ ধিক্কারবাণী উচ্চারণ করিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মাতৃগর্ভে অঙ্কুরিত ভ্রূণ জানিতে পারিল না কোন অপরাধে এই দুনিয়ার আলো-বাতাসের মধ্যে আসার সুযোগ হইতে সে কেন বঞ্চিত হইল। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র হৃদয়ানন্দ সাউ, হাসপাতালের নার্স, কর্তব্য পালনে ইচ্ছুক শিলিগুড়ির হোমগার্ড কেহই বুঝিতে পারিল না কোন্ পাপের ফলে তাহাদের এই শোচনীয় মৃত্যুবরণ। ২৬টি নিষ্পাপ জীবনের শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটিল।

মুষ্টিমেয় ষড়যন্ত্রী ব্যতীত সমগ্র রাজ্যের সকল বিবেকবান শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি দিয়া গণতন্ত্র-শান্তি-শৃঙ্খলার এই জহ্লাদদের উপর ঘৃণা বর্ষণ করিলেন। ৬ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ধিক্কার মিছিল শোকস্তব্ধ নীরবতা অথচ বজ্র-কঠিন শপথের মধ্য দিয়া এই অন্ধকারের জীবদের ঘৃণ্য পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মৃত্যু-পরোয়ানা জারি করিলেন। পশ্চিম বাংলার সর্বত্র ধিক্কার মিছিলে, সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে নরপশুদের এই পৈশাচিক কাজের বিরুদ্ধে ঘৃণা বর্ষিত হইল। মৌনব্রত পালন করিতে থাকিলেন ভারতের মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী, আর নীরবতা পালন করিলেন রাজ্যের কংগ্রেস(ই)-র নেতৃবৃন্দ।

সংগ্রামী মানুষ বন্ধ্-এর এক অভিনব চেহারা মুখোমুখী দাঁড়াইয়া আজ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিবেন—ইহারা কাহারা, কি ইহারা করিতে চাহে—জনগণের বিপদ কোন্ দিক হইতে আসিতেছে। এই অর্থবহ ঘটনা হইতে রাজ্যের সকল স্তরের মানুষের সহিত বাংলার যৌবন চেতনায় আরও সমৃদ্ধ হইয়া দায়িত্ব পালনে নিজেকে আরও সুনিশ্চিত করিয়া তুলিবেন, আরও সুসংগঠিত হইবেন একান্তভাবে সেই কামনাই করি।

পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা প্রসঙ্গেঃ অপপ্রচার ও রাজ্য সরকারের বক্তব্য

সাম্প্রতিককালে কোন কোন মহল থেকে পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগ উঠেছে। একেবারে হালফিল তাঁরা এ নিয়ে বেশ সোরগোলও তুলছেন। কিন্তু কখন এই অভিযোগ উঠছে? যখন বাকী ভারতবর্ষের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে অধিকাংশ জায়গায় নারী নির্যাতন চলছে অবাধে, চলছে জাত-পাতের নৃশংস লড়াই, চলছে বিভেদকামী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। উত্তর ও মধ্য ভারতে চলছে ভয়াবহ ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দেশের কোন কোন অঞ্চলে সংবিধান-স্বীকৃত অধিকারকেও প্রতিদিন পদদলিত করা হচ্ছে। হরিজন, আদিবাসী তথা দুর্বলতর মানুষের উপর চালানো হচ্ছে সংঘবদ্ধ আক্রমণ। কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী ও বিদেশী শক্তির প্ররোচনায় দেশকে টুকরো টুকরো করারও চেষ্টা চলছে, জাতীয় সংহতি হয়ে পড়ছে বিপন্ন। এই সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি বিচার করলে যে কোন নিরপেক্ষ মানুষই স্বীকার করবেন যে এখানকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এমন নয় যা নিয়ে সোরগোল তোলা যায়। বরং তুলনামূলক বিচারে পশ্চিমবঙ্গ আজ ভারতের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ রাজ্যগুলির অন্যতম।

তবু এ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে কেন? এই রাজ্যে জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত শক্তিগুলি ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসের পর থেকে এই অসহিষ্ণুতা আরো বেড়েছে। ৩৬ দফা কর্মসূচীকে ভিত্তি করে এ রাজ্যে জনগণের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের ভিত্তি যতই দৃঢ়মূল হচ্ছে ততই কায়েমী স্বার্থবাদীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। এদের হতাশার আরো কারণ হ'ল যে, ৩৬ দফা কর্মসূচীর সাফল্য আজ আর কেবলমাত্র পশ্চিমবাংলার সীমানায় আবদ্ধ নেই, তা বাইরের বিরাট সংখ্যক গণতান্ত্রিক মানুষকেও আকর্ষণ করছে এটাকে এ রাজ্যের ও বাইরের বামফ্রন্ট-বিরোধীরা ভয় পাচ্ছেন বলে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে এ'রা 'গেল', 'গেল' রব তুলে রাজনৈতিক অস্থিরতা আমদানি করতে চাইছেন।

বামফ্রন্ট সরকার বিশ্বাস করে যে, রাজ্যের মানুষের সক্রিয় সহযোগিতায় বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেও সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর কষ্ট লাঘবের জন্য কিছুটা ব্যবস্থা করা যায়। আর এরই মধ্য দিয়ে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাদের নিজস্ব ক্ষমতায় আস্থাশীল করা ও তাদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা যায়। ৩৬ দফা এই সীমিত লক্ষ্য পূরণেরই কর্মসূচী। গত সাড়ে তিন বছরে এই কর্মসূচীকে সার্থকভাবে রূপ দানের আন্তরিক প্রচেষ্টা চলছে। তারই ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ৩৬ দফা অনুযায়ী বামফ্রন্ট সরকার বিনষ্ট গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পুনরুদ্ধার করেছেন, স্বাধীন মতামত প্রকাশের ও সমালোচনার অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারও বিরাজ করছে। ভূমি-সংস্কারকে দেওয়া হয়েছে অগ্রাধিকার। ছোট জমির মালিকদের খাজনা মকুব, বকেয়া ঋণ বাতিল, ভূমিহীন কৃষক ও খেতমজুরদের সারা বছর কাজের ব্যবস্থা ও নূনতম মজুরী নির্ধারণ, কৃষি ও সেচের কাজে নানাভাবে সাহায্য করা, নাম রেকর্ডভুক্ত করে বর্গাদারদের অধিকারকে স্বীকৃতিদান প্রভৃতি ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের অর্জিত সাফল্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পনের বছর পর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামীণ মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে গ্রামীণ উন্নয়নের ভার। ৩৬ দফা অনুযায়ী এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কর্ম-সংস্থান, বেকারভাতা প্রদান, শস্যবীমা প্রথা চালু করা হয়েছে, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনা বেতনে লেখাপড়ার ব্যবস্থা হয়েছে, সংখ্যালঘু এবং উপজাতি উন্নয়নে অবলম্বিত হয়েছে নানা কার্যকরী পদক্ষেপ, আদিবাসীরা ফিরে পেয়েছে অরণ্যের অধিকার। আর এ সবের ফলেই পশ্চিমবাংলায় এক জনজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে এক আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ়প্রত্যয়ী মানুষের এবং এর উজ্জ্বল প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে ভারতের নানা প্রান্তে গণতান্ত্রিক মানুষের মধ্যে। এই জাগরণকে যাঁরা ভয় পান তাঁরাই আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে বাজার গরম করার চেষ্টা করছেন।

সত্তর দশকের সন্ত্রাস-কবলিত ক'টি বছর

আজ যখন বর্তমান পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সোরগোল তোলা হচ্ছে তখন ১৯৭৭-এর নির্বাচন-পূর্ব সত্তর দশকের প্রথম ক'টি বছরের দিকে ফিরে তাকালে সহজেই বোঝা যাবে আমরা কোথায় ছিলাম এবং এখন কোথায় আছি। ১৯৭০ সালে রাজ্য জুড়ে নেমে আসে গণতন্ত্র-হত্যাকারী সন্ত্রাস: '৭২ সালের নির্বাচনের আগে পর্যন্ত ১৬৫৩টি রাজনৈতিক খুন সংগঠিত হয়। শ্রমিক-কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণ, ২০,০০০ শ্রমিক-কর্মচারীকে এলাকা থেকে উৎখাত, ব্যাপকহারে তাদের ছাঁটাই, লে অফ্‌, মিথ্যে মামলা রুজু, এলাকায় এলাকায় সন্ত্রাস, ন্যায়সংগত বোনাস বন্ধ, ৪২ জন সরকারী কর্মচারীকে হত্যা, ছোট ও মাঝারি চাষী ও বর্গাদারদের ওপর অত্যাচার—সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি আমরা দেখেছি। '৬৭, '৬৯ সালে দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা জমির বড় অংশ এই সময় বড় জমির মালিকেরা বেআইনীভাবে আবার দখল করে নেয়। বীভৎসতার চরম রূপ দেখা যায় যখন '৭১ সালে শ্রদ্ধেয় জননেতা হেমন্ত বসু খুন হন, খুন হন ভগৎ সিং-এর সহকর্মী জীবন মাইতি, আন্দামান ফেরত সুরেন্দ্র ধরচৌধুরী, বর্ধমানের শিবশংকর চৌধুরী, জননেতা মহাদেব ব্যানার্জী। ১২ জুলাই জেলের মধ্যে ১১ জন বিচারাধীন বন্দীকে গুলি করে হত্যা, কাশীপুরে গণহত্যা—যার শিকার ২০ জন যুবক, প্রগতিশীল সাংবাদিক-সাহিত্যিক সরোজ দত্ত এবং অপর আর একজন সাংবাদিক রাখাল নাথের হত্যার কথাও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়ার কথা নয়। নারীনির্যাতনের দিক দিয়েও এই অধ্যায় চরম কলংকময়। '৭১ সালে কোয়ালিশন সরকারের ৮৮ দিনের রাজত্বে ১৮ জন মহিলাকে হত্যা করা হয়। নারকেলডাঙ্গা থানার ভিতর অসীমা পোদ্দার এবং পানিহাটীতে কল্যাণী ব্যানার্জী নির্মমভাবে নির্যাতিতা হন। পিতৃহত্যাকারীকে বাধা দিতে গিয়ে বন্দী হন ভারতী তরফদার। '৭৭-এর নির্বাচনের পর তিনি মুক্ত হন।

শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর নেমে আসে ব্যাপক হারে আক্রমণ।

গণ-টোকাটুকি এ সময় শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে বিপন্ন করে দেয়। জোরজুলুম শিক্ষার সমগ্র পরিবেশকে কলুষিত করে। ৫০০ মাধ্যমিক, ১০০ প্রাথমিক শিক্ষক ও ১৫০০ ছাত্রকর্মী নিজ দেশে পরবাসী হতে বাধ্য হন। ৪৫০টি স্কুল-কলেজ সমাজ-বিরোধীদের দৌরাত্ম্যে বন্ধ হয়ে যায়। বহু সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষা-ব্রতীকে এই সময় প্রাণ দিতে হয়। শিক্ষার সংগে সংগে সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও চরম নৈরাজ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অপসংস্কৃতি উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭৫ সালে অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর জীবনের সর্বক্ষেত্রে যখন আক্রমণ বহুগুণে বেড়ে যায় তখন শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপরও আক্রমণ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এই সময় বহু প্রগতিশীল পুস্তকের প্রচার নিষিদ্ধ হয়, অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ হয় রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ও গান, বিশ্বের সর্বকালের সেরা চিন্তাবিদদের রচনাবলী প্রচারেও অনেক ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হয়। বাধা পায় বহু মনীষী ও কবি-সাহিত্যিকের উদ্দেশে শ্রদ্ধানুষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গের শক্তিশালী বাম-পন্থী আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য চলে এক মরীয়া প্রয়াস। এ সময় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে এক বিরাট জেলখানায় পরিণত করা হয়। যেখানে জেলখানাগুলিতে সর্বমোট ২০,০০০ মানুষকে রাখার ব্যবস্থা আছে সেখানে ৩৫ হাজার মানুষকে বন্দী করে রাখা হয়। এক মিসাতে আটক হন ৩৬৬৭ জন। ১৩০০ রাজ-বন্দীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সুদূরে তামিলনাড়ু ও কেরলের জেল-খানায়, ৬০ জন বন্দীকে হত্যা করা হয় জেলখানার ভিতর। জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে ঘন কালো অন্ধকার বিরাজ করতে থাকে।

গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার

সুদীর্ঘ সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে যখন বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল তখন প্রথমেই এই সরকার পূর্বতন আমলে অপহৃত গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শ্বাসরোধকারী অবস্থার অবসান ঘটালেন। সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হ'ল। এর ফলে শুধু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী ও নেতারা নন, অন্তর্কলহের জন্য ধৃত ১৭০০ কংগ্রেস কর্মীও ছাড়া পেলেন। জরুরী অবস্থাকালে অবলম্বিত সমস্ত নিপীড়ন-মূলক ব্যবস্থা বাতিল করা হল। এই সরকারের আমলে বাক্‌স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা, গতি-বিধির স্বাধীনতা সবই নিরাপদ। গণতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা বিরোধী দলগুলির ক্ষেত্রেও এখন সুনিশ্চিত। শ্রমিক আন্দোলন তথা যে-কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশী-হস্তক্ষেপ বন্ধ। পূর্বতন আমলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার জন্য বরখাস্ত সরকারী কর্মচারীদের এই সরকার পুনরায় চাকুরীতে পুনর্বহাল করেছেন। এই সরকার হৃত গণতান্ত্রিক অধিকার যেমন পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেছেন তেমনি অধিকার বিকাশের জন্য কার্যকর পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে এসেছে। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দানা বাঁধছে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের কর্মসূচী অনুযায়ী এ রাজ্যে ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েতী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতী সংগঠন গ্রামীণ জীবনে নূতন উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। গ্রামবাংলা এখন নিঃসন্দেহে নতুন ভবিষ্যতের সূচনা করছে।

গ্রামীণ মানুষের জাগরণ, তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচী, পূর্ণাঙ্গ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের স্বীকৃতি, সর্বোপরি দুর্বলতর শ্রেণীর অগ্রগতির স্বার্থে সরকারী অঙ্গীকার স্বার্থান্বেষী মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে। তাই আইন-শৃংখলা বিপন্ন বলে রব উঠছে।

কিন্তু সত্যিই কি এ রাজ্যে আইন-শৃংখলা বিপন্ন?

যে সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি সীমান্ত রাজ্যের অবস্থিতি সেই অবস্থাতে সচেতন মানুষ মাত্রই জানেন, আইন-শৃংখলার কিছু সমস্যা কিভাবে দেখা দেয়। আইন-শৃংখলার সমস্যা দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। দেশে চরম দারিদ্র্য, সীমাহীন বেকারত্ব, প্রভূত শোষণ, বিপুল বঞ্চনা রয়েছে। প্রতিপদে রয়েছে লাঞ্ছনা, অন্যায়, অবিচার। এমনই এক অবস্থার মধ্যে আইন-শৃংখলাজনিত সমস্যা দেখা দেওয়া অনিবার্য। মনে রাখতে হবে, দু'শ বছরের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ এবং ত্রিশ বছরের পুঁজিপতি, জোতদার-জমিদারের সেবায় নিয়োজিত শাসনের ফলে দেশ আজ নানান গভীর সমস্যায় পীড়িত। আইন-শৃংখলার সমস্যা তারই একটি। দেশের যে সত্তর শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য-সীমার নীচে বাস করছেন, তাদের অবস্থার উন্নতি না ঘটিয়ে দেশের সব কিছু ঠিক-ঠাক চালানো সম্ভব নয়, কাজেই আইন-শৃংখলার সমস্যা থাকবেই। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব সমস্যার কথা মনে রাখতে হবে। দেশ বিভাগের ফলে বাংলার মানুষের দুই-তৃতীয়াংশ চলে গেছে অন্য রাষ্ট্রে। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবাণিজ্য বিরাটভাবে ক্ষতি-গ্রস্ত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু সর্বহারা হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে এর ফলে বিরাট চাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং তা থেকে সমস্যা দেখা দিয়েছে৷ এই উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রের আশ্চর্য উদাসীনতা ও বৈষম্য-মূলক আচরণের ফলে স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পরেও আমাদের খণ্ডিত স্বাধীনতার বলিরা পথে পথে ঘুরছেন। এ ছাড়া সীমান্ত রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের কিছু সমস্যা রয়েই গেছে।

দেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিচার না করে কোন রাজ্যের আইন-শৃংখলার প্রশ্ন বিবেচিত হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার মনে করেন অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠামোর মৌলিক ও গুণমুখী পরিবর্তনের মধ্যেই দেশের সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে। কেবল পুলিশ প্রশাসন নিয়ে এ সমস্যার সমাধান কখনই হতে পারে না। একটি অঙ্গরাজ্যের শাসনকার্যে ন্যস্ত থেকে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে মৌলিক কতটুকু কি করা সম্ভব? তবু এই সরকার সীমিত ক্ষমতা সত্ত্বেও তার কর্তব্য পালনে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্পর্কে একটি অপপ্রচার হল যে, এই সরকার সমস্ত সমাজবিরোধীকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার ফলে রাজ্যে অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে। এই প্রচারের মাধ্যমে পরিস্থিতির নিঃসন্দেহে বিকৃত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এটাতো বাস্তব অভিজ্ঞতা। সমাজবিরোধীদের মুক্তি দেওয়ার বিষয়টিও একটি ভয়ঙ্কর অর্ধসত্য। বামফ্রন্ট সরকারের নির্বাচনী ইস্তাহারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্ষমতাসীন হবার পর এই সরকার ৩৪,২০৪টি রাজনৈতিক মামলা তুলে নেন। এদের মধ্যে ১,৯১৭ জন কংগ্রেসী। রাজনৈতিক কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত ২৭০ জনের দণ্ডাদেশ হ্রাস করে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। আর মুক্তি দেওয়া হয়েছে ২১৮ জন মিসা বন্দীকে। এ-কথা ঠিক যে প্রত্যাহার করা কোন কোন মামলার ক্ষেত্রে সমাজবিরোধীরা জড়িত ছিল এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই এরা কংগ্রেস (ই) সমর্থক। বামফ্রন্ট সরকার নীতিগতভাবে বিনা বিচারে আটক রাখার বিরোধী, বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য কাউকে শাস্তি দেবারও। তাই অনেক সাজানো ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

এবং রাজনৈতিক মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে। সাধারণ ক্ষমার অঙ্গ হিসাবে বিনা বিচারে আটক বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হলেও সরকার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, এই ক্ষমা সর্বকালের জন্য নয়, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর যেসব মামলা দায়ের করা হয়েছে সেগুলি কোন মতেই প্রত্যাহার করা হবে না, কোন রকম সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া হবে না এবং হচ্ছেও না। পুলিশকে সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, অপরাধীকে অপরাধী হিসাবে গণ্য করতে এবং রাজনৈতিক আনুগত্য নির্বিশেষে অপরাধীদের কঠোর হাতে দমন করতে হবে, হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য বামফ্রন্ট-বিরোধী বা সমর্থক কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। সরকারের এই সুষ্ঠুনীতির ফলেই সমাজ-জীবনে শান্তি বজায় রয়েছে। তবে মুস্কিল হল যে অধিকাংশ সমাজবিরোধীই রাজ্যের বর্তমান প্রধান বিরোধী দলের ছত্রছায়ায় রয়েছে। এরাই সাম্প্রতিককালে নানারকম সমাজবিরোধী কাজ শুরু করেছে ও সমাজ-জীবনকে বিপর্যস্ত করার চক্রান্তে মেতেছে। এরাই আজ আইন-শৃংখলার ক্ষেত্রে বড় সমস্যা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সতর্ক আছেন। জনগণের সহযোগিতায় এদের মোকাবিলা করতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গ বরাবরই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। এজন্য দেশী-বিদেশী কায়েমী স্বার্থ-বাদীদের সে চক্ষুশূল। এরা স্বভাবতই নানা চক্রান্তে লিপ্ত। তবু সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে পশ্চিমবঙ্গ আজও গণতান্ত্রিক মানুষের গর্বের জায়গা। তাই গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল যখন গণতন্ত্রের শত্রু বিচ্ছিন্নতাবাদের, উগ্র প্রাদেশিকতার হিংস্র আক্রমণে রক্তাক্ত তখন পশ্চিমবঙ্গই জাতীয় সংহতির, প্রাদেশিকতার কলুষমুক্ত গণতন্ত্রের পতাকাকে প্রতিদিন দৃঢ়ভাবে ঊর্ধ্বে তুলে ধরছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা শতচেষ্টা করেও এখানে এক ইঞ্চি মাটি খুঁজে পাচ্ছে না, তাই আমরা ভ্রাতৃঘাতী কোন হাঙ্গামা ঘটতে দেখি না, দেখি না অন্য প্রদেশের বা ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষকে বিন্দুমাত্র আতঙ্কিত হতে। তবু কিছু লোক চেঁচাচ্ছেন—'আইন-শৃংখলা নেই—গেল, গেল সব গেল!' কেন এই আর্তনাদ? কি গেল?

গ্রামাঞ্চলে এতকাল পুলিশ জোতদার জমিদার মহাজনদের স্বার্থ রক্ষা করে এসেছে। গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প, সেটেলমেন্ট ক্যাম্প ইত্যাদি সবই বসতো ধনী জোতদারের বাড়িতে। ফসল কাটার সময়ে, ধান বোনার সময়ে কিংবা জমি থেকে ভাগচাষী উচ্ছেদের সময়ে পুলিশ বরাবরই জোতদার-জমিদারের স্বার্থরক্ষা করে এসেছে। এ ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের নির্দেশ—ফসল কাটার সময়ে পুলিশকে ভাগচাষী ও খেতমজুরদের সমর্থনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে।

আইন মোতাবেক বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করার কথা। এতকাল এটা শুধুমাত্র আইনই ছিল। বামফ্রন্ট সরকারের বলিষ্ঠ নীতির ফলে প্রায় দশ লক্ষ বর্গাদারের নাম রেকর্ড করা হয়েছে। এ সবেই গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থবাদীরা প্রমাদ গুণছেন। আগের মত ডাকলেই গরীব ভাগচাষী, ক্ষেতমজুরকে পেটানোর জন্য বা বর্গাদারের রক্তে বোনা ধান কেড়ে নেবার জন্য পুলিশ হাজির হচ্ছে না। এতেই বিরোধীরা সম্ভবত আতঙ্কিত হয়েছেন।

সরকারের দ্বিধাহীন নির্দেশ—কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ যাবে না এবং গত সাড়ে তিন বছর ধরে যাচ্ছেও না। কায়েমী স্বার্থবাদীদের আর্তনাদের এটাও অন্যতম কারণ। এখন আপনারাই বিচার করুন—জনগণের বিপুল রায়ে যে সরকার নির্বাচিত তার পক্ষে জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের বিরোধিতা করা কর্তব্য না মানুষের গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষা বিকাশে সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ কর্তব্য।

সরকার সবিনয়ে এই কথাটাই বলতে চায় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একদিকে যেমন কাউকেই আইন নিজের হাতে নিতে দেবেন না, অন্যদিকে তেমনি অহেতুক আইন-শৃংখলা নামক জুজুর ভয় দেখিয়ে এ দেশের শ্রমিক-কর্মচারী-মধ্যবিত্তের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে দাবিয়ে রাখবেন না। এতে যদি কারো স্বার্থ বিঘ্নিত হয় তবে সরকার নিরুপায়।

আমরা আগেই এ কথা বলেছি যে আইন-শৃংখলা সমস্যা মূলতঃ সামাজিক-আর্থনীতিক সমস্যা থেকেই উদ্ভূত। তবুও যেসব ক্ষেত্রে সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য প্রবল হয়, সেখানে পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে অবস্থার যে মোকাবিলা করা যায় তাও আমরা দেখেছি। পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুরে বা নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের কিছু কিছু অংশে সামাজিক অপরাধ প্রবণতা যখন কিছুটা উগ্র হয়ে ওঠে তখন পুলিশী ব্যবস্থার সাহায্যে সে পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনা হচ্ছে। কিন্তু অন্য কয়েকটি রাজ্য পুলিশী প্রশাসনের সাহায্যে অবস্থা খুব যে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছেন এমন উদাহরণ তো বিশেষ দেখা যাচ্ছে না।

আইন-শৃংখলা অন্য রাজ্যে

যে সমস্ত মানুষ পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃংখলা নিয়ে সোরগোল তুলছেন তাঁরা অন্য কয়েকটি রাজ্যের উদ্বেগজনক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি দেখেও নিশ্চুপ কেন তা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়। দিল্লী ভারতবর্ষের রাজধানী এবং দিল্লী প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রের কর্তৃত্বাধীন

এই দিল্লী সম্পর্কে ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রীচন্দ্রচূড় ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০ পাটনার এক সভায় বলেন, "সাম্প্রতিককালে দিল্লীতে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির এতই অবনতি হয়েছে যে, কোন লোকের পক্ষে বিশেষ করে মহিলাদের পক্ষে প্রভাতীভ্রমণে বের হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে।" দিল্লীতে দিনের বেলাতেও মেয়েরা একা বের হন না, রাতে ভুল করেও কোন মহিলা রাজপথে নামেন না। ১৯৭৮-৭৯ সালে দিল্লীতে রেকর্ডভুক্ত অপরাধের সংখ্যা ৫৩,৬৪০। ১৯৭৯-৮০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৬,৬২০টি। দিল্লীর আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি এমনই ভয়াবহ যে দিল্লী প্রদেশ কংগ্রেস (ই) সভাপতি শ্রী এইচ. কে. এল. ভগত গত ২৫ জুলাই ১৯৮০ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজৈল সিং-এর সঙ্গে দেখা করে অপরাধ দমনে অবিলম্বে মিসার পুনঃপ্রবর্তন দাবী করেন।

সাম্প্রতিককালে ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হরিজন নিগ্রহ এক ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করেছে। ভারতের স্বাধীনতার ৩৩তম বার্ষিকী উৎসবের দিনটিতে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারত ভ্রাতৃঘাতী ভয়াবহ দাঙ্গায় মেতে উঠেছিল, এর ফলে তিন শতাধিক মূল্যবান জীবন নষ্ট হয়েছে। নষ্ট হয়েছে সম্প্রীতি ও মৈত্রীর বাতাবরণ। ভারতবর্ষ আদৌ এক থাকবে কি না সে নিয়েও কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন। হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে নরহত্যা, নারীনির্যাতন, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধমূলক ঘটনা বেড়েই চলেছে।

গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের ঘটনাতে উত্তরপ্রদেশ সবার শীর্ষে। প্রতি দু'মিনিটে সেখানে একটি করে বড় রকমের অপরাধমূলক ঘটনা ঘটছে। প্রতি দশ মিনিটে একটি করে রাহাজানি, প্রতি ১৫ মিনিটে একটি করে চুরি, প্রতি ৩০ মিনিটে একটি করে সশস্ত্র দাঙ্গা, প্রতি ৪৫ মিনিটে একটি করে লুঠ, প্রতি তিন ঘণ্টায় একটি করে খুন এবং প্রতিদিন তিনটি করে নারীনির্যাতন। উত্তরপ্রদেশে অপরাধ-

প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে পুলিশের শুধু যোগাযোগই নেই, পুলিশ নিজেও বহু জঘন্য অপরাধে লিপ্ত। বাগপতের জঘন্য ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে মনে আসে। বিহারের পরস বিঘা, দোহিয়া, পিপরায় যা ঘটেছে তা সভ্য সমাজের পক্ষে কলঙ্কজনক। ভাগলপুরের কয়েদীদের পুলিশের অন্ধ করার ঘটনা বিহার রাজ্যের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির ওপর এক নতুন আলোকপাত করছে। সেখানকার সামাজিক অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীরা সামাজিক দিক দিয়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক। পুলিশ এদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে নি। মরীয়া হয়ে এদের অন্ধ করেছে—যে ঘটনা নিঃসন্দেহে নারকীয়। অভিযুক্ত কয়েদীরা সামাজিক দিক দিয়ে কতটা মারাত্মক এই পরিস্থিতিতে তার প্রমাণ হচ্ছে। এ ধরনের সামাজিক অপরাধের গুরুত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ঘোর উদ্বেগজনক আইন-শৃংখলাজনিত সমস্যারই ইংগিত দিচ্ছে। দিল্লীতে প্রতিবন্ধী দিবসে অন্ধদের উপর নির্মম ল্যাঠিচার্জের ঘটনায় সারাদেশ লজ্জায় অধোবদন হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে হাইকোর্টের ভিতরে প্রবেশ করে পুলিশ ১২ জন আইনজীবীকে নির্মমভাবে প্রহার করে। এতে একজন মাননীয় বিচারপতিও আহত হন। মধ্যপ্রদেশের বিদিশা জেলার দুজন গ্রামবাসীকে পুলিশহাজতে পিটিয়ে মারা হয়েছে কিছুদিন আগে। কর্ণাটকের চিকমাগালুরে কফিবাগানে ১৯৮০ সালের ২৬ মার্চ পুলিশ ও গুণ্ডারা নারী শ্রমিকদের বিবস্ত্র করে মার্চ করায়। উড়িষ্যার পুরী জেলায় কুহুদিহাটে হরিজনবস্তীতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে। অন্ধ্রপ্রদেশে দুর্বলতর শ্রেণী এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি আক্রমণ চলেছে অব্যাহত গতিতে। গুজরাটে মেডিকেল ছাত্রদের আন্দোলন সহিংস রূপ নিয়েছে। শুধু জাত-পাতের লড়াই বা নারীনির্যাতন নয়, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরলের বাইরে ভারতের অন্য রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের জন্য নির্বিচারে অত্যাচার চালানো হচ্ছে।

বাইরের রাজ্যের এই অন্ধকারকে আড়াল করার জন্য বোধ করি পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে সোরগোল তোলা হচ্ছে। একদিকে নানা কায়দায় জনজীবন বিপর্যস্ত করার চক্রান্ত চলছে, অন্যদিকে আইন-শৃংখলার ব্যাপারে কেন্দ্রের কাছে ক্রমাগত নালিশ জানিয়ে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ দাবি করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক অশান্তি সৃষ্টি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রীকে গত বৎসর এক পত্রের উত্তরে জানান, আমাদের হাতে তথ্য আছে কংগ্রেস (ই)-র কিছু সদস্য আমাদের সরকারকে তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্যে বর্তমানে মরীয়া হয়ে শান্তিভঙ্গ করার জন্য আক্রমণ চালাচ্ছেন। তারা সাধারণ অপরাধগুলিকেও রাজনৈতিক বলে দাবি জানাচ্ছেন। তাঁরা বীজ রোপণ ও ধান কাটার মরশুমে ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরদের প্রতি আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়াশীল জোতদার ও গ্রামের গুণ্ডাদের সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কংগ্রেস (ই) সমর্থকদের পুলিশ সক্রিয় সাহায্য না করলে তাঁরা পুলিশের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেন এবং যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেস (ই) পরিচালিত সেহেতু এ'রা ভয়াবহ পরিণামের ভীতি প্রদর্শন করেন এবং অনবরত ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁরা পুলিশ ও প্রশাসনকে দ্বিধান্বিত করার চেষ্টা করেন। কিভাবে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ঘটনা সাজানো হচ্ছে তারই একটি দৃষ্টান্ত হল নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামের জনৈক রাজকুমার ঘোষের হত্যার কাহিনী। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো এক চিঠিতে রাজকুমার ঘোষকে কংগ্রেস (ই) কর্মী আখ্যা দিয়ে তাকে হত্যার ব্যাপারে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন। এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পর এক চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেল। প্রধানমন্ত্রীর চিঠির জবাবে গত ২৮ মার্চ ১৯৮০ মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "রাজকুমার ঘোষের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার তিন মাস আগে। মৃত রাজকুমার ঘোষ দীর্ঘকাল ধরে নানা অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত ছিল এবং ৯টি ডাকাতি ও হত্যার মামলায় জড়িত ছিল। এ-সব মামলা রুজু হয়েছিল পূর্বতন কংগ্রেস রাজত্বে এবং রাষ্ট্রপতির শাসনকালে। এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে এ রকম ব্যক্তিকে আপনি আপনার দলের কর্মী বলে দাবী করেছেন।"

১৯৮০-র ২৫ ফেব্রুয়ারী শ্রীমতী গান্ধী আর একটি চিঠিতে অভিযোগ করেন যে প্রাক্তন এম. এল. এ. শ্রীঅমরনাথ মণ্ডল ও তাঁর পরিবারের উপর হামলা চালিয়ে তাঁর ছেলের মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সম্পর্কেও। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভাতেও বিরোধীদলের পক্ষ থেকে অনেক হৈ চৈ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী ব্যাপারটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে প্রধানমন্ত্রীর চিঠিরও জবাব দেন। তদন্তের সময় মণ্ডল পরিবার লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, স্থানীয় কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বের একাংশ এই খুনের সঙ্গে জড়িত। কারণ নিহত ব্যক্তি কংগ্রেস (ই) দলে ঐ নেতৃত্বের বিরোধী গোষ্ঠীতে অবস্থান করতেন। পুলিশী তদন্তেও দেখা গিয়েছে যে শ্রীমণ্ডল কংগ্রেসী কোন্দলের শিকার হয়েছেন এবং এর সঙ্গে কোন বামপন্থীদলের যোগাযোগ নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে অভিযোগ করেছেন যে 'নিরীহ' কংগ্রেস কর্মীদের উপর নাকি অত্যাচার চালানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে বিস্তৃত তদন্তের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বহু ঘটনার উল্লেখ করে একটি বিস্তৃত তালিকা পেশ করেছেন যাতে দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বর্ণিত 'নিরীহ' কংগ্রেস কর্মীদের উপর আক্রমণের অভিযোগ শুধু অমূলকই নয়, বরং এদের আক্রমণেই বহু সি. পি. আই (এম) এবং বামফ্রন্ট কর্মী আক্রান্ত, আহত বা নিহত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আরও লিখেছেন যে, "আমি নিশ্চিত, আপনি নিজে তদন্ত করলেও দেখতে পাবেন যে এই 'নিরীহ' কংগ্রেস কর্মীরা শুধুমাত্র সমাজ-বিরোধীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে বা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে না, এদের অন্তর্দলীয় কোন্দলেও ব্যবহার করা হচ্ছে।" এদের হাতে বামফ্রন্ট আমলে শুধু যে ১৬৪ জন বামফ্রন্ট কর্মী নিহত হয়েছেন তাই নয়, এদের ঘরোয়া কোন্দলেও নিহত হয়েছেন ৩২ জন। এদেরই একেকটি গোষ্ঠী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বিপক্ষ গোষ্ঠীর হাত থেকে রক্ষার আবেদন জানাচ্ছে।

গত ২৯ নভেম্বর, ১৯৮০ তারিখে প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস (ই) দলের সভাপতি শ্রীমতী গান্ধীকে লেখা এক চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী জানান কংগ্রেস (ই) দলের কর্মীরা কিভাবে রাজ্যে আইন-শৃংখলা-জনিত সমস্যার সৃষ্টি করছে। তিনি বলেন বিগত লোকসভা নির্বাচনের পরেই পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস (ই)-তে অন্তর্দলীয় সংঘর্ষ তীব্রতর হয়েছে। যুব কংগ্রেস (ই) ও কংগ্রেস (ই)-র বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে সমাজবিরোধীরা যুক্ত হয়ে আছে। তিনি এই প্রসঙ্গে কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রীকে লেখা মুখ্যমন্ত্রীর চিঠির বয়ান থেকে এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ

১৯৮০ সালের প্রথম নয় মাসে কলকাতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে দশটি এবং প্রত্যেকটিতে কংগ্রেস (ই) জড়িত। এইসব সংঘর্ষে একজন মারা যায় এবং অপর একটি ঘটনায় পুলিশের গুলিতে মারা যায় আর

একজন। এই দশটি ক্ষেত্রে পুলিশের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কংগ্রেস (ই)-র লোকেরাই গণ্ডগোল শুরু করেছিল। প্রত্যেকটি ঘটনায় পুলিশ অভিযোগ ও প্রতি-অভিযোগের ভিত্তিতে সংঘর্ষকারী উভয় পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। এটাও দেখা যাচ্ছে যে কংগ্রেস (ই)-র যতজন গ্রেপ্তার হয়েছে অন্যপক্ষেরও ততজন গ্রেপ্তার হয়েছে। আমরা ক্ষমতা পাবার পর থেকে কংগ্রেস (ই)-র অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ঘটেছে শুধু কলকাতাতেই ৫৬টি, এর মধ্যে ৩১টি ঘটেছে বর্তমান বছরের নয় মাসে। ১৯৭৯ সালে কংগ্রেস (ই)-র অন্তর্দলীয় সংঘর্ষে মারা গেছে ১৬ জন। এর মধ্যে ১৫ জন কংগ্রেস (ই)-র লোক এবং একজন গৃহস্থ বধূ যাঁর কোন রাজনৈতিক পরিচয় নেই। কারা কাদের দ্বারা নিহত হয়েছে তার একটা ধারণা আপনি পরিশিষ্ট থেকে পাবেন। আপনি বুঝতে পারবেন যে পুলিশ এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে এবং বিরাট সংখ্যক দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার করেছে। এই সময় কংগ্রেস (ই)-র কোন একটি গোষ্ঠীর ছেলে গোষ্ঠীযুদ্ধে মারা গেলে পুলিশ অপর গোষ্ঠীর ছেলেদের গ্রেপ্তার করল, অমনি সেই গোষ্ঠীর নেতারা অভিযোগ করলেন পুলিশ রাজ্য সরকারের বিরোধী রাজনৈতিক ছেলেদের হেনস্থা করেছে।

কংগ্রেসের নিজেদের মধ্যেকার মারামারি নতুন নয়। এমন কি কংগ্রেসী শাসনেও এ ঘটনা ঘটেছে, এ ধরনের সংঘর্ষে বহু মৃত্যুও হয়েছে।

একজন সমাজবিরোধী পুলিশের গুলিতে মারা গেলে বা আহত হলে কংগ্রেস (ই) নেতারা তাকে কংগ্রেস (ই) কর্মী বলে দাবি করেন। রাজ্য কংগ্রেস (ই) নেতাদের এই দাবি ওঠানোর ঝোঁক বেশ জ্বালাতনের ব্যাপার। আমি বুঝতে পারি না এই ধরনের দাবি দলের ভাবমূর্তিকে কতটা উজ্জ্বল করে। জনৈক দুলাল মণ্ডলের কথাই ধরা যাক। একদিন রাতে মাতাল অবস্থায় রিক্সা করে নিষিদ্ধ পল্লী থেকে ফেরার পথে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। সে পেটে যন্ত্রণার কথা জানালে জেলের ডাক্তার পরীক্ষা করে বুঝলেন পুরনো লিভারের অসুখ এবং তা মারাত্মক আকার নিয়েছে দেখে তিনি হাসপাতালে পাঠাবার পরামর্শ দেন। সেখানে সে অপারেশনের আগেই মারা যায়। রাজ্য কংগ্রেস নেতারা চেঁচিয়ে উঠলেন যে একজন কংগ্রেস (ই) কর্মীকে পিটিয়ে মেরেছে অথচ মেডিকেল রিপোর্ট বলছে অন্য কথা। দুলাল মণ্ডলের রাজনৈতিক পরিচয় নেই এবং বেশ কিছু সংখ্যক অপরাধমূলক ঘটনায় সে জড়িত ছিল। একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনাসহ অনেকগুলি ব্যাপারে সে অভিযুক্ত। আপনার রাজ্যদলের নেতারা প্রমাণ করতে চাইছেন যে সে একজন কংগ্রেস (ই) কর্মী এবং পুলিশ তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে।

জেলাগুলি থেকে পাওয়া প্রাথমিক হিসাবে দেখা যাবে ১৯৮০'র প্রথম আট মাসে রাজনৈতিক সংঘর্ষে মারা গেছে ৪৫ জন। এদের মধ্যে ১৯ জন সি. পি. আই (এম) ও অন্যান্য বামপন্থী দলের সমর্থক এবং ২৩ জন কংগ্রেস (ই)-র। এর মধ্যে কংগ্রেস (ই)-র অন্তর্যুদ্ধের বলিও হয়েছে। এ সমস্ত মৃত্যুই দুঃখজনক। কাজেই কংগ্রেস (ই)-র ছেলেরা নির্দোষ আর বেছে বেছে তাদের খুন করা হচ্ছে এ-কথা সত্য নয়।

কলকাতায় যখন প্রধানত সমাজবিরোধীরা সংঘর্ষ চালাচ্ছে সে সময় গ্রামাঞ্চলের সংঘর্ষগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন ছাড়াই ঘটেছে। আমাদের সরকার গরিবদের পক্ষ নিয়ে চলে। গ্রামের গরিবরা যখনই তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে, জোট বাঁধছে, তখনই স্বার্থান্বেষী চক্রের আঁতে ঘা লাগছে। তারা হতাশ হয়ে পড়ছে। হিংস্র হয়ে উঠছে। সরকারী প্রশাসন আগে যেমন গ্রামে বড়লোকদের পক্ষ নিয়ে এগিয়ে আসত এখন আর তেমন আসছে না। এর ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে উত্তেজনা। রাজ্য-সরকার এবং বামফ্রন্ট এই উত্তেজনা প্রশমনের ব্যাপারে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তাঁদের সমস্ত রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অতীতের মত এখনও ধান চাষ ও ধান কাটার মরশুমে সংঘর্ষ ঘটছে। এ বছর কংগ্রেস (ই)-র সমর্থকরা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে জোতদারদের পক্ষাবলম্বন করছে এবং পরিস্থিতি জটিল করে তুলছে।

এরা যে নিজেরাই আইন-শৃংখলার নানা সমস্যা সৃষ্টি করছে তাই নয়, চরম বিপজ্জনক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনেও মদত যোগাচ্ছে। সাম্প্রতিক উত্তরখণ্ড আন্দোলন এর উদাহরণ। উত্তরখণ্ড আন্দোলনের প্রধান সংগঠক শ্রীঈশ্বর তিরকি একজন সুপরিচিত কংগ্রেস (ই) নেতা। এই দলের এম. পি., শ্রীপ্রসেনজিৎ বর্মণও এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এ সবের মাধ্যমে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিকে বিপর্যস্ত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

গত ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ প্রধানমন্ত্রীর কাছে লেখা আরো একটি চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন যেগুলিতে আবারো দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস (ই)-র গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজ্যের আইন-শৃংখলা সমস্যার সৃষ্টি করছে। একাধিকবার এ-ও দেখা গেছে যে গুণ্ডার দল এবং মূলত সমাজবিরোধীরা যখন দেখে যে পুলিশ তাদের পেছনে লেগেছে তারা তখন নিজেদের কংগ্রেস (ই) সমর্থক বলে দাবি করে। কংগ্রেস (ই) নেতারা তাদের নিন্দা করছেন বা তাদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করছেন, এমন দৃষ্টান্ত কিন্তু বিরল। মুখ্যমন্ত্রীর ঐ চিঠিতে বলা হয়েছে:

(ক) গত ৫-১২-৮০ তারিখে পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ শহরে স্থানীয় দুটি ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত একদল সশস্ত্র গুণ্ডা জনৈক সমরেন্দ্র পালের বাড়ি আক্রমণ করে। আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ঐ ভদ্রলোকের ছেলে ভোলা। খবর পাওয়া গেছে এই দলটি কংগ্রেস (ই)-র একটি গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট। ভোলাকে সেখানে না পেয়ে হাঙ্গামাকারীরা বাড়িতে আগুন ধরাতে চেষ্টা করে, কিছু মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে যায় ও শেষ পর্যন্ত ভোলার ১১ বছর বয়স্ক বোন তন্দ্রাকে ও ৯ বছরের ভাই কুনালকে কুপিয়ে হত্যা করে। কংগ্রেস (ই)-র অপর একটি গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট ভোলার দলের ছেলেরা ঐ দিনই কিছুক্ষণ আগে প্রথমোক্ত দলকে আক্রমণ করেছিল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই ভোলাদের বাড়িতে পরের ঐ আক্রমণ।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হল একজন যুব কংগ্রেস (ই) নেতা রাজ্যপাল মহোদয় ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে দাবী করেছেন যে ভোলা ও তার দল যুব কংগ্রেস (ই) কর্মী। এ-ও জানা গেছে, প্রতিদ্বন্দ্বী দলের একজন নেতা যিনি টাউন কংগ্রেস (ই)-র সভাপতি, তিনি পুলিশ রেকর্ড অনুযায়ী ঐ অঞ্চলের একজন সুপরিচিত গুণ্ডা। দুদলেরই বেশ কিছু সদস্য অতীতে অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার অনেক আগেও ঐ অঞ্চলের বহু অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

(খ) দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে কলকাতার উপকণ্ঠে। এখানে কংগ্রেস (ই) ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসুর অনুগামী জনৈক বাপী দত্ত শ্রীবসুরই অপর একজন অনুগামী সাধননারায়ণ বসুকে খুন করে। রিপোর্টে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে অন্তর্দলীয় কলহে এ মৃত্যু ঘটেছে।

(গ) তৃতীয় ঘটনা খোদ কলকাতাতেই ঘটে। এই ঘটনায় বোমার আঘাতে ৭ বছরের একটি বালক তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

চলন্ত ট্যাক্সি থেকে একদল গুন্ডা একটি বোমা নিক্ষেপ করে। লক্ষ্য ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী-গোষ্ঠীর জনৈক সদস্য। কিন্তু আঘাত তাকে না লেগে একটি নিষ্পাপ শিশুর গায়ে লাগে। এই দুটি গোষ্ঠী কংগ্রেস (ই)-র দুটি উপদলের সমর্থনপুষ্ট। এই শিশুটি হল কংগ্রেস (ই)-র অন্তর্দলীয় কলহের আরও একটি বলি. এ ঘটনা থেকে তা স্পষ্টই প্রতিভাত।

আরও একটি সাম্প্রতিক ঘটনার এখানে উল্লেখের দাবী রাখে। জগদ্দল থানার অন্তর্গত ভাটপাড়ার রিলায়েন্স জুট এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পারসোনাল ম্যানেজার শ্রী এম. এন. বল কিছুদিন পূর্বে কর্তব্যরত অবস্থায় কংগ্রেস (ই)-র একটি গোষ্ঠীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হন। কংগ্রেস (ই)-র সমর্থিত ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব্ জুট ওয়ার্কার্সের স্থানীয় ইউনিটের কিছু কর্মীই যে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তা দেখা গেছে। উক্ত ইউনিয়নের স্থানীয় নেতা গোলকেশ ভট্টাচার্যকে পুলিশ খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করেছে।

উল্লেখিত ঘটনাগুলি থেকে এটা স্পষ্টই প্রতিভাত যে কংগ্রেস (ই)-র গোষ্ঠীবৃন্দ ও এই দলের পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত কিছু সমাজবিরোধী এ রাজ্যে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিতে সমস্যা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জাগ্রত জনমত তাদের এই অপচেষ্টাকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে। প্রতিক্রিয়ার বিষ-বাষ্পে এ রাজ্যের আবহাওয়াকে কলুষিত করা বর্তমানে সম্ভব নয়।

১৯৭১-৭২ সালে সারা দেশে ১,৭৪৩ বার গুলি চালিয়ে পুলিশ যখন ২৬১ জনকে খুন করে এবং ৬৪০ জনকে আহত করে তখন আইন-শৃংখলা বিপন্ন এ কথা শোনা যায় নি। পুলিশী বর্বরতা লুকোবার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যখন ১৯৭২ সাল থেকে পুলিশের কার্যকলাপের রিপোর্ট প্রকাশ পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন তখনও কোন প্রতিবাদ ওঠে নি। ১৯৭৪ সালে বিহার ও গুজরাটে গণবিক্ষোভ দমনের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পুলিশ-বাহিনী নির্বিচারে যখন গুলি চালিয়েছিল তখনও কোন অভিযোগ ওঠে নি। ধিক্কার শোনা যায় নি ১৯৭৪ সালে রেল ধর্মঘট দমনের জন্য পুলিশী বর্বরতার সময়েও। জরুরী অবস্থার সময়ে গোটা দেশ যখন পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল, ২,২৬৩টি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে মারা গিয়েছিলেন ১,০৮৪ জন অসহায় মানুষ, তখনও কোন আওয়াজ ওঠে নি। আর আজ এরা সরব হয়েছেন তখন, যখন পশ্চিমবাংলার জেলখানায় একজনও বিনা বিচারে আটক ব্যক্তি নেই, যখন জেলের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক হত্যা নেই, নেই রাজ-নৈতিক হয়রানি, নেই হরিজন হত্যার কলঙ্ক, নেই নারীর উপর অত্যাচারের সামান্যতম নজির, নেই আদিবাসী ভায়েদের উপর একটি আক্রমণের দৃষ্টান্ত, নেই জাত-পাতের লড়াই, নেই পুলিশী জুলুম, নেই সংবাদপত্রের উপর হামলা, নেই এলাকা থেকে উচ্ছেদের ব্যাপার, নেই গণটোকাটুকির বিভীষিকা, নেই চাঁদার জুলুম ও মস্তানবাহিনীর অত্যাচার, নেই বর্গাদার ছোট চাষীর উপর জোতদার জমিদারের আক্রমণ, নেই শ্রমিকের উপর মালিকের হামলা, নেই গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে পুলিশের অন্যায় হস্তক্ষেপ, নেই জাতীয় ঐক্যের শত্রু বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। এ ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে কায়েমী স্বার্থ-বাদীরা যে আওয়াজ তুলছেন তার নিহিত অর্থ জনগণের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

রাজ্যের বর্তমান সরকার জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করে চলেছেন। এই সরকার আত্মসমালোচনা করেন, আহ্বান করেন গঠনমূলক ও যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা। জনগণ জানেন এই সরকার একটা নতুন পথে চলতে চাইছে। এই সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা-রটনায় যাঁরা ব্যস্ত, তাঁদের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের সচেতন মানুষ কিন্তু সর্বদাই সজাগ আছেন।

আইন-শৃংখলা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে মুখ্যমন্ত্রীর পত্র

প্রধানমন্ত্রীর কাছে লেখা মুখ্যমন্ত্রীর ২৯-১১-৮০-র চিঠির পূর্ণ বয়ান—

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

কিছুকাল আগে আপনি আমাকে বলেছিলেন আপনার দলের লোকেরা আপনার কাছে অভিযোগ করেছে যে তাদের (কংগ্রেস-ই'র ছেলেদের) এই রাজ্যে সি. পি. আই (এম) সমর্থকরা আক্রমণ করছে এবং পুলিশ তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আপনি আমাকে কয়েকটি ঘটনা তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলেছিলেন। আমি এর প্রত্যেকটি ঘটনা তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠিয়েছি। ঐ রিপোর্ট দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে সমস্ত ঘটনাগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে দুষ্কৃতকারীদের রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনা করা হয় নি।

আমাদের মধ্যে আলোচনার সময় আমি আপনার কাছে উল্লেখ করেছিলাম যে, আইন-শৃংখলা রাজ্যের বিষয় এবং রাজ্য সরকার তার দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তা সত্ত্বেও আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, আপনার দলের লোকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ একটা রিপোর্ট পাঠাব যাতে আপনি পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটাতে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারেন। কংগ্রেস (ই)-র এইসব লোকজন কেবল অন্যান্য দলের লোকদের সঙ্গেই হিংসাত্মক সংঘর্ষে লিপ্ত নয়, অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেদের মধ্যেও মারামারি করছে। আপনাকে কেবল প্রধানমন্ত্রী হিসাবেই নয় কংগ্রেস (ই) সভাপতি হিসেবেও লিখছি যাতে এখানে আপনার পার্টির অবস্থা বুঝতে পারেন। এটা খুবই উদ্বেগের বিষয় বিগত লোকসভা নির্বাচনের পরই এইসব আন্তঃপার্টি সংঘর্ষ তীব্রতর হয়েছে। যুব কংগ্রেস (ই) এবং কংগ্রেস (ই)-র বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে সমাজবিরোধীরা যুক্ত হয়ে আছে। সমাজবিরোধীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সংঘর্ষ বেড়ে গেছে।

আমি এখন কতকগুলি ঘটনা উল্লেখ করব। ১৯৮০ সালের প্রথম নয় মাসে কলকাতার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে দশটি এবং প্রত্যেকটিতে কংগ্রেস (ই) জড়িত। এইসব সংঘর্ষে একজন মারা যায় এবং অপর একটি ঘটনায় পুলিশের গুলিতে মারা যায় আর একজন। এই দশটি ক্ষেত্রে পুলিশের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কংগ্রেস (ই)-র লোকেরাই গন্ডগোল শুরু করেছিল। প্রত্যেকটি ঘটনায় পুলিশের অভিযোগ ও প্রতি-অভিযোগের ভিত্তিতে সংঘর্ষকারী উভয় পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। এটাও দেখা যাচ্ছে যে কংগ্রেস (ই)-র যতজন গ্রেপ্তার হয়েছে অন্য-পক্ষেরও ততজন গ্রেপ্তার হয়েছে। আমরা ক্ষমতা পাবার পর থেকে কংগ্রেস (ই)-র অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ শুধু কলকাতাতেই ৫৬টি, এর মধ্যে ৩১টি ঘটেছে বর্তমান বছরের প্রথম নয় মাসে। ১৯৭৯ সালে কংগ্রেস (ই)-র অন্তর্দলীয় সংঘর্ষে মারা গেছে ১৬ জন। এর মধ্যে ১৫ জন কংগ্রেস (ই)-র লোক এবং একজন গৃহস্থ বধূ, যাঁর কোন রাজনৈতিক পরিচয় নেই। কারা কাদের দ্বারা নিহত হয়েছে তার একটি ধারণা আপনি পরিশিষ্ট থেকে পাবেন। আপনি বুঝতে পারবেন যে পুলিশ এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে এবং বিরাট সংখ্যক দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার করেছে। এই সময় কংগ্রেস (ই)-র

কোন একটি গোষ্ঠীর ছেলে গোষ্ঠীযুদ্ধে মারা গেলে পুলিশ অপর গোষ্ঠীর ছেলেদের গ্রেপ্তার করল, অমনি সেই গোষ্ঠীর নেতারা অভিযোগ করলেন পুলিশ রাজ্য সরকারের বিরোধী রাজনৈতিক ছেলেদের হেনস্থা করছে।

কংগ্রেসের নিজেদের মধ্যেকার মারামারি নতুন নয়। এমন কি কংগ্রেসী শাসনেও এ ঘটনা ঘটেছে, এ ধরনের সংঘর্ষে বহু মৃত্যু ঘটেছে।

একজন সমাজবিরোধী পুলিশের গুলিতে মারা গেলে বা আহত হলে কংগ্রেস (ই) নেতারা তাকে কংগ্রেস (ই) কর্মী বলে দাবি করেন। রাজ্য কংগ্রেস (ই) নেতাদের এই দাবি ওঠানোর ঝোঁক বেশ জবালাতনের ব্যাপার। আমি বুঝতে পারি না এই ধরনের দাবি দলের ভাবমূর্তিকে কতটা উজ্জবল করে। জনৈক দুলাল মণ্ডলের কথাই ধরা যাক। একদিন রাতে মাতাল অবস্থায় রিক্সা করে নিষিদ্ধ পল্লী থেকে ফেরার পথে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। সে পেটে যন্ত্রণার কথা জানালে জেলের ডাক্তার পরীক্ষা করে বুঝলেন পুরনো লিভারের অসুখ এবং তা মারাত্মক আকার নিয়েছে দেখে তিনি হাসপাতালে পাঠাবার পরামর্শ দেন। সেখানে সে অপারেশনের আগেই মারা যায়। রাজ্য কংগ্রেস (ই) নেতারা চেঁচিয়ে উঠলেন যে একজন কংগ্রেস (ই) কর্মীকে পুলিশ পিটিয়ে মেরেছে অথচ মেডিকেল রিপোর্ট বলছে অন্য কথা। দুলাল মণ্ডলের রাজনৈতিক পরিচয় নেই এবং বেশ কিছু সংখ্যক অপরাধ-মূলক ঘটনায় জড়িত, একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনাসহ আরো অনেক-গুলি ব্যাপারে সে অভিযুক্ত। আপনার রাজ্য-দলের নেতারা প্রমাণ করতে চাইছেন যে সে একজন কংগ্রেস (ই) কর্মী এবং পুলিশ তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে।

জেলাগুলি থেকে পাওয়া প্রাথমিক হিসাবে দেখা যাবে ১৯৮০-র প্রথম আট মাসে রাজনৈতিক সংঘর্ষে মারা গেছে ৪৫ জন। এদের মধ্যে ১৯ জন সি. পি. আই (এম) ও অন্যান্য বামপন্থী দলের সমর্থক এবং ২৩ জন কংগ্রেস (ই)-র। এর মধ্যে কংগ্রেস (ই)-র অন্তর্দ্বন্দ্বের বলিও রয়েছে। এ সমস্ত মৃত্যুই দুঃখজনক। কাজেই কংগ্রেস (ই)-র ছেলেরা নির্দোষ আর বেছে বেছে ওদের খুন করা হচ্ছে এ-কথা সত্য নয়।

কলকাতায় যখন প্রধানত সমাজবিরোধীরা সংঘর্ষ চালাচ্ছে সে সময় গ্রামাঞ্চলের সংঘর্ষগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিই সমর্থন ছাড়াই ঘটেছে। আমাদের সরকার গরিবদের পক্ষ নিয়ে চলে। গ্রামের গরিবরা যখনই তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে, জোট বাঁধছে তখনই স্বার্থান্বেষী চক্রের আঁতে ঘা লাগছে। তারা হতাশ হয়ে পড়ছে হিংস্র হয়ে উঠছে। সরকারি প্রশাসন আগে যেমন গ্রামে বড়লোকদের পক্ষ নিয়ে এগিয়ে আসত এখন আর আসছে না, এর ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে উত্তেজনা। রাজ্য সরকার এবং বামফ্রন্ট এই উত্তেজনা প্রশমনের ব্যাপারে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তাঁদের সমস্ত রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অতীতের মত এখনও ধান চাষ ও ধান কাটার মরশুমে সংঘর্ষ ঘটছে। এ বছর কংগ্রেস (ই) সমর্থকরা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে জোতদারদের পক্ষাবলম্বন করছে এবং পরিস্থিতি জটিল করে তুলছে।

আমরা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা এবং নিরপেক্ষতার অভাব সম্পর্কে অভিযোগেরও সম্মুখীন হচ্ছি প্রতিনিয়ত। এ ধরনের অভিযোগ কেবল বিরোধীরাই করছেন না, সি. পি. আই (এম) ও অন্যান্য বামফ্রন্ট দলের কাছ থেকেও পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্য প্রশাসন সর্বদা এই ধরনের অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছেন এবং সময় নষ্ট না করে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা নিয়েছেন। সমস্ত পুলিশী-শক্তি রাজনীতিগতভাবে শাসক দলের পক্ষ অবলম্বন করেছে তা মনে করার হেতু নেই। বিপরীত দিকে, শহরগুলিতে কংগ্রেস(ই) ও অন্যান্য ভূস্বামী এবং বুর্জোয়া দলগুলির স্বার্থান্বেষী চক্রের সঙ্গে পুলিশের পুরনো যোগসূত্র অব্যাহত রয়েছে। রাজনৈতিক পরিচয় ও সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য না রেখে নিরপেক্ষভাবে সমাজ-বিরোধীদের মোকাবিলা করার জন্য আমরা পুলিশকে প্রতিনিয়ত নির্দেশ দিয়ে আসছি। আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি শাসকদলের সমর্থকগণও বহু ঘটনায় গ্রেপ্তার হচ্চে এবং তাদের বিচার করা হচ্চে। আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে বিগত কংগ্রেসী রাজত্বে আমরা যখন বিরোধীর আসনে ছিলাম সে সময় আমাদের দলের ১১০০ জন লোক নিহত হয়েছে। তখন কিন্তু আমরা পুলিশী নিরাপত্তা পাই নি অথবা অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু করা হয়নি। পরিস্থিতির একটা পরিষ্কার চিত্র আপনাদের কাছে তুলে ধরার জন্য ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ দিলাম। আপনি যখন আপনার কাছে প্রদত্ত কংগ্রেস(ই) রিপোর্টগুলি পর্যালোচনা করবেন তখন উল্লিখিত বিষয়গুলিও বিবেচনা করবেন। আপনি যদি আপনার প্রভাব খাটিয়ে আপনার কর্মীদের আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা সৃষ্টি না করতে এবং সমাজবিরোধীদের ক্ষতিকর কার্য-কলাপ বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পরামর্শ দেন তা হলে ভাল হয়।

ভবদীয়
স্বাঃ জ্যোতি বসু

নিহত ব্যক্তির নাম	আততায়ী	এলাকা/তারিখ
১। অসীম দাস—কংগ্রেস(ই) (সোমেন মিত্র গোষ্ঠী)	কংগ্রেস(ই) (সুব্রত মুখার্জী গোষ্ঠী)	আমহার্স্ট স্ট্রীট থানা ৫.৩.৭৯
২। শক্তিপদ চক্রবর্তী—কংগ্রেস(ই) (সুব্রত মুখার্জী গোষ্ঠী)	কংগ্রেস(ই) (সোমেন মিত্র গোষ্ঠী)	এন্টালি থানা ৩.১০.৭৯
৩। তারক রায় (চোর তারক)—কংগ্রেস(ই) (প্রদীপ ঘোষ গোষ্ঠী)	কংগ্রেস(ই) (অজিত পাঁজা গোষ্ঠী)	নারকেলডাঙ্গা থানা ৪.২.৮০
৪। বসন্ত সরকার—কংগ্রেস(ই) (হেমেন মণ্ডল গোষ্ঠী)	কংগ্রেস(ই) (গৌর দাস গোষ্ঠী)	মানিকতলা থানা ১৩.৩.৮০
৫। স্বপন দাস—কংগ্রেস(ই) (সোমেন মিত্র গোষ্ঠী)	কংগ্রেস(ই) (সুব্রত মুখার্জী গোষ্ঠী)	এন্টালি থানা ৫.৫.৮০
৬। কার্তিক খটিক—কংগ্রেস(ই) (সোমেন মিত্র গোষ্ঠী)	কংগ্রেস(ই) (সুব্রত মুখার্জী গোষ্ঠী)	আমহার্স্ট স্ট্রীট থানা ১৫.২.৮০

নিহত ব্যক্তির নাম	আততায়ী	এলাকা/তারিখ
৭। প্রদীপ মল্লিক—কংগ্রেস(ই) (সোমেন মিত্র গোষ্ঠী)	কংগ্রেস(ই) (সুব্রত মুখার্জী গোষ্ঠী)	বেলেঘাটা থানা ৫.৩.৮০
৮। উদয় সিংহ রায়—কংগ্রেস(ই) (সোমেন মিত্র গোষ্ঠী)	কংগ্রেস(ই) (সুব্রত মুখার্জী গোষ্ঠী)	মানিকতলা থানা ২১.৩.৮০
৯। শংকর রায়—কংগ্রেস(ই) (সুব্রত মুখার্জী গোষ্ঠী)	কংগ্রেস(ই) (সোমেন মিত্র গোষ্ঠী)	আমহার্স্ট স্ট্রীট থানা ৩০.৩.৮০
১০। দেবাশীষ দাসগুপ্ত—কংগ্রেস(ই) (লক্ষ্মীকান্ত বোস গোষ্ঠী)	কংগ্রেস(ই) (নীরেন চক্রবর্তী গোষ্ঠী)	টালিগঞ্জ থানা ৩.৪.৮০
১১। বিশ্বনাথ মুখার্জি—লালগোলা	কংগ্রেস(ই) (সুব্রত মুখার্জী গোষ্ঠী)	মানিকতলা থানা ২৩.৫.৮০
১২। সমর কীর্তনীয়া		
১৩। কমল কুণ্ডু		
১৪। জয়দেব দাস—কংগ্রেস(ই) (সোমেন মিত্র গোষ্ঠী)	কংগ্রেস(ই) (সুব্রত মুখার্জী গোষ্ঠী)	এন্টালি থানা ৫.৬.৮০
১৫। রঞ্জন মণ্ডল—কংগ্রেস(ই) (সোমেন মিত্র গোষ্ঠী)	কংগ্রেস(ই) (সুব্রত মুখার্জী গোষ্ঠী)	এন্টালি থানা ৫.৭.৮০
১৬। আবদুল কালাম খান—কালনা (সুব্রত মুখার্জী গোষ্ঠী)	সমাজবিরোধী	বড়বাজার থানা ৬.৭.৮০
১৭। তপন রায়—কংগ্রেস(ই) (সোমেন মিত্র গোষ্ঠী)	কংগ্রেস(ই) (সুব্রত মুখার্জী গোষ্ঠী)	বটতলা থানা ২.৮.৮০

১৯৮১-৮২ সালের অনুদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাসের আয়-ব্যয়ক ভাষণ

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ১৯৮১-৮২ সালে ব্যয়ের জন্য ৩৩নং দাবি, প্রধান খাত ঃ ২৭৭—শিক্ষা (যুব কল্যাণ)-এর অধীনে ৪,১৬,৪৯,০০০ টাকা (চার কোটি ষোল লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার টাকা) মঞ্জুর করা হোক।

২। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি এই সভার মাননীয় সদস্যগণ সম্পূর্ণভাবে সচেতন গোটা দেশের তাবৎ যুবসমাজ কি ভয়াবহ ক্রমবর্ধমান বেকারীত্বের যন্ত্রণা ভোগ করছেন। নিশ্চয়ই মাননীয় সদস্যগণ অবহিত আছেন সৃজনশীল যুবসমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠার ও দায়িত্ব পালনের সুযোগের কি বেদনাময় সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ। স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে যুবজীবনের যে সুস্থ চাহিদাগুলি থাকে তা পূরণ করতে গোটা দেশ কি নিদারুণভাবে অক্ষম। সমগ্র দেশের ২৩ কোটি যুবসমাজের মধ্যে এক ভগ্নাংশকে মাত্র উৎপাদনশীল কর্মে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সারা দেশের এই অবস্থার মধ্যে বিরাজমান একটি অংগরাজ্যের যুবসমাজের অবস্থা অনিবার্য কারণেই ভিন্নতর হতে পারে না। বর্তমান সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর চৌহদ্দির মধ্যে বিচরণ করে একটি রাজ্য সরকারের পক্ষে তার যুব সম্প্রদায়কে সমস্যামুক্ত করা এবং তার জীবনকে অর্থবহ করার জন্য কোন সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্পূর্ণভাবেই অসম্ভব। এই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের যুবকল্যাণ বিভাগ তার সাধ্য ও সামর্থ্য অনুসারে যুবজীবনের সমস্যাগুলিকে লাঘব করা ও তার চাহিদাকে যতটুকু সম্ভব পূরণ করার কাজে নিবেদিত।

৩। বিগত তিন বৎসর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারকে দেশের যুবসমাজ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভংগী এবং তার গঠনমূলক পরিকল্পনাসমূহকে একটি নীতির মধ্যে সুসংবদ্ধ করে একটি জাতীয় যুবনীতি ঘোষণা করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা চালিয়ে আসছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে এই নীতি ঘোষণা করানো যায় নি। এই বিভাগের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে বহুমুখী বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কোন যুবকল্যাণ মন্ত্রক বা বিভাগ না থাকা। এমন কি এই রাজ্যের মত অন্য কোন রাজ্যে যুবকল্যাণ বিভাগ না থাকার ফলে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং অন্য রাজ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ এই বিভাগের ভাগ্যে জোটে নি। তবুও রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রিসভার গতিশীল নেতৃত্বে, যুব সংগঠনসমূহের বিশেষ করে বামপন্থী যুব-সংগঠনগুলির প্রাসংগিক ও সময়োপযোগী পরামর্শ ও উপদেশ এবং এই বিভাগের কর্মচারীদের যুবজনোচিত ক্ষিপ্রতা ও আকাংক্ষিত আন্তরিকতার জন্য রাজ্যে যুবকল্যাণ বিভাগ তার কর্মকান্ডকে গোটা রাজ্যব্যাপী সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছে। অনেক নূতন প্রকল্প প্রবর্তন করা হয়েছে, রাজ্যের যুবমনের বৃহদাংশের কাছে পৌঁছান গেছে। কিন্তু স্বীকার করতে এতটুকু সংকোচ কিংবা দ্বিধা নেই যে, রাজ্যের প্রায় পৌনে দুকোটি যুবজনের চাহিদা ও কামনার তুলনায় খুব কমই দিতে পেরেছি।

আশা করব মাননীয় সদস্যদের সুচিন্তিত সৃজনশীল সমালোচনা যুবকল্যাণ বিভাগের কণ্টকাকীর্ণ যাত্রাপথে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করবে।

৪। এই বিভাগ ইতিমধ্যে যে সাফল্যের সাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে তা সম্ভব হতো না যদি গোটা রাজ্যের যুবসমাজের বিরাট অংশের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করতে না পারত।

৫। আমি প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে এই কথা বলতে চাই যুবকল্যাণ বিভাগ, তার সম্বল যত সীমিত হোক, পথ যত বন্ধুর হোক, লক্ষ্য যত দূরূহ হোক, কল্যাণকামী মানুষের, যুবসমাজের সক্রিয় অংশ-গ্রহণের মধ্য দিয়ে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে। যুবসমাজকে হতাশাগ্রস্ত করে অপসংস্কৃতির ঘৃণ্য আবেদনে উত্তেজিত করে, সমাজ বিমুখ করে, কূপমণ্ডুকতা, সংকীর্ণতা, আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা ও ধর্মীয় মতান্ধতার শিকারে পরিণত করে বাংলার যৌবনকে বিপথে পরিচালিত করার সমস্ত চক্রান্তের জাল ছিন্নভিন্ন করে যুবসমাজ যাতে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে পারে তার জন্য যুবকল্যাণ বিভাগ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতার সাথে কাজ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

৬। যুবকল্যাণ বিভাগে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পগুলি সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে মাননীয় সদস্যদের নিকট উপস্থাপিত করছি।

৭। **বেকার যুবকদের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প—** আমরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করব যুবসমাজের সামনে সব-চেয়ে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে বেকারীর সমস্যা। বন্ধ্যা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অনিবার্য ফল বেকার সমস্যা।

রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পের অধীন স্বনির্ভর কর্মবিনিয়োগ কর্মসূচীর মাধ্যমে এই বিভাগ বেকার সমস্যা প্রশমনে ব্রতী হয়েছে। যদিও একথা সর্বজনস্বীকৃত যে বেকার সমস্যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তবুও সমস্যাটিকে সাধ্যানুসারে প্রশমনের জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অতিরিক্ত কর্মসংস্থানপ্রকল্প রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কসমূহ ও অন্যান্য লগ্নিকারী সংস্থা লগ্নির সর্বাধিক ৯০ শতাংশ মঞ্জুর করেন ও ১০ শতাংশ প্রান্তিক ঋণ হিসাবে রাজ্য সরকার মঞ্জুর করেন। একথা সত্য যে, ব্যাঙ্কের টালবাহানা প্রকল্পটির বাস্তবায়ণে নানা-বিধ প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে তবু চেষ্টা চলছে এই প্রকল্পে গতির তরঙ্গ সৃষ্টি করবার।

বর্তমান সরকার সমস্যাটির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে অশিক্ষিত যুবকদের জন্যও এই প্রকল্পের সুযোগ সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮১ পর্যন্ত ৩২ লক্ষ টাকারও বেশি প্রান্তিক ঋণ হিসাবে ৯৬০টি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে ২,৫০০-এরও অধিক বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে।

৮। **বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্প—**স্বনিযুক্তি প্রকল্পের কর্ম-সূচী আরও সার্থক করার লক্ষ্য নিয়ে যুবকল্যাণ বিভাগ বৃত্তি-মূলক প্রশিক্ষণের কাজে অগ্রণী হয়েছে। উদ্দেশ্য যাতে প্রশিক্ষণ শেষে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে বেকার যুবক-যুবতীগণ নিজেদের বাঁচার উপযোগী ব্যবস্থা নিজেরাই করতে সক্ষম হয়। এই প্রকল্পের জন্য তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। চলতি

আর্থিক বছরে তফসীলভুক্ত জাতি অধ্যুষিত এলাকায় ও তফসীলভুক্ত যুবক-যুবতীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

৯। **কমিউনিটি হল ও মুক্তাঙ্গন মঞ্চ স্থাপন**—গ্রাম বাংলার যুবক-যুবতীদের সংস্কৃতি চর্চার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই অথচ যুবজীবনকে অন্ধকার পথে ঠেলে দিয়ে হতাশাগ্রস্ত ও জীবনবিমুখ করে অপসংস্কৃতির জালে আবন্ধ করার অপচেষ্টা অব্যাহত আছে। তাই সুস্থ জীবনধর্মী সংস্কৃতিচর্চার প্রসারে সহায়তা করার জন্য এই বিভাগ কমিউনিটি হল ও মুক্তাঙ্গন মঞ্চ স্থাপন করছে। এইসব কমিউনিটি হল ও মুক্তাঙ্গন মঞ্চের কয়েকটি ইতিমধ্যেই রূপায়িত হয়েছে এবং কয়েকটির কাজ সমাপ্তির পথে। এইসব কমিউনিটি হল ও মুক্তাঙ্গন মঞ্চ ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলের যুবক যুবতীরা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, আলোচনা-চক্র, বিতর্ক প্রভৃতির প্রসার ঘটাতে সক্ষম হবেন। এই বাবত ২০ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে।

১০। **যুব উৎসব**—যুবকল্যাণ দপ্তর সুস্থ সংস্কৃতি ও গ্রামীণ প্রতিভার সুষ্ঠু লালনের জন্য ব্লক, জেলা ও রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসব সংগঠিত করছে। এ বছর ইতিমধ্যেই প্রায় সব ব্লকে যুব উৎসব শেষ হয়েছে এবং বাকি ব্লকগুলিতে শীঘ্রই শেষ হবে। এই বছর ন্যূনপক্ষে ৩ (তিন) লক্ষ যুবক-যুবতীর সর্বাত্মক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে যুব উৎসবগুলির বিপুল প্রভাব অনুভূত হচ্ছে এবং সুস্থ সংস্কৃতি প্রসারের এক নতুন পরিমন্ডল গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠছে।

১১। **স্কাউটিং, গাইডিং, ব্রতচারী ও মণিমেলার জন্য আর্থিক সাহায্য দান**—স্বাধীনতার পর যে নতুন মূল্যবোধ ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠা প্রত্যাশিত ছিল, সেই প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে নি বরং পুরাতন মূল্যবোধগুলি নির্মূল হতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে যুবকল্যাণ বিভাগ যুবক-যুবতীদের মধ্যে স্কাউট, গাইডিং, ব্রতচারী ও মণিমেলা আন্দোলনকে উৎসাহিত করতে তৎপর হয়েছে। কারণ এরা যুবসমাজকে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষার মাধ্যমে গঠনমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করে চরিত্র গঠন করতে চায়।

১২। **যুব-আবাস প্রকল্প**—বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, রাজ্যের ভিতরের ও বাইরের জনসাধারণের জীবনযাত্রা, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়েব মাধ্যমে জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ করা ও গন্ডীবন্ধ দৃষ্টিভঙ্গী অতিক্রম করে দেশ-জাতি-সমাজ সম্পর্কে সঠিক ধারণা সৃষ্টি করা যুবসমাজের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু বিপুল ব্যয়ভার ও থাকার ব্যবস্থার অভাবের জন্য যুবসমাজ সেই সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। যুব সম্প্রদায়ের এই সমস্যার কথা বিবেচনা করে যুবকল্যাণ বিভাগ রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে যুব-আবাস স্থাপন করার উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করেছে। লালবাগ ও দীঘার যুব-আবাস নির্মাণের কাজ সমাপ্তির পথে। বিহারের রাজগীরে যুব-আবাসের জন্য একটি বাড়ি ক্রয় করা হয়েছে; শীঘ্রই যুব-আবাস হিসাবে এটি ব্যবহৃত হবে। কলকাতার মৌলালীতে রাজ্য যুবকেন্দ্রেও যুবক-যুবতীদের জন্য যুব-আবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর কাজও সমাপ্ত প্রায়। এই বিভাগ বীরভূমে, বক্রেশ্বর ও সুন্দরবন অঞ্চলে বকখালিতে দুটি যুব-আবাস স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বোলপুরে যুব-আবাসের সম্প্রসারণের কাজ হাতে নিয়েছে।

১৩। **শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান**—মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য এই বিভাগ আর্থিক সাহায্য অনুমোদন করে। ছাত্র নয় এমন যুবক-যুবতীদেরও ক্লাব ও সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান দেওয়া হয়। বর্তমান বছরে ২৭৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী এই কর্মসূচীর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। পল্লীবাংলার অনগ্রসর এলাকার ছাত্রছাত্রীরা যাতে এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য এই বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

১৪। **রাজ্য যুবকেন্দ্র**—কলকাতার মৌলালীতে রাজ্য যুবকেন্দ্রের নির্মাণের কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে। রাজ্য যুবকেন্দ্রটি সমগ্র যুবসমাজের এক মিলনকেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। এর মধ্যে বিতর্ক, আলোচনাচক্র এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মধারা সংঘটিত করার জন্য একটি অডিটোরিয়াম থাকবে। এ ছাড়াও রাজ্য যুবকেন্দ্রে বিজ্ঞান সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার, ব্যায়ামাগার, বহুমুখী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতি থাকবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মরণীয় ঘটনাবলী ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সামনে উজ্জ্বল করে ধরে রাখার জন্য একটি সংগ্রহশালা এর অন্তর্ভুক্ত আছে। আশা করা যায় রাজ্য যুবকেন্দ্র সামগ্রিকভাবে সর্বস্তরের যুবসমাজের কাছে আকর্ষণীয় সম্পদ বলে বিবেচিত হবে এবং শতসহস্র যুবক-যুবতীর অকুণ্ঠ অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক জগতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করতে সক্ষম হবে।

১৫। **বহুমুখী জেলা যুবকেন্দ্র স্থাপন**—শুধু কলকাতায় নয় জেলায় জেলায়ও বহুমুখী জেলা যুবকেন্দ্র স্থাপন করার কাজ এই বিভাগ হাতে নিয়েছে। বর্তমানে সাতটি জেলায় জেলা যুবকেন্দ্র স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

১৬। **ব্লক তথ্যকেন্দ্র**—গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও যুবজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা রকম তথ্য সরবরাহ করার জন্য ব্লক তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সমস্ত ব্লক যুব-করণেই এই তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

১৭। **পর্বতারোহণ, শিক্ষণ, পর্বতাভিযান, ট্রেকিং ও স্কীয়িং-এ অনুদান**—অজানাকে জানবার, অদেখা বস্তুকে দেখবার এবং দুর্গমকে অতিক্রম করবার প্রবণতা যুবসমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঐ বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করেই যুবকল্যাণ বিভাগ পর্বতাভিযান পরিচালনা, ট্রেকিং, স্কীয়িং ও পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা নিয়েছে। পর্বতাভিযানের ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল সাজসরঞ্জামের দুষ্প্রাপ্যতা পর্বতাভিযাত্রীদের কাছে এক বিরাট প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দেয়। এই সমস্যার কথা বিবেচনা করে এই বিভাগ কলকাতায় একটি সরঞ্জাম ভান্ডার স্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে বেশ কিছু পর্বতারোহী উপকৃত হয়েছেন। এই পর্বতারোহণ সরঞ্জাম ভান্ডার আরও বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চলছে।

১৮। **বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টিতে এই বিভাগের প্রয়াস**—বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি ঘটলেও আমাদের যুবসমাজের, বিশেষতঃ গ্রামীণ যুবসমাজের কাছে আজও সঠিকভাবে তার বার্তা পৌঁছয় নি। এর কারণ মূলতঃ প্রচলিত বিজ্ঞান শিক্ষায় যান্ত্রিকতা, ব্যয়বহুলতা এবং অপ্রতুল ব্যবস্থাপনা। ফলে আজও সমাজের বিভিন্ন স্তরে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও অজ্ঞানতা ভয়াবহরূপে বিরাজমান। এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানের আলো গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যুবকল্যাণ বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বিজ্ঞানচেতনা প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিজ্ঞান ক্লাব স্থাপন এবং ভারত সরকারের সংস্থা বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালা কর্তৃক মূল্যায়নের ভিত্তিতে কিছুসংখ্যক বিজ্ঞান ক্লাবকে তাদের কর্মসূচী প্রসারের জন্য এই বিভাগ থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। কলকাতার বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার সঙ্গে যুক্তভাবে এই বিভাগ গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত)

জন্য প্রতি বছরই ব্লক, জেলা, রাজ্য, আন্তঃরাজ্য পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র এবং জেলা, রাজ্য ও আন্তঃরাজ্য বিজ্ঞান মেলা ও বিজ্ঞান শিবির নিয়মিতভাবে সংগঠিত করে আসছে।

১৯। **জেলা বিজ্ঞানকেন্দ্র, পুরুলিয়া**—বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালা ও যুবকল্যাণ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে পুরুলিয়া জেলায় একটি বিজ্ঞানকেন্দ্র স্থাপনের কাজ সমাপ্তির পথে। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা। যুবকল্যাণ বিভাগ এর জন্য ৫ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে। এই কেন্দ্রে গ্রামীণ এলাকায় বিজ্ঞান গবেষণা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের উন্নতিকরণ, বেকার যুবকদের স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান, বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদান প্রভৃতি ব্যবস্থা থাকবে।

২০। **বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র**—নিরক্ষরতা একটি সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধি দূরীকরণের সামাজিক দায়িত্ব মুখ্যতঃ যুবসমাজের। তাই যুবকল্যাণ বিভাগ তার সীমিত সঙ্গতি নিয়ে এই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়েছে। এই বিভাগ ইতিমধ্যেই হুগলী জেলার শিল্পাঞ্চলে ও দার্জিলিং জেলার চা বাগানের শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় কিছু সংখ্যক বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেছে।

২১। **শ্রীঅরবিন্দ বালকেন্দ্র পরিচালন**—বস্তী এলাকার শিশুদের শিক্ষা, চরিত্রগঠন ও বিনোদনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিভাগ কলকাতায় তিনটি শ্রীঅরবিন্দ বালকেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিতে প্রতি বছর শিশু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার হাজার হাজার শিশু এই উৎসবে অংশ নেয় এবং গঠনমূলক কাজে অনুপ্রাণিত হয়।

২২। **বিদ্যালয় সমবায় গঠন**—বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটে গ্রামবাংলার ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক অসচ্ছলতা বিবেচনা করে এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমবায় আন্দোলনের মূল বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যুবকল্যাণ বিভাগ গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় সমবায় গঠনে ব্রতী হয়েছে। এইসব সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রী ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করা হয়।

২৩। **পাঠ্যপুস্তক পাঠাগার**—এই বিভাগের অধীন ব্লকসমূহে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য পাঠ্যপুস্তক পাঠাগারের ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়াও তফসিলভুক্ত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক পাঠাগারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

২৪। **মাসিক পত্রিকা 'যুব-মানস' প্রকাশন**—যুব সমাজের মননশীলতা ও সাহিত্য চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য এবং যুবকল্যাণ বিভাগের কর্মসূচী যুব সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত করার প্রয়াসে যুবকল্যাণ বিভাগ মাসিক 'যুব-মানস' পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। 'যুব-মানস' সাধারণ যুবক-যুবতীদের প্রগতিশীল জীবনধর্মী সাহিত্য চর্চার অবলম্বন হয়ে উঠেছে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও তথ্যমূলক রচনাবলী যুবমানসে নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন এলাকার যুবক-যুবতীদের দাবীর কথা মনে রেখে এই পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে।

২৫। **খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য সাহায্য প্রকল্প**—যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে খেলাধুলার আকর্ষণ অপারিসীম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে খেলাধুলার চর্চা ও প্রসারের উপযুক্ত পরিবেশের একান্ত অভাব। খেলাধুলার জন্য মাঠের অভাব, সাজসরঞ্জামের অভাব, শরীরচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগের অভাব ইত্যাদি বিবেচনা করে খেলাধুলার এই সংকীর্ণ সুযোগকে একটু প্রসারিত করার জন্য এবং গ্রামীণ প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করার জন্য যুবকল্যাণ বিভাগ কয়েকটি মূল্যবান কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

গ্রামাঞ্চলে খেলার মাঠ তৈরি ও সংস্কারের জন্য বিভিন্ন ক্লাব ও ক্রীড়াসংস্থাকে আর্থিক অনুদান দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এইজন্য ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই বিভাগের অধীন ৩২৭টি ব্লক অফিস থেকে ক্রীড়া সরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য প্রতিটি ব্লককে ৩,০০০ টাকা বর্তমান আর্থিক বছরে বরাদ্দ করা হয়েছে।

শরীরচর্চায় সাহায্য করার জন্য জিমনাসিয়াম হল নির্মাণ ও বিভিন্ন জিমনাসিয়াম সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য এই বিভাগ থেকে ১০ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

গ্রামীণ ক্রীড়ার মান উন্নয়নের জন্য রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ্ (Sports Council) -এর সুপারিশ অনুযায়ী এই বিভাগের অধীন ৩২৭টি ব্লক যুব অফিসের প্রতিটিতে অনাবাসিক প্রশিক্ষণ শিবির (Non-residential Coaching Camp) খোলা হচ্ছে। এই বাবদ ব্লক পিছু বর্তমান বছরে ৩,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২৬। **প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ**—যুবকল্যাণ কর্মসূচীর ব্যাপক প্রচার ও সর্বস্তরের মানুষের সংগে পরিচিতির জন্য এই বিভাগ বিভিন্ন মেলা, উৎসব ইত্যাদিতে প্রদর্শনী মণ্ডপের মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করে।

২৭। **জাতীয় সমরশিক্ষার্থী বাহিনী**—জাতীয় সমরশিক্ষার্থী বাহিনীতে ছাত্র-যুব (Student youths) প্রতিনিধিগণকে মূলতঃ প্রতিরক্ষা প্রশিক্ষণ, নেতৃত্বের বিকাশ, নিয়মানুবর্তিতা এবং দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সংস্থার প্রতিটি ইউনিট ও শাখা কার্যালয়গুলি তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকেন প্রতিরক্ষা বাহিনী ও জাতীয় সমরশিক্ষার্থী বাহিনীর জওয়ান ও অফিসারগণ। প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে এই দুই ধরনের অফিসারবৃন্দ যৌথভাবে সহযোগিতা করেন। জাতীয় সমরশিক্ষার্থী বাহিনীর অফিসারদের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় থেকে বেছে নিয়ে নিয়মিত প্রতিরক্ষা প্রশিক্ষণকেন্দ্রে তালিম দেওয়া হয়। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের পর্বতারোহণ, স্কীয়িং, প্যারাট্রুপিং, গ্লাইডিং ইত্যাদি প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে।

অন্যান্য অনেক রাজ্য থেকে আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও জাতীয় সমরশিক্ষা কার্যক্রমে উৎকর্ষতা, পর্বতাভিযান, গ্লাইডিং এবং সুটিং-এ পারদর্শিতা এবং বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যে আত্মনিবেদনের মাধ্যমে এই রাজ্যের জাতীয় সমরশিক্ষার্থী বাহিনী এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী।

এই সংগঠন পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্য দেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিরক্ষা বাহিনীর অফিসার ও জওয়ানদের বেতনাদি ও শিক্ষার্থীদের পোশাকের খরচ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার নানা ধরনের শিবির ও প্রশিক্ষণ চালানোর ব্যয়ভারের ৫০ শতাংশ বহন করেন। অপরদিকে রাজ্য সরকার শিক্ষার্থীদের জলখাবার ও পরিচ্ছদ ধোয়ার খরচ, অফিস চালানোর খরচ ও আংশিক সময়ের জন্য নিয়োজিত অফিসারদের প্রশিক্ষণ ব্যয় ও মাসিক যাণ্মাসিক অর্থ দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া প্রশিক্ষণ শিবিরের এবং বিভিন্ন শিক্ষাক্রমের ব্যয়ভারের ৫০ শতাংশ বহন করেন রাজ্য সরকার। রাজ্যে এই সংস্থাটির ৪৮টি ইউনিট ও ৬টি শাখা কার্যালয় আছে।

২৮। **সমস্যাজর্জর** যুবসমাজের চাহিদা পূরণে সীমিত শক্তি নিয়েও যুবকল্যাণ বিভাগ নিষ্ঠা, দায়িত্বপরায়ণতা এবং সহমর্মিতার মনোভাব নিয়ে যে বহুমুখী কর্মকাণ্ড সংঘটিত করছে তার একটি

[শেষাংশ ২৪ পৃষ্ঠায়]

বর্তমান বিশ্ব এবং গণতন্ত্র

সুনন্দ দে

আমাদের দেশে একদল লোক আছে, যারা গণতন্ত্র সম্পর্কে একটু অতিমাত্রায় চিন্তিত। তারা যতবেশি নিজেদের দেশের গণতন্ত্র নিয়ে চিন্তিত, তার চেয়ে বেশি চিন্তিত সমাজতান্ত্রিক দেশের গণতন্ত্র নিয়ে। শুধু আমাদের দেশের সেইসব লোক কেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানীসহ যেসব দেশেই পুঁজিপতিরা আছে এবং নিঃস্ব আছে, সেসব দেশমাত্রেই এই ধরনের লোক আছে। এইসব দেশ যারা শাসন করে, তাঁরা হলেন সমাজ-তান্ত্রিক-দেশের-গণতন্ত্র সম্পর্কে চিন্তান্বিত লোকদের নেতা। সোভিয়েত, চীন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে খাওয়া-পরা, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসার সমস্যা একজন লোককেও পোহাতে হয় না—এই বাস্তব ঘটনা আজকের যুগে সমাজতন্ত্রের ঘোর শত্রুদেরও স্বীকার করতে হয়। ধন্যবাদ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অগ্রগতিকে। পৃথিবীজুড়ে এই জনমতকে অগ্রাহ্য করার সাহস ও ক্ষমতা কারু নেই যে, সমাজতান্ত্রিক দেশে জন্মালে লেখাপড়ার জন্য চিন্তা করতে হয় না, ভাত-কাপড়ের জন্য চিন্তা করতে হয় না, চাকরির জন্য চিন্তা করতে হয় না, অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসার জন্য চিন্তা করতে হয় না, বাসস্থানের জন্য চিন্তা করতে হয় না।

এখন আমাদের দেশের কোটি কোটি নিপীড়িত-লাঞ্ছিত-গরিব-বুভুক্ষু মানুষের অজস্র কৌতূহল—তাহলে আমাদের দেশে সেই ধরনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয় না কেন? সমাজতন্ত্রের শত্রুরা এর উত্তরে ঝাঁকে ঝাঁকে উত্তর দিতে থাকে—চীন, সোভিয়েত, কিউবা, ভিয়েতনাম, কোরিয়া প্রভৃতি চোদ্দটি দেশের যে সমাজতন্ত্র, সেটা বিদেশী জিনিস, আমাদের দেশের মাটিতে সেটা খাটে না; দু'নম্বর উত্তর হল, চীন-সোভিয়েতের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশে খাওয়া-পরার কোন সমস্যা নেই বটে, কিন্তু সেইসব দেশে গণতন্ত্র নেই, লোকের স্বাধীনভাবে কথাবার্তা বলার স্বাধীনতা নেই, বিরোধী দল নেই। শুধু আমাদের দেশে কেন, আমেরিকা বা বিলেতে কিংবা যে কোন দেশে যেখানে সমাজতন্ত্র নেই, সেখানেই সমাজতন্ত্রের শত্রুরা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই কথাগুলিই ব্যবহার করে থাকে। পৃথিবীজুড়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ দ্রুত বাড়ছে, কিন্তু গরিব-বুভুক্ষু মানুষের মধ্যে এক বিরাট অংশ সমাজতন্ত্রের শত্রুদের এইসব প্রচারে বিভ্রান্ত। শিল্পী-সাহিত্যিক-শিক্ষক-অধ্যাপক ও বুদ্ধি-জীবী মানুষের এক বিরাট অংশ সমাজতন্ত্রের শত্রুদের এই প্রচারের প্রচারকের ভূমিকা পালন করে। যদিও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এসব শতাব্দী-পূর্বের বস্তাপচা অভিযোগ, কিন্তু পুঁজিপতি ও তাদের প্রচারকরা এখনও এইসব প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

মার্কসবাদ 'বিদেশী', পুঁজিবাদ 'দেশী'?

প্রথমতঃ সমাজতন্ত্র ও তার আদর্শ মার্কসবাদ বিদেশী কিনা। ১৯১৭ সালে যখন রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন চীন, কিউবা, কোরিয়া, ভিয়েতনামে অন্যান্য সমস্ত দেশে এসব 'বিদেশী জিনিস', পাশ্চাত্যের জিনিস বলে সমাজতন্ত্রের শত্রুরা প্রচার করতো। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশি দেশ চীনে ১৯৪৯ সালের বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল, তারপর এক এক করে আরো বারোটি দেশে। তাতে সেসব দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচে গেল। মার্কসসাহেব জার্মানির লোক, তাঁর আদর্শ প্রথম সার্থক হল রাশিয়ায়, অর্থাৎ বিদেশেই। তখন বলা হল, ওসব পাশ্চাত্যের দেশ। এরপর অন্যান্য সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছে 'বিদেশ' বলে খ্যাত, অথচ প্রাচ্যের দেশ, এই এশিয়া মহাদেশের দেশ চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল। বিদেশে সৃষ্ট মতবাদ দিয়ে চোদ্দটি দেশের অর্থাৎ পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচে গেল। কারণ মতবাদটা আন্তর্জাতিক, সবদেশেই প্রযোজ্য। আমাদের দেশের লোকেরা কলেরা বসন্তের টীকা নেয়। পানীয় জলের সুব্যবস্থা না থাকায় কলেরা এখনও নির্মূল হয় নি, কিন্তু বসন্ত রোগ প্রায় নির্মূল হয়েছে বললেই চলে। কিন্তু কলেরা ও বসন্তের টীকার জন্য যে ওষুধ দেওয়া, সেই ওষুধের মতবাদ বা ফর্মুলা বিদেশেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের শত্রুরা তো কখনই বলে না যে, ভারতের মানুষকে কলেরা বসন্তের টীকা দেওয়া চলবে না, কারণ সেই টীকা 'বিদেশী'। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে টাটা, বিড়লা ও এই ধরনের পুঁজিপতি বা বড়লোক বলে কেউ আর থাকবে না, সেইজন্য পুঁজিপতিদের কাছে সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ এসব ঘৃণ্য। অন্যদিকে সমাজতন্ত্র গরিব নিঃস্ব মানুষের দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশা ঘুচিয়ে দিতে পারে, সেইজন্য মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি গরিবদেরই মতবাদ। যারা মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র এসবের বিরুদ্ধে কথা বলে, তারা আসলে টাটা-বিড়লা-পুঁজিপতি-বড়লোকদেরই ওকালতি করে, গরিবদের তারা শত্রু।

আমাদের দেশে এখন যে ব্যবস্থা আছে, তাকে বলা হয় পুঁজি-বাদী ব্যবস্থা, অর্থাৎ পুঁজিপতিদের জন্য ব্যবস্থা। এই ধরনের ব্যবস্থা সর্বপ্রথম ওই পাশ্চাত্যেই তৈরি হয়েছিল, অর্থাৎ বিলেতে, জার্মানিতে, ফ্রান্সে। সেই ব্যবস্থা বিলেতের সাহেবরা আমাদের দেশে নিয়ে এসেছিল এবং সাহেবরা দেশ ছেড়ে যাবার পরও সেই ব্যবস্থাতেই দেশ চলেছে। টাটা ও বিড়লার সম্পত্তি এক হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। তাহলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও 'বিদেশী'। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী যখন বলেন মার্কসবাদ বিদেশী, তখন তিনি যে ব্যবস্থা লালন-পালন করছেন, সেই ব্যবস্থাও 'বিদেশী'। বিলেতী সাহেবরা দেশ ছেড়ে চলে গেলেও বিদেশী পুঁজিপতিরা আমাদের দেশে এখনও ব্যবসা চালিয়ে দেশের সম্পত্তি লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস এবং ইন্দিরা গান্ধীরাই সেই ব্যবস্থা করেছেন। বিদেশী কোম্পানিগুলিকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দিলে ভারতের প্রত্যেক মানুষই তো খুশি হবেন, ইন্দিরা গান্ধী সেটা করছেন না কেন? আসল কথা হল, মার্কসবাদ এবং সমাজতন্ত্রও আন্ত-র্জাতিক, পুঁজিবাদও আন্তর্জাতিক। পুঁজির যেমন কোন দেশ নেই, সমাজতন্ত্রেরও কোন দেশ নেই। মার্কসবাদের দেশ নেই। যেখানেই পুঁজি, সেখানেই মার্কসবাদ। পুঁজিবাদের সৃষ্টি মার্কস-বাদের অনেক আগে। পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে সমাজতন্ত্র সৃষ্টি করার জন্যই মার্কসবাদ। সেইজন্য পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় শত্রু মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদীদের সবচেয়ে বড় শত্রু মার্কস-বাদীরা এবং মার্কসবাদ প্রয়োগ করে যাঁরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেন, সেই কমিউনিস্টরা। অর্থাৎ যারা মার্কসবাদ,

সমাজতন্ত্র কমিউনিস্টদের বিরোধিতা করে, তারা পুঁজিবাদেরই ভৃত্য, গরিবদের শত্রু। পুঁজিপতিদের কোন দেশ নেই, তারা নিজের দেশের মানুষকেও শোষণ করে, বিদেশের মানুষকেও শোষণ করে। ঠিক তেমনই শ্রমিকশ্রেণীরও দেশ নেই। তারা নিজেদের দেশের পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রাম করে, তেমনি অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের জন্যও লড়াই করে। কমিউনিস্টদের চূড়ান্ত লক্ষ্য, বুর্জোয়া সামাজিক ব্যবস্থার সবকিছু জোর করে উৎখাত করে নতুন ব্যবস্থা অর্থাৎ সমাজতন্ত্র কায়েম করা। কোটি কোটি নিপীড়িত শোষিত মানুষকে এ পথে কমিউনিস্টরা পরিচালিত করবে। এতে গোপনীয়তা কিছু নেই। কমিউনিস্টদের এই বিপ্লবের আতংকে শাসকশ্রেণীগুলি কাঁপতে থাকে, বাকি মানুষ, সর্বহারা সবাই তাতে উল্লসিত হয়। এগুলি শতাধিক বছর আগে মার্কস-এংগেলসের মুখে উচ্চারিত হয়েছে, কমিউনিস্ট ইস্তাহারে। চোদ্দটি দেশে তারপরে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে, পৃথিবীর বাকি অংশে সমাজতন্ত্রের শক্তি দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। কাজেই শতাধিক বছরের আগের তুলনায় পুঁজিপতিদের কাঁপুনি কতগুণ বেড়েছে, সহজেই তা লক্ষ্যণীয়। ক্ষমতাসীন বা শাসনক্ষমতাহীন শাসকশ্রেণীগুলির মুখপত্র ও মুখপাত্ররা যা বলছে, সেটা সমাজতন্ত্রের শক্তি সম্পর্কে, কমিউনিস্টদের সম্পর্কে ভয়ংকর আতংকেরই প্রতিধ্বনি।

গণতন্ত্র আছে সমাজতান্ত্রিক দেশেই, পুঁজিবাদী দেশে আছে গণতন্ত্রের নামে ধাপ্পা

সমাজতান্ত্রিক দেশে ও পুঁজিবাদী দেশে পরস্পরবিরোধী সমাজব্যবস্থা। এই দু'রকমের দেশে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের গণতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করা সমাজতন্ত্রেরই সূত্র এবং গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করেই সমাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। সামন্ততান্ত্রিক-জমিদারী-রাজা-মহারাজার যুগে যখন শিল্পের অগ্রগতির ফলে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়, তখন পুঁজিপতিরা যে গণতন্ত্র চালু করে, সেই প্রথাগত গণতন্ত্র পুঁজিবাদের বিকাশ ও সাম্রাজ্যবাদের যুগে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে, পুঁজিবাদে গণতন্ত্র ধ্বংসের পথে যায়। পুঁজিপতিরা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের এই কুৎসিত চেহারা ঢাকতে নানারকমের দোহাই পাড়ে, তাদের প্রিয় উত্তর হল 'সমাজতান্ত্রিক দেশেও গণতন্ত্র নেই' নামক অপবাদটি।

তেত্রিশ বছর হ'ল দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু নামমাত্র কয়েকটি পুঁজিপতি পরিবারের সম্পত্তি দ্রুত বেড়ে চলেছে, নিঃস্ব নিঃস্বতর হয়েছে। অথচ দেশে আইন আছে, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে যেমন ভেজাল মেশানো চলবে না, আয়কর দিতে হবে, বৃহৎ পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ করা হবে, দাম বাড়ানো চলবে না, চোরাকারবার, ফাটকাবাজি, মজুতদারি করা চলবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সমস্ত আইনকে অকেজো করে রাখা হয়, চলতে থাকে ওদের লুটতরাজের নৈরাজ্য। সাধারণ লোককে বোঝানো হয়, দেখ শুধু তোমাদের বিরুদ্ধে নয়, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধেও আইন আছে, আইনের চোখে সব সমান—এই ধাপ্পার নাম 'গণতন্ত্র'। অথচ জিনিসপত্রের দামের চাপে, খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে, বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম একটা জীবিকার অভাবে কোটি কোটি মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মরছে। মজুতদারের আড়ত থেকে মানুষ যদি খাবার কেড়ে আনতে যায়, কিংবা কৃষকরা যখন এক চিলতে জমি, কয়েকটা পয়সা বেশি মজুরি চায়, ভাগচাষীরা যদি চায় আমাকে উচ্ছেদ কোর না, কিংবা শ্রমিকরা যদি একটু বেশি মজুরি বা বোনাস চায়, তখন দেশজুড়ে হৈ হৈ রৈ রৈ রব উঠে যায়—আইন-শৃংখলা নেই, হিংসাত্মক কাজ চলছে, দেশের অর্থনীতির ক্ষতি হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সাথে সাথে গ্রেপ্তার, জেল, কোর্টে শাস্তি। এতেও নিশ্চিন্ত না হয়ে আমাদের দেশের শাসকরা বিনা বিচারে আটক আইনের ব্যবস্থা রেখে দেয়। জনতা সরকারের তিরিশ মাস ছাড়া গত তেত্রিশ বছর ধরে বিনা বিচারে আটক আইন কংগ্রেস শাসকরা জারি করে রেখেছে। এটা কি গণতন্ত্র? এ তো গণতন্ত্রের নামে ধাপ্পা। দাম বাড়ানোর জন্য, আয়কর ফাঁকি দেবার জন্য, কালোবাজারী করার জন্য, ভেজাল দেবার জন্য, দেশের সংবিধান, আইন-কানুন লঙ্ঘনের জন্য টাটা-বিড়লা-বাজোরিয়া-কানোরিয়া-গোয়েঙ্কা ও অন্যান্য পুঁজিপতিদের গায়ে আঁচরটি কোনদিন লাগে নি। সরকারের সহায়তায় পুঁজিপতিরা যথেচ্ছ লুটতরাজ চালিয়ে যেতে পারবে, তার বিরুদ্ধে দু'একটা মিছিল মিটিং প্রতিবাদ সভা করার অধিকারের নাম দেওয়া হয়েছে গণতন্ত্র। একে কি গণতন্ত্র বলা যায়, না গণতন্ত্রের নামে ধাপ্পা। কেন্দ্রীয় বাজেটের সময় বলা হল, জিনিসের দাম কমানো হবে, কিন্তু সব জিনিসের দাম বেড়ে আগুন হয়ে গেল। বলা হল, সাবানের দাম আড়াই টাকার জায়গায় দু' টাকা প'য়তাল্লিশ পয়সা হবে; অন্যদিকে চিনির দাম ছিল ২·৭০ টাকা, বেড়ে বার টাকা, এখন দাঁড়িয়েছে ছয় টাকা। এটা কার দোষে হল? দেশে তো চিনির ঘাটতি নেই। জিনিসের দাম বাড়ে তো দশ গুণ, শ্রমিকদের কি দেওয়া হয়? দেশে ষাট কোটি মানুষের মধ্যে শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা দু' কোটি। শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি কমে যায় বাড়ে না। জিনিসপত্রের দামের হাত পা শরীর কিছুই নেই যে বাড়বে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো হয়। এরই নাম গণতন্ত্র? সেজন্য লেনিন বলেছেন, বুর্জোয়ারা এক হাতে যা দেয়, অন্য হাতে সেটা কেড়ে নেয়; সব দেশেরই অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যে সমস্ত শ্রমিক বুর্জোয়াদের ওপর আস্থা রাখে, সেই সমস্ত শ্রমিকরা সবসময় বোকা বনে যায়। সত্তর বছর পরও লেনিনের কথাগুলি কত জাজ্বল্যমান, যে কেউ এখন দেশের পরিস্থিতি থেকে মিলিয়ে নিতে পারেন। সব মানুষের সমান সুযোগ, আইনের চোখে সবাই সমান—এগুলি কত মিথ্যে ও ফাঁকি, বোঝা দুষ্কর নয়। যে কোন পুঁজিবাদী দেশেই এই অবস্থা। যে দেশে অঢেল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সেই সম্পদ করায়ত্ব থাকার জন্য কোটি কোটি মানুষ খাওয়া, পরা, জীবিকা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের অভাবে নির্মম যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে, সেই দেশে গণতন্ত্র কোথায়? ওদেরই তৈরি আইন-কানুন-সংবিধান-গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-রীতিনীতি সব লঙ্ঘন করে গরিব মানুষের ওপর শোষণ-অত্যাচারের স্টীম রোলার চালায় শাসকগোষ্ঠী; এটাকে আড়াল করে বলা হয় প্রতিবাদ জানানোর অধিকারটাই গণতন্ত্র। প্রতিবাদ জানাতে গেলে লাঠি, গুলি, জেল—এগুলি আবার আড়াল করে রাখা হয়। লেনিন লিখেছেন, "জনগণকে পদানত রাখতে বিশ্বজুড়ে বুর্জোয়া-জমিদারদের সরকারগুলির অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, তারা দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করে। প্রথমতঃ সন্ত্রাস।...দ্বিতীয়তঃ প্রতারণা, তোষামোদ, মধুর বাক্য, শত সহস্র প্রতিশ্রুতি, এক টুকরো সুরাসিক্ত রুটি এবং অত্যাবশ্যকীয় জিনিস আগলে রেখে অপ্রয়োজনীয়গুলি দান করা।" তেষট্টি বছর আগে লেনিন তখনকার দুনিয়ার অভিজ্ঞতায় একথা লিখেছিলেন। স্বাধীনতার পর তেত্রিশ বছর কংগ্রেসী শাসন ও তিরিশ মাসের জনতা সরকারের শাসন অর্থাৎ বুর্জোয়া-জমিদারের শাসনে দেখা যাচ্ছে, লেনিন-উক্তি আজও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। লেনিন এই অভিজ্ঞতার কথা লিখে বলেছেন, পাণ্ডি বুর্জোয়া নেতারা 'নিশ্চয়ই' জনগণকে শেখাবে, বুর্জোয়াদের

ওপর আস্থা রাখ। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী জনগণকে অবশ্যই শেখাবে, কোন সময়েই বুর্জোয়াদের বিশ্বাস কোর না।

একদলীয় না বহুদলীয় ব্যবস্থা?

পুঁজিবাদী সমাজে কার্যতঃ দুটি দল হলেই চলে। একটা শাসক-গোষ্ঠীর শাসক দল, অন্যটি শ্রমিকশ্রেণীর দল বা কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ভাল করেই বোঝেন, অনেকগুলি দল থাকলে তাদের অনেক সুবিধা। তাহলে বিভক্ত হয়ে যাবে জনমত। শুধু শাসকদল থাকলেই তাদের চলে না, অনেকগুলি বিরোধী দল দরকার যারা শাসকদলের বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহ করে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কাছ থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে। এইসব দলগুলি শাসনক্ষমতায় শুধু লোক বদল চায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বদল কখনই চায় না। বিরোধী পক্ষে থেকেও কমিউনিস্টদের এরা ঘোরতর শত্রুতা এ কারণেই করে। এইজন্য ইন্দিরা গান্ধীর জায়গায় মোরারজী দেশাই বা চরণ সিং এলে জনগণের দৈনন্দিন অবস্থার বা জীবনের মৌলিক সমস্যাবলীর কোন হেরফের হয় না। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টিকে ভেতর থেকে ও বাইরে থেকে আক্রমণ করার জন্য শক্তি যা বামপন্থী পার্টিগুলির অস্তিত্বও বুর্জোয়ারা অপছন্দ করে না। একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত এই বামপন্থী দলগুলির একটা ইতিবাচক ভূমিকা থাকে; কিন্তু যখন বিপ্লবের দামামা বাজে, তখন তাদের দোদুল্যমানতা বিপ্লব বিরোধিতার পর্যায়ে পর্যবসিত হতে থাকে।

একদলীয় সরকার সম্পর্কে সোভিয়েত অভিজ্ঞতা

নভেম্বর বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় অনেকগুলি রাজনৈতিক দল ছিলঃ যেমন, বলশেভিক (কমিউনিস্টরা), ক্যাডেট, অক্টোব্রিস্ট, মেনশেভিক, সোশ্যাল রেভ্যুলিউশনারী, এনার্কিস্ট ও অন্যান্য অনেক দল। কিন্তু কেন এমন হল যে সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন দলের অস্তিত্ব নেই! কমিউনিস্ট মতবাদে মার্কস-এঙ্গেলস কী বলে দিয়েছেন যে সমাজতন্ত্রে কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন দল থাকবে না, না কি লেনিন-স্তালিন এটা ঠিক করেছিলেন, অথবা কি এর পেছনে অন্য কোন পরিস্থিতি বা ঘটনা কী কাজ করেছে? সোভিয়েত ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই এসব উত্তর পাওয়া যাবে।

১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আরও একটা বিপ্লব হয়, যার নাম বুর্জোয়া বিপ্লব। শ্রমিক, কৃষক, সৈন্যরা জারের রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে। এতে জন-গণের আশা-আকাঙ্ক্ষা কার্যতঃ কে রূপ দিতে পারে, সে সম্পর্কে কর্মসূচী হাজির করার ও তা প্রমাণ করার সুযোগ আসে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাছে। দীর্ঘ আড়াই বছর যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেশের মানুষ চেয়েছিল শান্তি, রুটি ও স্বাধীনতা। কিন্তু জার-তন্ত্রের উৎখাতের সাথে সাথেই ক্ষমতা দখল করল কয়েকটি বুর্জোয়া পার্টি। যেমন, অক্টোবর সেভেনটিস্থ (অক্টোব্রিস্ট বলে পরিচিত) এবং কনস্টিটিউশন্যাল ডেমোক্র্যাট্স্ (ক্যাডেট বলে খ্যাত)। কিন্তু জারের আমলে যে বুর্জোয়া-জমিদার শাসন ছিল, এই দলগুলি সেই শাসন-ব্যবস্থাই চালু রাখে। তারা যুদ্ধ বন্ধ করার কথা বললো না, স্লোগান তুললো—'বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালাবোই।' তারা মনে করেছিল, দেশের জনমতের মধ্যে এভাবে তারা দেশপ্রেমের ধোয়া তুলে বুর্জোয়া-জমিদার শাসন-ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে পারবে। জমিদারদের হাত থেকে জমি নিয়ে কৃষকদের বিলি করার আশু ও জরুরী দাবির দিকে তারা ফিরেই তাকাল না। সেইসময় সমাজতন্ত্রী বলে পরিচিত দলগুলিরও যথেষ্ট প্রভাব রাশিয়ায় ছিল। যেমন মেনশেভিক পার্টি ও সোশ্যাল রেভ্যুলিউশনারী পার্টি। মেনশেভিক পার্টি সরাসরি যুদ্ধ চালাবার স্লোগান না দিলেও অনুরূপ স্লোগান দেয়, 'মাতৃভূমি রক্ষা কর।' সোশ্যাল রেভ্যুলিউশনারী পার্টি কৃষকদের হাতে জমিদানের স্লোগান দিয়ে বিরাট আশা কৃষকদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল। অস্থায়ী সরকারে এই পার্টির নেতা কেরেনস্কিও স্থান করে নেয়, এতে সরকারের ওপর বিপ্লবী রঙের আস্তরণও পড়ে। বিপ্লবের সময় শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের যে সমস্ত সোভিয়েত গড়ে ওঠে, সে-সবের নেতৃত্ব নিতে তারা সমর্থ হয়। সোভিয়েতের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ব্যবহার করে এই দুটি বামপন্থী পার্টি অস্থায়ী সরকারের বুর্জোয়া পার্টিগুলিকে জনগণের আশু দাবিদাওয়া পূরণে বাধ্য করতে পারতো। কিন্তু তারা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি না বসা পর্যন্ত জনগণকে অপেক্ষা করতে বললো। অন্যদিকে সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে এনে তাদের ব্যবহার করা হল বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য। একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি ডাক দিলেন, সোভিয়েত-গুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিতে হবে, কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করতে হবে এবং যুদ্ধ এক্ষুনি বন্ধ করতে হবে। গোটা দেশের মানুষ এই স্লোগানের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হলেন। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লব হল, অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারও উৎখাত হল। মেনশেভিক পার্টিও নিজেদের মার্কসবাদের প্রতি ও সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে এসেছে। কার্যতঃ তারা বুর্জোয়া উদারনৈতিকতার প্রভাবে চালিত হয়ে আপোষের পথ নেয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরও এই দুটি দলের প্রতি জনসমর্থন ছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে সাথেই বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদতে গৃহযুদ্ধ শুরু করে দেয়। লেনিন দুটি দলকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার হতে আহ্বান জানালেন। কিন্তু তাতে এ দুটি দল সাড়া না দিয়ে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করার নীতি গ্রহণ করে। জনগণের মেজাজ ও মানসিকতা লক্ষ্য করে সোশ্যাল রেভ্যুলিউশনারী পার্টি সরকারে অবশেষে যোগ দেয় এবং মোট আঠার জন মন্ত্রীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদে সাতটি মন্ত্রীপদ পায়। এর আগেই এই পার্টি বাম ও ডানে দু'ভাগ হয়ে যায়। এই পার্টির জমি সংক্রান্ত নীতিও সরকারের নীতি বলে ঘোষিত হয় যদিও তাতে কমিউনিস্ট পার্টিরও অনেকের আপত্তি ছিল। কিন্তু বরাবরই অতিবিপ্লবী সাজার একটা বাসনা তাদের ছিল এবং সরকার থেকে বেরিয়ে আসার অজুহাতের অপেক্ষা করতে থাকে। জার্মানির সাথে ব্রেস্ট-লিটভস্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে, তার বিরোধিতা করে এবং তাকে অজুহাত করে তারা ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে সরকার ত্যাগ করে। দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল রেভ্যুলিউশনারী ও মেনশেভিকরা ইতি-মধ্যেই সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে। অনেক প্রদেশে সোভিয়েত ভেঙে তারা শ্বেতফৌজ, বিদেশী হস্তক্ষেপকারী ও বুর্জোয়া পার্টিগুলির সশস্ত্র উপায়ে সরকার গঠন করে। বাম-পন্থী সোশ্যাল রেভ্যুলিউশনারীরাও সোভিয়েত সরকার ত্যাগ করে এই সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবী অভিযানে যোগ দেয়। এই গৃহযুদ্ধে দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল রেভ্যুলিউশনারীরা কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতাকে হত্যা করে। গৃহযুদ্ধে সোভিয়েত সরকারের শত্রুদের চরম পরাজয় ঘটে এবং সমাজতন্ত্রের পথে ধাপে ধাপে সোভিয়েত ইউনিয়ন এগিয়ে যায়। বামপন্থী সোশ্যাল রেভ্যুলিউশনারীর একটি অংশ দল ছেড়ে গঠন করে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি, অপর একটি অংশ গঠন করে পপুলিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি। পরে এই ভগ্নাংশ দুটি দলও বলশেভিক পার্টিতে যোগ দেয়। কাজেই দ্বিদলীয় ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন অবস্থাতেই লেনিন-স্তালিনের কমিউনিস্ট পার্টিকে দায়ী করা যায় না। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতেই

অন্যান্য দলগুলি বিলীন হয়ে গেছে, বিপ্লবের পরে কোন পার্টিকে ধ্বংস করতে হয় নি।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অবস্থা

প্রথম মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম হয়, তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলি দেশ যেমন সাম্রাজ্যবাদী কবল থেকে স্বাধীন হয়, আবার অনেকগুলি দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলির সাথে মোর্চা গঠন করে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল বুর্জোয়া নেতৃত্ব; সেইজন্য আমাদের দেশে বুর্জোয়া-জমিদার শাসন কায়েম যা আজও বুর্জোয়া-জমিদারের দল কংগ্রেস দ্বারা শাসিত হচ্ছে। কিন্তু যেদেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব কমিউনিস্ট পার্টির হাতে ছিল এবং অন্যান্য বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দল তার সহযোগী ছিল, সেখানে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে। যেমন বুলগেরিয়া, পোলান্ড, পূর্ব জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া, চীন ও ভিয়েতনামে। এ-সব দেশে কোথাও দ্বি-দলীয় ও কোথাও বহু-দলীয় সরকার হয়েছে। কোথাও এখনও তার অস্তিত্ব আছে, কোথাও তার অস্তিত্ব আপনা থেকে বিলীন হয়ে গেছে বা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে মিশে গেছে। আবার একই ঐতিহাসিক কারণে রোমানিয়া ও হাঙ্গেরীতে একদলীয় সরকার রয়েছে। হাঙ্গেরীতে বিপ্লবের পর তথাকথিত ফ্রীডম পার্টি প্রতিবিপ্লব শুরু করে ও ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। রোমানিয়ায় ন্যাশনাল পেজেন্ট পার্টি ও ন্যাশনাল লিবারেল পার্টি সরকারের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত-মূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। সেজন্য পেজেন্ট পার্টিকে সংসদ করে বেআইনী করা হয়, লিবারেল পার্টি আপনা থেকে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নতুন সমাজব্যবস্থা গঠিত হবার সাথে সাথে অনেকগুলি পার্টি তাদের লক্ষ্য পূর্ণ হবার কথা বিবেচনা করে স্বেচ্ছায় বিলুপ্তি ঘোষণা করে। যেমন, বুলগেরিয়ার র‍্যাডিক্যাল পার্টি, হাঙ্গেরীর ডেমোক্র্যাটিক পেজেন্ট পার্টি, রোমানিয়ায় ন্যাশনাল পপুলার পার্টি, প্লাউসেন ফ্রন্ট ইত্যাদি। যেসব সমাজতান্ত্রিক দেশে এখনও বহুদলীয় ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি গোটা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যান্য পার্টিগুলি কিছু বুদ্ধিজীবী, কিছু গ্রাম বা শহরে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রভাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ। হাঙ্গেরী ও রোমানিয়ায় ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে নিজেদের মিশিয়ে দেয়। চীন, মঙ্গোলীয়া, কিউবা ও যুগোস্লোভিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টিই একমাত্র রাজনৈতিক দল। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সবাই এখনই কমিউনিস্ট হয়ে গেছে, তা-ও নয়। আশি কোটি লোকের দেশ চীনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা চার কোটির কম, অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগেরও কম।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এক-দলীয়, দ্বিদলীয়, ত্রিদলীয় বা বহুদলীয় যে সরকারই থাকুক না কেন, সরকারের লক্ষ্য একটাই। সেটা হলঃ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সমাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করা। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ ছাড়া বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েম হতে পারে না, তা করতে গেলে মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টিরও প্রয়োজন তাকে রূপায়িত করতে' এজন্য কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ছাড়া বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অসম্ভব। কিন্তু গণতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যে যেগুলি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে, তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী বুর্জোয়া সমাজের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। তাদের নীতি ও কাজকর্ম সমাজতান্ত্রিক সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নতুন ছাঁচে ঢালা হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ যতই শক্তিশালী হয়, এইসব দলগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখার প্রয়োজনীয়তাও হ্রাস পায়। কারণ সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির মূল স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে সাধারণ মানুষ তাকে বরদাস্ত করবে না। দলের মধ্যে সংকট দেখা দেয়। যেমন চেকোস্লোভাকিয়ার সোস্যালিস্ট পার্টি ও পিপলস পার্টি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অংশই একমাত্র টি'কে থাকতে সক্ষম হয়। যেসব গণতান্ত্রিক দলে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিরোধী শক্তির কবলিত, তাদের রাজনৈতিক জীবনের বিলুপ্তি ঘটে। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলে শুধু দলের সাইনবোর্ড রাখার জন্য দল রাখার ব্যাপারটা আর থাকে না।

এ-সবের মানে এই নয় যে, সমাজতান্ত্রিক দেশে একদলীয় সরকারের চেয়ে বহুদলীয় সরকার ভাল। শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি একটি সমাজতান্ত্রিক দেশকে কত দ্রুত উন্নতির সোপানকে বেয়ে তুলতে পারে চীন ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে তা লক্ষণীয়।

মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের ফারাক, শহর ও গ্রামের মধ্যেকার ফারাক সমাজতান্ত্রিক দেশে যতই ঘুচে যেতে থাকবে, ততই এক-দলীয় সরকারের দিকে অগ্রগমন ঘটে। সেজন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজে একদলীয় সরকার স্বাভাবিকই, দু' দিন আগে বা পরে, কিন্তু সেটা ঘটে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই তা হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে সেজন্য একদলীয় সরকার হবে, না বহুদলীয় সরকার হবে, তা-ও কারও ইচ্ছেমতো হয় না। ইতিহাসের ঘটনাবলী ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকার ওপর তা নির্ভর করে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সে-ই প্রশ্ন মুখ্যই যে, পুঁজিবাদী সমাজে অনেক দল বিশেষ বিরোধী দল আছে কেন, এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে নেই কেন?

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণের জন্য পুঁজিবাদী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী রাজনৈতিক দল গঠন করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে মুখ্যতঃ শ্রেণী থাকে একটাই, শ্রমিকশ্রেণী অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণী। সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সবচাইতে উন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশেও সাধারণ মানুষের মধ্যে বাইরের জগতের পুঁজিবাদী সমাজের প্রভাব কাজ করার বিপদ থেকে যায়, অবশিষ্টাংশও থেকে যেতে পারে। এই কারণেই বলা হয়, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি বা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব তুলে দেওয়া হলে সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিচ্যুতি বারবার ধরা দেয়। পোলান্ড ও পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে এই বিচ্যুতি লক্ষণীয়।

পুঁজিবাদী সমাজে সম্পূর্ণ অন্য রকম ব্যাপার। এখানে পরস্পরবিরোধী দুটি শ্রেণী—শ্রমিকশ্রেণী বা সমাজতন্ত্রের শক্তি যারা কখনই পুঁজিবাদকে বরদাস্ত করে না, অন্যদিকে পুঁজিপতি-জমিদার শ্রেণী যারা সমাজতন্ত্রের শক্তি বা শ্রমিকশ্রেণীকে বরদাস্ত করতে পারে না। কাজেই পুঁজিপতি-জমিদারদের দল যেখানে ক্ষমতায় আছে, সেখানে বিরোধী দল অবশ্যই থাকে। থাকতে বাধ্য। পুঁজিপতি-জমিদারদের শাসকদল বিরোধীদল চায়, চায় বিরোধী পুঁজিপতি-জমিদারদেরই কোন অংশের দল, যাতে 'গণতন্ত্র' নামক সাইনবোর্ডটা দেখানো যায়। শ্রমিকশ্রেণীর কোন দল তারা চায় না। সেজন্য যেসব পুঁজিবাদী দেশে একনায়কতন্ত্র, সেসব দেশে সব-চাইতে বেশি আঘাত আসে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর। শ্রমিক-শ্রেণী পার্টি বা কমিউনিস্ট পার্টি ততক্ষণই তারা চলতে দিতে পারে, যতক্ষণ তাতে পুঁজিবাদী-জমিদার শাসনকাঠামো পরিবর্তনের

পক্ষে বিপজ্জনক না হয়ে ওঠে। বিপদের আঁচ পাবার আগেই নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু কোথাও গোড়াতেই নিষিদ্ধ হয়। স্পেনে কমিউনিস্ট পার্টি ফ্রাঙ্কোর চল্লিশ বছরের রাজত্বে নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু তাতে কমিউনিস্ট পার্টি মরে যায় নি, বেঁচে আছে ছিল, এবং তার শক্তিবৃদ্ধিও ঘটেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায়, চিলি বা ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ। কিন্তু সেখানকার কমিউনিস্টদের ভয়ে শাসকদের ঘুম হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যে দলই জিতুক, তাতে জনগণের সমস্যার কোন পরিবর্তন হয় না।

চীনে এখনও আটটি গণতান্ত্রিক দল রয়েছে। সভা, সমিতি, সম্মেলন সবই তারা করে। গত বছর অক্টোবর পিকিঙে আটটি গণতান্ত্রিক দল জাতীয় কনভেনশন করেছে। তাতে দু'হাজার পাঁচ শত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। জাতীয় বুর্জোয়া, শহুরে মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, এই সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবী, সমবায় চাষী ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক লোক এসব দলের সদস্য ছিল। জাপানী আগ্রাসনের প্রতিরোধের সময় মূলতঃ এসব দলগুলির জন্ম (১৯৩৭-৪৫) ১৯৪৯ সালে বিপ্লবের মধ্যে তারা চীনে সমাজতন্ত্র গঠনের শপথ নেয়। ১৯৪৯ সালে 'চীন জনগণের রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলনেও তারা অংশ নেয় এবং সম্মেলনের সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই কর্মসূচীই ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত চীনের সংবিধান হিসাবে কাজ করে।' সমস্ত স্তরে রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলনের সংগঠন রয়েছে। তাতে কমিউনিস্ট পার্টি ও আটটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা রয়েছে। চীন বিপ্লবের বত্রিশ বছরে শ্রেণী হিসেবে পুঁজিপতিরা লুপ্ত হয়েছে, শোষণ লুপ্ত হয়েছে। ফলে এইসব গণতান্ত্রিক দলগুলির সামাজিক ভিত্তিরও আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি ঘটানোই পার্টিগুলির বর্তমান লক্ষ্য। এই সম্মেলনে চীনের নেতা তেং সিয়াও পিং বলেন, রাষ্ট্রনীতি নিয়ে প্রস্তাব সমালোচনা ইত্যাদি দায়িত্ব নিয়ে দলগুলি দিলে তা দেশের স্বার্থের সহায়ক। এদের সম্পর্কে ১৯৫০-এর দশকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি 'দীর্ঘমেয়াদী সহাবস্থান ও পারস্পরিক তদারকির' নীতি অনুসরণ। এই নীতি মাঝখানে বিপর্যস্ত হলেও এখন তা আবার পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে।

ধর্মের ক্ষেত্রেও তা-ই। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হয়, সেখানে ধার্মিকদের নিধন করা হয়, ধর্ম বে-আইনী করা হয় ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তার উল্টো। সমাজতন্ত্রের ৬৪ বছর পরও সোভিয়েত ইউনিয়নে গির্জা মন্দির সব রয়েছে। লোকও সেখানে যাতায়াত করে। তবে বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা বিস্তৃতি লাভ করায় ধর্মীয় উন্মাদনা ও বিশ্বাস দুই-ই কমে গেছে। চীনের সংবিধানে বলা হয়েছেঃ ধর্মে বিশ্বাস করার এবং বিশ্বাস না করার উভয় স্বাধীনতাই জনগণের রয়েছে। ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা এখনও চীনে অবাধ। পিপলস কংগ্রেসে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের অনুগামীদের জাতীয় সংগঠনও রয়েছে। চীনে এক সময় সবচাইতে প্রভাবশালী ছিল বৌদ্ধধর্ম। হান জাতির মধ্যে তাও-ধর্ম খুবই প্রভাবশালী। অন্যান্য জাতির সামান্য কিছু লোক তার ভক্ত। আরব ও পারস্য থেকে সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মের প্রচার করে ব্যবসায়ীরা। বিভিন্ন জাতি এক কোটি লোক এই ধর্ম গ্রহণ করে।

খ্রীষ্টধর্ম প্রথম চীনে আসে অষ্টম শতাব্দীতে, তারপর ১২৯৪ সালে। ক্যাথলিক ধর্ম প্রচার হয় ষষ্টদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে। মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী কাজ হাসিল করতো। চীন বিপ্লবের বত্রিশ বছরে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগীর প্রসার ঘটায় ধার্মিক লোকের সংখ্যা কমে যায়। জোর করে কিছু করতে হয় নি, মন্দির গির্জা মসজিদ রয়েছে। সাংবিধানিক গ্যারান্টি ছাড়া সম্প্রতি এক আইনে বলা হয়েছে—কোন নাগরিকের ধর্মবিশ্বাসের ওপর আঘাত করা হলে এবং কোন সংখ্যালঘু জাতির আচার-অনুষ্ঠানের ওপর আঘাত করা হলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। প্রাচীন চীনের সংস্কৃতি, জনপ্রিয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন ধারণার বিকাশে বৌদ্ধধর্ম ও তাও ধর্মের অবদান আছে। চীনের শিল্প সংস্কৃতির সম্পদ হিসেবে বর্তমান সরকার বিভিন্ন বৌদ্ধপ্রাসাদ ও প্রাচীন চীনের বহু ধর্মীয় উপাদান সযত্নে রক্ষা করছে।

ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহ ধনতান্ত্রিক দেশের কোথাও এই স্বাধীনতা নেই। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর বাংলাদেশে সরকারের আক্রমণের আজও শেষ। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতে হয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সর্বত্র অভাব। তা ছাড়া ধর্মে বিশ্বাস না করার স্বাধীনতা ও এ-সব দেশে খর্বিত। পাকিস্তানে ইসলাম ধর্ম মেনে চলছে না, এই সন্দেহ হলেই কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। নাস্তিকতার জন্য কত মনিষী পশ্চিম ইউরোপে নির্যাতিত ও খুন হয়েছে, সে ইতিহাস কোনদিন মুছবে না।

সামগ্রিক দিক থেকে বিচার করলে এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দু'শো বছরের অভিজ্ঞতায় এটা অকাট্য সত্য যে, এই গণতন্ত্র ফাঁকা, অন্তসারশূন্য, প্রবঞ্চনাপূর্ণ। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশের ৬৪ বছরের অভিজ্ঞতায় এটাও অকাট্য সত্য যে, সমাজতান্ত্রিক দেশেই সার্থক ও ফলপ্রসূ গণতন্ত্র সুরক্ষিত। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধারক বাহকরা তাদের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে সমস্ত মাধ্যম দিয়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বন্যা ছুটিয়ে দেয়। জমিদার পুঁজিপতিদের সীমাহীন আক্রমণের প্রতিরোধে যারা সংগ্রামে অবতীর্ণ, সেই লক্ষ কোটি নিপীড়িত শোষিত মানুষকে এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে দিতে হবে. সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে এবং সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আলোচনা

প্রতিবন্ধী শিশু-সমস্যা ও আমাদের কর্তব্য

ডাঃ তীর্থংকর দত্ত

অধ্যাপক, বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স, কলিকাতা।

প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা এবং সুপরিকল্পিত শিক্ষার দ্বারা যথাসম্ভব উপযুক্ত করে তোলা এবং তাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যথোপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করার বিশেষ পরিকল্পনা বিশ্বের সর্বত্র এই শিশু-প্রতিবন্ধী বর্ষে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেই সরকারী এবং বেসরকারী স্তরে ঐ একই উদ্দেশ্যে একটা কর্মচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। জনসাধারণের উন্নতির জন্য, ব্যাপকভাবেই হোক অথবা সীমিতভাবেই হোক, কোন পরিকল্পনা করতে হলে প্রথমেই সতর্ক পরিসংখ্যান দ্বারা জানা উচিত জনগণের প্রকৃত সমস্যা কি, কত ব্যাপক এবং গভীর। এই কর্মপ্রক্রিয়া আমাদের দেশের প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নতিকল্পেও গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে এখনও পর্যন্ত প্রতিবন্ধী শিশুসংখ্যা কত সঠিকভাবে জানা যায় নি। পশ্চিমবঙ্গেও একই অবস্থা; শহরাঞ্চলের বিভিন্ন হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র অথবা প্রতিবন্ধী শিশু-চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো থেকে তবুও বেশ কিছু তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের সমীক্ষা কার্যত কিছুই হয় নি। সম্প্রতি একটি কলকাতা শহরভিত্তিক সমীক্ষায় জানা গেছে যে শহরাঞ্চলের প্রতি ১০০০ অধিবাসীদের মধ্যে নূন্যাধিক ১০ জন প্রতিবন্ধী আছেন; ১৪ বছরের নীচে শিশুদের মধ্যে এই সংখ্যা হল প্রতি হাজারে ৯·৪। এই সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতেই দেখা যাচ্ছে এই কলকাতা শহরেই সমস্যাটা কত ব্যাপক এবং গভীর; এর ওপর গ্রামাঞ্চলের সমস্যাটাও যদি সঠিক নির্ণয় করে যোগ দেওয়া যায় তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে অনুমান করতেও ভয় হয়।

কিন্তু ভয় পেয়ে হাল ছেড়ে দিলে বিপদ উত্তরোত্তর বাড়বে বৈ কমবে না এবং অবশেষে ধ্বংস অনিবার্য। বিকলাঙ্গ কিংবা প্রতিবন্ধী শিশুরা যদি চিরকাল সমাজের বোঝা হয়ে থাকে, তাদের যদি ভবিষ্যতে কোন উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো না যায়, তবে অচিরে সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে এবং পরিণামে সমাজও পঙ্গু হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

তাই এদের উন্নতির জন্য এবং প্রতিষ্ঠাকল্পে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এদের রোগ নির্ণয় করা দরকার এবং অল্প থেকেই উপযুক্ত চিকিৎসাধীনে রাখতে পারলে ভবিষ্যতে এরা অনেকেই যথেষ্ট কর্মক্ষম হয়ে উঠতে পারবে এবং স্বাধীন জীবিকা দ্বারা নিশ্চয়ই স্বনির্ভর হবে। শিশুদের শারীরিক অথবা মানসিক প্রতিবন্ধকতা প্রধানতঃ দুই কারণে হয়ঃ জন্মগত কারণে অথবা জন্মের পর নানারকম রোগভোগের জন্য। জন্মকাল থেকে সাধারণ এবং সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার পর শিশুরা প্রধানতঃ যে যে কারণে বিকলাঙ্গ হয়ে যেতে পারে সেগুলো হলঃ শারীরিক আঘাত, স্নায়বিক রোগ—প্রধানতঃ পোলিওমায়েলাইটিস, অথবা দাহজনিত ক্ষত। এই সব বিকলাঙ্গকারী পরিস্থিতি থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্য জন্মের পর থেকেই যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার এবং রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা (Immunization) নেওয়া উচিত। তা ছাড়া আঘাত, রোগ অথবা দাহজনিত শারীরিক বিকলতা হলেও প্রথমাবস্থায় তার পরিমাণ নির্ণয় করে উপযুক্ত চিকিৎসা করলে প্রতিবন্ধকতা অনেকখানি দূর করা সম্ভব হয় এবং শিশুও ভবিষ্যতে স্বনির্ভর নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু জন্মগত কারণে যে সব শিশু প্রতিবন্ধী হয় তাদের প্রথমাবস্থায় সনাক্ত করা খুবই কঠিন। যে সময় প্রতিবন্ধকতা সাধারণভাবে ধরা পড়ে তখন হয়ত বিকলতা অনেকখানি বেড়ে গেছে এবং চিকিৎসার ভবিষ্যত সুফলও সীমিত হয়ে গেছে। তাই প্রথমেই জন্মগত কারণগুলো নিবারণ করার ব্যবস্থা নেওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। শিশু গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন মাকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে যতদূর সম্ভব নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করতে হবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকলে নিজের অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকবে, ফলস্বরূপ গর্ভস্থ শিশুও রোগাক্রান্ত হবে না। গর্ভকালীন অবস্থায় অতিরিক্ত পরিশ্রম গর্ভমধ্যস্থ শিশুর ক্ষতি করতে পারে। তা বলে একেবারে চুপচাপ শুয়ে-বসে কাটানোও সমীচীন নয়; বরং সংসারের সহজ কাজগুলো এবং সম্ভব হলে সামান্য সহজসাধ্য ব্যায়াম করা উচিত। এতে শরীরের মাংসপেশীগুলো কার্যতৎপর থাকে এবং ফলস্বরূপ অনুবর্তী প্রসব অনেক সহজ, সরল এবং স্বাভাবিক হয়। গর্ভবতী মা'র নিয়মিত ব্যবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে খুবই ভাল হয়। এই সময় মা'র সুষম খাদ্যের যেমন প্রয়োজন, তেমন মনের প্রফুল্লতাও আবশ্যক। গর্ভস্থ শিশুর দেহে ও মনে মা'র শারীরিক এবং মানসিক সুকুমারতার প্রতিফলন হয়। এটা প্রশ্নাতীত সত্য যে সহজ স্বাভাবিক প্রসব সব নবজাতকের পক্ষে সর্বতোভাবে নিরাপদ। মনুষ্যজন্মের প্রথম থেকেই প্রাকৃতিক নিয়মে এই প্রক্রিয়া কার্যত কোন জটিলতা ছাড়াই চলে আসছে। এর ব্যতিক্রম, যে কোন কারণেই হোক, ঘটাতে গেলেই নবজাতকের ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে এতে আর আশ্চর্য কি! তাই কিছু কিছু আধুনিক চিকিৎসকের এই প্রতিষ্ঠিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানোর চেষ্টা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। পূর্বকালে প্রসূতিগৃহ

আলাদা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যই ছিল যাতে সবার ছোঁওয়া হয়ে নবজাতক শিশুর দেহে রোগ সংক্রামিত না হয়। কিন্তু পরবর্তী-কালে কুসংস্কার এবং অজ্ঞতার প্রভাবে বাড়ির সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর ঘরে ও পরিবেশে গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছিল। আজকাল অবশ্য সহরাঞ্চলে এই অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু সুদূর গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা কি এখনও এই অজ্ঞতার প্রভাবমুক্ত হতে পেরেছে?

জন্মের পর শিশু যখন ক্রমাগত বাড়তে থাকে তখন যে লক্ষণ-গুলো দেখলে বুঝতে পারা যাবে শিশু ভবিষ্যতে শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে উঠবে কিনা সেগুলো সঠিকভাবে বোঝা সাধারণ লোকের পক্ষে, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, এক রকম দুঃসাধ্য। কিছু কিছু পূর্বলক্ষণ আছে যেগুলো ভবিষ্যতে শিশুর প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেয়। এ-সব সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করতে পারলে বহু প্রতিবন্ধী শিশুকে একেবারে প্রথমাবস্থায় উপযুক্ত চিকিৎসাধীনে আনা যেতে পারে; ফলে এই সব শিশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সাহায্যে প্রতিবন্ধকতা অনেকখানি কাটিয়ে উঠে ভবিষ্যতে হয়ত দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক হয়ে উঠতে পারবে। জীবনের প্রথমাবস্থায় প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ কয়েকটি পূর্বলক্ষণ পরবর্তী অনুচ্ছেদে জানানো হয়েছে। যে কোন মা, অথবা আপনজন একটু মনোযোগী হয়ে লক্ষ্য করলে আশা করি বুঝতে পারবেন।

লক্ষণগুলো ক্রমপর্যায়ে দেওয়া হলঃ

(১) বুকের দুধ অথবা বোতলে খাওয়ানো মুশকিল। ঠিকমত টানতে পারে না।

(২) অল্প শব্দে অথবা সামান্য ছোঁয়াতে অতিরিক্ত হাত-পা নেড়ে উত্তেজনা দেখানো এবং ভীষণ তীক্ষ্মভাবে কেঁদে ওঠা; অথবা সব সময় হাত-পা একেবারে শিথিল করে থাকা এবং দুর্বল কান্না।

(৩) শরীরের পেশীগুলো কঠিন আড়ষ্ট হয়ে থাকে; অথবা অতিরিক্ত শিথিল হয়ে থাকে।

(৪) হাত দুটো এমন শক্ত করে মুঠো করে থাকে যে সহজে খোলা যায় না। স্নানের আগে তেল মাখানোর সময় মা অনেক কষ্টে হয়ত মুঠি খুলতে পারেন।

(৫) শিশুটিকে দু-হাতে সোজা করে তুলে ধরলে অনেক সময় শরীরটা শক্ত হয়ে ধনুকের মত পেছন দিকে বেঁকে যেতে পারে, অথবা পা দুটো শক্ত হয়ে একটা আর একটার ওপর উঠে গিয়ে কাঁচির মত আড়াআড়ি থাকতে পারে।

(৬) সাধারণত একটি সুস্থ শিশু ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অল্প হাসে এবং মা যেদিকে যায় সেদিকে কিছুটা তাকাবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিবন্ধী শিশু এ-সব ঐ বয়সে পারে না; অনেক দেরীতে সম্ভব হতে পারে।

(৭) জন্মের পর একটি সুস্থ শিশু হঠাৎ শব্দে হাত-পা ছুঁড়ে চমকে ওঠে, কিন্তু একটি বধির শিশুর পক্ষে এটা সম্ভব নয়। এক মাস বয়সে সুস্থ শিশু যে কোন পরিচিত শব্দে, বিশেষ করে মা'র গলার স্বরে অথবা বাটি চামচের শব্দে অথবা পরিচিত কোন খেলনার আওয়াজে এমনভাবে চোখ দুটো স্থির রেখে সতর্ক হবার চেষ্টা করে যেন মনে হয় কোন্ দিক থেকে শব্দটা আসছে বোঝার চেষ্টা করছে। বধির শিশু পারে না।

(৮) ৩—৪ মাস বয়সেই একটি সুস্থ শিশু মা দুধ খাওয়াতে গেলে অথবা খাওয়ার বোতল দেখলেই হেসে হাত-পা নেড়ে মনের খুশী প্রকাশ করে; কিন্তু প্রতিবন্ধী শিশু পারে না।

(৯) এ ছাড়া ৬ থেকে ৮ মাসে বসতে শেখা; ১০ থেকে ১২ মাসে দাঁড়াতে শেখা; তারপর ধীরে ধীরে চলাফেরা সব কিছুই প্রতিবন্ধী শিশুদের সময়মত হয় না, অনেক দেরিতে হয়।

এই সব লক্ষণগুলো দেখলেই মা-বাবার অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। প্রতিটি চিকিৎসকের কর্তব্য এই সব শিশুদের ভালমত পরীক্ষা করে সব কিছু যাচাই করে উপযুক্ত চিকিৎসা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করা। বিশেষতঃ একজন শিশু-চিকিৎসকের এই কর্তব্যে অবহেলা করা অপরাধ। এর জন্য যদি অন্যান্য সহকর্মীদের সহযোগিতা প্রয়োজন হয় নিঃসংকোচে তা নেওয়া উচিত।

এই সব প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নতির জন্য এবং সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য পরিবারের প্রত্যেকের সহানুভূতি এবং সহযোগিতার যেমন একান্ত প্রয়োজন, তেমনি সমাজ কিংবা সরকারের দায়িত্ব কোন অংশে কম নয়। প্রসূতিদের স্বাস্থ্য রক্ষা, উপযুক্ত প্রসূতি সদন নির্মাণ, নবজাতকের জন্য উন্নত ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা; প্রতি-বন্ধীদের রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং পরিকল্পনামাফিক শিক্ষার প্রকৃত ব্যবস্থা সমাজকেই করতে হবে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে এই সব প্রতিবন্ধীদের ভিক্ষার পাত্র অথবা দয়ার পাত্র করে না রেখে কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা যে কোন দায়িত্বশীল সরকারের অবশ্য কর্তব্য। আর যতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশবাসীকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করা না যাবে, প্রতিবন্ধীর সংখ্যা এবং সমস্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে, ধীরে ধীরে সারা দেশটাই পঙ্গু হয়ে যাবে।

মফঃস্বলবাসী তরুণদের লেখক হওয়া শক্ত

ডঃ সুকুমার মাইতি

লেখক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে অনেকেরই ইচ্ছা এবং সে কারণেই মফস্বল থেকে প্রকাশিত অসংখ্য ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকাকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশের চেষ্টায় বহু তরুণ জীবনের বহু অমূল্য সময় ব্যয় করে চলেছেন। কিন্তু তাঁদের ক'জনই বা সফলকাম হয়েছেন বা হতে পারবেন। বেশীর ভাগই যে সফলকাম হতে পারবে না তা সত্য কারণ প্রতিভা থাকলেও মফস্বলে বসে সে লেখক হওয়া সহজসাধ্য নয় এ সত্যটুকু সকলেই স্বীকার করবেন।

যেমন সব বীজ অঙ্কুরিত হয় না আবার যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা আছে সে যদি উপযুক্ত পরিমাণে জল হাওয়া তাপ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না পায় তা হলে যেমন মহীরুহে পরিণত হতে পারে না তেমনি প্রতিভা থাকলেই লেখক হওয়া যায় না যদি না সেই প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রটিকে সুপ্রশস্ত করা হয়।

কিরূপ অনুকূল পরিবেশ পেলে একজন মফস্বলবাসী তরুণের পক্ষে লেখক হওয়া সম্ভব? মফস্বল থেকে যাঁরা লেখক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চাইছেন তাঁদের অনেকেরই পরিবারগত কোন পূর্ব ঐতিহ্য নেই বললেই চলে। পরিবারগত পূর্ব ঐতিহ্য বলতে এই যে পূর্বপুরুষদের কেউ না কেউ লেখক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সেই সুবাদে ঐ বংশেরই একজন উত্তরসূরী তরুণ লেখক হিসাবে সকলের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হচ্ছেন।

শুধু প্রতিভা থাকলে চলে না সেই প্রতিভা স্ফুরণের জন্য অনুশীলন বা চর্চা একান্ত প্রয়োজন এবং এর জন্য চাই উপযুক্ত লাইব্রেরী যার একান্ত অভাব গ্রামাঞ্চলে। এ ছাড়া রয়েছে উৎসাহ-দাতার অভাব, প্রকাশ ও প্রচারের অপ্রতুলতা।

এবংবিধ সমস্যাজর্জরিত হয়েও যদি কোন তরুণ সৃজনশীল রচনাকর্মে আত্মনিয়োগ করেন তাহলে তাঁকে আরো কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেগুলি আলোচনা করা দরকার।

মফস্বল থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় যদি কারু রচনা প্রায়শই প্রকাশিত হতে থাকে তবুও তিনি দেশের বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছতে পারবেন না। কারণ ঐ সব পত্রিকার প্রচার অতি অল্পই এবং আয়ুষ্কাল এত স্বল্প যে এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকদের লেখা সম্পর্কে ধারণা গড়ার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়। এই সব পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে হয়তো একটি স্বল্প পরিসর স্থানের মধ্যে সুনাম অর্জন করা যায় কিন্তু দেশের বৃহত্তর ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত পাঠক-সাধারণের কাছে পৌঁছিতেই পাবা যায় না।

ধরা যাক এ-সব অসুবিধার মাঝখানে থেকেও একজন তরুণ কলম চালিয়ে যাচ্ছেন লেখক হওয়ার দুরন্ত বাসনা নিয়ে তবুও তাঁর প্রতিষ্ঠার পথে নানা বাধা রয়েছে।

মফস্বলবাসী একজন লেখক কলকাতায় একটি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি লেখা পাঠালেন। লেখাটি সম্পাদকের মনোনীত হল কিনা তিনি তা বুঝতে পারছেন না। কারণ খবর পেতে হলে লেখার সংগে জবাবী কার্ড দিতে হবে নতুবা অমনোনীত রচনা ফেরৎ নেওয়ার জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাতে হবে। কবিতা বা অন্য ছোট লেখা হলে তবু রেহাই নতুবা যদি বড় গল্প, উপন্যাস, নাটক কিংবা প্রবন্ধ হয় তাহলে একবার একটি লেখা পাঠানো এবং অমনোনীত হলে ফেরৎ নেওয়ার জন্য কি পরিমাণ মূল্যের ডাকটিকিটের প্রয়োজন হবে তা একবার ভেবে দেখুন। কলকাতাবাসীদের চলার পথে এ-কাজ সমাধা হতে পারে। এ ছাড়া আরো একটি ভাবনার দিক রয়েছে -একজন লেখক যখন প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাচ্ছেন তখন তো আশা রয়েছে লেখাটি হয়তো মনোনীত হতে পারে. তবে আবার ফেরৎ নেওয়ার জন্য ডাকটিকিট দেওয়া কেন? ফেরৎ ডাকটিকিটও দেওয়া হল না এবং লেখাটি প্রকাশিত হল না তখন ঐ লেখাটির কপি লেখক কিভাবে পেতে পারবেন? সম্পাদকেরা বলেন—লেখার কপি রেখে লেখা পাঠান দরকার। কিন্তু একটা লেখা কতবার কপি করে লেখক পত্রিকা দপ্তরে পাঠাবেন! এমনও ঘটছে যে উপযুক্ত ফেরৎ ডাকটিকিট দেওয়া সত্ত্বেও লেখাটি ফেরৎ আসে নি এবং প্রকাশও পায় নি।

ধরা যাক্ একটি লেখা মনোনীত হয়ে প্রকাশিত হল তখন লেখক জানবেন কি করে? ওঁরা বলেন পত্রিকা দেখে। মফস্বলে কি সব পত্রিকা আসে কিংবা একজন লেখকের পক্ষে কি সব পত্রিকার গ্রাহক হয়ে টাকা ব্যয় করা সম্ভব? লেখককে যদি একটি সৌজন্য সংখ্যা পত্রিকা দপ্তর থেকে পাঠান হত তাহলে তো এক-দিকে যেমন সৌজন্য রক্ষা করা হত অন্যদিকে লেখককে উৎসাহিত করা হত। নামী ও দামী লেখকদের সৌজন্য-সংখ্যা নিশ্চয়ই দেওয়া হয়ে থাকে তবে মফস্বলবাসী নবীন লেখকদের যে সৌজন্য-সংখ্যা দেওয়া হয় না এ-কথা অনেকেই স্বীকার করবেন।

লেখকদের লেখা প্রকাশিত হলে লেখকেরা সম্মান দক্ষিণা পেয়ে থাকেন। যে সব পত্রিকা এই দক্ষিণা দিয়ে থাকেন তাঁরা তাদের একটি নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী সকলকে সমান হারে দেবেন এটাই কাম্য। কয়েকটি পত্রিকা রয়েছে যাঁরা লেখা প্রকাশ পেলেই লেখকের নামে চেক পাঠিয়ে দেন আর কিছু পত্রিকা রয়েছে এ ব্যাপারে তাঁদের কাছে ধর্ণা না দিলে তাঁরা তা দেন না এটা কেন? এমন কি সরকারী পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার জন্য দক্ষিণা পেতে হলে অফিসে গিয়ে বিল জমা না দিলে টাকা পাওয়া যায় না। এখানে সেই একই প্রশ্ন লেখক কি করে জানবেন যে তার লেখাটি প্রকাশ পেয়েছে কি না এবং সংবাদ পেলেও তিনি জানবেন কি করে যে ঐ পত্রিকা সম্মান দক্ষিণা দিয়ে থাকেন এবং তার জন্য বিল জমা দিতে হবে। মফস্বল থেকে গিয়ে লেখা প্রকাশ পেয়েছে কিনা খোঁজ নিয়ে সম্মান দক্ষিণা বের করতে যে রাহা খরচ হবে তা অনেক সময় দক্ষিণার অঙ্ককেও ছাড়িয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে কি পত্রিকা দপ্তর

সম্মান দক্ষিণাসহ পত্রিকার একটি সৌজন্য-সংখ্যা পাঠিয়ে লেখকদের উৎসাহিত করতে পারেন না?

এ-ও সত্য লেখক-জীবনের শুরুতে যে সব রচনা জন্মলাভ করে তার সবগুলোই প্রকাশের জন্য মনোনীত হতে পারে না কিংবা প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাগুলোতে স্থানলাভ করতে পারে না। কিন্তু পরিণত ও বলিষ্ঠ রচনাও যে সব সময় সব পত্রিকায় প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না এ ঘটনাও সত্য। এর অন্যতম কারণ গোষ্ঠী চেতনা। এক একটি পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী প্রায় নির্দিষ্ট রয়েছে, ঐ গোষ্ঠীর বাইরের লেখকদের লেখা প্রকাশের সুযোগ তাই কম। তাই মফস্বল-বাসী লেখকদের পক্ষে সব সময় সুযোগই হয় না ঐ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া। মফস্বলের ছেলেরা এমনিতেই একটু লাজুক প্রকৃতির। ওদের পক্ষে প্রায়শই সম্ভব হয় না কলকাতার মত জন-বহুল নগরীতে বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সৃষ্ট গোষ্ঠীর ব্যূহ ভেদ করে নিজেদের স্থান করে নেওয়া। কলকাতায় আত্মীয়-স্বজন না থাকলে একরাতও কাটানো এক প্রকার অসম্ভব বিশেষ করে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের, এ প্রসঙ্গে মেয়েদের কথা না তোলাই ভাল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেখানে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে সেক্ষেত্রে লাজুক প্রকৃতির ঐ ছেলেদেরকে কেউ অগ্রাধিকার দেবে এমন কথা ভাবা যায় না, অথচ দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় এদের প্রবেশের একটা প্রয়োজনও ছিল। মফস্বলের ছেলেদের সাহিত্য প্রাঙ্গণে প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ বলেই আজকের সাহিত্য নগর-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। নাগরিক জীবনের সুখ দুঃখ, আশা-নিরাশা ও পরিবেশের কথা যত পাই গ্রাম-জীবন সেই পরিমাণে সাহিত্য-প্রাঙ্গণে উপেক্ষিত। গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত সম্ভাবনাময় তরুণদের এগিয়ে আসার আহ্বান আজ কেউই জানাচ্ছেন না।

একমাত্র সরকারই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারেন, এগিয়ে আসতে পারেন নানাভাবে নানা প্রকারে প্রকাশের ক্ষেত্রটিকে উন্মুক্ত করে। সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মাধ্যমে জেলা বা মহকুমা-ভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা করে পুরস্কার প্রদান করা এবং ঐ সব রচনা প্রকাশের ব্যবস্থা করে কলকাতা তথা দেশের সুধীসমাজের কাছে সুপরিচিত করতে পারেন। সরকারী দপ্তর থেকে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় সেখানে ঐ সব লেখা প্রকাশের ব্যবস্থা করা, রবীন্দ্র পুরস্কার বা সাহিত্য একাদেমী পুরস্কারের মত বড় পুরস্কার না হোক বিভিন্ন সময়ে ছোট ছোট পুরস্কার প্রদানের দ্বারা মফস্বলবাসী তরুণদের প্রকৃত লেখক হওয়ার পথে সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন।

প্রবীণদের পুরস্কার প্রদান তাঁদের পরিণত প্রতিভার স্বীকৃতি সন্দেহ নাই, কিন্তু তরুণদের কি ঐভাবে উৎসাহিত করে সুস্থ যুবমানস তৈরী করার চেষ্টা করা যেতে পারে না?

সরকার যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন সেই সব পত্র-পত্রিকায় মফস্বলবাসী লেখকদের রচনা লেখক পরিচিতিসহ প্রকাশের ব্যবস্থা করলে এবং বিভিন্ন সময়ে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী লেখকদের চিন্তা-ভাবনাকে দেশবাসীর সামনে পৌঁছে দিলে একটি বলিষ্ঠ ও সুস্থ সমাজ জীবনেরই প্রতিষ্ঠা ঘটবে সন্দেহ নাই। স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যেমন দেশবাসীকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রয়াস একটি জাতীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছে তেমনি সুলেখক তৈরীর দায়িত্বও সরকারকে নিতে হবে। লেখক তৈরীর ভূমিকা যদি কেবলমাত্র কয়েকটি বেসরকারী ব্যবসায়িক প্রকাশকগোষ্ঠীর করায়ত্ত থাকে তাহলে তাঁরা নিজেদের মত করে লেখক তৈরী করবেন, সেক্ষেত্রে তাঁরা দেশগঠনের পক্ষে সহায়ক না-ও হতে পারেন।

আজকের দিনে এই সব তরুণ ও গ্রামীণ লেখকদের জীবন ও জীবিকার প্রশ্নটিকে বিবেচনা করে দেখতে হবে। গ্রামীণ যুব-মানসের এই দিকটি যাতে উপেক্ষিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য দেওয়ার সময় এসেছে বৈকী।

[আয়-ব্যয়ক ভাষণ : ১৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সংক্ষিপ্ত রূপরেখা মাননীয় সদস্যবৃন্দের অবগতির জন্য উপস্থাপন করলাম।

২৯। মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, রাজ্যের আনু-মানিক ১ কোটি ৭৫ লক্ষ যুবক-যুবতীর কল্যাণ বিধানের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার পরিমাণ মাথাপিছু ২·৪ টাকা। আমার বলতে কোন কুণ্ঠা নেই প্রয়োজনের তুলনায় এই অর্থ অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু রাজ্যের সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে ও বিভিন্ন বিভাগের কল্যাণমুখী কর্মসূচীর কথা বিবেচনা করে এর অধিক অর্থ বরাদ্দ করা সম্ভব হয় নি। সেইজন্য মাননীয় সদস্যগণের কাছে একান্তভাবে অনুরোধ করব আসুন আমাদের মিলিত প্রচেষ্টার সাহায্যে এই সীমিত অর্থকে যুবকল্যাণের কাজে সঠিকভাবে লাগানোর জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করি।

আমি আমার ভাষণের শেষে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় সদস্যগণকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব, তাঁরা যেন যুব-কল্যাণ বিভাগের ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরের প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দের দাবী অনুমোদন করেন।

ছোবল

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

ডুগ-ডুগ-ডুগ-ডুগ করে ঈশান ডুগডুগিটা বাজায়। সামনে আর পিছনে তিনটে ছ'টা ঝাঁপি। সামনেরগুলোতে লাউডগা, উদয়লা মিলে চারটে আর পিছনের দিকে দু'টো। পিছনের বড়টা চাল রাখা ঝাঁপি। বাপের আমলের ধানের মরাই আর চালের ডালার মাপমত বড়সড় করে করা। সামনের মাঠটা পেরোলেই চাতরা গাঁ। চাতরার পিছনে মথুরডাঙা আর তার ঈশান কোণে বাড়াভগলাদিঘী। ও গাঁ'টা ভগলাদিঘীর বাইরে কিন্তু হাতগোণা লোকজন, লোকে তাই বলে বাড়াভগলাদিঘী। ঈশান ভাবে আজ গায়ে গতরে বড় বেদনা, খান কয়েক গাঁ ঘুরে ফিরে আসবে।

মাঠটা পেরিয়ে চাতরাতে ওঠে ঈশান। ডুগডুগির শব্দ শুনে ছেলের দল পিছু ধরে। কত্তামায়েরা নাতি-নাতনী বগলে করে সাপখেলা দেখতে আসে। কুকুরগুলো গলা ছাড়ে। দিঘীটার চার-পাশ একপাক ঘোরে। ছেলেগুলো পিছন পিছন হাঁটে, গাঁয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত এসে ফিরে যায়। ছোড়দি পুকুরের পাড় পর্যন্ত এসে কুকুর তিনটে একস্বরে চিৎকার করে লেজ নাড়তে নাড়তে গাঁয়ের দিকে ফিরে যায়। বৌনি না হওয়ার রাগে পিছন পানে তাকিয়ে দুটো গালাগাল করে ঈশান। গাঁয়ের লোকগুলো অযাত্রা করে দিল। দিনটা মাটি।

মথুরডাঙাতে যখন ঈশান এসে পোঁছোয় তখন চানবেলা পেরিয়ে গেছে। সামনে মাকালীর জাগ্রত বিগ্রহ। বাঁকটা নামিয়ে জিবে মাথায় ধুলো ঠেকায় ঈশান। বেশ কিছু লোকজন এসেছে পুজো দিতে। দূর দূর থেকেও লোক আসে। কারো বাত, কারো পেট গোলমাল, কারো অম্বলশূল আবার মেয়ের বিয়ে না হওয়া কি বৌয়ের বরকে হাতকরা এমন সব ব্যারাম আছে। মন্দিরের সামনে একটা মিষ্টির দোকান। মিষ্টি বলতে মণ্ডা আর বরফি। মা কালী আর বড় বড় বোলতার ভোগে লাগে। জনাকয়েক ছোকরা সামনে বসে তাস পিটছে। আঙুলের ডগে সাহেব, বিবি, গোলাম, টাকা। ডুগডুগির শব্দে সব কোঁচায় হাত দেয়। গোটা তিন-চার করে বিড়ি। তবু ঈশান ঝাঁপি খোলে। এখনও বৌনি হোল না। দু'-চারজন করে বেশ লোক জমে যায়। প্রথমে মা মনসার উগ্র বাহন কেলে। দিন দশেক আগে ধরা। বিষদাঁত ভাঙা হয়ে গেছে তবু গর্জন যায় নি। অন্য ঝাঁপিগুলো সুতলি দিয়ে বাঁধা কিন্তু ঈশান এটাতে লাগিয়েছে লাইলনের দড়ি। বুড়ো বয়সে ঈশান পা সরাতে পারে না তাই ঝাঁপির খোলটা সামনে নাড়ে। ডুগডুগির সংগে বেসুরে গান ধরে—

> সিতলিয়া নাগে কৈল সীতার সিন্দুর।
> কাজলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥
> পদ্মনাগে কৈল দেবীর সুন্দর কিঙ্কিনী।
> বেতনাগ দিয়া কৈল কাঁকানি কঞ্চুনি॥

কেলের পর বোড়া। তারপর একে একে চিতি, ঘেসোবোড়া, লাউডগা। ঈশানের বেটাটা কাজের হয়েছে। বয়েস ন'-দশ। পরশু লাউডগাটা ধরেছে। ঈশান শেষে বার করে দুধে গোগরো। সাড়ে তিন হাত লম্বা, দুধের মত রং, গায়ে থোপ থোপ দাগ, মাথার উপর খড়মের দুটি ছাপ। অনেক দিনের সাপ। ঈশানের এটার প্রতি কেমন মায়া। সাপটাও খুব পোষমানা হয়ে গেছে। এক এক করে ঝাঁপিগুলো বন্ধ করে ঈশান। সাড়ে সাত আনা হয়েছে। ঈশান মাথার উপরে তাকায়। সূর্য বেশ খানিকটা হেলেছে। মথুরডাঙা পেরিয়ে ঢোকে বাড়াভগলাদিঘী। গাঁ-পাড়া ঘুরে বাজারে। দোকান-পাতি বন্ধ করে খেতে গেছে সব। তেলিপাড়ায় ঢোকে ঈশান। খানিক ডুগডুগি বাজাতে ছেলেপিলে, বুড়োবুড়ি সব এসে জোটে। খেলা হয়। আধসেরটাক চালও হয়। ঈশান দেখে দেহের ছায়া পুবে পড়ছে। বেড়ে গেছে বেশ খানিক। ফিরতে হবে এবার। কাঁধে বাঁক তোলে ঈশান।

সূর্যের আলো কমে আসে। ঘরমুখো ঈশান কাঁধের বাঁকের চাপে আরো খানিক বেঁকে গেছে। রাস্তার পাশের দোকান থেকে দু'-আনার চানাচুর কেনে। মাঠটা পেরিয়ে গাঁয়ে ঢোকে। গাঁয়ের এক কোণে সেদো মুচির ঘর। বাঁশ গাছের ছায়ায় বেশ খানিক কালো অন্ধকার জমেছে। একটু আগে সারা রাস্তার ধুলো আকাশে ছড়িয়ে গরু-ছাগল ঘর ঢুকেছে। ঈশান গাংদেয়ালিতে বাঁকটা রেখে সেদোর ঘরে ঢোকে। ঠিকমত ঠাওর করতে পারে না। মাথাটা সোজা করতেই বাতাটা লেগে বেশ খানিক পচা খড়মাটি সমেত ঝরে পড়ে। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সেদো। হাঁক পাড়ে—'ক্যারে।' ঈশান 'আমি গো' বলে দুয়োরের খুঁটিটাতে ঠেস দিয়ে বসে। সেদো হাঁক পাড়ে—'ওরে ও ভবি তোর ঈশেদা এয়েচে, ডাকচে আয়।' ভবি সেদোর বোন। কোলনাড় হয়ে দাদার কাছে আছে। কোমরে কাপড়ের পাকটা বাঁধতে বাঁধতে এসে হাত বাড়ায়—'পৈসা দাও দাদা তবে লেশা করবে। তা না হলি দিতে লারব বাবু।'

ঈশান বলে—'দিদির আম্মার বড় কথা। তা দুবা গা দিদি দুবা।'

ভবির ঝাঝ বাড়ে। বলে—'দুবা দুবা করে দু' মাস কাটালে। ট্যাঁকে পৈসা থাকলি লেশা কর, তা লইলে ছ্যাড়ে দাও।'

ঈশান কোঁচা থেকে তিন আনা পয়সা বার করে। এগিয়ে দিয়ে বলে—'লে গো দিদি লে।'

ভবি পাছা ঘুরিয়ে ঝাপটি মারে—'রসের নাগর আমার—লে বললি লে, দে বললি দে। আগের মাসের পাঁচ সিকে, তার আগের মাসের তিন টাকা, ই মাসের এক টাকা সব ছাড় এক সাথে তবে মাল দুবো।'

ঈশান চটে বলে—'তোর তো বড় ট্যাঁক ট্যাঁক কথা!'

ভবি কোমর নাচিয়ে বলে—'তুমি পারা আমার ভাতার যে রসে চুবিয়ে রসের কথা বলব। সত্যি কথা ট্যাঁক ট্যাঁকই ঠেকে।'

সেদো বলে—'ছাড় ভবু ছাড়। ঈশেন আমার অনেক কালের খদ্দের, চটাচটি করিস নে।'

ভবি সেদোর কথা শুনে আরো চটে ওঠে। বলে—হ'গো। উনি আমার স্যাঙাৎ তাই বিনি পয়সায় দুবো। ব্যাতে রক্ত উঠিয় মাল করি, মুখপণে গোঁজে উঠে যায়।'

ঈশানের মেজাজটা মাল না পাওয়ায় খিঁচড়ে ওঠে। নেশা চটে যায়। বলে ওঠে—'তবু যদি ভাতারের ভাত পেতো।'

গাল পাড়তে পাড়তে ঝ্যাঁটা নিয়ে তেড়ে আসে ভবি। ঈশান বাঁকটা নিয়ে রাস্তায় নামে। ভবি তখনও গাল পাড়ছে।

ঈশান পেছন ফিরে বলে—'মাগী না হলে গতর ছিঁচে দিতুম।' তারপর হনহন করে এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

চারদিকে বেশ অন্ধকার। বর্ষার জল পেয়ে গাছপালা পাতায় ভর্তি হয়ে গেছে। অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে। অমূল্য উনুন ধরিয়েছে। ভিজে ডালপালা থেকে ফেনা কেটে ধোঁয়া বেরিয়ে আসে। নাক চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে অমূল্যের। বাপের আনা চাল ধুয়ে উনুনে চাপিয়ে দেয়। লম্ফটাকে খানিক দূরে সরিয়ে মাছের আঁশ ছাড়ায় অমূল্য। ছাই মাখিয়ে শক্ত করে ধরে ছোট বটিটার উপর। দুটো চ্যাং বেরিয়ে গেছে বিকেলে লালা ছিঁচে ধরার সময়। রাগটা এখনও রয়ে গেছে অমূল্যের। চ্যাং আর কই টিকলি তিনটের তলপেটটা কেটে নাড়ি-ভুঁড়িগুলো বার করে আনে। পচা সুতোর মত ছিঁড়তে ছিঁড়তে বেরিয়ে আসে সব।

ঈশান দুয়োরটাতে বোবার মত বসে থাকে। মাথাটা হেলিয়ে দেয় বাঁশের খুঁটিটার গায়ে। অনেকদিন পরে কেমন মনটা গুমরে ওঠে ঈশানের। তার যেন মনে হয় দিনগুলো আর কাটছে না। লোকে আর সাপ খেলা দেখে না। আগে ডুগডুগি শুনলে লোকের গাজন হোত, এখন সারা গাঁয়ে দুটো খেলাও হয় না। কত রকম মজা হয়েছে আজকাল। কুড়ি পয়সা দিয়ে বাসে উঠলেই বাগান-বেড়ের সিনেমা হল। কত বাংলা-হিন্দী বই। টিকিট করে যাত্রাও হচ্ছে আজকাল। চেয়ারে বসে সব যাত্রা শুনছে। ঘরে ঘরে রেডিও জুটেছে। চায়ের দোকানেও রেডিও। সাপ খেলানো দেখিয়ে ক্ষিদে আর মিটবে নি। সাপে কামড়ালে আগে লোকে ছুটত গুণিন ডাকতে, এখন ছোটে হাসপাতাল। বিশ্বাস কমছে আর তার সাথে কমছে চাল, ডাল, আলু, কুমড়ো। ডালার চাল কমতে কমতে আজ ভিক্ষে মুঠিতে দাঁড়িয়েছে। মাঠে ধানের চারা, ঘরের জালা তল ছুঁই ছুঁই। রোজ মদের ঘোরে বেশ কেটে যায় ঈশানের। আজ মাথা পেট একসাথে যেন তাকে খেয়ে ফেলছে। ঈশান ভেবে কুল পায় না কি করবে। লোকে বলে সাপ খেলালে সাপের হাতে মরণ। তার না হোক আর টেনেটুনে ক' বছর কিন্তু তার ন' বছরের ছেলেটার কি হবে? তাকেও কি মা মনসা নেবে? ভাবতে ভাবতে শিউরে ওঠে ঈশান। চার চারটে ছেলেকে আশিনগেড়ের বটগাছের তলায় রেখে আসতে হয়েছে ঈশানকে। শেষটা অনেক শিকড়বাকোড়ে বাঁচল কিন্তু গর্ভধারিণী তার কাছে রেখে চলে গেল উপরে। এই বুড়ো বয়সে তার উপর যত ঝক্কি। গুম মেরে খানিক বসে থাকে ঈশান। হঠাৎ তার যেন মনে হয় বাঁচতে গেলে এখন থেকে পালাতে হবে। শহরে কিছু ঠিক জুটে যাবে। না জুটুক ছেলেটাতো রেহাই পাবে। পালাতেই হবে তাকে। ঘর থেকে ঝাঁপিগুলো বার করে আনলো ঈশান। অমূল্য ভাবে বাপের নেশাটা আজ খুব জোর লেগেছে। কতদিন পুকুরের পাড় থেকে, মাঠের মাঝ থেকে ডেকে তুলে এনেছে অমূল্য। বোঝে, যেথায় যাক ঠিক ফিরবে ঘোর কাটলে।

হাজরা পুকুরের পাড়ে গিয়ে থামে ঈশান। চারদিকে বাঁশ বন। ঘন ঘন তালগাছ। এদিক ওদিক কুল বেঁউচের ঝোপ। ঝোপের মাঝ থেকে বোড়া সাপের 'গুড়ুক' 'গুড়ুক' ডাক ভেসে আসছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে ভেসে ওঠা চাঁদের কাটা আলোয় পুকুরের পদ্ম-বনে আলো পড়ে। ওই পদ্মের বন থেকে পদ্মবোড়া ধরেছিল একটা। দুধে গোগরোটাও এই পুকুর থেকে ধরা। ঝাঁপির মুখগুলো খোলে ঈশান। ছেড়ে দেবে সব। নিজের কষ্ট যদি না ফুরোয় তবে এদের কষ্ট দিয়ে কি হবে? যার কোল থেকে ধরেছে তার কোলেই ফিরিয়ে দেবে। তারপর ভোর রাতে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। দুধে গোগরোর ঝাঁপিটাতে ঠুকে দেয় বার দুয়েক। ফুঁক দেয় ফুসফুসের সবটুকু জোর দিয়ে। খোলে ঝাঁপির খোলখানা। নেড়ে দেয় ঝাঁপিটা, সাপটা বেরিয়ে যায় বেশ খানিকটা। আর একটু নেড়ে দেয় ঈশান। সাপটা মাথাটা একটু তুলে আবার ফিরে আসে। ঈশান বোঝায়—'যা, চলে যা। তোরও কষ্ট, আমারও কষ্ট।' সাপটা হাত কয়েক গিয়ে ফোঁস করে আবার ফিরে আসে। ঈশান সাপটার পিঠের উপর হাত বুলোয়। বলে—'যা বাছা যা। কি করতে থাকবি? তুইও আমায় খেতে দিতে লারিস, আমিও তোকে খেতে দিতে লারি। যা বাছা যা।' সাপটা তবুও যেতে চায় না। ঈশান ঝাঁপিটার খোলটা দিয়ে মারতে যায়—'যা, পালা যা।' সাপটা ফোঁস করে একটু উঠে আবার ঢুকে পড়ে। ঈশান বোঝে ও যাবে না। গেলেও ওরা আর বাঁচতে পারবে না। সব বিষদাঁত তো সে নিজের হাতে ভেঙে দিয়েছে। ঈশান ভাবে একদিন যারা তার পেটের ভাত জুটিয়েছে তাদের আজ ঠেলে দেবে মরণের মুখে? ঝাঁপিটা বন্ধ করে। বাঁকে তুলে নিয়ে, যেন আরো খানিক বুড়ো হয়ে ফেরে ঈশান।

ছেলেটা উনুনের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঈশান ভাতগুলো নামায়। খোলাতে মাছগুলো চাপিয়ে দেয়। আবার উঠোনের বেল-গাছটার শিকের উপর এসে বসে। ভাবনার ভিতর ডুবে যায় ঈশান। অন্য দিন মদের ঘোরে সব ভাবনা রঙিন হয়ে যায়। আজ সব চিন্তাগুলো কাটা ধানের গোছার মত মনের ভেতর খচ্‌খচ্ করে বিঁধে। সামনের ভাবনার সাথে পিছনের ভাবনাগুলো তাকে আঁকড়ে ধরে। তার জাতভাই নকুল বাগদি, হরি বাগদি, জ্ঞানো বাগদি পাকা সিঁদেল চোর। ঈশান ভাবে ওদের সংগে যোগ দেবে। ওরা মার খায়, জেলে যায় তবু চায়ের দোকানে বসে বসে কেমন সিগারেটের প্যাকেট ফোঁকে! কিন্তু এ শরীরে তাকে কে আর নেবে? তাছাড়া বাপের বারণ আছে। বাপ ছিলো নামকরা ডাকাত। শেষ বয়েসে একটা পা লুলো হয়ে গেছল। বাপ বলত—স্বপনে মা কালী বলেছে লোকের ছেলের পা কাটার ফল। সেই থেকে বাপ ডাকাতি ছেড়ে দেয়। দল ছেড়ে, গাঁ ছেড়ে মা মনসার চরণে স্থান করে নেয়। বহু দূর দূর থেকে সাপ আর নানান গাছগাছড়া জোগাড় করে আনত। এতবড় গুণিন এ তল্লাটে কেউ হতে পারে নি। সবাই ঈর্ষে করত বুড়োটা দু' হাতে কামাচ্ছে দেখে। নিত্যদিন বড় ঝাঁপিটার আধা ঝাঁপি চাল, বেগুন, আলু। খেলতে গেছল হরের চকের ঝাঁপানে। উল্টো দল লড়তে না পেরে বলল জিবে সাপ ধরতে। সাপটা ছিল আগের দিনের ধরা। বিষের থলে ভর্তি। বুঝতে পারে নি তার বাপ এমন সাপ তুলে দিয়েছে তার বুকে। ঝাঁপানের মাচা থেকে নামতে হয় নি হরি গুণিনকে। লটকে পড়েছিল মাচার উপর। বাপের মতই বৌটাও এমনি তড়াক করে চলে গেল। কোলের ছেলে রেখে বোশেখ মাসের বিকেলে গেছলো ঘাস কাটতে। ভাগে পালতো পদ্দারদের একটা বকনা। ঘাসগুলো মানুষটা সমেত জ্বলে উঠেছিল বাজের আগুনে। বাটালি কাটা মুখ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। আরো ভাবনা মাথায় আসার ভয়ে উঠে পড়ে ঈশান।

ছেলেটাকে টেনে তোলে। দুটো টিনের থালায় ভাত বাড়ে। ভাত খেতে খেতে বার তিনেক হুমড়ী খেয়ে থেমে যায় অমূল্য। ঈশান বলে—'বলি বাপ একটু দেখে খা।' বাপের কথায় ঈশান একটু চাঙা হয়। ঘুম কাটতে বাপকে খবর দেয় কল্লেপুকুরে তিনটে গাছে তাল নেমেছে। তাল নামলে অনেক আশা। যদি রোজ ছ'-সাতটা পায় তাহলে গোটা চার ভগবানদিঘীর হাটে বিক্রী করে এলে দেড় টাকা সাত সিকে পাবে। ভাদর পড়ার আগে না করলে মুস্কিল।

ভাদ্দরে তাল কেউ খাবে না। মনে মনে তালগুলোর হিসেব করে অমূল্য। দুটো তাল মেড়ে ময়দাতে দিলে খেয়ে আলা। বিক্রি চারটে তালের মধ্যে দুটোতে তেল, নুন, কেরোসিন হয়ে যাবে। বাকি দুটোর পয়সা মনে মনে জমায় অমূল্য। হিসেবমত একটা কালী-পুজোর লাল প্যান্টুল হয়ে যায় অমূল্যের। কুড়ি পয়সার পটকার হিসেবটা একসাথে সেরে নেয় অমূল্য। দুটো বড় বড় পাথর কুড়িয়ে তুলে রেখেছে। সানে ঠুকে দিলেই—পটাস্। চোখটা বন্ধ করে ফেলে অমূল্য। যেন আগুনের ফিন্‌কিটা ছুটে আসে। খাওয়া হয়ে যায় বাপ বেটার। কুঁড়ের ভেতর তালায় পেতে শুয়ে পড়ে।

রাত গড়ায়। বাঁশের ঝাড়গুলো পেঁত্নির মত সুর তুলে কাঁদে। চারদিকে থমথমে ভাব। চাটাই-এর উপর ঈশান মড়ার মত ঘুমোয়। অমূল্য চুপি চুপি বাইরে বেরিয়ে আসে। হাতে বাপের লাঠিটা। উঠোন থেকে নামে। বুকটা কেমন কেঁপে ওঠে। আবার ঘরে ঢোকে। আস্তে আস্তে বাপকে ঠেলা দেয়। ডাকে—'বাবা, ও বাবা।'

ঈশান পাশ ফিরে বলে—'কি কোস—হাগতে যাবি?'

অমূল্য বলে—'না, তাল কুড়ুতে।'

ঈশান ধমকায়! বলে—'মাঝ রাত, এখন বলে তাল কুড়ুবে। শো শো।'

অমূল্য শুয়ে পড়ে। দূরে মুরগী ডাকে। অমূল্য বোঝে তিন প্রহরের ডাক। বাপকে ঠেলা দেয়—'বাবা, লোকে সব কুড়িয়ে নিবে যে।' ঈশান আর পারে না। উঠে বসে লণ্ঠনটা জ্বালে। সংগে যেতে হবে না। ঘরে বসে থাকলেই চলবে। অমূল্য বেরিয়ে আসে বাইরে। প্রথমে ছোটে ছোড়দি পুকুরে, অন্ধকারে গাছের গোড়া হাতড়ায়। প্রথম গাছটাতে কিছু পায় না। জলের ধারের গাছটাতেও পড়ে নি। অমূল্য চাঁদের আবছা আলোয় দেখে জলে একটা তাল ভাসছে। প্যান্টের সুরকিটা খুলে লাঠি নিয়ে জলে নেমে যায় অমূল্য। একটা নয়, দুটো। তুলে এনে বস্তায় পোরে। কাঁধে প্যান্টটা রেখে বস্তাটা নিয়ে এগিয়ে যায় কল্লে পুকুরের দিকে। কল্লেতে পায় একটা। কল্লে ছেড়ে সরকার পুকুরের দিকে হাঁটে। চুপিচুপি পাড়ে ওঠে। পুকুরে রাখা আছে মাছ চুরির ভয়ে। মাছের সাথে তাল, বেল সবই দেখে। একটা তাল বেলের দামও এখনও আট আনা। অমূল্য এগিয়ে যায় বাঁ দিকের গাছটার তলায়। দুম্ করে একটা তাল পড়ে। রাখাগুলো বলাবলি করছে তালটা কুড়িয়ে আনবে। পায়ের শব্দ পেতেই অমূল্য তাড়াতাড়ি সরে পড়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে বস্তাটা কাঁধ পাল্টায়। রাখাগুলো হাঁক পাড়ে—'কোন শালারে?' টর্চের আলোর ফোকাস মারে। পাড়ের উপর উঠে দেখে ঈশানের বেটাটা তিরতির করে ঘর মুখে ছুটছে।

সকাল হয়ে এসেছে। সরকার মশাই এসে দাঁড়ান চাকর দুটো সংগে নিয়ে। ভোরবেলা খবর পেয়েই ছুটে এসেছেন। হাতে একটা ছাতার বাঁট, লাঠির কাজ করে। কুকুর, ছাগল, গরু, চড়ুই, মানুষ সবকিছুই তাড়ান যায়। সংগে এনেছেন দুটো মুনিস। একজনের হাতে পাঁচমণি একটা ধানের বস্তা, অন্য জনের হাতে বাজার করা থলে। ভোরবেলা, গরম লাগায় ঈশান আর অমূল্য বাইরে এসে শুয়েছিল। সরকার মশাই ঠেলা মারেন লাঠির ডগটা দিয়ে—'ওঠ, বেটা ওঠ'। ঈশান উঠে সরকার মশাইকে সামনে দেখে ভড়কে যায়। দূর থেকে মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করে। অমূল্য ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকে। সরকার মশাই বলেন—'কাল শালা মাছ চুরি করতে গেসলি?' ঈশান আরো ভড়কে যায়। বলে—'মাছ কোথায় বাবু? আমি তো কিচ্ছু জানি নি!'

—'কিচ্ছু জান না! তোল শালা বেটাটাকে।'—ছাতার বাঁটটা নিয়ে তেড়ে আসেন।

ঈশান বোঝে বেটা তাল কুড়োতে গেছল। দোষ মকুব হবে ভেবে বলে—'আমি যাইনি বাবু, মা মনসার দিব্যি বলছি। বেটাটা হয়ত তাল কুড়ুতে গেছল।'

—'বার কর বেটা তাল'—গর্জে ওঠেন সরকার মশাই।—'শালা তাল গাছ কি তোর বাপের? মাসে তিরিশ টাকা দিয়ে দুটো রাখা পুষছি ঘোড়ার ঘাস কাটতে—না? বার কর বেটা তাল।' ছাতার বাঁটটা এক পাক ঘুরিয়ে ঈশানের বুকের উপর তুলে বলেন—'পুকুরের পাড় দিয়ে যাবি তো ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দেবো, ভিটে উঠিয়ে দেবো গাঁ থেকে।'

ঈশান দুটো তাল বার করে আনে ঘর থেকে। সরকার মশাই তেড়ে যান—'মোটে দুটো? দেখতো রে জগাই।'

জগাই ঢুকে বার করে আনে আরো দুটো। চারটে কুড়োয় বস্তার মধ্যে। সরকার মশাই বলেন—'তুই দেখতো মাধাই।'

মাধাই ঢুকে দেখে আর একটা। পাঁচটা কুড়িয়ে নেয় বস্তাটাতে। বাঁটটা তুলে আর একবার ধমক দিয়ে ঘোরেন সরকার মশাই। দু পা এগিয়ে মনটা কেমন খুঁত খুঁত করে। কলিকাল—শাস্ত্রে বলে শুদ্রের রাজত্বি। সব মুখ শোঁকাশুঁকি আছে। গ্রাম-পঞ্চায়েতের লোকেরা আবার এদের মাথায় নিয়ে নাচাচ্ছে। নিজে দেখাই ভাল। ঘরটার ভেতর উঁকি দেন। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। বলেন—'শালা অন্ধকার দেখেছ! চুরি করে রাখার জন্যে অন্ধকার করে রেখেছে। ওই একটা তাল না? যা ভেবেছি তাই। হাঁড়িতালটা মনে হচ্ছে?' খোঁচা মারেন ছাতার বাঁট দিয়ে। ঠিক তাই। ছাতার বাঁট দিয়ে টানতে টানতে বলে—'হাঁড়ি তাল, আমার গাছের হাঁড়ি তাল।' ছুটে বেরিয়ে আসেন সরকার মশাই 'বাপরে' বলে চিৎকার করে। পিছনে ছোটে গোখরো। ছোটটা খুলে গেছে। লাঠিটা ফেলে ছুটছেন সরকার মশাই। জগাই মাধাই পেছন ফিরে সাপ দেখেই দে ছুট। সরকার মশাই প্রাণপণ চেঁচাচ্ছেন—'বাবা জগাইরে, বাবা মাধাইরে।' সরকার মশাই বেগতিক দেখে পেছন ফিরে হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচান—'বাবারে, খেলুরে। ঈশানরে, ও বাপ ঈশানরে।'

চেঁচামেচিতে অমূল্য লাফিয়ে ওঠে। ঘুরে দেখে বাপ চালের বাঁশটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের সব ঢিলে চামড়া দু'চোখের চারপাশে এসে জড় হয়েছে। বাপ হাসছে। হাসতে হাসতে ছোট্ট একটা ঢিল ছুঁড়ে দেয় সামনের দিকে। সাপটা দাঁড়িয়ে ওঠে ল্যেজের উপর। তুলে গলায় জড়িয়ে ঈশান হো হো করে হেসে ওঠে। সরকার মশাই তখনও ছুটে চলেছেন চেঁচাতে চেঁচাতে—'জগাইরে, মাধাইরে, ঈশানরে, বাপরে...'

কবিতা

রক্তেরও কি মানুষ থাকে না

বীরেশ ঘটক

জমাট বাঁধানো রক্তে পারলে দেখে নিও
প্রতিবিম্ব খুঁজে পাও কি না
পরিজন, বন্ধু ভাই, অথবা
নিজের।

আঘাতেই শুধু রক্ত ঝরে,
ঝরে নাকি হৃদ্‌পিণ্ডের গভীরে কখনো?
ভূতগ্রস্ত মানুষেরা রক্তলিপ্সু, কেন না সংকটে
নিরেট রক্তের ভাই পাথরের মতো থাকে
থরে থরে সাজানো পাহাড়ে।
সে পাথরে ঠোকাঠুকি হয়,
রক্ত ঝরে কদাচ কখনো?
রক্তের ভেতরে হাত ডুবিয়ে মানুষ
তুলে নেয় পাথর ও নুড়ি।
জমাট বাঁধানো রক্তে পারলে দেখে নিও
প্রতিবিম্ব খুঁজে পাও কি না—পরিজন-বন্ধু-ভাই
অথবা নিজের।

মানুষ ঝরায় রক্ত, রক্তও কি ঝরায় না মানুষ,
মানুষের রক্ত থাকে, রক্তেরও কি মানুষ থাকে না?

সহজ পাঠ্য

দেবেশ ঠাকুর

আকাশখানা ঢলো ঢলো
বাতাসটুকুও দুলুদুলু
কিসের সময় পড়তে পারিস্?
আমি জানি ওরাও জানে

আমি জানি ওরাও জানে
একটা কিছু হতেই হবে
জিনিসটা কি প্রশ্ন সবার
জিজ্ঞাসাটা উত্তরই তাই

জিজ্ঞাসাটা উত্তরই তাই
নইলে হঠাৎ বৃষ্টি কেন!
মাটির ধারা পাহাড় চড়ে
পাহাড়টা ভাই নেতিয়ে এলো

পাহাড়টা ভাই নেতিয়ে এলো
এক্ষুণি নয়—অনেক শ্রমে
অনেক ছেনি, অনেক জলে
এবার সোজা পাহাড় চড়া

এবার সোজা পাহাড় চড়া
আরও সোজা লাঙল টানা
সবুজ বৌ-এর বুক জড়িয়ে
আরও সহজ বেঁচে থাকা।

একা নয়, মিলেমিশে থাকা

গৌতম ঘোষ দস্তিদার

একটি কুমারী মেয়ের দ্যাখা পেয়ে আজ সকালে অদ্ভুত
মন-ভালো টের পেয়ে যাই, যেমত পাওয়া গিয়েছিল
সেই একান্ত কোপাইয়ের রুগ্ন শরীর ছুঁয়ে একদিন,
তেমনই আজ প্রত্যুষে আমাদের ব্যক্তিগত মনোকষ্ট, ভালো লাগা
একাকার হ'য়ে একটি সুন্দর ভোরের আবির্ভাবে
কেমন স্থির হ'য়ে থাকে এই বেঁচে থাকা একটি
টলটলে কবিতার মতো

এই ধূল্যবলুণ্ঠিত জীবনের সব গ্লানি ঝেড়ে ফেলে
আজ সকালে আমি সিংহের মতো রোঁয়া ফুলিয়ে
একটি পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্যে
ব্যক্তিগত দুঃখ-টুঃখ ফুৎকারে ভাসিয়ে দিয়ে
অই অসীম মেঘের জন্যে রূপান্তরিত হ'তে চাই
অবিকল মানুষের মতো, মানুষের সাথে, একা নয়,
মিলেমিশে যেতে..

দিল্লীর অষ্টম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব : কয়েকটি কথা

উৎপলেন্দু চক্রবর্তী

'The world is one family'— লিখিতভাবে এই শ্বাশ্বত বাণীটি ছিল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মূল লক্ষ্য। দু সপ্তাহ ধরে, দশটি প্রেক্ষাগৃহে, একশো পঁচিশটি (১২৫) বিদেশী ছবি এবং আটত্রিশটি ভারতীয় ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে বহু অর্থ ব্যয়ে, 'Vasudhaiva Kutumbakam' মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটলো অষ্টম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের, রাজধানী নয়া দিল্লীতে।

সামগ্রিক বিচারে যেটা সহজেই লক্ষ্যণীয় সেটা হোলো এ দেশের সংবিধানের বা প্রশাসনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হোলো, যে বাণী যত বেশী উচ্চারিত হয় কাজটাও ঠিক তত বেশী বিপরীত হয়। ফলে এই শাসন-কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত ডাইরেক্টরেট অফ ফেস্টিভ্যাল আর কতদূর অগ্রসর হবেন? সুতরাং উৎসবের জাঁকজমক এবং তার বাহ্যিক আবরণে যত বড় বড় হরফেই সংস্কৃত শ্লোক বা বাণী লেখা থাক না কেন যে উৎসবের চলচ্চিত্রের শৈল্পিক মান নির্ণয়ের দায়-দায়িত্ব এবং উৎসব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মূলত আমলাদের হাতে আবদ্ধ থাকে সেখানে ফাঁকা গৌরব প্রদর্শনের তাগিদটা যত ভালভাবে অনুভব করা যায় ঠিক ততটাই উপলব্ধি করা যায়—এই চলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গে সাধারণ দর্শক, চলচ্চিত্রকার, চলচ্চিত্রের কলাকুশলী ও শিল্পীদের মান উন্নয়নের ব্যাপারটা খুবই গৌণ। ফলে ফেস্টিভ্যাল যায়, ফেস্টিভ্যাল আসে—পড়ে থাকে দর্শক সাধারণ, তাঁদের অনুন্নত চলচ্চিত্র চেতনা নিয়ে।

কেন এই অনুভূতি? একেবারে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে গুটি কয়েক কথা বলার প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে। কারণ দেশের এবং দশের অর্থে অনুষ্ঠিত হয় এই চলচ্চিত্র উৎসব। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় গৌরব ও উন্নতির ঢ্যাঁরা পেটাবার জন্য এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবের আয়োজন। শুধু তাই নয়, ভারতীয় চলচ্চিত্র কতটা সমৃদ্ধির পথে চলেছে এবং সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কী ধরনের গৌরবজনক ভূমিকা গ্রহণ করেছে সেটাও পরোক্ষভাবে উৎসবের প্রচ্ছন্ন প্রচার হোয়ে দাঁড়ায়। অথচ উৎসবের মূল লক্ষ্যের ধার-কাছ দিয়েও যে কর্মকর্তারা হাঁটেন না এটা ক্রমশ পরিষ্কার হোয়ে উঠছিল। কিন্তু এ-বছর একেবারে গোড়া থেকেই অর্থাৎ পুরোহিতের প্রথম মন্ত্রপাঠেই গণ্ডগোল দেখা দিল।

এত বড় একটা উৎসবের আয়োজন করতে যে সময় ব্যয় করা উচিত ডাইরেক্টরেট তা কোন বছরই করেন না,—এবারে তারা কাজ শুরু করেছিলেন নভেম্বরে। অর্থাৎ মাত্র দু'মাস আগে থেকে। সুতরাং গোলমাল বা বিশৃংখলার পূর্বাভাস পাওয়া গেছিল গোড়া থেকেই।

কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর যেটা সেটা হোলো এ'দের ছবি নির্বাচনের পদ্ধতি।

উৎসবে প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ থাকে (১) কমপিটিটিভ (২) ইন্ডিয়ান প্যানোরমা (৩) ইনফরমেশন সেকশন।

প্রথমটির জন্য থাকে জুরি বোর্ড, দ্বিতীয় দু'টির জন্য থাকে প্যানেল কমিটি। উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে কিন্তু জুরি বোর্ডের মেমবাররা এ দেশে এসে পৌঁছান নি—এ জাতীয় ব্যাপার ঘটেছে বহুবার, এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়।

আর প্যানেল কমিটির সদস্যারা দু'একজন ছাড়া যাঁরা নির্বাচিত হন তাঁরা হয় ভয়ানক প্রাদেশিক বা উন্নতমানের ছবি নির্বাচনের জন্য যে ধরনের যোগ্যতা ও বোধবুদ্ধি দরকার তা তাঁদের নেই। যার ফলে ছবি নির্বাচনের ভেতর এমন একটা অসংলগ্ন জগা-খিচুরি ব্যাপার থাকে যা দেখে মনে হয় এই 'ফাজলামি'র কী দরকার ছিল, অন্ততঃ যে উৎসবের সঙ্গে এই গরীব দেশের ৫০ লক্ষ টাকার রাজস্ব জড়িত। যেমন ধরুন এবারের ইন্ডিয়ান প্যানোরমায় পশ্চিমবাংলা থেকে যে চারটি ছবি নির্বাচিত হয়েছিল সেগুলি হোলো—(১) সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' (২) মৃণাল সেনের 'আকালের সন্ধানে' (৩) তপন সিংহের 'বাঞ্ছারামের বাগান', (৪) তরুণ মজুমদারের 'দাদার কীর্তি'। এই ছবি নির্বাচন প্রসঙ্গে Director of Festivals-এর মন্তব্য : "The 21 films in the Indian Panorama this year, Mr. Raina feels, reflect the improving standards of young Indian film makers."

এই মন্তব্য কি পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত ৪টি ছবির ক্ষেত্রে খাটে? এক সময় উৎসব কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন যে, এই বিভাগে ভারতবর্ষের নানান প্রদেশের তরুণ এবং উঠতি পরিচালকেরা প্রাধান্য পাবেন। কিন্তু কার্যতঃ সেই মনোভাব অনুপস্থিত। দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করুন শৈল্পিক মান নির্ণয়ের মাপকাঠিটা—'হীরক রাজার দেশে'র পাশে 'দাদার কীর্তি', 'আকালের সন্ধানে'র পাশে 'বাঞ্ছারামের বাগান'—এরই নাম improving standard? আসলে যে ছবিটা পরিষ্কার হোয়ে ওঠে সেটা হোলো এ-সব কমিটি-টমিটি কোনো ব্যাপার নয়, দু'একজন প্রতিষ্ঠিত পরিচালক ছাড়া গোটা ব্যাপারটাই নির্ভর করে দিল্লীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, তদ্বির-তদারক এবং আমলাদের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর ঠিক যেভাবে delegate হওয়ার সুযোগটিও পাওয়া যায়। যাঁদের প্রকৃত অর্থে চলচ্চিত্র দেখার, উৎসবে প্রতিনিধিত্ব করার দাবী ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে তাঁদের কতজনকেই না 'ফালতু' লোক হয়ে ঘুরতে দেখেছি আর তারই পাশে অমুক অফিসার বা

তমক ডাইরেক্টরের অনুমোদন নিয়ে বীরদর্পে বুকে ব্যাচ পরে গুচ্ছের লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রতিনিধি হিসেবে যাদের কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই।

আরও ভয়াবহ দৃশ্য চোখে পড়বে যখন প্রতিনিধিদের স্তর থেকে সাধারণ দর্শকদের দিকে অর্থাৎ অ-বুদ্ধিজীবীদের দিকে তাকাবেন। তাঁরা বহু জায়গায় গন্ডগোল করেছেন। তাঁদের দাবী: আমরা আরো সেকস চাই। যেখানেই খোলাখুলিভাবে যৌনদৃশ্য দেখার সুযোগ ঘটে নি সেখানেই দর্শকরা ক্ষুব্ধ হোয়েছেন, শো বানচাল করেছেন এবং জোর করে টিকিটের পয়সা ফেরত নিয়েছেন। এই বিকৃত চাহিদা ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার জন্য পুলিশ ডাকলে চলবে কেন? দর্শকের এই বিকৃত রুচি তৈরী করেছে কে? ফেস্টিভ্যাল মানেই সেকসের ছড়াছড়ি এমন মানসিকতা তাদের মাথায় দীর্ঘকাল ধরে ঢুকিয়ে আসছেন কারা? Directorate-এর লোকেরাই এই বিকৃত চাহিদার জন্মদাতা। অথচ প্রতি বছরই এর পাশাপাশি তাঁরা ঘোষণা করে চলেন 'এবার তৃতীয় বিশ্ব থেকে অনেক ছবি আসবে।' হ্যাঁ, এবার এসেছিল। কিন্তু জীবন-চেতনাসমৃদ্ধ ছবি একেবারেই ছিল না। আসলে কূটনৈতিক সম্পর্কের তাগিদে তৃতীয় বিশ্বের ছবি আনলে কি আর যথার্থ শিল্প-সম্মত ছবির আমদানি ঘটে? তাছাড়া, ব্যবসার দিকে তাকিয়ে সচেতনভাবেই সেই সব ভাল ছবি আনা হয় না যা দর্শকের মান উন্নত করতে পারে। আর তারই খেসারৎ দিতে হয়েছে নির্লজ্জের মতন—বিদেশী প্রতিনিধি, সমালোচক ও জুরি মেম্বারদের কাছে—তারিখটা ছিল ৬ই জানুয়ারি। খোদ বিজ্ঞান ভবনে শো। সুইডিশ-স্প্যানিশ ছবি 'দি সাবিনা' দেখানো হবে। বিজ্ঞান ভবনে একমাত্র ডেলিগেট আর সাংবাদিকদের জন্য আসন সংরক্ষিত। কিন্তু ছবি প্রদর্শনের পূর্বেই গরম হাওয়া বইল: সুইডিশ-স্প্যানিশ ভেনচার যখন, তখন নিশ্চয়ই জোর সেক্সের ব্যাপার আছে ছবিতে। সুতরাং হলে তিল ধারণের জায়গা নেই। ছবিও শুরু হোলো। হঠাৎ বাইরে বিকট আওয়াজ; বন্ধ দরজায় দমাদ্দম লাথি; সামনের দরজাতে চিৎকার চ্যাঁচামেচি। হুড়মুড় করে একদল লোক ঢুকে বসার জায়গা খুঁজতে লাগলো—তাদের কারও হাতে নগদ পয়সার টিকিট, অনেকের হাতেই সাংবাদিক-কার্ড। মেঝেতে বসে পড়লেন অনেক মহিলা। বিশৃঙ্খল পরিবেশেই 'কমপিটিশন বিভাগে'র ছবি চলতে থাকলো। এখন প্রশ্ন হোলো, এই অতিরিক্ত দর্শকের নগদ পয়সায় কেনা টিকিট এবং সাংবাদিক-কার্ড (press) কে জোগালো? কর্তৃপক্ষ নীরব।

পরের দিন ৭ই জানুয়ারি, ঘটনা আরও চরমে পেঁছলো। সেদিন হাঙ্গেরির পরিচালক জোলতান ফাবরির ছবি 'বালিন্ত ফাবিয়ান মিট্স গড' দেখানো হোচ্ছিল। ছবিটি সম্পর্কে সাংবাদিক ও প্রতিনিধিদের প্রবল আগ্রহ ছিল। কারণ ৭ম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এই জোলতান ফাবরিই পেয়েছিলেন 'স্বর্ণময়ূর' তাঁর 'হাঙ্গেরিয়ানস' ছবির জন্য। কাজেই সেদিনও শো আরম্ভ হওয়ার বহু আগে থেকেই চেয়ার দখল করে বসে আছেন আমন্ত্রিত সমালোচক ও ডেলিগেটরা। কিন্তু ছবি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালকের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। দরজায় লাথি, চিৎকার—সদর দিয়ে শ'খানেক লোক ঢুকে পড়লো—তাদের সবার হাতে ডেলিগেট কার্ড—তারপর জায়গা না পেয়ে টেবিল চাপড়ানি—মৃণাল সেনকে কার সঙ্গে উচ্চ গলায় কথা বলতে দেখলাম; একটু বাদে দোতলা থেকে চিৎকার; তারপর একতলা থেকে চিৎকার 'নো ডেলিগেট, নো শো।' পাল্টা চিৎকার 'ডেলিগেট গো আউট'। এরই মধ্যে মাইকে ঘোষণা চলল: 'আপনারা শান্ত হোন, ছবি দেখানো হবে।' কে কার কথা শোনে। কারা যেন গায়ের চাদর প্রোজেক্টরের সামনে মেলে ধরে গোটা পর্দাটাকে অন্ধকারে ঢাকতে থাকলো; অথচ ছবি চলছে; সে যে কি প্রহসন! ডাইরেক্টরেট-এর অধিকর্তারা ছুটে এলেন, ছুটে এলেন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী বসন্ত শাঠে—তিনি দর্শকদের শান্ত হবার জন্য অনুরোধ করলেন। মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে নানান প্রশ্ন। মন্ত্রী পরিষ্কার জবাব দিতে পারছিলেন না—কারণ নির্দিষ্ট আসন সংখ্যার বাইরে এতগুলো মানুষ কি করে টিকিট বা কার্ড পেল এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া বড় দুরূহ, বড় কঠিন। সে যে দেশেরই মন্ত্রী হন। আমার শুধু একটা কথাই মনে পড়ছিল, যে সরকার একটা Film-Festival চালাতে গিয়ে নাজেহাল হোয়ে পড়ে, discipline রক্ষা করতে পারে না সেই সরকার এতবড় একটা দেশকে কখনও সুশৃঙ্খলভাবে চালাতে পারে? বা তাদেরই মুখে কি পোষায় পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে? কারণ এতো শুধু দুটো দিনের ঘটনার বর্ণনা, এ রকম যে আরও কত অঘটন ঘটেছে যার সংখ্যা অগুণতি। পৃথিবীর আর পাঁচটা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এমন ঘটনার নজীর নেই।

জনসাধারণের অর্থে অনুষ্ঠিত আমাদের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলি, চলচ্চিত্রের মতন একটি শক্তিশালী মাধ্যমকে যদি 'অগ্রগতি'র নামে এইভাবে বিশ্বের দরবারে এগিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তা জাতীয় জীবনের সুস্থ বিকাশের পরিপন্থী হোতে বাধ্য। সুতরাং আজ বাস্তববাদী সুস্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং সুস্থ চলচ্চিত্র-চেতনার প্রসারের জন্য সমস্ত চলচ্চিত্র শিল্পী, কলা-কুশলী, পরিচালক ও সংগঠনগুলিকে অবশ্যই সতর্ক ও সচেতন হোয়ে দাবী তুলতে হবে যে, ফেস্টিভ্যাল যদি তার মূল লক্ষ্য থেকেই সরে দাঁড়ায়, সাধারণ দর্শক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে এর সাংস্কৃতিক মূল্যটা কোথায়?

ময়না তদন্ত: ঝড় আসছে

ঘটনা এই যে, তরুণ চিত্র-পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তী'র 'ময়না-তদন্ত' দিল্লীর অষ্টম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে পরিত্যক্ত হয়েছিল—আমলা শাসন এবং প্রতিষ্ঠানবাজী এবং কতিপয় বৃদ্ধ চলচ্চিত্র-বোদ্ধা ছবিটির কারণে স্বস্তি-বোধ না করায়ই একজন তরুণ তুর্কী'র প্রতিভা, শ্রম এবং স্বপ্ন সাময়িক হতাশার চোরা-বালিতে ডুব পেরেছিল। যদিও আনন্দের বিষয়, কিছু পরেই ঘটনার গতি অন্য দিকে গড়িয়েছে। জাতীয় চলচ্চিত্র-প্রতিযোগিতায় 'ময়নাতদন্ত' তার স্ব-শক্তিতে ভাস্বর হয়েছে। সাহেবদের হাত-তালির কারণেই হয়তো দেশীয় বিচারকমণ্ডলী ছবিটিকে দ্বিতীয় বার অবহেলা করতে সাহসী হন নি। সম্প্রতি খড়দা সিনে ক্লাবের একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে উৎপলেন্দুর কাছে তাঁর ছবি তৈরির নেপথ্য সুখদুঃখের কাহিনী এবং চলচ্চিত্রোৎসবে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ শোনার পর দেখলাম 'ময়নাতদন্ত'। এর আগে 'মুক্তি চাই'-নামে তথ্যচিত্রটিতে তাঁর যে ব্যাঘ্র-মনস্কতার পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম, তাই আরো নতুনভাবে, তীব্রভাবে তাঁর প্রথম কাহিনীচিত্রে আদ্যোপান্ত ফুটে উঠতে দেখলাম।

একটি উপজাতি সমাজের পটভূমিকায় ময়নাতদন্তের কাহিনী-বিস্তার। দরিদ্র উপজাতি সমাজের এক অসহায় বিধবার দুরন্ত ছেলে ভোলা শবর—বান্ধবী চিন্তার সাথে আদাড়ে-বাদাড়ে, পাহাড়ে-জঙ্গলে বাঁশি বাজিয়ে, হেসে-খেলে যার দিন কাটে স্বচ্ছ জলের মতো। হঠাৎ একদিন সরকারী সংরক্ষিত বনভূমিতে অকারণে বনরক্ষীর হাতে প্রহৃত হয়ে আরো শাস্তি পেতে সে জমিদারের 'হাতুয়া' (বন্ডেড্ লেবার) হয়ে যায়। মা এবং প্রেমিকার কারণে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা তাকে পীড়িত করলেও জমিদারের চাকররূপে তাকে তৃপ্ত থাকতেই হয়। কেননা তার তখন একটাই

আশা, জমিদার তাকে মিলিটারির চাকরি করে দেবে। অন্যদিকে ভোলার সাথে স্থানীয় সাঁওতালদের সখ্যতা ক্রমশ একটা বিশেষ গাঢ়তায় পৌঁছে যায়। তাই জমিদার যখন সাঁওতালদের উদ্বাস্তু করার উদ্দেশ্যে তার হাতে রাইফেল তুলে দিতে চায়, তখন ভোলা তা প্রত্যাখান না করে পারে না। জমিদারের থাবা থেকে মুক্তি এবং প্রেমিকাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্নে তাকে নিয়ে দূরে কোথাও পালানোর পরিকল্পনা করে সে। কেননা চিন্তাকে কেড়ে

নেবার জন্যে স্ব-বর্ণের এক 'উপযুক্ত' বৃদ্ধ পাত্র ইতিমধ্যেই নির্বাচিত। ভোলার স্বপ্ন আছে, অথচ নিজের পায়ের তলার মাটির অভাবে চিন্তার মুখোমুখি হলে সে খুব বেশি ভীত হয়ে যায়। আর এই সময়ই হঠাৎ একদিন এক বনরক্ষীকে বনের মধ্যে অসহায় কাঠ কুড়োনি মেয়ের সাথে পাশবিক হওয়ার কালে তাকে প্রচণ্ড ক্রোধে প্রহার করে ভোলা, সরকারের ঝোলানো নিষেধাজ্ঞার সাইনবোর্ড বন্দুকের গুঁতোয়, লাথিতে ভেঙে চুরে তার রুদ্ধ ক্রোধকে প্রকাশ করে। ফলত তাকে দু' বছরের জন্যে জেলে যেতেই হয়। তারপর যখন সে ফিরে আসে তখন তাকে আর আগের ভোলারূপে সনাক্ত করা যায় না। কংকালসার যুবকটিকে জেলখানা উপহার দিয়েছে এক কঠিন পেটের ব্যাধি। ঘরে ফিরে তার তখন একা, অসহায়, ক্ষুধার্ত, পরান্নজীবী হয়ে ধ্বংসস্তূপের মতো শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। বৃদ্ধা মা অবশেষে, দীর্ঘ অনাহারের পর একদিন শহুরে পিকনিকবাবুদের কাছে সারাদিন গতর খাটিয়ে একথালা এঁটো ভাত নিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু তখন ভোলা আর নেই। বনের মধ্যে সে পড়ে আছে ঠাণ্ডা মৃতদেহ হয়ে। বন-কর্তৃপক্ষ ভোলাকে তবু ছাড়ে না। শেষ শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে তার মৃত্যু সন্দেহজনক, এই অহেতুক সন্দেহে তার মৃতদেহ থানায় পাঠায়। সেখান থেকে ভোলা যায় ময়নাতদন্তের টেবিলে। ভোলার পেট কেটে দ্যাখা হবে তার মৃত্যুর কারণ। আর বাঁশে ঝোলানো ছেলের লাশের পিছু পিছু থানায় পৌঁছয় ভোলার বৃদ্ধা মা। থানার দুয়ারে দাঁড়িয়ে সে উন্মত্ত বাঘিনীর মতো চেঁচায় : 'কি পেলে তোমরা, আমার ছেলের পেট চিঁড়ে, পেলে একমুঠো ভাত? পেলে কি তোমরা?'... ক্যামেরা তার মুখের ওপর স্থির হয়ে যায়। ছবি শেষ হয়। প্রশ্নটা থেকেই যায়।

আমরা অপুকে চিনতাম। চিনতাম নিশ্চিন্দিপুর গ্রামকে। সেই অপুই যেন পঁচিশ বছর পর ভোলা হয়ে ফিরে এসেছে। অপুকে জোর করে ইস্কুলে পাঠানো হয়েছিল, ভোলাকে তার মা আর জোতদারের লোক ছাতুরা হতে বাধ্য করে। সত্যজিতের বামুনপাড়ার সীমাবদ্ধ গণ্ডি ছাড়িয়ে উৎপলেন্দু অধিকাংশ মানুষের সমাজে স্থাপন করেছেন তার নায়ককে। সত্যজিৎ থেকে উৎপলেন্দু—বাংলা ছবির এই ধারাবাহিকতায় 'ময়নাতদন্ত' যে শুধু একটি বিশেষ ছবি-সংযোজন তাই নয়, বছর পঁচিশের সামাজিক পরিবর্তন অবশ্যই নঞর্থে এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা উজ্জ্বল ফুটে ওঠে উৎপলেন্দুর স্বচ্ছ সেলুলয়েডে।

ডিটেইলস-এর নিপুণতায়, দৃশ্যাবলীর শৈল্পিকতায় আবহ-সঙ্গীতের ব্যঞ্জনায়, চরিত্র এবং ঘটনার শক্তিশালী টানাপোড়েনে, আঙ্গিনয়িক উৎকর্ষতায় 'ময়নাতদন্ত' পথের পাঁচালির যথার্থ উত্তরসূরী হয়ে ওঠে।

অভিনয় এই ছবির এক পরম সম্পদ। কেননা, ছবিটিতে কেউই তথাকথিত অর্থে 'অভিনয়' করেন না। যদিও অধিকাংশ শিল্পীই নাট্যজগতের বাসিন্দা তবু অভিনয়ে কোন নাটুকেপনা নেই। নেই মোটা দাগের চেষ্টাকৃত অভিনয়। শিল্পীরা এখানে শিল্পী নন, ছবির চরিত্র—এক আদিবাসী অধ্যুষিত পাহাড়তলির মানুষ-জন। আলাদা ভাবে কারো নামোল্লেখ ঈষৎ অনুচিৎ হলেও নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত (ভোলা), রেবা রায়চৌধুরী (ঐ মা) ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় (জোতদারের প্রথম বউ)—প্রমুখের অভিনয় ছবি দ্যাখার কয়েক মাস পর এখনো স্মৃতিতে জ্বলন্ত।

ছবিটিতে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়তো আছে। আছে সত্যজিৎ এবং ঋত্বিকের কিছু স্পষ্ট প্রভাব। কিন্তু সামগ্রিকতার কাছে সে-সব খুব তুচ্ছ হয়ে যায়। ছবিটির চিত্রনাট্যে এমন একটা ঘন-পীনদ্ধতা আছে যে, অন্যান্য কলাকৌশলগত বিচ্যুতি আমাদের শেষপর্যন্ত আর মনে থাকে না। ছবিটিতে একজন তরুণ পরিচালকের প্রবল জীবনবোধ এবং বিশ্বাস কোন শ্লোগান না তুলে, পরম জীবন-নিষ্ঠায় হয়ে ওঠে এক অনুপম শিল্পকাজ।

এইসব দেখেশুনে 'ময়নাতদন্ত'-কে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রবাহে একটি নতুন মাইল-স্টোন রূপে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়। আর ছবিটি দেখে একটি কথাই শুধু মনে হয় যে, একদল তেজী ঘোড়-সওয়ার সব বাধাবিঘ্ন দু'পায়ে মাড়িয়ে ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ছেন ছবির জগতে। আগামী দিনে ছবি আর আফিম ছড়াবে না; তেলেভাজা খাওয়াবে না। ছবি-শিল্প আমাদের বেঁচে থাকার সাথে নিবিড়ভাবে ওতপ্রোত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং হে বৃদ্ধ ছবি-ব্যবসায়ীগণ, আপনারা এখনই বাণপ্রস্থের কথা ভাবুন, আর দর্শককুল, আপনারা আপনাদের ছবি-রুচিকে পাল্টাবার প্রচেষ্টায় এখনই অঙ্গীকারবদ্ধ হোন। কেননা ঝড় আসছে। ঝড় আসবেই।

গৌতম ঘোষ দস্তিদার

লোক-চিত্রকলা

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

ফুল বলে ধন্য আমি

যে সুন্দর ফুলের রূপ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে ঘর সাজাই তার মনের কথা জানার চেষ্টা আমরা কতটুকুই-বা করি। দেবতার পুজোয় যাকে আমরা অর্পণ করি, বিভিন্ন উৎসবে যেমন অন্নপ্রাশন, জন্মদিন পালন ও বিয়েতে যার প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন মানুষের মৃতদেহ সাজাতেও ফুরিয়ে যায় না। কোন ভালবাসা যা মানুষের মনের মধ্যে জমে থাকে তার প্রকাশও অনেক সময় একটি ফুলের মালার মধ্যে দিয়েও ঘটে থাকে। রবীন্দ্রনাথের কথায় তাই বলা যায়,

'হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তারপরে হায়
ফেলে দিয়ো যদি সে ফুল শুকায়।

বছর পাঁচেক আগে দিল্লির সমাচার এক সংবাদ শুনিয়েছিল এক গোলাপফুল সম্পর্কে। গোলাপটির বয়স নাকি ন'শ বছরের কাছাকাছি। হ্যাম্পসায়ারের একটি গীর্জার দেয়াল থেকে গোলাপটি পাওয়া গেছিল। ফুলটি ছিল শুকনো আর তাতে অনেক পাপড়ি ছিল। সঙ্গে ছিল একটি ডাল ও কয়েকটি পাতা। শুধু তাই নয় দিল্লির আরেকটি খবরে জানা গেছে যে বিজ্ঞানীরা ফুলের লিঙ্গ পরিবর্তনও শুরু করে দিয়েছেন। মানুষের লিঙ্গ পরিবর্তনের কিছু কিছু খবর কাগজে মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে। এই পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে এইসব ক্ষেত্রে। কিন্তু ফুলের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে কিছু হর্মোণ প্রয়োগ করে স্ত্রীজাতের ফুলকে পুরুষ-জাতে এবং এর বিপরীতটাও করা সম্ভব হচ্ছে।

পৃথিবীর সব ফুলের রঙই সুন্দর নয়। তবে সামগ্রিকভাবে ফুলকে সৌন্দর্যের প্রতীক বলা যেতে পারে। সুন্দর ফুলের মধ্যে থাকে ফ্লেভোনয়েড (Flavonoid) এবং টারপিনয়েড (Terpinoid)। ফুলের বিভিন্ন রঙের জন্য ক্রোমোপ্ল্যাস্ট, অ্যানথোসায়ানিন প্রভৃতি রঞ্জক পদার্থ দায়ী। উদ্ভিদ প্রজননের একটি নির্দিষ্ট অঙ্গ হচ্ছে ফুল। যখন পরাগের দানা গর্ভমুণ্ডের ওপর জমা হয়, তখনই ফুলে ফল ধরার সুযোগ ঘটে। পরাগ মিলনের জন্য জল ও বায়ুরও ভূমিকা আছে। কোন কোন ফুলে দেখা গেছে যে সেখানে স্বয়ং পরাগমিলন ঘটে। এই ফুলগুলি সাধারণতঃ ছোট আকারের হয়। এদের পাপড়ি খোলে না। স্বয়ং পরাগ মিলন পদ্ধতি যেহেতু খুব সুখের নয়, তাই একই গাছের এক ফুল অন্য ফুলের পরাগ নিতে সহজে চায় না। এই কারণে এ ধরনের পরাগ মিলন খুব কম সময়েই ঘটে। তীব্র গন্ধযুক্ত ফুলগুলি দেখা গেছে যে গুবরে পোকার সাহায্যে পরাগ মিলন ঘটায়। ফুলের মধ্যে যে ব্যাপারই থাক না কেন, তার থেকে যদি গন্ধ বেরিয়ে আসে, যাতে মানুষ মুগ্ধ হয়, তবে ফুলের কথা সত্যি হয়ে উঠবে। তখন 'ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মনে মেতে' এই গান গাইতে মন যেন আনচান করে উঠবে।

মানুষের চেয়ে পোকামাকড় ফুলকে ভালভাবে চেনে। মানুষ কোন ফুল ভাল লাগলে তা গাছ থেকে ছিঁড়ে নিজের কাছে রাখতে চায় আর পোকামাকড় তা না করে নিজেরা ফুলের মধ্যে এসে পড়ে আর তার গন্ধে মোহিত হয়ে যায়। যে সব ফুলের রূপ নেই, তাদের ক্ষেত্রে গন্ধই বেশী প্রাধান্য পায়। এই গন্ধ মানুষ ও পোকামাকড় সবাইকে আকর্ষণ করে থাকে। ফুলে গুবরে পোকা ছাড়া আর যারা ছুটে আসে তাদের মধ্যে আছে প্রজাপতি, মাছি, মৌমাছি, বোলতা প্রভৃতি। কোন কোন ফুলে বেশ সুগন্ধ থাকে আবার কোনটায় মোটেই গন্ধ পাওয়া যায় না। একে প্রকৃতির খেয়াল বলা যেতে পারে। তবে এই খেয়ালীপনার পেছনেও কারণ আছে। সাধারণতঃ যে সব ফুলের গন্ধ তীব্র তাদের রং ততটা উজ্জ্বল নয়, আবার খুব রঙীন ফুলের সুগন্ধও ততটা নয়। ফুলের বর্ণকেও রসায়নবিদ্‌রা ঘুচিয়ে দিতে পারছেন তাদের রাসায়নিক কৌশলে।

সময় আপন তালে এগিয়ে চলে। এর হিসেব রাখার একটা ব্যবস্থাও এখন আছে। তাই নিয়মমতো হিসেবে চব্বিশ ঘণ্টায় একদিন হয়। এই চব্বিশ ঘণ্টাকে আবার ঘড়ির কাঁটা দিয়ে তার ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড সবই জানা যাচ্ছে। কিছু কিছু ফুল আছে যাদের ফোটারও নাকি নির্দিষ্ট সময় আছে। এই সময়ের ছন্দকে মেনে চলতে কনভোলভোলাম ঠিক তিনটের সময় তার পাপড়ি মেলে। ওয়াটার লিলি সাতটায় এবং মেরীগোল্ড ন'টায় ফোটে। সূর্যঘড়ি যেমন সময় বলে দেয়, বিভিন্ন ফুলের যদি ফোটার সময় নির্দিষ্ট থাকে তবে তার থেকেও জানা যাবে সময়কে। তখন প্রকৃতির ছন্দ বিজ্ঞানের সৃষ্টি ঘড়িকে আলিঙ্গন করবে। ফুলের এইভাবে ফোটার গুণের জন্য সে যদি গর্ব করে বলে, 'ধন্য আমি মাটির পরে'—তবে তাকে মর্যাদা অবশ্যই দিতে হবে। আর আলো যখন পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে আমন্ত্রণ জানাতে ফুল বুঝি এগিয়ে আসে। তাইতো কবির কথায় ফুল সায় দেয়, তাই মনে হয় 'ফুলগুলি যেন আলো পান করার শিল্পকরা পেয়ালা।'

আমরা জানি জাফরান থেকে একপ্রকার রং তৈরী করা হয়। এই রং পুডিংয়ের জন্য লাগে। এই জাফরান আবার পাওয়া যায় একপ্রকার গাছের ফুল থেকে। ফুলের আরেকটি ব্যবহার হচ্ছে একপ্রকার মশলা প্রস্তুত করার জন্য। এর থেকে পাওয়া যায় লবঙ্গ। গোলাপজাতীয় এক প্রকার গাছের ফুলের কুঁড়ির মত এরা দেখতে। ফুলের থেকে যে পুষ্পসার পাওয়া যায় তার থেকে পাওয়া যায় আতর এবং বাস তেল। ইংল্যান্ডের ল্যাভেন্ডার ফুল, বুলগারিয়ার গোলাপের আতর আজ সকলেই বোধহয় চেনে। গোলাপজল থেকেও গোলাপফুলের প্রয়োজন আছে। গোলাপ-ফুলের পাপড়ি দিয়ে আতর তৈরী করা যায়। এই আতর তেলের মতন দেখতে। বর্ণ তার পীত। এর মধ্যে থাকে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য। রক্তগোলাপে আবার বিভিন্ন ভিটামিন থাকে। ফুলের এই ব্যাপক প্রয়োগের কথা কিছুটা বোধহয় সে জানে। রূপে, গন্ধে সে সবাইকে মুগ্ধ করে। দেবতার পুজায় তার প্রয়োজন। তাই ফুলের কথা যেন কবির গানেই শোভা পায়।

ডঃ কমল চক্রবর্তী

বইপত্র

আধুনিক চীন বিপ্লবের ইতিহাস (১৯১৯-১৯৫৬)। হো কান্-চি।

অনুবাদ : দ্বিজেন গুপ্ত। রায়-পণ্ডিত পাবলিকেশনস, ৪৪।১বি, বেনেটোলা লেন, কলি-৭০০০০৯। মূল্য—আটাশ টাকা।

প্রথাগত ধারাবাহিক ইতিহাস পাঠের পাশাপাশি যদি নির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ সমাজ পরিবর্তনের প্রশ্ন সম্পর্কিত বিস্তৃত ইতিহাস পাঠের সুযোগ আসে, তবে তা বিশেষভাবে আদরণীয়, শিক্ষাপ্রদ তো বটে। আবার এই বিশেষ ধরনের ইতিহাস যদি বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যনিষ্ঠ এবং বিশ্বাসযোগ্য হয় তবে তা মতাদর্শ নির্বিশেষেই সবিশেষ হার্দ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বাংলা অনুবাদে "আধুনিক চীন বিপ্লবের ইতিহাস" অনুরূপ একটি গ্রন্থ। হো কান্-চি রচিত "এ হিস্ট্রি অব দি মডার্ন চাইনিজ রেভলিউ-শন" গ্রন্থটি ১৯৫৯ সালে পিকিং থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি মূল চীনা ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ্চাত্য ভাষাসমূহ বিভাগের ইংরাজী ফ্যাকাল্টি। বাংলায় অনুবাদ করেছেন দ্বিজেন গুপ্ত। প্রকাশক দাবী করেছেন যে সংশ্লিষ্ট চীনা গ্রন্থটির এটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ। সেদিক থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ-সম্ভারে এটি একটি উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন।

হো কান্-চি রচিত আলোচ্য গ্রন্থটিতে ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫৬ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত চীনের বিপ্লবী জনগণের নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবী সংগ্রামের একটি ধারাবাহিক প্রামাণ্য ও জীবন্ত চিত্র অতি নিষ্ঠা সহকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে। যে সময়কালের কথা (১৯১৯-১৯৫৬) বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে, তাকে স্পষ্টতঃ দু'টি প্রধান কালপর্যায়ে বিভক্ত করা যায়ঃ (এক) ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র আন্দোলন থেকে ১৯৪৯ সালে চীন বিপ্লব সমাধা হবার প্রাক্-পর্যায় পর্যন্ত, এবং (দুই) ১৯৪৯ সালে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র আন্দোলনের গুরুত্ব হল এই যে এই আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে উন্নিত হবার লক্ষ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সূচিত করে। এই সময়ে নতুন নতুন সামাজিক শক্তিসমূহের উত্থান হয়। শ্রমিক-শ্রেণী, সংঘবদ্ধ ছাত্রসমাজ এবং উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী ইত্যকার শক্তিসমূহের সমাবেশে একটি শক্তিশালী মোর্চার জন্ম হয়। আবার এই ৪ঠা মে'র আন্দোলনেরও একটি ধারাবাহিক ও স্পষ্ট পূর্ব-পরিপ্রেক্ষিত আছে, যে পর্যায়গুলি অতিক্রম না করে ১৯১৯ সালের আবির্ভাব ঘটে না। সে পর্যায়গুলি হলঃ ১৮৪০-এর আফিং যুদ্ধ; ১৮৫১-এর তাইপিং যুদ্ধ; ১৮৯৪-এর চীন-জাপান যুদ্ধ; ১৮৯৮-এর সংস্কার আন্দোলন, ১৯০০-এর য়ি হো তুয়ান আন্দোলন; ১৯১১-এর বিপ্লব। এই তাৎপর্যপূর্ণ ধারা-বাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের পথ বেয়েই ঐতিহাসিক ৪ঠা মে'র আন্দোলন (১৯১৯) সৃষ্টি হয়।

আবার ১৯১৯ থেকে ১৯৪৯-এ চীন বিপ্লব সমাধা হবার মধ্যবর্তী কালসমূহেও অধিকতর গুরুত্ব ও তাৎপর্যমণ্ডিত বিপ্লবী অগ্রগতিসূচক ঘটনাবলীর সমাবেশ হয়েছে। যেমন : ১৯২৬-এর উত্তরাভিযান; ১৯২৭—৩৭-এর কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রাম; ১৯৩৫-এ ঐতিহাসিক লং মার্চে লাল ফৌজের জয়লাভ; ১৯৩৭ থেকে ধারাবাহিক জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ। এই বিপ্লবী সংগ্রামগুলির পথ বেয়েই গণ বিপ্লবের দেশব্যাপী বিজয়লাভ সংগঠিত হয় অক্টোবর ১৯৪৯ সালে।

সংগ্রামের উপরোক্ত কালপর্যায় স্মরণে রেখে বোঝা যায় যে আধা-উপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীনা সমাজে (চীনে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশের পর) মৌলিক বিরোধ ছিল সাম্রাজ্য-বাদ ও চীনা জাতির মধ্যে বিরোধ এবং সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে চীনা জনগণের বিরোধ, প্রথমটিই ছিল প্রধান বিরোধ। সামন্তবাদের সঙ্গে আঁতাত করে চীনকে আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজে রূপান্তর করণের সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ার সঙ্গে চীনা জনগণের সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামের প্রক্রিয়া সমতালে এগিয়ে চলেছিল। ১৮৪০ সালের আফিং যুদ্ধ থেকে ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রগঠনের এই ১০৯ বছর সময়ে চীন জনগণ অপ্রতিহতভাবে ও বীরত্বের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক বিপ্লবী সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। বিপ্লব দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল, এবং প্রত্যেক ভাগেরই নিজস্ব ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য আছে; ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পূর্বের ৮০ বছরব্যাপী বিপ্লব ছিল পুরানো ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লব বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিচালিত এবং বিশ্ব-বুর্জোয়া বিপ্লবের অন্তর্গত। ৪ঠা মে, ১৯১৯ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী বিপ্লব নূতন ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের হোতা শ্রমিকশ্রেণী এবং এই বিপ্লব হচ্ছে বিশ্ব-প্রলেতারীয় বিপ্লবের অংশ।

হো কান্-চি প্রণীত গ্রন্থটিতে আলোচ্য সময়কালের বিপ্লবের ইতিহাস বিষয় ও কাল-পর্যায়ের দিক থেকে কীভাবে বিন্যাস করা হয়েছে তা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে, পাঠকদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সৃষ্টির জন্য। পনেরটি অধ্যায়ে বিভক্ত সমগ্র আলোচনা এইরূপঃ ৪ঠা মে'র আন্দোলন ও চীনের কমিউ-নিস্ট আন্দোলনের উদ্ভব (মে ১৯১৯—জুন ১৯২১); চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, চীনা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রসার (জুলাই ১৯২১—ডিসেম্বর ১৯২৩); বিপ্লবী সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন, বিপ্লবী আন্দোলনের উত্থান (জানুয়ারী ১৯২৪—জুলাই ১৯২৬); উত্তরাভিযান। প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে সংকট অবস্থা (জুলাই ১৯২৬—জুলাই ১৯২৭); চীনা বিপ্লবে ভাটা। বিপ্লবী ঘাটি গঠন ও প্রসার (আগস্ট ১৯২৭—সেপ্টেম্বর ১৯৩১); জাপ-

[শেষাংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়]

বিভাগীয় সংবাদ

নদীয়া জেলাঃ

নদীয়া জেলা বিজ্ঞান মেলা '৮১

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও নদীয়া জেলা যুবকরণের পরিচালনায় এবং বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার সহযোগিতায় গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে তিন দিন কৃষ্ণনগর কলেজ অফ কমার্সে 'নদীয়া জেলা বিজ্ঞান মেলা' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই বিজ্ঞান মেলায় ৩৩ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞান ক্লাব থেকে অংশগ্রহণ করে। প্রতিদিন বিকালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী জনসাধারণ বিজ্ঞান মেলা দেখবার জন্য উপস্থিত হন। শেষদিন সন্ধ্যায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে মানপত্র এবং সফলকাম প্রতিযোগীদের মানপত্রসহ পুরস্কার দেওয়া হয়। নদীয়া জেলা বিজ্ঞান মেলার প্রথম ছয় জনকে পূর্বাঞ্চল বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণের জন্য পাঠান হয়।

কৃষ্ণনগর-১—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও কৃষ্ণনগর-১—ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় গত ২৩, ২৪ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী '৮১ তিন দিন কৃষ্ণনগর-১ ব্লকের অন্তর্গত দিগনগর হাই স্কুলে ও দিগনগর পঞ্চায়েত ময়দানে 'ব্লক যুব উৎসব-১৯৮১' অনুষ্ঠিত হলো : এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল এ্যাথলেটিকস্, ভলিবল, কাবাডি, খো-খো খেলা, আবৃত্তি, সেমিনার, বিতর্ক, সঙ্গীত, নৃত্য, তবলা-লহরা, ছোটদের অঙ্কন, একাঙ্ক নাটক, শিশু সংস্থার অভি-প্রদর্শনী ইত্যাদি প্রতিযোগিতা।

কৃষ্ণনগর ১নং ব্লক যুব উৎসবে জনৈকা শিশু প্রতিযোগীকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি পরিমল বাগচীর হাত থেকে পুরস্কার নিতে দেখা যাচ্ছে।

উক্ত উৎসব পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উদ্‌বোধন করেন নদীয়া জেলা জজ মাননীয় শ্রীঅবনীমোহন সিন্‌হা এবং সমাপ্তি দিবসে পুরস্কার বিতরণ করেন নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীপরিমল বাগচী।

উৎসবের তিন দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ক্রীড়া ও শিক্ষানুরাগীদের এবং জনসাধারণের উপস্থিতিতে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল।

ক্রীড়া বিভাগের বিভিন্ন প্রতিযোগীদের ৩৫০ জন এবং সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রতিযোগিতায় প্রায় ৫০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

উৎসবের শেষ দিনে সফলকাম প্রতিযোগীদের প্রত্যেককে পুরস্কারসহ মানপত্র দেওয়া হয়।

করিমপুর—এই ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে সম্প্রতি ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠান-সূচী সম্পন্ন হলো। স্থানীয় পঞ্চায়েত সংস্থার বিভিন্ন শাখার সহযোগিতায় উৎসব প্রাঙ্গণ সার্বিক সফলতা লাভ করে। প্রায় ১০০০ জন প্রতিযোগী নৃত্য, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বিতর্ক প্রভৃতি বিষয়সূচীতে এবং ক্রীড়ানুষ্ঠানের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। মুসলিম বালিকাদের নৃত্যনাট্য এবং প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি একাংক নাটক সমবেত দর্শকবৃন্দের কাছে বিশেষভাবে আদৃত হয়। আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ শম্ভুনাথ মান্ডির অনুপস্থিতিতে তাঁর বাণী পড়ে শোনান প্রধান অতিথি করিমপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।

চাকদহ—গত ১১ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারী এই ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় শিমুরালি উপেন্দ্র বিদ্যাভবন ও শিমুরালি সাংস্কৃতিক সংঘ ময়দানে ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়সূচীতে স্থানীয় বিদ্যালয় ও যুব সংস্থার প্রায় ৮০০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। একাংক নাটক প্রতিযোগিতার আসরটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আনুমানিক ১০,০০০ দর্শক বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচী উপভোগ করেন।

পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন চাকদহ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকনক মৈত্র ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হরিণঘাটা বিধানসভার সদস্য শ্রীননী মালাকার। শ্রীমৈত্র ও শ্রীমালাকার তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে যুব উৎসবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। চাকদহ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসাফিয়ার রহমান ও ব্লক আধিকারিক শ্রীতপন মুখোপাধ্যায় সমবেত অংশগ্রহণকারী সংস্থা ও সুধী দর্শকবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যুব উৎসবের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোচনা করেন। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও মানপত্র দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

হাঁসখালি—সাতাশে ফেব্রুয়ারী। হাঁসখালি ব্লকের দু'দিনের যুব উৎসব শুরু হয় বাদকুল্লায়। বিশিষ্ট অতিথিরা প্রদীপ জ্বালিয়ে, পতাকা উত্তোলন করে, পায়রা উড়িয়ে, শাঁখ বাজিয়ে বিভিন্ন মঙ্গলাচরণের মধ্যে যুব উৎসবের প্রতিবন্ধী দিবসটির শুভ উদ্বোধন করলেন বেলা সাড়ে এগারোটায়।

উৎসবের প্রাক্‌মুখ রচিত হয় সুদৃশ্য যুব মিছিলের মাধ্যমে। তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী কর্ণাঢ্য মিছিলে সমবেত হয়ে উৎসবের দিগঙ্গন—সুরভি অঙ্গনে প্রবেশ করে। তারপর শুরু হয় ক্রীড়ানুষ্ঠান। দুপুর আড়াইটে থেকে কৃত্তিবাস, দ্বিজেন, বিনয়

(বিনয় ঘোষ) ও শিল্লাম মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ শুরু হয় একই সংগে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক মিলিয়ে মোট ৭২৫ জন প্রতি-

হাঁসখালি ব্লক যুব উৎসব অংগণ অভিমুখে মিছিল।

যোগী অংশগ্রহণ করে। উৎসবের বিশিষ্টতার মধ্যে প্রতিটি অনুষ্ঠানের শেষে অভিজ্ঞানপত্র ও পুরস্কার দিয়ে যোগ্যতা ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন সংসদ সদস্যা শ্রীমতী বিভা ঘোষ, বিধায়ক সুকুমার মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস এবং কবি-সাহিত্যিক নিজম দে চৌধুরী, নীরদবরণ হাজরা, অজিত দাস, অধ্যাপক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও দেবদাস আচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্বভারতীয় লোকসংগীত, তরজা গান, নবমী ঘোষ ও সম্প্রদায়ের দেহশৈলী-প্রদর্শন, লোক-রঞ্জন শাখা অভিনীত 'মা' নাটক ও স্থানীয় দুটি সংঘের কুশলী-উদ্যতিতে অভিনীত হয়েছে নাটক। কয়েক হাজার দর্শক এসব আনন্দানুষ্ঠান দুদিন ধরে উপভোগ করেছেন।

হাঁসখালি ব্লক যুবকরণ প্রতিযোগীদের উষ্ণ অভিনন্দন ও অতিথিদের স্বাগত জানিয়েছেন গোলাপফুল দিয়ে; অন্তরঙ্গ শুভেচ্ছার স্মারক হিসেবে।

হাঁসখালি ব্লক যুব উৎসব '৮১-তে যুব উৎসবের সূচনায় প্রতিযোগীদের মার্চপাস্ট

হাওড়া জেলাঃ

বাগনান-২—গত ১৯ থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী দেউলটির চক্-কমলা ফুটবল ময়দানে ক্রীড়ানুষ্ঠান ও বাটুল মহাকালী উচ্চ-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাগনান-২ ব্লক যুব উৎসব-এর শুভ সূচনা হয়। সাংস্কৃতিক বিভাগে ২৭৯ জন এবং ক্রীড়া বিভাগে ৩০২ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। মোট ৫৮১ জন প্রতিযোগীর মধ্যে মহিলা ছিলেন ১৯৬ জন। বিষয়-সূচীগুলির মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও একাংক নাটক প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে আদৃত হয়। প্রায় ৫০০০ দর্শক বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচী ৪ দিন ধরে উপভোগ করেন।

বীরভূম জেলাঃ

রাজনগর—পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও আনুকূল্যে এবং রাজনগর ব্লক যুব অফিসের ব্যবস্থাপনায় রাজনগর ব্লক যুব উৎসব কমিটির পরিবেশনায় এবং লাউজোড় নেতাজী সংঘের সহযোগিতায় ১৩ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ তিনদিনব্যাপী "যুব উৎসব" বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হল। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষকে স্মরণ করে ১৩ই ফেব্রুয়ারী পতাকা উত্তোলন ও শিশুদের মার্চ-পাস্টের মধ্য দিয়ে সকাল ৭-৩০ মিনিটে এই উৎসবের শুভ উদ্বোধন করে স্থানীয় প্রতিবন্ধী হরিজন শিশু শ্রীমান অমর দাস। এই উৎসবের অংগ হিসাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শিশু বিভাগে মোট ২৬ জন সহ প্রায় ৭০০ জন ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী এই উৎসবে অংশ-গ্রহণ করে। ছাত্রদের কবাডি ও ছাত্রীদের খো-খো প্রতিযোগিতায় মোট দশটি দল অংশগ্রহণ করে। এতদ্ব্যতীত এখানে তৃতীয় বৎসর একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় ৮টি দল অংশ গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও কেবল আদিবাসীদের জন্য "লোকনৃত্যের" ব্যবস্থা ছিল। শিশু বিভাগের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হলো দৌড়, চামচ-মার্বেল দৌড়, বিস্কুট দৌড় এবং বালক-বালিকাদের সম্মিলিত 'রিলেরেস', আবৃত্তি ও বসে আঁকা প্রতিযোগিতা।

১৫ই ফেব্রুয়ারী বিকাল ৪টায় প্রথম পর্যায়ের পুরস্কার বিতরণ করেন জেলাশাসক শ্রী এস. এন. মেনন, আই. এ. এস. এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে রাত্রি ১২টায় একাঙ্ক নাটকের পুরস্কার বিতরণ করেন শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের অধ্যাপক শ্রীনিশীথকুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের রিডার শ্রীদীপকচন্দ্র পোদ্দার, অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল, গুসকরা মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান এবং বাতিকার অভেদানন্দ বিদ্যা-পীঠ-এর শিক্ষক শ্রীঅশোকানন্দ গোস্বামী মহাশয়, ইত্যাদি।

সভাপতির ভাষণে মাননীয় বিচারক অধ্যাপক শ্রীনিশীথ মুখোপাধ্যায় গণমুখী নাট্য প্রযোজনার গুরুত্ব বর্ণনা করেন এবং সহজ ও সর্বজনগ্রাহ্য অথচ শিল্পসৃষ্টিময় নাট্য নির্বাচনের আবেদন জানান। সভাতে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ও ধন্যবাদ জানান শ্রীশান্তিকুমার মুখোপাধ্যায়।

লাভপুর—গত ২১শে মার্চ লাভপুর ব্লক যুব উৎসব শিশু ও নারী দিবস দিয়ে শুরু হয়। সকালে শিশুদের ক্রীড়ানুষ্ঠান চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। বিকালে শিশুদের ছড়া বলা, ছবি আঁকা ও আমোদপুর সুকান্ত সব পেয়েছির আসরের অনুষ্ঠান বেশ মনোরম হয়ে ওঠে। সন্ধ্যায় লাভপুর সত্যনারায়ণ শিক্ষানিকেতনের ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য সকলের প্রশংসা অর্জন করে। পরদিন আদিবাসী ও প্রতিবন্ধী দিবসে আদিবাসী-দের দৌড়-ঝাঁপ, রণ্পা, তীরধনুক ছোঁড়া দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। আদিবাসী মহিলারাও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

বিকালে গ্রামীণ খেটে খাওয়া লোকের ভিড়ে বীরভূমের লোক-সংস্কৃতি বোলান গান, ভাদু গান, আদিবাসী নাচ ইত্যাদির মাধ্যমে জমে ওঠে। শেষদিন ছাত্র-যুব দিবসের ক্রীড়ানুষ্ঠানে দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প, ব্যালেন্স রেস, যেমন খুশী সাজো খেলা-গুলিতে প্রচুর ভিড় জমে। সন্ধ্যায় পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন লাভপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীপীযুষ মুখার্জী। বি. ডি. ও. শ্রীসীতাংশুভূষণ হালদারও বক্তব্য রাখেন। সকলকে ধন্যবাদ জানান ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীরণজিত মাইতি। রাত্রিতে মহুগ্রাম যুব গোষ্ঠীর যাত্রানুষ্ঠান 'নাচ ঘরের কান্না' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক তথ্য-চিত্রও পরিবেশিত হয়। যুব উৎসব কমিটি একটি স্মারক পুস্তিকাও প্রকাশ করেন।

বোলপুর—বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে বোলপুর ব্লক যুব উৎসব হয়ে গেল। ২৯ মার্চ থেকে ১লা এপ্রিল বিভিন্ন অনুষ্ঠান স্থানীয় যুবকরা বিশেষভাবে উপভোগ করেছেন। প্রথম দিন শিশু ও নারীদিবসে শিশুদের ক্রীড়ানুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন করেন বোলপুরের অতিরিক্ত মহকুমা শাসক বি. সি. ঘোষদস্তিদার। সকলকে স্বাগত জানান ব্লক যুব আধিকারিক (ভারপ্রাপ্ত) শ্রীরণজিত মাইতি। শিশুদের ছড়াবলা, ছবি আঁকো প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করা হয়। কায়োযোগাচার্য অনিল পালের (বিশ্বভারতী) পরিচালনায় কিশোর-কিশোরীদের ব্যায়াম প্রদর্শন চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় দিনে আদিবাসীদের নানান খেলা দলগতভাবে নৃত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতা উপভোগ্য হয়। পরদিন শ্রমিক-কৃষক দিবস জমে ওঠে ভলিবল, রায়বেশে ও ভাদুগানে। শেষদিন যুব-ছাত্র দিবসে আবৃত্তি, সংগীত, ক্রীড়া, যেমন খুশী সাজো প্রতিযোগিতা হয়। বিকালে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বীরভূমের অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রীপ্রবোধ সেন। বোলপুর-শ্রীনিকেতন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাল ও বি. ডি. ও. শ্রীশিবপ্রসাদ ঘোষও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাত্রিতে মহাধুমধামে বাজি পোড়ানো হয়। শেষে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কৃষ্টি সংসদের সদস্যরা ফ্যাসী-বিরোধী যুদ্ধের পটভূমিকায় 'জোয়া' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

মালদহ জেলা ঃ

পুরাতন মালদহ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও ব্লক ক্রীড়া সংস্থার সাহায্যে পুরাতন মালদহ ব্লক যুব উৎসব ১৩ই মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল পুরাতন মালদহ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। এই উৎসব উপলক্ষে নানান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ফেব্রুয়ারী মাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় মোট ৪৬৭ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয় উৎসবের মূল মঞ্চে। আবৃত্তি (তিনটি বিভাগ), অঙ্কন (দুটি বিভাগ), সঙ্গীত (দুটি বিভাগ), আলোচনাচক্র, বিতর্ক, একাঙ্ক নাটকে মোট ১৯৮ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

১৩ই মার্চ উৎসবের উদ্বোধনী দিবসে ২২টি ক্লাব ও বিদ্যা-লয়ের যুবক-যুবতীগণ বর্ণাঢ্য মিছিল সহকারে পথ পরিক্রমা করে। বিধান সভার সদস্য শ্রীশুভেন্দু চৌধুরী মহাশয় প্রদীপ জ্বালিয়ে মূল উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ১৫ই মার্চ সমাপ্তি দিবসে পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মালদহ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীদুর্গাকিংকর ভট্টাচার্য মহাশয়। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন যে, এই সরকার যুব উৎসবের মধ্য দিয়ে যুব সমাজের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। এই উৎসবের ভিতর দিয়ে সুস্থ সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা যাতে প্রকাশ পায় তার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তিনি বলেন যে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে খুবই আনন্দ হচ্ছে এবং মনে হচ্ছে যেন আজ আমি এদেরই একজন। ভাষণ শেষে তিনি ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতি-যোগিতায় সফল ১৭৪ জন প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। প্রতিদিন দীর্ঘ সময় ধরে বিপুল সংখ্যক দর্শক উৎসবকে সাফল্য-মণ্ডিত করেন। এই একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করে "পুঃ মালদহ দুর্গা অপেরা"। ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে "মঙ্গলবাড়ী গ্রাম উন্নয়ন সমিতি" এবং "হাসিখুশি সংঘ"। ১৫ই মার্চ নাটক শেষে নাটকের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। নাটকের পুরস্কার বিতরণ করেন প্রজেক্ট অফিসার শ্রীচিত্তরঞ্জন মজুমদার মহাশয়।

কালিয়াচক-৩—সম্প্রতি এই ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় এবং সুবিশাল (১২৪০ জন) শিশু সমাবেশের মাধ্যমে ব্লক যুব উৎসবের সূচনা হয়। সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মূল অনুষ্ঠান সূচীগুলিতে মোট ৮৯৩ জন অংশ নেয়। ৩০টি যুব সংস্থা, ২২টি বিদ্যালয়, ৫টি মহিলা সমিতি, ১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও ১৫টি স্টল এই উৎসবে সামিল হয়।

হরিশচন্দ্রপুর-২—যুব উৎসবের প্রথম দিন (২৫.২.৮১) মহা-সমারোহে উৎসবের উদ্বোধন করলেন, মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সামসুল হক মহাশয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, এ. এস. মৈত্র মহাশয়, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, হরিশচন্দ্রপুর ২নং ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনসুর রহমান মহাশয়, শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক সমীর চক্রবর্তী মহাশয়। এছাড়াও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়েরাও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সামসুল হক মহাশয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে "যুব উৎসব" সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং পঞ্চায়েত সভাপতি মনসুর রহমান মহাশয়ও যুব উৎসব "কি ও কেন" এই সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা করা হয়, এবং এর পরেই ১২ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের "বসে আঁকো" ছবি প্রতি-যোগিতা, বিভিন্ন আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও আলোচনা চক্র প্রতি-যোগিতা শুরু হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিন (২৬.২.৮১) শুরু হয় "ক্রীড়া প্রতিযোগিতা"। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন, উচ্চ লম্ফন, ৮০০ মিটার দৌড়, লৌহ বল নিক্ষেপ, খো-খো (মহিলা) ও কাবাডি ইত্যাদি। রাত্রি ৯টার সময় সাদলীচক হাইস্কুল এক নাটক (সোনার কেল্লা) মঞ্চস্থ করেন।

উৎসবের সমাপ্তি দিবসে (২৭.২.৮১) রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুল গীতি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। এইদিনই পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এই উৎসবের সমস্ত বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন, হরিশচন্দ্রপুর ২নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনসুর রহমান মহাশয়। উক্ত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিশচন্দ্রপুর ২নং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক অপূর্ব শংকর মৈত্র মহাশয়, মালদা জেলা পরিষদের সহকারী

সভাধিপতি সামসুল হক মহাশয়, রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব কমিটির সদস্য রঞ্জিত চক্রবর্তী মহাশয়। যুব উৎসব সমাপ্তি দিবসে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন, এবং যুব উৎসব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তন্মধ্যে মাননীয় রঞ্জিত চক্রবর্তী মহাশয় যুব কল্যাণ বিভাগের সমস্ত প্রকার কর্মসূচী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এর পরেই শুরু হয় আমাদের পুরস্কার বিতরণ। প্রায় সমস্ত সংস্থা, ক্লাব, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীই পুরস্কার পেয়েছিলেন। উৎসবের শেষদিন রাত ৮টার সময় স্থানীয় ইয়ুথ ক্লাবের বিশিষ্ট কয়েকজন সদস্য একত্রিত হয়ে এক নাটক (চেক পোস্ট) মঞ্চস্থ করেন। এই প্রথম বৎসর হরিশচন্দ্রপুর ২নং ব্লকে "যুব উৎসব" হওয়াতে যুবক, ছাত্র-ছাত্রীদের তরফ থেকে বেশ উৎসাহ ও সাড়া জেগেছিল। এই তিন দিনের উৎসবে মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৪২০ জন। মোট দর্শক সংখ্যা ১৫০০ জন।

হবিবপুর—গত বছরের মত এবারও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং হবিবপুর ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় সম্প্রতি যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হোল। ৪, ৬ এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী—তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান নানা রকম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে শেষ হয়। এই উৎসবে ব্লকের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আইহো ফুটবল মাঠে ছেলেমেয়েদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষ হয়। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন যুব উৎসব কমিটির স্পোর্টস সাব কমিটির সদস্যগণ। মূল উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ৬ ও ৭ই ফেব্রুয়ারী আইহো হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। মালদা জিলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমানিক ঝা পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। আইহো গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রীরা নৃত্য-সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভাপতিকে বরণ করেন এবং উপস্থিত দর্শকবৃন্দের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। শ্রীঝা স্থানীয় যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে আহ্বান করেন এবং অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করেন।

সন্ধ্যা সাতটায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিভাগের পরিচালনায় ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। রাত্রে গম্ভীরা নৃত্যের মধ্য দিয়ে এ দিনের উৎসবের যবনিকা টানা হয়।

৭ই ফেব্রুয়ারী "বিতর্ক প্রতিযোগিতা"র মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান-সূচী শুরু হয়। ইতিপূর্বে এই অনুষ্ঠানে বিতর্ক প্রতিযোগিতা কখনো হয় নি—তাইতে শিক্ষিত যুবমানসে এ বিতর্ক বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং নতুন উৎসাহের সাড়া জাগায়। এরপর হয় ছাত্রছাত্রীদের এবং সর্বসাধারণের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, মহিলাদের আল্পনা প্রতিযোগিতা এবং মিউজিক্যাল চেয়ার। সন্ধ্যা ৬টায় পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এম. এল. ভগত। এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন আইহো হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণপদ সরকার।

যোগাসন প্রদর্শনী পরিচালনা করেন ঋষিপুরের অসিত সিন্‌হা ভ্রাতৃদ্বয়। বিচিত্রানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হবিবপুরের ব্লক যুব উৎসব শেষ হয়। ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীঅনন্ত দাস যুব কল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে যুব উৎসব প্রস্তুতি কমিটির সদস্যদের, পরিচালকমণ্ডলী, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী এবং উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কালিয়াচক-১—এই ব্লক যুবকরণ ও ব্লক ক্রীড়া সংস্থার যৌথ উদ্যোগে গত ২রা থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এক ব্লকভিত্তিক যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। কালিয়াচক উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে চারদিনব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন করেন উপসমাহর্তা শ্রীপ্রবীরকুমার সেন। এই চারদিন খেলাধুলা, আবৃত্তি, বিতর্ক, অংকন, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ৪২৬ জন। মালদার 'সংলাপ' গোষ্ঠীর 'হয়তো নয়তো' ও ফতেখানি হাই মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের 'ক্যালেন্ত্র স্থানীজ্ঞ ও লেজীম' প্রদর্শনী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অনুষ্ঠানের শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহঃ এ. খালেক ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জেলা জনগণনা আধিকারিক শ্রী বি. আর. ভকত। সমবেত সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীদিবাকর দত্ত।

ইংলিশবাজার—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অধীন ইংলিশবাজার ব্লক যুবকরণ কর্তৃক আয়োজিত ইংলিশ-বাজার ব্লক যুব উৎসব গত ১৩ই থেকে ১৫ই মার্চ '৮১ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শোভানগর জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজে।

১৩-৩-৮১তে সকাল দশটার সময় সংগীত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ ১০ কি. মি. মশাল দৌড় আরম্ভ হয়। এই মশাল দৌড় অমৃতি থেকে শোভানগর অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ হয়। ১ম স্থান অধিকারি মহঃ সিরাজুল-এর মশাল দিয়ে মশাল টাওয়ারে অগ্নিসংযোগ করে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শ্রীশুখেন্দুবিকাশ মণ্ডল, অধ্যক্ষ, শোভানগর জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রী ডি. কে. সেনগুপ্ত (অতিরিক্ত জেলা-শাসক, মালদা) মহাশয় ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলার বিশিষ্ট ক্রিড়াবিদ শ্রীপবিত্র সেন (ডাম্ভুদা)। ঐদিন উদ্বোধন শেষে তাৎক্ষণিক বক্তব্য ও শোভানগর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক 'মা মাটি মানুষ' যাত্রানুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

ইংলিশবাজার ব্লক যুব উৎসবে উচ্চলম্ফন প্রতিযোগিতা।

১৪-৩-৮১ ২য় দিনের অনুষ্ঠানে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, ও গম্ভীরা অনুষ্ঠান হয়। মাননীয় শ্রীশৈলেন সরকার, এম. এল. এ. মহাশয় একটি আলোচনা সভাতে যোগ দেন। আলোচনা সভার বিষয়-বস্তু ছিল স্বাধীনোত্তর যুব সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা। এই বিষয়ের

উপর মাননীয় শ্রীসরকার দৃঢ়কণ্ঠে যুবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা কি হওয়া উচিত তা ব্যক্ত করেন।

১৫-৩-৮১ ৩য় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় ভলিবল ফাইনাল খেলার মাধ্যমে। খেলায় বদ্পুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত চ্যাম্পিয়ান হয় ও শোভানগর রানার্স হয়। এর পুরস্কার বিতরণী সভা আরম্ভ হয় এই সভাতে। মাননীয় শ্রীমানিক ঝা (সভাধিপতি, জেলা পরিষদ) মহাশয় প্রধান অতিথি ও শ্রীসুবোধ ঝা মহাশয় সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। মানিক ঝা তাঁর ভাষণে যুবকল্যাণ বিভাগের কাজকর্ম সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখেন। পুরস্কার বিতরণী শেষে ছোটোদের একটি নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রি ৯-৩০ মিনিটে যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীপুলক বাগচী ও শ্রীস্বদেশরঞ্জন চাকী ব্লক যুব উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এই উৎসবে মোট প্রতিযোগী ছিল ২২৫ জন। এর মধ্যে ১০১ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। এই উৎসবে প্রতিদিন প্রচুর দর্শকের সমাগম হয়। গম্ভীরা অনুষ্ঠান দেখতে ১৪-৩-৮১ তারিখে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয়। রাত্রি ১-২০ মিঃ পর্যন্ত এই গম্ভীরা দেখতে দর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেদিনীপুর জেলা:

বিনপুর ১নং ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে ও পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় স্থানীয় লালগড় রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে গত ১৩-২-৮১ থেকে ১৬-২-৮১ এই চারদিনব্যাপী যুব উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসুধীরকুমার পাণ্ডে মহাশয়। বিনপুর ১নং

বিনপুর ১নং ব্লক যুব উৎসবে মৎস্য বিভাগ কর্তৃক মৎস্য প্রদর্শনী।

ব্লকের অধীনস্ত ৯৩টি প্রতিষ্ঠানের (ক্লাব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমেত) মোট ১৬২৫ জন যুবক-যুবতী এই যুব উৎসবের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অন্যান্য প্রতিযোগিতার সঙ্গে ভলিবল প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা ছিল। এই প্রতিযোগিতায় মোট ২৪টি দল অংশগ্রহণ করে। বিনপুর ১নং ব্লক আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসী ভাই ও বোনেদের জন্য পৃথক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। যেমন আদিবাসী নৃত্য, সংগীত, ক্রীড়া ইত্যাদি। এই যুব উৎসবের মধ্যে প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা ছিল। এই প্রদর্শনীতে কৃষি বিভাগ, মৎস্য বিভাগ, মহিলা সমিতি, শিল্প বিভাগ, পঞ্চায়েত বিভাগ ও বিজ্ঞান সঙ্ঘ থেকে স্টল দেওয়া হয়। এই প্রদর্শনী সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করে। এই যুব উৎসবে রাত্রিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। যেমন নাটক, সংগীত, বাউল ও তর্জা গান ইত্যাদি। এ ছাড়া ছায়াছবি দেখানোরও ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতি যুবক-যুবতীগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীযুক্ত ঋড়েশ্বর সিং, সহ-সভাপতি, মেদিনীপুর জেলা পরিষদ। বিনপুর ১নং ব্লকের সাধারণ মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করায় এই যুব উৎসব ও মেলা যথার্থ সার্থকতা লাভ করে।

খেজুরী—গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮ পর্যন্ত এই ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে ও পরিচালনায় কামারদহ হাসপাতাল ময়দানে যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। ১৭টি বিদ্যালয় ও ৪৩টি যুব সংস্থার মোট ৬৩৬ জন এই প্রতিযোগিতার সামিল হয়। এর মধ্যে ২০৫ জন মহিলা প্রতিযোগী। যুব উৎসব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক এই দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে ১৫০টি পুরস্কার দেওয়া হয়। জেলা জনকল্যাণ সমিতির সদস্য শ্রীশিবরাম বসু পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।

এগরা-২—গত কয়েক বৎসরের মত এ বৎসরও এগরা ২নং ব্লক যুব উৎসব গত ৩০শে জানুয়ারী থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ পর্যন্ত বালিঘাই-এ অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এই ব্লকের পাঁচ শতের অধিক যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। একাংক নাটকগুলি বেশ উপভোগ্য হয়। সফল প্রতিযোগীদের ব্লক যুব অফিস থেকে পুরস্কার ও মানপত্র প্রদান করা হয়। এই যুব উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য স্থানীয় যুবসম্প্রদায় ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে গত বৎসরের মত এই বৎসরও কাঁথি মহকুমার মধ্যে সর্বপ্রথম এই ব্লকে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মোহনপুর—মোহনপুর ব্লক যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় এবং ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে ১১ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলি মোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আসর বসে মোহনপুর ব্লক সংলগ্ন ময়দানে। প্রথম দু'দিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে (শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী সহ) মোট ৪৬৪ জন। ১৩ই ফেব্রুয়ারীর বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় ৭৭ জন। ঐদিন রাত্রে তিনটি সংস্থা একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ৭৭ জন —এ ছাড়া দুটি একাংক নাটক রাত্রের প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় এবং রাত্রি ১০টায় একটি নাটক পদর্শন করা হয়। ১৫ তারিখের বিশেষ অনুষ্ঠান ৬ মাইল দৌড়। ৫৫ জন এতে অংশ নেয়। 'যেমন খুশী সাজো' ছাড়াও বিকেলে একটি আলোচনা সভার বিষয়বস্তু

ছিল 'জনস্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ'। প্রায় ৩০০০ দর্শক অনুষ্ঠানগুলি উপভোগ করেন।

১৫ তারিখের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুশীল কুমার দে এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সভাপতি শ্রীবিভূপদ আচার্য এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও মানপত্র প্রদান করা হয়।

ঘাটাল—গত ১৮, ১৯ ও ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১, নোতুক বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে ঘাটাল ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হল। এই যুব উৎসবে ক্রীড়া, আবৃত্তি, সংগীত, বিতর্ক, বসে আঁকা ও একাংক নাটক প্রতিযোগিতা এবং শিবায়ন পালাগান, মনসার ভাসান গান, পীরের গান, গণসংগীত, আদিবাসী গান ও নাচ, কবি সম্মেলন, মণিমেলা প্রদর্শনী ও ব্রতচারী নৃত্য প্রভৃতি বিভিন্ন অপ্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে মোট যোগদানকারী প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০ জন। অপ্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানগুলিতে মোট ১৭৪ জন অংশগ্রহণ করেন। ঘাটাল মণিমেলা এবং নোতুক বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ব্রতচারীদল উপস্থিত দর্শকদের বিশেষ আনন্দ দেয়। এ ছাড়া, শিবায়ন পালাগান, মনসার ভাসান গান, পীরের গান ও তুষু গান পরিবেশন যুব উৎসবের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। ঘাটাল ব্লকের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় অস্তিত্বপ্রায় লোক সাহিত্যকে প্রকাশ ও প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই উক্ত অনুষ্ঠানগুলিকে যুব উৎসবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যুব উৎসবের শেষ দিনে কৃতী প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আমন্ত্রিত দল হিসেবে 'ঐকতান' গোষ্ঠী কর্তৃক 'গায়েন' এবং মিতালী ক্লাব কর্তৃক 'জিওর্দানো ব্রুনো' নাটক দুটি যুব উৎসবে মঞ্চস্থ করা হয়। তিন দিনে যুব উৎসবে প্রায় ৫০০০ দর্শক ও শ্রোতা উপস্থিত থেকে সংগঠকদের যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছে। ঘাটাল ব্লক যুব উৎসব স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

নয়াগ্রাম—স্থানীয় বালিগেড়িয়া এস. সি. হাই স্কুলে গত ৩০শে জানুয়ারী থেকে ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নয়াগ্রাম ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর জেলা সভাধিপতি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বামফ্রন্ট সরকার কেন এই যুব উৎসবের আয়োজন করছেন তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং প্রদর্শনী ছিল এই উৎসবের অঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে এক বিচিত্রানুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্লকের ৮ জন প্রতিবন্ধী অংশ নেয়। প্রায় দু' হাজার প্রতিযোগী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। আদিবাসী নৃত্য ও গানে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শক সমবেত হ'ন যুব উৎসবের আনন্দমেলায়।

চন্দ্রকোণা-১—গত ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চন্দ্রকোণা-১ ব্লকে "ব্লক যুব উৎসব" প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে জাড়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সম্পন্ন হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি শ্রীঝাড়েশ্বর সিং, সহ-সভাধিপতি, মেদিনীপুর জেলা পরিষদ। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন জাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীরামকিংকর চক্রবর্তী ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য শ্রীগুরুপদ চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীঅসিত চট্টোপাধ্যায় ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আগে এক সুবৃহৎ শিশু ও যুব শোভাযাত্রা জাড়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করে।

চন্দ্রকোণা ১নং ব্লক যুব উৎসবে ভলিবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়।

উৎসবের তিন দিনই ক্রীড়া ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (বিতর্ক, একাঙ্ক নাটক, সংগীত, আবৃত্তি প্রভৃতি) অনুষ্ঠিত হয়। আদিবাসীদের জন্য তীর নিক্ষেপ, মাটির কলসীসহ ব্যালেন্স দৌড়, লাঠিখেলা প্রভৃতি প্রতিযোগিতা নির্দিষ্ট ছিল। এই সকল প্রতিযোগিতা উৎসবের শেষ দিনে জনসাধারণের মধ্যে প্রচন্ড আনন্দের বন্যা এনে দেয়। উৎসবের শেষ দিনে সংসদ সদস্য শ্রীবিজয় মোদক কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত ছিলেন।

চন্দ্রকোণা ১নং ব্লক যুব উৎসবে লাঠিখেলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী একজন প্রতিযোগী।

যুব উৎসবের শেষ দিন (১৩ই ফেব্রুয়ারী) পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান শুরু হয় বেলা চারটায়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধান সভার সদস্য শ্রীউমাপতি চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি মহাশয় সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীঅসিত চক্রবর্তী। ক্রীড়া ও

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬৬ ও ১৩৬ জন।

গত ২রা জানুয়ারী থেকে চন্দ্রকোণা ১নং ব্লকে এক "মহিলা সীবন প্রশিক্ষণ" কেন্দ্রের সূচনা করা হয়। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পাঁচ মাস ধরে চলবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের ১৫ জন প্রশিক্ষণরতা। সীবন শিল্পে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শ্রীমতি উমা রায় এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

২৪-পরগণা জেলাঃ

গাইঘাটা—১৯৮১ ব্লক যুব উৎসব বিগত বছরগুলির ন্যায় এবারও অনুষ্ঠিত হল গত ২৩, ২৪ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী গাইঘাটা হাই স্কুল ময়দানে। গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে যুব উৎসব কমিটির সভাপতি করে একটি মূল কমিটিই এই উৎসব পরিচালনা করে।

এই ব্লকের ৩০টি ক্লাব এবং ৮টি মণিমেলা সংস্থা নিজ নিজ পতাকা এবং বাদ্যযন্ত্র সহকারে এক দীর্ঘ বর্ণাঢ্য মিছিল গাইঘাটার বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে গাইঘাটা স্কুল প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হয়। ২৪-পরগণা জিলা পরিষদের সদস্য শ্রীঅরুণকুমার মহাপাত্র পায়রা উড়িয়ে এবং চারটি পটকা ফাটিয়ে চতুর্থ বার্ষিক ব্লক যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং যুব উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

যুব উৎসবের ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক বিভাগের সমস্ত প্রতিযোগিতাই বিভিন্ন বয়সের ওপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণীপুর পি. জি. বি. টি. কলেজের ছাত্রেরাই পরিচালনা করেন। ক্রীড়া বিভাগে ১১০০ এবং সাংস্কৃতিক বিভাগে ৭০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

উৎসব শেষে ২৫শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যেবেলায় সমস্ত সফল প্রতিযোগীদের আকর্ষণীয় পারিতোষিক এবং মানপত্র বিতরণ করা হয়। শ্রীঅরুণকুমার মহাপাত্র সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীদের এবং শ্রীকৃষ্ণপদ তরফদার ক্রীড়া বিভাগের প্রতিযোগীদের পুরস্কার এবং মানপত্র বিতরণ করেন। ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসুদর্শন চন্দ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই উৎসব গাইঘাটাবাসী এবং তৎসংলগ্ন ইছাপুর-১ এবং ২, ধরমপুর-১ এবং ২ ও জলেশ্বর-১ এবং ২ অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড আনন্দ এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করে। ঐ তিন দিনে প্রায় ১৫ হাজার দর্শক বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

গাইঘাটা ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে ও ফুলসরা ব্রহ্মময়ী পল্লী মহিলা সমিতির পরিচালনায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হস্তচালিত তাঁতের সাহায্যে বিছানার চাদর তৈরীর প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন কয়েকজন মহিলা।

গাইঘাটা ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে ও ফুলসরা ব্রহ্মময়ী পল্লী মহিলা সমিতির পরিচালনায় গ্রামীণ মহিলাদের একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয় ফুলসরা ব্রহ্মময়ী পল্লীতে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিষয়—মহিলাদের হস্তচালিত তাঁতের মাধ্যমে "খেস্" তৈয়ারী। তিন মাসের জন্য এই প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ শুরু হয় ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য শ্রীরণজিতকুমার মিত্র। এখানে প্রশিক্ষণরত মহিলার সংখ্যা তিরিশ জন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগ থেকে দুই হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণ শেষে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি ও স্থানীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে মহিলারা ব্যক্তিগতভাবে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক সমস্যা মেটাবার উদ্যোগ নিতে পারবেন।

বসিরহাট-১—প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বসিরহাট যুবকরণের উদ্যোগে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী '৮১ থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারী '৮১ পর্যন্ত ইটিন্ডা পানিতর অঞ্চলে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রগ্রেসিভ ফাইটার্স ক্লাব ময়দানে সাংস্কৃতিক এবং ইটিন্ডা এ্যাথেলেটিক এসোসিয়েশন ময়দানে ক্রীড়ানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শিশুদের বসে আঁকো, ছড়া বলা, অঙ্ক কষা, দৌড়; বড়দের আবৃত্তি, রবীন্দ্র ও নজরুলগীতি, বিতর্ক। শিশুদের অভি-প্রদর্শনী এবং সর্বস্তরের জন্য খেলাধুলা যুব উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এলাকার অনেক প্রতিযোগী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে যুব উৎসবটিকে আনন্দমুখর করে তোলে। এই যুব উৎসব এলাকার যুবমানসে বিশেষভাবে আনন্দ সঞ্চার করে এবং সাড়া জাগায়। এই উৎসবে আটশতের মত প্রতিযোগী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

এলাকার যুবকদের প্রচেষ্টায় উৎসবটি সুন্দরভাবে শেষ হয়। এই উৎসবে যে সমস্ত প্রতিযোগী বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সফলকাম হয় এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে তাদের পুরস্কৃত করা হয়।

উৎসবের শেষ দিনে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীনিখিলরঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়ের উপস্থিতিতে এবং পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীআমীর খসরু মহাশয়ের সভাপতিত্বে সফলকাম প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

মন্দিরবাজার—এই ব্লক যুবকরণের উদ্যোগ ও পরিচালনায় বিরেশ্বরপুরে গৌরমোহন শচীন মণ্ডল মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত ১৯ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী '৮১ যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। দুইটি ভাগে দিনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩৩০ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সফল প্রতিযোগীদের বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এই যুব উৎসব বিশেষভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সন্দেশখালি-২—ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে ১৭, ১৮ এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন, সব পেয়েছির আসরের অভি-প্রদর্শনী এবং ক্রীড়া প্রতিযোগীদের মার্চ-পাস্টের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন বিধান সভার সদস্য শ্রীকুমুদরঞ্জন বিশ্বাস। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে যুব উৎসব এই অঞ্চলের মানুষের কাছে আশীর্বাদ-স্বরূপ বলে বর্ণনা করেন। উৎসবের দিনগুলিতে প্রতিদিনই অসংখ্য

মানুষের সমাগম হয়। চারশতের মত প্রতিযোগী ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ক্রীড়া বিভাগের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারী সাংস্কৃতিক বিভাগের চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে ফেব্রুয়ারী ক্রীড়া বিভাগের চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারী পঞ্চায়েতের দুই বর্ষ পূর্তি উৎসব দিবসে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন যুব উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। যুব উৎসবের দিনগুলিতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন গণসংগীত পরিবেশন করেন 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ', বসিরহাট শাখা। দ্বিতীয় দিনে বাউল সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীসুজিত দে ও সম্প্রদায়। তৃতীয় দিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। যুব উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এই অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রী ও যুবকরা, পঞ্চায়েত সমিতি এবং শিক্ষকগণ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা প্রশংসনীয়।

বারাসাত ২নং ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় এবং বারাসাত ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সহায়তায় সম্প্রতি ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হল। যুব উৎসব চলে ২৬শে মার্চ থেকে ২৮শে মার্চ ১৯৮১ পর্যন্ত। যুব উৎসব উপলক্ষে কৃতি প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ ও মানপত্র প্রদান করা হয় ৩০শে মার্চ, ১৯৮১। এবারের এই উৎসব ছিল ভিন্ন স্বাদের। ব্লক অঞ্চলের যুবক-যুবতী এবং কিশোর-কিশোরীদের মনেই শুধু উৎসবের আনন্দ ছিল না, ছিল এলাকার সমস্ত মানুষের মধ্যেও। বলা বাহুল্য, এতদ্ অঞ্চলে দু' বছর আগে পর্যন্ত মানুষ কখনও কল্পনাও করতে পারতো না যে, ছাত্র-যুব সমাজকে নিয়ে এমন ধরনের উৎসব সরকারী উদ্যোগে সংঘটিত হয়। বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (পুরুষ, মহিলা ও শিশু বিভাগের), আবৃত্তি, সংগীত, নাটক, আদিবাসী নৃত্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এমন কি ব্লক অঞ্চলের দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছিল বসে রচনা প্রতিযোগিতা। এই উৎসবে প্রায় ৭৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এই যুব উৎসবের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের পারদর্শিতা অনেক বেশী করে আমাদের মনে আশার আলো সঞ্চার করে। উৎসবের উপর বক্তব্য রাখেন শ্রীকমল মুখার্জী (সভাপতি যুব উৎসব কমিটি ও সভাপতি বারাসাত ২নং পঞ্চায়েত সমিতি) ও শ্রীরঞ্জিত মিত্র (এম.এল.এ., বনগাঁ) এবং সামগ্রিক বিষয়বস্তুর উপর বক্তব্য রাখেন যুব কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস মহাশয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে 'যুব উৎসব' সম্পর্কিত বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন উক্ত অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও সম্পাদক তথা বারাসাত ২নং ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীশান্তিশংকর ভট্টাচার্য।

মুর্শিদাবাদ জেলা:

লালগোলা—গত ২০, ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১, তিন-দিনব্যাপী ব্লক যুব উৎসব ১৯৮১ হয়ে গেল। উদ্যোক্তা যুব কল্যাণ বিভাগ (পঃ বঃ সরকার), ব্যবস্থাপনায়—লালগোলা ব্লক যুবকরণ, মুর্শিদাবাদ ও পরিচালনায়—ব্লক যুব উৎসব কমিটি, লালগোলা (স্থান—লালগোলা মহেশনারায়ণ একাডেমী উচ্চ বিদ্যালয় ময়দান)। ২০শে ফেব্রুয়ারী সকাল ১১টায় যুব উৎসবের পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীশতদল চক্রবর্তী, বি-ডি-ও, লালগোলা ব্লক এবং উদ্বোধন করেন শ্রীসাইদুর রহমান, লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সভার সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমদনমোহন রায়, প্রধান শিক্ষক, লালগোলা এম. এন. একাডেমী। ব্লক যুব উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। শিশু ও যুবক-যুবতী মোট ৪৮০ জন প্রতিযোগী এই যুব উৎসবে অংশ-গ্রহণ করে এবং যুব উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং লালগোলার অধিবাসীরা একত্রিত হয়ে যুব উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। কৃতী ও সফলকাম প্রতিযোগীদের একটি মানপত্র এবং পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বহরমপুর—বহরমপুর ব্লক যুব উৎসব-'৮১কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—বাছাই অনুষ্ঠান ও মূল অনুষ্ঠান। বাছাই অনুষ্ঠান হয় ১৭, ১৮ ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী এবং মূল অনুষ্ঠান হয় ২৬, ২৭ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী। অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ছিল তিন ধরনের (ক) ক্রীড়া, (খ) সাংস্কৃতিক ও (গ) প্রদর্শনী। কেবলমাত্র খেলাধুলাবিষয়ক (এ্যাথলেটিক্স্) প্রতিযোগিতা গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের জন্য পৃথক পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও মানপত্র প্রদান করা হয়।

যুব উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত, কারা ও সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। উদ্বোধনের দিন সকালে প্রায় ৩০০ জন ছেলে-মেয়ে যুব উৎসবের পতাকা ও ফেস্টুনসহ প্রভাতফেরী ও সন্ধ্যায় মশাল মিছিলে যোগদান করে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন লোকসভার সদস্য অধ্যাপক শ্রীরেণুপদ দাস মহাশয়। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল মোট ৭২৪ জন। প্রতিযোগীদের মধ্যে তফশীলী জাতি ও তফশীলী উপজাতির সংখ্যাঃ ছেলে—৪০ জন, মেয়ে—১১ জন। প্রায় ১৫০০০ (পনের হাজার) দর্শক এই যুব উৎসব উপভোগ করেন এবং উৎসবকে সার্থক করে তোলার জন্য সহযোগিতা করেন।

জলপাইগুড়ি জেলা:

কালচিনি—এই অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্লক যুব উৎসব ২১, ২২, ২৩ ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী '৮১তে পালিত হয়েছে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে কালচিনি থানা মাঠে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে কালচিনি কালীবাড়ী মাঠে। এ বৎসর এই যুব উৎসবে সরকারী বিভিন্ন দপ্তর থেকে স্টল দেওয়া হয়েছিল। ডি. ওয়াই. এফ. হ্যামিলটনগঞ্জ শাখা এবং স্থানীয় শ্যামাপ্রসাদ ক্লাবও স্টল দিয়ে এই মেলার আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। দীর্ঘ লম্ফন, উচ্চ লম্ফন, তীর নিক্ষেপ, দৌড় প্রভৃতি প্রতিযোগিতা বিপুল উদ্দীপনার সংগে অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় আবৃত্তি, সংগীত, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রভৃতি বিষয়ে বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় ছটি (৬) দল অংশগ্রহণ করে এবং দুটি নাটক প্রদর্শনীরূপে অভিনীত হয়। নাটক প্রতিযোগিতায় হাসিমারার 'ভূমিকা নাট্যগোষ্ঠী' শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার পায়। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীসুখেন্দুবিকাশ রায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সর্বতোভাবে এই উৎসবের সাফল্য কামনা করেন। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, প্রধান শিক্ষক, ইউনিয়ন একাডেমি, কালচিনি। ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীরামপদ সিকদার ও উপ-সমিতির সদস্যদের উদ্যোগে অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই বৎসরই প্রথম এই যুব উৎসব উপলক্ষে একটি স্মারক পত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের উদ্যোগে গত ২৪শে জানুয়ারী থেকে পাঁচদিনব্যাপী যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হল। গ্রামাঞ্চলের যুবক-যুবতীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসবের দিনগুলো প্রাণবন্ত

হয়ে ওঠে। প্রায় ৯০০ জন প্রতিযোগী ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। রবীন্দ্র-ভবনে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক

কালচিনি ব্লক যুব উৎসবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার ক্ষুদে শিল্পীরা।

অনুষ্ঠানে যুবজীবনে প্রভাব সৃষ্টিকারী ঘটনাবলী সম্বন্ধে দু' দিন ধরে এক আমন্ত্রণমূলক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট বক্তাদের মনোজ্ঞ ভাষণ শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে রেখাপাত করে। উৎসবের রাতে লোকনৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি ও প্রগতি নাট্য সংস্থার একাংক নাটক 'অতীত ও বর্তমান' এবং বেরুবাড়ী উদীয়মান নাট্য সংস্থার 'সোনালী স্বপ্ন' আরেক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

মাটিয়ালী—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং মাটিয়ালী ব্লক যুবকরণ ও যুব উৎসব কমিটির ব্যবস্থাপনায় গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১লা মার্চ পর্যন্ত চালসা গয়ানাথ বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই মেলার উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য শ্রীজগৎ সাহা মহাশয়। এই উৎসবে ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন ক্লাবের ছেলেরা ক্রীড়া বিভাগে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের সংখ্যা ২৫০। এ ছাড়া বিকালে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং ক্লাবের ছেলেরা আবৃত্তি, সঙ্গীত, বিতর্ক প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে উৎসবটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। রাত্রে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কয়েকটি ক্লাবের সদস্য অংশ নেয়। সর্বশ্রেষ্ঠ দল ও শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনয়ের জন্য মাটিয়ালী পাবলিক লাইব্রেরী পুরস্কৃত হয়। পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন জলপাইগুড়ি জেলার সভাধিপতি শ্রীদিগেন খাসনবীশ মহাশয় এবং পুরস্কার বিতরণ করেন মাটিয়ালী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসুকরা ওরাঁও মহাশয়। সবশেষে বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনদিনব্যাপী যুব উৎসবের সমাপ্তি হয়।

পুরুলিয়া জেলা:

মানবাজার-১—২১শে ফেব্রুয়ারী '৮১ সকাল ১০টায় ব্লক সংলগ্ন মাঠে যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন মানবাজার-১নং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীআব্দুল হামিদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মানবাজার-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও যুব উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীঅশোক চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কংসাবতী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশ্যামল দে। উৎসবের উদ্বোধনকালে মানবাজার উদীয়মান তরুণ সংঘের শিশু-গোষ্ঠী ব্যান্ড বাজিয়ে সম্বর্ধনা জানায় ও সমস্ত প্রতিযোগী "মার্চ পাস্ট" করে।

২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী '৮১ পর্যন্ত যুব উৎসব কমিটির নির্ধারিত সমস্ত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিপুলভাবে সাড়া পাওয়া যায়। প্রতিযোগিতার মধ্যে ছৌ-নৃত্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়। ব্লকের প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত, বিদ্যালয় ও বেশীর ভাগ মহিলা সমিতি ও যুব প্রতিষ্ঠান উৎসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করে। প্রদর্শনীমূলক অনুষ্ঠানগুলি খুবই আকর্ষণীয় হয়। ধাদাকিগোড়া আদিবাসী নাওয়া সাগেন ক্লাব কর্তৃক রিজা নাচ, বালিগুমা পল্লী উন্নয়ন ক্লাব, বামণী গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভালুবাসা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক বুলবুলি নাচ, মোহনডি মহাশক্তি সংঘ ও বাগডেগা দলের ছৌ-নাচ, মানবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক সাঁওতালী নাচ, বারমেশো গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক সাঁওতালী নাটক (রেঙ্গেজ জ্বালা), মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক তথ্যচিত্র ও স্থানীয় সঙ্গীত শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক সঙ্গীতানুষ্ঠান স্থানীয় দর্শকসাধারণকে বিশেষ আনন্দ দান করে ও যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করে। সমস্ত প্রতিযোগিতা সর্বাঙ্গসুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। স্থানীয় যুবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সাধারণ মানুষের আন্তরিক সহযোগিতায় উৎসব হয়ে উঠে প্রাণবন্ত।

২৪শে ফেব্রুয়ারী বিকাল পাঁচটায় পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মানবাজার আর. এম. ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক শ্রীবিজয় পতি। প্রধান অতিথি ছিলেন মানবাজার কেন্দ্রের বিধানসভা সদস্য শ্রীনকুলচন্দ্র মাহাতো। যুব উৎসবের সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বক্তব্য রাখেন মানবাজার আর. এম. ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক শ্রীপ্রভাত দত্ত, শ্রীশান্তি রায়, গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীঅনিল মাহাতো, মানবাজার-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীলম্বোদর মাহাতো, মানবাজার-১নং ব্লকের ডি. এস. শ্রীসুভাষ দাস প্রমুখরা।

উৎসব সুষ্ঠুভাবে সফল করার জন্য স্থানীয় যুব সম্প্রদায়, শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রতিযোগী ও সাধারণ মানুষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ব্লক যুব আধিকারিক।

১৫০ জন সফল প্রতিযোগীকে মানপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি শ্রীনকুল মাহাতো।

কোচবিহার জেলা:

কোচবিহার জেলা বিজ্ঞান মেলা-৮১

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে কোচবিহার জেলা বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হ'ল যথাক্রমে ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী জেনকিনস্ বিদ্যালয়ে। এতে এই জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় ও বিজ্ঞান ক্লাবের ২৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয় বি. টি. ও সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযতীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী। প্রতিযোগিতায় জেনকিনস্ বিদ্যালয়ের বিশ্বরূপ লাহিড়ী ও অরূপ মৈত্র, সুনীতি একাডেমীর মিতা দত্ত ও পারমিতা পাকড়াসী, হলদীবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের শুভাশীষ দত্ত, তুফানগঞ্জ বিজ্ঞান সংস্থার সুশীল সরকারকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন জেনকিনস্ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীমনীন্দ্রনাথ বর্মন ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার। সফল প্রতিযোগীরা ২১শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সায়েন্স ক্যাম্পে যোগ দেয়। স্থানীয় স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও উৎসাহী প্রায় ৪০০০ দর্শক মেলা পরিদর্শন করেন।

কোচবিহার-১—গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংহতি দিবস

উদ্‌যাপনের মাধ্যমে হরিণচওড়া বাণীনিকেতন বালিকা বিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ব্লক যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন বিধান সভা সদস্য শ্রীবিমলকান্তি বসু। মোট তিন দিন ধরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আবৃত্তি, প্রবন্ধ, অঙ্কন, বিতর্ক, রবীন্দ্র, নজরুল ও ভাওয়াইয়া সংগীত প্রভৃতি প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ছিল শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী দিবস। এ দিন আদিবাসী সংঘের ক্রীড়া প্রাঙ্গণে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা হয়। উদ্বোধন করেন জেলা যুব আধিকারিক শ্রীগণেশ দেব রায়। বিভিন্ন দিনে অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার, প্রদীপ নাথ ও গোপাল সাহা।

১৫ই ফেব্রুয়ারী যুব ছাত্র দিবস হিসাবে পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের এ দিন পুরস্কার ও মানপত্র প্রদান করা হয়। অতিথি, প্রতিযোগী ও দর্শকদের যুব উৎসবকে সফল করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ব্লক যুব আধিকারিক ও সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র দাশ। প্রতিদিন প্রতিযোগিতা ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটকের ব্যবস্থা ছিল। সাংস্কৃতিকা, সবুজের দল, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থা, নেতাজী স্কোয়ার, ভবানী ক্লাব ও কিশোর সংঘ তাদের নাটক মঞ্চস্থ করে। সবুজের দলের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের 'অরুণ বরুণ কিরণমালা' নাটকটি দর্শকদের অভিনন্দন লাভ করে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় মোট ৬৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে আনুমানিক ৪৫০০ দর্শক বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন।

দিনহাটা-২—গত ২৬, ২৭ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী দিনহাটা-২নং ব্লক যুব করণের পরিচালনায় বড়শাকদল সবুজ পল্লী প্রাঙ্গণে যুব উৎসবের আসর বসে। উৎসবের উদ্বোধন করেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীআইনুদ্দিন মিঞা ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পরিবহণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। উৎসবের তিনটি দিনকে যথাক্রমে 'নেতাজী দিবস' (২৬শে), 'ঠাকুর পঞ্চানন দিবস' (২৭শে) এবং 'কৃষক-শ্রমিক মৈত্রী দিবস'। 'সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা বিরোধী দিবস' (২৮শে) হিসাবে পালন করা হয়। সকল বিভাগে মোট ১৭৫৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। আনুমানিক ৮০০০ দর্শক তিনদিনব্যাপী এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানসূচি উপভোগ করেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে বিশেষ স্থানাধিকারী প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়।

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে এই উৎসবে যুব কল্যাণ বিভাগের অর্থ ছাড়াও কৃষি বিভাগ, স্বল্প সঞ্চয় বিভাগ, সি. এ. ডি. পি., এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ, রেডক্রস্ সোসাইটি, স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা বিভাগ ও স্থানীয় জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত নানাভাবে আর্থিক সাহায্য করেছেন।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা:

হেমতাবাদ—গত ৭ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত হেমতাবাদ বি-ডি-ও অফিস প্রাঙ্গণে ব্লক যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন ব্লক যুব আধিকারিক ও উৎসব কমিটির সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ। উদ্বোধনী দিবসে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বাছাই পর্ব শুরু হয় এবং বিকালে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আসর বসে। জেলার প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন সংগীতশিল্পী শ্রীতরণী বিশ্বাস উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রভূত আনন্দ দেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হয় ৮ই ফেব্রুয়ারী। সন্ধ্যায় তরুণ আবৃত্তিকার শ্রীশুভব্রত লাহিড়ীর আবৃত্তি একটি অনাবিল অভিজ্ঞতা বলা যেতে পারে। শেষদিন অর্থাৎ ৯ই ফেব্রুয়ারী দুপুর বারটায় আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিল 'মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান'। পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে বি-ডি-ও শ্রীঅনাথবন্ধু লালা তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে যুবকল্যাণ বিভাগের কর্মসূচির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এই ধরনের অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা হেমতাবাদ অধিবাসীদের কাছে প্রথম এবং ভুলত্রুটি থাকলেও এই উৎসবের ফল সুদূরপ্রসারী বলে শ্রীলালা অভিমত প্রকাশ করেন। মোট ৬৩ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৬৫০ জন। ৯ তারিখ সন্ধ্যায় মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান' নাট্যানুষ্ঠানে অংশ নেয় রাইনা নাট্যগোষ্ঠী।

[আধুনিক চীন বিপ্লবের ইতিহাস : ৩৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক বামপন্থী বিচ্যুতির সংশোধন এবং দৃঢ়ভাবে বলশেভিকীকরণের পথ গ্রহণ (সেপ্টেম্বর ১৯৩১—ডিসেম্বর ১৯৩৫); জাপবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নয়া অভ্যুত্থান। অভ্যন্তরীণ শান্তি-স্থাপন (ডিসেম্বর ১৯৩৫—জুলাই ১৯৩৭); জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রথম যুগ (জুলাই ১৯৩৭—ডিসেম্বর ১৯৪০); প্রতিরোধ সংগ্রামের বিপজ্জনক পরিণতি (জানুয়ারী ১৯৪১—ডিসেম্বর ১৯৪২); প্রতিরোধ সংগ্রামে চূড়ান্ত বিষয় (জানুয়ারী ১৯৪৩—সেপ্টেম্বর ১৯৪৫); জাপানের আত্মসমর্পণের পর আভ্যন্তরীণ শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য চীনা জনগণের সংগ্রাম (সেপ্টেম্বর ১৯৪৫—জুন ১৯৪৬); তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক রণকৌশল। গণমুক্তি ফৌজ কর্তৃক কুয়োমিন্টাংয়ের সামরিক আক্রমণ প্রতিহতকরণ (জুলাই ১৯৪৬—জুন ১৯৪৭); তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ। গণবিপ্লবের দেশব্যাপী বিজয়লাভ (জুলাই ১৯৪৭—অক্টোবর ১৯৪৯); বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়োত্তর পর্বে জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও রূপান্তর (অক্টোবর ১৯৪৯—১৯৫২) এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌল জয় (১৯৫৩—জুন ১৯৫৬)।

গ্রন্থটিতে প্রতিটি অধ্যায় এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে পরবর্তী বিপ্লবী সংগ্রামের পটভূমিকায় উত্তরণের চিত্র অত্যন্ত সহজ প্রাঞ্জল ও বুদ্ধি গ্রাহ্য বলে প্রতিভাত হয়। ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকায় ইতিহাস রচনার আবশ্যিক শর্ত রক্ষিত হয়েছে। অনুবাদ সাবলীল হওয়ায় গ্রন্থটির পাঠ খুবই প্রীতিপ্রদ হবে।

আলোচনার শেষভাগে মাও সে তুং-এর একটি বিখ্যাত বক্তব্য স্মরণ করা যাক। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের বিংশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ইয়েনামে সংবাদপত্রের জন্য লেখায় তাঁর এই বক্তব্য আছে: "বিপ্লবের সংঘটনে অহিফেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে পরবর্তী যুদ্ধ-সংগ্রামগুলির প্রত্যেকটিরই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু এগুলির স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ণায়ক বিষয়টি হল এই যে, এই সংগ্রামগুলির উত্তরকাল কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার আগে না পরে।" বর্তমান গ্রন্থের আলোচনায় এই মূল দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুণ্ণ আছে।

সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ, সর্বহারার বিশ্ব শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি : মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত মৌল নীতিসমূহের আলোকেই চীন বিপ্লবের এই আলেখ্য প্রশংসনীয় যোগ্যতায় রচনা করেছেন হো কান্-চি।

আমাদের দেশে বহমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির মোকাবিলায়, শোষণ থেকে জনগণের পূর্ণ মুক্তি অর্জনের দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিক সংগ্রামে এ ধরনের পুস্তক প্রচারের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। **সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়**

সম্প্রতি কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে আয়োজিত এক আপ্যায়ন সভায় পূর্বভারতের বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
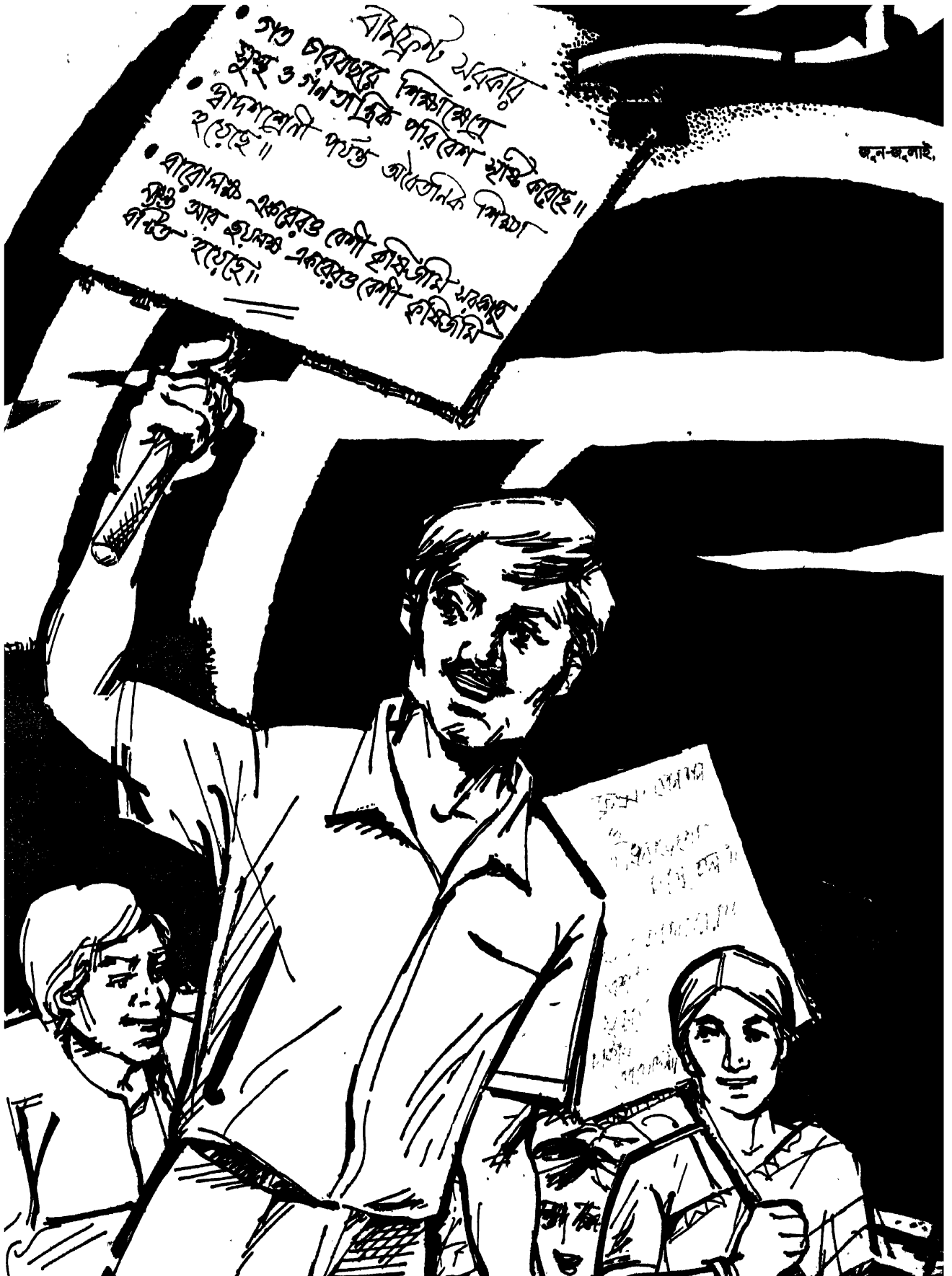
Regd. No. 32875/78

Postal Reg. WB/CC-15

কলকাতার মৌলালিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের নবনির্মিত রাজ্য যুব কেন্দ্র

বামফ্রন্ট সরকার
• গত চারবছরে শিক্ষাক্ষেত্রে
সুস্থ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে॥
• দ্বাদশশ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা
হয়েছে॥
• বারোলক্ষ একরেরও বেশী খাসজমি সরকারে
ন্যস্ত আর ৬লক্ষ একরেরও বেশী কৃষিজমি
বণ্টিত হয়েছে॥
জুন-জুলাই,

মহাজাতি সদনে বামফ্রন্ট সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী

বামফ্রন্ট সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত গাইছেন লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীবৃন্দ। মঞ্চে মুখ্য-মন্ত্রী জ্যোতি বসু ও মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যগণ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
জুন-জুলাই, '৮১
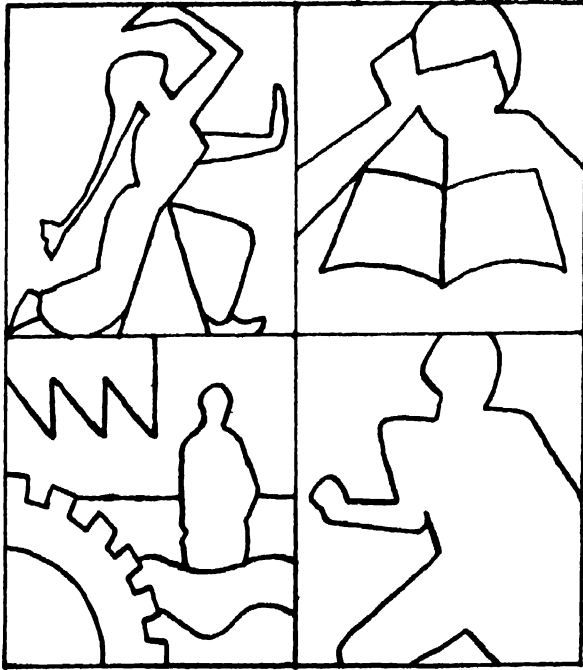
উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি এবং পত্রিকা সম্পাদক :
কান্তি বিশ্বাস

প্রচ্ছদ : পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা-৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—চাল্লিশ পয়সা

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

আলোচনা

প্রতিবেদন

গল্প

কবিতা

শিল্প-সংস্কৃতি

লোক-চিত্রকলা

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

বইপত্র

বিভাগীয় সংবাদ

পাঠকের ভাবনা

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার চার বৎসর পূর্ণ করে পঞ্চম বর্ষে পা দিল। যদি বলি ভারতের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে এ একটি—তা হলে বোধ করি যাঁরা ইতিহাস জানেন তাঁরা কোন আপত্তি করবেন না। ভারতের সংবিধানে আছে সরকারের পিছনে যতক্ষণ পর্যন্ত আইন সভার অধিকাংশের সমর্থন আছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সরকার পাঁচ বৎসর পর্যন্ত টিকে থাকবে। (দেশে ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা জারী করে এই মেয়াদকে অবশ্য ছয় বৎসর করা হয়েছিল।) কিন্তু আইনকে যারা কখনও নিরপেক্ষতার আসনে বসাতে চায় না—যারা নিজ স্বার্থকে হাসিল করার জন্য আইনকে বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করতে এতটুকু শরম করে না—তাদের কাছে সংবিধানের এই সমস্ত বিধান নিতান্তই ফালতু। কেরালায় প্রথম নির্বাচিত কম্যুনিস্ট মন্ত্রীসভাকে খারিজ করার মধ্য দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের শত্রুদের যে প্রেতনৃত্য শুরু হয়েছিল তার কালো ছায়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্যেও দেখা গেছে। এই অবস্থায় রাজ্যের একটি বামপন্থী সরকারের চার চারটি বছর এক নাগাড়ে কাটিয়ে দেওয়াটাকে একটা তুচ্ছ ঘটনা বলব কোন্ সাহসে?

রাজ্যের বাম সরকার গত চার বৎসর ধরে ফুল বিছানো বিছানায় আরাম করে মধুযামিনী যাপন করে নি। অনেক খাড়াই-উৎরাই, বহু বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করেই তাকে উর্ধ্বশ্বাসে পথ চলতে হয়েছে। দীর্ঘদিনের কুশাসন ও দুর্নীতির জঞ্জাল পরিষ্কার করে রাজ্যবাসীর কল্যাণের কাজে হাত লাগাতে না লাগাতেই ভয়াবহ বন্যার অভাবনীয় তাণ্ডব মোকাবিলা করতে হয়েছে। বন্যার পরেই গ্রামত্যাগী লাখো লাখো কঙ্কালসার মানুষের ভুখা মিছিলে রাজধানীর রাজপথ ছেয়ে যাবে এই নারকীয় কল্পনায় যারা পুলক অনুভব করেছিল তাদের মুখে ছাই দিয়ে গণ-উদ্যোগ সৃষ্টি করে—নব নির্বাচিত পঞ্চায়েতকে হাতিয়ার করে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে যে সাফল্যের অসামান্য নজীর এই সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল দেশবাসী দীর্ঘকাল ধরে তা মনে রাখবে। তার পর বৎসরেই হিসাবছাড়া খরার দাপটও এই সরকারকে কম বেগ দেয় নি।

এরই সাথে পাল্লা দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত কিছু বেসামাল রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও ব্যক্তি কম নাচন-কুদন করে নি। কড়োয়ার মাঠ থেকে বড়বাজারের রাস্তায় তার পদচিহ্ন মানুষ দেখেছেন। ভাগ্য-বিড়ম্বিত, ভিটে-ছাড়া, দেশ-ছাড়া অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার আকুতিকে ভুল পথে চালিত করে মরিচঝাঁপির বিয়োগান্ত নাটকের মঞ্চে এদের করুণ আস্ফালন করতেও মানুষ দেখেছেন। অপারেশন বর্গায় ভীত বৃহৎ ভূ-স্বামী ও তার সেবকের দলকে আইন নেই, শৃঙ্খলা নেই বলে ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়তেও দেখা গেছে। রাজ্যের শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে ঘোলা জলে মাছ শিকার করার ব্যর্থ প্রয়াসও এঁরা প্রচুর চালিয়েছেন। অর্থনৈতিক অসহযোগিতা সাংবিধানিক জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টাও কম হয় নি। শিক্ষা মন্দিরের বার ক্লাসের দরজা পর্যন্ত নিরন্ন-নিরক্ষর মানুষের সন্তান-সন্ততিদের জন্য খুলে দিয়ে, মাতৃভাষার মাতৃদুগ্ধে শিক্ষার্থীদের পুষ্ট করার সাহায্যে শিক্ষাকে সার্বজনীন করার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের মধ্যে কেউ কেউ সর্বনাশের ভূত দেখতে পেয়েছেন। এঁরা দল বেঁধে মেহের আলী পাগলার মত বাম সরকারকে শুধু অহোরাত্র 'তফাৎ যাও তফাৎ যাও' বলে আর্ত চীৎকার করে চলেছেন। নিজেদের কৃতকর্মের আয়নায় এই সরকারের সাফল্যগুলি দেখে স্বৈরতান্ত্রিক অশুভ শক্তি নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়ে জঘন্য ও কুটিল পথে এই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছে। কেন্দ্রের শাসক দলের পক্ষ থেকে তাই তাবড় তাবড় নেতারা গদা হাতে দিনরাত্রি এই সরকারের বিরুদ্ধে পাইতারা কষে চলেছেন।

এই সব ভ্রূকুটিকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেই সরকার তার লক্ষ্যপথে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান আর্থিক, সামাজিক কাঠামোয় সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এই সরকার অত্যন্ত সচেতন। তাই প্রশাসনের গতানুগতিকতাকে পরিত্যাগ করে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব-মধ্যবিত্ত মানুষের সাথে সম্পর্ককে অত্যন্ত নিবিড় করে তাদের সাহায্য, সহযোগিতা এবং উন্নয়নমূলক প্রত্যেকটি কাজে তাদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই এই স্বল্প চার বৎসরে এই সরকার গোটা দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের কাজের ব্যবস্থা করে দেবে এ ক্ষমতা এ সরকারের নেই। কিন্তু বেকারীত্বের সুযোগ গ্রহণ করে যুব সমাজকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ভণ্ডামিপূর্ণ প্রক্রিয়াকে

এই সরকার বন্ধ করেছে। কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমেই একমাত্র কাজ দেওয়া হবে এ নীতি আজ সারা দেশের যুব সম্প্রদায়ের নিকট থেকে উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছে। বেকার ভাতা সমাধান না হলেও বেকারীত্বের দায়িত্ব যে সমাজের তার অন্ততঃ একটা স্বীকৃতি এই ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে। বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণ, বহু বাধা-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও শিল্পে অগ্রগতি, কেন্দ্রীয় সরকারের রূঢ় ব্যবহার সত্ত্বেও রাজ্য যোজনা খাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কয়েক গুণ অধিক অর্থবরাদ্দ প্রভৃতি কাজে যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে—কেরালা, ত্রিপুরা ব্যতীত কোথায় তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে?

৫২ লক্ষ কৃষি পরিবারের মধ্যে ৪৮ লক্ষ কৃষি পরিবারকে জমিসংক্রান্ত সমস্ত প্রকার কর দেওয়া থেকে অব্যাহতি, দিনমজুর-ক্ষেতমজুর-গরীব কৃষকদের জন্য কৃষি পেনসন চালু, ৪০ কোটি টাকার কৃষিঋণ মকুব, গরীব ও প্রান্তিক কৃষকদের বিভিন্ন প্রকার সুবিধা, সরকারী ব্যবস্থাপনায় গরীব কৃষকদের জন্য বিনা সুদে ব্যাঙ্কের ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা, সারের দামে রাজ্য সরকারের ভর্তুকী, ফসলের জন্য উৎপাদক-কৃষকেরা যাতে বেঁচে থাকার মত দাম পান তার জন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রয়াস সমগ্র দেশের গ্রামীণ মানুষকে নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। প্রচণ্ড অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও সরকারী, আধা-সরকারী, স্কুল-কলেজ, পৌর ও পঞ্চায়েতের কর্মীদের জন্য এ সরকারের আন্তরিক দরদের যে প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে তার কি কোথাও নজীর আছে? শ্রমিকশ্রেণী যাতে মালিকের হাত থেকে তার পাওনা আদায় করতে পারেন তার জন্য যে ভূমিকা এই সরকার পালন করে চলেছে এর ফলে দেশের সমস্ত শ্রমিকের মধ্যে নতুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পৌর-জীবনকে একটু স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া, খেলাধূলার আসর থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক জগতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্তগুলি যে এক নূতন আলোড়ন তৈরী করেছে এমন কি কেউ আছেন—একে অস্বীকার করবেন?

শুধু বস্তুগত সাফল্যই নয়—দেড় যুগ পরে পঞ্চায়েত ও পৌর নির্বাচনের ব্যবস্থা করে এই সরকারের গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির ও মানুষের প্রতি তার অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই প্রকাশ করেছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণ-বিদ্বেষ, আঞ্চলিকতার বিষবাষ্পে সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশ যেখানে কলুষিত—তখন এখানে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতির স্বাদ সাধারণ মানুষ আস্বাদন করতে পারছেন। কেন্দ্রের শাসক দল শাসিত রাজ্যগুলিতে যেখানে ব্যক্তিস্বার্থ, ক্ষমতার কোন্দল, পারস্পরিক খেয়োখেয়ি মন্ত্রীসভা সহ গোটা প্রশাসন যন্ত্রে অত্যন্ত কুৎসিত-ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে—তখন এই রাজ্যের অবস্থা কি মানুষের তা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না।

মানুষ যে তা বোঝেন—যখনই সুযোগ আসছে তখনই তাঁরা সুস্পষ্টভাবে তা ব্যক্ত করছেন। সম্প্রতি পৌর নির্বাচন ও উপ-নির্বাচনের ফলাফল চোখে আঙ্গুল দিয়ে এই সত্যকেই দেখিয়ে দিল। তবুও কুচক্রী দলের চক্রান্তের কোন বিরতি নেই। কামান্ধ মন্ত্রী ও দলীয় নেতার পশু-প্রবৃত্তির উৎকট লালসার আগুনে যখন চাকুরী প্রার্থী অভাগিনী বোনের ইজ্জৎ জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে যায় তখন তাদের পদে লোক সরানোর কথা না ভেবে ওরা এই সরকারের অপসারণের কথা ভাবে। গান্ধীবাদী নিষ্ঠাবান কর্তব্যকর্মে অবিচল রাজ্যপালকে হটানোর কথা ভাবতে ওদের এতটুকু দ্বিধা হয় না।

এই সমস্ত ঘটনাই এই সরকারের উপর নূতন নূতন দায়িত্বভার অর্পণ করে চলেছে। আত্ম-সন্তুষ্টির কোন অবসাদ এই সরকারকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। সামনে যে সময়টুকু আছে তার প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে হবে—মানুষের কল্যাণে, জনগণের চেতনা বৃদ্ধির কাজে এই হচ্ছে এর সুদৃঢ় সঙ্কল্প। সংসদকে এড়িয়ে গিয়ে একটার পর একটা কালা কানুন জারি করা, বিচার ব্যবস্থার উপর উপর্যুপরি হস্তক্ষেপ, পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতি মৌল দ্রব্যের উপর সাত মাসের মধ্যে দু'বার করে অস্বাভাবিক কর আরোপ এবং সর্বশেষে তথাকথিত অত্যাবশ্যকীয় শিল্পক্ষেত্রে ধর্মঘটকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে অর্ডিন্যান্স জারী—ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত বহন করে আনছে। এই অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার এক রাজনৈতিক কর্তব্যের উদাত্ত আহ্বানে আজ এই সরকারকে যোগ্যতার সাথে সাড়া দিতে হবে—দেশপ্রেমিক শক্তি একান্তভাবেই তা কামনা করে। এরই সাথে বাংলার উচ্ছ্বসিত যৌবন ঘোষণা করতে চায়—

"বিপন্ন পৃথিবীর আজ শুনি শেষ মুহুর্মুহু ডাক
আমাদের দৃপ্ত মুঠি আজ তার উত্তর পাঠাক"

শিক্ষার সংকট এবং বামফ্রণ্ট সরকারের চার বছর

মহম্মদ আব্দুল বারি

গত ২রা জুন দিল্লীতে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্বোধনী ভাষণের কয়েকটি মন্তব্যের মধ্যেই স্বাধীনতার চৌত্রিশ বৎসরের শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষানীতির প্রকৃত ছবি ফুটে উঠেছে। শ্রীমতী গান্ধীর নিকট চৌত্রিশ বছর পরে স্বাক্ষরতার অভিযান সম্পর্কে নতুনভাবে পর্যালোচনা করে অগ্রসর হতে হবে। কেন না ১০০ ভাগ মানুষ শিক্ষিত হলেই সত্যকারের শিক্ষিত বলা যায় না। "I must say that we are a bit disheartened with the whole aspect of literacy."

ভাবতে অবাক লাগে যে দেশে প্রতি দশকে গড়পড়তা ৩০ লক্ষ নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা মোট নিরক্ষর মানুষের সংখ্যার সঙ্গে সংযোজিত হচ্ছে। ১৯৫১ সালে মোট নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ছিল ২৪·৬৬ কোটি, ১৯৭১-এ ৩০·৭ কোটি এবং ১৯৯৯ সালে বর্তমান হারে নিরক্ষরতা বৃদ্ধি হলে দাঁড়াবে ৩৪ কোটিতে। কোটি কোটি নিরক্ষর মানুষের দেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী—নিরক্ষরতার এই বিরাট অঙ্কে সামান্যতম বিচলিত বোধ না করে, চিরাচরিত দাম্ভিকতার সঙ্গে অন্য দশের শিক্ষার গুণাবলী সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য জুড়ে দিয়ে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করে মূল প্রশ্নটি এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কারণ খুবই পরিষ্কার, ৩৪ বছর স্বাধীনতার পরেও দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট গভীরতম, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপন্ন, পুঁজিপতিশ্রেণী ও জমিদারদের অবাধ মৃগয়া ক্ষেত্র এই ভারতভূমিতে মুষ্টিমেয় মানুষ শিক্ষিত হয়ে শিক্ষা-রূপ সম্পদের অধিকারী। অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ গতরের সমস্ত রক্ত জল করে সম্পদ সৃষ্টি করে তাদের ধনভাণ্ডারকে আরও স্ফীত করুক এইটাই ওদের কাম্য। নিরক্ষরতার নাগপাশে আবদ্ধ কৃষককুল, মজুরেরা, তথাকথিত ছোটলোকেরা অঙ্কের হিসাব থেকে বঞ্চিত থাকুক, বংশপরম্পরায় পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ভূমিদাস হিসাবে সারাদিনের ঘামঝরা পরিশ্রমে ধরিত্রীর বুক থেকে ৩৩ টাকা মূল্যের সম্পদ সৃষ্টি করে জোতদারের গোলা ভর্তি করে ফসল তুলে দিক। ওরা একটু অংকের হিসাব বুঝবে, ওরা ধরিত্রীকে জানবে, সমাজ সচেতন হবে পাপ-পুণ্যের বিচার করতে সমর্থ হবে—তবেই তো সর্বনাশ!

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তিত শিক্ষাধারার মূলসূত্রকে অবলম্বন করে দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাতে cross commercialisation of many education institutions ছাড়া কি হতে পারে!

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনায় শিক্ষা প্রসারের গুরুত্বের চেয়ে চাকরি প্রদানের প্রভূত ব্যবসায়ী মনোভাব প্রকট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। ফলে ভারতবর্ষের হাজার হাজার গ্রামে যেখানে সাধারণ মানুষ দেশের মাটির সঙ্গে অহরহ লড়াই করে সম্পদ সৃষ্টিকারীর কারিগর হিসাবে সমাজকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, সেই সব গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। হয়তো কোন কোন অনুন্নত এলাকায় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে কিন্তু পড়াশুনার কোন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় নি। ভারতবর্ষের ১৬·১ লক্ষ শ্রেণী-কক্ষ নির্মাণের কোন ব্যবস্থা হয় নি। এখনও মোট ৪৭৪,৬৩৬ প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে ১৬৪,৯৩১ বিদ্যালয় ৬ জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত। সেদিনের মন্ত্রী-সম্মেলনে উড়িষ্যার শিক্ষামন্ত্রী যে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরলেন তাতে কিভাবে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা চলছে তার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল। প্রায় ১০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে শিক্ষক থাকেন তাঁরা প্রায়ই স্কুলে উপস্থিত হন না, আবার কেউ অন্য কাউকে কিছু টাকার বিনিময়ে দায়িত্ব দিয়ে নিজেদের মহান দায়িত্ব শেষ করছেন।

অন্যদিকে উচ্চশিক্ষার সংকট—ক্রমবর্ধমান যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে হতাশাজনিত ভাবধারার প্রতিফলন, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি, গণটোকাটুকি, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক করে তুলছে। সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দেশের অগণিত যুবশক্তি উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী হয়েও বিপথে পরিচালিত হচ্ছেন। গতানুগতিক শিক্ষাধারায় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এক অসামাজিক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে শিক্ষাজগতে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের ছড়াছড়ি। চিকিৎসা বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা সমাজের বিত্তশীলদের করায়ত্বে চলে যাচ্ছে। শিক্ষায় আদর্শবোধ, দেশপ্রেম প্রভৃতি গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো কথার কথা হয়ে পড়েছে। বিশেষ সুবিধাভোগী এবং শোষকশ্রেণীর শোষণ ও নিপীড়নের হাতিয়ার তৈরীর কারখানা হিসাবে উচ্চশিক্ষায়তনগুলি গড়ে উঠছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিয়ে শিক্ষায়তনের পবিত্রতা রক্ষার প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী চিকিৎসা বিদ্যালয়ে ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয়ের capitation fees দিয়ে ভর্তি করার বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু তিনি যদি এর প্রকৃত কারণগুলি ব্যাখ্যা করতেন তবে দেশবাসী তাঁর আন্তরিকতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। সমাজে চিকিৎসা বিদ্যা বা প্রযুক্তি বিদ্যার মত অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা ক্রয় করার ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষাক্ষেত্রে একদল মুনাফাখোর ক্রয়-ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হয় এবং সমাজ গঠনে উপরিউক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যর্থ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কুম্ভীরাশ্রু "People's Democracy" পত্রিকার নিম্নলিখিত অংশে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। The Prime Minister, who makes her dislike clear of the system of capitation fees for admission to medical and engineering colleges, feels helpless in curbing the malpractice in the Congress (I) ruled states of Andhra Pradesh and Karnataka. In the traditional strong holds of the Congress (I), Karnataka and Andhra Pradesh, in the past two years (1979-81), and eight such colleges have been started respectively.

One private medical college in Karnataka asks for as much as 20,000 U.S. dollars for a seat in the medical college. In Andhra Pradesh, only recently, in engineering college with capitation fees was inaugurated by the external affairs Minister, P. V. Narsimha Rao. Are these the "expectations" that Mrs. Gandhi is talking about under Congress (I) rule?

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে সারা ভারতের শিক্ষা-ক্ষেত্রের প্রতিচ্ছবি আরও বেশী বেশী করে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রাস করছিল। বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে শিক্ষা-ক্ষেত্রে কোন মৌলিক পরিবর্তন না আনতে পারলেও কতগুলি বাস্তবিক এবং দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, যেগুলো এ দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহলে যেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে অন্যদিকে এ রাজ্যের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে এবং শিক্ষার প্রতি নতুন করে আস্থার ভাব জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

প্রথমতঃ, গতানুগতিক পদ্ধতিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিবর্তন করে সরকার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

চিরাচরিত পদ্ধতিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গ্রামের উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং গ্রামের জোতদার শ্রেণীর সন্তানেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করতেন—কেন না বিদ্যালয় সংগঠিত করার আর্থিক ক্ষমতা তাদের হাতেই ন্যস্ত থাকত। ফলে যেমন অনুন্নত এলাকায় বিদ্যালয় সংগঠিত হত না—হলেও সেখানে চাকুরীসর্বস্ব একটি অভিভাবকহীন আড্ডাখানা হয়ে পড়ে থাকত, অন্যদিকে চাকুরীর প্রত্যাশায় হাজার হাজার বেকার যুবক রাজ-নৈতিক দাদাদের স্মরণাপন্ন হয়ে স্কুল সংগঠন করার অনুমতি নিয়ে যত্রতত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করতে আরম্ভ করে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৭৭ সালের পূর্বে পূর্বতন সরকার প্রায় ৩ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মঞ্জুরীর কাজ সমাধা না করতে পেরে নানারূপ দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। কোন কোন জেলায় যেমন ২৪ পরগনা এবং বর্ধমান জেলার কোটার বাইরে অনেক শিক্ষকের নিয়মবহির্ভূত নিয়োগ হয়, যার বোঝা আজও বামফ্রন্ট সরকারকে বহন করতে হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার সুনির্দিষ্ট ভাবে ঘোষণা করে যে, এই রকম কোন সংঘটিত স্কুলকে মঞ্জুরি না দিয়ে প্রয়োজন-ভিত্তিক গ্রামে বা মহল্লায় গণতান্ত্রিক ভাবে পুনর্গঠিত হয়ে জেলা বিদ্যালয় পর্ষদ কর্তৃক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকারের মধ্য দিয়ে। এই পদ্ধতি অবলম্বনে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৪৬০০ নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রায় ১২,০০০ শিক্ষকের নিয়োগব্যবস্থা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়াশীল এবং কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহকশ্রেণীর পক্ষ থেকে বামফ্রন্ট সরকারকে প্রচন্ড আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তথাকথিত সংগঠিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নানাভাবে প্ররোচিত এবং সংগঠিত করে হাইকোর্টে শত শত মামলা দায়ের করে ও ইনজাংশন আদায় করে আমাদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষক নিয়োগের কাজকে ব্যাহত করেছে।

প্রথমদিকে বামফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার পদক্ষেপ হিসাবে কতকগুলি কার্যকরী ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করেছে। আমাদের দেশের শতকরা এক ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। গরীব ক্ষেতমজুর, প্রান্তিক কৃষক, কল-কারখানার শ্রমিক, গ্রামের কুটীরশিল্পী তাঁর অতীত অভিজ্ঞতায় জানেন, নিরক্ষরতা তাঁর জীবনে কত বড় অভিশাপ। বঞ্চনা, শোষণ, প্রতারণা সমস্তের জন্যই দায়ী তার নিরক্ষরতা। তাই সে তার ছ'বছরের শিশুটিকে ঘিরে স্বপ্নের নীড় রচনা করে তাকে আর অশিক্ষিত করে রাখবে না, মানুষ করার, চোখ ফোটানোর ব্যবস্থা করবে। বিদ্যালয়ে হয়তো পাঠিয়েও দেয়া হয়, কিন্তু দুঃখের দিনে ঘরে এক-মুঠো খাবারের অভাব ঘটলেই তার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। বাছাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলতে হয় 'বাবা আজ আর তোর স্কুলে যাওয়া হবে না, অমুকের বাড়ীতে কাজ করে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।' বামফ্রন্ট সরকার এই দুঃসহ বেদনা লাঘব করার জন্য ৯,৭১,০০০ (৯ লক্ষ ৭১ হাজার) হাজার ছেলে-মেয়ের টিফিনের বৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রায় ৩৯ লক্ষ শিশুকে মধ্যাহ্ন-কালীন খাবারের ব্যবস্থা করেছে। সমস্ত অনুন্নতশ্রেণীর মেয়েদের এবং অন্যান্য শ্রেণীর শতকরা ৪০ ভাগ মেয়েদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমস্ত ছেলেমেয়েদের বিনা মূল্যে স্লেট পেনসিল, বই খাতা সরবরাহ করার মধ্য দিয়ে গ্রাম-বাংলার মানুষের মনে এক নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে। উৎসাহ-মূলক কর্মসূচীর একটি পরিসংখ্যান এই লেখায় দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষায়তনগুলোর পরিবেশ সুন্দর করে গড়ে তোলার উদ্যোগ-পর্ব দ্রুতগতিতে চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যেই ৫ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণের অনুদান দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার ইতিহাসে এই বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের উদ্যোগ একটি নজীরবিহীন ঘটনা।

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের উদ্যোগে সমস্ত প্রতিক্রিয়া-শীল এবং কায়েমী স্বার্থবানেরা আজ একজোট হয়ে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে বদ্ধপরিকর। কারণ খুবই পরিষ্কার। শাসকগোষ্ঠী ইতিহাসের চাকা পিছনে ঘোরাবার ব্যর্থ চেষ্টায় অপারগ হয়ে মাঝে মাঝে গতানুগতিকতার বেড়াজাল থেকে কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা যে একেবারেই করে না তা নয়। ১৯৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে পূর্বতন সরকার প্রাথমিক স্তরের সিলেবাস পরিবর্তনের অভিপ্রায় নিয়ে একটি সিলেবাস কমিটি গঠন করে। কিন্তু উক্ত সিলেবাস কমিটিকে গতিশীল করার কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নি পূর্বতন সরকার। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সরকারী তৎপরতায় উক্ত সিলেবাস কমিটিকে সমস্ত শ্রেণীর শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে পুনর্গঠিত করে নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার করা হয়। বিভিন্ন রাজ-নৈতিক মতাদর্শের সমস্ত সংগঠনের প্রতিনিধিরাই উক্ত কমিটিতে স্থান পান। দু'বছর ধরে আলোচনা-পরামর্শ প্রভৃতির মাধ্যমে উক্ত কমিটি একটি কার্যকরী সিদ্ধান্তে আসে এবং বামফ্রন্ট সরকারের নিকট একটি সুপারিশ করে। এই প্রথম সারা ভারতের মধ্যে একটি মাত্র রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে একটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচী রচনা করা হয়।

উক্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে বলেছে, "মানবের বিকাশের কয়েকটি দিক আছে যথা—দেহ, জ্ঞান, কর্ম ও অনুভূতি। এই বিকাশ-ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায়—জ্ঞানার্জন, চিন্তন ও মননের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার মাতৃভাষা ও সাধারণ গণিত শিক্ষার দক্ষতা অর্জন অনুভূতির সুষম বিকাশ, সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধ গঠন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সু-অভ্যাসসমূহ গঠন। শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ-সাধন, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল মনোভাব গঠনের এবং তদনুযায়ী নিজ

জীবনচর্চায় অভ্যস্ত হওয়ার উপযুক্ত ভিত্তিস্থাপনই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য।"

উক্ত প্রতিবেদনে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাদানের বিপক্ষে জোরালো মত পোষণ করেন। সামাজিক ও পরিবেশ পরিচিতির এক নতুন দিকদর্শন ও নির্দেশিকা সন্নিবেশিত হয়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং বুদ্ধিজীবীদের একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ প্রচণ্ড বিরোধিতার আসরে নেমে সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে শুরু করলেন। সিলেবাস কমিটিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মূল্য লক্ষ্য সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলে নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে পারলেন না কিন্তু বাইরে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে হাত মেলালেন। কেন না সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর পরে শিক্ষার কতকগুলো মৌলিক প্রশ্ন সমাধানের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে দেখে যারা এতদিন ধরে মনের কোণে পোষণ করতেন 'লেখাপড়া করে যে গাড়ী ঘোড়ায় চড়ে সে', তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। শিক্ষা-রূপ সম্পদের অধিকারী হয়ে যারা যুগ যুগ ধরে সমাজের শোষকশ্রেণীর অনুকম্পায়, অনুগ্রহে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে শাসকগোষ্ঠীর শোষণযন্ত্রের সহায়ক শক্তি হিসাবে প্রবাহিত করার এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে তারা শিউরে উঠলেন—যখন বুঝলেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজের শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মানুষও সমাজে তার অবস্থান বুঝে নিতে চলেছে। স্বাধীনতার পরে তিন দশকব্যাপী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক কোন পরিবর্তন না করে কেবলমাত্র এক শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষার 'স্বাধীন ভারতের ইংরেজ' তৈরির প্রচেষ্টায় অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা গেল গেল রব তুলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করার চেষ্টা করলেন।

সিলেবাস কমিটির প্রতিবেদনের প্রতি পূর্ণ মূল্য প্রদান করার নিমিত্ত বর্তমান সরকার পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য এক বৈপ্লবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি প্রাথমিক শিক্ষককে বর্তমান পাঠক্রমের উপযোগী করে তোলার জন্য শিক্ষিত করে তুলতে হবে। ১৯৮০ সালের মে মাসে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে ১০ দিনের কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত বেসিক ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ, মাধ্যমিক ও কলেজস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌গণ উক্ত কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করে শিক্ষকদের জন্য প্রতিটি বিষয়ের উপরে একটি নির্দেশিকা পুস্তক রচনা করেন। ১০০ জন শিক্ষাবিদ্ উক্ত কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী আলোচনা ও মতামত ব্যক্ত করেন। শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক সৃষ্টির একটি নতুন মূল্যায়ন করেন। ভারতবর্ষের মধ্যে এই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও গতানুগতিকতা কাটিয়ে শিক্ষাকে জীবনোপযোগী করে তোলার প্রচেষ্টা দেশের বুদ্ধিজীবীদের কাছে এত গুরুত্ব লাভ করল। বর্তমান ১০০ জন শিক্ষাবিদের উদ্যোগে সারা পশ্চিমবঙ্গে ৫০,০০০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নতুনভাবে স্বল্পমেয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করছেন। এ এক নূতন উদ্যোগ। ওদের কাছে অবাক লাগাই স্বাভাবিক।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বৃটিশ শাসনের ১৯৩০ সালের পর সুদীর্ঘ ৩০ বছরের মধ্যে এমন কোন আইন করা হয় নি যা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে একই প্রশাসনিক আওতায় আনা যায়। ফলে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয় স্থাপনার মধ্যে বিস্তর ফারাক ও অসামঞ্জস্য থেকে যায়। এর ফলে নানা রকম দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ, একশ্রেণীর মানুষের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবসা-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। শিক্ষাদানের গুরুত্ব লোপ পেতে থাকে। বর্তমান সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৭৩ সালের প্রাথমিক আইনের সংশোধনী আইন পাশ করে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গব্যাপী একই ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে আনবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। রাজ্যস্তরে একটি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও জেলাস্তরে একটি করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ গঠন করে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুসামঞ্জস্য পদ্ধতিতে ঢেলে সাজান হচ্ছে। উক্ত পর্ষদগুলি সমস্ত স্তরের শিক্ষক, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি যথা পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, করপোরেশন প্রভৃতির প্রতিনিধিত্ব দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক কাঠামোর রূপ পরিগ্রহ করছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উদ্যোগকে অঙ্গীভূত করা হচ্ছে। ১৯৮০ সালের প্রাথমিক সংশোধনী আইনের কার্যকরী ব্যবস্থা এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই সুনিশ্চিত করা হবে। এর পরেও কি ওরা বলবে—বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে সংকীর্ণ রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে?

প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবনজীবিকার বিষয় বামফ্রন্ট সরকার অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে বিচার করছেন। ইতিমধ্যেই এই চার বছর মাগ্গীভাতা বৃদ্ধির ফলে গড়পড়তা প্রায় সকল শিক্ষক ১৮০ টাকার বেশী আর্থিক লাভ ভোগ করছেন। পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় পে-কমিশনে সমস্ত শিক্ষকসমাজকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন বলে অভিহিত করে একটি বেতন হার সুপারিশ করেছেন যা সারা ভারতে সর্বাপেক্ষা বেশী বেতনহার। উক্ত বেতনহার কার্যকর করতে বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা আশা করছি আগামীদিনে 'যার নাই কোন গতি সে করে পণ্ডিতি' বাক্যটি সামাজিক চিন্তা জগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে আগামীদিনে মেধাবী ছাত্রদের এই পেশা আকৃষ্ট করবে।

প্রাথমিক স্তরে উপরিউক্ত কার্যকরী ব্যবস্থাগুলি জনমানসে যে উদ্দীপনার ছাপ ফেলেছে, নিম্নের বর্ণনায় তার তুলনামূলক প্রমাণ পাওয়া যাবে।

আমরা আশা করছি, আগামী ষষ্ঠ বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৬ থেকে ১১ বৎসর বয়সের মোট ছিয়াশী লক্ষ শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা যাবে। মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছিল গত সত্তর দশকের প্রথম দিকে। বৃটিশ আমলে মাধ্যমিক শিক্ষান্তে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রাম বা শহরের শিক্ষিত মানুষ অথবা জমিদার শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ চলত। স্বাধীনোত্তর কালেও সরকারী কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—শিক্ষায় এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়েই হতে লাগল। বেকার সমস্যার সমাধান, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের স্বজন-পোষণ মাধ্যমিক শিক্ষাকে কলুষিত করল। গ্রামবাংলায় এবং শহরে ব্যবসাভিত্তিক বিদ্যালয়ের প্রাদুর্ভাবে শহরের মধ্যবিত্ত মানুষের সন্তানদের মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সত্তর দশকের প্রথমদিকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে যায় তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের মাধ্যমে পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত হয়। গণটোকাটুকি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাঙ্গণে এমনই প্রকট আকার ধারণ করে যে, আগামী দিনের ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরী করার আশা ছেড়ে দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকবৃন্দও গণটোকাটুকিতে ইন্ধন যোগাতে লাগলেন। পর্ষদ কর্তৃক বিশেষ অনুমতি দান-সাপেক্ষে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকার হাজার হাজার জুনিয়র হাই-স্কুল নবম ও দশম শ্রেণীতে উন্নীত করে "বিশেষ অনুমতি" পেয়ে

পরীক্ষার ব্যবস্থা করে ছাত্র ও অভিভাবকদের পকেট মারের কাজে লিপ্ত হলেন শিক্ষক তথাকথিত সমাজসেবী ও শিক্ষাজগতের পান্ডারা। এমনও ঘটনা দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে অন্য রাজ্য থেকে আগত তথাকথিত একজন সমাজসেবী দক্ষিণেশ্বরে শিক্ষাব্যবস্থায় বেকার যুবক-যুবতীদের মাসে ৫০/৬০ টাকা বেতন দিয়ে হাজার হাজার টাকা অর্জনের ব্যবস্থা করে নিলেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্যালয়-গুলি এই অশুভ প্রতিযোগিতায় তাদের অতীত মর্যাদা ও সুনাম বজায় রাখতে অসহায়বোধ করতে লাগল। কেন না বিদ্যালয়ের স্টান্ডার্ড বজায় রাখার মত প্রশাসন ব্যবস্থা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার ১৯৭৪ সালে স্টাফ প্যাটার্ন-এর নূতন সার্কুলার ও ১০+২ ব্যবস্থা চালু করে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিলম্ব করতে চাইলেন। অন্যদিকে নূতন স্কুলের অনুমোদনের কাজ তাদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলে ১৯৭৬ পর্যন্ত কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। সৎ ও নিষ্ঠাবান শিক্ষকদের শিক্ষাদান দুষ্কর হয়ে পড়ল। এমনই একটি নড়বড়ে প্রশাসন নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার প্রথমেই বিদ্যালয়গুলিতে তার অতীত পবিত্রতাকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দুর্নীতিগ্রস্ত মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে ভেংগে দিয়ে একটি অর্ডিন্যান্সের বলে একজন প্রশাসক নিয়োগ করে মাধ্যমিক ব্যবস্থার জরাজীর্ণ অবস্থায় একটু প্রাণসঞ্চার করলেন। বিশেষ অনুমতি দানে পরীক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়া হল। বামফ্রন্ট সরকারের চার বছরের সবচেয়ে বড় অবদান পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন। নিয়মিত পরীক্ষা ব্যবস্থা আজ অভিভাবক, ছাত্রসমাজ ও শিক্ষক সমাজের মনে এক নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। পশ্চিমবংগ একটি রাজ্য যেখানে মাধ্যমিক পরীক্ষা আবার মার্চ মাস থেকে আরম্ভ হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হচ্ছে। শহর ও মফস্বলের ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় সমভাবে কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছে। বিশেষ বিশেষ ব্যবসা-ভিত্তিক বিদ্যালয়গুলি কেবল কৃতি ছাত্র সৃষ্টি করার মর্যাদায় অধিকারী হচ্ছে না।

বর্তমান নতুন আইন সংশোধনের ফলে মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক কাঠামোতে ঢেলে সাজান হয়েছে। অদূর-ভবিষ্যতে শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা একটি স্বয়ংস্বাশিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিক শিক্ষার আরও গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটাতে চলেছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে পশ্চিমবংগের বামফ্রন্ট সরকার অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্পদ এলাকার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করেছেন এবং সংখ্যালঘু ভাষাভিত্তিক বিদ্যালয়ের অনুমোদনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

নিম্নবর্ণিত পরিসংখ্যান পশ্চিমবংগের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার অগ্রগতির হিসাব প্রতিফলিত করবে।

	১৯৭২-৭৬	১৯৭৭-৮১
১। নূতন বিদ্যালয় (মাদ্রাসা সমেত)	—	৯১৫
২। নূতন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি	—	৮০০০+নতুন বিদ্যালয়ের সংগঠন শিক্ষক
৩। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭৫১	৩৩৫
৪। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নূতন শিক্ষকপদ সৃষ্টি	সৃষ্টি হয় নি	৬২১১
৫। পূর্ণ ঘাটতি অনুদান	১.১.৭৩-এর পূর্ব পর্যন্ত ৩,৫০০	সমস্ত হাই, জুনিয়ার হাই, হাই মাদ্রাসা ও জুনিয়ার হাই-মাদ্রাসা এবং সিনিয়ার মাদ্রাসা—সর্বসাকুল্যে প্রায় ১০ হাজার বিদ্যালয়
৬। আনুপাতিক খরচ	কিছু দেওয়া হত না	১৯৮০-৮১ সব পূর্ণ বেতন, ঘাটতি বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা অনুযায়ী বিভিন্ন হারে কন্টিনজেন্সি অনুদান দেওয়া হচ্ছে।
৭। গৃহনির্মাণ বাবদ অনুদান		
(ক) উচ্চ মাধ্যমিক	৬৫	৮৫১
(খ) মাধ্যমিক	কোন রেকর্ড নেই	১৩৭০
(গ) জুনিয়র হাই	—	৬৮৫
(ঘ) উচ্চ মাদ্রাসা	—	৬৩
(ঙ) জুনিয়র মাদ্রাসা	—	৬০
(চ) সিনিয়র মাদ্রাসা	—	৯
৮। উন্নয়নমূলক কর্মসূচী		
(ক) বিনামূল্যে টিফিন	৬টি সরকারী বালিকা বিদ্যালয়	১০ হাজার বালক ১০ হাজার বালিকা
(খ) পাঠ্যপুস্তক	৫০০টি	২৪৭০টি
(গ) ল্যাবরেটারী অনুদান	১০৪০টি	২৫৬৬টি
(ঘ) ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক	আগে দেওয়া হত না	৩৬,০০০ ছাত্র-ছাত্রীকে
৯। ভাষাগত সংখ্যালঘু ও তপসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য		
(ক) তপসিলী ছাত্রাবাস	৮০	৯২
(খ) তপসিলী আশ্রম ছাত্রাবাস	৩০	৩১
(গ) তপসিলী উপজাতি ছাত্রাবাস	৫০	৭৬

১৯৭৭ সালের পূর্বে সংখ্যালঘু ভাষাগত সম্প্রদায়ের জন্য বিদ্যালয়ের কোন সুযোগ ছিল না। বর্তমানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সে ব্যবস্থা হচ্ছে।

বামফ্রন্ট সরকারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও চার বছরের মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা। ১৯৭৭ সালের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বালিকাদের জন্য শিক্ষা অবৈতনিক ছিল। এমন কি পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এ কথা জোরের সঙ্গে বলা যেত না যেহেতু শহরাঞ্চলে অনেক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে নানা অজুহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ফি আদায় করে স্কুলের ব্যবসা চালাত এক শ্রেণীর সাধুবেশী ঠগ্ বিদ্যাব্যবসায়ীগণ।

বামফ্রন্ট সরকার একদিকে যেমন দীর্ঘদিনের সামন্তপোষণের পাপ খাজনা ব্যবস্থা তুলে দিয়ে কৃষক সমাজের কাছে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন অন্যদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে বেতন-রূপ বাধাকে অপসারিত করে সর্বসাধারণের নিকট শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ক্ষেত মজুর, প্রান্তিক কৃষক, কুটীরশিল্পী, ছোট ব্যবসায়ী আজকে তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার প্রেরণা পেয়ে বলতে পারে "যা বাবা একটু শুনে পড়ে আয়, বেতন তো আর লাগবে না! আমার কাজ অবসর সময়ে করবি।" গ্রাম-শহরের ধনিক-শ্রেণীর প্রতিভূ আর বলতে পারে না, 'তোর ছেলেকে স্কুলে দিয়ে কি করবি? চাকরি পাবে? দেখছিস না—আমার কয়টি বেকার? তোর ছেলে লেখা পড়া শিখে চাকুরি পাবে না আবার কিষাণ দাস হবে? কি হবে পয়সা খরচ করে ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে' ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ থেকে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিষময় প্রতিফলন পড়তো কম টাকা বেতন দেওয়ার মধ্য দিয়ে। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারের সন্তানরা যখন শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত বেতন প্রদানের গর্বে শ্রেণীকক্ষের প্রথম সারিগুলিতে বসে শিক্ষক মশাই-দের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করত তখন গরীবের সন্তানেরা পিছনের বেঞ্চিতে বসে নিজেদের অর্থনৈতিক দৈন্যদশার কথা ভেবে হীন-মন্যতারূপ সেন্টিমেন্টের শিকার হয়ে নিজেদের ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ করত। এই অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং শ্রেণীকক্ষে অন্তত একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা গেছে। এখনও সমাজে যখন অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকটরূপেই বিদ্যমান তখন ধনীর দুলালেরা বিদ্যারূপ সম্পদকে বিক্রয় করার যথেষ্ট সুযোগ পাবে তবু গরীবের সন্তানদের নিকট শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে বামফ্রন্ট সরকার উপস্থাপিত করেছে এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মধ্যদিয়ে।

শিক্ষক-শিক্ষিকার বেতন প্রদানের ব্যবস্থার আমূল পবিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে ম্যানেজিং কমিটির দয়ার উপর নির্ভর করতে হয় না কোন মাধ্যমিক শিক্ষককে। ব্যাংকের মাধ্যমে মাস-পয়লা বেতন প্রদানের ব্যবস্থা শিক্ষক সমাজের নিকট একটি অকল্পনীয় হয়েছিল সুদীর্ঘকাল ধরে। শিক্ষক নিয়োগ-নীতির পরিবর্তন করে সর্বক্ষেত্রে যোগ্য ও সর্বাধিক গুণাবলীসমন্বিত শিক্ষকদের শিক্ষায়তনে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বজন-পোষণ ও দুর্নীতি দূর করার জন্যই এরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির মুসলিম মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে নানাভাবে মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করতে থাকে। মাদ্রাসাশিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে ইংরেজ থেকে আরম্ভ করে আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী সুকৌশলে মুসলিম সমাজকে পশ্চাদপদ করে রাখার হীনচক্রান্তে লিপ্ত, অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা বিস্তারের নামে শিক্ষাক্ষেত্রে কতকগুলো সমস্যা সৃষ্টি করে। কার্যত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা হতাশাগ্রস্ত মুসলিম যুবকদের কোন রকমে জীবিকা অর্জনের একটি ব্যবস্থা মাত্র। বামফ্রন্ট সরকার প্রথমেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে পরীক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত দুর্নীতিকে দূর করে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সমপর্যায়ভুক্ত স্থানে দাঁড় করান। প্রতিটি বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। পরীক্ষক নির্বাচনও শিক্ষকদের যোগ্যতার ভিত্তিতে করা হয়। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার একটি অঙ্গ হিসাবেই পরিগণিত করা হচ্ছে। বিগত ১৯৬৭ সাল থেকে মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের কোন সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নি—বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অতীতের এই সমস্ত কাজের বোঝা দ্রুততার সঙ্গে সমাধা করা হচ্ছে।

সিনিয়র মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানর জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হয়। উক্ত কমিটির সুপারিশ অনুসারে এই প্রথম ভারতের মধ্যে একটি অঙ্গরাজ্যে সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনক্রম চালু করা হয়েছে। সিনিয়র মাদ্রাসার সিলেবাস পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে। ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে সমন্বয়সাধন করা হয়েছে। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্দিষ্ট কোটার ভিত্তিতে এবং পরিদর্শকদল কর্তৃক সুপারিশ-ক্রমে পশ্চিমবঙ্গে গত চার বৎসরে ২৫টি হাই মাদ্রাসা—৪৯টি জুনিয়র হাই এবং ১৮টি সিনিয়র মাদ্রাসাকে অনুমোদনের ব্যবস্থা হয়েছে।

শিক্ষার সহযোগী সংস্থা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। গত চার বৎসরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয়েছে—যেখানে ১৯৭৭ সালের পূর্বে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা মাত্র ৭০০টি ছিল,—সেখানে বর্তমানে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭৭৫টিতে। পূর্বে যেখানে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি বৎসরে ৬০০ টাকা অনুদান পেত, বর্তমানে সেটা ৪০০০ টাকায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। মহকুমা গ্রন্থাগার ৩০০০ হাজার টাকা থেকে ১০৫০০ টাকা, জেলা গ্রন্থাগার ৫০০০ হাজার টাকা থেকে ৫০০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা

কান্তি বিশ্বাস

কর্মহীনতা কর্মক্ষম মানুষের বড় অভিশাপ। এই ব্যাধি শুধু ব্যক্তির জীবনকেই দুর্বিষহ করে তাই নয় গোটা সমাজকেও কলুষিত করতে উদ্যত হয়। কত গবেষণা, কত আবিষ্কার এই পৃথিবীতে হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কতই না অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অথচ দুনিয়ার দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে এই সর্বনাশা ব্যাধির দাপট বেড়েই চলেছে। যে সকল যুবক-যুবতী কাজের আশায় দিনগুণে চলেছেন—কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম লিখিয়েছেন—উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেও এদের সংখ্যা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। ১৯৮০ সালের শেষের হিসাবে দেখা যায় এদের সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭৪ লক্ষ, পশ্চিম জার্মানিতে ৯ লক্ষ, ফরাসী দেশে ২২ লক্ষ. ব্রিটেনে ১৮ লক্ষ এবং জাপানে ১১ লক্ষ। আমাদের দেশ ভারত-বর্ষ। চাষযোগ্য উর্বরা জমির পরিমাণে এই দেশ অদ্বিতীয়। অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের বিচারে এই দেশ বহু দেশের ঈর্ষার কারণ। স্বাধীনতালাভের পর পাঁচ পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ করে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দেড় বৎসর পিছনে ফেলে আসলাম কিন্তু বেকার সমস্যার ভয়াবহতা কমেনি বরং বেড়েই চলেছে। এক সমীক্ষার ফল ১৯৮০ সালের ২১শে নভেম্বরের ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেসে প্রকাশিত হয়েছে।

তথ্যটি নিম্নরূপঃ—

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে (১৯৫৬) বেকার সংখ্যা ছিল ... ৫৩,০০,০০০

দ্বিতীয় ” ”	”(১৯৬১)	...	৭১,০০,০০০
তৃতীয় ” ”	”(১৯৬৫)	...	৯৬,০০,০০০
তিন বৎসরের পরিকল্পনা ছুটির	”(১৯৬৮)	...	১,২৬,০০,০০০
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার	”(১৯৭৩)	...	১,৭১,০০,০০০
পঞ্চম ” ”	”(১৯৭৮)	...	২,১২,০০,০০০

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী গত ৭.৫.৮১ তারিখে রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের (প্রশ্ন নং ১৫৬৬) জবাবে জানিয়েছেন, চলতি ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে একমাত্র শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই বেড়ে দাঁড়াবে ৪৬ লক্ষ ৬০ হাজার। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রথম শুরু সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯২৯ সালে। তখন তাদের শুধু গ্রামীণ বেকারের সংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ। ১৯৩০ সালের শেষে বিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টি করে তারা দেখিয়ে দিল যে সে দেশে সকল যুবকের জন্য তারা কাজের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। কোন বেকার নেই। পৃথিবীর বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ চীন। সেখানেও কোন বেকার নেই। বিশ বৎসরের উপর ধরে দাঁতে দাঁত দিয়ে দুনিয়ার দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে লড়াই করে যাঁরা দেশকে মুক্ত করল —বেকার নেই সেই ভিয়েতনামেও। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষ বসবাস করে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে তার কোথাও বেকারত্বের যন্ত্রণায় যুবজীবনকে আর্তনাদ করতে হয় না।

এই অর্থনৈতিক সামাজিক কাঠামো অক্ষত রেখে কেউ কল্পনাও করে না যে বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হবে। কিন্তু গণমুখী নীতি, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোন জনকল্যাণকামী সরকার যদি অগ্রসর হয় নিশ্চিতভাবে এই সংকটকে কিছুটা লাঘব করা যায়।

প্রায় সকল সংবিধান বিশারদগণই স্বীকার করেন যে, আমাদের সংবিধান পদবীতে যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও কাজে এককেন্দ্রীক। সুষম অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে যে ক্ষমতা ও অধিকার একান্ত প্রয়োজনীয় তার সিংহভাগই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত। দেশকে শিল্পায়িত করতে হলে যে সব প্রাথমিক শর্ত পূরণ করা দরকার তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রায় সবটুকুই দিল্লির সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত। এই অবস্থায় কোন রাজ্য সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন মৌলিক পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই ওঠে না এমন কি, কোন বলিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। রাজ্যসরকারগুলির পক্ষে এই পরিস্থিতি আরও সংকটময় হয়ে ওঠে যদি গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীন কোন স্বৈরতান্ত্রিক সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন থাকে। এমন কি কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই দলের সরকার থাকলেও এই অবস্থার কোন গুণগত তারতম্য হয় গত ৩৪ বৎসরের ইতিহাসে তারও কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই সকল অনিবার্য বাধা বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও বেকারীর জ্বালা কমানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার গত চার বৎসরে যা' যা' করেছে তা দেশের সমগ্র যুব সমাজকে অধিকতর পরিমাণে সচেতন করে তুলবে। উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে তাঁদের। নতুন অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ হয়ে নতুন পথে সংগঠিত হতে যুব-সম্প্রদায়কে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবে তাতে বিন্দুমাত্র সংশয়ই নেই।

কর্মসংস্থানের প্রশ্নে এই রাজ্যের বর্তমান সরকারের ভূমিকা মূলতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সম্পন্ন কর্মসূচী, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প এবং মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পে গ্রহণ করা ব্যবস্থা।

গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী

আমাদের রাজ্যে শতকরা ৭৫ জন মানুষ বাস করেন গ্রামে। সামন্ততান্ত্রিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক ও মহাজনী-শোষণ বিভিন্ন প্রকারে এখনও গ্রামে বিদ্যমান। খেতমজুর, ছোট কৃষক এবং প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা, গ্রামীণ মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ। গ্রামবাংলার এই ৩৮ হাজার গ্রামে ১৯৭৮ সালে দেড়যুগ পরে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ১৫টি জেলা পরিষদ, ৩২৪টি পঞ্চায়েত সমিতি ও ৩২৪২টি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে। সেই থেকে এই পঞ্চায়েতের সাহায্য নিয়ে কাজের বিনিময়ে খাদ্য, গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা, গ্রাম পুনর্গঠন প্রকল্প প্রভৃতির সাহায্যে গ্রামে যে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে তাতে গ্রামীণ বেকারী বা কৃষিজীবী বেকারীর তীব্রতা একটু কমেছে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে গত চার বৎসরে ১৬ কোটি ৮৩ লক্ষ ১৪ হাজার কাজের দিন সৃষ্টি হয়েছে। অন্যান্য কর্মসূচী নিয়ে সাকুল্যে ১৯ কোটি কাজের দিন এই সময়ে তৈরি হয়েছে। যার ফলে, গড়ে প্রতি বৎসরে প্রায় ৫ কোটি শ্রমদিবস গড়ে তুলে এই সরকার দেশের সামনে এক

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছে। এই কর্মসূচী রূপায়ণের সাথে সাথে ভূমিসংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, কৃষি সম্পর্কে বিভিন্ন ঘোষণা একত্রে গ্রামোন্নয়ন ও কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি করার যে সুযোগ তৈরি হয়েছে তাতে ভবিষ্যতে আরও নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। গ্রামে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় একটি কাঠামো একটু পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পেরেছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

এই রাজ্যে নিবন্ধভুক্ত ক্ষুদ্র শিল্পের বর্তমান সংখ্যা ১,৪০,৫২০। এর মিলিত কর্মসংস্থানের পরিমাণ ২,৯৫,৮২১। গত চার বৎসরে নিবন্ধভুক্তির পরিমাণ ৪৩,৮৯৭। অর্থাৎ এ যাবৎ যত সংস্থা হয়েছে তার শতকরা ৩১ ভাগই হয়েছে এই সরকারের আমলে।

খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষৎ-এর ঋণ অনুদানের সুযোগ দূর দূরান্ত গ্রামের অবহেলিত কুটিরশিল্পী ও শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকার যুবকের নিকট পর্যন্ত পেঁাছে দেওয়া গেছে। ১৯৭৭ সালের পূর্বের চার বৎসরে এই ঋণ ও অনুদানের পরিমাণ ছিল ২৬,৬০,০০০ টাকা, তা বেড়ে বিগত চার বৎসরে হয়েছে ১,৯৪,০০,০০০ টাকা অর্থাৎ পূর্ববর্তী চার বৎসরের ৭ গুণেরও বেশি। এর ফলে, ২৭,০৮৩ জনের অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

রেশমের চাষকে সম্প্রসারিত করে নতুন করে অন্ততঃ ৫৫,০০০ জন মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে সাহায্য করা গেছে। এ ছাড়া যুবকল্যাণ এবং তফসিলী আদিবাসী মঙ্গল বিভাগের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে আরও কয়েক হাজার যুবকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প

শিল্পের ক্ষেত্রে বহুবিধ বাধা ডিঙিয়ে এই সরকারের আমলে যতটুকু অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে ইতিপূর্বে তার কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঐ বিষয়ে গুটিকয়েক তথ্য নিচে দেওয়া হলঃ

১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ সালে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে—২০৩টি, বিনিয়োগ হয়েছে ১৫৩ কোটি টাকা; প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে—৪৪২টি, প্রকল্পের বিনিয়োগ হবে—৯২০ কোটি টাকা, সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের পরিমাণ সৃষ্টি হয়েছে—৪৩,০০০ জনের।

১৯৮১-৮২ সালে শেষ হবে এমন প্রকল্পের কাজ চলছে ১৩৩টিতে। এতে বিনিয়োগ হবে ৩৫৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭৬-৭৭ সালে অর্থাৎ এই সরকার আসবার আগের বৎসরে সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থাপনের পরিমাণ বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পেয়েছিল ১৭,০০০। (উৎস—রিভিউ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।

বর্তমান আর্থিক বৎসরের ৪ মাসে আরও ৩৮টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে—এতে বিনিয়োগ হবে ৩৭ কোটি টাকা।

রুগ্ন ও বন্ধ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য বরাদ্দ হয়েছে এই সময়ে ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এই চার বৎসরে ৩৫টি রুগ্ন ও বন্ধ শিল্প-কারখানা খুলে প্রায় ৩৫,০০০ হাজার শ্রমিককে তাঁদের কাজ ফিরে পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এদের সাময়িক বেকারত্ব ঘুচেছে।

রাজ্যের ঝিমিয়ে পড়া অর্থনৈতিক গতিকে চাঙ্গা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাবে রাজ্যের ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যেও। ১৯৭৬-৭৭ সালে পরিকল্পনা বাবদ এই রাজ্যের জন্য প্রাক্তন রাজ্য সরকার ব্যয়-বরাদ্দ করেছিল মাত্র ২০৪ কোটি টাকা। সেই বরাদ্দের পরিমাণ প্রতি বৎসর বাড়াতে বাড়াতে ১৯৮০-৮১ সালে করা হয়েছিল ৫৮৩ কোটি টাকা। চলতি সালে (১৯৮১-৮২) ঐ বাবদ খরচের পরিমাণ ৬৭০ কোটি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে অর্থাৎ ৪ বৎসরে পরিকল্পনা খাতে তিন গুণেরও বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে পরিকল্পনা বহির্ভূত ও পরিকল্পনাগত ব্যয়ের আনুপাতিক হার ছিল ৩:১। বাহুল্য ব্যয় বর্জন করে পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়ার ফলে এই আনুপাতিক হার এখন দাঁড়িয়েছে ২:১।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে এই রাজ্যে (১৯৭৪-৭৮) শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের সমস্ত পরিকল্পনার জন্য ব্যয় হয়েছিল ৩১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) এই বরাদ্দ বৃদ্ধি করে করা হয়েছে ১৬৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ পাঁচ গুণেরও বেশি।

একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ গড়ে তোলার কাজে এই সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে বেকার যুবকের বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে কাজ দেওয়ার লোভ দেখিয়ে যাতে কেউ তাঁকে জাহান্নামের পথে টেনে নামাতে চেষ্টা করতে না পারে সেজন্য চাকুরি দেওয়ার মালিক—আগের সরকারের ক্যাবিনেট সাব-কমিটির পথকে বর্জন করে একমাত্র কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কাজের ব্যবস্থার বলিষ্ঠ নীতি বর্তমান সরকারের জন্মলগ্ন থেকেই চালু হয়েছে। এই কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ইতো-মধ্যে ৫৫ হাজার যুবক-যুবতী কাজ পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের যেসকল সংস্থা অন্ততঃ এই রাজ্যে আছে সেখানেও এই নীতি কঠোরভাবে বলবৎ করার জন্য অবিরত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রাজ্য সরকার দাবি জানিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের কথা, কেন্দ্রীয় সরকার তাতে উল্লেখযোগ্যভাবে কোন সাড়া দিচ্ছে না। ফরাক্কায় জাতীয় তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে এই নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে খামখেয়ালীভাবে লোক নিয়োগ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর প্রতিবাদে এই রাজ্যের যুবসমাজ বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলার যুব সম্প্রদায় দলমত নির্বিশেষে সংগঠিতভাবে একে প্রতিরোধ করে যাচ্ছেন। রাজ্য সরকার বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে সম্ভবমত এই প্রথা চালু করার জন্য আগ্রহী এবং সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সংবিধান সংশোধনের জন্য অনুরোধ করা হতে পারে।

তথাপি কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথীভুক্ত বেকারের সংখ্যা এই রাজ্যে ২৭ লক্ষের উপর। এর মধ্যে ৩ লক্ষের মত যুবক-যুবতী এই রাজ্য সরকারের প্রচলন করা বেকারভাতা পাচ্ছেন। বর্তমান বৎসরে ঐ বাবদ সাড়ে চৌদ্দ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বেকারভাতা সমাধান নয়। কিন্তু এটা স্বীকৃত যে বেকারিত্বের জন্য দায়ী বেকার যুবক নয়—দায়ী সমাজব্যবস্থা। সংবিধানের ৪১ নং অনুচ্ছেদে বেকারভাতা দেওয়ার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হলেও আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ঐ বিষয়ে কোন উদ্যোগও গ্রহণ করে নি—উপরন্তু এই রাজ্য সরকার ভারতে এই প্রথম এই ব্যবস্থা যখন প্রবর্তন করল তখন কেন্দ্রের কাছ থেকে বন্দনা না এসে নিন্দাই এই সরকারের ভাগ্যে জুটেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা

গ্রামীণ কর্মসংস্থানের কাজের বদলে খাদ্য ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মসূচী সরেজমিনে দেখে যোজনা কমিশন নিযুক্ত কর্মসূচী মূল্যায়ন কমিটি তার চূড়ান্ত রিপোর্টে এর ভূয়সী প্রশংসা করেছে। তৎসত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এ বাবদ প্রতিশ্রুতিমত গম দিতে কার্যতঃ অস্বীকার করেছে। অন্যতম অজুহাত হিসাবে

রাজ্য সরকারের নিকট হতে অন্ততঃ ৫০ শতাংশ ভাগ গমের হিসাবও না পাওয়ার কথা তারা বলেছিল। অথচ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একাধিকবার তথ্য দিয়ে বলা হয়েছিল যে ৫০ শতাংশ কেন ৯৫ শতাংশ গমের হিসাব তারা দিল্লিতে জমা দিয়েছে। তথাপি যখন কেন্দ্রীয় সরকারের এই গান বন্ধ করা গেল না তখন এর সত্যাসত্য ঠিক করার জন্য সংবিধানের ১৪৩ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্য সরকার বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টে পাঠাতে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এমনই সৎ সাহস যে এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। প্রকৃত ঘটনা হ'ল, কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পকে আস্তে আস্তে সংকুচিত করতে চায়। ১৯৭৯-৮০ সালের কাজের বদলে খাদ্য এই বাবদ কেন্দ্রীয় জনতা সরকার বরাদ্দ করেছিল ৭০০ কোটি টাকা। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এর নাম পরিবর্তন করে রেখেছে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প এবং ১৯৮০-৮১ সালে এর বরাদ্দের উপরে কাঁচি চালিয়ে অর্ধেক করে মঞ্জুর করেছিল ৩৪০ কোটি টাকা এবং বর্তমান আর্থিক বৎসরে ঐ বাবদ বরাদ্দের পরিমাণ আরও কমিয়ে করেছে মাত্র ১৮০ কোটি টাকা। সম্প্রতি (১৭.৭.৮১) অনুষ্ঠিত দিল্লিতে এই বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীদের সভায় কেন্দ্রীয় শাসকদলের বহু রাজ্যমন্ত্রীই এই বাবদ অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করতে কেন্দ্রের কাছে জোরালো দাবি হাজির করেছেন।

এটা সর্বজনস্বীকৃত যে আমাদের মত গরিব দেশে কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্য গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর। আমাদের রাজ্যে এই শিল্পের যে প্রসার ঘটেছে তাকে আরও অনেক ব্যাপক করা যেতো যদি কেন্দ্রীয় সরকার এক্ষেত্রে একমাত্র বড় শিল্পপতিদেরই সেবা করার নীতি একটু সম্বরণ করতে পারত; এই শিল্পের পক্ষে যে সকল বড় বাধা আছে তার মধ্যে একটি কাঁচামালের অভাব। ক্ষুদ্র শিল্পে কাঁচামাল কেন্দ্রীয় সরবরাহ সংস্থা থেকে আমাদের রাজ্যের ভাগ্যে জুটেছে ১৯৮০-৮১ সালেঃ

ইস্পাত— প্রয়োজনের তুলনায়		৮·৫ শতাংশ	
লৌহপিন্ড	,, ,,	৯·৫	,,
প্যারাফিন	,, ,,	১৪·৬	,,
চর্বি	,, ,,	১·৯	,,

কাঁচামালের অভাবে এ্যালকোহল ভিত্তিক শিল্পের এই রাজ্যে নাভিশ্বাস উঠেছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাগণ অর্থের জন্য যখন ব্যাঙ্কের স্বারস্থ হন তখন তাঁদের আবেদনের শতকরা ৮০ ভাগই নাকচ হয়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসহ বিভিন্ন বিভাগে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পের অধীন বহু শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবকের কাজের ব্যবস্থা হতে পারে। এতে অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। প্রধানতঃ এই বিনিয়োগ করার দায়িত্ব ব্যাঙ্কের। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার সময় থেকে এই ভূমিকা ব্যাঙ্ক বলিষ্ঠতার সাথে পালন করবে এই কথাই অহরহ প্রচার করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত এই ব্যাঙ্কগুলির বিনিয়োগের এই পরিমাণ এই রাজ্যে কি তা' একটু দেখা যাক।

এই রাজ্যে গ্রাম ও আধা শহর এলাকাতে প্রতি ৩৫,০০০ লোক-পিছু একটি করে ব্যাঙ্কের শাখা, যদিও ভারতে এর সামগ্রিক গড় ২০,০০০-পিছু একটি। এই ব্যাঙ্কগুলি এই রাজ্যে তার জমা টাকার শতকরা ৩৫ ভাগ বিনিয়োগ করে। অথচ বিহারে ৬২, ওড়িশায় ৮৭, মহারাষ্ট্রে ৬৭, অন্ধ্রপ্রদেশে ১০৪, কর্ণাটকে ৭০, তামিলনাড়ুতে ৮৯, মধ্যপ্রদেশে ৬৬, রাজস্থানে ৮০, হরিয়ানায় ৬৭ এবং কেরালায় ৫৪ ভাগ বিনিয়োগ করেছে। ব্যাঙ্কগুলির নিকট থেকে ঋণ পাওয়ার প্রধান বাধা জামিন বা গ্যারান্টি না পাওয়া। গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানেরা এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পায় না। কিন্তু "ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া" স্থাপিত হওয়ার পর অন্ততঃপক্ষে এই অসুবিধা দূর হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তা হয় নি। ফলে, কোন নিজস্ব আর্থিক সম্পদ ছাড়া কোন উৎসাহী ও সম্ভাবনাময় যুবকের পক্ষে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কিছু করা খুবই দুরূহ কাজ। এই অবস্থায় রাজ্য সরকার রাজ্যের ঋণ-গ্রহণেচ্ছু অগণিত মানুষের দুর্দশা ও অসহায় অবস্থা বিবেচনা করে রাজ্য সরকারের একটি নিজস্ব ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে মনস্থ করে। রাজ্য সরকার মনে করে এই প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কের সাহায্যে ঋণের ক্ষেত্রে শূন্যতা খানিকটা পূরণ করা যাবে এবং যে সকল মেকি অজুহাতে এই রাজ্যের সম্পদহীন মানুষকে ঋণ দিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি চরম অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া সম্ভব হবে। এ বৎসরের শুরুতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট এই ব্যাঙ্ক খোলার অনুমতি চেয়ে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে, দুর্ভাগ্য এখনও কোন উত্তর আসে নি।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উৎপন্ন পণ্যের বাজার সৃষ্টির ক্ষমতা রাজ্য সরকারের সীমিত। এই শিল্পকে সাহায্য করার জন্য কোন কোন দ্রব্যের উৎপাদন করার একচেটিয়া অধিকার এদের হাতে দেওয়া উচিত এবং কোন কোন দ্রব্য উৎপাদন করার ঊর্ধ্বসীমা বৃহৎ কারখানার জন্য বেঁধে দেওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে নির্দেশ কিছু দিলেও কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হয় না বললেই চলে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতি, আমদানি-রপ্তানি নীতি এবং কর-নীতি অধিকাংশ সময়ে এই শিল্পকে সাহায্য না করে আঘাতই দিয়ে থাকে। ফলে এই শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে বেকারত্বের চাপ যে পরিমাণে কমানো যেত তার ধারেকাছেও যাওয়া যায় নি।

একথা সকলের জানা যে বেকার সমস্যার সমাধানের পথ—দেশকে শিল্পায়িত করা বেশি বেশি পরিমাণে শিল্প কারখানা গড়ে তোলা। সংবিধানের ৭ম তফসিলে ২৪ নং ধারায় শিল্পকে সাধারণভাবে রাজ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ঐ তফসিলেই কেন্দ্রীয় তালিকায় ৭ ও ৫২ নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে কিংবা জনস্বার্থের খাতিরে যে কোন শিল্পকে কেন্দ্রীয় সরকার নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। শুধু তাই নয়, শিল্প প্রসারের জন্য যে পরিবেশ আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন তা মূলতঃ ও প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় সরকার। শিল্প লাইসেন্স প্রদান করা থেকে শুরু করে অর্থ, বৈদেশিক মুদ্রা, কাঁচামাল, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়, করনীতি এক কথায় কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর শিল্পের বিকাশ নির্ভর করে। স্বাধীনতা লাভের পরেও কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতির ফলে দেশে শিল্পের অগ্রগতি নিদারুণভাবে বাধা পাচ্ছে। বেকারী বাড়ছে। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত হচ্ছে। এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষক দল পৃথিবীর ২০০টি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সমীক্ষা করে যে তথ্য প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যায় যে, মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বিচারে ভারতের স্থান ১৯৬তম অর্থাৎ ভারতের নিচে মাত্র ৪টি দেশ আছে।

আরও উদ্বেগের বিষয় যে শিল্পের ক্ষেত্রে যতটুকু উন্নতি হয়েছে তাতে আঞ্চলিক বৈষম্য না কমে বেড়েই চলেছে। বঞ্চনার বিচারে ভারতের পূর্বাঞ্চল দুয়োরানীর অভাগা সন্তান। নীচে দু-একটি তথ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি। ১৯৭২ সালের ৩১শে মার্চ থেকে ১৯৭৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সংগঠিত শিল্পে যে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে তার অঞ্চলভিত্তিক পরিসংখ্যান হচ্ছেঃ

অঞ্চল		বৃদ্ধি
উত্তর অঞ্চল—	৭ বৎসরে বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৫·৩৮ শতাংশ
পশ্চিম অঞ্চল	„ „ „ „	২৭·৫৭ „
দক্ষিণ অঞ্চল	„ „ „ „	২৩·৫২ „
মধ্য অঞ্চল	„ „ „ „	১৮·৯০ „
পূর্ব অঞ্চল	„ „ „ „	১৬·০৬ „
ভারতের গড়	„ „ „ „	২৩·২৩ „

(উৎস—ভারত সরকারের শ্রমবিভাগের ত্রৈমাসিক এমপ্লয়মেন্ট রিভিউ)

চতুর্থ ও পঞ্চম যোজনাকালে সারা দেশে কলকারখানার কাজের সংখ্যা বেড়েছে ৪৬·৮৬ লক্ষ। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বেড়েছে ২·২৭ লক্ষ।

কলকারখানা স্থাপনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন মূলধনের। আমাদের মত গরিব দেশে এই অর্থের যোগানের একটা বড় অংশ আসে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থপ্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও অসমতা বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় অর্থ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত গত দশ বৎসরে বিভিন্ন রাজ্যে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা থেকে কয়েকটি উদাহরণ এখানে উপস্থিত করছিঃ

রাজ্য				বিনিয়োগ
গুজরাটে (লোকসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের ৪৫ শতাংশ মাত্র)	...	...	...	৭৬৯·৩৩ কোটি টাকা
মহারাষ্ট্রে (লোকসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের ১০ শতাংশ বেশি)	...	...	...	১০১৯·৮৬ „ „
কেরালায়	...	...	...	১৫৬·৭৭ „ „
পশ্চিমবাংলায়	...	...	...	৪৭৩·৭৮ „ „
ত্রিপুরায়	...	...	...	৩·৭০ „ „

(উৎস—আই ডি বি আই-এর অপারেশনাল স্ট্যাটিসটিক্স ১৯৭৫-৭৬ থেকে ১৯৭৮-৭৯)

প্রথম যোজনা থেকে শুরু করে পঞ্চম যোজনার শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে সারা দেশে বিনিয়োগ হয়েছে ১৫,৬৬৮ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ হয়েছে ১০৮৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ সারা দেশের ৬·৯ শতাংশ মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের সংগঠন আই ডি পি আই যে তথ্য প্রকাশ করেছে তা থেকে কেন্দ্রীয় অর্থ বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলিও এই রাজ্যের প্রতি অবিচার করে চলেছে তার একটি ছোট্ট হিসাব দিচ্ছিঃ

এই প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশে গড়ে মাথাপিছু বিনিয়োগ করেছে ... ... ৯৫·৫৯ টাকা

„	„	গুজরাটে	...	২৪৯·৯১ „
„	„	মহারাষ্ট্রে	...	২২৬·০৩ „
„	„	কর্ণাটকে	...	১৩৬·৫২ „
„	„	হরিয়াণায়	...	১৪২·১৩ „
„	„	তামিলনাড়ুতে	...	১২৪·৯৯ „
„	„	পাঞ্জাবে	...	১০৫·৩৮ „
„	„	পশ্চিমবঙ্গে	...	৯১·২১ „

শুধু আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকার দ্বারাই আঞ্চলিক বৈষম্য আরও শোচনীয় হচ্ছে তা নয়, কেন্দ্রীয় সরকার তার যোজনা বরাদ্দের ক্ষেত্রেও একই পথ অনুসরণ করে চলেছে। ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পরিকল্পনা-খাতে কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে দেশে গড়ে মাথাপিছু বাৎসরিক ব্যয় ধার্য করেছে ৫২ টাকা, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ৩২ টাকায়। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীতেওয়ারী গত ১৯-২-৮১ তারিখে রাজ্যসভায় সি পি আই এম সদস্যা শ্রীমতী কনক মুখার্জীর এক প্রশ্নের উত্তরে যা জানিয়েছেন তা থেকে দেখা যাচ্ছে, এই রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ শুধু যে সর্বনিম্ন তাই নয়, তা আবার বছরে বছরে কমে যাচ্ছে। বার্ষিক যোজনা-খাতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দঃ

১৯৭৮-৭৯ সালে	মাথাপিছু	কেন্দ্রীয়	বরাদ্দ		৫২ টাকা
১৯৭৯-৮০	„	„	„	„	৩৩ „
১৯৮০-৮১	„	„	„	„	৩২ „

ষষ্ঠ যোজনায় কেন্দ্রীয় সাহায্য এই রাজ্যের জন্য ধরা হয়েছে ৪৯৯৫ কোটি টাকা। এই রাজ্যের অর্ধেকেরও কম লোকসংখ্যাযুক্ত গুজরাটের জন্য ধরা হয়েছে ৩৬৬০ কোটি টাকা এবং মহারাষ্ট্রের জন্য ধরা হয়েছে ৬১০০ কোটি টাকা।

ষষ্ঠ যোজনায় কয়লা ও পেট্রোল সহ শিল্প ও বাণিজ্য-খাতে কেন্দ্রীয় বিনিয়োগ হবে ১৯,০১৮ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের জন্য ধরা হয়েছে—১,০১৮ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট বিনিয়োগের ৫·৭ শতাংশ মাত্র।

প্রথম থেকে পঞ্চম যোজনায় যা বরাদ্দ ছিল ষষ্ঠ যোজনায় তা ১·২ শতাংশ কম।

পেট্রোলিয়াম দপ্তরে বর্তমান যোজনাকালে বরাদ্দ হয়েছে ৪,৩০০ কোটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গে (হলদিয়া শোধনাগার সম্প্রসারণ প্রভৃতি বাবদ)—৮৪·২১ কোটি টাকা, হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালস্-এর জন্য কোন টাকা ধরা হয় নি অথচ মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের জন্য এ বাবদ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

ইস্পাত শিল্পের জন্য মোট কেন্দ্রীয় বরাদ্দ—৪০০০ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের জন্য মোট কেন্দ্রীয় বরাদ্দ—৩৩৮·৫৯ কোটি টাকা।

১ম—উপকূলবর্তী ইস্পাত কারখানার (ভিশাখাপত্তনম) জন্য বরাদ্দ ১০৫০ কোটি টাকা।

২য়—উপকূলবর্তী ইস্পাত কারখানার (ওড়িশা) জন্য বরাদ্দ ৫০ কোটি টাকা।

ঐ দপ্তর-নিযুক্ত উপদেষ্টাসংস্থা দ্বিতীয় কারখানা স্থাপনের জন্য হলদিয়াকে দেশের সর্বোত্তম বলে গণ্য করা সত্ত্বেও এর জন্য কেন্দ্র থেকে কোন সম্মতি পাওয়া যায় নি।

জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতি বাবদ এই যোজনায় খরচ ধরা হয়েছে ৯৭·৩৭ কোটি টাকা। গোড়ায় দিল্লী রাজ্যের সাথে হলদিয়াতে জাহাজ মেরামতি কারখানা স্থাপন করতে একমত হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা গার্ডেনরীচ, শিপ্ বিল্ডারস্ অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ফিজিবিলিটি রিপোর্ট দিল্লীতে দাখিল করে। কেন্দ্র এ বিষয়ে নীরব।

ইলেকট্রনিকস্ দপ্তর ও পরমাণু শক্তি দপ্তর এই পাঁচ বৎসর ব্যয় করবে ৪৯২·৩৪ কোটি টাকা, এর একটি ইউনিট কলকাতার নিকট-বর্তী লবণ হ্রদে খোলার জন্য জমি বরাদ্দ করা সত্ত্বেও কেন্দ্র মৌন।

সিমেন্ট উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এই সময়ের মধ্যে সিমেন্ট কর্পোরেশন অফ্ ইন্ডিয়া ব্যয় করবে ৩০০·২০ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২·৫০ কোটি টাকা।

কাগজ ও কাগজের বোর্ড উৎপাদনের জন্য ব্যয় করা হবে

৩১৪·৬৮ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্পের বিভিন্ন প্রকার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বরাদ্দ হয়েছে শূন্য।

বর্তমান রাজ্য সরকার তার নিজস্ব সহায়-সম্বলকে সাধ্যানুসারে সংগ্রহ করে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বাড়িয়ে যাচ্ছে। হালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে যে সমস্ত রাজ্য-সমূহের অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের অর্ধেকই করেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সাহায্য ও নিজস্ব সম্পদ মিলিয়ে যে টাকা ধার্য করেছে তার একটি হিসাব নিচে দিচ্ছিঃ

১৯৭৬-৭৭	মাথাপিছু	...	৫১ টাকা
১৯৭৭-৭৮	„	...	৬৯ „
১৯৭৮-৭৯	„	...	৮৩ „
১৯৭৯-৮০	„	...	৮৬ „
১৯৮০-৮১	„	...	১৩০ „
১৯৮১-৮২	„	...	আরও বাড়বে।

এই রাজ্যে বিভিন্ন কারখানা স্থাপন কিংবা যা আছে তা সম্প্রসারণের জন্য যে সকল প্রস্তাবগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করা সত্ত্বেও যার কোন সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না তার কয়েকটি উদাহরণ নিচে উল্লেখ করছিঃ

১। উপকূলবর্তী ইস্পাত কারখানাঃ—

হলদিয়াতে স্থাপন করার জন্য সর্বশেষ রাজ্য সরকারের চিঠির নম্বর ১২৮১—আই এন ডি/পি আই তাং ২-৩-৮১ কেন্দ্রীয় সরকারের কোন উত্তর নেই।

২। প্রতিরক্ষা ইলেকট্রনিক্সঃ—

এর একটি ইউনিট খোলার সিদ্ধান্ত হওয়ায় স্থান নির্ণয় কমিটির নিকট রাজ্য সরকার প্রস্তাব দেয়। লবণ হ্রদে বিনামূল্যে ১০০ একর জমি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিদ্যুৎ ছাঁটাই ঐ কারখানায় কখনও করা হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর আধা-সরকারী পত্রে (নং ১০৬১ পি এম্ ও।৮০ তারিখ ২৮-৬-৮০) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, বিষয়টি বিবেচনাধীন—আর কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

৩। জাহাজ মেরামত কারখানাঃ—

১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী হলদিয়াতে এই কারখানা খোলার বিষয়টি রাজ্যকে জানিয়েছিলেন। বর্তমান প্রতিরক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর পত্র-নম্বর ৬২০ ভি আই পি। আর আর এম্ ৮১।১ তারিখ ১৪-৪-৮১তে জানিয়েছেন যে, এই ইউনিটের সম্ভাব্যতার উপর এর জন্য টাকা বরাদ্দ করার প্রশ্ন নির্ভর করে। ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টি অত্যন্ত ঘোলাটে করে দেওয়া হয়েছে।

৪। ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যাল-এর একটি ইউনিট এই রাজ্যে খোলার জন্য তিনখানি চিঠি লেখা হয়েছে। সর্বশেষ পত্র নম্বর ১৯৫ সি আই এম্ তারিখ ৩১-৩-৮১। দুঃখের বিষয় এর একটিরও উত্তর দিল্লী থেকে আসে নি।

৫। ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জঃ—

এর কয়েকটি ইউনিট খোলা হবে এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এই রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী কেন্দ্রকে এই রাজ্যে এর একটি ইউনিট খোলার জন্য অনুরোধ করেন। পত্র নম্বর ৫২৯ সি আই এম ১৬-৬-৮০। কেন্দ্র থেকে কোন উত্তর নেই।

৬। দুর্গাপুরে স্টীল-প্ল্যান্ট সম্প্রসারণঃ—

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এর সম্প্রসারণের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল তার অর্ধেক মাত্র পূরণ হয়েছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়েছে—কোন সিদ্ধান্ত জানা যায় নি।

৭। এ্যালয় স্টীল দুর্গাপুরে সম্প্রসারণঃ—

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এর উৎপাদন ক্ষমতা ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন থেকে বাড়িয়ে ৩ লক্ষ টন করার যে প্রস্তাব রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে করেছিল—পত্র নম্বর ১৫৭২ আই এন ডি/পি আই তারিখ ১১-৩-৮১ তার কোন উত্তর পাওয়া যায় নি।

৮। সিন্টার প্ল্যান্টঃ—

৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ষষ্ঠ যোজনায় একটি সিন্টার প্ল্যান্ট এ রাজ্যে খোলার অনুরোধ করে দিল্লীতে রাজ্য সরকার প্রস্তাব দেয়। পত্র নম্বর ১৫৭৩ আই এন ডি/পি আই তারিখ ১১-৩-৮১—এখনও কোন উত্তর পাওয়া যায় নি।

আরও যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কারখানা স্থাপন বা সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে অনুরোধ করেছে তার কয়েকটির উল্লেখ নীচে করা হলঃ

হলদিয়ায় তৈল শোধনাগার সম্প্রসারণ, একটি ড্রাগ প্ল্যান্ট ও একটি ড্রাগ ইউনিট (লবণ হ্রদ বা কল্যাণীতে) স্থাপন, হিন্দুস্থান এ্যান্টিবায়োটিক্স-এর একটি ইউনিট প্রতিষ্ঠান, হিন্দুস্থান অর-গ্যানিক কেমিকেলস্-এর দ্বিতীয় ইউনিট খোলা, কান্দলা ও সান্টা-ক্রুজের পর লবণ হ্রদ এলাকায় তৃতীয় রপ্তানি সহায়ক অঞ্চল স্থাপন প্রভৃতি। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার হয় নীরবতা পালন করে চলেছে না হয় "বিবেচনাধীন" বলে বিষয়গুলিকে অনিশ্চয়তার ফাঁসে বেঁধে রেখেছে; অথচ এর অধিকাংশগুলিই বিশেষজ্ঞগণ সুপারিশ করেছেন।

যে কোন একটি অঞ্চলকে শিল্পে উন্নত করতে হ'লে তার কতক-গুলি আনুষঙ্গিক বস্তু বা বিষয় যাতে সহজে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এ ব্যাপারে এ রাজ্যের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গীর দু'একটি ঘটনার প্রতি তাকানো যাকঃ—

সিমেন্ট

সিমেন্ট এমনই একটি বস্তু যার উন্নয়নমূলক কাজে প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। ১৯৮০ সালে আমাদের প্রয়োজন ছিল ২০,০০,০০০ মেট্রিক টন, বরাদ্দ করা হল ১২,০০,০০০ টন, সরবরাহ হল ১০,৩৪,০০০ মেট্রিক টন।

১৯৭৯ সালে সিমেন্ট কন্ট্রোলারের এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ২৩টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত এলাকার মধ্যে মাথাপিছু সিমেন্টের ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গে সর্বাপেক্ষা কম। এখানে বৎসরে মাথাপিছু ২৫·৩৪ কেজি, অথচ অন্য অনেক রাজ্যে ১৯২·২২ কেজি পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়।

বিদ্যুৎ

সমস্ত প্রকার উৎপাদনে বিদ্যুৎ একান্ত প্রয়োজনীয়। ১৯৫১ সালে সারা দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র প্রকল্পগুলির ৩০ শতাংশ ছিল পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৭৩ সালে কমে দাঁড়ায় ১০ শতাংশে। ঐ সময়ে সারা দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ে এগার গুণ। এই রাজ্যে বাড়ে ছয় গুণ। ১৯৭৫ সালে বর্মণ কমিশনের রিপোর্টে এই রাজ্যের ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকটের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চরম অবহেলার কথাই উল্লেখ করেছেন।

উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদ্যুৎ শক্তির চরমতম অভাব থাকা সত্ত্বেও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এই অঞ্চলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছেঃ রাজ্য সরকার ক্ষোভের সাথে একথা প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে যে, অনুমান করা যায়—১৯৮৯-৯০ সালে এই রাজ্যের সর্বোচ্চ চাহিদা

দাঁড়াবে যেখানে ৩,১৬৭ মেগাওয়াট—সেখানে, তখন উৎপাদন থেকে পাওয়া যাবে (যদি ঠিক ঠিক মত কাজ হয়) ২০২২ মেগাওয়াট।

ঘাটতি দাঁড়াবে ১১৪৫ মেগাওয়াট। গোটা উৎপাদন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেবে—বেকার সমস্যা আরও ভয়াল মূর্তি নিয়ে হাজির হবে।

পশ্চিমবঙ্গে কয়লা, লৌহ ইত্যাদি শিল্পে ব্যবহারযোগ্য যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের সমস্ত অঞ্চলে স্থাপিত কলকারখানা যাতে অভিন্ন দামে উক্ত দ্রব্যাদি কিনতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার পরিবহণ খরচায় ভরতুকি দিয়ে তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। অন্যদিকে মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে তুলাসহ শিল্পের অন্যান্য কাঁচামাল যা তৈরি হয়—অন্যান্য অঞ্চলে তার পরিবহণ ব্যয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোন ভরতুকি দেবে না। ফলে, পশ্চিম-অঞ্চলের সাথে প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চলের শিল্পগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় প্রচণ্ডভাবে মার খাবে। ফল তাই হচ্ছে।

এই সব কারণে রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি ধাক্কা খাচ্ছে। বেকার সমস্যা বাড়ছে।

গোদের উপর বিষফোড়ার মত কেন্দ্রীয় সরকার একটির পর একটি দপ্তর এই রাজ্য থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

অন্যদিকে ডাক ও তার বিভাগসহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে এ'রাজ্যে কয়েক হাজার পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে আছে। জনসাধারণ অসুবিধা ভোগ করছেন। কয়েক হাজার যুবক-যুবতী কর্মসংস্থানের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন। যদিও বা এই সব শূন্য পদে কোন শুভ মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকার লোক নিয়োগ করতে উদ্যোগী হয় তা হলেও—জলে কুমীরের নাগাল থেকে উদ্ধার পেয়ে ডাঙায় বাঘের কবলে পড়তে যাওয়ার শামিল হবে। কেন না কয়েক মাস পূর্বে আঞ্চলিকতাবাদ-নিরপেক্ষ দিল্লির সরকার এক আদেশ জারি করেছে। চাকুরিতে নিয়োগ করার পূর্বে তিনটি বেয়াড়া রাজ্য যথা—কেরালা, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবংগের চাকুরীতে নির্বাচিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার গোপনে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগকে দিয়ে অনুসন্ধান করে তবেই চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে। ভারতের আর কোন রাজ্যের যুবক-যুবতীদের জন্য সন্দেহের এই বিধি-নিষেধ নেই। এমন কি, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং আসামেও নয়। ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি এম এ বেবী এই অত্যন্ত অবমাননাকর ও পক্ষপাতদুষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন—বিষয়টি বিচারাধীন। সেজন্য কোন মন্তব্য করছি না। তবে শুধু এইটুকু বলে রাখা যেতে পারে যে, এই তিন রাজ্যের যুব সমাজসহ সাধারণ মানুষ কেন্দ্রের শাসকদলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমর্থন জানিয়েছেন। সেই অপরাধে(?) এই অমর্যাদাকর কৌশলে তাঁদের শাস্তি দেওয়া কতটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছে গোটা দেশের রাজনৈতিক সচেতন গণতন্ত্র-প্রিয় মানুষ তার বিচার করবেন।

সারা দেশে তীব্র বেকারীত্বের জ্বালায় যুব জীবন জর্জরিত হয়ে যখন এর থেকে স্থায়িভাবে মুক্তির নিশানা খুঁজতে পথ হাতড়াচ্ছে, তখন কোন কোন মহল এই সমস্যার সমাধানের আসল পথকে আড়াল করার জন্য অদ্ভুত সব তত্ত্ব সুকৌশলে প্রচার করতে তৎপর হয়েছে। হিমাচল প্রদেশে সরকার নির্দেশ জারি করেছে—কোন বেসরকারী শিল্প কারখানায় পর্যন্ত অন্য রাজ্যের লোকজন নিয়োগ করা চলবে না। কর্নাটকের সরকার ঐ একই ধরনের কথা আওড়ে যাচ্ছে। মহারাষ্ট্র থেকে দক্ষিণ ভারতীয়দের বিতাড়িত করতে পারলেই সব মুশকিলের অবসান হবে—এই সর্বনাশা নীতিতে বিশ্বাসী একটি উগ্রবাহিনীর নাম "শিবসেনা"। কিছুদিন আগে বোম্বাই শহরে এই শিবসেনাদের এক জমায়েতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হয়ে তাদের আশীর্বাদ জানালেন। আর সেই জমায়েত থেকেই ওরা মিছিল করে ঐ শহরে একটি এলাকায় বসবাসকারী দক্ষিণ ভারতীয়দের ঘরবাড়ি দোকান ইত্যাদি চুরমার করল, অনেককে জখম করল। "ভূমি-সন্তান"কেই একমাত্র চাকুরি দিতে হবে—এক সময়ে বিহারের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী এ কথা প্রচার করতেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, অল্প কিছুদিন পূর্বে উত্তর প্রদেশে একটি বড় প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া উক্তি করেছেন যে, যে এলাকায় এই প্রকার প্রকল্প হবে সেই এলাকার যুবকদেরই সেখানে চাকুরি হওয়া উচিত।

পশ্চিমবংগের বামফ্রন্ট সরকার তথা এই রাজ্যের যুবসমাজসহ জনসাধারণ এই নীতিকে ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশে মোট নথিভুক্ত বেকারের ৫ ভাগের ১ ভাগ বুকে ধারণ করেও রাজ্যের যুবসমাজ এ দাবি করে না যে ভিন্ন রাজ্যের শ্রমিকদের এ রাজ্য থেকে বিতাড়িত করতে হবে। যদিও তাঁরা জানেন, এখানে সংগঠিত কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ৬০ শতাংশ অন্য রাজ্য থেকে আসা শ্রমিক। কেন না শ্রমিক বিতাড়নের পথ, চেয়ার দখলের পথ, বেকার সমস্যা সমাধানের পথ নয়। এতে সমাধান আরও দুরূহ হয়। এই জ্বলন্ত সমস্যার নিরাময়ের পথ—এক পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক পথ সে পথ সমাজতন্ত্রের পথ। সেই পথেই এ রাজ্যের যুবকদের সচেতনভাবে সংগঠিত করতে হবে, সংগঠিত করতে হবে গোটা দেশের যুব সমাজকে—ঐক্যবদ্ধ করতে হবে শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্তসহ সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষকে।

তবু একথা স্বীকার করতেই হবে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই রাজ্য সরকারের সাথে সাংবিধানিক সহযোগিতাটুকু অন্ততঃ করে তা'হলেও বেকারত্বের প্রকোপ বেশ কিছুটা কমানো যাবে। আশা করতে আপত্তি নেই—কেন্দ্রীয় সরকার অতীতের বেদনাময় ঘটনার পুনরাবৃত্তির পথ পরিহার করবে।

প্রসঙ্গ : পঞ্চায়েত

অমিতাভ রায়

পঞ্চায়েত। গত দু-তিন বছরে পশ্চিমবাংলার সমাজজীবনে সবচেয়ে আলোচ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পঞ্চায়েত। অতএব পঞ্চায়েত নিয়ে গবেষণা-আলোচনার সীমা নেই; পঞ্চায়েত-এর সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে প্রচার পাল্টা প্রচারেরও শেষ নেই। "পঞ্চায়েত দেশটাকে ছারখার করে দিল" এবং "পঞ্চায়েত ছাড়া গ্রামোন্নয়ন সম্ভব নয়" ইত্যপ্রকার কথাগুলি চলতে ফিরতে কানে আসে। কেন? এই প্রশ্নকে সামনে রাখলে সবারই আগেই যে কথাটা স্বীকার করতে হয় তা হল,—পঞ্চায়েত একটা নতুনত্ব আনতে পেরেছে (তা না হলে বিষয়টি এত তোলপাড় তুলত না)।

পঞ্চায়েত কি কি করল তার হিসেব-নিকেশ করতে গিয়ে একটা বিষয় জেনে রাখা ভাল,—পঞ্চায়েত বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের আবিষ্কার নয়। বিষয়টি যদি বামপন্থী নেতৃবৃন্দের চিন্তাপ্রসূত হত তা হলে এ দেশের জাতীয়তাবাদী-ওড়না ব্যবহারকারী মানুষ সংঘ-দল-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির ব্যাপক কলতানে কর্ণযুগল যে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। বরঞ্চ পঞ্চায়েত হল এ দেশের প্রাচীন কৃষিভিত্তিক-গ্রামকেন্দ্রিক সমাজের প্রাণস্বরূপ। সেই প্রাচীনযুগেও এই ব্যবস্থা চালু ছিল। দেশে রাজা-বাদশা অথবা জমিদার-সেরেস্তাদারদের শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকলেও এবং দেশের লোকের শ্রমের একটা বড় অংশ তাদের বিলাস-ব্যসন-ভরণ-পোষণে ব্যবহৃত হলেও আদতে কৃষিভিত্তিক প্রতিটি গ্রামীণ সমাজ ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভারতীয় সমাজের এই বিশেষত্ব কার্ল মার্কস-এরও দৃষ্টি এড়ায় নি। ভারতীয় সমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রসঙ্গে তিনি তাঁর ক্যাপিট্যাল বইতে উল্লেখ করেছেন। [ক্যাপিট্যাল : প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৭-৩৩৮] ভারতের বিভিন্ন নামী-দামী ঐতিহাসিকরাও এই ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন তাঁদের বিভিন্ন প্রখ্যাত গ্রন্থে। তবে আজকের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিয়ে এত হৈ-চ কেন? বামফ্রন্টের মূল কৃতিত্ব (এবং প্রকারান্তরে সেটাই হৈ-চৈ-এর কারণ) তাঁরা পশ্চিমবাংলায় দল-ভিত্তিক পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপর গ্রামোন্নয়নের দায়িত্ব দিয়েছেন; উদ্দেশ্য প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, ক্ষমতার বিভাজন এবং গণমুখী কর্মসূচীর বাস্তবায়ন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রশাসনে তথা গ্রামোন্নয়নে বেশী বেশী মানুষের অংশ গ্রহণ। আর এ সমাজের অধিকাংশই যখন গ্রামবাসী তখন গ্রামোন্নয়নের অর্থ দেশের উন্নতি। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। কিন্তু মূল যে নীতির প্রশ্নটা অর্থাৎ পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেটাই ছিল নতুন, এ রাজ্যের নবপর্যায়ের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায়। এত দিনকার নিয়ম অনুযায়ী যে কোন মানুষ তা তিনি যে রাজনীতিই করুন না কেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়বার সময় তাঁকে দলবিহীন হতে হবে। (অবিশ্যি '৭৮-এর নির্বাচনের আগে নির্বাচন কবে হয়েছিল তা হয়ত সাবেক আমলের অনেক পঞ্চায়েতরই মনে ছিল না।) এ আবার কেমন ব্যাপার? ব্যাপারটা অনেকটা গ্রামের ছেলের শহরে এসে নিজেকে শহুরে বলে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার মত আর কি! গ্রামের ছেলে হঠাৎ শহরে এলেই যেন তার আদব-কায়দা একদিনেই শহুরে হয়ে যায়, তার এতদিনকার ঐতিহ্য, ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, গ্রামীণ সারল্য যেন একদিনেই চলে যায় এমনই ভাবটা। সারাজীবন কোন দলের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় নির্দল বলার ব্যাপারটাও সেরকম। নির্দল বলে ঘোষণা করলেই যেন ব্যক্তিবিশেষের উপর তার দলের প্রভাব তক্ষুনি তক্ষুনি মুছে যায়; তার আদর্শও যেন হঠাৎই অন্তর্হিত হয়। বামফ্রন্ট এই লোক-ঠকানো যুক্তিহীন ব্যাপারটা তুলে দিয়ে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন।

৪৬ হাজার ৭৬৭ জন গ্রাম পঞ্চায়েত, ৮ হাজার ৪৬৩ জন পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি এবং ৬৪৮ জন জিলা পরিষদের প্রতিনিধি অর্থাৎ মোট তিনটি স্তরে ৫৫ হাজার ৮৭৮ জন জন-প্রতিনিধি নির্বাচিত হবার পর কি কি হল? নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার যে মূল উদ্দেশ্যগুলি [(১) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, (২) প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণ, (৩) গ্রামীণ মানুষের স্বাবলম্বন, (৪) গ্রামীণ সমাজের পুনর্বিন্যাস] কি যথার্থ রূপ পেয়েছে?

পশ্চিমবাংলার নবপর্যায়ের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বয়স মাত্র তিন। তিন বছরের এই শিশু কতটুকু কাজ করতে পারল তার মূল্যায়ণ করা খুবই কঠিন। কারণ নির্বাচন তিন বছর আগে হলেও সরকারী নিয়মকানুনই প্রয়োগ করার জন্য সময়ের যেমন অপ-ব্যবহার হয় তা উল্লেখ না করাই ভাল। ঢিলেঢালা প্রশাসনকে দ্রুতগামী করা সহজ কথা নয়। সুতরাং সরকারী নীতির আদেশে রূপান্তর এবং সে অনুযায়ী কাজ শুরুর ব্যবস্থা করতে বেশ কিছু সময় লেগেছে। যদিও যথার্থ মূল্যায়ণ সম্ভব নয় তবে একটা কাজ করা যায় তা হল,—একটু খতিয়ে দেখা। অর্থাৎ উদ্দেশ্যের দিকে চোখ রেখে ব্যাপারটা এগোচ্ছে তো? না কি অন্য কিছু ঘটছে!

॥ দুই ॥

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ যে হচ্ছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আজ গ্রামীণ ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগের মৌলিক মাধ্যম হল পঞ্চায়েত। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবার পর অর্থাৎ নতুন পর্যায়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হবার পর ১৯৭৮-৭৯ এবং ১৯৭৯-৮০ এই দুটি আর্থিক বছরে পঞ্চায়েতের জন্য রাজ্য সরকার মোট ৭১ কোটি ৫৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা খরচ করেছেন। পরের বছরের অর্থাৎ ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছরের বাজেটে এ বাবদ মোট ১৪ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়। এবারের অর্থাৎ ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরেও পঞ্চায়েতের জন্য ১৬ কোটি ৬৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ব্যবহারের সুযোগ বাজেটে আছে।

ভারতবর্ষের বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামোয় রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার করুণ অবস্থার কথা আজ সর্বজনজ্ঞাত। এ হেন অবস্থায় রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে বিপুল অর্থ-ব্যয়ের সুযোগ রেখেছেন তা উল্লেখযোগ্য। এত বেশী পরিমাণ টাকা

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ব্যয়ের সুযোগ সৃষ্টির অর্থ ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যকে শুধুমাত্র নীতিগতভাবে নয় কার্যান্বিত করার সফল প্রচেষ্টা,—এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই সবাই একমত। কারণ, যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক সম্পতি ব্যতিরেকে কোন সংস্থাই সুষ্ঠুভাবে তার পরিকল্পনা রূপায়িত করতে পারে না। অতএব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েতের হাতে যথেষ্ট সুযোগ থাকছে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জনপ্রতিনিধিদের অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েত, সমিতি অথবা জেলা পরিষদের সদস্যদের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তা এতদিন কেবলমাত্র সরকারী আমলাদের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। কোন এলাকার কোন কাজ কিভাবে রূপায়িত হবে অথবা কোন্ কাজটা আগে হবে কোন্‌টা পরে হবে এটা স্থির করবার দায়িত্ব এখন আর সেই এলাকার সরকারী কর্মচারীর হাতে নেই। সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এখন সেই সমস্ত কাজ করার একমাত্র স্বীকৃত কর্তৃপক্ষ। এতে প্রশাসনের মধ্যে সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের সংযুক্তির সুযোগ এসেছে। কারণ, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত প্রায় ৫৬ হাজার জনপ্রতিনিধির ৫০·৭ শতাংশ কৃষক, ১৪ শতাংশ শিক্ষক, ৭·৫ শতাংশ বেকার, ৪·৮ শতাংশ ভূমিহীন কৃষক, ১·৮ শতাংশ বর্গাদার, ১·৬ শতাংশ গ্রামীণ শিল্পী, ১·৪ শতাংশ দোকানদার, ১·৩ শতাংশ বস্ত্রকুশলী, ১·১ শতাংশ ডাক্তার, ০·৬ শতাংশ দর্জি, ০·৬ শতাংশ ছাত্র, ০·৪ শতাংশ মৎস্যজীবী এবং অন্যান্য ১৪·৪ শতাংশ অর্থাৎ বর্তমান পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সমস্ত স্তরের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান দিয়েছে। সুতরাং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণের যথেষ্ট সুযোগ পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা তৈরী করেছে।

এতকাল গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচী হত গ্রামের মানুষকে বাদ দিয়ে। কলকাতা বা কোন শহরে বসে বড় বড় শহরে বসে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন পণ্ডিত-বিদগ্ধ মানুষ গ্রামোন্নয়নের জন্য, গ্রামের মানুষকে স্বাবলম্বী করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প উদ্ভাবন করতেন। বাস্তবের সঙ্গে এই সমস্ত প্রকল্পের এত ফারাক থাকত যে কোন দিনই তা গ্রামের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হত না। এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সামান্য উল্লেখ না করে পারছি না।

মালদা জেলার কোন একটি গ্রামে একটি অভিজ্ঞ সরকারী পরিকল্পনাকারীদের দল ১৯৭৫-এর শেষ দিকে যায়। তাদের সঙ্গে ছিল গ্রামের মানুষকে স্বাবলম্বী করার তিনটি প্রকল্প। প্রথমটি তালগুড়, দ্বিতীয়টি মুরগী পালন এবং তৃতীয়টি শুয়োর পালন। প্রধানমন্ত্রীর বিশদফা কর্মসূচীকে সফল করার জন্য এই প্রচেষ্টা নেওয়া হয় কিনা জানি না, তবে গ্রামের লোকেরা তিনটি প্রকল্পই হাসতে হাসতে বাতিল করে দেয়। কারণ, তাদের মতে তালগুড়-এর বদলে তালরস থেকে মদ তৈরী করলে বেশী লাভ; মুরগী ঐ এলাকায় বাঁচে না, কারণ গরম খুব বেশী; এবং শুয়োর সরকার বিনামূল্যে দিলেও ছেলেকে ভাত দিতে পারে না সে শুয়োরের খাবার আনবে কোত্থেকে! অতএব খুব স্বাভাবিক কারণেই সরকারী দল সাফল্যের সাথে পিছু হটেন।

আজকের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্য এখানেই। কোন্ এলাকায় কোন্ প্রকল্প কার্যকরী হতে পারে তা ঠিক করছেন গ্রামের মানুষ। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেই প্রকল্প বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা চলছে। যেমন কুচবিহারে সুপারির উৎপাদন ভাল। ঐ জেলার একটি গ্রাম দেওচরাই, এই গ্রামটিতে কাটা-সুপারির প্রচলন করা হয়েছে। বাড়ির মেয়েরা সুপারি কেটে বেশ ভালই উপার্জন করছেন।

৫২ জন মহিলা এই কাজে নিযুক্ত আছেন। পশ্চিম দিনাজপুরের নিজস্ব শিল্প, ঠোকড়া (পাটের শতরঞ্চী) উৎপাদন ও বিক্রীর ব্যাপারে পঞ্চায়েতের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা একটি বলবার মতো ঘটনা। এইরকম অসংখ্য ছোটবড় উদাহরণ আনা যেতে পারে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে গ্রামের মানুষের স্বাবলম্বনের জন্য পঞ্চায়েত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল গ্রামীণ সমাজের পুনর্বিন্যাস। হ্যাঁ, অল্পবিস্তর এই ঘটনাটি সর্বত্র ঘটছে। জোতদার-মহাজন-ব্যবসায়ী এই তিন অশুভ শক্তির নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উদ্যত মানুষকে সক্রিয় মানসিক-নৈতিক-অর্থনৈতিক সমর্থনের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা একটা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে। যত দিন যাচ্ছে ততই গ্রামীণ সমাজের শত্রুরা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে এবং শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য শক্তিশালী হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার সব গ্রামেই এ ঘটনা ঘটছে বললে অসত্য বিবৃতি হবে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ছবি দেখা যাবে।

॥ তিন ॥

দলভিত্তিক না হলেও ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বর্তমান। খুব স্বাভাবিকভাবেই জানতে ইচ্ছে করে তাদের তুলনায় এ রাজ্যে কাজ বেশী হয়েছে না কম হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ১ নং তালিকাটি এ ছবি পরিষ্কার করে দেবে।

প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক পঞ্চায়েতে অন্যান্য খাতে ব্যয় করার সুযোগ থাকলেও শুধুমাত্র কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতাধীন কাজের হিসেব নেওয়া হল কেন। কারণ স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার। অন্যান্য খাতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কত খরচ কোন্ রাজ্যে হয়েছে তার বিস্তারিতে যাবার বদলে কেন্দ্রীয় কোটা কে কেমনভাবে ব্যয় করেছে তার হিসেব নেওয়াই ভাল। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়িয়ে যখন দেখা যায় ১৯৭৮-৭৯-এর হিসেব নিয়ে কাজ করা ছাড়া কোন উপায় নেই তখন অন্যান্য খাতে ব্যয়ের হিসেব অনুসন্ধানের মত আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও প্রশাসনিক সুযোগ পাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সর্বোপরি এ হেন শ্রম ও সময়ের মূল্য কে যোগাবে?

বরঞ্চ যে হিসাবটা অনেক বেশী তুলনামূলক হবে সেই প্রকল্পর মাধ্যমেই তুলনামূলক বিচারটা করা যাক। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী মারফৎ ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বর্ষে অন্ধ্রপ্রদেশে ১৮৭·৭৯ লক্ষ, আসামে ১৭৫·৬৪ লক্ষ, বিহারে ৬৪১·৪২ লক্ষ, গুজরাটে ৩০১·০০ লক্ষ, হরিয়ানায় ৩০·৬৩ লক্ষ, হিমাচলপ্রদেশে ২·৭২ লক্ষ, কর্ণাটকে ৪৪·৭১ লক্ষ, কেরালায় ৪০·৬৯ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশে ৪৫০·০০ লক্ষ, মহারাষ্ট্রে ১৪৩·০৯ লক্ষ, ওড়িশায় ৩৬২·৩৯ লক্ষ, পাঞ্জাবে ৪৯·৯৩ লক্ষ, ত্রিপুরায় ২৯·৬৫ লক্ষ, উত্তরপ্রদেশে ২২৩·৩২ লক্ষ, রাজস্থানে ৫০০·৭৪ লক্ষ, পশ্চিম বাংলায় ৫৩৩·৪৪ লক্ষ, মিজোরামে ২ লক্ষ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে ১০·৯৯ লক্ষ শ্রমদিবস তৈরী হয়েছে। এর পরও কি বলতে হবে পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ঠিকঠিকভাবে চলছে না?

॥ চার ॥

পঞ্চায়েতে কাজকর্ম কেমন চলছে? এ প্রশ্নর সঠিক মূল্যায়ন হবে না যদি না কিছু নমুনা এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়। অতএব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সংগৃহীত সামান্য কয়েকটি নমুনা উপস্থিত করছি।

তালিকা নং—১। ১৯৭৭-৭৯ আর্থিক বর্ষে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে কৃতকার্য

রাজ্য অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	বন-উন্নয়নের মাধ্যমে ভূমি-সংরক্ষণ (হেক্টর)	ক্ষুদ্র-মাঝারি সেচ প্রবর্তন (হেক্টর)	বন্যা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কৃষিযোগ্য জমিতে রূপান্তর (হেক্টর)	বাগিচা এলাকা সৃষ্টি (হেক্টর)	বিদ্যালয়-গৃহ তৈরি/মেরামতি (সংখ্যা)	পঞ্চায়েত-গৃহ ও সমষ্টিকেন্দ্র নির্মাণ (সংখ্যা)	মাটি কাটা (কি. মি.)	অন্যান্য কাজ (সংখ্যা)	কৃষিক্ষেত্র উন্নয়নের অন্য ব্যবস্থা গ্রহণে উপকৃত এলাকা (হেক্টর)	রাস্তা নির্মাণ: সংরক্ষণ/উন্নয়ন (কি. মি.)	রাস্তা নির্মাণ: নতুন রাস্তা নির্মাণ (কি. মি.)
অন্ধ্রপ্রদেশ	—	২১৪	—	—	৩৩৭৫	—	৩৯১৫	—	—	১২০৪৩	৩১১
আসাম	—	সং	—	বা	—	দ	—	নে	—	ই	—
বিহার	৮৬৮	৫৪১৫১	৪১০০	৪৮	—	—	—	৭৪	—	৬৩৫১	৮২০৫
গুজরাট	১৩৩৭	২১৪৮৮	২০১১	৮৩৫০০	—	—	—	—	৩১৮৭৭	১৩৫১১২	—
হরিয়ানা	১২৯০	—	১১৩০৬	সংবাদ নেই	৪১	১৮	১০১	২৬	—	৩৩	১৭০
হিমাচলপ্রদেশ	—	—	—	—	—	—	—	—		৩২৫	৩২
কর্ণাটক	—	সংবাদ নেই	সংবাদ নেই	৬৯৩	সংবাদ নেই	সংবাদ নেই	—	—		—	—
কেরালা	৪৯	৩৬৯	সংবাদ নেই	সংবাদ নেই	৬	সংবাদ নেই	—	—		৬০	১৮৯৬৫
মধ্যপ্রদেশ	১২৫০	১৭১৫	—	—	১৪৯৬৮	—	—	৮০০০		—	২২৩
মহারাষ্ট্র	৩৩৫০০০	সংবাদ নেই	স	ং	বা	দ		নে		৪২০০০	২৪৭০
ওড়িশা	৬৮৫	৩২৯৮৫৭	১৬৯০৫	৭২৯২	৯৭৯৮	৬	—	৭৫৪	৭০৮	৩২৫৩২	৪৯৭৮
পাঞ্জাব	১৭৫	সংবাদ নেই	স	ং	বা		দ	নে		ই	
রাজস্থান	সংবাদ নেই	সংবাদ নেই	সংবাদ নেই	সংবাদ নেই	৩০৫১	৭৮৯	২০১৯	২৮০৫১		—	৯৭৩৩
উত্তরপ্রদেশ	২৭১৭২	সংবাদ নেই	সংবাদ নেই	সংবাদ নেই	সংবাদ নেই	সংবাদ নেই	৩৯৩২	—	—		৮০৮৬
পশ্চিমবঙ্গ	৫৭৫৪	৪৫২১০	৭৫৫০০	—	১৮৯০	—	—		১২১৪	১৩৫০	৩৪১৮০
মিজোরাম	সংবাদ নেই	সংবাদ নেই	সংবাদ নেই	সংবাদ নেই	৪০	৬৩	—	৬২	—	—	৪
ত্রিপুরা	৭১৮৫	৯৩৭০	১৭	—	৯১০	—	—	৩	৩৪৩	২৫৫২	৩৫৪৫
মোট	৩৮১০৬৫	৪৭০৪৫৪	১১০১৪৭	৯১৫৬৩	৩৪০১২	৮৭৮	১০২৬৭	৩৭৮৩৫	৭৬২১২	৯৯১৪৫৮	৯৩০৪৪

*ভারত সরকার-এর গ্রামীণ পুনর্গঠন মন্ত্রকের ১৯৭৯-৮০'র বার্ষিক রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত।

বামফ্রন্টের চারবছরে সংস্কৃতিক্ষেত্রে বিপুল সাফল্য

অনন্নয় চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের চার বছর পূর্ণ হল। জন্মলগ্ন থেকেই একের পর এক চক্রান্তের বেড়াজাল ছিন্ন করে দৃঢ় প্রত্যয়-সিদ্ধ পদচারণার পঞ্চম বর্ষের দরজায় পা রেখেছে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে নির্বাচনী সংগ্রামে জয়লাভ করে একটি বিসদৃশ প্রশাসন কাঠামোর মধ্যে কাজ করে সাফল্যের ক্রমান্বয় দেউড়ি অতিক্রম করে যাওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। বিশেষ করে কেন্দ্রে যখন বিপ্রতীপ আদর্শ ও রাজনীতির এক সরকার আসীন এবং অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রায় সমস্ত ক্ষমতাই সেখানে কেন্দ্রীভূত তখন বিচ্ছিন্ন দুয়েকটি রাজ্যে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী-দের আদর্শানুসারী সরকার চালান আরও কঠিন বিষয়। কিন্তু এই দুঃসাধ্য কাজ সম্ভব হয়েছে এ রাজ্যের ব্যাপকতম জনগণের সমর্থনে এবং বামফ্রন্টের সুযোগ্য পরিচালনায়। বিশেষ করে নেতৃত্বে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর মতো জনপ্রিয় নেতা।

ইতিহাসের চরমতম বিধ্বংসী বন্যাজনিত পরিস্থিতি যেভাবে বামফ্রন্ট সরকার মোকাবিলা করেছে ভারতবর্ষের মতো দেশে তা নজিরবিহীন। দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার মরিচঝাঁপিতে ভুল বুঝিয়ে নিয়ে এসে যে জঘন্য চক্রান্ত করা হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার তাও ব্যর্থ করে দিয়েছে। মাঝেমধ্যে সমাজ-বিরোধীদের ব্যবহার করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনমন করার অপচেষ্টাও বার বার ব্যর্থ হয়েছে। কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে সামনে রেখে বিরোধী দলগুলি শিক্ষা সংস্কারের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যের জিগির তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের প্রতি চাতক পাখীর মতো তাকিয়েছিলেন, তাও বোধহয় সফল হলো না। সত্তরের দশকের শুরু থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বুকে এক বিশেষ পরিস্থিতি চলছিল। খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বেকারীর সমস্যা কিছু নতুন নয়, অন্যান্য রাজ্যের মতোই ভয়াবহ। কিন্তু গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অগ্রগণ্য ক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গে মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল তা ছিল আরও ভয়াবহ। অফিসে, দপ্তরে, কলে-কারখানায়, ক্ষেতে খামারে মানুষের কোন নিরাপত্তা ছিল না। শিক্ষার জগৎ বিপর্যস্ত করা হয়েছিল। স্বৈরতন্ত্রের বিকট মূর্তির সামনে মানুষকে অসহায় করে তোলা হয়েছিল। সাতাত্তরে নির্বাচনের মাধ্যমে এ রাজ্যের জনগণ স্বৈরশক্তিকে পরাভূত করে গণতন্ত্রের বিজয় পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। বামফ্রন্ট সরকারের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব জনগণ কর্তৃক ফিরিয়ে দেওয়া গণতন্ত্রের পরিবেশকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করা। স্বৈরশক্তির সমস্তরকম অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তাই নয় বামফ্রন্ট গণতান্ত্রিক শক্তি ও পদ্ধতির ভিত্তিকে অনেক বেশী দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন।

ক্ষমতাসীন হয়েই বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছিলেন তাঁরা রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে প্রশাসন পরিচালনা করবেন না। তাইতো জোতদার-জমিদার-সামন্ত প্রভুদের ঘুঘুর বাসা পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচন দীর্ঘ চোদ্দ বছর পর অনুষ্ঠিত করে গ্রামের জনগণের হাতে নতুন করে গ্রাম গড়ার দায়িত্ব তুলে দেন। জোতদার-জমিদারদের প্রতিনিধিদের অধিক সংখ্যায় পরাজিত করে নগ্নপদ হাঁটুর উপর কাপড় পরা দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়েছেন। সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ এই পঞ্চায়েতগুলিকে দিয়েছে গ্রামোন্নয়নের উদ্দেশ্যে। শুধু শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন হয়েছে তাই নয় গ্রামাঞ্চলে আজ এক প্রাণের জোয়ার প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ভূমিহীন কৃষক এখন পেয়েছেন অনেকখানি নিরাপত্তা। কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত রকম বাধা সত্ত্বেও অব্যাহত রেখে রাজ্য সরকার খেত মজুর ও গ্রামীণ শ্রমজীবীদের জীবনে স্বস্তি এনে দিয়েছে। বর্গাদারদের আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে সমগ্র ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছে। কৃষি পেনশন দেওয়াও আর এক অনন্যসাধারণ কাজ।

বেকারভাতা প্রদান, বেকারদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগ করে দেওয়া ছাড়াও শিল্পক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখা, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও করা হয়েছে যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে। কেন্দ্রের বিমাতৃ-সুলভ আচরণ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের সারা দেশের জন্য মূল্যমান নির্ধারণের দাবী অস্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও খাদ্য সংস্থান ব্যবস্থা এ রাজ্যে অতিরিক্ত সংকটে নিপতিত হয় নি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে এসবই বামফ্রন্ট সরকারের কৃতিত্বের পরিচায়ক।

॥ দুই ॥

এ রাজ্যের জনগণের ন্যূনতম চাহিদার প্রতি সদাসতর্ক দৃষ্টি-দানের পাশাপাশি বামফ্রন্ট উপলব্ধি করেছেন যে একটি রাজ্য সরকারের পক্ষে ভারতের মতো যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় শোষণমূলক অর্থনীতির যাঁতাকলের মধ্যে মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের সমাজ পরিবর্তনের মৌলিক সংগ্রামে সহায়তা করাই বামফ্রন্টের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর সেই সংগ্রামী চেতনা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসারণের জন্য আবশ্যিক প্রয়োজন শিক্ষা ও সুস্থ সংস্কৃতির বিস্তার। স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পরেও শতকরা সাতষট্টি ভাগ মানুষ এ রাজ্যে নিরক্ষর। এই নিরক্ষরতার অন্ধকারে শিক্ষার প্রদীপটি জ্বালবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার বাজেটের এক বড় অংশ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করছে। কলেজ স্তর পর্যন্ত শিক্ষার দায়িত্ব সরকার নিয়েছেন তাই নয় দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবৈতনিক করে দিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে এই অভূতপূর্ব দায়দায়িত্ব গ্রহণ বিরল দৃষ্টান্ত। এতকালের বঞ্চিত, অবহেলিত বুনো রামনাথদের মাসিক বেতন প্রাপ্তিতে নিশ্চয়তা এসেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বামফ্রন্ট যে বিরাট কর্মকান্ড শুরু করেছেন তার ফলে সত্তরের দশকের নৈরাজ্য দূর হয়েছে তাই নয় সর্বস্তরে শিক্ষা সম্পর্কে এসেছে প্রবল সচেতনতা। সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার প্রতি। বিদ্যালয় বিহীন কয়েক হাজার গ্রামে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় যেমন স্থাপন করেছে তেমনি প্রাথমিক শিক্ষায় গতিবেগ সঞ্চার করবার জন্য নানা পন্থাও উদ্ভাবন করার প্রয়াস করছে প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষজ্ঞদের সহায়তায়। গ্রাম ও বস্তি অঞ্চলের শিশুদের বিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যায় টেনে আনার জন্য বিনামূল্যে বই খাতা স্লেট প্রদান, দ্বিপ্রাহরিক আহার ও জামাকাপড় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে যাতে ব্যাপক সংখ্যক শিশু দ্রুত ও যথোপযুক্ত-ভাবে শিক্ষালাভ করতে পারে তার জন্য পাঠ্যক্রমও নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে একটি কমিটির মতামত অনুসারে। শিক্ষার সর্বজনীনতার প্রতি লক্ষ্য দিয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করার মত দৃঢ় সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে। অধিক সংখ্যক মানুষকে লেখাপড়া শেখানর ব্যবস্থায় কায়েমী স্বার্থের শিবিরে মড়াকান্না শুরু হয়ে গেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় বিদেশী ভাষার জন্য নির্লজ্জ ওকালতি দিল্লীর দরবার পর্যন্ত পৌঁছেছে। এসব উপেক্ষা করে জনগণের ঘরে ঘরে ব্যাপক শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার দৃঢ় সংকল্পে সরকার এগিয়ে চলেছে। স্বাধীন দেশের সক্ষম উত্তরসূরী গড়ে তোলার জন্য পরিবেশানুগ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য-পুস্তকও রচনা করে বিনামূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে দেওয়া হচ্ছে।

॥ তিন ॥

দৈনন্দিন জীবনে কিছুটা নিরাপত্তা, সামাজিক পরিবেশে অনেক-খানি স্বস্তি ও শৃংখলা আজ ফিরে এসেছে। মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশে সাধারণ মানুষ তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সংগ্রামে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু এই সংগ্রাম বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না যদি না সুস্থ সংস্কৃতির সংগ্রাম পরিপূরকভাবে পাশাপাশি চলে। জীবন-জীবিকার সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে অর্জিত অর্থনৈতিক সুবিধা এই সমাজব্যবস্থায় হারিয়ে যায় ক্রমান্বয় মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির করালগ্রাসে। তাই তাঁদের সংগ্রাম আজ ধাবিত সমাজ পরিবর্তনের গতিপথে। এই সংগ্রামের মূলমন্ত্র ও প্রধান হাতিয়ার হলো সংগ্রামী চৈতন্য। সংগ্রামী চৈতন্য প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তের দ্বান্দ্বিক অভিঘাত থেকে জন্ম নেয় সত্য, তবে এর জন্য সতর্ক অনুশীলনও প্রয়োজন আছে। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সংস্কৃতির সংগ্রাম এই চৈতন্য গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান শর্ত।

ভাববাদী অনুভূতিসর্বস্ব শিল্পী-সাহিত্যিকরা আজ যৌনতা, ধর্মীয় কুসংস্কার, পশ্চাদ্‌পদতাকে প্রশ্রয় দিয়ে এক জীবন-বিরোধী সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তুলেছেন। বিশ্বের সমস্ত ধনতান্ত্রিক ও উন্নয়নকামী দেশে রাষ্ট্রীয় ও ধনকুবেরদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই অপচেষ্টা চলছে। ধনবাদ সমাজের শ্রেণী শোষণের প্রকৃত রূপটি গোপন করবার জন্য, জনমানসকে প্রবৃত্তির দাসত্বে আবদ্ধ করার জন্য তার সমস্ত প্রচার যন্ত্রগুলিকে ব্যবহার করে। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের প্রতিটি ধনবাদী রাষ্ট্রে পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম-গুলি বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত। তারা স্বভাবতই শ্রেণীস্বার্থে তরল যৌন-আবেদনমূলক, ভোগসর্বস্ব, হতাশা সৃষ্টিকারী শিল্প-সংস্কৃতি রচনায় উৎসাহদান করে থাকে। ধনবাদ নারীর প্রতি মর্যাদা কখনই রক্ষা করতে পারে না কারণ নারীকে তারা ভোগ্যপণ্যরূপে গণ্য করে। তাই নরনারীর সম্পর্কের কোন সুস্থ সৃজনশীল রূপ তাদের কাছে ধরা পড়ে না। মানুষের যৌন-জীবনের জৈব ভূমিকা ছাড়াও একটা সামাজিক ভূমিকাও আছে যা প্রজাতি রক্ষার এবং উৎপাদনী শক্তির বিকাশের পক্ষে একটি অপরিহার্য উপাদান। এই শক্তি শ্রমের সহযোগী হিসাবে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করলে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কায়েমীস্বার্থের স্থিতাবস্থা এক ধরনের শিল্পী-সাহিত্যিকরা সচেতন বা অবচেতনভাবে অনুসরণ করে যাচ্ছেন বলেই যখন শ্রম-জীবী মানুষের অগ্রগতি হয় তখন এ'দের শিল্প-সাহিত্যে যৌন প্রসঙ্গ বড় হয়ে দেখা দেয়। লেনিন বলেছেনঃ "আমার মনে হয় এই সব আড়ম্বরযুক্ত যৌন তত্ত্বগুলি যা কিনা প্রধানত প্রতারণা-মূলক এবং প্রায়ই নিছক কল্পনাপ্রসূত সেগুলি ওঠে বুর্জোয়া নৈতিকতার কাছে মাথা নোয়ান আর নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের অস্বাভাবিকতা ও ভোগের আতিশয্যকে সমর্থন করার প্রয়োজনে। বুর্জোয়া নৈতিকতার প্রতি এই প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধাকে আমার অত্যন্ত বিরক্তিজনক মনে হয় এবং এর দ্বারা যৌন সমস্যার বিষয়গুলিকে আরও খুঁচিয়ে তোলা হয়। এইগুলি প্রধানত বুদ্ধিজীবীদের এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠতম লোকেদের সখের ব্যাপার। পার্টিতে, শ্রেণীসচেতন সংগ্রামী সর্বহারাদের মধ্যে এর কোনও স্থান নেই।"

সংস্কৃতি শব্দের অর্থ পরিশীলিত কর্ম। সংস্কৃতির জগত শিল্পী-সাহিত্যিকের সুস্থ শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্জাত সৃষ্টি-সম্ভারে পরিপূর্ণ, যা জীবনকে সুন্দর করে, প্রাণবন্ত করে এবং সমাজকে অগ্রগতিমুখী করে তোলে। আর এই অগ্রগতিতে বাধা দেয়, সৃষ্টির মধ্যে নেতিবাদের প্রচার করে, কায়েমীস্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতা করে এমন শিল্প-সাহিত্যকে আমরা অপসংস্কৃতি বলে থাকি। অপসংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র তামসিকতায় এবং বিকারে এর পরিচয়। আর এই বিকার শুধু যৌনতার দ্বারাই সিদ্ধ হয় তা নয়, আচার-সর্বস্ব ধর্মীয় উন্মাদনা, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, যুক্তিবাদ-বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে আবেগসর্বস্ব নিয়তিবাদকে প্রশ্রয়দান ইত্যাদির দ্বারা সাধিত হয়। আজকের ভারতবর্ষে এসবেরই আজ প্রাধান্য। তাই ধর্মীয় কুসংস্কারজনিত বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক নানা ঘটনা, সমাজ অগ্রগতির পক্ষে বাধা-স্বরূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাদুর্ভাব ঘটতে দেখা যাচ্ছে। ভারতের সামন্ততান্ত্রিক অবশেষমূলক পশ্চাদপদতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের রপ্তানি করা ইয়াংকি সংস্কৃতি।

ভারতের নবজাগরণের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সংস্কার আন্দোলন এবং যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিবাদের চর্চা-আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার প্রধান ক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশ। সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাংলাদেশের ঐতিহ্যের মধ্যে র‍্যাশনালিজমের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। এছাড়া দেশ বিভাগের পরে খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে ভাঙাগড়ার সম্মুখীন হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে অনেক প্রাচীন অভ্যাস ও সংস্কারের শিকড় উপড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন-জীবিকার সংগ্রাম এখানে তীব্র হওয়ার ফলে প্রতি-ক্রিয়ার ভিত্তিমূল এখানে পঞ্চাশের দশক থেকেই বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু ষাটের দশকে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ ও বাংলা-দেশ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে উগ্রজাতীয়তাবাদের এক বাতাবরণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে সৃষ্টির চেষ্টা হয়। এসব সত্ত্বেও ষাটের দশকের শেষের দিকে দু-দুবার বামপন্থী সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়ার ঘটনা এ রাজ্যের শোষকশ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থের মধ্যে মৃত্যুঘন্টার সংকেত বহন করে আনল। ফলে কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে সত্তর দশকের শুরু থেকে শুরু হল প্রগতি-বিমোচন অভিযান। এই আধা-ফ্যাসিবাদী অভিযান বিকট মূর্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জন-জীবনের প্রত্যন্তে। পৈশাচিক আক্রমণে জর্জরিত করে তোলা হল

সুস্থ জীবনমুখী, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে। প্রত্যক্ষ সরকারী ও সরকারী প্রশ্রয়পুষ্ট সমাজবিরোধী নগ্ন আক্রমণের সঙ্গে যুব সমাজকে বেপথু করার লক্ষ্য নিয়ে সমাজ হলো অপসংস্কৃতির মনোহর সম্ভার। সাট্টা-জুয়া, চোলাইমদ, সর্বজনীন পুজোর নামে হামলা, সাম্প্রদায়িক গুরুবাদী উন্মাদনা, খেলাধুলোর ময়দানে বিশৃঙ্খলা, যৌন আবেদনমূলক সাহিত্য-নাটক-চলচ্চিত্র-সঙ্গীত, সামন্ততান্ত্রিক আবেদনমূলক যাত্রাপালা ইত্যাদি বৃহৎ পুঁজিও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় রাতারাতি ফুলে ফেঁপে উঠলো। মন্ত্রীরা প্রত্যক্ষভাবে এই সব অপসংস্কৃতির ফেরিওয়ালাদের আশীর্বাদ জানালেন, সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি টাকার পুঁজি নিয়োজিত হল এসবের পিছনে।

॥ চার ॥

সমস্ত ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। স্বৈরাচার, সন্ত্রাস, গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকারের অপহ্নব, সুস্থ মূল্যবোধ সংহার, অপসংস্কৃতির প্লাবনের বিরুদ্ধে সাতাত্তরের সুযোগে এ রাজ্যের জনগণ রায় দিলেন সুস্থতার সপক্ষে, নির্বাচিত করলেন বামফ্রন্ট সরকারকে। অনিবার্যভাবেই বামফ্রন্ট তার ছত্রিশ দফা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে যেমন জীবন-জীবিকার প্রশ্নকে গুরুত্ব দিলেন তেমনি উল্লেখযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে গুরুত্ব দিলেন অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সংস্কৃতির সংগ্রামকে। ক্ষমতায় আসীন হয়েই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সরকারী নীতি ঘোষণা করে সুস্থ সাংস্কৃতিক আবহাওয়া গড়ে তোলার আহ্বান জানান; এতে এর জন্য সরকারী দায়দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। অনতিবিলম্বেই তথ্য বিভাগের সঙ্গে সংস্কৃতি বিভাগ নামে একটি নতুন দপ্তর যুক্ত হল।

অপসংস্কৃতির নিরোধ ও সুস্থসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা এটাই সরকারী নীতি। এরাজ্যের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী-কলাকুশলীরা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পাশাপাশি স্বৈরাচারের সহোদর অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযান নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রেখেছিলেন। সরকারী প্রয়াস তার সঙ্গে যুক্ত হল। অপসংস্কৃতির নিরোধ বর্তমান কাঠামো ও আইন ব্যবস্থার মধ্যে সহজসাধ্য নয়। মানুষের সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার, কাজ পাওয়ার অধিকার, শিক্ষার অধিকার মৌলিকভাবে স্বীকৃতি না হলেও মানুষের ক্ষতি করার, তার মেরুদণ্ডে ঘূণ ধরিয়ে দেওয়ার অধিকার প্রতিক্রিয়াশীল মহলের স্বীকৃত। আইনী বাতাবরণ সহজেই তাঁরা সৃষ্টি করে নেন। তাই আইন করে সাম্প্রদায়িক প্রচার, উগ্র যৌনতামূলক সাহিত্য-নাটক-চলচ্চিত্রের গতিরোধ করতে গেলে সহজেই কেমন যেন জাল কেটে বেরিয়ে যায়। তাই আইনের পথে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশী। তাছাড়া বিগত এক দশক ধরে বাংলার এই সমাজটাকে যেভাবে পর্যুদস্ত করা হয়েছে এবং প্রগতিশীল সংস্কৃতির উপর আক্রমণ, নোংরা সাহিত্য ও সংস্কৃতি অবাধ প্রচারের মাধমে যেভাবে রুচির বিকৃতি ঘটান হয়েছে তাকে সুস্থতায় ফিরিয়ে আনতে হলে আইন করে তা করা দুঃসাধ্য। এর জন্য প্রয়োজন এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার-অভিযান এবং সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প সুস্থ সংস্কৃতির বিপুল প্রসার ও প্রচার। কিন্তু সেখানেও বাধা দুস্তর। সরকারী অর্থ সীমিত এবং বর্তমান কাঠামোর মধ্যে ব্যাপক সংস্কার সাধনের সুযোগও সীমাবদ্ধ। বিপ্লবের মাধ্যমে যে পরিবর্তন সাধন করা যায় নির্বাচনের মাধ্যমে ততটা করা যায় না। তাছাড়া বেসরকারী প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী হলেও অপসংস্কৃতির প্রচার-মাধ্যমগুলির তুলনায় নিতান্তই সামান্য। গ্রামেগঞ্জে, মহল্লায়, অফিসে-দপ্তরে, ট্রেড ইউনিয়নে, গণনাট্য ও গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন এবং সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা প্রবল হলেও বাণিজ্যিক সংস্কৃতির প্রচার-অভিযানের মুখোমুখী তা প্রভাব সৃষ্টিতে বেশী সফল নয়। কোটি কোটি টাকার পুঁজি যে এই অপসংস্কৃতি প্রচারে ব্যয় হচ্ছে শুধু তাই নয়, প্রচার মাধ্যমগুলি সামাজিক ও শ্রেণীগত কাঠামোর জন্যই অপসংস্কৃতির সেবায় নিয়োজিত। সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের সুস্থ সংস্কৃতির প্রয়াস সে তুলনায় অনেক বেশী সীমিত।

এই সীমিত অবস্থার মধ্যেও বিগত চার বছরে বামফ্রন্ট সরকার যা করেছেন তাও নজিরবিহীন এবং গৌরবজনক সন্দেহ নেই। সাহিত্য, যাত্রা, নাটক, সঙ্গীত, চারুকলা, চলচ্চিত্র, লোকশিল্প, আদিবাসী সংস্কৃতি প্রভৃতি সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকারী দৃষ্টি সমানভাবে আকর্ষিত হয়েছে। এরাজ্যে ইতিপূর্বে যা কখনও হয় নি এই সরকার তাই করেছেন। অর্থাৎ সরকারী অফিসারদের উপর নির্ভরশীল হয়ে যে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ জনপ্রিয় করে তোলা যায় না সরকার তা উপলব্ধি করেছেন। তাই যাত্রা-নাটক, সাহিত্য, লোকশিল্প, চারুকলা ও ভাস্কর্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র প্রতিটি বিভাগেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি করে উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করেছেন। এই উপদেষ্টা পর্ষদগুলি নিয়মিত সভা করে সরকারকে পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করছেন। বলাবাহুল্য, এই সব উপদেষ্টা পর্ষদ দলমত-নির্বিশেষে শুধুমাত্র গুণ ও যোগ্যতার বিচারে গঠন করার ফলে ব্যাপকভাবে এঁদের কাজকর্ম সাংস্কৃতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন ও উৎসাহের সঞ্চার করেছে।

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জনগণের ভালবাসা থাকলে যে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবহেলিত একটি জিনিসকেও জনপ্রিয় করে তোলা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা। এই পত্রিকাটি আগে মাত্র দুতিন হাজার ছাপা হত এবং সরকারী দপ্তরগুলিতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হত। এই সরকার আসার পর সুষ্ঠু নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করায় বিশিষ্ট লেখকরা এখন এই পত্রিকায় লিখছেন। জনগণের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়বস্তু ও উন্নতমানের রচনা পরিবেশনের ফলে আজ প্রায় সত্তর হাজার কপি এই পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। অনুরূপভাবে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ইংরাজী, হিন্দী, উর্দু, সাঁওতালী, নেপালী প্রভৃতি ভাষার পত্রিকাগুলিও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যুব-কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত 'যুব মানস' পত্রিকাটিও প্রকাশনার মান ও বিষয়বস্তুতে একটি প্রথম শ্রেণীর সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকারূপে সর্বজন-স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশেষ করে এই পত্রিকাগুলির রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত, মানিক, মে দিবস, স্বাধীনতা দিবস প্রভৃতি সমস্যা বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকাটিকে সরকারী পরিচালনাধীনে এনে এর রুগ্নদশা মোচন করে যেমন সৎ সাংবাদিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে তেমনি জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যক্ষ পরিচালনায় পত্র-পত্রিকা ছাড়াও একটি উপদেষ্টা পর্ষদের সাহায্য নিয়ে সরকার এমন এক বিজ্ঞাপন প্রদানের নীতি নির্ধারণ করেছেন যার ফলে দলমত-নির্বিশেষে প্রতিটি পত্র-পত্রিকাই প্রচার-সংখ্যার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে সরকারী বিজ্ঞাপন পাচ্ছে। পূর্বের সরকারের আমলে বিরোধী দলের পত্র-পত্রিকা এমন কি অন্যান্য সুস্থ সাংস্কৃতিক চিন্তাবাহী পত্র-পত্রিকাগুলি সরকারী বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত হত। সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা করে ও মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেও বিপুল পরিমাণ বিজ্ঞাপন অনেক পত্র-পত্রিকাই নিয়মিত পাচ্ছে। মফস্বল জেলার ছোট, মাঝারি পত্রিকাগুলিও সুষ্ঠু নীতির ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন পেয়ে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা

লাভ করেছে। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে সরকার এইসব পত্রিকার উপর হস্তক্ষেপ করার নীতি অবলম্বন করেন নি।

॥ পাঁচ ॥

সাহিত্যক্ষেত্রে সরকার যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তার সাফল্যও কম নয়। শিশুবর্ষে প্রকাশিত 'আলোর ফুলকি' নামক দেড়শো বছরের শিশুসাহিত্য সংকলন প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষের পর বিপুল চাহিদা লক্ষ্য করে সরকার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছেন পূর্বের পনের টাকা মূল্যেই। জেলা ও মহকুমাস্তরে তথ্যকেন্দ্রগুলি যাতে জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগের সেতু হয়ে উঠতে পারে সেজন্য এখানকার গ্রন্থাগারগুলিকে সমৃদ্ধ করে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ ক্রয় করা হয়েছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আরেকটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য অনুদান দেওয়া। এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিগত বছরে সরকার পাণ্ডুলিপিসহ লেখকদের কাছে আবেদন আহ্বান করেছিলেন। পাঁচ শ জনেরও বেশী লেখক আবেদন করেছিলেন। সর্বশ্রী নারায়ণ চৌধুরী, নেপাল মজুমদার, শঙ্খ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, অরবিন্দ পোদ্দার, গোলাম কুদ্দুস, কৃষ্ণ ধর, সুনীল বসু, শ্যামসুন্দর দে, পবিত্র সরকার প্রমুখ সাহিত্যিক ও সমালোচকদের নিয়ে গঠিত উপদেষ্টা পর্ষদ এইসব লেখকদের আবেদন ও পাণ্ডুলিপি বিচার-বিবেচনা করেছেন। সরকার এই নির্বাচনের ভিত্তিতে মার্চ মাসে ৯৯ জন লেখককে অনুদান দিয়েছেন এবং আরও বেশ কিছু লেখককে অনুদান দেবেন। অনুদান-প্রাপ্ত লেখকদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অসীম রায়, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, প্রভাত গোস্বামী, কুমুদ দাশগুপ্ত, চিত্ত ঘোষাল, অমলেন্দু চক্রবর্তী, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, ঋষি দাস, দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়, কল্পতরু সেনগুপ্ত, রামশংকর চৌধুরী।

এ ছাড়াও প্রয়াত সাহিত্যিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু চক্রবর্তী, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকের গ্রন্থ প্রকাশের জন্যও তাঁদের পরিবারবর্গকে অনুদান দেওয়া হয়েছে। রচনার বিষয় ও মানের দিকে লক্ষ্য না রেখে শুধু ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে প্রকাশক মহল এমন এক ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ করে চলেছে যার ফলে বহু সৎ লেখক প্রকাশনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং প্রগতিশীল ও সিরিয়াস গ্রন্থের অভাবও ঘটছে। সরকার তাই এই অভিনব পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতি বছর কয়েক শ ভাল বই পাঠককে উপহার দানের সুযোগ করে দিয়েছেন। এর জন্য সরকারের ব্যয় হবে চার লক্ষাধিক টাকা।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সরকারের পরিকল্পনা কল্যাণকামী। অশক্ত ও আর্থিক অনটনে ক্লিষ্ট সংগীতশিল্পীদের আর্থিক সহায়তা দানের ফলে সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে যেমন নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হল তেমনি কিছু পরিবারের খানিকটা সুবিধাও হল। সহায়তা পেয়েছেন তিমিরবরণ, আকিঞ্চন দত্ত, সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারেশ বসু, সুরেশ চক্রবর্তী, জগবন্ধু চক্রবর্তী, দয়াল কুমার, মণীন্দ্র দাস প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পিসহ গ্রামাঞ্চলের বহু লোকশিল্পী। সঙ্গে সঙ্গে আবেদনের ভিত্তিতে শহর ও মফস্বলের অনেকগুলিকে সরকার পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান দিয়েছেন। এই অনুদানের অর্থে সাহায্যপ্রাপ্ত দলগুলি সাংগীতিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে, নতুন নতুন প্রযোজনা করতে সমর্থ হবেন। আলি আকবর মিউজিক কলেজ, উদয়শংকর রিসার্চ সেন্টার, মণিপুরী নর্তনালয়, ক্যালকাটা পিপলস কয়্যার, কলামণ্ডলম, সুরঙ্গমা প্রভৃতি নামী সংগঠনসহ প্রায় কুড়িটি সঙ্গীত-সংস্থা। এর জন্য সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় দুই লক্ষ টাকা।

চারুকলা ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও সরকারী সহায়তা এই রাজ্যে সর্বপ্রথম। সংস্কৃতির আঙিনায় এই বিভাগই আজ সবচেয়ে অবহেলিত। সরকার তেরজন শিল্পীকে বছরে দু হাজার চার শ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। প্রাপকদের মধ্যে প্রখ্যাত শিল্পী গোবর্ধন আশও রয়েছেন। এ ছাড়া লোকচিত্রকলা, পেন্টার্স ফ্রন্ট, ক্যানভাস প্রভৃতি চিত্রশিল্পীদের সংগঠন দশ হাজার থেকে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান পেয়েছেন যাতে নবীন শিল্পীরা দলগতভাবে শিল্পচর্চার সুযোগ লাভ করেন। সরকারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ চিত্র ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে 'অবনীন্দ্র পুরস্কারে'র প্রবর্তন। সাহিত্যের জন্য রবীন্দ্র, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু শিল্পের এই আঙ্গিকটি নিয়ে ইতিপূর্বে কোনও সরকার ভাবেন নি। অথচ আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতেও বাংলার এই শিল্প-মাধ্যমটি বহু গৌরবের অধিকারী। বিশ্ববিখ্যাত বহু শিল্পীর পাশে এ রাজ্যের অতীত ও বর্তমান দিনের অনেক শিল্পীই মর্যাদার আসন লাভ করেছেন। তাই সরকার এই শিল্প-মাধ্যমটিকে তার উপযুক্ত মর্যাদার আসনে স্থাপন করলেন। দশ হাজার টাকার এই পুরস্কারটি প্রথম বছর পেলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না শিল্পী মীরা মুখোপাধ্যায়। শিল্পী-সমাজ নিশ্চয়ই এর জন্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। এ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য যে কমিটি রয়েছে তার মধ্যে রয়েছেন এ রাজ্যের সব দিক্‌পাল শিল্পীরা—চিন্তামণি কর, সত্যজিৎ রায়, প্রভাস সেন, পরিতোষ সেন, রথীন মৈত্র, সুনীল পাল, বিজন চৌধুরী, নির্মাল্য নাগ, ঈশা মহম্মদ, পূর্ণেন্দু পত্রী, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ হোড় প্রমুখ।

নাট্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী কাজকর্ম যা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তা আরও বহুমুখী ও ব্যাপক। ব্যবসায়িক কুরুচিপূর্ণ নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি খুবই স্পষ্ট। সরকার এই সব নাটকের কুপ্রভাব থেকে মানুষকে মুক্ত করবার জন্য সৎ, জীবনমুখী নাট্য প্রয়াসগুলিকে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। সেই লক্ষ্য থেকেই অনেকগুলি গ্রুপ-থিয়েটারকে আর্থিক অনুদান দিয়েছেন; সৎ পরিচালক, নাট্যকার, অভিনেতা, সঙ্গীত পরিচালক, আলোক-শিল্পী, মঞ্চশিল্পীকে পুরস্কার প্রদান করেছেন। দশজন তরুণ নাট্যকর্মীকে মাসিক তিন শ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে যাতে নাট্যক্ষেত্রে তাঁরা চর্চা ও অনুশীলন করে সমৃদ্ধ হতে পারেন এবং নতুন অবদান রাখতে পারেন। তরুণ অপেরা, লোকনাট্য, সত্যাম্বর অপেরা, দীনবন্ধু নাট্যসমাজ প্রভৃতি পাঁচটি যাত্রাদলকেও সরকার পুরস্কৃত করেছেন সমাজ সচেতন যাত্রাপালা প্রযোজনার জন্য। সৎ নাট্যদলগুলিকে বেশী পরিমাণে অভিনয়ের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য উত্তরে গিরীশ মঞ্চ, দক্ষিণে মাইকেল মধুসূদন মঞ্চ প্রভৃতি কয়েকটি মঞ্চ নির্মাণ করছেন। কয়েকটি অব্যবহৃত মঞ্চ অধিগ্রহণ করে প্রযোজনার উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও হচ্ছে। সরকার এ বছর জেলাগুলিকে সাতটি কেন্দ্রে ভাগ করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত করার কর্মসূচী নিয়েছিলেন। একমাত্র নদীয়া কেন্দ্র ছাড়া সবগুলিতেই উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। জেলার নাট্যদলগুলি ছাড়াও প্রতিটি ক্ষেত্রেই কলকাতা থেকে নামী নাট্যদলগুলি অংশগ্রহণ করেছে। সুদূর দার্জিলিং জেলার

পার্বত্য অঞ্চলেও পাঁচদিনব্যাপী নাট্যোৎসব বিপুল সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছে। হাড়-কাঁপানো শীতের মধ্যেও প্রতিদিন দর্শকপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এই উৎসব হয়েছে। নাট্যক্ষেত্রে পরামর্শ ও সক্রিয় ভাবে সহায়তাদান করছেন উৎপল দত্ত, শিশির সেন, কল্পতরু সেনগুপ্ত, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, তাপস সেন, অনুপ কুমার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, হাবুল দাস, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, শ্রীজীব গোস্বামী, জোছন দস্তিদার, জ্ঞানেশ মুখার্জী প্রমুখ নাট্যশিল্পী ও বিশেষজ্ঞগণ।

লোকশিল্পের প্রশস্ত অঙ্গনে সরকারী ক্রিয়াকলাপ ইতিমধ্যে গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত স্পর্শ করেছে। গত কয়েক বছর জেলা স্তরে, কোথাও কোথাও ব্লক ও মহকুমা স্তর পর্যন্তও লোকসঙ্গীত ও শিল্পের উৎসব হয়েছে। এই উৎসবগুলিতে যে কেবল লোক-শিল্পীরাই সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেছেন তাই নয়, লোক-শিল্পীদের আর্থিক, সামাজিক ও শিল্পগত অবস্থা পর্যালোচনার জন্য জেলাভিত্তিক ওয়ার্কশপ করেছেন এবং সেখান থেকে নিবিড়-ভাবে এঁদের বর্তমান অবস্থা অনুধাবন করা হয়েছে। কীভাবে লোকশিল্প-মাধ্যমকে পুনরুজ্জীবিত করে অপসংস্কৃতির ব্যবসায়িক আক্রমণকে প্রতিহত করা যায় তার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারকে গভীরভাবে সাহায্য করছেন সুধী প্রধান, পল্লব সেনগুপ্ত, অরুণ রায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দুলাল চৌধুরী, রামশংকর চৌধুরী, পিনাকী ভৌমিক প্রমুখ লোকসাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা।

এ ছাড়াও নিয়মিত রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত-মানিক প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের জন্মজয়ন্তীকে উপলক্ষ্য করে সরকারী আলোচনা-সভা ও অনুষ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শুধু শহর কলকাতা নয়, মফঃস্বলেও যাতে এই ধরনের অনুষ্ঠান হতে পারে সরকার তার জন্য জেলায় জেলায় সরকারী অর্থ দিয়েছেন। নিজস্ব অনুষ্ঠান ছাড়াও বেসরকারী উদ্যোগে কোন ভাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা হলে সরকার সাধ্যমত সহায়তার হাত প্রশস্ত করেছেন। এ ব্যাপারে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি যেমন উদার তেমনি বহুমুখী। সম্প্রতিকালে নির্ভীক সাংবাদিক ও চারণকবি দাদাঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানটিকে সরকার একটি বেসরকারী জন্মোৎসব কমিটির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পালন করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের প্রয়াসও বেশ উল্লেখ-যোগ্য। বিগত চার বছরে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, রাজেন তরফদার, উৎপল দত্ত, তরুণ মজুমদার প্রমুখ খ্যাতনামা পরি-চালকদের দিয়ে সরকার বেশ কয়েকটি উন্নতমানের ছবি করিয়েছেন যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের তিনটি গল্পের ভিত্তিতে ছবি করছেন পূর্ণেন্দু পত্রী, সৈকত ভট্টাচার্য ও জোছন দস্তিদার। তরুণ পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর সরকারী প্রযোজনায় তোলা ছবি "ময়না তদন্ত" রাষ্ট্র-পতির পুরস্কার লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। অপসংস্কৃতিমূলক হিন্দী ও বাংলা ছবির প্রবাহের বিরুদ্ধে সুস্থ ও উন্নতমানের ছবি তৈরীর সরকারী পরিকল্পনা শুধু যে এ রাজ্যের প্রবীণ ও নবীন পরিচালকদের আকর্ষণ করছে তাই নয়—অন্য রাজ্যের প্রথম সারির চলচ্চিত্রকাররাও উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এসেছেন বামফ্রন্ট সরকারের কাছে অর্থের জন্য। শ্যাম বেনেগাল, সাথ্যু, সৈয়দ মির্জা প্রমুখ পরিচালকদের মধ্যে কেউ কেউ সরকারী প্রযোজনায় ছবি করতে শুরুও করেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এ আমাদের এক গৌরব। শুধু কাহিনীচিত্র নয় দলিলচিত্র ও শিশুচিত্র রচনায় সরকারী অবদানও অনন্য। শিশুকল্পনা ও বিজ্ঞানভিত্তিক ছবিগুলি যদি ব্যাপকভাবে প্রদর্শিত হয় তাহলে শিশু ও কিশোর মন গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করা হবে। এ রাজ্যের জনজীবনের নানা সমস্যাকে কেন্দ্র করে নির্মিত দলিল চিত্রগুলি যেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা ইতিপূর্বে কখনও লক্ষ্য করা যায় নি। এগুলি স্থূল সরকারী প্রচার নয়, সমস্যার গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সমাধানের ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত চিত্রও হয়ে উঠেছে।

এ রাজ্যে নির্মিত ছবিগুলি যাতে পরিবেশকদের ব্যবসায়িক চক্রান্তে পড়ে মার না খায় সেজন্য সরকার বাধ্যতামূলক প্রদর্শনের যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সেই বিলে এখনও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাওয়া যায় নি। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারলে যেমন এ রাজ্যের চলচ্চিত্রশিল্পের অনেকখানি সংকট মোচন হবে তেমনি দর্শক-রুচি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালিত হবে। সরকার ও ব্যাঙ্কের যৌথ উদ্যোগে গ্রামাঞ্চলে বেশ কয়েকটি সিনেমা হল তৈরী করে প্রদর্শনের সুযোগ বৃদ্ধির পরিকল্পনাও সরকার নিয়েছেন। এ ছাড়া সর্বপ্রথম এই রাজ্যে কালার ফিল্ম ল্যাবরেটরিও সরকার নির্মাণ করছেন। এতকাল এ রাজ্যের পরি-চালকদের রঙিন ছবির কাজ সমাধা করার জন্য বম্বে বা মাদ্রাজ ছুটতে হত। ফলে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হত বিপুল পরিমাণে। আশা করা যায়, অদূর-ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্যের চলচ্চিত্রকাররা কলকাতায় আসবেন এই কাজের জন্যে। কলকাতার বুকে সরকারী প্রয়াসে যে আর্ট থিয়েটার কমপ্লেক্সটি নির্মিত হচ্ছে তা হবে জাতীয় গৌরব। মাত্র চার বছরে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের এই বিপুল কর্মকাণ্ড শুধু জনগণের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে তাই নয়, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপরূপে মানুষের সাধুবাদও লাভ করেছে।

পাশাপাশি যুবকল্যাণ দপ্তর শহর ও গ্রামাঞ্চলে যুব সমাজের সুস্থ শরীর ও মন গঠনে ব্যাপক কর্মসূচী রূপায়ণে তৎপর হয়ে উঠেছেন। অপসংস্কৃতির লক্ষ্য—যুবসমাজ যাতে বিকলাঙ্গ না হয়ে পড়ে তার জন্য এই দপ্তর বিভিন্নমুখী কর্মসূচী নিয়ে যেভাবে সমগ্র পশ্চিম বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছেন তা ফলপ্রসূ হতে বাধ্য। বিকল্প সংস্কৃতিই অপসংস্কৃতির দুর্বার গতি রুদ্ধ করতে পারে —বামফ্রন্ট সরকার এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করেছেন ও সৃষ্টির রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন এবং বাঞ্ছিত ফল ফলাতেও শুরু করেছে। জনসাধারণ এর জন্য আশান্বিত ও আনন্দিত।

যুব কল্যাণ বিভাগ চার বছর এক ঝলকে

সৌমিত্র লাহিড়ী

পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকারের চতুর্থ বছরটিও অতিক্রান্ত হল। এবার শুরু হবে শেষ বছরের যাত্রা। তারপর আবার নতুন করে জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করে ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রশ্ন।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ রূপায়ণের জন্য সময় পাঁচটি বছর। কোন কোন প্রতিশ্রুতি আবার দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের মাধ্যমে রূপায়ণ প্রয়োজন হয়। কিন্তু মধ্যবর্তিকালীন সময়েও পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষণ একান্ত জরুরী হয় ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনে।

চার বছরে যুবকল্যাণ বিভাগ কি করেছে এ প্রশ্ন বিচার করতে হলে আমাদের একটু পিছন ফিরে তাকাতে হবে। সদ্য পার হয়ে আসা দিনগুলির কথা একটু স্মরণ করতে হবে।

যুবকল্যাণ বিভাগের জন্ম এক ভয়ংকর রক্তাক্ত বাংলার যন্ত্রণা-দগ্ধ সময়ে। ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে সামান্য কিছু কর্মী ও মাত্র ৯৭ হাজার টাকা বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দের ঝুলি নিয়ে এই দপ্তর কাজ শুরু করে। পশ্চিম বাংলার যুবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে এই দপ্তর এমন প্রত্যাশা হয়ত ছিল। কিন্তু তখন সেই প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। যুবসমাজকে ছিন্নমূল উদ্‌ভ্রান্ত নীতিহীন আদর্শহীন-মূল্যবোধহীন সময় উপহার দেওয়া ছাড়া তারা আর কিছু করতে পারে নি। কোন সুস্থ পরিকল্পনা, কোন সুষ্ঠু প্রকল্প, কোন গঠনমূলক কর্মতৎপরতা সেদিন এ দপ্তরকে চঞ্চল করে তুলতে পারে নি।

ভারতবর্ষের লক্ষ কোটি শিশুর মতই এই সদ্যজাত বিভাগটিও উপযুক্ত বিকাশের সুযোগ পায় নি, তাই বিপুল সম্ভাবনার উজ্জ্বল হাতছানি থাকলেও টালমাটাল পায়ে এগোতে পারে নি।

এলো বামফ্রন্ট সরকার। লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর উত্তাল জোয়ার পশ্চিম বাংলার রক্তাক্ত চত্বরে নতুন প্রাণের ঢল নামাল। শত সহস্র যুবক-যুবতী দাঁতে দাঁত কষে সংগ্রাম করেছেন, লড়াই করেছেন, বন্দীর নিষ্ঠুর জীবনযাপন করেছেন, বাড়ী ছাড়া-পাড়া ছাড়া-এলাকা ছাড়া হয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত শুধুমাত্র আদর্শ সম্বল করে প্রতিক্রিয়ার হিংস্র আক্রমণ ও নির্যাতন মোকাবিলা করেছেন। জনগণ অনেক রক্ত অশ্রু আর ঘামের বিনিময়ে বামফ্রন্ট সরকারকে পশ্চিম বাংলার বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুবক-যুবতীদের ভূমিকাও ছিল অনন্যসাধারণ।

যুবসমাজের সমস্যা অনেক। বিরাট তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। গোটা সমাজ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন নয়, বরং যুবসমাজ মূল সমাজের একটি বৃহৎ স্পন্দনশীল সৃজনধর্মী ও প্রাণবন্ত অংশ। তাই যুবসমাজের সমস্যার মোকাবিলাও বিচ্ছিন্নভাবে করা যায় না। মূল সমাজের আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান না করতে পারলে যুবসমাজের সমস্যারও সমাধান সম্ভব নয়।

তবুও কিছু করা যায়। হতাশা ক্রোধ ক্ষোভ থেকে কিছুটা আত্মবিশ্বাসের পথে ফিরিয়ে আনা যায়; আশা-আকাঙ্ক্ষা অতি সামান্য হলেও পূরণ করা যায়, যদি কর্মদ্যোম সৃষ্টি করা যায়, যদি আন্তরিকতা নিষ্ঠা সততা সম্বল করে দুরূহ কাজও সমাধা করব এই দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হওয়া যায়। বিগত চারটি বছরে যুবকল্যাণ বিভাগের কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে অগ্রগতির চিত্র যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে হলে এই কথাই বলতে হবে—যুবকল্যাণ বিভাগ যুবসমাজের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, পেরেছে বিদ্বেষ ও ঘৃণার পরিবেশ পালটে দিয়ে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। কেউ কিছু দিতে পারলে তার কাছে প্রত্যাশাও বেড়ে যায়। তাই বিগত চারটি বছরে এই দপ্তরের কাছে যুবসমাজের প্রত্যাশাও হাজার মাইল প্রলম্বিত হয়েছে।

॥ দুই ॥

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে শুধুমাত্র অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প ও পর্বতাভিযানকে উৎসাহিত করা ছিল যুবকল্যাণ দপ্তরের কাজ। কিন্তু বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দপ্তর পরিচালনায় দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন এনেছেন। সম্পূর্ণ নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আরও বেশী বেশী করে গ্রামীণ যুবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কাছাকাছি উপনীত হওয়ার প্রয়াসী হয়েছেন। অবশ্য পুরাতন কর্মসূচীগুলিও অব্যাহত গতিতে রূপায়িত হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকার যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই দপ্তরের কাজকর্ম পরিচালনা করতে চান তার নিদর্শন মিলবে প্রতি বছরের বাজেট বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিলে। যখন যাত্রা শুরু করে তখন এই দপ্তরের বাজেট ছিল মাত্র ৯৭ হাজার টাকা (১৯৭২-৭৩), কংগ্রেস সরকার যেবার ক্ষমতাচ্যুত হয় সেই শেষ বছরে এই দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দ ছিল মাত্র ৪১·৯৯ লক্ষ টাকা। আর বামফ্রন্ট সরকার আসার পর বর্তমান বছরে এই দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দ স্থির হয়েছে ২ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। নিচে (১৯৮১-৮২) পর পর পাঁচ বছরের ব্যয়-বরাদ্দ টেবল দেওয়া হলঃ

আর্থিক বছর	ব্যয়-বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)
১৯৭৭-৭৮	৫২·৭৬
১৯৭৮-৭৯	১১৩·১৭
১৯৭৯-৮০	১৬৯·৫৬
১৯৮০-৮১	২২৪·০৭
১৯৮১-৮২	২৬৮·৩৫

সারা ভারতে একমাত্র পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকারই গোটা রাজ্যে যুবকল্যাণ বিভাগকে ব্লক স্তর পর্যন্ত প্রসারিত করেছে। এই সরকার যখন ক্ষমতাসীন হয় তখন মাত্র ৪০টি ব্লকে যুবকরণ ছিল, বর্তমানে পশ্চিম বাংলার ৩৩৫টি ব্লকের মধ্যে ৩২৭টি ব্লকেই যুবকরণ স্থাপিত হয়েছে। ব্লকস্তর ছাড়া ও জেলা যুবকল্যাণ কার্যালয়ও কাজ করতে শুরু করেছে। অর্থাৎ সাংগঠনিকভাবে

এই দপ্তর বর্তমানে গ্রামবাংলার প্রান্তভূমিও স্পর্শ করতে সক্ষম।

যুবসমাজের সবচেয়ে তীব্র ও প্রকট সমস্যা হল কর্মহীনতার যন্ত্রণা। আমাদের দেশের যুবসমাজ কাজ করতে চায় না এমন নয়। পরপর পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হয়েছে, কিন্তু তবুও যুবক-যুবতীদের দুটো বলিষ্ঠ হাতে কাজ দেওয়ার সুযোগ নেই। এই আমাদের দেশ : যার হাত আছে তার কাজ নেই, যার কাজ আছে তার ভাত নেই, আর যার ভাত আছে তার হাত নেই।

এই নিদারুণ সংকটের কথা বিবেচনা করেই যুবকল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান (Additional Employment Programme) গ্রহণ করা হয়। বিগত চার বছরে এই বিভাগের উদ্যোগ ও পরিচালনায় প্রান্তিক ঋণসহ মোট তিন কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ দশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। ফলে প্রায় তিন হাজার যুবক-যুবতী নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছেন।

স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের আছে বিরাট ভূমিকা। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে অল্প-স্বল্প আয়ের পথ করে নেন অল্প শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা। এ পর্যন্ত ১৩৬টি প্রকল্পে প্রায় তিন হাজার যুবক-যুবতী এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তপশীলভুক্ত জাতি উপজাতির জন্য ২০ লক্ষ টাকার বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

শুধু পশ্চিম বাংলা নয়, সারা ভারতের যুবসমাজের কাছে একটি বড় ঘটনা হল রাজ্য যুব কেন্দ্রের বাস্তবায়ন। কলকাতার মৌলালি মোড়ে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০ কাঠা জমির ওপর নির্মিত হয়েছে এই কেন্দ্র। রাজ্য যুব কেন্দ্র সমগ্র যুবসমাজের এক মিলন কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। যুবসমাজ এই কেন্দ্রে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার চর্চা ও প্রসারে উপযুক্ত সুযোগ পাবেন। এই যুব-কেন্দ্রে আছে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ, সাধারণ পাঠাগার, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞান সংগ্রহশালা, যোগ ব্যায়ামাগার, যুব আবাস, বহুমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সংগ্রহশালা প্রভৃতি। আশা করা যায়, রাজ্য যুব কেন্দ্র সামগ্রিকভাবে সর্বস্তরের যুবসমাজের কাছে আকর্ষণীয় সম্পদ বলে বিবেচিত হবে এবং শত সহস্র যুবক-যুবতীর অকুণ্ঠ অংশ গ্রহণে এক অর্থ-বহ ও প্রাণময় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে।

রাজ্য যুব কেন্দ্রের পরিকল্পনা অনুসারে বহুমুখী জেলা যুব কেন্দ্রও স্থাপন করা হচ্ছে। মালদা, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, ২৪ পরগণা (উত্তর), হুগলী—এই সাতটি জেলায় জেলা যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। প্রতিটি যুব কেন্দ্র স্থাপন করতে ব্যয় হচ্ছে সাত লক্ষ টাকা। জেলা যুব কেন্দ্রগুলিতে থাকবে গ্রন্থাগার, কমিউ-নিটি হল, পাঠাগার প্রভৃতি।

যুবসমাজকে হতাশাগ্রস্ত ও সমাজ বিমুখ করে দেওয়ার জন্য সংস্কৃতির নামে প্রতিক্রিয়া শিবির অপসংস্কৃতির জোয়ার আমদানি করেছে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংস করে অশ্লীলতা, যৌনতা, সমাজবিমুখতা, হতাশা ও বিশ্বাসহীনতার অন্ধকারময় জগতে যুব-জনকে নিমজ্জিত করার যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে তাকে প্রতিরুদ্ধ করে সুস্থ জীবনধর্মী সংস্কৃতির প্রসারে পালটা একটা আন্দোলনও গড়ে তুলেছেন যুবসমাজ। যুবকল্যাণ বিভাগ এই পালটা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য অনেকগুলি কর্মসূচী গ্রহণ করে। যুবকল্যাণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় এবং প্রত্যক্ষ সহায়তায় রাজ্য স্তর থেকে জেলা ও ব্লক স্তর পর্যন্ত যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আবরণহীন নারীদেহ, যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে এমন সংগীত, নাটক, যাত্রা ঢালাওভাবে সত্তর দশকে আমদানি করা হয়েছিল। মদ-নারী আর জুয়ায় যুবজীবন ছিল পঙ্কিল। অন্ধকার থেকে আলোর ফেরায় এহেন প্রক্রিয়ায় যুব উৎসবগুলির অতুলনীয় ভূমিকা রয়েছে। গ্রামীণ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও অচেনা-অজানা প্রতিভার আবিষ্কারে যুব উৎসব সারা রাজ্যে গভীর ছাপ রেখেছে। এ বছর প্রতি ব্লকে চার হাজার দু'শ টাকা করে এই উৎসবে দেওয়া হয়। ৩২৭টি ব্লকে সর্বমোট কমপক্ষে ২০ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এবং কম করেও ৫ লক্ষ যুবক-যুবতী প্রতিযোগীরূপে অংশগ্রহণ করেন।

যুবসমাজের মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তার প্রকাশ যেমন ঘটছে, তেমনি দেখা যাচ্ছে ক্রমশ বেড়ে চলেছে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও ধর্মীয় উন্মাদনা। ক্রমশ ভীড় বাড়ছে মন্দির মসজিদ গীর্জায়। ভোলা বাবা পার করে গা-র কুৎসিত উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ছে শহর গ্রামে।

বিজ্ঞান কুসংস্কার মুক্ত করে চেতনা বাড়ায়, যুক্তি ও বুদ্ধির জগৎকে প্রসারিত করে। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ-সময়-দেশ ও পরিবেশকে চিনতে শেখায়। তাই যুবকল্যাণ বিভাগ যুবসমাজের মধ্যে বিজ্ঞান চিন্তার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে নানা রকম কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

বর্তমান সরকার প্রতি বছর ব্লক স্তর থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত এবং পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বিজ্ঞান আলোচনাচক্র প্রতি-যোগিতার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ব্লক-জেলা-রাজ্য স্তরে বি. আই. টি. এম-এর সঙ্গে যৌথভাবে আলোচনাচক্র সংগঠিত করা হয়। জেলা ও রাজ্যস্তরে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান প্রদর্শনী দেখতে আসেন। বিজ্ঞান প্রদর্শনী বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে ৪১টি সায়েন্স ক্লাবকে অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। পশ্চিম বাংলার ৮২টি সায়েন্স ক্লাবের কর্ম-ধারার মূল্যায়ন করে বি. আই. টি. এম. যাদের অর্থ সাহায্য করতে বলেছিল যুবকল্যাণ বিভাগ তাদেরই এই সাহায্য দিয়েছে। ভারতের মধ্যে পশ্চিম বাংলার পুরুলিয়াতেই প্রথম একটি জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। যুবকল্যাণ বিভাগ এর জন্য ব্যয় করেছে ৫ লক্ষ টাকা।

গ্রাম বাংলায় সংস্কৃতি চর্চার উপযুক্ত কেন্দ্রের বড় অভাব। দুঃস্থ জীর্ণ কিছু সংস্থা নিদারুণ সংকট মাথায় নিয়ে অদম্য উৎসাহে যাত্রা, নাটক, থিয়েটার, সংগীত, ক্রীড়া প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন।

বর্তমান সরকার এই সমস্যাটির প্রতিও গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন। ব্লকে ব্লকে কমিউনিটি সেন্টার ও মুক্তাঙ্গন মঞ্চ গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে।

কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করার ব্যয় ধরা হয়েছে মোটামুটিভাবে ২৫ হাজার টাকা। এর ২৫ শতাংশ স্থানীয় উদ্যোগে সংগ্রহ করতে হয়, বাকী ৭৫ শতাংশ যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে দেওয়া হয়। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা ও বর্ধমান জেলায় চারটি করে এবং অন্যান্য ১৩টি জেলায় ৩টি করে কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হয়। এই আর্থিক বছরে ৭০টি কমিউনিটি সেন্টারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। মেদিনীপুর (৮), ২৪ পরগণা (৯), বর্ধমান (৭), দার্জিলিং (৩), নদীয়া (৩) এবং অন্যান্য জেলায় ৪টি করে সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। ১৯৮০-৮১

আর্থিক বছরে অর্থাৎ বর্তমান বছরে ৫৩টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করতে ব্যয় হবে ৯ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭৫০ টাকা। কুচবিহারে (১১), উত্তর ২৪ পরগণায় (৬), দক্ষিণ ২৪ পরগণায় (১৩), জলপাইগুড়িতে (৭), পশ্চিম দিনাজপুরে (৩), মালদায় (২), নদীয়ায় (৩), বাঁকুড়ায় (৩), বীরভূমে (৩) এবং বর্ধমানে (২)টি করে কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা হবে এবার।

মুক্তাঙ্গন মঞ্চ তৈরীর জন্যও যুবকল্যাণ বিভাগ আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। সাধারণত ১৪ হাজার টাকা ব্যয়ে মুক্তাঙ্গন মঞ্চ নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ব্যয়ে মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা ও বর্ধমান জেলায় চারটি করে এবং অন্যান্য জেলায় তিনটি করে মুক্তাঙ্গন মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে।

১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে চার লক্ষ নব্বই হাজার টাকা ব্যয়ে মেদিনীপুরে(৮), ২৪ পরগণায়(৯), বর্ধমানে(৭), দার্জিলিং-এ(৩), নদীয়ায়(৩) এবং অন্যান্য জেলায় চারটি করে এ ধরনের মুক্তাঙ্গন মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরে (১৯৮০-৮১) কুচবিহারে (১১), উত্তর ২৪ পরগণায় (৬), দক্ষিণ ২৪ পরগণায় (১৩), জলপাইগুড়িতে (৭), পশ্চিম দিনাজপুরে (৩), মালদায় (২), নদীয়ায় (৩), বাঁকুড়ায় (৩), বীরভূমে (৩), বর্ধমানে (২)টি মুক্তাঙ্গন মঞ্চ নির্মাণ করার জন্য ৫ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। প্রথম দুটি বছরে যুবকল্যাণ বিভাগ আর্থিক সাহায্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে দিয়েছিল। এখন সরাসরি দেওয়ার সাংগঠনিক শক্তি অর্জিত হওয়ায় সরাসরি আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। আর্থিক সাহায্যের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে। কমিউনিটি সেন্টার ও মুক্তাঙ্গন মঞ্চ, গ্রামীণ সংস্কৃতির বিকাশ এবং অনাবিষ্কৃত প্রতিভার স্ফুরণে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করবে। যুবসমাজের প্রতি দরদী মন নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রগুলি। এ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ১৭০টি কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা এবং ১৭০টি মুক্তাঙ্গন মঞ্চ স্থাপন করার জন্য ১৪ লক্ষ টাকা যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে ব্যয় করা হয়েছে।

গ্রামীণ সাংস্কৃতিক সংস্থা ও ক্লাবগুলি ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে পারে না, আর্থিক সংগতিহীনতার জন্য। অথচ রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত সন্ধ্যা বা স্থানীয় বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি সুস্থ জীবনধর্মী সংস্কৃতিকে বেগবান করা একান্তভাবে প্রয়োজন। তাই যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে এ ধরনের ক্লাব অনুষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত সাড়ে এগার লক্ষ টাকা এ বাবদ ব্যয়িত হয়েছে।

কলকাতা মহানগরীর খেলা-পাগল যুবক-যুবতীর উচ্ছ্বলতা দেখলে আপাতভাবে মনে হতে পারে আমাদের এই বাংলায়, ক্রীড়া-চর্চার খুব দ্রুত প্রসার ঘটছে। ক্রীড়াচর্চার প্রসার কিছু ঘটলেও, ক্রীড়ার মান যে দ্রুত নেমে যাচ্ছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, গ্রাম-বাংলায় এমন অসংখ্য বিস্তীর্ণ এলাকা রয়েছে যেখানে একটা খেলার উপযোগী মাঠ নেই, খেলাধুলোর সাজ-সরঞ্জাম নেই, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই, আর্থিক সংকটে ক্রীড়া সংস্থাগুলি জর্জরিত, নিয়মিত খেলাধুলো বন্ধ হয়েছে—বহুকাল শরীরচর্চাও বন্ধ। ক্রীড়ামোদী কিছু যুবক-যুবতী হয়ত তারই মধ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন খেলাধুলার চর্চা টিকিয়ে রাখার জন্য।

যুবকল্যাণ বিভাগ গ্রামীণ ক্রীড়ার পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণের জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। খেলার মাঠ তৈরী করা বা সংস্কার করার জন্য ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রকল্প অনুমোদন করা হচ্ছে। এর ৭৫ শতাংশ ব্যয় বহন করে যুবকল্যাণ বিভাগ। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে মেদিনীপুর, বর্ধমান, ২৪ পরগণা জেলায় ৪টি করে এবং অন্যান্য জেলায় তিনটি করে খেলার মাঠ তৈরী করার জন্য মোট ১২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে মেদিনীপুরে, ২৪ পরগণা ও বর্ধমান জেলায় ৯টি করে এবং অন্যান্য জেলায় ৬টি করে মাঠ তৈরী করার জন্য ২৪.৭৫ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছরে এই সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। এই টাকায় বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগণা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ৮টি; মালদা, কুচবিহার, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হাওড়া ও নদীয়া জেলায় ৪টি; পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও পুরুলিয়া জেলায় ৩টি এবং মেদিনীপুর জেলায় ১০টি ও হুগলী জেলায় ৬টি করে খেলার মাঠ তৈরীর সাহায্য দেওয়া হয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরেও খেলার মাঠ তৈরীর জন্য সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এ পর্যন্ত ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় করে যুবকল্যাণ বিভাগ ৩০০টি মাঠ নির্মাণ ও সংস্কার করেছে।

প্রতিটি ব্লকেই যুব উৎসবের অন্যতম অঙ্গ থাকে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গ্রাম গ্রামান্তরের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া কুশলীরা অংশগ্রহণের সুযোগ পান। অতীতে কখনও এত ব্যাপকভাবে গ্রামীণ ক্রীড়া-চর্চার সুযোগ সরকার সৃষ্টি করেন নি।

উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে ক্রীড়ার মানোন্নয়নের জন্যও সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যুবকল্যাণ বিভাগ গ্রামীণ ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করছে প্রতিটি ব্লকে কমপক্ষে তিনটি করে। সাধারণত এক মাস স্থায়ী হয় এই প্রশিক্ষণ শিবির। প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য দশ লক্ষ টাকা এ বছর ধার্য করা হয়েছে।

জিমন্যাসিয়ামের জন্যও সরকারী সাহায্য যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বর্ষে জিমন্যাসিয়াম সরঞ্জাম কেনার জন্য বিভিন্ন জেলার মধ্যে দশ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। দশ লক্ষ টাকায় নির্মিত হয়েছে ৪০টি ব্যায়ামাগার।

পর্বতাভিযান যেমন দুঃসাহসিক তেমনি ব্যয়বহুল। পর্বতাভি-যাত্রী সংস্থাগুলি আর্থিক কারণে ও সরঞ্জামের অভাবে অনেক সময় অভিযান থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হন। যুবকল্যাণ বিভাগ যুব-মানসে দুঃসাহসিকতা ও দুর্জয়কে জয় করার আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য এ পর্যন্ত ২ লক্ষ ২২ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছে। এ ছাড়াও পর্বতাভিযান প্রশিক্ষণের জন্য ৪৬ জনকে ও স্কীয়িং-এর জন্য ১৪ জনকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে এই বিভাগের পক্ষ থেকে।

গ্রামীণ ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে সাহায্যের জন্য ক্লাব অনুদান দেওয়া হয়। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে খেলার সরঞ্জাম বিতরণের জন্য ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা যুবকল্যাণ দপ্তর থেকে মঞ্জুর করা হয়। বিগত চার বছরে খেলার সরঞ্জাম বিতরণের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে এবং পশ্চিম বাংলার প্রায় সব ব্লকের সব ক্লাবই এর ফলে উপকৃত হয়েছে।

যুবকল্যাণ বিভাগ বর্তমানে ১৮টি যুব আবাস পরিচালনা করছে। যুবসমাজের মধ্যে কূপমণ্ডুকতা দূর করে অজানা অচেনা দেশ সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বাসনা প্রবল। যুব-মানসে ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকলেও সুযোগের অপ্রতুলতার জন্য এবং আর্থিক অনটনের কারণে অনেক ইচ্ছারই অপমৃত্যু ঘটে। যুব-কল্যাণ বিভাগ বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানে যুব আবাস স্থাপন করছে। লালবাগ ও দীঘার যুব আবাস নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে এসেছে। আর অল্পদিনের মধ্যেই চালুও হয়ে যাবে। বক্রেশ্বর-এর যুব আবাস নির্মাণের প্রস্তুতির কাজও অনেকটা এগিয়েছে। ইতিমধ্যেই

বীরভূম জেলা পরিষদ যুব আবাস নির্মাণের জন্য জায়গা দিয়েছে। শুশুনিয়ার যুব আবাস নির্মাণের কাজও অনেকটা এগিয়েছে। বকখালিতে একটি যুব আবাস নির্মাণ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বিহারের রাজগীরেও যুবকল্যাণ বিভাগ একটি যুব আবাস স্থাপন করেছে। ইতিমধ্যেই বাড়ি সংগৃহীত হয়েছে।

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ভ্রমণের জন্য যুবকল্যাণ বিভাগ আর্থিক সাহায্য দান প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত চার বছরে ১০৬৬টি বিদ্যালয়ের প্রায় ৩২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এ সুযোগ পেয়েছেন। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ২০ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা।

ছাত্র নয় এমন যুবক-যুবতীদের ভ্রমণের জন্যও সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছরে ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা এ বাবদ দেওয়া হয়েছে। আগের আর্থিক বছরে (১৯৭৯-৮০) এ বাবদ দেওয়া হয়েছিল ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। বিগত চার বছরে সর্বমোট চার লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

বর্তমান সংকটময় আর্থিক পরিবেশে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অল্প বয়স থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সমবায়ী মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে পারলে অদূর-ভবিষ্যতে সমবায় আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে উৎসাহিত করে ১১৯টি বিদ্যালয়ে সমবায় স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৬৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হয়েছেন।

ছাত্রদের জন্য যুবকল্যাণ বিভাগের আর একটি কর্মসূচীও বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর সমাদর লাভ করেছে। এই বিভাগের পক্ষ থেকে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করে টেকস্ট বুক লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়েছে যার ফলে প্রায় ৬৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হচ্ছেন।

আমাদের দেশে নিরক্ষরতার সমস্যা পর্বতপ্রমাণ। স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও এই সমস্যা বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় নি, বরং ক্রমশঃ সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হয়েছে। যুবসমাজ সমাজের মঙ্গলের জন্য নিস্বার্থভাবে কাজ করে থাকে। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুধু সমাজ সেবা নয়, সমাজ ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সংকট দূর করার সংগ্রামেরই অঙ্গ। এই সংগ্রামে সামিল হওয়ার জন্য যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকেও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচী অন্যান্য বিভাগের পক্ষ থেকেও নেওয়া হয়। তাই কতকগুলি সীমিত এলাকায় এই কর্মসূচী যুবকল্যাণ বিভাগ হাতে নিয়েছে। দার্জিলিং জেলার চা-বাগিচা এলাকায় ১০০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, এখন তারা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে চা-বাগিচার শ্রমজীবী যুবকদের টেনে আনছেন। হুগলীর কল-কারখানা-অধ্যুষিত শিল্পাঞ্চলে এবং আরামবাগে ১৫০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

যুবকল্যাণ বিভাগ যুবসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এবং যুবসমাজ সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারের ভাবনাচিন্তার সঠিক উপস্থাপনের জন্য বিভাগীয় প্রদর্শনীর (Exhibition) আয়োজন করছে। বিগত এক বছরে বিভিন্ন জেলায় প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই বিভাগের বক্তব্য যুবসমাজের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বিভাগীয় কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত করান ছাড়াও তিন দশকের ছাত্র-যুব আন্দোলনের ইতিহাসসমন্বিত প্রদর্শনী বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শিত হয়েছে।

যুব সংযোগ গড়ে তোলার জন্য এই বিভাগ নিয়মিত মাসিক 'যুবমানস' পত্রিকা প্রকাশ করছে। এই মুখপত্রটি যুব সমাজের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এর প্রচার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে।

যুবকল্যাণ বিভাগের কাজকর্মের চার বছরের মূল্যায়ন করতে গিয়ে একটি বিষয় প্রসঙ্গত বলা জরুরী প্রয়োজন। যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে দেশের যুবসমাজ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী এবং তার গঠনমূলক পরিকল্পনাসমূহকে একটি নীতির মধ্যে সুসংবদ্ধ করে একটি জাতীয় যুবনীতি ঘোষণা করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা চালান হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে এই নীতি ঘোষণা করানো যায় নি। এই বিভাগের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে বহুমুখী বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কোন যুবকল্যাণ মন্ত্রক বা বিভাগ না থাকা। এমন কি এই রাজ্যের মত অন্য কোন রাজ্যে যুবকল্যাণ বিভাগ না থাকার ফলে অভিজ্ঞতা-বিনিময় এবং অন্য রাজ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ এই বিভাগের ভাগ্যে জোটে নি। তবুও রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রিসভার গতিশীল নেতৃত্ব যুব সংগঠনসমূহের বিশেষ করে বামপন্থী যুব সংগঠনগুলির প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী পরামর্শ ও উপদেশ এবং এই বিভাগের কর্মচারীদের যুবজনোচিত ক্ষিপ্রতা ও আকাঙ্ক্ষিত আন্তরিকতার জন্য রাজ্যে যুবকল্যাণ বিভাগ তার কর্মকাণ্ডকে গোটা রাজ্যব্যাপী সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছে, এবং প্রায় পৌনে দু' কোটি যুবক-যুবতীর দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয়েছে।

(৩৯ পাতার পর)

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ভাষার স্থান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলার শিক্ষা আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাংলার কৃতী সন্তানদের মহান ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে অধ্যক্ষ মৈত্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, 'বাংলা ভাষা আজ যে সমৃদ্ধি লাভ করেছে তার পরেও যদি বাংলা ভাষার যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয় তবে এর চাইতে আর দুঃখের কি হতে পারে।'

সাহিত্য ও ভাষা প্রশ্নে বিতর্কের প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যক্ষ মৈত্র বলেছেন, সকল স্তরের সমস্ত বিষয় পাঠের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই হল কাম্য মানবিক সম্পর্কের বিকাশ সাধন। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক সম্পর্ক যদি যথাযথভাবে বিকশিত না হয় সে ত্রুটি শিক্ষাব্যবস্থা তথা সমাজ-ব্যবস্থার—শিক্ষণীয় বিষয়ের নয়।

অধ্যক্ষ মৈত্রর যুক্তিটি খুবই মূল্যবান এবং শিক্ষায় সাহিত্য পাঠ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ওপর বৈজ্ঞানিক যুক্তির আলোক সম্পাত।

বর্তমান শিক্ষা বিতর্কে রবীন্দ্রনাথের নাম বার বার এসেছে। মনীষী কবির শিক্ষা-চিন্তার মর্মবস্তুকে বিকৃত করে স্ব-পক্ষের উপযোগী ব্যাখ্যার মাধ্যমে কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী বিভ্রান্তি ছড়াতে চেষ্টা করেছেন। অধ্যক্ষ মৈত্র তৃতীয় প্রবন্ধে "শিক্ষায় ভাষা ও রবীন্দ্রনাথ"-এ শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষার কোন্ স্তরে কোন্ কোন্ ভাষা পড়ান উচিত ইত্যাদি প্রসঙ্গে কবির মত উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তেই এসেছেন যে, বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের ভাষানীতি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার পরিপন্থী তো নয়ই বরং তার সুযোগ্য সম্প্রসারণ ও কালের সঙ্গে সংগতি-পূর্ণ।

অধ্যক্ষ মৈত্রর চতুর্থ তথা শেষ প্রবন্ধটি সবচেয়ে মূল্যবান।

(শেষাংশ ৩৬ পাতায়)

ভূমি-সংস্কার আইনের দ্বিতীয় সংশোধনী (১৯৮১)

বিনয় চৌধুরী

কেন এই আইন আনতে হলো?

ষষ্ঠ পরিকল্পনার কাঠামোতে (১৯৮০-৮৫) মন্তব্য করা হয়েছে "সমস্ত রাজ্যগুলিতে জমির উপর ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আইন চালু হওয়া সত্ত্বেও, হিসাবমত বাড়তি জমি বিতরণের জন্য দখল করা সম্ভবপর হয় নি। তাই আইনের ফাঁকগুলিকে বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া দরকার এবং জমির ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আইন কার্যকরীভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করা দরকার।" ১৯৭৯ সালের ১৪ই জুন, কেন্দ্রীয় কৃষি-মন্ত্রক থেকে যে তথ্য পরিবেশন করা হয়, তাতে দেখা যায় ৬৮ লাখ ৬০ হাজার একর হিসাবমত বাড়তি জমি, তার মধ্যে ৪৪ লাখ ৭০ হাজার একর বাড়তি ব'লে ঘোষণা করা হয়, দখল নেওয়া হয় ২৩ লাখ ৩০ হাজার একর এবং মাত্র ১৫ লাখ ৮০ হাজার একর বিলি করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী দখল আইন (State Acquisition Act) নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল তখন যে তথ্য পরিবেশন করা হয় তাতে বলা হয়, ১৮ লাখ হ'তে ২০ লাখ একর বাড়তি জমি পাওয়া যেতে পারে। মনে রাখতে হবে তখন পরিবারভিত্তিক সিলিং ছিল না—এবং কৃষি জমির ঊর্ধ্বসীমা ছিল ২৫ একর। এখন সিলিং পরিবারভিত্তিক এবং ঊর্ধ্বসীমা সেচ এলাকায় ১২½ একর এবং অ-সেচ এলাকায় ১৭½ একর। অতএব বাড়তি জমি অন্ততঃ ৩০/৩৫ লাখ একর হওয়া উচিত। মোট জমি চাষ হয় ১ কোটি ৩৭ লাখ একর। কিন্তু ১৯৮০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সিলিং বহির্ভূত কৃষি জমি সরকারে ন্যস্ত হয়েছে মাত্র ১২,১১,৬১৬·৭৫ একর। এর মধ্যে জমিদারী দখল আইনে ১০,৬৪,১৭৩·২২ একর এবং ভূমি সংস্কার আইনে ১,৪৭,৪৪৩·৫৩ একর। অতএব এটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে সিলিং কমিয়ে এবং পরিবারভিত্তিক করেও বিশেষ ফল পাওয়া যায় নি। আইনের বিভিন্ন ফাঁকের সুযোগ নিয়ে, সিলিং আইন এড়িয়ে, জমি বড় বড় জোতদাররা রাখতে সমর্থ হয়েছে। তাই আইনের ফাঁকগুলি বন্ধ করে, প্রকৃত বাড়তি জমির দখল নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্যই এই আইন আনা হয়েছে।

এ আইনে শতকরা ৯৯ ভাগ কৃষকের ভয় পাবার কিছুই নেই

১৯৭০-৭১ সালের এগ্রিকালচারাল সেন্সাস অনুযায়ী, পশ্চিম-বঙ্গে মোট হোল্ডিং সংখ্যা ৪২,১৬,৩২৭-এর মধ্যে ১২½ একরের কম জমি আছে এমন হোল্ডিং-এর সংখ্যা ৪১,২৫,৯৫১ এবং অ-সেচ এলাকায় ১২½ একর হতে ১৭½ একর জমি আছে এমন হোল্ডিং কমপক্ষে ৫০,০০০ হবে। অতএব ৪১,২৫,৯৫১ হোল্ডিং কোন মতেই এই আইনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। মাত্র ৪১,০০০ হোল্ডিং যাদের আছে এবং সিলিং আইন নানাভাবে ফাঁকি দিয়েছে, তারাই এই আইনের আওতায় পড়বে। ৯৯ ভাগ কৃষকের বাগান, পুকুর প্রভৃতি সব রকম জমি নিয়েই মোট জমির পরমাণ সিলিং-এর নীচে।

•

জমির সংজ্ঞা

জমির সংজ্ঞায় কৃষি অ-কৃষি সব জমিকেই ধরা হয়েছে। এটা নুতন কিছু নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ১৮৯৪ সালের ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট-এ এবং জমিদারী দখল আইনে কৃষি ও অ-কৃষি সব ধরনের জমিই আইনের আওতায় আছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ভূমি সংস্কার আইন—জমিদারী দখল আইনেরই পরিপূরক আইন—অথচ এখানে অ-কৃষি জমি ছাড়া অন্য সব ধরনের জমিকে ওই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এর ফলে কৃষি জমিকে অ-কৃষি জমি হিসাবে দেখিয়ে সিলিং-এর বহির্ভূত নিজ দখলে রাখার প্রবণতা দেখা গেছে। ২৪ পরগণায় কৃষি জমিতে জল ঢুকিয়ে মেছোভেড়ী ব্যাপকভাবে হতে থাকে। সোনারপুর থানায়, শামুকপোতা মৌজায় একটা ৩৩ একর মেছোভেড়ী—২০২ একর মেছোভেড়ীতে রূপান্তরিত হয়। একমাত্র ২৪ পরগণা জেলায় এই-ভাবে ৫৪,০০০ একর মেছোভেড়ীতে রূপান্তরিত হয়।

মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায় বাগানের ছাড়ের সুযোগ নিয়ে এমনিভাবে বাগান বলে দেখিয়ে হাজার হাজার একর জমি দখলে রাখা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে সিলিং ধার্য করার কোন অর্থই হবে না, যদি সিলিং ছাড়াও মেছোভেড়ী, বাগান প্রভৃতির নামে সিলিং-এর উপরে বহুগুণ বেশী জমি রাখতে দেওয়া হয়।

তাছাড়া বর্তমানে বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হয়েছে, তাতে সব রকম জমিতেই কোন না কোন ধরনের চাষ করা সম্ভব। কৃষি ও অ-কৃষি জমির মধ্যে মালিক পার্থক্য ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে।

এর ফলে বাগান, পুকুর প্রভৃতি ধ্বংস পাওয়ারও আশঙ্কা অমূলক। কারণ যাঁরা ফলের চাষ, অথবা মাছের চাষের উপরই নির্ভর করতে চান তাঁরা ৫২ বিঘা পর্যন্ত ফলের বাগান অথবা মাছ চাষের পুকুর রাখতে পারবেন। যাঁরা এ নিয়ে হৈচৈ করছেন, তাঁরা চান ৫২ বিঘা ধানি জমি রেখে, তার উপর যত খুশী বাগান ও পুকুর রাখবেন, এটা স্বভাবতই মেনে নেওয়া যায় না। সামাজিক বন সৃজনের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সংশোধনী আইনের ৮নং ধারায় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পিছনের দুটি নির্দিষ্ট তারিখ হতে আইনের ব্যবস্থা চালু করার প্রশ্ন

এই বিলটি আইনে পরিণত হলে, ১৯৬৯ সালের ৭ই অগাস্ট হতে প্রযুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কারণ ওই সময়েই, পরিবারভিত্তিক সিলিং প্রবর্তনের সম্ভাবনা সাধারণভাবে সকলে

অনুমান করতে পারেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে শুরু করেন। সুপ্রীম কোর্ট ১৯৮০ সালের ৯ই মে তারিখের রায়-এর বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছেন। অতএব এ নিয়ে সংবিধানগত প্রশ্ন ওঠার আদৌ কোন কারণ নেই। সিলিং আইনকে ফাঁকি দিয়ে রাখা লুকোন জমি উদ্ধার করার ক্ষেত্রে, রেভিনিউ অফিসাররা ১৯৫৩ সালের ৫ই মে হতে সমস্ত বেনামী হস্তান্তর বিচার করে দেখতে পারবেন কারণ ওই তারিখে জমিদারী দখল বিল—যাতে কৃষি ও অ-কৃষি জমির উপর সিলিং ধার্য হয়—গেজেটে প্রকাশিত হয়। কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, এর ফলে ছোট ও মাঝারি জোতের মালিক—যাঁরা সিলিং বহির্ভূত জমি কিনেছেন—তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। বহু মামলা মোকর্দমা সৃষ্টি হবে। ছোট ও মাঝারি জোতের মালিকরা যদি প্রকৃতই খরিদ করে থাকেন—তাহলে যাতে তারা কোনরূপ অসুবিধায় না পড়েন, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে, বর্তমান সংশোধনী আইনের ৪৪নং ধারার ২নং উপধারায় (অর্থাৎ মূল আইনে ৫২(৪) ধারায়) তাঁদের অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারবে। অতএব এ বিষয়েও অহেতুক উদ্বেগের কোন কারণ নেই। আর মামলা মোকর্দমা সৃষ্টি হওয়ার কথা? অবস্থাপন্ন জোতদাররা গরীবদের হয়রানি করে, নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য যে কোন ছুতায় কোর্টের আশ্রয় নেয়। প্রকৃত বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করার মত একটা অত্যন্ত ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বিষয়ের বিরুদ্ধেও প্রায় ৩০।৩২ হাজার মামলা রুজু হয়েছে। অতএব মামলা মোকর্দমা সৃষ্টি হবে এ যুক্তিতে কোন প্রগতিশীল সামাজিক ন্যায় বিচারের সপক্ষে আইন করা হতে বিরত থাকা যায় না।

বর্গা রেকর্ড করা ছোট জোতের মালিকের সুবিধা

বর্গাদারদের নাম রেকর্ডভুক্ত হওয়ার দরুন ছোট জোতের মালিকদের প্রয়োজনের সময়ে জমি বিক্রি অসুবিধা দূর করার জন্য এই সংশোধনী আইনের ৩৩নং ধারায় রাজ্য ও এলাকাভিত্তিক ল্যান্ড কর্পোরেশন গঠন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেচ এলাকায় ১ হেক্টর ও অ-সেচ এলাকায় ১½ হেক্টর পর্যন্ত জমির মালিক—যাদের অন্য তেমন কোন আয় নেই—জমির আয়ই মুখ্য—তারা এর সুযোগ নিতে পারবে। ল্যান্ড কর্পোরেশন, জমির বাজার দরের সমপরিমাণ টাকা বর্গাদারকে ঋণস্বরূপ দেবে—উক্ত জমি বন্ধক রেখে। বর্গাদার ওই টাকা জমির মালিককে দিয়ে দেবে এবং ঋণের টাকা পরিশোধ করলেই জমির মালিক হয়ে যাবে। এই ব্যবস্থার ফলে ছোট জোতের মালিকদের প্রয়োজনের সময়ে বর্গা রেকর্ড হওয়া সত্ত্বেও জমি বাজার দরে বিক্রী করতে অসুবিধায় পড়বে না এবং বর্গাদাররাও ল্যান্ড কর্পোরেশন হতে আগাম ঋণ পেয়ে ক্রমশঃ জমির মালিক হতে পারবে।

পাট্টাদার ও বর্গাদারদের সাহায্যকল্পে সমবায়

সংশোধনী আইনের ৩৬নং ধারায় পাট্টাদার ও বর্গাদারদের সাহায্য করার জন্য "কো-অপারেটিভ কমন সার্ভিস সোসাইটি" গঠন করার ববস্থা করা হয়েছে। যে কোন এলাকায় ৭ অথবা তার বেশী সংখ্যক ব্যক্তি—যারা ১ একর পর্যন্ত জমি যে কোন শর্তে চাষ করে—তারা এই ধরনের সমবায় গঠন করতে পারবে। এই সমবায় উৎপাদনে সাহায্য করার জন্য চাষের বলদ, উন্নত জাতের বীজ, সেচের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের জন্য সহজ সুদে ঋণের ব্যবস্থা করবে। উৎপন্ন ফসলের ও বিক্রীর সুবন্দোবস্ত করবে। হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, পাট্টা প্রাপকরা গড়পড়তা ২ বিঘা করে জমি পেয়েছে। তাই পাট্টা প্রাপকদের গরু, লাঙ্গল, বীজ, সার প্রভৃতির জন্য সরকার অথবা ব্যাঙ্ক হতে সাহায্যের কোনরূপ ব্যবস্থা না থাকলে, তাদের পক্ষে চাষ চালান খুবই শক্ত। বর্গাদারদেরও অনুরূপ সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। নতুবা তারা জমির মালিকদের নিকট হতে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয় এবং ঋণে আবদ্ধ বাঁধা গোলামে পরিণত হয়। পাট্টাদার ও বর্গাদারদের এই অসুবিধা দূর করার জন্য এই ধরনের সমবায় গঠন করার কার্যক্রম নেওয়া হচ্ছে। পাট্টাদার ও বর্গাদাররা এর দ্বারা যে বিশেষভাবে উপকৃত হবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

জমির রূপান্তর করতে হলে, সরকারের অনুমতি নিতে হবে

সংশোধনী আইনের ৯নং ধারায় বলা হয়েছে, মূল আইনের ৪বি-এর পর ৪সি-কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ৪সি-তে বলা হয়েছে রায়ত যদি তার জমির পরিমাণ অথবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন করতে চায়, তাহলে তাকে কালেক্টরের কাছে আবেদন করতে হবে। কালেক্টরের অনুমতি ছাড়া জমির ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন করা চলবে না। সরকারের অনুমতি না নিয়ে বালি খাদ, ইঁটভাটা, ধান চাষের জমিতে মাছ চাষ প্রভৃতি এমন ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে যে বৃহত্তর স্বার্থে এর নিয়ন্ত্রণ না হলে, জাতীয় সম্পদ নষ্ট হবে এবং বহু কৃষকের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে। অনেকে আপত্তি জানিয়েছেন, এতে কৃষকদের নানাভাবে হয়রানি বাড়বে। এ আশঙ্কার তেমন কোন ভিত্তি নেই। চাষের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক বিষয়, যেমনঃ বসবাসের ঘর, পুকুর, কুয়া কাটান, গাছ লাগান ইত্যাদি ব্যাপারে চাষের উদ্দেশ্যে নেওয়া জমি ব্যবহার করায় কোন বাধা নেই। চাষের উদ্দেশ্যে নেওয়া জমি, সম্পূর্ণ পৃথক অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হলে, সরকারের কাছ হতে অনুমতি নিতে হবে। এ অনুমতি পেতে যাতে অযথা বিলম্ব না হয় এবং কোনরূপ দুর্ভোগে না ভুগতে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

আদিবাসী ও বর্গাদারদের নূতন সুযোগ

সংশোধনী আইনের ১১ নং ধারায় (মূল আইনের ৮ নং ধারায়) যে জমি বর্গায় চাষ হয়, সেই জমি যদি বিক্রী করা হয়, তাহলে বর্গাদার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা কিনে নিতে পারবে। আদিবাসীদের হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পাওয়ার ক্ষেত্রে, আইনকে আরো জোরদার ও কার্যকরী করার চেষ্টা হয়েছে।

ধর্মীয় ও দাতব্য ট্রাস্ট

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে অনেক ধর্মীয় ও দাতব্য ট্রাস্টের সম্পূর্ণ আয় যে উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয় না। তাই ট্রাস্টের আয় যাতে সম্পূর্ণভাবে ট্রাস্টে উল্লেখিত উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়, তা সুনিশ্চিত করার জন্যই সংশোধনী আইনে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রাস্টের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা সৃষ্টি করা এই আইনের আদৌ উদ্দেশ্য নয়। তাই এই নিয়ে যে বিভ্রান্তি ছড়ান হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

আজকের বিজ্ঞাপন

সুপার্থ চট্টোপাধ্যায়

একটি পত্রিকার পাতা ওল্টাতে গিয়ে ছবিটার ওপর দৃষ্টি পড়ল। ক্ষুধার্ত এক পোষাকের বিজ্ঞাপন। পেছনে অন্ধকার গুহার ল্যান্ডস্কেপ। যেখান থেকে বেরিয়ে আসা একটি পথ ধরে ছুটে আসছে একটি গ্লোম-আপ মেয়ে। বয়স হয়ত বছর বাইশ-চব্বিশ হবে। পরণে প্রিন্টেড এক অদ্ভুত ধরনের পোষাক, খানিকটা ম্যাক্সির মতো। হাঁটুর সামান্য নীচে পর্যন্ত নেমেছে ঝুল। ওপর দিকে বক্ষদেশ প্রায় অনাবৃত, তবু কোথাও আটকে আছে একই প্রিন্টের রিবনে বাঁধা ববড চুল। উড়ছে হাওয়ায়, উড়ছে সেই কাপড়ে তৈরী আধুনিক ধাঁচের ঝোলা। ছুটে আসার তালে তালে দুলছে ফ্রন্ট-কাট পোষাকের প্রান্ত—চকিতের জন্য দেখা যাচ্ছে উরু পর্যন্ত। ফুটস্টেপের নীচে লেখা মোটা হরফেঃ

Come out of the Bone Age, Darling!

সন্দেহ নেই দৃষ্টি হোঁচট খাবার মতো দৃশ্য। সেই পোলিও-লিথিক-নিওলিথিক যুগ পেরিয়ে মানুষ সভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে নিত্যনব বিজ্ঞাপনের হাতছানিতে ভোগ্যপণ্যের খোঁজে ছুটে চলেছে এ সত্য অস্বীকার করবার নয়। তবু আপাতভাবে এটি যেন এক শক্ত ধাঁধা—মানুষ নিজেই সেই বিজ্ঞাপনের জগতের দিকে ছুটে চলেছে না সেই জগৎ আজ দুর্নিবারভাবে আমাদের টানছে যাকে এড়িয়ে যাওয়া বায়ুমণ্ডলের পিছুটান মুছে অন্য কোথাও দাঁড়াবার মতোই দুঃসাধ্য ব্যাপার। একথা ঠিক, বিজ্ঞাপন-বিরোধী কথাবার্তা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সর্বাধুনিক জীবনের প্রয়োজন মেটাতে বিজ্ঞাপনের জগতে পণ্য আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে—কোন্ পণ্য সে-সম্বন্ধে একটু মূলক-সন্ধান করলে দোষ হবে না নিশ্চয়ই। অন্তত অপসংস্কৃতি সম্বন্ধে আমরা যখন সচেতন হতে শুরু করেছি, নারীমুক্তি আন্দোলনের আওয়াজ যখন অনেক দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে, তখন এই বর্তমান প্রসঙ্গটিও নিশ্চয়ই ভাবা দরকার।

সাধারণভাবে আমরা জানি, এখনকার 'ম্যানিপুলেটিভ' ও 'কমব্যাটিভ' মার্কেটের হাল-চাল বিশেষভাবে ধরা পড়ে বিজ্ঞাপনের ছবিতে বা প্রচারে। জিনিস ভাল বা মন্দ কতখানি সেটা বড় কথা নয়। প্রথম এবং প্রধান কথা, তা কতখানি ক্রেতাকে আকৃষ্ট করতে পারছে। আর এই আকর্ষণের জন্য বিজ্ঞাপনের জগতে বিচিত্র জিনিসের সঙ্গে প্রথমত এবং প্রধানত দ্রষ্টব্যবস্তু আজ নারী—আরো স্পষ্টভাবে বললে বলতে হয় নারী-শরীর। সংসার করবার জন্য সাবান, টুথপেস্ট, মাথার তেল, চা, দেশলাই ইত্যাদি নিত্য-প্রয়োজনীয় যে-সব জিনিস লাগে অথবা দৈনিক চাহিদা ছাড়িয়ে 'স্টেটাস মেন্টেন' করবার জন্য যে-সব দামী দ্রব্য দরকার, যেমন টি.ভি., ফ্রিজ, স্কুটার, ভি.আই.পি. লাগেজ ইত্যাদি সর্বত্র দেখা যায় নারীকে উপলক্ষ্য ক'রে বিজ্ঞাপিত বস্তুর দিকে ক্রেতার দৃষ্টি-আকর্ষণ করা। দৃষ্টি-আকর্ষণের তথা আবেদন জাগরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজতম এবং ব্যাপকতম উপায়—মানুষের যৌনচেতনায় আঘাত করা। কারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত শ্রেণী-নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের পক্ষে এই বিশিষ্ট আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ প্রায় অনিবার্য। তাই 'অর্থ' ছাড়া বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের কোম্পানী-গুলি আজ ক্রেতার কাছে নিঃশব্দে দাবী করছে দ্বিতীয় আর এক পণ্য, তা হল মানুষের সাবেকী স্বভাব, অর্থাৎ তার যৌনচেতনার কাছে আত্মসমর্পণ। 'সেক্স-ওরিয়েন্টেশান' আজ তাই অধিকাংশ এ্যাডভার্টাইজিং ডিপার্টমেন্টের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু। লুইস চেসকিন্ড তাঁর Why People Buy গ্রন্থে জানিয়েছেন যে দীর্ঘ-কাল ধরে সজাগ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে তিনি বুঝেছেনঃ

> An individual is motivated to buy something by an ad, but he often does not know what motivated him. (pp. 54-56)

এই 'মোটিভেশনটাই' বড় কথা। আজকের মানুষ জানে না বিজ্ঞাপন তার নিজস্ব চিন্তাধারা, তার রুচি ও বুদ্ধিকে কি প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। কিভাবে এটি ঘটে সেটি একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে।

বেশ কিছুদিন আগে স্টেটসম্যান কাগজের খেলার পাতায় বিজ্ঞাপন-চিত্র বেরিয়েছিল কয়েকদিন ধরে। প্রথমে বোঝবার উপায় ছিল না এটি কিসের বিজ্ঞাপন। কারণ কোন্ বিষয়ে বিজ্ঞাপন তা বলা হতো না। দেখা যেত শুধু নীচের দিকের পাতার বাঁ দিকে প্রায় কোয়ার্টার-অংশ জুড়ে পেছন-ফেরা একটি মেয়ের ছবি। তার পিঠের নীচে দাঁড়ানো একটি হালকা মই এবং তার উপর দাঁড়ানো একটি কার্টুন মানুষের খাটো ছবি। একপাশে কাগজ-আঁটা ফাইলে বিজনেস-সংক্রান্ত দু-তিন লাইনের কিছু কোড-মেসেজ। কার্টুন মানুষটি মেয়েটির জামার চেন টেনে নামিয়ে দিচ্ছে একটু একটু করে। আর তার পরেই দর্শকচিত্তকে উত্তেজিত জেনে নীচে বোল্ড টাইপে আশ্বাস দেওয়া হতো—Look here at Next Day! এ রকম পর পর কয়েকদিন—প্রতিবারেই চেনটি ক্রমশ নীচে নামছে। অবশেষে হল উত্তেজনার অবসান। শেষ চিত্রে দেখা গেল চেনটি সম্পূর্ণ নীচে নামিয়ে দিয়েছে বামন মানুষটি। নীচে লেখাঃ It almost Down! একধারে 'রিজেন্ট কিং' সিগারেটের খোলা প্যাকেট, তারপর প্রোডাকসন এবং সেলের ইকনমিক ডাটা। অর্থাৎ ক্রেতার স্বার্থে মার্কেটে সিগারেটটির দাম কিভাবে আস্তে আস্তে কমানো হচ্ছে তার ব্যাখ্যা।

সচেতন একজন সুস্থ মানুষের মনে অতঃপর এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, একটি মেয়ের জামা খুলে নেওয়ার সঙ্গে মার্কেটে সিগারেটের দাম কমার এই কুৎসিত সাদৃশ্য দেখাবার কি অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল? এক প্যাকেট সিগারেট পোড়ানোর মতোই কি নারী শুধুমাত্র কামনার নেশা জোগায়? সিনেমার সেক্সি দৃশ্য আর পর্ণ-

গ্রাফ লিটারেচারই কি শুধু মানুষের মনকে উন্মত্ত করে, বিজ্ঞাপন-চিত্রগুলিরও কি ব্যাপক ভূমিকা সেখানে নেই? দ্বিতীয়ত, স্টেটসম্যানের মতো এমন একটি কাগজে দেওয়া হয়েছে এই বিজ্ঞাপন, যে-কাগজের অন্তত শতকরা সত্তর ভাগ পাঠক সুরুচিসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ হবেন বলেই আমরা ধরে নিতে পারি। তাঁরা নিশ্চয়ই ইকনমিক গ্রাফ দেখেই বিজ্ঞাপিত সিগারেটটির কনসেসনরেট বুঝে নিতে পারতেন। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শুধু 'রিজেন্ট কিং' সিগারেট নয়, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সমস্ত রকম ভোগ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন চিত্রেই ক্রেতার চিত্তকে উত্তেজিত করে তোলার জন্য ইকনমিক গ্রাফ দেখানো অপেক্ষা বডি-কার্ভ দেখানোটাই একালীন বিজ্ঞাপনগুলির প্রচারকলার বিশেষ কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশিষ্ট এ্যামেরিকান মার্কেটিং এ্যানালিস্ট ম্যাকলুহান বিজ্ঞাপন-শিল্পের উৎকর্ষ দেখে উল্লসিত হয়েছেন এই ভেবেঃ

> The art of advertising has wonderously come to fulfil the early definition of anthropology as the science of man embracing woman.
> (Understanding Media—The Extensions of Man, London 1964, p. 226)

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞাপন-শিল্পের এই যৌনানুগত্য ব্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে আর কিছু না-হোক পুঁজিবাদী দেশের বৃহদায়তন কোম্পানীগুলির চরিত্র ফুটে উঠেছে। সুস্থ সংযত সামাজিক পরিবেশের মধ্যে আরো উন্নততর চিন্তা-চৈতন্যের ভূমিতে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করার অপেক্ষা তার চিত্তকে বিকারগ্রস্ত করে চলেছে আজকের বিজ্ঞাপন প্রচারশিল্প। সভ্যতার সুন্দরদ্বীপ থেকে মানুষের হবে নির্বাসন, তার শ্রমে গড়া সংস্কৃতি কামনার কালো খাদের নীচে তলিয়ে যাবে। 'টেকনোক্র্যাটিক এ্যাডভার্টাইজিং ওয়ার্ল্ডে'র বিশাল কৃত্রিম পরিবেশে মৃত মন নিয়ে টিঁকে থাকবে মানুষ। তবু 'নারী'কে দরকার। কারণ আমাদের আবেগের কেন্দ্রবিন্দু নারী। সুতরাং তাকে উৎপাদনের পণ্য বা উপযন্ত্রের সহায়করূপে ব্যবহার করতে পারলে অবিশ্বাস্য মুনাফা-অর্জন সম্ভব। কারণ ইকনমিক্সের পরিভাষায় আজকে কোম্পানীগুলির সামনে যে সম্ভাবনাময় 'কনজিউমার সোসাইটি' বর্তমান, যে-কোনভাবেই হোক তাদের চিত্তে অভাববোধ জাগানো দরকার; যে-কোন উপায়েই হোক তাদের কামনায় জ্বালানী যুগিয়ে তাদের 'অর্থ' ব্যয়ের ক্ষমতাকে নিঃশেষে নিংড়ে নেওয়া দরকার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, নর্থকোট পার্কিনসন ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে যখন আমাদের দেশে এসেছিলেন, তখন ক্যাপিটালিস্ট মনোপলির সপক্ষে বক্তৃতা করেই ধনবিজ্ঞানের একটি ধূর্ত নিয়ম সম্বন্ধে উৎপাদকদের কিছু উপদেশ দিয়ে গিছলেন। তাঁর মতে, ক্রেতার ডিমান্ড অনুযায়ী সাপ্লাই বাড়বে—অর্থনীতির এই চিরাচরিত নিয়ম একেবারেই বাজে কথা। কারণ ইতিহাসের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, 'চাহিদা' ক্রেতার মধ্যে স্বয়ংভূত নয়, বরং সুচতুর বিজ্ঞাপনের সাহায্যেই তার মনের গহনে ভোগ্যদ্রব্যের অভাববোধ জাগানো যায় (Advertise or Perish: The Statesman, March 8, 1970)

অধ্যাপক চেম্বারলীনও নিষ্কুণ্ঠভাবে অনেক আগে বলেছিলেন, বিজ্ঞাপন চাহিদাকে প্রভাবিত করে ক্রেতার অভ্যস্ত অভাববোধের ও পরিবর্তন ঘটাতে পারেঃ

> Advertisement affects demands . . . by altering the wants themselves. (The Theory of Monopolistic Competition, Massachusetts, 1931, p. 119)

কাজেই বলা যায়, বিজ্ঞাপন-বিভাগে 'নারী'কে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রথমে মানি-হোল্ডার কনজিউমারের মধ্যে নির্দিষ্ট ভোগ্যদ্রব্যটির জন্য অভাব জাগানো, তারপর তাকে প্রলুব্ধ করার জন্য 'ফ্রি কনজিউমার গুডস্'-এর মতো একটি মোহময়ী নারীর বিজ্ঞাপনচিত্র সামনে রাখা। কখনো মুখের সৌন্দর্যে ভুলিয়ে, কখনো বিশেষ-বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিয়ে সংমূঢ় ক্রেতার কানে কানে লুব্ধ মন্ত্রণার জাল বুনে, কখনো-বা একটি ফ্রিজ, টি.ভি. বা সুদৃশ্য ফোমে মোড়া শয্যায় শায়িতা সেরা সুন্দরীর সঙ্গে 'অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি'তে গ্যাজেট দেখাবার অসংখ্য অনুষঙ্গ দেখিয়ে তাকে আকৃষ্ট করছে। তার ফলে মার্কেটে, শপিং সেন্টারে বাড়ছে ক্রেতার 'ক্লিঙ'। বা ধনতান্ত্রিক সমাজের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি—খাদকসমাজ। মনে রাখা দরকার, বিজ্ঞাপনের নিত্যনব উৎকর্ষ বাড়াবার জন্য বহু বিজ্ঞ মাথা খাটছে, খরচা হচ্ছে কোটি টাকায়, বিলিয়ন ডলারের হিসেবে। সুররিয়লিস্ট স্বপ্ন ও টেকনিক, অ্যাবস্ট্রাক্ট প্যাটার্নস, এক্স-রে ফটোগ্রাফি, টাইপোগ্রাফি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্লুপ্রিন্টস ইত্যাদির সমবায়িক সংঘাতে চিত্তস্পর্শী বিপজ্জনক এ্যাড-ফিল্মস ও পোস্টার দিয়ে মানুষের মনের সূক্ষ্ম সংবেদনস্তর পর্যন্ত খুঁচিয়ে চিরে ফেলা হচ্ছে। ফলে মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি নষ্ট হয়ে স্নায়ু বা শরীরের নার্ভগুলির স্পর্শকাতর সংবেদনক্ষমতা হারিয়ে যাচ্ছে। বাইরের জগতের উত্তেজনাকর উসকানিতে, বিজ্ঞাপন বিভাগের রূপ-রঙ-শব্দের চড়া আবিষ্কার ও প্রচারযন্ত্রের সামনে পড়ে মানুষের স্নায়ুর শিরাগুলো 'দপ্' করে জ্বলে উঠেই নিভে যাচ্ছে। জর্জ সিমেল একে বলেছেন 'intensification of nervous stimulation' বা 'metropolitan type of individuality'-' বিশেষত্ব (শ্রদ্ধেয় লেখক বিনয় ঘোষ তাঁর 'মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ' বইতে 'মেট্রোপলিটন মন' শীর্ষক অধ্যায়ে এ বিষয়ে গভীর আলোচনা করেছেন।) স্বভাবতই বিজ্ঞাপন-বিভ্রান্ত এই মন নিয়ে পুরুষ আজ আর নারী-রূপের সৌন্দর্যরসিক নয়, হয়ে পড়ছে ফিগারদর্শক মাত্র। অথচ এর মধ্য দিয়ে কিন্তু পুরুষের 'libidinal experience' ও পূর্ণতা পাচ্ছে না, অনুভূতি-
হীনতার ফলে অল্প বয়সেই মরে যাচ্ছে মানুষের মনে
হীনতার ফলে অল্প বয়সেই মরে যাচ্ছে মানুষের মনে 'eroitic desire'। সুস্থ যৌনজীবনের পরিবেশ না পেয়ে মানুষ হয়ে পড়ছে শিশ্নোদরপরায়ণ। পর্যাপ্ত ভোগ্যপণ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনগুলি সেই যৌনক্ষুধায় ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে সমানভাবে—যেজন্য আজকের শতকরা নব্বই ভাগ বিজ্ঞাপনচিত্রের মডেল 'নারী' এবং সর্বত্রই নারীর সেক্স-অ্যাপীলকে কাজে লাগানো হচ্ছে। ফলে নারী নিজে যেমন তার উগ্র দেহ-সম্বন্ধে জাগ্রত হচ্ছে বিশেষভাবে তেমনি নারী সম্বন্ধে পুরুষের ধারণাও দ্রুত পালটে যাচ্ছে। নারী আজ লিপস্টিক, হট জিনস্ এবং ব্রা-রই যেন অন্য নাম। ইউরোপে এইজন্য একসময় 'বার্নিং দ্য ব্রা'র মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল ('Eroticism in Modern Advertising': Penguin Survey of Business and Industry, 1965—Colin Colby)

বলা বাহুল্য, পোষাকের বিজ্ঞাপন-চিত্রেই আজ নারী সবচেয়ে বেশি 'এক্সপ্লয়েটেড' হচ্ছে। ফ্যাশানের দুরন্ত মোহে নারী আজ সমকক্ষ হতে চাইছে পুরুষের। যন্ত্রোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজ মুনাফার স্বার্থে তাকে স্বাধীনতার মোহে ভুলিয়ে তার দেহকে পুরুষ-ক্রেতার সামনে তুলে ধরতে বাধ্য করছে। যেজন্য

> The most obvious change in readymade garment advertising during the last few years has been—apart from the increase in volume and the number

of competing brands—the introduction of sex as a motivating factor. (Change in Readymade Wear Advertising: The Statesman, April 30, 1970—B. P. Menon)

গত কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের দেশে সেইজন্য রেডিমেড পোষাকের বিজ্ঞাপনে যৌনচিত্র খুব বেশি পরিমাণে বেড়ে গেছে এবং ক্রমশ বাড়ছে।

সুতরাং যুবমানসের পক্ষ থেকে আমাদের আজ সচেতন হবার সময় এসেছে। বলা বাহুল্য, এই সচেতনতা অবশ্যই সাহায্য পাবে জনজীবন থেকে এবং সরকার থেকে। কারণ মনে রাখা দরকার, বামফ্রন্ট সরকার ছাড়া এর আগে আর কোন সরকার সংস্কৃতিকে সুস্থ রাখার জন্য কোন বলিষ্ঠ-দৃঢ় ভূমিকা নেন নি। অপসংস্কৃতি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা কারোর ছিল না। অথচ রুগ্ন সংস্কৃতিকে দিয়েই যথারীতি বিভিন্ন সম্মেলনে অভিনয় করিয়ে নেওয়া হয়েছে। যথারীতি 'বারবধূ'র মতো অভিনয় চলেছে দিনের পর দিন। বাঙালি সংস্কৃতির ধ্বজাধারী বাংলা কাগজ ছবি ছাপিয়ে চুটিয়ে লুটেছে টাকা। অনেক মানী মানুষ ছড়িয়েছেন মতামতের পুষ্পবৃষ্টি। তারপরে বামফ্রন্ট সরকার কি ভূমিকা নিয়েছিলেন তা আজ আর বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

যুবমানসের পক্ষ থেকে সরকারকে আমরা অনুরোধ করছি, বিজ্ঞাপনে এই নারী-প্রচার কিভাবে বন্ধ করা যায়, 'কমব্যাটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট' ধ্বংস করে কিভাবে সুস্থ 'কনস্ট্রাকটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট' চালু করা যায় সে সম্বন্ধে চেষ্টা করুন। যাদের নিয়ে এই বিজ্ঞাপন, সেই নারীদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন হন। কেন, কি মূল্যে তাঁদের বিজ্ঞাপনের বাজারে এত দাম দেওয়া হচ্ছে তা গভীরভাবে চিন্তা করুন, জনমত সংগ্রহ করুন, আন্দোলনে অংশ নিন। পুরুষকে প্রলুব্ধ করা, না পুরুষের চিন্তা ও চৈতন্যের অংশী ও সঙ্গী হওয়া—কোন্‌টা যথার্থ নারী-স্বাধীনতার সংজ্ঞা তা তাঁরা ব্যাপকভাবে ভাবুন। মূঢ় পুরুষের সামনে মিছিল করে (যে মিছিল হবে একান্তভাবে নারী-সম্মেলন) প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁরা নারী-অঙ্গ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞাপন পোড়ান। দাবী জানান, নারী দিয়ে কিছুতেই আর বিজ্ঞাপনের বাজারে মজা লুটতে দেব না। সিগারেট, দেশলাই, ধূপের বিজ্ঞাপনে নারী নীরবে নির্বিচারে ক্রেতার কামনার সামনে ধূ-ধূ করে জ্বলবে তা কিছুতেই আর হবে না। তাঁরা নিজেরাই এ ব্যাপারে সক্রিয় হোন। সুশ্রী কমনীয় সৌন্দর্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। কারণ এ আশ্বাস তাঁরা পেতে পারেন যে তাঁদের সেই আন্দোলনে সরকার সামনে দাঁড়াবেনই, দাঁড়াবেন এক বিশাল সংখ্যক সুস্থ চিন্তাসম্পন্ন যুবকদল।

[প্রসঙ্গ পঞ্চায়েত : ১৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

গ্রাম পঞ্চায়েত—তরিয়াল। জেলা—পশ্চিম দিনাজপুর। লোকসংখ্যা—১৫ হাজারের বেশী। গোবিন্দপুর, পারোল, চিতোড়া ডালা ও তরিয়াল এই পাঁচটি নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে ১৪ জন প্রতিনিধি ১৯৭৮-এ নির্বাচিত হন। মাত্র দশ টাকা তের পয়সা নিয়ে এই পঞ্চায়েত দায়িত্বভার গ্রহণ করে। পরে ১৯৭৮-এর ১৬ই আগস্ট থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত তরিয়াল গ্রাম পঞ্চায়েত বিভিন্ন খাতে মোট ৯৪ হাজার ৪৭৪ টাকা, ৬ কুইন্ট্যাল ৩৭ কিলোগ্রাম ৫৬০ গ্রাম গম, ১৩৩৭ কুইন্ট্যাল ৮১ কিলোগ্রাম ৫০০ গ্রাম চাল পায়। এই আয় থেকে ৩০টি নতুন রাস্তা ও ৮টি পুরানো রাস্তা মেরামত করা হয়েছে, পঞ্চায়েতের দপ্তরের জন্য বাড়ী তৈরী হচ্ছে। ২২ হাজার ৫৫২ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত—ফতেপুর। জেলা—নদীয়া। নব পর্যায়ে পঞ্চায়েতের কাজ শুরু হবার পর এ পর্যন্ত মোট ২২টি নতুন রাস্তা তৈরী ও পুরানো ৯টি রাস্তার সংস্কার হয়েছে। এদের মোট দৈর্ঘ্য ৬০ কি.মি., ৩টি নতুন নলকূপ বসানো হয়েছে, পুরানো ১৯টি নলকূপ মেরামত হয়েছে, ২টি কাঠের সেতু ও ১০টি কালভার্ট নির্মিত হয়েছে।

নদীয়া জেলার মোল্লাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের দপ্তরের জন্য বাড়ী করেছে, ৩২টি ছোট বড় রাস্তা (দৈর্ঘ্য ২৫ কি. মি.) উন্নয়ন করেছে ও বেশ কিছু পাকা সেতু, বাঁশের সেতু, কালভার্ট নির্মাণ করেছে।

নদীয়া জেলার হরিণঘাটা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত এখনও পর্যন্ত গত তিন বছরে ৪৭টি রাস্তার উন্নতি করেছে, ৩০টি নলকূপ মেরামত করেছে, ৭২টি কালভার্ট তৈরী করেছে, ৩০২টি বাড়ী নির্মাণ অথবা সংস্কার করেছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত কসাব, জেলা বীরভূম। এই গ্রাম পঞ্চায়েত গত বছরে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা ৪৪৩টি গৃহের পুনর্গঠন, ১২৩টি বাড়ীর মেরামতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২·৪ হেক্টর জমির সেচ বাঁধ তৈরী হয়েছে, ১৮·৭৫ কি. মি. সেচনালার সংস্কার হয়েছে। ১৯ কি. মি. রাস্তা মেরামত, ১৯টি ইঁদারা মেরামত ও ৫৩ হাজার ইঁট তৈরী হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত কাজ, জেলা বীরভূম, এই গ্রাম পঞ্চায়েত গত তিন বছরে যা করেছে,—রাস্তা মেরামত—২৮ কি. মি.; নতুন নলকূপ স্থাপন—১৬টি; নলকূপ সংস্কার—৮টি; নতুন পুকুর—১টি; নতুন কূপ—৩টি; প্রাথমিক বিদ্যালয়-গৃহ—২টি।

উপরের তথ্যগুলিতে কৃষি কাজে খরচের হিসাব (যেমন সার, বীজ, ডিজেল প্রভৃতি অনুদান, সাহায্য ও ঋণ) সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, সমীক্ষায় রিলিফের হিসাবও গৃহীত হয় নি। কারণ, কৃষিকাজে সহায়তা অথবা রিলিফে খরচ কোন স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করে না। যদিও কৃষি কাজে সহায়তা অথবা রিলিফের সামাজিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। সুদীর্ঘ আলোচনার সমাপ্তির মুহূর্তে যে কথা জোর দিয়ে বলতে চাই তা হল পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সব জায়গায় সমান গতিতে না চললেও সুষ্ঠু পরিচালন-ব্যবস্থা সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত না হলেও এবং উন্নয়ন সম্বন্ধে সম্যক সুপরিকল্পনা না থাকলেও পশ্চিমবাংলার নবপর্যায়ের পঞ্চায়েতব্যবস্থা এ রাজ্যের গ্রামগুলিতে তথা সমাজজীবনে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এবং গ্রামীণ জীবনে যথেষ্ট উন্নতির লক্ষণ সৃষ্টি করেছে।

মৃত্তিকা

রমেন চক্রবর্তী

মনতোষের পাল্লায় পড়ে বেশ খানিক দেরী হয়ে গেল। দেরীর জন্য এখন আরেক জনের মুখ-ভার অবস্থার মুখোমুখি গিয়ে পড়তে হবে।

মনে মনে কিছু কৈফিয়ৎ বানিয়ে রাখলেও, বিশ্বাস্যভাবে সেটা হাজির করাও কম কষ্টকর নয়। তাতে যদি সহজে কাজ হয় তো সৌভাগ্য সেটা। আগে থেকে সময় বেঁধে কথা দেওয়া, তাই দেরীর জন্য কথা উঠবেই। তা ছাড়া, এমনিতেও অনেকখানি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে মৃন্ময়। তার পেছনে কারণ যাই থাক, মৃত্তিকাও সব সময় তার সাথে মানিয়ে চলতে পারে না। নানান ঝামেলা-সমস্যায় সে-ও তো তিতো-বিরক্ত, কাঁহাতক মানিয়ে চলবে।

সম্পর্কটা তবু রয়ে গিয়েছে যাহোক করে। অবস্থা এখন এমন, যেন এটা থাকলেও যা, না থাকলেও তাই। এখন মৃত্তিকার মনে হয়, এ-সমাজে প্রেমিক হোক আর উটকো লোক হোক, তার মন যুগিয়ে চলা ছাড়া কোন উপায় নেই। এ-দেশে মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই একটা কঠিন শাস্তি; তার কোন আশা থাকতে পারবে না, ইচ্ছা না,— কাছাকাছি পুরুষগুলোর কেবলি মন যুগিয়ে চলতে হবে।

তা এই যখন অবস্থা তখন শুধু মৃন্ময় বলে কথা কি, মনতোষ কেন নয়? রূপ-যৌবন নিয়েই তো প্রেম, সেখানে ঘাটতি পড়লেই সব শেষ। তাহলে মৃন্ময় নামক বোকামিকে আঁকড়ে পড়ে না থেকে, মনতোষ কেন নয়? তাছাড়া, পুরুষ জাতটাই এমন, নির্বিন্ধ আত্মীয়তার সম্পর্কে যদি বেড় না পড়ে, অমনি থাবা বাড়িয়ে মাংস খুবলে ধরতে আসবে। মৃন্ময়কে অবশ্য এই দলে এক্ষুণি ফেলা যাচ্ছে না; কিন্তু সক্ষমতা থাকলে কি এত দিনে মনতোষের মত থাবা বাড়াত না? অক্ষম বলেই ও এই পাঁচ-পাঁচটা বছর মেনি-বেড়ালের মত পেছনে লেগে আছে। ওর অক্ষমতাই হয়তো ওকে এতখানি নিষ্ঠাবান করেছে। তবে হ্যাঁ, এটাও খুব সত্যি, ওর অনাথ-অনাথ শুকনো মুখ দেখলে মৃত্তিকার বুকের ভেতরটা এখনও টন্ টন্ করে ওঠে। আর তাই কথা দিতে হয়, কথা রাখবার চেষ্টাও করতে হয়।

আগে আগে বাড়ি পর্যন্ত যেত মৃন্ময়। হালে যাওয়া বন্ধ করেছে। মৃত্তিকার একমাত্র ছোট ভাই, নীলেশের সাথে কি নিয়ে যেন একদিন গোলমাল হয়েছিল,—সেই থেকে আর যায় না। গোলমাল যা নিয়ে হোক, এটুকু জানে মৃত্তিকা, ওকে শাসিয়েছে নীলেশ। আজকাল অনেককেই শাসিয়ে বেড়াচ্ছে—এছাড়া এখন ওর কোন কাজও নেই (ক্লাশ এইটে পা দিয়েই স্কুল ছেড়েছে, ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তার পর পাড়ার দাদাদের পাল্লায় পড়লে যেমন হয় আর কি)। মৃন্ময়ের সাথে এখন তাই পথে-ঘাটেই দেখা হয়, কথা হয়।

মনতোষের পাল্লায় পড়ে অন্তত ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট হয়েছে। নয়তো রিহার্সাল শেষ হবার সাথে সাথেই বেরিয়ে আসতে পারলে মৃন্ময়ের ভার-মুখ দেখতে হত না। ও আবার রেগেমেগে একটা কিছু করতে পারে না। আর তাই ওকে মাঝে মাঝে কি রকম দুর্বল আর মেয়েলী মনে হয়। যাই হোক, মৃন্ময়ের মান ভাঙাতেও আর তেমন উৎসাহ পায় না মৃত্তিকা। পাবে কি, এই পাঁচ বছরে কোন-ভাবেই কি তাকে কিছুমাত্র উৎসাহিত করতে পেরেছে? বরং অন্ধকার আরও বেশি করে গিলে ফেলেছে চারপাশ। এই অন্ধকারে মনতোষের মুখখানাই বেশি উজ্জ্বল মনে হয়। হয়তো সেটা মায়া, সাময়িক বিভ্রম মাত্র। আর এটাও তো সত্যি, প্রয়োজন ফুরোলে মনতোষের কাছে তার দাম আখের ছিবড়ের বেশি নয়।

বাবা যত দিন ছিল, সব ব্যাপারে একটা নিশ্চয়তা ছিল। যেই চোখ বুজলে, সংসারটা এক হ্যাঁচকায় মুখ থুবড়ে পড়ল। মৃত্তিকা ক্লাশ নাইনে স্কুল ছেড়েছিল,—ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। নীলেশটাকে পড়াবার সাধ্যমত চেষ্টা করেও ক্লাশ এইটের ওপারে নিয়ে যেতে পারে নি। কেননা, ততদিনে তার অক্ষম দুর্বল কাঁধে ভারী নড়বড়ে সংসারটা বেশ জুৎসই হয়ে চেপে বসেছে। এই অসহনীয় দশায় মৃন্ময় কোন দিনই উপশম হয়ে উঠতে পারেনি। পাশাপাশি দুর্বল পা-ফেলে তাল রাখবার চেষ্টা করেছে মাত্র (মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়, তার এই দশায় মৃন্ময় দর্শক মাত্র।) মনতোষের অস্তিত্ব তাই এখানে অনেকখানি নির্ভরযোগ্য, বলিষ্ঠ।

একদিন খুব কায়দা করে পেছু নিয়েছিল মনতোষ। সেই প্রথম, রিহার্সাল সেরে ফিরছে মৃত্তিকা, একা। পেছন থেকে ডাক শুনে রাস্তায় থমকে পড়েছিল।

'একা ফিরছেন যে!'

পেশাদারী হেসে মুখোমুখি হয়েছিল মৃত্তিকা: 'আপনিও তো একা!'—ততদিনে মনতোষের মনোভাব জরীপ করা হয়ে গেছে তার। আর বুঝে নিয়েছে, ও বিবাহিত হলেও এতদিনে ওর বৌ বাসি মাংসের স্তূপ হয়ে গেছে। আর এই রকম হলে, তার পক্ষে বড় বেশি অখুশি ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠবারই কথা।

'একা একা হাঁটছি আরকি। এমনিতে এ-সব তো হয় না, স্কোপ নেই তেমন...'

'আমি এক মাসীমাকে দেখতে যাচ্ছি; শরীর খারাপের খবর পেয়েও ক'দিন সুযোগ পাচ্ছি না কিছুতে'—আসলে বাড়ীতে ফেরার দরকার, মা'র অবস্থা ফের খারাপ যাচ্ছে, কেমন আছে এতক্ষণে কে জানে। কিন্তু মনতোষ যদি পিছু নেয়, তাই সতর্কতা হিসেবে খানিক মিথ্যে বলে দিয়েছিল। কেননা, সেই কুৎসিত পরিবেশে ওকে নিয়ে গেলে তার সমস্ত চটক ধুয়ে-মুছে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে।

'চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই...'

'আহ্, আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন। সেই অসুস্থ পরিবেশে আপনাকে নিয়ে...'

'তাহলে আরেক দিন যাবেন। আসুন—'

একটা ট্যাক্সি যেন তৈরী হয়েই পেছু পেছু আসছিল। মৃত্তিকাকে একেবারে হাত ধরে তার ভেতরে নিয়ে তুলেছিল মনতোষ। সে-সময়ে নিজের নিম্নবিত্ত দম্ভ (ওরা তাদের যতখানি

সস্তা ভাবে ততখানি আদৌ নয় ইত্যাদি) বুঝিয়ে দেবার একটা চমৎকার সুযোগ হাতে এসে গিয়েছিল, মৃত্তিকা সুযোগটা কাজে লাগায় নি। কি লাভ হত তাতে, ফালতু দম্ভের কি কোনই দাম আছে!

তারপর একটা রেস্টুরেন্টের খুপরি। খেলাচ্ছলে কিছু দামী খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া, আর প্রায় নাটকেরি কিছু সংলাপ নিজের মত করে নিয়ে কানের কাছে মনতোষের অবিশ্রান্ত প্রলাপ।

শেষে নিরিবিলি গঙ্গার কিনার। মনতোষের একটা হাত মৃত্তিকার কাঁধের ওপর।

'আমি চাই না এত সম্ভাবনা থাকতেও তুমি অকারণে শেষ হয়ে যাও, এ-ভাবে ফুরিয়ে যাও...'

এ-সব সবই আগে থেকে শোনা কথা, মৃত্তিকা অনেকবার শুনেছে। চোখেলাগা ফীগার হলেই এমন কানের কাছে গুনগুন করতে আসে সব। তবু সেই মুহূর্তেই যেন কেমন লোভী আর দুর্বল হয়ে পড়েছিল সে।

'আপনার মত হৃদয়বান মানুষের কাছাকাছি হতে পারব আমি কোন দিন ভাবিনি; অথচ এটাও জানি জীবনে এমন একজনকে না পেলে সব সম্ভাবনা বাসি ফুলের মতই শুকিয়ে যায়...'

মনতোষদের বাৎসরিক নাটকের ব্যাপারটা নিয়ে তাই আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এই সুবাদে আরও কিছু অফিস-ক্লাবও মোটামুটি বাঁধাবাঁধির মধ্যে এসেছে। এক সময়ে তো শুধুমাত্র ছোটখাট এ্যামেচার গ্রুপগুলোর মুখ চেয়েই কাল কাটাতে হত। তবে মনতোষের সুবাদে সবচেয়ে আশাপ্রদ যেটুকু হয়েছে, সেটুকু হল ওর এক সিনেমা পরিচালক বন্ধুর সাথে আলাপ। আশাপ্রদ এই কারণে যে, ওখানে হয়তো একটা ছোটখাট রোল জুটেও যেতে পারে। মনতোষ যথেষ্ট করেছে তার জন্য। আর একবার এ-লাইনের সিঁড়িতে পা রাখবার সুযোগ পেলে, খুব একটা অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

ওর সাথে আজ থিয়েটারে যাবার বায়না ধরেছিল মনতোষ। আজকাল ও এমন সাহসী আর অবুঝ-নাছোড় হয়ে উঠেছে যে. এমনি আচমকা সব আব্দার করে বসে। ওকে চটাবার ইচ্ছা নেই বলেই আব্দার মেটাতে হয়। শেষমুহূর্তে মনতোষের বাড়ী থেকে একটা ফোন এসে আজ জোর বাঁচিয়ে দিয়েছে। নইলে মৃন্ময়কে চটিয়ে দেওয়া ছাড়া কোন পথই থাকত না আর।

মৃন্ময় চটে গেলেও মুখে কিছু বলত না—কোন জোরও খাটাতে চেষ্টা করত না। আসলে, নিজের অক্ষমতা মনে মনে ওকে এতখানি দুর্বল ও সংকুচিত করে রেখেছে যে, ও তা পারে না। তা বলে একটি যুবক যদি তার পুরোপুরি পৌরুষের অধিকার নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াতে না পারে তো ধীরে ধীরে রাশ আলগা হবেই—পাশাপাশি কোন প্রয়োজন বা পাল্টা প্রলোভন থাকলে তো কথাই নেই। তবু, একটা বাধা এসে মাঝে মাঝে মৃত্তিকার পথ আটকে দাঁড়ায়, সেটা হয়তো তার সংস্কার—পুরোনো মূল্যবোধ। তা বলে এটাও আর কতদিন পথ আটকাতে পারবে (মৃন্ময়ের মুখ আগের মত সর্বগ্রাসী হয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে না তার। তবু ও এখনো একটা বাচ্চা ছেলের মত শুকনো মুখে এসে পড়ে—লুকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে; কিন্তু বুকের সেই আকুল ব্যথাটা সেদিনের মত টন্‌টন্‌ করে ওঠে না আজো)। মাঝে মাঝে এমনো মনে হয়, মৃন্ময় নামক যন্ত্রণাটা যদি তার জীবনে না থাকত, তার এগিয়ে যাবার পথ অনেক সুগম হত। যাই হোক, এ-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, সময় অনন্তকাল ধরে তার জন্য সুযোগের ডালি সাজিয়ে রাখবে না। তাই যেটুকু দুর্বলতা আজো অবশিষ্ট, তাকে কাটিয়ে উঠতে হবে,—আর যত দ্রুত সম্ভব।

ঘণ্টাখানেক যা দেরী হয়ে গেছে, ফোনটা যদি এই ঘণ্টাখানেক আগে এসে যেত—দেরীটা এড়ানো যেত। দেরীর জন্য মৃন্ময় অবশ্য অধৈর্য হয়ে চলে যায় নি। এত সহজে ও এ-সব ব্যাপারে অধৈর্য বা হতাশ হয় না। রাত সাড়ে ন'টা-দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলেও ও তা পারে...

মোড়ের মাথায় চায়ের দোকানটায় বসে বিড়ি ফুঁকছিল মৃন্ময়। মৃত্তিকাকে দেখে বিড়ি ফেলে এগিয়ে এল। বিড়ি খাওয়া মৃত্তিকার অপছন্দ, তা বলে সিগারেট কিনবে পয়সা কোথায়। নেশাটা আপাতত ছাড়া যাচ্ছে না বলে কম খায় মৃন্ময়, আর মৃত্তিকার সামনে কখনই নয়।

'এই, আজ আমায় তুমি চা খাওয়াবে?'

মৃন্ময়ের শুকনো মুখে যেন আলোর রোশনাই, মৃত্তিকা কেমন হক্‌চকিয়ে গেল।

'খাওয়াব; কিন্তু শর্ত করছ কেন?'—মৃত্তিকা বুঝতে পারল মৃন্ময় তাকে চমকে দিতে চায়।

টাইপ করা কাগজের ফালিটা বাড়িয়ে ধরে মৃদু অথচ রহস্যময় হাসল মৃন্ময়।

আগে থেকেই ব্যাপারটার কানাঘুষো কানে আসছিল। আর মৃন্ময়ও ধরাধরি তদ্বিরের কিছু বাকী রাখেনি—আঠার মত লেগে ছিল নেতাদের পেছনে। তবু খুব একটা বিশ্বাস ছিল না মৃত্তিকার। কিন্তু বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতই ব্যাপারটা ঘটে গেছে...বুকের ভিতরটা কেমন হালকা হয়ে গেছে, আশ্চর্য! কোথা থেকে যেন এক ঝলক নির্মল বাতাস ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছে তার চোখে-মুখে-বুকে।

'তোমার আমার এতে কুলোবে না?'

মাইনের পরিমাণ আগে থেকে জানা। প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারী হলেও আজকাল আর আগের মত নেই। দিনকাল যেমন বদলে গেছে, তেমনি আগের দিনের পুরোনো ছকটাও নতুন আদল নিয়েছে।

কাগজখানা খামে ভরে পুরো খামটা ভাঁজ করে বুকের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল মৃত্তিকা। 'শুধু চা কেন, তোমাকে আজ আমি অন্য অনেক কিছু খাওয়াব'—পরে গলা নামিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করলঃ 'তার পর তো সব দায় তোমার, তখন তুমি যা খুশি করবে। আমায় রাখলে রাখবে, মারলে মারবে...' সে যেন কোন্‌ গভীর গহন গহ্বরের মাঝে চলে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে, যেখান থেকে আর কোন দিনই সে ফিরে আসতে পারত না। আজকের বাতাস তাই এত মুক্ত নির্মল,—বুক জুড়িয়ে যায়...

আশ্চর্য, আকাশে আজ চাঁদ এল কোত্থেকে! তার কি আজ আসবার কথা? আর এই বুক জুড়োনো বাতাস এত দিন কোথায় আটকে গুম মেরে ছিল? এখন থেকেই বরাবর এ-বাতাস বয়ে যাবে নাকি? মৃন্ময়ের একটা হাত কখন মৃত্তিকার কাঁধের ওপর ভর রেখেছে। ও-ই বা আজ এতখানি সাহসী হয়ে উঠল কি করে? এত দিন ওর ভীরুতাই কি মৃত্তিকাকে এমন অসহায়, মনে মনে নীতিভ্রষ্ট, বে-পরোয়া করে তুলছিল?

ফুটপাথ ধরে পাশাপাশি চলতে চলতে ফিস্‌ফিসিয়ে মৃত্তিকা বলল, 'তুমি আমার মাকেও একটু দেখো, তাহলে আমি এ-সব ছেড়েছুড়ে দেব। আমার আর ভাল্লাগে না এ-সব...'

মৃত্তিকার মুখের ওপরে তাকাল মৃন্ময়। এই মৃত্তিকার সাথে তার অনেক দিন পর দেখা। আর একেই সে এই পাঁচ পাঁচটা বছর ধরে সমগ্র সত্তা দিয়ে আশা করে এসেছে।

'এখন থেকে আসল দায় তো তোমার।' মৃন্ময় ফিস্‌ফিসিয়েই জবাব দিলঃ 'তুমি যা ভাল বুঝবে করবে, আমি কেন তাতে বাধা দিতে যাব!'

কবিতা

আবহমান

মন্দিরা রায়

সমূহ নিয়ম ভেঙে সোনালী কিরীট
মেলে ধরলো সূর্য, আর
তার চরাচর জুড়ে বর্ণিল সুন্দর।
দিনকে সঙ্গে নিয়ে রাত, আর
রাতকে সঙ্গে নিয়ে সারিবদ্ধ মিছিলের মতো
এগিয়ে চলছে ঢেউ, কালকে সঙ্গে নিয়েই
মুহূর্ত, মুহূর্ত কাঁধ রেখেছে তোমার সঙ্গে,
আর
আবহমানের হাত আমাদের মুঠোয়॥

গ্রামের গভীর কোন ঘরে

অমিতেশ মাইতি

গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে যেতেই 'গ্রাম গ্রাম' গন্ধ শরীরে জড়ালো
বুড়ি গাইয়ের কম্পিত পদক্ষেপ থেকে ইতিহাসের মন্থর
পদধ্বনি শুনলাম
কংসাবতীর মায়ায় আবদ্ধ জীবন থেকে ভারাবনত অনুভবকে
সরিয়ে নিই...
ক্রমশঃ হৃদ্য অন্তস্থল থেকে ঠাকুরঘরে প্রার্থনামগ্ন মায়ের
আকৃতি মনে আসে
কালবোশেখীর ঝড়ে তুলসীতলায় প্রদীপ নিভে যায়
অমোঘ নিয়মে, যেমন
গ্রামের শ্মশানে আমার ভাই শুয়ে থাকবে একদিন—
তিনটে প'য়ত্রিশের লোক্যালে
আমি পৌঁছে তার মুখাগ্নি করবো, তার পুড়ে যাওয়ার
গাঢ় গন্ধ মেখে
রাত্রির শিরার ভিতর নিজস্ব এক জাহাজ ভাসাবো, দ্রুত হাতে
বৈঠা তুলে নেব—কেঁপে উঠবে লণ্ঠনের ভারতবর্ষ,
বাঁশবাগান আন্দোলিত
হবে প্রবল বিক্ষোভে—কোন কিছু মেনে নেবে কোন কিছু নয়,
এটাই স্বাভাবিক
আমার মাঠে রোয়া ধান, বোনের ক্লান্ত হাসি ছুঁয়ে যাবে
অস্থির বাতাস
গ্রীমবাস শহরে ঠাট্টা ছেড়ে আমি একদিন ঠিক ঠিক চলে যাবো
গ্রামের গভীরে—যেখানে ভারতবর্ষ নামে আমার একমাত্র ভাই
রুগ্নদেহ কোটরাগত চক্ষুসহ নিয়তির সাথে ডুয়েল লড়ছে, যেখানে
আমার ভারতী নামে বোন খালি পেটে ইশকুল করে॥

রাত্রি গভীর হলে

সুগত কর

রাত্রি গভীর হলে
শহরের অন্তিম কোলাহল
শেষ ট্রেনে চলে যায়
খুলে পড়ে হৃদয়ের শেষ অন্তর্বাস
সময় উলঙ্গ হয়
মুখ থেকে সরে যায়
সমস্ত মুখোস, দেঁতো হাসি,
হৃদয় গহনে অনুল্লেখ ভালবাসা
বার বার উচ্চারিত হয়
চোখের দু'পাশে জমে
থিরি থিরি কাঁপে।

রাত্রি গহীন হ'লে
উড়াল জোছনায় লেবুফুল ঝরে যায়
কোথাও আগুন লাগে,
বন্দুকের নলে কোথাও
নিভে যায় বুকের আগুন,
লাশকাটা ঘরে হাতড়ে ফেরা,
ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছার
একে একে মৃতদেহ নিদারুণ উন্মোচন,
কতকাল কতকাল ঘুম জেগে থাকে
ফুলের গোপন রেণু উড়ে যায় ঝড়ের বাতাসে।

আবার সকাল হয়
সৌরকীট সূর্যের মোহন তন্তুতে
বোনা হয় দিন,
পাখালির দল আবার ডানার জড়তা ভাঙে
আকণ্ঠ বিদ্বেষ হানে কাক,
প্রেম অপ্রেম ভেঙে মানুষেরা
স্বাধীন রৌদ্রের মাঝে
শ্রমের শৃংখল পরে,
প্রাচীন অভ্যস্ত হাতে
ধান বোনে কৃষকের হাড়,
জীর্ণ ইমারতে
আর একদিন অলীক আলপনা।

চক্র : অসুখের ছবি এবং ছবির অসুখ

সামগ্রিকভাবে হিন্দী চলচ্চিত্র চিরকালই রুচিহীন, নির্বোধ প্রমদোপকরণ রূপে যথাযোগ্যতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে এসেছে। তবু, হিন্দী ছবির বস্তাপচা গপ্পো, বিকিনি শাসন, রঙ-চঙে প্রেম-প্রীতি, মহব্বৎ, ব্লো হট নায়িকা, রুদ্ধশ্বাস আতঙ্ক, ন'টা গান, গব্বর সিং, রঙিন উপত্যকা—এই সব সাত-সতের চিরকালীন খয়া খর্বুটে উপাদানের হরি-লুঠের পাশাপাশি গত কয়েক বছরে অন্য চলচ্চিত্রের প্রভাব এবং দায়িত্ব লক্ষণীয়ভাবে চোখে পড়েছে। এখনো পর্যন্ত ভারতীয় ছবিতে সেই নব-নিরীক্ষা ততোটা সুদূর বিস্তৃত না হলেও, সারা দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বেশ কিছু তরুণ শক্তিমান পরিচালক, যাঁরা শুধুমাত্র বাণিজ্য বা কলাকৌশলের জন্যেই ছবি করেন না, যাঁরা সর্বতোভাবে বিশ্বাস করেন, জীবন মানেই সংগ্রাম এবং চলচ্চিত্র সেই সংগ্রামেরই স্থির প্রতিচ্ছবি, আমাদের বেশ কিছু সৎ এবং জীবন-মনস্ক ছবি উপহার দিয়ে সমাজের প্রতি শিল্পীর যে দায়, তা পালনে সচেষ্ট হয়েছেন—এটাই আশা এবং আনন্দের কথা।

আমরা যখন হিন্দী ছবি মানেই নানাবিধ বোম্বেটে লাম্পট্যের সুস্বাদু গরমমশলা-ব্যাপার-স্যাপার, এই সরল সত্যটি টের পেয়ে তাতে আফিমের আচ্ছন্নতার মতো জড়িয়ে থাকছি, বা, সেই দিনগত পাপক্ষয় থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার চেষ্টা করছি, তখন তিন তিনটি হিন্দীভাষী ছবির (অ্যালবার্ট, আক্রোশ, শোধ—যা এই পত্রিকায় পূর্বে আলোচিত) আবির্ভাব আক্ষরিক অর্থেই সেই বোম্বেটে নেশা যা নির্লিপ্তির ওপর একটি বিস্ফোরক আক্রমণরূপে চিহ্নিত হয়ে যায় অনায়াসে।

সাথ্যু, বেনেগাল, মণি কাউল, নিহালনি, মির্জা এবং বিপ্লবের সেই ধারাবাহিকতায় হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে পরিচালক রবীন্দ্র ধর্মরাজ একটি সাহসিক সংযোজন। কিন্তু, শোকের বিষয়, অধুনা মুক্তি-প্রাপ্ত 'চক্র' তাঁর প্রথম এবং শেষ ছবি। মাত্র ৩৩ বছর বয়সেই সেই প্রতিশ্রুতি এবং সম্ভাবনার ফুলকিটা নিভে গ্যাছে, চিরতরে।

নিউ ওয়েভ্ বা অফবিট্ ছবি চলচ্চিত্রের সমূহ প্রচলিত ব্যাকরণকে তুচ্ছ করে সাবলীল হাত ডুবিয়ে দিচ্ছে সময় এবং সমাজের অন্তর্বাসের একেবারে অতলে। এবং সেখান থেকে দায়িত্ববান হাতে তুলে আনতে চাইছে এই ঘুণধরা সমাজের বিষাক্ত কার্য এবং কারণ। আর সেই দায়িত্বশীলতার উত্তরাধিকারসূত্রেই আমাদের কাছে এসেছে রবীন্দ্র ধর্মরাজের 'চক্র', এক বিরল অভিজ্ঞতার ফসল রূপে।

'চক্র'-এ প্রচলিত অর্থে কোন গল্প নেই। বস্তুত, যে জীবন গল্পহীন, নীরক্ত, সাদামাটা তাকেই ছবির বিষয় করেছেন ধর্মরাজ। সাজানো-গোছানো বোম্বাই শহরের উপকণ্ঠে বাঁশ, চট, চাটাই, ছেঁড়া ন্যাকড়ার আপাত নির্ভরযোগ্যতায় ঘেরা যে গিজি, নোংরা ঝুপড়ি-জীবন—খোলা আকাশের নিচে অজস্র ছিন্নমূল মানুষের যে যন্ত্রণাময় বেঁচে থাকা—তাকেই অবলম্বন করেছেন পরিচালক। জীবনবোধ এবং শৈল্পিক নিরাসক্ততা দিয়ে এইসব হাড় হাভাতের গ্লানিময় দিনযাপনকে তিনি ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন নিখুঁত। সেই হিসেবে, বলা যায়, উদ্বাস্তু জীবনের এ এক নিপুণ ডকুমেন্টারি।

আম্মা নামে একটি স্বামীহারা, নিরাপত্তাহীন যুবতী মেয়েকে অবলম্বন করে পরিচালক সমাজের একটি বিশেষ দিকের ওপর আলো ফেলতে চেয়েছেন। পর্দা জুড়ে শারিতা মেয়েটির ক্লোজ-আপ্ মুখকে লং-শটে নিয়ে গিয়ে ক্যামেরা প্যান্ করে তার চোখ দিয়ে ফ্ল্যাশ ব্যাকে তার একদার সুখী সংসার, হঠাৎই এক লোলুপ পুরুষের থাবা এবং তার স্বামীর সেই পশুটিকে হত্যা এবং স্ত্রীপুত্র নিয়ে শহরে পালানো, শহরে ওয়াগন ভাঙতে গিয়ে পুলিশের হাতে গুলিবিদ্ধ হওয়া—খুব দ্রুত এই টুকরো দৃশ্য-গুলির মধ্যেই যতটুকু যা গল্প আছে, তারপর সব সুনসান্, ফাঁকা।

রোজ পৃথিবীতে ভোর হয়, বিপন্ন মানুষের দিন কাটে—কাটবে বলেই। রাত আসে, রাত শেষ হয়। শুধু জেগে থাকে এক সর্বগ্রাসী খিদে, নিরাপত্তাহীন মানুষের শুধু টিঁকে থাকার সংগ্রাম। চক্রাকারে জীবন গড়ায়। সেই টিঁকে থাকার জন্যেই কেউ চুরি করে, কেউ বেশ্যা হয়ে থাকে। নায়িকা আম্মার জীবনে আছে স্বৈচারিতা। এমন কি, তা বয়স্ক সন্তানের গোচরেই। গুন্ডা লুকা অন্যের পকেট কাটা, লুঠপাঠের ওপরই টিঁকে থাকতে চায়। আম্মা আর লুকা কোন বিচ্ছিন্ন চরিত্র নয়। তাদের চারপাশে আছে তার মতোই প্রতিবেশীরা। যারা সকলেই রক্তাল্পতায়, কাজহীনতায়, লোভে, ক্ষুধায়, অসহায়তায় বেঁচে-বর্তে থাকে। মানুষের ন্যূনতম প্রাপ্তিটুকু এখানে নেই। এক সর্বভুক দারিদ্র এবং খিদে এই সব মানুষকে নিছক জন্তু করে রাখে।

সব মেট্রোপলিটান শহরে অর্থ এবং সাফল্যের অশ্লীল স্তূপের পাশাপাশি আমরা, বাবুরা, ফুটপাথে-রেল স্টেশনে যাদের দেখে ঘেন্নায়, আতংকে নাকে রুমাল দিই, ধর্মরাজ তাকেই এত নগ্ন করে দেখিয়েছেন যে তা দেখে আমাদের আঁতকে না উঠে উপায় থাকে না। এবং তখন আতংকিত দর্শক নিজের মধ্যে এক অমোঘ প্রশ্ন টের পায়, এ কোন্ জীবন? এই কি মনুষ্য জন্ম? আমাদের সব বাবু মূল্যবোধ এই ছবিতে কী অবলীলায় ধুলোয় গড়াগড়ি যায়। সন্তানের প্রায় সামনেই মা পর-পুরুষের সাথে শায়িতা, সন্তান প্রতিক্রিয়াহীন, এমন কি রাত্রিবেলা হঠাৎ দ্বিতীয় পুরুষের আবির্ভাবসংবাদ মা'র কাছে তাকেই পেঁাছে দিতে হয়। মায়ের শয্যা-সঙ্গীর সাথে সাবলীল সম্পর্কেও কোন গ্লানি থাকে না। যদিও বেঁচে থাকার জন্যে যে মা শরীর বেচে, সে-ই যখন সন্তানকে কু-বৃত্তি থেকে নিরত রাখতে চায়, তখন আমাদের যুক্তিবোধ একটু ধাক্কা খায়। কিন্তু আম্মার সেই আচরণ তো প্রকৃত অর্থে কোন মূল্যবোধের ক্রিয়াজাত নয়, তা আসলে স্বামীর মৃত্যুর ভয়াবহ স্মৃতির অনুষঙ্গে এক তীব্র নিরাপত্তাহীনতার আশংকা-জনিত।

এই ছবিতে কিছু যৌন-অনুষঙ্গ আছে। খিদে এবং যৌনতায় যে অনিবার্য সহাবস্থান, তা এই ছবিতে দেখান হয়েছে। কিন্তু

এই সব দৃশ্য অনেক ক্ষেত্রে এত বেশী প্রকট করে দেখান হয়েছে যা ছবির মূল বক্তব্য থেকে দর্শকদের দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। বক্স অফিসের কথা ভেবেই কি পরিচালক এই সমস্ত দৃশ্যের দীর্ঘ অবতারণা করেছেন? তা নইলে ছবির বিজ্ঞাপনে শুধুমাত্র একটি বিশেষ মুহূর্তকে ধরে রেখে দর্শক আকর্ষণের চেষ্টা কেন? মনে হয়, পরিচালক আন্তরিকভাবে দৃশ্যায়িত করতে চেয়েছিলেন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অসহায়, অসুস্থ, বিপন্ন বেঁচে থাকা। কিন্তু পরিচালক শেষ পর্যন্ত সুলভতার দাসত্ব স্বীকার করে নিলেন। ছবিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল আপন কক্ষপথ থেকে। ছবিটি দর্শকের চেতনায় আঘাত না হেনে এক চটুল রোমহর্ষক সুড়সুড়ি দিয়ে গ্যাল, যা যে-কোন সৎ শিল্পের পরম শত্রু। ছবিটি আঙ্গিকে চেয়েছিল অসুখের ছবি, কিন্তু ছবিটি নিজেই অসুখে আক্রান্ত হয়ে গ্যাল।

ছবিটি, আগেই বলেছি, ডকুমেন্টারিমূলক। তাই তথাকথিত ফিচার-ফিল্মের অনেক ইচ্ছাপূরণ এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। পরিচালকের সেদিকে কোন আকর্ষণ আদপেই ছিল না। নিরাসক্ত সংবাদদাতার মতো তিনি এক অমোঘ, নিখুঁত এবং জান্তব সাংবাদিকতার মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তিনি শুধু সংবাদ ছেপেছেন, কোন মন্তব্য, কোন আরোপিত দর্শন তাতে গুঁজে দিতে চান নি। শিল্পীর কাজ জীবন্ত বাস্তবকে জীবন্ত মানুষের হাতে তুলে দেওয়া—ব্রেখ্‌ট বলেছিলেন। পারদর্শিতা তবে তার প্রক্রিয়াটা ধর্মরাজের আয়ত্ব ছিল না আদৌ।

এই শাস্ত্র-বিরোধী ছবিটিতে কিছু শাস্ত্রীয় গোঁজামিল রয়ে গেছে। যেমন, এই ছবির আবহসঙ্গীত এবং গান-সংযোজনা (হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর) খুব প্রকটভাবে ফরমুলা-সর্বস্ব। এইসব প্রাকৃত দৃশ্যের পেছন থেকে সুরেলা গলায় হঠাৎ-হঠাৎ গান গেয়ে ওঠা যথেষ্ট কুরুচিকর এবং অপ্রযুক্ত। এমনকি, শেষ দৃশ্যে বুলডজারের হিংস্র দাঁত যখন ভয়ংকরভাবে পিষ্ট করছে উদ্বাস্তু মানুষের সর্বস্ব, তখন তার সাথে ভূপেন্দ্রর সুন্দর কণ্ঠে গান গেয়ে চলা কোন স্বতন্ত্র দ্যোতনা দিতে পারে না। সেই সাংঘাতিক দৃশ্যে একবার মাত্র একটা বাচ্চা অবছাভাবে কেঁদে উঠেছিল। অসহায় মানুষের বোবা যন্ত্রণা, নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যবহার্য জিনিসের ডিটেইল এবং বিপন্ন আর্তনাদ ইত্যাদি নানা সুপ্রযুক্ত কল্পনায় দৃশ্যটি হ'তে পারতো আরো মর্মন্তুদ। যেমন হ'য়েছিল উল্লসিত মদ্যপানে (নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িক প্রথা) শবদাহের দৃশ্যটির ব্যথাতুর ব্যঞ্জনা।

ছবিটিতে কিছু আকস্মিকতাও আছে। জীবনের আকস্মিকতাও কখনো শিল্পে বেমানান। সেই আকস্মিকতার শিকার নাসিরুদ্দিন শাহ কৃত লুকা চরিত্রটি। তার আবির্ভাব আচরণ এবং পরিণতি সবই বেমক্কা। বুলডজার-দৃশ্যটিও নাটকীয়তা বর্জিত নয়। এমনকি ছিন্নমূল মানুষদের সামাজিক প্রেক্ষাপটটা শ্রেণী-বিন্যস্ত সামাজিক ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে প্রদর্শনের অবকাশ এবং ঔচিত্য অস্বীকার করা যায় না। সেই এলোমেলো চেষ্টা মাত্র একটি পর্বে হাস্যকরভাবে কংগ্রেসী নেতার বক্তৃতাদৃশ্যে করা হ'য়েছিল। দৃশ্যটিতে হিন্দী ছবির ভাঁড়ামো এবং ফরমুলার ছাপ প্রকট। এই ছবির মানুষেরা যদি দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস ক'রে থাকে, তাহ'লে স্মিতার ঘর-সংসার, খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-আষাক এবং তার ছেলের নিপাট সার্ট-প্যান্ট, মোলায়েম-শোভিত মুখ, স্মিতার প্লাকড্ ভ্রূ—এইসব বেশ বিসদৃশ।

তা সত্ত্বেও স্মিতা পাতিল এই ছবিতে একটি বস্তির মেয়ে ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর হাঁটাচলা, বসা, দাঁড়ানো, কথা বলা, বিভিন্ন মুদ্রা, স্নান করা ইত্যাদিতে কোথাও কোন ভদ্রতার লেশমাত্র নেই। তিনি যে কখন নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন ক'রে বস্তির মেয়ে আম্মা হ'য়ে গেছেন, তা বোধহয় তিনি নিজেই জানেন না। তাঁর কৃত সব চরিত্রের পূর্ব-ঐতিহ্য এখানে তছনছ। সঠিক কারণেই বছরের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর জাতীয় পুরস্কারটি তাঁর করতলগত হয়েছে। নাসিরুদ্দিন শাহ্-কে চিত্রনাট্য কোন সহায়তা করে নি। তবু তিনি যথাসাধ্য দাপটে অভিনয় ক'রে গেছেন। আশ্চর্য লাগে, এক তরুণ অভিনেতা, রণজিৎ চৌধুরী, ভারতীয় ছবির দুই বাঘা ব্যক্তিত্বের সাথে কি রকম সমানে পাল্লা দিয়ে গেলেন! কুলভূষণ খার-খান্দার করণীয় কিছু ছিল না, করেনও নি।

ছবির ক্যামেরা-কাজও অনবদ্য। বিশেষভাবে কিছু স্টিল তো বাঁধিয়ে রাখার মতো। তবে ছবিটির সম্পাদনা আরো নির্দয় হওয়ার প্রয়োজন ছিল। বিশেষত, স্মিতার গাহন-দৃশ্য (স্মিতা যদিও দৃশ্যটি ক'রেছেন চমৎকার) এবং অন্যান্য শারীর-দৃশ্যগুলিকে সংক্ষেপিত করা যেত অনায়াসে। তাতে হয়তো বক্স-অফিসের আনুকূল্য পাওয়া গেছে, কিন্তু ছবির শিল্পোৎকর্ষতা বাড়ে নি এক-চুলও। বংশীচন্দ্র গুপ্তের শিল্প-নির্দেশনা এবং সেট্-নির্মাণ এই ছবির একটি স্মরণীয় শিল্পকাজ, যা অন্য কোন কারণে তাঁকে জাতীয় পুরস্কারটি পেতে না দিলেও তিনি এই কাজটির জন্যে নিশ্চয়ই অমর হ'য়ে থাকবেন।

উপল উপাধ্যায়

(২৬ পাতার পর)

'শিক্ষাব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ কি এবং কোন্ পথে' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে তিনি কতকগুলি তথ্য পরিবেশন করেছেন যা সাধারণ পাঠকের খুব কাজে লাগবে।

বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার নাকি সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কুক্ষিগত করে সরকারের দখলে রাখতে উদ্যত। মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী শিক্ষা স্বাধীকার রক্ষার জন্য কলকাতা মহানগরী উত্তাল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হালে উপযুক্ত পানি না মেলায় রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতই কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার কব্জা করে নিয়েছে? জবাব মিলবে এই প্রবন্ধে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কাউন্সিল, রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংক্ষেপে আলোচনা করে কাদের নিয়ে সেইসব সংস্থা গঠিত হবে, কাদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে, কতজন নির্বাচিত করা এবং কতজন মনোনীত সদস্য থাকবেন তার তালিকা দিয়েছেন। শিক্ষা পরিচালন সংস্থাগুলিতে আমলাতান্ত্রিক প্রভাব খর্ব করে গণতন্ত্রীকরণের সুস্পষ্ট প্রয়াস এই তালিকাতেই চমৎকারভাবে ধরা পড়বে।

অধ্যক্ষ মৈত্র বইটি অতি ক্ষুদ্র একটি সংকলন। শিক্ষার সঙ্গে জড়িত অনেক প্রশ্নই এখানে আলোচনায় আসে নি। মূলত সাম্প্রতিক বিতর্কই অধ্যক্ষ মৈত্র প্রবন্ধগুলির সংকলিত করায় প্রেরণা বলা চলে। তবে দীর্ঘকালের শিক্ষক-শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুযোগ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য তিনি অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় প্রাঞ্জল ভঙ্গীতে মূল কথাগুলি অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মত অভ্রান্তভাবে ছুঁড়ে দিতে পেরেছেন। সম্ভবত সেই কারণেই বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্তের মুখবন্ধ ললাটে ধারণ করার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছে।

লোক-চিত্রকলা

শিল্পী: অমর দে

কলকাতার রিক্সাওয়ালা

বাতাসে বিষ

প্রবীর লাহিড়ী

কালো ধোঁয়ার আস্তরণে চোখ জ্বালানো অস্বস্তি—যে কোনও শিল্পশহরের একই অবস্থা। মোটর চড়ায় আনন্দ সঙ্গে আনছে শারীরবৃত্তিক অস্বাচ্ছন্দ্য। চিমনির ধোঁয়া, মোটরগাড়ীর ধোঁয়া, পারমাণবিক শক্তির যথেচ্ছব্যবহার আর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের 'সদ্ব্যবহারের কুফলে শম্ভু বিশে অমৃতস্য পুত্রের অসহনীয় কালযাপন।

বেশ কয়েক বছর আগে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে বোর্নিওয় মশা দমনের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রচুর পরিমাণ ডি ডি টি ছড়ানোর পর দেখা যায় সত্যিই কাজ হয়েছে। হঠাৎই দেখা গেল ওখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের খড়ের চাল ভেঙে পড়ছে। অনুসন্ধানে দেখা গেল যে এক ধরনের শুঁয়োপোকার দৌরাত্ম্যেই এই অবস্থার উৎপত্তি। এই শুঁয়োপোকাদের ধরে খেত যারা তাদেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে ডি ডি টি-র ছোঁয়ায়, আর শুরু হয়েছে শুঁয়োপোকাদের মহোৎসব। ঘটনার এখানেই শেষ নয় —এর পরের ঘটনাকে বলা যেতে পারে মাছি মারতে কামান দাগা। গৃহাভ্যন্তরের মাছি তাড়াতেও ডি ডি টি-র যথেচ্ছ ব্যবহার করা হল। টিকটিকিরা মাছি খেয়ে দেয়াল থেকে খসতে লাগলো টপ্ টপ্ করে। কারণ মাছির শরীরে ডি ডি টি ঠাসা। বিড়ালের মহানন্দ। ওরাও ওদের পরমপ্রিয় খাদ্য টিকটিকি ধরে খেতে লাগলো—শুরু হোল বিড়ালদের মড়ক। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার আর দরকার নেই। ইঁদুররা দল বেঁধে বেরোলো গর্ত থেকে—ওদের চিরশত্রু বিড়াল প্রায় নিশ্চিহ্ন। ওদের আক্রমণে চারদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব। খাদ্য ভাণ্ডার শূন্য। অবস্থা এমনই চরমে পৌঁছাল যে প্লেনে করে বিড়াল এনে প্যারাস্যুটে নামাতে হোল ইঁদুর দমনের জন্য। ডি ডি টি দেখা দিল বুমেরাং হোয়ে।

বাতাস দূষিতকরণের ফলে মানুষের মড়কের ঘটনাও বিরল নয়। উনিশশো ত্রিশের ডিসেম্বরে বেলজিয়ামের শিল্পাঞ্চল মিউস ভ্যালি ঢেকে গিয়েছিল ধূসর ধোঁয়াশায়। স্থানীয় অধিবাসীরা প্রায় সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়লো। অনবরত কাশি, শ্বাসকষ্ট, বমি-বমি ভাব—এই ছিল উপসর্গ। বেশ কয়েক হাজার লোক অসুস্থ—মৃত্যুর সংখ্যা ষাট। সব মৃত্যুই হয়েছিলো হার্ট ফেল করার ফলে।

আমেরিকার শিল্প-অধ্যুষিত ডোনোরায় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো আটচল্লিশের অক্টোবরের শেষের দিকে। স্থির বাতাসে, গন্ধকের গন্ধে, ধোঁয়াশার কম্বলে নিজেদের ঢাকলো ডোনারা। তখন ফুটবল খেলা চলছিল দুই স্কুলের মধ্যে। বুকে হাত চেপে ধরে কাশতে কাশতে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে এল খেলোয়াড়েরা। গলা, চোখ, নাক জ্বালা, বমি-বমি ভাব আর মাথা ধরার বাঁধনে বাঁধা পড়লো ঐ অঞ্চলের প্রায় ছ'হাজার লোক। মৃত্যুর সংখ্যা কুড়ি।

বাহান্নর ডিসেম্বরের লন্ডনের কুখ্যাত ধোঁয়াশার পর দেখা গেল যে সাধারণ মৃত্যুর হার থেকে প্রায় তিন হাজারের বেশী লোকের মৃত্যু হয়েছে। বলা কঠিন, প্রকৃতপক্ষে আরও কত জনের মৃত্যুর জন্য ঐ ঘটনা দায়ী।

আবহাওয়া দূষিত হওয়ার দুটো কারণ হতে পারে—প্রথমটি প্রাকৃতিক, দ্বিতীয়টি কৃত্রিম। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে উঠে আসে বিভিন্ন ধরনের পদার্থ—যারা ছড়িয়ে পড়ে হাজার মাইল জুড়ে। ঐ সমস্ত পদার্থের মধ্যে আছে এ্যামোনিয়া, কার্বন-ডাই-অক্সাইড; ক্লোরাইড—যাদের স্বাস্থ্যহানির ধর্ম সুবিদিত। জৈবিক পদার্থের পচনের ফলেও কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি উদ্ভূত হয়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের একদম গোড়ার দিকে আগুন জ্বালানোর সঙ্গে আবহাওয়া দূষিতকরণ শুরু। কাঠ থেকে কয়লা —কয়লা থেকে পেট্রল—আর সম্প্রতি তেজস্ক্রিয় পদার্থ—এই হোল জ্বালানির সভ্যতার ইতিহাস। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্রই এখন পেট্রলের আর ডিজেলের গন্ধ। গাড়ীর ধোঁয়ায় ভেসে আসছে কার্বন মনোক্সাইড যা শরীরাভ্যন্তরের অক্সিজেন-বাহক হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। তা ছাড়া আছে সীসা, নাইট্রোজেন-অক্সাইড, ওজোন, কার্বনকণা ইত্যাদি। পেট্রলের অসম্পূর্ণ দহনের ফলেই বিভিন্ন দূষিত পদার্থের উদ্ভব হয়।

শরীরের ভেতর ঢুকে সীসা স্নায়ুতন্ত্র, কিডনি ও রক্তের ওপর নিজের কুপ্রভাব বিস্তার করে। লোহিত কণিকার আয়ুষ্কাল ও সংখ্যা দুটোই কমিয়ে দেয় সীসা—যার ফলে উদ্ভব হয় এ্যানিমিয়া। স্নায়ুতন্ত্র এবং কিডনির স্বাভাবিক কাজকর্মেরও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সেই গর্জনতেলের পিপে ঢেলে উত্তাল সমুদ্রকে শান্ত করার গল্প আমাদের প্রায় সকলেরই পাঠ্য ছিল। বর্তমানে তেল ঢালাটা নিতান্তই মূর্খামি। কারণ তেলের বাঁধনে আমরা সকলেই বাঁধা। এখানে তেল বলতে বোঝাচ্ছি পেট্রোলিয়ামকে। পৃথিবীতে উৎপাদিত বেশীর ভাগ তেলই আমদানি-রপ্তানি হয় বিরাট বিরাট জাহাজে এবং ছিটেফোঁটা সেই তেল গড়িয়ে গিয়ে সামুদ্রিক পরিবেশকে বিষিয়ে তোলে। সাতষট্টিতে বিরাট তেলের জাহাজ 'টোরে ক্যানিয়ন' একলক্ষ টন তেলের চাদর বিছিয়ে দিয়েছিল সমুদ্রে, এ রকম তৈলাক্ত ঘটনা খুব একটা বিরল নয়। সামুদ্রিক জীবজগতের পক্ষে এইসব ঘটনা খুবই ভয়ঙ্কর।

শিয়ালদহ স্টেশনে আর সাবেক আমলের রেলগাড়ীর ভস্ ভস্ আওয়াজ তেমন শোনা যায় না। কিন্তু কলকাতার মাথা ফুঁড়ে সটান আছে অসংখ্য চিমনি, যাদের কালো ধোঁয়ায় পাল্টে যায় আকাশের রঙ। ধোঁয়ার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকে বিভিন্ন পদার্থ, প্রতিনিয়তই যাদের আমরা টেনে নিচ্ছি আমাদের ভেতরে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কি আর এমন ক্ষতি হবে। কিন্তু আমাদের যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকতো, দেখতাম আমাদের রক্তবর্ণ ফুসফুসের রঙ্ পালটিয়ে কালচে হয়ে যাচ্ছে। দিনের পর দিন এই বিষাক্ত আবহাওয়া শরীরাভ্যন্তরে ঘটাচ্ছে বিষক্রিয়া।

সামগ্রিক মানব-সমাজের চেতনাই পারে আমাদের পরিবেশকে নির্মল শ্বাসোপযোগী করতে। 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'—আর সমগ্র মানবজাতি সুন্দর প্রকৃতির অঙ্গনে।

বামফ্রণ্টের শিক্ষানীতি প্রসঙ্গ ঃ

ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ। ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। দাম—১·৫০ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যক্ষ ভবেশ মৈত্রর শিক্ষা সংক্রান্ত চারটি প্রবন্ধ একত্র করে বামফ্রন্ট সরকারের "শিক্ষা-নীতি প্রসঙ্গে" পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে।

পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকার চারটি গৌরবজ্জ্বল বছর অতিক্রম করে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করেছে। বিগত চার বছরে বহু ঝড়-ঝাপ্‌টা অতিক্রম করে এই সরকার নির্বাচনের সময় জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে রূপায়ণ করার চেষ্টা করেছে।

বামফ্রন্ট সরকারের ৩৬ দফা কর্মসূচির মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ছিল। বর্তমান বছরের বাজেট অধিবেশনে শিক্ষামন্ত্রীদ্বয় অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন যে ঘোষিত কর্মসূচির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

বস্তুতঃ শিক্ষাজগতে বামফ্রন্ট সরকার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মূলতঃ শিক্ষার রুদ্ধদ্বার সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করার জন্যই এই সব পদক্ষেপ। যদিও রাজ্য সরকারের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং সমাজের মৌল কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ছাড়া প্রকৃত গণশিক্ষার দাবি বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। তবু সততা, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা থাকলে এই ব্যবস্থার মধ্যেও কিছু কিছু ভাল কাজ করা যায় তা বামফ্রন্ট সরকার দেখিয়ে দিয়েছে।

শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হোক এটা কায়েমী স্বার্থবাজরা চায় না। শিক্ষা চেতনা বাড়ায় আর চেতনাই জন্ম দেয় প্রতিবাদী কণ্ঠের। তাই পশ্চিম বাংলার কায়েমী স্বার্থবাজরা বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতিকে আক্রমণ করেছে বারে বারে।

বিগত চার বছরে শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের জন্য যা কিছু চেষ্টা হয়েছে তার একটিও স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী বুদ্ধিজীবীদের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় নি। সম্প্রতি সহজ পাঠ ও প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা থাকা উচিত কি উচিত নয়, এই প্রসঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হয়েছে। শিক্ষা নিয়ে এত বিপুল আলোড়ন, বিতর্কের ঝড়, উত্তপ্ত চিঠি আদান-প্রদান অতীতে ভারতের কোন রাজ্যে কখনও হয় নি। শিক্ষা বিতর্ক থেকেই বোঝা যায় সরকারের পদক্ষেপগুলি জনমানসে কী তীব্র আলোড়ন তুলেছে।

বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে এই আলোড়ন চলাকালে শিক্ষা প্রসঙ্গে অনেক বিদগ্ধ আলোচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সব আলোচনা প্রবন্ধ-নিবন্ধই যে সারবান ছিল তা নয় কিন্তু তার মধ্যে অনেকগুলিই ছিল দুই মলাটে ধরে রাখার যোগ্য।

সাম্প্রতিক শিক্ষা বিতর্কে অধ্যক্ষ ভবেশ মৈত্র ছিলেন বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতির সপক্ষে অন্যতম প্রচারক। বিভিন্ন আলোচনা সভা, সেমিনার এবং জনসভায় অধ্যক্ষ মৈত্র অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে সরকারের শিক্ষানীতি ব্যাখ্যা করেছেন। হাজার হাজার মানুষকে সরকারের প্রকৃত লক্ষ্য বুঝাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বিগত কয়েক মাসে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধও রচনা করেছেন। ৪৮ পৃষ্ঠার বর্তমান ক্ষুদ্র সংকলনটি তারই প্রতিনিধি-স্থানীয় একটি সংকলন। এই সংকলনে আছে চারটি প্রবন্ধ 'গণশিক্ষা এবং নূতন প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি', 'গণশিক্ষার আলোকে ভাষার স্থান একটি সমীক্ষা', 'শিক্ষায় ভাষা ও রবীন্দ্র-নাথ', 'শিক্ষা ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ কি এবং কোন পথে'।

চার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু শিরনামগুলিতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতির মূলকথা কি তা বলতে গিয়ে অধ্যক্ষ মৈত্র বলেছেন 'মানুষের উৎপাদিকা শক্তি ও চিন্তা-চেতনাকে বিকশিত করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সমাজের সামগ্রিক মানবশক্তি বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। তাই শিক্ষা যত প্রসারিত ও উন্নত হয় দেশের সম্পদ ও শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনাও তত বাড়ে। নীতিগতভাবে এসব কথা বার বার স্বীকৃতি পেলেও বাস্তবে এর যথাযথ প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় নি। বর্তমান রাজ্য সরকার কি করেছে? অধ্যক্ষ মৈত্রের ভাষায় 'এক কথায় বলা চলে সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সময়ের ঘোষিত প্রস্তাব, বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশ এবং সাধারণ মানুষের অপূর্ণ আশা-আকাংখা প্রভৃতিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা তাঁরা করছেন। আগের থেকে পার্থক্যটা এখানেই। গণমুখিনতাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অধ্যক্ষ মৈত্র তার প্রবন্ধগুলিতে সহজ সরল ভাষায় প্রকৃত তথ্য-গুলি পেশ করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা সিলেবাস কমিটিতে কারা ছিলেন, কত বৈঠক ও আলোচনা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন, শিক্ষক ও শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মতামত কি মূল্য পেয়েছে তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান পাঠক্রম রচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির ওপর দাঁড় করিয়ে অধ্যক্ষ মৈত্র বলেছেন 'আশা করা যায় রাজ্য সরকার, শিক্ষাবিভাগ ও শিক্ষকসমাজের যৌথ প্রচেষ্টায় শিক্ষাকে সহজলভ্য, সহজবোধ্য, অর্থবহ ও সকলের জন্য করার যে কর্মপ্রয়াস সুরু হয়েছে তা অচিরেই ফলবতী হবে এবং পশ্চিমবঙ্গে জনশিক্ষার ভিত সুদৃঢ় ও প্রসারিত হবে'।

শিক্ষায় ভাষার স্থান নিয়েও বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাই মাধ্যম হওয়া উচিত একথা সর্বজনস্বীকৃত। বিশ্বের সমস্ত স্বাধীন দেশগুলিতে তা আজ আর কেবল স্বীকৃত নীতির পর্যায়ে নেই, তা বাস্তবে রূপায়িত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বেশ কিছু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এই প্রসঙ্গে বিতর্কের সূত্রপাত করেছিলেন। অধ্যক্ষ মৈত্র দ্বিতীয় প্রবন্ধে

(শেষাংশ ২৬ পাতায়)

বিভাগীয় সংবাদ

জলপাইগুড়ি জেলা :

কালচিনি ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ও স্থানীয় শ্যামাপ্রসাদ সংঘের পরিচালনায় ১০ দিনব্যাপী ভলিবল ও ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। ভলিবল প্রশিক্ষণ শিবিরে ৩০ জন যুবক অংশগ্রহণ করে। ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিবিরে ২৫ জন বালিকা এবং ৩০ জন বালক অংশগ্রহণ করে। গত ১৫.১.৮১ তারিখে এই প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয় এবং শেষ হয় ২৪.১.৮১ তারিখে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ইউনিয়ন একাডেমীর প্রধান শিক্ষক শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ মহাশয় যুবকল্যাণ দপ্তরের এই প্রয়াসকে অভিনন্দন জানান এবং এই ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা একদম নতুন ও প্রথম সেই হিসাবে কালচিনি ব্লকের অধিবাসিবৃন্দ বিশেষ করে খেলোয়াড়বৃন্দের গর্ব অনুভব করা উচিৎ বলে অভিমত প্রকাশ করেন। প্রশিক্ষণের পর ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। তাতে মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে। ডিমার প্রেমী জনতা ক্লাব বিজয়ী হয় এবং হ্যামিল্টনগঞ্জ সুভাষ স্মৃতি ব্যায়ামাগার বিজিতের সম্মান অর্জন করে। পুরস্কার বিতরণ করেন এই ব্লকের বি. ডি. ও. শ্রীশ্যামাপদ সর্দার। অনুষ্ঠানে তিনি কালচিনি ব্লক যুব-করণের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

(২) ব্রতচারী প্রশিক্ষণ শিবির

কালচিনি ব্লক যুব-করণের সার্থক প্রচেষ্টায় গত ১৫.৫.৮১ থেকে ২২.৫.৮১ তারিখ পর্যন্ত হ্যামিল্টনগঞ্জ কালীবাড়ি মাঠে ব্রতচারী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়কমণ্ডলীর নায়ক প্রশিক্ষক শ্রীবাসুদেব কর্মকার মহাশয়-এর নেতৃত্বে মোট ১২২ জন ছেলে ও মেয়ে (ছেলে ৫১, মেয়ে ৭১) এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। ব্রতচারী শিক্ষা সম্পূর্ণ-রূপে এই ব্লকে প্রথম, তাই সারা ব্লকে অনুষ্ঠানটি বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। ব্রতচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন কাল-চিনি ইউনিয়ন একাডেমীর প্রবীণ শিক্ষক শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়। সমাপ্তি দিবসে সমস্ত শিক্ষার্থীগণ সমবেতভাবে ব্রতচারী শিক্ষা প্রদর্শন করেন।

(৩) কাবাডি প্রশিক্ষণ

গত ২৭শে এপ্রিল '৮১ থেকে এক মাসের কাবাডি প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে কালচিনি ইউনিয়ন একাডেমীর মাঠে। ১০ থেকে ১৬ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের কাবাডি খেলায় উৎসাহিত করা, আধুনিক আইন-কানুন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা, গ্রামীণ স্তরে কাবাডি খেলার চর্চা বহুল ভাবে প্রচারের জন্য এবং উদীয়-মান খেলোয়াড় খুঁজে বের করার অভিপ্রায়ে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কর হয়। এতে সর্বমোট মহিলা ৬৫ জন, পুরুষ ৬০ জন অংশ-গ্রহণ করে। জলপাইগুড়ি জেলার কাবাডি এসোসিয়েসনের সদস্য ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক শ্রীমহেন্দ্র দেবনাথ-এর নেতৃত্বে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়। কাবাডি প্রশিক্ষণ ২টি জোনে ভাগ করে করা হবে। একটি ইউনিয়ন একাডেমীকে কেন্দ্র করে অপর একটি হাসিমারা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। ২টি শিবিরের প্রশিক্ষণ কার্য শেষ হবার পর দু'টি কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মধ্যে টুর্নামেন্ট করার ব্যবস্থা করা হবে। ২৭ মে '৮১ এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ শেষ হয়। হাসিমারা জোনে আর একটি শিবির শুরু হবে জুলাই মাস থেকে।

(৪) ফুটবল বিবরণী

গ্রামীণ খেলাধুলোর মধ্যে সবচাইতে জনপ্রিয় খেলা হল ফুটবল খেলা। কালচিনি ব্লক স্পোর্টস্ এসোসিয়েসনের অন্তর্ভুক্ত সাতাশটি (২৭) ক্লাবকে একটি করে ফুটবল অনুদান দেওয়া হয়েছে কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির অনুমোদন নিয়ে। গত ২০.৫.৮১ তারিখে উপস্থিত ক্লাব-সম্পাদকগণের হাতে একটি করে ফুটবল তুলে দেন ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীরামপদ সিকদার।

(৫) অ-আবাসিক ফুটবল শিবির

কালচিনি ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ও পরিচালনায় গত ১২ মে '৮১ থেকে হ্যামিল্টনগঞ্জ ফুটবল মাঠে এক মাস ব্যাপী অ-আবাসিক ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। ১২ থেকে ১৬ বৎসর বয়স্ক বালকদের এই ফুটবল খেলার আধুনিক নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবহিত করা এবং আধুনিক খেলার পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল করার জন্য এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ স্পোর্টস কাউন্সিলের অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক শ্রীশান্তি দাম মহাশয়ের নেতৃত্বে এই প্রশিক্ষণ চলছে। এতে সর্বমোট ৯৫ জন (১৬ বৎসর পর্যন্ত ৫৫ জন তদউর্ধে ৪০ জন) শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষ হয় গত ১২.৬.৮১ তারিখে।

বর্ধমান জেলা :

কালনা ১নং ব্লকের যুব উৎসব ধাত্রীগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় ৮০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ২০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কাটোয়ার 'রূপা' নৃত্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উৎসবের উদ্বোধন করেন শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী মহাশয়, মহকুমা শাসক, কালনা। সমাপ্তির দিন স্থানীয় বিধানসভার সদস্য শ্রীগুরুপ্রসাদ সিংহ রায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন ও যুব উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীপংকজ মুখোপাধ্যায়, বি. ডি. ও., কালনা ১নং ব্লক। কালনা ১নং ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীশশাংক মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে সমগ্র উৎসবটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা :

করণদিঘী ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে গত ১২ থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা চলে স্থানীয় করণদিঘী হাইস্কুল ময়দানে এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আসর বসে করণদিঘী বি. ডি. ও. অফিস প্রাঙ্গণে। ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ১০০০ জন। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৩০০ জন। ১৪ই ফেব্রুয়ারীর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার

পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান শ্রীশশিভূষণ দাস। প্রধান অতিথি হিসাবে পুরস্কার বিতরণ করেন পঃ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শ্রীনির্মল মুখোপাধ্যায়। এছাড়া এই সভায় উপস্থিত ছিলেন করণদিঘী যুব-ছাত্র উৎসব পরিচালনা কমিটির সভাপতি শ্রীশহীদ আলি বিশ্বাস ও কার্যকরী সভাপতি ও স্থানীয় বি. ডি. ও. যোশেফ মুর্মু।

প্রদর্শনী বিভাগে গ্রাম ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের বিপণি প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উৎসব চলাকালীন বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী তাদের নাটক মঞ্চস্থ করে সমবেত দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনের আয়োজন করেন।

পুরুলিয়া জেলাঃ

বাগমুণ্ডি ব্লক যুবকরণ—এবারে বাগমুণ্ডি যুব উৎসবে ধমসা ঢেঁটরায় ঘা পড়েছিল ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশে তখন প্রকৃতি নিজেই বসন্ত উৎসবে মেতে উঠেছে, পলাশ-কুসুম-শালের সম্ভারে তখন চলছে রঙের হোলি খেলা। ২২শে মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ, তিনদিন ধরে বৈচিত্র্যময় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর খেলাধুলোর ব্যাপক আয়োজনের মাধ্যমে বাগমুণ্ডির মানুষের মধ্যে জেগেছিল অফুরান প্রাণের জোয়ার, অনাবিল আনন্দের তুফান। উৎসবের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল প্রতিটি অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ আর সর্বস্তরে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগ।

বাগমুণ্ডী ব্লক যুব উৎসবের প্রদর্শনীতে প্রখ্যাত ছৌ নৃত্যশিল্পী গম্ভীর সিং-এর মাটির মূর্তি। পাশে দাঁড়ান স্থানীয় তরুণ শিল্পী রামচন্দ্রকুমার এটি গড়েছেন।

গত বছরের মতো এবারে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল দৌড়, লম্ফন, লৌহগোলক নিক্ষেপ, তীর নিক্ষেপ, মিউজিক্যাল চেয়ার, ভারসাম্যের দৌড়। নতুন কয়েকটি প্রতিযোগিতা যোগ হয়েছে এবার—ভলিবল টুর্নামেন্ট, পাহাড়ে আরোহণ ও সন্তরণ। সবক'টি প্রতিযোগিতায় মাত্রাধিক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। শিশুদের বর্ণময় 'র‍্যালি'তে অংশ নিয়েছে প্রায় শ' পাঁচেক শিশু।

উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল প্রদর্শনী। যে কক্ষটিতে সদা অগণন ভিড় লেগে থাকতো, সেটি ছিল স্থানীয় প্রতিভাবান তরুণশিল্পী রামচন্দ্র কুমারের তৈরী ছৌ-নৃত্যশিল্পী পদ্মশ্রী গম্ভীর সিং মুড়ার মৃন্ময় মূর্তি। মহিষাসুরের ভূমিকায় বিশেষ ভঙ্গিমার এই মূর্তিটিতে শিল্পী নিপুণহাতে যথাযথ ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছিলেন। উৎসবে যোগ দিতে এসে স্বয়ং গম্ভীর সিং সে মূর্তি দেখে আনন্দে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যান। রামচন্দ্র কুমার গত বছরের যুব উৎসব প্রদর্শনীতে একটি অপরূপ 'সাঁওতালী মেয়ের মূর্তি' উপহার দিয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

চড়িদার মুখোস শিল্পীদের অভিনব অপূর্ব মুখোসের প্রদর্শনী এবারও ছিল। 'ছৌ-নৃত্যশিল্পী পরিচয়' কক্ষে বাগমুণ্ডি ব্লকের প্রখ্যাত ছৌ-নৃত্যশিল্পীদের স্বদেশে ও বিদেশে প্রাপ্ত স্মারক, পদক, শীল্ড, অভিজ্ঞানপত্র ও বহু দুর্লভ আলোকচিত্র জনসাধারণ এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলো। 'যুব তথ্য ব্যুরো'য় ছিল নানান ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা, সাময়িকী এবং রাজ্য যুব উৎসব ও বিভিন্ন ব্লকের যুব উৎসবের কয়েক শ' আলোকচিত্রের প্রদর্শনী। পুরুলিয়ার 'ছত্রাক' পত্রিকার সহযোগিতায় প্রায় শ' দুয়েক লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের সুষ্ঠুভাবে সাজানো প্রদর্শনী এবার বিদগ্ধজনকে আকৃষ্ট করেছে। 'বিজ্ঞান কক্ষে' ছোটদের মজাদার কুটকাট খেলায় ও একটি টেলি-স্কোপে ছিল চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র দেখার জন্য আবালবৃদ্ধবনিতার ভিড়। ঝাড়গ্রামের 'রঙ ও তুলির' চিত্রপ্রদর্শনীতে কিছু প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন শিশুশিল্পীর ছবি ছিল প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ। সারা প্রদর্শনী কক্ষ জুড়ে শিল্পী সঞ্জীব মিত্রের রঙিন কাগজের দৃষ্টিনন্দন কাজ ছিল অতিরিক্ত আকর্ষণ।

এবারে ঝুমুর গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন পঞ্চাশজন স্থানীয় শিল্পী। ছো-নৃত্য প্রতিযোগিতা চলেছে সারারাত্রিব্যাপী। ঝুমুর আর ছো-নাচের আসরে উল্লেখযোগ্য জনসমাগম, মানভূমী সংস্কৃতির এ দুটি কলার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা নতুন করে সূচিত করেছে। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্র কবিতা ও আধুনিক কবিতার পাশাপাশি ছিল মানভূমী কবিতা। স্থানীয় তরুণরা দারুন উৎসাহে আবৃত্তি করেছে তাদের প্রাণের ভাষায় রচিত, কবি অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সাঁঝবিহান' কাব্যের কবিতা 'রামশাল ধানের পারা কথাটির দাম'। প্রতিযোগিতার সময় স্বয়ং কবি বিচারকের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এই অঞ্চলে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হলো শিশুদের 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা।

প্রথম ও শেষ রাত্রিতে দু'টি আমন্ত্রিত দলের ছো-নাচ অনুষ্ঠিত হলো। একটি পদ্মশ্রী গম্ভীর সিংয়ের দলের, অপরটি কলেবর কুমারের দলের। ঝুমুর গানের একটি বিশেষ আসরে একগুচ্ছ টাটকা রজনীগন্ধার মতো গান উপহার দিয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পী, সুরকার

ও গীতিকার টীমা ঠাকুর (স্বয়ম্বর পাঠক)। 'বিচিত্রা' অনুষ্ঠানে নানান স্বাদের গানের ডালি সাজিয়েছেন কয়েকজন পরিণত সুকণ্ঠী শিল্পী। আকুল মাহোয়ারের বাঁশী ও ক্লারিওনেট, মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ঠুংরী ও রাগপ্রধান গান, অজন দাসের দেশাত্মবোধক গান ও আধুনিক গান এবং আনোয়ার আজাদের গজল গানে 'বিচিত্রা' দারুন উপভোগ্য হয়েছিল।

এবারও যুব উৎসব কমিটি কয়েকজন স্থানীয় বিশিষ্ট গ্রামীণ শিল্পীকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। বাগমুণ্ডির ব্লক যুব উৎসব কমিটি স্থানীয় শিল্পীদের সম্বর্ধনা জানানোকে দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিশিষ্ট ঝুমুরিয়া ঘোঙা গ্রামের টীমা ঠাকুর, চড়িদা

বাগমুণ্ডি ব্লক যুব উৎসবে পরশুরামের বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকায় একজন ছো-নৃত্যশিল্পী

গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধ মুখোস শিল্পী গৌরীনাথ সূত্রধর ও দেশ-বিদেশে খ্যাতনামা ছো-নৃত্যশিল্পী ডাভা তোড়াং-এর কলেবর কুমারকে সম্বর্ধনা জানানো হলো এবার। প্রসঙ্গতঃ গত বছর প্রখ্যাত ছো-নৃত্য শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়া ও জনপ্রিয় ঝুমুরিয়া সুচাঁদ মাহাতোকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল।

যুব উৎসবে চরিত্রে স্বতন্ত্র এবং মর্যাদায় উজ্জ্বল একটি নতুন অনুষ্ঠানের সংযোজন হয়েছে—মানভূমী সাহিত্য বাসর। খোলা আকাশের নীচে, বৃক্ষছায়ায় বসেছিল আসর। এ জাতীয় অনুষ্ঠান পুরুলিয়া জেলাতে এই প্রথম। এতে কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা শুনিয়েছেন বিশিষ্ট কবি অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তরুণতর কবি গৌরীশঙ্কর দাস, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর দরিপা। 'সুরা বাউরী' নামে একটি বলিষ্ঠ গল্প শুনিয়েছেন সত্য গুপ্ত। আরো একটি গল্প পাঠ করেছেন প্রকাশ জয়সুর্ব। মানভূমী রাত-কথার নাটক 'টিপার ডরে' উপহার দিলেন সুবোধ বসুরায়। মানভূমী সাহিত্যচর্চার উপর একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করলেন নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণ দিয়েছিলেন প্রখ্যাত সংগীত-সাহিত্যিক রাজ্যেশ্বর মিত্র। 'ছত্রাক' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সুবোধ বসুরায় সাহিত্যসভার আয়োজনে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন।

বাগমুণ্ডি যুব উৎসব প্রতিবছর এমনি করে সৃজনশীল সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে চিত্তবিনোদনের উৎসধারা খুলে দিচ্ছে স্থানীয় তরুণ-তরুণী তথা আপামর জনসাধারণের কাছে।

কোচবিহার জেলা:

মাথাভাঙ্গা-১—গত ৪ ও ৫ এপ্রিল মাথাভাঙ্গা শহরে ডি. ওয়াই. এফ-এর সম্মেলন উপলক্ষ্যে যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে একটি প্রদর্শনী মণ্ডপের আয়োজন করা হয়। মণ্ডপের উদ্বোধন করেন স্থানীয় এম. এল. এ. শ্রীদীনেশচন্দ্র ডাকুয়া। এই মণ্ডপে কোচবিহার জেলার নানা ক্লাব ও স্কুলের যুবক-যুবতীরা হস্তশিল্প ও বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শন করে। এছাড়া মণ্ডপে যুব-কল্যাণ বিভাগের অগ্রগতি ও কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ উপ-স্থাপন করা হয়। শেষ দিন অর্থাৎ ৫ই এপ্রিল পরিবহন বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিবেন চৌধুরী এবং যুবকল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস মণ্ডপটি পরিদর্শন করেন। এই প্রদর্শনী মাথাভাঙ্গা শহরের জনসাধারণকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

মুর্শিদাবাদ জেলা:

বহরমপুর ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে গত ১৪ই জুন মনোজ্ঞ আসরে 'নজরুল সন্ধ্যা' উদযাপন করা হয়। জেলা যুব আধিকারিক শ্রীঅধীররঞ্জন ঘোষের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন সাংবাদিক শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়। নজরুলের কবিতা পাঠ ও সঙ্গীত আসরের মাধ্যমে প্রায় ৫০০ দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, মীনা বড়াল, রেবা সরকার, শ্যামল গোস্বামী, অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেবাশীষ রায়, সুরজিৎ ভট্টাচার্য ও সেন্টু চট্টোপাধ্যায়।

নদীয়া জেলা:

রানাঘাট-২—গত ৩রা থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী গাংনাপুর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ব্লক যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। রানাঘাট (পশ্চিম) কেন্দ্রের বিধানসভা সদস্য শ্রীগৌরচন্দ্র কুণ্ডু যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন। নানা ধরনের কুচকাওয়াজ এবং অভি প্রদর্শনীর মাধ্যমে একটি মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলা হয়। নানা ধরনের ক্রীড়াসূচি প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং সাংস্কৃতিক প্রতি-যোগিতাও সমানতালে সন্ধ্যার সময় প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন সব পেয়েছির আসর গোষ্ঠি এবং ব্রতচারী সমিতির ভাই-বোনেরা লোকনৃত্য ও ব্রতচারী অভিপ্রদর্শনীর মাধ্যমে উৎসব প্রাঙ্গণকে মুখর করে তোলে। প্রায় ৫০০০ হাজার দর্শক প্রতিদিন উৎসব অনুষ্ঠান উপভোগ করে ভূয়সী প্রশংসা করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে এ ধরনের অনুষ্ঠান গাংনাপুর এলাকায় এই প্রথম।

৫ই ফেব্রুয়ারীর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রানাঘাট-২ নং ব্লকের পঞ্চায়েত সভাপতি শ্রীসত্যভূষণ চক্রবর্তী। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও মানপত্র প্রদান করা হয়। লোকরঞ্জন শাখার ফুলওয়ালী ও একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আসর জনমনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে।

যুবক-যুবতীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণসূচি

গত ফেব্রুয়ারী মাসে যুবকল্যাণ বিভাগের আর্থিক অনুদানে এই ব্লকে যুব-করণ পাঠরত নয় এমন যুবক-যুবতীদের নিয়ে একটি ভ্রমণসূচি তৈরী করেন। ৪০ জন এই ভ্রমণে সামিল হন। বীরভূমের নানান দর্শনীয় স্থান (বক্রেশ্বর, মলানজোড়, কেঁদুলি, শান্তিনিকেতন প্রভৃতি) ভ্রমণ করে যুবক-যুবতীরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এ ধরনের ভ্রমণসূচির প্রায়স আয়োজন বিশেষভাবে সবাই অনুভব করেন।

২৪-পরগণা জেলা:

দেগঙ্গা—গত ১৭-১৯শে মার্চ ব্লক যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন হাবড়া কেন্দ্রের বিধানসভার সদস্য শ্রীনীরদ রায়চৌধুরী। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৭০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ১৯শে মার্চের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কৃতি প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও মানপত্র দেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন যুব উৎসব কমিটির সভাপতি আবদুর রহমান ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দেবপ্রসাদ কাঞ্জিলাল।

রাজারহাট ব্লক যুব-করণ—তৃতীয় বার্ষিক রাজারহাট ব্লক যুব উৎসব সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো। এই উৎসবের ক্রীড়া পর্যায় গত ৭ই ও ৮ই মার্চ রাজারহাট হরেকৃষ্ণ স্মৃতি পল্লীকল্যাণ সংস্থার মাঠে হয়ে গেল। এই পর্যায়ের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধানসভা সদস্য শ্রীরবীন্দ্রনাথ মন্ডল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে মোট ২৬টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। ৮৩ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিতে হয়েছিল এবং রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত দলগতভাবে বিজয়ী হয়। প্রাথমিক পর্যায় থেকে হিসেব করলে প্রায় ৮০০ প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করে।

সাংস্কৃতিক পর্যায়ের অনুষ্ঠান গত ২৩শে থেকে ২৭শে এপ্রিল চারিগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শ আশ্রম বিদ্যালয় ও রঘুনাথপুর যুবসংঘের প্রাঙ্গণে আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদ্যাপিত হয়েছে।

প্রতিযোগিতার বিষয়সূচির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গণসঙ্গীত প্রতিযোগিতা। রাজারহাট এলাকায় এ ধরনের অনুষ্ঠান এই প্রথম হলো। একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় মোট নটি দল অংশগ্রহণ করে। প্রথম স্থানাধিকারী হয় জনকল্যাণ সমিতি, দেশবন্ধুনগর। সমস্ত প্রতিযোগিতাগুলির বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সমিতির মাননীয় সদস্যবৃন্দ এবং দমদম ব্রতচারী নায়ক মন্ডলীর প্রতিনিধিরা।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে গণসঙ্গীত, আবৃত্তি এবং বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। উত্তরী, রূপছত্র, শ্রীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এইসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অন্যতম অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীঅজিত পাণ্ডে কর্তৃক গণসঙ্গীত পরিবেশন এবং বিশ্বশ্রী মনোহর আইচ কর্তৃক দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শন ও মনোহরস্কোপ ছিল সর্বাপেক্ষা মনোগ্রাহী।

সমাপ্তি দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে শ্রীবরুণ সরকার, সদস্য, জেলা পরিষদ এবং মনোহর আইচ। শ্রীসরকার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার এবং শ্রীআইচ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন।

সাগর ব্লক যুব-করণ—গত ২রা এপ্রিল থেকে ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৮১ সাগর ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এবং যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় রুদ্রনগর জনকল্যাণ সংঘ বিদ্যানিকেতন ময়দানে তিনদিনব্যাপী ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধানসভার সদস্য শ্রীপ্রভঞ্জন মন্ডল। এই উৎসবে রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগ, ভূমি ও রাজস্ব বিভাগ এবং সাগর বিজ্ঞান ক্লাব ও বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প প্রদর্শনীর স্টল দেন। সাংস্কৃতিক বিভাগে ছিল শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, হিতোপদেশ থেকে গল্প বলা এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি। সর্বসাধারণের প্রতিযোগিতায় ছিল সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং একাঙ্ক নাটক। খেলাধুলার মধ্যে ছিল শিশুদের তিনটি প্রতিযোগিতা, বালিকাদের দুটি প্রতিযোগিতা, কিশোর বিভাগের তিনটি প্রতিযোগিতা, পুরুষদের তিনটি প্রতিযোগিতা, মহিলাদের তিনটি প্রতিযোগিতা এবং সর্বসাধারণের ক্রশ কান্ট্রি রেস।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ। কাকদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের সদস্য শ্রীহৃষিকেশ মাইতি এদিন সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থানাধিকারীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার এবং প্রশংসালিপি প্রদান করেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়।

যুব উৎসবের দিনগুলিতে ২২টি যুব সংগঠন এবং ১১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ছয়শত প্রতিযোগী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিদিন প্রায় তিন হাজার দর্শক উৎসব প্রাঙ্গণে সমবেত হতেন।

এই ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে একটি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৩৭টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় জীবনতলা কিশলয় সংঘ মনসাদ্বীপ খাসমহল উদয়ন ক্লাবকে পরাজিত করে সাগর এলাকায় শ্রেষ্ঠ দলের স্বীকৃতি লাভ করে। মোট ২৪ জন খেলোয়াড়কে জার্সি প্রদান করা হয়।

জয়নগর ২নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে নিমপীঠে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ থেকে ১লা মার্চ ১৯৮১ ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। ক্রীড়া, সংগীত, আবৃত্তি, একাঙ্ক নাটক, যোগব্যায়াম প্রদর্শনী ইত্যাদি প্রতিযোগিতা যুব উৎসবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিমপীঠ রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শঙ্করানন্দমহারাজ যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন। সমস্ত প্রতিযোগিতায় পাঁচশ'র বেশী প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিদিন প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। ১লা মার্চ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যুব উৎসব শেষ হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন বিধানসভা সদস্য শ্রীপ্রবোধকুমার পুরকাইত। অনুষ্ঠানের শেষে ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীমতী আরতি চক্রবর্তী সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই যুব উৎসব স্থানীয় জনমানসে খুশীর জোয়ার এনে দেয়।

মেদিনীপুর জেলা:

পাঁশকুড়া-২ ব্লক যুব-করণের পরিচালনায় দেউলিয়া হীরারাম হাই স্কুল প্রাঙ্গণে গত ৪ঠা এপ্রিল থেকে ৬ই এপ্রিল ব্লক যুব উৎসব-'৮১ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সকাল ৭টায় স্থানীয় বিধানসভার সদস্য অধ্যাপক শ্রীস্বদেশ

রঞ্জন মাঝি যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্লক যুব উৎসব কমিটির সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীবীরভদ্র গোড়ী মহাশয়। স্বাগত ভাষণ দেন ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান। ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন যথাক্রমে স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেউলিয়া হীরারাম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীগৌরহরি জানা। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিভাগে পুরুষ ও মহিলা মিলে মোট ৪২০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে এবং মোট ৮১ জনকে পুরস্কার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মানপত্র দেওয়া হয়। ক্রীড়া বিভাগে একশ', দু'শ এবং তিনশ' মিটার দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প; লৌহবল, বর্শা ও ডিসকাস নিক্ষেপ; কবাডি, ভলিবল, মন্থর গতিতে সাইকেল রেস, যোগাসন, মহিলাদের লোকনৃত্য ও যেমন খুশী সাজো দর্শকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। সাংস্কৃতিক বিভাগে ছিল আবৃত্তি, সংগীত, প্রবন্ধ, বিতর্ক ও সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা এবং আলোচনা চক্র। এ ছাড়া বিভিন্ন দিনে সন্ধ্যায় রক্তিম গোষ্ঠীর গণসংগীত, শিশুনাট্য সংস্থার সাজানো বাগান, রঙ্গশ্রী থিয়েটার ইউনিটের ও পুলশিটা নবারুণ স্পোর্টিং ক্লাবের নাট্যানুষ্ঠান জনসাধারণের মধ্যে সাড়া জাগায়। এই উৎসব এতদাঞ্চলে যুবকদের নতুন করে উৎসাহিত করে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের আর্থিক সহায়তায় পাঁশকুড়া-২ ব্লক যুব-করণের পরিচালনায় গত ৭ই জুন রবিবার আশুরালি নবারুণ সংঘের মাঠে গত ১৯৮০ সালের চূড়ান্ত পর্যায়ের ফুটবল খেলা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় কোলাঘাটের চৌরঙ্গী ক্লাব ৪-১ গোলে কাউরচণ্ডী মিলন মন্দিরকে পরাজিত করে বিজয়ী ট্রফি জয়লাভ করে।

চন্দ্রকোনা ১নং ব্লক যুবকরণ আয়োজিত সীবন প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণকারী মহিলাগণ

পুরস্কার বিতরণ করেন মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অধিনায়ক ও ভারতের প্রখ্যাত ফুটবল তারকা মইদুল ইসলাম। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বি-ডি-ও শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঠে তিল ধারণের স্থান ছিল না।

মইদুল ইসলামের প্রধান অতিথির ভাষণে স্থানীয় ফুটবল প্রেমিকরা উৎসাহিত হন ও অনুপ্রাণিত হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্থানীয় ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান।

মালদা জেলাঃ

চাঁচল-২—এই যুব-করণের উদ্যোগে মালতীপুর ক্লাব, মালতীপুর লাইব্রেরী ও চাঁচল-২ সমষ্টি ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় গত ৯ই, ১০ই, ১৩ই ও ১৪ই মার্চ '৮১ মালতীপুরে ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন চাঁচল-২ ব্লকের পঞ্চায়েত সভাপতি গোলাম সুবেদ আলি। বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি সন্ধ্যায় একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিভাগে যথাক্রমে ২৬৫ জন ও ১২৫ জন অংশগ্রহণ

চাঁচল ১নং ব্লক যুব উৎসবে মহিলাদের কবাডি প্রতিযোগিতা।

করে। ক্রীড়া বিভাগে সর্বমোট ৪৯ পয়েন্ট পেয়ে মালতীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত চ্যাম্পিয়নের আখ্যা লাভ করে। একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে মালতীপুর লাইব্রেরী। ১৪ই মার্চ পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথির পদ গ্রহণ করেন শ্রীসুকুমার সান্যাল, চাঁচল-২ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। বিশেষ

চাঁচল ২নং ব্লক যুব উৎসবে মালতীপুর সংস্কৃতি সংসদ পরিচালিত 'নবজন্ম' নাটকের একটি বিশেষ মুহূর্ত।

অতিথির আসন গ্রহণ করে সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমানিক ঝা, সভাধিপতি, মালদহ জেলা পরিষদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এই ব্লকের ভারপ্রাপ্ত ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীআশিস ঘোষ।

কালিয়াচক-১—খেলাধুলার উন্নতিকল্পে সম্প্রতি এই যুব-করণের উদ্যোগে ৩০ দিন ব্যাপী ২টি ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩০টি ক্লাবের ৩০ জনকে নিয়ে প্রথম প্রশিক্ষণ শিবিরের আওতায় আনা হয়। এবং অপর ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৫টি ক্লাবের ৩৫ জনকে নিয়ে দ্বিতীয় শিবিরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হওয়ার পথে।

এছাড়া এই মাসে ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬ জনকে নিয়ে ন' মাস ব্যাপী একটি ইলেকট্রিক ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। শিবির উদ্বোধন কালে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

রতুয়া-২—পুখুরিয়া ও নশীপুরের যৌথ যুব উদ্যোগে রাম-প্রসাদ ক্লাব প্রাঙ্গণে গত ২৪শে মে, ১৯৮১, রবীন্দ্র স্মরণে রবীন্দ্র আলোচনা, গান, আবৃত্তি ও "বৈকুণ্ঠের খাতা" নাট্যাভিনয় স্থানীয় যুবকদের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ২৫শে মে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে অভিনীত হয় শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত "কাঞ্চনরঙ্গ" নাটকটি। বিশেষ উল্লেখ্য মনোজ দাসের উভয় নাটকের নির্দেশনা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রায় দেড় হাজার দর্শককে আনন্দ দান করে।

গ্রামীণ খেলোয়াড়দের উন্নতিকল্পে গত মে মাসে ১৪ থেকে ১৬ বৎসর বয়স্ক ৪০ জন কিশোরকে নিয়ে একটি ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শ্রীপুষ্পেন চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে এই ৪০ জন এক মাস ব্যাপী ফুটবলের আধুনিক নিয়মকানুন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করে।

বামোনগোলা ব্লকের যুব উৎসব হয়ে গেলো ১৯৮১র ফেব্রুয়ারীর ২০, ২১, ২৭, ২৮ তারিখে। ২০, ২১ তারিখে নির্ধারিত ছিলো ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আর ২৭ ও ২৮ তারিখ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য। উৎসব চলে আনন্দ নিকেতন মহবীর উচ্চতর বিদ্যালয়ের (পাকুয়াহাট) মাঠে। উৎসব পরিচালকমণ্ডলীর পরিকল্পনা আর পরিচালকমণ্ডলী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অনলস পরিশ্রমে সুষ্ঠুভাবে উৎসব শেষ হয়। উৎসবে অংশগ্রহণ-কারী মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিলো ৫৪০ জন। তার মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ৯০ জন আর ক্রীড়ানুষ্ঠানে ৪৫০ জন। প্রতিযোগীর মধ্যে মহিলারা ছিলেন এক-তৃতীয়াংশ। দর্শক সংখ্যা প্রতিদিনই গড়পড়তা তিনশ'। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ জন। নিরাপত্তা, প্রাথমিক চিকিৎসার মতো কিছু কিছু ব্যবস্থা ছিলো। উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে বামনগোলা-হবিবপুর ব্লকের বামফ্রন্ট কমিটির আসনাধিকারী শ্রীঅমিয় রায় উৎসবের সূচনা করেন।

অনেক বয়স্ক-বয়স্কারাও এই উৎসবে প্রতিযোগীর ভূমিকা নেন। ভূমিকা নেন অনেক সরকারী কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকেরা। উৎসবের বিজয়ী প্রতিযোগীদের দেয়া হয় একটি করে পুরস্কার আর মানপত্র। পুরস্কার আর মানপত্র বিজয়ী-বিজয়িনীদের হাতে তুলে দেন জেলা পরিষদের সভাপতি শ্রীমানিক ঝা। তাঁর সমাপ্তি ভাষণে তিনি সুন্দরভাবে যুবসমাজের সুবিধা-অসুবিধা আর দায়িত্বগুলো তুলে ধরেন। যুবসমাজ সংগঠনের জন্য আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন।

বামনগোলা ব্লক যুব উৎসবে ভারসাম্য দৌড় প্রতিযোগিতার একটি মুহূর্ত।

পাঠকের ভাবনা

যুবমানসের মান ও প্রচার

পশ্চিমী দুনিয়ার ডলার সাম্রাজ্যবাদী নয়া উপনিবেশবাদীদের আগ্রাসী নীতি বিশ্বকে অর্থনৈতিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের মুখে সমাসন্ন করছে। অপর দিকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সার্বিক প্রগতি ধনতান্ত্রিক জগতের ভিত্তি দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে দিচ্ছে। উত্তর আয়ারল্যান্ডের উত্তাল সংগ্রাম, পৃথিবীতে আলোড়ন তুলছে।

এদিকে ভারতবর্ষের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রায় গোটা ভারত জুড়েই শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা হতে চলেছে। মহড়া চলছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থ-নৈতিক সংকটের বোঝা শাসকশ্রেণী চাপাতে চাইছে সাধারণ মানুষের উপর। কাজেই ফলশ্রুতি ঃ ধর্মঘট, নির্বিচারে গুলি, দাঙ্গা, রাষ্ট্রপতিপ্রধান ব্যবস্থা প্রচলনের প্রয়াস।

অপর দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে স্বৈরশক্তি, কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়া শক্তির স্থান নেই সে কথা পুনর্বার প্রমাণিত হল পৌর নির্বাচন, উপ-নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফলের মাধ্যমে।

যে কথা বলতে চাই এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'যুবমানসের' লেখায়—সময়োচিত চিত্রের মুদ্রণের প্রতি এবং 'যুবমানস' পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে এবং সময়মত যুবকল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে পাঠকবর্গের হাতে 'যুবমানস' পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা সমীচীন নয় কি?

সলিল আচার্য
'বন্ধু-কুটীর' রায়কত পাড়া, জলপাইগুড়ি

মফঃস্বলবাসী তরুণ লেখকের আশা

যুবমানস এপ্রিল '৮১ সংখ্যায় ডঃ সুকুমার মাইতি "মফঃস্বল-বাসী তরুণদের লেখক হওয়া শক্ত" নামক প্রতিবেদনে আমার মত হাজার হাজার তরুণের লেখক জীবনের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার জন্য আমার মত হাজার হাজার তরুণ খুঁজে পেয়েছে এমনই এক একজন মানুষ এবং এমনই একটা পত্রিকা যাতে তাদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরা হয়।

গৌরাঙ্গ দাশ
কুমড়া কাশীপুর
মহিষা
২৪-পরগণা

বিজ্ঞানবিষয়ক লেখা প্রসঙ্গে

আমি মাদারীহাট ব্লকের অন্তর্গত সবুজ সংঘ—অনুসন্ধানী (বিজ্ঞানচক্র)-এর পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই আন্তরিক অভি-নন্দন। কারণ আমরা থাকি বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু জানবার আশায়। জানুয়ারী '৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ পড়ে আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি।

এই ধরনের লেখা যুবমানসের পাতায় প্রায়ই পড়তে পেলে আমরা অবশ্যই অভিভূত হব। এতে যদি পঃ বঙ্গের বিভিন্ন ব্লকের বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু সংবাদ, কিছু সংক্ষিপ্ত বাস্তব প্রবন্ধ ইত্যাদি পরি-বেশন করা হয় তাহলে আমাদের খুবই ভাল লাগবে। আমরা এই ধরনের আবিষ্কার-কাহিনী পাঠের প্রত্যাশা নিয়ে থাকছি। আশা করি, আমাদের নিরাশ করবেন না।

আমরা সকলেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র।

বাবুল মিত্র
সম্পাদক
মাদারীহাট সবুজ সংঘ অনুসন্ধানী
(বিজ্ঞানচক্র)
পোঃ—মাদারীহাট
জেলা—জলপাইগুড়ি

প্রচ্ছদশিল্পীকে অভিনন্দন

যুবমানসের মে, ১৯৮১ সংখ্যার প্রচ্ছদশিল্পী শংকর সরকার নিপুণ হাতের তুলিতে গত ৩ এপ্রিলের বাংলা বনধ্‌কে মনে রেখে ধ্বংসলীলা ও মৃত্যুর মিছিলের পাশাপাশি কান্না ও শোকের যে গভীর বেদনাময় অনুভূতির সঙ্গে আমাদের মিশিয়ে ফেলেছেন, সেজন্যে শিল্পীকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না।

এক শ্রেণীর গুণ্ডাবাহিনীর নগ্ন আক্রমণে সেদিন অনেকগুলি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন, অনেকেই সারা জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে গেছেন, বোমার আঘাতে অসংখ্য বাস-ট্রাম ধ্বংস হয়েছিল, জন-জীবনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যে, জনগণবিচ্ছিন্ন একটি কায়েমী স্বার্থের দল ফ্যাসিস্ট কায়দায় যে রোমহর্ষক বিভীষিকা পশ্চিম-বঙ্গের বুকে আমদানি করেছিল, তা যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে শংকর সরকারের আঁকা ছবিতে। আমার বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ সমস্ত সাধারণ মানুষ এই ছবি দেখে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিতে পারবেন, সংগ্রামী চেতনায় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারবেন—যাতে কোন বিভেদকামী শক্তি অথবা গুণ্ডাবাহিনীর হাতে ভবিষ্যতে আর এক ফোঁটা রক্ত অথবা একটি জীবনেরও কোন রকম ক্ষতি না হয়।

কাজী মুরশিদুল আরেফিন
পোঃ—খোলাপোতা, ২৪ পরগণা
পিনঃ ৭৪৩৪২৮

গত ৭ই জুলাই রাজভবনে এক অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের নতুন মন্ত্রী তামাং দাওয়া লামাকে শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিং। শ্রীতামাং পার্বত্য উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন।

Reg. No. 32875/78

Postal Reg. No. WB/CC-15

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে মহাজাতি সদনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু

আগস্ট, ১১
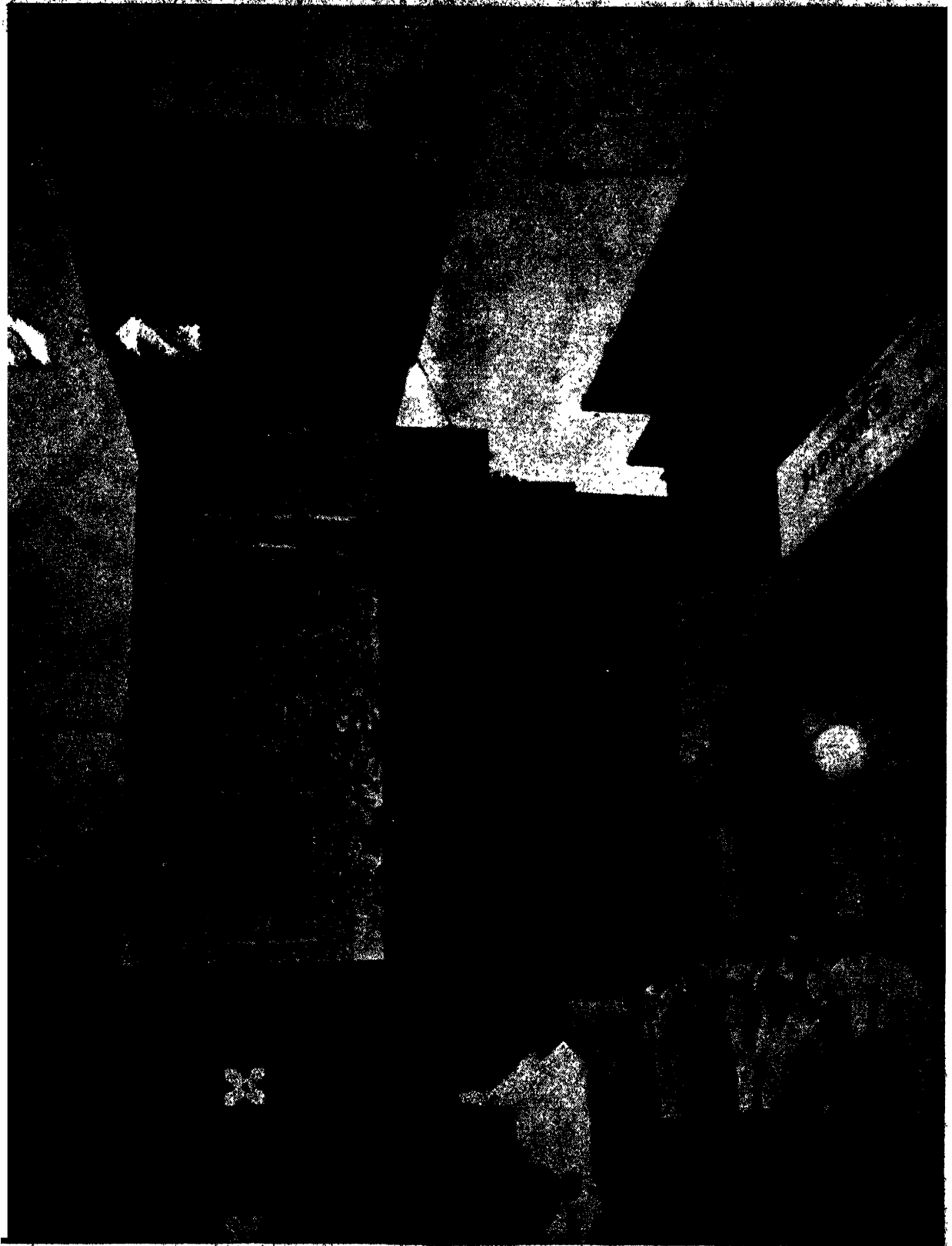
প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র 'যুবমানস'-এর উদ্যোগে 'শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের ভাষানীতি' প্রসঙ্গে দু'টি বিভাগে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। অসংখ্য প্রবন্ধ যুবকল্যাণ দপ্তরে জমা পড়ে। যে-সমস্ত প্রবন্ধ বিজ্ঞাপনের নিয়ম অনুসারে জমা পড়ে, তা বিচারকমণ্ডলীর কাছে বিচারের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বিচারকমণ্ডলী ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবন্ধগুলি বিচার করেন। প্রতিযোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হওয়ায় প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশে কিছু দেরী হয়ে গেল। যুবকল্যাণ দপ্তরে চিঠি দিয়ে, টেলিফোনে অথবা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে অনেক প্রতিযোগী যোগাযোগ করেন, ফলাফল জানতে চান। কিন্তু আমরা তাঁদের যথাসময়ে ফলাফল জানাতে পারি নি। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

চূড়ান্ত ফলাফল নিচে দেওয়া হলঃ

ক—বিভাগ

প্রথম : শ্রাবণী বসু (বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর)
দ্বিতীয়: গৌতমকুমার দাস (বি, টি, রোড গভঃ স্পন্সর্ড স্কুল)
তৃতীয় : অনুব্রত সেনগুপ্ত (হিন্দু স্কুল, কলকাতা)

খ—বিভাগ

প্রথম : সুস্মিতা বসু (ইংরেজি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
দ্বিতীয়: সুভাষচন্দ্র দাস (টাকি গভঃ কলেজ)
তৃতীয় : স্বপনকুমার পোদ্দার (গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ)

যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করার কথা আগেই ঘোষিত হয়েছিল। বর্তমানে স্থির হয়েছে যে, একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হবে। অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট কর্মসূচী চূড়ান্তভাবে স্থির হলে সফল প্রতিযোগীদের তা জানিয়ে দেওয়া হবে।

জনসংযোগ আধিকারিক
যুবকল্যাণ অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যার 'বইপত্র' বিভাগে বামফ্রন্টের শিক্ষানীতি বইটির সমালোচনা করেছেন সরল বিশ্বাস। ভুলবশতঃ নামটি ছাপা হয়নি বলে আমরা দুঃখিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
আগস্ট, '৮১

উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি এবং পত্রিকা সম্পাদক :
কান্তি বিশ্বাস

প্রচ্ছদ : দিলীপ ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা-৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—চল্লিশ পয়সা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

দেশ স্বাধীন হবার চৌত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। স্বাধীনতা দিবসে আমরা স্মরণ করছি সেই সমস্ত অমর শহীদদের যাঁরা তাঁদের উদ্ধত যৌবন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করতে অকাতরে বিসর্জন দিয়েছিল। তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল আত্মত্যাগ ভারতবর্ষের দেশপ্রেমিক জনগণ প্রতি মুহূর্তে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করবে।

সেই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমরা যদি গত চৌত্রিশ বছরের ভারতবর্ষের দিকে ফিরে তাকাই তবে দেখতে পাব স্বাধীনতার রক্তিম আকাশে নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার খুলে যায় নি। বরং শোষণ আর অত্যাচারের কালো মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে স্বাধীনতার ফুটন্ত সকাল।

এই সময়ে একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং বৃহৎ ভূস্বামীদের শোষণ ও অত্যাচার দিনকে দিন বেড়েছে। বেড়ে চলেছে অর্থনৈতিক সংকট। এই সংকট গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হবার পর এমন একটি বছর যায় নি যখন ঘাটতি বাজেটের বোঝা জনসাধারণের কাঁধে চাপে নি। ফলস্বরূপ ঘটেছে মুদ্রাস্ফীতি। টাকার মূল্য কমতে কমতে ২২ পয়সায় এসে দাঁড়িয়েছে, যা এত অল্প সময়ে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সম্ভবতঃ ঘটে নি। ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দেড় কোটি ছাড়িয়ে গেছে। গোটা পৃথিবীর তিন ভাগের দু' ভাগ শিশু-শ্রমিকের বাস ভারতবর্ষে। আর বিদেশী ঋণের দায়ে ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান বেহাল অবস্থা। সব মিলিয়ে যে সংকট তার হাত থেকে রেহাই পাবার ক্ষমতা বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর নেই।

আর তাই এই শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের জনগণের বিরাট বিরাট গণসংগ্রামকে রুদ্ধ করতে একের পর এক স্বৈরতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়ে যাচ্ছে বর্তমান শাসকগোষ্ঠী। নতুন কালা কানুন 'এসমো' প্রয়োগ করে মানুষকে ওরা বোঝাতে চাইছে সমস্ত সংকটের দায় জনগণের।

কিন্তু এভাবে ভারতবর্ষের সংগ্রামী মানুষদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, যায় না, এ-কথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদদের অমর স্মৃতিকে বুকে ধরে ভারতবর্ষের মেহনতী মানুষ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে মৌলিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কায়েম করার শপথে অবিচল থাকবে। স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্যকে উপলব্ধি করার চেতনায় নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। পঁয়ত্রিশতম স্বাধীনতা দিবসে এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

ভূমি-সংস্কার ও শ্রমিকশ্রেণী

বিনয় চৌধুরী

ভারতবর্ষে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক মন্দা সমগ্র অর্থনীতিকে বিপর্যয়ের মুখে নিয়ে এসেছে। ১৪ই এপ্রিল তারিখের "ইকনমিক টাইমস্"-এ আমাদের দেশের শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক ও গভীর মন্দার মর্মন্তুদ ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৮০ সালের ক্যালেন্ডার বৎসরে, সামগ্রিকভাবে শিল্প-উৎপাদন ১৯৭৯ সালের তুলনায় ০.৬ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৯ সাল হ'তে শিল্প-উৎপাদনের হার ক্রমশঃ কমে আসছে। কয়েকটি মূল শিল্পে এই উৎপাদন হ্রাস ভয়াবহ। কয়লা শিল্পে হ্রাসের হার ১০.৪; ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে হ্রাসের হার ৮.৮; পাদুকাশিল্পে উৎপাদনের হ্রাসের হার ৭.৪; ধাতুশিল্প ও পরিবহণ শিল্পে হ্রাসের হার ৭.১; কাষ্ঠ শিল্পে হ্রাসের হার ৫.৯।

শুধু উৎপাদন হ্রাস নয়, মূল্যবৃদ্ধির হারও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। ফলে অবস্থা জটিলতর হয়ে উঠছে। ১৯৭৯-৮০ সালে ঘাটতি বাজেটের দরুন অতিরিক্ত নোট ছাপতে হয়েছে—২৭৫০ কোটি টাকা। ১৯৮০-৮১ সালে ঘাটতি বাজেটের পরিমাণ ১৯৭৫ কোটি টাকা। ১৯৮১-৮২ সালে যে বাজেট গৃহীত হয়েছে তাতে এখন দেখান হয়েছে ১৫৩৮ কোটি টাকা ঘাটতি। কিন্তু গত ২ বছরের অভিজ্ঞতায় এটা নিঃসন্দেহভাবে বলা যায়, এটা অনেক বাড়বে। এই বিপুল ঘাটতি বাজেট এবং বিভিন্ন নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর বেশী বেশী করে শুল্ক চাপানর ফলশ্রুতি অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত—যাদের আয় মোটামুটি বাঁধা—তারা চরম দুর্গতির মুখে দাঁড়িয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের সংকটের বোঝা, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির উপর অসম বাণিজ্যের মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়ার যে ব্যবস্থা নিয়েছে, তাতে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির বাণিজ্যিক ঘাটতি বেড়ে যাচ্ছে। কিছু দিন আগে দিল্লীতে, জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির যে মিটিং হ'লো তাতে আঙকটাডের সেক্রেটারী জেনারেল জানান, মাত্র এক বছরে এই সব দেশের বাণিজ্যিক ঘাটতি ৭০ বিলিয়ন ডলার হ'তে বেড়ে ৯০ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ঘাটতি ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৯-৮০ সালে বাণিজ্যিক ঘাটতি হয়েছিল ২৫০০ কোটি টাকা। ১৯৮০-৮১ সালে এই ঘাটতি বেড়ে ৪৫০০ কোটি টাকা হয়েছে।

শিল্প, ব্যবসায়-এর ব্যাপক ও গভীর মন্দার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের এর কারণ খুঁজে বার করতে হবে এবং কোন্ পথে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব তা ঠিক করতে হবে। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির এই ব্যাপক ও গভীর সঙ্কটের মূল কারণঃ প্রথমতঃ, স্বাধীনতা লাভের পর ঔপনিবেশিক অতীতের কুৎসিত অবশেষগুলিকে নিশ্চেষ্ট করে দেওয়ার দিকে পদক্ষেপ না করে, উত্তরোত্তর বিদেশী পুঁজিকে আরো বেশী করে জাঁকিয়ে বসার ও আমাদের জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে যেখানে আমাদের দেশে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ ছিল ২৫৬ কোটি টাকা—এখন তা বেড়ে ২০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে—পরিকল্পনাগুলির বাবদ বৈদেশিক ঋণ ১৪০০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

দ্বিতীয়তঃ সামন্ততান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক জমিদারীর নিঃশেষে বিলোপসাধন ক'রে কৃষি অর্থনীতির অগ্রগতির পথের সর্ববৃহৎ বাধা অপসারণ না ক'রে, নানা ভাবে তাকে জিইয়ে রেখে কৃষি উৎপাদনকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। যদি প্রকৃতি ভূমি-সংস্কারের মাধ্যমে, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির পথ প্রশস্ত করা হতো তাহলে (১) আমাদের আভ্যন্তরীণ বাজারের বিকাশ হতো, (২) শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় নানা কাঁচামাল আরো বেশী বেশী উৎপাদন করা সম্ভব হতো, (৩) শিল্পে নিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় বাড়তি মূলধন কৃষিক্ষেত্রে সৃষ্টি হতো—বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিকট এই ভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে গোটা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হতো না, (৪) আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য আরো বৃদ্ধি পেতো এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, শিল্প গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমরা কিনতে পারতাম—বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছে ঋণের জন্য দ্বারস্থ হতে হতো না।

এই অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে, জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতির জন্য ভূমিসংস্কারের গুরুত্ব কতখানি তা বুঝতে বিন্দু-মাত্র অসুবিধা হয় না। ভূমিসংস্কার শুধুমাত্র কৃষকদের স্বার্থেই নয়—সমগ্র দেশের স্বার্থে। তাই ভূমিসমস্যা আজ জাতীয় সমস্যা। শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, মধ্যবিত্ত সকলেরই জীবন ও জীবিকার প্রশ্ন ভূমিসংস্কারের সাথে যুক্ত। তাই ভূমিসংস্কারের সমস্যা সম্বন্ধে সকলের অবহিত হওয়া দরকার এবং এই ব্যাপারে প্রত্যেককে তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করার জন্য এগিয়ে আসা দরকার।

বামফ্রন্ট সরকার, সীমিত ক্ষমতা নিয়ে, ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। সেগুলি নিয়ে আলোচনা করার আগে, একটা বিষয় পরিষ্কার করা দরকার বলে মনে করি। ভূমি-ব্যবস্থায় যে মৌল পরিবর্তন সাধন করা আমাদের লক্ষ্য, তা একমাত্র জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব—যার অক্ষ-শক্তি কৃষি বিপ্লব—তাছাড়া সম্ভব নয়। বর্তমান সংবিধানের চৌহদ্দীর মধ্যে থেকে, রাজ্যসরকার যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে কাজ করে, তাতে ওই ধরনের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়। এই বিষয়ে কোনরূপ ভুল ধারণা পোষণ করা, বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলার পক্ষে পরিপন্থী। বামফ্রন্ট সরকার যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে, তার আশু লক্ষ্য কৃষক সমাজের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন আশু ও আংশিক দাবীর সংগ্রামে উৎসাহিত করে, মৌল পরিবর্তনের সংগ্রামের দিকে এগিয়ে আনা।

আমাদের দেশে কৃষকসমাজ সমস্বার্থবিশিষ্ট একটি জনসমষ্টি

নয়। ধনতান্ত্রিক বিকাশ ও বাজারের প্রভাবে কৃষকসমাজের মধ্যে নির্দিষ্ট স্তরভেদ নিয়ে এসেছে। এদের বিভিন্ন অংশ বিপ্লবে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কৃষি-মজুর ও গরীব কৃষক-হচ্ছে কৃষক সমাজের শতকরা ৭০ ভাগ। তারা হবে শ্রমিক শ্রেণীর মূল মিত্র। মাঝারি কৃষক জনগণতান্ত্রিক মোর্চার আস্থাভাজন মিত্র। ধনী কৃষকের কোন কোন অংশ কংগ্রেসী কৃষিসংস্কারের দ্বারা কিছুটা উপকৃত হয়েছে এবং তাদের অনেকে ধনতান্ত্রিক জমিদারে উন্নীত হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, কৃষি-মজুর নিয়োগ করে বলে কৃষি-মজুরদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও গুরুভার করের বোঝা, শিল্পজাত পণ্যের চড়া দাম, কৃষিজাত পণ্যের লাভজনক দর না পাওয়া প্রভৃতি কারণে মোটামুটিভাবে তাদেরও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে মিত্র হিসাবে পাওয়া যেতে পারে। তাই বর্তমান স্তরে সমগ্র কৃষকসমাজকেই আমাদের সপক্ষে আনার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখে, বামফ্রন্ট সরকার কৃষকসমাজের বিভিন্ন অংশের কতকগুলি আশুজরুরী সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

প্রথমতঃ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর: এই অংশ সবচাইতে জঙ্গী। এদের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়ছে। ১৯৬১ সালে কৃষকসমাজের এরা ছিল শতকরা ১৬ ভাগ; ১৯৭১ সালে বেড়ে হয় শতকরা ২৬ ভাগ। এখনও জানা যায় নি তবে অনুমান হয় ১৯৮১ সালে শতকরা ৪০ ভাগ ছাড়িয়ে যাবে।

এদের তিনটি জরুরী আশু দাবীর উপর বামফ্রন্ট সরকার জোর দিয়েছেঃ

(১) ন্যূনতম মজুরী ৮ টাকা ১০ পয়সা বেঁধে দিয়েছে; তা যাতে এরা পায় তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার সাথে সাথে ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করে সংগ্রামও চালান হয়েছে, ফলে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকায় ৮·১০ টাকা আদায় হয়েছে এবং বাকী সর্বত্র কমপক্ষে ২·০০ টাকা হতে ৩·০০ টাকা মজুরী বৃদ্ধি হয়েছে। ৪০ লক্ষ ক্ষেতমজুর বছরে যদি ১০০ দিনও ২·০০ টাকা করে বেশী অর্জন করে, তাহলে এদের ক্রয়-ক্ষমতা ৮০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। এ দ্বারা আভ্যন্তরীণ বাজার কিছু পরিমাণে চাঙ্গা হয়।

(২) আমাদের পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ২৭ ভাগ জমিতে সেচ পায়। সেচহীন এলাকায় বছরে ৩।৪ মাসের বেশী ক্ষেতে কাজ থাকে না। তাই যখন ক্ষেতে কাজ থাকে না তখন বহু লোককে অনাহারে-অর্ধাহারে কাটাতে হয়। তাই বামফ্রন্ট সরকার এই দুঃসময়ে 'কাজের বদলে খাদ্য' পরিকল্পনা চালু করে একদিকে কয়েক লক্ষ ক্ষেতমজুরকে অনাহার-অর্ধাহারের হাত থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করেছে। তেমনি আবার এইসব কাজের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থ-নীতির অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করেছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 'কাজের বদলে খাদ্যের' পরিকল্পনায়, ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা, জলনিকাশী ব্যবস্থা, পুষ্করিণী সংস্কার, গ্রাম্য রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি নানা ধরনের স্থায়ী উন্নয়নমূলক কাজের দ্বারা স্থানীয় অর্থনীতির প্রভূত উপকার সাধন করা হয়েছে। গত ৩ বছরে 'কাজের বদলে খাদ্য' পরিকল্পনার মাধ্যমে ১৫ কোটির মত শ্রমদিবস সৃষ্টি করা গেছে। এটা কম কথা নয়।

(৩) ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, কারিগর, মৎস্যজীবীদের বসৎ-বাড়ীর জন্য ৮ ডেসিমেল করে জমি যে যেখানে বাস করছে সেখানে পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৬৪,০০০ জনকে বসৎবাড়ীর জন্য পাট্টা দেওয়া হয়েছে। গৃহনির্মাণের জন্য পাহাড়ী এলাকায় ১,৫০০ টাকা এবং সমতল এলাকায় ১০০০ টাকা অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এর দ্বারা বহু ক্ষেতমজুর বাসভূমির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

দ্বিতীয়তঃ বর্গাদারঃ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে বর্গা-দার বা শোষিতদের একটা বড় অংশ। অতীতে বর্গাদারদের সমস্যাকে শোষিতদের একটা বড় অংশ। অতীতে বর্গাদারদের সমস্যাকে ভিত্তি করে ১৯৪৬ সালের বিখ্যাত তে-ভাগা আন্দোলন হয়েছিল। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে পরবর্তীকালে বর্গাদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্গাদারদের ব্যাপকহারে উচ্ছেদ চলতে থাকে, আইনসম্মত ভাগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা পেত না এবং বর্গাদাররা খোরাকী ও চাষের খরচের জন্য অত্যন্ত চড়া সুদে জমির মালিকদের কাছ হতে ঋণ নিতে বাধ্য হতো এবং ঐ ঋণে আবদ্ধ হয়ে বাঁধা গোলামে পরিণত হতো।

বামফ্রন্ট সরকার তাই (১) বর্গাদারদের অন্যায় উচ্ছেদের হাত থেকে বাঁচান, (২) আইনসম্মত ভাগ ও অন্যান্য অধিকার যাতে তারা ভোগ করতে পারে এবং (৩) যাতে নামমাত্র সুদে ব্যাঙ্ক হতে ঋণ পায় এবং ঋণের দাসত্ব থেকে বর্গাদাররা মুক্তি পায়—এই তিনটি কর্মসূচী অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বরে ভূমিসংস্কার আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে বর্গাদারদের অন্যায় উচ্ছেদ থেকে বাঁচানর ব্যবস্থা করা হয়। উচ্ছেদ প্রধানত করা হতো নিজ চাষে নেওয়ার নামে। তাই "নিজ চাষের" সংজ্ঞায় তিনটি সর্ত আরোপ করা হয়।

(১) নূতন করে বর্গাদারদের উচ্ছেদ করে জমি নিজ চাষে নিতে হলে প্রমাণ করতে হবে যে ঐ জমিই তার আয়ের প্রধান উৎস। অন্য কোন বিকল্প আয় তেমন নেই।

(২) যিনি নিজ চাষে জমি নেবেন তাঁকে জমি যেখানে রয়েছে তার ৮ কিলোমিটারের মধ্যে বছরের মধ্যে অন্ততঃ ৬ মাস থাকতে হবে।

(৩) নিজ চাষে নিয়ে সেই জমি নিজে অথবা পরিবারের লোক-জন দিয়ে চাষ করতে হবে। বর্গাদারকে ছাড়িয়ে মজুর দিয়ে চাষ করান চলবে না। অন্যায় উচ্ছেদ বন্ধ করার পক্ষে এই সংশোধন অনেকখানি কার্যকর হয়েছে।

প্রকৃত বর্গাদারদের নাম অতীতে আইনতঃ রেকর্ড করা হতো না। তাই তারা আইনের চোখে বর্গাদার বলে সাব্যস্ত হতো না এবং আইনসম্মত অধিকার ভোগ করতে পেত না। বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত প্রকৃত বর্গাদারদের একটা সময় সীমার মধ্যে আইনতঃ রেকর্ড করার কার্যক্রম নেয়। এই কার্যক্রমই "অপারেশন বর্গা" নামে পরিচিত। যেখানে ১৯৭৭ সালের আগে মাত্র ২ লক্ষের মত বর্গা-দারের নাম রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত ছিল সেখানে ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০ লক্ষ বর্গাদারের নাম রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। স্মরণ রাখতে হবে পঞ্চায়েত নির্বাচন, ১৯৭৮ সালের বন্যা এবং ১৯৮০ সালে লোকসভার নির্বাচন প্রভৃতি কারণে একটানা বর্গা রেকর্ডের কাজ চালান সম্ভব হয় নি।

বর্গাদারদের ঋণের বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক হতে শতকরা ৪ টাকা সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং যদি আষাঢ়-শ্রাবণে ঋণ নিয়ে চৈত্রের মধ্যে শোধ করে দেয় তাহলে বামফ্রন্ট সুদের টাকা নিজ তহবিল হতে দেবে এবং সে ক্ষেত্রে বর্গা-দার বিনা সুদে টাকা পাবে। ১৯৭৯ সালে, ৫৯,১১৪ জনকে এবং ১৯৮০ সালে ৭১,০৫৪ জনকে এইভাবে ঋণ দেওয়া হয়। ক্রমশঃ বাড়িয়ে সমস্ত বর্গাদার ও খাস জমির প্রাপকদের এই ধরনের ঋণের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চলছে।

প্রান্তিক ক্ষুদ্র কৃষকঃ ১৯৭১ সালের লোকগণনায় হিসাব

অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে ২৫ লাখের কিছু বেশী পরিবারের জমির পরিমাণ ২½ একরের কম। এদের সরকারী পরিভাষায় প্রান্তিক চাষী বলা হয়। ২½ একর হতে ৫ একর পর্যন্ত জমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা ১০ লাখের কিছু কম। এদের সরকারী পরিভাষায় ক্ষুদ্রচাষী বলা হয়। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রচাষী উভয়ে একত্রে ৩৫ লাখ পরিবার। যেহেতু সেচ ও অ-সেচ এলাকার উৎপাদনে তারতম্য আছে; সেইহেতু সাধারণতঃ ১ একর সেচসেবিত এলাকাকে ১½ একর সেচবিহীন এলাকার সমতুল্য বলে গণ্য করা হয়। তাই বামফ্রন্ট সরকার সেচ এলাকায় যাদের ৪ একর পর্যন্ত জমি এবং অ-সেচ এলেকায় ৬ একর পর্যন্ত জমি আছে তাদের ক্ষেত্রে কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ঘোষণা করা হয়—সেচ এলাকায় ৪ একর পর্যন্ত জমি ও অ-সেচ এলাকায় ৬ একর পর্যন্ত জমির খাজনা ছাড় দেওয়া হলো এবং বাংলা ১৩৮৫ সাল হতে তা কার্যকরী করা হয়। এর দ্বারা প্রায় ৬॥ কোটি টাকা এরা বাৎসরিক রেহাই পায়। পরে বামফ্রন্ট সরকার খাজনা প্রথা উঠিয়ে দিয়ে, ল্যান্ড হোল্ডিং লেভী আইন পাশ করেন। এর মারফৎ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের ভূসম্পত্তির উপর কোন লেভী বসবে না। ৫০,০০০ টাকার বেশী মূল্যের সম্পত্তি যাদের আছে তাদের ক্রমবর্ধমান হারে লেভী বসবে। হিসাবে দেখা গেছে এর দ্বারা প্রায় ৪৩ লাখ পরিবার (বর্তমান হিসাব অনুযায়ী) লেভীর দায় থেকে মুক্তি পাবে।

সরকার বর্তমানে ঘোষণা করেছে সেচ এলাকায় যাদের ৪ একর এবং অ-সেচ এলাকায় যাদের ৬ একর পর্যন্ত জমি আছে তাদের সমস্ত সরকারী ঋণ (তাকাভি) মকুব করা হবে। এর দ্বারা প্রায় ৪০ কোটি টাকার ঋণ মকুবের সুবিধা এই অংশ পাবে। কো-অপারেটিভ ঋণের ক্ষেত্রে এই অংশের কৃষকের দেয় সুদ সরকার দিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন; যদি তারা আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে তাদের আসল পরিশোধ করে দেয়। এর দ্বারা প্রায় ৮ কোটি টাকা এরা ছাড় পাবে।

ধনী কৃষক সমেত সমগ্র কৃষক: এ ছাড়া সমগ্র কৃষক সমাজের জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যথা: কৃষক যাতে ফসলের লাভজনক দর পায়, তার জন্য বিভিন্ন ফসল ওঠার সাথে সাথে, প্রাথমিক বাজারে ক্রয়কেন্দ্র খুলে, ফসল লাভজনক দরে কেনার ব্যবস্থা কিছু কিছু করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঘোষিত দরের উপর সাবসিডি দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিনা বেতনে ১২ ক্লাশ পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ অন্যান্য অংশের মত সমগ্র কৃষক সমাজ ভোগ করছে। কৃষকদের বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এর ফলে সমগ্র কৃষক সমাজের মধ্যে প্রচুর উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। তারা আরো বেশী করে কৃষক সভার সদস্য হওয়ার জন্য এগিয়ে আসছেন। গত বছর রাজ্য কৃষক সভার সদস্য সংখ্যা ছিল ৩১ লাখ ৮২ হাজার, এ বৎসর সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮ লাখ ৫০ হাজার। সারা রাজ্যে এমন কোন ব্লক নেই যেখানে কৃষক সভার কোন সংগঠন নেই।

১৯৮০ সালে কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, এক নূতন জোয়ার লক্ষ্য করা গেল। গত কয়েক বছরে কৃষিজাত ফসলের দর ও শিল্পজাত বিভিন্ন পণ্যের দরের মধ্যে ফারাক ক্রমশঃ অস্বাভাবিক রূপে বেড়ে যাওয়ায় কৃষিজাত পণ্যের লাভজনক দরের সংগ্রাম, বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক প্রভৃতি কৃষক আন্দোলনের দিক হতে দুর্বল এলাকাতে এই আন্দোলন তীব্র আকারে দেখা দেয়। শুরুর দিকে নেতৃত্ব জমিদার ও ধনী কৃষকদের হাতে থাকলেও, এই আন্দোলনে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক এমন কি শ্রমিকশ্রেণী ও বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলি অংশ নেওয়ায় সর্বস্তরের কৃষক সমাজের আন্দোলন ব্যাপক ও তীব্র সংগ্রামে পরিণত হয়। ফসলের লাভজনক দরের সাথে যুক্ত হয়, ক্রেতা সাধারণের জন্য খাদ্য ও বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সস্তা দরে সরবরাহ করার দাবী, যুক্ত হয় ক্ষেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরী সুনিশ্চিত করার দাবী, ঋণ মকুব করার দাবী। ইন্দিরা কংগ্রেস আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, নির্মম দমন পীড়ন শুরু হয়, জাতীয় নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু তা সত্বেও আন্দোলনকে দমন করা সম্ভব হয় না। কৃষকদের দাবী কিছু কিছু মেনে নিতে বাধ্য হয়। আগে যেখানে ১৬ টাকার বেশী কুইন্ট্যাল প্রতি আখের দর দিতে সরকার রাজী হয় নি—আন্দোলনের চাপে আখের দর কুইন্ট্যাল প্রতি ২৩ টাকা হতে ২৮ টাকা দিতে বাধ্য হয়। ধান, গম, পেঁয়াজ প্রভৃতি অন্যান্য ফসলের দরও বাড়াতে বাধ্য হয়। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু সরকার ঋণ মকুব করেন ৬০ কোটি টাকা হতে ৯০ কোটি টাকার। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক নূতন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সারা ভারতব্যাপী সর্বস্তরের কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী সংগ্রাম গড়ে তোলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। শোষিত নিপীড়িত জনসংখ্যার সর্ববৃহৎ অংশ কৃষক। ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হলে, ইন্দিরা সরকারের ক্রমবর্ধমান আক্রমণের মোকাবিলা করতে হলে, কৃষকদের ব্যাপকভাবে এই সংগ্রামে শামিল করতে হবে। এর সম্ভাবনা বর্তমানে যেভাবে দেখা দিয়েছে, অতীতে কোন দিন এমনভাবে দেখা যায় নি। তাই শ্রমিকশ্রেণীকে এই নূতন সম্ভাবনার কথা মনে রেখে, এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে, শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের ব্যাপকতম ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে আরো শক্তিশালী করতে হবে—স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে। প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। গত ২৬শে মার্চ দিল্লীতে বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির আহ্বানে যে বিরাট কৃষক সমাবেশ হয়ে গেল—তা এক নবদিগন্ত আমাদের সামনে উন্মোচন করেছে। কৃষক আন্দোলনের এই নূতন জোয়ারে শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে হবে। মে দিবসে এই শপথই আমাদের নিতে হবে।

শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের ভাষানীতি

সুস্মিতা বসু

('যুবমানস' আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার খ-বিভাগে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে 'প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী' প্রকাশ করেন। প্রায় তিন দশক ধরে যে শিক্ষাক্রম চলে আসছিল তার কিছু কালোপযোগী মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তায় এই নতুন প্রণয়ন। যে শিক্ষাক্রম এতদিন চালু ছিল তার মূল কিন্তু ১৯৪৭-এর 'মধ্যরাত্রের স্বাধীনতা'য় নয়। এর প্রতিষ্ঠা বহু পূর্বে ঔপনিবেশিক শাসনের অঙ্গুলিসংকেতে। স্বাধীনতায় প্রত্যয় দৃঢ় হলে আজকের শিক্ষাব্যবস্থা হবে সেই কেরানী-কুলের জীর্ণ অবয়বকে ভেঙে, কারণ মেকলের (Macaulay) 'দাক্ষিণ্যে'র যুগ আজ অপসৃয়মান। নতুন 'শিক্ষাক্রমে'র লক্ষ্য নতুন দিনের ভাষ্য অনুযায়ী জীবনমুখী পাঠ্যসূচী রচনা।

এক বাস্তবসম্মত ও জীবনমুখী শিক্ষাক্রম রচনার প্রতিশ্রুতিতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে মাতৃভাষা। 'সহজ সরলভাবে মাতৃভাষার অনুশীলন প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ।' এই অনুশীলনের প্রকৃতি হচ্ছে 'মাতৃভাষায় শব্দসম্ভার (Vocabulary) বাড়ানো এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে ভাবগ্রহণ ও প্রকাশের উন্নতিসাধন'। এছাড়া স্থির হয়েছে 'প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন ভাষা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে না'। অর্থাৎ 'অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির সময়ে ইংরেজী ভাষার জ্ঞান আবশ্যিক ব'লে বিবেচিত হবে না'। মোটামুটিভাবে প্রাথমিক স্তরে বামফ্রন্ট সরকারের প্রস্তাবিত ভাষাশিক্ষার প্রায়োগিক দিক তিনটি—মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, মাতৃভাষায় ভাবপ্রকাশের উন্নতি এবং দ্বিতীয় কোন ভাষা না শেখানো।

নতুন শিক্ষাক্রমের সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় সম্ভবত এই ভাষা-নীতি। আপত্তিটা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে আসছে না, আসছে না কোনমতেই মাতৃভাষা শিক্ষা উন্নয়নে। এগুলোর যাথার্থ্য বহু আগেই স্বীকৃত। দ্বিতীয় কোন ভাষা এই স্তরে না শেখানোর নীতিটাই প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। এই প্রতিবাদের অনেক শরিকই যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক মুনাফা লোটার জন্য শিক্ষাদরদী হয়ে পড়েছেন একথাটা একান্তে খেয়াল রেখেও খোলা মনে বিচার করে দেখতে হবে ইংরিজি তুলে দেবার পেছনের যুক্তিগুলো, ভেবে দেখতে হবে এর প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল।

শিশুপাঠের প্রথম ধাপ হল মনের মধ্যে বস্তু সম্পর্কে ধারণার (Concept) সৃষ্টি। ভাষার প্রয়োজন ভাবপ্রকাশে ও ধারণার বিধৃতিতে। ভাষার পরিধি বাড়ে ধারণা বাড়ার সাথে, অভিজ্ঞতার হাত ধরে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরটি ধারণার কাল, মহীরুহে বিস্তারের প্রস্তুতিপর্ব। এখানে বিষয় শিক্ষাই মূল কথা। এবং এটা সাধারণ জ্ঞানেই সাব্যস্ত যে, বিষয়শিক্ষা দিতে হবে শিশুর আপন করে জানা কোনো ভাষায়। মাতৃভাষায় বিষয়শিক্ষা দেওয়াটাই সবচেয়ে সহজ, যেমন ছাত্রের পক্ষে, তেমনি শিক্ষকেরও। বিষয়-শিক্ষাই যেখানে মুখ্য সেখানে সম্পূর্ণ বিদেশী একটি ভাষা শিখিয়ে শিশুমনকে ভারাক্রান্ত করে তোলবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। প্রাথমিক স্তরে মোটামুটি আত্মস্থ মাতৃভাষাতেই শিশুরা শিক্ষালাভ করবে এটাই নিরীক্ষিত সত্য।

একটি বাংলাভাষী শিশুর সামনে ইংরিজি ভাষার পরিবেশ বা পরিমণ্ডল বলতে কিছুই নেই। বাংলাকে যেমন স্কুলে যাবার আগেই সে মুখে মুখে মোটামুটি রপ্ত করে ফেলে, ইংরিজি তা নয়। এ ভাষা সে না পারে বুঝতে, না পারে বলতে। ইংরিজি তার কাছে নিতান্ত বিদেশী— alien । একটি বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক। সোজা সহজ কথা—সে যায়। এই বাক্যটির ভাব কোন শিশু স্কুলে ভর্তি হবার আগেই জেনে গেছে। প্রথম শ্রেণীতে এসে তা সে লিখতে-ও শিখেছে, স্বচ্ছন্দে। বাংলার সাথে সমানভাবে যদি শিশুদের ইংরিজি শেখানো হয় তাহলে এই বাক্যটি তার প্রথম শ্রেণীতেই জানা উচিত। ইংরিজি অনুবাদে বাক্যটি দাঁড়ায়—He goes । আবার She goes তা-ও ঠিক। এখানে খুব সচেতনভাবেই এসে যাচ্ছে লিঙ্গের (Gender) প্রশ্ন। বাংলায় কিন্তু লিঙ্গের ব্যাপারটি গৌণ। তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর আগে এটি তাদের বিধিবদ্ধভাবে শেখানো হয় না। অনেক বেশী অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয় 'goes' শব্দটি নিয়ে। 'Go' মানে যাওয়া, এটি ধরা যাক শিশু সহজেই শিখে নিয়েছে। কিন্তু সাথের ঐ '-es' টুকু? Third person singular number -এর 'সাংখ্যতত্ত্ব'কে আর এড়ানো গেল না। এই অবস্থায় শিশুর পরিণত মনের (maturation) ওপর নির্ভর না করে সাধারণত তাকে জবরদস্তি মুখস্থ করানো হয়। এর ফলটা খুব সুখপ্রদ হয় না। যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বার্ষিক ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রথম শ্রেণীতে ইংরিজিতে শিশুরা খুব ভাল নম্বর পায়—পাঠ্য থাকে কম, মুখস্থ হয় সহজে। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে পাঠ্যবিষয় বাড়ায় বেশী মুখস্থ করা সম্ভব হচ্ছে না, পরীক্ষার ফলেরও ঘটছে ক্রমাবনতি। আর, না বুঝে মুখস্থ করে পাস করা মৌলিক চিন্তাধারা গড়ে ওঠার পথে এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সব মিলিয়ে ঐ ছোট বয়স থেকে ভাষা-শিক্ষায় চাপ এসে পড়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় হয় না। এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে অস্বীকার করার ফলই হচ্ছে শিশুদের মনোজগতকে পঙ্গু করে রাখা।

ইংরিজি শিক্ষা আমাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের দান। এঙ্গেলস এই অমোঘ সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন যে, 'বুর্জোয়ারা যেহেতু শ্রমিকের ততটুকুই জীবনধারণের স্বীকৃতি দেয় যতটুকু নিতান্ত প্রয়োজন, সুতরাং আশ্চর্য হবার কিছু নয় যে তারা শ্রমিককে ততটুকু শিক্ষার সুযোগ দেয় যতটুকু তাদের (বুর্জোয়াদের) নিজের স্বার্থে প্রয়োজন'। ইংরেজরাও তাই-ই করেছিল। প্রশাসন চালাতে প্রয়োজন ছিল কিছু স্থানীয় আমলা—কেরাণী-মুৎসুদ্দির। ইংরিজি শিক্ষাটা তৈরী হয়েছে এদেরই 'শিক্ষিত' করে তোলার তাগিদে। এই শিক্ষার গোড়ার কথাটা সাম্রাজ্যবাদের ঝাণু পাণ্ডা, মেকলের ভাষ্যেই শোনা যেতে পারেঃ 'We do not at present aim at giving education directly to the lower classes, we aim at raising of an educated class . . .'

যারা নাকি পরে অজ্ঞজনগণকে কিঞ্চিৎ জ্ঞানদান করবে। যে ইংরিজি শিক্ষা ঔপনিবেশিকতার প্রয়োজনে গড়া আজকের দিনে তার কোন মূল্য নেই। কিন্তু যখন সেই একই আদলে দেশজুড়ে প্রাথমিক শিক্ষাদান চলতে থাকে তখন শাসকদলের সাম্রাজ্যবাদী আনুগত্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে প্রাথমিকস্তরে ইংরিজি চাপানোর পেছনে থাকে এক সুনিপুণ অবহেলার কাহিনী। শিক্ষাকে সাধারণের নাগাল থেকে এক নিরবচ্ছিন্ন সতর্কতার দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে নৈব্যক্তিক বিভূতির ভূষায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে কিছু 'elite' তৈরীর নির্লজ্জ তাড়নায়. প্রাথমিক শিক্ষা উপেক্ষিতই থেকেছে। পৃথিবীর কোন স্বাধীন দেশে ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয় ভাষা শেখে না। বিষয়শিক্ষার জন্য সেখানে বিদেশী ভাষার দুরূহতার সঙ্গে পাঞ্জা কষার দরকার পড়ে না।

বর্তমান ভারত সরকারের একটি বিশিষ্ট নীতি শিক্ষা-সংকোচন। এই নীতির আনুষঙ্গ হিসেবে বিষয়শিক্ষার সুযোগ ও গুরুত্ব হ্রাস শাসন-কর্তৃপক্ষের বেশ পছন্দসই কায়দা। প্রাথমিক স্তরে বিদেশী ভাষার বাড়তি বোঝা চাপিয়ে শিশুমনকে পঙ্গু করাটাও এরই অনুবর্ত। ইংরিজিকে প্রথম শ্রেণী থেকে তেত্রিশ বছর পড়ানোর পর-ও যে কোন পরীক্ষায় ইংরিজিতে অকৃতকার্যতার পরিমাণ সর্বাধিক। গোলমালটা আদতে শিক্ষা-প্রণালীতেই। যে স্তরে ইংরিজি শেখানো হচ্ছে সে স্তরে শিশুর বাংলা ভাষার গঠন সম্পর্কে খুব পরিষ্কার ধারণা গড়ে উঠছে না। একটা ধারণা থেকেই সে অন্য ধারণায় যাবে। কাজেই গোড়ার ধারণাটা আগে পরিষ্কার থাকা দরকার। শান্তিনিকেতনে ক্লাস নিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের হাতে-কলমে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার ভিত্তিতেই তিনি লিখছেনঃ 'ভালো ক'রে বাংলা শেখার দ্বারাতেই ভালো ক'রে ইংরেজী শেখার সহায়তা হ'তে পারে'। তাঁর পর্যবেক্ষণই তাঁকে বলে দিয়েছিল 'মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তারপরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত ক'রে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না। ইংরেজীর অতি প্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলী সাবধানে সেলাই ক'রে ক'রে কাঁথা বুনতে হয় না।' আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীতে ইংরিজি শেখা-ও হচ্ছে না, বিষয়শিক্ষা-ও বিঘ্নিত হচ্ছে। সিলেবাস কমিটির জনৈক সদস্য গৃহীত ভাষানীতি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, 'বয়স বৃদ্ধি হওয়ার পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ইংরিজি শিক্ষার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ জন্মিতে পারে না।.. কেবলমাত্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষেই পরিণত বয়সে নূতন ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব।' এ যুক্তি বাস্তবসম্মত নয়। সবচেয়ে বড় কথা, এ জাতীয় বক্তব্যের ঝোঁকটা আমাদের বিষয়শিক্ষা ও ভাষা-শিক্ষার এক অনাবশ্যক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন করে দেয়। বিদেশী ভাষা শেখার প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবেই বিষয়শিক্ষার প্রয়োজনের অধীন এই কথাটা খেয়ালে রাখতে হবে। আমাদের ইংরিজি শিখতে হয়, কেননা আন্তঃরাজ্য ও আন্তঃরাষ্ট্র যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম এই ভাষা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু অধ্যায় এই ভাষাতেই লিপিবদ্ধ। প্রচারক্ষেত্র ব্যাপক বলে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার বিখ্যাত রচনা-গবেষণা গ্রন্থ এই ভাষাতেই অনূদিত হয়। যোগাযোগ (Communication) ও বিষয়শিক্ষা মূলত এই দুই কারণেই ইংরিজি শেখার প্রয়োজনীয়তা।' আজ আর ইংরেজী শেখাটাই শেষ লক্ষ্য বা শেষ কথা নয়।...ইংরিজী বই প'ড়ে জানা এবং সেই অর্জিত জ্ঞানকে মাতৃভাষার মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য ক'রে তোলার দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের বিদ্যালয়ের ইংরিজী শিক্ষার কর্মসূচী তৈরী করতে হবে'—সিলেবাস কমিটির এই সিদ্ধান্ত বাস্তবানুগ।

'অন্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সেখানে শিক্ষার পূর্ণতার জন্য যারা বোঝে তারা বিদেশী ভাষা শেখে। কিন্তু বিদ্যার জন্য যেটুকু আবশ্যক তার বেশী তাদের না শিখলেও চলে। কেননা তাদের দেশে সমস্ত কাজই নিজের ভাষায়।' —এ কথা রবীন্দ্রনাথের। আমাদের দেশে প্রশাসন জনসাধারণের থেকে অনেক দূরে এক 'তাসের দেশে'র নিয়মের রাজত্বে বাস করছে। শুধুমাত্র মাতৃভাষা জানার অপরাধে অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জনগণের এক গরিষ্ঠাংশ। স্ফীত হচ্ছে মুষ্টিমেয় একদল ইংরিজিশিক্ষিতের। বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যারা ইংরিজি ভাল জানে তাদেরই সুযোগ বেশী। আর আর্থ-সামাজিক সুবিধাভোগী এক শ্রেণী ব্যয়বহুল ইংরিজি মাধ্যমের বিদ্যালয়-গুলিতে পড়ার দৌলতে এই সুবিধাগুলি ভোগ করছে। অধিকাংশের জন্য যে ব্যবস্থা সেটা গালভারী শব্দচ্ছটা ও মহৎ আপ্তবাক্যে মণ্ডিত হয়ে সযত্ন উপেক্ষায় সমাজটার মতই ক্ষয়িষ্ণু। ইংরিজি এখানে শেখানো হয় না, যদিও কর্মজীবনে সেটাই চাওয়া হয় বড় করে। শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য টিঁকিয়ে রাখা হচ্ছে শাসক-শ্রেণীর নিজের স্বার্থে, অনুগত আমলা তৈরীর একান্ত তাগিদে। প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরিজি ভাষা তুলে দেওয়ার অর্থ অনেকে ভেবেছেন সাধারণের ইংরিজি শিক্ষার পথ বন্ধের বন্দোবস্ত। কিন্তু সিলেবাস কমিটি বিদ্যালয় স্তরে ইংরিজি শিক্ষার যে প্রস্তাবিত সার্বিক চিত্রটি দিচ্ছেন তা অন্য কথা বলেঃ

> 'পরিণত বয়স, দ্বিতীয় ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা এবং বিশেষ ক'রে মাতৃভাষার উন্নততর যোগ্যতা শিক্ষার্থীকে দ্বিতীয় ভাষা শিখতে বিশেষভাবে প্রেরণা যোগাবে এবং সাহায্য করবে। একাদশ শ্রেণী থেকে ভাষার সঙ্গে সাহিত্য সংযোগ ক'রে এই দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা যদি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক রাখা হয় এবং একটি সুবিন্যস্ত পাঠ্যসূচী রচনা ক'রে পশ্চিম বাংলার ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে উপস্থাপিত করা হয় তবে নিশ্চিতভাবে বলা চলে এর ফলে এখন ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষা ও ইংরিজির উপর যে দখল জন্মাচ্ছে তার চাইতে তারা অনেক উন্নত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।'

বামফ্রন্ট সরকারের এই নতুন শিক্ষানীতি অভিনন্দনযোগ্য হলেও বর্তমান ব্যবস্থায় এর কতগুলি সীমা আছে। দেশের সর্বত্র একই শিক্ষাপদ্ধতি চালু না হলে এর ব্যাপক সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। একটা সর্বগ্রাসী স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে গণতন্ত্রের ছোট একটা এককও যেমন সফল হতে পারে না তেমনি শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ না হলে নতুন প্রস্তাবগুলির আকাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সার্বজনীন শিক্ষার একটি গুরুত্ব-পূর্ণ শর্ত। কিন্তু শিক্ষার সার্বজনীনতায় বুর্জোয়া শাসকদল সব সময়েই শঙ্কিত। তলস্তয় এক নির্ভুল বস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণে সমকালীন রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছিলেনঃ

> 'The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore always oppose true enlightenment.'

কুখ্যাত ৪২তম সংবিধান সংশোধনের কল্যাণে শিক্ষা এখন যুগ্ম-তালিকাভুক্ত। বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার সার্বজনীন গণতান্ত্রিক শিক্ষা চাইলেও বর্তমান ব্যবস্থায় তাঁরা কতদূর এগোতে পারবেন সেটাই সমস্যা।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বামফ্রন্ট সরকারের ভাষানীতি

শ্রাবণী বসু

('যুবমানস' আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ক-বিভাগে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত)

বামফ্রন্ট সরকার, শিক্ষানীতি সংস্কারের ক্ষেত্রে বহুপূর্বেই স্বীকৃত কতকগুলি বিজ্ঞানসম্মত মৌলিক নীতি ইতোমধ্যেই প্রবর্তন করেছেন এবং বাকী আরও কতকগুলো সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা, পরীক্ষানীরিক্ষা চলেছে। সম্প্রতি তাঁরা যে নীতিগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন তাদের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার পাঠক্রম থেকে ইংরেজী বা অন্য কোন দ্বিতীয় ভাষাকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র মাতৃভাষাকেই চালু রাখা।

সর্বস্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মৌলিক এবং সর্বজনগ্রাহ্য নীতিটির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, শিশুর জীবনের শুরুতেই, তার শৈশব এবং বাল্যে, পরিবেশ এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে, তাকে নিজের মাতৃভাষাটি ভালোভাবে, নিখুঁতভাবে শেখবার সুযোগ দিতে হবে, যাতে করে সে শিক্ষার পরবর্তী স্তরগুলোতে, অনায়াস দক্ষতার সঙ্গে, দুরূহতর জ্ঞানার্জন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত মননের কাজে, একটি অতি উত্তম সহায়ক-যন্ত্র হিসেবে মাতৃভাষাকে কাজে লাগাতে পারে অথচ আমরা দেখে বিস্মিত হচ্ছি যে কিছু পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি এবং স্বনির্বাচিত দেশপ্রেমিক বা সমাজবিজ্ঞানী, শিশু বিদ্যার্থী তথা সমগ্র সমাজের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর এবং প্রয়োজনীয় এই সিদ্ধান্তটির বিরোধীতা করছেন।

বাঙালী তার শিক্ষানীতি, সাহিত্য, শিল্প, এমনকি সমাজ-চিন্তার ক্ষেত্রেও বারবার রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে। শিক্ষাপদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তিনি যে বক্তব্য রেখে গেছেন, আজও তাদের অনেকগুলো শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। শিক্ষায় ভাষার মাধ্যম প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই বহু উদ্ধৃত উক্তিটি করেছিলেন, 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ'। কথাটি আরও প্রাঞ্জল করতে গিয়ে তিনি বল্লেন, "মনের চিন্তা ও ভাব কথার প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার একটা অঙ্গ", এবং "আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ স্বভাবতই সমাজের মনে কাজ করে, এটা সুস্থ চিত্তের লক্ষণ।"

গান্ধীজীও প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন এবং তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষার প্রকল্পে ৭ থেকে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে মাতৃভাষা ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভাষার স্থান ছিল না। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে মুদালিয়র এবং কোঠারী কমিশনদ্বয় মাতৃভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সুপারিশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের "আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন" কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাথমিক স্তরে, তার শিক্ষাজীবনের শুরুতেই যদি আমরা তার ঘাড়ে ইংরেজীর মত একটি সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষাকে চাপিয়ে দিই তার ফলাফল কী হতে পারে, দুইশত বৎসরের ইংরেজ শাসন এবং স্বাধীনোত্তর যুগেও এমনকি আমাদের শৈশব অভিজ্ঞতাও তার দুঃখাবহ সাক্ষ্য বহন করে।

একটি দেশ বা সমাজের মানবগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, শিল্প, আদব-কায়দা, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই গড়ে ওঠে তার নিজের মাটি ও পরিবেশকে ভিত্তি করে। বহুকাল ধরে যে ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ কোন একটি মানবগোষ্ঠীকে প্রভাবান্বিত করে, কালক্রমে সেগুলোও ঐ গোষ্ঠীটির নিজস্ব পরিবেশেরই অঙ্গীভূত হয়ে যায়। ভারতবর্ষেরও এই ব্যাপারটি চলেছে হাজার হাজার বছর ধরে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, বহু জাতি, ভাষা, সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক গঠন ও রীতিনীতিরও পরিবর্তন ঘটেছে, ধীরে ধীরে। অনেক নতুন ভাষারও সৃষ্টি হয়েছে, সমাজ ও পরি-বেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু, এই পরিবর্তিত পরিবেশ ও সামাজিক রীতিনীতিগুলোও একান্তভাবে ভারতীয় জন-গোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব বস্তুতে পরিণত হয়েছে—তারা কখনোই বিদেশী নয়।

কিন্তু, ইংরেজী ভাষার ক্ষেত্রে এটি ঘটে নি, যেমন ঘটে নি গ্রীক, আরবী, তুর্কি বা ফারসী ভাষার ক্ষেত্রে। এই ভাষাগুলো নানাভাবে আমাদের ভাষাগুলোকে প্রভাবান্বিত করেছে, এমন কি এই সংস্পর্শের প্রভাবে কিছু কিছু নতুন ভাষারও উদ্ভব হয়েছে, যেমন উর্দু, কিন্তু এই বিদেশী ভাষাগুলো কখনোই ভারতীয় তথা বাঙালীর মাতৃভাষারূপে গণ্য হয় নি। কিছু কিছু ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সরকারী কাজকর্মের বাহন হিসেবেই এদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল এবং এখনও তাই।

সে তো সুদূর অতীতের ব্যাপার নয়, কম-বেশী দেড়শো বছর। বিদেশী ইংরেজবণিক ও শাসকেরা হিসেব করে দেখলো, ব্রিটেন থেকে লোক আমদানী কমিয়ে দিয়ে এবং ইংরেজী শিখিয়ে নিয়ে যদি এ-দেশী লোকগুলোকে দিয়েই কেরানী ও নিম্নতর আধি-কারিকের পদগুলোর কাজ চালানো যায়, তাহলে খরচ অনেক কম পড়ে এবং শাসকগোষ্ঠীর অনুগত, একটি ব্রিটিশ ঘেঁষা মধ্যশ্রেণীরও জন্ম দেওয়া যায়। লর্ড বেন্টিঙ্ক থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালে সর্বক্ষেত্রেই, বিদেশী শাসকেরা তাদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যিক স্বার্থের কথা স্মরণে রেখেই এ দেশের শিক্ষানীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই নীতিরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল স্তরে ইংরেজী ভাষাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া এবং ইংরেজীকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা।

কিন্তু, কথা হচ্ছে, দীর্ঘ দুশো বছরের ইংরেজ শাসন এবং ইংরেজী শিক্ষার পরেও ইংরেজী ভাষা কোন সময়েই এ দেশের লোকেরা ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারে নি এবং সার্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ দেশের মানুষ যে কতটা পিছিয়ে ছিল, সে তো সকলেরই জানা কথা। কিন্তু এর কারণ কি?

তাহলে, আবার সেই রবীন্দ্রনাথের কথাতেই ফিরে যেতে হয়। "শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ"। শিশুর দেহ গড়ে ওঠে মাতৃ-দুগ্ধে, যেটা তার জন্মলব্ধ অধিকার। মাতৃভাষা শিশু শিখতে থাকে তার বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, স্বাভাবিক নিয়মে, অনায়াসে।

যে পরিবেশ, প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক, ঐতিহ্য, রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা, সংস্কৃতি, শিশুকে ঘিরে একটি পরিমণ্ডলের মত বিরাজ করে, মাতৃভাষাই হচ্ছে তার সহজতম এবং প্রত্যক্ষ বাঙময় প্রতীকী প্রকাশ এবং যেহেতু শিশু তার এই পরিবেশ এবং ভাষার পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়েই বড় হয়ে উঠতে থাকে, সেইহেতু মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিশু তার পরিবেশ এবং পরিবেশ নির্ভর সকল প্রকারের প্রাথমিক জ্ঞানসমূহের মধ্যে অতি সহজেই প্রবেশ করতে পারে।

কিন্তু, সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, যে মাতৃভাষা শিশু তার পরিবার এবং সমাজের কাছ থেকে শেখে তা তার দীর্ঘ বিদ্যার্থী-জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

সাহিত্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা ও চর্চার জন্য সব ভাষারই একটি পরিশীলিত রূপ আছে।

প্রাথমিক স্তরেই, অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুকে তার মাতৃভাষার এই পরিশীলিত রূপটির সঙ্গেও সম্যক্‌ভাবে পরিচিত করানো দরকার, যাতে পরবর্তী স্তরগুলোতে বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরীরা অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে তার মাতৃভাষাকে ব্যবহার করতে পারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দূরূহতর বিষয়গুলোর গভীরে প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু, এ কাজের জন্য শিশুকে তার সাধ্যমত সময় দিতে হবে। একটি শিশু, সবেমাত্র ধীরে ধীরে তার পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করেছে। তার মস্তিষ্ক এখনো পরিপূর্ণতা লাভ করে নি। তার মননক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে এখনও অনেক বাকী। এই অবস্থায়, নিজের মাতৃভাষাকে ভালভাবে আয়ত্ব করার কাজে এবং প্রাথমিক জ্ঞানার্জনে সময় দেবার পরে, তার কাছে আমরা কি আশা করতে পারি যে, সে ইংরেজীর মত একটি বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ব করার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারবে, যে ভাষার জন্ম সম্পূর্ণ বিদেশী পরিবেশে, বিদেশী ধ্যানধারণার প্রতিকী প্রতিভাস হিসেবে? না, তা যে সে পারে না, এ একটি পরীক্ষিত সত্য। শিশু না পারে ভালোভাবে নিজের ভাষা শিখতে, প্রাথমিক বিদ্যা অর্জন করতে এবং না পারে ইংরেজী শিখতে। গোটা প্রাথমিক শিক্ষাটাই একটা প্রহসনে পরিণত হয়। আমাদের দুশো বছরের শিক্ষার ইতিহাসই হচ্ছে এইরূপ একটি মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি।

আসলে, একক্ভাবেও, সকল সময়েই বিদেশী ভাষা শিক্ষা একটি আয়াসসাধ্য ব্যাপার, বিশেষ করে সেই ভাষার জন্ম যদি হয়ে থাকে সম্পূর্ণ বিদেশী পরিবেশে, কেননা, একটি ভাষা শেখবার সময় অহরহ আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই মনে মনে অনুবাদের মধ্য দিয়ে যাই এবং, একই বস্তু বা ভাবের দুইটি ভিন্ন প্রতিকী প্রকাশের এই অনুবাদিক বিনিময় বেশ আয়াস ও সময়সাপেক্ষ। প্রচুর অভ্যাসের প্রয়োজন। এছাড়া, পরিবেশ এবং ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতির ক্ষেত্রে এমন অনেক জিনিস থাকে যা আমাদের দেশের অধিকাংশ শিশুরই পরিবেশ এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে। তাই শিশুর পক্ষে, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী বা অন্য কোন দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা একটি নিষ্ফল প্রয়াস এবং অকারণ শাস্তি।

বলা হচ্ছে, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী তুলে দিয়ে, চাকুরীর প্রতিযোগিতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, উচ্চতর শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে বারোটা বাজান হচ্ছে। অত্যন্ত অমূলক অসার যুক্তি। বামফ্রন্ট সরকার, আবশ্যিক ভাষা হিসাবে ইংরেজী শিক্ষাকে তো একেবারে তুলে দেন নি। পরবর্তী স্তরগুলোতে, অর্থাৎ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে, ইংরেজী আবশ্যিক পাঠক্রমের মধ্যেই থাকছে, অর্থাৎ, কিশোর-কিশোরীরা, যখন তারা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনেকটা পরিণতির দিকে এগিয়েছে, তখন পুরো সাতটি বছর ইংরেজী ভাষা শেখবার সময় পাচ্ছে। পৃথিবীর তাবৎ উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, এই সাতটি বছর একজন গড়পড়তা কিশোর-কিশোরীর পক্ষে একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য যথেষ্ট এবং বিদেশী ভাষা শেখবার পক্ষে এই বয়স অধিকতর উপযোগী।

এ কথা তো কেউ অস্বীকার করে নি যে ইংরেজী ভাষা আজকের পৃথিবীতে প্রধানতম ব্যবহারিক আদান-প্রদানের ও যোগাযোগের ভাষা, ফারসী ভাষা যেমন ইউরোপীয় দেশগুলিতে। ইংরেজী, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেও অন্যতম প্রধান ব্যবহারিক ও যোগাযোগের ভাষা, উচ্চতর বিশেষজ্ঞ জ্ঞানচর্চার জন্যও এই ভাষা-শিক্ষার প্রয়োজন আমরা মেনে নিয়েছি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বহু ছাত্রছাত্রী, মাতৃভাষা ছাড়াও অন্য একটি ভাষা শিখে থাকে, কিন্তু কোন দেশেই তা প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে নয়। মাধ্যমিক স্তরে তারা যে দ্বিতীয় ভাষাটি শিখছে, তা কোনক্রমেই নড়বড়ে শিক্ষা নয়। আমাদের দেশেও চৌদ্দ বা ষোল বছর ইংরেজী শিখে ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভাষাটিকে ভালোভাবে আয়ত্ব করতে পারে না, কারণ তাদের এই ভাষায় প্রবেশের সময়টাই তাদের শিক্ষার পথে প্রতিবন্ধকের কাজ করছে এবং ফলে বিসমিল্লায় গলদ থেকে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক রুশদেশের দৃষ্টান্তও আমাদের কাজে লাগবে, কেননা কিছু কিছু এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতিকে আক্রমণ করেছেন, যাঁরা কথায় কথায় সমাজতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক রুশ বা চীন দেশের দৃষ্টান্ত আওড়ান।

সমাজতান্ত্রিক রুশদেশ বহু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত, যাঁরা বাস করছেন অনেকগুলি সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রী রাজ্যের মধ্যে। এইসব সাধারণতন্ত্রের অধিবাসীরা এবং অন্যান্য ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীরা তাদের মাতৃভাষাতেই লেখাপড়া করে—এতে তাদের রুজিরোজগারের বা শিক্ষাগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনরকম অসুবিধার সৃষ্টি তো করেই নি, বরং উল্টোটাই ঘটেছে। শোষক সম্প্রদায় ভাষাকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সমাজতান্ত্রিক রুশদেশের ভাষাগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো এই শোষণ থেকে মুক্তিলাভ করেছে এবং দ্রুত ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। চীনসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও তাই।

সমাজতান্ত্রিক রুশদেশের ছাত্রছাত্রীরাও রুশ বা অন্য কোন দ্বিতীয় ভাষা শেখে না, তা নয়। কিন্তু, কোন ক্ষেত্রেই এই শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে শুরু হয় না

সোজাসুজি এ কথা বলতে চাই যে, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী তুলে দিয়ে এবং এই স্তরে কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করে, বামফ্রন্ট সরকার অভিনব কিছু করেন নি। এই শিক্ষানীতি পৃথিবীর সব উন্নত বা উন্নয়নশীল স্বাধীন বা সদ্যস্বাধীন দেশে বহু পূর্বেই গৃহীত হয়েছে। আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠীর বহু পূর্বেই যেটা করা উচিত ছিল, কিন্তু করেন নি, বামফ্রন্ট সরকার সেই অতিপ্রয়োজনীয় কাজটি করেছেন। এর বিরুদ্ধে দারুণ সোর তোলা হচ্ছে—আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই, কেননা, শিক্ষা অতি দ্রুত দেশের মানুষের সবার মধ্যে ছড়িয়ে যাক, তাদের চেতনার উন্মেষ ঘটুক, ভালোমন্দ উচিত অনুচিত বুঝতে শিখুক, এটা শাসক সম্প্রদায়ের অত্যন্ত অপছন্দের ব্যাপার। বাবার কাছে শুনেছি, তাঁদের ছেলেবেলায় কোন চাষীর ছেলে এসে উচ্চ বিদ্যালয়ে বা কলেজে লেখাপড়া শিখছে এটা গ্রামের বাবু-শ্রেণীর কাছে খুবই আপত্তিকর ছিল, কেননা তাহলে তাঁদের জমি

[শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায়]

জনতার কবি সুকান্ত

দীপক চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত হয়ে বাংলার কাব্যসাধনায় যে কবিকুল ব্রতী হয়েছিলেন তাঁরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যেভাবেই হোক পুরোপুরি রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত হতে পারেন নি। তাঁদের কবিতায় বারবার ছায়া ফেলেছেন রবীন্দ্রনাথ। কল্লোল, প্রগতি ও কালি-কলমের কবিরা বাংলা কবিতার ধারাকে যেভাবে প্রবাহিত করতে শুরু করেছিলেন তাতে মনে হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ 'যে কবির বাণীলাগি' কান পেতে ছিলেন সে কবির আবির্ভাব হ'তে বোধহয় আর দেরি নেই। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার স্বরসাধনায় একটা ফাঁক রয়ে গেছে। তার কাব্য বিচিত্রগামী হলেও সর্বত্রগামী হয় নি। যেখানে তাঁর প্রবেশ করার শক্তি ছিল না, বাধা হয়েছিল তাঁর জীবনযাত্রার বেড়া সেই শ্রমিক-কৃষকের জীবনের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই নিজের জীবনকে যুক্ত করতে পারেন নি। এমন ধারণা হওয়া তখন বোধহয় অস্বাভাবিক ছিল না যে রবীন্দ্রনাথের স্বরসাধনার ফাঁক পূর্ণ হতে চলেছে। কেননা, কল্লোল, প্রগতি ও কালিকলমের কবিকুল তাঁদের যাত্রাশুরুতেই ঘোষণা করেছিলেন,

"আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের
মুটে মজুরের
আমি কবি যত ইতরের।"

কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা তাঁদের ঘোষণাকে বজায় রাখতে পারেন নি। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের আশা তো পূর্ণ করতে পারলেনই না, উপরন্তু তাঁরা তাঁদের কাব্যধারাকে যৌনতার পথে প্রবাহিত করে দিলেন। রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে বিশেষ করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরোধিতা করে যে জনমানসের সাহিত্য বা কাব্যরচনা করা যায় না এই কবিকুল তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁরা একটা মোহের বশে মার্কসবাদ তথা সাম্যবাদের বিরোধিতা করে গেলেন। ফলে মাটির কাছাকাছি আসতেই পারলেন না।

এর পরবর্তীকালে চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে কেউ কেউ মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দীক্ষিত হয়ে বাংলার কাব্যজগতে আবির্ভূত হলেন। এ'দের মধ্যে সবচেয়ে সার্থক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। যখন সুকান্তের আবির্ভাব তখন পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে বারুদের গন্ধ। চারিদিকে ধূমায়িত বহ্নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর একদিকে দেশে দেশে দেখা দিচ্ছে সর্বহারা বিপ্লবের ঢেউ; অন্যদিকে নতুন করে সমরসজ্জার আয়োজন। ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে একদা 'সমাজবাদী বিপ্লবী' মুসোলিনী একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ইতালির ক্ষমতা দখল করলেন। ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী হিটলার বিশ্বের পুঁজিবাদীদের সমর্থন নিয়ে জার্মানীর চ্যান্সেলার হলেন। এর সঙ্গে যোগ দিল জাপান। পৃথিবীর বুকে ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। ১৯৩৬ সালে জাপান আক্রমণ করলো চীনের মূলভূখন্ড। ১৯৩৫ সালে ইতালি ঝাঁপিয়ে পড়লো আবিসিনিয়ার বুকে। ১৯৩৬ সালে স্পেনে ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ ঘোষণা করলো সাধারণতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে। তাকে সমর্থন করলো জার্মানী ও ইতালি। অবশেষে ১৯৩৮ সালে অস্ট্রিয়া আক্রমণ করলো জার্মানী। ফ্যাসিবাদের অগ্রগতিতে প্রমাদ গুনলেন বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহল। এর ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো ভারতবর্ষের বুকে। ফরাসী লেখক আঁরি বারবুস ও রমাঁ র'লার আহবানে সাড়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবিরোধী আবেদনে স্বাক্ষর করলেন। শুধু তাই না, "১৯৩৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথ আবিসিনিয়া ও স্পেনের যুদ্ধের নিন্দা করে বাণী পাঠিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে League Against Fascism and War-এর সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অ্যালবার্ট হলের সভায় সরোজিনী নাইডু দৃপ্তকণ্ঠে স্পেনের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহানুভূতি জানালেন। রবীন্দ্রনাথ স্পেনের মুক্তিফ্রন্টকে সমর্থন জানাবার জন্য আবেদন জানালেন।"

এহেন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে বাংলার কাব্য-জগতে সুকান্ত ভট্টাচার্যের আবির্ভাব। সুকান্ত কবিতাকে হাতিয়ার করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জাপানী বোমার মুহুর্মুহু আক্রমণের মধ্যে; পঞ্চাশের মন্বন্তরে বিপর্যস্ত সমাজজীবনের মধ্যে, প্রতিক্রিয়াশীলচক্র দ্বারা আক্রান্ত শিল্পীদের মধ্যে, জাপানের হাত থেকে দেশের প্রতিরক্ষার মধ্যে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে আর্ত মানুষের সেবার মধ্যে, জনযুদ্ধের আন্দোলনের মধ্যে, যুদ্ধশেষে স্বাধীনতার উত্তাল বিক্ষোভের মধ্যে। সুকান্তের আগে কোনো কোনো কবি সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে কাব্যসাধনা করে-ছিলেন সত্যি। কিন্তু তাঁরা কেউ পুরোপুরি সাম্যবাদী কবি হয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁদের হাত দিয়ে সাম্যবাদী কবিতা লেখা হয় নি। কারণ, তাঁরা আদর্শের সঙ্গে কবিতাকে মেলাতে পারেন নি। সাম্যবাদী কবিতা প্রসঙ্গে বলেছেন, G. S. Fraser

> "Communist Poetry requires a use of the symbolism of the great suffering masses: rather it does not require symbolism or allegory at all but a direct appeal to the masses, a direct praise of them, and a tone of practical exhortation, a direct description of their activities and sufferings. And it must not be cryptical or allusive or obscure, it must make no cultural demands on the masses that would give them a sense of inferiority or weaken them in the struggle."

সাম্যবাদকে আদর্শ করে সেই সময়ে যাঁরা কবিতা রচনা করে-ছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিষ্ণু দে, সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বিষ্ণু দে-র কবিতা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোতে পারে নি। এমনকি উচ্চশিক্ষিত মানুষের কাছেও তাঁর কবিতা অনেকটা গোলকধাঁধার মতো। অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দ ব্যবহার করার জন্য তাঁর কবিতা অনেক সময় দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। সমর সেন সম্বন্ধে ডঃ সরোজমোহন মিত্র যে কথা বলেছেন সেটাই তাঁর কাব্য সম্বন্ধে সত্যিকারের ব্যাখ্যা। "সমর সেন মধ্যবিত্ত সমাজের কবি। মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গেই তাঁর নির্ভেজাল সম্পর্ক। সে জন্য মধ্যবিত্তশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিরাশা ও বেদনাই তাঁর কাব্যে মুখ্য স্থান লাভ করেছে।...সেখানে ভাঙনের, নৈরাশ্যের চিত্রই প্রধান, তাকে প্রতিরোধের, পরিবর্তনের সংগঠিত আয়োজনের, আশাবাদের চিত্র গৌণ। সাম্যবাদী কবি হিসেবে সেখানেই তাঁর ব্যর্থতা।" কাব্যসাধনায় সমর সেনের যেখানে শেষ সুভাষ মুখো-পাধ্যায়ের সেখানে শুরু। মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষ হয়েও চিত্তের অস্থিরতা, দোদুল্যমানতা তিনি সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পেরে-

ছিলেন। তাই দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন, "কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?" সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও সুভাষবাবু 'পদাতিক'-এ এসে থেমে গেলেন। পরের কবিতাতে আর তেমন ধার দেখা গেল না। তিনি নিজেই এ কথা স্বীকার করে বলেছেন যে রাজনীতি আর কবিতাকে তিনি জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারেন নি। বিষ্ণু দে নিজেকে সাম্যবাদে বিশ্বাসী বলেছেন, সমর সেনও ছিলেন সাম্যবাদে আস্থাবান আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সাম্যবাদী দলের সক্রিয় কর্মী। তবুও তাঁরা কেউ জনতার কবি হতে পারলেন না। এর কারণ একটাই। সেটা হলো তাঁদের কবিতা আর রাজনীতির মধ্যে ছিল একটা দ্বন্দ্ব। সেটা সুকান্তের ছিল না। সুকান্ত কবিতা আর রাজনীতিকে একেবারে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। সুকান্তের নিজের কথাতেই তার প্রকাশ। একটি চিঠিতে তিনি তাঁর মেজ বউদিকে লিখেছেন, "আমি কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হবো, আমি কি সেই ধরনের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই; জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি? তাছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্ট-দের কাজ-কারবার সব জনতাকে নিয়েই।" মানবসমাজের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদন সম্পর্কের ভিতর দিয়ে যে ভাষার জন্ম হয়েছে সেই ভাষাতেই কবিতার প্রকাশ হওয়া উচিত। একথা সুকান্ত উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি এতো সহজবোধ্য ভাষায় সমাজ-সচেতন কবিতা রচনা করতে পেরেছিলেন। কডওয়েল কবিতা সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলেছেন,

> "Poetry is written in language and therefore it is a book about the sources of language. Language is a social product, the instrument whereby men communicate and persuade each other, thus the study of poetry's sources cannot be seperated from the study of society."

সুকান্ত যে যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই যুগে ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠেছিল। সর্বহারা জনগণের বিপ্লবকে স্তব্ধ করার জন্য ধনিকগোষ্ঠী ফ্যাসিবাদের পথ ধরলেও লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বহারারাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং স্তালিনের নেতৃত্বের কাছে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ে সর্বহারাশ্রেণী নতুন শক্তিতে শক্তিমান। নতুন প্রেরণা পেয়ে তাদের মনে এসেছে নতুন উৎসাহ। সেই কথাই ঘোষণা করলেন সুকান্ত,

> "ইতিহাস মোড় ফেরে পদতলে বিধ্বস্ত বার্লিন,
> পশ্চিম সীমান্তে শান্তি, দীর্ঘ হয় পৃথিবীর আয়ু.
> দিকে দিকে জয়ধ্বনি, কাঁপে দিন রক্তাক্ত আভায়।"

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের চক্রান্তে বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ তার করাল ছায়া বিস্তার করলো। বিদেশীর গোপন ষড়যন্ত্রের ফলে শিল্পীদের ওপর চললো আক্রমণ। এমনকি হত্যা করতেও তারা কুণ্ঠিত হলো না। অগণিত সাধারণ মানুষ অনাহারে আর মহা-মারীতে মৃত্যুমুখে পতিত। একদিকে পর্বতপ্রমাণ খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার; অপরদিকে অনাহারক্লিষ্ট সাধারণ মানুষ। এই সময়ে কোনো আপোষ নয়—সংগ্রামই একমাত্র পথ। সংগ্রামী কবি সুকান্ত উপলব্ধি করলেন এই কথা। সুদৃঢ় কণ্ঠে বললেন,

> "আমি এক ক্ষুধিত মজুর।
> আমার সম্মুখে আজ এক শত্রুঃ এক লাল পথ,
> শত্রুর আঘাত আর বুভুক্ষার উদ্দীপ্ত শপথ।"

সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, "রক্তে আনো লাল,/ রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।"

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে ফ্যাসিবাদ পরাজিত। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বাইরের যুদ্ধ শেষ হয়েছে ঠিক, কিন্তু আসল যুদ্ধ এখনো বাকি। দেশের মাটিতে যে বিদেশী শক্তি এখনো ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে তাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। সুকান্ত সে কথাই বললেন,

> "পরের জন্য যুদ্ধ করেছি অনেক,
> এবার যুদ্ধ তোমার আর আমার জন্য।"

এই যুদ্ধে দীর্ঘদিনের শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে—ধনিক আর শ্রমিকের মধ্যে। সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্যই এই সংগ্রাম। কার্ল মার্কস বলেছেন, "সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী...সমাজব্যবস্থায় যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে মানুষও তার অংশীভূত; উৎপাদকশক্তি ও উৎপাদন-ব্যবস্থার সংঘাত মানুষকে চেপে ধরছে, মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে। এই সংঘাতের তীব্রতা মানুষকে নতুন সমাধানের সন্ধানে চালিত করছে। উৎপাদনব্যবস্থা তো মানুষ-বর্জিত প্রকৃতি-জগতের বিষয় নয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত। সেজন্য মানুষকেই সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়।"

পুঁজিবাদ সাধারণ মানুষকে সঙ্কট থেকে সঙ্কটের দিকে নিয়ে চলেছে। শোষণে-পীড়নে মানুষ দিশাহারা। এই সঙ্কটমোচনের একমাত্র পথ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। আর তার জন্য চাই শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের সুদৃঢ় ঐক্য। সাম্যবাদী কবি সুকান্ত একথা জানতেন বলেই বলতে পেরেছেন,

> "হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিকালের চেতনা—
> আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি,
> প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের
> তুষার-গলানো উত্তাপ।
> টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ো তোমার
> অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।
> শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
> একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।"

মার্কসবাদী শ্রেণীসচেতনার সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে সুকান্তের 'চারাগাছ', 'একটি মোরগের কাহিনী', 'সিঁড়ি', 'কলম', 'সিগারেট', 'চিল', 'রাণার' প্রভৃতি কবিতাতে। তিনি কলম, সিগারেট, সিঁড়ি প্রভৃতিকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী যখন শোষণের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। ধর্মঘট করছে, বিদ্রোহ করছে তখন আর ক্রীতদাসের মতো চুপ করে মার খাওয়া নয়। শিকল ছেঁড়ার সময় এসেছে। পড়ে পড়ে মার খাওয়ার দিন শেষ। কলমকে প্রতীক করে সুকান্ত মানুষকেই শুনিয়েছেন,

> "—কলম! বিদ্রোহ আজ! দল বেঁধে ধর্মঘট করো।
> লেখক স্তম্ভিত হোক, কেরাণীরা ছেড়ে দিক হাঁফ।
> মহাজনী বন্ধ হোক, বন্ধ হোক মজুতের পাপ;
> উদ্বেগ-আকুল হোক প্রিয়া যত দূর দেশে দেশে,
> কলম! বিদ্রোহ আজ, ধর্মঘট হোক অবশেষে;
> আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
> দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম,
> আনো দিকে দিকে"

'সিগারেট' কবিতাতে সুকান্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শ্রমিক-শ্রেণীকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে পালোয়ান যক্ষপুরীতে এসে যেমন শোষণের ফলে নিঃশেষ হয়ে গেছে তেমনি ভাবে শ্রমিকশ্রেণী আর নিঃশেষ হবে না। তাই বিক্ষুব্ধ সিগারেটের মুখ দিয়ে সুকান্ত বলেছেন,

"আমরা বেরিয়ে পড়ব,
সবাই একজোটে, একত্রে—
তারপর তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে
জ্বলন্ত আমরা ছিট্‌কে পড়ব তোমাদের হাত থেকে
বিছানায় অথবা কাপড়ে;
নিঃশব্দে হঠাৎ জ্বলে উঠে
বাড়িসুদ্ধ পুড়িয়ে মারব তোমাদের,
যেমন করে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছ এতকাল॥"

'একটি মোরগের কাহিনী' সুকান্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। একটি মোরগকে শোষিত মানুষের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অত্যাচার-অবিচারের কাহিনীকে উপস্থাপিত করেছেন কবি। এই কবিতাটি সম্বন্ধে ডঃ সরোজমোহন মিত্র বলেছেন, "অসহায় মানুষের জীবনযন্ত্রণার মর্মন্তুদ কাহিনীই এই কবিতায় বাঙ্ময়রূপ লাভ করেছে। এই যন্ত্রণা ট্রাজিক রূপ লাভ করেছে যখন এই প্রতিবাদী ক্ষুধায় কাতর মোরগটি নিজেই একদিন সেই বিরাট প্রাসাদের দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে চলে যায়। কারণ ধনপতি বলে, "সবচেয়ে ভাল খেতে গরীবের রক্ত।" (ভাল খাবার) শোষিত বঞ্চিত মানুষের অসহায়তার এমন করুণ চিত্র বাঙলা কাব্যে আমরা পূর্বে দেখি নি। চিত্রকল্পের অনন্যতায়, রূপকের চমৎকার ব্যবহারে, ভাবের গভীরতায়, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায় একটি মোরগের কাহিনী সার্থক কাব্যরূপ লাভ করেছে।"

আর একটি অসাধারণ কবিতা 'রাণার'। গ্রামের রাণার পিঠে টাকার বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছে; অথচ তার নিজের ঘরেই নেই খাবার সংস্থান, সে কতো দুঃখ-কষ্ট ও দস্যুর ভয় উপেক্ষা করে দিনের পর দিন—বছরের পর বছর কলুর বলদের মতো ঘানি টেনে চলেছে। শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি রাণার। কিন্তু এই বঞ্চনা তো চিরদিন চলতে পারে না। দিন এসেছে দিন বদলের। শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে মাথা উ'চু করে দাঁড়াবার সময় এখন। সম্মিলিত প্রতিরোধে একদিন এই শোষণের দুর্গ ভেঙে পড়বেই। এই আনন্দ-সংবাদ রাণাকেই পৌ'ছে দিতে হবে অগ্রগতির মেলে। তাই তো রাণার ছুটে চলেছে জোরে—আরও জোরে। পূবের আকাশ লাল হবার আগেই তাকে পৌ'ছে দিতে হবে এই খবর দিক থেকে দিগন্তে।

"শপথের চিঠি নিয়ে চল আজ
ভীরুতা পিছনে ফেলে —
পৌ'ছে দাও এ নতুন খবর
অগ্রগতির 'মেলে',
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি—
নেই, দেরি নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে
দুর্দম, হে রাণার॥"

কার্ল মার্ক্স বলেছেন, "বুর্জোয়া সমাজের দাসত্বকে বহিদৃষ্টিতে মনে হয় সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা। কারণ, মনে হয় ইহা যাহা দিতেছে তাহা পরনির্ভরতা হইতে ব্যক্তিমানুষের পূর্ণ মুক্তি। কিন্তু এইখানে সম্পত্তি, শিল্প (Industry) ধর্ম প্রভৃতি যাহা কিছুর সহিতই তাহার জীবনের যোগ নাই তাহারই অবাধ বিচরণের স্বাধীনতাকে সে নিজের স্বাধীনতা বলিয়া ভুল করে।" এই ভুল সুকান্ত করেন নি। তিনি ধনতন্ত্রের তথাকথিত স্বাধীনতার মোহে মোহাচ্ছন্ন না হয়ে সাম্যবাদের সঠিক রাস্তায় এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাই জন্যই তিনি বলতে পেরেছিলেন,

"আমার ঠিকানা খোঁজ করো শুধু সূর্যোদয়ের পথে।
ইন্দোনেশিয়া, যুগোস্লাভিয়া, রুশ ও চীনের কাছে।"

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলার সবচেয়ে সমাজসচেতন কবি সুকান্ত। সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরসূরী। আমরা প্রথমেই বলেছি যে তৎকালীন বাংলার কবিকুল রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে কাব্য-রচনার প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু সুকান্ত রবীন্দ্র-প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়ে বাংলার কাব্যজগতে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেছিলেন। "প্রান্তিক-নবজাতক-জন্মদিনে—সভ্যতার সংকটের রবীন্দ্রনাথ সুকান্তের মধ্য দিয়ে আবার আধুনিক কবিতায় যেন প্রতিষ্ঠিত হলেন।" সুকান্তের কবিতার ভাষাতেও রবীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেয়। ডঃ সরোজমোহন মিত্র বলেছেন, "সাম্যবাদী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য জনতার কবি হতে গিয়ে মানবপ্রেমিক ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী রবীন্দ্র-সত্তাকে ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে গিয়েছেন।" সুকান্ত সঠিক অর্থেই জনতার কবি। তিনি কখনও কবির একক জগতে বাস করেন নি; ভেসে গেছেন জনতার প্রবল জোয়ারে। তাঁকে আমরা দেখেছি জনতার কাছে কাছে—শোষিত মানুষের পাশে। দেখেছি, 'বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণ-সংগীতের সুর;/জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে' জনতার সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করতে। সংগ্রামে সংগ্রামে রক্তের কেনা দামে জীবনকে তিনি অমৃতময় করে তুলেছিলেন। সুকান্তের সংগ্রামের হাতিয়ার কবিতা। সমাজের শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষের জীবনবোধ, জীবনযন্ত্রণা ও প্রতিবাদের ভাষাকে কাব্যরূপ দিয়ে মানুষকে দেখিয়েছেন শোষণমুক্ত এক সুন্দর পৃথিবীর পথ। মনীষী রম্যা র'লার মতোই তিনি বলতে চেয়েছেন, "আমার সকল কাজ সকল ক্ষেত্রেই চিরদিনই গতি-পন্থী। যাহারা থামিয়া নাই, চিরদিন আমি তাহাদের জন্যই লিখিয়াছি। আমি নিজে কোনো দিন থামি নাই; আশা করি যত-দিন বাঁচিব থামিব না। জীবন যদি সম্মুখপানে চিরচলমান না হয়, তবে আমার কাজে জীবন অর্থহীন। তাই যে-সকল জাতি ও শ্রেণী পথ কাটিয়া চলিয়াছে মহামানবের সমুদ্রপানে, আমি আছি তাহাদের সাথে। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমজীবী সাধারণ এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট গণতন্ত্র সঙ্ঘের সহযাত্রী আমি। ঐতিহাসিক বিবর্তনের অপ্রতি-রোধ্য উত্তাল তরঙ্গ তাহাদের বহন করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের ভবিতব্যই আমার ভবিতব্য।

'কাদের জন্য লিখি।' অভিযাত্রী সেনাবাহিনীর যাহারা অগ্রগামী দল, এমন এক বিপুল আন্তর্জাতিক সংগ্রাম যাহারা শুরু করিয়াছে যাহা সফল হইলে শ্রেণী ও সীমান্তের বেষ্টনী ভাঙিয়া এক মহা-মানব সমাজের সৃষ্টি হইবে, আমি লিখি তাহাদেরই জন্য।"

[১ পৃষ্ঠার পর]

চষবার লোক পাওয়া যাবে কোথায়? মনোভাব যে আজও বিশেষ পাল্টায় নি, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শাসকসম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ প্রতিভূরা বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা-নীতির তীব্র বিরোধিতা করছেন, তার অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভয়ঙ্কর হচ্ছে কিছু মেকী সমাজতন্ত্রী বা প্রগতিবাদী, যারা সমাজতন্ত্র বা প্রগতির নলচে আড়াল দিয়ে শাসকশোষক সম্প্রদায়েরই স্বার্থসিদ্ধি করছে। দেশের জনগণের মঙ্গলের জন্যই এদের মুখোশ উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন।

আলোচনা

দ্বিশতবর্ষের আলোকে জর্জ স্টীফেনসন্

ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল

সভ্যতার অগ্রগতির মূলে যেসব মহাপুরুষের কৃতিত্ব রয়ে গেছে তাঁদের সকলের নাম কিন্তু আমাদের সব সময় মনে থাকে না। এই যেমন কোন ইঞ্জিনিয়ার সেতু নির্মাণ করেছেন, কেউ বাঁধ করেছেন, কেউ বা উড়োজাহাজ বা জাহাজের নকশা তৈরি করেছেন। স্বীকার করতেই হবে তাঁরা প্রত্যেকেই বেঁচে রয়েছেন তাঁদের নির্মিত জিনিসের মধ্যে। তবে যাঁদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে প্রস্ফুটিত জর্জ স্টীফেনসন্ তাঁদের মধ্যে একজন, যাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও অধ্যবসায় বিজ্ঞানের যুগে এনেছিল এক বিরাট পরিবর্তন।

'নিউক্যাসেল'-এর "ওয়াইলাম-অন-টাইন" নামক ছোট্ট একটি জায়গায় ১৭৮১ সালে তাঁর জন্ম হয়। পিতা ছিলেন কয়লাখনির অয়ারম্যান, সপ্তাহে মাত্র বার শিলিং করে রোজগার করতেন. এরই উপর নির্ভরশীল ছিল তাঁর ছ-টি বাচ্চা ও তাদের 'মা'। দরিদ্রের সংসার। খুব কষ্টেই কাটত দিনগুলো। অভাবী পিতার মুখের দিকে চেয়ে বোধহয় বুঝতে পেরেছিল নাবালক পুত্রেরা তাই তারা যখন থেকেই উপার্জন করতে শিখল তখন থেকেই কাজের সন্ধানে চলে যেতে লাগল। জর্জ স্টীফেনসন্ ছিলেন দ্বিতীয় পুত্র। অত্যন্ত নাবালক বয়সেই তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন দুমুঠো অন্নের অন্বেষণে। প্রথম জীবনে স্টীফেনসন্ একজন প্রতিবেশীর রাখাল বালকের কাজ করতেন। দিনে দুই পেনীর চাষ-আবাদ দেখা-শোনার কাজ শুরু করেন। কিছু দিনের মধ্যেই এই কাজ ছেড়ে এবং কয়লা থেকে রাবিশ পাথর বাছার কাজে নিযুক্ত হন। এখান থেকেই তাঁর আসল জীবনের শুরু।

চোদ্দ বৎসর বয়সে তিনি পিতার সাহায্যকারীর পদ লাভ করেন। কিছুটা মর্যাদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পারিশ্রমিকও বাড়ে. সপ্তাহে বার শিলিং। এইবার তিনি জীবনে দাঁড়াবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। পরিবারের অবস্থা একটু ভালো হলেও তাঁরা কিন্তু এক ঘরেই থাকতেন।

জর্জ স্টীফেনসন্ কারখানার লোহা ইস্পাতের মধ্যে জীবন কাটালেও মন কিন্তু তাঁর লোহার মত ছিল না, তিনি ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক, খুব পাখী ভালবাসতেন তিনি। বাবার সঙ্গে কাজ করার সময় ইঞ্জিনের যন্ত্রপাতির দিকে প্রখর নজর থাকত তাঁর। এখনকার ইঞ্জিনের মত তখনকার ইঞ্জিন লোকোমোটিভ ছিল না, শুধুমাত্র কয়লা তোলার কাজেই ব্যবহৃত হত। স্টীফেনসন্ এই ইঞ্জিনের খারাপ ভাল সব বোঝবার চেষ্টা করতেন, তবে অসুবিধা ছিল এই যে তিনি লেখাপড়া জানতেন না। ফলে এই ইঞ্জিন সম্বন্ধে যে সমস্ত সমালোচনাপূর্ণ ম্যাগাজিন প্রকাশ পেত সেগুলি তিনি পড়তে পারতেন না। সেই কারণেই রাতের স্কুলে ভর্তি হন। সেখানেও তিনি অভাবনীয় প্রতিভায় খুব অল্প সময়ে লেখাপড়া শিখলেন আর তার সঙ্গে অঙ্কেও দক্ষ হয়ে উঠলেন। তবুও তিনি ইঞ্জিন থেকে তাঁর মনকে সরিয়ে নেননি। কুড়ি বৎসর বয়সে ব্রেক্‌সম্যানের কাজ পেয়ে গেলেন এবং তারপরই তিনি বিয়ে করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিন বৎসর পরই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং বৃদ্ধ পিতার অন্ধপ্রাপ্ততা স্টীফেনসনের জীবনে আর এক বিষাদের ছায়া নিয়ে আসে। তিনি সমস্ত সাফল্যের কথা ভুলে যান।

এই সময় দেশের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপের দিকে যায়। পরিবারের আয়ও কমে যায়, স্টীফেনসন্ ঘড়ি মেরামতের কাজ শুরু করেন। এবং খনিতে যারা কাজ করতেন তাদের জামা-জুতো তৈরী করেও কিছু অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন। এবার কিলিংওয়ার্থ খনিতে একটি পাম্পিং ইঞ্জিন খারাপ হয়, তিনি এটা মেরামতের ভার নেন এবং যথারীতি সারিয়ে তোলেন। খনির মধ্যে কর্মচারীরা যাতে মাইন ড্যাম্প থেকে রক্ষা পায় তার জন্য সেফ্‌টি ল্যাম্পের আবিষ্কার তিনিই করেন।

এর পর স্টীফেনসন্ লোকোমোটিভ ইঞ্জিন তৈরী করবার কথা চিন্তা করেন। খনির সঙ্গে যুক্ত অনেক রেলরাস্তা তখন ছিল কিন্তু ওয়াগন ঘোড়ার গাড়ীতে টেনে নিয়ে যেত। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে রিচার্ড ট্রেভিথিক্ নামক এক বার্নিশম্যান একটি স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার করলেও স্টীফেনসন্ একটি ইঞ্জিন তৈরী করলেন যেটি ঘণ্টায় অন্তত চার মাইল পথ পরিক্রমা করতে সক্ষম ও প্রচুর পরিমাণ জিনিসপত্র নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠতে পারত। এই ইঞ্জিনের আয়ু ছিল অনেকদিন কিন্তু এটার নির্মাণ ছিল খুবই সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। তাই স্টীফেনসন্ অন্য চিন্তা করতে লাগলেন।

অবশ্য তখন থেকেই স্টীফেনসন্ রেল ইঞ্জিন নির্মাতা বলে বেশী পরিচিত হন। তাঁর কোম্পানীর এক উদ্যোক্তা এডওয়ার্ড পিসস্টক্‌টন এবং ডার্লিংটনের মধ্যে একটি লোকোমোটিভ ইঞ্জিন চালাবার কথা চিন্তা করলেন। সেই সময় তিনি স্টীফেনসনের পরামর্শ চাইলেন ও স্টীফেনসনকেই ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করলেন, মাত্র ৩০০ পাউন্ডের বিনিময়ে। ১৮২৫ সালে এই লাইন চালু হল। স্টীফেনসনই এই রেল প্রথম চালালেন। বারটি ওয়াগন, একটি ডিরেক্টরদের জন্য বিশেষ কামরা আর একুশটি জনসাধারণের জন্য কামরা নিয়ে গাড়ী চলতে শুরু করল ঘণ্টায় বার মাইল বেগে।

এবার সুতা ব্যবসার সুবিধার জন্য ম্যানচেস্টার থেকে লিভার-পুল পর্যন্ত আর একটি লাইন চালু হল। এই কাজে স্টীফেনসন্ ছিলেন প্রধান। ডিরেক্টররা স্থির করলেন এই ইঞ্জিন যিনি করতে পারবেন তাঁকে চারশো পাউন্ড প্রাইজ দেওয়া হবে। তাঁরা সময়ও

[শেষাংশ ১৫ পৃষ্ঠায়]

হৃদযন্ত্র প্রসঙ্গে

সরোজেন্দ্রমোহন ঘোষ

একটু এদিক করলে হার্টটিকে Heart যে হার্ট Hurt করা হয় এ খবরটি শিক্ষিত সমাজের কাছে হয়তো বা অজানা নয়। কিন্তু লেখাপড়া যাঁরা জানেন না তাঁদের কাছে বোধ করি এটি আজো অজ্ঞাত রয়েছে। অবশ্য এ খবর জেনে মাত্রাতিরিক্ত সাবধান হওয়ারও কোনো মানে হয় না। অতি সাবধানীদের বেশি গলায় দড়ি পড়ে।

হার্টের বাংলা নাম হল হৃদ্‌যন্ত্র। বিজাতীয় প্রভাবে হার্ট বলতেই আমরা অভ্যস্ত। এই হার্ট নিয়ে কবিতা, গল্প, গাথায় কত যে রসসিক্ত রোমান্টিক কাহিনীর অবতারণা হয়েছে তার শেষ খুঁজে মেলা ভার। অথচ এই হার্টের চেহারা কিন্তু আদৌ গল্প, গাথার স্থান পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

রক্তঘেষা বাদামী রঙয়ের চেহারা। হাত মুঠো করলে যেমনটি হয় এটির আকৃতি কতকটা তেমন ধাঁচের। ন্যাসপাতির আকৃতি-বিশেষ। ওজন করলে ৮ থেকে ৯ আউন্স হয়। হৃদ্‌ধারা (Pericardium) নামক একটি পাতলা আবরণে এটি ঢাকা থাকে।

হার্ট একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। সংকোচন আর প্রসারণের সাহায্যে শরীরের এধার থেকে ওধারে রক্তছড়ানো আর গ্রহণের কাজ করে। সংকোচনের সাহায্যে রক্ত শরীরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেয় আর প্রসারণের মাধ্যমে আবার সেটি টেনে নেয় নিজের থলিতে।

আমাদের বুকের বাঁ ধারে যে ফুস্‌ফুস্‌টি রয়েছে তার মধ্য থেকে দড়ির মতো একটি 'সন্ধিবন্ধনী' হার্টটিকে ঝুলিয়ে রেখেছে। হার্টের গোড়া থাকে বুকের উপর দিকে, মাথাটি ঝুলে থাকে নীচের দিকে বাঁ দিকের স্তনের বোঁটার আধ ইঞ্চি নীচে। এটি হচ্ছে দেহের পাম্প মেশিন। হার্টের মধ্যে চারটি পাম্পঘর রয়েছে। এদের মধ্যে দু'টি পাম্পঘরের দায়িত্ব একটু বেশি। একটি ঘর ফুস্‌ফুসের দিকে রক্ত পাম্প করে আর অন্যটি দরকারমতো সারা দেহে রক্ত ছড়িয়ে দেয়। হিসাব করলে দেখা যাবে হার্ট এভাবে প্রতিদিন প্রায় ৬০,০০০ মাইল রক্ত চালনা করে। এই হারে কাজ করলে একটি পাম্পিং মেশিন ৪০০০ হাজার গ্যালনের একটি ট্যাংক একদিনে অনায়াসে ভরতি করে দিতে পারে।

মুষ্টিযুদ্ধ যাঁরা করেন, তাঁদের হাতের পেশির শক্তি আমরা অনেকেই দেখেছি। অবাক হয়ে ভেবেছি, কি সাংঘাতিক হাতের জোররে বাবা! মুষ্টিযুদ্ধের সময় হাতের পেশির যতটা খাটুনি হয়, তার চেয়েও প্রায় দ্বিগুণ খাটুনি করে হার্ট। হার্টের কাজের সংগে পাল্লা দিয়ে দেহের কোনো পেশী যদি কাজ করতে যেত তাহলে সে পেশীর অন্তিম দশা অনেক আগেই দেখা দিত। শরীরের কোনো পেশীই হার্টের মতো অতোটা শক্তিশালী নয়। অবশ্য মেয়েদের জরায়ু পেশীর শক্তি হার্টের চেয়ে খানিকটা বেশি। কারণ সন্তান ভূমিষ্ঠ করানোর দায়িত্ব ঐ পেশীর ওপরে ন্যস্ত থাকে। তবে এ-কথা মনে রাখতে হবে জরায়ু পেশী সারাজীবনের মধ্যে সাধারণত মাত্র ২/৩ বার সন্তান জন্মদানের সময় শক্তি পরীক্ষা দিয়ে থাকে অপরপক্ষে হার্ট আমৃত্যু একইভাবে শক্তি পরীক্ষা দেয়।

হার্ট একেবারেই বিশ্রাম নিতে পারে না এ-কথা বলা বোধকরি ভুল হবে। হার্টও বিশ্রাম নেয়। কিন্তু কখন? দু'টো স্পন্দনের অর্থাৎ দু'টো পালস্ বিটের মাঝখানের সময়ে। শরীরে রক্ত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হার্টের বাম পাম্পঘরটি এক সেকেন্ডের দশভাগের তিন ভাগ সময় নিয়ে থাকে। এই ফাঁকে হার্ট আধ সেকেন্ড বিশ্রাম নেয়। অন্য একটি সময়েও হার্টের কাজ কিছুটা কমে যায়। যখন আমরা ঘুমোই। ঘুমোনোর সময় রক্ত বয়ে যাওয়ার অনেকগুলি সূক্ষ্মনালী অর্থাৎ ক্যাপিলারিজ অকেজো হয়ে থাকে। ফলে ঐ নালী দিয়ে হার্টকে আর রক্ত পাঠাতে হয় না। স্বভাবতই তখন হার্টের কাজ কমে যায়। এই সময়ে অনেকের পালস্ রেট অর্থাৎ নাড়ীর গতি ৭২ থেকে ৫৫তে নেমে আসে।

যাই হোক এতবড় একটা কাজের কাজির 'ভালমন্দ' তেমন করে আমরা কিন্তু দেখি না। অবশ্য ২/১ জন আছেন যাঁরা আবার খুব বেশি হার্টের কথা ভাবেন। ফলে অনেক সময় বিনা কারণে এঁরা নিজেকে ভাবিয়ে তোলেন। হার্ট সম্বন্ধে বেশি না ভেবে সামান্য একটু সতর্ক হলেই চলে।

অনেক সময় ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে মনে হয়, হার্ট লাফিয়ে চলছে অথবা থেমে থেমে চলছে। এটা হলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যেমন চলছে চলতে দিন। এমনটি হয়েই থাকে। সময়ে সময়ে হার্টের চলাফেরার মধ্যে খানিকটা বেসুরো তাল ফুটে ওঠে। যাঁরা গাড়ী চালান তাঁরা হয়তো লক্ষ্য করেছেন, তাপ প্রজ্জ্বলনের যন্ত্রটির মধ্যেও মাঝে মাঝে এ ধরনের ত্রুটি দেখা যায়। হার্টের মধ্যেও তাপ প্রজ্জ্বলনের শক্তি আছে। নিজেকে সংকুচিত করার সময়ে হার্ট এই শক্তির সাহায্যে প্রেরণা পাঠায়। অনেক সময় এই প্রেরণা বা শক্তি তরঙ্গের মধ্যে তারতম্য ঘটে। প্রেরণার গতি বেশি হলে হার্ট লাফিয়ে চলে, কম হলে থেমে থেমে চলে।

রাতে অনেকে বিকট স্বপ্ন দেখে গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকেন। পরক্ষণেই জেগে উঠে দেখেন বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করছে। হার্টের গতি অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। মনে ভয় ঢুকে পড়ে। হার্ট কেন এভাবে ছুটে চলছে? এটি আর কিছু নয়, ঘুমের ঘোরে যে বিকট স্বপ্নের সংগে আমরা দৌড়োই, হার্টও সেই সময় আমাদের সংগে পাল্লা দিয়ে দৌড়োয়। এই অস্বাভাবিক চলন দেখে মনে ভয় হয় বলে ঐ ভয়ের জন্য হার্ট আরো তাড়াতাড়ি দৌড়োতে থাকে। আমরা ঐ সময়টিতে যদি শান্ত হয়ে থাকি তাহলে কিন্তু ভয় থাকে না। হার্টও শান্ত হয়ে ঠিকমতো স্বাভাবিক নিয়মে চলতে থাকে। এই সময়ে যদি কোনোভাবেই মনকে শান্ত করা না যায়, তবে কানের পেছনের গলার দিকের মাড়ির কাছটিতে আস্তে আস্তে মালিশ করতে হবে। এখানে Vagus Nerve থাকে। এই নার্ভটি অনেকটা ব্রেকের কাজ করে। এটাতে 'ম্যাসাজ' করলে হার্ট শান্তভাব ধারণ করে। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক হয়।

আমরা যখন টেবিলে বসে কাজ করি, তখন হঠাৎ বুকের কাছে অনেকের ব্যথা দেখা দেয়। অমনি আমরা ভয় পেয়ে যাই। ভাবি,

এই ধাঁধা 'হার্ট অ্যাটাক' হল। আসলে হয়তো ব্যাপারটাই অন্য-রকমও! এটা পাকস্থলীতে অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার জন্যও হতে পারে। পেটে বায়ু জমলে এ ধরনের ব্যথা দেখা দিতে পারে। গুরু-পাক খাবার খেলেও এমনটি হতে পারে। হার্টের গোলমালেও অবশ্য প্রথম প্রথম এ ধরনের ব্যথা দেখা দেয়। তবে সেটি সাধারণতঃ অতিরিক্ত খাটুনির পর বা অস্থিরতার পর দেখা দিতে পারে। এই ব্যথার সাহায্যে হার্ট 'সিগন্যাল' দিয়ে সাবধান করে দেয়। হার্ট জানিয়ে দেয়, তোমার এই খাটুনি বা তোমার এই অবস্থার সংগে আমি আর পাল্লা দিয়ে চলতে পারছি না।

এই সব কারণে আগে থেকেই হার্টটিকে তরতাজা রাখা উচিত। কিন্তু কিভাবে আমরা হার্টকে পুষ্টি জোগাবো? অবশ্য এজন্য বেশি কিছু করা লাগে না। কারণ হার্ট নিজের পুষ্টি নিজেই রক্ত থেকে জোগাড় করে নেয়। যদিও হার্টের ওজন শরীরের ওজনের দুশো ভাগের এক ভাগ, তবু পুষ্টির জন্য হার্টের, শরীরে যত রক্ত সরবরাহ হয়, তার মাত্র কুড়ি ভাগের এক ভাগ রক্ত হার্টের দরকার হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, হার্টের চার ঘর থেকে যে-সব রক্ত চলাফেরা করে, হার্ট কিন্তু ভুল করেও সেই রক্ত থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে না। হার্টের যে দুটি করোনারি আর্টারি আছে হার্ট তাদের থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে থাকে। এই দুটি আর্টারিতে কিছুমাত্র গন্ডগোল শুরু হলেই সে দেহের মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়ায়। কেউ জানে না কখন কিভাবে এটা ঘটবে। তবে বিশেষজ্ঞ-দের ধারণা, শৈশব থেকে অথবা অনেক সময় জন্ম থেকেই ঐ করোনারি আর্টারিতে চর্বি জমতে থাকে। ক্রমে ক্রমে চর্বির আধিক্যে আর্টারি বন্ধ হয়ে যায় অথবা আর্টারির মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে স্বাভাবিক রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। এভাবে যখন আর্টারি অকেজো হয়ে পড়ে, তখন হার্টের যে অংশটি এই আর্টারি থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করতো, সে অংশটি পুষ্টির অভাবে অকেজো হয়ে যায়। হার্টের মধ্যে তখন এক ধরনের ক্ষত টিস্যু জন্ম নেয়। এই ক্ষত যত বড় হবে, হার্টের বিপদও তত বেশি হবে।

অনেক সময় খেয়ালের অভাবে হার্ট অ্যাটাক অনেকেই ধরতে পারেন না। কারণ কখন, কোন সময়, কেন বুকে সামান্য একটু ব্যথা হয়েছিল, সে ঘটনা অনেকেই ভুলে যান।

যাই হোক, মোটের উপর হার্টকে সুস্থ রাখার জন্য খানিকটা সতর্ক হওয়া উচিত। এজন্য প্রথমেই দেখতে হবে শরীরের ওজন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে কিনা। প্রতি পাউন্ড অতিরিক্ত চর্বির জন্য হার্টকে অতিরিক্ত খাটুনি করতে হয়। এভাবে রক্তচাপ তখন বাড়তির দিকে এগোয়। সেইজন্য শরীরের ওজন স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতেই হবে। বয়স অনুযায়ী যতটুকু ওজন দরকার, তার চেয়ে বেশি ওজন যেন না হয়।

যাঁরা সিগারেট খান, তাঁরা অজান্তে প্রতিদিন খানিকটা করে 'নিকোটিন বিষ' শরীরে সংগ্রহ করেন। এই নিকোটিন শরীরের আর্টারিকে সংকুচিত করে। এতে চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপের বিরুদ্ধে তখন হার্টকে কাজ করতে হয়। এছাড়া নিকোটিন হার্টকে উত্তেজিত করে। ফলে হার্টের গতি তখন স্বভাবতই বেড়ে যায়। সেইজন্য হার্টকে ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে দেওয়ার জন্য সিগারেটের নেশা ছেড়ে দিতে হবে।

যাদের মেজাজ সব সময় খিটখিটে থাকে, তারাও কিন্তু অজান্তে হার্টকে বিপাকে ফেলেন। কারণ খিটখিটে মেজাজ হলে অ্যাড-রিনালিন গ্লান্ড (Aderenaline Gland) উত্তেজিত হয়। ফলে নিকোটিনের প্রতিক্রিয়ার মত এগুলিও আর্টারিগুলির স্থিতি-স্থাপকতা গুণ নষ্ট করে। আর্টারিগুলি কঠিন হয়। ফলে রক্তের চাপ বাড়তে থাকে। পালস্ রেট দ্রুততর হয়। অতএব আমাদের সব সময়ে খোশমেজাজে থাকা উচিত।

আমরা বিশ্রাম নিলে হার্টও বিশ্রাম পায়। সেইজন্য সময়মতো খানিকটা ঘুমানো হার্টের পক্ষে খুবই উপযোগী হয়। এছাড়া হাল্কা ধরনের মেজাজী বই পড়েও হার্টকে বিশ্রাম দেওয়া যায়।

হার্ট সুস্থ রাখার জন্য মৃদু ব্যায়াম খুব উপকারী। দিনে ১ থেকে ২ মাইল হেঁটে বেড়ানোর অভ্যাস করলে ভাল হয়। এজন্য উঁচুনীচু জায়গায় উঠানামা করলে, যেমন, কোনো বাড়ির ৫/৬তলা ওঠার জন্য সবটা লিফট্ ব্যবহার না করে ২তলা পর্যন্ত হেঁটে ওঠে তারপরে লিফটের সাহায্যে উপরে উঠলেও খানিকটা ব্যায়াম হতে পারে। যাঁদের আর্টারিতে ফ্যাট জমতে শুরু করেছে, এই ধরনের ব্যায়ামে রক্তচলাচলের নতুন গলিপথ সৃষ্টি হতে পারে। তখন হঠাৎ একটা আর্টারি বন্ধ হলেও হার্টের তেমন ক্ষতি হয় না।

খাওয়ার ব্যাপারেও খানিকটা সতর্ক হওয়া উচিত। এমন খাদ্য খেতে হবে যার মধ্যে পরিমিত চর্বি থাকে। বেশি চর্বিযুক্ত খাদ্য সব সময় খেলে উপকারের চেয়ে অপকারের পাল্লা ভারি হবে। অতএব সাধু সাবধান।

[১৩ পৃষ্ঠার পর]

নির্ধারণ করলেন, এটাকে তৈরী করতে হবে ১৮২৯ সালের ১লার মধ্যে, শুধু তাই নয়—ইঞ্জিনের ওজন পাঁচশো পাউন্ড হওয়া চাই ও ঘন্টায় কুড়ি মাইল যেতে পারবে এমন। স্টীফেনসন্ তাঁর ছেলের সহায়তায় অসম্ভব পরিশ্রম করে রকেট নামে একটি ইঞ্জিন তৈরী করলেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য চারটি ইঞ্জিন এসেছিল, বলা বাহুল্য, রকেটই পুরস্কৃত হয়। সালটা ছিল ১৮৩০।

স্টীফেনসন্ যেদিন পুরস্কৃত হলেন, দেশে-বিদেশে উল্কার মত ছড়িয়ে পরল তাঁর নাম। কিন্তু স্টীফেনসন্ যেমন তেমনই রয়ে গেলেন। ছোটবেলাকার সেই সংগ্রামী মন আর মাটির ঘরের গন্ধকে তিনি ছাড়তে পারলেন না। তাইতো দেশের জনসাধারণ যখন তাঁর নামের আগে সম্মানসূচক পদবী যোগ করতে চেয়ে-ছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন,

> "I have to state that I have no flourishes to my name, either before or after and I think it will be as well if you merely say 'George Stephenson'."

আজ ১৯৮১ সাল অর্থাৎ তাঁর জন্ম দ্বিশতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। এই দ্বিশত বর্ষের আলোকে আমরা তাঁকে স্মরণ করব তাঁর আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে—যে আবিষ্কার আজ-ও বয়ে চলেছে লক্ষ কোটি মানুষকে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত।

বাধা

দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঠে এলেই নিবাস অন্য মানুষ। সীতা যে তাকে পইপই করে বলে দেয় তড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবার জন্যে সেটা তার মোটেও মনে থাকে না। অনেক মান-অভিমান, অনেক জেদ আর রাগ দেখিয়েও সীতা তার স্বামীর স্বভাবের পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। ফলে নিবাসের এই আচরণ সীতার কাছে একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু কেবল নিবাস হলেও স্বল্প কথা ছিল। তার সংগে আবার জুটেছে নন্দু। সীতা আর নিবাসের একমাত্র সন্তান। কতই বা বয়স। বড় জোর বছর আষ্টেক। এই বয়সেই ছেলেটা বেশ সেয়ানা। অন্তত নিবাস তাই ভাবে। আর সীতা মুখ ঝামটা দিয়ে বলে—যেমন বাপ তো তার তেমনি বেটা।

আসলে নিবাসের জন্মলগ্নেই বোধহয় বিধাতাপুরুষ কিছু লিখে দিয়েছিলেন। সীতাও সব সময় তাই বলে।

—তোমরা তো ওই জমিটাক বেশি ভালবাসেন। বাড়ি কেন যে আসেন? আর কেহ চাষ করে না।

সীতার কথার উত্তর না দিয়ে হাসে নিবাস। সে জানে সীতা নানা রকম বায়না মাঝে মাঝেই করে থাকে। এই যেমন সিনেমা—সীতাকে সে একদিনের জন্যেও সিনেমায় নিয়ে যেতে পারে নি। আসলে সিনেমার চাইতেও বড় কথা সীতাকে সে দুবেলা পেট ভরে খাবারের আশ্বাসও দিতে পারে না। সিনেমা তো আরো পরে। তার বাপ-ঠাকুরদা সিনেমার কথা শুনলে মূর্চ্ছা যেত। কিন্তু দিন পালটেছে। এখন কৃষকের বউরা সিনেমায় যায়। সীতাও যেতে চেয়েছিল। নিবাসের সময় হয় না। সে সব সময় পড়ে আছে তার জমিতে।

তার জমি বললে কথাটা অস্পষ্ট থেকে যায়। নিবাসের ঠাকুরদার যা ছিল—বাপের আমলে তা কোনদিক দিয়ে যেন উড়ে গেল। ক' বিঘে জমির মালিক নিবাসের বাপ হঠাৎ একদিন দেখল নেই, তার আর কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত কৃষকের যা অবস্থা হয়। শেষ অবস্থা আর কি। তার বাপ হল সেই ক্ষেতমজুর। নিবাসও বড় হয়ে যখন এই ক্ষেতমজুর হবার খাতায় নাম লেখাতে গেল সেই সময় একদিন সরকার থেকে লোক এল তার কাছে। এই গাঁয়ে ভেস্টেড জমি আছে অনেক। সেগুলো বের করা হয়েছে খুঁজে। আর বিলি হবে নিবাসদের মত ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে। সেই বাবুরাই বন্দোবস্ত করেছিল সাত বিঘে জমির। এখন হারানো ছেলে ফিরে পেলে যে আনন্দ হয়, নিবাসের জমি পেয়ে সেই দশা। তার গর্ব, অহংকার—সব এই জমিকে নিয়ে। তার বাপ-ঠাকুর্দার মনে স্বপ্ন, অহংকার আর গর্ব যেমন ছিল নিবাসের মধ্যেও ঠিক তেমনটি। রক্তের ধারা বেয়ে কৃষকের এই অহংকার বয়ে যেতে থাকে কিনা কে জানে!......সে-ও পড়ে থাকে জমিতে। কখনও শক্ত হাতে ধরে লাঙ্গলের মুঠি। আবার কখনও মেতে ওঠে ফসল বোনার কাজে। মই লাগিয়ে জমি করে তোলে বিছানায় পাতা চাদরের মত টান টান। ছেলেটাকে নিয়ে যায় সংগে। সেই সকালে গামছায় পান্তাভাতের হাঁড়ি, লংকা আর পেঁয়াজ বেঁধে—পোটলাটা চাপিয়ে দেয় ছেলের কাঁধে। নিজে তাড়িয়ে নিয়ে চলে বলদ দুটোকে। হাঁটতে হাঁটতে মাঠে এসে পৌঁছয় যখন—সূর্য সবে পূব আকাশে উঁকি-ঝুকি মারতে সুরু করেছে।

জমিতে পা দিতেই কাজ। মাটি যেন আলিঙ্গন করে টেনে নেয় নিবাসকে বুকে। মাটির গন্ধ, ভেজা বাতাসের ঝাপ্টা, কচি ঘাস আর ধানের সুক্ষ্ম গন্ধ নিবাসকে করে তোলে আকুল। খালি গা, লেংটি পরা প্রায় দিগম্বর ছেলেটা বাপের খাবারটা আলের উপর রেখে দিয়েই দৌড়তে থাকে। হাতের ছোট্ট লাঠি নিয়ে তাড়া করে কখনও ঘাস-ফড়িং, কখনও বা মাছরাঙ্গার পিছু। মাঝে মাঝে প্রজাপতি ধরে ধরে গেঁথে রাখে ছোট ছোট কাঠি দিয়ে আলের ওপর।

এই সময় নিবাস কাজ করে একমনে। মাথার ওপর শঙ্খচিলের ধ্বনিময় ডাক—কাজের ফাঁকে ফাঁকে সীতার মুখখানাকে মনে করিয়ে দেয়। সীতাকে সত্যি সত্যি সে ভালবাসে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে সীতা যেন কিছুতেই কথাটা বিশ্বাস করতে চায় না। মুখ বেঁকিয়ে হাসে। অভিমানে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। আর মাঝে মাঝে নিবাসের মনে হয় সীতা যেন অনেক দূরের কোন নারী। তার বলিষ্ঠ বাহুর বাঁধনে ধরা দিয়েও সে কেমন নিস্পৃহ, উদাসীন। বিরক্ত হয়ে নিবাস বলে,

—কি চাস তুই, অমন করিস কেন?

—মোক কি দিবেন বলিছিলেন, মনে নাই? ফিসফিস করে কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে সীতা জিজ্ঞেস করে। এবার বুঝতে পারে নিবাস। সীতার কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল তাকে একটা রূপোর নাকছাবি দেবে বলে। এখনো দিতে পারে নি সে। সীতা সব সময় ঠারেঠোরে নিবাসকে এই কথাটাই বলতে চায়। প্রতিজ্ঞা পালন এখনও করতে পারে নি সে।

মাথার ওপর চক্কর দিয়ে উড়তে থাকে পাহাড় থেকে নেমে আসা পাখির দল। নানা শব্দে জায়গাটার নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে উড়ে যায় দূরে নদীর চরের দিকে। শীতের কন্‌কনে ভাবটা কমতে থাকে। বলদ দুটোকে ছেড়ে দিয়ে আলের ওপর বসে বিড়ি ধরায় নিবাস। ছেলেটা দৌড়তে দৌড়তে অনেক দূরে চলে গেছে। পলকা একটা লাঠি নিয়ে তাড়া করে উড়ন্ত পাখিদের। একমুখ ধোয়া ছেড়ে নিবাস হাঁক পাড়ে

—নন্দু.........বাউরে।

মাঠে মাঠে প্রতিধ্বনি তুলে ক্ষেতের পর ক্ষেত পার হয়ে সে ডাক ছড়িয়ে যেতে থাকে দূরে আরো দূরে। ছেলের কানে সে ডাক পৌঁছতে পিছন ফিরে দেখে নেয় বাপকে। আবার আপনমনে দৌড়তে থাকে মাছরাঙ্গা কিংবা গাঙশালিকের পেছনে।

—এ্যাই শালা, ইপাকে আয়।

আবার প্রতিধ্বনি তুলে কেঁপে কেঁপে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে বাপের শাসানি।

রোদের তাপে জ্বলে ওঠে কখনও মাঠ ঘাট। দূরের বনানীতে

আগুনে লেগে যায় বিনা কারণে। আবার কখনও রোদ হয়ে ওঠে আবেশ ধরানো, মধুর। কখনও আকাশে কালো মেঘের দীর্ঘছায়া মাঠকে ভরে তোলে তরল অন্ধকারে। মেঘের আস্তরণ ভেদ করে নেমে আসে বৃষ্টি। ফসলের প্রাণ। অঝোর বর্ষণে চলতে থাকে মাঠের কাজ। ফাটলধরা মাটির তৃষ্ণার্ত মুখ আকণ্ঠ পান করে বৃষ্টির ফোঁটা। মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে যায় কয়েকটা কাক। ভিজতে ভিজতে, চীৎকার করতে করতে। নিবাস আর তার ছেলে কিন্তু তখনও ভিজেই চলে মাঠে।

সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে বাপ-বেটা। নন্দুর সারাদিনের ফসল ক'টা প্রজাপতি, কিছু ঘাসফড়িং আর ক'টা কাচ-পোকা পড়ে থাকে উঠোনের এককোণে। লম্ফর ম্লান আলোতে বাপ-বেটা একসংগে খেতে বসে। একসংগেই বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। ছেলেটা ঘুমতে না ঘুমতেই কাদা।

রাতে নিবাসের পাশে শুয়ে সীতা খানিকক্ষণ উসখুশ করে। নিবাসের পিঠ চুলকে দিতে দিতে আস্তে বলে

—এবার ফলন ভালই হবে, কি কহেন?

—কে বলে?

—বীরুবাবু আসছিল, উনি তো কহিলেন।

কহিল ছেলের বাপটা খুব ফসল ফলাইছে রে?

—ওই শালা ইদিকে আসে কেন? শালা মোর পাছে কেন যে লাগে।

বীরুর কথা শোনামাত্র মাথায় রক্ত চড়ে যায় নিবাসের। এই লোকটাকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। এ গাঁয়ের মাতব্বর। কোন্‌কালে ওর বাপ এখানে এসেছিল কাপড় ফিরি করতে। আস্তে আস্তে জমি হল। নামে বেনামে। বীরুর বাপ মারা গেছে কবেই। কিন্তু বীরু আছে। বাপের চাইতেও করিৎকর্মা। নিজের জমির সীমানা বাড়ানো আর টাকা উপায় তার ধ্যান। থলথলে মুখ, পরণে চেক লুঙ্গি, মস্ত একটা ভুঁড়ি—চেহারাটার মধ্যে ভীষণতার আভাষ মূর্ত করে তোলে। গালে মাংসের পরিমাণ বেশি থাকায় চোখ দুটো সব সময় কুৎকুৎ করে। সামনের পাটির একখানা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। ওটা দেখাবার জন্যেই বোধহয় বীরু কারণে অকারণে হেসে ওঠে। নিবাস জানে বীরু বহুদিন থেকেই জমিটা তাকে ছেড়ে দিতে বলছে। এ জমি নাকি নিবাস কোনদিন ধরে রাখতে পারবে না। সরকারী জমি হলেও না। অনেক মিষ্টি কথা, নানান ছলনা, নানা আশা বীরু তাকে দিয়ে আসছে দেখা হলেই। ওই সাত বিঘে পেলে বীরুর আশেপাশে অন্যের জমি বলতে আর কিছু থাকবে না।

এতদিন এ-সব কথা মোটেই কানে তোলে নি নিবাস। কিছুদিন আগেও তালমার হাটে দেখা হয়েছিল বীরুবাবুর সংগে। চায়ের দোকানে চেক চেক লুঙ্গিপরা সেই এক দৃশ্য। গায়ে নাইলনের হলুদ গেঞ্জি। গেঞ্জি ভেদ করে ভুঁড়িটা বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিবাসকে দেখামাত্র হাঁক পাড়তে থাকে বীরুঃ

—নিবাস, ও নিবাস, শুনে যা কনেক, বাউ।

আরে শোন শোন যাস কোথা।

দাঁড়াতে হয় নিবাসকে। প্রথম প্রথম এটা সেটা। ঘর আর পরিবারের খবরাখবর। নিবাসের বাবার সংগে বীরুবাবুর কত হৃদ্যতা ছিল এইসব। অবশেষে ধীরে ধীরে জালগোটানোর মত সন্তর্পণে কথাটা পাড়ে।

—আজকাল জমি পোষা আর হাতি পোষা সমান রে। তুই কেমন করিরা জমি করিস তা তো ভেবে পাই না।

—পারি আর কই? ওই কোন গতিকে চলি যার।

—এক কাম কর নিবাস, বীরুবাবু জালটা পুরোপুরি গুটিয়ে নিয়ে বলে

—জমিখানা মোকে দিয়া দে। আমি দাম দেব। চাষ করবি তুই। কোন অসুবিধা হবে না। এখন যেমন চাষ করিস তখনও করবি।

কিন্তু এ সর্বনাশা কথায় নিবাস মোটেই আমল দেয় নি। ও প্রসঙ্গেই আর ফিরে যেতে চায় নি।

—মোর কাম আছে বাবু, আমি যাই।

—তাহলে কি ঠিক করলি।

—জমি আমি দিব না। জমিন তো মোর মা হয়। আর কথা না বাড়িয়ে নিবাস সোজা হাট থেকে রওনা দিয়েছে। বীরুর কুৎকুতে চোখের ক্রুর-কুটিল দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করেই। পেছন থেকে বীরু অবশ্য শান্ত, নিরুত্তাপ গলায় বলেছে

—বাড়ি ফিরে ভাবি দেখিস, নিবাস, বাপ আমার।

রাগে নিবাস জবাব দিতে পারে নি কথাটার। ও কথার আবার জবাব কি? জমি তার নিজের। কত পুরুষের চাষী তারা। হতে পারে তার বাবার কোন জমি ছিল না। কিন্তু কত পুরুষ ধরেই তাদের জমির সংগে সম্পর্ক। বাবা যে জমি রাখতে পারে নি আজ কপালগুণে তা ফিরে পেয়ে নিবাস ছেড়ে দেবে এত মূর্খ সে নয়। এখন এ জমি তো তার মায়েরই মতন। নিবাস ভাবে সে একদিন থাকবে না। তখন চাষ করবে তার ছেলে। তারপর তার ছেলে। তারপর......

এভাবেই নিবাসের উত্তরাধিকারীরা জমির সম্মান দেবে। আর পরিবর্তে মাটি দেবে ফসল আর বাঁচবার যাবতীয় উপকরণ।

মাথার ওপর উড়বে শঙ্খচিল। বুনোহাঁস আর গাঙশালিকের দল সেদিনও জলের খোঁজে উড়ে চলবে পশ্চিমের বিস্তীর্ণ জলার দিকে। দুপুরবেলা চিলের একটানা চীৎকারে তারাও আনমনা হয়ে তাকাবে আকাশের দিকে। লাঙ্গলের মুঠি আলগা করে একপলক দেখে নেবে চিলগুলোর ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে ওঠা-নামা। আবার লাঙ্গলের মুঠিতে হাত বসবে শক্ত হয়ে। কচি ধানের বুকে বাতাসের ঢেউয়ে জাগবে আশা।

আজ বীরু আসবার খবর শুনে নিবাসের ঘুমঘুমভাবটা নিমেষে উবে গেল। অন্ধকারে সীতার দেহে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে উঠল

—শালাকে কি বললি তুই?

—বললাম তোমরা বাড়িতে নাই।

—শালা আর কুনদিন আসিলে ঘর ছাড়ি বাহির হবি না।

কদিনবাদে এক সকালে নিবাস ছেলে নন্দুকে নিয়ে হাজির হল জমিতে। নিড়ানি লাগাতে হবে। শেষ নিড়ানি দেওয়ার চিন্তা করছিল সে। জমির সীমানায় এসে চোখ জুড়িয়ে যায় নিবাসের। কি সুন্দরই না হয়েছে ধানগুলো। ছড়াও বেড়িয়েছে তেমনি। নন্দুকে ছেড়ে দিয়ে জমির পেছনে লেগে পড়ে। রোদটা বড় মিঠে। হলুদ হালকা রোদে চান করতে করতে নন্দু আলের ওপর দিয়ে দৌড়ে বহুদূর চলে যায়। নিবাস মাঝে মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখে নেয় ছেলেকে। মাঝে মাঝে গালাগাল দিয়ে ডাকে।

হঠাৎ দূরে বীরুবাবুর চেহারাটা ভেসে ওঠে। আলের ওপর দিয়ে থলথলে মাংসের স্তূপ এগিয়ে আসছে তারই দিকে। শেষ পর্যন্ত তার জমির কাছে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ে বীরুবাবু। দুইগালে সেই কুৎসিৎ হাসি। চোখ দুটো ঢাকা পড়ে যায় মাংসের আড়ালে। ফসলের বাহার দেখে বীরু তারিফ করে নিবাসের।

—তোর জমির ধান বড় খাসা হইছে রে। বড় সুন্দর। তুই শালা যাদু জানিস নাকি?

—কি যে কহেন, বাবু। সংক্ষিপ্ত উত্তর নিবাসের ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে। বীরুবাবুর আলাপের পরিণতি কোথায়

গড়াবে জানতে বাকি নেই তার। অবশেষে নিবাসের আশংকাকে সত্যি করে বীরু জিজ্ঞেস করে—

—তোকে যে বলছিলাম। কি করলি তার? জমিখানা তো ভেস্টেড। সরকার তোকে দিছে। তুই এবার আমায় দে। না না, চাষ-আবাদ সবই তুই করবি।

—ও হয় না বাবু। আমি তো আপনাকে বলেই দিছি। মাটি মোর নয়। সরকার যখন হিসাব চাহিবে।

উত্তেজিত হয়ে ওঠে বীরু। কুৎকুতে চোখে হিংস্রতা। উত্তেজনা-হীন কণ্ঠেই বলে—আরে সরকার তো অমন কত দেয়। কে তার হিসাব রাখে বল্? এ গাঁয়ে তো সরকার থাকবে না। থাকব তুই আর আমি। আমার সুখ তুই দেখবি—তোরটা আমি। কেমন, ঠিক বলি নাই? তবে না মোরা মানুষ।

বীরু আর দাঁড়ায় নি। সম্ভবত রাগটা চাপা আর সম্ভব হচ্ছিল না।

এবার রাগ চড়তে থাকে নিবাসের। সুন্দর এই সকালটা যেন তেতো বিস্বাদ হয়ে ওঠে তার কাছে। ছেলেটাকে কাছে ডেকে চড় কষায়। সবুজ ফসলের মাঝে নন্দুর কান্না পরিবেশটাকে করে তোলে বিষণ্ন। দুপুর গড়াতেই জমির কাজ ছেড়ে উঠে পড়ে নিবাস। আলপথ দিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বীরুর কথাগুলো ভাবতে থাকে। তার এই হয়েছে এক জ্বালা। বীরুকে মুখের ওপর কিছু বলে দেওয়া যায় না। গাঁয়ের মাতব্বর। ওর সাঙ্গ-পাঙ্গরা আরো নিষ্ঠুর আরো ভয়ংকর। আবার দিনের পর দিন ওর কথাগুলো হজম করে যাওয়াও যেন নিবাসের পক্ষে অসম্ভব। জোর করেই নিয়ে নিতে চায় জমিটাকে। আজ বীরু মিষ্টিকথা বলছে। দু'দিন পর আর তা বলবে না। হয়ত সরাসরি জমিটা দখল করে বসবে। কিংবা রাতারাতি খুন করে তিস্তার জলে ভাসিয়ে দেবে সমস্ত পরিবার সুদ্ধ। বীরুর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। এগুলো ভাবতে গিয়ে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে নিবাসের। কোন কিছুরই যেন তল খুঁজে পায় না সে।

বাড়িতে এসেও ভালো করে খেতে পারে না। সীতা ছেলেটাকে খাইয়ে দিয়ে দাওয়ায় এসে স্বামীর কাছে বসে। অন্ধকারে, নিঃশব্দে নিবাসের পিঠে আলতো হাত রেখে জিজ্ঞেস করে—কি হইছে তোমার। শরীর খারাপ?

উত্তর দেয় না নিবাস। বীরু তাকে উত্তেজিত করে তুলেছে। সীতার কাছে সে কথা কিছুতেই প্রকাশ করতে চায় না।

—কিছু না।

—ঘুমাবেন না।

—তুই যা। আমি পিছে যাব।

সীতা বোঝে নিবাসের মনে কোন একটা কিছুর দ্বন্দ্ব চলছে। খানিকটা আঁচ করলেও তার সংগে যে বীরুবাবুর এত কথাবার্তা হয়েছে নিবাস কোনদিনই তা বউয়ের কাছে প্রকাশ করে নি।

মস্ত টিনের চালওয়ালা বাড়ি বীরুর। ঢোকবার মুখে বৈঠক-খানা। ওইখানে বসে চলে গোপন পরামর্শ। লোকজনের ভীড় লেগেই আছে। এ গ্রাম সে গ্রামের নানা খবর ঘরে বসেই পায় সে। আশেপাশের গ্রামে কি ঘটছে না ঘটছে সব তার নখদর্পণে। ইদানীং এ অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে যে থমথমে ভাব এটাও সে লক্ষ্য করেছে। কাজেই এ মুহূর্তে নিবাসের জমিটা নেয়া ঠিক হবে কিনা চিন্তা করে সে।

ইতিমধ্যে নিবাসের কাছে লোকও পাঠিয়েছে। ন্যায্য দামে কিনে নেবে একথাও বলেছে বীরু। কিন্তু নিবাস টলে নি কোন কথাতেই। সেদিন নিবাসের বাড়ি থেকে ফিরে এসে লোকগুলো এ খবর দিতেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে বীরু।

—কি কহে শালা, দাম দিলেও দিবে না।

—না।

—ঠিক আছে দেখি দেয় কি না দেয়। তোরা আমার পিছে আছিস তো?

লোকগুলোর সম্মতি পেয়ে আশ্বস্ত হয় বীরু। ও জমি তার চাই যে করে হোক। ওটা তার দরকার। পরিবার বড় হচ্ছে। ছেলেরা নিজেদের ভাগে যাতে কিছু কিছু জমি পায় তার ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। দরকার হলে ছিনিয়ে নিতে হবে ওই সাত বিঘে।

মাঠের কাজ শেষ করে নিবাস মেতে ওঠে ঘরের কাজে। অনেক-দিন চালাটা ঠিক করা হয় নি। খড়ের ঘর। ক'বছর ধরে খড় পালটানো হয় নি। চালটা থেকে খড় উড়ে গিয়ে বাঁশের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। আকাশের খোলা চেহারা ঘরে বসেই দেখা যায়। সেদিন খড় ছাওয়ার কাজ করছিল সে চালে উঠে। দূর থেকে বীরুকে আসতে দেখে বিরক্তিতে মুখখানা কুঁচকে ওঠে তার। কঠিন হয়ে ওঠে মুখের পেশী।

এদিকেই আসছে বীরু। পরণে চেক লুঙ্গি। গায়ে নাইলনের গেঞ্জি। হাতে ছাতা। ভুঁড়িখানা বেঢপ হয়ে ফুলে আছে। নিবাসের চালার সামনে এসে মুখ তুলে বীরু একটু জোরের সংগেই বলে—কি করিস নিবাস।

—দেখছেন না। এই কনেক কাম-কাজ করি।

—আরে নামি আয়। দুইটা কথা কহি।

—কি আবার কথা। কহেন। ওখান থেকে কহেন না।

—কি ঠিক করলি?

—কেন আপনি অমন করেন? আপনার জমি কি কম আছে? আমারটা না পাইলে চলিবে না? আমি ও দিব না বীরুবাবু। কতবার বলিছি মাটি আমার না হয়। রীতিমত উত্তেজিত নিবাস। আজ বীরুর চোখের দিকে তাকিয়ে যুদ্ধ করে যায় সে। নিবাসের দৃঢ় উত্তরে থমকে যায় বীরু। একটু থতমত খেয়ে বলে—বাব্বা, খুব কথা শিখেছিস, রে। আচ্ছা, আচ্ছা, বাপের মাটি ভাল করিয়া চাষ করিস। বলে অপেক্ষা না করে দ্রুত হাঁটতে থাকে। চলতে চলতে অকারণ ছাতাটা খুলে মাথায় ধরে। ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে শরীর। শালার কুলোপানা চক্কর দেখলে—মনে হয় কেউ-কেটা একখানা। সেও জানে কি করে এদের শায়েস্তা করতে হয়। আল-পথের ওপর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে যেতে এক সময় মন্থর হয়ে যায় তার পায়ের গতি। নিবাসের জমির কাছে এসে পড়েছে সে। ফসলের এমন মোহন রূপ মুগ্ধ করে তোলে বীরুকে। কয়েক-মুহূর্ত আগের কথাকাটাকাটির স্মৃতি ভুলিয়ে দেয় নিবাসের ক্ষেতের চেহারা। বীরু অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। মনের চিন্তা আবার ডানা মেলতে সুরু করেছে তার। আসল কথাটা বুঝেছে সে। নিবাস যাদুকর নয়। কিন্তু জমির ভাষা তার মত বোধহয় আর কেউ বোঝে না। কাজেই ও জমি দখল করে নিতে পারলে ক্রমে নিবাসকেও মুঠোয় পাওয়া সহজ হবে। সবটুকু জমিতে ওকে দিয়েই ফলিয়ে নেবে সোনার ফসল। অতএব বীরু পরিকল্পনাটা আবার ঝালিয়ে নেয় মনে মনে।

কিন্তু আজকাল সময় বড় জটিল হয়ে উঠছে। সমস্ত অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে চলছে কি একটা গোপন বোঝাপড়া। চারদিকে অবস্থা থমথমে। আর এই জিনিসটাকেই সে সব চাইতে বেশি ভয় করে। চাষী আর ক্ষেতের মজুর এরাও জোট বাঁধছে। একটি-দুটি করে মৌচাকের মাছির মত ওরা ভন্‌ভন্ করে। এসব দেখেই বীরুর মনে অস্থিরতা। আর এদিকে লোভকেও তো কিছুতেই

দমন করা যায় না। এই দোটানার মধ্যে পড়ে বীরু না পারে এগুতে না পিছোতে।

আশ্বিনের শেষে ধানে পাক ধরতেই সীতা মনে করিয়ে দেয় নিবাসকে। সীতা জানে এখন থেকে ঘনঘন মনে করিয়ে দিতে হবে নিবাসের প্রতিজ্ঞার কথা। এবার ফলন খুব ভালো। তাই আগে-ভাগে দাবীটা পেশ করে সীতা।

—হবে হবে। এবার তোকে দিবই যেমন করিয়া হউক। সীতা হাসে। হাসতে হাসতে বলে—মনে যদি না থাকে তোমার?

—মনে থাকে কি না থাকে দেখতে পাবি। নন্দুর দিকে তাকিয়ে নিবাস হাঁক পাড়ে—বাউরে, বিড়িখানা ধরায়ে আন।

ছেলে বিড়িটা মুখে দিয়ে ধরাতে চলে যায়। সেই ফাঁকে নিবাস বলে—বাউটাক এবার স্কুলে দিবার লাগে।

হেসে লুটিয়ে পড়ে সীতা।

—বাউটাক ভদ্দরলোক করিবেন নাকি? পড়ালেখা করিলে ভাটিয়া বনি যাইবে। তখন? জমিতে আর যাবে না?

পূর্ববঙ্গ থেকে যারা এখানে এসে বসবাস করছে তারাই ভাটিয়া। সীতা এদের কথাই বলে। ভাটিয়ারা তার মতে মোটেই ভালো লোক নয় যেমন বীরুবাবু।

হেমন্তের সুরুতে ধান পাকতে সুরু করলে নিবাস প্রস্তুত হয় ফসল তোলবার জন্যে। আগের দিন রাতে সীতাকে সে বলে—কাল ধান কাটা হবে। তুই খাবার নিয়ে যাস মাঠে। সীতা রাজী হয়েছে।

সোনালীরোদ ছড়িয়ে পড়বার সংগে সংগে নন্দুকে নিয়ে রওনা হয় নিবাস। হলুদরঙের চাদর বিছানো কাছে দূরের সমস্ত মাঠে। আকাশ ভেঙে রোদ ঝরছে, ছড়িয়ে পড়ছে ঝরনার মত। হাসছে সমস্ত প্রকৃতি। মাথার ওপর পাখিদের উল্লাস। ঘাসের ওপর পায়ের আঘাতে ছিটকে পড়ছে শিশির। লাফ দিয়ে ধানক্ষেতে লুকিয়ে পড়ছে ফড়িং। সোনালী ধানের শিষের ওপর নানাবর্ণের প্রজাপতি পাখা মেলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁপছে। নিবাস এখন নিশ্চিন্ত। কালরাতেই কৃষকদের সভায় বীরুবাবুর সমস্ত কাহিনী বলে এসেছে সে। সবাই নিবাসকে ভরসা দিয়েছে। বিপদের দিনে নিবাসের পাশে দাঁড়াবে সবাই প্রতিজ্ঞা করেছে।

বাপের পেছনে ছেলে। মাঝে মাঝে পড়ে যাচ্ছে অনেক পেছনে। বাধ্য হয়ে নিবাস দাঁড়িয়ে পড়ে। পিছন ফিরে রেগে হাঁক মারে—শালা, তাড়াতাড়ি আসিবার পারিস না। বাপের ধমকে আবার দৌড় সুরু করে নন্দু।

ক্ষেতের কাছে আসতেই বীরুকে দেখতে পায় নিবাস। এতক্ষণ আলের আড়ালে বসেছিল। বোধহয় অপেক্ষা করছিল তার জন্যেই। বীরুকে ওভাবে দেখতে পেয়েই ধক্ করে ওঠে বুক।

—তুই আজ ধান কাটবি, আমি খবর পাইছি, রে। হাতের দোনলা বন্দুকটা মাটিতে ভরদিয়ে বলে ওঠে বীরু।

নিবাসের চোখের সামনে কেঁপে ওঠে পৃথিবী। তাকিয়ে দেখে বীরুবাবুর লোকগুলো তারই জমির ধান কেমন ধীরেসুস্থে কেটে আঁটি বেঁধে রেখে দিচ্ছে এক জায়গায়।

এক মুহূর্ত। লাফ দিয়ে নিবাস মুখোমুখি হয় বীরুর চেলা-দের। ধ্বস্তাধ্বস্তি, চীৎকার। মুখের ওপর পড়তে থাকে ঘুষি। আলের ওপর দাঁড়িয়ে বীরু বলে—ছাড়বি না শালাকে। বাপ্পোৎ, এত তেল!

হৈ-চৈ আর চীৎকারে আকৃষ্ট হয় নন্দু। এতক্ষণ সে ফড়িং ধরে বেড়াচ্ছিল। বাপের ওই অবস্থা দেখে ছুটে আসতে থাকে। দাঁড়ায় গিয়ে লোকগুলোর একেবারে কাছে। ছোট্ট দুই মুঠি তুলে জোয়ান, ষণ্ডালোকগুলোকে কিল মারতে থাকে নন্দু। চীৎকার করে বলতে থাকে—ছাড়ি দেন, ছাড়ি দেন মোর বাপক।

আজই প্রথম বাইরের রূঢ় পৃথিবীর সংগে পরিচিত হবার সংগে সংগেই কে যেন তার মুখে জুগিয়ে দেয় প্রতিবাদের ভাষা।

কবিতা

হাঁক দাও

দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

বিবর্ণ দিন। হতাশ কান্না। কি হবে? চিন্তা এই।
মুমূর্ষু রাত। বোবা ক্ষুধা মরে। হাঁড়ি ফুটো—চাল নেই।
ডাল পাতাহীন। ঘুমসজ্জায় ব্যস্ত সবাই না কি?
সাড়াও পাই না? ফিসফিস চুপ। চঞ্চল কই আঁখি?

হায়রে এ দেশ। জীবনের শেষ, মুকুল পূর্বাভাসে।
শিশু যৌবনে ভংগুর বীণা দুখের দীর্ঘশ্বাসে।
প্রতি একশয় নিরানব্বই ব্যর্থ অর্থহীনে।
অকাল মৃত্যু নিঃসাড়ে আনে অবাক সর্তহীনে।
কি করে বাঁচব? সময় খারাপ। আলাপের ফাঁকে ফাঁকে.
বেকার বন্ধ্যা বুভুক্ষু প্রাণ অগুণতি ঝাঁকে ঝাঁকে।
আলোচনা নীল, পথ নেই কোন নিদারুণ অভিশাপ।
অপরাধ কার? কে করছে এই? নেই তার কোন মাপ।

শপথ আগামী দিনের শান্ত সুনীল আকাশ নীচে
প্রস্তুত হও অগ্রণী হও থেকো না যেয়ো না পিছে।
ভেঙে ফেল বাধা। জ্ঞাত অজ্ঞাত ঘৃণ্যকে দূর কর,
সুদীপ্ত হাঁক : বজ্র মুষ্ঠি : জমা রোষ ফেটে পড়ো।

ছিন্নভিন্ন

দেবাশিস প্রধান

ভারবাহী পশুর মতো টানতে টানতে, ক্লান্তির শরীর
বেয়ে তরতরিয়ে ঘাম,
হৃদয় নিয়ে ফেরিঘাটে পাড়ি দেওয়া
দুঃখীর প্রাত্যহিক কাজ!

স্বজন তোমার কেউ কি আছে?
যখনই আপন ভেবে ঘরমুখী হও
সব্বাই মধুর হাসি-হেসে—দূরে চলে যায়
আন্তর প্রদেশ জুড়ে বিষময় কণা,
পড়ে থাকা সারাটি জীবন?

দু'হাতে মাথা রেখে ফল নেই
মুষ্টিবদ্ধ হাতে ভেঙ্গে দাও কোমল স্বপ্ন...
ঘরসংসার প্রিয় স্বজনবিলাসী
কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে বে-পথু পথিক।
আহা! কান্না থামাও
এইবার শুরু হোক্ স্বজনবিরোধ
ক্ষয়রোগে তিরিশ বসন্ত গেছে যাক্
ঘরশত্রু বিভীষণদের আছাড় দাও
মারো, কুচি কুচি করে ছুড়ে দাও ডাস্টবিনে.
এমন ধ্বংসকালীন আকালের দিনে
দেখাও ছিন্নভিন্ন প্রজ্ঞা, রক্তাক্তশরীর
শরীর ভেজা পোশাক, আর আরক্ত গোলাপ!

শৈশব দিন

শমীন্দ্র ভৌমিক

কে নিয়েছে বয়স? আমার কে নিয়েছে বয়স?
বাবার পিঠে ঘোড়া এবং মায়ের লুকোচুরি—
দিদির হাতে রান্নাবাটি বালক দিনের কথা,
উড়িয়ে নিয়ে গেছে আমার নীল আকাশের ঘুড়ি।

আম কুড়োবার ধুম ও ভাই আম কুড়োবার ধুম;
বৈশাখী ঝড় উড়োয় ধুলো ঝরায় গাছের পাতা—
পল্টু গোরা তিলু এবং দুর্গা গেছে ঝিলে,
ভাইটি আমার পদ্য লেখে সবুজ গড়ন খাতায়।

লাল সাটিনের জামা, আমার লাল সাটিনের জামা—
যেমন ছিল তেমন কেন ছোটই আছে খালি;
হাত ঢোকে না হাতায় কেমন বড় হওয়ার ম্যাজিক
শৈশব দিন ভাল্লাগে, তুই কোনখানে পালালি?

আর পড়ে নেই, নেই যে আমি সহজপাঠের ছড়ায়,
পাঠশালাতে আসন পেতে বর্ণ পরিচয়ে—
নীল নোটিশে গাঁ ছেড়েছি এখন পথে ঘাটে;
মানুষ যেমন হারিয়ে থাকে বনমানুষের ভয়ে॥

ভুল পথ

কিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

ফুটো হাঁড়ি পড়ছে জল
তবু সব 'বিলেত' চল!
দন্ত যদি হয়রে ডাট
থাকে বজায় সকল ঠাট!
নামের আগে 'মিস্টার'
কিম্বা যদি 'সিস্টার'
লাগাও
চড়বড়িয়ে বাড়বে দাম (?)
ইচ্ছেমতো হাঁকাও।
কিন্ডারগার্টেন
পড়াশুনা সার্টেন (?)
বাংলা জানা ভেতো
মানুষ নয় সে তো (?)

এটাই দেখি চলছে হাল
হ'চ্ছে সব ফল মাকাল।
আপন ছেড়ে পরের দোরে
ঘুরছে যে সব মদের ঘোরে।
'নিজের জেনে পরের জানো'—
মাপকাঠিটা একেই মানো।
যাচ্ছে ভুলে সত্যিটা
তাই জোটে না পথ্যিটা।

পেশাদার যাত্রা জগৎঃ কিছু সমস্যা

মধু গোস্বামী

যাত্রা-ব্যবসা ইঁটের ব্যবসার মত। মরসুমে অতিবৃষ্টি হোলেই যাত্রাদলের মালিকদের লাভের অংকে টান পড়ে। ইঁটখোলার মালিকরা সেই কম লাভের ক্ষতি পুষিয়ে নেয় পরের বছর ইঁটের দাম বাড়িয়ে, কিন্তু, ইঁটের মত যাত্রা মানুষের জীবনে অতোখানি প্রয়োজনীয় নয়, তাই পরের বছর যাত্রামালিকদের ইচ্ছে থাকলেও সুদে-মূলে কম-লাভের ক্ষতি উশুল করে নেওয়া সব সময় সম্ভব হয় না।

চলতি বছরে যাত্রার মরসুম অনেক সংক্ষিপ্ত হোয়ে গেছে বৈশাখী-বাদলের আক্রমণে, তাই খানিকটা বাধ্য হোয়েই যাত্রাদলগুলি আগামী মরসুমের প্রযোজনার কাজে হাত লাগিয়ে দিয়েছে খুব তাড়াতাড়ি। ফুটবল জগতের মত দলবদলের পালা সুরু হয়ে গেছে যাত্রাজগতে।

দলবদলের পর নতুন দলের সাফল্যের পূর্বাভাষ এবং আগামী প্রযোজনা নিয়ে ইতিমধ্যেই দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায়—'যাত্রা কলমে' লেখালেখি, এবং ঢাউস ঢাউস বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছে। গবেষণা সুরু হয়ে গেছে যাত্রাপাগল নায়ক ও দর্শকদের মধ্যে। বড় বড় দলগুলো যথারীতি আগামী মরসুমের জন্যে বায়না পেতেও সুরু করেছে।

এইসব রুটিনমাফিক খবরের তলায় আগের মতই চাপা পড়ে যাচ্ছে আসল সমস্যাগুলো—যাত্রাজগতের নাড়ীর পাকে পাকে সে সমস্যাগুলো ক্রিমিকীটের মত জড়িয়ে আছে।

সে সমস্যাগুলোর মধ্যে দু'একটি বিষয়ে আলোচনা করার জন্যই এই প্রবন্ধের সূত্রপাত।

(১) যাত্রা-অফিস (গদীর) সাধারণ কর্মীদের বেতন, ছুটি ও ভবিষ্যতের সমস্যা।

(২) কম বেতনের সাধারণ শিল্পীদের বেতন ও ভবিষ্যতের সমস্যা।

(৩) আধুনিক যাত্রা-পালার গতি-প্রকৃতি।

যাত্রাজগতের সাধারণ কর্মী বলতে বোঝায় ম্যানেজারদের বাদ দিয়ে—বাকী যাঁরা অফিসের কেরাণীর কাজ থেকে জুতো সেলাই চণ্ডীপাঠ অবধি করেন।

এ'দের বেতনের অবস্থাটা হোলো সর্বনিম্ন ২০০·০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৪০০·০০ টাকা অবধি। অসুখ না করলে, কামাই না করলে সারা বছরে এ'দের কোন নির্দিষ্ট ছুটির ব্যবস্থা নেই। সকাল থেকে রাত্রি অবধি এদের কাজ করতে হয়। ৮ ঘণ্টার চুক্তি যাত্রাজগতে কার্যকরী নয়। এ'দের কোন শিল্পীদের মত অগ্রিম পাবার ব্যবস্থা নেই, নেই বোনাস, কি প্রভিডেন্ট ফান্ড। এ'দের ছুটি, এ'দের বেতন, এ'দের কাজের সময়, এ'দের অগ্রিম বা বোনাস সবই নির্ভর করে ব্যক্তি মালিকের খেয়ালখুশী, ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর। এ এক আজব জগত! সরকারী সপ এস্ট্যাবলিসমেন্ট এ্যাক্টের গতিরুদ্ধ এখানে, এমনকি, জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকারও যাত্রাজগতের সাধারণ কর্মীদের জীবন-জীবিকার স্বার্থ সম্পর্কে আপাত মৌন। আর, ব্যবসা-জগতের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানে নেই কোন সাধারণ কর্মীদের দাবী আদায়ের সংস্থা।

(২) প্রায় একই আর্থিক-অবস্থা যাত্রাজগতের ছোট শিল্পীদের। দল যতদিন চলে ততোদিন মাসের মাহিনার হিসাবে এ'দের দৈনিক বেতন। দল বন্ধ হোলেই এ'রা বেকার। যদিও এ'দের অগ্রিম পাবার ব্যবস্থা আছে, তবু, বেতনের সংগে সংগতি রেখে সেই অগ্রিমের অংকটা এতই কম যে তাই দিয়ে দীর্ঘ তিন/চার মাস বেকার অবস্থায় থেকে সংসার চালান সম্ভব নয়। এ'দের কোন প্রভিডেন্ট ফান্ড নেই। নেই কোন সংগঠিত সংস্থা—যার মাধ্যমে এরা দাবী-দাওয়ার লড়াই চালাতে পারেন। এই ক্ষেত্রে পূর্বে কিছু প্রচেষ্টা দেখা গেলেও, বর্তমানে সেই প্রচেষ্টা একেবারে অনুপস্থিত।

(৩) আধুনিক যাত্রা-পালার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে এই ক্ষেত্রে যাত্রামালিকদের একটাই সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি—দর্শকরা যেমনটি চায়, তেমন পালা বেঁধেই ব্যবসা করতে হবে। যেহেতু আজকের পশ্চিম বাংলায় প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা কিছুটা পায়ের তলায় মাটি পেয়েছে, তাই কিছু কিছু দল সেই দিকে লক্ষ্য রেখে প্রগতিশীল পালা বাঁধার চেষ্টা করছে। একটি বিশেষ দল বাদে, মনে হয়, বাকী দু'একটি দল যাঁরা বর্তমানে প্রগতিশীল পালা বাঁধায় মন দিয়েছে, তাঁদের কাছে আদর্শের চেয়ে এই 'বিশেষ বাজার'টির আকর্ষণই বেশী। নাম না করেই বলা যায় উৎপল দত্তের পালা ও পরিচালনায় এক সময় এক একটি দল প্রগতিশীল প্রযোজনায় মাতে, উৎপলবাবু সরে গেলেই সে দলগুলির গা থেকে প্রগতিশীলতার নামাবলী খসে পড়ে।

তবুও, তুলনামূলক বিচারে আধুনিক যাত্রাপালা প্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল যাত্রাপালার স্থান অতি নগণ্য। এর পিছনে যেমন আছে যাত্রামালিকদের শ্রেণীদৃষ্টি, বড় বড় সংবাদপত্রের শ্রেণীদৃষ্টি ভঙ্গিগত বিরোধিতা, তেমনি আছে, সাধারণ যাত্রা-পালার দর্শকদের নিম্নমানের সাংস্কৃতিক-চেতনা। শেষোক্ত সমস্যাটাই সবচেয়ে ভাবনার বিষয়।

যাত্রার বাজার মূলতঃ গ্রামবাংলা এবং মফঃস্বল শহরকে ঘিরে। এর মধ্যে গ্রামবাংলার স্থানই সর্বাগ্রে। আধুনিক সভ্যতার অনুপস্থিতি হেতু গ্রামবাংলার মানুষের জীবনে সিনেমার প্রভাব আজো নগণ্য। তাঁদের মানসিক ক্ষুধা মেটাবার প্রধান অবলম্বন ঐতিহ্যবাহী যাত্রা। কিন্তু প্রগতিশীল রাজনীতির প্রভাব গ্রামের মানুষের জীবনে বর্তমানে যতো গভীর—প্রগতিশীল সংস্কৃতিক চিন্তা-ভাবনার প্রভাব, ঠিক তার বিপরীতে ততোখানি কম। এ'দের এই পশ্চাদপর চিন্তা-ভাবনাকে পুঁজি করেই যাত্রামালিকরা তাঁদের শ্রেণীস্বার্থ ও মুনাফা দুই ক্ষেত্রেই ফয়দা লুঠছে। তাই বেশীর ভাগ আধুনিক যাত্রাপালাগুলি লোকশিক্ষার মাধ্যম না হোয়ে নিছক পশ্চাদপর দর্শকদের মনোরঞ্জনের মাধ্যম হয়ে পড়েছে।

পেশাদার যাত্রাজগতের উপরোক্ত সমস্যাগুলি নিয়ে, তাই যাত্রা-জগতের বাইরে প্রগতিশীল মানুষের চিন্তাভাবনার সময় এসেছে।

লোক-চিত্রকলা

'একদিন সূর্যের ভোর আসবেই'

শিল্পী: পরিমল দস্তরায়

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

অ্যাপ্‌ল্‌

অ্যাপ্‌ল্‌ (Apple) নিয়ে বেশ ভালই মাতামাতি চলছে। ১৯শে জুন, ১৯৮১ ভারতে তৈরী যোগাযোগ রক্ষাকারী পরীক্ষা-মূলক উপগ্রহ অ্যাপ্‌ল্‌ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে আর সেদিন থেকে অ্যাপল নিয়ে হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেছে।

অ্যাপল কি? অ্যাপল হল পৃথিবীর সাপেক্ষে একটি স্থির উপগ্রহ। ব্যাপারটা আরেকটু সহজ করে বোঝা যাক। একটা ট্রেন ছুটে চলেছে। ট্রেনটা ছোটার সময় আশপাশের গ্রাম-গঞ্জ-নগর-শহর-পথ-ঘাট-গাছ-পালা অতিক্রম করে চলেছে। অর্থাৎ ট্রেনটা কিছু পৃথিবীর উপর অবস্থিত বিভিন্ন স্থির বিষয়কে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে। এখন একটা ইঞ্জিন ট্রেনটার পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে। দুটো গাড়িরই একই বেগ। তাহলে কি হবে? ট্রেনের মধ্যেকার যে কোন জায়গা থেকে দেখলে ঐ ইঞ্জিনটিকে সব সময় একই দূরত্বে দেখা যাবে। তা হলে বলা যায় যে ট্রেনটির সাপেক্ষে ইঞ্জিনটি স্থির। তাই তো? ঠিক সেইরকমভাবে প্রতি মুহূর্তে একটি নির্দিষ্ট বেগে সূর্য পরিক্রমারত পৃথিবীর যে কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সব সময় একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হলে যে কোন বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট বেগসম্পন্ন হতে হবে। অ্যাপল্‌ হল সে রকম একটি বস্তু যা পৃথিবীর ১০২ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশর উপর পৃথিবী থেকে ৩৬ হাজার কিলোমিটার দূরত্ব বজায় রেখে পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির হয়ে আছে। অ্যাপল্‌ হল একটি জিও-স্টেশনারী উপগ্রহ। এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হলে কতকগুলো প্রাথমিক বিষয় একটু স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন। বেতার তরঙ্গ সরলরেখায় যায়; ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে তাকে বেশীদূরে অন্য স্থানে পাঠানো যায় না। কারণ পৃথিবীপৃষ্ঠ বাঁকা। শর্টওয়েভ বেতার তরঙ্গ ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসে। ফলে, শর্ট-ওয়েভ বেতার তরঙ্গ সরলপথে অগম্য স্থান থেকে প্রচারিত হলেও তা গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়ে। মাইক্রোওয়েভ টেলি যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত তরঙ্গ বা টেলিভিশনের জন্য প্রয়োজনীয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্য শর্টওয়েভ বেতার তরঙ্গের চেয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য হয়; এই ধরনের তরঙ্গগুলির কম্পাংক এবং শক্তি শর্টওয়েভ বেতার তরঙ্গের চেয়ে বেশী। সুতরাং এই ধরনের তরঙ্গগুলি আয়নোস্ফিয়ার ভেদ করে চলে যায়। কিন্তু এই তরঙ্গগুলি আয়নোস্ফিয়ার ভেদ করে চলে যাক এটা কাম্য নয়। সুতরাং তাদের প্রতিফলক ব্যবহার করে পৃথিবীতে ফেরত আনা যেতে পারে। জিও-স্টেশনারী উপগ্রহ অর্থাৎ যে সমস্ত উপগ্রহ পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির তাদের এই প্রতিফলক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অ্যাপল্‌ হল এ রকম একটি প্রতিফলক মাত্র। পৃথিবী থেকে অ্যাপল্‌-এর দূরত্ব ৩৬ হাজার কিলোমিটার হবার পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করলেও পৃথিবী আবার নিজের অক্ষকে কেন্দ্র করেও পাক খায়। সুতরাং পৃথিবীর সাপেক্ষে কোন উপগ্রহকে স্থির থাকতে হলে তাকেও ২৪ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে। অঙ্ক কষে দেখা গেছে যে পৃথিবী থেকে ৩৬ হাজার কিলোমিটার দূরবর্তী কোন বস্তুর পক্ষেই এই ঘটনা ঘটান সম্ভব। বিষুবরেখা থেকে ৩৬ হাজার কিলোমিটার দূরে এ রকম একটি কক্ষপথ কল্পনা করে তার নাম দেওয়া হয়েছে ভূ-সমলয় কক্ষ; ভূ-সমলয় কক্ষ যে বিষুবরেখার সমান্তরাল তা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ কোন উপগ্রহকে পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির থাকতে গেলে তাকে অবশ্যই একমাত্র কক্ষে স্থান করে নিতে হবে। তাহলে কি এই বিশেষ কক্ষপথটা একদিন উপগ্রহর ভীড়ে জমাট হয়ে যাবে না? যেতেই পারে। সেইজন্য প্রতিটি উপগ্রহের জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা বেছে দেওয়া হয়। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকম্যুনিকেশন এজেন্সী নামক একটি সংস্থা ঠিক করে দেয় কোন্‌ উপগ্রহ কোন্‌ স্থানে থাকবে। যেমন অ্যাপল্‌-এর নির্দিষ্ট স্থান ১০২ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

আগেই বলেছি অ্যাপল্‌-এর প্রয়োজনীয়তার কথা। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে অ্যাপল্‌ হল একটি পরীক্ষামূলক টেলি-যোগাযোগকারী উপগ্রহ। এ ধরনের উপগ্রহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত প্রথম নয়, এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, কানাডা, জাপান, ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী এ ধরনের জিও-স্টেশনারী উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে।

অ্যাপল্‌ কিন্তু উৎক্ষেপণ করা হয়েছে ফরাসী-গায়নার 'কুরু' নামক একটা জায়গা থেকে। কেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন আর জাপান ছাড়া অন্য কোন দেশ এককভাবে উপগ্রহ উৎক্ষেপণে এখনও পর্যন্ত সক্ষম হয় নি। ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ব্রিটেন, ইতালী, হল্যান্ড, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, বেল-জিয়াম, ডেনমার্ক এবং আয়ারল্যান্ড এই এগারটি দেশ নিয়ে গঠিত "ইউরোপীয়ান স্পেস্‌ এজেন্সী" (ESA) নামক একটি সংস্থা এই ধরনের উপগ্রহ উৎক্ষেপণে সক্ষম। অ্যাপল্‌ উৎক্ষেপণের জন্য ই.এস.এ.-র এরিয়েন রকেটের সাহায্য নিতে হয়েছে। এই এরিয়েন রকেটের সাথে অ্যাপল্‌ কথাটি নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। এরিয়েন প্যাসেঞ্জার পে-লোড এক্সপেরিমেন্ট" (Ariane Passenger Pay-Load Experiment) এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল, অ্যাপল (APPLE) সামান্য কিছু যন্ত্রাংশ বাদ দিয়ে অ্যাপল্‌ মূলতঃ ভারতে নির্মিত হয়েছে: অ্যাপল্‌-এর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রও ভারতে এবং অবশ্যই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের হাতে।

ফুটবলের উন্নতি করতে হলে

দিলীপ পাল
(কোচ, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও প্রাক্তন ভারতীয় খেলোয়াড়)

কি করে ফুটবলের উন্নতি করা যায়?—এই প্রশ্নটা আজকাল অনেকেই করে থাকেন, যারা অবশ্য ফুটবল ভালবাসেন ও দেশের মান-সম্মান-প্রতিপত্তি নিয়ে চিন্তা করেন। এ নিয়ে ফুটবল নিয়ন্ত্রণ কর্তাদের কিন্তু কোন মাথাব্যথা নেই। আমার মনে হয় সমস্ত ফুটবল অর্গানাইজেশনগুলির উচিত পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে বসে এর কারণগুলি নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করে একটা সমাধানের পথে এগিয়ে যাওয়া। এই প্রস্তাব নিশ্চয়ই অযৌক্তিক নয়।

কলকাতার ফুটবলকে ভারতের পথিকৃৎ বলে ধরা হয়। এই কলকাতার ফুটবল যদি উন্নত হয় তবেই বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি হতে পারে এবং আন্তর্জাতিক আসরেও সুনামের সঙ্গে খেলতে পারবে। সেই কবে ১৯৬২ সালে আমরা জাকার্তায় এশিয়ান গেমসে চ্যাম্পিয়ানশিপের খেতাব অর্জন করেছিলাম, তারপর! আমরা ক্রমশঃ দিন দিনই পেছিয়ে পড়ছি। মূলতঃ এর জন্য দায়ী কিন্তু কলকাতার বড় বড় দলগুলি। তারা নিজেদের আধিপত্য নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। কি করে নতুন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করা যায় তার চিন্তা করেন। খেলার মান ও ভাল খেলা সম্বন্ধে বড় একটা ভাবেন না। ক্লাবের স্বার্থে তারা খেলোয়াড়দের জাতীয় দলে পর্যন্ত অংশগ্রহণ করতে দেন না। এতে জাতীয় স্বার্থ তো ক্ষুন্ন হয়ই; উপরন্তু আন্তর্জাতিক আসরে ভারতীয় দল বড়সড় গোলের ব্যবধানে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে স্বদেশে ফেরে।

এই বছর কলকাতা প্রথম ডিভিশনে ২৭টি দলের মধ্যে খেলা হচ্ছে। যদি গড়ে এক একটি দলে ২৫টি করে খেলোয়াড় ধরা যায়, তবে প্রথম ডিভিশনে খেলার জন্য প্রায় ৭০০ খেলোয়াড়ের প্রয়োজন। সমস্ত সিনিয়র ক্লাবে এতগুলো প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় নিশ্চয়ই পাওয়া সম্ভব নয়। স্বভাবতঃই যে-সব ক্লাব বড় বড় দলগুলির মত সমান সুযোগ সুবিধা পায় না এবং আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত তারা ভাল খেলোয়াড় সংগ্রহ করতে পারে না। প্রতি বছরই তারা র‍্যালিগেশন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কি করে প্রথম ডিভিশনে টিকে থাকা যায় তার কথাই চিন্তা করে। যতদিন না এই ছোট ছোট দলগুলি অর্থনৈতিক সংকটমুক্ত হবে এবং বড় বড় দলগুলির মত সুযোগ সুবিধা পাবে ততদিন তারা ভাল দল তৈরী করতে পারবে না। ফুটবল খেলাও হবে অতি মন্থর আর মানের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

আমার মনে হয় সিনিয়র ডিভিশনে আর একটি দল বাড়িয়ে ২৮টি দল করে দুটো গ্রুপ করা উচিত। ধরা যাক্‌ সিনিয়র ডিভিশন গ্রুপ-এ এবং সিনিয়র ডিভিশন গ্রুপ-বি। গ্রুপ-এ'তে রিটার্ন লীগ এবং গ্রুপ-বি'তে অন্যান্য ডিভিশনের মত একক লীগ চালু থাকবে। গ্রুপ-এ'তে যারা নীচে থাকবে তারা পরের বছর গ্রুপ-বি'তে এবং যারা গ্রুপ-বি'তে চ্যাম্পিয়ন হবে, তারা পরের বছর গ্রুপ-এ'তে খেলবে। আসলে একটি ডিভিশন বাড়ান হল। প্রতি বছর ওঠানামা বজায় রেখে এই পদ্ধতি চালু করলে খেলার জৌলুস বাড়বে বৈ কমবে না।

কোন ক্লাবে ছোট ছোট ছেলেদের ভালভাবে ট্রেনিং দিয়ে খেলোয়াড় তৈরী করার চেষ্টা হয় না। কারণটা কারুরই অজানা নয়। বড় বড় দলগুলি ছোট ছোট দলগুলি থেকে উঠতি ও সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের নিয়েই টীম তৈরী করে। তারা জুনিয়র খেলোয়াড়-দের উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে টীম তৈরী করার কথা চিন্তাই করে না। আর খেলোয়াড়েরাও উন্নতির সুযোগ আছে ভেবে বড় দলে খেলার সুযোগ খোঁজে। আর ছোট ছোট দলগুলিও সিজনের এক মাস আগে প্র্যাকটিশ শুরু করে কোনরকমে একটি দল খাড়া করে। আমার মনে হয় এই স্বল্প সময়ের ট্রেনিং অর্থহীন ও মূল্যহীন। এতে করে খেলোয়াড়ের ভিত তৈরী হয় না। সঙ্গত কারণেই খেলার মান বাড়ে না। পরিশেষে সুদক্ষ ফুটবল খেলোয়াড়ের পরিচিতি ময়দানের সবুজ মাঠে রাখতে হলে কতকগুলি কর্তব্যের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে শিক্ষণের ক্ষেত্রে। প্রথমতঃ সুকঠোর পরিশ্রম, দ্বিতীয়তঃ অনুভূতিকে করতে হবে তীক্ষ্ন, তৃতীয়তঃ বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপন। ভাল ফুটবল খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে ফুটবলই হবে তার একমাত্র সঙ্গী। ফুটবলই হবে তার স্বপ্ন ও জীবন।

আর একটা কথা, আমাদের দেশে যে রকম আবহাওয়ায় ফুটবল খেলা হয় এ রকম আবহাওয়ায় আর কোন দেশে খেলা হয় বলে মনে হয় না। সব দেশেই এখন রাত্রে ফুটবল খেলা চালু হয়ে গেছে। আমাদের দেশেও যত শীঘ্র সম্ভব চালু করা উচিত। নতুবা ফুটবল মরশুমকে শীতকালে নিয়ে গেলে কিছুটা উন্নতি হবে সন্দেহ নেই। কারণ অত্যধিক গরমে শরীরের অর্ধেক ক্ষমতা খেলার আগেই নষ্ট হয়ে যায়। যার জন্য মনে হয় খেলোয়াড়দের শারীরিক অবস্থা খেলার উপযুক্ত নয়।

খেলার স্বার্থে দেশ ও জাতির স্বার্থে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত। (ক) প্রতি ক্লাবে জুনিয়র খেলোয়াড়দের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা (খ) ওঠা-নামা চালু রেখে লীগ পদ্ধতির পরিবর্তন করা (গ) ফুটবলকে শহরমুখী না করে মফঃস্বলে ছড়িয়ে দেওয়া (ঘ) নৈশ ফুটবল চালু করা (ঙ) ফুটবলের জন্য আলাদা একটা স্টেডিয়াম করা। দেখতে হবে ছোট ছোট দলগুলো যাতে ঐ স্টেডিয়ামের অংশীদার হতে পারে এবং ব্যবহার করতে পারে। আর সচেষ্ট হতে হবে ঐ স্টেডিয়ামে যাতে বড় বড় খেলা হয়। তাহলে হয়তো কিছুটা উন্নতি হবে।

পরিশেষে বলি, সরকারকেও খেলার মান সামগ্রিকভাবে উন্নতির জন্য চিন্তা করতে হবে। চিন্তা যে করছেন না তা নয়। যেমন গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট ছেলেদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, লবণ হ্রদে

[শেষাংশ ৩১ পৃষ্ঠায়]

জীবন শিল্পী সুকান্ত/অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫/১ বি, সরণি কলকাতা-৬
দাম—বারো টাকা

'অসংখ্য মুহূর্তের সামগ্রিকতা হলো জীবন', এবং সেই সব মুহূর্তগুলি থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রঙের উপলব্ধি হলো শিল্পী-জীবন, যে জীবনের সংগে পাঠকের নিবিড় পরিচয় ঘটে, তৈরী হয় এক নতুন মেলবন্ধন। সুকান্ত বাংলা বাক্যে বহুল আলোচিত। সমালোচিত কিছু বিদগ্ধ পণ্ডিতজনের কাছে। অনেকে একুশ বছর বয়েসকে দেখতে চেয়েছেন সহানুভূতির চোখে, কেউ কেউ দুঃখ পেয়েছেন তাঁর কবি-প্রতিভা রাজনৈতিক আদর্শে ও সামাজিক মূল্যবোধে পরিপূর্ণতা লাভ করায়। সুকান্তর কাব্য-সাহিত্য নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছেন অনেকে। কিন্তু যিনি জনগণের কবি হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, নিজেকে স্বীকার করেন একজন কমিউনিস্ট হিসাবে, স্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন 'কমিউনিস্ট-দের কাজ-কারবার সব জনতা নিয়েই' তখন তাঁর কাব্য সাহিত্যকে আলোচনা করতে গেলে সামগ্রিক সমাজজীবন ও রাজনৈতিক জীবনকে বাদ দিয়ে আলোচনা করা যায় না।

'জীবনশিল্পী সুকান্ত' একটি সঠিক বিশ্লেষণী মূল্যায়ন। গ্রন্থকার অনুনয় চট্টোপাধ্যায় একজন জনগণের কবিকে দেখেছেন তাঁর আদর্শের ভিত্তি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। কাব্য-সাহিত্যকে আলোচনা করেছেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের আলোকে। ব্যাকরণসম্মত কবি-সাহিত্যিকদের মতো শিল্পী-জীবনকে ব্যক্তি-জীবন থেকে আলাদা করে দেখতে চান নি বলে আমরা সুকান্তকে খুঁজে পেয়েছি অসংখ্য মানুষের প্রতিনিধি সৈনিক হিসাবে, যিনি সুখ, দুঃখ প্রতিবাদের ভাষাকে নিপুণ হাতে মেলে ধরেছেন নির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদের উপর। সেখানে বাদ যায় নি কবির সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি, বাদ যায় নি ছোটোখাটো ব্যক্তিগত ঘটনাও।

এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বিকশিত হচ্ছে সমাজ, তার গতি-পথের ক্রমান্বয় উত্তরণ পেঁৗছে দেবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। কবি স্থির দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন অনিবার্য পরিবর্তন। তিনি ঠিক জেনে গেছেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কবি-সাহিত্যিকরা সমস্ত মানুষের জন্য সাহিত্য রচনা করতে পারেন না, রচনা করেন অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর গঠিত কোন একটি শ্রেণীর সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করতে। সুকান্তের জীবনকালের দশকগুলি এক টালমাটাল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের আলোকে যখন সারা বিশ্ব নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হচ্ছে ঠিক সেই সময় কলকাতায় কিশোর কবি সুকান্তের বুকের ভেতর গড়ে ওঠে কঠিন শপথ। মাঝরাতে জাপানী বোমায় আক্রান্ত শহরের বুকে বসে লিখে চলেন প্রতি-রোধের কবিতা। কখনো ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর ক্রোধ এবং ঘৃণা। কখনো দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে উজাড় করে দেন সমস্ত ক্ষমতা।

অনুনয় চট্টোপাধ্যায় ঠিক এমনিভাবেই এঁকেছেন সুকান্তর ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনকে। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরি-স্থিতির প্রেক্ষাপটে কবিমানসের একুশ বছরে যে চরম পরিপূর্ণতা তাকে দশটি পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছেন। তাঁর সতর্কদৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি কোন কিছু। সমগ্র আলোচনায় পরিলক্ষিত হয় নি কোন রকম দুর্বলতা। কমিউনিস্ট পার্টির একজন অক্লান্ত পরিশ্রমী সদস্য কবিকে তত্ত্বগত আদর্শের ভিত্তিতে যেমন দেখেছেন তেমনি তাঁর কাব্যের শিল্পশৈলীকে বিচার করেছেন কাব্যিক দিক দিয়ে। স্পষ্ট পার্থক্য টেনেছেন ব্যাকরণসম্মত কবিদের প্রকৃতি, প্রেম ও নৈসর্গিকতা থেকে। 'সুকান্ত কাব্যের শিল্প মূল্যে' লেখক সঠিক-ভাবেই উচ্চারণ করেছেন 'ভাব ও বিষয়ে তিনি যুগন্ধর আবার শিল্পশৈলীতে ঐতিহ্যানুযায়ী স্রষ্টা'। মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন কবিতার শরীর, চিত্রকল্প ও আঙ্গিকতা নিয়ে। অত্যন্ত বিশ্লেষণী মন নিয়ে দেখেছেন সুকান্ত কবিতার যে মূল বৈশিষ্ট্য-পরিণত শব্দচয়ন, ছন্দ, অন্ত্যমিল, যথাযোগ্য প্রতীকের ব্যবহার এবং পরিমিতি বোধকে। কবির গল্প এবং গান নিয়েও যথাযথ আলোচনা করেছেন। তবু কিছুটা অতৃপ্ত থাকতে হয়। সুকান্ত-কবি-প্রতিভা বাংলা কাব্যকে কতখানি প্রভাবিত করেছে সে সম্বন্ধে আর কিছুটা আলোচনা হলে ভালো হতো। 'জীবনশিল্পী সুকান্ত' শুধুমাত্র একজন কবির কাব্য-মূল্যায়ন নয়, সমসাময়িক কালের একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দলিল। গ্রন্থটির প্রয়োজন ছিল অনেক আগে।

রামপ্রসাদ রায়

বিভাগীয় সংবাদ

কোচবিহার জেলা

তুফানগঞ্জ—গত ৬ ও ১৫ জুন এই যুব অফিসের উদ্যোগে দু'টি গ্রামীণ ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করা হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসুরেশ বসাক ও বিডিও তুফানগঞ্জ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দু'টি শিবিরে মোট ১০০ জন উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড় যোগ দিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই এই শিবিরে থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হ'ন।

জলপাইগুড়ি জেলা

ধুপগুড়ি—এই যুবকরণের উদ্যোগে ও পরিচালনায় গত মে-জুন মাসে একমাসব্যাপী দু'টি ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রথম শিবিরের উদ্বোধন করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীগোপাল চাকি। প্রশিক্ষক ছিলেন শ্রীসুকুমার বসু, ময়নাগুড়ি (পঃ বঃ স্পোর্টস ফেডারেশনের কাউন্সিল কোচ)। মোট ৭টি ক্লাব ও যুব প্রতিষ্ঠানের ৫৪ জন সদস্য এই শিবিরে অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীদের বয়স সীমা নির্ধারিত ছিল ১২—১৬ বৎসর। প্রতিদিন দু'ঘণ্টা করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ধুপগুড়ি ব্লক যুবকরণের অ-আবাসিক ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির।

দ্বিতীয় শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় গয়েরকাটা উচ্চ বিদ্যালয়ে। গয়েরকাটা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এই শিবিরের উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষক ছিলেন শ্রীমানিকলাল ভৌমিক। ৩টি ক্লাব ও গয়েরকাটা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সাকুল্যে ৫০ জন এই শিবিরে যোগদান করে। এই ধরনের শিবির মাঝে মাঝে সংগঠন করা হলে গ্রামীণ খেলোয়াড়রা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে অংশগ্রহণকারীরা মত পোষণ করেন।

পঃ বঃ সরকার, যুব-কল্যাণ বিভাগ (**কালচিনি ব্লক যুবকরণ**)-**এর উদ্যোগে এবং কালচিনি ব্লক স্পোর্টস এসোসিয়েসনের ফুটবল টুর্ণামেন্ট সাব-কমিটি'র পরিচালনায় গত ১৫.৭.৮১ তারিখ থেকে** হ্যামিল্টনগঞ্জ ফুটবল মাঠে এবৎসর 'জলপাইগুড়ি জেলা যুব উৎসব' উপলক্ষে ১৯৪৭ স্মৃতি শীল্ড ও শ্যামাপ্রসাদ সংঘ রানার্স কাপ লিগ-কাম-নক্ আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ১৫.৭.৮১ তারিখে ডিমা চা-বাগান ও স্থানীয় হামরো সংঘের মাধ্যমে এই খেলার শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে এই ব্লকের সমষ্টি-উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহাশয়। এই খেলা প্রথম পর্যায়ে চলবে ২৮.৭.৮১ তারিখ পর্যন্ত। তারপর সেমি ফাইনাল এবং ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। সর্বমোট কালচিনি ব্লকের ১২টি ফুটবল দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা

গোয়ালপোখর ২নং ব্লকে গত ১৮ই জুলাই '৮১ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব-কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ও ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় একটি ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতি ও শ্রীনিমাইচাঁদ করণ, বি.ডি.ও উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত সভাপতি শ্রীঘোষ বিভিন্ন যুব সংগঠনগুলির মধ্যে ফুটবল বিতরণ করেন ও গ্রামীণ খেলাধুলার উপর বক্তব্য রাখেন। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ১২ থেকে ১৯ বছর বয়স্ক প্রায় ৫০ জন কিশোরকে মনোনীত করা হয়। প্রশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হ'ন শ্রীশিবেন্দু ঘোষ, ইসলামপুর।

গোয়ালপোখর ২নং ব্লকে প্রশিক্ষক শ্রীশিবেন্দু ঘোষ ফুটবলার তৈরিতে ব্যস্ত।

এই প্রশিক্ষণ শিবির স্থানীয় তরুণদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানের শেষে ব্লক যুব আধিকারিক জানান যে গোয়ালপোখর ২নং ব্লকের অন্তর্গত চাকুলিয়ায় খুব শীঘ্রই ২০ জন যুবককে নিয়ে (তপশীল জাতি ও উপজাতির মধ্যে) সাইকেল রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু হচ্ছে।

হিলি—গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারি '৮১

পর্যন্ত তিওড় হাইস্কুলে হিলি যুবকরণের উদ্যোগে ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন মাননীয় জেলা সমাহর্তা শ্রীসুখবিলাস বর্মা, আই. এ. এস. পশ্চিম দিনাজপুর। প্রায় ১০০০ ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতী উৎসবের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সমাপ্তি দিবসে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সভাধিপতি শ্রীননীগোপাল রায় যুব উৎসব গ্রাম্য পরিবেশে করবার পরামর্শ দেন। পরিশেষে ব্লক যুব আধিকারিক মহাশয় যুব উৎসবের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন এবং সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হিলি ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে গত ১লা জুন থেকে ফুটবল ও ভলিবল প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। একমাসব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ১০০ জন যুবক ও ছাত্র অংশগ্রহণ করে। এই শিবির প্রশিক্ষার্থী ও স্থানীয় জনমনে এক বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

এই ব্লকের প্রায় ৪৮টি ক্লাব এবং বিভিন্ন সংস্থাকে গত জুন মাসে খেলাধুলার বিভিন্ন প্রকারের ক্রীড়া-সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। মোট ২টি ক্যারাম বোর্ড, ৫টি ভলিবলসহ নেট এবং ৪১টি ফুটবল বিতরণ করা হয়।

নদীয়া জেলা:

কৃষ্ণনগর-১—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার (কলিকাতা) সহযোগিতায় এবং কৃষ্ণনগর-১ ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় গত ৮-৮-৮১ তারিখে কৃষ্ণনগর সি.এম.এস. সেন্ট জনস্ হাই স্কুলে 'ব্লক বিজ্ঞান আলোচনা প্রতিযোগিতা-১৯৮১' অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণনগর-১ ব্লকের অধীন বিভিন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের মোট ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম ৬ জনকে মানপত্রসহ পুরস্কৃত করা হয়। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র সুবীর হালদার, শক্তিনগর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী মলি সাহা, দিগনগন হাই স্কুলের ছাত্র নিতাইচন্দ্র সিকদার যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিযোগী আগামী ২৭-৮-৮১ তারিখে নদীয়া জেলা বিজ্ঞান আলোচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতা কৃষ্ণনগর সি.এম.এস. সেন্ট জনস্ হাই স্কুলে সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে।

ব্লক বিজ্ঞান আলোচনা প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন কৃষ্ণনগর সি.এম.এস. সেন্ট জনস্ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রীসত্যজিৎ মণ্ডল এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে কৃষ্ণনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ ও নদীয়া জেলা যুব আধিকারিক শ্রীগোপেশ্বর মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষ্ণগঞ্জ—এই যুবকরণের পরিচালনায় সম্প্রতি (৯ জুন—১০ জুলাই) ফুটবল ও কবাডি প্রশিক্ষণ শিবির সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে। ১৬ বৎসর পর্যন্ত কিশোর-কিশোরীদের জন্য এই শিবির উন্মুক্ত ছিল। ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরে সামিল হয় মোট ৭০ জন। এবং কবাডি প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেয় ৩৫ জন কিশোর এবং ২৫ জন কিশোরী। ১০ জুলাই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীপরিমল বাগচী। ব্লক ও জেলা যুব আধিকারিকদ্বয় স্থানীয় ক্রীড়ামোদী জনগণের সহযোগিতার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানান।
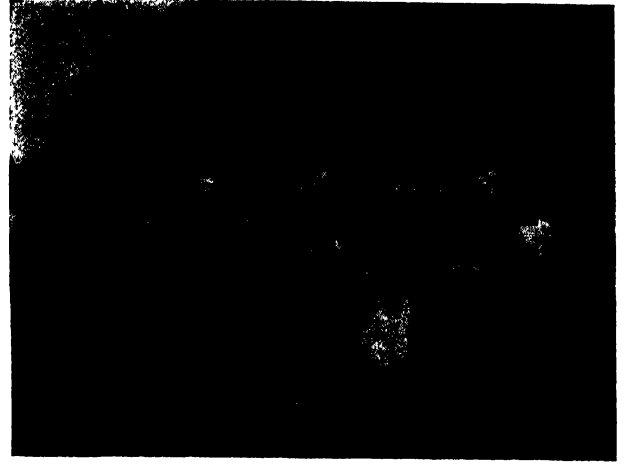
কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক যুবকরণ-এর কবাডি প্রশিক্ষণ।

শান্তিপুর এই যুব অফিসের পরিচালনায় সম্প্রতি ৫ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট) দুটি ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হয়েছে। এক-মাসব্যাপী এই দুটি শিক্ষণ শিবিরে ফুটবল ও ভলিবল খেলার নানান উচ্চতর কলাকৌশল সম্বন্ধে তালিম দেন একজন অভিজ্ঞ এন.আই.এস. কোচ। ফুটবল ও ভলিবল দুটি শিবিরে অংশ নেয় যথাক্রমে ৫২ ও ২৬ জন। যোগদানকারী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ শেষে মানপত্র দেওয়া হয়।

হাঁসখালি ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে বৃত্তিমূলক কর্মশিক্ষণের উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য ৬ মাসের দুটি সীবন শিল্প প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয় গত ৫ জুন। সীবন শিল্পের প্রশিক্ষণ দুটি চলছে একটি হাঁসখালি ব্লক যুবকরণে ও অপরটি বাদকুল্লার সুরভিস্থান ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ে। প্রথম প্রশিক্ষণ শিবির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্যা শ্রীমতী বিভা ঘোষগোস্বামী, নদীয়া জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য, বিধায়ক শ্রীসুকুমার মণ্ডল, নদীয়া জেলা পরিষদ সচিব শ্রীসুবল মার্ডি, জেলা যুব আধিকারিক শ্রীগোপেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীদেবপ্রসন্ন ঘটক এবং হাঁসখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস প্রমুখ অতিথিবৃন্দ।

শ্রীমতী বিভা ঘোষগোস্বামী বলেন, জীবনে চলার পথে, স্ব-নির্ভর হওয়ার প্রতিযোগিতায় মেয়েরা পিছিয়ে থাকতে পারেন না। তাই এই জাতীয় প্রশিক্ষণের সুযোগ খুবই অর্থবহ। আমরা যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্‌যোগটিকে স্বাগত জানাই।

শান্তি ভট্টাচার্য প্রশিক্ষার্থিনীদের উদ্দেশ্যে বলেন, চাকরির সুযোগ সীমিত। তাই কর্মমুখীন যে কোনো প্রশিক্ষণ জীবন-নির্ভর। আপনারা আন্তরিকভাবে এটি শিখে কাজে লাগান। শ্রীসুকুমার মণ্ডল বলেন, আমার ব্লকের যুবক-যুবতীদের কাছে যুবকল্যাণ বিভাগের এই যুবকরণটির কল্যাণকর উদ্‌যোগগুলি যুবমনে প্রেরণার সঞ্চার করেছে। এই জাতীয় প্রশিক্ষণ জীবনে চলার পথ দেখায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বগুলা যুব কেন্দ্রের ৩০ জন ও সুরভি-স্থান ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ের ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থিনী-

দের নদীয়া জেলা পরিষদের ট্রাইসেম (TRYSEM) পরিকল্পনার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলকথা, প্রশিক্ষণার্থিনীরা মাসিক সত্তর টাকা হিসাবে 'বৃত্তি' পাবেন এবং অতিরিক্ত একজন প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষিকা নিয়োজিত হয়েছেন দুটি কেন্দ্রের জন্য।

সংসদ-সদস্যা শ্রীমতী বিভা ঘোষগোস্বামী ও নদীয়া জেলা যুব আধিকারিক হাঁসখালি ব্লক যুবকরণের আগামী দিনের ফুটবলারদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

৫ই জুন বিকাল চারটা। বগুলা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে ফুটবলের ওপর একমাসব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করলেন সংসদ সদস্যা শ্রীমতী বিভা ঘোষগোস্বামী ও জেলা যুব আধিকারিক শ্রীগোপেশ্বর মুখোপাধ্যায়। এতে ৬০ জন সফল প্রশিক্ষার্থী ছিলেন। প্রশিক্ষক ছিলেন ক্রীড়াপ্রশিক্ষক শ্রীকাঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬ জুলাই বাদকুল্লা। বিকেল চারটায় একমাসব্যাপী ফুটবলের ওপর একটি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন হলো সুরভি অঙ্গনের যুবক সংঘের মাঠে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উদ্বোধক অতিথি ছিলেন নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীপরিমল বাগচি, বিধায়ক শ্রীসুকুমার মণ্ডল, হাঁসখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্য শ্রীবিমল চৌধুরী, এন.আই.এস. কোচ শ্রীবিশ্বনাথ সরকার ও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীদেবপ্রসন্ন ঘটক। এই প্রশিক্ষণে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ও শ্রীকার্তিক সরকার। এতে প্রশিক্ষার্থী ছিলেন ৬৫ জন। প্রশিক্ষক ছিলেন শ্রীসুদীপ্ত মিত্র।

রানাঘাট-২—এই ব্লকের উদ্যোগে গত ৪ঠা আগস্ট পূর্ণনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্লক বিজ্ঞান আলোচনাচক্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। স্থানীয় চারটি বিদ্যালয় থেকে মোট ১০ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে কুমারী সুমিতা বসু, শ্রীপিনাকী শুকুল ও শ্রীকল্যাণ রায়। তিনজনই আড়ংঘাটা ইনস্টিটিউশনের ছাত্রছাত্রী। পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীবীরেনচন্দ্র দত্ত। ৩৩৯ জন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে শেষ হয়।

পুরুলিয়া জেলা:

বাগমুণ্ডি ব্লক যুব অফিস—এই ব্লকে তরুণদের মধ্যে খেলাধুলার প্রসার ও নিয়মিত চর্চার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছে। ক্লাবগুলিকে প্রতি বছর খেলাধুলার সরঞ্জাম সরবরাহ, তরুণ-তরুণীদের বিভিন্ন খেলাধুলায় প্রশিক্ষণ এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে। ফলে শহর থেকে দূরে অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে, আদিবাসী অধ্যুষিত এই অনুন্নত এলাকায় যুবক-যুবতীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার এসেছে।

এখানে গত ১৬ই জুন থেকে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত ফুটবল প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। প্রায় ৪৮টি ক্লাবের ও চারটি স্কুলের ১২০ জন তরুণকে প্রশিক্ষণ দিলেন ধীরেন্দ্রনাথ সিংমাহাতো ও স্বপন চক্রবর্তী। এই দুই উদ্যমী তরুণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে ইতিমধ্যে বেশ কিছু শক্তিশালী ফুটবল ও ভলিবল টীম গড়ে উঠেছে।

ফুটবল কোচিং চলে রোজ ভোর পাঁচটা থেকে সাড়ে আটটা। দুটি পর্বে ভাগ করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে ছাতাটাঁড় মাঠে, দ্বিতীয় পর্যায়ে তুন্তুড়ি মাঠে। কোচিংয়ের সঙ্গে ফার্স্ট এইড, খেলাধুলোর নিয়মানুবর্তিতা, একালের সেরা ফুটবলারদের বিশেষত্ব, ভালো খেলোয়াড় হবার উপায় ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিদিন প্রশিক্ষণ শেষে ক্লাস নিয়েছেন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ও বিগত দিনের নামীদামী খেলোয়াড়রা। ফুটবল কোচিংয়ের পাশাপাশি ৩০শে জুন থেকে মেয়েদের তুন্তুড়ি মাঠে খো-খো কোচিং দেওয়া হয়। এখানকার মেয়েদের কাছে খো-খো একটি সম্পূর্ণ নতুন খেলা। এই খেলাটিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বাগমুণ্ডি ব্লক যুব অফিসের এই প্রথম প্রয়াস। কোচিং দেন নিকুঞ্জ মাঝি।
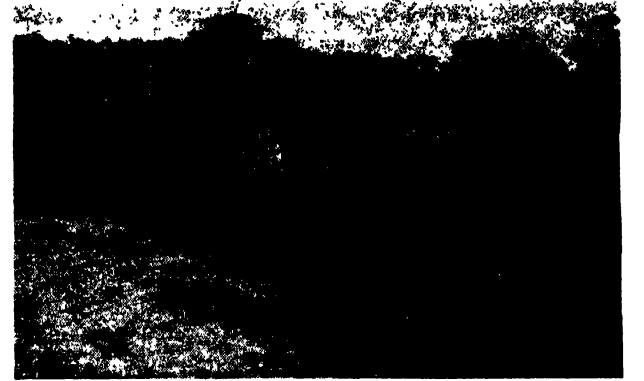
পুরুলিয়া জেলায় বাগমুণ্ডি ব্লকে মেয়েদের খো খো প্রশিক্ষণ চলছে।

আগামী ১৭ই আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে ভলিবল প্রশিক্ষণ। চল্লিশ জন তরুণ ঘোড়াবাঁধা মাঠে কুড়ি দিনের জন্য প্রশিক্ষণ নেবে। এর পর শুরু হবে কবাডি প্রশিক্ষণ। বিভিন্ন প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সব ক্লাবগুলোকে যুব অফিস থেকে ফুটবল দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ১৬টি ক্লাবকে ভলিবল ও নেট দেওয়া হয়েছে। এদের টীমগুলো এবার যুব উৎসবে আয়োজিত ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। এছাড়া খেলাধুলার অন্যান্য সরঞ্জামও সরবরাহ করা হয়েছে।

বলরামপুর—গ্রামীণ খেলাধুলার অগ্রগতির জন্য স্থানীয় যুব অফিসের উদ্যোগে ও পরিচালনায় ফুটবল, ভলিবল ও কবাডি খেলার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির সম্প্রতি শুরু হয়েছে (৭ই জুলাই)। চলবে একমাসব্যাপী। স্থানীয় বি-ডি-ও শিবিরের

উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় বিধান সভা সদস্য। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য ক্রীড়ামোদী জনগণও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের প্রেরণা দেন। এই এলাকার ৪০টি ক্লাব ও ৫টি বিদ্যালয়ের মোট ৮০ জন ফুটবল, ৭০ জন ভলিবল ও ৬৫ জন কবাডি প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেয়। এছাড়া নিজ নিজ এলাকার এইসব খেলাধূলার প্রসার-কল্পে যুব অফিস থেকে ৪০টি ক্লাবের মধ্যে ৩৫টি ফুটবল, ১৩টি ভলিবল ও নেট, ৮টি ক্যারাম বোর্ড, ৪ সেট ক্রিকেট সরঞ্জাম ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

আগামী ১৪ই আগস্ট ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে।

মেদিনীপুর জেলা:

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুবকল্যাণ বিভাগের আর্থিক উদ্যোগে **পাঁশকুড়া ২নং ব্লক যুবকরণের** পরিচালনায় গত ৮ই আগস্ট' ৮১ শনিবার ভোগপুর কেনারাম স্মৃতি বিদ্যালয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে "নবীকরণ শক্তির উৎস" বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনাচক্রে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া কয়েকটি "সায়েন্স ক্লাব"ও অংশগ্রহণ করে। আলোচনার শুরুতে ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান সমস্ত প্রতিযোগী ও সমবেত বিজ্ঞানপ্রেমী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকবৃন্দকে স্বাগত জানাতে গিয়ে বলেন যে, গ্রাম-বাংলার আনাচে কানাচে বহু ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা লুকিয়ে আছে। সেই সমস্ত প্রতিভাপন্ন ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের জন-সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এই বিভাগ। প্রাথমিক-ভাবে এই আলোচনাচক্রের মাধ্যমে প্রতিভাপন্ন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন ভোগপুর কেনারাম স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীহরেন্দ্র নাথ দাস। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সাগরবাড় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীবীরভদ্র গোড়ী। সভাপতি, প্রধান অতিথি ও উপস্থিত বিচারকমণ্ডলী যুবকল্যাণ বিভাগের এই ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই আলোচনাচক্রে বিচারক-মণ্ডলীর সিদ্ধান্তে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন যথাক্রমে কুমারী কাকলী ঘোষ, কোলা ইউনিয়ন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, শ্রীঅতনু গুছাইত, কোলা ইউনিয়ন হাই স্কুল (কোলাঘাট সায়েন্স হবি সেন্টার) ও শ্রীপার্থপ্রতিম দাস, ভোগপুর কেনারাম স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় (ভোগপুর যুব সম্প্রদায়)। অনুষ্ঠান শেষে সমবেত দর্শক-বৃন্দ এই ধরনের সুন্দর সাবলীল মার্জিত পরিবেশে সুশৃংখল পরিচালনায় এই শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের জন্য যুবকল্যাণ বিভাগকে ধন্যবাদ জানান।

২৪ পরগনা জেলা

গাইঘাটা—গত ২৬শে আগস্ট '৮১ বুধবার গাইঘাটা ব্লকে ডেওপুল অগ্রগামী স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করা হয়। ডেওপুল ক্লাবের সম্পাদক, ক্লাব সদস্য, স্থানীয় যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতায় ডেওপুল বাজার থেকে ডেওপুল অধর মেমোরিয়াল জুনিয়র হাইস্কুল পর্যন্ত (প্রায় ১ কি.মি.) ৩০০ (তিন শত) গাছ রোপণ করেন। গাছগুলির মধ্যে কৃষ্ণচূড়া, ইউক্যালিপটাস, সোনাঝুড়ি, ঝাউ, দেবদারু প্রভৃতি ছিল। বিকাল ৫টার কৃষ্ণচূড়া রোপণ করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গাইঘাটা ব্লকের ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসুদর্শন চন্দ। অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তব্য রাখেন শ্রীকপিল ঘোষ। স্থানীয় যুবক-যুবতী ও গ্রামবাসিগণ বিশেষ উৎসাহ নিয়ে বৃক্ষগুলির সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বনগাঁ ব্লক যুবকরণ—আয়োজিত দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২০শে আগস্ট স্থানীয় ঘোষ ইনস্টিটিউসনে প্রতি-যোগিতামূলক বিজ্ঞান আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আলোচনায় স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায়। প্রথম দুজনের নাম বিশ্বজিৎ বসু ও মলয় ঘোষ। এরা দুজনেই বনগাঁ হাই স্কুলের ছাত্র।

ঐ অনুষ্ঠানে বনগাঁ ঘোষ ইনস্টিটিউসনের প্রধান শিক্ষক শ্রীপল্লবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং সফল প্রতি-যোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। প্রতিযোগিতায় দশজন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গত ২০শে আগস্ট তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাসের উপস্থিতিতে বনগাঁ ব্লক এলাকার গোপালনগর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন দুরন্ত সংঘকে খেলাধূলার মাঠ উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য ৩৭,৫০০·০০ টাকার একটি ড্রাফট্ দেওয়া হয়। যাদবপুর বিধানসভার সদস্য শ্রীক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য উক্ত সংঘের প্রতিনিধি শ্রীবিনয়ভূষণ রায়ের হাতে তুলে দেন। ঐ টাকা যুব কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়েছে।

বাগদা ব্লক যুবকরণ—যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং বাগদা ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় গত ২১শে আগস্ট '৮১ বাগদা হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান আলোচনা চক্রে বাগদা এলাকার বিভিন্ন স্কুলের মোট ১০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। সফল প্রথম প্রতিযোগীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাগদা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রীচৈতন্যপদ বিশ্বাস মহাশয় এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক মাননীয় শ্রীদেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

মুর্শিদাবাদ জেলা

লালগোলা—গত ৩০শে জুলাই, ১৯৮১ তারিখে লালগোলা মহেশ নারায়ণ একাডেমীতে ব্লকভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনা চক্র '৮১ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। যৌথ উদ্যোক্তা ছিলেন যুব কল্যাণ বিভাগ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) ও বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা (ভারত সরকার) এবং ব্যবস্থাপনায় লালগোলা ব্লক যুবকরণ, মুর্শিদাবাদ।

এই অনুষ্ঠান সভায় পৌরহিত্য করেন লালগোলা মহেশ নারায়ণ একাডেমীর প্রধান শিক্ষক শ্রীমদনমোহন রায় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লালগোলা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীশতদল চক্রবর্তী। পুরস্কার বিতরণ করেন লালগোলা মহেশ নারায়ণ একাডেমীর সহ-প্রধান শিক্ষক শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ। ব্লক-ভিত্তিক আলোচনা চক্র '৮১-র বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপৎসিং কলেজ, জিয়াগঞ্জ-এর বিজ্ঞান বিভাগের তিন অধ্যাপক শ্রীস্বপন দাস, শ্রীকল্যাণ বক্সী ও শ্রীসুভাষ ভট্টাচার্য।

উপরোক্ত আলোচনা সভায় বিচারকমণ্ডলীর রায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে শৈলজা মেমোরিয়াল গালর্স হাই স্কুলের দশম

শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী স্বীপান্বিতা চৌধুরী, দ্বিতীয় লালগোলা মহেশ নারায়ণ একাডেমীর দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীঅতনু রায় ও তৃতীয় ঐ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীআত্মারঞ্জন মুখার্জী।

হাওড়া জেলা

বাগনান-২ ব্লক যুবকরণ—বাগনান যুবকরণ, হাওড়া-র অধীনে গত ১৫ই জুলাই ১৯৮১ থেকে ১৪ই জুন ১৯৮১ পর্যন্ত ফুটবল ও ৮ই জুন থেকে ৭ই জুলাই পর্যন্ত কবাডি কোচিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

বাগনান ২নং ব্লকের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ফুটবল ক্যাম্প দুটি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। ঘোড়াঘাটা ফুটবল মাঠ ও বাটুল দত্তপুকুর মাঠে ফুটবল ক্যাম্প হয়। মোট ষাট জন যুবক এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে। ২নং ব্লক-এর অধীনস্থ ক্লাব ও স্কুল ছাত্ররা এই ক্যাম্পে উৎসাহের সংগে যোগদান করে।

বাগনান ব্লক-২ যুবকরণ আয়োজিত বিজ্ঞান আলোচনাচক্র চলছে।

কবাডি কোচিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় গুণিনপাড়া হস্পিটাল মাঠে। এই কোচিং ক্যাম্পে মোট ৩০ জন যুবক অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় অঞ্চলের যুবকদের উৎসাহে এই ক্যাম্প সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত হল। এই ক্যাম্পে দূর অঞ্চলের যুবকরাও যোগদান করে।

এই শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয় গত ২৬শে জুলাই দত্তপুকুর মাঠে। ব্লকের অন্তর্গত ক্লাব ও অন্যান্য যুব সংগঠনগুলি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ফুটবল ও কবাডি খেলা প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি শ্রীনির্মলেন্দু সরকার ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়, রাষ্ট্রমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য শ্রীপ্রীতিময় পাল।

প্রধান অতিথি শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় বলেন গ্রামাঞ্চলের খেলাধুলোর উন্নতি প্রয়োজন এবং আমাদের দেশে গ্রামীণ প্রতিভাগুলিকে সম্মান দেওয়া প্রয়োজন। শ্রীপাল ক্যাম্পের যোগদানকারী সংগঠনকারীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। সভার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্যাপারী, এবং সভায় যোগদানকারী যুবকদের প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়।

গত ১০ই আগস্ট সোমবার, চন্দ্রভাগ গার্লস হাই স্কুলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, যুব কল্যাণ বিভাগ ও বিড়লা কারিগরি শিল্প সংগ্রহশালায় যৌথ উদ্যোগে ও বাগনান ২ নং ব্লক, যুব কল্যাণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। এই আলোচনা সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল "শক্তির পুনঃ নবীকরণ"। আলোচনা সভায় বিভিন্ন স্কুল থেকে মোট ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানের দিন বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীগণ এবং সংগঠনের যুবক ও যুবতীরা আগ্রহের সাথে আলোচনা সভায় যোগদান করে।

আলোচনা সভায় প্রতিযোগী হিসাবে মুগকল্যাণ স্কুলের ছাত্র প্রথম এবং চন্দ্রভাগ শ্রীকৃষ্ণ গার্লস স্কুলের ছাত্রী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

নদীয়া জেলা

শান্তিপুর ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে প্রতিযোগিতামূলক ব্লক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র গত ১০ই আগস্ট স্থানীয় ফুলিয়া শিক্ষা নিকেতনে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল শক্তি উৎসের নবীকরণ। বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে মোট ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। আনুমানিক ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাচক্রে পৌরোহিত্য করেন শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং প্রধান অতিথি হিসাবে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার ও মানপত্র বিতরণ করেন শ্রীশান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, বি-ডি-ও, শান্তিপুর।

কালিগঞ্জ ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় গত ২৮শে জুলাই কামারী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৩০ দিন ব্যাপী এক কবাডি প্রশিক্ষণ শিবির উদ্বোধন করেন স্থানীয় ব্লক পঞ্চায়েত সভাপতি। প্রশিক্ষক ছিলেন রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ের প্রাক্তন খেলোয়াড় মহঃ খোদাশেখ হোসেন। গত ৩১শে আগস্ট এই প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হবার কথা। এই অঞ্চলে কবাডি খেলাকে জনপ্রিয় করতে ও প্রসার ঘটাতে এটি একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে সামিল হয়েছেন ৪৮ জন উদীয়মান তরুণ শিক্ষার্থী।

সম্প্রতি (১১ই আগস্ট) দেবগ্রাম এস. এ. বিদ্যাপীঠে এই যুব অফিসের পরিচালনায় ব্লক বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। সভাপতি এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এবং স্থানীয় বি-ডি-ও শ্রীহরিপদ রায়। অংশগ্রহণকারী ১০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৬ জনকে পুরস্কার ও মানপত্র দেওয়া হয়। প্রথম দু'জন প্রতিযোগীকে জেলান্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্য নির্বাচিত করা হয়। প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

২৪-পরগণা জেলা

দেগঙ্গা ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় কার্তিকপুর দেগঙ্গা আদর্শ বিদ্যাপীঠে গত ১৯শে আগস্ট ব্লক বিজ্ঞান আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় অরুণ কর (কলসুর হাই স্কুল), মহঃ আবু সঈদ বিশ্বাস (সুবর্ণপুর হাই স্কুল) এবং সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (কার্তিকপুর দেগঙ্গা আদর্শ বিদ্যাপীঠ) যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে আদর্শ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅবনীতারণ সাহা এবং স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য ডাঃ সুধীরকুমার পাল। অনুষ্ঠানটিকে সার্থক

করার জন্য এই অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক সহযোগিতা অভিনন্দনযোগ্য।

কোচবিহার জেলা

হলদিবাড়ী ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় গ্রামীণ খেলাধূলার মান উন্নয়নকল্পে সম্প্রতি এক ব্লকভিত্তিক নক-আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মোট ২১টি প্রতিযোগী দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ১৫ই আগস্টের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় শান্তিনগরের ইউনিক ক্লাব বিজয়ী হয়। অচেনা বন্ধু গোষ্ঠি (আননোন ফ্রেন্ডস্ ক্লাব) পূর্বপাড়া বিজেতা হয়। প্রতিদিন ১০০০ দর্শক এই প্রতিযোগিতার উত্তাপ ভাগ করে নেন।

জলপাইগুড়ি জেলা

জলপাইগুড়ি সদর—বিশ্বব্যাপী শক্তিসংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা কি ভাবছে এ-ব্যাপারে স্থানীয় ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশনে সম্প্রতি 'পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি' শীর্ষক এক বিজ্ঞান আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রথম দুটি স্থান অধিকার করে সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের মনীষা ঘোষ এবং জিলা বিদ্যালয়ের দেবাশীষ বিশ্বাস। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী শিপ্রা গুপ্ত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণকালে যুবকল্যাণ বিভাগের এই ধরনের উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন এবং শহর-গ্রাম নির্বিশেষে সমস্ত বিদ্যায়তনের ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রতিযোগিতায় সামিল হওয়ার আবেদন জানান। ফণীন্দ্র দেব বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুবোধ মিত্র অনুষ্ঠানে সভাপতির পদে আসীন ছিলেন।

হুগলী জেলা

চন্ডীতলা ১নং যুবকরণের পরিচালনায় গত ১৭ই আগস্ট ব্লক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় মশাট আপতাপ মিত্র বিদ্যালয়ে। এই ব্লকের ৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫টি বিদ্যালয়ের ৯ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীনকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন মশাট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে গরলগাছা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীবিদ্যুৎ হাজরা যুবকল্যাণ বিভাগের এই অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ বছরের আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু 'শক্তির নবীকরণ' তাঁর মতে গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দুরূহ বিষয়। তিনি অনুরোধ করেন যে, বিষয় নির্বাচনের সময় গ্রামীণ প্রেক্ষাপট যেন মনে রাখা হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন যে, সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বেনীমাধব বালিকা বিদ্যালয়ের ব্রততী মিত্র ও আকুনী বি. জি. বিদ্যালয়ের পার্থপ্রতিম মান্না।

মুর্শিদাবাদ

কান্দি ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে গত ১৪ই আগস্ট স্থানীয় রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। 'পুর্ণ নবীকরণ-যোগ্য শক্তির উৎসাবলী'র উপর এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীবৈদ্যনাথ দে। কান্দি রাজ কলেজের ছাত্র অয়ন চক্রবর্তী এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। সামগ্রিক উদ্যোগ ও সহযোগিতার জন্য ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীতুহিন রায় অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

গ্রাম বাংলায় খেলাধূলার প্রসার এবং সম্ভাবনাময় ফুটবল খেলোয়াড়ের সন্ধানে যুবকল্যাণ বিভাগ যে পরিকল্পনা নিয়েছে তাকে বাস্তবায়িত করতে জলপাইগুড়ি সদর ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে অরবিন্দ নগর এবং মন্ডলঘাটে দু'টি প্রশিক্ষণ শিবির এক মাসের জন্য খোলা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ১২ থেকে ১৬ বছর বয়স্ক ১১২ জন কিশোরকে দু'টি শিবিরের জন্য মনোনীত করা হলেও চূড়ান্ত বাছাইয়ের পর ৮৫ জনকে ফুটবল খেলার নানা কলাকৌশল সম্পর্কে তালিম দেওয়া শুরু হয়। অরবিন্দ নগর শিবিরের দায়িত্বে ছিলেন জেলার প্রাক্তন খ্যাতনামা খেলোয়াড় ও আই. এফ. এ.-র আন্ডার স্টাডি কোচ শ্রীঅমল সান্যাল। অন্য দিকে মন্ডলঘাট শিবিরের প্রশিক্ষক ছিলেন গোয়ালিয়র থেকে জিমন্যাসটিক্স-এ শিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীবিপুলশংকর নিয়োগী। সরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণ শিবির স্থানীয় তরুণদের মনে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করে।

গত ১২ই আগস্ট **ভগবানগোলা ১নং ব্লকের** অন্তর্গত ভগবানগোলা উচ্চ বিদ্যালয়ে ব্লকভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। শক্তির উৎসের পুনরুদ্ধার বিষয়ক প্রতিযোগিতামূলক আলোচনাচক্রে এই ব্লকভুক্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। যৌথ উদ্যোক্তা ছিল যুবকল্যাণ বিভাগ (পঃ বঃ সরকার) ও বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা (ভারত সরকর) এবং ব্যবস্থাপনায় ভগবানগোলা ১নং ব্লক যুবকরণ, মুর্শিদাবাদ। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক শ্রীমঙ্গলময় মজুমদার এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক। পুরস্কার বিতরণ করেন ঐ বিদ্যালয়ের বর্ষীয়ান শিক্ষক শ্রীগণেশচন্দ্র সাহা। এই আলোচনাচক্রে বিচারকমন্ডলীর পদে আসীন ছিলেন জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎসিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীস্বপনকুমার দাশ, শ্রীসুভাষ ভট্টাচার্য ও শ্রীকল্যাণ বক্সি। বিচারকমন্ডলীর রায়ের ভিত্তিতে আসরাউল হক্, মুস্তাফা কামাল, রেজায়ুল করিম, আদিলুজ্জামান, স্বদেশবন্ধু সরকার ও রেজায়ুনল হক্ যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও মানপত্র দেওয়া হয়। এই ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, মহকুমা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক ও স্থানীয় বিজ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করেন।

[২৪ পৃষ্ঠার পর]

স্টেডিয়াম করা, খেলার মাঠে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা। বিশেষ করে ১৯৮১ সালের কলকাতার লীগ যেভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে শেষ হল তাতে সরকারের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়, দর্শক ও ক্লাবগুলোর সহযোগিতাও উল্লেখ করার মত। আবার বলি, সরকার যদি ফুটবল অর্গানাইজেশনগুলির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বসে ফুটবলের অবনতির কারণগুলি নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করেন, তাহলে উন্নতি হবেই হবে বলে আমার ধারণা।

পাঠকের ভাবনা

গ্রাম বাংলার ছোট পত্রিকাগুলির সমালোচনা হোক

আমি 'যুবমানস' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকার প্রতিটি বিভাগ আমার দারুণ ভাল লাগে। যেমন—কবিতা, সাহিত্য আলোচনা, শিল্পকলা, বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা এবং পুস্তক সমালোচনা।

সুন্দর ছাপা, সুদৃশ্য প্রচ্ছদ, পত্রিকাটিকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। ইতিমধ্যে পত্রিকাটি পাঠক মহলে সমাদর লাভ করেছে। তবু পাঠকেরা পত্রিকার কিছু কিছু সমস্যা চিঠি লিখে জানিয়েছেন, এজন্য সেই সব পত্রলেখকদের ধন্যবাদ।

সম্পাদক মহাশয়ের কাছে আমিও একটি আবেদন রাখছি—পুস্তক সমালোচনা (বইপত্র) বিভাগে প্রায় প্রত্যেকটি সংখ্যাতেই দামি দামি বই-এর সমালোচনা দেখতে পাই, ছোটখাট (লিট্‌ল ম্যাগাজিন) পত্রিকাগুলির সমালোচনা খুবই কম চোখে পড়ে।

আমার অনুরোধ গ্রাম-বাংলায় প্রকাশিত ছোট পত্রিকাগুলিকে আপনাদের সমালোচনায় স্থান দেওয়া হোক। আশা করি বিষয়টি আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

বাবলু রায়
সম্পাদক, 'জোনাকি' সাহিত্য পত্রিকা
বনগ্রাম, ২৪-পরগণা

যুবমানসের পাতায় গ্রামীণ সাহিত্য

যুবমানস পত্রিকার আমি একজন সাধারণ পাঠক।

সাহিত্যের মিছিলেও আমি একজন শেষ সারির শেষ ব্যক্তি। অনেক সামনে থেকে যারা হাত উঁচিয়ে সাহিত্যের শ্লোগান দেয় তাদেরকে এখান থেকে দেখা যায় না। শোনা যায় না তদের তীব্র অঙ্গীকার। দূরত্ব অনেক। দূরত্ব কলকাতা থেকে গোবরডাঙ্গা ইছাপুরের।

যুবমানসের পাতায় গ্রামীণ সাহিত্যকে বিশেষ স্থান দেওয়ায় আমি ধন্য। দেশ মানে শুধু শহরই নয়। সমস্যা, সংশয়, সঙ্কোচ—গ্রামে গ্রামে। গ্রীষ্মের অসহ্য বুকফাটা তাপে। তৃষ্ণার তীক্ষ্ণতায়। বর্ষার বীভৎস বন্যা-প্লাবিত হতাশায়। তলশেষ জলের ব্যর্থতায়। শীতের নিদারুণ কনকনে ঠাণ্ডায়। দীর্ঘ বরফ-রাতের অস্থিরতায়।

এদেরই নিয়ে আমি গল্প লেখার চেষ্টা করি। এদের দৈনন্দিন শূন্যতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করি। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, বিদগ্ধ, বিক্ষুব্ধ এরা।

আমার প্রিয় সম্পাদক, আমাকে যদি এই যুবমানসের অমূল্য পাতায় একটু স্থান দেন, তাহলে এদেরকে আমি যুবমানসের সাদা পাতায় কালো অক্ষরে তুলে ধরতে পারি।

সম্মতির অপেক্ষায় রইলাম।

৭ই শ্রাবণ, ১৩৮৮

সরকারের প্রতি অনুরোধ

সম্প্রতি রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও অন্য কয়েকটি মহাবিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই সঙ্গে আরও তিনটি প্রস্তাব রাখছি।—

(১) গ্রাম-বাংলার কিছু কিছু মহাবিদ্যালয়ে প্রভাতী বিভাগ কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য খোলা প্রয়োজন।

(২) প্রস্তাবিত মেদিনীপুর ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে না হলেও অন্য একটি উচ্চতর পঠন-পাঠন কেন্দ্র কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য খোলা যেতে পারে। এতে বিজ্ঞান, কলা, গার্হস্থ্য বিদ্যা, কারিগরী বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা যায়।

(৩) সারা বাংলার সমস্ত মহাবিদ্যালয়ে প্রভাতী বিভাগে বাংলা মাধ্যমে পড়াশুনোর ব্যবস্থা নেওয়া এবং এর মধ্যে নির্দিষ্ট কতকগুলি কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য থাকবে।

শ্রীরাধাকান্ত ঘোড়াই
অধ্যক্ষাধিপতি, এস. ও. এম. মন্দির
মেদিনীপুর

২৫শে আগস্ট পূর্তমন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের স্মৃতি-শিলার আবরণ উন্মোচন করলেন। পাশে দুগ্ধ ও পশুপালন মন্ত্রী শ্রীঅমৃতেন্দু মুখার্জি।

Reg. No. 32875/78 Postal Reg. No. WB/CC-15

ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী মহাকরণের সামনে শহীদ বেদীতে ৯ই আগস্ট-এর শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন।

গত ১ই নভেম্বর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির রজতজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বিশাল জমায়েতে ভাষণ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু

স্টুডেন্টস হেল্থ হোমে ৩রা নভেম্বর ভারতের যুব ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা দিবসে রক্তদান করছেন যুব আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। মোট ২৫৯ জন রক্তদান করেন।
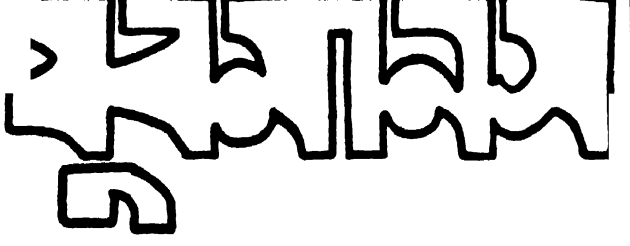
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
ডিসেম্বর, '৮১

উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি এবং পত্রিকা সম্পাদক : কান্তি বিশ্বাস

প্রচ্ছদ : কাজল দাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা-৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—চল্লিশ পয়সা

প্রবন্ধ

আলোচনা

প্রতিবেদন

গল্প

কবিতা

শিল্প সংস্কৃতি

লোকচিত্রকলা

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

খেলাধুলা

বিভাগীয় সংবাদ

পাঠকের ভাবনা

সম্পাদকীয়

এই বিপজ্জনক খেলা বন্ধ করুন

ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত, বুকে নবীন আশা, চোখে কাব্যিক কল্পনা, মনে রঙিন স্বপ্ন, দেহে তাজা প্রাণ, বাহুতে অমিত শক্তি, সৃষ্টি করার উন্মাদনায় ভরপুর মানসিকতা—এই ত যৌবনের বৈশিষ্ট্য। এই যৌবনের সঠিক ব্যবহারে দেশ হয় সমৃদ্ধশালী, জাতি হয় উন্নত। উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক অবস্থায় এই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ আজ জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে বহুলাংশে মুক্ত; জীবন-ধারণের ন্যূনতম চাহিদাগুলি পরিপূর্ণ করতে তারা সক্ষম। অন্যদিকে দুর্লভ গুণাবলীর অধিকারী এই মানব সম্পদের কি শোচনীয় অপচয়! সবচেয়ে ধনশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাতাস আজ প্রায় এক কোটি কর্মহীন যুবকের মর্মবেদনায় ভারাক্রান্ত। বিলাত আর ফরাসী মুল্লুক থেকে শুরু করে প্রথম সূর্যোদয়ের দেশ হিসাবে পরিচিত জাপান সর্বত্র আজ তরুণের সৃজনী শক্তির অপমৃত্যুর এক করুণ দৃশ্য বিরাজমান। ব্যতিক্রম শুধু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতাভুক্ত দেশগুলি। শত বৎসরের বেশি পুরনো নিদারুণ শক্তিশালী জমিদারী ব্যবস্থার জোয়াল থেকে বেরিয়ে এসে মাত্র দশ বৎসরের মধ্যেই সবচেয়ে জনবহুল রাষ্ট্র চীন দেশ থেকে বেকারীত্বকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারল। দুই দশকের উপর ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সাথে দাঁতে দাঁত দিয়ে মুক্তি সংগ্রামরত ক্ষত-বিক্ষত ভিয়েতনাম আজ বুক চিতিয়ে বলে "সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ আর বেকারীত্বের দংশন আমরা নিশ্চিহ্ন করতে পেরেছি।" সমাজবাদী দেশগুলি যা পেরেছে ধনবাদী দেশগুলি তা পারে নি। তা করতে পারে না। আর পারে না বলেই এক-একটা পাঁচসালা পরিকল্পনা আমরা শেষ করছি আর তারই সাথে পাল্লা দিয়ে বেকারের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। গ্রাম-শহর মিলে আজ কয়েক কোটি তরুণ বেকারীত্বের তীব্র জ্বালায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কয়েক মাস পূর্বে রাজ্যসভায় জানিয়েছেন যে ষষ্ঠ পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে দেশে বেকারের সংখ্যা আরও বাড়বে।

বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেকার যুবক আমাদের দেশে। আবার আমাদের দেশের মোট বেকার যুবকের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বাস করে আমাদের এই রাজ্য পশ্চিমবাংলায়। হঠাৎ এই অবস্থার সৃষ্টি হয় নি। যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে আমরা আছি তাতে সব যুবক কাজ পাবে এ আশা করা বাতুলতা। এ রাজ্যে এই বেকারীত্বের তীব্রতা আরও বেড়েছে এই জন্য যে বিগত দুই দশক ধরে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় সমগ্র পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে শিল্পে অগ্রগতির পরিমাণ দেশের অপরাপর অংশ হতে কম। এই সময়ের মধ্যে কোলকাতায় পাতাল রেল ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন কেন্দ্রীয় বিনিয়োগ এই রাজ্যে হয় নি বল্লেই চলে। অথচ সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় কতকগুলি অনিবার্য কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। অতি দ্রুত গতিতে এই কর্মহীন যুবকের সারি বেড়েই চলেছে।

রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার এ বিষয়টির প্রতি যথোচিত নজর দেয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার আশু কোন পথ যে নেই তাও এই সরকার সঠিকভাবেই উপলব্ধি করে। এই সংকটের গভীরতা অনুভব করে রাজ্য সরকার তাই এক-দিকে বেকার ভাতা চালু করে বেকারদের যৎসামান্য রিলিফের ব্যবস্থা করে এবং বেকারত্বের জন্য বেকার যুবক দায়ী নয়—দায়ী সমাজব্যবস্থা —এই নিষ্ঠুর সত্যকে সরকারী স্বীকৃতি দিয়ে সচেতন যুব সমাজের বক্তব্যকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করে। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রকল্পের সাহায্যে এই সমস্যার ভয়াবহতা একটু কমানোর জন্য কতকগুলি যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পঞ্চায়েতের সাহায্যে কাজের বদলে খাদ্য সহ বিভিন্ন গ্রামীণ পরিকল্পনা শুরু করে। এতে গ্রামে কিছু কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। গ্রামীণ বেকারদের কষ্টের একটু লাঘব হয়। এরই সাথে রাজ্যে থমকে দাঁড়ানো শিল্পের গতিতে একটু প্রাণ সঞ্চার করার জন্য অনেকগুলি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হলদিয়া জাহাজ মেরামত, পেট্রো-রসায়ন ও উপকূলবর্তী এলাকায় ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র স্থাপন, লবণহ্রদে ইলেকট্রনিক কারখানা ও দুর্গাপুরে ট্রাক নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করা, অনেকগুলি বন্ধ ও রুগ্ন কারখানা খোলা, এবং চালু কারখানাগুলিকে যেখানে যেখানে সম্ভব আরও সম্প্রসারিত করা প্রভৃতি প্রস্তাবগুলি উল্লেখযোগ্য। এই প্রকল্পগুলির পিছনে কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ মহলের জোরালো সমর্থন থাকা সত্ত্বেও বিনা কারণে অথবা অতি হাস্যকর অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের অভাবে এর কোনোটিই কার্যকরী করা যাচ্ছে না। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট রাজ্যগুলি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট সামরিক শাসনাধীন 'পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় হওয়া সত্ত্বেও কারখানা স্থাপন করতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি ওঠে নি। অথচ রাজ্যের রাজধানী কোলকাতার দোরগোড়ার লবণ-হ্রদে ইলেকট্রনিক কারখানার অনুমতি দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচণ্ড আপত্তি—কেন না এটি বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা। সত্যিই রহস্যময় কেন্দ্রীয় সরকারের অপার লীলা! দিল্লীর মাতব্বরেরা কি এ কথা জানে না যে বাংলাদেশ থেকে অনেক বেশি বিপজ্জনক পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী? তারা কি এ কথা জানে না যে বর্তমানের আণবিক যুগে হাজার মাইলের দূরত্বও যুদ্ধের ক্ষেত্রে কোন দূরত্বই নয়? এ কথা সর্বজন-স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার লবণহ্রদে ইলেকট্রনিক শিল্পকেন্দ্র খুলতে অনুমতি না দিয়ে এক বিপজ্জনক নজীর সৃষ্টি করল। এই রাজ্যের বেকার যুবকদের কাছে এ এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

সারা ভারতে সোয়া দুই লক্ষ রুগ্ন শিল্প-কেন্দ্র ধুকছে। এর মধ্যে এক বিরাট অংশ ইতি-মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। এই রাজ্যেও এই বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পকেন্দ্রের সংখ্যা নেহাত কম নয়। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের বর্তমান সরকার দুর্বল ও বন্ধ কারখানাগুলির মধ্যে ৫৭টিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। এতে ৩৭ হাজার শ্রমিক পুনরায় তাদের কাজ ফিরে পেয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের বাধা প্রচুর। কোন রুগ্ন বা বন্ধ শিল্পকেন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য রাজ্য সরকার ঐ শিল্পকেন্দ্রের সমস্যা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন তদন্ত পর্যন্ত করতে পারে না, কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব-অনুমতি ছাড়া। সংবিধানের এই ফাঁসে আটকিয়ে গিয়ে রাজ্য সরকারের শুভ প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে বারে বারে হোঁচট খায়। কাজ অহেতুক দেরী হয়।

কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের গম কেন্দ্রীয় সরকার কার্যতঃ বন্ধ করে দিয়ে এবং হালে তৈরী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ কেন্দ্রীয় সরকার নিদারুণ ভাবে ছাঁটাই করে কৃষিজীবী বেকার যুবকদের কাজের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তা মূলতঃ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

দেশের মধ্যে দিল্লীর সরকার সবচেয়ে বড় নিয়োগকর্তা। সরকারী দপ্তর ও তার পরিচালিত সংস্থায় নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা বিরাট। এই রাজ্যে অবস্থিত এই সকল বিভাগ ও সংস্থায় প্রচুর সংখ্যক শূন্য পদ দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে। একমাত্র ডাক ও তার বিভাগেই বেশ কয়েক হাজার পদ শূন্য অবস্থায় রয়েছে। এই সকল পদগুলি পূরণ করলে রাজ্যের বেশকিছু সংখ্যক বেকার যুবক-যুবতী বেকারীর জ্বালা থেকে একটু রেহাই পেতে পারতেন। এই পদ-গুলি পূরণ করার জন্যে বিভিন্ন পক্ষ থেকে

জোরালো দাবী উঠেছে। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার এক বিজ্ঞপ্তি জারী করে তার অধীন পদসমূহে নিয়োগের জন্য এক নতুন বিধানের কথা ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণায় গোটা দেশ থেকে তিনটি রাজ্যের যুব সমাজকে পৃথক করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার দ্বারা তদন্ত না করে এই তিন দুয়োরানীর সন্তান-সন্ততিদের যোগ্যতা যাই থাক না কেন—কোন পদে নিয়োগ করা হবে না। রাজ্য তিনটি হচ্ছে কেরালা, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্রীয় আইন সভায় বিরোধী সদস্যদের তীব্র প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এর পক্ষে সাফাই গেয়েছেন এবং যা করা হয়েছে তা ঠিক করা হয়েছে বলে দম্ভোক্তি করেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার এখানেই থামেন নি। সামরিক বাহিনীতে লোক নিয়োগের জন্য প্রার্থীকে একটি ফর্ম পূরণ করতে হয়। এ বৎসর সেই ফরমে প্রার্থীটিকে উল্লেখ করতে হবে যে সে কতদিন পশ্চিমবাংলায় কিংবা কেরালায় বসবাস করেছে। বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না যে এই দুই রাজ্যের যুবদের প্রেমে গদগদ হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগ, যার দায়িত্বে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজে, এই হুকুমনামা জারী করে নি। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তসমূহ ও ব্যবস্থাগুলির দ্বারা এই রাজ্যের যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ যে যথেষ্ট পরিমাণে সংকুচিত হবে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা ভারত সরকারের এই নির্দেশের সাথে এই রাজ্যের মানুষ বিশেষ করে যুবসমাজের মর্যাদার প্রশ্ন গভীরভাবে জড়িত।

সত্যিই কি এই রাজ্যের যুবক-যুবতী সাধারণভাবেই সমাজবিরোধী অথবা এমন সব বিপজ্জনক কাজের সাথে যুক্ত যাতে করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের তদন্ত ছাড়া এরা কেন্দ্রীয় সরকারী বিভাগ বা সংস্থায় কাজ পেতে পারেন না। রাজ্যে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকার তো এই সাড়ে চার বৎসরে লক্ষাধিক যুবক-যুবতীকে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করেছেন। কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে, গোয়েন্দা রিপোর্টের কোন প্রকার তোয়াক্কা না করে এই সকল নিয়োগ করা হয়েছে। এই রাজ্যের ঘটন-অঘটন, ত্রুটি-বিচ্যুতির গন্ধ শুঁকতে চাওয়ায় দিবা-নিশি ব্যস্ত সেই সব বিচক্ষণ মহোদয়গণকে তো এমন কথা বলতে কখনো শুনি নি যে এই রকম তদন্ত-টদন্ত না করে লোক নিয়োগ করার ফলে রাজ্যের প্রশাসনে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে, রাজ্যের নাভিশ্বাস উঠেছে। না হলে কেন এই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা তদন্ত?

দেশ-প্রেমের মানদণ্ডে, দেশাত্মবোধের বিচারে এই রাজ্যের যুবক-যুবতী কি এমনই অবিশ্বাসী, এই রাজ্যের আবহাওয়া কি এতই কলুষিত, বাংলার মাটি কি এতই দূষিত যে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ করার পূর্বেই যাচাই করে দেখতে হবে যে এখানকার বিষাক্ত পরিবেশে একজন যুবকের কতদিন কেটেছে!

ভিন্ রাজ্য থেকে আগত কর্মরত মানুষদের তাড়িয়ে দিয়ে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারীত্বের জ্বালা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কোন কোন রাজ্যের যুব সমাজের এক অংশকে যখন ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় লিপ্ত হতে দেখা যায়, তখন এই রাজ্যে কর্ম নিয়োগ কেন্দ্রে ২৮ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীর নাম নথিভুক্ত থাকা সত্ত্বেও এবং এই রাজ্যে অবস্থিত কল-কারখানায় শতকরা ষাট ভাগ অবাঙ্গালী শ্রমিক নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও এখানকার চেতনাসম্পন্ন যুব সমাজ অধিকতর কাজের সুযোগ সৃষ্টির আশায় ভিন্ রাজ্য থেকে আসা শ্রমিক-কর্মচারীদের তাড়িয়ে দেয়ার মত কোন সর্বনাশা দাবী তোলে না—কেন না তারা জানে এ পথ বেকার সমস্যার সমাধানের পথ নয়; বরং সমাধানের পথকে এ-জাতীয় আন্দোলন আরও দুরূহ করে তোলে। যুব মনের এই উন্নত চেতনার পুরস্কার কি কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘৃণ্য ঘোষণা?

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোলামী থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য এই রাজ্যের যুব সমাজ যে ত্যাগ ও আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন সেই বিনয়-বাদল-দীনেশ ও সুভাষ-যতীন-ক্ষুদিরাম-সূর্য সেনের বংশধরদের এইভাবে অপমানিত করার সাহস দেখাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাত একটু কেঁপে উঠল না?

১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত হতাশা, লোভ-লালসা, যৌনতা, ক্লীবতা, অপসংস্কৃতি আর কুশিক্ষার দ্বারা গোটা যুব সমাজের মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিয়ে তার মাথাটাকে বিকৃত করে দেবার যাবতীয় দক্ষ পরিকল্পনাকে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী যুব সমাজ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দেবার ফলে কোন বিশেষ মহল ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তাই বলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের গোটা যুব সমাজকে এইভাবে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার পথ গ্রহণ করবেন? একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখেছেন কি—এর পরিণাম কি ভয়াবহ হতে পারে—এর প্রতিক্রিয়া কি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হতে পারে?

তাই সমগ্র দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিশেষ করে যুব সমাজের কাছে আহ্বান, কেন্দ্রীয় সরকারের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন। আর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন, দেওয়ালের লেখা পড়তে চেষ্টা করুন। ইতিহাসের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হোন, এই বিপজ্জনক খেলা বন্ধ করুন।

'এসমা-৮১'—জরুরী অবস্থা সৃষ্টির সুচিন্তিত পদক্ষেপ

বরদা ভট্টাচার্য

১৯৭৫ সালের জুন মাসে দেশে 'জরুরী অবস্থা' জারী করে একচ্ছত্র স্বেচ্ছাচার চালাবার "মধুর অভিজ্ঞতাময়" দিনগুলির কথা শাসকদল, বিশেষ করে তাদের নেতৃবর্গ কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। স্বেচ্ছাচার তথা স্বৈরতন্ত্রের প্রতি শাসকদলের ঝোঁক ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করবার পর থেকেই সুস্পষ্ট হতে থাকে। তারই পরিপূর্ণ চেহারা দেখতে পাওয়া গেল জরুরী অবস্থা ঘোষণার মধ্য দিয়ে। প্রতিবাদ, আন্দোলন, সংগ্রাম, এককথায় গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ তাঁরা সহ্য করতে পারেন না। নিজেদের দলের মধ্যে কোন গণতান্ত্রিকতা নেই—সারা দেশেও গণতন্ত্র উচ্ছেদের জেহাদ ঘোষণা করে একদলীয় শাসন প্রবর্তন করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছেন। জরুরী অবস্থার দিনগুলিতে নির্মম অত্যাচারের বন্যায় দেশের মানুষের প্রতিবাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিয়ে নিরঙ্কুশ স্বৈরশাসন চলেছিল ১৯টি মাস ধরে। কিন্তু ১৯ মাসের এই সুখকর স্মৃতি আবিল হয়ে ওঠে যখনই মনে পড়ে ১৯৭৭-এর তিক্ত বিষাদময় অভিজ্ঞতার কথা। অপরাজেয় শাসক দল, অপরাজেয়া তাঁদের নেত্রী সদলবলে নির্বাচনে পরাজিত হয়ে শুধু ক্ষমতাচ্যুতই হন নি, —শাহ কমিশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন তদন্ত কমিশন একটার পর একটা কলঙ্কজনক কাহিনী উদ্ঘাটিত করে তাঁদের নাস্তানাবুদ করে তুলেছিল ১৯৭৭-এর নির্বাচনোত্তর দিনগুলিতে।

স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয়বার ক্ষমতা দখলের পর থেকে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে আবার জরুরী অবস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করে একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা কায়েম করার। বলা বাহুল্য, সেই একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা হবে পুরুষানুক্রমিক, একান্তই পারিবারিক। কিন্তু এই অভিলাষ চরিতার্থ করার পথে দুর্লংঘ্য বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে ১৯৭৭-এর নির্বাচনের ফলাফল। সেই কারণেই সরাসরি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার ইচ্ছা মনের মধ্যে অবদমিত রেখে নানারকম কৌশল গ্রহণ করতে হবে শাসক দলের নেত্রীকে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য।

তাই ১৯৮০ সালের জানুয়ারীর নির্বাচনে ক্ষমতা দখলের পর থেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে একটার পর একটা মরীয়া প্রচেষ্টা চলেছে সারা দেশে এমন একটা সাংবিধানিক প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি করার যার অনিবার্য পরিণতি হবে একনায়কতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সেই একনায়কতন্ত্রী সরকারের যে কোন রকম সম্ভাব্য বিরোধিতার উৎখাত করা। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই নির্বাচনের পর থেকেই প্রচার শুরু হয়ে গেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি ধাঁচের সরকার গঠনের। সাময়িকভাবে একটু পিছু হটলেও সেই প্রচারাভিযান আজও অব্যাহত রয়েছে। শুধু অপেক্ষা করতে হচ্ছে উপযুক্ত সময়ের, প্রকৃষ্ট সুযোগের। সেই সময় এবং সেই সুযোগ উপস্থিত হওয়ার সংগে সংগেই তাকে কাজে লাগানো হবে সম্পূর্ণ সার্থকভাবে। সংবিধান হবে পরিবর্তিত। আইনসংগতভাবেই সাংবিধানিক কায়দায় পরিবর্তন হবে শাসনব্যবস্থার—পার্লামেন্টারী ক্যাবিনেট পদ্ধতির বদলে সৃষ্টি হবে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার।

জাতীয় নিরাপত্তা আইন বা ন্যাসা সেই কাঠামোরই একটি অংগ—কুখ্যাত 'মিসা'র অবিকৃত সংস্করণ। জাতীয় নিরাপত্তা আইন—অর্থাৎ সংক্ষেপে বিনাবিচারে আটক রাখার আইন করেই তাঁরা ক্ষান্ত হয় নি—ফৌজদারী দণ্ডবিধিকে সংশোধন করে তাকে আক্রমণমুখী করা হয়েছে—দমন পীড়নের হাতিয়ার হিসাবে। সেই একই পথে, একই লক্ষ্য সামনে রেখে তৈরী করা হয়েছে 'এসমা' বা অত্যাবশ্যক শিল্পসংস্থা কৃত্যক চালু রাখার আইন যে আইনের বলে যে কোন শিল্পে, প্রতিষ্ঠানে বা সংস্থায় শ্রমিক কর্মচারীদের যে কোন ধরনের আন্দোলন করার অধিকার নিষিদ্ধ করার একচ্ছত্র ক্ষমতা হাতে রাখা হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা আইন, সীমাবদ্ধভাবে প্রেস সেনশারশিপ আইন, অত্যাবশ্যক শিল্পসংস্থার ধর্মঘট বা কর্মবিরতি নিষিদ্ধ করার আইন এক সঙ্গে গ্রথিত হলে যে চিত্র প্রকাশ পায় রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থায় তা জরুরী অবস্থার নামান্তর, স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি।

বিনাবিচারে আটক রাখার আইন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে ক্ষমতালাভের সাথে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কংগ্রেসী শাসনের অংগের ভূষণ। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর হাতে তা হয়েছে আরও ব্যাপক, আরও হিংস্র যার কিছুটা পরিচয় দেশের সমস্ত মানুষ পেয়েছিল জরুরী অবস্থার দিনগুলিতে। অত্যাবশ্যক সংস্থায় ধর্মঘট নিষিদ্ধকারী আইনও পূর্বসূরী ইংরাজদের কাছ থেকে পাওয়া এক দানবীয় অস্ত্র যা শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘটকে দমন করার হাতিয়ার হিসেবে প্রযুক্ত হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পিতা জওহরলাল নেহরুর শাসনকাল থেকে। তবুও কিছু পার্থক্য আছে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে কয়েকবার এই আইন অর্ডিন্যান্স হিসেবে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু তা হয়েছে কিছু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সরকারের স্বভাবসুলভ মোকাবিলা করার পদ্ধতি হিসাবে। বিশেষ করে যখন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা ১৯৬০ ও ১৯৬৮ সালে ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়েছিলেন প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতনের দাবীতে এবং মূল্যবৃদ্ধির পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করে মহার্ঘভাতা প্রদানের দাবীতে। এবং ১৯৭৪ সালে রেল শ্রমিককর্মচারীরা ২০ দিনব্যাপী ঐতিহাসিক ধর্মঘট করেছিলেন, বোনাস, বেতনক্রম পরিবর্তনসহ কয়েকটি দাবীতে, কেন্দ্রীয় সরকার সেই ধর্মঘটগুলির প্রাক্কালে রেল ডাক তার প্রভৃতি সংস্থায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে অর্ডিন্যান্স জারী করেন এবং বহু ধর্মঘটী কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করেন ধর্মঘটকে দমন করবার জন্য। বে-সরকারী শিল্প সংস্থায় ধর্মঘট বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে অসংখ্যবার সন্দেহ নেই, কিন্তু তা হয়েছে নির্দিষ্ট শিল্পের ধর্মঘট চলাকালীন বাস্তব অবস্থায়। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশের কংগ্রেস সরকার কখনও শ্রমিক কর্মচারী খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনজীবিকার সংগ্রাম করার অধিকারকে মেনে নেয় নি এবং যখনই তাঁরা সংগ্রাম বা ধর্মঘট করেছেন তাঁদের জীবনজীবিকার দাবী আদায়ের জন্য অথবা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য, সরকার এবং মালিকশ্রেণী সেই ধর্মঘটকে দমন করতে পুলিশ, লাঠি, গুলি, টিয়ারগ্যাস, গ্রেপ্তার প্রভৃতির নির্বিচার প্রয়োগ করেছেন। আইনী ধর্মঘট এদেশে কখনও হয় নি, হয় না। এদেশে ধর্মঘট মাত্রই মালিক তথা শাসকশ্রেণীর চোখে বে-আইনী, এটা দিনের পর রাত্রি আসার মত স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। বিশেষ করে সরকারী সংস্থায় ধর্মঘটকে শাসকশ্রেণী বিদ্রোহ দমনের মানসিকতা নিয়ে প্রচণ্ড পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করেই মোকাবিলা করেন বা করেছেন আর শ্রমিক কর্মচারীরা এই দমন-পীড়নকে প্রতিরোধ করেই ধর্মঘট করেন, এটাই হচ্ছে সাধারণ এবং স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা। এদেশে কোন লক আউট বা লে-অফের জন্য মালিককে গ্রেপ্তার করা হয় নি বা হয় না, শ্রমিক কর্মচারীরা ধর্মঘট করলেই পুলিশ ধর্মঘটী শ্রমিক কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করবে, এর মধ্যে আবার প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? সরকারই ত মালিকদের সরকার। সেই কারণেই কংগ্রেস রাজত্বে বিভিন্ন সময়ে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে যে সব আইন বা অর্ডিন্যান্স জারী হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন হলেও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সৃষ্ট 'এসমা-৮১'র প্রবর্তনের মত সারা দেশজুড়ে এই ধরনের আলোড়ন শুরু হয় নি। শুধুমাত্র কোন বিশেষ সংস্থায় বা সংগঠনে ধর্মঘট চলাকালীন অবস্থার তাৎক্ষণিক মোকাবিলা করার প্রয়োজনে 'এসমা-

৮১' আইন পাশ করা হয় নি। আসলে জুলাই '৮১-তে নাটকীয় চমক্ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'এসমা' অর্ডিন্যান্স ঘোষণার দিন কোন উল্লেখযোগ্য শিল্প বা সংস্থায় সংগঠিত ধর্মঘট ছিল না। আর সেই জন্যই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 'এসমা-৮১' অর্ডিন্যান্স জারী এবং তৎপরবর্তীকালে পার্লামেন্টে ভোটের মাধ্যমে 'এসমা-৮১' দেশের সাধারণ আইন হিসাবে প্রবর্তন গুণগতভাবেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আর সেই কারণেই 'এসমা-৮১'কে একমাত্র আই এন টি ইউ সি (আই) ছাড়া দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমিককর্মচারীদের সংগঠন স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং এই আইনকে প্রতিরোধ করবার জন্য ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

'এসমা-৮১'র পরিধি অপরিসীম। প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে যদিও ডাক তার পরিবহণ প্রভৃতি কয়েকটি সংস্থা বা শিল্পের নাম উল্লেখ করা হয়েছে—সেটা শুধু উদাহরণস্বরূপ। যে কোন সংস্থা সম্বন্ধে দেশের আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে পারে সেই সমস্ত সংস্থাই এই আইনের আওতাভুক্ত। শুধু প্রত্যক্ষভাবে ধর্মঘট (এমনকি বিক্ষোভ প্রদর্শনও) করাই শুধু নয়, যে কোন ধরনের কাজ (আন্দোলন) সরকার বা শাসকদলের মতে সংস্থা চালু রাখার অন্তরায়মূলক হবে, সে সবই এই আইনের গণ্ডীর মধ্যে পড়বে। ধর্মঘটের সংগে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক কর্মচারীরা বা ধর্মঘটের প্রতি সমর্থনমূলক কাজকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিরাই শুধু নয়, ধর্মঘটের প্রতি মনে মনে সমর্থন করে এরকম সন্দেহভাজন ব্যক্তিমাত্রই গ্রেপ্তারযোগ্য অপরাধে অপরাধী হবে এবং যে কোন পুলিশ কর্মচারীর সন্দেহই 'অপরাধীকে' গ্রেপ্তার করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ হবে। আর যা বোধহয় কোন সভ্যদেশেই প্রচলিত নয় তেমন এক নজীরবিহীন ব্যবস্থা হল সরাসরি বিচার হবে 'অপরাধীদের'। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন অবকাশই তাদের থাকবে না। অভিযোগকারী পুলিশ কর্মচারীর সাক্ষ্যই হবে যথেষ্ট—অভিযোগ প্রমাণের জন্য অপর কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে না। জেল, জরিমানা প্রভৃতি শাস্তি একেবারে জ্যামিতিক ফর্মুলায় বাঁধা। এই বিধিগুলিই 'এসমা-৮১'কে অতীতের সমস্ত অর্ডিন্যান্স আইন থেকে পৃথক এক বিশেষ চরিত্র দিয়েছে আর সংবিধান প্রদত্ত ধর্মঘট করার এবং বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারকে হাস্যকর বস্তুতে পরিণত করেছে। গ্রেপ্তার, জেল, জরিমানা, পুলিশী নির্যাতনের সন্ত্রাসের মাধ্যমেই শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘট করার অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা গ্রহণ করা হয়েছে 'এসমা-৮১'র আইনের সাহায্যে। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শ্রমিক কর্মচারীকে ধর্মঘট করতে দেওয়া হয় না। 'এসমা-৮১' ভারতবর্ষের শ্রমিক কর্মচারীকে ধর্মঘট করতে না দেওয়ার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই স্থায়ী আইন হিসেবে প্রবর্তিত হয়েছে। এবং সেই কারণেই 'এসমা-৮১' শুধুমাত্র শ্রমিক মালিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণকারী একটি সাময়িক ব্যবস্থা নয়—এটা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অংগীভূত এক সুচিন্তিত পদক্ষেপ। উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখার অন্তরায় দূর করা বা দেশের সম্পদ সৃষ্টি বা যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতিতে বাধা দূর করা ইত্যাদি গালভরা কথা ঘোষিত হলেও, আসলে প্রত্যক্ষভাবে ঘোষণা না করেও জরুরী অবস্থার সৃষ্ট পরিবেশ তৈরী করাই যে এই আইনের উদ্দেশ্য তা যে কোন সাধারণ বুদ্ধির মানুষের কাছেও দিবালোকের মত স্পষ্ট। স্পষ্টতঃই ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতি শিল্পমালিকদের মুখপাত্ররা উলঙ্গ উল্লাস প্রকাশ করেছেন এই আইন প্রণয়নের জন্য, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন মালিকশ্রেণীর স্বার্থবাহী সরকারকে। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সংবাদপত্রসমূহের কোন কোন গোষ্ঠী সাধারণভাবে জরুরী অবস্থার বিরোধিতা করলেও, ইমার্জেন্সির এক বৎসর শীর্ষক তাঁদের পর্যবেক্ষণে সপ্রশংস মন্তব্য করেছিল—যে অপর সকল বিচারের কথা বাদ দিলেও জরুরী অবস্থার ইতিবাচক ভূমিকা হিসাবে শ্রমিক আন্দোলন উদ্ভূত শ্রমদিবস নষ্ট হওয়ার প্রবণতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে দমন করতে সক্ষম হয়েছে। নিঃসন্দেহে 'এসমা-৮১' জরুরী অবস্থার সেই ভূমিকার কথা স্মরণ রেখেই একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে শাসকশ্রেণী বা তাদের রাজনৈতিক সংগঠন ইতিহাসের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করে না, কখনও করে নি। তাই রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেস বা সেই দলের একচ্ছত্র নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ইচ্ছাই এ দেশের ভবিষ্যতের চূড়ান্ত নিয়ামক ঘটনা হতে পারছে না। ১৯৮১ সালে আবার ১৯৭৫ সালকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা বিয়োগান্ত নাটকের করুণ ট্র্যাজেডিতে পরিণত হচ্ছে। পার্লামেন্টে 'এসমা-৮১' গৃহীত হবার সংগে সংগেই ভারতবর্ষের তিনটি রাজ্য সরকার---পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এবং কেরালার বামগণতান্ত্রিক সরকার দৃঢ়তার সংগে ঘোষণা করলেন যে তাঁদের রাজ্যে এই স্বৈরতান্ত্রিক আইন তাঁরা প্রয়োগ করবেন না। জরুরী অবস্থার সন্ত্রাসের অভিজ্ঞতায় পোড়খাওয়া ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী তীব্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন এই বর্বর আইনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলবার জন্য। সেই সংগ্রামে সাথী হয়েছেন যুগ যুগ ধরে মুখবুজে মারখাওয়া ভারতবর্ষের লক্ষকোটি কৃষক ক্ষেতমজুর। ২৩শে নভেম্বরের শ্রমিকদের ঐতিহাসিক দিল্লী অভিযান সেই সংগ্রামেরই দ্ব্যর্থহীন অভিব্যক্তি। ইতিমধ্যেই দিকে দিকে শ্রমিক কর্মচারীরা ধর্মঘট সংগ্রামে নেমে পড়ছেন 'এসমা-৮১'কে উপেক্ষা করে। উত্তরপ্রদেশের কারারক্ষীদের দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট, অন্ধ্র প্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে শ্রমিক কর্মচারী এমনকি পুলিশ কর্মচারীদের ধর্মঘট—'এসমা-৮১'কে নিছক কাগুজে আইনে পর্যবসিত করেছে। সন্ত্রাস সৃষ্টির দুরভিসন্ধিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিকে দিকে শ্রমিক কর্মচারী খেটেখাওয়া মানুষেরা প্রমাণ করছেন—শেষ কথা বলবে শ্রমিক, কৃষক, খেটেখাওয়া মানুষ—শাসকশ্রেণী ইতিহাসে কখনই শেষ কথা বলতে পারে নি। দলমত নির্বিশেষে শ্রমিক-কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ মোর্চা 'জাতীয় প্রচার কমিটি' শাসকশ্রেণীর স্বৈরতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ দুর্গ। প্রচার কমিটির আহূত ১৯শে জানুয়ারী ভারতব্যাপী শিল্প ধর্মঘট, শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দলিল 'এসমা-৮১'কে ইতিহাসের আবর্জনায় নিক্ষেপ করবে যেমন করেছিল ১৯৭৭-এ জরুরী অবস্থা কায়েম করার কুৎসিত ষড়যন্ত্রকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আইন এবং সিনেট নির্বাচন

পরিমল দাস

১৯৭৯ সালের নতুন আইন Calcutta University Act, 1979 অনুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিনেট নির্বাচন গত আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্য সকল নির্বাচনী কেন্দ্রের ফল ঘোষিত হলেও রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট কেন্দ্রের ফল অবশ্য কোর্টের নির্দেশে এখনো প্রকাশিত হয় নি।

একশ' চব্বিশ বছরের পুরণো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচন বরাবরই সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এবারও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। বরং বলা চলে, নানা কারণে এবারের নির্বাচন এই রাজ্যে ত বটেই, রাজ্যের বাইরেও অনেকের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল। এই কারণগুলির মধ্যে দুটো অন্তত উল্লেখের দাবি রাখে,—
(১) বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা ও ভাষানীতি এবং
(২) নূতন আইন।

এবারের সিনেট নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকার গত সাড়ে চার বছর ধরে যে-নীতি শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যকর করেছেন, তার একটা যাচাই-এর মধ্য দিয়ে হয়েছে। এই পরীক্ষায় বামফ্রন্ট সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে সন্দেহ নাই।

বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছে ১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে। তখন রাজ্যের শিক্ষাজগতে এক চরম অরাজকতা চলছিল। এই অরাজকতার শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে এই অরাজক পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকায় এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। এই অবস্থাকে আরো জটিল করে তুলেছিল তৎকালীন শাসকদল কংগ্রেস সৃষ্ট সন্ত্রাস। শিক্ষায়তনগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমাজবিরোধীদের লীলাক্ষেত্র। ছাত্রসমাজকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলার জন্য একটা সচেতন প্রয়াস সে-সময়কার শাসকদলের পক্ষ থেকে নিরন্তর চালিয়ে যাওয়া হয়। এই সময়ে শিক্ষায়তনগুলিতে লেখাপড়া করা ছাড়া আর সব কিছুই হত। পরীক্ষায় গণটোকাটুকি একটা অধিকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যেকার সম্পর্ক নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত রকম সুস্থ মূল্যবোধ লোপ পেয়েছিল। একদিকে যখন এই অবস্থা অপরদিকে তখন দেখা গেল পরীক্ষাসমূহ দিনের পর দিন বা মাসের পর মাস পেছিয়ে যাচ্ছে। কবে পরীক্ষা হবে তার যেমন ঠিকঠিকানা ছিল না, তেমনি পরীক্ষা যদি বা শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল, ফল প্রকাশ কবে হবে সেটা ছিল আরো অনিশ্চিত। বছর গড়িয়ে গেলেও ফল প্রকাশিত হত না। এরই পাশাপাশি আবার পরীক্ষার পাশ-ফেল নিয়ে চলছিল টাকার খেলা, চলছিল চরম দুর্নীতি। সে-সময় এ রকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিরা নিজেরাই তাঁদেরই গ্রহণ করা পরীক্ষার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ সময়ে একবার অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের প্রশ্ন এলে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অফিসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ১৯৭০ সালের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ করেছেন এমন কাউকে যেন ইন্টারভ্যুর জন্য ডাকা না হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষরই যখন এই হাল তখন সাধারণ মানুষের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃতপক্ষে, গোটা পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষা ব্যবস্থা একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছিল।

শিক্ষাজগতে সামগ্রিক এই অরাজকতা বা নৈরাজ্যের অবস্থা বামফ্রন্ট শাসন ক্ষমতায় এসে উত্তরাধিকার সূত্রে পেল। ক্ষমতায় এসেই এই নৈরাজ্য দৃঢ়তার সঙ্গে দূর করে শিক্ষাক্ষেত্রে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার সাথে সাথে বামফ্রন্ট সরকার জনগণের কাছে প্রদত্ত নির্বাচনী কর্মসূচীর প্রতিটি ধারাকে বাস্তবায়িত করার কাজে অগ্রসর হলো। বামফ্রন্ট জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে,—

(ক) "শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের দাবি বাস্তবায়িত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং উর্দু, নেপালী ও সাঁওতালী ভাষাসহ অন্যান্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে উৎসাহ দান করা হবে।

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকুরীর নিরাপত্তা ও সরকার থেকে সকল পর্যায়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সরাসরি মাসিক বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

(গ) পরিচালক কমিটিগুলিতে পর্যাপ্ত ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারী প্রতিনিধি গ্রহণ করে সেগুলির গণতন্ত্রীকরণ করা হবে।

(ঘ) নতুন সর্বাত্মক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ও তার স্বার্থে পর্যাপ্ত শিক্ষক প্রতিনিধিসহ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত স্কুল বোর্ডগুলির ব্যবস্থা করা হবে।

(ঙ) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য একটি নূতন সর্বাত্মক আইন প্রণয়ন করা হবে এবং গ্রন্থাগারগুলির সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে।

(চ) শিক্ষানীতির বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে।"

বিগত সাড়ে চার বছরের রাজত্বে বামফ্রন্ট সরকার তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি সর্বতোভাবে পালন করেছে। বামফ্রন্টের কর্মসূচীর দিকে তাকালে দেখা যাবে শিক্ষার সার্বজনীন অধিকার, শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার এবং ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রভৃতি দাবিকে কেন্দ্র করে অতীতে যে আন্দোলন হয়েছে এতে তারই স্বীকৃতি রয়েছে। রয়েছে শিক্ষাকে গণমুখী ও জীবনমুখী করে তোলার সচেতন প্রয়াস। আমাদের রাজ্যের শতকরা ৬৫ জন নিরক্ষর। এই নিরক্ষর মানুষদের মধ্যে শহরের বস্তি এবং গ্রামের মানুষের সংখ্যাই বেশী। নিরক্ষরতা দূর করে শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে প্রাথমিক স্তরে কেবলমাত্র মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করার পাশাপাশি প্রতিটি গ্রামে যাতে অন্তত একটি প্রাথমিক স্কুল থাকে তার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। মাতৃভাষার উপর এই গুরুত্ব আরোপ স্বার্থান্বেষী মহলে স্বাভাবিকভাবেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারকার সিনেট নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারের এই শিক্ষানীতি ও ভাষানীতিকে স্বার্থান্বেষী মহল থেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচন নতুন আইন অনুসারে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হল এ-কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইন তৈরী করার পূর্বে সরকারের তরফ থেকে শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের সকল সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করা ও মতামত নেওয়া হয়েছে। অতীতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ-ধরনের উদ্যোগ আর কোন সরকার গ্রহণ করে নি।

এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষায়তনগুলির পরিচালন সংস্থাগুলিকে গণতন্ত্রীকরণের দাবি দীর্ঘদিনের। গত ৩৪ বছরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার তথা ইউ. জি. সি. নিয়োজিত বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রাখলেও মুষ্টিমেয় কিছু লোক বা গোষ্ঠী যাঁরা শিক্ষা ব্যবস্থায় খবরদারী করে এসেছেন তাঁদের ক্ষমতাকে খর্ব করে কোন ব্যবস্থা সরকার নিজ শ্রেণীস্বার্থেই এতাবৎকাল করেন নি। বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সঙ্গে আলোচনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য নতুন আইন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (সংশোধনী) আইন ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা আইন ইতোমধ্যে প্রণয়ন করেছেন। এই আইনগুলিতে পরিচালন সংস্থায় সমাজের সকল অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষাবিদসহ শ্রমিক, কৃষক সকলেরই পরিচালন সংস্থায় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের প্রাধান্য রাখার পাশাপাশি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অধিকাংশ প্রতিনিধির পরিচালন ব্যবস্থায় আসার বিধি এই আইনগুলিতে রয়েছে। উল্লেখের দাবি রাখে যে, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ ছাড়াও ছাত্র এবং কর্মচারীদের কি স্কুল, কি কলেজ, কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচিত করার নিয়ম এই প্রথম আইনে লিপিবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা বড় দাবি স্বীকৃতি লাভ করল।

নতুন আইন অনুযায়ী কলকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সিনেট নির্বাচন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই আইনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আখ্যা দিলে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি করা হবে না। একদিকে যেমন এর ছাত্র-সংখ্যা বিশাল, অপরদিকে তেমনি এর পরীক্ষার সংখ্যাও বিপুল। সারা বছরে যে ক'দিন বিশ্ব-বিদ্যালয় খোলা থাকে তার প্রতিদিনই কোন না কোন পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রহণ করতে হয়। নূতন আইন করার সময় গণতন্ত্রীকরণের সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশাল ছাত্রবাহিনী, পঠন-পাঠন, পরীক্ষা ও ফলপ্রকাশ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যে জটিলতা রয়েছে তার থেকে উত্তরণের রাস্তা কি হতে পারে তা হিসেবের মধ্যে নিয়েই এগুতে হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এর আগের আইনটি বিধিবদ্ধ হয়েছিল ১৯৬৬ সালে (Calcutta University Act, 1966)। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে আমেরিকার ফোর্ড ফাউনডেশনকে এই আইন রচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পুরনো আইনের লক্ষণীয় দিক হল শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা বর্তেছিল এ্যাকাডেমিক কাউনসিলের উপর, আর প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল সিন্ডিকেটের উপর। কিন্তু কার্যত ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটেছিল উপাচার্যের নিকট। সেনেটকে সর্বোচ্চ পরিচালন সংস্থা হিসেবে আখ্যা দিলেও প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটা বিতর্কের আসর। এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে ছিলেন, মুখ্যত পদাধিকারবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপক (Professor)। এছাড়া কিছু রীডার, লেকচারার, কলেজের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকরা যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসতেন। এ রকম একটা বিশাল সংস্থার ঘন ঘন সভা করা সম্ভব হত না, তাই পঠন-পাঠন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হত না। তেমনি, সিনেটের কলেবরও একদিকে যেমন ছিল বিশাল, অপরদিকে পদাধিকারবলে সদস্য এবং মনোনীত সদস্যদের নিয়ে তা ছিল ভারাক্রান্ত। বছরে একবার বাজেট পাশ করা ছাড়া এর বিশেষ কোন কাজই ছিল না। ফলে, সিন্ডিকেটই কার্যত সর্বোচ্চ পরিচালন সংস্থা হিসেবে প্রতিভাত হত। আর উপাচার্য তো রয়েছেনই। নতুন আইনে এর একটা বিপুল পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। এই আইন রচনা করা হয়েছে প্রধানত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ইউ. জি. সি. কর্তৃক যে কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল সাধারণত যা গণি কমিটি হিসেবে পরিচিত তার রিপোর্ট এবং ইউ. জি. সি. নিয়োজিত কমিটি অন গভর্ণেন্স অব ইউনিভার-সিটিজ এ্যান্ড কলেজেস-এর রিপোর্টের ভিত্তির উপর। নতুন আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলনলচে পাল্টে দেওয়া হয়েছে। সিনেট আগের তুলনায় আয়তনে কিছু ছোট যদিও ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভার প্রতিনিধিসহ শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, ছাত্র, কর্মচারী সকল স্তরের মানুষেরই প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রয়েছে, যা অতীতে ছিল না। আগের আইনে যেখানে মাত্র শতকরা ২৫ জনের মত নির্বাচিত হয়ে আসতেন, নতুন আইনে সেখানে শতকরা ৮০ জন সদস্যকেই নির্বাচিত হয়ে আসতে হচ্ছে। এ্যাকাডেমিক কাউনসিলের কোন ব্যবস্থাই রাখা হয় নি। তার বদলে স্নাতকোত্তর স্তরে নয়টি ফ্যাকালটি কাউনসিল যেমন, ফ্যাকালটি কাউনসিল ফর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন আর্টস, ফ্যাকালটি কাউনসিল ফর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন কমার্স, সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাকালটি কাউনসিল ফর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন সায়েন্স ইত্যাদি গঠিত হবে। তেমনি গঠিত হবে স্নাতক স্তরে তিনটি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিল যেমন, কাউনসিল ফর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন আর্টস, সায়েন্স, কমার্স, হোম সায়েন্স, ফাইন আর্টস এ্যান্ড মিউজিক, কাউনসিল ফর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন মেডিসিন, ডেন্টাল সায়েন্স, হোমিও-প্যাথী, ভেটিরিনারী সায়েন্স এ্যান্ড আয়ুর্বেদ ও কাউনসিল ফর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন ইনজিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনলজি ইত্যাদি। এই ফ্যাকালটি কাউনসিল এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউনসিলগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে পঠন-পাঠন, সিলেবাস, পরীক্ষা নেওয়া, ফল প্রকাশ করা থেকে শুরু করে শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় কিছু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং কার্যকরী করবেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক স্তরে যে পরিচিত চেহারা রয়েছে, তারও কিছু পরিবর্তন ঘটবে। এখন কনট্রোলার অব এক্সামিনেশনস ডিপার্টমেন্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিশতাধিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফল প্রকাশের ব্যবস্থা রয়েছে। নতুন আইনে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দরুন কেন্দ্রীয়ভাবে কন্ট্রোলারের দপ্তর থাকা অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে, কারণ পরীক্ষা নেওয়া এবং ফল প্রকাশের দায়িত্ব নিজ নিজ ক্ষেত্রে ফ্যাকালটি কাউনসিল এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউনসিল-গুলিই করবেন। তেমনি কলেজ ইনসপেকশনের কাজটিও আর কেন্দ্রীভূত থাকছে না। একদিকে যেমন সেনেট, সিন্ডিকেট প্রভৃতি সংস্থাগুলিকে গণতন্ত্রীকরণ করা হয়েছে, তেমনি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে নতুন আইনের মধ্য দিয়ে। এই সব ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাতে তার বর্তমান জটিল পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এবং যুগপোযোগী একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে আগেকার গৌরব ফিরে পেতে পারে। নতুন আইনে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য আরো কিছু আছে যা এখানে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নেই।

এই পটভূমিতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ, একদিকে শিক্ষাকে মুষ্টিমেয়ের হাত থেকে উদ্ধার করে তার সামাজিকীকরণ করা বা গণমুখী করার কাজে যেমন বামফ্রন্ট সরকার হাত দিয়েছে, নিরক্ষরতা দূর করা এবং শিক্ষাকে দ্রুত বিস্তারের জন্য প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে ও কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে তার যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করেছে, অপর দিকে তখন স্বার্থান্বেষী মহল থেকে (কিছু প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীসহ) পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থা গেল গেল রব তুলে সারা দেশে একটা কুৎসিত প্রচার চালান হচ্ছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও এই কোরাসের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সিনেট নির্বাচনের গুরুত্ব অন্যান্য-বারের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে সিনেট নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে জনসাধারণের মধ্যেও বিপুল উৎসাহ দেখা যায়। অতীতে আর কখনো এত লোক সিনেট নির্বাচনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন নি। বিভিন্ন স্তরের প্রায় ৬০ হাজার মানুষ কোন না কোন নির্বাচনে অংশ-গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে তিরিশ হাজার ছিলেন কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট কেন্দ্রের ভোটার। আগে এই কেন্দ্রে হাজার দুই-এর বেশী ভোটার হতেন না। নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বামফ্রন্টের শিক্ষানীতি এবং ভাষানীতি জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করেছে। কারণ বামফ্রন্টের সমর্থক "শিক্ষাব্যবস্থা গণতন্ত্রীকরণ সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ"-র প্রার্থীরা বিপুল সংখ্যায় বিজয়ী হয়েছেন।

আশা করা যায় নতুন আইনের বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সংস্থাগুলিতে গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিনিধিরা বেশি নির্বাচিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় তার অতীত গৌরব ফিরে পাবে, পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিফলনও তাতে যথাযথ বিম্বিত হবে, যেমন এর আগে হয়েছে। ১৯৫১ সালের আইনে প্রথম সিনেট নির্বাচনে মোহিত মৈত্র, অনিলা দেবী, গোপাল হালদার প্রমুখ কয়েকজন নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই সময়ে (১৯৫৬ সাল) সারা দেশ জুড়ে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবিতে আন্দোলন চলছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রশ্নে শাসক-দলের মধ্যকার দ্বন্দ্ব প্রশমিত না করতে পেরে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব এনেছিলেন, যার বিরুদ্ধে গোটা পশ্চিমবাংলা আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিনিধিরা সেদিন বিধান-বাবুর দাওয়াইর বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করে-ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের স্বাতন্ত্র্য, শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে রক্ষার উদ্দেশ্যে। এই প্রস্তাব সেদিন বিপুল ভোটে পাশ হয়েছিল। সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে যেমন মানষের আকাঙ্ক্ষা এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত, ঠিক তেমনি ঐ সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিল এবং বিধানবাবুর প্রস্তাবকে পরাজিত করতে সাহায্য করেছিল।

নতুন পরিস্থিতিতে, নতুন পরিবেশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার যোগ্য ভূমিকা পালন করবে এই আশাই আমরা প্রকাশ করছি।

সংগ্রামী শিল্পী পাবলো পিকাসো

বিজন চৌধুরী

১৯৮১ সালের ২৫শে অক্টোবর শিল্পী পাবলো পিকাসোর জন্মশতবর্ষ দিবস।

দেশে দেশে এই দিনটি পালিত হচ্ছে। তাঁর দীর্ঘ জীবনের শিল্পসৃষ্টিসমূহের মূল্যায়ন করেছেন এই যুগের মানুষেরা। তাঁর অবদানকে স্মরণ করে ব্যক্তি পিকাসোকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

শিল্পকলা, সংস্কৃতি এবং যুদ্ধ, শান্তি ও মানুষের ভবিষ্যৎ, এসব সম্পর্কে পশ্চিমবাংলার তথা কলকাতার মানুষ নিবিড়ভাবে সচেতন। এই শহরে প্রদর্শনী হয়েছে পিকাসোর শিল্পকর্ম ও জীবনের উপর। আলোচনা, সভানুষ্ঠান ও বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই শিল্পীকে স্মরণীয় করে রাখতে চাইছেন। এই বিতর্কিত শিল্পীকে, যুদ্ধবিরোধী ও সংগ্রামী এবং শান্তির সপক্ষে আন্দোলনকারী এই যোদ্ধাকে এ দেশের মানুষ যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে ভুল করে নি।

পিকাসোর সারা জীবনের সাধনা, বিশাল কর্মকাণ্ড এ যুগের বিস্ময়। এর ব্যাপ্তি বহুদিকে। দীর্ঘ ৯২ বৎসর তিনি বেঁচে ছিলেন। সারা জীবন ধরে শিল্প সৃষ্টিতে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। নতুন ধারা উপধারার জন্ম দিয়েছেন। প্রচণ্ড ক্ষমতাধারী এই শিল্পী যেন সৃষ্টির ক্ষেত্রে সদা উদ্‌গারণকারী এক আগ্নেয়-গিরি। তিনি শিল্পের অনেক প্রচলিত কানুনকে ভেঙেছেন, আবার নতুনভাবে গড়েছেন অনেক কিছু। সমালোচনা আছে তাঁর নিত্য নতুন এই পট পরিবর্তনের। এও ঠিক যে শিল্প অঙ্গনে তাঁর সময় সময় "এনার্কিস্ট"সুলভ বিচরণ, ভয়ঙ্কর ও বীভৎস রসকে পরিবেশন আলোচনা সাপেক্ষ। তবুও একথা স্বীকার্য যে, দু-এক শতাব্দীর মধ্যে এ ধরনের ক্ষমতাবান শিল্পীর, প্রোজ্জ্বল প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে নি।

ছোট বয়সেই তিনি ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন। কিশোর বয়সের তাঁর অনেক সৃষ্টি নিয়েও শিল্প সমালোচক মহল কৌতূহলী। পিকাসোর কিশোর জীবনের ছবি ইউরোপের অনেক দিকপাল শিল্পীদের মানের সমতুল্য, এটি অনেক শিল্পরসিকদের ধারণা। ১৬ বৎসর বয়সেই তাঁর আঁকা ছবি 'মাদ্রিদে' ললিতকলা একাডেমির জাতীয় প্রদর্শনীতে স্বীকৃতি লাভ করে এবং উচ্চ প্রশংসিত হয়। প্রচলিত গল্প আছে যে, পিকাসোর বাবা পুত্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তার সমস্ত রং, তুলি পুত্রকে দিয়ে দিয়ে-ছিলেন। বলেছিলেন আমি আর ছবি আঁকব না। হয়তো এই চিত্রকলার শিক্ষক পুত্রের ভবিষ্যৎ পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন। পুত্রের ক্ষমতার মধ্যে নিজের সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার ছায়াপাত লক্ষ্য করেছিলেন। পিকাসোর শিল্পরঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ঘটেছিল নায়ক হিসাবে, জীবনের শেষ দিন-টিতেও তিনি নায়কই ছিলেন।

পিকাসো চিত্রকর্মকে কোনদিনই আনন্দের উপকরণ হিসাবে গণ্য করেন নি। সব সময় মানুষের জীবনের, জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। শিল্পসত্তা নিয়ে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেছিলেন।

এই শিল্পী চিরদিনই ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। ফ্যাসিস্ট বর্বরতাকে, স্বৈরাচারী প্রভুত্ববাদকে এবং অত্যাচারকে তিনি নির্মমভাবে আঘাত করেছেন বার বার। ১৯৩৭ সালে স্পেনের 'গোয়েনির্কা' শহর ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর আদেশে জার্মান বোমারু বিমান দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নির্মমভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এই নির্মমতা, ধ্বংস শিল্পী পিকাসোকে দারুণ বিচলিত ও ক্ষুব্ধ করে তোলে। তিনি প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন। এই সময় তিনি সৃষ্টি করেন ছবি 'গেয়েনির্কা'। এই ছবি এক ঐতিহাসিক সৃষ্টি হিসাবে আজ স্বীকৃত।

এই আলোড়নকারী ছবিটিকে ফ্যাসিস্টরা সহ্য করতে পারে নি। এটি দখল করতে চেয়েছিলেন। শোনা যায় যে, প্যারীর পতনের পর স্বয়ং হিটলার এই ছবিটিকে নিজেদের হাতে পেতে সৈন্যাধ্যক্ষ-দের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পিকাসোর বন্ধু-বান্ধবেরা পূর্বেই গোপনে ছবিটিকে আমেরিকায় নিরাপদ স্থান বিবেচনায় পাচার করেন। সে ছবি ফ্যাসিস্টদের হাতে অবশ্যই যায় নি। ছবিটি দীর্ঘ দিনই আমেরিকায় ছিল। এই শতবর্ষ উৎসব উপলক্ষেই মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ২৬শে অক্টোবর ১৯৮১তে স্পেনে বিখ্যাত 'প্রাদো' সংগ্রহশালায় ছবিটি স্থান লাভ করেছে। ২৬শে অক্টোবর স্পেন সরকারের এই ঘোষণা ও পিকাসোর ছবির রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন বিশ্বের মানুষের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হিসাবেই গণ্য হয়েছে। বিস্ময় কৌতূহলী করেছে অনেককে। কারণ স্পেনের বর্বরতার প্রতিবাদে তিনি দেশত্যাগী হয়ে স্বদেশে কোনদিন ফেরেন নি। আর আজকে তাঁর নিজেরই সৃষ্টি সে দেশে রাজকীয় সম্মানে অধিষ্ঠিত হতে চলেছে।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তিনি যেমন ছিলেন ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ তেমন যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে আন্দোলনকারীর ভূমিকায়ও ছিলেন একজন প্রথম সারির নেতা। তাঁর আঁকা শান্তির প্রতীক শ্বেতকপোত মানুষের মনে উজ্জ্বল আশাবাদ এবং সুন্দর জীবনের প্রেরণা জাগিয়ে রাখে আজও।

পিকাসো ছিলেন চিরদিন সংগ্রামী ও প্রগতি-শীল রাজনীতির অনুসারী। যুদ্ধপরবর্তী বর্ষে ১৯৪৪ সালে ফরাসী দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে তিনি সদস্যপদ গ্রহণ করেন। সেই সংবাদ বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু যাঁরা এই শিল্পীর গৌরবময় অতীত ও স্পেন দেশের শিল্প ঐতিহ্যকে জানতেন তাঁরা বিস্মিত হন নি। বুর্জোয়া পত্রপত্রিকা এই সময়ে শিল্পীর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। অনেক সমা-লোচকরা এ কথাও বলেন যে, ফরাসী দেশের যুদ্ধ পরবর্তী বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসানের অঙ্গ হচ্ছে এ ধরনের রাজনীতির সঙ্গ করা। পিকাসোর এ পরিণতি, রাজনৈতিক উত্তরণকে তারা অবশ্যম্ভাবী বলে, হালকা চালে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল। এরা সযত্নে ভুলে যেতে চাইল যে, জার্মান দখলের সময় পিস্ট প্যারীতে অবস্থানরত পিকাসোর বীরোচিত আচরণ ও ভূমিকাকে। তিনি প্যারী ছেড়ে আমেরিকায় পালান নি। জার্মানদের কাছে কোন সুযোগ নেন নি। স্বার্থের প্রলোভন বা ফ্যাসিস্ট আতঙ্ক তাঁকে কব্জা করতে পারে নি। এ কারণেই প্যারিসের পতনের পর নাৎসী তাঁবেদার ভি সি সরকারকে তিনি অসমর্থন জানিয়েছিলেন এবং প্রকাশ্যে নিন্দা করেছিলেন।

জার্মানরা তাঁর সমস্ত ছবি দখল করে নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড বাংকারে সীল করে মজুত রাখে কড়া প্রহরায়। তিনি সে সময়ে অজ্ঞাতবাস নিয়ে-ছিলেন নিজের কাজের মধ্যে, স্টুডিওতে। এ সময়ের সৃষ্টিসমূহ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কী গভীর বেদনায় শিল্পী আহত। কী অসীম যন্ত্রণা তিনি ভোগ করছেন প্রতি মুহূর্তে। পিকাসোর এই সময়ের সৃষ্টিতে ক্রোধ ঝরে পড়েছে। তা ছাড়া এসব সমালোচকরা ভুলে যায় যে, দখলকারী জার্মানদের বিরুদ্ধে যে গুপ্ত প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল পিকাসো তাকে গোপনে সব সময় সাহায্য করেছেন। তিনি ছিলেন প্রতিরোধক আন্দোলনের একজন সহ-যোগী। জার্মান বন্দীশালা থেকে পালিয়ে অনেক শিল্পী, সাহিত্যিক, কবিরা পিকাসোর গোপন তত্ত্বাবধানে গা ঢাকা দিয়ে তাদের কাজ করে গেছেন এ ঘটনাও প্রকাশিত।

তাই বলা যায় যে, এই সচেতন ও সংগ্রামী শিল্পীর প্রগতিশীল রাজনীতিতে প্রবেশ নিশ্চয়ই হঠাৎ ঘটে নি। বুর্জোয়া সমালোচকরা যতই দাবী করুক যে, এটা একটা প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর হঠাৎ খেয়াল মাত্র। এসব সমালোচনা বুর্জোয়া সমালোচকরা যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে করেন তা সুবিদিত। পিকাসোর রাজনীতির চরিত্রকে কাট-ছাট করে এরা অতি মানব এক প্রতিভাধর বলেই তাঁকে পুজো দিতে চায় এবং মানুষের চোখ ঐ দিকে নিবিষ্ট রাখতে চায়। কিন্তু এভাবে তাঁকে রূপায়িত করার চেষ্টা সত্ত্বেও মানব সমাজের কাছে তিনি সচেতন, সংগ্রামী ও মানবপ্রেমিক শিল্পী হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছেন এবং মানুষের সম্মান ও শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন।

যে কোন শিল্পীর সৃষ্টিসমূহকে বিচার করতে হলে তার সময়কার সামাজিক, অর্থনৈতিক ইতিহাসকে মনে রাখা উচিত। এইসব কারণগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হলেও শিল্পীর উপর প্রভাব ফেলে। পিকাসোর বিভিন্ন পর্বের সৃষ্টিতে এই সামাজিক প্রভাবকে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। যদিও কোন কোন পর্বের অতিবিমূর্ততা

প্রশ্নাতীত নয়, তবু তাঁর সামগ্রিক শিল্পকর্মের যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পারবো যে, এ সমাজের বাস্তবতা, বিভিন্ন দ্বন্দ্ব, ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর সৃষ্টিতে ছায়াপাত করেছে।

পিকাসো গ্রামে অনেকদিন কাটিয়েছেন। প্রকৃতি, মানুষ, বাস্তব জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায় বলা যায় "আমি যা কিছু শিক্ষালাভ করেছি সবই গ্রামে।" এছাড়াও তিনি স্পেনের শহর বার্সিলোনা, মালাগাতে প্রথম যৌবনকাল কাটিয়েছেন। এ কারণেই এ-সব শহরের চরিত্রগুলি তাঁর ছবিতে এসেছে বারবার। অসহায় বিবর্ণ মানুষেরা এবং ভবঘুরে, ইহুদী, শ্রমিক, কৃষক, ভিক্ষুক সবই তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু। এ সময়ের সৃষ্টিতে এইসব বেদনাতুর অসহায় মানুষদের এক নতুন নীলাভ ও পরে গোলাপী আভায় সিঞ্চিত করে পট পরিকল্পনা করেন। শিল্পজগতে এই নীল ও গোলাপী পর্ব ("ব্লু" ও "পিঙ্ক পিরিয়ড") এক নতুন আস্বাদ এনে দেয় যা মানুষের প্রতি অনুরাগ ও সহানুভূতির প্রতীক হিসাবে আজও উচ্চ আসনে সমাদৃত। পশ্চিম দুনিয়ায় এক ধরনের শিল্পী সমালোচক আছেন যারা তাঁর সৃষ্টির আঙ্গিকগত দিকগুলো নিয়ে চরম উৎসাহী। তারা বিভিন্ন শিল্প শৈলীর সঠিক মূল্যায়নের পরিবর্তে শিল্পীকে এক অলৌকিক শক্তিধর শিল্পী হিসাবে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এ-সব এরা করে এমন সুকৌশলে যে, পিকাসোর সমাজচিন্তা বলে যেন কিছুই ছিল না। এরা শুধু বিভিন্ন শিল্পবাদের কথা যেমন কিউবইজম, সুরিয়ালিজম বা পরবর্তী বিমূর্ত ধারাগুলির কথা সোচ্চারে বলেন। অবশ্যই পিকাসো এই সব শৈলীর প্রবক্তা ছিলেন ও বিভিন্ন ধারায় কাজও করেছেন। কিন্তু তাঁর এই ভয়ঙ্কর ভাঙ্গাগড়া ও অস্থির চঞ্চল বিচরণ সামাজিক বাস্তবতা দিয়েই বিচার করতে হবে।

পিকাসো যে যুগে ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন তখনকার তাঁর স্বদেশ স্পেনের অবস্থা ছিল এক ভয়ংকর অগ্নিগর্ভ। ইউরোপের উন্নত দেশগুলি যেমন ফ্রান্স, জার্মানী ও ইংল্যান্ডের তুলনায় স্পেন ছিল অনেক পশ্চাদপদ, প্রায় আধা সামন্ততান্ত্রিক অবস্থানে। মধ্যযুগীয় ভূমিদাস প্রথা, দারিদ্র্য, বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন—মুর্, ইহুদী, ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পরস্পরের বিবাদ সে দেশকে এক আতংকময় অবস্থানে ঠেলে দিয়েছিল। কলকারখানা প্রায় ছিলই না, শিল্প শ্রমিক নগণ্য ও অসংগঠিত। সংস্কারাচ্ছন্ন, সংকীর্ণ মধ্যবিত্তের প্রাধান্যে সমাজে আলোবাতাসহীন এক শ্বাসরোধকারী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ইউরোপের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ও শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতি সংস্কারমুক্ত, যুক্তি নির্ভর অধিকার রোধের যে যুগ শুরু হয়েছিল স্পেন ছিল সে গণ্ডীর বাইরে। এই দারিদ্র্য ও নির্মমতার বিরুদ্ধে স্বভাবতই এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল সে দেশে। সেখানে দেখা দেয় এক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, ধ্বংসের শ্লোগান দেয় তারা। প্রতিক্রিয়া হিসাবে রাজতন্ত্রী প্রতিহিংসা পাল্টা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এই ধ্বংস, মৃত্যু, ভাঙ্গা গড়ার পটভূমিতে পিকাসোর যাত্রা শুরু। তাই তাঁর ছবিতে প্রচণ্ড পরিবর্তন ও ভাঙ্গাগড়ার প্রভাব।

পিকাসোর নানান বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা অবশ্যই ছিল। সু-রিয়ালিজমের ম্যানিফেস্টোতে ঘোষণা করলেন যে, তারা মার্কসবাদী ও ফ্রয়েডপন্থী। উভয় চিন্তাবিদই আমাদের পথপ্রদর্শক। নিশ্চয় এ ধরনের ঘোষণা প্রচণ্ড স্ববিরোধী। যদিও তারা উত্তরকালে এ পথ পরিত্যাগ করেন। যাই হোক এটা বোঝা যায় পিকাসোর সমাজচিন্তা ও সামাজিক সচেতনতা, অস্থিরতা স্ববিরোধী হলেও মানুষের পক্ষেই ছিল। জীবনের জয়গান সে চিরদিন গেয়েছে। মানুষের ভবিষ্যৎকে এক আলোকোদ্ভাসিত পথে নিয়ে যেতে চেয়েছে আর এ কারণেই এই পৃথিবীর লোক তাকে ভুল বোঝে নি ভালবেসেছে, শ্রদ্ধা করেছে, স্মরণ করছে।

জিনিষের দাম কেন বাড়ছে?

ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত

দ্রব্যমূল্য কেন বাড়ছে—এই প্রশ্নের নানা ধরনের উত্তর হতে পারে। সহজতম উত্তর হচ্ছে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব। যদি বাজারে কোন একটা জিনিস কম থাকে চাহিদার তুলনায়, তাহলে যারা বিক্রী করছে তারা দাম বাড়াবে—এবং ততোটাই বাড়াতে চাইবে যতক্ষণ না দাম এত বেশী হয় যে অনেকে আর এই দামে কিনতে চাইবে না, এবং তার ফলে যোগান-চাহিদার মধ্যে তফাৎ রয়ে যাবে।

অবশ্য সব সময়ই যে এমন হবে তা নয়। কোন কোন অবস্থায় দাম বাড়লে চাহিদা বাড়তে পারে, এবং দাম কমলে চাহিদা কমতে পারে। যদি ক্রেতার মনে হয় যে দাম ভবিষ্যতে আরও বাড়বে, তাহলে দাম তখন বাড়লেও সে ছুটে কিনতে যাবে। উল্টোভাবে, যদি ক্রেতার মনে হয় দাম কমবে ভবিষ্যতে তাহলে সে এখন দাম কমলেও কিনতে চাইবে না। প্রথম ক্ষেত্রে দাম বেড়েই চলবে, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দাম কমেই চলবে। এর পিছনে কারণ ভবিষ্যতে দাম কি হতে পারে আন্দাজ করে কেনাবেচার সিদ্ধান্ত। এইসব ক্ষেত্রে চাহিদা-যোগানের ফাঁক বেড়েই চলে, এবং অর্থনীতিকে সংকটের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

দাম ওঠা-নামার আর একটা বড়ো কারণ ব্যবসায়ীদের ফাটকাবাজী। কৃষির ক্ষেত্রে ধান বা পাট যখন ওঠে তখন ব্যাপারীরা সস্তা দামে সেটা কিনে রাখে। চাষীরও ওই দামে না বিক্রী করে উপায় থাকে না—যেহেতু ওর নগদ টাকার দরকার ধার মেটাতে। অনেক ক্ষেত্রে মাঠে থাকতে থাকতেই ধান বিক্রী হয়ে যায়, মহাজন-ব্যাপারীর কাছে অল্প দামে। কয়েক মাস পরে ওই ধান, পাট বা আলুই দুগুণ বা আরো বেশী দামে বিক্রী করে ব্যাপারী লাভ করে। এর ফলে চাষী এবং শহরের ক্রেতা দুজনেরই ক্ষতি হয়—শুধু মাঝখানে থেকে ব্যাপারীই দুহাতে টাকা গোণে। যে সব বছরে চাষ ভালো হয়, বৃষ্টি পেয়ে, সেই বছরেও চাষীর হাতে টাকা ভালো আসে না, যেহেতু ধানের দামও দ্রুত পড়ে যায়।

আমাদের দেশে দাম সাধারণতঃ বাড়ে খাদ্য-সংকট থেকে। যে সব বছর খাবারের উৎপাদন ভালো হয় না, সেই বছরগুলোতে ব্যবসায়ীরা খাদ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। অনেক সময় ঘাটতি যতোটা তার থেকে অনেক বড় করে দেখানো হয় "কৃত্রিম অভাব" তৈরী করে, গুদামে মাল মজুত করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বড়ো ব্যবসায়ীরা একসঙ্গে ফন্দী করে, গুদামে মাল রেখে, বাজারে না ছেড়ে, জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। এবছর যেমন ধারণা ছিল সাড়ে তেরো কোটি টন খাদ্য-দ্রব্য তৈরী হবে—কিন্তু ৪০ লক্ষ টন কম তৈরী হয়েছে। এর ফলে বিদেশ থেকে দাম দিয়ে গম কিনতে হচ্ছে। খাদ্যের দাম বাড়লে সব জিনিসেরই দাম বাড়ে, যেহেতু সবকিছুর উৎপাদনের জন্যই শ্রমিকের খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যের ঘাটতি এবং মূল্যবৃদ্ধির তাই অংগাংগী সম্পর্ক।

সম্প্রতি তৈলসংকট আর একটা বড়ো কারণ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তেলের প্রয়োজন শিল্পে, কৃষিতে এবং পরিবহনে। শিল্পে এবং পরিবহণে তেলের প্রয়োজন মোটামুটি জানা। কৃষিক্ষেত্রেও তেল লাগে ট্রাক্টর এবং পাম্পসেট চালাতে। তাছাড়া রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি—তৈলজাত এবং তেলের দাম বাড়লে এসবেরও দাম বাড়ে। ভারতে তেলের আর একটি বড় ব্যবহার বিদ্যুতের বিকল্প হিসাবে, যেমন কেরোসিন। ১৯৭৩ সালের পর থেকে পৃথিবীর বাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব থেকে ভারত মুক্তি পায় নি। এর ফলেও বিভিন্ন জিনিসের দাম বেড়েছে।

দাম বাড়বার আর একটা কারণ বিভিন্ন ব্যাপারে বিদেশী-নির্ভরতা। পাশ্চাত্যে তেলের ব্যবহার বেশী—এবং তেলের মূল্যবৃদ্ধির সংগে সংগে ওদের যন্ত্রপাতিরও দাম বেড়েছে। যার ফলে, যন্ত্রপাতি আমদানীর সংগে সংগে ওই মূল্যবৃদ্ধি সমস্ত অর্থনীতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

মূল্যবৃদ্ধির ফলটা কি? এর ফলে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়, পরিকল্পিতভাবে লগ্নী করা যায় না। যে সব প্রোজেক্ট—যেমন কোলকাতার ভূগর্ভস্থ রেলপথ বা দ্বিতীয় হুগলী সেতু—শেষ হতে সময় নেয় তার প্রাথমিক হিসাব এবং চূড়ান্ত ব্যয়ের মধ্যে, সব কিছুর দাম বাড়ার জন্য, ফারাক হয় আকাশ-জমিন। এর ফলে শুরুতে যে প্রোজেক্ট লাভজনক মনে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত সেটাই বিরাট লোকসানের বোঝা নিয়ে অর্থনীতিকে চেপে রাখে। শুধু তাই নয়, সৎপথে উৎপাদনশীল কাজে না থেকে অনেকের লক্ষ্য হয় ফাটকাবাজী করে সস্তায় টাকা করা—এর ফলে দাম আরও বাড়ে।

মূল্যবৃদ্ধির সবচেয়ে খারাপ দিক—আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি। যাদের নির্দিষ্ট আয় তাদের আয় টাকার মূল্যে ঠিক থাকলেও 'আসল আয়' কমে আসে। আগে দশ টাকায় যা কেনা যেতো, কিছুদিন পরে দেখা যায় কুড়ি টাকাতেও সেই জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ, আয়ের হিসাবটা যদি টাকার অঙ্কে না করে, 'ওই টাকায় কতো কুইন্টাল ধান কেনা যাবে' সেইভাবে হিসাব করা হয় তাহলে আয়টা ক্রমাগত কমবে। ভারত-বর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের এক বড়ো দাবীই হলো 'আসল মজুরী' রক্ষা করা, যা মূল্যবৃদ্ধি ক্রমাগত খেয়ে ফেলছে। বহু পাশ্চাত্য দেশে ব্যবস্থা আছে যে মূল্যবৃদ্ধির সংগে সংগে মজুরী বাড়বে—কিন্তু আমাদের এই পোড়া দেশে সেসব হবার নয়। শ্রমিক আন্দোলন তাই ক্রমাগত চালাতেই হয় 'আসল মজুরী' রক্ষার জন্য—কোন রকমে মাসের পর মাস আন্দোলন, ধর্মঘট করে মজুরী বাড়িয়ে আগের 'আসল মজুরী'র সমান করতে করতে আবার দাম বেড়ে যায়।

অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের কাছে মূল্যবৃদ্ধি একটি শুভবার্তা—কারণ এর ফলে মুনাফা বাড়বে। যতো জিনিসের দাম বাড়বে ততো তালে তালে ব্যবসায়ীদের 'মার্জিন' বাড়বে। তাই, টাটা-বিড়লা এদের মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যসংকট, শিল্পসংকট—এই সবে কোন ক্ষতি হয় নি। একচেটিয়া মালিকরা তো যতটা পারেন দাম বাড়ানই, যেহেতু কোন প্রতিযোগী নেই; এমনকি বহু ক্ষেত্রে স্বল্প প্রতিযোগীরা একজোট হয়ে প্রতিযোগিতা বন্ধ রেখে দাম বাড়ান—যাতে সকলেরই সুবিধা। যেমন চিনিকলের মালিকরা। যদিও এই সমস্ত restrictive practices বন্ধ করবার জন্য আইন ইত্যাদি রয়েছে, তার প্রয়োগ হয় না। মূল্যবৃদ্ধি তাই অসম শ্রেণী-শোষণ ব্যবস্থার সূচক।

তুলনায় সমাজতান্ত্রিক দেশে মূল্যবৃদ্ধি খুব সামান্যই হয়। কারণ, ব্যক্তিগত মুনাফার স্বার্থে ফাটকাবাজী নেই। কারণ, খাদ্যের মূল্যে ভরতুকী ও সুনিয়ন্ত্রিত রেশন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ন্যূনতম প্রয়োজন মেটে। কারণ, পরিবহণে ভরতুকী, যেহেতু পরিবহণের ব্যয় সমস্ত দ্রব্যের মূল্যের মধ্যেই থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, গত ত্রিশ বছরে হাঙ্গেরীতে রেল বা বাসের ভাড়া বাড়ে নি। এবং সমাজ-তান্ত্রিক দেশে রুটি, ডিম, দুধ ইত্যাদির দাম অস্বাভাবিক সস্তা। কাজেই মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণগুলো ওসব দেশে নেই।

ভারতে খাদ্য সমস্যা বা শিল্পের মন্দা বাজার কাটে নি। এবং ফাটকাবাজী বন্ধ করবার কোন যোগ্য পন্থা নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় ১৪টি জিনিস একই দামে ভারতের সর্বত্র কেন্দ্রীয় সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিলির দাবী এখনও অস্বীকৃত—অথচ এই ব্যবস্থা চালু করা গেলে মুদ্রাস্ফীতি কমতো এবং গরীব মানুষের ওপর মুদ্রাস্ফীতির কুফল কম পড়তো।

[শেষাংশ ১৪ পৃষ্ঠায়]

প্রতিবেদন

লিটল ম্যাগাজিন ঃ প্রকৃতি ও গতি

লিটল ম্যাগাজিনের সংজ্ঞা বা সংখ্যা নির্ণয় দ্দুটোই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে সেটা খুবই প্রযোজ্য। কারণ ছোট প্রাণের ছোট ব্যথা এবং ছোট ছোট দুঃখ কথার শরিক এই ক্ষীণতনু পত্রিকাগুলি। সংজ্ঞার আঁটোসাটো বাক্যবিন্যাসের মধ্যে না গিয়ে বলা যায় এগুলি যেন বিশাল রাজপ্রাসাদ এবং অট্টালিকার পাশে দোচালা। মাথার উপর খড়ের ছাউনি, নিচে গোময় এবং মাটির অন্তরঙ্গ আলাপ আর সারা দেওয়ালে গিরিমাটি আর খড়িমাটির সরু-মোটা টান। কোথাও পদ্মফুল, কোথাও দুটি পাখি আবার এদিক-ওদিক আলতা দিয়ে আঁকা দুটি চরণ। দেবদেবীর উদ্দেশ্যে নিজস্ব বানানে আমন্ত্রণও লেখা আছে। জেলেবৌ, চাষীবৌ এবং তাঁতীঝি-এর এই যে ঘরসংসার, ছোটখাট কিন্তু ছিমছাম, এটার সাথে লিটল ম্যাগাজিনের কোথায় যেন একটা নিবিড় সম্পর্ক। শহর কলকাতার পত্রপত্রিকা-গুলির ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে—মহানগরীর জনসমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের কথা মনে এলেও। আধুনিকতার আনাগোনা আছে ঠিকই কিন্তু গ্রাম-জীবনের আচার অনুষ্ঠান এবং বাঙালীর কৃষি-নির্ভর সভ্যতার ঐতিহ্য আমাদের কলকাতা কালচারে বেশ আসন জুড়ে বসে আছে। সন্ধ্যের শাঁখ, হাতের শাঁখা কিংবা পুজোর ছুটির আমেজ সব কিছুর মধ্যেই পথের পাঁচালীর ভাব ও ভাষা বারে বারে দোলা দিয়ে যায়।

সঠিক সংখ্যা বলা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব। তিনশ' হতে পাঁচশ'; হয়ত, তারও বেশী। এটা এক বছরের সংখ্যা এবং সংকলনের যোগফলের কথা বলছি। অবশ্য সব বছরে সংখ্যা প্রকাশ এক থাকে না—প্রকৃতির খরা ঝরার মত জীবন এবং সমাজে জলাভাব কিংবা অতিবর্ষণ আছে, স্বভাবতই সৃষ্টির এবং প্রকাশের মাটিতে তার প্রভাব পড়ে। খুব কম পত্রিকাই ছ'বছরে পা দিতে পেরেছে। অন্ততঃ যত পত্রিকা প্রকাশ পাচ্ছে তার ষাট ঊর্দ্ধ শতাংশ সম্বন্ধে একথা বলা যায়। কেউ প্রসবাগার, কেউ সূতিকাগার আবার অধিকাংশের অন্নপ্রাশন পর্যন্ত এগোচ্ছে কিন্তু টালমাটাল পায়ে প্রথম হাঁটতে গিয়ে প্রথম পড়া শেষ পড়াতে পর্যবসিত হচ্ছে। সাহিত্যের কোন অশরীরী আত্মা যেন ভর করছে এদের ওপর—জনক-জননীকে অশেষ দুঃখ দিয়ে কোল ফাঁকা করে চলে যাচ্ছে।

শিশুমৃত্যুর এই কারণ নির্ণয়ে আজকের এই প্রবন্ধের প্রচেষ্টা। ব্যবসায়িক বড় পত্রিকার আলোচনা উহ্য থাকবে, প্রতিষ্ঠিত এবং ছোট পত্র-পত্রিকার কথাও বিশেষ উঠবে না—শুধু দূরের ও কাছের দশ বছর অতিক্রম করে নি এমন কিছু পত্র-পত্রিকা আলোচনায় আসবে। বয়সটা খানিক উপরে উঠলেও ক্ষতি কিছু হবে না কারণ সাহিত্য মাধ্যম এবং লিটল ম্যাগাজিনের রোগ বা জ্বালা-যন্ত্রণা হতে তারাও মুক্ত নয়। দেশ, অমৃত, শিলাদিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি—এদের কথা তুলব না কারণ এরা বড়সড় প্রকাশন সংস্থার অন্তর্ভুক্ত এবং কেউ আজ টাকা আনে, কেউ আসছে দিনে আনবে। এরা লিটল ম্যাগাজিন নয় সেটা বলা বাহুল্য কিন্তু পত্রিকা হিসাবে নামটা আসতেই পারে কারণ এদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অনুকরণ, অস্বস্তিকরভাবে, বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিনের লেখককুল করে থাকেন। অন্যান্য পত্রপত্রিকার মধ্যে নন্দন, পরিচয়, এক্ষণ, বারোমাস, অনুষ্টুপ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, গল্পগুচ্ছ, সমতট, নান্দী-মুখ, চতুষ্কোণ ইতিমধ্যে পাঠকমনে দাগ কেটেছে

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

এবং বেশ কয়েকটি অনেকটা পথ অতিক্রম করেছে ফলে অনিশ্চয়তার টানাপোড়েন তারা বেশ খানিক কাটিয়ে উঠেছে।

যে সব পত্রপত্রিকা নিয়ে এই আলোচনা তাদের সবকটির আলাদাভাবে পরিচয় এমন কি নামোল্লেখও অসম্ভব। যেসব সমস্যার কথা উল্লেখ করতে যাচ্ছি তাদের অনেকগুলি হয়ত অনেক লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নয়। গ্রাম হতে প্রকাশিত বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিন অবাক করে দেয় অনেক সময়। বাঁকুড়া হতে প্রকাশিত 'অবান্তর' পত্রিকার যামিনী রায় সংখ্যা অনেক দিক হতে অভিনব কিন্তু পত্রিকাটির অনিয়মিত প্রকাশ আমাদের কম হতাশ করে না। একই পত্রিকার মতিগতির পরিবর্তন অনেকক্ষেত্রে আমাদের অবাক করে—পুরনো কৃত্তিবাস আর নতুন কৃত্তিবাস একই পত্রিকার রূপান্তর একথা মেনে নেওয়া বড় কঠিন হয়ে পড়ে। বেশ কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর লিটল ম্যাগাজিন আগে পাতিরামের স্টল আলো করে রাখত কিন্তু এখন আর চোখে পড়ে না। কিছু পরিচিত পত্র-পত্রিকা ভীষণ অনিয়মিত হয়ে যাচ্ছে। সব কিছু মিলে কেমন যেন এক গভীর অসুখে লিটল ম্যাগাজিনগুলো ভুগছে, আবার এর মাঝে জন্ম-মৃত্যুর যাওয়া-আসা চলছে অবিরত। এখন প্রয়োজন নতুন করে ভাবার —কোথায় এই লিটল ম্যাগাজিনগুলির দুর্বলতা, কোথায় ঘটে যাচ্ছে সম্পাদকমণ্ডলীর ভুলচুক, কোথায় লেখকগোষ্ঠী পাঠকদের কাছ হতে দূরে সরে গেছেন, কোথায় পাওয়া যাবে সেই আলো-বাতাস যা বাড়িয়ে তুলবে সাহিত্যের এই চারা-গাছগুলিকে।

লিটল ম্যাগাজিন পড়তে গিয়ে আর একটা বিষয় খুবই ধাক্কা দেয়—মননশীল প্রবন্ধের উপেক্ষার কথা বলছি। কবিতা বা যে কোন রচনাকে পাঠকের মনের কোণে ঠাঁই করে দিতে হলে প্রবন্ধকে অবশ্যই সামনে আনতে হবে। চিন্তাশীল প্রবন্ধের অভাবে লিটল ম্যাগাজিন-গুলিকে হৃদয় সর্বস্ব বলে মনে হয় এভাবে চললে চেতনাহীন ভাবাবেগের স্রোতে ভেসে যাওয়ার ভয় একটা থেকেই যায়। এ সম্বন্ধে শারদীয় ('৮৮) কয়েকটি পত্র-পত্রিকার উল্লেখ করছি।

বিহার হতে প্রকাশিত 'সপ্তদীপা' এমনি বেশ ছিমছাম কাগজ ('আমাদের ডাক' বাদে) কিন্তু প্রবন্ধের ঝুলি একেবারেই ফাঁকা—হতাশ লাগে।

চব্বিশ পরগণা হতে বেরিয়েছে 'সাহিত্য কল্প' দু'টি প্রবন্ধ আছে এতে। সম্পাদক মহাশয় (যাঁর নাম পত্রিকারও উপরে) 'রবি ঃ রাহুগ্রাসে' চর্বিতচর্বণ প্রবন্ধটি বাদ দিয়ে উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ হতে অন্য একটি প্রবন্ধ নিতে পারতেন। ঠিক সময়ে অনুরোধটি রাখতে পারলে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের হাতে যা তথ্য আছে (অন্যান্য লেখা পড়ে যা মনে হয়) একটি ভাল প্রবন্ধ পাঠককে উপহার দিতে পারতেন।

চব্বিশ পরগণার আর একটি কাগজ 'দেশ আমার মাটি আমার' কামনা করেছে 'প্রত্যেকটি লেখার দয়াহীন সমালোচনা', সাহস আছে স্বীকার করতেই হয়, কিন্তু একগাদা প্রশংসাপত্র এবং নামীদামী লেখকদের লেখা দেখে মনে হয় মাননীয় সম্পাদক মহাশয় ভিতরে ভিতরে খুব ভয় পেয়েছিলেন। তিনটি প্রবন্ধ ছাপানোর জন্য তিনি পাঠকদের ধন্যবাদ অবশ্যই পাবেন কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনের উপর দু'টি প্রবন্ধ বোধহয় খুব জরুরী ছিল না বিশেষতঃ আলোচনায় যখন রিপিটেশনের ভয় আছে।

'প্রামিথিউস' পত্রিকায় (বর্ধমান) তিনটি প্রবন্ধ ও কিছু আলোচনা কবিতা ও গল্পের সাথে জায়গা করে নিয়েছে এবং পিকাসো ও রাজনৈতিক ছবির উপর যে দুটি আলোচনা আছে তা অবশ্যই পত্রিকার মান উন্নয়নে সাহায্য করেছে।

কলকাতার কাগজ 'তিনজন' শুধু গল্পের পত্রিকা—প্রবন্ধ নেই এতে। সম্পাদকীয়বিহীন এবং প্রবন্ধরোহিত পত্রিকাটি সম্পাদক যে ভাবনা হতেই প্রকাশ করুন না কেন পাঠকের কাছে পৌঁছানোর সোজাসুজি উদ্দেশ্য, যা সকল লেখকও সম্পাদকের ইচ্ছে, তা কিন্তু সফল হয়নি। দুটো কথায় অন্তরঙ্গতা হলে তবে গল্প, আরো জমলে টল্প—এত নির্বাক হলে মন খুলে জমিয়ে বসি কি করে?

'ক্রন্দসী' প্রকাশ পেয়েছে কলকাতা হতে। দীপক সরকারের 'প্রসঙ্গ লেখালেখি' প্রবন্ধটি লেখকের শ্রম ও আন্তরিকতার ফসল। প্রাবন্ধিকের কলম পাঠকদের নিঃসন্দেহে নাড়া দেবে।

শিলিগুড়ি হতে প্রকাশিত 'উত্তর ধ্বনি'র সম্পূর্ণ প্রবন্ধ সংখ্যা প্রকাশ করেছে গত আশ্বিনে। জীবন ও সংস্কৃতির যে রূপরেখাটি এতে ফুটে উঠেছে তা পাঠক ও লেখকদের পড়া এবং যত্ন করে রাখার মত—ঠিকমত তথ্যকে ব্যবহার করতে পারলে লেখকদের কাহিনীর মাল-মশলা এবং পাঠকদের চিন্তার রসদ অনেকখানিই দেবে।

পান্নালাল মল্লিক সম্পাদিত এবং বসিরহাট হতে প্রকাশিত এক টাকার কাগজ 'স্বদেশ' এক কথায় অপরূপ। আশ্বিন ১৩৮৮ সংখ্যাটি দেখে (কাগজটি প্রথম দেখার সুযোগ পেলাম) মফস্বলের পত্রিকা সুন্দর হতে পারে না এই যুক্তিটি, যা অনেকেই বলে থাকেন, তা অতি সরলীকরণ মনে হোল। বেশ কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ চলছে এ পত্রিকায়।

নাটক, চলচ্চিত্র এবং সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা ভাল প্রবন্ধ প্রকাশ করে চলেছে কিন্তু স্থানাভাবে আলোচনা করা গেল না। আলোচনার অনেক ত্রুটির মধ্যে এটিও যুক্ত থাকল।

কোন কূলে মোর...

প্রত্যেক পত্র-পত্রিকার একটা নিজস্ব চরিত্র থাকে—অন্তত থাকা উচিত। কবিতায় যেমন একটা নির্দিষ্ট ছন্দ, গল্পে থাকে একটা পথ, উচ্চাঙ্গ-সংগীতে বৈচিত্র্যময় কিন্তু বিশেষ রাগ তেমন পত্রিকাও একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হাঁটে। শ্রাবণ ১৩৩৮ অর্থাৎ আজ হতে পঞ্চাশ বছর আগে 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার ভূমিকাতে বলা হয়েছিল—'...তাহার প্রধান উদ্দেশ্য প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাব-গঙ্গার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহাইয়া দেওয়া। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পরিচয়' বাঙালী পাঠককে দিতে অভিলাষী। কখনো মূল ভাষার অনুসরণে আলোচনা করিয়া, কখনো বা ভাষান্তরের সাহায্য লইয়া, কখনো সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া, কখনো বা মূলানুগ অনুবাদ করিয়া। এই সঙ্গে মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকেও পরিচয় তাহার দৃষ্টি সদা জাগ্রত করিয়া রাখিবে। কবিতা, কথাশিল্প, নাটক, কলানুশীলন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব-পরিশীলনের সকল বিভাগগুলিই যাহাতে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠে; এ বিষয়ে পরিচয় সাধ্যমত চেষ্টা করিবে। পরিচয় জানে যে তার সাধ যত, সাধ্য তার বহু পশ্চাতে।...' একটা পথের সন্ধানে হেঁটেছে 'কালি ও কলম', 'সবুজপত্র', 'কল্লোল', 'প্রগতি'। পথের সঙ্গী অনেক অদলবদল হয়েছে, অনেক সময় পথ শেষ হয়ে গিয়েছে পর্বতের পাদদেশে কি নদীবক্ষে কিন্তু অভিযাত্রীরা থামেন নি—পথ তৈরি করে নিয়েছেন। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ তাদের ছিল নির্দিষ্ট লক্ষ্য। কল্লোলের যুগ আমাদের কাছে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। যেমন 'বনস্পতির বৈঠক' ও 'চলমান জীবন'-এ সেই আন্দোলনের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য আরো স্পষ্ট হয়।

কনিষ্ঠ বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় এই 'চরিত্র' খুঁজে পাওয়া বড় দুষ্কর। সাহিত্যের ফসল এরা তরীতে বোঝাই করে কিন্তু কোন কূলে তারা পাড়ি দেয় তা বোঝা যায় না। বেশ কিছু কবিতা আছে, বেশ কিছু গল্প আছে, প্রবন্ধও আছে এক-দু'খানা এবং এক বা একাধিক বোল্ড পয়েন্ট বোল্ড-এ ছাপা সম্পাদক আছেন কিন্তু কোথায় যাচ্ছি তা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। অধিকাংশ লিটল ম্যাগাজিনের একটি সম্পাদকীয় থাকে এবং বাছা বাছা শব্দে অন্যতম উদ্দেশ্যের বয়ানও থাকে কিন্তু লেখা বাছাই এবং সম্পাদনায় দুর্বলতা বড় বেশী চোখে পড়ে। এক-একটি লেখা এক-এক ভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং সময় সময় তা পরস্পরবিরোধী। বিভিন্ন লেখক আলাদাভাবে ভাববেন কিন্তু সম্পাদক এক মলাটের মধ্যে সব এঁটে দেবেন তা মোটেই আকাঙ্ক্ষিত নয়। কিছু কিছু ম্যাগাজিন ক্ষীণ কলেবরের মধ্যে সমাজতত্ত্ব হতে আবহাওয়া দূষিতকরণ সবকিছুই সাহিত্য পত্রের অঙ্গীভূত করে। যদি পত্রিকার প্রকাশ নিয়মিত হয় এবং প্রত্যেকটি লেখা সেই বিষয়ের বিশেষ অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত মানুষের হয় তাহলে গল্প কবিতার সাথে চলে যায়—অন্যথায় কেমন খাপছাড়া লাগে। এ সমালোচনা আমার দক্ষিণ কলকাতা হতে প্রকাশিত 'চারাগাছ' সম্বন্ধেও। সম্পাদকমণ্ডলী হয়ত বলবেন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ফসল চামড়া-শিল্প, খেলাধুলা, এসমা এসব প্রবন্ধগুলি। কিন্তু তাহলে লিটল ম্যাগাজিনগুলি কি মিনি সংবাদপত্র হয়ে উঠবে? শুধু তথ্য নয়, লেখকরা চামড়া-শিল্প, ছাপাখানার কর্মীদের জীবনকে জেনে এবং তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে সাহিত্যে তা তুলে ধরুন। লিটল ম্যাগাজিনের পাঠকরা তত্ত্ব বা তথ্যের চেয়ে 'মেসিনের মুখোমুখি মানুষটা' আরো বেশী ভালবাসে এবং সম্পর্কটাও হয়ে ওঠে অনেক নিবিড়। কাজেই লিটল ম্যাগাজিনের নির্দিষ্ট একটা গন্তব্যস্থল থাকা একান্ত প্রয়োজন।

কি গাব আজি কি শোনাব...

যে কোন পত্রিকার কাছে আমাদের একটা বিশেষ ধরনের আশা থাকে। জেলাগুলি হতে যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পায় তাদের কাছে আমাদের মোটামুটি আশা (ক) ঐ জেলার সংস্কৃতির একটা পরিচয় আমরা পাব (খ) সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে পরিবর্তন সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে এসেছে তার একটা ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে (গ) তরুণ লেখকদের জীবন্ত এবং দুরন্ত দু'একটি লেখা অন্তত চোখে আসবে (ঘ) কিছু নতুনতর তাজা লৌকিক শব্দ ভাষার ভাণ্ডারে জমা পড়বে।

হাতের কাছে যেসব পত্র-পত্রিকা আছে রঘু-নাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ হতে প্রকাশিত (সাল উল্লেখ নেই, সম্ভবতঃ ১৩৮৭) 'ঐকতান'-এর কথা ধরা যাক। সুন্দর প্রচ্ছদ, ভাল কাগজ, ছাপাও মন্দ নয় এবং পত্রিকাটির চেহারার মধ্যে বেশ একটা ছিমছাম ভাব আছে কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসংস্কৃতি বা নবসংস্কৃতির কোন আলোচনা নেই এতে। প্রবন্ধ একেবারে বাদ। প্রতিষ্ঠিত লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'জুটি' গল্পটি ছাড়া ঐ জেলার মানুষের কোন পরিচয় মেলে না। লোকমুখে চলতি কিন্তু রহস্যময় শব্দগুলো স্থান করে নিতে পারে নি জেলা হতে প্রকাশিত এই পত্রিকায়। মেদিনীপুর হতে প্রকাশিত 'বহ্নি' (পঞ্চম বর্ষ—প্রথম সংখ্যা—আশ্বিন ১৩৮৭) বড় আশা নিয়ে পড়তে বসেছিলাম। সম্পাদিকা লিখেছেন—'১৯৭৫-এ যে নবজাতকের জন্ম হয়েছিল ভাল করে বেড়ে ওঠার আগেই '৭৮-এর বন্যায় তাকে ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল। আশা করে ছিলাম লেখকদের কলমে সংবাদপত্রের বন্যার নিম-কাব্য ছাড়িয়ে সত্যিকারের প্রকৃতি ও মানুষের লড়াই-এর একটা জীবন্তরূপ পাব কিন্তু প্রবন্ধ '৭৮-এর বন্যা' এবং কবিতা 'বন্যার পরে' আমাদের সে আশা মেটাতে পারে নি। শেষ মুহূর্তে কোন শুভাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শে ছাপাখানায় বসে লেখা যেন। এই বন্যার উপরেই ঐ সময়ে আফসর আহমেদের 'জলস্রোত-জনস্রোত' প্রকাশ পেয়েছিল পরিচয় পত্রিকায়। এক কিশোর গল্পকারের এই লেখা চমকে দিয়েছিল সেদিন শুধু পাঠকদের নয়—বেশ কিছু পাকা গল্পকারদের। বন্যার উপর অনেক গল্প পড়েছি কিন্তু কোন পত্রিকাতেই এমন জীবন্ত ছবি চোখে পড়ে নি। একটু উৎসাহ দিলে সেদিনের মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমানের লেখকদের হাত হতে অনেক ভাল লেখা বেরিয়ে আসতো। কল্যাণ ভৌমিকের সম্পাদনায় 'নন্দনির্জন' নামে প্রকাশিত একটি পত্রিকা হাতে এসেছিল। ঐ পত্রিকার ৪০—৪৩ সংখ্যায় এক কবির লেখা পড়েছিলাম যাঁর একমাত্র না হলেও বিশেষ সাধ প্রেয়সীর বাহুমূলে উকুন হওয়ার। অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার চারপাশের জীবনকে অস্বীকার এবং বেশ কিছু লেখকের কিম্ভূতকিমাকার ইচ্ছের কারণ নিজের এলাকার মানুষও সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীনতা। মাটির সাথে মনের যোগ থাকলে অধিকাংশ লিটল ম্যাগাজিন আজ অন্য চেহারা নিত।

পুরুলিয়া হতে প্রকাশিত মানভূমসংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'ছত্রাক' নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে একটিমাত্র উপভাষাকে কেন্দ্র করে ঐ অঞ্চলের সংস্কৃতি ও সংস্কারকে তুলে ধরার কাজে কিন্তু নির্দিষ্ট নিয়মের বন্ধনে সমস্ত লেখার মান সব সময়ে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে হাজির হতে পারছে না। ভৌগোলিক পরিবেশের মণ্ডল একটু বাড়ালে এবং ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে খানিক উদার হলে পত্রিকাটি পাঠকমহলে অধিক সমাদর পেত।

সাহিত্যসভার ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা

আজকাল বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিন দেখলে মনে হয় প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ এবং অপ্রতিষ্ঠিত নবীন লেখকদের অনুপাত মোটামুটি ১ : ৪ এবং কখনো কখনো ১ : ৩ রাখার পক্ষপাতী। দু'একজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের লেখা থাকতেই পারে কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত হলে অস্বস্তিকর ঠেকে। পাঠক প্রশ্ন তুললে সম্পাদকরা বলেন যে নামী লেখকের লেখা না থাকলে পত্রিকা বিক্রি হয় না। কথাটা খানিক সত্যি হলেও সবটা সত্যি নয়। অনেক পাঠকই আছেন যাঁরা লিটল ম্যাগাজিন কেনেন প্রতিশ্রুতিবান উঠতি লেখকদের তরতাজা লেখা পড়তে। নামী লেখকদের লেখা প্রায় প্রতি সপ্তাহে হাতে আসে, লিটল ম্যাগাজিন সেক্ষেত্রে আর নতুন কি দেবে? সবক্ষেত্রে নাহলেও অনেক ক্ষেত্রে এটা সত্যি প্রতিষ্ঠিত লেখকদের বাতিল লেখাগুলিই অনেক সময় হাত ঘুরে লিটল ম্যাগাজিনের হাতে যায়। ভালো হলেও অবশ্য উদ্দেশ্য সফল হয় না। খড়গপুর হতে প্রকাশিত 'সময়' এ বছরের পুজো সংখ্যায় জনা সাতেক নামীদামী কবির কবিতা ছেপেছে। চব্বিশ পরগণা জেলা হতে প্রকাশিত 'পিয়ালী' সম্বন্ধে আমার একই অভিযোগ। দু'টি পত্রিকাতেই পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট দক্ষতা ও কুশলতার ছাপ রয়েছে কিন্তু 'ঐটুকু' যেন অঙ্গ-হানি করেছে। হিন্দ মোটর (হুগলী) হতে প্রকাশিত শারদীয় 'অনির্বাণ' (১৩৮৭)-এর ব্যাপার এমনিই বড়সড়।

এসবের পিছনে অবশ্য একটা কারণ আছে। অনেক সময়ই ভাল লেখার জন্যে সম্পাদককে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়। ভাল লেখকের বড় অভাব —এ অভিযোগ প্রায়শই ওঠে। এটাও স্বাভাবিক কারণ খুব কম পত্রিকা ভাল লেখা ও ভাল লেখকের সন্ধানে প্রচেষ্টা চালায়। সবচেয়ে সোজা পথ সাহিত্য সভা। সাহিত্যিক আড্ডার ফসল বহু অসামান্য লেখা, বহু অসামান্য লেখক। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু এক সময়ে পৃথকভাবে দু'টি বড়সড় আড্ডার ব্যবস্থা করেছিলেন। আড্ডা হতেই উঠে আসত বাংলা-সাহিত্যের বহু সৃষ্টির কাঁচা রসদ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পত্তন করেছিলেন 'খামখেয়ালী সভার'। বড় 'লিটল ম্যাগাজিন' গোষ্ঠীগুলিতে আজও আসর বসে। ছোটগল্পের পত্রিকা 'গল্পগুচ্ছ' প্রায় প্রতি মাসে গল্প পাঠের আসর এবং ছোটগল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশেষজ্ঞদের আলোচনা সভার ব্যবস্থা করেছে। গল্পগুচ্ছের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কনিষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিনেরও সপ্তাহে বা মাসে এমনি সভার আয়োজন অনেক রোগ-জরার প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করবে। তৈরি হবে নির্দিষ্ট একটি লেখক-গোষ্ঠী, নতুন লেখক তৈরী হবে, ভাববিনিময়ের ফলে চিন্তার প্রসারতা ঘটবে, চাপের ফলে লেখার উৎসাহ বাড়বে, পাঠকও হয়ত খানিক এগিয়ে আসবে, লেখকদের হঠাৎ করে আরশোলা, উকুন হওয়ার সাধ জাগবে না এবং ক্রমশঃ বেশী বেশী সংখ্যক লেখক ও পাঠককে পত্রিকার সাথে যুক্ত করা যাবে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকেও এর মধ্যে যুক্ত করা যেতে পারে—তবে সেক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পত্রিকাগুলিরই।

মাঝে মাঝে জেলা শহর এবং তার আশেপাশে সাহিত্যসভার বাৎসরিক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র হাতে আসে। যাই, কিন্তু তেমন মন ভরে না। সাধারণ ক্ষেত্রে কলকাতার বড়সড় লেখকরা আসন অলঙ্কৃত করেন এবং তাঁদের উপস্থিতিতে ভাব-বিনিময়ের একটা সুযোগও আসে তবুও পাঠকরা যেন ঠিক আমল পান না। কর্মকর্তা অর্থাৎ উঠতি কবি-সাহিত্যিকরা আতিথেয়তা নিয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েন, এ পর্যন্ত সব ঠিকই আছে, তবে পাঠকরা যখন কিছু প্রশ্ন রাখেন, হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে তা নেহাৎ মামুলি এবং কিছুটা ঝাঁঝালো, কর্মকর্তারা তাঁদের অস্বস্তির কথা গোপন রাখেন না। পাঠক যদি মন খুলে দু'কথা বলার সুযোগ না পায় তাহলে সাহিত্য-সভার মূল্য কি? পাঠককে বাদ দিয়ে নিশ্চয় সাহিত্য গজিয়ে উঠবে না—উঠলেও সে হবে নেহাত ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ব্যাপার। বেশ কিছু লেখক ও কবির হাতকচলানো, নিজ মুখে নিজের নাম সংকীর্তন, আড়ালে আবডালে মুখ রোচক সমালোচনা—এ সবের অভিজ্ঞতা অকথিত থাক।

মূল্য, বিনিময় কিংবা গাঁটগচ্চা

দিন দিন কাগজ ও ছাপার ব্যয় বেড়ে চলেছে ফলে ছোট পত্র-পত্রিকাগুলি নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। অনেক সময়ই নেহাত বেজার হয়ে কেউ কেউ আট আনা এক টাকা বার করে দেন। পত্রিকার এক কপির দাম ত্রিশ পয়সা এবং গ্রামাঞ্চলে এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় যে দু'কাপ চা খেয়ে পত্রিকার দামের সাথে 'কাটান' দিতে হয়। এসবের ফলে অনেক সময় পত্রিকা প্রকাশ কয়েক সংখ্যা পরে বন্ধ হয়ে যায় আবার অনেকে এগোতেই সাহস করেন না। তবে অনেক ক্ষেত্রে খুব কম পয়সাতেও ছিমছাম পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব। স্থানানুসারে অবশ্য একটু এদিক-ওদিক হতে পারে।

(ক) সাইজ ১/৘

কোয়ালিটি—নিউজ প্রিন্ট

মোট বই—৩০০

প্রত্যেক বই-এর জন্য প্রয়োজন ১২ সিট কাগজ।

৩০০ বই-এর জন্য ৩০০×১২=৩৬০০ সিট বা ৩৬ দিস্তা।

দাম ২.৫০ করে×৩৬ দিস্তা ৯০.০০

ছাপা ১৩০.০০ (ফর্মা)×৩ ফর্মা ৩৯০.০০

(স্থান বিশেষে কমবেশী হতে পারে)

কভারের কাগজ ৩ দিস্তা×১০.০০— ৩০.০০

কভার প্রিন্টিং ১৫.০০

মোট ৫২৫.০০

বাইন্ডিং নিজেরা করা যায়। হিসেব মত করতে পারলে খরচ আরও কিছু কমতে পারে। তিন ফর্মা অর্থাৎ ৪৮ পাতা না করে দু'ফর্মার করা হলে খারাপ হবে না। হিসাবটা নিজেরা বার করে নিতে পারবেন।

(খ) ফোল্ডার

সাইজ=২৮ সে.মি.×১১ সে.মি.

পাতা—৮

কোয়ালিটি—বেঙ্গল

মোট সংখ্যা—তিন শত

কাগজ ৬ দিস্তা। দাম ৩.৬০ করে (৩.৬০×৬)=২১.৬০

ছাপা পাতাপিছু ১০ থেকে ১৫ টাকা [১২ ধরে হিসাব]=৯৬.০০

মোট ১১৭.০০

শারদীয় সংকলন বা বিশেষ সংখ্যা ম্যাপ-লিথোতে ছাপলে শুধু কাগজের দাম আর গোটা দশেক টাকা চাপবে। পত্রিকার দাম ন্যূনতম পঞ্চাশ করা বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞাপন পেলে দাম কমবে। যাঁরা নতুন পত্রিকা বার করবেন ভাবছেন কিন্তু এখনও সাহস করেন নি এই হিসাবটিতে তাঁরা খুব ভীতিপ্রদ কিছু লক্ষ্য করছেন কি? ফোল্ডারের সাইজ আরো ছোট হলে, যে ক্ষেত্রে এক ইম-প্রেসনে একদিক ছাপা যাবে (ছোট প্রেসের কথা মনে রেখে বলছি), ছাপার দাম বেশ কিছু কমে আসবে। যেসব পত্র-পত্রিকা দু'তিন সংখ্যা প্রকাশের পর আর প্রকাশ পাচ্ছে না ফোল্ডারের কথা নতুন করে ভাবতে পারেন। তবে ছোট হলে সাজানো-গোছানো নিখুঁত হওয়ার খুবই প্রয়োজন। অধিকাংশ লিটিল ম্যাগাজিনে বানান ভুলের যে ঐতিহ্য আছে তাকে অস্বীকার করতে হবে। পাঠককে 'আমাদের পত্রিকার প্রুফ-রিডার' এই সম্মানটুকু দিয়ে সম্পাদক হিসাবে নিজের দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করা চলবে না। বিজ্ঞাপনের ভাষার ব্যাপারে প্রয়োজনে একটু দৃষ্টি দিতে হবে। পত্রিকার একেবারে দ্বিতীয় পাতায় কাঁচা শিল্পীর হাতে আঁকা বাঁদরের তবলা বাজানোর বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে একটু ভাবতে হবে, অন্তত অন্য কোন পাতার ব্যাপার। বেশ কিছুদিন আগে ২৪ পরগণা জেলা হতে প্রকাশিত 'অনুভব' নামের একটি পত্রিকার সম্পাদনায় বেশ একটা ছিমছাম ভাব লক্ষ্য করেছিলাম পত্রিকাটি জুড়ে।

চিন্তার বিনিময়

লিটল ম্যাগাজিনগুলির কাছে আশা তারা অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিন দেখবে, পড়বে, আলোচনা ও সমালোচনা করবে। কাছাকাছি সাহিত্য সম্মেলনের এবং আলোচনা সভার খবর থাকবে তার মধ্যে। হুগলী জেলা হতে প্রকাশিত 'মহুয়ামন', আনন্দের কথা, এসব নিয়ে ভাবছে। ষাট পাতার একটি পত্রিকায় (শারদ সংকলন/১৩৮৭) দু'পাতার বেশী এ'রা গ্রন্থসমালোচনা

এবং বাকি দেড় পাতার মত অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিনের জন্য বরাদ্দ রেখেছে। কলকাতা হতে প্রকাশিত 'ঘোড়সওয়ার' মুদ্রণবিচ্যুতি সত্ত্বেও পারস্পরিক যোগাযোগের একটা চেষ্টা রেখেছে। চমকে দেওয়ার মত কাজ কলকাতা হতে প্রকাশিত 'মাটির কাছে'। আমার কাছে এখন বছর তিনেক আগের একটি সংখ্যা শুধু আছে। অনুবাদ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর জগৎকে কাছে টানার যেমন প্রচেষ্টা আছে, 'সাংস্কৃতিক সমাচার' শীর্ষক আলোচনার মধ্যে কলকাতা ও গ্রাম-জীবনের মধ্যে একটা যোগসূত্র গড়ার তেমন ইচ্ছে আছে। বাংলার পত্র-পত্রিকা বিভাগীয় আলোচনায় হাওড়া জেলার লিটল ম্যাগাজিন-গুলির উপর মরমী আলোচনাটি অনেক পা-কর্ম এবং মাথা-কর্মের ফসল। নিজের জগৎকে জেনে বৃহত্তর জগৎকে জানার প্রচেষ্টা অবশ্যই সাধুবাদ পাবে পাঠকদের কাছ হতে।

তুমি সুন্দর তাই...

যে কোন কাগজের কাছে একটা আশা থাকে সুন্দর হবে চেহারাখানা যাতে প্রথম দর্শনেই মনে দোলা দিতে পারে। এ ব্যাপারে অধিকাংশ লিটল ম্যাগাজিন ভাবনাচিন্তা কমই করে। কারণ অভিজ্ঞতার অভাবও হতে পারে। এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন অবসর সময়ে প্রেসকর্মীদের সাথে একটু জমিয়ে ফেলার। নানা টাইপ, ব্লক ইত্যাদি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনায় ধারণা অবশ্যই বাড়বে। অঙ্গসজ্জার ব্যাপারে ব্যবসায়িক পত্র-পত্রিকাগুলির দিকে চোখ বুলোলে মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। ছাপার প্রাথমিক জ্ঞানের উপযুক্ত ছোটখাট বইও বেরিয়েছে দু'চারখানি। গ্রামের দিকের পত্রিকাগুলি প্রেসের ক্ষমতার কথা বলবেন কিন্তু এটাও তো সত্যি স্নো, পাউডার না মাখলেও শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ভোলাতে পেরেছিলো।

উপকথা

আলোচনাটির উদ্দেশ্য কোন বিশেষ লিটল ম্যাগাজিনের সমালোচনা নয়, লিটল ম্যাগাজিনের ভাবনাচিন্তার কোনটা ভাল কোনটা মন্দ লাগে, পত্রিকা যাঁরা প্রকাশ করেন তাঁদের গোচরে আনা। বেশ কিছুকাল আগে চব্বিশ পরগণা হতে প্রকাশিত 'দিশারী' পত্রিকায় অশোক কুণ্ডুর 'বেড়ি' নামের একটা গল্প পড়েছিলাম কিন্তু আর কোনদিন অশোক কুণ্ডুর গল্প পেলাম না। দুঃখ লাগে এই ভাল হাতের গল্প লেখককে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যেতে দেখে। লিটল ম্যাগাজিনগুলি যে দায়িত্ব নিয়েছে তা পালন করতে আরো বেশি রক্ত জল হবেই। আমার ধারণা লিটল ম্যাগাজিনগুলি তার অনেক সমস্যারই সমাধান করে ফেলতে পারবে, অনেক ফসল সে তুলতে পারবে তার ডিঙিতে যখন সে বুঝে উঠবে সে নিজেকে যত ছোট ভাবে তত ছোট সে নয়। বড় পত্র-পত্রিকাগুলির চেয়ে অনেক বড় দায়িত্ব তার কাঁধে। প্রতি মুহূর্তেই নতুন লেখক গড়ার দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয়, আবার একই সাথে বৃহৎ ব্যবসায়ী পত্র-পত্রিকাগুলির সবজান্তা ভাবের প্রত্যুত্তর দিতে হয়। হাজার দু'হাজারি মনসবদারি জোটে কি জোটে না কিন্তু ভিতরে ভিতরে ক্ষয় সুরু হয়ে যায়। চারপাশের এসবকিছু থেকে সামাল হয়ে পথ হাঁটতে হয়। হাঁটাটা তখনই জোরকদমে হবে যখন লেখক ভাবতে পারবে—যা ভাবি তা লিখি, কোন খাদ নেই তাতে। সম্পাদক যখন বোঝাতে পারবেন লেখককে 'লিটল ম্যাগাজি'নের বাংলা অর্থ 'ছোট পত্রিকা' নয়—'অনু পত্রিকা'; এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে সৃষ্টির টানটান অসীম শক্তি।

[**জিনিসের দাম কেন বাড়ছে** : ১০ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

গত দু বছরে দ্রব্যমূল্য শতকরা ২০ ও ১৫ ভাগ হারে বেড়েছে। এ বছরও যথেষ্ট বাড়বে। অথচ মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করবার বিশেষ কোন প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে নেই। বরঞ্চ মূল্যবৃদ্ধি যাদের জন্যে সেই ফাটকাবাজদের সঙ্গে সরকারের দহরম মহরম।

সাম্প্রতিক আই-এম-এফ ঋণের চুক্তি নানা-ভাবে দ্রব্যমূল্যে বাড়াবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করেছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, খাদ্যদ্রব্যে ভরতুকী বন্ধ হবে। যেমন বন্ধ হবে রাসায়নিক সারের মূল্যে ভরতুকী উভয়তঃ খাদ্যশস্যের মূল্য বাড়বে। এছাড়া, আই-এম-এফ ঋণের কথা মনে রেখে, গত দু বছরে পরিবহণ ব্যয় বাড়ানো হয়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়িয়ে—এর ফলেও দাম বাড়বে। বেসরকারী ব্যবসায়ে মালিকদের নানা বিধিনিষেধ কমবে—এর ফলেও দাম বাড়বে। সব মিলে ওই ঋণ দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির এক বিরাট সম্ভাবনা তৈরী করছে।

রবীন সেনের বাড়ী ও আমার জীবনযাপন

হীরালাল চক্রবর্তী

আমাদের বস্তি থেকে একটু দূরে একটা খোলা জায়গার জমিতে রবীন সেন একখানা বাড়ি তুলেছে। বাড়িখানা ছবির মত। আড়াই ফুট তিনফুট উঁচু পাঁচীল দিয়ে ঘেরা। সামনে কচিঘাসের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। দেশী-বিদেশী নানা ফুলের সম্ভারে প্রাঙ্গণটি ঝলমল করে।

রবীন সেনের বাড়িখানা দোতলা। সামনেটা জাহাজের মাস্তুলের মতন। কারুকার্য করা রেলিং বারান্দায়। নীচে বারান্দার সিঁড়ির দুপাশে বসার বাঁধানো চেয়ার। আর ঠিক ওখান থেকে সদর গেট পর্যন্ত লাল কাঁকর বিছানো পথ। দুপাশে লাল রং-এর ত্রিকোণ ইঁট দিয়ে সাজানো। ওপরের ঝুলবারান্দার কার্নিশে দুটো ফুলের টব। তাতে লাল রং-এর ফুল ফুটে আছে। ফুলের নাম জানি না। ভারি সুন্দর দেখতে।

এই হল রবীন সেনের বাড়ি। এর সবটাই নাকি রবীন সেনের উপ্‌রি টাকায় হয়েছে। আর তার স্ত্রীর ভাগ্যে। ওর স্ত্রী পরমাসুন্দরী। প্রায়ই কচিঘাসের ওপর সে ঘুরে ঘুরে ফলগাছ তদারক করে। যেন এটা ছাড়া জগতে আর কোন কাজ নেই। ছোট্ট ছেলেটা তিন চাকার সাইকেলে চড়ে মায়ের পেছনে পেছনে ঘোরে। মায়ের মতই সুন্দর। কোঁকড়া চুল ডাগর ডাগর চোখ। কোলে নেবার জন্য আমার হাতটা অনেক সময় নিসপিস করে।

রবীন সেন স্কুটারে যাতায়াত করে। মস্ত ভারিক্কি চেহারা তার। মোটা গোঁফ। কালো গায়ের রং। একটা দৈত্যের মত লাগে। স্কুটারে চড়িয়ে যখন স্ত্রীকে নিয়ে যায় মনে হয় যেন হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তাই বটে। শুনেছি হরণ করেই এনেছে। একজন ধনী রাজনৈতিক নেতার কন্যা। যে নেতার দৌলতে রবীন সেনের এত রমরমা। পায়ের নীচের মাটি এত শক্ত। ও বাড়ির ঝির মুখে এসব শোনা। বাড়ির গেটটার মুখে আমি প্রায়ই এসে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখতাম। বাড়িখানা ছবির মত মনে হয়। ঝি-র সংগে প্রায়ই আমার দেখা হয়। লোহার গেটটা খুলে ও এমন একটা ঠমক মেরে চলে যায় যেন বাড়ির আদ্দেক মালিকানা ওর। প্রথম প্রথম অবজ্ঞায় ভুরু কোঁচকাত। তারপর প্রশ্ন চোখের তারা নাচিয়ে। একদিন বললাম, বাড়িখানা দেখবার মত।

এরপর সে আর কোনদিন কিছু শুধোয় নি। ঠমকঠামক একই রকম চলত।

রবীন সেনের বাড়ি দেখতে গিয়ে প্রায়ই কাজে লেট হত আমার। আমি একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করি। মাইনে যা না পাই ধমক খাই তার চেয়ে বেশী। মালিকের নাম অনুকূল ভুঁইয়া। বোঁচামুখে খিচ্‌খিচ্ করে সব সময়। কৈফিয়তের শেষ নেই। একদিন বোধহয় অজান্তে কড়া সুরে বললাম, 'রবীন সেনের বাড়ি দেখছিলাম।' ভয়ানক চটে গিয়ে বোঁচামুখ এক দোকান লোকের মধ্যে ঘোড়ারোগ ফোরারোগ বলে যা তা অপমান করল।

রবীন সেনের মত একটা বাড়ির স্বপ্ন দেখা সত্যি ঘোড়া রোগ। আগে চোখ বুজলেই লাল নীল হলুদ কি সব দেখতাম। মাঝে আবার সবটাই হলুদবরণ দেখতাম। লোকে বলত কাওলা রোগ। তখন যে-ই দেখত একবারটি করে জ্ঞান দিতে ছাড়ত না। শরীরের যত্ন চাই খাদ্য খাওয়া চাই কত কি। আমি চোখ মেলে দেখতাম আমার পরম আত্মীয়দের মুখ। মার নিরস কঠিন মুখ—বাবার ব্যক্তিত্বহীন অসহায় চাউনি। দেখতে দেখতে আপনা থেকেই চোখ বুজে আসত আমার। রবীন সেনের বাড়িখানা দেখার পর থেকেই চোখ বুজলে ছবির মত ভেসে ওঠে এক-খানা বাড়ি। নানা রং-এর ফুল। সাজানো ছোট্ট একটি বাগান। তার মধ্যে পরীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে একজন মহিলা।

আমাদের ঘরে ছোট্ট একটি জানালা আছে। সেটা খুললে কচুরিপানায় ভরা এ'দো পুকুরের আঁশটে গন্ধ নাকে লাগে। গন্ধটা আমাদের গা সহা। ঘরের মধ্যেও এরকম একটা ভ্যাপসানো গন্ধ দিনরাত। কোনদিন রোদ্দুর ঢোকে না। রবীন সেনের মত খোলামেলা তো নয়। খুব ঘিঞ্জি আমাদের বস্তি। সারা গলিতেই নোংরা ছড়ানো। বাচ্চাদের নোংরাই বেশী। বাতাসের পায়ে হেঁটে ও সব গন্ধ ঘরে আসে আশ্রয় নিতে।

আমি রোজ দুবেলা রবীন সেনের বাড়ির সামনে দিয়ে যাই-আসি। এর মধ্যে তিনচার মিনিট দাঁড়াই। রবীন সেন হয়ত তখন বাইরে চেয়ার পেতে চা পান করে। ওর স্ত্রী পটের থেকে চা ঢেলে দেয়। রবীন সেন তারপর ওঠে। স্কুটারটা বার করে এবং বোঁ-ও-ও শব্দে বেরিয়ে যায়।

রবীন সেনের নাকি কোন ব্যবসা নেই। তার টাকা নাকি ভূতে জোগায়। ঝি বলেছে। ওর শ্বশুর খুব জাঁদরেল রাজনৈতিক নেতা। হিল্লি-দিল্লি করে। রবীন সেন গুন্ডা ছিল। এখন নেই। এখন একজন ভি আই পি। রাজনীতির অর্জুন। আমাদের মত মানুষের শরীরের বেওয়ারিশ হাড় নিয়ে গবেষণা করে। এবং তারপর নিজের মত স্বর্গ বানায়।

আমার সংসারে সাতটা জীবন। সত্তর টাকা উপ্‌রি খেটে মাইনে পাই। ঘিঞ্জি বস্তির ছোট্ট ঘরে খাটালের গরুর মত বাস করি। আর রবীন সেনের বাড়ি দেখে স্বপ্নের উত্তাপে বিভোর হয়ে যাই। সেই ঘোড়া রোগে পেয়ে যায়। রবীন সেনের মত একখানা বাড়ির বাসনা হয়। আমি চোখ বুজলেই লাল নীল হলুদের উড়ন্ত রং ভাসতে দেখি। বুদ্‌বুদের মত সেগুলো জেগে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। সেই উড়ন্ত বুদ্‌বুদের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাই একখানা বাড়ি। ফুলের সজ্জা। একটি রূপসী মহিলার মুখ। আর দেখতে পাই জটিল রেখাময় বুনো বেড়ালের মত গোঁফ-ওয়ালা একটা মুখ। সে মুখ রবীন সেনের। যে আমাদের হাড়ের ইঁট দিয়ে স্বর্গোদ্যান বানায়।

বোঁচামুখো সেতুয়ার শ্যালক কাঁকন চাবড়ী আমার পিঠের হাড়ে গুঁতো মেরে প্রায়ই শাসায়, 'ওহে ঘোড়া রুগী, হেক্কোরবাজী ছেড়ে কাজ করো, নয়তো পত্র ধরিয়ে দেবো।'

রবীন সেন একদিন আমার সামনে পড়ে গেল। মনে হল যেন একটা উড়ন্ত বাজ পাখি আমার সামনে নামল। ক্যাঁচ করে স্কুটারটা থামিয়ে চোখের গগল্‌স্‌টা কপালে তুলে আমার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে বললে, কাকে চাই?

রবীন সেনের গলার স্বর মনে হল নকল। মানুষের এত কর্কশ গলা হয় কখনো! ছবির মত যার বাড়ি। ফুলেফুলে সাজানো বাগান। বিনা শ্রমে যে লাখো লাখো টাকা কামিয়ে স্বর্গোদ্যান বানায়।

ঝি-টা একদিন ঠমক মেরে এগিয়ে এল। কোমর দুলিয়ে একটা কটাক্ষ হেনে বিড়বিড় করে বললে, ফুলটুল চুরি কোর না বাপু। এ্যাল্‌-সিয়ানটাকে তালে লেলিয়ে দেবো।

একদিন মাত্র দেখেছিলাম কুকুরটাকে। রবীন সেনের স্ত্রী তার গলায় শেকল পরিয়ে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমাকে দেখে গ'ক গ'ক করে তেড়ে এল। সেদিন বেশিক্ষণ দাঁড়াইনি। মাইনের থেকে এ্যাড্‌ভান্স নিয়ে ছোট বোন অঞ্জুর ওষুধ কিনে ফিরছিলাম। অঞ্জু বাঁচবে না। তবু ওর জন্যে ওষুধ কিনতে হয়। বাবা যেরকম হাঁপের টানে মাঝে মাঝে চোখ উল্টে হেক্কি দেন অঞ্জুও সেরকম করে। সেদিন ধরেই নিতে হয় কাজ বন্ধ। হয়ত মনে মনে খুসীও হই এতদিনের জীবনযন্ত্রণার অবসান দেখে। কিন্তু সকালবেলা উঠে দেখি সব ঠিক ঠিক চলছে। ওর হৃৎপিন্ডটা ধুক ধুক করে নড়ছে। অর্থাৎ অঞ্জুর জীবন-যন্ত্রণার মেয়াদ শেষ হয় নি।

আমাদের গলিতে একটা কুকুর আছে। তার নাম মুনিয়া। এ গলির উত্তরাধিকারী সে। ওর দিদিমাকে দেখেছি। মাকে দেখেছি। ওকেও দেখছি। ওর দিদিমা একদিন বড় রাস্তায় গাড়ির

নীচে চ্যাপ্টা হয়ে সারা রাস্তা নোংরা করে শুয়েছিল। ওর মাকে কর্পোরেশনের ধাঙড়েরা মাংসের লোভ দেখিয়ে শেষ খাওয়া খাইয়ে দিয়েছিল। মুনিয়া বারোয়ারী গলির এ'টোকাঁটা খেয়ে আজও বেঁচে থাকে। ওর গায়ে লোম নেই। ঘাড়ের নীচে দগদগে ঘা। এ গলিতে উৎসবের মত ক্বচিৎ কখনো যদি মাংসের দুটি একটি হাড়ের টুকরো পড়ে সে লেজ নেড়ে পরম আনন্দে কৃতজ্ঞতা জানায় গলির বাসিন্দাদের। মুনিয়ার সংগে আমার দেখা হয় দিনের শুরুতে আর অবসানে। গলির সরু মুখটিতে আমার চেহারা ফুটে উঠলেই মুনিয়ার লেজ নড়েচড়ে। স্তূপীকৃত জঞ্জালের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। অতঃপর সারা রাত লেজ লুটিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে আমাদের ঘরের সামনে বসে থাকবে। মুনিয়াও একদিন মরে যাবে। আমার বোনের মত ওরও অসুখ হয়। হাত পা কাঁপে। আমি জানি না আমায় দেখলে ও এত খুসী হয় কেন? মুনিয়াকে আমি কখনো কিছু দিই না। একটুকরা মাছের কাঁটাও কদাচিৎ বাড়িতে এলে ওকে দেবার হিসাব পাই না। অথচ আমাকে দেখলেই ও খুসী হয় লেজ নাড়ে। নিয়মিত পৌঁছে দেবে দোরগোড়া পর্যন্ত। মুনিয়া একদিন ঠিক মরে যাবে। মরে গেলে এ গলিতে আর কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না। রবীন সেনের কুকুরটা রোজ মাংস খায়। সেই ঠমকি ঝি টা একদিন বলছিল। বলার সময় ওর মুখে একরকমের গর্ব ফোটে। কুকুরটা খুব রাগী। কিন্তু মেমসাহেবকে দেখলেই সব তেজ ঠাণ্ডা। একদিন একটা ডালিয়া ফুল লুকিয়ে আমাকে দিয়ে বললে, আর চেও না। টের পেলে মেমসাহেব জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে।

—একটা ফুলের জন্য? অবাক চোখে বললাম।

ও বললে, নয়তো কি? রাগলে খুন করতে পারে।

ঝি মাথা নেড়ে বলে, বড়লোকের ব্যাপারই ওরকম। কোন এক সোমবাবুকে নিয়ে কত কি কাণ্ড। এক-একদিন মেমসাহেব তো পিস্তল নিয়ে তাড়া করে বাবুকে।

—কেন?

—আর কেন? সে দম টানে, বাবুর কি আর সেদিন আছে? সোমবাবু এখন দিল্লীর মন্ত্রী। সে-ই তো সব। বাবুর পেছনে গুটি করেক গুণ্ডা ছাড়া আর কেউ নেই। যাক্ গে তুমি এখন যাও।

সেই ডালিয়া ফুলটা অন্যমনস্কভাবে হাত থেকে পড়ে গেল। অমনি মুনিয়া থাবায় তুলে দাঁত দিয়ে নির্মমভাবে ছিঁড়ে ফেলল পাঁপড়িগুলো। সজোরে লাথি মেরে বললাম, —শালা। এই জন্যেই এ'দো গলির কাঁটা কুড়িয়ে মরিস। দ্যাখ্ গে যা রবীন সেনের কুকুরটাকে। ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়ায়।

লাথি খেয়েও মুনিয়া ফুলটাকে নিয়ে অনেকক্ষণ টানাটানি করে। মুনিয়া যেন লাথি খেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে গেল। একটা জান্তব আক্রোশে ফুলটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল।

আমি একদিন দেখলাম রবীন সেন স্ত্রীর কাঁধে হাত দিয়ে বাগানে ঘুরছে। ওর স্ত্রী হাসছে। কি সুন্দর হাসি। পড়ন্ত বেলার আলো খেলছিল মুখে। ছোট্ট ছেলেটা ঘুরে বেড়াচ্ছে আপন মনে। শেকলে বাঁধা এ্যালসেসিয়ানটা চুপচাপ বসে কুত-কুতে চোখে চেয়ে রয়েছে কর্তাগিন্নীর দিকে। এমন মনোরম অপরাহ্ণটি বোধহয় ও-ও উপভোগ করছিল।

আমি ঐ রাত্রেই একটা স্বপ্ন দেখলাম। বাবা সকালবেলা একখানা চাদরের বায়না করেছিলেন। বড় শীত করে তাঁর। হাঁপানী রোগী। এবারের শীতটাই হয়তো তাঁর শেষ শীত। শীতের দুঃখে দিনরাত আমাকে শাপান্ত করেন। আমাদের একখানা ঘর এক চিলতে বারান্দা। তার এক ধারে মুখ গুঁজে মা সারাদিন ছাইপাঁশ রাঁধে। অন্যদিকে দুটো তক্তাপোস। একটার ওপর আর একটা। পাশাপাশি রাখার জায়গা নেই। ওই তক্তাপোসে আমরা দু ভাই আর বাবা শুই। ঘরের মধ্যে মা বোনেরা আর ছোট ভাইটা। বাবা একখানা জীর্ণ তেলচিটে কম্বল গায়ে দেন। সেটা এত ছেঁড়া কাটা যে শীত আটকায় না তাতে। তাই বাবা একখানা তুষের চাদরের বায়না ধরেছেন। বাবার তুষের চাদর সপ্তাহের রেশন অঞ্জুর অনিশ্চিত শেষ মুহূর্তটির কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপরই দেখলাম স্বপ্নটা। রবীন সেনের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ রবীন সেন ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। মুখে সকৌতুক হাসি নিয়ে হাত বাড়িয়ে বললে, ভেতরে এস।

আমি সংগে সংগে ভেতরে এসে হাসি মুখে বললাম, খুব সুন্দর আপনার বাড়িখানা।

সকলে তাই বলে।

কথা বলতে বলতে কাঁকর বিছানো পথ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। সেই পদ্মফুল মুখখানি পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এল। বললে, এসো শিল্পী। তোমার শিল্পীর চোখ আছে বলেই বাড়িখানার সৌন্দর্য বুঝতে পারো। রিয়ালি উ হ্যাভ এ মাইন্ড অব আর্টিস্ট।

কুকুরটা আমাকে দেখে লেজ নেড়ে অভিনন্দন জানালো। আমাকে একজন সমঝদার আর্টিস্ট ভেবেই তার এই বদান্যতা? রবীন সেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়িখানা দেখাল। তারপর বললে, বলো তোমার মত সমঝদারকে আমি কি দিয়ে খুসি করতে পারি।

আমি ম্লান মুখে বললাম, আমাদের নরকপুরকে স্বর্গ বানানো সহজ কথা নয়।

—হুঁ তা অবশ্য ঠিক। তবু তোমাকে আমি আমার বাগানের সেরা ফুল দেবো। যার গন্ধ যতক্ষণ তোমার নাকে লাগবে নরকে বসেও স্বর্গসুখ হবে।

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, তাই দিন।

রবীন সেন কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে বললে, ফুল তো এখন পাবে না। হাত ধুয়ে আসতে হবে। অতীত বর্তমান ভুলে যেতে হবে। তবে না?

—তা কেমন করে? বর্তমানকে ভুলতে পারি কেমন করে?

—তা হলে হবে না।

ঘুম ভেঙ্গে গেল। তেষ্টায় গলা বুক শুকিয়ে গেছে। মনে পড়ল রাত্রে একগাল মুড়ি খেয়ে শুয়েছিলাম। জলও খাই নি। দুদিন ধরে মুড়ি খেয়ে কাটছে। জলের আক্কা নেই। তাড়াতাড়ি উঠে জল খেতে যাচ্ছিলাম মায়ের পরিচিত কিন্‌কিনে গলার স্বর শোনা গেল। মা কাঁদছে। যে রাত্রে সংসারটা ডাহা উপোস থাকে মা অমনি করে কাঁদে। মায়ের একমাত্র অধিকার ওতে। কেউ বাধা দিই না। ঐ সম্বলটুকু ছিনিয়ে নিই না। পাছে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যায় তাই মা ভয়ে জোরেও কাঁদতে চায় না। সুরটা হয় মর্মান্তিক, স্বরটা চাপা। মনের মধ্যে স্বপ্নের ছবিটা মিলিয়ে গেল।

দরজা খুলে মেজবোনের কাঁধের ওপর দিয়ে দেখলাম অঞ্জুর ওপর ঝুঁকে পড়েছে মা। মেজবোন ছোট্ট করে বললে, অঞ্জু মারা গেছে। এবার সত্যি সত্যি মরেছে রে দাদা।

কে যেন কানে কানে বললে, হাত ধুয়ে এসো। অতীত আর বর্তমান ভুলে যাও।

দেখলাম অন্ধকারে বিশাল নাক তীক্ষ্ম চক্ষু বাজ পাখিটা। হাতে দড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে। অঞ্জুকে নিয়ে যাবে। হাসল। পিঠে হাত দিল।—নিতে এলাম তোমার বোনকে। আমার স্বর্গোদ্যানে একখানা ইঁটের কমতি পড়েছে। কিছুতে মেলাতে পাচ্ছি না।

রবীন সেন মাথা দুলিয়ে হাসল। তার ঈগল নাক ঈষৎ স্ফীত। গর্বিত। বেলা বাড়ছে। অঞ্জুর ছোট শরীরটা কাঁধে উঠল। অনেককাল আগে অঞ্জু যখন দু' আড়াই বছরের তখন অঞ্জুকে অনায়াসে যেমন কাঁধে তুলে নিতাম আজও সেরকম তুলে নিলাম। তুষের চাদরের বিলাপ ছেড়ে বাবা দুবার শুধোলেন, কি হল? কাঁদিস কেন সব?

বাবার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেড়ালের মত হালকা অঞ্জুকে নিয়ে আমরা পথে নেমে এলাম। মুনিয়া জঞ্জালের ওপর সোজা দাঁড়িয়েছে। সে ধীরে ধীরে আমাদের কাছে এসে খানিকদূর এগিয়ে গেল। আর গেল না। বোধহয় অতটা পথ গিয়ে ফিরে আসার ভরসা পেল না। মুনিয়া উদাস চোখে চেয়ে রইল শুধু। এ গলির আর একটা মর্মান্তিক মৃত্যুর সাক্ষীর মত।

রবীন সেনের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখলাম ফুলটা চেয়ে আছে। যেন আমাদের বিদায় দিতে আস্তে আস্তে মাথা দোলাচ্ছিল। ছবির মত বাড়িটা রোদে ঝলমল। মিষ্টি রোদে ঘুরছে পদ্মমুখী মহিলা। চেয়ারে এলিয়ে কাগজে মুখ আড়াল দিয়ে খবর পড়ছে রবীন সেন। হরিধ্বনি শুনে কুকুরটা লাফ দিয়ে নেমে এল। শেকলে আটকে গেল তার দাপট। রবীন সেনেরা তাকাল। সেই ঠমকি ঝি-টা ঘাড় তুলে কাজ থামিয়ে কপালে হাত ঠেকাল।

রবীন সেনের বাড়িটা মস্ত একটা ছায়া ফেলেছে আমাদের সামনে। বাড়িটা যেন হঠাৎ উপড়ে এসে নাচতে লাগল। বাড়িটা হাড়ের গাঁথনী দিয়ে তৈরী। পথ রোধ করে দাঁড়াল।

[শেষাংশ ২৮ পৃষ্ঠায়]

ভয়

মৈনাক মুখোপাধ্যায়

গভীর রাতে, যখন একা হেঁটে ফিরি
ফুটপাতে অনেক লোক শুয়ে থাকে
আমার বড় ভয় করে
মনে হয়, শুয়ে থাকা মানুষ কেউ
হঠাৎ উঠে এক লাথিতে 'নর্থ স্টার' খুলে দেবে
বলবে, অত শব্দ ক'রে যেতে নেই
আমার ছেলের ঘুম ভাঙ্গবে
সাবলীল হাতে চোখ দুটো গেলে দেবে
—অমন ক'রে তাকাও কেন?
আমার বৌ-এর লজ্জা করে
ঘাড়ে চড় মেরে কানের কাছে মুখ আনবে
—মাথাটা নিচু ক'রে যাও
আমার বাবা মারা যাচ্ছেন...
...রাতের ফুটপাতে, একা হাঁটিতে খুব ভয় আমার

সৈনিক হয়ে যাই

শুভাশিস হালদার

...এইভাবে আমার দিনভর ক্ষয়ের বিনিময়ে
জীবনের একমাত্র স্বপ্ন একটু একটু করে ধরা দেয়
মাটির হৃৎপিণ্ডে,—
সবুজ ধানের গাছে অবশেষে শীষ ধরে।
তবুও অতীত স্মৃতি
ভাসতে দেয়না আমাকে
আশার রশ্মি বুকে, পরম আনন্দে।
কান পাতলেই শুনতে পাই ফিস্ ফিস্ কথা—
আবার কিসের ষড়যন্ত্র?!
আঁতকে উঠি ধান কাটার খস খস শব্দে...
নির্জন নিঃসঙ্গ রাতে ঘর ছাড়া হয়ে
আলের উপরে বসে থাকি
ফসল পাহারায়।
পুরানো ভয়টা চেপে ধরার আগেই
পূবাকাশে দৃষ্টিকে নিবন্ধ রেখে
দু' হাত মুঠো করি;
মাটির গন্ধ মাখা দেহে
আমি তখন সৈনিক হয়ে যাই॥

লোকটা

শ্যামল গায়েন

বর্তমানে রাত্রি আসলে হায়নার চিন্তা-ভাবনা
ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়—
বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ। আকাশে কয়টি তারা
কেউ দেখে না। লোকটি শুধু দাঁড়িয়ে থাকে,
তালপাতার ঘরে তারপর চলে গেলে
অসম্ভব যন্ত্রণায় নিভে যায় তারাদের আলো।
লোকটি বসে বসে আকাশে ওঠে, মাটিতে নামে,
আর একটা লাল ইমারতের সংগে
তালপাতা-কুঁড়ের অবৈধ সহবাস দেখে

হাতের আঙুল ঠিক আছে কিনা, চোখের
জায়গায় চোখ
নাক দিয়ে বাতাস যায়-আসে কিনা,
কানের জায়গায় কান
পাঁচটা আঙুল দিয়ে দেখেশুনে নেয় সব
তারপর অর্জুনস্য দৈব মহিমায় অধিবৃত্ত জল—
—লোকটির মাথাশুদ্ধ হাতের মতো মাটিতে
ঝুলে পড়ে,
সংগে সংগে ভূ-পৃষ্ঠের যত ফাটল বন্ধ
হয়ে গেলে—
লোকটি বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় নীল আকাশের
নিচে।

হাতে তার এখন তীক্ষ্ম ফলক
মুষ্টিবদ্ধ ঊর্ধ্বমুখে তোলা—সামনে ভোর

তাই দেখে এক অসীম শক্তিধর বস্তু
কেঁপে উঠল ভয়ংকর ভয়ে॥

অগ্নিকণাই চেনাবে প্রকৃত পথ

রঞ্জিতকুমার সরকার

অগ্নিকণাই চেনাবে প্রকৃত পথ
কেননা সে চেনে মহতী বিস্ফোরণ
জঞ্জালে জট পাকিয়েছে বহু মত
অগ্নিবলয় জানে না সংকোচন।

শুধু বাগ্মিধী...উদাসীন কথকতা
সবল পেশীর মৌন অনিচ্ছায়
বাড়িয়েছে ঋণ জীবনের বশ্যতা
কেন তবে দিন পিছনেই সরে যায়?

জীবনের চোরাবালি শুষে নেয় শ্রম
ক্ষুধিত বাতাস খরায় আত্মহারা
জীবন এনেছে জীবনেরই বিভ্রম
প্রতিবাদ শুধু ক্রন্দন হল সারা!

অগ্নিকনাই চেনাবে প্রকৃত পথ
কেননা সে চেনে মহতী বিস্ফোরণ
খুঁজে নিতে হবে উত্তরণের ব্রত
মেহনতই হোক ঈপ্সিত সে জীবন।

শিল্প-সংস্কৃতি

প্রাগৈতিহাসিক

সমীর মুখোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প "প্রাগৈতিহাসিক" আমাদের এমন এক সুড়ঙ্গপথের মধ্যে নিয়ে যায় যার শেষে কোন ক্ষীণ মোমবাতির আলোর স্নিগ্ধতাও পাওয়া যায় না। সেই গল্পকে যখন নাট্যরূপ দেবার চেষ্টা হয়, তখন পরিচালকের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় গল্পের কাছাকাছি থেকে তার অন্তর্নিহিত আদিমতাকে স্পর্শ করা। সমকালীন শিল্পীদল পরিচালক অম্বর রায়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এই গল্পের নাট্য রূপায়ণে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে—এই নাটক মঞ্চস্থ হয় একাডেমিতে। ভিখুকে কেন্দ্র করে গল্প গড়ে ওঠে এবং একটা মর্মান্তিক পরিণতির দিকে এগোয়। ভিখুর প্রাণে অন্তহীন আক্রোশ ও ঘৃণা এবং এক মুহূর্তের জন্যও যেখানে রোদ ঢুকতে পারে না। ডাকাতি করতে গিয়ে ডান হাতে চোট খেলো, সে হাত অকেজো হয়ে রইলো কিন্তু এমনই তার দাপট যে এক এক সময় মনে হয়েছে সে তার প্রতিবন্ধকতার কথা না মনে রেখে পৃথিবীর বিরুদ্ধে নিরন্তর জেহাদ ঘোষণা করে গেছে। ভিখুর ভূমিকায় সুব্রত ঘোষ তার চরিত্রের বীভৎস রূপটা সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছে। নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের ছায়া হয়তো পড়েছিল ভিখুর অভিনয়ে—অন্তত কয়েকটি জায়গায় সেই একই উগ্র অমার্জিত সম্ভাষণ ও প্রতিক্রিয়া যা "দানসাগরের" স্মৃতি বহন করে নিয়ে আসে। প্রহ্লাদ বাগ্দীর চরিত্রে সোমনাথ ভট্টাচার্য তেমন সাবলীল অভিনয় করতে পারে নি, বার বার মনে হয়েছে যেন ভাবভঙ্গীর মধ্যে কিছু কৃত্রিমতা আছে। বরঞ্চ বাগ্দী বৌ-এর ভূমিকায় শাশ্বতী চৌধুরী খুবই জীবন্ত হয়ে ওঠে। ভিখু কতখানি দরদ ও সহানুভূতির যোগ্য, এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা নাটকীয় মুহূর্তের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। কাহিনীর মাঝখানে প্রবীণ নেকো মাঝির আবির্ভাব চারপাশের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে এক বিন্দুর আলোর ছোঁয়া দিয়ে যায়। নেকো মাঝি যেন সব নীচতার, হিংস্রতার অনেক উর্ধে। তার টীকা টিপ্পনীর মধ্যে এক সত্যদ্রষ্টার পরিচয় আমরা পাই। এইখানে অশোক চক্রবর্তীর অভিনয় যথেষ্ট আনন্দদায়ক। নেকো মাঝি গল্পে না থাকলেও, মঞ্চে তাকে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় নি। পাঁচী, যাকে নিয়ে ভিখুর প্রতিহিংসা প্রবণতা চরিতার্থ হয় এবং গল্পের শেষাংশে যার ভূমিকা নিঃসন্দেহে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মলি রায়ের অভিনয়ে তা আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে। নারীসুলভ কমনীয়তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে রুক্ষ রাস্তাঘাটের প্রতিবাদী সত্তা। পাঁচী আর বসির মিয়ার বিবাহের মুহূর্তে কেমন যেন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল এবং হিন্দু মন্ত্রের সঙ্গে কোরাণ পাঠের যে কয়েকটি অস্পষ্ট শব্দ শোনা যায় তার তাৎপর্য কি খুব পরিষ্কার হয়, জোরাল হয়?

ভিখুর মনের ভাব বোঝাতে যে অদৃশ্য গলা মঞ্চের পেছন থেকে কথা বলে যায়, তার ফলে কিন্তু ভিখুর মধ্যে কোন ভাবান্তর বা পরিবর্তন সব সময় লক্ষ্য করা যায় না—এটা খুব ছোট খামতি হলেও চোখে পড়ে। নাটকের শুরুতে যে প্রাগৈতিহাসিক জন্তু টেরোডেকটিলের প্রতিচ্ছবি পর্দায় প্রতিফলিত হয়, তার সঙ্গে গল্পের অন্তর্নিহিত আদিমতার সাদৃশ্য দেখাবার চেষ্টা স্থূল মনে হয়। আগুনের দৃশ্য খুবই বাস্তবানুগ যদিও আগুনের লেলিহান শিখা চারিদিকে ছড়িয়ে যাওয়ার অনেক পরে প্রহ্লাদ বাগ্দীর ঘরে তার আঁচ লাগে। এই নাটকে একটা রহস্যের অনিশ্চয়তার আবহাওয়া আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে এবং মাঝে মধ্যে যে সব জন্তু জানোয়ারের ডাক ভেসে আসে দূর থেকে তাও যেন এই সব অনুভূতিকে আলতো ভাবে নাড়া দিয়ে যায়।

ভিখু ও পাঁচীর চরিত্র যে পঙ্কিলতার মধ্যে বেড়ে ওঠে তাতে স্বস্তিবোধ আসবে কোথা থেকে? একটা কদর্য্য, বিবেকহীন, উদ্ভট সমাজের যোগ্য প্রতিনিধি এরা দুজনে—তাদের ভাবভঙ্গী, চলনবলন জীবনধারা সব কিছু এমনই এক তমিস্রার ইঙ্গিত দেয় যার জয় শেষ পর্যন্ত অনিবার্য। এই দুজনের অভিনয় আমাদের একটা অচেনা পৃথিবীর দিকে টেনে নিয়ে যায়।

চিত্ত সরকারের আলো সম্পর্কে বড় রকমের কোন সমালোচনা নেই কিন্তু অনেকবার অভিনেতাদের গভীর অন্ধকারে মঞ্চ ত্যাগ করে চলে যেতে দেখা গেছে। গল্পের শেষে যে অবিস্মরণীয় কয়েকটা পংক্তি আমাদের সূর্যগ্রহণের অমোঘতায় নিমজ্জিত করে, মঞ্চে যখন ভিখুর কাঁধে পাঁচী নতুন জীবনের দিকে হাত বাড়িয়েছে, তখন ওই একই ছত্রের আবৃত্তি শোনা যায় গম্ভীর গলায়, কিন্তু তার দাগ যেন পড়তেই চায় না মনের মধ্যে। হারিয়ে যায় অরণ্যের ঘন অন্ধকার, অবচেতন মনের মায়াবী ছায়া।

পরিচালক একটা কঠিন পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমন একটা অবস্থা তৈরী হয়েছে যেখানে সভ্য সমাজের চিরাচরিত মূল্যবোধের সামান্যতম আভাসও আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। গল্প বলবার ক্ষমতা আছে পরিচালকের তার সব অনুপুঙ্খ নিয়ে। গল্পের চরিত্ররা প্রায় প্রত্যেকে নিজেদের ভূমিকায় যথেষ্ট নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে।

লেখক শিল্পীদের স্থায়ী সংগঠন

২৯শে নভেম্বর ১৯৮১ বেকার হলে "গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর" বিশেষ সাধারণ সভায় কলকাতা ও অন্যান্য জেলার ৪২৪ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মিলনীর অস্থায়ী রূপের বিলুপ্তি এবং লেখক শিল্পীদের স্থায়ী সংগঠন হিসাবে "গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ" প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে বলা হোল—"১৯৭২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী সরলা মেমোরিয়াল হলে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের ব্যাপক মঞ্চ 'গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর' জন্ম হয়। প্রায় এক দশক সম্মিলনীর কর্মসূচী পরিচালনার অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ আমরা এই বিশেষ সাধারণ সভায় সমবেত হয়েছি সময়োপযোগী আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।"

তারপর একে একে সভার কাছে পেশ করা হোল কেন্দ্রীয় সংসদ সভার (২৫.১০.৮১) সিদ্ধান্তকৃত সুপারিশ (ক) স্থায়ী সংগঠনের নাম (খ) নতুন সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র (গ) সম্মিলনীর কেন্দ্রীয়, জেলা ও আঞ্চলিক সংগঠনের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি, রাজ্য ও জেলাস্তরে সংগঠন গড়ার সীমানা নির্ধারণ, সম্মিলনীর সদস্যপদ, অফিস-ঘর, আর্থিক দায়দায়িত্ব সহ যা কিছু তা নতুন সংগঠনে প্রত্যর্পণ, সম্মিলনীর জেলা কমিটিগুলিকে যা ছিল নবগঠিত সংঘের জেলা কমিটি হিসেবে এবং যেখানে শুধু আঞ্চলিক কমিটি ছিল সেই কমিটিগুলিকে সংঘের জেলা কমিটি হিসেবে মনোনয়ন। এইসব প্রস্তাবের উপর আলোচনা করলেন ৩০ জন প্রবীণ ও নবীন লেখক শিল্পী প্রতিনিধি।

তারপর সভাপতিমণ্ডলীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে উপস্থিত সমস্ত প্রতিনিধি একসাথে হাত তুলে সমর্থন ও অভিনন্দন জানালেন "গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ"-কে। মুহূর্তে হলঘর করতালিতে মুখর হয়ে উঠলো। লেখক শিল্পীরা গ্রহণ করলেন আগামী দিনের পথ চলার ধ্রুব-পথ।

১৯৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারী বৌবাজারে ভারত সভা হলে উপস্থিত লেখক শিল্পী বুদ্ধি-

জীবীদের সভায় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেছিলেন—"গণতন্ত্র আজ বিপন্ন।... আপনাদের কাছে আমার আবেদন—এসব নৃশংস ঘটনার খানিকটাও যদি আপনারা আপনাদের ভাষায় বলেন, সরকারের কাছে তুলে ধরেন দলবদ্ধভাবে, তাহলে অনেক কাজ হয়। যেমনভাবে যতটুকু সম্ভব—একটা বিবৃতিও যদি দেন এসবের বিরুদ্ধে তাহলেও অনেক কাজ হয়।... আজ ব্যাপক জনগণের সঙ্গে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরাও আক্রান্ত। আপনাদের কাছে অনুরোধ, ভুলুণ্ঠিত গণতন্ত্রও বিপন্ন মানবাধিকার রক্ষার জন্য আপনাদের অসামান্য শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসুন। বিবৃতি দিন, আপনাদের লেখার মধ্য দিয়ে, শিল্পের মধ্য দিয়ে। জনগণের উপর সীমাহীন নিপীড়নের কথা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দিন।"

এই আহ্বানের ফলশ্রুতি ১৬ই ফেব্রুয়ারী সরলা মেমোরিয়াল হলের কনভেনশনে "গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সম্মিলন-এর প্রতিষ্ঠা। পরে ১৯৭৩ সালের মে মাসে ফুটনানী হলের প্রথম সম্মেলনে "সম্মিলনী" শব্দ যুক্ত হয়, গৃহীত হয় আবেদন ও গঠনতন্ত্র। তার আগে সন্ত্রাসের অবসান দাবী করে স্বাক্ষরসম্বলিত প্রচারপত্রে বলা হয়—উন্মত্ত এক হিংসার শক্তি সর্বশক্তি নিয়ে জেগে উঠতে চাইছে তার কাছে সবাইকে মাথা নীচু করাতে। আমরা গভীরভাবে অনুভব করছি এই অন্যায়ের, এই উন্মত্ততার অবসান হওয়া দরকার।...সাধারণ মানুষের গণঅধিকারও এই ভয়াবহ সন্ত্রাসে আজ বিপন্ন। শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মানুষের জীবিকাও বিপন্ন একই কারণে। ...আমরা মনে করি প্রতিটি মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার, মত প্রকাশের অধিকার আছে। আমরা দাবি করি সরকার অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।" বলা বাহুল্য পশ্চিমবাংলার শাসন কর্তৃত্বে তখন সিদ্ধার্থ রায়ের সরকার।

সম্মিলনীর প্রথম সম্মেলনের গৃহীত আবেদনে বলা হয়েছিল—"আমরা সৃজনকর্মের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী সাহিত্যিক কলাকুশলীরা এ দেশের, এ সমাজের মানুষ তাই দেশের অধিকাংশ মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা আশা-নিরাশার আমরা অনিবার্যভাবে অংশীদার। তাই শিল্পীর সৃষ্টি একান্তভাবে সমাজের সামগ্রী..." জীবনের অর্জিত মহিমা, অধিকার মনুষ্যত্বকে যারা খর্ব করছে, মানব ইতিহাসের গতি ও এ দেশের সামাজিক বিকাশের ধারাকে যারা রুদ্ধ করছে, তাদের স্বৈরাচার এবং অন্যায় বিধানের বিরুদ্ধে সত্যের পক্ষে, মানব সভ্যতা, সমাজ প্রগতির স্বার্থে আমাদের শিল্প হাতিয়ারটি যথাযোগ্য-ব্যবহার করবো এই হোক আমাদের অঙ্গীকার। আমাদের লক্ষ্য হোক অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা।"

প্রায় দশ বছর পথ চলার পর সম্মিলনীর গর্ভ থেকে যখন "গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ" জন্মগ্রহণ করলো তখন অতীতের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাগুলি বারংবার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, দাঁড়াবে। কারণ সেই স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার সুমহান উত্তরাধিকার সংঘের প্রাণদায়িনী শক্তি।

'সংঘ'-র ঘোষণাপত্র

সম্মিলনীর ছিল 'আবেদন', আর সংঘকে গ্রহণ করতে হয়েছে 'ঘোষণাপত্র'। মোট ১৩টি ধারা সম্বলিত এই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রের প্রথমেই বলা হয়েছে—"শ্রমজীবী জনগণের নেতৃত্বে ও বৃহত্তর গণতান্ত্রিক মানুষের সমর্থনে যে মুক্তিপথগামী সংগ্রাম চলছে তার মধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের সৃষ্টিশীল শক্তির এক সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়। এই সৃষ্টিশীল শক্তির মুক্তধারাই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক সর্বপ্রকার প্রগতির একমাত্র উৎস। সামাজিক বিকাশের সমস্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এর মধ্যেই নিহিত।...আজকের শিল্প সাহিত্যে জনগণকে এবং জনগণের এই সংগ্রামী মনোবলকে মহিমান্বিত করাই হবে শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।" জনগণের মধ্যে সেই শিল্পকলা প্রচারের শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে—"সাধারণ মানুষের হৃদয়-রাজ্যে প্রবেশাধিকারের স্বার্থেই শিল্প সাহিত্যে ভাষা, শব্দ, উপমা, প্রতীক, চিত্রকল্প ইত্যাদি ব্যবহারে দুরূহতা ও দুর্বোধ্যতা পরিহার করতে হবে।"

ঘোষণাপত্রে যেমন একদিকে সৃজনশীল শিল্পকর্ম বিকাশে উদ্যোগ গ্রহণ, তা প্রচার ও প্রসারে সহযোগিতার কথা নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে তেমনি সংগে সংগে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামের ঘনিষ্ঠ সাথী হয়ে তার জয়ের পথকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে অবিচল থাকার কথাও ঘোষিত হয়েছে। বলা হয়েছে—"যতদিন না ভারতে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন গণতন্ত্রের বিপদ বার-বারই দেখা দেবে, মানুষের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি হবে। স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষেব সঙ্গে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রামও দীর্ঘপথবাহী হবে।" আরও বলা হয়েছে—"একদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের ঘৃণ্য মানবতা বিরোধী আণবিক নিউট্রন বোমা সহ অস্ত্রের আস্ফালন ও অন্যদিকে দেশের ঐক্যবিরোধী ও গণতন্ত্র বিরোধী স্বৈরাচারী শক্তির দাপাদাপি—এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বশান্তি, জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব পালন সংগঠনকে করতে হবে।" "...এই সংঘ গণতন্ত্রের সাথে সংগতি রেখে সমস্ত সংখ্যালঘু জাতি উপজাতি ও ধর্মসম্প্রদায়ের জীবনজীবিকা সহ সমানাধিকার ও মৌলিক অধিকারসমূহের জন্য সংগ্রাম করবে। সংগ্রাম করবে নারী সমাজের প্রগতি, সমানাধিকার ও মুক্তির জন্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেখানেই মানুষের ওপর নিপীড়ন, অবক্ষয়ী সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যবাদী সংগঠন তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হবে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হবে আমাদের এবং বিশ্ব শান্তির সপক্ষে জনমত সংগঠিত করবে।"

পরিশেষে আহ্বান জানানো হয়েছে—"আসুন আমরা লেখক শিল্পীরা সুস্থ সংস্কৃতি, প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও প্রসারিত করা এবং সমাজবাদী প্রগতির জন্য সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করি। আসুন আমরা নবীন ও প্রবীণ সমস্ত লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী গবেষক সাংবাদিকদের দলমত নির্বিশেষে 'গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ'র ব্যাপকতম মঞ্চে সংগঠিত করি।"

এই ঘোষণাপত্রের নিরীখে ব্যাপক অংশের লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী-গবেষক ও সাংবাদিকদের সংঘের সদস্যভুক্ত করার কথা গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। কলাকুশলী বলতে যাঁদের সাধারণভাবে বোঝায়, অর্থাৎ মঞ্চশিল্পী, আলোক-চিত্রশিল্পী প্রভৃতি তাঁরাও শিল্পী হিসাবে সংঘের সদস্য হবেন। গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে সংঘের নিজস্ব নাটক বা সঙ্গীতের কোন দল গঠন করা যাবে না। আঞ্চলিক স্তরে সংগঠন করার পরিকল্পনা গঠনতন্ত্রে না থাকায় সম্মিলনীর যেসব আঞ্চলিক শাখা ছিল, সেখানকার প্রতিনিধিরা সাধারণ সভায় অসুবিধার দিকগুলি উল্লেখ করেন। জবাবী ভাষণে বলা হয়—সম্মিলনীর আঞ্চলিক শাখাগুলি কমবেশী সাধ্যমত কাজ করেছেন, ব্যাপক লেখক শিল্পীকে সমবেত করেছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে আঞ্চলিক স্তরে কাজ সীমাবদ্ধ থাকায় জেলা সংগঠন কার্যতঃ অচল হয়েছে, সমগ্র জেলায় সংগঠনের প্রভাব পড়ে নি। আর জেলা সংগঠন মজবুত বা ক্রিয়াশীল না থাকার অনিবার্য ফল হিসাবে আঞ্চলিক স্তরে খাপছাড়া, অগোছালো ভাব এসেছে, ধারাবাহিক কাজে ছেদ পড়েছে, গ্রামে হতাশা এবং বিচ্ছিন্নতা গড়ে উঠেছে। তাই নবগঠিত সংগঠন জেলা সংগঠনকে শক্তিশালী করার পরিকল্পনা নিয়েছে। জেলা সংগঠনের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্তরে সংঘের কর্মসূচী নিয়ে যাবার পরিকল্পনা পরবর্তী সময়ে নির্ধারণ করা হবে।

সাধারণ সভা থেকে ছ'টি প্রস্তাব গৃহীত হয়—(ক) 'নাসা' ও 'এসমা' বিরোধী। (খ) আই এম এফ থেকে শর্তাধীন ঋণ গ্রহণের বিরুদ্ধে। (গ) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ চক্রান্ত ও নিউট্রন বোমার বিরুদ্ধে। (ঘ) সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারের স্বার্থে। (ঙ) সাহিত্য ও শিল্পকলা একাডেমী স্থাপনের দাবীতে। (চ) সিনেমা কর্মচারীদের ধর্মঘটে সমর্থন ও সুষ্ঠু মীমাংসার দাবীতে।

সাধারণ সভা থেকে ৯১ জনের রাজ্য সংসদ নির্বাচন করা হয়। ঐদিনই সংসদ সভার প্রথম সভায় আরও ৬ জন সদস্যকে সংসদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংসদ সভা থেকে নারায়ণ চৌধুরী সভাপতি; আশু সেন, রবীন্দ্র গুপ্ত, তারাপদ মুখোপাধ্যায় ও সরোজমোহন মিত্র—সহ-সভাপতি, নেপাল মজুমদার ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

[শেষাংশ ২৮ পাতায়]

লোকচিত্রকলা

শিল্পী : সৌনিক সেন

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

শক্তির পুনর্নবীকরণ

যে বিজ্ঞান মানব সভ্যতার অগ্রগতির দিক নির্দেশক, সেই বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূল উৎস শক্তি। প্রথম শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যেখানে মাত্র 7 Quantum শক্তি ব্যয় হয়েছে, সেখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত শক্তি ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় 4 Quantum এবং পরবর্তী শতাব্দীতে এই শক্তি ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে 100 Quantum এ। এতদিন পর্যন্ত কয়লা, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদই ছিল শক্তির মূল উৎস। কিন্তু বিভিন্ন অবাস্তব ব্যয়, অসাধু প্রতিযোগিতার জন্য ব্যয় ও বিভিন্ন অপরিকল্পিত ব্যয় ও অন্যান্য বিপুল চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে শক্তির মূল উৎসগুলি প্রায় নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে খনিজ তৈল আর কয়েক দশক চলবে, কয়লা ২০০ বৎসর, অনেকে বলেন ৫০০ বৎসর চলবে, প্রাকৃতিক গ্যাসেরও একই দশা।

আগামী দিনের শক্তি সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীগণ শক্তির অপ্রচলিত উৎসগুলি থেকে শক্তিকে আবার পুনর্নবীকরণ করার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। এ সম্বন্ধে ছোট্ট একটি ইতিহাস আছে। ভারতীয় বিজ্ঞানী শ্রীজগদীশচন্দ্র বসুই প্রথম শক্তির পুনর্নবীকরণের কথা ভেবেছিলেন। আজ থেকে নব্বই বৎসর আগে তিনি তাঁর একখানি ডাইরিতে লিখে গিয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পৃথিবী এক আশু সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছে। তাই আজ বিজ্ঞানীরা সৌর শক্তি, পারমাণবিক শক্তি, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রের ঢেউ ইত্যাদি অপ্রচলিত উৎস থেকে শক্তি অন্বেষণ করছেন।

যে শক্তি নিয়ে বিজ্ঞানীদের বিপুল পরিমাণে আশা রয়েছে সেটি হল সৌরশক্তি। সৌরশক্তিকে আবদ্ধ করে রাখার জন্য বিজ্ঞানীরা সৌরজলাশয় সৃষ্টি করেছেন। এরূপ জলাশয়ের নীচ থেকে উপরে ক্রমে নিম্ন ঘনত্বের হারে যদি লবণমিশ্রিত করা যায় তবে বিকিরণের দ্বারা জলে আবদ্ধ তাপশক্তি তথা সৌরশক্তির অপব্যয় রোধ করা যায় এবং সৌরশক্তি থেকে টারবো জেনারেটরের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব। হাঙ্গেরিতে এ ধরনের কিছু প্রাকৃতিক জলাশয় পাওয়া গিয়েছে। যেখানে 1.5 মিটার গভীর জল 70°C তাপমাত্রায় আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ইজরাইলে 100 K.W. বিদ্যুৎ উৎপন্নকারী একটি সৌর জলাশয় কেন্দ্র বর্তমানে কাজ করে চলেছে। সূর্যালোকের বিকিরণ ও প্রতিফলনকে কাজে লাগিয়ে সমতলাকৃতি সংগ্রাহকের সাহায্যে রান্না করার জন্য সৌরচুল্লি বানানো যেতে পারে। এর থেকে ছোটখাটো পরিবারের রান্নার কাজ সুন্দরভাবে চলে যায়।

ভারতীয় বিজ্ঞানী S. C. Dighy সৌরচালিত ইঞ্জিন তৈরী করেছেন। এই যন্ত্রটি সেচের কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। ডঃ ই. রডারের মতে সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জল বিশ্লেষণ বিক্রিয়ার ন্যায় জলকে সৌরশক্তির সাহায্যে ভেঙ্গে তা থেকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন হাইড্রোজেন তৈরী করা সম্ভব। যা শিল্পের কাজে ব্যাপকভাবে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

সৌরশক্তি সমৃদ্ধ ক্যাডমিয়াম সেল মহাকাশে উপগ্রহকে সচল রাখার জন্য একমাত্র জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সৌরশক্তিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে পারলে ভারত এবং এই মহাদেশের অন্য কয়েকটা দেশই বেশী লাভবান হবে। আমাদের দেশে প্রায় সব

সসীমকুমার বাড়ৈ

সময় মোটামুটি রৌদ্র থাকে। এর থেকে শক্তি উৎপাদন খরচও হবে অত্যন্ত কম। পৃথিবীতে কত সৌরশক্তি পড়ছে, কত ব্যয় হচ্ছে তার একটি চার্ট এখানে দেওয়া হল।

প্রতি সেকেন্ডে	মেগাওয়াট
সূর্য থেকে নির্গত হয়	380,000,000,000 000,000,000
পৃথিবীতে পৌছায়	173,000,000,000
পৃথিবী থেকে প্রতিফলিত হয় ...	58,000,000,000
বায়ুমণ্ডল, মাটি, জলে শোষিত হয় ...	86,000,000,000
সালোক সংশ্লেষে লাগে	40,000,000

(জ্ঞান ও বিজ্ঞান)

বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি প্রায়শই যে শক্তির ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছে তা হল পারমাণবিক শক্তি। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টারে ইউরেনিয়াম 235 বা Plutonium 239 জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং উচ্চশক্তিসম্পন্ন নিউট্রনের আঘাতে শৃংখল প্রক্রিয়ায় পরমাণু চূর্ণ করা হয়। এর ফলে উৎপন্ন তাপ দিয়ে স্টীম এবং স্টীম দিয়ে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থকে শোধনাগারে পুনরায় জ্বালানীতে পরিণত করা হয়।

দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তিভাণ্ডার হচ্ছে সমুদ্র। সৌরশক্তি, বায়ুর গতিশক্তি ও চন্দ্র আকর্ষণের ফলে সৃষ্ট কসমিক শক্তির এক বিপুল ভাণ্ডার এই সমুদ্র। আর্সোন দ্যা অৎর্সোনভ্যাল-এর "Ocean Thermal Energy Conversion" এর তত্ত্ব অনুযায়ী সমুদ্রের পৃষ্ঠ ও তলদেশের তাপমাত্রার এক বিরাট ফারাক থাকায় কোন নিম্নস্ফুটনাংকের তরলকে যদি পর্যায়ক্রমে নলের মাধ্যমে একবার সমুদ্রের তলদেশে ও পরে পৃষ্ঠীয়তলের মাধ্যমে প্রবাহিত করা যায় তবে উচ্চতাপমাত্রার সমুদ্র জলের প্রভাবে ঐ তরল বাষ্পে পরিণত হয়। এবং উক্ত বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে প্রচুর পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যায়। আবার ভাসমান টারবো জেনারেটরের মাধ্যমে সমুদ্র তরঙ্গের বিপুল শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করা যায় বলে যে ধারণা তা বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে তৈরী K.W. বিদ্যুৎ তৈরী করতে খরচ পড়বে 1.73 টাকা।

অনেক সময় যা আমরা তুচ্ছ করে নষ্ট করি তা থেকে আমাদের আগামী দিনের শক্তি সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য অনেক শক্তি উৎপাদন করা যেতে পারে। গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট ত আগের থেকেই শুরু হয়ে গেছে। গোবর থেকে উৎপন্ন গ্যাস হল প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাস। বর্তমানে জ্বালানী হিসাবে ত বটেই, আলোক শক্তি সৃষ্টি করার গ্যাস হিসাবে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এইভাবে কচুরীপানা থেকেও জৈব গ্যাস উৎপন্ন করা যায়। যার জ্বালানী মূল্য 21,000 B.T.U.I.

সামুদ্রিক জলজ উদ্ভিদ যেমন ল্যামেনারিয়া, ম্যাক্রোসিসটিস ইত্যাদি থেকেও জৈব গ্যাস তৈরীর ব্যাপারে সুফল পাওয়া যায়। হ্যালো-ব্যাকটেরিয়াম জাতীয় জীব প্রচুর পরিমাণে সৌরশক্তি আবদ্ধ করে রাখতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে এই শক্তি থেকে রাসায়নিক শক্তি সহজেই তৈরী করা যায়। সম্প্রতি গবেষণার ফলে জানা গেছে প্রত্যেক প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাস-এ হৃদস্পন্দনের ফলে সামান্য পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। একে ধরে রাখার জন্য এখনও কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি।

উদ্ভিজ্জ পদার্থ অ্যালকোহল আজ আর শুধু সুরা হিসাবেই পানীয় নয়। পেট্রোলিয়ামের বিকল্প হিসাবেও যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। গ্যাসোলিনের সাথে 10% অ্যালকোহল মিশিয়ে ইতিমধ্যে তা গাড়ির জ্বালানী হিসাবেও পরীক্ষিত হচ্ছে। ইউফরবিয়াসী গোত্রের কিছু উদ্ভিদ যেমন সেপিয়াম সেরিফরুম, হোভিয়া ইত্যাদি উদ্ভিদ

[শেষাংশ ২৭ পৃষ্ঠায়]

বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের খেলাধূলার অনেক পরিবর্তন এনেছে

বহুদিন ধরে ভারত আন্তর্জাতিক খেলাধূলার আসরে মোটেই সুবিধা করতে পারছে না। সার্বিক ব্যর্থতার কারণ হিসেবে বারবার কিছু হাস্যকর অজুহাত দেওয়া হয়েছে অথবা বলা হয়েছে গ্রামের দিকে ব্যাপকভাবে নজর দেওয়ার কথা। অথচ এই তত্ত্ব কথাটা জানা সত্ত্বেও আজও খেলাধূলাকে গ্রামমুখী করা যায় নি।

কিন্তু কেন? প্রথমেই আসে সরকারের ব্যর্থতার কথা। আজও কেন্দ্রীয় সরকার খেলাধূলাকে তেমন কোন গুরুত্ব দেন না। খেলাধূলার জন্য আলাদা কোন মন্ত্রী নেই। গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সঙ্গে খেলাধূলাকে জুড়ে দেওয়া হয়। ফলে দেখা গেছে ক্রীড়াবিষয়ক মন্ত্রী খেলাধূলার দিকে নজর দেওয়ার সময় পান না মোটেই। এমনতর পরিস্থিতিতে ক্রীড়া প্রশাসকদের দায়িত্ব বেড়ে যায় বহুলাংশে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা স্বাধীনতার পর থেকে দেশে যারা ক্রীড়া প্রশাসক হিসেবে এসেছেন তাঁদের অধিকাংশের যোগ্যতা বিবেচিত হয়েছে রাজনীতির মাপকাঠিতে। খেলাধূলা সম্পর্কে তাঁদের সামান্যতম জ্ঞানটুকু না থাকার জন্য তথাকথিত ঐসব ব্যক্তিরা গালভরা নামের পদগুলোই শুধু অলংকৃত করেছেন, কাজের কাজ কিছুই হয় নি। তাঁদের কর্ম এবং চিন্তা এমন এক গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল যেখানে শুধুমাত্র বছরের পর বছর গদী আঁকড়ে রাখার পদ্ধতি দেখা যায়, অন্য কিছু নয়। অতি সম্প্রতি এশিয়ান গেমস কমিটিতে প্রথমে মালহোত্রা এবং পরে শুক্লাকে নিয়ে যে কেলেঙ্কারী হয়ে গেলো তাতে বলা যায় 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে'।

বেশ কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকার খেলাধূলায় ভারতের মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পর্ষদ গঠন করেন। ঠিক সেই ধাঁচে তৈরি হয় রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ। প্রতিটি পর্ষদ গণ্ডমূর্খদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়। দলবাজি আর নোংরামি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এ'দের হাতে জাতীয় ক্রীড়ার উন্নতির দায়িত্ব দিয়ে পরিস্থিতিকে জটিল থেকে জটিলতর করে তোলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দয়ায় ক্ষমতায় এসে তাঁরাই বানচাল করে দিয়েছেন গ্রামীণ ক্রীড়ার 'মাস্টার প্ল্যান'। সব রাজ্যের মতো পশ্চিম বাংলাতেও এই চিত্রটাই ছিল। সাতাত্তর সালে বামফ্রন্ট এ রাজ্যে ক্ষমতায় এসেই বুঝতে পারলেন খেলাধূলাকে গ্রামমুখী করতে হলে প্রশাসনিক স্তরে যোগ্য লোকের প্রয়োজন। সেজন্যই রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ পুনর্গঠন করলেন এবং সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন। পশ্চিম বাংলার শহরে তো বটেই গ্রাম-গঞ্জেও খেলাধূলা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। শুধুমাত্র কমিটি তৈরি করে এ কাজ করা সম্ভব হয় নি। বছরের পর বছর ক্রীড়াখাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলো। একটা হিসেবে দেখছি, সাতাত্তর সালে পর্ষদের জন্য যেখানে দু' লক্ষ টাকা ছিল চলতি আর্থিক বছরে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে চৌদ্দ লক্ষ টাকা। যদিও সরকার মনে করেন এ টাকায় সব কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। তবুও সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে এই মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ একটা নজীরবিহীন নজীর।

রঞ্জন রায়

সরকারী খরচে গ্রামে-গঞ্জে একশ'র বেশি ফুটবল কোচিং ক্যাম্প হয়েছে। বিভিন্ন ব্লকে এখনো ঐ পরিকল্পনামাফিক কাজ চলছে। কিন্তু ফুটবলই শেষ কথা নয়। যে খেলা ছাড়া অন্য খেলায় কিছুতেই পারদর্শিতা অর্জন করা যায় না, হওয়া যায় না চৌকস খেলোয়াড় সেই জিমনাসটিকের ওপর নজর দেওয়া হয়েছে। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে গ্রামীণ খেলা কাবাডি ও খো-খো'র ওপর। ফলে এ-সব খেলা আজ আর গাঁয়ে-গঞ্জে অবহেলিত নয়।

হাওড়া, কোচবিহার, চন্দননগর, শিলিগুড়ি ও বালুরঘাটে তৈরি হবে দশ হাজার আসন-বিশিষ্ট স্টেডিয়াম। পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে।

কিন্তু অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে বলতে হচ্ছে এতো সব করা হচ্ছে যাদের জন্য তাদের অধিকাংশই দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বাস করেন। ফলে আর্থিক সংস্থানের জন্য তাদের খেলাধূলা ছেড়ে অন্যদিকে চলে যেতে হয়। সরকার এদিকেও তীক্ষ্ন নজর দিয়েছেন। যাতে কোন প্রতিভা অকালে নষ্ট না হয় সেজন্য ঠিক করা হয়েছে বাইশ বছরের কম বয়সী তরুণদের আড়াই শো থেকে তিন শো টাকা দেওয়া হবে। বর্তমানে তিন শো ছেলেমেয়ে এই সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী যে কোন খেলোয়াড়কে দৈনিক বারো টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা আর একটু বেশি সুযোগ পান। তাদের দৈনিক বারো টাকা করে দেওয়া তো হচ্ছেই সঙ্গে যাতায়াত ও খাওয়া-দাওয়ার খরচ দেওয়া হয়।

লক্ষ্য করে দেখা গেছে এসব ছেলেরা যে ক্লাবে নিয়মিত খেলাধূলা চর্চা করেন সেসব ক্লাবের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়। এর ওপর সাম্প্রতিককালে ক্রীড়া সরঞ্জামের দাম এতো বেড়েছে যে মফস্বলের ক্লাবগুলোর পক্ষে ক্রীড়া সরঞ্জাম কেনা একরকম দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সরকারের যুব-কল্যাণ দপ্তর। তারা ক্লাবগুলোর হাতে বিনা পয়সায় সরঞ্জাম পেঁৗছে দিচ্ছে।

পশ্চিম বাংলার মানুষ কি কোনদিনই কল্পনা করতে পেরেছিলেন যুব-কল্যাণ দপ্তর আয়োজিত যুব উৎসবে গ্রামেগঞ্জে খেলাধূলার রাজসূয় যজ্ঞ বসে যাবে? কী বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল ঐ উৎসবকে ঘিরে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাই শক্ত। প্রাণশক্তি উজাড় করে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে যেভাবে বদ্ধ ঘরের দুয়ার অতিক্রম করে সবুজ প্রান্তরে ছুটে এসেছিলেন তা বহুদিনের স্মৃতি হয়ে থাকবে। শেষ এখানেই নয়। তিন শো সাতাশটি ব্লকে নিয়মিতভাবে খেলাধূলা চর্চার জন্য যুব-কল্যাণ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় চালু হতে চলেছে কোচিং সেন্টার। কাজ চলছে দ্রুতগতিতে।

এত করেও সরকার সন্তুষ্ট নন। তাদের কথা, আরো বহু কাজ বাকী। কাজ সবে শুরু হয়েছে। ত্রিশ বছরে যে কাজে হাত পড়েনি সে কাজে হাত দিয়ে পাঁচ বছরেই শেষ করে দেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য সরকার দীর্ঘমেয়াদী যে সব পরিকল্পনা নিয়েছেন সেগুলো সম্পূর্ণ হলে এ রাজ্যের গ্রামের খেলাধূলার আদলটাই বদলে যাবে। বোধ করি যে কারণেই গ্রামের খেলাধূলার চিত্রটা কেমন হবে সে কথা বোঝাতে অন্যান্য রাজ্য উদাহরণ হিসেবে পশ্চিম বাংলার দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছেন।

বামপন্থীদের হাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সুরক্ষিত

তিরানব্বই বছর বয়সের প্রবীণ বিপ্লবী অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের তীব্র ভাষায় নিন্দা করে বলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সার্বিক ইতিহাস রক্ষায় বামফ্রন্ট সরকার অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, এই সরকার বিপ্লবীদের যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন তার জন্য এই সরকারের পরিচালকদের ধন্যবাদ। দুঃখজনক ঘটনা এই সরকার ফেলে দেওয়ার জন্য পেছন থেকে চক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্তকারীদের জন্য রয়েছে আমার অন্তরের ঘৃণা।

মৌলালি মোড়ে রাজ্য যুব কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সংগ্রহশালা স্থাপন করেছেন। গত ৯ই ডিসেম্বর ছিল তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। যুব কেন্দ্রের পঞ্চমতলে অবস্থিত এই সংগ্রহশালার নাম দেওয়া হয়েছে 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'। এতে দুই শতাব্দীব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনাবলী আলোকচিত্রের মাধ্যমে ধরে রাখা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রহশালার দ্বারোদ্ঘাটন করেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী। উদ্বোধন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

প্রবীণ বিপ্লবী গণেশ ঘোষ বলেন, স্বাধীনতার ৩৪ বছর পর আন্তরিকতার সঙ্গে অতীত সংগ্রামের সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই ইতিহাস আগামী দিনে যুব সমাজের মনে প্রেরণা যোগাবে।

বিশিষ্ট গবেষক চিনমোহন স্নেহানবিশ বলেন, মাত্র ছয় মাসের পরিকল্পনায় এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। অনেকের কাছে এখনও অনেক তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে। এসব সংগ্রহ করতে হবে।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও গবেষক ডঃ নিশীথরঞ্জন রায় বলেন, বামফ্রন্ট সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেন। সারা ভারতে এই প্রথম এ ধরনের গ্যালারী স্থাপিত হল। দু'শ বছরের ইতিহাস ধরে রাখার এবং বিভিন্ন মত ও পথের অবদান সঠিকভাবে হাজির করার ক্ষেত্রে এ কাজ খুবই মূল্যবান।

উদ্বোধক অশ্বিনীকুমার ঘোষ দীর্ঘ ভাষণে স্মৃতিচারণ করে বলেন, কংগ্রেস আমলে স্বাধীনতার ইতিহাস লেখার জন্য একটা কমিটি হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল বিকৃত ইতিহাস লেখার প্রয়াস। ওরা ১৯২১ থেকে স্বাধীনতার ইতিহাস লিখতে উদ্যত হয়েছিল। প্রতিবাদে অনেক ঐতিহাসিক কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তাদের ইতিহাসে অসংখ্য শহীদের আত্মত্যাগ, বিপ্লবীর সংগ্রাম এবং নির্যাতন ভোগের কাহিনী বাদ পড়ে যায়। বহু বিশিষ্ট ঘটনাও চেপে যাওয়ার চেষ্টা হয়। এক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মহৎ সংগ্রামের ইতিহাস লেখা হয়। যার ফলে সরকারী অনুষ্ঠানে আসার আগে মনে দ্বিধা ও ভয় ছিল। কিন্তু আজ আমি আনন্দিত ও গর্বিত। বামপন্থীদের হাতে ইতিহাস সুরক্ষিত হয়েছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা মর্যাদা পেয়েছে। প্রবীণ বিপ্লবী বামফ্রন্ট সরকার ও তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এদের সাধুবাদ জানানোর ভাষা আমার নেই। মনুমেন্টের নাম পরিবর্তন করে শহীদ মিনার রাখার সময় দেখেছি বামপন্থীদের বিপ্লবীদের প্রতি মর্যাদাদানের আন্তরিকতা। আজ সংগ্রহশালা দেখেও আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলাম। এদের দেখে ভরসা জাগে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম মহান বিপ্লবীরা করেছিলেন ভবিষ্যতে যুব সমাজ তা সঠিকভাবে জানতে পারবে জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। তিনি বলেন, ইতিহাস বিকৃত করলে জাতির অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে যায়, ভবিষ্যৎ বংশধররা উপযুক্ত পথের সন্ধান করতে পারেন না। কংগ্রেস সেই সর্বনাশা কাজটিই করেছিল। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, বামফ্রন্ট সরকার ইতিহাস রক্ষার জন্য এই গ্যালারী করেছেন। প্রবীণ বিপ্লবীরাই বলবেন কতটা সফল হওয়া গেছে। কোথায় ত্রুটি কোথায় বিচ্যুতি যা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতায় বলবেন। আমরা আরও তথ্য সংগ্রহ করতে চাই, আরও ঘটনার সন্নিবেশ ঘটিয়ে এই সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ করতে চাই। তিনি বিপ্লবীদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন এবং জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, যার কাছে যা তথ্য আছে তা উপদেষ্টাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। এই সংগ্রহশালা আরও সমৃদ্ধ করুন। সভায় বহু বিশিষ্ট বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী উপস্থিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' দেখতে আসেন। এই সংগ্রহশালা বেলা তিনটে থেকে রাত সাতটা পর্যন্ত প্রতিদিন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। অবশ্য সরকারী ছুটির দিনে এটা বন্ধ থাকবে।

গত ৯ই ডিসেম্বর রাজ্য যুব কেন্দ্রে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সংগ্রহশালার উদ্বোধন করছেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীঅশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী

যুবকল্যাণ দপ্তরের প্রচেষ্টায় গ্রামে-গ্রামে খেলাধুলার প্রসার ঘটছে

আমরা গ্রামাঞ্চলে ছেলে-মেয়েদের খেলা শেখাচ্ছি—তার অর্থ এই নয় যে, আমরা চুনী গোস্বামী-বলরাম তৈরি করবো। পশ্চিম বাংলার

সহর ছেড়ে গ্রামে গ্রামে খেলাধুলোকে জনমুখী করার উদ্দেশ্য হলো যুবমানসকে খেলাধুলোয় আকৃষ্ট করা। স্পোর্টসম্যানশিপ গড়ে তোলা এবং যুবকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে খেলাধুলো ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তর উদ্যোগী হয়েছে। ক্রীড়া-সাংবাদিক ক্লাবে ক্রীড়া-সাংবাদিকদের সাথে এক আলোচনাচক্রে উপরোক্ত কথাগুলি বলেন যুবকল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস।

শ্রী বিশ্বাস ক্রীড়া সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন গ্রামীণ খেলাধুলোর জন্য বামফ্রন্ট সরকার কী কী কাজ করছেন তা জানানোর জন্য।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর যুবকল্যাণ দপ্তর গ্রামে গ্রামে খেলাধুলোর প্রসার ঘটানোর জন্য বিরাট উদ্যোগী হয়েছে এবং অনেক কাজও করেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত এই কাজের কোন প্রসার ছিল না।

শ্রী বিশ্বাস বলেন, খেলাধুলোর উন্নতির জন্য স্পোর্টস কাউন্সিল আছে। যুবকল্যাণ দপ্তর স্পোর্টস কাউন্সিলের পাল্টা কিছু করছে না। তাদের সম্মতি নিয়েই যুবকল্যাণ দপ্তর গ্রামে গ্রামে খেলাধুলোর প্রসারের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন কেন্দ্রীয় সরকারেরও যুবকল্যাণ দপ্তর আছে। কী রাজ্য কী কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাংলার যুবকল্যাণ দপ্তরের মতো গ্রামীণ খেলাধুলোর উন্নতির জন্যে আজ পর্যন্ত কিছু করে নি।

পশ্চিমবঙ্গে ৩৩৫টি ব্লক আছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩৩৫টি ব্লকের মধ্যে ৩২৭টি ব্লকে খেলাধুলোর প্রসার ঘটিয়েছে। বাকি আটটি ব্লকে এখন পর্যন্ত পঞ্চায়েত না হওয়ার দরুন টেকনিক্যাল কারণে ওই আটটি ব্লকে এখন পর্যন্ত কিছু করা যায় নি।

শ্রী বিশ্বাস বলেন, সংস্কৃতি ও খেলাধুলোকে বাদ দিয়ে যুবমানস তৈরি করা যায় না। তাই স্পোর্টস কাউন্সিল শহরাঞ্চলের খেলাধুলোর উন্নতির জন্যে যা করার করুক, আমরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে যুবমনকে খেলাধুলামুখী করার প্রয়াস চালিয়ে যাবো; অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীরা মাঠে নামুক দৌড়ঝাঁপ করুক। প্রাথমিক পর্যায়ে খেলাধুলোর গোড়াপত্তন করবো। সেখান থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় বাছাই করে বড় খেলোয়াড় তৈরির দায়িত্ব ওপরের মহলের।

তিনি বলেন, ১৯৭৮-৭৯ সাল হতে ১৯৮১-৮২ সাল পর্যন্ত ৩২৭টি ব্লকে ৩২২টি খেলার মাঠ তৈরি করে দিয়েছে যুবকল্যাণ দপ্তর। ৩২৭টি মাঠ তৈরি করতে ১ কোটি ৭৫ হাজার টাকা খরচ করেছে। ওই সময়ের মধ্যে ৩৫ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার ক্রীড়া সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে উল্লিখিত ব্লকগুলিতে। জিমন্যাসিয়ামের সরঞ্জাম বাবদ ২২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। প্রতি ব্লকে ফুটবল, ভলিবল, কাবাডির কোচিং-এর জন্যে ৯ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

তিনি বলেন, বিরাট কিছু করেছি এ দাবি করছি না। তবে প্রতি ব্লকের প্রতি ক্লাবের কোচিং-এর জন্যে পাঁচ হাজার টাকা দিলে সকলেই সুযোগ পেতে পারেন।

শ্রী বিশ্বাস সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, সরকারী টাকায় মাঠ তৈরি করা হয়েছে। ওই মাঠের দায়িত্ব একটি ক্লাবের, কিন্তু খেলার সুযোগ প্রত্যেককেই দিতে হবে—এই অঙ্গীকারের পর পঞ্চায়েতের সুপারিশ অনুযায়ী যুবকল্যাণ দপ্তর ওই ব্যবস্থা করেছে।

তিনি বলেন, কোচিং-এর সময় বহুসংখ্যক ব্লকে ঘুরে দেখেছি এবং ছেলেদের উৎসাহ-উদ্দীপনাও ব্যাপক এটাও লক্ষ্য করেছি। তা না হলে হাজার হাজার ছেলে কোচিং-এ আসবে কেন?

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সবচেয়ে উৎসাহ দেখেছি হাওড়া, মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমান জেলায়।

খেলাধুলোর প্রসার, খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব তৈরি, খেলার মাঠ তৈরি, কোচিং এবং ক্রীড়া সরঞ্জাম দিয়ে যুবকল্যাণ দপ্তর গ্রামে গ্রামে যুবমনে খেলাধুলোর প্রতি আকৃষ্ট করার এই প্রয়াসকে ক্রীড়া সাংবাদিকরা শুধু প্রশংসাই করেন নি সাথে সাথে বলেছেন এতো বড়ো প্রচেষ্টার খবর এই প্রথম আমরা জানতে পারলাম। যুবকল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস এ জন্যে সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানান এবং পশ্চিম বাংলার খেলাধুলোর উন্নতির জন্যে আরও কি করা যায় সে সম্পর্কেও কতকগুলি সুপারিশ করেন।

হুগলী জেলা ছাত্র-যুব উৎসব

চন্দননগর শহরে চারদিনব্যাপী হুগলী জেলা ছাত্র-যুব উৎসব গত ২৫শে অক্টোবর সমাপ্ত হলো। গোটা হুগলী জেলার কয়েক হাজার ছাত্র-যুব এই উৎসবের কর্মসূচীতে সানন্দে অংশগ্রহণ করেন। গ্রামাঞ্চলের যে সব আদিবাসী যুবক ক্ষেতে-খামারে কাজ করেন তাঁরাও যুব উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। উৎসবের কর্মসূচীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। সাঁতার, যোগাসন, ফুটবল, ভলিবল থেকে আরম্ভ করে তীর নিক্ষেপ প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় হুগলী জেলার প্রায় দুই হাজার যুব-ছাত্র অংশগ্রহণ করেন।

২৯শে অক্টোবর উৎসবের উদ্বোধন করেন পরিষদীয় মন্ত্রী ভবানী মুখার্জি। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন যে ছাত্র-যুবরা দেশের প্রাণশক্তি। এদের সঠিক পথে চালনা করার জন্যেই বামফ্রন্ট সরকার জেলায় জেলায় যুব উৎসবের আয়োজন করছেন।

উৎসব উপলক্ষে চারদিনব্যাপী প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সভার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। চন্দননগর মেরীর মাঠে আয়োজিত প্রদর্শনীতে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ছাড়াও বেশ কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী প্রদর্শনী মণ্ডপ ছিল। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের 'কৃষক আন্দোলনের ইতিকথা' শীর্ষক প্রদর্শনী মণ্ডপে চারদিনে কুড়ি হাজারের বেশি নরনারীর সমবেশ ঘটে। তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যুব-ছাত্রদের সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, এই উৎসবের লক্ষ্য হলো যুব-ছাত্রদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে আদর্শের কথা তুলে ধরা। আমাদের দেশে যুব-ছাত্রদের মধ্যে একটা অস্থিরতা ও আলোড়ন চলছে। এই অস্থিরতা ও আলোড়ন অনেকে ভয়ের চোখে দেখেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের যুবশক্তি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ভুলে যান নি। যদি আমরা তাদের সঠিক পথের নিশানা দেখাতে পারি, তবে তারা এগিয়ে যেতে পারেন।

শ্রী ভট্টাচার্য আরো বলেন, আমাদের দেশের যুবকদের পথ দেখাতে হবে। কোন্ পথ আমরা দেখাব? সমস্যাটা কি? কেন আমাদের এত সমস্যা? সমস্যা সমাধানের জন্যে যুবকদের এমন পথে চালনা করতে হবে, যাতে আমাদের দেশে এমন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হয়, যেখানে যুবকদের জীবনটা উৎসবের মতন হয়ে উঠবে।

চারদিনের আলোচনা সভার বিভিন্ন দিনে সংসদ সদস্য বিজয় মোদক, অতিরিক্ত এ্যাড-ভোকেট জেনারেল সাধন গুপ্ত, সংসদ সদস্য অজিত বাগ, ডক্টর ক্ষুদিরাম বসু, মহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল অংশগ্রহণ করেন। মহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল প্রমুখ মৌলিক ভূমি সংস্কারের প্রশ্নটি যুব-ছাত্র সমাবেশে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বামফ্রন্ট সরকারকে বিপ্লবী সরকার বলা যায় না। তাই মৌলিক ভূমি সংস্কারের মতো ব্যাপক কর্মসূচী বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করতে পারে না। একমাত্র জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লবী সরকার দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে প্রকৃত ও মৌলিক ভূমি সংস্কার করতে পারে।

মৌলিক ভূমি সংস্কারের রূপরেখা বর্ণনা প্রসঙ্গে রসুল বলেন, জনগণতান্ত্রিক সরকার যে ভূমি সংস্কার করবে, সেখানে অকৃষক জমির মালিক হয়ে খেতমজুরদের শোষণ করতে পারবে না। অকৃষক জমির মালিকদের জমি ভূমিহীন খেতমজুর ও প্রকৃত ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন কৃষকদের বেকারত্ব কিছুটা হ্রাস হবে। এবং ভূমিহীনরা জমি পেয়ে উৎপাদন করবে। ফলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। তখন তারা বাজারে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার ক্ষমতা অর্জন করবে। চাহিদা বাড়ার সংগে সংগে সরবরাহের প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবে আসবে এবং নানা ধরনের নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপিত হবে সেখানে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকদের কাজ জুটবে।

চারদিনের ছাত্র-যুব উৎসব হুগলী জেলার যুবকদের মধ্যে একটা প্রভাব বিস্তার করেছে বলে যুব উৎসবের সাধারণ সম্পাদক অসিত নিয়োগী ও চন্দননগর মহকুমা তথ্য আধিকারিক বিভূতিভূষণ রায় জানান।

ব্লক যুবকরণ সংবাদ

পশ্চিমদিনাজপুর জেলা

হেমতাবাদ—যুব-কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে পঃ দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ব্লকে সম্প্রতি একটি চারমাসব্যাপী সাইকেল মেরামতী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বিগত ২রা নভেম্বর '৮১ তারিখে হেমতাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীআনন্দমোহন বর্মন এই কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হেমতাবাদ ব্লকের তপসিল সম্প্রদায়ভুক্ত ৩০ জন যুবক চার মাস ধরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানে যুব-আধিকারিক শ্রীগোপাল ঘোষ এই ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করার যৌক্তিকতা এবং উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। শ্রীঘোষ বলেন যে, প্রশিক্ষণ শেষে যাতে শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করে স্বনির্ভর হতে পারেন, সে ব্যাপারেও আমাদের লক্ষ্য আছে। স্থানীয় তপসিল উপজাতি কল্যাণ সমিতির সভাপতি শ্রীবিধুভূষণ রায়ও বক্তব্য রাখেন এবং এ ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করার জন্য যুব-কল্যাণ দপ্তর কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানান। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেবেন স্থানীয় সাইকেল মেরামতী কারিগর আনওয়ারউল হক।

মালদহ জেলা

চাঁচল-১ ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে গত ৩১ আগষ্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর '৮১ পর্যন্ত এক-মাসব্যাপী ফুটবল, ভলিবল ও কবাডি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির চলে স্থানীয় সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টি-টিউশনে এবং ভলিবল ও কবাডি প্রশিক্ষণ চলে চাঁচল কলেজ ময়দানে। এই শিবির স্থানীয় যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রভূত সাড়া পড়ে যায়। শ্রীজয়ন্ত প্রামাণিক নিজ খরচায় কবাডি ও ভলিবলের প্রশিক্ষার্থীদের টিফিন সরবরাহ করেন। ফুটবল, ভলিবল এবং কবাডির প্রশিক্ষক হিসাবে যথাক্রমে লতিফুল রহমান, শ্রীসুদীপ চক্রবর্তী এবং শ্রীদিলীপ রায় শিবিরটি পরি-চালনা করেন। সুষ্ঠুভাবে শিবির চলার জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও বিডিও শ্রীশ্যামলকুমার মণ্ডলের প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে। এ ছাড়া স্থানীয় ৩৫টি ক্লাব ও সংস্থাকে খেলাধুলোর সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়।

বাঁকুড়া জেলা

পাত্রসায়ের—এই যুবকরণের পরিচালনায় গত ৪ঠা আগষ্ট থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর '৮১ পর্যন্ত পাত্রসায়ের স্পোর্টিং ইউনিয়নের ফুটবল মাঠে একমাসব্যাপী ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীদীপককুমার হাজরা এই প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন। এই ব্লকের ১৫টি ক্লাবের ৩০ জন শিক্ষার্থী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেন। শিক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা ছিল, ১৩ বৎসর থেকে ১৬ বৎসর পর্যন্ত। এই প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রভূত জনসমাগম হয়।

গত ৮ই আগষ্ট '৮১ ব্লকভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র শেষ হয়। পাত্রসায়ের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস বিষয়-বস্তুর উপর আলোচনাচক্রে যোগ দেয় মোট ৬ জন ছাত্র-ছাত্রী। এই আলোচনাচক্রে পুরস্কার বিতরণ করেন স্থানীয় ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ব্লক পঞ্চায়েত সভাপতি শ্রীঅশোককুমার মণ্ডল। প্রায় ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা এই আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন।

নির্ভর করছে শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহ-উৎসাহ ও প্রচেষ্টার উপর এবং শিক্ষকের শেখানোর আগ্রহ, ইচ্ছা ও মানসিকতার উপর। সংঘের পক্ষ থেকে স্থানীয় তরুণ সমাজসেবী শ্রীশংকর চক্রবর্তী বলেন যে, যুব-কল্যাণ বিভাগের এই বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মসূচী নূতন নয়—এর আগেও এই ব্লকে এ ধরনের প্রশিক্ষণ সাফল্যজনকভাবে শেষ হয়েছে। কিন্তু যুবকদের জন্য এই ধরনের বাস্তব ও বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচী এর আগে গ্রহণ করা হয় নি। এই প্রকল্প অনুমোদন করতে বহু বাধাবিপত্তির সৃষ্টি হয় কিন্তু ব্লক যুব-আধিকারিক শ্রীদেওয়ানের অক্লান্ত পরিশ্রম ও উৎসাহের ফলে এই প্রকল্প শুভারম্ভ হতে চলেছে।

কাকদ্বীপ ব্লক যুবকরণ আয়োজিত কবাডি প্রশিক্ষণ শিবির

মেদিনীপুর জেলা

পাঁশকুড়া-২—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব-কল্যাণ বিভাগের পাঁশকুড়া ২নং ব্লক যুবকরণের আর্থিক সহায়তায় এবং আশুরালী নবারুণ সংঘের সক্রিয় সহযোগিতায় গত ৩১শে অক্টোবর '৮১ ৬ মাসব্যাপী বৈদ্যুতিক কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করতে গিয়ে স্থানীয় পাঁশকুড়া ২নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও প্রবীণ শিক্ষক শ্রীবীরভদ্র গোড়ী মহাশয় বলেন, যুব-কল্যাণ বিভাগের এই ধরনের গঠনমূলক কর্মসূচী স্থানীয় হতাশাগ্রস্ত বেকার যুবকদের মধ্যে নূতন করে আশার আলোর সঞ্চার করবে। বিশেষ অতিথির ভাষণে স্থানীয় দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সাংবাদিক শ্রীপ্রসাদচন্দ্র হুতাইত মহাশয় এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, আরো খুশী হবো সেদিন, যেদিন জানতে পারবো এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সফলতার সঙ্গে শেষ হয়েছে। কিন্তু অসাফল্য ও সাফল্য

শিক্ষার্থী ও অতিথিদেরকে স্বাগত জানাতে গিয়ে স্থানীয় যুব-আধিকারিক শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এই ধরনের প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে অতীতে বহু বেকার দুঃস্থ যুবক-যুবতী হাতে-কলমে কাজ শিখে নিজেদের আর্থিক সংস্থানের রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন। শ্রীদেওয়ান আরো জানান যে, এই ধরনের আরো কয়েকটি প্রকল্প অনু-মোদনের অপেক্ষায় রয়েছে, বিশেষ করে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য। ২ ও ৩ মাসের মধ্যে এগুলি চালু করতে পারবেন বলে জানান। শ্রীদেওয়ান প্রসঙ্গক্রমে জানান যে, এই বৈদ্যুতিক কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছয়মাসব্যাপী চলবে এবং সপ্তাহে ৫ দিন ক্লাস হবে। ৪৪ জন শিক্ষার্থীকে এই শিবিরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গত ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ বাঁকাডাঙ্গা জন-কল্যাণ সমিতির প্রাঙ্গণে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের তমলুক শাখার প্রধান পরিচালক

বাঁকাডাঙ্গা গ্রামের ৩৫ জন দুঃস্থ অবহেলিত মানুষকে ধান চালের ভানকী ব্যবসাকে ত্বরান্বিত করার জন্য ৫০০ (পাঁচ শত টাকার) চেক এক এক করে প্রত্যেকের হাতে তুলে দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাঁশকুড়া ২নং ব্লকের ও তমলুক ব্লকের যুব-আধিকারিক শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান ও শ্রীবিদ্যুৎ অধিকারী। শ্রীদেওয়ান জানান যে, উক্ত বাঁকাডাঙ্গা গ্রামে অধিকাংশ মানুষ ধান ভানকী ব্যবসা করে জীবিকানির্বাহ করেন কিন্তু আর্থিক মূলধন না থাকায় ব্যবসার প্রসার ঘটছিল না। এ অবস্থায় বাঁকাডাঙ্গা জনকল্যাণ সমিতি এদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং ব্লক যুবকরণের মাধ্যমে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের তমলুক শাখার নিকট ডি-আর-আই প্রকল্পে ঋণ দানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে দরখাস্তগুলি প্রেরণ করা হয় এবং বাঁকাডাঙ্গা জনকল্যাণ সমিতির সম্পাদক শ্রীশম্ভুচরণ ঘাটার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বার্ষিক ৪% টাকা হারে ৩৫ জনের ৫০০ টাকা করে ঋণ মঞ্জুর হয়। সভাপতির ভাষণে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, এই ধরনের সহজ ঋণের মাধ্যমে গ্রামের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাঁকাডাঙ্গা জনকল্যাণ সমিতির সম্পাদক শ্রীশম্ভুচরণ ঘাটা।

খেজুরী—ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে কলাগেছিয়া জগদীশ বিদ্যাপীঠ সংলগ্ন খেলার মাঠে এবং খেজুরী আদর্শ বিদ্যাপীঠ সংলগ্ন খেলার মাঠে এক মাসের জন্য দুইটি ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত শিবির দুটিতে এই ব্লকের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্কুল ও ক্লাব থেকে যথাক্রমে ৩৬ জন ও ৩৫ জন ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছাত্র অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি দিবসে খেজুরী আদর্শ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সভাপতিত্বে ছাত্রদিগকে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে প্রশিক্ষণ শিবিরের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এই ধরনের আরও প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ রাখেন।

নদীয়া জেলা

চাপড়া—এই যুবকরণের পরিচালনায় সম্প্রতি (৬ আগস্ট—৬ সেপ্টেম্বর) ফুটবল ও কবাডি প্রশিক্ষণ শিবির সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে। ১৬ বৎসর পর্যন্ত কিশোরদের জন্য এই শিবির উন্মুক্ত ছিল। ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরে সামিল হয় মোট ৫০ জন এবং কবাডি প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেয় ৪৩ জন কিশোর। ১লা অক্টোবর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীগোপেশ্বর মুখোপাধ্যায়, জেলা যুব-আধিকারিক। ব্লক যুব-আধিকারিক শ্রীমতী আভারাণী দাস স্থানীয় ক্রীড়ামোদী জনগণের সহযোগিতার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানান।

খড়িবাড়ী-ফাঁসিদেওয়া ব্লক যুবকরণ আয়োজিত ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির

[শক্তির পুনর্নবীকরণ : ২২ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

বায়ুর CO_2 কে হাইড্রোকার্বনে পরিণত করে ল্যাটেক্স-এর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে যা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

কোপেইফেরা ল্যাঙ্কস ডারফি গাছ যা আমাজান ফরেস্টে (ব্রাজিলের) পাওয়া যায়, তাতে যে ল্যাটেক্স তৈরী হয়, নোবেল পুরস্কার জয়ী বিজ্ঞানী মেলভিন ক্যালভিনের মতে তা উৎপাদনগত দিক থেকে ডিজেল ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু এই ল্যাটেক্স দিয়ে তিনি সরাসরি গাড়ি চালিয়ে এক দৃষ্টান্তবিহীন সাফল্য রেখেছেন।

মাটির অত্যন্ত গভীরে অনেক পদার্থ এখনও উচ্চ তাপমাত্রায় গলিত অবস্থায় রয়েছে। ভূ-বিজ্ঞানীগণ নলের মাধ্যমে মাটির গভীরে জল পাঠিয়ে সে জলকে প্রথমে বাষ্পে ও পরে তা থেকে কার্য উপযোগী শক্তি উৎপাদনে ফলপ্রসূ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ডিজেল বা পেট্রোলচালিত যন্ত্র ও যানবাহনের যে ধোঁওয়া পরিবেশকে কলুষিত করছে তা এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে যন্ত্রাংশের উপযোগী এক বিশেষ শক্তিতে পরিণত করা যায়। সম্প্রতি আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি এর ব্যবহার চালিয়ে যাচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম লগ্নে শক্তির পুনর্জীবন সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল শুধুমাত্র কাগজে-কলমে কিছু তত্ত্বের অবতারণা মাত্র। কিন্তু গত কয়েক দশকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে অনেকগুলি বিকল্প পদ্ধতির মূল্যায়ন হয়েছে। কিন্তু যতটুকু মূল্যায়ন হয়েছে আমাদের ব্যাপক চাহিদার কাছে তা যৎসামান্য। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শক্তি সমস্যা নিয়ে এক সম্মেলন হয়ে গেল, তাতে ভারত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আন্তর্জাতিকভাবেও এই বিকল্প পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আর আজ বিজ্ঞানীরা যে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাতে হয়ত আমরা শক্তি সমস্যার বিকল্প পদ্ধতিতে অপরাজেয় থাকব।

পাঠকের ভাবনা

প্রবাসীর অনুরোধ

'যুবমানস' পত্রিকার আমরা দুই পাঠক। এই প্রিয় পত্রিকার কাছে আমাদের কিছু অনুরোধ আছে। তার আগে কি একটা ছোট্টো গল্প শোনাতে পারি?

জ্যৈষ্ঠের দুপুর। খাঁখাঁ করছে রোদ্দুর। রাস্তায় পিচগলানো গরম, শরীরের ঘামঝরানো ক্লান্তি সবকিছু উপেক্ষা করে ওরা চলেছে মনে একটি আশা নিয়ে। কয়লাপ্রাণ শহর ধানবাদে একটা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করার বাসনায়। এ শহরে বই পড়ার লোক আছেন অনেক, লেখারও লোক আছেন কিছু, কিন্তু সুযোগ?

ওদের আশা সফল হয় নি। তার কারণ বই ছাপানোর জন্য যে অর্থমূল্যের দাবী করেছিলেন ছাপাখানার ভদ্রলোক সে অর্থ সংগ্রহ করা সদ্য যুবক ঐ কয়েকটা ছাত্রের পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হয় নি। হতাশ হয়েছিল ওরা, কিন্তু সংকল্প থেকে সরে যায় নি। প্রকাশ করেছিল এ শহরের একমাত্র হাতে লেখা পত্রিকা। কিন্তু এ শহরে এ জিনিস কতদিন চলবে?

সেই জ্যৈষ্ঠের পর আর এক গ্রীষ্ম গেল, সেই উৎসাহী তরুণদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে। আর এক জ্যৈষ্ঠ আসার সময় হল। মাত্র দুজনের যৌথ প্রচেষ্টায় সে পত্রিকা আজও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। পাঠক সীমিত, লেখকও সীমিত, তবু তা থেমে থাকে নি।

অনুরোধ, এইসব মফস্বলবাসী, গ্রামবাসী ও প্রবাসী বাঙালীদের জন্য প্রিয় পত্রিকা 'যুবমানস' কিছু একটা করুক। গল্প না হোক অন্ততঃ কবিতার জন্য কি একটা পাতা এদের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা যায় না? গুণগত বিচারে উৎকৃষ্ট না হলে তা বাতিল করার দায়িত্ব তো সম্পাদকমণ্ডলীর থাকবেই।

যুব সমাজের মানসিকতার প্রতীক বলেই এ অনুরোধ 'যুবমানস'-এর কাছেই করতে পারছি, আর কারো কাছে নয়।

শ্রীচন্দন সরকার ও সূর্যদেব
যুগ্ম সম্পাদক 'বক্তব্য' [হাতে লেখা পত্রিকা]
ধানবাদ

গ্রামের লেখকদের আবেদন

যুবমানসের সাহিত্য বিভাগে প্রকাশিত কিছু কিছু কবিতা প্রাণ স্পর্শ করে, ক্ষণিকের তরে মনটা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়ে ভাল লাগার সুখটুকু মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করে।

তবুও প্রাণে বেদনার তরঙ্গ জাগে এই কারণেই যে গ্রাম-বাংলার বহু তরুণ-তরুণীর হৃদয়ও মানব হৃদয়; তাঁদের দুঃখ আছে; আছে সুখ। তাঁরাও কিছু বলতে চান। কিন্তু কেউ তাঁদের দুঃখ-সুখের কথা শুনতে চান না। গ্রামের সবুজ শ্যামলের গণ্ডিতে বাস করে, পাখির কলকাকলি শুনে, জলরঙে আঁকা আকাশের প্রচ্ছদপট দেখে, চলার পথে ধুলো-মাটি মেখে, শাপলার চচ্চাড় খেয়ে, সরল গ্রাম্য নরনারীকে ভালবেসে তাঁরা কি নিষিদ্ধ এলাকার বাসিন্দা হয়ে গেছেন? কল্লোলিনী কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় তাঁদের কী কোন কথাই প্রকাশ করা যায় না?

আমার অনুরোধ গ্রাম-বাংলার কবি, সাহিত্যিকদের যুবমানসের পৃষ্ঠায় স্থান দিয়ে তাঁদের প্রতিভাকে লালন করা হোক। আশা করি আমার প্রস্তাবের সপক্ষে যথাসম্ভব গ্রাম-বাংলার কবি সাহিত্যিকদের রচনা আহ্বান করা হবে।

কমলেশ মিত্র
শ্রীনগর—হাবড়া, ২৪ পরগণা

কিন্তু কেন?—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব-কল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র 'যুবমানস' সত্যিই একটি নন্দিত পত্রিকা। সুন্দর কাগজ, ঝকঝকে ছাপা, মনোলোভা প্রচ্ছদপট, এবং মাঝেমধ্যে দু'একটি সুন্দর কবিতা প্রাণে রেখাপাত করে।

আমার কয়েকটি অনুরোধ, ভাল ছোট গল্প প্রকাশ করুন। কবিতা বিভাগ আর একটু বড় হোক। ছোটগল্প দু'টি প্রকাশ করলে ভাল হয়। গ্রামবাংলার কবি-সাহিত্যিকদের আপনার পত্রিকায় আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিন। গ্রাম-বাংলার অন্যান্য মানুষের মতো এখানকার কবি-সাহিত্যিকরাও যে অবহেলিত। একবার প্রখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় একটা কথা বলেছিলেনঃ কবি-সাহিত্যিক হতে হলে তাকে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় আসতেই হবে।

কিন্তু কেন? আশা করি আমার অনুরোধটুকু আপনার শুভ্রনৈতিকতায় বিবেচিত হবে।

আমিও গ্রাম-বাংলার অবহেলিত কবি-সাহিত্যিকের মিছিলের অবহেলিত মানুষ। আপনার পত্রিকায় কী আমার স্থান হবে? সম্মতির আশায় রইলাম।

নিবেদন ইতি—

কমলেশ মিত্র
শ্রীনগর—হাবড়া, ২৪ পরগণা

আশুতোষ দেবনাথের 'ইউনিফর্ম' গল্পটি প্রসঙ্গে

যে শ্রমিক বাবা জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুও মেটাতে অক্ষম সে কিভাবে মেয়েকে কিনে দেবে নামী স্কুলের দামী ইউনিফর্ম? বাবার এই অক্ষমতা ও অসহায়তা কিশোরী মেয়ে বুঝতে পারে। তাই সে নীরব থাকে। সাধারণভাবে নিজেকে সকল কৃত্রিমতা থেকে দূরে রাখে। সেই মেয়ের কাছেও বাবাকে মিথ্যে বানিয়ে বলতে হয়, দিদিমণির দেওয়া ইউনিফর্ম কেনার 'টাকাটা যে পকেটমার হয়ে গেল।' কিন্তু এক্ষেত্রেও মেয়ের নীরবতায়, বাবার নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে ভাবে, মেয়ে হয়তো ভাবছে—'সবার বাবা পারে ইস্কুলে যাওয়া শাড়ী, জামা, জুতা কিনে দিতে। তার বাবার কেন পকেটমার হয় তারই এনে দেওয়া টাকা।' এর উপর, বাবার এই অসহায়তাকে মা আঘাত করলে মেয়ে যখন তার প্রতিবাদ করে তখন বাবার অসহায়তা আর লজ্জা বহুগুণ বেড়ে যায়। তার কাঁদতে ইচ্ছা করে, বিবেকের খচ্-খচানি তার মধ্যে 'অহরহ রক্ত ঝরতে থাকে'।

এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য তাই বাবা আত্মগোপন ক'রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খাটতে থাকে। বাবার এই অবস্থার কারণ উপলব্ধি করে মেয়ে আর স্থির থাকতে পারে না। তার 'অস্তিত্ব ভেঙে খান খান হয়ে যেতে চায়'। তার বুকের গভীর থেকে কান্না হয়ে বেরিয়ে আসে 'বাবা, বাবাগো। আমার দরকার নেই ইউনিফর্মের। আমি আর স্কুলে যাবো না। তুমি ফিরে এসো।' সেই মেয়েই যখন হঠাৎ পাওয়া সাহসে ভর দিয়ে দিদিমণির সামনে এসে দাঁড়ায় এবং পড়ে গিয়ে কপাল কেটে যাওয়া সত্ত্বেও দিদিমণির জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে, 'কই, না তো, আমি পড়ি নি'! তখন তার সমগ্র নীরবতাই এক ঝড়ের পূর্বপ্রস্তুতি বলেই আমরা উপলব্ধি করি। আর এখানেই 'ইউনিফর্ম' গল্পটি শেষ করেছেন গল্পকার আশুতোষ দেবনাথ।

গল্পটি লেখক সমাজবাদী বাস্তবতার আদর্শে লিখেছেন এবং সেদিক থেকে গল্পটি সার্থক বলা যায়। এ কারণে লেখককে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে উৎসাহিত করছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি সম্পাদক মহাশয়কেও। গল্পটি প্রসঙ্গে আর যা বলার আছে তা হলো, কোন ছোট গল্প পাঠের সময় পাঠককে আগাগোড়া তার মধ্যে নিবিষ্ট রাখার মতো প্রয়োজনীয় গঠনগত

বৈশিষ্ট্যের ঘাটতি 'ইউনিফর্ম' গল্পটিতে আছে। (এ প্রসঙ্গে যুবমানসের গতবারের শারদ-সংখ্যায় চাঁদ পাঠকের 'জোনাকি' গল্পটি বুঝি কোন দিন ভোলা যায় না।)

সম্ভাবনাপূর্ণ এই তরুণ গল্পকারের 'জীবন জীবিতের' নামক প্রথম গল্প-সংকলন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশ পেতে চলেছে।

গ্রাম-গঞ্জের তরুণ সাহিত্য সংগ্রামীদের সঠিকভাবে আবিষ্কার করে তাঁদের আর্থিক সাহায্য তথা উৎসাহ দানে প্রয়াসী হওয়ার জন্য বামফ্রন্ট সরকার নিশ্চয়ই অভিনন্দিত হবে।

সৈয়দ শুহা আলী
নব ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা

অনুরোধ

'যুবমানস' অগ্রণী মানুষের সংগ্রামী মানুষের এতদিন অনীহায় দূরে পড়ে থাকা বৃহত্তর মানুষের মুখপত্র। এই পত্রিকাকে এতদিনে আমরা আপন করতে পেরেছি। তাই সেই অধিকারে কতকগুলি দাবী রাখছি।

(১) 'যুবমানস' সাপ্তাহিক না হোক অন্ততঃ পাক্ষীক হোক।
(২) 'বইপত্র' সমালোচনার পাতাটি বাড়ানো হোক।
(৩) লিটিল ম্যাগাজিনের উপর প্রতি সংখ্যায় একটি সমীক্ষা থাকুক। লিটিল ম্যাগাজিনের প্রাপ্তিসংবাদ ও তাদের গতিবিধির উপর মনোজ্ঞ আলোচনা থাকুক।
(৪) নিয়মিত অনুবাদ গল্প-কবিতা সংযোজন হোক।

সত্যনারায়ণ মজুমদার
সম্পাদক, রণভূমি
আসাননগর, নদীয়া

স্কেচ

আপনাদের 'যুবমানস' পত্রিকার নভেম্বর '৮১ সংখ্যায় লোকচিত্রকলা বিভাগে শিল্পী দেবনারায়ণ দেবনাথ মহাশয়ের স্কেচটি ইতিপূর্বে আমাদের 'মৈত্রী' নামক সদ্য প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনে লিনোকাট-এর ব্লকে প্রকাশিত হয়েছে এবং পাশাপাশি শহরাঞ্চল থেকে কয়েকজন লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক স্কেচটি তাঁদের লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশ করার ব্যাপারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করছেন। ঠিক সেই সময়েই আপনাদের যুবমানসের মতো পত্রিকায় স্কেচটি প্রকাশিত হতে দেখে আমরা আনন্দিত। আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে স্কেচটি আরও বেশী বেশী মানুষের নজর কাড়বে সে আশা আমরা করতে পারি। এ জন্য আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সুধীন সেন, শ্রাবণী সেন
'মৈত্রী' সাংস্কৃতিক সংস্থা
চাঁদপাড়া বাজার, উঃ ২৪ পরগণা

অভিনন্দন

সাহিত্য বিভাগের মানুষ হয়েও ভীষণভাবে চমক্ খেলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাসিক মুখপত্র 'যুবমানস' পড়ে। ভাষার এত সাবলীলতা, প্রকাশের এত স্বচ্ছতা, ছাপার এত পরিচ্ছন্নতা সাহিত্যবিষয়ক কোন গ্রন্থেই আমার চোখে পড়ে নি। নভেম্বর ১৯৮১ সংখ্যাটির সম্পাদকীয় কলমটি কেবল যুবমনকে নাড়া দেয় না, নাড়া দেয় পশ্চিমবঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার মনকে। সম্পাদকীয় কলমের পৃষ্ঠাটি উল্টোতেই যে আর্টিকেলটি চোখে পড়ল তার গুণের কথা দু'এক কথাতেই শেষ করে দেওয়া সম্ভব নয়। রচনাটির কেবল প্রশংসাই করছি না, বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে এ রকম একটি রচনার প্রয়োজনীয়তা ছিল। মানুষের অন্তরের ভাষাকে এ রকম দরদীকণ্ঠে প্রকাশ করার জন্য রচনাটির লেখক বাংলার পাঠকের কাছে অমর হয়ে থাকবেন। শিশু প্রতিবন্ধী বর্ষ সম্পর্কে কিছু কথার আলোচনার প্রয়োজনীয়তা চলতি বছরে যথেষ্ট আছে। 'যুবমানস' তা পূরণ করেছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগটির মানও যে অত্যুন্নত তা অনস্বীকার্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বীরেন্দ্রনাথ পাল
সম্পাদক 'নতুন সূর্য'
পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর

[লেখক শিল্পীদের স্থায়ী সংগঠন : ১৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সাধারণ সম্পাদক; শ্যামসুন্দর দে, অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রক্ষিত, অমল চক্রবর্তী, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক ও বরুণ সরকারকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৬ জনের একটি কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। রাজ্য সংসদ ও কর্মপরিষদ এবং সাধারণ সভ্য থেকে বর্তমান জেলা কমিটিগুলি যাদের নবগঠিত সংঘের জেলা কমিটি হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয় তারা জেলা ও রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করবেন। ব্যাপক সংখ্যক লেখক শিল্পীকে গঠনতন্ত্র অনুসারে সমবেত করার কাজ চালাবেন।

সাধারণ সভার শেষে নবগঠিত সংঘের ফেস্টুন সহ এবং বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটার, গণনাট্য সংঘ ও সাংস্কৃতিক কর্মী এবং বিশিষ্ট লেখক শিল্পীদের নিয়ে "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্ত ও 'নিউট্রন বোমার' বিরুদ্ধে একটি মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমার শেষে বেকার হলের প্রকাশ্য সমাবেশে সমবেত হয়। সভাপতিত্ব করেন নারায়ণ চৌধুরী। নবগঠিত সংগঠনের প্রতি শুভেচ্ছা জানান সর্বশ্রী মন্মথ রায়, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার, নবেন্দু ঘোষ, প্রভাতকুমার গোস্বামী, সাধন গুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত (পরিচয়)। বিশিষ্ট অভিনেতা ও পরিচালক দিলীপ রায় আঞ্চলিক ভাষায় লেখা শ্রমজীবী মানুষের সপক্ষে উচ্চারিত স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। সবশেষে প্রদর্শিত হয় বিশ্ববিখ্যাত ছবি 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন'।

[রবীন সেনের বাড়ি ও আমার জীবনযাপন : ১৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ভয়ানক রাগ হল। চেঁচিয়ে বললাম, না দেব না। অঞ্জুর একখানা হাড়ও দেবো না। নাও দেখি তুমুল বাঁধিয়ে দেবো। আক্রোশে চোখ ঝলসে উঠল আমাদের।

এই রোকো।

সন্তুরা দাঁড়াল। আবার চলতে লাগল। কানের পাশে খল খল হাসি আর চাপা ধমক। হাত ধুয়ে এসো। অতীত বর্তমান মুছে ফেল।'

—না। হট্ যাও—হ—ট যা—ও—

এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী চীনা খেলোয়াড়দের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু

ফোটো—সুব্রত দত্ত

Reg. No. 32875/78

Postal Reg. WB/CC-15

গত ২০শে নভেম্বর গোর্কী সদনে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু

যুবমানস
জানুয়ারী, '৮২
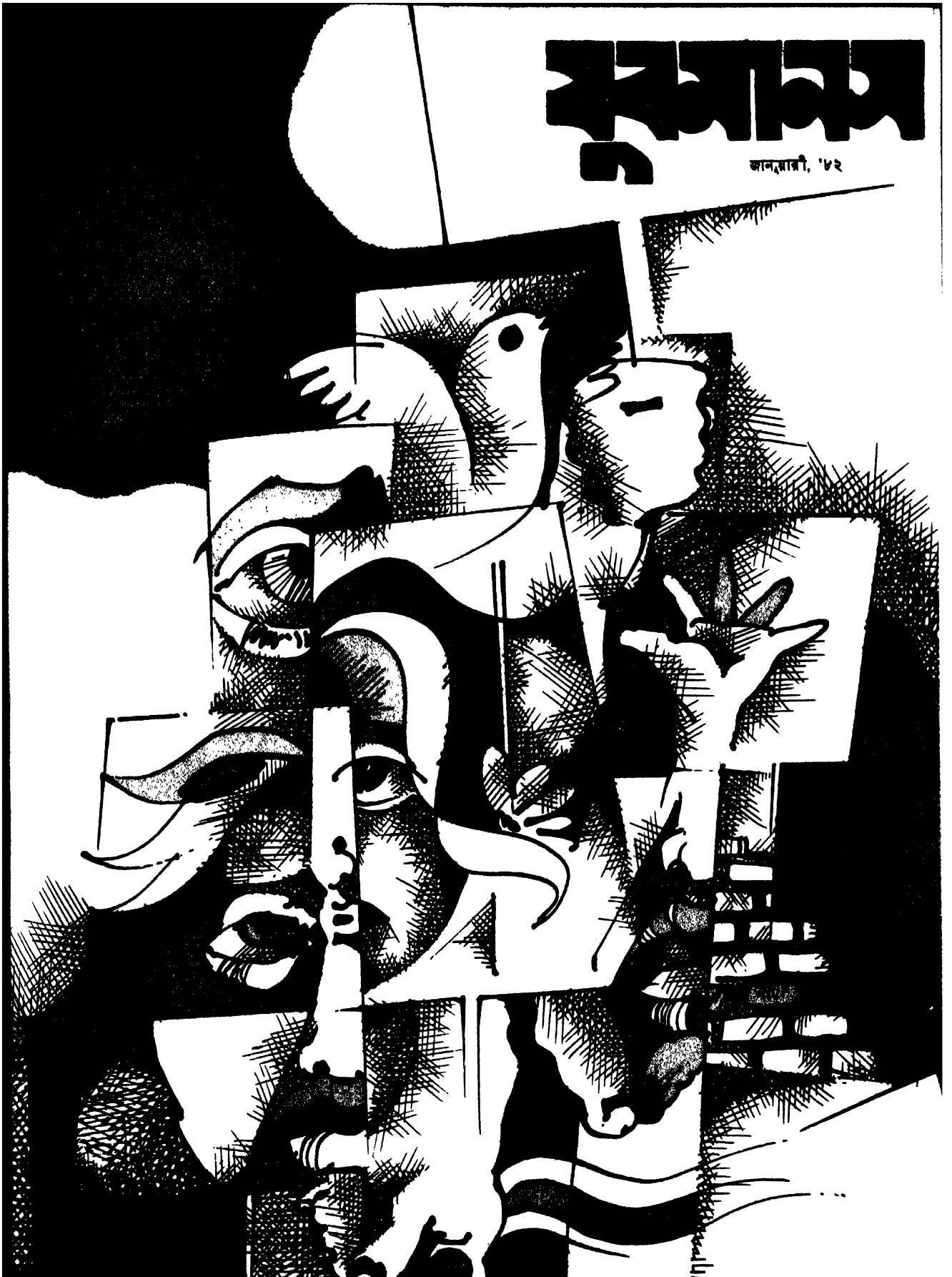
ফিল্মোৎসব—'৮২-তে আগত অতিথিদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ও অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র

যুবমানস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
জানুয়ারী, '৮২

উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি এবং পত্রিকা সম্পাদক : কান্তি বিশ্বাস

প্রচ্ছদ : চন্দন বসু

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা-৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—চল্লিশ পয়সা

সম্পাদকীয়

এই আপত্তি কিসের ইঙ্গিত?

এই রাজ্যের বামফ্রন্ট কমিটির সুপারিশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন আগামী ১৫ই মার্চের মধ্যে করতে হবে। রীতি অনুসারে এই সিদ্ধান্ত রাজ্যপাল শ্রীভৈরবদত্ত পাণ্ডেকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশনার শ্রীশাকধেরের নিকট দাবী পেশ করা হয়েছে।

মন্ত্রিসভা তথা বিধানসভার মেয়াদ জুন মাস পর্যন্ত থাকা সত্ত্বেও মাস তিনেক পূর্বেই নির্বাচন করার আবেদন উত্থাপন করা হয়েছে। কারণ হিসাবে রাজ্যের প্রাকৃতিক অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মে-জুন মাসে সূর্যদেবের প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণে প্রায় সব জেলাতেই মানুষ ত্রাহি ত্রাহি রব তোলে। রাজনৈতিক দলগুলির কর্মীদের এবং ভোটের দিন ভোটারদের অসহ্য গরমের ধকল পোহাতে হয়। আবার ঐ সময় কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় রীতিমত বর্ষা শুরু হয়ে যায়। তার ফলে ভোটের যাবতীয় কাজকর্মে হরেক রকমের বাধা তৈরী হয়। এই সকল অনিবার্য অসুবিধাগুলি সঠিকভাবে উপলব্ধি করে নির্বাচন কমিশন ১৯৫৭ সালে শুধু এই রাজ্য কেন—গোটা ভারতবর্ষের নির্বাচন ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে করার জন্য সুপারিশ করেছিল। ভারতের ভূগোলে যাঁদের ক-খ জ্ঞান আছে এবং যাঁরা মানুষের ক্লেশে কষ্ট পান তাঁরাই নির্বাচন কমিশনের এই সুপারিশ তারিফ না করে পারবেন না।

তাছাড়া এই সময় নির্বাচন হলে একটা বাড়তি সুবিধাও পাওয়া যায়। আর্থিক বৎসর শুরু হয় এপ্রিল থেকে। ফেব্রুয়ারী-মার্চে নির্বাচন হলে নতুন সরকার জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে এবং নিজেদের পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে সারা বছরের বাজেট তৈরী করতে সময় পায়। এর ফলে পরিকল্পনাবিহীনভাবে সরকারী কাজ চালানোর কয়েকটি মাসের অনিশ্চয়তা এবং তজ্জনিত অপচয়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

বিধানসভার অন্তিম লগ্ন উপস্থিত হওয়ার তিন মাস পূর্বে নির্বাচন করার ব্যাপারটি যে অবৈধ নয়—তা-ও রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রস্তাবে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সংবিধান এবং ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের বিভিন্ন ধারার উপর মন্ত্রিসভা তার প্রস্তাবকে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশের সংবিধানবিশারদ ও আইনজ্ঞগণ এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে আইন-সিদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। এ ধরনের আগাম নির্বাচন বিভিন্ন রাজ্যে এমন কি কেন্দ্রে ত হয়েছেই —পশ্চিমবঙ্গেও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্য-মন্ত্রিত্বের আমলেও একাধিকবার হয়েছে। দু-একটি রাজনৈতিক দলের কতিপয় শীর্ষস্থানীয় নেতা রাজ্য সরকারের এই প্রস্তাবের মধ্যে বে-আইনীর গন্ধ পেয়েছেন। সংসদীয় রীতি-নীতির মৃত্যু-ঘণ্টা শুনেছেন, গণতন্ত্রের ভবিষ্যত অন্ধকার দেখেছেন। এদের চক্ষু-কর্ণ-নাসিকার বীভৎস ভৌতিক শক্তি দেখে অবাক হতে হয়!

এই ভদ্রমহোদয়গণ হারমোনিয়ামের ঘাট বদল করে নতুন করে সুর তুলেছেন—নির্বাচন যদি করতেই হয় তবে এই ভোটার তালিকা অনুসারে নৈব নৈব-চ। কারণ দুটি। বর্তমান মন্ত্রিসভার আমলে এই তালিকা জন্মলাভ করেছে এবং তৈরীর কাজে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একটি সংগঠনের কিছু লোক ঢুকে গিয়েছিল। তালিকাটি এই জমানায় তৈরী হয়েছে বটে কিন্তু এর তৈরীর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব এবং অধিকার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োজিত নির্বাচন কমিশনারের। প্রতি রাজ্যে কমিশনারের একজন করে প্রতিনিধি থাকেন। তিনি কমিশনারের নির্দেশ অনুসারে এই তালিকা তৈরী করেন। রাজ্য সরকারের যখন যতটুকু সাহায্যের দরকার হবে প্রয়োজনমত ততটুকু সাহায্যই সরকার করতে পারে, তার বেশি নয়। যতদূর জানা গেছে, ঐ একই তালিকা অনুযায়ী যাতে রাজ্যে এ বছর পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে পারে সেজন্য বিধানসভা এবং লোকসভার নির্বাচনের বুথভিত্তিক ভোটার তালিকা তৈরী না করে গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক তালিকা তৈরী করার বিষয়টি বিবেচনার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনারকে অনুরোধ করা হয়েছিল। কমিশনার সাহেব তাতে রাজী না হওয়ায় পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে সরকার এক অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। এই হচ্ছে ভোটার তালিকা তৈরীতে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে লোক গণনার মত করে ভোটার তালিকা তৈরী করার জন্য যে লোক নিয়োগ করার দরকার হয়েছিল সেক্ষেত্রেও কমিশনার সাহেবের নির্দেশ ছিল—পূর্বে এই কাজে যাদের নিয়োগ করা হয়েছিল এবারেও তাদেরই নিয়োগ করতে হবে। যদি অতিরিক্ত লোকজনের প্রয়োজন হয় তবেই বিধিমত সেই সংখ্যক লোক নতুন করে নিয়োগ করতে হবে। ফলে, রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রি-সভার আমলে যাঁরা এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন মূলতঃ তাঁরাই এবারেও ঐ কাজের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। এবারের ভোটার তালিকা যাতে সম্ভবমত নির্ভুল হয় সেজন্য প্রত্যেকটি বুথের অধীন এলাকার মানচিত্র এঁকে বিস্তারিত বিবরণ-সম্বলিত তালিকা তৈরী হয়েছে। এপ্রিল মাসে ভোটার তালিকা তৈরী সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ব্যাপকভাবে প্রচার করে এই কাজ শুরু হয়—চলে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। রাজ্যের চীফ্ ইলেক-টোরাল অফিসার এ বিষয়ে একাধিকবার সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের ডেকে আলোচনাও করেছেন। এইভাবে তৈরী খসড়া তালিকা প্রকাশ করার পর মাসাধিককাল সময় আপত্তি, সংশোধন এবং সংযোজন করার জন্য সময় দেয়া হয়েছিল। প্রত্যেকটি আবেদনকারীর বক্তব্যকে বিচার করে দায়িত্বশীল অফিসারগণ এই তালিকার চূড়ান্ত রূপ দেন। এই তালিকাই গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। এর পরও যদি কোন ভুলভ্রান্তি থেকে যায় কিংবা ইতিমধ্যে যদি কোন ভোটার মারা যায় অথবা স্থান ত্যাগ করে বা ভোটার হওয়ার প্রয়োজনীয় বয়স অর্জন করে তবে তার সংশোধন বা সংযোজন করার জন্য ১৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত সময় দেয়া হয়। নির্বাচনী কমিশনার দিল্লীতে জানুয়ারীর গোড়ার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে ভোটার তালিকা তৈরীর জন্য পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অন্যদিকে কংগ্রেস(ই) শাসিত কর্ণাটক ও অন্ধ্রে বিধানসভার মেয়াদ আর মাত্র কয়েক মাস বাকী থাকা সত্ত্বেও এ জাতীয় কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী গত ডিসেম্বর মাসে সংসদে কংগ্রেসী সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে জানান—পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা সম্পর্কে কোন রাজনৈতিক দলের নিকট হতে উল্লেখ করার মত কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নি। যা এসেছে তা সাধারণ ধরনের এবং ভোটার তালিকা ৩১শে ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে। ভোটার তালিকা তৈরীর মত এক বিরাট কাজে রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত নির্বাচনী অফিসার যদি রাজ্য সরকারের নিকট কোন লোক-জন চান—সরকার তা দিতে বাধ্য। এই লোকজনের মধ্যে যদি কো-অর্ডিনেসন কমিটির কোন সদস্য থাকেন সেই অজুহাতে তালিকা বাতিল করার কোন দাবী কি কোন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও করতে পারেন? বোধ করি নিঃসন্দেহে বলা যায়—রাজ্য সরকারের এমন কোন অফিস নেই যে অফিসে কর্মচারী সংগঠন ঐ কো-অর্ডিনেসনের কোন সদস্য নেই। তাই বলে এ যাবৎ রাজ্য সরকার রাজ্যে যে শ'য়ে শ'য়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছেন ঐ অফিসগুলির মাধ্যমে—তা কি সবই অবৈধ—সবই কি এখন বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে?

আবার আর একটি বক্তব্যও ঐ একই মহল থেকে বলা হচ্ছে,—বামফ্রন্ট সরকার জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাই ভয় পেয়ে পালিয়ে বাঁচবার জন্য মেয়াদ ফুরোবার তিন মাস পূর্বেই নির্বাচন করতে চাইছে। ঐ মহাশয় ব্যক্তিদের উর্বর মস্তিষ্কের জল্পনা যদি সত্যিই হয় তাহলে সে

জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রাজ্য সরকারকে জুন মাস পর্যন্ত আর মহাকরণে রাখা কেন—মার্চ মাসেই নির্বাচনী দরিয়ায় তাদের চুবিয়ে মারার এ হেন সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে মহাশয়গণের এত আপত্তি কেন?

আদরের ভাগ্নেদের আর একটি তাজ্জব দাবী অহরহ শোনা যায়,—নির্বাচন হতে পারে তবে এই সরকারকে ক্ষমতায় রেখে কখনই নয়। স্বাধীনতা লাভের পর এখন পর্যন্ত বিধানসভা কিংবা লোকসভার যত নির্বাচন হয়েছে দু-একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত সবই ত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার আমলেই হয়েছে। মহাশয়দের ত ভুলে যাওয়ার কথা নয়—সংবিধান তৈরীর সময় তখনকার আইন-সভার কোন কোন সদস্যের পক্ষ থেকে দাবী তোলা হয়েছিল যে সংবিধানে এমন কথা বলা হোক যে, নির্বাচনের অন্ততঃ কিছুদিন পূর্বে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে। সেই সময় কংগ্রেসের পক্ষ থেকেই এই দাবীকে নস্যাৎ করে দেয়া হয়েছিল এই বলে যে—নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে যখন নির্বাচন হবে তখন নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য মন্ত্রিসভার পদত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না। তা হলে কোন্ যুক্তিতে এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে খারিজ না করে নির্বাচন করা যাবে না—এই দাবী তোলা হয়? ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনের সেই কদর্য দৃষ্টান্ত তুলছি না। কিন্তু তার পরেও বিভিন্ন রাজ্যে জোর-জুলুম, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-জখম, বুথ দখলের মত ঘৃণ্য কৌশলের মধ্য দিয়ে নির্বাচন হয়েছে। এমন কি, উত্তরপ্রদেশে গাড়ওয়াল লোকসভার আসনের গোটা নির্বাচনটাই নির্বাচন কমিশনার বাতিল করে দিয়েছেন—আর তারই পাশাপাশি সম্পূর্ণ শান্তিতে এই রাজ্যে ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত, ১৯৮০ সালে লোকসভা ও ১৯৮১ সালে পৌর নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৮০ সালের লোকসভার নির্বাচন—যখন প্রত্যেকটি নির্বাচনী এলাকার জন্য একজন করে দায়িত্বশীল অফিসারকে নির্বাচনী কমিশনার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন—তার একজনও কি নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হওয়া সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন?

বিগত চার বছর ধরে এই রাজ্যে এই মহোদয়-গণ নির্বাচনকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সমস্ত প্রকার চেষ্টা চালিয়েছেন। বিধানসভার উপ-নির্বাচনের কথা যখনই বলা হয়েছে তখনই আপত্তি তোলা হয়েছে, পৌর নির্বাচনকে বন্ধ করার জন্য হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট করে ব্যর্থ হয়ে নির্বাচন বয়কট করার মহড়া দেয়ার চেষ্টা করেছেন, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-নির্বাচন বন্ধ করার জন্য কোর্টে গেছেন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্বাচন বন্ধের জন্য মোকদ্দমা করেছেন। শুধু নির্বাচিত না হতে পারার আতঙ্ক থেকে এই আপত্তি—না গোটা সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-ভাবনার এ এক অশুভ ইঙ্গিত? গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষের উদ্বেগ আরও বেড়ে যায় যখন তারা দেখেন পুলিসের অভাবের জন্য লোকসভার একটি আসনে দীর্ঘ দিন নির্বাচন স্থগিত থাকছে। পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশের উপ-নির্বাচনগুলি করার কোন তাগিদ ঐ সরকার-গুলি অনুভব করছেন না। সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়—অন্যান্য ঘটনার সাথে যখন কেরালায় এবং আসামে নতুন সরকারের অভিষেক এইভাবে হয়।

তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রস্তাবের বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া কোন এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দেশের সকল গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে—বিশেষ করে যুবসমাজের কাছে আমাদের নিবেদন—মনে রাখবেন সত্যিকারের গণতন্ত্রের মূল্য হচ্ছে সদা জাগ্রত প্রহরা। আশা করি, এই মূল্য দিয়েই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা কৃতসংকল্প হবেন, গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরীর মত সজাগ থাকবেন।

"আজকের তরুণদলের ইচ্ছাশক্তি ও মেধা যাতে ব্যাপকভাবে সমাজের অবক্ষয়ে ব্যয় না হয় সে সম্পর্কে আমাদের সদা জাগ্রত থাকা আবশ্যক।"

—আইনস্টাইন

ভারতীয় অর্থনৈতিক সঙ্কটে আমাদের ভাবনা

দীনেন্দ্রনারায়ণ মুন্সী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরে পৃথিবীর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে অস্থিরতা শুরু হয়েছে তাতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ভারসাম্য রক্ষা করতে বৃহৎ শক্তিগুলির উপর অনেক বেশী করে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের দিন শেষ হওয়ার পর্যায়ে পারমাণবিক শক্তির অতি দ্রুত আত্মপ্রকাশ ও রণহুঙ্কার গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশগুলিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির লড়াইয়ের প্রতিপক্ষ আজ আর সমশক্তিসম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশ নয়, প্রতিপক্ষের মঞ্চে আজ সমাজতান্ত্রিক দেশের শিবির। সমাজতন্ত্রের উত্তরণের যুগে এই হুমকি স্বাভাবিক কারণেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী দুনিয়ার শোষিত মানুষের কাছে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। শক্তির মূল্যায়নে সাম্রাজ্যবাদী দেশের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রস্তুতি কম নয়। সুতরাং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা যদি প্রকট হয় তবে লড়াইয়ের ব্যাপ্তি অনেক প্রসারিত হবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার কোন ঘোষণা যদিও নেই, তবুও বৃহৎশক্তির আর্থিক সাহায্য ও রাজনৈতিক সহযোগিতা কেন্দ্রীয় সরকারের চালিকাশক্তি—এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ নেই বললেই হয়। একদিকে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকে জাতীয় স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করে শর্তাধীন ঋণ নেওয়া, অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়া সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের কাছ থেকে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্য, এই দ্বৈত পররাষ্ট্রনীতির কোন ব্যাখ্যা নেই। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ঋণ ও বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্য উন্নয়নশীল ও পিছিয়ে পড়া দেশের অর্থনীতিতে যে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে এবং যার ফলে সাধারণ রুটিরুজির নাগরিক অশেষ দুর্ভোগ ভোগ করেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক দেশের ক্ষেত্রে প্রমাণিত সত্য।

ভারতের শাসকদল জাতীয় কংগ্রেস, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় পার্লামেন্টে এ বিষয়ের উপর বিতর্কে জনপ্রতিনিধিদের আশ্বাস দিয়েছেন যে জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করে কোন কাজ তিনি করেন না এবং বিশেষত আই.এম.এফ.-এর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের বিষয়ে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশিত হিন্দু পত্রিকার সাংবাদিক শ্রী এন. রাম কর্তৃক প্রেরিত কয়েকটি প্রতিবেদন যা ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো হয়েছে, তাতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত যে ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীভেঙ্কটরমণ, আই.এম.এফ.-এর সচিবের সাথে পত্রালাপে ঋণ গ্রহণের শর্তগুলি সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে মেনে নিয়েছেন। ৫·৮ বিলিয়ান আমেরিকান ডলারের অর্থমূল্য ভারতীয় মুদ্রায় তীব্র মুদ্রাস্ফীতি ঘটাতে যথেষ্ট বলা যেতে পারে। বর্তমান ভারতের ঋণ ১৫,০০০ কোটি টাকা এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ঋণ যোগ করলে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ২০,০০০ কোটি টাকা, যার অর্থ বৈদেশিক ঋণ যা এর পূর্বে জাতীয় আয়ের শতকরা এগার ভাগ ছিল তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে শতকরা পনের ভাগ। এর সাথে অন্যান্য অর্থ সংস্থার ঋণ যোগ করলে ঋণের বোঝার চাপে আমরা মৃতপ্রায় হয়ে যাবো। বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে ঋণ গ্রহণ করে ঋণের বোঝা আরও ভারী করার ব্যবস্থা হয়েছে।

যে শর্তগুলি আই.এম.এফ.-এর সাথে জড়িত তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করে বলা যেতে পারে যে এতে আমদানীকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে (কাঁচামাল সহ কারিগরি দক্ষতা পর্যন্ত), মুদ্রা অবনয়নের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এই ঋণ গ্রহণকালে অন্য কোন সংস্থার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করা চলবে না এবং সম্পূর্ণ টাকার সুদের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা। ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময় বাৎসরিক ১০০০ কোটি টাকা (সুদ+আসল) শোধ দিতে হবে। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরম সংকটের দিনে এই ঋণ ভারতের মত পিছিয়ে পড়া দেশের অর্থনীতিতে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। সোভিয়েত রাশিয়া, পূর্ব জার্মান প্রভৃতি দেশের সাথে ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের চুক্তি অথবা ঋণ গ্রহণের শর্ত কখনই এই ধরনের জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করে নি।

জাতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণে অধিক অর্থের ব্যয় জাতীয় গড়পড়তা আয় বাড়িয়ে থাকে এবং এই নিয়মানুসারে ভারতীয় নাগরিকদের ইদানীংকালে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধিতে উৎসাহ বোধ করা যেতে পারে। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতিতে শতকরা ৭০ ভাগ নাগরিক দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করেন এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় নির্ধারণের সময় তাদেরকেও হিসাবে আনা হয়ে থাকে, যা কখনই যথার্থ জাতীয় আয়কে প্রতিফলিত করে না। উচ্চ আয়সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী ব্যক্তির আয়ের গড়পড়তা হিসাব করলে যে তথ্য পাওয়া যেতে পারে তা কখনই বাস্তব অবস্থাকে প্রতিফলিত করবে না। সুতরাং পরিকল্পনা মতে এই ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে তা ভারতের বেশীর ভাগ মানুষের আসল আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে না। অন্যদিকে উৎপাদনের আয়ে চাহিদার ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে জীবনযাপনের ব্যবহার্য সামগ্রীর অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি আরও শতকরা কিছু অংশকে ক্রয়ক্ষমতার নীচে নামিয়ে দিতে সাহায্য করবে। সুতরাং জাতীয় স্বার্থে এই ধরনের ঋণ নেওয়া থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিরত করতে তীব্র জনমত গঠন করা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত দোকানসমূহে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ। কারণ সরকার ভরতুকি দিতে অপারগ। অন্যদিকে চিনি, ইস্পাত সহ কয়েকটি রপ্তানি দ্রব্যে লক্ষণীয় পরিমাণে ভরতুকি দিচ্ছে দীর্ঘদিন যাবৎ। ১২০০ কোটি টাকার ওপর এই ভরতুকি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যয় হলে মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে সফল হতে পারত এবং একচেটিয়া বাজারের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যবসায়ী সমাজ মূল্যস্তর ইচ্ছানুযায়ী বৃদ্ধি করতে সক্ষম হতে পারতো না। জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার এই দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ নয়।

গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় বৈদেশিক নীতিতে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী সর্বস্তরে বজায় থাকছে না। অর্থনৈতিক মন্দা ব্যবস্থাকে সাময়িকভাবে উত্তরণের উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তির কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের ঘটনা ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে অনেকবার ঘটেছে। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও ব্যবসায়িক লেনদেন সময়ের তাগিদে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে করতে হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সারা পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তাতে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তির কাছে বিপদের সংকেতই শুধু বহন করছে না, শোষণ চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মহড়া চলছে। ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়ায় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের শোচনীয় পরাজয়ে দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের প্রাণে নতুন জোয়ার এনেছে। ঔপনিবেশিক শক্তির পিছু হটে যাওয়ার রাজনৈতিক তাৎপর্যকে ঠিকভাবে জনমানসে পরিচালিত করতে পারলে শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করে শোষিত, নিষ্পেষিত মানুষ স্বাধিকারে বেঁচে থাকতে পারবে যার ফল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনে সাহায্য করবে।

সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতি যে বুনিয়াদের উপর গড়ে উঠছে তাকে যথাযথ মেনে চললে দেশের উন্নতি নির্দিষ্ট লক্ষ্যানুযায়ী সম্পন্ন করা যায় এবং তাকে সামনে রেখে অন্যদেশের মানুষ উৎসাহ বোধ করেন।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক আখ্যায় ভূষিত করা হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দলগত সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সরকারের গঠন। জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা লাভের পরে এই সরকারের দায়িত্বে প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে আছেন (১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯-এর জুলাই পর্যন্ত বাদে)। সুদক্ষ রাজনীতিবিদ হিসাবে জওহরলাল নেহরু পঞ্চশীল নীতির পুরোধা ছিলেন, সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ার বন্ধু ছিলেন, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশ আমেরিকা ও ইউরোপের রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথেও তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল। অর্থনীতির অনেক অস্থির মুহূর্তে তিনি বিদেশের সাহায্য গ্রহণ করে ভারতীয় অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর সময়ে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারের পরিস্থিতি বর্তমান অবস্থার তুলনায় অনেক স্থিতিশীল রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সময়ের পথ দিয়ে তাঁর কন্যার প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ এবং মসনদের অধিকার বজায় রাখার জেহাদ জাতীয় অর্থনীতিকে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

বিদেশের কাছ থেকে জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করে ঋণ গ্রহণ, অর্থনীতিকে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কব্জায় ফেলে দেওয়া ইত্যাদি ঘটনায় তাঁর ঘোষিত 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থার' ফাঁকা বুলি ভারতীয় জনগণকে আর বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না। তাই তাঁর দলের স্বার্থে সংবিধানের সংশোধন, নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করা, শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন স্তব্ধ করতে 'এসমা', 'নাসা' ইত্যাদি কালা আইনের নানাভাবে প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জনগণের কাছে যে পথগুলি খোলা রয়েছে তার একটি শোষণ নিষ্পেষণ মেনে নিয়ে অনুগত নাগরিক হিসাবে তার প্রতি আস্থা স্থাপন করা, অন্যদিকে এই জনস্বার্থহানিকর শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ সংগঠিত করা। প্রথমটির পক্ষে গণ-জমায়েত প্রাথমিক পর্যায়ে বেশী হতে পারে, কিন্তু আন্দোলন সংগঠিত করতে পারলে গণ-চেতনার সম্প্রসারণ হবে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগে বিকল্প রাজনৈতিক শিবিরের জয়লাভ অসম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় রাজনৈতিক দলসমূহের অবস্থান ভাববার প্রয়োজন।

বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্নেই উপস্থিত ছিল এবং সময়ের সাথে পা মিলিয়ে তার শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন নামে বিস্তার লাভ করেছে। অন্যদিকে বাম রাজনীতির পুরোধা কমিউনিস্ট পার্টি প্রাক্-স্বাধীনতাকালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ বেয়ে আজ নিজ অস্তিত্ব শুধু বজায় রাখছে না, অন্যান্য বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপনে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে চলেছে। রাজনৈতিক মতাদর্শে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিভাজন হয়েছে এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি আদর্শগত প্রশ্নে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দলকে সম্প্রসারিত করতে পেরেছে যার প্রভাবে অন্যান্য দলগুলিও আজ ব্যাপক ভিত্তিতে ঐক্য গঠন করতে উৎসাহিত এবং জাতীয় কংগ্রেসের সমকক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা গঠন করতে বদ্ধপরিকর। কিভাবে এই ঐক্য সম্ভব তা আলোচনা করার সুযোগ এই দলগুলির এসেছে। বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের প্রাথমিক শর্ত স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করবার মানসিকতা। এই মানসিকতা বুর্জোয়া দলগুলির পক্ষে সম্ভব নয় কারণ জনসমর্থন সংগ্রহে তারা নীতি অপেক্ষা জবরদস্তিকে অথবা রজতমুদ্রাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অন্যদিকে বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির মূল বুনিয়াদ অগণিত শোষিত জনগণ, সুতরাং তারাই স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই সংগঠিত করতে পারে। আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে এই জঙ্গী মনোভাব গঠন হবে, যা সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় সম্প্রসারিত হয়ে বিকল্প শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। কমিউনিস্ট মতাদর্শের দর্শন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এই শিক্ষাই দিয়ে থাকে যে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে জনগণ শিক্ষিত হলে চেতনার স্ফুরণ অতি দ্রুত হতে পারে এবং শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই আজ প্রয়োজন জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলে, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক মঞ্চে তাদের জমায়েত করা এবং নেতৃত্বের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে তাদের অগ্রবর্তী বাহিনীর যোদ্ধা হিসাবে তৈরী করার প্রশ্নে সঠিক নির্ভয় মানসিকতা এবং আত্মত্যাগ।

"পৃথিবীতে সংগ্রাম চলবেই। এই সংগ্রাম এড়াইয়া চলিতে গেলেই আমাদিগকে শাস্তি-ভোগ করিতে হইবে। সংগ্রামের পর সংগ্রামের ভিতর দিয়া আমাদের আদর্শ বিকাশের পথে চলিয়াছে। সমগ্র মানবজাতিকে ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্য নৈতিক বিচারই যুদ্ধকালে আমাদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। এই অস্ত্রের দ্বারাই আমরা প্রতিরোধ করিব। প্রয়োজন হইলে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য আক্রমণ করিব।"

—রবীন্দ্রনাথ

জনস্বাস্থ্য এবং আমাদের সমাজ

ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সাধারণ চিত্র

মানুষের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে কয়টি প্রাথমিক শর্ত পূরণ হওয়া প্রয়োজন, রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা তার মধ্যে একটি। এই ক্ষেত্রে সুস্থ মানব সমাজ গঠনে রোগের প্রতিরোধ, রোগের চিকিৎসার চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে জোরদার করার মধ্য দিয়েই শতকরা আশী ভাগ রোগেরই প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব।

কিন্তু লোকসভার তথ্য অনুযায়ী, ৩০৬ মিলিয়ন ভারতীয় (যার মধ্যে ২৪৯ মিলিয়ন গ্রামের ও ৫৭ মিলিয়ন শহরের) দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। তাদের মাসিক উপার্জন ৭৫ টাকারও কম, ফলে বছরে মোটামুটি ১৮০ কিলোগ্রাম খাদ্যদানা, যার থেকে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম ১০০ থেকে ১৪০০ ক্যালোরি খাদ্যশক্তি সংগ্রহ করতে পারে, তা কিনতেও তারা অপারগ। এই অবস্থায় এরা অপুষ্টিতে ভুগতে বাধ্য এবং দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় তা হাজার ধরনের ব্যাধির সৃষ্টি করে।

অপুষ্টি যেখানে প্রধান কারণ

যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ আমাদের দেশে অত্যন্ত বেশী। এই রোগের ব্যাপকতার মূল কারণ খাদ্যাভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অজ্ঞতা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার অভাব। আমাদের দেশের ৬০ ভাগেরও বেশী মানুষ নিরক্ষর, স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চেতনা তাই তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। সেজন্য অনেক ক্ষেত্রেই যক্ষ্মা-রোগী দিনের পর দিন বাড়ীতে বসে থাকে ও অন্যান্যদের মধ্যে রোগটি ছড়ায়। টোটকা, দু'চারটে ওষুধ হয়তো চলে, তারপর যখন হাসপাতালে যায় তখন শেষ অবস্থা এবং ইতি-মধ্যেই সে নতুন যক্ষ্মারোগীও বেশ কয়েকটি তৈরী করে দিয়েছে। অবশ্য হাসপাতালে গিয়েও বিশেষ কোন লাভ নেই। প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যদিও-বা সম্ভব, ঝামেলা থেকেই যায়—কারণ যক্ষ্মারোগের প্রয়োজনীয় ওষুধের 'সাপ্লাই' নেই। আসলে ব্যাপারটা অনেক গভীরে। সেটি হল ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৬৩ ভাগ লোক গড়ে ৭৫ পয়সাও খরচ করতে পারে না। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতে অপুষ্টিতে যাঁরা ভুগছেন, তাঁদের সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার প্রায় ২ গুণ।

তাই যক্ষ্মারোগকে দূর করতে হলে, এই ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যকে দূর করা প্রয়োজন সবার আগে।

যক্ষ্মার মতো কুষ্ঠরোগও আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। ৩ মিলিয়নেরও অধিক মানুষ আজ এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত, এবং যক্ষ্মার মতো কুষ্ঠরোগেরও প্রধান কারণ খাদ্যাভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অজ্ঞতা ও প্রাথমিক চিকিৎসার অভাব।

আমাদের দেশে যারা দৃষ্টিশক্তিহীন তাদের এক-তৃতীয়াংশের অন্ধত্বের কারণ অপুষ্টি। অপুষ্টিগত রোগের কারণ যে চূড়ান্ত দারিদ্র্য তা বলাই বাহুল্য।

পুষ্টির অভাবে আমাদের দেশে প্রতি মাসে ৮৫,০০০ অন্তঃসত্ত্বা মহিলা মারা যান। এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মেয়েদের শতকরা ৭০ ভাগই রক্তাল্পতায় ভোগে। দেশের সবচেয়ে গরীব যারা তারা দৈনিক ৯৪০ ক্যালোরি মানের খাদ্যও পায় না। অপরদিকে সবচেয়ে অবস্থাপন্ন ৫% লোক দিনে ৩১৫০ ক্যালোরি মানের খাদ্য ভোগ করে।

পানীয় জলের অভাব

আমাদের দেশের একটি প্রধান সমস্যা পানীয় জল। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবের জন্যই প্রচুর মানুষ নানাপ্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। তাই আসুন, আমাদের দেশের বিশুদ্ধ পানীয় জলের অবস্থাটা একটু দেখতে চেষ্টা করি।

কবীন্দ্র দেশমুখ্য

আমাদের দেশে ৭৫% অধিবাসীর কাছে "বিশুদ্ধ পানীয় জল" স্বপ্নবিলাস মাত্র। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৫০ থেকে ৬০ শতাংশের ক্ষেত্রে রোগের কারণ দূষিত জলের ব্যবহার, এছাড়াও, প্রতি মাসে যে এক লক্ষ শিশু মারা যায়, তাদের অধিকাংশের মৃত্যুর কারণ জল-সংক্রান্ত ব্যাধি।

১৯৭২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারত-বর্ষের ৫,৫০,০০০ গ্রামের মধ্যে ১,৫২,৬০০টি গ্রামকে "প্রবলেম ভিলেজ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। "প্রবলেম ভিলেজ" বা "সমস্যাপীড়িত গ্রাম"—এই সংজ্ঞাটি সেই সমস্ত গ্রামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক রোগ প্রতিবারে মহামারীরূপে দেখা দেয়; যেখানে ১·৬ কি.মি. ব্যাসার্ধের মধ্যে মাটির ১৫ মিটারের নিচে পর্যন্ত জলের সন্ধান পাওয়া যায় না। দূষিত জলের ব্যবহারের জন্য Cholera, Typhoid, Gastro-enteritis এবং জীবাণু সংক্রমণজনিত বিভিন্ন liver disease-এ প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে ১½ মিলিয়ন লোক।

কলকারখানা এবং শ্রমিক-স্বাস্থ্য

অবৈজ্ঞানিক পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা এবং শ্রমিক-দের প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও সুস্থ পরিবেশের অভাবের জন্য Silicosis, Bysinosis জাতীয় রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার কারখানা ও খনি শ্রমিক মৃত্যুর দিন গুনছে। এর সংখ্যা ১৯৫০ সালে ছিল ১০% কিন্তু বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭%-এ।

স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়

মুদালিয়ার কমিশনের ২০ বছর আগেকার রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক বাজেটের অন্তত ১০ শতাংশ বরাদ্দ হওয়া উচিত স্বাস্থ্য-খাতে, কিন্তু, প্রকৃত বরাদ্দ হলঃ—

পরিকল্পনা ১ : ৩·৩%
„ ২ : ৩·০%
„ ৩ : ২·৬%
„ ৪ : ২·১%
„ ৫ : ১·৭%
„ ৬ : ১·৯% (প্রস্তাবিত)

যে কোন দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা কর্মসূচীর বাস্তব সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন দেশের সরকারের এ ব্যাপারে অনুকূল ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ যা হওয়া উচিত তার তুলনায় অনেক কম। লক্ষণীয়, (স্বাস্থ্যরক্ষা যেহেতু কোন উৎপাদনশীল প্রকল্প নয়) কেন্দ্রীয় বাজেট কিভাবে এই খাতে কমছে। শুধু তাই নয়, "More than 50% of the health budget is spent for maintainance and construction of buildings; 20% in salary of the staff and out of the remaining 25-30%, big and teaching hospitals eat up the lions share. A very poor portion remains to serve the need of common people."

(National policy to Health Care Delivery: Dr. G. P. Dutta)

অথচ অন্যান্য খাতে ব্যয়

(১) লোকসভায় তথ্য ও প্রচার মন্ত্রীর ঘোষণাঃ—রঙীন টিভির জন্য চারটি প্রচারযান ও যন্ত্রপাতির জন্য মোট খরচ পড়বে ৫৭০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি।

(২) রাজপুত্র চার্লসের বিয়ে উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির লন্ডন সফরের জন্য খরচ হয়েছে কমসম করেও ৫০ লক্ষ টাকা।

(৩) এই দেশেই এশিয়াড '৮২-র প্রস্তুতিকল্পে আনুমানিক ৭০০ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে।

(৪) আমাদের দেশের বাজেটে প্রতিরক্ষাবাবদ খরচ ধরা হয়েছে ৪,২০০ কোটি টাকা। অথচ আমাদের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি নাইরোবিতে ঘোষণা করেছেন—যুদ্ধবিহীন পৃথিবীই ভারতের লক্ষ্য।

(৫) অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থান—ভারতের কোটি কোটি জনগণের এই তিন মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে যে সরকার শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন গত ৩৪ বছরে, সেই সরকারই ১০ বছর মেয়াদী মহাকাশ-গবেষণা কর্মসূচীতে ৮৫৪ কোটি টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ১৯৮০-৮১ সালে সামরিকখাতে ব্যয়বরাদ্দ হয়েছিল ৩৮০০ কোটি টাকা, এ বছর (৮১-৮২) তা বেড়ে হয়েছে ৪২০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ শুধু এক বছরেই বেড়েছে ৪০০ কোটি টাকা।

স্বাস্থ্য ও পুলিশ-মিলিটারী খাতে ব্যয়ের তুলনা-মূলক হিসেব

কাল	জনস্বাস্থ্য (কোটি টাকায়)	পুলিশ-মিলিটারী (কোটি টাকায়) ব্যয়বরাদ্দ	পুলিশ-মিলিটারী খাতে ব্যয় জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের কত-গুণ বেশী
৩য় পরিকল্পনা	২২৫·৯	৩২৯৩·১	১৪·৬
বার্ষিক "	১৪০·১	২৯১০·২	২০·৮
৪র্থ "	৪২৩·৫	৭২৩০·২	১৭·১
৫ম "	৬৮১·৬	৯৯৫১·০	১৪·৬
'৬১-৭৮ মোট	১৪৭১·১	২৩৩৮৪·৫	১৫·৯

অর্থাৎ, '৬১-'৭৮ এই পর্বে পুলিশ-মিলিটারী খাতে ব্যয় হয়েছে জনস্বাস্থ্য খাতের প্রায় ১৬ গুণ বেশী।

শুধু পুলিশ-মিলিটারী নয়, আমলাদের সাদা-আমলাতন্ত্র হাতীকে পুষতে খরচ হয় কোটি কোটি টাকা। বিভিন্ন মন্ত্রী ও আমলাদের মাইনে ও অন্যান্য হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, যে কোন পার্লামেন্টের অধিবেশনে প্রতি মিনিটে খরচ হয় ৯৫০ টাকা।

শিশুশ্রম এবং শিশুস্বাস্থ্য

কিছুদিন আগেই সারা পৃথিবী জুড়ে মহা-সমারোহে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ পালিত হয়ে গেল। আমরা দেখলাম শিশুদের জন্য নানারকমের সুন্দর সুন্দর বই, শিশুদের নিয়ে নাটক করার ধুম, শুনলাম আমাদের বিভিন্ন নেতাদের গদ্-গদ্‌কণ্ঠে মধুরভাবে বলতে,—'শিশুরা ফুলের মতো', 'শিশুরাই তো জাতির ভবিষ্যৎ' ইত্যাদি ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ আমাদের সামনে একটা প্রশ্ন রেখে গেছে—এত সমস্ত সমারোহ কোন্ শিশুদের ঘিরে? যেখানে আমরা জানি—

ফুলেদের কথা পাখীদের কথা
ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী আর তেপান্তরের মাঠ-
তোর পৃথিবী এমন নয়,
এমন নয়
হাত বাড়ালেই মিলবে অন্ন
পা বাড়ালেই মিলবে ইস্কুল......খেলার মাঠ......
তোর স্বদেশ এমন পোড়া দেশ—
একটি শিশু জন্মালে
তার জন্য খোলা ফুটপাত
তার মাথার উপর উলঙ্গ আকাশ......

বাবা-মায়ের কাছ থেকে যাদের একমাত্র উত্তরাধিকার দারিদ্র্য, অপুষ্টি যাদের গ্রাস, শিক্ষা যাদের স্বপ্ন, আর উদয়াস্ত শ্রম যাদের কাছে নিয়ম, তারা সমগ্র সমাজের বুভুক্ষা ও অনগ্রসরতার মূক কিন্তু মুখর দর্পণ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত-প্রান্তরে যে সমস্ত অবহেলিত, নিষ্পেষিত শিশু প্রতি-নিয়তই পাথরে মাথা কুটে মরছে, আসুন আমরা তাদের কাছে যাই। আসুন আমরা তাদের কাছে যাই, যাদের জানার দুর্ভাগ্য হয়নি যে, তাদেরই নিয়ে এক নিষ্ঠুর, নির্দয়, প্রহসন করা হয়েছিল —যার নাম "আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ।" সেই আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষেই পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে এক কোটি কুড়ি লক্ষ শিশু—অপুষ্টিতে শীর্ণকায় হয়ে, রোগে ভুগে আর দূষিত পরিবেশের শিকার হয়ে।

(১) আমাদের দেশে ছ'বছরের কম বয়সী সাড়ে এগারো কোটি শিশুদের মধ্যে কমপক্ষে প্রায় পাঁচ কোটি শিশু দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে।

(২) ভারতে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে একশ উনচল্লিশ।

(৩) ১ থেকে ৫ বছরের শিশুদের দৈনিক ১৩৫০ ক্যালোরিযুক্ত খাবার দরকার। কিন্তু ভারতবর্ষের এই বয়সের ৯৩% শিশুই পেয়ে থাকে গড়ে মাত্র ৬৫০ ক্যালোরিযুক্ত খাবার।

(৪) প্রতি বছর পঞ্চাশ লক্ষ শিশু জীবাণুপূর্ণ দূষিত জল পান করে পেটের বিভিন্ন অসুখে প্রাণ হারায়। অথচ, ধনী দেশগুলোর টাকায় ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলির কোন কোন এলাকা ঝকঝকে হয়ে ওঠে। রাতা-রাতি গজিয়ে ওঠে স্কাইস্ক্রেপার, পাঁচতারা হোটেল, বসে ফ্যাসিনোর আসর, গড়ে ওঠে বার আর সুপার মার্কেট। আমলা মন্ত্রী আর বহুজাতিক কোম্পানীর এক্সিকিউটিভরা জমকালো পোষাক পরে বাঁকানো ঠোঁটে ইংরাজী কিংবা ফরাসীর তুবড়ি ছোটাতে ছোটাতে বিমানে সারা বিশ্ব চষে বেড়ান।

(৫) সর্বমোট, ভারতে বর্তমানে ৬০০ লক্ষ শিশু অপুষ্ট। প্রতি মাসে ১ লক্ষ শিশু অপুষ্টি-জনিত কারণে মারা যায় এবং প্রায় ১২-১৪ হাজার শিশু 'ভিটামিন এ'-র অভাবে শৈশবে অন্ধ হয়ে যায়।

[Statesman, 31 December, '78]

"The most important factors responsible for blindness in childhood are malnutrition, particularly Vit. A deficiency. Small pox, ophthalmia neonatorum and sore eyes due to bad hygiene. Vit. A deficiency is a dietarn defect and is the index of backward economy of a country.

School Health Service in proper line can do useful work in prevention of blindness. Timely eye examination can save many eyes before being blind."

[BETA, December, 1980]

কিন্তু যেদেশে, অধিকাংশ শিশুই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, সেই দেশে "School Health Service" অলীক কল্পনা মাত্র।

শিশুমৃত্যু নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের ইউনিসেফের সমীক্ষার উত্তর—"তৃতীয় বিশ্বের সরকারী বাজেটে সবচেয়ে উপেক্ষিত বিষয় হল জনস্বাস্থ্য। উন্নত দেশে সরকার স্বাস্থ্যখাতে যা ব্যয় করে, উন্নতি-শীল দেশগুলি ব্যয় করে তার একশ ভাগের এক ভাগ। আফ্রিকা ও এশিয়াতে মাথাপিছু স্বাস্থ্য-খাতে সরকারী ও বেসরকারী ব্যয় এখনও বছরে মাত্র ৪০ টাকা।"

শিশুকে পরিপুষ্ট হতে হলে অন্তত ছয় মাস পর্যন্ত তাকে পূর্ণমাত্রায় মাতৃদুগ্ধ পান করতে হবে। কিন্তু ভারতের মতো দরিদ্র দেশের শীর্ণ-জননীর স্তনদুগ্ধই যায় শুকিয়ে। প্রতি বছর অন্তত দশ লক্ষ মাতৃহারা শিশুর আর্তনাদে তৃতীয় বিশ্বের আকাশ-বাতাস ভরে ওঠে।

শিশুশ্রম

ভারতের সংবিধানের ১৪ নং ধারা শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করার কথা বলে না, ফলে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা হচ্ছে, যদিও এটা উচিত নয়।

ভারতীয় শিশুর একটা বড় অংশের পরিচয়—তারা শ্রমিক, কারণ তাদের গতর খাটানো টাকা নিঃসম্বল পরিবারের একটি আশা। ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থার সিংহভাগটাই দখল করে আছে মান্ধাতার আমলের এবং অনুন্নত যন্ত্রপাতি। উন্নত যন্ত্রপাতি আর আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার যেখানে প্রয়োজন নেই, সেখানে অদক্ষ নারী কিংবা শিশু শ্রমিক দিয়ে খুব সহজেই কাজ চালানো যায়। আর সেটা বেশ সুবিধাজনক। কারণ তাদের শ্রম-শক্তির দামও সস্তা।

ভারতবর্ষ শিশুশ্রমের ব্যাপারে অন্যান্য দেশের তুলনায় লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে।

(১) ভারতে শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা বিশ্বে সর্বাধিক, প্রায় ১·৬৫ কোটি।

(২) ১৯৭১ সালের এক হিসেব অনুযায়ী, ভারতে শিল্পে, কৃষিতে এবং হস্তশিল্পে নিযুক্ত শিশুদের সংখ্যা ৮০ লক্ষ।

(৩) এদের প্রায় ৮০% কাজ করে কৃষিতে—যেখানে শিশু নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের নিম্ন সীমারেখা বেঁধে দেওয়ার কোন আইন নেই।

(৪) সমীক্ষায় জানা গেছে, যেসব পরিবারের মাসিক আয় ৩০০ টাকার কম, সেসব পরি-বারের মাসিক আয়ের ৩০% পর্যন্ত উপার্জিত হয় শিশুশ্রম দ্বারা।

(৫) মধ্যপ্রদেশের 'শ্লেট-পেনসিল' তৈরীর কার-খানায় শিশু-শ্রমিকদের দুঃসহ অবস্থার কথা মনে হয় কারো অজানা নয়। এই কারখানায় শিশুশ্রমিকসহ প্রত্যেক শ্রমিকের পুষ্টি ও সুস্থ পরিবেশের প্রচণ্ড অভাব।

"The slate-pencil factories of Mandsaur, in Madhya Pradesh, are torture and death chambers. Children are driven by poverty to do this work, where they will swallow dust which will kill them, where their fingers will be cut to the bone. Few will survive beyond 40. No one will grow old, except the factory owners: who will grow old and rich.

The slate-pencil industry is based in two brutal assumptions: that human life is cheaper than dust and the worker's health is unimportant compared to the owner's wealth."

[Sunday, 14 December, '80]

এইভাবে, প্রচণ্ড শ্রম এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে ভারতবর্ষে হাজার হাজার শিশু অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ভারতীয় ঔষধশিল্পে বহুজাতিক সংস্থাগুলির একাধিপত্য

বর্তমানে নানাজাতীয় অত্যাবশ্যক জিনিসের দাম বাড়ার সাথে সাথে ওষুধের দামও বেড়েই চলেছে এবং এর সাথে সাথে আমাদের মতো দরিদ্র দেশের জনগণ ক্রমশঃই চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কারণ এই আকাশ-ছোঁয়া মূল্য দিয়ে ওষুধ কেনার সামর্থ্য আমাদের অধিকাংশ ভারতবাসীরই নেই। যে শতকরা ২০ ভাগ মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পায়, তাদের কথা ছেড়ে দিলে, যাদের ওষুধ কেনার বিন্দুমাত্র সামর্থ্য নেই সেই শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ গিয়ে ভীড় জমায় শহরাঞ্চলের হাসপাতালগুলিতে যেখানে প্রতি ভারতবাসীর জন্য বাৎসরিক ২০ পয়সার ওষুধের সুবন্দোবস্ত আছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়—ক্রমাগত ওষুধের এত দাম বাড়ছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের একবার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দিকে তাকাতে হবে, যারা ভারতবর্ষসহ তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজেদের জাল বিস্তার করে রেখেছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষে ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানীর সংখ্যা প্রায় ২৩০০টি। এদের মধ্যে হেক্সট, ফাইজার, গ্ল্যাক্সো, পার্ক ডেভিস, সিবা-গিগি, স্যান্ডোজ, মে' এন্ড বেকার ইত্যাদির মতো মাত্র ৭০টি অতিকায় বহুজাতিক সংস্থা ভারতীয় বাজারের শতকরা ৭০ ভাগ ওষুধ উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যান্য ছোট ছোট ওষুধ কোম্পানীগুলো এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। এ ব্যাপারে সরকারী বৈষম্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করার মতো। লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে, কাঁচামাল সরবরাহের ব্যাপারে সরকার থেকে দেশী কোম্পানীগুলোর ওপর বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় যার ফলে দেশী কোম্পানী-গুলো ক্রমাগত সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। যেমন, দুষ্প্রাপ্য জীবনদায়ী ওষুধের সঙ্গে এমন কতক-গুলি ওষুধের লাইসেন্স বহুজাতিক সংস্থা-গুলিকে দেওয়া হয়, যেগুলি আমাদের দেশী কোম্পানীগুলো অনায়াসেই তৈরী করতে পারে। এইভাবে আমাদের এই অনুন্নত কারিগরীবিদ্যার সুযোগ নিচ্ছে বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো।

এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসমচুক্তি ও সরকারী বৈষম্যের ফলে দেশী কোম্পানীগুলোর অবস্থা দিন দিন করুণ হয়ে উঠছে। "ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মা-সিউটিক্যালস্" পরিবেশের সঙ্গে খানিকটা মানিয়ে নিলেও "বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যালস্ ওয়ার্কস লিমিটেড", "বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী লিমিটেড", "গ্লুকোনেট লিমিটেড" প্রভৃতি দেশীয় কোম্পানীগুলো শোচনীয়ভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

"In production of essential drugs the role of the multinationals are almost insignificant, but they are very enthusiastic in the manufacture of the household remedies such as alcohol-based tonics, vitamins, baby food etc. The real intention of the drug companies is to produce a consumer society, where drugs will be manufactured not only on what the people actually need, but what they want to sell.

For this they are launching a highly sophisticated propaganda machinery with well-suited, well-versed middle man, fictitious literature, advertisement and baseless research papers. A sizeable section of the medical community has been influenced by them with physicians sample and other facilities. They are quite successful in this regard. In India a worker is found to spend a portion of his meagre salary in purchasing tonics without any proper indication and a poor mother is providing her under nurished baby with baby food instead of mothers milk or easily available low cost substitutes.

[Health and Society, 2 Aug., 1980]

মুনাফার জন্য মানুষের জীবন নিয়ে ছিনি-মিনি খেলতেও এই ওষুধ কোম্পানীগুলো কুণ্ঠিত হয় না। ওষুধের মান অনুন্নত করা এর একটি চরম নিদর্শন। ১৯৭৭ সালে উত্তরপ্রদেশের কানপুর ও অন্যান্য জায়গায় তৈরী ভেজাল গ্লুকোজ গ্রহণের ফলে ৪০ জন প্রাণ হারান। উন্নত দেশগুলিতে যে সমস্ত ওষুধ 'নিষিদ্ধ' বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলি সগৌরবে বিক্রি হতে থাকে ভারতের মতো অনুন্নত দেশের বাজারে। ফলে রোগীদের রোগ নিরাময় তো দূরে থাক, বরঞ্চ আরও বেশী করে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এই পৃষ্ঠার একেবারে নীচের ছকটি থেকে এই সমস্ত বহুজাতিক সংস্থাগুলোর মুনাফার অঙ্ক লক্ষণীয়:—

দরিদ্র দেশের মানুষ যখন "গিনিপিগ"

দরিদ্র দেশের জনগণকে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করার ঘটনা আজ নতুন নয়, বহুদিন থেকেই শুরু হয়েছে। আমরা জানি, হিটলারের আমলে লক্ষ লক্ষ ইহুদী ও গণতান্ত্রিক মানুষ কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে বিষাক্ত গ্যাস, গুলি ও টাইফাস রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছিলেন। এই মৃত্যুপথযাত্রীদের নিয়ে এক-শ্রেণীর চিকিৎসা-বিজ্ঞানী তখন যথেচ্ছ 'গবেষণা' চালানোর এক অভূতপূর্ব সুযোগ লাভ করেন। ইতিহাসে এই ধরনের বিকৃতকামী গবেষকদের বারংবার আবির্ভাব ঘটেছে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পাশ্চাত্যের বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলো সেই দেশে অপ্রচলিত বা বিপজ্জনক বলে নিষিদ্ধ অনেক ওষুধের ফলাও কারবার করে থাকে। কারণ এই কোম্পানীগুলো জানে,—

(১) এইসব অনুন্নত অনেক দেশেই যথোপযুক্ত ভেষজ আইন নেই।

(২) আইন থাকলেও, প্রশাসনের অপদার্থতায় তা কার্যকর হয় না কিংবা প্রশাসন যন্ত্রকে অর্থের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করা যায়।

(৩) এইসব দেশে চিকিৎসক, গবেষক, অধ্যাপক ইত্যাদি শ্রেণীতে কিছুসংখ্যক বিবেকহীন জীব আছে। শিক্ষাবৃত্তি, গবেষণার অনুদান, বিদেশভ্রমণ ইত্যাদি যৎসামান্য উপঢৌকনের

Name of the firm	Original equity	Present paid up Capital *In Lakhs of Rs.*	Revenues	Remittance send abroad
Glaxo Laboratories	1.50	540.00	758.00	98.7
Bayer (India) Ltd.	4.00	300.00	172.345	41.37
Ciba (India) Ltd.	3.00	487.50	316.87	48.21
Cynamid (India) Ltd.	1.502	70.146	45.595	35.65
Pfizer Ltd.	2.00	558.28	420.00	68.23

Source: Multinationals in Drugs and Pharmaceuticals Industry; By—J. S. Mazumdar.

বিনিময়ে তাদের দিয়ে অনেক কিছুই করিয়ে নেওয়া যায়।

এবং এইসব দেশে নিরক্ষর লক্ষ কোটি লোকের বাস, যাদের গিনিপিগের মতো ব্যবহার করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহজেই চালানো যায়।

"গিনিপিগ" যখন হাসপা রোগীরা

দিল্লীর অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব্ মেডিকেল সায়েন্স (A.I.I.M.S.) হাসপাতালের গবেষক-চিকিৎসকদের এম. ডি. ও এম. এস. ডিগ্রীর গবেষণার জন্য ওই হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের না জানিয়ে তাঁদের উপর নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এগুলির মধ্যে কয়েকটির ফল রোগীদের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে বলে জানা গেছে, আর কয়েকটির ফলাফল সম্পর্কে চিকিৎসকদের নির্দিষ্ট কিছুই জানা নেই। হেপাটিক অ্যামিবিয়াসিস (Hepatic amaebiasis)-এর রোগীদের উপর এমন তিনটি নতুন নতুন ওষুধের ফল দেখা হচ্ছে, যার মধ্যে অন্তত একটির ব্যবহার অন্যান্য বিভিন্ন দেশে নিষিদ্ধ হয়েছে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার জন্য। শিশু বিভাগের চিকিৎসকদের নেওয়া একটি 'গবেষণা' বিভাগে উদরাময়ে আক্রান্ত শিশুদের কিড্নীর biopsy নেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছে। ইতিমধ্যে আর একটি প্রকল্পে anthritis- এর রোগীদের কিড্নীর biopsy করা হচ্ছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, কিড্নীর biopsy ক্ষেত্রবিশেষে রোগীদের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। একটি বড় ওষুধ কোম্পানীর প্ররোচনায় viral hepatitis--এর রোগীদের উপর সম্পূর্ণ নতুন একটি ওষুধের ফল পরীক্ষা করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, ওষুধটি ব্যর্থ হলে তার ফল ভোগ করতে হবে রোগীদেরকে, আর সফল হলে ওই রোগীরা সুস্থ হবেন ঠিকই, তবে তার সঙ্গে কোম্পানীটি চড়া দামে বাজারে ওষুধটি ছেড়ে বিরাট মুনাফা অর্জন করতে থাকবে—দেশের জনসাধারণের উপর ওষুধ কোম্পানীগুলো যে শোষণ চালাচ্ছে তা আরো কিছুটা তীব্র হবে।

[সূত্রঃ ইকনমিক টাইম্স্, ৬-৫-৮০]

"গিনিপিগ" যখন এই কলকাতারই বেলেঘাটা-মানিকতলা অঞ্চলের কিছু বস্তিবাসী

ঘটনাস্থল উত্তর-পূর্ব কলকাতার বস্তিসমূহ এবং তাদের সংলগ্ন নিম্নবিত্ত অঞ্চলগুলো। ঘটনার কাল ১৯৭৪-৭৬ সাল। যেসব ব্যক্তিরা এই অপ-কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন, ইনডিয়ান কাউন্সিল অফ্ মেডিকেল রিসারচের কলকাতাস্থ সংস্থা কলেরা রিসার্চ সেন্টারের সর্বোচ্চ পদাধিকারী কতিপয় বিজ্ঞানী। এ'রা এই সময়ে এই অঞ্চলের মানুষদের উপর দুটো পরীক্ষা চালিয়েছেন, যা অমানবিক, চিকিৎসাশাস্ত্রের নীতির বিরোধী এবং দেশের প্রচলিত আইনেরও পরিপন্থী। ১৯৭৪ সালে এই বিজ্ঞানীরা 'ফ্যানাসিল' (Fanasil) নামে একটি দীর্ঘ কার্য-কালবিশিষ্ট সালফাজাতীয় ওষুধ বেলেঘাটা-মানিকতলা অঞ্চলের নিম্নবিত্ত মানুষের উপর প্রয়োগ করেন। 'ফ্যানাসিল' পৃথিবীর কোন দেশেই pharmacology-তে উল্লিখিত বিধিবদ্ধ ওষুধ হিসেবে স্বীকৃত নয়। ভারতীয় pharmacology- তে ফ্যানাসিলের উল্লেখ নেই এবং ওষুধটি ভারতে সহজলভ্যও নয়। জানা গেছে, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ মেডিকেল রিসার্চ অথবা তার কলকাতাস্থ সংস্থাটি 'ফ্যানাসিল' বে-আইনীভাবে ভারতে আমদানী করেছে। কলকাতায় আসার আগে 'ফ্যানাসিল' মরক্কোতেও জনগণের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। 'ফ্যানাসিল' সম্পর্কে W.H.O -এর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য—

"The sulphonamide in question had been used as a prophylactic against cerebro-spinal meningitis in Morocco and the drug associated mortality was approximately 120 per million. Several of the victims were small children ...... it would have been useful to have additional information on the average incidence of sulphonamide induced mortality."

১৯৬৪ সালে হেলসিংকি এবং ১৯৭৫ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত চিকিৎসকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ওষুধ পরীক্ষা সম্পর্কে কতকগুলো রীতি-নীতি তৈরী করা হয়েছিল, যা 'হেলসিংকি-ঘোষণা' নামে পরিচিত। 'হেলসিংকি ঘোষণা'র একটি প্রধান নীতি হল,—কোন ব্যক্তির দেহে কোন পরীক্ষামূলক ওষুধ প্রয়োগের আগে তাকে এই বিষয়ের ভালমন্দ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে তার সহযোগিতা চাওয়া হবে এবং তিনি ওষুধ গ্রহণে সম্মত থাকলে তার সম্মতি লিখিতভাবে সংগ্রহ করতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে বৈধ অভিভাবক লিখিত সম্মতি দেবেন।

কিন্তু ১৯৭৪ সালে বেলেঘাটা-মানিকতলা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় 'হেলসিংকি-ঘোষণা'র নীতি মানা হয় নি। শুধু তাই-ই নয়, এই 'হেলসিংকি-ঘোষণা'কে উপেক্ষা করে ১৯৭৫-৭৬ সালে বেলেঘাটা-মানিকতলা অঞ্চলে আবার নতুন ধরনের এক অপ-প্রচেষ্টা চালানো হয়। এই পরীক্ষায়, একটি নতুন ধরনের কলেরা ভ্যাকসিন লক্ষাধিক লোকের উপর প্রয়োগ করা হয়। তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক শিশুও ছিল।

বেলেঘাটা-মানিকতলায় ১৯৭৫-৭৬ সালে প্রযুক্ত নতুন ভ্যাকসিনটি যথোপযুক্তভাবে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয় নি। মানবদেহে প্রয়োগের আগে যে কোন ওষুধের জীবদেহে প্রার্থিত কার্যকারিতা ও প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি পরীক্ষার যে পূর্বশর্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানে ন্যূনতম করণীয়, সে-সব করেছেন বলেও কোন তথ্যাদি এই পরীক্ষার হোতারা বিজ্ঞানীদের (কোন বিজ্ঞান সম্মেলন বা বিজ্ঞান পত্রিকা মারফৎ) সামনে রাখেন নি। এই রীতি যদিও অবশ্যপালনীয়। "জানা যায়, এক ব্যক্তি ভ্যাকসিন প্রয়োগের পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু ঘটে। অনেকের হাত বা পা ফুলে ওঠে। অনেক চৈতন্যলোপের ঘটনাও জানা গেছে।"

(The Statesman, September 13, 1978)

১৯৭৪-৭৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই দুটি অপ-পরীক্ষা, যা মানবতার বিরুদ্ধে এক ঘৃণ্য অপরাধ, কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির যুগ যুগ ধরে দরিদ্র দেশগুলোর নিরক্ষর জনগণের উপর নির্মম অত্যাচারের এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

উপরের আলোচনাগলো থেকে একটি জিনিসই বেরিয়ে আসে, স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই সমস্যার মূল ধরে টান মারতে হবে, গড়ে তুলতে হবে গণমুখী স্বাস্থ্যব্যবস্থা, করতে হবে সমাজের আমূল পরিবর্তন। এবং সঠিক স্বাস্থ্য-নীতি ও স্বাস্থ্যদাবীর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জন-মুখী আন্দোলনই পারে সঠিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বনিয়াদের উপর একটি সম্পূর্ণ ও কার্যকরী স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটাতে। তার জন্য এখন থেকেই প্রয়োজন প্রস্তুতির—একই সাথে ভাঙ্গার ও গড়ার।

তথ্যসূত্র :

Health and Society
BETA
Sunday
ইকনমিক টাইমস্
পরিবর্তন
রূপান্তর
অংকুরে শুরু
নিশান
আনুগ্য
আনন্দবাজার পত্রিকা
উৎস মানুষ
বিজ্ঞান বিচিত্রা
জ্ঞান ও বিজ্ঞান
এবং
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী।

প্রচার মাধ্যমগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা

বেতার ও দূরদর্শন আজকের দিনে ভীষণ শক্তিশালী গণমাধ্যম। যে কোন গণতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রেই এই মাধ্যমগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। আর আমাদের মত অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের ভারে জর্জরিত একটি দেশে তো এই মাধ্যমগুলি আরও বেশী কার্যকরী। রেডিও এখন একটু স্বচ্ছল পরিবারেরই অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। দূরদর্শন অবশ্য এখনও সীমাবদ্ধ পরিসরে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ-হেন একটি গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম ক্রমাগত অসত্য প্রচার করে চলেছে। কোন সভ্য গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে এর চেয়ে ক্ষতিকর আর কি হতে পারে?

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রচারযন্ত্র সব সময়ই শাসকশ্রেণীর পক্ষে এবং শোষিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র, সাহিত্যপত্র, চলচ্চিত্র, শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি সব কিছুই সাধারণত শাসকশ্রেণীর নেপথ্য অঙ্গুলি নির্দেশে পরিচালিত হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে বুর্জোয়া সমাজের রক্ষকরা যতই চিৎকার করুক না কেন, বাস্তবে তার অস্তিত্ব বিশেষ থাকে না।

সাধারণ চোখে অবশ্য প্রচার মাধ্যমগুলির এই নিদারুন পরাধীনতা ধরা পড়ে না। অরাজনৈতিক মানুষ ভাবেন বেতারে তো সব দলের কথাই প্রচার করা হয়, সংবাদপত্রের সমস্ত মতেরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, হিকি সাহেব সংবাদপত্রের যে আদর্শের কথা বলেছিলেন, সব মতের অবাধ প্রতিবিম্ব কিন্তু কোন মতের দাসত্ব নয় (open to all parties but influenced by none) তার চিত্র তো বিরল নয়। তা হলে এই প্রশ্ন কেন?

বিভ্রান্তি ও সংশয় দূর করার জন্য তাই বারবার সীমাবদ্ধতার চিত্রটি তুলে ধরার প্রয়োজন হয়। বেতার ও দূরদর্শনের পক্ষপাতিত্ব ও শাসক দলস্তুতির অসংখ্য নজির অতীতে তুলে ধরা হয়েছে সংসদে ও সংসদ চৌহদ্দির বাইরে। কিন্তু সরকার পক্ষ বারবার বলেছেন, সব ঝুটা হ্যায়, বেতার ও দূরদর্শন স্বক্ষেত্রে স্বাধীন নিরপেক্ষ ও সব দলের প্রতি সমানভাবে উদার।

বেতার ও দূরদর্শন সংস্থা গণতন্ত্রীকরণের দাবি দীর্ঘদিন ধরে উঠেছে। ভারতের মত বহুভাষা, জাতি ও উপজাতিসমৃদ্ধ বিশাল দেশে বেতার ও দূরদর্শনের গণতান্ত্রিক পরিচালনব্যবস্থা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

নিজ নিজ রাজ্যে বেতার ও দূরদর্শনে কোন্ বিষয়গুলি প্রাধান্য পাবে, প্রচারের ধারা কি হবে, রাজ্যের সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণে কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার, তা বলার অধিকার রাজ্য সরকারগুলির নেই: বস্তুতঃ রাজ্যে অবস্থিত বেতার কেন্দ্রগুলির ব্যাপারে কোন ভূমিকাই নেই রাজ্য সরকারের অথচ রাজ্যের সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সমস্ত দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত।

ভারতে প্রায় ২২০ রকমের ভাষা ও উপভাষা আছে। রাজ্যে রাজ্যে আছে ভিন্ন ধরনের আচার-আচরণ, আশা-আকাংখা তথা সংস্কৃতি। ভিন্ন ভাষা ভিন্ন সংস্কৃতি ও বিশাল ভূখণ্ড একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভারত। নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের পথ সংকুচিত হলে জাতীয় ঐক্যও বিপন্ন হতে বাধ্য। ভারত জুড়ে যে অনৈক্য ও সংহতিহীনতার সংকট বর্তমানে প্রকট তাতে রাজ্যের জনগণের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের প্রতিফলন সুস্পষ্ট।

জাতীয় সংহতি ও ঐক্য সুদৃঢ় ও প্রসারিত করার ক্ষেত্রে বেতার ও দূরদর্শন খুবই কার্যকর প্রচার মাধ্যম। কিন্তু সেই মাধ্যমই অতি দ্রুত বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলছে।

কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্যমন্ত্রী বসন্ত শাঠে ১৯ জানুয়ারি ভারতব্যাপী শিল্প ধর্মঘটের প্রাক্কালে একটি সারকুলার বা ফতোয়া জারি করেছিলেন

সরল বিশ্বাস

বেতার ও দূরদর্শন কেন্দ্রগুলির উদ্দেশে, যার মূল কথা হল দিনকে রাত করতে হবে আর রাতকে দিন। প্রচার মাধ্যমগুলির বিশ্বাসহীনতা বৃদ্ধি করতে এই ফতোয়া আর একটি উল্লম্ফন। বিশ্বাসহীনতা একদিনে জন্মায় নি। দীর্ঘদিনের অনুসৃত অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক নীতির ফলশ্রুতিতেই মাধ্যমগুলির নিজস্ব বিশ্বাসযোগ্যতা মলিন থেকে মলিনতর হয়েছে।

দু' একটা উদাহরণ আলোচনায় আনলে বিষয়টি আরও পরিস্কার হবে।

অভিজ্ঞতাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। জীবনের দর্পণে যে প্রতিবিম্ব ছায়া ফেলে তাকে প্রচারে ডুবিয়ে দেওয়া যায় না। গোয়েবলাসের তত্ত্ব তৃতীয় দশকেই অচল হয়ে পড়েছিল। এখন তো শতাব্দী শেষ হয়ে এলো। দুঃখজনক হলেও সত্য শাঠে-সাহেবরা এখনও গোয়েবলস হতে চান, ইতিহাসের পাতা উল্টাতে চান না।

বেশীদিন আগের কথা নয়। ১৯৭৪ সাল। দেশব্যাপী প্রায় বিশ লক্ষ রেল শ্রমিকের ঐতিহাসিক ধর্মঘট। সারা ভারতে তুমুল আন্দোলনের ঢেউ। অথচ আকাশবাণী নিয়মিত প্রচার করতে লাগল অবস্থা স্বাভাবিকের চেয়েও স্বাভাবিক। সব ট্রেন চলছে, মালগাড়ি-যাত্রীগাড়ি এমন কি ভ্রমণের বিশেষ গাড়িও চলছে। কোথায় কত হাজার শ্রমিক কাজে ফিরে এসেছেন তার পরিসংখ্যানও ঝরঝর করে সংবাদপাঠক বলছেন।

বাস্তবের সঙ্গে এই প্রচারের বিন্দুমাত্র মিল ছিল কি? রেললাইন গ্রামের পর গ্রাম, মাইলের পর মাইল সংযুক্ত করে রেখেছে। সেখানে চাকা অচল, বহু মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে স্টেশন থেকে ফিরেও এসেছেন। লক্ষ কোটি মানুষের এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। সারা ভারতে একই অভিজ্ঞতা একসঙ্গে হওয়ার সুযোগ কম থাকে, এতে সেই সুযোগ মিলল। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আওয়াজ উঠল 'শ্রীমতী গান্ধীর নয়া খেল্, আকাশবাণী চালায় রেল'।

আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার ভয়ংকর রুদ্ধশ্বাস দিনগুলি প্রচার মাধ্যমগুলির আসল রূপ আরও নগ্ন করে দিয়েছিল। একটানা উনিশ মাস দেশের অভ্যন্তরে যে নিদারুণ উৎপীড়ন ও দানবীয় দমন-দলন চলেছিল তার সিকি শতাংশও বেতারে দূরদর্শনে শুধু প্রচার করা হয় নি তা নয়, সম্পূর্ণ মনগড়া গল্প ক্রমাগত প্রচার করে এই মাধ্যমগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা আরও দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। প্রথমত স্মরণ করা প্রয়োজন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দাবার চাল, বিচ্ছিন্নতাবোধ, সন্ত্রাসবাদ, দেশের অভ্যন্তরে নানা প্রশ্নে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ প্রচারযন্ত্রের দেউলিয়া শঠতা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিকল্প বেতার কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার অবসানের পর রাজনৈতিক জগতে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটল। কংগ্রেসের দীর্ঘ অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে কেন্দ্রে জনতা পার্টি ক্ষমতাসীন হল। জনতা দলের নির্বাচনী কর্মসূচীতে বেতার ও দূরদর্শনের বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য মাধ্যমগুলিকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংস্থায় রূপান্তরিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তৎকালীন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী আদবানী এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করার জন্য কিছু উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু সেই বাগাড়ম্বরপূর্ণ উদ্যোগ আয়োজন শেষ পর্যন্ত আঁতুড়ঘর অতিক্রম করতে পারে নি। তার আগেই জনতা দলের শাসনের অবসান ঘটল।

ক্ষমতায় ফিরে এসে শ্রীমতী গান্ধী স্বয়ংশাসিত প্রচারযন্ত্র করার আয়োজন উদ্যোগে বরফজল ঢেলে দিলেন। বাতিল হয়ে গেল সব প্রচেষ্টা এবং শাসক দলের বিশেষ করে শ্রীমতী গান্ধীর পারিবারিক মাহাত্ম্য কীর্তন করার এক অদ্ভুত শঠতাপূর্ণ তৎপরতা সুরু হল।

লিলিপুটকে কল্পনার দৈত্যের মত দীর্ঘ করে বিস্মিত করার প্রতিযোগিতায় কোন্ কেন্দ্র কতটা সফল তা দেখার জন্য কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রক পরিমাপ যন্ত্র নিয়ে হাজির হলেন। গণতান্ত্রিক রীতিনীতির যে সামান্য অবশিষ্ট এই মাধ্যমগুলির মধ্যে ছিল তা-ও দ্রুত অপসৃত হল।

(শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায়)

ডিরোজিওর কবিতাঃ শ্মশানে ভোরের শব্দ

আকাশ ভট্টাচার্য

পাঠ্য ইতিহাস বইগুলোর দীর্ঘদিনের উপেক্ষার পর হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর আবার নতুন করে মূল্যায়ন শুরু হয়েছে—এটা খুবই আনন্দের বিষয়। তাঁর দেড়শততম জন্মবার্ষিকী পত্রপত্রিকায়, মঞ্চে, চলচ্চিত্রে বেশ ধুমধাম করে পালিত হলেও ডিরোজিওর কবিপরিচিতিটা বাঙালার তরুণ সমাজের কাছে বিশেষ পরিচিত নয়। আমরা ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজের এক কিম্বদন্তী অধ্যাপক, ইয়ং বেঙ্গলের পথপ্রদর্শক এবং বাংলার নবজাগরণের এক অন্যতম স্তম্ভ বলেই জানি। কিন্তু তাঁর কবি-প্রতিভার বিশ্লেষণ করলে এই অকালপ্রয়াত কবির প্রতি আমরা সেরকমই মর্মবেদনা অনুভব করব যেমনটি করি কবি সুকান্তর জন্য।

ডিরোজিওর রচনা সবই ইংরেজীতে। মাত্র তের বছর বয়সে ডিরোজিওর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তিনি যখন নিয়মিত 'ইন্ডিয়া গেজেটে' কবিতা লেখা শুরু করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বছর। ১৮২৭ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮২৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর খ্যাতনামা কাব্য 'দি ফকির অফ জঙ্গীরা'। আর তার মাত্র তিন বছর পর ১৮৩১ সালে এই কিম্বদন্তী পুরুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই হল কবি ডিরোজিওর অতি স্বল্প জীবনের খুব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সমসাময়িক কালকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব ইউরোপের অবাধ বাণিজ্যনীতি (অথবা অন্য ভাষায় শিল্প পুঁজিবাদের অগ্রসর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি) তখন আঘাত করেছে ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রকে। এখানে মনে রাখা দরকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে এসে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রকে নির্মম আঘাত করে একদিকে যেমন রেলপথ বসিয়েছিল তেমনি অন্যদিকে তার বাণিজ্যিক স্বার্থে নতুন জমিদারী ব্যবস্থা ও তার শাখা-প্রশাখার জট পাকিয়ে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে জঘন্য এক মিতালীও ফেঁদেছিল। সাহিত্যের বেশীর ভাগটাই তখন ছিল ধর্মীয় প্রভাবযুক্ত। তাই ইয়ংবেঙ্গলের যোগ্য সেনাপতি হিসাবে ডিরোজিওর স্বল্পজীবনটুকু ব্যয়িত হয়েছিল পশ্চাৎপদ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের উপর দাঁড়িয়ে মানবিক মূল্যবোধের উপযুক্ত পটভূমি তৈরী করতে। মাও সে তুং তার 'On Art and Literature' গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন— 'A given culture is the ideological reflection of the politics and economy of a given society' আর সমগ্র শিল্পের একটা component হিসাবে কবিতাতো শুধু '...a productive economic activity of man'* এভাবেই পশ্চাৎপদ ভারতবর্ষের বুকে রেনেশাঁর ঝড় চলছিল, তারই একফালি উত্তাল মেঘ বলা যায় ডিরোজিওর কবিতাকে। যে কোন রেনেশাঁই চারটি অমূল্য মানবিক মূল্যবোধ বয়ে আনে। সেগুলো হল (১) মানুষ ও মনুষ্যত্বের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, (২) স্বদেশপ্রেম, (৩) নারী-স্বাতন্ত্র্যবোধ, (৪) জীবন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বেষ্টিপ্রধান বিচারপূর্ণ মানবহিতকর মান আরোপের চেষ্টা। দেখা যাক, হিউম-বেকনের শিষ্যরূপে, নব্যবঙ্গের শিক্ষাগুরুরূপে রেনেশাঁর এই স্বপ্ন ডিরোজিওর কবিতায় কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে। *Candwell

প্রথমত বলে রাখা ভাল জাতে ফিরিঙ্গী হলেও ডিরোজিওর কাছে ভারতবর্ষই ছিল নিজের মাতৃভূমি এবং স্বদেশ। সামন্ততান্ত্রিক কু-সংস্কারে জর্জরিত ছিন্নভিন্ন স্বদেশকে দেখে ডিরোজিওর তরুণ প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। ভাবতে অবাক লাগে, সে-যুগে দাঁড়িয়ে কি করে তিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখলেন। এরকম স্বদেশপ্রেম সত্যি সে যুগে বিরল। 'To India my native land' কবিতায় তিনি বলছেন—

'My country! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast
Where is that glory, where that reverence now?'

ঔপনিবেশিক-সামন্ততান্ত্রিক নিষ্পেষণের হাহাকারটাই শুধু নয়। দেশের ছিন্নতারের বীণায় আবার নতুন করে জীবনের গান বাঁধবার প্রেরণায় ডিরোজিওর যাত্রা—

'—but if thy notes devine
May be by mortal wakened once again,
Harp of my country, let me strike the strain!'

এতদিন মানুষ যত শোষিত হয়েছে সাহিত্যের আসরে তত হয়ে পড়েছে দৈবনির্ভর। কারণ মুক্তির উপায়টা ছিল তার অজানা। বৈজ্ঞানিক সীমাবদ্ধতা মধ্যযুগীয় বাংলা কবিতাকে দৈবের খাঁচায় পয়ার-ত্রিপদীর জালে অক্টোপাসের বেঁধে রেখেছিল। ডিরোজিও নিয়ে এলেন সাগরপারের ফরাসী বিপ্লবের স্পন্দন। মানুষের উপর মানুষের শোষণ যদিও এই বিপ্লব ঘোচাতে পারে নি তবু যা দিয়ে গেছে তা হলো নিপীড়িত জনগণের মহাউত্থানের প্রেরণা, জন্মসূত্রে পাওয়া প্রত্যেকটা মানুষের স্বাধীনতার হুঙ্কার। আর এই প্রেরণাতেই ডিরোজিও Freedom to the slave' কবিতায় অনুভব করলেন—

'How felt he when he first was told
A slave he ceased to be,
How proudly beat his heart, when first
He knew that he was free!—
The noblest feelings of soul
To glow at once began,
He knelt no more, his thought were raised,
He felt himself a man.'

এ যেন শুধুই ক্রীতদাসটির মুক্তি নয়, পয়ার-ত্রিপদীর ছন্দজাল বিদীর্ণ করা কাব্যসাহিত্যের মুক্তিশ্বাস। যদিও ডিরোজিও বা তার ইয়ংবেঙ্গল সম্পূর্ণ ইংরেজীতেই সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তবু এর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে অনেক। বিশেষতঃ মাইকেল ডিরোজিওর প্রতি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। আর সেই প্রভাবের ফলেই হয়ত মাইকেল পয়ার-ত্রিপদীর বাঁধ ভাঙতে পেরেছিলেন। ডিরোজিওই প্রথম ভারতীয় যিনি রেনেশাঁসের বৈপ্লবিক রোমান্টিকতা বুকে নিয়ে কাব্য রচনা করেন।

সারা পৃথিবী জুড়ে তখন যে ভাঙাচোরার দিনবদল শুরু হয়েছিল তা যে শুধু দাসপ্রথা থেকে ক্রীতদাসদের অথবা সামন্ততান্ত্রিক শোষণের নাগপাশ থেকে ভূমিহীন কৃষককে মুক্তির আশ্বাস দিয়েছিল তা নয়, নিয়ে এসেছিল নারীমুক্তির এক উত্তাল আন্দোলনের ঢেউ। ভারতবর্ষে 'সতীদাহ প্রথা' চিরতরে বন্ধ হল। যে ডিরোজিও কোনো উপেক্ষিতা নারীর আত্মকথা জানাতে গিয়ে তার 'Song of the Indian girl' কবিতায় বলেছিলেন—

'Spirit of love! O bear my soul
Further than Gunga's water roll,
For my spring of joy has been brief'

সেই ডিরোজিওই 'সতীদাহ প্রথা' বিলোপে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখলেন,

'Hark! heard ye not? The widow's wail is over;
No more the flames from impious pyres ascend
See Mercy, now primeval peace restore.'

এভাবে বহু কবিতার লাইন তুলে দেখানো যায় যে একটা ঘুণেধরা ঝুরঝুরে সমাজকাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে কি দুঃসাহসের সঙ্গে ডিরোজিও রেনেশাঁসের গান গেয়েছিলেন। কডওয়েল কবিতার উদ্দেশ্য বিচার করতে গিয়ে বলেছেন 'The purpose of society is freedom, the purpose of poetry is also freedom.' হ্যাঁ কবিতা হল মানবমুক্তির এক নিদারুণ আকুতি। মানবমুক্তির জন্য সংগ্রামের এক ছন্দোবদ্ধ হাতিয়ার হল কবিতা। ডিরোজিও এদিক দিয়ে সম্পূর্ণ সফল। মানবমুক্তির খরবন্যার স্বপক্ষে মেরুদণ্ড টান করে ঘুরে দাঁড়ানোর আওয়াজই ডিরোজিওর কবিতা। কবিতা হল সমাজ পরিবর্তনের এক দোর্দণ্ড প্রচার। অবশ্যই তাকে শিল্পগত উৎকর্ষতার কষ্টিপাথরে উন্নীত হতে হবে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে আজ থেকে দেড়শ বছর আগে যখন ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গনে Mythological (ধর্মীয় গাথা) কাব্যের যুগ চলছে; যখন সংস্কৃত আদিরসকে পয়ার-ত্রিপদীর জাঁতাকলে ফেলে পাঁচালী ঢঙে বাংলা করাই ছিল সাহিত্যের একমাত্র ঔপজীব্য তখন কি করে ডিরোজিও একা একটা শুভ শিবিরের পত্তন করলেন! ডিরোজিও জানতেন চারপাশের সমাজ ও ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক, এ-সব নিয়ে মানুষের সংশয়াচ্ছন্ন মনই জন্ম দেয় ধর্মীয় কাব্যসাহিত্যের। আর ধর্মের

ছাতার নিচে দ্বুকিয়েই সাহিত্যের অঙ্গনে যৌন প্রতিক্রিয়ারা প্রবেশ করে। কিন্তু অনুসন্ধিৎসার অনন্ত সমুদ্রে দুর্জ্ঞেয় সত্যের দ্বীপেই ছিল ডিরোজিওর যাত্রা। এই যুক্তিবাদী মনের জোরেই মরবার শেষ দিনটি অবধি বাট্রান্ড রাসেলের মত বলে গেছেন, তিনি খ্রীশ্চান নন। এই যুক্তিবাদী মনই তাকে Nous অথবা যুক্তির শাসনাধীন দুনিয়া গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। আর এই স্বপ্নের ঘোরেই তিনি প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত-তান্ত্রিক সাংস্কৃতিক শিবিরের বিরুদ্ধে একা সেনাপতির ভূমিকা পালন করেছিলেন। ডিরোজিওই বলতে পারেন, 'I feel I have not lived in vain'.

ডিরোজিওর কবিতায় অনেকেই বায়রনের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করেন। অনেক ক্ষেত্রে বায়রনের প্রভাব এত প্রকট যে মনে হয় বায়রনের স্থূল অনুকরণ হয়ে গেছে। কিন্তু আগেই বলেছি ডিরোজিওকে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা দিয়ে বিচার করতে হবে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর জটিল থেকে জটিলতর সাহিত্যিক মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে চলবে না। সেই যুগ এবং ডিরোজিওর অপরিণত বয়সের কথা মনে রেখে তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। এদিক দিয়ে বিচার করলে ডিরোজিওর এই ত্রুটি মার্জনীয়। শুধু তাই নয় আরো অনেক জায়গায় কবিতার মানদণ্ডের বিচারে ডিরোজিও উৎকৃষ্টতার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে। দুরন্ত যৌবনের অস্থির উন্মাদনা অনেক সময় ডিরোজিওর কবিতাকে দিকভ্রান্ত করিয়েছে। তা সত্ত্বেও শিল্পের আসল কষ্টিপাথরে ডিরোজিও কালোত্তীর্ণ কবি। ডিরোজিওর কবিতা দেড়শ' বছর পরেও নবোৎসাহে অনূদিত হচ্ছে—দেশে-বিদেশে জনপ্রিয়তা বাড়ছে। তাই আজকের বিশ্ব-মুক্তি আন্দোলনে সমবেত কোটি কোটি নওজোয়ান ডিরোজিওদের দিকে তাকিয়ে আমাদের বলতে ইচ্ছে করে

'Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds,
And sweet loosing of the spell that binds
Your intellectual energies and powers
That stretch (like young birds in soft summer hours)
Their wings, to try their strength.'

সূত্র নির্দেশ

১। ডিরোজিওর কবিতা—অনুবাদ ও সম্পাদনা পল্লব সেনগুপ্ত
২। বিদ্রোহী ডিরোজিও—বিনয় ঘোষ
৩। Illusion and Reality—christopher Caudwell.
৪। এছাড়া বিভিন্ন সংখ্যা নন্দন ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা

[প্রচার মাধ্যমগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা : ১০ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সম্ভবত তাই রাজীব গান্ধীর মত নতুন 'বাবু' মেলার পরও সঞ্জয় গান্ধীর ভূত আকাশবাণীর কাঁধ থেকে এখনও নামে নি।

তথাপি শাসকদলের ভাঙ্গা রেকর্ড এখনও বাজে। একটু কান পাতলে এখনও শোনা যায় সেই পুরাতন প্রতিশ্রুতি। আকাশবাণী, দূরদর্শন, সংবাদ ও অন্যান্য কর্মসূচী প্রচারের ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ। সংসদে প্রশ্ন উঠলে কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্যমন্ত্রী যুক্তিজাল বিস্তার করছেন, পরিসংখ্যানের চাপে আসল সত্য আড়াল করার চেষ্টাও করছেন।

শাঠেসাহেবের সাম্প্রতিক সারকুলার একটু বেশী মাত্রায় নগ্ন ও কুৎসিৎ মাত্র।

ফতোয়াটি সত্যি চমৎকার গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির অনন্য নজির।

১৯ জানুয়ারি সারা ভারতে শিল্প ধর্মঘট আহ্বান করেছিলেন ইন্দিরা কংগ্রেস পরিচালিত একটি ট্রেড ইউনিয়ন বাদে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক কর্মচারীদের জাতীয় ফেডারেশনগুলি নিয়ে গঠিত জাতীয় প্রচার কমিটি।

গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের ঘোষিত ও অনুসৃত নীতির এবং কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত করার অধিকার ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রাথমিক ও মৌলিক অধিকার। এ অধিকার সর্বত্র স্বীকৃত। আমাদের দেশেও স্বীকৃত।

কিন্তু বন্ধ ডাকার ডাক দিয়েছিলেন নেত্রী, সাথে সাথে প্রচারের বন্যা। মাসাধিককাল ধরে কে বা কারা বন্ধের বিরোধীতা করেছে বেতার ও দূরদর্শন তা বেশ ফলাও করেই প্রচার করছিল। বন্ধের পক্ষে রাজ্যে রাজ্যে প্রবল প্রচার অভিযান চললেও তার বিশেষ চিত্র এই মাধ্যমগুলিতে প্রতি-ফলিত হয় নি। অথচ বন্ধ বিরোধীতায় 'ক', 'খ'. 'গ', 'ঘ', 'ঙ' এমন কি লি-কাররাও কি করেছে তা জানা গেছে অনর্গল।

শাঠে সাহেব তাতেও সন্তুষ্ট নন। বিরোধী-পক্ষের সংবাদ সম্পূর্ণ ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া হোক—এটাই শাঠে এন্ড কোং চান। তাই এলো সারকুলার। ১৯ জানুয়ারির বন্ধের বিকৃত সংবাদ জনসমক্ষে হাজির করা হল। জনসাধারণ আবার দেখলেন আকাশবাণী দূরদর্শনের সাংবাদিকের স্বাধীনতা! অচল কলের চাকা কিভাবে তারা সচল করে দিল। কিন্তু এ বড় প্রাচীন এবং অচল কাহিনী। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: গোয়েবলসের রেডিও।

তিরিশের দশকে গোয়েবলস প্রচার চালিয়ে সত্যকে চাপতে পারেন নি। আর আজ শাঠে-সাহেবরা সেই কাজ করতে পারবেন? ২০ জানুয়ারি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নি একটিও, জীবনের অভিজ্ঞতায় মানুষও বুঝেছেন সেদিন দেখা যায় নি চিমনির ধোঁয়া, খোলা যায় নি সাইরেন শংখ। ১৯ জানুয়ারি কি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তা বেতার দূরদর্শন না জানালেও জনগণ জানবেন।

এবার ধন্যবাদের পালা। ধন্যবাদ শাঠেসাহেব! নিজেদের গণতান্ত্রিক মুখোশ নিজের হাতেই টেনে ছিঁড়ে নগ্ন কদর্য কুৎসিৎ স্বৈরাচারী অবয়ব জন-সমক্ষে তুলে ধরার জন্য ধন্যবাদ! আপনাদের গণ-তান্ত্রিক ভড়ং, নিরপেক্ষতার আবরণ এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীন অস্তিত্বের ফানুস আন্দোলন সংগ্রামের ময়দানে চুপসে যাচ্ছে দ্রুত। উত্তাপ যত বাড়বে, তত বেশী ফুটোফাটা প্রকটরূপে আত্ম-প্রকাশও করবে। শুধু একটি জিজ্ঞাসা, আপনারা যে বিশ্বাসহীনতার ভূমি প্রসারিত করলেন সেই সুযোগ বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও জাতীয় অনৈক্যের শক্তিকে প্ররোচিত করতে এবং সাম্রাজ্য-বাদীদের বিকল্প বেতারকেন্দ্র স্থাপনের চক্রান্তকে আরও পুষ্ট করতে পারে এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে এই মাধ্যমগুলি একেবারে অব্যবহারযোগ্য হয়ে যেতে পারে এ-কথা কি একবারও ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখেছেন?

শ্রমজীবি মেয়েদের সঙ্গে

শিপ্রা দাস

—'পেট ভর খানে কা ভাত নেহি হোতা হ্যায়, আউর কাপড়া ভি নেহি হ্যায়......।'—

বুকভরা ক্ষোভ নিয়ে বললেন মুনেশ্বরী দেবী। পরনে ছেঁড়া ময়লা শাড়ী। পাটের আঁশে ঢাকা আপাদমস্তক। কাজ করছেন অনবরত। পাট বিছিয়ে দিচ্ছিলেন 'ব্রেকার ফিটার' মেসিনে। মেসিনের মর্জিমাফিক কাজ। একটু এদিক ওদিক হলেই বিপদ।

শব্দ আর শব্দ। চারদিকে মেসিনের কান ঝালাপালা করা শব্দ। পাশের মানুষটি কথা বলছেন। কিন্তু কেউই কিছু শুনতে পাচ্ছে না। তাই কারো মুখে রা নেই। ওদিকে ঘর ভর্তি পাটের ধুলো আর আঁশ। দম আটকে আসছে। এর মধ্যেই কাজ করছেন সব শ্রমিকেরা। মেয়ে পুরুষ সবাই।

পাটকলের কারখানায় মেয়েরা কাজ করছেন দু'রকমের। কেউ করছেন ব্রেকার ফিটিং। কেউ করছেন পাটের ব্যাগ সেলাইয়ের কাজ। ব্রেকার ফিটিং-এর কাজটি বেশ শক্ত। সামনে ঘড়ি ঝোলানো আছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ওজনের পাট ব্রেকার মেসিনে বিছিয়ে দিতে হবে। সময়ের এদিক ওদিক হলেই প্রোডাকসনের হের-ফের। মালিকের বকুনি। আরও কত কি! এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে থেকে পাট বিছানোর কাজ করতে হয়। যেমন পরিশ্রমের তেমন ধৈর্যের। যেখানে পরিশ্রমের কাজ সেখানে মেয়েরাই তো পারবে। তাই এই কাজ সব পাটকলেই মেয়েরা করছেন। সারাদিনে আট ঘণ্টা পরিশ্রম। দিন রুজি হিসেবে কাজ করে মাসে প্রায় চার'শ টাকা পর্যন্ত রোজগার করেন।

ব্যাগ সেলাই-এর কাজটা অবশ্যই কাজ হিসেবে পয়সা। দু'ধরনের পাট ব্যাগ মেয়েরা সেলাই করেন। হেসিয়ান আর স্যাকিং। হেসিয়ান পঞ্চাশটিতে এক বান্ডিল। কিন্তু স্যাকিং পঁচিশটিতে এক বান্ডিল। কারণ স্যাকিং-এর জমিটা মোটা। মেয়েরা হেসিয়ান এক বান্ডিল সেলাই করে পাচ্ছেন বাইশ পয়সা ওদিকে এক বান্ডিল স্যাকিং সেলাই করে পাচ্ছেন এগার পয়সা। সেলাই করার সময় ৭৫ ভাগ হেসিয়ানের সাথে অবশ্যই ২৫ ভাগ স্যাকিং সেলাই করতে হবে। এই রোজগারের ওপর মেয়েদের সংসার। অভাবের গন্ডী কাটাতেই ওদের এ কাজ। আর এ কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকদের শ্রবণ শক্তি কমে যায় এবং তার চেয়েও মারাত্মক ফুসফুসের ক্ষয়-রোগ অধিকাংশেরই শুরু হয় অল্পদিনের মধ্যে।

ভারতবর্ষে ৬৯টি পাটকলের মধ্যেই ৪৬টি পাটকল রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। সমস্ত পাটকলের মোট শ্রমিক সংখ্যা আড়াই লাখ। এর মধ্যে প্রায় সাত হাজারের মতো রয়েছেন মহিলা শ্রমিক। আজ থেকে প্রায় দশ-বারো বছর আগেও এ-সব পাটকলগুলিতে মহিলার সংখ্যা ছিল এর দ্বিগুণ। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে মহিলার সংখ্যা কারখানাগুলিতে কমে যাচ্ছে। পাটকলের একজন কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, এর কারণ কি?

—'কারণ বেশ কয়েকটি রয়েছে। প্রথমতঃ, মেয়েদের রাতের বেলা কাজে রাখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, মেয়েদের ম্যাটারনিটি লিভ দিতে হয় ছয় মাস। তখন আমাদের তার বিনিময়ে একজন বদলি নিতে হয় এবং দু'জনকেই পারিশ্রমিক দিতে হয়। ফলে মিলের ক্ষতি হয় অনেক। এর জন্য আমরা চেষ্টা করছি মেয়েদের সংখ্যা কমিয়ে দিতে।'

ভাবছিলাম এর কি কোন বিকল্প পথ নেই! যেখানে আজকের দিনে সব মেয়েরা সব কাজে এগিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে এই সব মেয়েদের আস্তে আস্তে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে এরাই বা যাবে কোথায়?

এবার প্রোডাকসানের দিকটা দেখা যাক। 'ইন্ডিয়ান জুট মিল এ্যাসোসিয়েসনের' রিপোর্ট—

সাল	উৎপাদন	বিদেশী মুদ্রা এনেছে
১৯৪৪—৪৫	১০·১৬ লক্ষ টন	৩২%
১৯৭১—৭২	১১·০৮ „ „	১৭·৩৬%
১৯৭৪—৭৫	৯·৪ „ „	৯·৪৭%
১৯৭৭—৭৮	১০· „ „	৪·৫৮%
১৯৭৯—৮০	১১·৫ „ „	২·৯৫%

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে বিদেশের বাজারে পাটের চাহিদা অনেক কমেছে। কিন্তু আমাদের দেশের বাজারে আনুপাতিকভাবে এর চাহিদা অনেক বেড়েছে। গত ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পাটের উৎপাদনের খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। মেয়েরা সংখ্যায় কম হলেও উৎপাদনের একটা অংশ তাদের শ্রমেই হচ্ছে এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না। অথচ মিলে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা আগের তুলনায় এখন অনেক কম। মহিলা শ্রমিক কমিয়ে দিয়ে উৎপাদনের অঙ্ক বাড়ানো সম্ভব হয় নি। মেয়েদের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ত রয়েছে কিছু। সেই সমস্যা তো প্রকৃতিগত। আর এই সমস্যা সমাধান করাও একটা সামাজিক দায়িত্ব।

—'মেয়েরা কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দায়িত্ব-শীলা। তবে সবচেয়ে বড় কথা কী জানেন মিলের পরিবেশে কাজ করা মেয়েদের পক্ষে সত্যিই খুব কষ্ট।'—সব মিলের শ্রমিক অধিকর্তারা অবশ্য এ কথা বললেন।

মিলের কাজে মেয়েদের সংখ্যা কমলেও ল্যাম্প বালব্ তৈরীর কারখানায় মেয়েদের ভিড় দিন দিন বাড়ছে। কলকাতায় কম-বেশী প্রায় ১৭৫টির মতো ল্যাম্প বালব্ তৈরীর কারখানা রয়েছে। এই সব কারখানাতে মোট শ্রমিকের অর্ধেকের বেশী রয়েছেন মহিলা। প্রথমে টিউব কাটিং-এর কাজ দিয়ে বালবের কাজ শুরু। তারপর ফ্রেম্থ, স্টেম্, ইনসাইডিং, মাউন্টিং, গেটার, সিলিং, ভ্যাকুয়ান, এইজিং, ক্যাপিং ও টেস্টিং-এর কাজ পরপর চলতে থাকে। সব শেষের কাজ প্যাকিং। মেয়েরা সবরকমের কাজই অল্প বিস্তর করতে পারেন। তবে ইনশাইডিং, মাউন্টিং, ক্যাপিং ও প্যাকিং-এর কাজ সবটাই মেয়েরা করেন। সারাদিনে আট ঘণ্টা পরিশ্রমের বিনিময়ে এ সব মেয়েরা দিনে আড়াই টাকা থেকে ছয় টাকা পর্যন্ত রোজগার করতে পারেন। শিক্ষার আলো এ'দের মধ্যে নেই বললেই চলে।

ওদিকে অধিকাংশ মেয়ে দিন রোজে সেলাই-এর কাজ করছেন। মেয়েরা দিনে আট ঘণ্টা পরিশ্রম করে তিন টাকা থেকে ছয় টাকা পর্যন্ত পান। তবে নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজ শেষ করতে হবে। নচেৎ মজুরী কাটা যাবে।

ঠিক ভোর ছ'টা। মিলে ঢোকার সাইরেন বেজে উঠলো। শুরু হল মেয়েদের প্রথম শিফ্টের কাজ।

—'শুধু কাজ আর কাজ। আমাদের কথা কেউ শোনে না। বাড়িতে স্বামী অসুস্থ। তিন ছেলে বেকার। তাদের একজনকে একটা কাজ দেবার জন্য সাহেবকে বলেছি। তিনি তো কথাটা কানেই নিচ্ছেন না। আমার চাকরী তো ফুরিয়ে এলো।'—হাতে কাজ। পঞ্চাশের কোঠায় যোগমায়া দেবী। কথাগুলো বলেন একদমে। কাজের ভারে ক্লান্ত তাঁর চেহারা।

ওপাশের ব্যাগের কাজে বৃদ্ধাটির একমাত্র অন্ধের যষ্টি তাঁর নাতিটি। সাত কুলে তাঁর আর কেউ নেই। কাজ থেকে অবসর নেওয়ার ঘণ্টা বেজে গেছে। নাতিটিকে নিয়ে এবার তিনি কী করবেন? বয়স যে তার কম। পাটকল কি তাকে নেবে? নিঃসম্বল, নিঃস্বহায় তার একাকীত্বে বৃদ্ধা জর্জরিত। উপায় কী কিছু আছে?

পাট ঝেড়ে ঝেড়ে মেসিনে বিছিয়ে দিতে দিতে সুরবালা দেবী বলেন,—'কেবল অভাব আর অভাব। পরিবারে অনেক মানুষ। শান্তি নেই একটুও। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা কাজের পর মনে হয় বিশ্রাম করি। একটু শান্তিতে থাকি। কিন্তু কেমন করে হবে? আর আনন্দফুর্তি করারই বা সময় কোথায়। এর জন্য তো দরকার পয়সার।'—প্রতিটি শ্রমিক-মহিলার মুখে মুখে একই কথার পুনরাবৃত্তি। মেসিন চলছে ঝম্‌ঝম্। মেহনতী শ্রমিকের মাথার ঘাম পায়ে। একদিকে ওদের বোবা কান্না। অন্যদিকে সাহেব—প্রোডাকসান—আরো—আরো অনেক কিছু!

—'মিহিরকাকু তুমি কি খেয়েছ? আমি কিন্তু খাই নি, খাই নি অনেক দিন।'—এই বলে পাঁচ বছরের মেয়ে বাবুলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। প্রায় চারদিন উপোস কাটানোর পর শিশু বালিকার তখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে।

প্রতিবেশী মিহির সেদিন প্রথম জানতে পারে মায়াদেবীর পরিবারে দীর্ঘদিনের অনাহারের কথা। প্রতিবেশিনী বড় আত্মাভিমানী। তাই অতি সন্তর্পণে মিহির কিনে দেয় সামান্য খাবার। সেদিনের মতো সাময়িক ক্ষুধার নিবৃত্তি।

তিনটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর সংসার তাঁর। স্বামী অনেক দিন বেকার। মায়াদেবী করেন সেলাই-এর কাজ। রোজগার অতি সামান্য। পরিশ্রম তো রয়েছেই। এমনি অসহনীয় অবস্থা মায়াদেবীকে অনেক সহনশীল করে তুলেছে। তিনি বললেন,—'অভাব আরও আসে আসুক, ভয় করি না। সবই সইবার ক্ষমতা আছে।'

—অভাবের সংসারে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো করানো সম্ভব হচ্ছে কি?

—'নিশ্চয়ই হচ্ছে। আজকাল তো স্কুলে বেতন দিতে হয় না। আর অভাব বলে চুপ করে থাকলে তো চলবে না। ছেলেমেয়ে কষ্ট করছে তা আমারই কষ্ট। অভাবের সংসার বলে, সবাই আমাদের তুচ্ছ ঘৃণা করে। সব কিছুকে দূরে ঠেলে আমার ছেলে-মেয়েরা মানুষ হোক, সেই শিক্ষাই তাদের দেবার চেষ্টা করছি। ওদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি যথেষ্ট তৎপর।'

—'অভাব আপনার পারিবারিক জীবনে কতটা অশান্তি এনেছে।'

—'একটুও না। ঘরে চাল নেই তা স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করে তো শুধু পাড়ার লোক জানানো ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা লাভবান একটা দিকেই, যতই অভাব থাকুক ভুল বোঝাবুঝি আমাদের নেই।'—এক চিলতে ঘর যাঁদের একমাত্র মাথা গোঁজার ঠাঁই, সেই ঘরের ছোট একটি খাটিয়ার ওপর বসে কথাগুলো হচ্ছিল মায়াদেবীর সঙ্গে।

খেয়ালী ভদ্রলোকটি। চিরকাল উদাস, অন্যের কাজে ছুটে যান সবার আগে। প্রতিবেশীর বিপদে তিনি সবার আগে। সামাজিক কাজে তিনি সব সময়েই ব্যস্ত। শুধু নজর নেই তাঁর নিজের সংসারের দিকে, স্ত্রীর দিকে। সাধ্বী স্ত্রী হিসেবে বন্দনাদেবীর দায়িত্ব স্বামীর ভরণপোষণ যোগান। তাইতো প্রতিকূল অবস্থাতেও একটা সিন্ধী সেলাইয়ের কারখানায় কাজ করতে করতে বন্দনা-দেবী প্রাণান্ত।

—'আমার স্বামীর রাজরোগ। রাজখানা পাই কোথায়? ভাতে ভাতও জোটে না অনেক দিন। নয়টি ছেলেমেয়ে সবাই ছোট।'—হিট বার্ণার মেসিনে ২৪টা ল্যাম্পোর সাহায্যে বালবে তাপ দিতে দিতে কথাগুলো বলেন শ্রীমতী গীতা দাশ। ছোট একটা ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে মাটির ঘর। ছেলে-মেয়ে অসুস্থ স্বামী সবাইকে নিয়ে একঘরেই আছেন। আবার তিনি কাজের মাঝে বলেন,—'আমার চারদিকে অভাব, সমস্যা, বাঁচার জন্য লড়াই। আমি যেন শেষ দিনটি পর্যন্ত লড়াই করতে পারি। যেন ভেঙ্গে না পড়ি।'

একদিকে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখী হয়ে এদের জীবনের আকাশ যখন ফ্যাকাশে তখন কিন্তু অষ্টাদশী মেয়েটির চোখে রঙ্গীন স্বপ্ন। বাবা অসুস্থ। ছোট ভাই বোন। মা ব্যস্ত থাকেন গৃহস্থালীর কাজে। সংসারের অনেক দায়িত্ব তার ঘাড়ে। তবু স্বপ্ন ঘর বাঁধার, সংসার পাতার। ক্যাপিং-এর কাজ করতে করতেই বলে,—'মোটা ভাত মোটা কাপড়েই যথেষ্ট। অভাব আমরা মানিয়ে নিতে পারি। কিন্তু যার সাথে ঘর করবো তিনি হবেন সৎ চরিত্রের।'

—'না। না। ঘর চাই না, সংসার চাই না। এই যা আছি যথেষ্ট। অভাবের সংসারে অভাবটাই বেশী। কাজেই নতুন করে অভাবের সংসারে গিয়ে মোকাবিলা করতে চাই না। এক এক সময় মনে হয় জীবনটা যন্ত্রণাময়। বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলে বেঁচে যাই।'—জীবনের প্রতি তীব্র ক্ষোভ, অভিমান আর হতাশা নিয়ে টেস্টিং-এর কাজ করতে করতে বলেন গোবরার মেয়ে মায়া দাশ। বয়স বত্রিশ পেরিয়ে। বৌদির সংসারে যার লাঞ্ছনাটাই পাওনা। তবু ঐ ঘরেই তার একমাত্র আশ্রয়।

কারখানার শ্রমিক মেয়েরা রাতদিন সমস্যায় জর্জরিত। ব্যস্ততাভরা তাঁদের দিনগুলো। এর পরে তাদের অন্য কোন ভাবনাই কি নেই? যেমন রাজনীতি, সংগঠন! হ্যাঁ। কিছু কিছু তৎপরতা আছে বৈকি! বালব্ কারখানার মায়াদেবী বলেন,—'সংগঠনের প্রয়োজন তো আছেই। আমি সংগঠনের কাজে সবার সঙ্গে সহযোগিতা করি।'

—'মালিক কি এক কথার মানুষ। কোন কিছু জানাতে হলে আমি সবাইকে একসাথে করি। তার-পর মালিককে আমাদের সমস্যা জানাই। দুই পক্ষের কিছু সর্ত ছাড়াছাড়ির পর হয়ত মধ্যস্থতা হয়।'—মাউন্টিং-এর কাজ করতে করতে জানালেন ঝরনা গুহ। অনেক দিনের পুরোনো কর্মী তিনি। তাই যে কোন ব্যাপারে মাথা দিতে হয় তাঁকেই।

পাটকলের ব্যাগের কাজে সব সময়ে ব্যস্ত থাকেন পুতুল দেবী। রাজনীতি বা ইউনিয়ন কী বা কেন তা বোঝার চেষ্টা করেন না। তাঁর মতে, —'সবাই ইউনিয়নে আছে তাই আমিও আছি।'

পার্বতী দেবীর ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। তিনি ব্রেকার ফিটিং-এর কাজ করেন। প্রশ্ন করতেই বেশ গলা খেঁকিয়ে বলে ওঠেন,—'হ্যাঁ। হ্যাঁ। ইউনিয়নের দরকার আছে। তাই আমি ইউ-নিয়নে আছি। আমাকে সাহেব একবার ছাড়িয়ে দেবে বলেছিল। ইউনিয়ন সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করে আমাকে রেখেছে।'

—'আমাদের সিন্ধী ব্যবসায়ীটি বড় অত্যাচারী। তাঁর শোষণনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন অনবরত। একবার একটি মেয়ে ইউনিয়ন করতে চেয়েছিল তাকে চাকরী থেকে ছাঁটাই করে দিয়েছে। আমাদের মতো দুস্থ মেয়েদের বাঁচাতে ইউ-নিয়নের প্রয়োজন অনেক। কিন্তু উপায় আছে কি কিছু?'—বেশ কিছুটা আক্ষেপ নিয়ে বলেন বন্দনা দেবী। প্রায় একুশ জনকে নিয়ে এই সেলাইয়ের প্রতিষ্ঠান। কাউকে কিছু বলার উপায় নেই। অভিযোগ করলে পরদিন ছাঁটাইয়ের নোটিশ।

বেলেঘাটার বালব্ কারখানার শ্রমিক বেলা দে। বয়স প্রায় চল্লিশের মতো। তাঁর সংগঠনের চেহারাটা একটু অন্য ধরনের। তাঁর মতে,—'ছেলে মেয়ে, স্বামী, সংসার এটাই মনে হয় রাজনীতি। সংসারের সংগঠনই একটা যেন বিরাট সংগঠন। এই সংগঠনের কাজ শেষ না হলে বাইরে যাবো কী করে?'

রাজনৈতিক থিয়েটার কি ও কেন

অনেকদিন থেকেই থিয়েটার নিয়ে একটি বিতর্ক চলেছে। সেটি হলো, থিয়েটারে রাজনীতির প্রভাব থাকবে কি থাকবে না। এই বিতর্কের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করেছেন। যারা বলে থাকেন যে থিয়েটারে রাজনীতি থাকা উচিৎ না, তারা কিন্তু একথা বেশ ভালোভাবেই জানেন যে শুধুমাত্র থিয়েটার কেন মানুষের কোনোরকম শিল্প থেকেই রাজনীতিকে পৃথক করা যায় না। তবুও তাঁরা বেশ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ গম্ভীর ভাব বজায় রেখে প্রগতিশীলতার ভাণ করে বলে থাকেন যে থিয়েটারকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা উচিত। কেননা, থিয়েটারে রাজনীতির প্রবেশ ঘটলে থিয়েটারের শৈল্পিক দিকের বিকাশ ঘটবে না। ফলে থিয়েটার তার জাত হারিয়ে ফেলবে। জেনে শুনেই তারা এমত প্রচার করে থাকেন। এর কারণ হলো যে বর্তমানে বুর্জোয়াশ্রেণী ভীষণভাবে ভীত। তারা আজ তাদের মৃত্যুর করাল ছায়া দেখতে পেয়েছে। তাই তারা এরকম একটি 'সোনার পাথরবাটি'-মার্কা মতবাদ প্রচার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন।

একথা আমরা জানি যে মানুষের জীবনে যে ঘটনাই ঘটুক না কেন তার সঙ্গে সমাজব্যবস্থার তথা রাজনীতির যোগ থাকবেই। কোথাও সে যোগ প্রত্যক্ষ। আবার কোথাও তা পরোক্ষ। এখন দেখবার চেষ্টা করবো যে রাজনীতি কাকে বলে। রাজনীতিকে যদি আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করি তাহলে দেখতে পাবো যে মানুষ সামাজিক প্রাণী। সামাজিক হওয়ার অর্থই হলো, অন্য সকলের ইচ্ছা বা সমাজের বিধিনিষেধ মেনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। এই বিধিনিষেধরূপী সকলের ইচ্ছার অপর নামই সমাজনীতি তথা রাজনীতি। এক কথায় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্ক আপাত-দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ মনে হলেও আসলে তা সমাজ-ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ রাজনীতি সাপেক্ষ। কার্ল মার্ক্স বলেছেন, "প্রত্যেকটা শ্রেণী-সংগ্রামই হলো রাজনৈতিক সংগ্রাম।" ভি. আই. লেনিন বলেছেন, "রাজনীতি বলতে কি বুঝবো? সাবেকী অর্থে রাজনীতি ধরলে প্রকাণ্ড ও গুরু-তর ভুল হতে পারে। রাজনীতি হলো শ্রেণী-সমূহের মধ্যে সংগ্রাম, রাজনীতি হলো বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামী প্রলেতারিয়েতের সম্পর্ক-পাত।" ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের মতে, "জীবন বলতেই যেখানে জীবনযাপন বুঝায়—বিধিনিষেধ-নিয়ন্ত্রিত সামাজিক জীবন পারস্পরিক সম্পর্কে সম্পর্কিত জীবন বুঝায়, সেখানে জীবন-সমালোচনা করতে যাওয়ার অর্থই সমাজনীতির বা রাজনীতির সমালোচনা করা।"

আমরা একথা জানি যে থিয়েটার হলো বাস্তব-জীবনের প্রতিফলন। মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিয়েই থিয়েটার। অর্থাৎ থিয়েটারে থাকে 'জীবন সমালোচনা'। তাই থিয়েটারে রাজনীতির প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। যাঁরা থিয়েটারকে রাজনীতির বাইরে রাখতে চান তাঁরা কি একথা জানেন না যে আজ পর্যন্ত বিশ্বে এমন একটিও সার্থক নাটক লেখা হয় নি যার মধ্যে রাজনীতি নেই। পৃথিবীর সর্বযুগের, সর্ব-কালের, সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্সপীয়র ছিলেন সবচেয়ে বেশি সমাজ সচেতন তথা রাজনীতি সচেতন। আমাদের দেশের নাট্য-ইতিহাসও এই কথাই প্রমাণ করে। রামনারায়ণ থেকে শুরু করে দীনবন্ধু-মধুসূদন সকলের নাটকেই তৎকালীন রাজনীতির প্রভাব পড়েছে। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিকে এনেছেন। মধুসূদনও তাঁর নাটককে রাজনীতির বাইরে রাখেন নি। গিরিশ ঘোষ—দ্বিজেন্দ্রলাল

দীপক চক্রবর্তী

রায়—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটকেও রাজ-নীতির প্রতিফলন রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তো বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নাট্যকার। রবীন্দ্র-নাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বিজন ভট্টাচার্য, মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত থেকে বর্তমানের অতি আধুনিক নাট্যকারেরা তাঁদের যাত্রা শুরু করেছেন।

বর্তমানে রাজনীতি বর্জিত থিয়েটারের নাম করে যে সব নাট্য-প্রযোজনা হচ্ছে তাতেও তো পরোক্ষভাবে রাজনীতিরই খেলা চলছে। শ্রেণী-সংগ্রামের সঠিক পথ থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য এইসব প্রযোজনায় যৌনতা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। যতদিন সাধারণ মানুষ এই যৌনতা ও ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকবে ততদিনই নির্বিবাদে চালানো যাবে শোষণের স্টীম রোলার। তাই শোষকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থে রাজনীতি-বর্জিত থিয়েটারের নাম করে এক সর্বনাশা রাজনৈতিক থিয়েটারের প্রচলন করতে চাইছেন। নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে বজায় রাখার জন্য যখন বুর্জোয়াশ্রেণী থিয়েটারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন তখন প্রগতিশীল মানুষ তাদের শোষণমুক্তির সংগ্রামে থিয়েটারকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করলেই বুর্জোয়াশ্রেণী চিৎকার করে ওঠেন। তখনই তাঁরা থিয়েটারকে রাজনীতি-বর্জিত করার জন্য সোচ্চার হন। কারণ, তাঁরা নিজেদের স্বরূপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। প্রগতিশীল থিয়েটারে দেখতে পান তাঁদের মৃত্যু-বাণ। তাই আজকের দিনে বুঝতে হবে যে রাজ-নীতিবর্জিত থিয়েটার অতীতে কোনোদিন হয় নি —বর্তমানে হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতেও কখনোই হবে না।

মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবক্ষয়ী চেতনা থেকে থিয়েটারের জন্ম হয় নি। থিয়েটার কেন কোনও শিল্পের জন্মই অন্ধকার থেকে না। থিয়েটার তথা সমস্ত শিল্পেরই জন্ম হয়েছে মানুষের বাঁচার সংগ্রাম থেকে। তাই 'Art is a social Phenomenon.' বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও শ্রেণীর কাছ থেকে শিল্প সৃষ্টি হতে পারে না। সমাজের বুকে অনাদি-অনন্তকাল থেকে যে সংগ্রাম চলেছে সেই সংগ্রামের প্রতিফলন শিল্প-সাহিত্য-নাটকে হবেই। সেই কারণেই সমস্ত শিল্প-সাহিত্য-নাটকে রাজনীতির প্রতি-ফলন অবশ্যম্ভাবী। তবে সে রাজনীতি কোথাও প্রত্যক্ষ আর কোথাও পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়। কোথাও রাজনীতি এমন সূক্ষ্মভাবে আসে যে আপাতদৃষ্টিতে তাকে রাজনীতি বলে মনে হয় না। সেখানেই রাজনীতি চিনে নেওয়ার সঠিক দৃষ্টির প্রয়োজন। ভি. আই. লেনিন বলেছেন, "People always have been the foolish victims of deception and self deception in politics, and they always will be until they have learnt to seek out the interests of some class, or other behind all moral, religious, political and social phrases, declaration and promises." বুর্জোয়াশ্রেণী এ-কথাও বলে থাকেন যে, থিয়েটারে রাজনীতি প্রবেশ করলে থিয়েটার আর থিয়েটার থাকবে না। থিয়েটার হয়ে উঠবে কোনও 'ইজম'-এর প্রচারক্ষেত্র। এটা একেবারেই অযৌক্তিক কথা। প্রচার আর থিয়েটার কখনোই এক জিনিস নয়। কিন্তু থিয়েটারের মধ্যে প্রচারধর্মিতা তো থাকবেই। বুর্জোয়াশ্রেণী রাজনীতিবর্জিত থিয়েটার বলতে যা বোঝায় তাতে কি তাঁদের 'ইজম'-এর প্রচার থাকে না? তাঁরা তো তাঁদের মতবাদ থিয়েটারের মাধ্যমে প্রচার করে থাকেন। তাঁদের বিরুদ্ধগোষ্ঠী যদি তাঁদের মতবাদ থিয়েটারের মাধ্যমে প্রচার করেন তাহলেই সেটা দোষের হবে কেন? বার্নাড শ'-ও তো বলেছেন যে, সমস্ত শিল্পই প্রচারধর্মী হতে বাধ্য। থিয়েটারও একটি শিল্প। তাই তাতে প্রচারধর্মিতা থাকবেই। কিন্তু প্রচারধর্মী হলেও সেটা হবে শিল্পসম্মত উপায়ে। মাও সে তুঙ বলেছেন, "শিল্পকর্ম রাজনৈতিক দিক থেকে যতই প্রগতি-

শালী হোক না কেন তাতে শিল্পগত গুণাবলীর অভাব থাকলে তা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। অতএব, আমরা যেমন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের দিক থেকে ভুল এমন শিল্পকর্মের বিরোধিতা করি, তেমনি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের দিক থেকে নির্ভুল কিন্তু শিল্পকর্মে শক্তিহীন এমন 'প্রচারপত্র ও শ্লোগানসর্বস্ব রীতির' প্রতি ঝোঁকেরও বিরোধিতা করি।"

থিয়েটারে রাজনীতি বলতে শুধুমাত্র বিষয়বস্তুতেই রাজনীতির প্রতিফলন বোঝায় না। থিয়েটারের সর্বক্ষেত্রে রাজনীতির প্রতিফলন একান্ত আবশ্যক। থিয়েটার হলো তিলোত্তমা শিল্প। তিল তিল করে সৌন্দর্য আহরণ করে যেমন তিলোত্তমার সৃষ্টি তেমনি বিভিন্ন শিল্পের সমন্বয়ে থিয়েটারের সৃষ্টি। সমবেত শিল্পীদলের প্রচেষ্টার সঠিক সমন্বয়েই সার্থক থিয়েটারের জন্ম। তাই থিয়েটারকে শিল্পসম্মত করতে হলে প্রতিটি শিল্পীর সঠিক ভূমিকা পালন করা দরকার। শিল্পীদের সঠিক ভূমিকা পালন করতে হলে তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান অপরিহার্য। স্বাভাবিকভাবেই অভিনেতাদের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। অভিনেতার যদি রাজনীতি তথা ডায়ালেক্‌টিক্স্‌ জানা না থাকে তাহলে সেই অভিনেতা কখনোই সার্থক চরিত্র সৃষ্টি করতে পারবেন না। তাই অভিনেতাকে যদি সার্থক চরিত্র সৃষ্টি করতে হয় তাহলে তাঁকে ডায়ালেক্‌টিক্স্‌ জানতেই হবে। উৎপল দত্ত বলেছেন, "ভাল অভিনয় করার জন্য ডায়ালেক্‌টিক্স্‌ ছাড়াও আরও অনেক কিছু লাগে—কণ্ঠ, উচ্চারণ, দৈহিক ক্ষমতা ইত্যাদি—কিন্তু পার্টটা বুঝতে গেলে ডায়ালেক্‌টিক্স্‌ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। ভাল অভিনয়ের জন্যও অন্যান্য গুণের সঙ্গে ডায়ালেক্‌টিক্স্‌-এর বোধ অপরিহার্য।" চরিত্রের দ্বান্দ্বিকদিগের পরিচয় বোঝার জন্য ডায়ালেক্‌টিক্স্‌ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। আর দ্বান্দ্বিকদিকের সঠিক পরিচয় না জানলে চরিত্র সৃষ্টি কখনোই সম্ভব নয়। প্রতিটি চরিত্রকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রথমত সে শ্রেণীগত মানুষ। শ্রেণীগত মানুষ হিসেবে তার বেশভূষা, আচরণ প্রভৃতি কেমন হওয়া উচিত সেটা প্রথমে বুঝতে হবে। তারপর দেখতে হবে তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দিক। উৎপল দত্ত উদাহরণ সহযোগে সুন্দরভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন, "গোর্কির সাতিন, চোর-বেকার-ভবঘুরে অথচ দার্শনিক। ওথেলো উঠতি ভেনেশীয় প্রজাতন্ত্রের ভাড়াটে সেনানী অথচ প্রেমিকশ্রেষ্ঠ। হ্যামলেট এক বন্ধ্যা রাজ্যের রাজকুমার, অথচ সবচেয়ে অগ্রসর চিন্তাবিদ, প্রতি মুহূর্তে প্রতি চরিত্র শ্রেণীগত অথচ ব্যক্তিগত।" অভিনেতার আরও একটি দিক আছে। সেটা হলো, অভিনেতা যখন মঞ্চে নামেন তখন দর্শকবৃন্দকে কখনোই বুঝতে দেন না যে তিনি দিনের পর দিন মহড়া দিয়ে চরিত্রের হাঁটা-বসা-বাচনভঙ্গী এবং সমস্ত রকম ক্রিয়াকলাপ একেবারে মুখস্থের মতো তৈরী করে এসেছেন। এমন কি নাট্যকারের প্রতিটি সংলাপ পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠস্থ। তিনি দর্শকবৃন্দকে বোঝাতে চান যে এই মুহূর্তে মঞ্চে যে অবস্থার সম্মুখীন তিনি হয়েছেন তার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এ অবস্থার সঠিক রূপায়ণ কি ডায়ালেক্‌টিক্স্‌ না জানলে সম্ভব? জানার ভিতরে অজানাকে দেখা, আবার অজানার মাঝে জানাকে প্রত্যক্ষ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ডায়ালেক্‌টিক্স্‌।

ডায়ালেক্‌টিক্স্‌ না জানলে অনুকরণশীল অভিনেতা হয়তো হওয়া যায়, কিন্তু সৃষ্টিশীল অভিনেতা হওয়া কখনোই সম্ভব না। বিশ্বের সমস্ত নাট্যতত্ত্ব এবং নাট্যরীতি জানলেও না। তার প্রমাণ আমাদের সামনেই বর্তমান। আমরা জানি এবং কেউ কেউ দেখেছিও যে শিশিরকুমার ভাদুড়ী চাণক্য এবং মাইকেল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এ দুটি চরিত্র শিশিরবাবুর অন্যতম সার্থক সৃষ্টি। আবার এ দুটি চরিত্রের মধ্যে চাণক্য-চরিত্রে শম্ভু মিত্র এবং মাইকেল-চরিত্রে উৎপল দত্ত অভিনয় করেছেন (উৎপলবাবু এখনও করছেন)। কিন্তু শম্ভুবাবুর চাণক্য এবং উৎপলবাবুর মাইকেল নিশ্চয়ই শিশিরবাবুর অনুকরণ নয়। শিশিরবাবু, শম্ভুবাবু এবং উৎপলবাবু তিনজনই ডায়ালেক্‌টিক্স্‌ প্রয়োগ করে সৃষ্টিশীল অভিনয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। শম্ভুবাবু এবং উৎপলবাবু দিনের পর দিন শিশিরবাবুর অভিনয় দেখেছেন। তবুও তাঁদের অভিনয়ের মধ্যে শিশিরবাবুকে অনুকরণের বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই। এর একমাত্র কারণ, উভয় অভিনেতার ডায়ালেক্‌টিক্স্‌-এর সঠিক জ্ঞান। আমাদের চোখের সামনে এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও যখন দেখতে পাই যে মঞ্চে এ্যামেচার শম্ভু মিত্র এবং এ্যামেচার উৎপল দত্ত ছেয়ে গেছে তখন স্বভাবতঃই রাজনৈতিক জ্ঞানহীন এই অনুকরণশীল অভিনেতাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না।

কিছু কিছু অভিনেতা আছেন যাঁরা সব সময়েই বলে থাকেন যে, কোনো কোনোদিন তাঁরা অভিনয়ে দারুণ মুড পান। সেদিন তাঁরা খুব ভালো অভিনয় করেন। আবার কোনো কোনোদিন তাঁরা অভিনয়ে মোটেই মুড পান না। সেদিন তাদের অভিনয় খারাপ হয়। এই রকম উদ্ভট ধারণা তাঁদেরই থাকে যাঁরা রাজনীতিতে একেবারেই অজ্ঞ। এরা কোনোদিনই সৃষ্টিশীল অভিনয় করতে পারবেন না। মুড-নামক সোনার হরিণের সন্ধান করেই এ'দের সারাজীবন কাটবে। কখনও কখনও খানিকটা প্যাঁচ পয়জার দেখিয়ে নিরেট দর্শকদের কাছ থেকে হাততালি পেয়ে আত্মতুষ্টি পেতে পারেন। কিন্তু সৃজনশীল শিল্পকর্ম থেকে এরা চিরদিন এক শ' হাত দূরে অবস্থান করবেন। অথচ ডায়ালেক্‌টিক্স্‌ বিশ্লেষণে নিমগ্ন অভিনেতাদের এ বালাই নেই। তাঁরা প্রতি রাতেই নতুন নতুন সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাঁরা কখনোই মুড-নামক সোনার হরিণের পিছনে ছুটে বেড়ান না। তাঁদের মন সব সময়ই থাকে সৃষ্টির আনন্দে ভরপুর। মঞ্চে তাঁদের চলাফেরা, কথা বলা—কোনোটাই যান্ত্রিক বলে মনে হয় না। সব কিছুই তাঁদের কাছে রসঘন। কারণ, তাঁরা যে ডায়ালেক্‌টিক্স্‌-রূপী পরশ পাথরের সন্ধান পেয়েছেন। রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন অভিনেতাদের কাছ থেকে সব সময়ই সৃজনশীল শিল্পকর্মের সৃষ্টি হবে। তাই প্রতিটি অভিনেতার সঠিক রাজনৈতিকজ্ঞান অপরিহার্য।

অভিনেতা সম্বন্ধে এতো কথা বলতে হলো এই কারণে যে থিয়েটারে অভিনেতাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পরিচালক যতো মুন্সিয়ানাই দেখান না কেন—আঙ্গিকের যতো রকম সার্থক প্রয়োগই করুন না কেন অভিনেতা যদি সঠিকভাবে চরিত্র বিশ্লেষণ করে ডায়ালেক্‌টিক্স্‌ প্রয়োগ করতে না পারেন তাহলে সৃজনশীল থিয়েটার কিছুতেই হবে না। পরিচালকমশাই চরিত্রের দ্বান্দ্বিক দিক বক্তৃতার মাধ্যমে হাজারবার ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন্তু অভিনেতাটি যদি রাজনীতির দিক থেকে নিরেট হন তাহলে পরিচালকের সমস্ত শ্রমই ভস্মে ঘি ঢালা হবে। কেন না, অভিনয়ের সময় সেই রাজনীতিজ্ঞানহীন অভিনেতাটি মুড-নামক সোনার হরিণ খুঁজে বেড়াবেন। তাই পরিচালকের সর্বপ্রথম কর্তব্য, প্রতিটি অভিনেতাকে রাজনীতিতে দীক্ষা দেওয়া। ডায়ালেক্‌টিক্স্‌ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একজন পরিচালককে কতো বিরাট দায়িত্বের বোঝা বহন করতে হয়। পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা কতোখানি কষ্টসাধ্য ও অধ্যয়নসাপেক্ষ।

এবার আমরা অনুধাবন করতে পারছি যে থিয়েটারকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার অর্থ শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত শক্ত করাই নয় সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারের শৈল্পিক মানও নিম্নমুখী করা। আজ এটা সর্ববাদিসম্মত যে থিয়েটারকে শিল্পসম্মত উপায়ে প্রস্তুত করতে হলে প্রতিটি শিল্পীর রাজনৈতিক জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। তাই যাঁরা বলেন যে, থিয়েটারে রাজনীতির প্রবেশ ঘটলে থিয়েটারের শৈল্পিক দিক নষ্ট হবে তাঁরা জেনেশুনেই একটি ভুল কথা প্রচার করে থাকেন। আমরা এ-ও জানি যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে থিয়েটার একটা না একটা শ্রেণীর কথা বলবেই। হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর কথা—তা না হলে শোষিত মানুষের কথা। কিন্তু আজ আমাদের বেছে নিতে হবে চলার সঠিক রাস্তা। কোন্ থিয়েটারকে আমরা গ্রহণ করবো? বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী নিম্নমানের থিয়েটার? না, শোষিত মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী শিল্পসম্মত রাজনৈতিক থিয়েটার? স্বাভাবিকভাবেই আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর থিয়েটারকে চাইবো। আমাদের দাবী হবে, সমস্ত শোষণ, বঞ্চনা আর নির্যাতনের কথা মূর্ত হয়ে উঠুক আজকের থিয়েটারে। শোষিত-বঞ্চিত আর নির্যাতিত মানুষ খুঁজে পাক তাদের মুক্তির পথ আজকের থিয়েটার থেকে। তাই আজকের থিয়েটারকে সঠিক অর্থেই হয়ে উঠতে হবে রাজনৈতিক থিয়েটার।

গ্রামাঞ্চলে শিশুঅন্ধত্ব নিবারণ : চাই যৌথ

সম্প্রতি বেশ কয়েকটি গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে গ্রামাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ৭০-৭৫ ভাগ মানুষ দৃষ্টিহীনতায় ভুগছেন। ভাবলে অবাক হতে হয় এর মধ্যে ছোট ছোট শিশুর সংখ্যাই ৫০ ভাগ। এই পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অধিকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে।

গ্রামাঞ্চলে এই বিপুল হারে বেড়ে যাওয়া দৃষ্টিহীনতার পিছনে রয়েছে মূলতঃ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, কু-সংস্কার, অজ্ঞতা ও ভিটামিন 'এ' খাদ্যের অভাব। বিশেষজ্ঞদের অভিমত ভিটামিন 'এ'-র অভাবে প্রথমে দেখা যায় 'রাতকাণা রোগ'। ভিটামিন 'এ'-র স্বল্প অভাবে দেখা দেয় 'কনজাংটাইভা' অর্থাৎ চোখের মণির সাদা অংশ ঘোলাটে হয়ে যায়, উজ্জ্বল চকচকে হওয়ার বদলে দেখায় শুকনো ও নিষ্প্রভ। ফলে দিনাবসানের সাথে সাথে শিশুরা নানারকম অসুবিধা অনুভব করে। এই ধরনের কষ্ট যদি প্রারম্ভিক অবস্থায় ধরা পড়ে তাহলে চিকিৎসার দ্বারা এই রোগের উপশম হয়। এছাড়া 'রেটিনো ব্লাস্টামো' নামক বংশগত রোগ শিশুদের জীবনে অন্ধত্বকে ডেকে আনে। এ রোগের উপসর্গ হল শিশুরা মাতৃস্তন পান করতে কষ্টবোধ করে, চোখ অত্যন্ত জ্বালা করে এবং চোখের মণি বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসে। এছাড়া উদরাময়, কৃমি সংক্রান্ত রোগে সঞ্চিত ভিটামিন 'এ' শেষ হয়ে যায়। তখন স্বাভাবিক কারণে ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত রোগ দেখা দেয় এবং অচিরেই অন্ধত্বকে ডেকে আনে।

এখন প্রশ্ন হল এই সমস্ত ফুলের মত শিশুদের জীবন থেকে ক্রমবর্ধমান দৃষ্টিহীনতাকে কিভাবে নিবারণ করা সম্ভব? কিভাবেই বা গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে এই অন্ধত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ও তার প্রতিকার এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা গড়ে তোলা যায়?

এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির অধিকর্তাদের সাথে আমার সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তাঁরা মনে করেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর প্রত্যেক মায়ের উচিত শিশুদের স্বাস্থ্যের দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা। সন্তানের বয়স যখন ২ থেকে ৩ দিন হবে তখনই তার চোখ দুটিকে বীজাণুহীন 'সোয়াব' দ্বারা এ্যান্টিসেপ্টিক লোশনের সাহায্যে ধুয়ে দিতে হবে। শিশু যাতে ঠিকমত ভিটামিন 'এ' পায় তা তখন থেকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে এ সময় যাতে সে মায়ের দুধের মধ্যে নিহিত 'কলস্ট্রাম' (colustrum) ঠিকভাবে পায়। শুধু শিশু নয় মা-ও যাতে

সুহাস মজুমদার

৬০০০ আই. ইউ. পরিমাণ ভিটামিন 'এ' গ্রহণ করে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা উচিত। গ্রামাঞ্চলে অনেক মা আছেন যাঁরা পারিবারিক কু-সংস্কার-বশতঃ নিজের সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করেন। ফলে শিশুর ভিটামিন 'এ'-র অভাব ঘটে এবং অচিরেই শিশুর মধ্যে দেখা দেয় নানা রকম রোগ। কিছুকাল বাদেই নীট ফলস্বরূপ শিশু অন্ধত্বের কবলে পতিত হয়। শিশু যখন ভাত খেতে আরম্ভ করবে তখন তার প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় থাকতে হবে মাছ, মুসুর ডাল, গাজর, কুমড়া, টাটকা শাক-সব্জি। এর সবগুলোতেই রয়েছে ভিটামিন 'এ'।

৫/৬ মাস বয়সেই শিশুকে অভ্যস্ত করতে হবে চটকানো খাদ্যে এবং সুপে। যেমন রাঙ্গা আলু সিদ্ধ, বিন সিদ্ধ, ডিমের কুসুম প্রভৃতি অল্প অল্প পরিমাণে দিতে হবে। সুপের মধ্যে থাকবে মাছ বা মেটে, টাটকা সব্জি, মুসুর ডাল। ভাতের সঙ্গে চটকে মেখে খাওয়ালে এর থেকে ভিটামিন 'এ'-র 'কেরোটিন' শরীরে গিয়ে ভিটামিন 'এ' তৈরী করে। টাটকা শাক-সব্জির মধ্যে পালংশাক, নটেশাক, মূলাশাক প্রভৃতি ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ। অন্যান্য সব্জির মধ্যে গাজরে, কুমড়ায় ভিটামিন 'এ'-র প্রাধান্য ব্যাপক। যে-সব শিশু উদরাময়ের জন্য শাক-সব্জি হজম করতে পারে না, তাদের এমন প্রাণীজ খাদ্য দিতে হবে যা ভিটামিন 'এ'তে সমৃদ্ধ। এ বিষয়ে চিকিৎসকদের মতামত গ্রহণ করে ভিটামিন 'এ' ট্যাবলেটও গ্রহণ করা যায়।

এখন কথা হল শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কিত এই যে ডাক্তারি তালিকা, তা গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর মায়েদের মধ্যে কিভাবে সহজ পন্থায় প্রবেশ করানো যায়? সমস্যাটি ভয়াবহ হলেও কাজটি কিন্তু আদৌ কঠিন নয়! এ ব্যাপারে মাননীয় সরকার ও গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে সজাগ হতে হবে। সরকারের দায়িত্বে দৃষ্টিহীনতার প্রাথমিক কারণগুলি সম্পর্কে আঞ্চলিক ভাষায় লেখা সতর্কপত্র বিলি করতে হবে। ট্রাকোমা, গ্লুকোমা, রেটিনো ব্লাস্টামো প্রভৃতি রোগ সম্পর্কে চলচ্চিত্র, বেতার, টি.ভি. গ্রামের পোস্ট অফিস ও পঞ্চায়েত অফিস থেকে এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালাতে হবে।

সুখের কথা, বামফ্রন্ট সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত হচ্ছে চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র। এই সব ক্যাম্পে অপারেশন-এর সুবিধা নিয়ে বহু মানুষ ফিরে পাচ্ছেন লুপ্ত দৃষ্টিশক্তি। গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসাকেন্দ্র এ ব্যাপারে বিশেষ তৎপর হয়েছে। প্রত্যেকটি সরকারী হাসপাতালে নতুনভাবে খোলা হয়েছে আই ব্যাঙ্ক। শুধু সরকারী উদ্যোগে নয় এ ব্যাপারে চাই জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা। সরকারী উদ্যোগ ও জনসাধারণের হার্দিক প্রচেষ্টা —এই দুয়ের যৌথ প্রয়াসেই একমাত্র গ্রামাঞ্চলে শিশু অন্ধত্ব নিবারণ সম্ভব। আর এই সম্ভাবিত সম্ভাবনার মধ্য দিয়েই সার্থক হয়ে উঠুক এ বছরের প্রতিবন্ধী বর্ষের শেষ কয়েকটি দিন।

সুখের রঙ হলুদ

কিলো, ত'র হাল?

সাথীদের ডাকে মুখ তোলে দুলি। হলদে রং-এর পাতাটাকে ওপাশে সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। দ্যাখে ঝুনি, কমলি, সীতা ওরা পাতার বোঝাগুলোকে লতা দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। এবার ফেরার পালা।

অস্পষ্ট ছায়া ঘিরে ধরেছে বনটাকে। পাখীদের কলরবও প্রায় স্তিমিত। শাল-সেগুনের পাতাগুলো এখন ছাতার মতো লাগছে। নিশাচরদের বেরুবোর সময় হয়েছে।

পায়ের কাছে জমানো পাতাগুলো দ্যাখে দুলি। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারা যায় না। কোমরটা টনটনিয়ে ওঠে। অসংবৃত শাড়ীটাকে পেঁচিয়ে কোমরে জড়ায়।

তরা যা, আমি একটুন পরেই যাব।

ওরা আর দ্বিরুক্তি না করে বোঝাগুলোকে মাথায় চাপিয়ে বনপথের সরু রেখাটায় পা চালায়। ঝুনি পিছন ফিরে দুলিকে পাতা কুড়োতে ব্যস্ত দেখল।

'তাড়াতাড়ি আসিস কিন্তুক।'

কথা ক'টা ছুড়ে দিয়ে সঙ্গীদের অনুসরণ করল।

কিছুক্ষণ পরে দুলির ভুল ভাঙ্গল। নাঃ, আর নজর চলছে না। এবার ফিরতেই হবে। ছোট্ট বোঝাটা বেঁধে মাথায় তোলে। আন্দাজে পায়ে চলার রাস্তাটা ধরে। তবু ভাল, এ বনটায় কোন হিংস্র জন্তু নেই। মাঝে মাঝে আধবাঘাগুলো বেরোয়। নেহাত দুর্বল লোক না হলে তেড়ে আসে না। আশৈশব পরিচিত পথে চলতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না তার। নদীটার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। বোঝাটাকে নামিয়ে দু' হাত ভরে জলপান করে। পেটের রাক্ষসটা আপাতত শান্ত হলো। কখন খেয়ে বেরিয়েছিল এখন মনে পড়ছে না। অন্যদিন কাক না ডাকা ভোরে চলে আসে। আজ একটু সময় পেতে অবেলাতেই চলে এসেছে।

খোড়ো ঘরের ঝুপড়িটার আগড় ঠেলে দুলি ঘরে ঢোকে। বাইরে তখন সন্ধ্যাদেবী লক্ষ জোনাকীর মালা পরে অভিসারিকার বেশে সজ্জিতা। ঝিঁঝি পোকার তানে অজানা রাগিনীর আলাপ শুরু হয়েছে।

ভেতর থেকে কথার টুকরো ছিটকে আসে। এ্যাত রাত্ হল যে?

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না দ্বিতীয়জন।

প্রশ্নকারীর উষ্মা বেড়ে ওঠে। লক্ষ্য পড়ে ছোট্ট বোঝাটার উপর।

এ্যাই দুটি পাত, কি কচ্ছিলি এ্যাতখন, সনুগে ত উয়ারাও গ্যেছল।

এবারও চুপচাপ রইল দুলি। কলঙ্গা থেকে ডিবাটা বের করে। হাতড়ে হাতড়ে দিয়াশালাইটাও। একটি মাত্র কাঠি বের হয়। থমথমে গলায় বলে ওঠে—আর খাড়িগুলান কি হ্যল? দুলির কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতায় রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়।

সরাদিন ব্যসে ব্যসে বিড়ি টানা হইছে লয়?

খাটিয়ায় শুয়ে থাকা কুঁকড়ে যাওয়া লোকটা এবার ওপাশে মুখ ঘুরিয়ে শোয়। দুলির স্বামী লখা।

শেষ শক্তি দিয়ে জ্বলে ওঠার পূর্বমুহূর্তে ডিবাটা টিমটিম করতে লাগল। তৈল অভাব ঘোষিত।

আদ্দেক টেপা পাতাগুলো সাজিয়ে রাখে দুলি। আড়চোখে তাকায় লখার দিকে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। কে বলবে দু' বছর আগের লখা আর এই কুঁকড়ে যাওয়া লোকটা এক।

কি তাগড়াই চেহারা ছিল। পেশীর কুঞ্চন সর্ব শরীরে খেলা করত। আর ছিল একবুক সরলতা। ওর পলকহীন মুগ্ধ চোখে চোখ রাখতে গিয়েই দুলি মরেছিল। বাপ-মায়ের অমতে জোর করে

সমীর দত্ত

লখার ঘরে চলে এল. মাঝখানে কয়েকটা উজ্জ্বল মুহূর্তের পরনা। মেয়েগুলো লখার প্রশস্ত বুকের দিকে তাকিয়ে দুলিকে হিংসে করত। আর দুলি ওর বুকে মাথাগুঁজে স্বপ্নরেণু মাখতে মাখতে আবেশে বুঁদ হয়ে যেত।

হঠাৎ বিপর্যয় নেমে এল ওদের সংসারে। বহুদিনের পুরানো মনিব লখাকে তার কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিল। নতুন আইন হয়েছে ভাগচাষীদেরও নাকি জমিতে ন্যায্য অধিকার রয়েছে। লখা জমির আশা কোনদিন করেনি। শুধু জমিটাতে লাঙ্গল চালাতে চালাতে মনে পড়ত তার বাপও একদিন এ জমিকে উর্বরা করেছিল শরীরের ঘাম দিয়ে। তখন জমিটা ছিল তাদের। তারপর কোন এক সময়ে মনিবের কুক্ষিগত হয়ে গেছে টের পায়নি। শুধু স্বপ্ন বুকে নিয়ে হালের বাঁটকে জোরে আকড়ে ধরতো। তবু মনিব তাকে আর বহাল করেনি। অসংখ্য ভাগচাষী উচ্ছেদ বলির শরিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে কোনক্রমে বেঁচেবর্তে রইল। আস্তে আস্তে বোঝা গেল মনের সাথে শরীরটাও ক্ষয়ে এসেছে। ক্ষয়রোগে ধরল তাকে। সংসার চালানোর কাণ্ডারী এখন দুলি। তাও কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু মাঝখানে এইকটা খরার মাসে অসম্ভব টানাপোড়নে চলতে বাধ্য হয়েছে। শরীরে আর একজনের উপস্থিতি টের পেয়েছে। এ সময় মেয়েদের একটু সাবধনে থাকতে হয়।

লখাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দ্যায় দুলি। সামনে শালপাতায় ভিজাভাত, নুন আর সামান্য ওলসিদ্ধ ধরে দেয়। লখা মুখ গোঁজ করে দুচার গ্রাস মুখে পোরে। বুনো ওলের কিরকিরাণি আজ তার কাছে অসহ্য লাগে। চিৎকার করে পাতা ধরে টান মেরে ফেলে দ্যায়। খাবারগুলো ছিটকে লাগে দুলির গায়ে। ও প্রস্তরমূর্তির মতো বসে থাকে। নিঃশব্দে দেখতে থাকে কাণ্ডগুলো। এক সময় ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে লখা আবার বিছানায় আশ্রয় নেয়।

জায়গাটা পরিষ্কার করে দুলি। ছড়িয়ে থাকা ভাতের কণাগুলো জড়ো করে এক জায়গায় রেখে দ্যায়। ডিবাটা এক সময় বিনা নোটীশে দপ করে নিভে গেল। ভেতর-বাহির সব একাকার।

খাবার রুচি ছিল না দুলির। কাপড়ের খুঁটটা মেলে মেঝেতে গা এলিয়ে দ্যায়। একটা জোনাকি পাতাগুলোর ভেতর ঢুকে পড়েছে। রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। দুলি মনে মনে হিসাব কষছিল কাল বাজারে ওথেকে কতো পাওয়া যেতে পারে। ওই শীর্ণ মানুষটার জন্য সত্যিই তার দুঃখ হয়। মনের গভীরে কেমন একটা অসহায়তা বোধ জাগে। আস্তে আস্তে উঠে বসে। লখার মাথার চুলে আঙুল চালায়। স্পর্শে লখার ক্রোধ বেড়ে যায়। জ্যামুক্ত তীরের মতো মাথাটাকে এক ঝটকায় ওপাশে সরিয়ে নেয়। বিষাক্ত ফলার মতো কথাগুলো দুলির বুকে বেঁধে।

থাক-থাক অত সুহাগ দিখাতে হবেক নাই। তুই মর না কেনে, মরলে আমার শরীলটা জুড়ায়।

বহুক্ষণ কোন কথা বলতে পারে না দুলি। ধরা গলায় বলে ওঠে, আমি মরলে তুই সুখী হবি ত। তার পরের কথাগুলো অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুলি বিড়বিড়িয়ে ওঠে। এখনই মুরে দেখাই দিথম, কিন্তুক আর একটা পেরাণকে মারবার কুনো অধিকার ত আমার নাই। কথাগুলো কেমন হেয়ালি ঠেকে লখার কাছে। কানজোড়া সজাগ হয়ে ওঠে দুলি তখনও বিড়বিড়িয়ে চলেছে।

পেটের শত্তুরটাকে খালাস না করে মরার উপায় আছে কি। কথাগুলো বোধগম্য হতে দেরী হয় লখার কাছে। মর্ম অনুধাবন করে হতভম্ব হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো বিছানায় উঠে বসে। শীর্ণ হাতখানা দুলির কাঁধে রাখে। সত্যি দুলি তুই যা বলছিস সত্যি। দুলি জবাব দেয় না।

দীর্ঘকাল পরে একরাশ আনন্দ পাওয়ার স্বাদে লখা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। দুলির দুকাঁধ ধরে ঝাঁকানি দ্যায়। বল দুলি, তুই যা বলছিস সত্যি, সত্যিই আমাদের ছেল্যা হবেক?

যেন বহুদূর থেকে সাড়া আসে, হুঁ।

গলগল করে দুচোখ বেয়ে অশ্রুপ্লাবন নেমে আসে তার। আর লখা তখন অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দুলির চোখের জলের দাগ মুছতে ব্যস্ত। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বৃষ্টিস্নাত আরেক লখা জমিতে লাঙ্গল দিচ্ছে।

অনেক কাল থেকে আমার বাঁচতে ইচ্ছা করে

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক কাল থেকে আমার বাঁচতে ইচ্ছা করে
শরতের মেঘের মত নিশ্চিন্ত আরামে ঘুম।
পিঞ্জরে গুটিয়ে আছি রোমীয় যুগ থেকে
তারও আগে পিরামিডের পাথরভাঙার কালে
কিম্বা হরপ্পার সভ্যতার ঢেউয়ের নীচে।
তবু বেঁচে আছি,
বেঁচে আছি দুটি হাতের জোরে—
যে হাত লাঙল ঠ্যালে কিম্বা চাকা ঘোরায়।
প্রাণান্তকর পরিশ্রমে জঞ্জাল ঠেলে
খড়-কুটো দিয়ে নীড় গড়ে
ক্লান্ত দেহে ফিরে দু-চোখ বুজি।
সে আরামটুকুও কেড়ে নেয় ওরা,
যারা সসাগরা ধরণী ইজারা নিয়েছে—
মাটি-আলো-বাতাস সব ওদের,
ওরা বরপুত্র। ওরা আইন বানায়,
ওরাই বিচারক। ওদের হাত পা বাড়ে,
ক্ষুধাও বাড়ে কুম্ভকর্ণের মত।
সঙ্কুচিত আমি হাইড্রা কিম্বা
থ্যালোফাইটায় পরিণত হবার মুখে।
হই না, আমার পেশীর জন্যই,
যার পরে ওরা বেঁচে আছে
ওদের বাড়-বাড়ন্ত যুগে যুগে।
পেশীটুকু বাঁচাতেই ওরা
ওদের বাড়তি খাবার দেয় আমাকে—
খুঁটে খাই সেইটুকু, বন্ধঘরে
ওদের ফেলে দেওয়া বাতাসে
ফুসফুস ফোলাই, আমার রক্ত
হারিয়ে ফ্যালে রঙ, হলুদ চোখে দেখি
বিবর্ণ আকাশ, যৌবনে গ্রহণ লেগে
পূর্ণিমা ঢাকা পড়ে।
হঠাৎ ঢেউ উঠেছে নিস্তরঙ্গ ভাবনায়
সভ্যতার পালে লেগেছে নতুন হাওয়া
জোয়ার আসছে আমার চেতনায়।
আমার এবং তোমার—
হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি
জীবনে মৌসুমী বাতাসের সজীবতা।
শোষিত আমরা এক আকাশের নীচে
বিশ্বাস আর প্রত্যয় অঙ্কুরিত,
চোখে নতুন বিশ্বের স্বপ্ন—
রাহুমুক্তির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
সমাজের নতুন আঙিনায়
বসন্ত উৎসবে আবির খেলব
আমাদের চেনা-চেনা মুখে।
মাথা তুলব হিমালয়ের মহিমা নিয়ে,
গঙ্গার স্নিগ্ধতা দিয়ে গড়ে তুলব
শিশুদের পৃথিবী।
তুমি এবং আমি
শোষিত বঞ্চিত শ্রমিক আর
আমাদের চেতনার সঙ্গমে।

তিনি

অচিন চক্রবর্তী

রোজ রাত্তিরে ঘুম ভাঙলেই দেখি
তিনি যাচ্ছেন ফিরে যাচ্ছেন ফিরে আসছেন
তীরে আসছেন তিনি
রোজ রাত্তিরে ঘুম ভাঙলেই দেখি
মাথার ওপর সারা নীল জুড়ে তিনি ভাসছেন
সুখে হাসছেন তিনি।
ঝড়ে বন্যায় রৌদ্রে বৃষ্টিপাতে
পর্ণকুটীরে বস্তিতে ফুটপাথে
প্ল্যাটফর্মের যাযাবর সংসারে
স্বপ্নপুরীর সচ্ছল উৎসারে
বেঁচে থাকছেন তিনি
মধ্যরাতের খাঁ খাঁ ক্যানভাসে
ছবি আঁকছেন তিনি।
ডানা ঝাপটায় পিকাসোর সাদা পাখি
রোদে ঝলসায় হাতে-হাত রাঙা রাখী;
মাটি-থেকে-মেঘ প্রসারিত লোভী হাত
চেতনে চকিত অশনি-সম্প্রপাত
সব কিছু রুখে তিনি
হাজারো পেশীর গ্রন্থিল বাঁধে
টানটান বুকে তিনি।
সারারাত ধরে সারাদিন ধরে ভাঙাগড়া বিকিকিনি
বেঁচে থাকছেন ছবি আঁকছেন ভালবাসছেন তিনি॥

জল-রঙ-ছবি

মিনতি চট্টোপাধ্যায়

এই তো সকাল আকাশ দুলছে
আহত বাতাস শব্দ গুণছে
নদীর বাথান আলু থালু ঝড়
উড়ন্ত চিল ডানা নির্ভয়।

গূঢ় কুণ্ঠন তোর দুই চোখে
সবুজ লজ্জা নীল রোষ নিয়ে
এইখানে মাটি বড় স্রোতময়
হাঁপর ফুঁসছে কবির পাঁজরে।

এই সে বিকেল রক্তমাখানো
দোয়েলের শিস গূঢ় সুর ভাঁজে
দ্বাদশীর চাঁদ ভাঙছে আকাশ
পাথরে প্রথম শব্দ উঠছে
গর্ভকেশর মাথা চাড়া দেয়
সাহসী আঙুলে জলরঙ ছবি।

মিছিলের মাঠে

বীরেশ ঘটক

এখন অচেনা মুখ মিছিলের মাঠে।

মুখে ছায়া,
ছায়া ছায়া বাচালতা
দূরের বনস্পতি সবিস্ময়ে
দেখেছে তা।
অনেকে দেখেনি
মিছিলের মাঠে এল, গেল কারা, অনেকে দেখেনি।

মিছিলের মাঠে কিছু চেনা মুখ ছিল
চেনা কিছু নির্জনতা,
ক্রোধের কাঠিন্য কিছু, বিষণ্ণতা ছিল।
ছিল নাকি স্মৃতি কিছু
ফেলে যাওয়া অন্তর্মুখীনতা
চলে গেল স্বল্পপরিসরে কোন বৈঠকী আড্ডায়।

চেনা মুখ, মিছিলের মাঠে এলে
অচেনা মুখেও যেন চেনা কিছু সমাজবদ্ধতা।
মুখে মুখ, চোখে আলো, অচেনা বিকেলে
বড় বেশী ভাল হয়

অচেনায় চেনা খুঁজে পেলে।

উজ্জ্বল দিনের গোলাপী কথা

মৈনাক হাসান

ফুটন্ত ফুলের উপর থেকে
ছিনিয়ে নিয়েছে সাবলীল গন্ধমালা
নিঃশব্দে সন্ধ্যে নেমেছে, শব্দহীন চরাচর
একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে শীতের দুঃসহ সকালে
রাঢ়ের সীমাহীন তরতাজা আকাশে—সূর্যদেব—
বিষণ্ণতার প্রান্ত ছুঁয়ে হিংস্র আদিমতা
ছড়িয়ে যেতে চায় লোমকূপের অন্ধকারে
গন্ধমালার পুরনো ইতিহাস—

নিশপিশ করে ওঠে নখের ডগাতে ডগাতে
কয়েকটা লালতারা মার্কা দিন
আনতে হবে দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারে
উদীপ্ত যৌবনের প্রতিশ্রুতি
গন্ধমালার পুনরাগমনের দুর্বার আকাংখা
একি হিংসা? অহিংসার নিদ্রাভঙ্গ?

জীবনের কাছে জীবনের আবেদন
বাজারের পশরার কাছে
বলিষ্ঠ তারবার্তা, নবজীবনের অভ্যুত্থান
নতুন দিনের প্রসব যন্ত্রণা
শংখধ্বনিতে তোলপাড় করে মনের অস্থির
আকাশ
উজ্জ্বল দিনের—গোলাপী কথা—

শিল্প-সংস্কৃতি

নাটকঃ রতিকান্তের রঙ্গ

"প্রয়াস" নাট্যগোষ্ঠীর ইতোপূর্বের সফল নাট্য প্রযোজনা "অশ্বমেধের" পরের নাটক "রতিকান্তের রঙ্গ"ও কিছুদিনের মধ্যে কলকাতার কয়েকটি মঞ্চে অভিনীত হয়ে সিরিয়াস নাটক দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। এ নাটকেরও লেখক ও নির্দেশক বিদ্যুৎ নাগ। জোতদারের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-ত্রাসনের বিরুদ্ধে এ শতাব্দীর আটের দশকের চাষী-ক্ষেতমজুরদের রুখে দাঁড়াবার নাটক "রতিকান্তের রঙ্গ"।

বাংলাদেশের রঙ্গপুর গ্রামের হাজারো যুবকের মতো এক যুবক রতিকান্ত সাহা। এক ভাগচাষীর ছেলে। বয়ঃসন্ধিকালে যাত্রাপালায় রাজা-উজির সেজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানোর মোহে ঘর ছেড়েছিল রতিকান্ত। যাত্রাদলের মালিক—অধিকারীর জুলুম ও অমানবিক নির্যাতনে সে আবেগ কেটে যেতে বেশী সময় লাগলো না। এক রাতে পালিয়ে চলে এলো নিজের গ্রামে। আদিগন্ত জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশুতি রাতে বাড়ির পথে ফিরতে রক্তাম্বরা খড়্গধারিণী এক দেবীমূর্তি দর্শন করলো। আলাপে জানা গেল দেবী নয় নিতান্তই মানবী আর তারই মতো এক দুঃখী-জন। নাম মধুময়ী। স্বামীর ঘর-ত্যাগী, জোতদার প্রহ্লাদ গোস্বামীর আশ্রিতা নারী। জোতদারের নির্দেশে গহীন রাতে দেবী রণরঙ্গিণী সেজে গ্রামের সংখ্যাহীন ক্ষেতমজুরের সম্বৎসরের জীবন ধারণের সংস্থানের অধিকার ছিনিয়ে নেবার অপপ্রয়াসে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ফসলের ক্ষেতে ঘুরে বেড়াতে হয় তাকে। ধর্মীয় কুসংস্কারের ভূতকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা চলতে থাকে। অন্যদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে এবং বামফ্রন্ট সরকারের ভাগচাষীর বর্গা রেকর্ডের আইনে সমস্ত ক্ষেতমজুর ও ছোট কৃষক একতাবদ্ধ হতে শিখেছে। একদিকে যুবতী মধুময়ীর প্রেমের আশ্রয় অন্যদিকে বৃদ্ধ পিতা ও গ্রামের অন্যান্য আত্মীয় মানুষদের অস্তিত্বের সংগ্রাম, এই দুইয়ের টানাপোড়েনে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভোগে রতিকান্ত। সাময়িকভাবে জোতদারের চক্রান্তের পক্ষে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেও, অচিরেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজের সমাজের মানুষগুলোর পাশে এসে দাঁড়ালো সে। জোতদারের গুরুভক্তির আড়ালে জমি চুরির ও ভাগচাষীদের চাষের অধিকার হরণের কুমতলব বুঝে নিতে বিলম্ব হল না, গ্রামের অশিক্ষিত মানুষগুলোর। শেষপর্যন্ত গ্রামের সকল মানুষের তীব্র ঘৃণা ও প্রজ্বলিত ক্রোধের সামনে সাজানো রণরঙ্গিনীর হাতের খড়্গ নিজের হাতে তুলে নিতে দ্বিধা করলো না রতিকান্ত। তখন জোতদারের রক্ষায় এগিয়ে এলো কোর্ট কাছারির দম্ভ আর থানা-পুলিশ। কিন্তু জাগ্রত গণরোষের সামনে চিরদিনই অত্যাচারী শাসক-শোষককে হার মানতে হয়েছে, এই হোল মানব ইতিহাসের শিক্ষা।

মোদ্দা এই কাহিনীটুকু দর্শকদের সামনে যুক্তিগ্রাহ্য করেও শিল্পসম্মত উপায়ে উপস্থিত করার প্রচেষ্টা, একান্ত আন্তরিকতার সাথেই করেছেন নাট্যকার-নির্দেশক। জমিদারের ধর্মসভা পরিচালনা, ভাগচাষী নয়ন—আর জোতদার প্রহ্লাদ-কর্তার কবির লড়াই, পঞ্চায়েতের সভা, নায়কের বাল্যবন্ধু নয়ন আর বর্তমানের মধুময়ী ও প্রাক্তন জাহ্নবীর বিবাহিত জীবনের কাহিনী, রতিকান্ত-মধুময়ীর প্রেম, জোতদারের স্ত্রীর সক্ষমতা সত্ত্বেও

রতিকান্তের রঙ্গ নাটকের একটি বিশেষ মুহূর্ত

বন্ধ্যাত্বের বেদনা ও অপত্য স্নেহ ইত্যাকার নানা উপকাহিনী সংস্থাপনে নাট্যকার প্রায় তিন ঘণ্টা দর্শককে মোটামুটি আবিষ্ট করে রাখেন। রঙ্গপুরে গ্রামের মানুষের সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের রূপ প্রকট করতে নাট্যকারের সব চেষ্টাই যে সমানভাবে সফল হয়েছে তা নয়। নাটকটা রতিকান্তের রঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও নায়ক রতিকান্ত কোন কোন সময় যেন সামাজিক পারম্পর্য, মানুষের সংহতি ও সমষ্টিগত উদ্যোগ-তৎপরতা ব্যতিরেকে একক চেষ্টায় ভেল্কি দেখাবার প্রয়াস পেয়েছে যা সর্বত্র বাস্তব পরিবেশগত বিশ্বাসের মাটিতে হাঁটে নি। স্ত্রী বিয়োগান্ত গ্রামের চাষী নয়নের বৃদ্ধ পিতার রাতে দাওয়ায় একা থাকার শারীরিক ভয়ে সদ্য বিবাহিত পুত্র-পুত্রবধূর ঘরে আশ্রয় গ্রহণ গ্রামীণ পরিবেশ-পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বেমানান। দেবী রণরঙ্গিনী না দেবী সিংহবাহিনী এ বিতর্কের মীমাংসায় ক্ষেত্রে খানিকটা সময় বাঁচানো যেতো। নয়ন-জাহ্নবী পরস্পরকে অনেক কিছুর মূল্যে আবিষ্কার করার পরেও ঐ প্রসঙ্গে নয়নের দীর্ঘ সংলাপ এড়ানো যেতো। শেষ দৃশ্যে জোতদারের পক্ষ নিয়ে পুলিশের রতিকান্তকে গ্রেপ্তারের সময় বর্গারেকর্ডে-সামিল গ্রামের চাষীদের কিঞ্চিৎ জবুথবু ভাব যথেষ্ট সময়ানুগ নয়।

রতিকান্তের ভূমিকায় নাট্যকার-নির্দেশক বিদ্যুৎ নাগের অভিনয় দর্শক দীর্ঘদিন মনে রাখবেন। জোতদার প্রহ্লাদকর্তার ভূমিকায় পার্থসারথি দেবও যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবীদার। এক অবিস্মরণীয় চরিত্র উপহার দিয়েছেন জোতদারের গৃহভৃত্য কাঙালীচরণের ভূমিকায় পল্লব রায়। নয়ন চরিত্রে সুনীল সিংহের কিছু ম্যানারিজম লক্ষ্যণীয়। জাহ্নবী ও মধুময়ীর চরিত্রে মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জোতদারের স্ত্রী চরিত্রে মনিদীপা রায় তাদের ব্যথা-বেদনা আবেগ-সংশয় নিয়ে স্বাভাবিকতায় প্রতিষ্ঠিতা হতে পেরেছেন। প্রজাসমিতির সভাপতিরূপে মৃণাল ভট্টাচার্যের চলন-বলনে গ্রামীণ মানুষের স্বাভাবিকতা আরও বেশী আনা দরকার ছিল। গ্রুপ থিয়েটারের নাট্য প্রযোজনায় সামগ্রিকভাবে টিম এ্যাকটিং বিশেষভাবে মনে রাখার মতো। প্রয়াসের এই নাট্যার্ঘও তার ব্যতিক্রম নয়। মঞ্চে আলোর ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্য সৃষ্টি করে না। এমন এক সৎ নাট্য প্রচেষ্টার ব্যাপক জনপ্রীতি কামনা করি। **প্রণব চট্টোপাধ্যায়**

কবি শ্যামসুন্দর দে সম্মানিত

জীবনধর্মী ও গণমুখী বাংলা কবিতা চর্চার শিবিরে ও সুস্থ সংস্কৃতির আন্দোলনে শ্রীশ্যাম-

সুন্দর দের প্রসিদ্ধি দীর্ঘদিনের কালসীমায় বিধৃত। এ বছর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আকাশবাণী
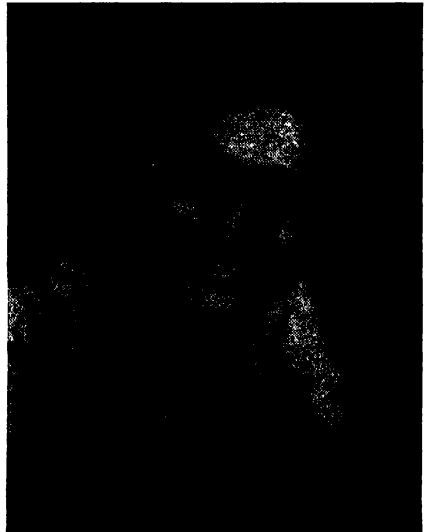
(শেষাংশ ৩২ পৃষ্ঠায়)

লোকচিত্রকলা

পথে এবার নামো সাথী......

শিল্পী : ভানু ত্রিবেদী

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

১৯৮১-র বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

অন্যান্য বছরের মতই ফেলে আসা বছর ১৯৮১-র ১০ই ডিসেম্বর বিভিন্ন বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ১০ই ডিসেম্বর আলফ্রেড বার্নাড নোবেল-এর মৃত্যুদিবস। ডিনামাইট-এর আবিষ্কর্তা আলফ্রেড বার্নাড নোবেল-এর নামানুসারেই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, সাহিত্য, অর্থনীতি এবং বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য প্রত্যেক বছর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এই পাঁচটি বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে শারীর ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং শারীর ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে আটজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এই আটজন বিজ্ঞানী এবং তাঁদের কাজকর্মের বিষয়ে এবার একটু খবরাখবর নেওয়া যাক।

পদার্থবিজ্ঞান

কাই সিগবান্ (সুইডেন), নিকোলাস ব্লোয়েম্‌বার্গেন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এবং আর্থার শ্যালো (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) একযোগে ১৯৮১-র পদার্থ-বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ইলেকট্রন ও লেজার স্পেকট্রোস্কপি বিষয়ে তাঁদের গবেষণার জন্যই তাঁরা নোবেল পুরস্কারের স্বীকৃতি পেলেন।

সুইডেনের উপশালা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাই সিগবান্-এর বর্তমান বয়স ৬৩। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, কাই সিগবান্-এর বাবা কার্ল মালে জর্জ সিগবান্ ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান।

নিকোলাস ব্লোয়েমবার্গেন ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১১ই মার্চ নেদারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি মার্কিন নাগরিক। বর্তমানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত আছেন।

আর্থার শ্যালো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হলেও ডক্টরেট করেছেন কানাডার টরেন্টো বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। ৬০ বছর বয়স্ক এই মার্কিন অধ্যাপক বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

পরমাণুর উপর এখন দুনিয়াজুড়ে নানারকম তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। আসলে পরমাণুর অন্তর্গত শক্তিকে বেশী রকম কাজে ব্যবহার করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই এহেন গবেষণার প্রতি-যোগিতা চলছে। আর গবেষণার ব্যাপ্তি যত বাড়ছে ততই আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন নতুন তথ্য। আবার এইসব তত্ত্বর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব। আর এইসব পারমাণবিক তত্ত্বর সঠিক ব্যবহারে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র বিস্তারিত হচ্ছে।

পরমাণুর কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস আছে। নিউ-ক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। ইলেকট্রনের পরিক্রমণের বিষয়ে বহুদিন এই ধারণাই পোষণ করা হত যে,—নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনের পরিক্রমণের কক্ষপথ আর সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহমণ্ডলীর পরিক্রমণের কক্ষপথ সমান। পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত হয় ইলেকট্রনের পথ পরিক্রমা। সৌর-জগতের গ্রহমণ্ডলীর পথ পরিক্রমার সদৃশ হলেও বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইলেকট্রনের কক্ষপথ পরিবর্তিত হয়। পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গেছে, উত্তাপ অথবা বিকিরণের প্রভাবে ইলেক-ট্রন কণা উদ্দীপ্ত হয়। উদ্দীপ্ত ইলেকট্রন নিজস্ব কক্ষ ত্যাগ করে অন্য পথে সঞ্চারিত হয়। বিকিরণে শক্তি শোষিত হবার দরুনই এই ব্যাপারটি ঘটে। শোষিত শক্তি পরিত্যক্ত হলে ইলেকট্রন নিজস্ব কক্ষে ফিরে যায়। বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রর সহায়তায় ইলেকট্রনের নিজস্ব কক্ষত্যাগ এবং কক্ষে ফিরে আসার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। আর একই সঙ্গে পরমাণুর গঠন এবং তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়। আলোকের কম্পাঙ্ক কমিয়ে বা বাড়িয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন কম্পাঙ্কের আলোক বিকিরণের প্রভাবে একই পরমাণুর বিভিন্ন ইলেকট্রন বিভিন্ন-ভাবে কক্ষচ্যুত হয়। লেজাররশ্মির সমতা গুণ বেশী হবার জন্য এবং তাকে ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ থাকায় লেজার রশ্মির সাহায্যে পরমাণুর বিভিন্ন অবস্থার পরিচয় অনেক পরিচ্ছন্নভাবে পাওয়া যায়। ব্লোয়েমবার্গেন এবং শ্যালোর গবেষণা এবং মৌলিক উদ্ভাবন পরমাণুর উপর লেজাররশ্মির ব্যবহার সংক্রান্ত। তাঁদের এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান পারমাণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছে।

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপির সাহায্যে পরমাণুর গঠন বৈশিষ্ট্য জানা যায়। কাই সিগবানের গবেষণায় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপির বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

রসায়ন

কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ে বিজ্ঞানীদের চিন্তার শেষ ছিল না। কারণ কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ মিলিত হয়ে কোন নতুন যৌগ তৈরী করার সময় ঠিক কি যৌগ তৈরী হবে তা আগে থেকে জানা সম্ভব ছিল না। সুতরাং রসায়নবিদদের বিক্রিয়ালব্ধ ফলাফল জানার জন্য অপেক্ষা না করে উপায় ছিল না। পরবর্তীতে তাঁদের আবার পরীক্ষা করে জানতে হত বিক্রিয়া-লব্ধ যৌগের ধর্ম, তাদের গঠনবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। আবার বিক্রিয়া শুরুর আগে তাঁদের পরীক্ষা করে করে জানতে হত কোন্ কোন্ বিক্রিয়ায় কি রকম অবস্থার প্রয়োজন। যেমন কোন বিক্রিয়ায় উচ্চচাপ প্রয়োজন, কোন বিক্রিয়ায় দরকার প্রচুর উত্তাপ আবার হয়তো কোন বিক্রিয়া সাধারণ অবস্থাতেই সংঘটিত হয়,—এই রকম সব নানারকম অবস্থা পরীক্ষা না করে জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বর উপর ভিত্তি করে রসায়নবিদরা পরীক্ষা না করেও বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলাফল, বিশেষতঃ বিক্রিয়ালব্ধ যৌগ সম্বন্ধে মন্তব্য করার অবস্থায় পৌঁছোলেন। অর্থাৎ কোয়ান্টাম তত্ত্বর সহায়তায় পরীক্ষাগারে না গিয়েও বিক্রিয়ালব্ধ যৌগর গঠনবৈশিষ্ট্য, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে জানতে বিজ্ঞানীরা সক্ষম হলেন। কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কৃত হবার পর দেখা গেল যে বস্তুজগতের যে কোন পদার্থ তা সে যৌগই হোক বা মৌলিক পদার্থই হোক না কেন তার ধর্ম নির্ভর করে পদার্থটির গঠনবৈশিষ্ট্যের উপর। অর্থাৎ পদার্থটির পরমাণুতে ইলেকট্রনের বিন্যাস পদার্থটির ধর্ম পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে। আবার ইলেকট্রনের বিন্যাসের উপর পদার্থটিতে পরমাণু-গুলির অবস্থান নির্ভরশীল। সব মিলিয়ে যে কোন পদার্থে পরমাণুর অভ্যন্তরীণ বিন্যাস এবং পরমাণুর সজ্জার উপর পরমাণুর ধর্ম নির্ণীত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট বহুবিধ বিষয় এখনও অজানা আছে। রাসায়নিক বিক্রিয়া সংক্রান্ত বেশ কিছু নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য এবার রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন জাপানের কেনিচি ফুকি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর রোনাল্ড হাফ্‌ম্যান।

৬৩ বছর বয়স্ক অধ্যাপক কেনিচি ফুকি ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জাপানের কিয়োটো বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। তিনি প্রথম জাপানী রসায়নবিদ্ যিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন।

রোনাল্ড হফ্‌ম্যানের জন্ম পোল্যান্ডে, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। নাৎসী বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করলে হফ্‌ম্যানের পরিবার চেকোশ্লোভাকিয়ায় চলে যান। পরে তাঁরা অস্ট্রিয়া, জার্মানী প্রভৃতি দেশে উদ্বাস্তুর জীবন যাপন করেন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। হফ্‌ম্যান ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত

(শেষাংশ ২৪ পৃষ্ঠায়)

এই আলোয় এই হাওয়ায়/জীবন সরকার

পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। দাম—ছয় টাকা।

কবি জীবন সরকার বিয়াল্লিশটি কবিতার এই সংকলনে একান্ত ব্যক্তিগত আবেগে সময় সংপৃক্ত গত দশকের জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কখনো তিনি আলোহীন ঘরে 'গুমোট গোঙানির শব্দে' আতঙ্কিত, কখনো রাখালিয়া বাঁশির আকাঙ্ক্ষায় অস্থির। এ সবকিছুই আমাদের যন্ত্রণা ও আশা নিরাশার বেলাভূমি ছুঁয়ে যায় এবং কবির ভাবনাচিন্তায় আমাদের সাধআহ্লাদ ফুটে ওঠে। কিন্তু কবি মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলে ওঠেন যে আমাদের ভাবনাচিন্তা 'গুবরে পোকার মত পিছলে যায়'। কারণ কি? আবেগের রশি ধরায় কবির অক্ষমতা না সময় ও কাল সম্বন্ধে অস্বচ্ছ ধারণা?

'বাউল হৃদয়ে ঝড়' কবিতায় কবি বলেন—'দীপালী/তোমাকে আমি সংগ্রামের স্তরে স্তরে/উত্তরণে পাশাপাশি রাখতে চাই' কিন্তু ঠিক পরের কবিতা 'এই আলোয় এই হাওয়ায়' শুনি—'প্রেম-প্রীতি স্নেহ-মায়া-মমতা/ব্যাপারগুলি ছুঁড়ে ফেলে/প্রস্তাবিত ধূসর জমিনে/লাঙল চালান/চাতকপাখীর ডানায়/বৃষ্টি নামবে/আর/চোখের জল, ঘামের জল/একাকার হয়ে ধান্য হবে।' এই 'চোখের জল' কার আর প্রেম-প্রীতি এসব ছুঁড়ে ফেলে দিলে কার জন্যে কিসের টানেই বা লাঙল চালানো? 'শিল্পের জন্য শিল্প' যেমন অমানবিক, বিপ্লবের জন্যেই বিপ্লব তাও অর্থহীন। এই ধরনের 'ধূয়াশা' দর্শন আর এলোমেলো ঝড়ঝাপ্টা 'এই আলোয় এই হাওয়ায়' পাঠককে মাঝে মাঝে পথভ্রান্ত করে দেয়।

শব্দের উপর কবির সবলতা ও দুর্বলতা দুইই চোখে পড়ে। স্থানে স্থানে শব্দের ব্যবহারে তাঁর উদাসীনতা কবিতার পেলবতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে বেশ কয়েক জায়গায় কিন্তু বেশ কিছু সাদামাটা কিন্তু সবল শব্দ ও পংক্তি মনে গভীর দাগ কেটেছে। 'অমার স্বপ্ন' কবিতায় নাড়া দেওয়ার মত কয়েকটি লাইন—'স্বপ্নের মতো এই কাপাসতুলো/এখন ভেসে বেড়াচ্ছে/এখন কেবল অফিস ফেরৎ মুঠো মুঠো/ক্লান্তি নিয়ে/স্বপ্ন খোঁজা চাঁদের/কিংবা মাটির'। কিংবা 'অশ্রুসিক্ত কাঠ/বর্ষা ধোয়া প্রবাল হাওয়ায়/শুধু ভেসে বেড়ায়/যে যায়—সে যায়—' (যে যায় সে যায়) বা 'ভাঙা নৌকায় জল সেচতে সেচতে বেলা গেল/তবু নদীর পারের খেলা শেষ হল না' (ঠিকানা)। এর পাশাপাশি 'পরানডা করে আনচান', 'কলকাতা! আমার কলকাতা', 'জীবন সরকার', 'অশনি সংকেত', 'মুন্সী প্রেমচন্দ' কবিতাগুলিকে খুবই দুর্বল মনে হয়। কবির কলমে ভালমন্দ সব লেখাই নানা সময়ে বেরিয়ে আসতে পারে কিন্তু প্রকাশকালে একটু নির্দয় হতেই হয় কারণ তখন তিনি কবি এবং সমালোচক।

কাব্যসংকলনটিতে 'নদী' এবং 'সাগর' উপমা হিসেবে বার বার এসেছে কিন্তু সবক্ষেত্রে কবিতায় নতুন কোন মাত্রা যোগ করতে পারে নি। কবি যদি অবশ্য উপমাটিকে কেন্দ্র করে ভাবকে ছড়িয়ে দিতেন তাহলে ঐ যুক্তি অবান্তর হয়ে যেত।

কাব্যগ্রন্থটিতে কবির আবেগের সততা আমাদের আশাবাদী করে তোলে এবং বেশ কিছু শব্দ ও পংক্তি আমাদের অনুভূতিকে নাড়া দেয়। তাই আশা রাখি, কাব্যের জমিতে 'লাঙল ডুবিয়ে চাষ' করে ভবিষ্যতে কবি সোনার ফসল ফলাবেন।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ বেশ ভাল।

জীবন জীবিতের/আশুতোষ দেবনাথ

পরিবেশক—নবসাহিত্য প্রকাশনী। ১২৮/১এ, রাজা রামমোহন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৯। দাম—ছ' টাকা।

একেবারে নতুন লেখকের আনকোরা বইয়ের নিজস্ব একটা স্বাদ থাকে, পাঠকের সাধও থাকে অনেকটা বেহিসেবী। আশুতোষ দেবনাথ তাঁর এই প্রথম গল্প সংকলনে আশা মেটাতে পারেন নি কিন্তু আশার তীব্রতা অবশ্যই বাড়িয়েছেন। সময়ে সময়ে খুবই হতাশ হয়েছি, আঁতকে উঠেছি পরিণতির অপরিণত রূপ দেখে কিন্তু এসব কিছুই তাঁর অভিজ্ঞতা ও ভাবনার সবলতা মনে দাগ কেটেছে বলে।

প্রথম গল্প 'ভোরের হুইসেল' শুরু হয়েছে এইভাবে—'শরতের আকাশে পান্ডুর চাঁদ। চারদিকে ম্লান জোছনা। কাদাভরা আঁকাবাঁকা পথে, চালের বস্তা বোঝাই একখানা গরুর গাড়ী চলেছে।' তারপরের মাত্র কয়েকটি লাইনে অদ্ভুত একটা পরিবেশকে গড়ে তুলেছেন লেখক। গাড়ি চালাচ্ছে ধলু সর্দার। জ্বর গায়ে সারাদিনের খাটুনিতে সে বড় শ্রান্ত। গাড়িতে বসে শংকর। তার ব্যবসা চাল পাচার। ধলু সে চাল গাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার ঘরে সারাদিন উনোন জ্বলেনি চালের অভাবে। গল্প ছবির মত ফুটে উঠছে কিন্তু গল্প যত এগিয়ে যাচ্ছে লেখক যেন সুর হারিয়ে ফেলছেন। কাহিনী যেখানে শেষ হোল তা আর পাঁচটা মামুলি গল্পের মত। ধলু কাদায় বসে যাওয়া গাড়িটা জেদের বশে তুলতে চায় না। এলোপাতাড়ি ধলুকে লাঠিপেটা করে শংকর। ওদিকে ভোর হয়ে আসে। ভোরের ডাউন ট্রেনের হুইসেলের শব্দে শংকর ঘাবড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

'অবনী পালের দুর্গামূর্তি' গল্পে নায়ক অবনী পাল পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট রাজেনবাবু ঠিকমত মজুরী না দেওয়ায় তাকে অসুর বানিয়ে দেয়। অবনী তার পোয়াতি বউয়ের ছবি ফুটিয়ে তোলে দুর্গার মধ্যে। অবনীর বেআব্রু জীবন ও ঘর-সংসার লেখক ভাল তুলেছেন কিন্তু পরিণতি দেখে মনে হয় অবনীর চেয়ে লেখক শেষ দিকে বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। ভাষার মধ্যেও দুর্বলতা আছে। পরবর্তী 'ঘরের আপন মানুষ' গল্পটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এই গল্পে। পারুলের 'শালা' শব্দ ব্যবহার এবং শ্বশুরবাড়ির লোক রেশন দোকানের যতীনকে ঘোমটার ফাঁকে 'যতীনদা' বলে ডাকা কিংবা মেঘের বিশেষণ 'ষড়যন্ত্রকারী'—ভাষার ব্যবহার অ-সচেতনার ফল।

'ঘরের আপন মানুষ', 'অহল্যার শাপমোচন', 'আশা' এই তিনটি সংকলনের সবচেয়ে শক্তিশালী গল্প। খুব সামান্য কথায় 'ঘরের আপন মানুষ' গল্পে সুদেব ও দুর্গা জীবন্ত হয়ে উঠেছে, টালমাটাল পরিবেশ গড়ে উঠেছে নিটোলভাবে। 'টালির ঘরের কাঠ পাতার ভাঙ্গাচোরা দাওয়ায় বসে সুদেব ছাঁচে গড়া মাটির পুতুলে গাঢ় গোলাপী রঙের প্রলেপ লাগাচ্ছিল'—এই সামান্য কটি শব্দে সুদেবও তার চারপাশের ছেঁড়াকাটা জীবন একাকার হয়ে যায়। 'অহল্যার শাপমোচন' সম্ভবত লেখকের পরবর্তী সময়ের লেখা—ভাষা ও ভাবের বাঁধুনী দেখে তাই মনে হয়। রতন ও সবিতার মনের এবং জীবনের চড়াই উৎরাই পথে যে অবিরত চলাফেরা তা প্রকাশের কারুকার্যে অসামান্য হয়ে উঠেছে। 'আশা' গল্পটি কলকারখানার কয়েকটি মজুর এবং হঠাৎ আগত একটি মেয়ের সামান্য কদিনের চেনা পরিচিতি এবং মনোজগতে তার প্রভাব এবং মেয়েটির আবার চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের পরোক্ষ অথচ সূক্ষ্ম একটি রূপ চমৎকার ফুটেছে।

'আরোগ্য' এবং 'মধুসুন্দরবন' দুটি অসামান্য গল্প খুবই চলতি পথে শেষ পর্যন্ত পরিণতিতে পেঁাচেছে। 'আরোগ্য' গল্পে প্রৌঢ় যামিনীর রক্ত দেওয়ার প্রস্তাব থেকে শেষ লাইনটি অবদি ('রাত জাগে ওরা') গল্পটি যদি শুধু কাহিনীর বাঁধনে আটকা না থেকে চরিত্রগুলির মনোজগতে একটু যাতায়াত করত (নিজেদের রক্ত দিয়ে যারা একটা মানুষকে জীবন দিতে চাইছে) তাহলে গল্পটি অসামান্য হয়ে উঠতে পারত। 'মধুসুন্দরবন' সেইসব মানুষদের নিয়ে যাদের ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমীরের সঙ্গে লড়তে হয় জীবিকার তাগিদে। ভাল ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক গোকুল, বাদল আর যদুকাকার মত মধুসংগ্রহকারীদের চরিত্রগুলিকে কিন্তু কাহিনী শেষ করেছেন খুবই মামুলিভাবে। এমন পরিণতি অনেক গল্পেই দেখা যায়।

সবশেষে বলতেই হয় লেখকের অভিজ্ঞতায়

প্রশংসনীয় ব্যাপ্তি ও গভীরতা আছে কিন্তু কলম এখনও ভাবকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারছে না। জীবনের গভীরতায় যখন তিনি ডুব দিতে চান ঐ জীবনের ভাষাকে আবিষ্কার করতেই হবে। আশা রাখি তিনি তা পারবেন।

বইটির ছাপা সাধারণ। প্রচ্ছদ বিশেষ আকর্ষণীয় নয় এবং অহেতুক অতিলৌকিক।

আঁতুড় ঘর/রাসবিহারী দত্ত

ক্রান্তিক প্রকাশনী; ১১, চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। দাম—সাত টাকা।

গ্রীক নাটকের অভিনয় দেখলে বা গ্রীক নাটক পড়লে আমাদের মনের মধ্যে যে হতাশা বোধ জাগে, আমরা যেমন পুতুলনাচের ইতিকথার চরিত্র হয়ে যাই অনুভূতির স্তরে স্তরে, রাসবিহারী দত্তের গল্প সংকলনটি পড়তে পড়তে আর এক অর্থে আমরা হতাশায় আক্রান্ত হই। কাহিনীর চরিত্রগুলি বারে বারে লেখকের হাতে ক্রীড়নক হয়ে পড়ে অথচ লেখকের কলমের গুণে নায়কোচিত ক্ষমতায় তারা গল্পে প্রবেশ করেছিল। ফল হয়েছে অনেকগুলি কাহিনীই কথা দিয়ে কথা রাখে নি। তবু সার্থক গল্পগুলির সার্থকতা দিয়েই হতাশার কারণ খোঁজা ভাল।

সংকলনের সবচেয়ে শক্তিশালী গল্পগুলি হোল 'আঁতুড়ঘর', 'চোখ', 'ভাঙাগড়া' ও 'বেত্তমিজ'। প্রথম গল্প অর্থাৎ 'আঁতুড়ঘর' গ্রামীণ জীবনের একটি বাস্তব ছবি। পচু বাগদি, পচুর বউ, ভানুর মা, সুখদা পিসী, সারদা খুড়ি, যশোদা মাসি—সব ক'টি জীবন্ত চরিত্র। পচুর বউ-এর প্রথম প্রসব এবং তা নিয়ে পাড়াপড়শির এত সমাবেশ। চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে গ্রামের লোকাচার ও লোক-বিশ্বাস কাহিনীতে প্রবেশ করেছে এবং একটি বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ওদিকে সরোজ জোতদার আজ আহ্লাদে আটখানা কারণ পচু আঁতুড়ঘরে একা বউকে ফেলে জমির ধান আগলাতে আসতে পারবে না। সুযোগ বুঝে সে লাঠিয়াল আনে। পাড়ার মেয়েরা আঁতুড়ঘর পাহারা দেয় আর পচু মরদদের নিয়ে জমি পাহারা দিতে যায়। লাঠিয়ালরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। গল্পের শেষ লাইনটি কাহিনীর সামগ্রিক পরিবেশে অসম্ভব আবেদন এনেছে—'যশোদা মাসি পিদিমটার সলতে আরেকটু উস্কে দিল।'

'চোখ' গল্পটি সার্থক হয়েছে রীতীশ ও বৈশাখীর দ্বন্দ্বকে লেখক জীবনযাত্রার বাস্তব অভিজ্ঞতায় এবং সমাজ ব্যবস্থার সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে পেরেছেন বলেই।

'ভাঙাগড়া' গল্পটির প্রথম লাইন—'অজ্ঞাতবাসের দ্বিতীয় মাসের গোড়ার খবর এল অর্জুনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে স্থানীয় মফঃস্বল শহরের এক মারোয়াড়ি বাড়িতে'—নিঃসন্দেহে খুবই চমকপ্রদ। চমক আছে কাহিনীর পরিণতিতেও। মাত্র ছিয়ানব্বই পাতার মধ্যভাগ হতে সাতানব্বই পাতার বেশ খানিকটা দীর্ঘতার কারণে খুবই ক্লান্তিকর। লেখক যা কিছুই বলতে চান না কেন সবই কাহিনীর ছন্দ ও লয়কে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। গল্পকে থামিয়ে ক্লাস নেওয়া অস্বস্তিকর।

'বেত্তমিজ' পরিবেশ, চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনী-বিন্যাসে বিশ্বস্ত ও সার্থক।

বাকি আটটি গল্পে লেখকের কলমের জোর স্থানে স্থানে প্রকাশ পেলেও কাহিনী বা চরিত্র বারে বারে থমকে গেছে স্রষ্টাকে স্থান করে দিতে। 'ধূপ' গল্পের নায়ক দিব্যেন্দুর বেকার বা হকার জীবনের কোন বাস্তব চিত্র লেখক উপস্থিত করতে পারেন নি। সেটি করতে পারলে এত বড় বড় বক্তৃতা তাকে দিয়ে শোনাতে হোত না; প্রয়োজন হোত না ট্রেন থামানোর, দিব্যেন্দুর মুখ থেঁৎলে দেওয়ার, অত বেশী রক্তপাত ঘটানোর এবং ধূপের ধোঁয়াকে কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠিয়ে দেওয়ার। কামরার মধ্যে দ্বন্দ্বটি খুবই স্থূল মনে হয়েছে এবং লেখক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন যাত্রীদের মধ্যে পরিবেশটি ঠিকমত তৈরি না করেই। বাস্তব সত্যকে সাহিত্য সত্যে উত্তরণের প্রয়োজনে যে গ্রহণ-বর্জনের প্রয়োজন হয় লেখক তা মেনে নেন নি।

'রাধাকান্তবাবুর বোধোদয়' পড়ে মনে হোল ছোট ছেলে কমলেশের মহত্ত্বকে বড় করার জন্যেই বড় দুটি ছেলে, তাদের দু' বৌ এবং নাতি-নাতনীদের লেখক অতখানি নীচতায় ঠেলে দিয়েছেন। শেষ দু' পাতায় রাধাকান্তবাবুর কথা-বার্তা এবং আচার-আচরণ দেখে বোধ হচ্ছিল রাধাকান্তবাবুর চেয়ে লেখক বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির ছেলের কাছে ক্ষমা চাওয়া, ছেলের বৌয়ের হাতে ধরা এবং 'বাঁধভাঙা বন্যার মত' চোখ ছাপিয়ে জলের স্রোত বইয়ে দেওয়া এ সব কিছুই বৃদ্ধ মানুষটির উপর মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার।

'রক্ষক' গল্পটি থানা অফিসারের ঘুষ নেওয়ার কাহিনী। খুব জানা বিষয় এবং অত্যধিক আলোচিতও। লেখক ব্যাপারটিকে গল্পের ছলে বলেছেন। আমাদের পাঠক চোখের কিছু বাড়তি আশা থাকে লেখক চোখের কাছে কিন্তু এখানে তা মেলে নি।

'সম্বিৎ' গল্পটি আগে সম্ভবতঃ "গল্পগুচ্ছ" পত্রিকায় পড়েছিলাম। এখানে পরিবর্তিত মনে হচ্ছে। স্মৃতির উপর নির্ভর করে তুলনা করতে গিয়ে আগের রূপটিকে আরো শক্তিশালী মনে হচ্ছে।

'বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র', 'মাৎস্যন্যায়', 'সুটিবেড়ের জঙ্গলে' মামুলি গল্প।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ বেশ ভাল।

*

জীবন সরকারের 'এই আলোয় এই হাওয়ায়', আশুতোষ দেবনাথের 'জীবন যে রকম' এবং রাসবিহারী দত্তের 'আঁতুড়ঘর' এই তিনটির মধ্যেই সভ্যতার চালিকাশক্তি শ্রমিক-কৃষক এবং তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের দুঃখবেদনার শরীক হওয়ার যে প্রচেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে তা আমাদের সত্তরের দশকের লেখকদের প্রতি আরো আশাবাদী করে তোলে। আরো গভীরভাবে জীবনের স্তরে স্তরে প্রবেশ করতে পারলে তাঁরা নিশ্চয় কিছু দিয়ে যেতে পারবেন যুগপৎ সমাজ ও সাহিত্যকে।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

[১৯৮১-র বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার : ২২ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

আছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ফুকি এবং হফ্‌ম্যান দুজনেই স্বাধীনভাবে তাঁদের গবেষণা করেছেন।

শারীর এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিন জন বিজ্ঞানী রজার ডব্লু স্পেরী, ডেভিড হিউবেল এবং টর্স্টেন ভিজেল ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে শারীর এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

রজার ডব্লু স্পেরী জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট-এর হার্টফোর্ড-এ। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ক্যালি-ফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজির অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর নিজস্ব গবেষণা ও অধ্যাপনার বিষয় হল মনোজীববিদ্যা।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর চোখ, কান, হাত, পা এমনকি ফুসফুস, কিডনি সবই থাকে দুটো করে। এমনকি স্তন্যপায়ী প্রাণীর মস্তিষ্কও দুটি। দুটি মস্তিষ্কের কাজ বিশ্লেষণ করার সুবাদেই স্পেরী ১৯৮১-র নোবেল পুরস্কার পেলেন। মস্তিষ্কের একেকটি অংশকে বলে,—হেমিস্ফীয়ার।

স্পেরীর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, অনুভূতি ও চিন্তা-ভাবনা করে অর্থাৎ অভিজ্ঞতা-প্রসূত চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারটি সম্পন্ন করা হল বাঁ হেমিস্ফীয়ারের কাজ। আর স্বতঃলব্ধ জ্ঞান এবং সৃজনশীল ক্ষমতার যোগান দেওয়া হল ডান হেমিস্ফীয়ারের কাজ। এমনকি কোন চিন্তার বহিঃ-প্রকাশ কিভাবে ঘটান উচিত এ কাজটিও করে ডান হেমিস্ফীয়ার।

হিউবেল এবং ভিজেল-এর গবেষণার ক্ষেত্রও কিয়দংশে মস্তিষ্ক। তবে তাঁদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল,—চোখ কোন দৃশ্য দেখলে তা কিভাবে স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ চোখের দেখা এবং মস্তিষ্কে সেই দৃশ্য স্নায়ু-তন্ত্রের মাধ্যমে পরিবহন সংক্রান্ত বিষয়টি ছিল এই দুই নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর গবেষণার মূল বিষয়।

ডেভিড হিউবেল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কানাডায় জন্মগ্রহণ করলেও বর্তমানে তিনি মার্কিন নাগরিক। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে নিযুক্ত আছেন।

টর্স্টেন ভিজেল ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরও কর্মস্থল হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি কাজ করছেন।

বিভাগীয় সংবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র-যুব উৎসব

২১ থেকে ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৮১ মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র-যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বহরমপুরের ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে। উৎসব উপলক্ষে যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয় তা শুরু হয় ১৩ই ডিসেম্বর থেকে। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন বিভাগে কবিতাআবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, কথকনৃত্য, অ-পূর্বকল্পিত ভাষণ, বিতর্ক, সূচীশিল্প, মডেল নির্মাণ, অংকন। জেলার সমস্ত ব্লক থেকে প্রতিযোগীরা এসেছিলেন। জেলার উত্তরে ফরাক্কা এবং পূর্বে জলঙ্গী থেকেও অংশগ্রহণকারীরা ব্লক যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে এসেছিলেন। প্রতিবন্ধীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

ক্রীড়ানুষ্ঠান: আন্তঃমহকুমা গ্রামীণ ফুটবল প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আদিবাসীদের তীর নিক্ষপ প্রতিযোগিতা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার মহিলা খো খো প্রদর্শনী, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার পুরুষদের কবাডি প্রতিযোগিতা প্রদর্শনী। তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় ৪০ জন আদিবাসী অংশগ্রহণ করেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সমস্ত ব্লক থেকে ২০০ জন প্রতিযোগী এসেছিলেন। প্রতিবন্ধীদেরও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়।

মূল অনুষ্ঠান: ২১শে ডিসেম্বর শিশু দিবস ও প্রতিবন্ধী দিবস হিসাবে উৎসব কমিটি পালন করেন। মূল অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে উৎসব উদ্বোধন করেন শিক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআবদুল বারি। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাধিপতি শ্রীনির্মল মুখোপাধ্যায়, জেলা শাসক শ্রীপ্রসাদ রায়, জেলা যুব কল্যাণ আধিকারিক শ্রীঅধীররঞ্জন ঘোষ। বিভিন্ন শিশু প্রতিষ্ঠান থেকে ৫ শতাধিক শিশুর সমাবেশ ঘটানো হয়। পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীআবদুল বারি।

সন্ধ্যায় প্রতিবন্ধী বিষয়ক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীআবদুল বারি ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা শাসক প্রমুখ।

২২শে ডিসেম্বর ছাত্র-যুব দিবস-এ উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস এবং রাজ্য প্রস্তুতি কমিটির সদস্য শ্রীঅমিতাভ বসু। শ্রীবিশ্বাস ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং ঐ অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। ব্রতচারী প্রদর্শনী হয়। আদিবাসীদের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে শ্রীবিশ্বাস পৌরোহিত্য করেন।

অন্যান্য দিবসগুলি যথাক্রমে শ্রমিক, কৃষক, স্বৈরতন্ত্র বিরোধী, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

উৎসব কমিটির হিসাব মত ৬ দিনে লক্ষাধিক মানুষ উৎসব প্রাঙ্গণে এসেছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় যাঁরা গ্রুপ থিয়েটার-এ বিশেষ জায়গা দখল করে থাকেন তাঁরা এবং অনেক অনামী প্রতিষ্ঠান নাটক পরিবেশন করেন। কলকাতা থেকে একটি নাটকের দল এসেছিল। পঃ বঃ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার মহুয়া নৃত্যনাট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সব পেয়েছির আসরের বহরমপুর শাখা ভারতীয় প্রাদেশিক লোকনৃত্য পরিবেশন করে। পাপেট থিয়েটারের নিবেদন—'একটি মোরগের কাহিনী' সর্বস্তরের মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করে।

উৎসব প্রাঙ্গণে ২৫টি বিভাগীয় স্টল অংশগ্রহণ করে। বিজ্ঞান পরিষদ, জেলা শিল্প কেন্দ্র, স্টল বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মীনা বাজার, পঞ্চায়েত, যুবকল্যাণ, স্বল্প সঞ্চয়, কৃষি বিভাগের

২১শে ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র-যুব উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহঃ আব্দুল বারি।

মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র-যুব উৎসবে আদিবাসীদের তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় প্রথম দশজন প্রতিযোগী।

স্টল বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মীনাবাজার নাগরদোলা, ছোট চিড়িয়াখানার ব্যবস্থা করা হয়।

২৬শে ডিসেম্বর ছিল শেষ দিন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি দিবস। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা শাসক শ্রীপ্রসাদ রায়। সভাপতিত্ব করেন বহরমপুর পৌরসভার পৌরপিতা শ্রীজনার্দন ঘোষ। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ৭৬-ব্যাটেলিয়ন কর্তৃক শেষ দিন ২৬শে ডিসেম্বর রাত্রি ১১টায় আতসবাজী পোড়ানর মাধ্যমে যুব উৎসবের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

এ ছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র-যুব উৎসব উপলক্ষে একটি স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। তাতে জেলার এবং জেলার বাইরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লেখা প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি প্রকাশনার মধ্য দিয়ে জেলার ছাত্র-যুব উৎসবের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

মুর্শিদাবাদ জেলার যুব উৎসবের প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রতিযোগীদের (অংশগ্রহণের) সংখ্যা নিম্নরূপঃ—

প্রতিযোগিতার নাম	প্রতিযোগীর সংখ্যা
১। আবৃত্তি ক, খ, গ বিভাগ	২৫৫ জন
২। বিতর্ক ক ও খ বিভাগ	১৫২ „
৩। সংগীত (রবীন্দ্র ও নজরুল)	১২০ „
৪। নৃত্য ক ও খ বিভাগ	৪১ „
৫। বসে আঁকো	৩৫ „
৬। সূচীশিল্প ও মডেল	২২ „
৭। অপ্রস্তুত ভাষণ	২৭ „

মেদিনীপুর জেলা ছাত্র-যুব উৎসব

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে গত ১৯শে ডিসেম্বর থেকে ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৮১ পর্যন্ত তমলুক শহরে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে জেলা ছাত্র ও যুব উৎসব শেষ হলো। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ব্লক থেকে প্রতিযোগীরা খেলাধুলা ছাড়াও সাংস্কৃতিক মঞ্চে তাদের প্রয়োগ কৌশল এবং নিপুণতা প্রদর্শন করে কৃতিত্ব অর্জন করেন। উল্লেখ্য প্রতিযোগীর মধ্যে ক্রীড়া বিভাগে ভলিবল, কবাডি, নানা দৈর্ঘ্যের দৌড়সহ ইনডোর খেলা ছাড়াও সাংস্কৃতিক বিভাগে একাঙ্ক নাটক, সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন প্রতিযোগীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

এই বছরটি বিশ্বপ্রতিবন্ধীদের কল্যাণে নিবেদিত হওয়ার উপলক্ষে প্রতিবন্ধী ভাই-বোনেদের জন্য অনুষ্ঠানগুলি উৎসবকে জেলা প্রতিবন্ধীদের কাছে স্মরণীয় করে রাখবে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যেসব উন্নয়নমূলক কাজকর্ম দেশের অগ্রগতিকে একত্রিত করেছে সেইসব দৃষ্টান্তগুলিকে চাক্ষুষ জনগণের সামনে বিভিন্ন মডেল প্রদর্শনীর মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়। কৃষি দপ্তর, যুবকল্যাণ দপ্তর, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরগুলি প্রদর্শনীতে যোগদান করে প্রদর্শনীটিকে মূল্যবান তথ্যভিত্তিক প্রদর্শনীতে রূপায়িত করে। প্রত্যহ প্রায় হাজার লোক উৎসবে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে অভিভূত হোন এবং উৎসাহিত বোধ করেন।

এছাড়া প্রত্যহ বিকাল ৩টা থেকে আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে বামফ্রন্টের মন্ত্রীমহোদয়গণ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

মালদহ জেলা ছাত্র-যুব উৎসব

মালদহ জেলা ছাত্র যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হল ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে জেলায় জেলায় ছাত্র যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মূল ছাত্র যুব উৎসবের সূচনা হয় স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে। বিভিন্ন ক্লাব ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্র যুব সংগঠনগুলির পনেরজন নির্বাচিত প্রতিনিধি রক্তদান করেন। অসংখ্য ছাত্র যুব মিছিল করে রক্ত দিতে আসেন কিন্তু রক্ত

মালদহ জেলা ছাত্র-যুব উৎসব উপলক্ষে যুব-ছাত্রদের একটি প্রাণবন্ত মিছিল মালদহ শহর পরিক্রমা করে।

সংগ্রহের সুযোগের অপ্রতুলতায় তাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব হয় নি। অনেকেই নাম লিখিয়ে রেখেছেন ভবিষ্যতে প্রয়োজনের মুহূর্তে যাতে তাদের আহ্বান করা যায়।

১৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে যুব ছাত্র উৎসব উদ্বোধন করে যুবকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস বলেন, ছাত্র যুব উৎসব কোন মামুলি উৎসব নয়। এই উৎসবের লক্ষ্য হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শান্তি ও প্রগতির সপক্ষে, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংহতির সপক্ষে এবং অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ জীবনমুখী সংস্কৃতি গড়ে তোলার সপক্ষে ছাত্র যুব সমাজ ও মেহনতি মানুষকে আরও সক্রিয় করে তোলা। শ্রীবিশ্বাস বলেন, বেকারী, দারিদ্র ও নানা সমস্যায় জর্জরিত যুব সমাজের জন্য আবার উৎসব কেন, এ প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা সমাজ বদলের জন্য যে সংগ্রাম গড়ে তুলি এ উৎসব তার থেকে আলাদা কিছু নয়। এই সব উৎসবের মধ্য দিয়ে যুব ছাত্র সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করার কাজ, বিশেষ করে অসংগঠিত ছাত্র যুবদের সচেতন করার কাজ আমরা করছি। শ্রীবিশ্বাস বামফ্রন্ট সরকারের সাড়ে চার বছরের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতার চিত্রটি বিস্তৃতভাবে তুলে ধরে বলেন, যুবসমাজকে বিপথে পরিচালিত করার যে চক্রান্ত চলছে তার মোকাবিলা করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাসক অসীম দাস এবং বক্তব্য রাখেন প্রবীণ নেতা মানিক ঝা।

টাউন হল মঞ্চে চারদিকে চারটি আলোচনা সভা পরিচালনা করে ছাত্র যুব উৎসব কমিটি। বেকার সমস্যা, ভূমি সংস্কার ও বামফ্রন্ট সরকার শীর্ষক আলোচনা চক্রে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ কৃষক নেতা দুর্গা সেন এবং বক্তব্য রাখেন কান্তি বিশ্বাস, আনন্দ ব্যানার্জী ও দুর্গা সেন। বক্তারা বেকার সমস্যার গভীরতা আলোচনা করে বলেন, ক্ষয়ের পথে ধাবমান পুঁজিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যর্থ প্রয়াসের ফলেই স্বাধীনতার চৌত্রিশ বছর পরেও বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তাঁরা বলেন, কৃষকের স্বার্থে মৌলিক ভূমি সংস্কার করতে কংগ্রেস দল কখনও প্রস্তুত নয়। অথচ বেকার সমস্যা সমাধানের মূল শর্ত হল ভূমি সংস্কার করা। বক্তারা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ, বেকার ভাতা চালু এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের প্রশংসা করে বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের নীতি সারা ভারতে বিকল্প পথে দাবি সোচ্চার করে তুলছে।

দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় ছিল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি। অধ্যাপক সন্তোষ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ভবেশ মৈত্র এবং শিক্ষক নেতা সুনীল সেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির তত্ত্বগত আলোচনা করে ভবেশ মৈত্র বলেন, জনবিরোধী সংস্কৃতি এবং জীবন বিমুখ শিক্ষা পরিবর্তন করে জনশিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে বামফ্রন্ট সরকার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় প্রতিক্রিয়া শিবির ক্ষিপ্ত হয়েছে। তাদের আক্রমণ অস্বাভাবিক নয়। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তারা এ কাজ করছে।

তৃতীয় আলোচনার বিষয় ছিল ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী দেবীদাস ঘোষালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন রাষ্ট্রমন্ত্রী শিবেন চৌধুরী এবং সৌরিন্দ্র ভট্টাচার্য, এম-পি। শ্রীচৌধুরী দীর্ঘ ভাষণে বলেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম জনগণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মূল লক্ষ্যের পরিপূরক এই সংগ্রাম। তিনি বলেন, শ্রীমতী গান্ধী ধাপে ধাপে স্বৈরতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছেন। এই গতি রোধ করার জন্য গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সমস্ত মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম প্রয়োজন। সৌরিন্দ্র ভট্টাচার্য দীর্ঘ ভাষণে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব ও তার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেন। চতুর্থ আলোচনার বিষয় ছিল গ্রামোন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা। এই আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন শৈলেন সরকার, এম-এল-এ এবং ডাঃ হরমোহন সিং, এম-এল-এ।

শৈলেন সরকার বলেন, পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে বামফ্রন্ট সরকার যে বিরাট দায়িত্ব দিয়েছেন দু-চারটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সকল ক্ষেত্রেই গ্রামের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা তার যোগ্য হয়ে উঠেছেন। ফলে গ্রামাঞ্চলে নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে।

শ্রীসরকার আরও বলেন, গ্রামের মানুষ যেভাবে নেতৃত্ব গড়ে তুলেছেন তাতে স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চীৎকার করছে সব রসাতলে গেল! আসলে ওরা চায় না মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করুক। আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী প্রফুল্লধন মুখার্জী।

উৎসবের পাঁচদিন বিশেষ আকর্ষণ ছিল প্রদর্শনী মণ্ডপ। অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় ছিল এই প্রদর্শনী। জেলার অন্যতম শিল্প রেশম, মৎস্য, পশুপালন প্রভৃতি প্রসঙ্গে যেমন ছিল সরকারী স্টল, তেমনি বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে ছিল যুবকল্যাণ বিভাগের প্রদর্শনী মণ্ডপ, শিক্ষা ও কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে ছিল তথ্য ও সংস্কৃতির স্টল। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের সূচীশিল্প, মৃৎশিল্প, চিত্রশিল্প, পোস্টার ও অন্যান্য নানা জিনিস রঙে রেখায় তুলির টানে অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে।

১৯শে ডিসেম্বর মালদহ শহরে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীর বর্ণাঢ্য মিছিল টাউন হল ময়দান থেকে বেরিয়ে শহর পরিক্রমা করে। আদিবাসী যুবক-যুবতীর মাদল ও বাজনার তালে তালে গণসংগীতের সুর আকাশ বাতাস মুখরিত করে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংঘ, নাট্য সংস্থা, ক্লাব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও যুব সংস্থার কর্মীরা হাতে নানা রঙের পোস্টার ও ফেস্টুন নিয়ে শোভাযাত্রায় সামিল হন। মিছিলের সামনে পেছনে সমবেত কণ্ঠে জীবন জয়ের গান শোভাযাত্রাটিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেহারা দেয়।

উৎসবের মূল ঘোষণা বারবার ধ্বনিত হয়। শান্তি ও প্রগতির জয়বার্তা, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ঘৃণা ও জীবনমুখী সংস্কৃতি প্রসারের দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে। উৎসবমুখর এই মিছিল দীর্ঘকাল জেলাবাসীর স্মরণে থাকবে।

শোভাযাত্রার শেষে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভা-

মালদহ জেলা ছাত্র-যুব উৎসবে আদিবাসী নৃত্য

পতিত্ব করেন শৈলেন সরকার, এম-এল-এ। যুবক যুবতীদের অভিনন্দন জানিয়ে ভাষণ দেন রাজ্য যুবনেতা ক্ষিতি গোস্বামী, পল্টু দাশগুপ্ত, রণজিৎ চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ ঘোষ এবং ছাত্রনেতা প্রদীপ বাগচি।

শোভাযাত্রা শেষে সাংস্কৃতিক মঞ্চের সামনে মুক্ত আকাশের তলায় আদিবাসী নৃত্য পরিবেশন করেন ইংরেজ বাজার (ওল্ড মালদহ), বামনগোলা, হবিবপুর, গাজোল, মানিক চক ও হরিশ্চন্দ্রপুরের আদিবাসী নৃত্যগোষ্ঠী। এক সঙ্গে এতগুলি নৃত্যগোষ্ঠী খুশির আমেজ ছড়িয়ে দেন দিক-দিগন্তে। হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত করতালিতে বারবার তাদের অভিনন্দিত করেন। মেহনতি মানুষের জীবনজয়ের সংস্কৃতি যে কত প্রাণবন্ত ও চমৎকার তার বিচ্ছুরণ এই নৃত্য-গোষ্ঠীর নাচের মুদ্রায় বারবার ধরা পড়ে।

সাংস্কৃতিক মঞ্চ

টাউন হল ময়দানে ও টাউন হলে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। কনকনে শীত সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সামিল হন। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকগীতি গায়ক উৎপল চৌধুরী, গণসংগীত শিল্পী নরেন মুখার্জী, বালুরঘাটের ক্রান্তি শিল্পী সংঘ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা। কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন ধারার যথাযথ প্রকাশ ঘটানোর প্রয়াস।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয় ইংরেজবাজার সীমান্ত এলাকা প্রকল্পাধীন শিশু শিল্পীদের আবৃত্তি, সংগীত ও ব্রতচারী নৃত্যের মাধ্যমে। প্রতিদিন দেশ-বিদেশের লোকসংগীত, গণসংগীত, নৃত্য, আদিবাসী গান, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, বাউলের আঙ্গিকে গণসংগীত ও সমবেত সংগীত পরিবেশিত হয়। এ ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ ছিল ঐতিহ্যমণ্ডিত গম্ভীরা গান, মহম্মদ উজ্জ্বল রায়ের জারী গান, অরুণ মাহিন্তার যন্ত্রসংগীত, বৃন্দাবন সাহার গীটার, নাদ ব্রহ্ম মিউজিক কলেজের সার্থক সাধনা নৃত্য-নাট্য, দেবব্রত সান্টিয়ার ও তুফান সরকারের লোকগীতি, দেবেশ হালদারের বাঁশি, আই হো মহদিপুরের শিল্পীদের এবং মটরবাবু প্রমুখের গম্ভীরা গান। লোকরঞ্জন শাখা মহুয়া ও চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। পাশাপাশি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মালদহ শাখার অংকুর, সংলাপ নাট্য সংস্থার শৃংখলিত নক্ষত্রের গান, প্রগ্রেসিভ ড্রামাটিক অর্গানাইজেশনের কেন্দ্রবিন্দু নাটকগুলি এবং যাত্রা শিল্পী পরিষদের যাত্রা 'ঘুম ভাঙা গান' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ছাত্র যুব উৎসবের অন্যতম অঙ্গ সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে প্রতি-যোগিতা। জেলার সবগুলি ব্লকের যুবক-যুবতীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় ব্লক যুব উৎসবগুলির সফল প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক উপ-সমিতির আহ্বায়ক সুভাশীষ চৌধুরী যে তথ্য দিলেন তা বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। সহস্রাধিক গ্রামীণ যুবক-যুবতী সাতাশটি বিভাগে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। আবৃত্তি, রবীন্দ্র-নজরুল সংগীত, স্বরচিত গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ, চিত্রাঙ্কন, গল্প পাঠ, মৃৎশিল্প, সূচীশিল্প, আলপনা, তবলার লহড়া, আঞ্চলিক লোকগীতি, পোস্টার অঙ্কন, হারমোনিয়াম বাদন ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যুবক-যুবতীদের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে গ্রামাঞ্চলের যুবক-যুবতীরা অংশগ্রহণ করেছেন। শুধু অংশগ্রহণ নয় সাফল্যের মাপকাঠিতেও তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সিংহ ভাগ দখল করেছেন। গ্রাম-বাংলার সংস্কৃতি চর্চার প্রসারে বিগত কয়েক বছরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনে দিয়েছে এ তারই ফলশ্রুতি। প্রতিযোগী প্রেরণের ক্ষেত্রেও ব্লক যুব আধিকারিকদের প্রভূত সাহায্য করেছেন পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা।

যেমন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় তেমনি ক্রীড়ার ক্ষেত্রেও ছিল ব্যাপক সাড়া। ডি. এস. এ. ময়দানে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ধরনের দৌড়, তীর নিক্ষেপ, ভারসাম্য দৌড়, পুরুষদের দশ মাইল দীর্ঘ দৌড়, মহিলাদের পাঁচ মাইল দীর্ঘ দৌড়, কাবাডি, ভলিবল প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় হাজারখানেক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। ক্রীড়ার ক্ষেত্রেও গ্রামাঞ্চলের ছাত্র যুবসমাজ ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। গ্রামীণ ক্রীড়ার প্রসারে ডি.এস.এ. এবং যুবকল্যাণ বিভাগ যে নিরন্তর সুপরিকল্পিত প্রয়াস চালাচ্ছে এই সাফল্য সেই প্রয়াসেরই পরিণত ফসল বলে অভিজ্ঞমহলের ধারণা।

ক্রীড়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ছাড়াও ছিল প্রদর্শনমূলক ক্যারাটে, বক্সিং ও বাস্কেটবল খেলা। বাস্কেট বল খেলায় জাতীয় জুনিয়ার দল ও জাতীয় সিনিয়ার দল অংশগ্রহণ করে। মালদহে এই খেলার চর্চা অতি সম্প্রতি শুরু হয়েছে। প্রদর্শনী খেলাটি বাস্কেট বল সম্পর্কে আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বাঁকুড়া-১ ব্লক যুবকরণের কবাডি প্রশিক্ষণ শিবির

ব্লক যুবকরণ সংবাদ

বাঁকুড়া জেলা

শালতোড়া—স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত টালি তৈরী, চানাচুর তৈরী, কাটা পোষাকের দোকান, স্টেশনারী, গোলদারী দোকান, সাইকেল মেরামতী দোকান ইত্যাদির সাতটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ চল্লিশ হাজার টাকা। এই প্রকল্পে একজন প্রতিবন্ধী যুবকও স্বনির্ভর হয়েছেন। মোট কর্মসংস্থান হয়েছে এগার জনের। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে টেলারিং-এমব্রয়ডারী, অভেদ্য তেল উৎপাদন ও টাইপ শেখা এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে টেলারিং প্রশিক্ষণের কাজ চলছে। এতে ৩১ জন মহিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। অভেদ্য তেল উৎপাদন এবং তপসিলী যুবক-যুবতীদের জন্য টাইপ শেখার প্রশিক্ষণ কিছুদিনের মধ্যে হাতে নেওয়া হবে।

গ্রামীণ ক্রীড়া প্রসারকল্পে গত জুলাই-আগস্ট মাসে এক মাসের জন্য পৃথকভাবে তিনটি (ফুটবল ও কবাডির উপর) প্রশিক্ষণ শিবিরে

কান্দি ব্লক যুবকরণ আয়োজিত কবাডি প্রশিক্ষণ শিবির

৬২ জন ছেলে-মেয়ে প্রশিক্ষণ নেয়। এছাড়া এই ব্লক যুবকরণ ৪২টি সংস্থাকে প্রায় তিন হাজার টাকার ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করে।

বিজ্ঞান আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় শালতোড়া বিধানচন্দ্র বিদ্যাপীঠে। উল্লেখযোগ্য তিলুড়ী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান লাভ করে।

বর্ধমান জেলা

ভাতার—এই যুবকরণের পরিচালনায় তপসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত যুবকদের জন্য গত ১৮ই নভেম্বর একটি সাইকেল মেরামতী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত সবাই এই ধরনের স্বনির্ভর কর্মসূচীর জন্য যুবকল্যাণ বিভাগের প্রয়াসকে অভিনন্দিত করেন এবং আশা করেন স্বনির্ভর কর্মসংস্থানে আগ্রহী যুবক-যুবতীরা ভবিষ্যতে বেশি করে এই বিভাগের কর্মসূচীতে যুক্ত হয়ে উপকৃত হবে।

গত ১০ই ডিসেম্বর ছয় মাসব্যাপী মহিলাদের জন্য একটি সিবন শিল্প প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হয়। প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন এমন এগারজন মহিলা প্রশংসাপত্র লাভ করেন। এই যুবকরণ এদের স্বনির্ভর করার পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা করছে।

রায়না-১—গত অক্টোবর-নভেম্বর মাসে দেড়-মাসব্যাপী একটি ফুটবল কোচিং ক্যাম্পের আয়োজন করে এই ব্লক যুবকরণ। স্থানীয় শ্যামসুন্দর কলেজ ময়দানে শুরুতে ৬০ জন এন. আই. এস. কোচ হরিনারায়ণ দাসের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নেয়। ৪৩ জন প্রশিক্ষণ শেষ করে। প্রশিক্ষনান্তে প্রশিক্ষার্থীদের প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়।

মেদিনীপুর জেলা

ভগবানপুর-১—গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এই যুবকরণ একমাসের দু'টি প্রশিক্ষণ শিবিরের (ফুটবল ও কবাডি) আয়োজন করে। ফুটবল ও কবাডি ক্যাম্পে যোগ দেয় যথাক্রমে বত্রিশ ও আঠাশ জন। ফুটবলের কোচ হিসাবে ছিলেন কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবাডি প্রশিক্ষণ শিবিরের দায়িত্বে ছিলেন প্রভাতকুমার আদক। এই ধরনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় যুবক-যুবতী ও জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় এবং উপস্থিত সবাই যুবকল্যাণ বিভাগের গ্রামীণ খেলাধুলা প্রসারের প্রচেষ্টাকে সবিশেষ প্রশংসা করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলা

ভগবানগোলা-২—সম্প্রতি স্থানীয় কে. সি. কে. জুনিয়ার মাদ্রাসা মাঠে একটি খো-খো প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। মোট ৫৯ জন ছাত্র (বিদ্যালয়) এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেয়। প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন মহঃ রফিকুল হাসান। শিবির চলাকালীন হেমনারায়ণ সাহা, সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতি ও প্রশান্তকুমার মৈত্র, বি-ডি-ও ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ প্রশিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেন।

কান্দি—গত আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে একমাস-ব্যাপী এই যুবকরণের উদ্যোগে ফুটবল, ভলিবল ও কবাডি খেলাধুলার উপর তিনটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। মোট ১৩০ জন যুবক এই তিনটি শিবিরে যোগ দেয়। গত ৩রা অক্টোবর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ আরাজুল্লাহ, বিশেষ অতিথি বিশ্বেশ্বর মাইতি, বি-ডি-ও এবং অধীররঞ্জন ঘোষ, জেলা যুব আধিকারিক প্রত্যেকেই এই ধরনের ক্রীড়া প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তুহিন রায়, ব্লক যুব আধিকারিক সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

সামশেরগঞ্জ—সাফল্যের সঙ্গে ব্লক যুব উৎসবের আয়োজন করার পরই এই নতুন ব্লক যুবকরণটি গত জুলাই মাসে ফুটবল, ভলিবল ও খো-খো (বালিকাদের জন্য) প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিডিও ও ব্লক যুব আধিকারিক উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারী যুবকদের উৎসাহ দেন। ফুটবলের দায়িত্বে থাকেন কালীঘাট ক্লাবের একজন প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং ভলিবল প্রশিক্ষণের

গবানগোলা-২ ব্লক যুবকরণ আয়োজিত শিক্ষাশিবির

সামসেরগঞ্জ ব্লক যুবকরণ আয়োজিত মেয়েদের খো খো প্রশিক্ষণ শিবির

যুবকরণের ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় খেলাধুলার উন্নতিকল্পে বালী-জগাছা ব্লকে একমাসব্যাপী দুইটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। একটি ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির ও অন্যটি মহিলা কবাডি প্রশিক্ষণ শিবির। দুইটি ক্ষেত্রেই বয়সসীমা ছিল ১৩ থেকে ১৬ বৎসর পর্যন্ত। বালী-জগাছা ব্লকের অধীনস্থ গ্রামপঞ্চায়েতের যুবক-যুবতীরা প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করে।

গত ১লা অক্টোবর '৮১ সাঁপুইপাড়া ইনডাস্ট্রীয়াল হাউসিং এস্টেট ময়দান বেলুড়ে বিকাল ৩ টায় ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন অতীত দিনের প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় শচীন মিত্র (ল্যাংচা দা) মহাশয়। অনুষ্ঠানে শ্রীমিত্র গ্রামীণ খেলোয়াড়দের উন্নতির জন্য এই ধরনের ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের গুরুত্বের কথা ব্যক্ত করেন এবং আধুনিক ফুটবলের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এতে সর্বমোট ৩৫ জন যুবক অংশগ্রহণ করে। কলিকাতার প্রথম ডিভিশন ক্লাব স্পোর্টিং ইউনিয়ন-এর প্রশিক্ষক দিলীপ পালের নেতৃত্বে এই ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের শুরু হয়।

১লা অক্টোবর '৮১ থেকেই একমাসব্যাপী কাবাডি প্রশিক্ষণ শুরু হয় নিশ্চিন্দা বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। ১৩ থেকে ১৬ বৎসর-পর্যন্ত বালিকাদের কবাডি খেলায় উৎসাহিত করা, আধুনিক আইন-কানুন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা, গ্রামীণস্তরে কবাডি খেলার চর্চা বহুল ভাবে প্রচারের জন্য এবং উদীয়মান খেলোয়াড় খুঁজে বের করার অভিপ্রায়ে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এতে সর্বমোট ৩০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ কবাডি এসোসিয়েসনের এবং হাওড়া জেলার কবাডি এসোসিয়ে-

[শেষাংশ ৩২ পৃষ্ঠায়]

দায়িত্বে ছিলেন জেলার একজন খ্যাতনামা খেলোয়াড়। ১৫ই আগষ্ট এই শিবির দুটি (ফুটবল ও ভলিবল) শেষ হয়।

গত সেপ্টেম্বর মাসে বালিকাদের খো-খো প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন এই বিভাগের কর্মী অনিত মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এতে অংশ নেয়। এর সমাপ্তি দিবসে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এই ধরনের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রত্যেক ছাত্রীকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়।

এ ছাড়া গত আগষ্ট মাসে ব্লকভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এই আলোচনা চক্রে যোগদান করে। প্রথম স্থান অধিকার করে রমা সাহা। সফল প্রতিযোগীদের প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ও পুরস্কার বিতরণ করেন বিডিও মহাশয়।

ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। বারো থেকে ষোল বছরের কিশোরদের জন্য এই শিবির উন্মুক্ত থাকে। বিভিন্ন যুব সংস্থা থেকে গ্রামাঞ্চলের ৩৭ জন কিশোর এই শিবিরে সামিল হয়। এন আই এস কোচ সুভাষ কুণ্ডু প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মানপত্র প্রদান করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্থানীয় দেবালয় স্পোর্টিং ক্লাব এই প্রশিক্ষণ শিবির সুষ্ঠুভাবে চলার ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করে।

হাওড়া জেলা

বালী-জগাছা—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং বালী-জগাছা ব্লক

২৪ পরগণা জেলা

কাকদ্বীপ—এই যুবকরণের পরিচালনায় অক্টোবর-নভেম্বর মাসে একমাসব্যাপী এক ফুটলব প্রশিক্ষণ শিবিরে ৩০ জন যুবক অংশ নেয়। প্রশিক্ষক ছিলেন নির্জন দত্ত। প্রশিক্ষান্তে স্থানীয় বিডিও রমাপ্রসাদ দাস সফল শিক্ষার্থীদের মানপত্র প্রদান করেন এবং এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ ছাড়া এই ব্লক যুবকরণ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ৩০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে এক মাসের একটি কবাডি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে। মানপত্র ছাড়াও প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে গেঞ্জি উপহার দেওয়া হয়।

দেগঙ্গা—গ্রামীণ খেলাধুলার প্রসারকল্পে যুবকল্যাণ বিভাগের কর্মসূচী অনুযায়ী এই ব্লকের পরিচালনায় গত ৫ই আগষ্ট একমাসব্যাপী একটি

কাকদ্বীপ ব্লক যুবকরণ আয়োজিত ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির

পাঠকের ভাবনা

খেলাধ্লো সম্পর্কে

নীতিগত দিক থেকে হয়ত আমার এ বক্তব্য ছাপতে আপনাদের আপত্তি থাকতে পারে, তবুও গত নভেম্বর '৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত কাজল মুখার্জীর প্রতিবেদন "ফুটবল খেলোয়াড় তৈরী করার সমস্যা" সম্পর্কে তার সমর্থনে ও প্রতিবাদে কিছু যুক্তি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই তাঁর লেখার পরিপ্রেক্ষিতে বলছি—

১। আগের থেকে এখন অনেক বেশী খেলোয়াড় আছেন এবং তারাও যথেষ্ট দক্ষ। যেহেতু আগে ফুটবলের জনপ্রিয়তা কম ছিল, সেহেতু মুষ্টিমেয় ভাল খেলোয়াড়রাই সব ক্ষেত্রে অংশ নেওয়ায় তারা অধিক সাফল্য পান।

২। ক্লাবের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখনও বর্তমান। তবে সেটা মহকুমায় League System-এ চলে। তাছাড়া, Block ভিত্তিক ও স্কুল স্তরেও প্রতিযোগিতা বর্তমান। তবে অংশগ্রহণে অনীহা লক্ষ্য করা যায়। যদিও, আমি লেখকের সঙ্গে একমত যে, এটা অর্থনৈতিক অবস্থারই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু যদি অন্যান্য বিষয়ের মত বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে শারীরশিক্ষার সঙ্গে অন্য খেলাধুলোকে যোগ করা হয়, তবে স্কুল স্তরে সুফল পাওয়া অবশ্যই সম্ভব। একই সঙ্গে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সমগ্র বৎসরের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্ব, আচরণ ও চরিত্রের দিকগুলিকে উন্নত করার জন্য কমপক্ষে ১০০ নম্বর বরাদ্দ রাখা উচিত। যেটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করবে। তাতে স্কুলের নিয়মশৃঙ্খলা ছাড়াও সমগ্র বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

৩। বর্তমানে সাধারণ Turnament কমে যাওয়ার কারণ শুধুই জীবিকা অর্জনের ব্যাপার নয়, এর সঙ্গে জড়িত নানা কারণ—

(ক) প্রতিফল হিসাবে সংগঠকরা কিছুই পান না।

(খ) খেলাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক......

(গ) সময়ের অভাব।

৪। প্রসঙ্গতঃ বলছি লেখকের মন্তব্য—"যে দেশে বেশীর ভাগ ছেলেদের দু বেলা দু মুঠো ভাত জোটে না তারা খেলাধুলোর কথা ভাববার অবকাশ পাবে কি করে।"

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য, যে দেশে ৬০-৭০ কোটি মানুষের বাস, সেখানে আরও ভালো ভালো খেলোয়াড় কেন পাওয়া যায় না? যে দেশে জনসংখ্যা কম থাকা সত্বেও বেশী ভালো দল গড়া সম্ভব হয় কি করে। যেমন, পাকিস্তান, ব্রাজিল। তারা কি সবাই খাদ্য বা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ? আসলে আমাদের দেশের বরাদ্দের (খেলাধুলো সংক্রান্ত) সিকি ভাগও ঠিকপথে ব্যয় হয় না।

বর্তমানে স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু প্রতিযোগিতা তুলনায় কম। তার প্রধান কারণ বেশীরভাগ স্কুলেই সামান্য ভলি বা খো-খো খেলার মতও জায়গা পাওয়া যায় না। এ ছাড়াও পূর্বের খেলোয়াড়দের খেলার মাঠের জন্য কোন অসুবিধায় পড়তে হয় নি, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সেসব মাঠ এখন জনবসতিতে রূপান্তরিত। (শহরের ক্ষেত্রে)

১৯৪৭ সাল থেকে যাঁরা দেশ পরিচালনা করছেন শুধুমাত্র তাঁদেরকেই দোষারোপ করে আমাদের কর্তব্য এড়ালে চলবে না। আমার মতে, যেটুকু হবে তা যেন সম্পূর্ণ হয়। কারণ গত April থেকে Aug-Sept মাস পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার নানা ব্লক স্তরে বিভিন্ন খেলাধুলোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠিত হয়। তাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং যে সময় দেওয়া হয় তাতে নবীনদের সুশিক্ষিত করা দূরের কথা, প্রাথমিক ধারণাও স্পষ্ট করে দেওয়া যায় নি। তাদের না থাকতো কোন Tiffin তেমনি ছিল না বিশেষ উৎসাহ। এজন্য আরও ব্যাপক কর্মসূচীর প্রয়োজন। এবং সেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্ভাব্য ছেলেদের উন্নততর সুযোগের ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। তা না হলে কোনদিনই ভালো ফল আশা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে আমি বলব; এখনও গ্রাম বাংলায় কিছু কিছু ছেলে আছে, যারা কলকাতার 1st division player দের থেকে কোন অংশে কম নয়। সুযোগ পেলে তারাই কলকাতার Club কর্মকর্তাদের সুপারিশে সুযোগ পাওয়া ছেলেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে।

এসব ঘটনাগুলি যদি ঠিক ঠিক চলে তবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়তে বাধ্য।

আর কলকাতার বড় Club গুলিকে নিয়মের প্যাঁচে না ফেললে তারা কোনদিনও সুবুদ্ধির পরিচয় দেবে না। নিয়ম করতে হবে, Club team-এর জন্য নিজেদের খেলোয়াড় নিজেদের তৈরী করতে হবে। এবং দল-বদলের ব্যবস্থারীতি বদলে অন্য কিছু ভাবতে হবে।

এ সম্পর্কে আমারও শেষ বক্তব্য, লেখকেব আলোচ্য বস্তুর শেষাংশ। 'রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে পাল্টান না গেলে মানুষের জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব নয়'। কারণ আমাদের সব ক্ষেত্রেই চলছে অসৎ উপায়। যেমন সরকারী টাকা আত্মসাৎ ও পক্ষপাতিত্ব।

প্রশান্ত ব্যানার্জী
মাধাইতলা, কাটোয়া, বর্ধমান।

পথিকৃৎ হোক

ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ে। আমাদের বাড়ীর পিছনে বেশ খানিকটা দূরে এক আধা অন্ধকারে ঘেরা বাঁশবনকে দেখিয়ে (তখন যাকে খুবই রহস্যময় মনে হত) মা বলতেন, "খোকা, ওখানে যেও না, ওখানে ভয় আছে।" তবু মন কথা শুনতো না, বার বার ওখানেই ঘোরাঘুরি করত। আর আজ সেই বাঁশবনের ভয়ের রহস্য ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে গেছে। কিন্তু সেই হ্যাংলা মনটা আজও বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে আরও বহু দূরে সমাজতন্ত্রের 'নক্সীকাঁথার' মাঠের দিকে। মন চাইছে 'অশ্বমেধের ঘোড়া' হয়ে সেখানে দিগ্বিজয়ে ছুটে যেতে। আশা রাখি 'যুবমানস' সেই জুজুবুড়ীর ভয়মুক্ত মন গঠনে চির পথিকৃৎ হবে।

স্বপন বিশ্বাস
গোবরডাঙা, ইছাপুর
২৪-পরগনা

অভিনন্দন

'যুবমানস' পত্রিকা যেন সত্যিকারের প্রাচীন জড়তার শেকল ছিঁড়ে ফেলে নব চেতনার আবির্ভাব বয়ে নিয়ে আসছে। এবারের সংখ্যায় বিশেষ করে প্রতিবেদন পড়ে আমার তাই মনে হয়েছে, এবং আরো ভাল হয় যদি বামফ্রন্ট সরকার যে উদ্দেশ্য নিয়ে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আছে এবং বামপন্থী পার্টিগুলির সাংগঠনিক দিকগুলি যাতে সুপ্রচারিত হয় তার জন্য ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে, বিভিন্ন ভাষায়, এই যুবমানসকে যদি ছড়িয়ে দেওয়া হয় তবেই কিন্তু দূষিত আবহাওয়া কাটিয়ে মুক্ত ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন সফল হবে, এটাই আমার ধারণা। কথা প্রসঙ্গে পুরোনো দিনের ফেলে আসা আমার একটি কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল। কবিতাটির মুখ্য উদ্দেশ্য হল যে বট গাছ বিশ্বমানবের ইতিহাস বহন করে চলেছে, সে বটগাছ মহাচীনে ছড়িয়ে দিয়েছে আশি কোটি বীজ। সেই বটগাছের নাম "মাও-সে-তুঙ"। সুতরাং, যুবকল্যাণ বিভাগকে যদি আমি বটবৃক্ষ ধরে নিই, তা হ'লে খুব একটা অন্যায় করব বলে মনে হয় না। যাই হোক, সেটা আপনাদের তদন্তের বিষয়বস্তু।

যুবকল্যাণ বিভাগকে আন্তরিকতার সাথে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

তপন রায়
প্রযত্নেঃ অজিত গড়গড়ী
গ্রামঃ সুবুদ্ধিপুর
ডাকঃ বারুইপুর
জেলাঃ দঃ ২৪-পরগণা

কে নিবি গো কিনে আমায় কিনে

নভেম্বর '৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত "আত্মহত্যা অথবা উন্নয়নের পন্থাসমূহ" লেখাটির জন্য প্রতিবেদক শ্রীমানব মুখাজীকে আমার আন্তরিক উষ্ণ অভিনন্দন জানাই। অত্যন্ত স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় প্রতিবেদক আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক সংকটের রূপরেখাটি তুলে ধরেছেন, যা পড়ে সাধারণ পাঠকরা পর্যন্ত সমস্যার মূল গভীরে গিয়েও আত্মস্থ হতে পারেন। আমাদের দেশের বিদগ্ধ অর্থনীতিবিদ্‌রা পর্যন্ত বলেছেন যে কঠোর ও অসম চুক্তি সাপেক্ষে এই বিশাল পরিমাণ ঋণের জন্য আই. এম.এফ.-এর স্বারস্থ হবার কোন প্রয়োজন ছিল না এবং কী কী সঠিক দূরদর্শিতাসম্পন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে Trade-deficit-এর বোঝা বইতে হতো না—তাও তাঁরা যুক্তিযুক্ত তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। কিন্তু তাতে আমাদের দেশের শাসকশ্রেণীর কি আসে যায়। তারা তো বিশাল ঋণের বোঝা সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ে সংকট-পরিত্রাণের স্বপ্ন দেখে। তাতেও কি বৈতরণী অতিক্রম করা যায়?

পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থার গোঁড়া প্রবক্তা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মিল্টন স্ফ্রিডম্যান অর্থ-নৈতিক সংকটের জটিলতা থেকে পরিত্রাণের যে স্পষ্টরোগহর দাওয়াই বাৎলেছেন তার মোদ্দা কথা হলঃ healthy economic development can be attained only by keeping private property rights intact, allowing private enterprise free play and especially by opening out the economy to salutary competition from abroad.

এই তত্ত্বীর ভিত্তিতেই আই. এম. এফ. অসম কঠোর চুক্তি সাপেক্ষে দরিদ্র দেশগুলোকে ঋণ মঞ্জুর করে, যার নির্গলিতার্থ হচ্ছেঃ ঋণগ্রহীতা দেশের সার্বভৌমত্বকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছে বিকিয়ে দেওয়া। আমাদের দেশের দেউলিয়া অর্থনীতির দশা দেখে বলতে কষ্ট হয়ঃ "কে নিবি গো কিনে আমায়?"

গাজী শহীদ
গ্রাম ও পোঃ মশাগ্রাম,
জেলাঃ বর্ধমান

[বিভাগীয় সংবাদ : ৩০ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সনের সদস্যা ও প্রশিক্ষক শ্রীমতী বিথীকা কাঞ্জিলাল-এর নেতৃত্বে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন বালী-জগাছা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদ্মনিধি ধর মহাশয়। অনুষ্ঠানে শ্রীধর গ্রামীণ খেলোয়াড়দের উন্নতিকল্পে এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের গুরুত্বের কথা সবিস্তারে বিবৃত করেন। উভয় প্রশিক্ষণ শিবিরে ব্লক যুব আধিকারিক সোমনাথ দেব উপস্থিত শিক্ষার্থীগণের নিকট প্রশিক্ষণ শিবিরের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হয় গত ৩রা নভেম্বর '৮১ এবং মহিলা কবাডি প্রশিক্ষণ শিবির সমাপ্ত হয় গত ৯ই নভেম্বর ১৯৮১।

জলপাইগুড়ি জেলা

কালচিনি—পশ্চিমবঙ্গ সরকার, যুব-কল্যাণ বিভাগ গ্রামীণ খেলাধুলার সম্প্রসারণ ও উন্নতি-কল্পে এ বৎসর বিভিন্ন ব্লক যুবকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ কয়েকটি খেলাধুলার উপর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। কালচিনি ব্লকেও ফুটবল ও কবাডি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এবং পরবর্তী সময়ে এই সমস্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ফলাফল নিরূপণের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা যুব উৎসব '৭৮ স্মৃতি শীল্ড ও শ্যামাপ্রসাদ সংঘ রানার্স কাপ ব্লকভিত্তিক ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু করা হয় গত ১৫ই জুলাই ১৯৮১। সর্বমোট ১২টি দল এতে অংশগ্রহণ করে। গ্রাম থেকে আসা দলের সংখ্যাই বেশী। এতে করে বোঝা যায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যত সংখ্যক ছেলেদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল তাতে ক্লাবের প্রতিনিধির সংখ্যাই বেশী ছিল। একমাসব্যাপী এই প্রতিযোগিতা চলে। প্রতিযোগিতার আয়োজন করে কালচিনি ব্লক স্পোর্টস এসোসিয়েসন ও কালচিনি ব্লক যুবকরণ যৌথভাবে। লতাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতও এই খেলায় সাহায্য করেছেন। পরিচালনা করেছে হ্যামিলটনগঞ্জ স্পোর্টস এসোসিয়েসন। গত ৭ই সেপ্টেম্বর এই টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয় হ্যামিলটন-গঞ্জ ফুটবল মাঠে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ডিমা চা বাগান ও হ্যামিলটনগঞ্জ স্পোর্টস এসো-সিয়েসন (এ) বিভাগ এই খেলায় পরস্পর প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করে। বিজয়ী হয় ডিমা চা বাগান ১—০ গোলের ব্যবধানে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মিন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীরমেশচন্দ্র সুবা এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীআনন্দ নার্জিনারি মহাশয়। ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীরামপদ সিকদার মহাশয় এই খেলা প্রসঙ্গে তথা যুবকল্যাণ দপ্তরের খেলাধুলা প্রসারের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা সে সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন এবং যাঁরা খেলাটি পরিচালনা করেছেন তৎসহ অন্যান্য যাঁরা পরিচালনার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

[কবি শ্যামসুন্দর দে সম্মানিত : ২০ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

আয়োজিত জাতীয় কবি সম্মেলনে তিনিই একমাত্র কবি যিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে মনোনীত হয়ে ভারতীয় কাব্য-সাহিত্যে বাংলা কবিতার সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারা অক্ষুন্ন রেখেছেন। এ সংবাদ গণ-তান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্রপ্রিয় প্রগতিশীল কাব্যানুরাগী মানুষের কাছে বিশেষ এক আনন্দ সংবাদ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কবি শ্যামসুন্দর দে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য ও শিশু ও কিশোর পত্রিকা আলোর ফুলকির অন্যতম সম্পাদক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

গ্রাহক হতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৭ টাকা। ষাণ্মাসিক চাঁদা সডাক ৩·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যার দাম ৪০ পয়সা।

বিশেষ সংখ্যার জন্য কোন অতিরিক্ত ম্ল্য দিতে হবে না। পত্রিকা প্রেরণের জন্য ডাক ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করবে।

শ্ধ্ মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

সহ-অধিকর্তা, য্বকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০০০১।

এজেন্সি নিতে হ'লে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০%
১৫০০-এর ঊর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০%
৫০০০-এর ঊর্ধ্বে	৪০%

১০টি সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

সহ-অধিকর্তা, য্বকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফ্লস্কেপ কাগজের এক প্ষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটাম্টি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবি করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

য্বকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিক-গ্লির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

য্বমানস পত্রিকা প্রসংগে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সংগে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য বিজনেস ম্যানেজারের সংগে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রজাতন্ত্র দিবসে কলকাতার রেড রোডে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর একটি বালিকা দলকে দেখা যাচ্ছে

G.S./BOOK-POST

218 DYS.YM/1982

একই অনুষ্ঠানে সি.এম.ডি.'এর বিশাল কর্ম-কান্ডের কিছু নমুনা চলমান প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়
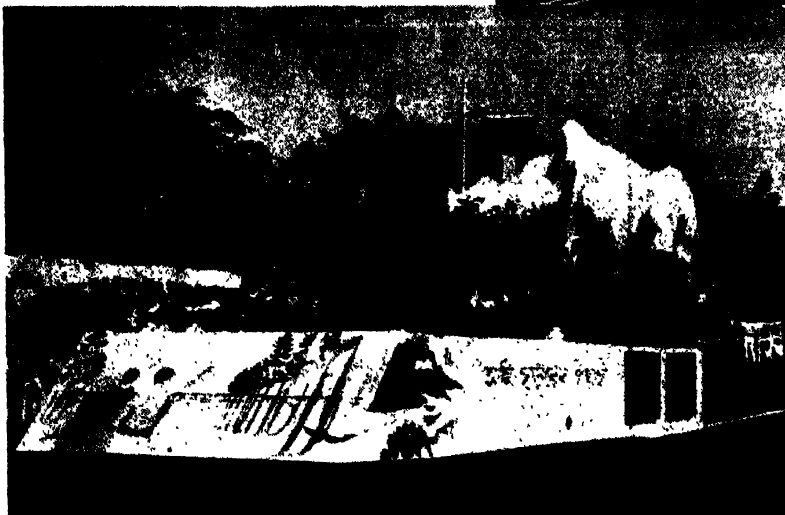
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের সুদৃশ্য ট্যাবলোটিও সমবেত দর্শকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে

ফেব্রুয়ারী ’৭২

গত ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ পর্বতারোহী সম্মেলনে আয়োজিত প্রদর্শনীর একাংশ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
ফেব্রুয়ারী, '৮২

উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি এবং পত্রিকা সম্পাদক :
কান্তি বিশ্বাস

প্রচ্ছদ : দিলীপ ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা-৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—চল্লিশ পয়সা

সম্পাদকীয়

২১শে ফেব্রুয়ারী স্মরণে

দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য অনেক দেশপ্রেমিক জীবন দিয়েছেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গার জন্য অনেক বীর আত্ম-উৎসর্গ করেছেন। দুর্গত, বিপন্ন মানুষকে উদ্ধারের জন্য অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। সাধারণের মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগের অগণিত মহান দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাসকে ধন্য করেছে। যখনি সুযোগ আসে মানুষ কৃতজ্ঞতার সাথে এইসব মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিকদের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

কিন্তু এ রকম ঘটনা কোথাও ঘটেছে বলে ত আমাদের জানা নেই যেখানে মাতৃভাষার গৌরব রক্ষার জন্য কেউ আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। কোথাও শুনি নি যে মাতৃভাষার পবিত্রতাকে অমলিন রাখার জন্য মাতৃভাষা প্রেমিক যুব-ছাত্র-শ্রমিক দ্বিধাহীন-চিত্তে, তেজোদীপ্ত ভঙ্গিতে রক্ত-রাঙা পথ অতিক্রম করে সভ্যতার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করে গেছেন।

এই রকমই এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল পূর্ব-পাকিস্তান—বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে।

ধর্মীয় উন্মাদনা ও চরম সাম্প্রদায়িকতার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে অবিভক্ত ভারতবর্ষ খণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা পেল। এ দেশের সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে পাল্লা দিয়ে পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী রাজশক্তির সাহায্যপুষ্ট হয়ে উগ্র অন্ধ সাম্প্রদায়িক জিগির প্রচার করতে শুরু করল। অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্যসংক্রান্ত জ্বলন্ত সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য পাকিস্তানের তদানীন্তন শাসকশ্রেণী ধর্মীয় বিদ্বেষ বেশি বেশি করে প্রচারের পথ বেছে নিল। বাংলা ভাষার মধ্যে তারা এক বিশেষ ধর্মের অশুভ ছায়ার খোয়াব দেখা আরম্ভ করল। তাদের কল্পনা করা বিভীষিকাময় প্রভাব খর্ব করার জন্য বাংলা ভাষার কীর্তিমান কবি-লেখকদের রচনার অংশবিশেষ পর্যন্ত পরিবর্তন করে প্রচার করতে থাকল। এই পরিবর্তিত রচনাসমূহ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হলো। রবি ঠাকুর থেকে নজরুল—কেউই এই অর্বাচীনদের কলমের খোঁচা থেকে রেহাই পেলেন না। ধর্মীয় গোঁড়ামিতে অন্ধ অপরিণামদর্শী এক শ্রেণীর মানুষ যখন এই ধরনের আত্মঘাতী কাজে মগ্ন তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এই প্রশ্ন হাজির হোল। মহম্মদ আলী জিন্না স্বার্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—বাংলা ভাষা পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদা পাবে না। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় পঞ্চান্ন ভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা—তার প্রতি এই চরম উপেক্ষা—স্বভাবতঃই পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীদের মনে এক নিদারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হোল। অসন্তোষ দিকে দিকে ধূমায়িত হতে থাকল। এখানে-ওখানে তার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটতে লাগল।

পাকিস্তানের গণ-পরিষদের (কেন্দ্রীয় আইন সভা) অধ্যক্ষ পূর্ব-বাংলার মানুষ তমিজুদ্দিন সাহেব বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে ঢাকার বিমানবন্দর তেজগাঁও-এ এসে যখন অবতরণ করলেন—ক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজের প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অধ্যক্ষ সাহেব তখন তাঁর কৃতকর্মের ফলভোগ করতে বাধ্য হলেন। মানুষ বুঝলেন বাংলা ভাষার অমর্যাদা বিনা প্রতিবাদে ছাত্র ও যুবসমাজ মেনে নেবে না।

পাকিস্তান ইতিহাস কংগ্রেসের এক অধিবেশন ঢাকায় আহ্বান করা হয়েছিল। প্রবীণ ও প্রথিতযশা ঐতিহাসিক নকভি সাহেব বাংলা ভাষার বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেন—আর তার বিরুদ্ধে ঢাকার ছাত্রসমাজ বলিষ্ঠ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন—নকভি সাহেব পালিয়ে বাঁচেন।

পাকিস্তানের স্রষ্টা মহম্মদ আলী জিন্না সাহেব কায়েদে আজম (জাতির পিতা) নামে তাঁর দেশবাসীর নিকট সমাদৃত হতেন। মূলতঃ তিনি ছিলেন ঐ দেশের রাজনৈতিক ফেরেশ্‌তা বা দেবদূত। অতুলনীয় সম্মান ও আস্থার পাত্র ছিলেন তিনি। ভাষার প্রশ্নে যখন বিতর্ক শুরু হয়েছে—জিন্না সাহেব ভেবেছিলেন তিনি নিজে ঢাকা এসে এ সম্পর্কে তাঁর কঠোর মনোভাবের কথা ব্যক্ত করলে নির্বিবাদে তা সকলে মেনে নেবেন। দু'-চার জনের ভিন্ন মত থাকলেও তা প্রকাশ করতে কেউ-ই সাহস করবেন না।

জিন্না সাহেব ঢাকায় এলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-চত্বরের কার্জন হলের প্রাঙ্গণে বিরাট-সংখ্যক বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র সমাবেশে তাঁর স্বভাবসুলভ দৃঢ়তা নিয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা—বাংলা ভাষার কোন স্থান হবে না। সমস্ত নীরবতাকে মুহূর্তের মধ্যে খান খান করে ভেঙ্গে দিয়ে সমবেত ছাত্রসমাজ গর্জে উঠলেন—না, তা হবে না। অভাবিত পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে কণ্ঠস্বর কঠোর করে বিরাজমান থমথমে অবস্থার মধ্যে পুনরায় জিন্না সাহেব বলে উঠলেন, উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। উপস্থিত সকলের হৃদয়ে ভূমিকম্পবৎ আলোড়ন সৃষ্টি করে উপস্থিত ছাত্র-সমাজ সমবেতভাবে সোচ্চারে বলে উঠলেন—না—তা হতে দেব না। তৃতীয় বারের মত জিন্না সাহেব তাঁর সমস্ত শক্তিকে সংহত করে তাঁর শীর্ণ শরীরকে ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা করে দাঁড় করিয়ে ক্রোধপ্রকম্পিত কণ্ঠে তাঁর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা সম্বল করে সর্বশক্তিমানের বাণী ঘোষণার মত করে বললেন—উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

জিন্না সাহেব একটি বারের জন্যও কল্পনা করতে পারেন নি—মাতৃভাষার যথার্থ সম্মান রক্ষার নিবেদিতপ্রাণ পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র-সমাজ কত আপোষহীন, নিজ ভাষার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও আবেগের কাছে তাঁর পর্বত-প্রমাণ জনপ্রিয়তা কত তুচ্ছ। তিনি ভাবতেও পারেন নি, সমস্ত রাজনৈতিক প্রচার, ধর্মীয় মতান্ধতা ও সংকীর্ণতার জারিজুরি মাতৃভাষা প্রেমিক ছাত্র-সমাজের কাছে কত নিরর্থক। রাজনৈতিক পাঞ্জাকষায় দক্ষ এবং অনন্যসাধারণ সুতীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী কায়েদে আজম তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এমন বে-কায়দায় কখনও পড়েছেন বলে জানা নেই। মাতৃভাষার রসে সিঞ্চিত টগবগে প্রাণের হৃদয়-নিংড়ানো উচ্ছ্বাস নিয়ে রবি-নজরুল-সুকান্ত-জসিমুদ্দিনের বাংলার ছাত্র-সমাজের যোগ্য প্রতিভূরা তৃতীয় বারে জিন্না সাহেবের গাম্ভীর্য ও কঠোরতাকে নির্মমভাবে উপেক্ষা করে-কুম্ভ-কণ্ঠে আওয়াজ তুললেন—না—তা মানবো না। তখন কি কেউ ভেবেছিলেন, বাংলার এই তরুণদল বঙ্গোপসাগরে বঙ্গভাষার যে তরঙ্গ সৃষ্টি করলেন তা এত দ্রুত ভারত মহাসাগরকে অতিক্রম করে আরব সাগরে আছড়ে পড়ে উপকূলে অবস্থিত করাচীকে টালমাটাল বে-সামাল করে দেবে?

ক্ষোভে আরক্ত হয়ে, ব্যর্থ ব্যক্তিত্বের বেদনায় কুণ্ঠিত হয়ে—ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রমাদ গুণে জাতির জনক সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন। আর মুহূর্তের মধ্যে বীরপুঙ্গব পুলিশের দল নেকড়ের মত নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বৃটিশের কাছ থেকে শেখা 'নেটিভ' ঠ্যাঙানো বিদ্যার ঝাঁঝ দেখাতে শুরু করলেন। অনেক ছাত্র গ্রেপ্তার হলেন, অনেকে হলেন প্রচণ্ডভাবে আহত। মাতৃভাষার বেদীমূলে ভক্তের রক্ত অর্ঘ্য নিবেদিত হলো। পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র-সমাজ রক্তের অক্ষরে স্বাক্ষর করলেন শপথ বাণী—রক্ত দেব, জান দেব তবু জবান দেব না, ভাষার অধিকার ছাড়ব না। এই ঘটনার সংবাদ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত গোটা পূর্ব-পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সকল প্রকার সরকারী নির্যাতন, নিপীড়ন ও আক্রমণকে তুচ্ছজ্ঞান করে প্রদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আকাশ-বাতাস মথিত করে ছাত্র-সমাজ দাবী তুললেন—"রক্তের বদলে ভাষা চাই"। ভাষার আন্দোলনে এক নূতন জোয়ারের সৃষ্টি হোল।

জালেম শাহী ইতিহাসের শিক্ষা কখনও নিতে চায় না। তাই তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠী অত্যাচার আর নিষ্পেষণের বন্যায় ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিলেন এই ভাষার আন্দোলনকে। অত্যাচার যত

বাড়তে থাকল আন্দোলন তত বেশি ব্যাপক ও গভীর হতে থাকল। ক্রোধে দিশেহারা শাসক-শ্রেণী তার সকল আক্রোশকে কেন্দ্রীভূত করল বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে। শস্য-শ্যামলা বাংলায় যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, মনোরম স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশে যাঁরা লালিত পালিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে এত জঙ্গীপনা—এটা কী করে হয়? তাই তাঁরা ঠাওর করলেন—বাংলা ভাষার মনোমুগ্ধকর মন্দাকিনীর ধারা এই নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের মূল উৎস। তাই ভাষাকে বিকলাঙ্গ না করে আন্দোলনকে পঙ্গু করা যাবে না। তাঁরা দাওয়াই বের করলেন, বাংলা ভাষাকে ত রাষ্ট্রীয় ভাষা করা হবেই না উপরন্তু বাংলা অক্ষর তুলে দিয়ে উর্দু হরফে বাংলা ভাষা চালু করা হবে।

বিক্ষোভের মজুত বারুদ ভান্ডারে যেন অগ্নি-সংযোগ করা হোল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল পূর্ব-পাকিস্তানের নবীন প্রাণ। বাংলার ক্ষণজন্মা প্রবাদপুরুষ ডঃ শহীদুল্লাহ প্রমুখ সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, লেখক এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন।

সভ্যতা-ভব্যতা, ন্যায়-নীতি, দেশের ভবিষ্যৎ, জনগণের কল্যাণ—সকল কিছুকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাইফেল উঁচু করে বেয়নেট তাক্ করে শাসকগোষ্ঠী চরম আঘাত হেনে আন্দোলনকে নিস্তব্ধ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। গণতান্ত্রিক শক্তি তাকে যেখানে যেভাবে পারে মোকাবিলা করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ালো।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। আন্দোলনের পীঠস্থান ঢাকার মনোরম এলাকা রমনার অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও ইন্জিনিয়ারীং কলেজ। সরকারী নিষেধ-বিধিকে অগ্রাহ্য করে ব্যবস্থা হোল ছাত্র-মিছিলের। কিন্ত শাসকগোষ্ঠী যেন এর অপেক্ষারই ছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারী শান্তিপূর্ণ ছাত্র জমায়েতের উপর বিনা প্ররোচনায় গুলি চলল। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং ইনজিনিয়ারীং কলেজের ছাত্রাবাসে নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে শাসক-কুল বীভৎসতার নগ্নরূপ প্রকাশ করল। দুনিয়ায় ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ বরকত-সালাম-রফিক-জব্বরের লাল খুনে রাঙ্গা হোল ঢাকার রমনা প্রান্তর। জালেম এজিদ সরকারের বর্বরতা ও নৃসংশতার বলি হয়েছিল হাসান-হোসেন কারবালার মরু পথে। আর ছাত্র-শ্রমিকের তাজা রক্তে লাল হোল রমনার শ্যামলিমা। রক্ত গোলাপ আর রক্ত জবায় ভাষাদেবীর ঐতিহাসিক বন্দনার বোধন হোল রমনায়। আজও হয়ত কান পাতলে শোনা যাবে তার সেই দিনের সেই সাড়া-জাগানিয়া ধ্বনি—"রক্ত নাও, জান নাও, বিনিময়ে ভাষা দাও।"

পূর্ব-পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্র ও যুব সমাজ, সচেতন বুদ্ধিজীবী ও অগণিত কৃষক ও শ্রমিক তাঁদের ভাষার দুষমনদের ক্ষমা করেন নি। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে একজন অতি সাধারণ ছাত্র খালেক নেওয়াজের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়—তাঁর দল ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ পূর্ব-পাকিস্তান আইন সভায় মাত্র ৯টি আসনে সংকুচিত হয়েছিল। বাংলা ভাষার দাবী, তাঁদের প্রাণের দাবীকে তাঁরা আদায় করে নিয়েছিলেন। বাংলা অক্ষরেই অবিকৃত বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল।

মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তকারীরা যতদিন পর্যন্ত শুধু বাংলা ভাষা-ভাষী এলাকায় নয় তামাম দুনিয়ার যে-কোন অংশে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে ততদিন পর্যন্ত ২১শে ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষার অনুরাগী, সচেতন মানুষকে নির্ভীক সংগ্রাম চালাতে অনুপ্রাণিত করবে—বজ্র কঠিন নির্দেশ দেবে।

অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারীকে শুধু সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাব তাই নয়, সেই দিনের মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের অমর স্মৃতির প্রতি শুধু কৃতজ্ঞতা নিবেদন করব তাই নয়—শপথ নেব—যাঁরা হরেক রকম বুলির আড়ালে মাতৃভাষার অমর্যাদা করতে চান, যাঁরা তার সঠিক ব্যবহারকে শিক্ষার ক্ষেত্রে, কার্যক্ষেত্রে ক্ষুন্ন করতে চান, দাস-সুলভ মনোভাববশতঃ কিংবা কোন বিশেষ ব্যক্তি-স্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য অন্য ভাষার সাথে এর যৌথ প্রয়োগের পক্ষে ওকালতি করতে চান—তাঁরা যত বড় পণ্ডিত ব্যক্তি হোন না কেন—মাতৃভাষার স্বার্থে, দেশের স্বার্থে তাঁদের আমরা ক্ষমা করব না। ভাষার শহীদদের গৌরবোজ্জ্বল অমরত্বকে কখনও আমরা কলঙ্কিত হতে দেব না। জব্বার-সালাম-রফিক-বরকতদের কাছে এপার বাংলার যুব সমাজের এই হোক সহ-যোদ্ধার, সতীর্থের শ্রেষ্ঠ অঙ্গীকার।

"মানুষের যে সভ্যতার রূপ আমাদের সামনে বর্তমান, সে সভ্যতা মানুষখাদক।......তার ঐশ্বর্য, তার আরাম, এমনকি তার সংস্কৃতি উপরে মাথা তোলে নিম্নতলস্থ মানুষের পিঠের উপর চড়ে। এই নিয়েই য়ুরোপে শ্রেণীগত বিপ্লবের লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছে।......দুর্বলের প্রতি নির্মম সভ্যতার ভিত্তি বদল না হলে ধনীর ভোজের টেবিল থেকে উপেক্ষায় নিক্ষিপ্ত রুটির টুকরো নিয়ে আমরা বাঁচব না।"—রবীন্দ্রনাথ

শহীদের রক্তে ভাস্বর দিন একুশে ফেব্রুয়ারি

কল্পতরু সেনগুপ্ত

ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ ভারতের এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই উপমহাদেশের (ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান) মানুষের স্মৃতিতে বহু শহীদের আত্মদানে এই দিনটি উজ্জ্বল হয়ে আছে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে ছাত্র ও যুবকেরা বুকের রক্ত ঢেলেছিল মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্র-ভাষা করার দাবীতে। ১৯৪৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি নাবিকরা বিদ্রোহ করে সাম্রাজ্যবাদীদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছিল। বছরের দিক থেকে আগে পরে কিন্তু একই তারিখে এমন দুটি মহৎ ঘটনা জাতির ইতিহাসে একবারই আসে। যে যুগান্তকারী ঘটনা দেশের ইতিহাসে পরিবর্তন ঘটিয়েছে, পরাধীনতার শৃংখল মোচন করেছে, নতুন করে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়েছে, মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার এই ঘোষণার তাৎপর্যকে উচ্চে তুলে ধরেছে। এই উপমহাদেশের জনজীবনে তাই ২১শে ফেব্রুয়ারি এক ঝলক আলোর মত একটি মহৎ দিন।

১৯৫২ সালের পরে প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি আসে, এবারও আসছে। দুই বাংলার আকাশে বাতাসে ঋতু পরিবর্তনের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়েছে, গাছে গাছে অঙ্কুরিত কিশলয় বসন্তের আগমনী বার্তা এনেছে। পলাশ আর কার্পাস গাছের শাখায় শাখায় রঙ ধরেছে। সেই রঙ মনে করিয়ে দেয় একটি বিশেষ দিনকে। সেই দিনের উদ্দেশে কথাগুলি সুর হয়ে ফুটে ওঠে অনেকের মুখে, "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি। ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি।" এই দিনটির জন্য বাংলাদেশের শহর-গ্রামে ছাত্র ও যুবকরা প্রস্তুত হতে থাকে। সভা ও সেমিনারের আয়োজন হয়, শহীদদের উদ্দেশে কবিতা ও গান রচনা হয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মহড়া চলে। জাতীয় জীবনে ২১শে ফেব্রুয়ারি এক পবিত্র দিন। ধর্মীয় উৎসবের দিনকে পেছনে ফেলে নতুন তাৎপর্যে এই দিনটি ধ্রুবতারার মত পথ দেখাচ্ছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ভোরের আলো ফুটবার আগে প্রভাত-ফেরী শুরু হয়। নাগরিকদের ঘুম ভাঙে প্রভাত-ফেরীর গানে। পবিত্র আজানের ধ্বনির মত শোনায় এই গান। সকরুণ অনুভূতির ছোঁয়া লাগে, সকলে জেগে ওঠে, যাত্রা করে আজিমপুর গোরস্থানের দিকে। শহীদমিনার ফুলে ফুলে ভরে ওঠে। প্রতিটি ফুল বাঙালী জাতির হৃদয় উৎসারিত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রতীক। ধীরে ধীরে প্রভাত-সূর্য পূর্বাকাশে দেখা দেয়, সূর্যালোক রাঙিয়ে দেয় বাঙালীর অন্তরকে। একটা সংকল্প জাগিয়ে তোলে।

২১শে ফেব্রুয়ারি কেবল বাংলাদেশকে রাঙায় না, সীমান্ত পেরিয়ে কলকাতার জীবনেও সে রঙের ছোঁয়া লাগে। ঢাকার মাতৃভাষার মর্যাদার সংগ্রামকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নিজেদের সংগ্রাম মনে করে। কলকাতার এবং পশ্চিমবঙ্গের শহরে শহরে সেই গানটি শোনা যায়, "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি—আমি কি ভুলিতে পারি।" এই দিনে ঢাকা-কলকাতা বড় কাছে এসে যায়। এই বাংলার বাঙালীর মনে মাতৃভাষার গৌরবে জাতীয়তাবোধ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই জাতীয়তাবোধ পূর্ব ও পশ্চিম দুই বাংলার মধ্যে মৈত্রীর সেতু বন্ধনের সংকল্প জাগায়। বাংলা-ভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করার ও জনজীবনের বিকাশের সহায়ক করার প্রেরণা দেয়।

ভাষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত জাতীয় মর্যাদা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্ন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরে সাময়িক হতাশ এলেও পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামশীল শক্তি অগণতান্ত্রিক কোন ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নি। পাকিস্তানী শাসকরা জনগণের অধিকার হরণ করে যে স্বৈরাচারী রাষ্ট্র প্রবর্তন করতে চেয়েছিল, জনসাধারণকে ধর্মীয় অন্ধতায় আচ্ছন্ন করে রাখতে চেয়েছিল, ছাত্র-সমাজ তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত পরিবেশকে পেছনে ঠেলে দিয়ে গণতান্ত্রিক দলগুলি এগিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। বুদ্ধিজীবীরা লেখনী ধরেছিলেন, শ্রমিক-কৃষক অর্থনৈতিক দাবীতে আন্দোলন করেছিলেন, বন্দীমুক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবীতে নারী-পুরুষ সংগঠিত হয়েছিল। জেলের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। এই পটভূমিতে পূর্ববাংলায় রাষ্ট্র-ভাষার আন্দোলন। মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ছাত্র আন্দোলন এক বিরাট গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পরিণত হয়। উর্দুভাষাকে জোর করে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করায় পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের জাতীয়তাবোধে আঘাত লাগে। ধর্মের ভিত্তিতে জাতিতত্ত্বে যারা বিশ্বাসী ছিল এবং দেশভাগ সমর্থন করেছিল তারাও এতে হতাশ হয়। ছাত্র ও যুবসমাজ এই ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ করে। ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলির আন্দোলনে পূর্ববাংলার জনসাধারণের সচেতন অংশ বুঝতে পারে, ধর্মকে সামনে রেখে ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে শাসন ও শোষণ করা হচ্ছে, পূর্ববাংলার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। এই চেতনা থেকে ধূমায়িত বিক্ষোভের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণায় জনমনে আগুন জ্বলে ওঠে। তিনি পল্টন ময়দানের সভায় ঘোষণা করেছিলেন—উর্দুই হবে সমগ্র পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ববঙ্গব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ঘোষিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ঢাকা শহরে একদিকে উত্তেজনা, আরেকদিকে উৎসাহ। অফিস আদালত দোকানপাট গাড়ি বন্ধ। ঢাকা শহরে থমথমে অবস্থা, পুলিশবাহিনীর বুটের শব্দে ভীতি সৃষ্টি করেছে। ১৪৪ ধারা জারী করে সভা, মিছিল বন্ধ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্ররা সমবেত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দশজন করে তারা এগিয়ে যাবে এসেম্বলীর দিকে। এক একটি দল এগিয়ে যায়, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। আরো ছাত্র জমায়েত হতে প্রথমে লাঠিচার্জ, পরে কাঁদানে গ্যাস, তার পরে বন্দুক গর্জে ওঠে। শহীদ হলেন আবদুল জব্বার, রফিকউদ্দিন, আবুল বরকত... অনেকে আহত হয়েছেন। বহু গ্রেপ্তার হয়েছেন। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে জেলায় ও গ্রামে। রাইফেল, মেসিন-গান নিয়ে পথে নামে ফৌজ। পূর্ববাংলা দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে গেল, একদিকে শাসকদল আরেকদিকে জনসাধারণ। আরো শহীদ হলেন শফিউর রহমান, আবদুল সালাম, ওয়ালিউল্লা, আরো কয়েকজন—তাদের মধ্যে একজন রিক্সা-ওয়ালা। ছাত্ররা গড়ে তুললো শহীদস্তম্ভ। সৈন্যরা

ভেঙে দিয়ে গেল। শহীদস্তম্ভ ভাঙলেও, মনের আসন নিভাতে পারলো না। সেদিনের চার কোটি বাঙালী বুঝতে পারলো ধর্মে এক হলে শোষণ বন্ধ হয় না। ধর্মের চেয়ে জাতিসত্তা বড়।

বাংলাভাষার জন্য সংগ্রাম পূর্ববঙ্গের জীবনে আশীর্বাদের মত নতুন করে জাগরণ সৃষ্টি করেছে। এই চেতনায় যেমন বাঙালীর জাতিবোধ জাগ্রত হয়েছে, তার সঙ্গে সাহিত্যে, শিল্পে শিক্ষায় প্রাণশক্তি জাগিয়ে তুলেছে। জনসাধারণ বুঝতে চেষ্টা করলো ভাষার সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক, স্বাধীনতার সঙ্গে ভূমি সংস্কারের সম্পর্ক। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের চিন্তা মুখ্য হয়ে উঠলো। পাকিস্তানের শাসকদল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা স্বীকার করতে বাধ্য হলো বাঙালীদের ঐক্য দেখে। এই জয় বিশ্বাস এনে দিয়েছে। পূর্ব-বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের সংগ্রামে। এই জাগরণের ফসল এমন একদল নতুন কবি যাঁরা বাংলা কাব্যসাহিত্যকে জীবনচিন্তায়, শব্দ সৃজনায় ও ছন্দলালিত্যে রূপময় করে তুলেছেন। ভাষা জাগরণের উদ্দীপনায় প্রকাশিত হয়েছে 'সূর্যদীঘল বাড়ি', 'সারেঙ বৌ'-এর মত আরো বহু উপন্যাস ও ছোট গল্প। যে গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন পদক্ষেপরূপে অভি-নন্দিত হয়েছে। মাটির সন্তান যারা তাদের জীবন ও চিন্তাকে সাহিত্যের পাতায় তুলে এনেছে। শত শত বছর ধরে সমাজে যে সংস্কার ও অজ্ঞতা জড়িয়ে রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র এমনকি আধুনিক সাহিত্যিকরা সমাজের যে স্তরে প্রবেশ করতে পারেন নি, এবং রবীন্দ্রনাথ যে অক্ষমতার জন্য খেদ প্রকাশ করেছেন এই নতুন সাহিত্যিকরা সেই অভাব পূরণ করতে চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশের এই নতুন সাহিত্যে দ্বিধাহীনভাবে মুসলিম সমাজে মোল্লা মণ্ডলীর প্রভাব, গ্রাম্য মোড়লদের রক্ষণশীলতার অভিশাপ, নারীর অবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে কৃষক, ক্ষেত মজুর, নাবিক, মাঝি-মাল্লার জীবনচিত্র উপস্থিত করেছেন। এই আলোড়ন থেকে সম্ভব হয়েছে শিল্পী জয়নাল আবেদিনের শিল্পরীতির প্রভাবে অসাধারণ শিল্পসৃষ্টি—যাতে পূর্ববাংলার জীবন, রূপ ও প্রাণের প্রকাশ। কামরুল হাসানের মত শিল্পীরা আজ কেবল পূর্ববঙ্গের নয় দুই বাংলার গর্বের শিল্পী। চলচ্চিত্রে 'সূর্যদীঘল বাড়ি' সম্ভব হয়েছে ভাষা আন্দোলনের জন্য। যে ছবি বাংলাদেশের জীবনের প্রামাণিক রূপায়ণের দিক থেকে এবং মানবিক আবেদনে সর্বকালের দর্শনযোগ্য ছবি হয়ে থাকবে। এরূপ ছবি মানুষের প্রতি সম্মানবোধ ও ভালবাসা না থাকলে সম্ভব হয় না। পশ্চিমবঙ্গে 'পথের পাঁচালী' ছবি হয়েছে সত্যি, কিন্তু 'সূর্য-দীঘল বাড়ি'র মত ছবি হয় নি। 'সারেঙ বৌ' এবং 'জীবন থেকে নেয়া' সম্পাদনার ত্রুটি এবং কারি-গরি দুর্বলতা থাকতে পারে কিন্তু জীবনভিত্তিক এবং নতুন দিকে দৃষ্টিপাতের প্রচেষ্টায় সার্থক। বাংলাদেশ চিরদিনই লোকসঙ্গীতে ও লোকগাথায় সমৃদ্ধ। এই সম্পদ চাপা পড়েছিল বিদেশী শাসনে। ভাষা আন্দোলনই এই সম্পদকে টেনে তুলেছে, নতুন করে মর্যাদা দিয়েছে। এইসকল সাংস্কৃতিক বিকাশের সঙ্গে রক্ষণশীলতার অবরোধ ভেঙে নারীশিক্ষার প্রসার, বোরখা ত্যাগ করে মেয়েদের বেরিয়ে আসা, পুরুষের পাশাপাশি কর্মজীবনে অংশগ্রহণ এবং সহশিক্ষা প্রবর্তন ইত্যাদিতে রয়েছে ভাষা আন্দোলন থেকে সম্ভূত আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা। ছেলেমেয়েদের নাম-করণের ব্যাপারেও নতুন চিন্তা প্রকাশ পেল। আরবীয় নামের গতানুগতিক অনুকরণ থেকে মুক্ত হয়ে বাংলা নাম অনেকের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল। আরবীয় নামের পেছনে বাংলা ডাক-নাম জুড়ে দেওয়ার রীতি ভাষার সংগ্রামের পরে প্রচলিত হয়েছে যাতে বাঙালীত্ব প্রকাশ পায়।

জাতির জীবনে কোন মহৎ দিন আকস্মিক-ভাবে আসে না তার জন্য প্রস্তুতি থাকে, পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে ছিল দেশবিভাগের পূর্বের গণসংগ্রামের চেতনা, এবং দেশবিভাগের পরে গণতান্ত্রিক আন্দালনের অভিজ্ঞতা। দেশবিভাগের পরে বাংলাদেশের গ্রামে কৃষকরা শোষণ ও দাসত্বমূলক প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, হাজং চাষীরা বিদ্রোহ করেছে, রেলশ্রমিকরা ধর্মঘট করেছে, মহিলারা গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করেছে। এইসকল আন্দোলনে ছাত্রসমাজ ছিল সহযোগী। এইসকল আন্দোলন থেকে ভাষা বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারবোধ জাগ্রত হয়েছে। যখন জাতিবোধ জেগে ওঠে তখন একটা জাতি সর্বদিক থেকে বিকশিত হয়ে ওঠে। যুক্তবাংলায় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন যেমন জাতীয় সত্তাকে উন্মেলিত করেছিল। সেই জাগরণ সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে ও ব্যবসায়ে প্রতিফলিত হয়েছে। বৈপ্লবিক চিন্তা-ধারা ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টির বিকাশে নতুন দেশ-প্রেম জন্মেছে। বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে মুক্তির স্বপ্ন জেগেছে ভাষা আন্দোলন থেকে। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের বা স্বরাজ্য গঠনের চিন্তায় বাঙালীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এই ঐক্যকে ভাঙতে গিয়ে পাকিস্তানী শাসকরা দেশ-বাসীর উপর আক্রমণ করেছে। এই আক্রমণের পাশবিকতায় ইসলামিক ভ্রাতৃত্বের ভাঁওতা জন-সাধারণ বুঝতে পেরেছে। ইসলামী শাসকদের নারকীয় মূর্তি দেখে বুঝেছে ধর্মই জাতি গঠনের একমাত্র ভিত্তি নয়। এই মোহমুক্তিতে ছাত্র, যুবক, কৃষকরা অস্ত্রধারণ করে জীবন দিয়ে লড়াই করেছে। এই সংগ্রামের এবং অগণিত মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছে স্বাধীনতা। জন্ম হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের। তাই ভাষা আন্দোলন আরো তাৎপর্য লাভ করেছে। ভাষা আন্দোলনের শহীদরা কারবালার শহীদের মত যেমন বিষাদের স্মৃতি জাগায়, তার সঙ্গে প্রেরণা জাগায় ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে যাবার জন্য।

ভাষা আন্দোলন পূর্ববঙ্গে জাতীয় জাগরণ ঘটিয়েছে, জাতিকে নবজন্ম দিয়েছে, নতুন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। যে প্রতিক্রিয়া-শীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সেই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে সেই বিরুদ্ধ শক্তি, ধর্মান্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদী চরেরা অর্জিত সেই সাফল্যকে ব্যর্থ করার জন্য প্রতি মুহূর্তে চক্রান্ত করছে। এই চক্রান্তের চেহারা বাংলাদেশের মানুষ দেখেছে ১৯৭৫ সালে মুজিবর রহমানকে হত্যা থেকে ১৯৮১-সালে জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে। সাম্রাজ্যবাদী ও পাকিস্তানের গোপন চক্রান্ত-কারীরা পদে পদে বাংলাদেশের প্রগতিতে বাধা দিয়ে শহীদের স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতি দেখে বোঝা যায় ভাষা আন্দোলনের শহীদের স্বপ্ন সার্থক করার জন্য বাংলাদেশের জনগণকে আরো আন্দোলন, আরো সংগ্রাম করতে হবে। রক্ত দিয়ে যাঁরা পথের নিশানা দিয়েছিলেন সেই লক্ষ্যে এখনো পৌঁছানো যায় নি। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের জীবনে শান্তি নেই। একথা বোঝে বাংলাদেশের মায়েরা, গ্রামের কৃষকেরা, ছাত্ররা। তাই ফেব্রুয়ারি মাস আসতেই অধীর হয়ে ওঠে, প্রশ্ন জাগে, হিসাব করে শহীদের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে। এই প্রতীক্ষা কবি ফজলে লোহানীর ভাষা ও ছন্দে ব্যক্ত হয়েছে— "মায়েরা সব গেয়ে ওঠো—আর চুপ নয়, এবার শুধু শহীদের গান। বিজয়ের গান। শহরে যাদের মৃত্যু হয়েছে, ফিরে আসছে, ফিরে আসছে, হাজারে হাজারে মিছিল করে।"

ভাষার শহীদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি পশ্চিম-বঙ্গেও উদ্‌যাপিত হয়। এখানেও সংকল্প গ্রহণ করা হয় মাতৃভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার। ভাষার সূত্রে এখানেও জাতি ও অধি-জাতির স্বাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়। প্রশ্ন জাগে বাংলাভাষা এখনো সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারলো না কেন। এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে স্বাধীনতার পরবর্তীকালের ব্যর্থতার চিত্র চোখের সামনে এসে যায়। আর এসে যায় ঔপনিবেশিক শাসনের পাপ কিভাবে রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে তার প্রমাণ। মাতৃভাষার বিষয়ে গর্বের অভাব। মাতৃ-ভাষাকে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে একমাত্র ভাষারূপে ঘোষণা করায় এবং সেভাবে শিক্ষাক্রম প্রস্তুত করার বিরুদ্ধে একদল 'শিক্ষাদরদী' পথে পথে চিৎকার শুরু করেছিলেন। এখন আবার তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ইংরেজীকে আবশ্যিক করার জন্য নাটকীয়ভাবে আন্দোলন করছেন। অথচ এঁরাই যখন ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষার শহীদ দিবসে উপস্থিত হয়ে উচ্ছাসের সঙ্গে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন, তখন কি মনে হয় তাঁরা আন্তরিকতার সঙ্গে কথাগুলি বলছেন? যাঁরা মাতৃভাষার জন্য আত্ম-দানকারী শহীদদের শ্রদ্ধা করেন তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার বিরোধিতা করতে পারেন না। এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানানোই স্বাভাবিক। স্বাধীনতার ৩১ বছর পরে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারই মাতৃ-ভাষাকে যোগ্য মর্যাদায় স্বীকৃতি দিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারির শহীদদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করলেন। বামফ্রন্ট সরকার সরকারী অফিসে বাংলা-ভাষায় কাজকর্ম ও যোগাযোগের নির্দেশ দিয়ে স্বাধীনতার একটি প্রধান শর্ত পালন করেছেন।

হাঙর এবং কুমীরের দল

কিছু দার্শনিক মনে করতেন, এখনও কেউ কেউ মনে করেন—পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া একটি স্বাভাবিক মানবিক প্রবৃত্তি। যেমন বিপদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা একটি প্রবৃত্তি। ম্যালথাস যে সময়ে দাঁড়িয়ে এই ধরনের কথা বলেছিলেন সেই সময়ের দিকে তাকিয়ে জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা সম্পর্কে আলোকপাত করা ছাড়া আধুনিক মানুষের আর কোন দায়িত্ব নেই। ফ্রয়েডকেও কেউ কেউ সম্প্রসারিত করেছিলেন এই দর্শনের নাগাল ছুঁতে। এটা গ্রামীণ গল্পে জানা যায় ভাল ভূতের ওঝা কেবলমাত্র ভূত তাড়াতে পারে না, বিশেষ ব্যক্তির ওপর ভূত নামাতেও পারে। পশ্চিমী দুনিয়ায় এই মুহূর্তে এই ধরনের ওঝা খুব প্রয়োজন। কবরের তলা থেকে ম্যালথাসকে বার করে সারা পৃথিবীর মানুষের ঘাড়ে, অন্তত সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়ক এবং রাষ্ট্রনায়িকাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সারা পৃথিবী যেন চিরন্তন যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া হোক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আমরাও ওঝাতত্ত্বে বিশ্বাসী। ম্যালথাসের ভূত তাড়াতে হবে হোয়াইট হাউস, দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট প্রভৃতি আখড়া থেকে—প্রয়োজনে সরষে, লঙ্কা পোড়া এবং আবশ্যিকভাবেই ঝ্যাটার ব্যবস্থা আমরা করব।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর শোনা যায় আমেরিকাতে গীর্জায় যাওয়া মানুষের সংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছিল। এই মানুষদের আবেদন ছিল করুণাময় যীশুর কাছে—আর যেন যুদ্ধ না হয়। এটা বাজি রেখে বলা যায় সবাই এ কথা বলে নি, অন্য সুরেও কেউ কেউ কথা বলেছিল। এটা পরম করুণাময় যীশু এবং অবশ্যই এফ. বি. আই. এবং সি. আই. এ. জানে (আমেরিকাতে যীশুর থেকে এফ. বি. আই., সি. আই. এ.-র কান অনেক শক্তিশালী)। এই গড্ডলিকা প্রবাহে না ভেসে দু'একজন কাতর আবেদন তুলেছিল পরম করুণাময় আর একটি ভিয়েতনাম লাগাও। এই মহাপুরুষরা কারা —এ পরিচয় জানতে হলে বেশ কিছু ক্যালেন্ডার মাড়িয়ে পৌঁছতে হবে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।

বাস্তিলের দুর্গ ভেঙ্গে পড়েছিল ফরাসী বিপ্লবের বন্যার আঘাতে। তারপরের ইতিহাস সহজ—আরও হাজার বাস্তিলের প্রাচীর ভেঙ্গে গোটা সমাজ এসে দাঁড়াল এক উন্মুক্ত প্রান্তরে—অবাধ ব্যবসার প্রান্তর। মধ্যযুগীয় বদ্ধ জলায় আটকে পড়া মানবিক প্রবৃত্তির সব ক'টি এসে দাঁড়াল এক নতুন দিগন্তে। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু সৃষ্টি সব-কিছু পেল নতুন প্রেরণা। রুশো বা ভলটেয়ারের লেখনীতেই স্বাধীনতা, সাম্য আর মৈত্রী আবদ্ধ রইল না। এই সমস্ত কিছু উন্নত উপলব্ধির পেছনে কাজ করছিল একটি দুর্বোধ্যতা। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা যা কিনা সমাজের চালিকাশক্তি মুগ্ধ হয়ে এক অদৃশ্য, দুর্জ্ঞেয় সত্তার প্রতি তার সমস্ত নিবেদন ঢেলে দিচ্ছিল এবং এই দুর্বোধ্য সত্তাটি হোল "বাজার"। যতক্ষণ এই "বাজার" তার দুর্বোধ্যতা নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত ততক্ষণে তাকে জানবার জন্য আছে স্বাধীনতা, যতক্ষণ "বাজার" তার সীমাহীনতায় আমাকে বিস্মিত করে ততক্ষণ আছে সেই সীমার অন্বেষণের জন্য সাম্য। এই সীমাহীনতার খোঁজ করতে গোটা দুনিয়া (প্রাসঙ্গিকভাবেই পশ্চিমী) তখন ছুটে চলেছে সামনে। পেছনে তাকানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মানুষ। গোটা দুনিয়া তখন পায়ের তলায়, কিন্তু পিপাসা অতৃপ্ত। "বাজার" তার সীমাহীনতা হারিয়েছে। পণ্য উৎপাদন নামক যে সত্তাটি মানুষকে ছুটিয়েছে নতুন নতুন বাজারের জন্য সেই সত্তা তখনও নতুন জমি চায়। যে অনুন্নত উপনিবেশগুলোকে জয় করা হয়েছে যেখানে মানুষ, জমি, সম্পদকে নিংড়ে সবটুকু রস বার করলেও তৃষ্ণা মিটছে না। অতএব চাই নতুন বাজার। কিন্তু সেটাও সম্ভব নয়, কারণ অন্য বাজারগুলোও অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দ্বারা অধিকৃত। স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি শব্দগুলো তখন উজ্জ্বলতা হারিয়ে কাগজে চেহারায় পর্যবসিত হয়। যথেচ্ছ বাণিজ্য করার স্বাধীনতা এবং সাম্য তখন পুঁজিবাদের সামনে একমাত্র বাধা। যে বিষয়টি এতদিন ছিল অর্থনীতিক এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রারম্ভিক সর্ত সেই বিষয়টিই

মানব মুখার্জী

আপাতত সবচেয়ে বড় বাধা। ইতিহাস কার্ল মার্কস্-এর এন্টিডুরিং-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজের গতিপথ পরিবর্তন করল। এতদিন পর্যন্ত যা ছিল উপনিবেশ দখল করার যন্ত্র সেই সামরিক দানবটিকে প্রস্তুত করা হোল অন্য উন্নত রাষ্ট্রের উপনিবেশ প্রয়োজনে সেই রাষ্ট্রটিকে দখল করার কাজে। দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়োররা বলেছিল, দশটি রাইফেল এবং ন'জন সঙ্গী থাকলেই দখল করা যায় কয়েক হাজার একর জমি। কিন্তু কথাটি আর বাস্তব রইল না। কারণ কয়েক একর জমির ওপরেই দাঁড়িয়ে বাধা দেবে উন্নত দেশের দশ জন মানুষ এবং দশটি রাইফেল। সুতরাং এখন প্রয়োজন কুড়িটি রাইফেল। কিন্তু সেই কুড়িটি রাইফেল আসার পর দেখা গেল প্রতিবেশীর হাতে উঠে এসেছে পঁচিশটি রাইফেল।

এ এক নতুন প্রতিযোগিতা। নামে "অস্ত্র প্রতিযোগিতা"। বিষয়ে সংহত মৃত্যুর পরিমাণ এবং গুণগত প্রতিযোগিতা।

বুর্জোয়া অর্থনৈতিক শব্দকোষ থেকে 'লেসে ফেয়ার' বা অবাধ বাণিজ্য নামক শব্দটি নির্বাসিত হওয়ার পর 'মনোপলি' বা একচেটিয়ার সাম্রাজ্য সুরু। নতুন সাম্রাজ্য দখলের স্বপ্ন এবং অর্থনৈতিক প্রবণতার সংমিশ্রণে সৃষ্ট ধৃতরাষ্ট্রের একশ সন্তানের ঢথুড়ি, একশ এক সন্তান) প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হোল—সন্তানটি কেতাবী ভাষায় অস্ত্র উৎপাদন শিল্প, বাংলা ভাষায় মানুষ মারার কারখানা। অর্থনীতির ইতিহাসে গিল্ড পেরিয়ে ট্র্যান্স ন্যাশানাল কর্পোরেশন বা বহুজাতিক

—— হাজিরের কাহিনী কল্পনা এই মুহূর্তে বাতুলতা। কিন্তু অর্থনীতির সুন্দর মূল্যবোধটি পচে দুর্গন্ধ ছড়ানোর এই ইতিবৃত্তিতে অস্ত্র উৎপাদন নামক ব্যবসাটির ভূমিকা অনন্য। নিজস্ব চরিত্রের দিক থেকেই এই শিল্পটি জন্মমুহূর্তেই একচেটিয়া। আমার মত মূর্খের অর্থনীতির কল্পনার পরিবর্তে আমাদের পক্ষে অনেক সুবিধা হবে ভ্লাদিমির ইলিচ উইলিয়ানভ নামক ব্যক্তিত্বটির কাছে অনেকবারের মত এবারেও হয়ত পাবো। লেনিনের কথায়—"যখন পুঁজিপতিরা প্রতিরক্ষার জন্য কাজ করে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের জন্য কাজ করে, তখন অবশ্যই এটা আর "বিশুদ্ধ" পুঁজিবাদ থাকে না, হয় বিশেষ ধরনের একটি জাতীয় অর্থনীতি। বিশুদ্ধ পুঁজিবাদের অর্থ পণ্য উৎপাদন। আর পণ্য উৎপাদন মানে পুঁজিপতি কাজ করছে একটি অজানা এবং খোলা বাজারের জন্য। কিন্তু প্রতিরক্ষার জন্য কাজ করছে যে পুঁজিপতি তা কোন বাজারের জন্য নয় সরকারের দেওয়া অর্ডার অনুযায়ী"।

এই বিশেষ শিল্পের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান যার জন্য একমাত্র একচেটিয়া পুঁজির ক্ষমতা ছাড়া এই দামাল গন্ডারটিকে সামলানো সম্ভব নয়। "যা কিছু বর্তমান সবই উৎপাদনের জন্য" এ সত্যটি পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে লেজে ফেয়ার্-এর সাথে সহমরণের যাত্রী হয়েছে। যে বিজ্ঞান ছিল বাড়তি উৎপাদনের হাতিয়ার সেই বিজ্ঞানই পরবর্তী ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায় জমে থাকা বাড়তি অবিক্রিত মালের মত পুঁজিবাজী দুঃস্বপ্নের জনক। অতএব ইতিহাসের এ পর্বে এসে বিজ্ঞান ব্যবহৃত হতে থাকলো সৃষ্টির পরিবর্তে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। অর্থনীতির চাহিদা বিজ্ঞানের গবেষণার মূল দর্শনকে নিয়ন্ত্রণ করে। অস্ত্র প্রতিযোগিতাও বিজ্ঞানের মূল ধারা থেকে কেটে আনা খালে নতুন দিকে বইতে সুরু করলো। কাটা খাল দিয়ে হাজির হোল মানুষ খুনের কুমীর। বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক ব্যবহারে ধন্য অস্ত্র উৎপাদনের ওয়ার্কশপে কোন ক্ষুদ্র মালিক অথবা মালিকগুচ্ছের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এবং এর ফলে অস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজির কেন্দ্রীকতা অনেক বেশী। মার্কিনী সমীক্ষা অনুযায়ী এক বিলিয়ন ডলার সামরিক শিল্পে বরাদ্দ হলে ১ লক্ষ কাজের সুযোগ তৈরী হয়, সেখানে সমপরিমাণে টাকা অসামরিক শিল্পে দেড় লক্ষ কাজের সৃষ্টি করে। এতেই এই পুঁজিনির্ভর চরিত্র অনুমান করা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকায় মোট সামরিক উৎপাদন করত মাত্র ৫৭টি সংস্থা এখানে কাজ করত ৫০,০০০-এরও বেশী মানুষ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে এই পুঁজি এবং ক্ষমতার ঘনত্ব ক্রমশ বাড়ছেই। আর সবচেয়ে বড় কথা পশ্চিমী দেশগুলোর সরকারগুলো চরিত্রগতভাবেই রাজনৈতিক 'একচেটিয়া', সুতরাং এই ব্যবস্থা উদ্ভূত একান্ত তাদের জন্য উৎপাদক সংস্থাসমূহ যে অর্থনৈতিকভাবে 'একচেটিয়া' হবে এটা স্বাভাবিক। ট্র্যান্স ন্যাশানালের স্বাভাবিক চরিত্রসমূহও এর

[শেষাংশ ৮ পৃষ্ঠায়]

২,০০০ সালের মধ্যে সবার স্বাস্থ্য : বাস্তবতা-স্বপ্ন-সমীক্ষা

মুকুলেশ বিশ্বাস

১৯৭৮ সালে ১৪ই নভেম্বর আলমাটার এশিয়া মধ্য-আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার ৭১টি দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন ১১টি ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে মানুষের কল্যাণে কি ধরনের স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ করা যায় সেই প্রসঙ্গে এক বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে এই জটিলতর সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করেন এবং তার প্রতিকার সাধনে কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ প্রয়োজন তারও উল্লেখ করেন। দীর্ঘ আলোচনার পরে বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার এই সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হয়েছে "২০০০ শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার দিতে হবে" এই চুক্তিতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষও তার স্বাক্ষর প্রদান করেছে।

বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার মতে "কেবলমাত্র রোগ ও অসুস্থতারই অবসান নয়, দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতারও এক পরিবেশ হলো স্বাস্থ্য" এখন প্রশ্ন হচ্ছে অঙ্গিকারবদ্ধ ভারতবর্ষকে যদি ২০০০ শতাব্দীর মধ্যে প্রতিটি নাগরিককে স্বাস্থ্যের অধিকার দেওয়ার সৎসংকল্প বাস্তবায়িত করতে হয় তা হলে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করা প্রয়োজন।

যে দেশে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামের অধিবাসী যাদের অধিকাংশ নিরক্ষর ও দরিদ্র—যে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্তরে কোন সঠিক স্বাস্থ্যনীতি রূপায়ণ সম্ভব হয় নি—সে দেশে এই শ্লোগান বাস্তবায়িত করা খুবই কঠিন কাজ। পরিসংখ্যানে জানা গেছে—পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ কুষ্ঠরোগী; ১ কোটিরও বেশী সক্রিয় টি. বি. রোগী; ১৩৬ লক্ষ শ্লীপাদ রোগী এবং বেশ কয়েক লক্ষ গ্যাস্ট্রিক রোগীর বাস ভারতবর্ষে। এ ছাড়া অপুষ্টি ও অনাহারে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে এক বিরাট জনসমুদ্র। সেই দেশে জাতীয় স্তরে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিশ্রুতি পালন করতে হলে শুধু চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে উদ্যোগ সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না—প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সমস্যা সমাধানের বিষয় ও গুরুত্ব নিয়ে ভাবতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে শুধু স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে ভাবলে চলবে না। এ ছাড়া বর্তমান রাষ্ট্রীয় বিন্যাসের মধ্যে জনসাধারণ যে অধিকার ভোগ করছে আর বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা যে শ্লোগান তুলেছে তার সঙ্গে বাস্তব চিত্রের কতখানি ফাঁক রয়েছে এই ধারণা নিয়ে যদি ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নির্ধারণ করা না হয় তাহলে অতীতের অনেক সদ্ইচ্ছার সোনালী রূপকথার মতো এই প্রতিশ্রুতিও প্রতারণার পরিসংখ্যানই বাড়াবে কার্যতঃ জাতীয় জীবনে কোন কল্যাণ-সাধন করতে পারবে না।

পাঠক সাধারণের স্মৃতি যদি রহস্যজনক কোন কারণে প্রতারণা না ক'রে তা হলে নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না—সারা বিশ্বের সঙ্গে বিশেষ

মর্যাদায় ভারতবর্ষও কিছু দিন আগে শিশুবর্ষ উদ্যাপন করেছিল। এ প্রসঙ্গে সংবাদপত্র, রেডিও, টি. ভি., সিনেমা ইত্যাদি সব প্রচার মাধ্যম শিশু-কল্যাণের বিচিত্র সব অনুষ্ঠানাদি জাতীর সামনে উপস্থাপিত করেছিল। বড় বড় শহরে ফুলের মতো শিশুদের মেলা চমৎকৃত করেছিল মহৎ উদ্দেশ্যকে। এককথায় শিশুবর্ষের শ্লোগানকে ভদ্রতার আব্রু দিয়ে গভীর যত্নে ঠান্ডা শীতল পরিবেশে লালন করা হয়েছিল যাতে কোনক্রমেই মাঠ-ময়দানের ধুলোমাটি, আলো-হাওয়া তার বিশেষ কৌলিণ্যকে বিঘ্নিত করতে না পারে। কিন্তু এই শ্লোগানের বাইরে ধুলো-কাদার মধ্যে পড়ে থাকলো যে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশুর দল তার খোঁজ কেউ রাখলো না। যাদের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ "যারা জাগরণে ভাতের কথা ভাবে—ঘুমোলে ভাতের স্বপ্ন দেখে—না খাওয়ার অসুখে ভোগে, মারা যায় না খেয়ে" অথবা জাতীয় পরিকল্পনার বাইরে না মরে বেঁচে থাকে। শ্লোগান ও বাস্তবতার আসল চেহারা হচ্ছে এই। নারী প্রগতি, নারীবর্ষ এবং অতি সম্প্রতি প্রতিবন্ধী বর্ষের যে সব শ্লোগান শোনা গেছে এবং সমাজ জীবনে সততাহীন দৃষ্টান্ত ঘটে চলেছে "অন্ধদের উপর লাঠি চার্জ—নারীদের বিভিন্ন কারণে থানায় নিয়ে অত্যাচার করা—কারণে অকারণে পুড়িয়ে মারা" ইত্যাদি সব ঘটনার মধ্যে কারুর বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় শ্লোগান ও বাস্তবতার দুই ভিন্ন মেরুতে অবস্থান। তাই কোন প্রগতিশীল শ্লোগান শুনলেই নতুন করে বিশ্বাস ভঙ্গের ইতিহাস তৈরী হওয়ার ভয় হয়। যেমন ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়।

দেশ স্বাধীন হয়েছে দীর্ঘদিন কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন কোন স্বাস্থ্যনীতি রচিত হয় নি যা জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ন্যূনতম গ্যারান্টি দিতে পারে। প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রকৃতি ধাতু ও জল মাটি নির্ভর যে চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল ধনী দরিদ্র ও গ্রাম শহরের মানুষের মধ্যে তার সুযোগ গ্রহণে তেমন তারতম্য ঘটতো না। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এবং পাশ্চাত্য প্রভাবে রাসায়নিক চিকিৎসা পদ্ধতির যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে ভারতবর্ষও তার প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু এই অগ্রগতির সুযোগ সমস্তটাই জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে প্রযুক্ত হচ্ছে। একথা সবাই জানে স্বাধীন দেশে জনস্বাস্থ্য আজ পর্যন্ত সংবিধানে স্বীকৃত কোন অধিকার নয়। সরকারী করুণা এবং বেসরকারী পণ্য হিসেবে চলে আসছে। এর সঙ্গে তার নিজস্ব স্বার্থে হাত মিলিয়েছে বিদেশী পুঁজি। ফলে জাতীয় স্তরে সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা রচিত হয় নি। গোটা চিকিৎসা পদ্ধতি একটা উঁচু মানের ব্যবসায়িক স্বার্থে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ ওষুধ তৈরী হয় তার শতকরা ৭৫ ভাগ ওষুধ তৈরী হয় বেসরকারী শিল্পের মাধ্যমে যার নিয়ন্ত্রক শক্তি বহুজাতিক সংস্থা। এরা হাজার রকমের প্রচার মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত ডাক্তার, নার্স রোগী সমস্ত অংশের মানুষকে আকর্ষণ করে নিজেদের ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করে চলেছে—মানুষের কল্যাণ এদের কাছে কোন প্রশ্নই নয়।

আমাদর দেশে বর্তমানে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে তাতে সব রকমের ওষুধের সুযোগ লাভ করে শতকরা ৫ ভাগ মানুষ। শতকরা ২০ ভাগ মানুষ আংশিক সুযোগ লাভ করে। বাকী শতকরা ৭৫ ভাগ যাদের প্রধান অংশ গ্রামবাসী তারা পয়সার অভাবে ওষুধ কিনতে পারে না। আর সরকারী যে ব্যবস্থা আছে তার সুযোগ বা সুফলও তেমন কিছু ভোগ করতে পারে না—কারণ বড় বড় হাসপাতাল অধিকাংশই শহর কেন্দ্রীক তাছাড়া বিভিন্ন রকমের আইন কানুনের বেড়াজাল ডিঙিয়ে হাসপাতালের দরজা থেকে ভিতরে প্রবেশ করার যোগ্যতা তাদের নেই। ফলে গ্রামের দিকে সামান্য অসুখে বিনা চিকিৎসায় কতলোক যে মারা যেতে বাধ্য হয় তার পরিসংখ্যান দেওয়া অসম্ভব। ভারতবর্ষে শিশু মৃত্যুর হার দেখলেই তা কিছুটা অনুভব করা যাবে।

১০০০ হাজার শিশুর মধ্যে ১ বছরে ভারতে মারা যায় ১২০ জন। অন্যদিকে আমেরিকায় ১৬ জন, যুক্তরাষ্ট্রে ১৭ জন, থাইল্যান্ডে ২৭ জন এবং শ্রীলঙ্কায় ৪৫ জন শিশু মারা যায়। এমনকি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মৃত্যুহার এক নয়।

[শেষাংশ ২২ পৃষ্ঠায়]

শিল্পসংস্কৃতি ও আমরা

তপন চক্রবর্তী

"সাংস্কৃতিক বিপ্লব" কথাটা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে বহুল প্রচারিত। যদিও এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ষাটের দশকের মাঝামাঝি চীন গোটা পৃথিবীতে একটা সাড়া জাগিয়েছিল। চীনের "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" গুণাগুণ বা তার মূল্যায়ন নির্ণয় করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতিকে একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে রাষ্ট্র ব্যবহার করে এটাই মূল বক্তব্যের বিষয়।

একটি জাতির জীবনধারার সঙ্গে উপরিকাঠামো হিসাবে সাংস্কৃতিক ধারা প্রবাহিত হয়। প্রতিটি দেশে নিজস্ব ধাঁচে সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। বলা বাহুল্য যে সাংস্কৃতিক বিকাশ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা নিরপেক্ষ নয়। শিল্প-সাহিত্য-চিত্রকলা-নাটক-ফিল্‌ম্ ইত্যাদি যা কিছু মাধ্যম আমাদের সামনে আছে তা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই তৈরী হয়। হয় তা চলতি রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য, নয় তো চলতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত মানুষের চেতনায় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা শিল্পীর সূক্ষ্ম অনুভূতি ও নান্দনিক মূল্যবোধ মিশ্রিত হয়ে বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে হাজির হয়। নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র শিল্প-সাহিত্যে প্রতিফলিত করার মধ্য দিয়ে সুস্থ মানসিকতা সৃষ্টি করার নিরন্তর প্রচেষ্টা প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্যিকদের সাধারণ লক্ষ্য। আবার অন্যদিকে "শিল্পের জন্য শিল্প"কে বেদবাক্য করে বন্ধ্যা পরিস্থিতির জালে জড়িয়ে সংস্কৃতির নামে অপ-সংস্কৃতির বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন—এ ঘটনাও প্রতিনিয়ত ঘটছে। আমরা জানি শুধুমাত্র কঠিন বাস্তবতাকে তুলে ধরেই সার্থক শিল্প সৃষ্টি করা যায় না। যেমন আমাদের দেশে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিপতি, জমিদার আছে, স্বাভাবিকভাবে শ্রেণীশোষণ আছে, খেটে খাওয়া মানুষের দুঃখদুর্দশা আছে। কখনও কখনও খেটে খাওয়া মানুষের একটা অংশ নোংরা কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষের বড় অংশই বঞ্চনার বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, অর্জিত অধিকার রক্ষার জন্য জীবন-সংগ্রামে যুক্ত। এখন একজন শিল্পী তার তুলিকায় কোন্ চিত্রটি কিভাবে চিত্রিত করবেন এটাই মূল প্রশ্ন। কোন শিল্পী সমাজের উপরতলার বা নিচু তলার মানুষের অসার দিকটাকে মূলধন করে বাস্তবতার দোহাই দিয়ে শিল্পায়ন করতে পারেন। আবার অন্যদিকে কোন শিল্পী জীবন-সংগ্রামের প্রতিটি বাঁক ও মোড় সূক্ষ্ম অনুভূতির সংমিশ্রণে একটি বলিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থিত করতে পারেন। যার মধ্য দিয়ে একটা ইতিবাচক দিক সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় কোন্ শক্তির জয় অবশ্যম্ভাবী তা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, ব্যক্তিগতভাবে আমরা চাই বা না চাই। গোটা দুনিয়া আজ দুটি মূল মতবাদে বিভক্ত। বর্তমানে নিরপেক্ষ থাকার কোন জায়গা নেই। তাই আমাদের দেশের ক্ষয়িষ্ণু ভঙ্গুর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরী দায়িত্ব হিসাবে আমাদের কাছে হাজির হয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষের পুরাতন ধ্যান-ধারণা বা মূল্যবোধের বিরুদ্ধে কষাঘাত করেই নতুন দিগন্তের উজ্জ্বল আলো মানুষের সামনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যা সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

হয়তো উপরোক্ত বক্তব্য কেউ "ইলিউশন্" (Illusion) বলে ব্যাখ্যা করবেন। কিন্তু বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষাপটে বা সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রমাণ করেছে যে মানুষ শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে চলেছে। যারা এই গতির পক্ষে তারাই প্রগতিশীল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শিল্প-সাহিত্য আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা নিরপেক্ষ নয়। তাই আমাদের মতো পিছিয়ে পড়া দেশে যেখানে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, পুঁজিবাদী শোষণ দুই-ই সমানভাবে চলছে এবং এই নীতির অবশ্যম্ভাবী কারণেই সংকট তীব্রতর হচ্ছে সেখানে এই সংকট সাংস্কৃতিক জগতকে প্রচণ্ড আঘাত করছে যার ফলে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের সুস্থ মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু সাধারণভাবে শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সহজ সরল আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে শোষণের বিরুদ্ধে রুটি রুজীর সংগ্রামে তাদের বলিষ্ঠতা আজকের দিনে সামাজিক ঘটনা। শিল্পে সাহিত্যে এই সামাজিক ঘটনাবলী প্রতিফলিত করতে পারলে সার্থক সৃষ্টি হতে পারে। সমাজের উপরতলার জীবনযাত্রা নিয়ে শিল্প সৃষ্টি যা বর্তমানে বহুল প্রচলিত তার মূল উপাদান কিছু "সেন্টিমেন্টাল" কথোপকথন, কিছু "ইমোসনাল" কথা আর নয় অতিবাস্তব-যৌন আবেদনের কিছু নোংরা দৃশ্য বা "একমেবা-দ্বিতীয়ম" একটা চরিত্র সৃষ্টি করা যা বর্তমানে একঘেয়েমিতে পরিণত হয়েছে, যা প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিসত্তা বা মানসিক বিকাশকে সংকুচিত করছে। কিন্তু সামাজিক দ্বন্দ্ব, উপরতলার মানুষের "আরও বড় হবার" ব্যর্থতার কারণে মানসিক দ্বন্দ্ব এবং সর্বোপরি সমাধান করার একটা প্রচেষ্টা আমাদের সুস্থ চিন্তার কিছু খোরাক দিতে পারে।

প্রতিষ্ঠিত কিছু শিল্পী-সাহিত্যিক প্রায়শই মন্তব্য করেন যে সাংস্কৃতিক জগৎ "রাজনীতি থেকে মুক্ত"। কিন্তু এই মন্তব্যের সত্যি সত্যি কোন যুক্তি আছে কি? আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন হয়েছে এবং খুব স্বাভাবিক কারণে নান্দনিক মূল্যবোধেরও পরিবর্তন হয়েছে। তাই আমাদের দেশের শিল্প-সাহিত্যে তার স্বাদ উপলব্ধি করতে পারলে ব্যাপক মানুষ নৈতিক সামাজিক দায়িত্ব বলিষ্ঠতার সঙ্গে পালন করতে উৎসাহী হতে পারেন। সাধারণভাবে আমরা জানি যে, শিল্প-সাহিত্য আদর্শ বাদ দিয়ে বা অন্ততঃপক্ষে যুক্তিকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি হতে পারে না।

শিল্প-সাহিত্য বাস্তব ঘটনাসমূহের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা সাধারণ মানুষকে সমাজ-জীবনের যা কিছু সুন্দর, যা সুস্থ, যা সত্য তা বুঝতে সাহায্য করে। অন্যায়, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে মানুষকে প্রতিবাদের ভাষা জোগানোর একটা হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে এই আশা আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি।

[হাঙর এবং কুমীরের দল ঃ ৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

মধ্যে সমানভাবে বর্তমান। যুদ্ধ যা কিনা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদের উগ্র বহিঃপ্রকাশ এই সত্যটি, যা কিনা প্রকৃত প্রস্তাবে মিথ্যা, এই তথ্যটিও প্রমাণিত হয় এই সংস্থাগুলোর কার্যকলাপে। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নামক চরিত্রটি সৃষ্টি হবার পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে অনেক কথার পরিবর্তে এই একটি মাত্র শব্দকে বসিয়ে। আমরা অন্য উৎপাদকদের সম্পর্কে এই কথাটি প্রয়োগ করলাম। রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস অর্থনৈতিক ক্ষমতা কিনা এ প্রশ্নের উত্তর জাতীয় বোমারু বিমান তৈরী করে এবং এই আমরা বহু আগেই পেয়ে গেছি। একটি উদাহরণ যথেষ্ট। আই. টি. টি. নামক কুখ্যাত বহুজাতিক কর্পোরেশনের কথা আমরা সবাই শুনেছি। ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় সব দেশে রাহাজানী করে সংস্থাটি অনেক সুখ্যাতি কুড়িয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর যুদ্ধ বিমান উৎপাদনের সাথে সংস্থাটি জড়িত ছিল। বিবরটি দাঁড়ায় এরকম, আমেরিকান কোম্পানী আই. টি. টি-র সহযোগিতায় জার্মানী ফোকস্‌উলফ্ বিমান তৈরী করার জন্য হিটলারের জার্মানীর পকেটে যথেচ্ছ হাত চালায় সংস্থাটি। এই বিমানগুলোই আবার আক্রমণ চালায় মিত্রপক্ষ বাকি দেশগুলোর মতই আমেরিকান বাহিনী এবং রসদের ওপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মিত্রপক্ষের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বিমান কারখানাটি। এবং এর জন্য যুদ্ধের শেষে পরাজিত জার্মানী এবং বিজয়ী আমেরিকার থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে আই. টি. টি। জাতীয়তাবাদ নামক শব্দটির সাম্রাজ্যবাদী অর্থ এর থেকে অনুমিত।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ভারতবর্ষের আলোকে লু স্যুন

শ্যামল মৈত্র

সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ের অন্যতম সৈনিক যে দুজন শিল্পী-সাহিত্যিকের জন্মশতবর্ষ এ বছর প্রতিপালিত হচ্ছে সেই লু স্যুন এবং পাবলো পিকাসোর মধ্যে অন্তরঙ্গে ছাড়াও বহিরঙ্গে একটা সুন্দর মিল রয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, দুজনেই তাঁদের মায়ের পদবী ব্যবহার করেছেন। পাবলো পিকাসোর পিতৃপদবী অনুযায়ী নাম পাবলো রুইজ এবং লু স্যুনের প্রকৃত নাম চৌ-সু-জেন; কিন্তু গভীর মাতৃভক্তির নিদর্শন হিসেবে মায়ের পদবী অনুসারে তিনি লেখক হিসেবে নিজেকে লু স্যুন নামে পরিচিত করেছিলেন।

একজন ভাষাতাত্ত্বিকের কাছে লু স্যুনের অন্যতম কৃতিত্ব হলঃ তিনি চৈনিক সাহিত্যে কথ্য ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। ভাষাকে আধুনিক এবং সর্বজনীন করে তোলার ক্ষেত্রে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার মধ্যে বর্তমানে চৈনিক ভাষার অগ্রগতি সবচেয়ে বিস্ময়কর। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুষ চৈনিক ভাষায় কথা বলে। অথচ সেই বিশাল চীন দেশে একটিমাত্র কথ্য ভাষার প্রচলন সম্ভব হয়েছে, যা সমগ্র পৃথিবীতে কোথাও এখনও ঘটানো যায় নি। চীন বিপ্লবের যাঁরা রূপকার ছিলেন এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যাঁরা কর্মী ছিলেন, তাঁদের নিরলস প্রয়াসের মধ্য দিয়ে এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন হয়েছে; আর এই বিশাল কর্মকাণ্ডের পুরোধা তথা প্রাণপুরুষ হলেন লু স্যুন, যিনি চৈনিক সাহিত্যে প্রথম কথ্য ভাষার প্রচলন করেন, জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে যাঁর গৌরবময় জীবনের কথা আজ প্রতিবেশী দেশের মানুষ হিসেবে আমরাও স্মরণ করছি শ্রদ্ধার সঙ্গে।

ভাষার দিক দিয়ে চীন আজ সবচেয়ে এগিয়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই শতকের গোড়ার দিকে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ভাষাসমূহের মধ্যে এই চৈনিক ভাষা সবচেয়ে পিছিয়ে ছিল। দীর্ঘকাল ধরে অত্যন্ত জটিল অক্ষর ও লিপির সমন্বয়ে গঠিত সাধুভাষা নি হুয়া এবং অসংখ্য আঞ্চলিক কথ্যভাষার ভেদবন্ধনে অবরুদ্ধ হয়ে সে ছিল। লু স্যুন তার বন্ধনমুক্তি ঘটিয়ে মুক্ত বাতাসে নিয়ে এসে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন, নবরূপে মণ্ডিত করেছিলেন। অবশ্য লু স্যুন এই অসমসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যজীবনের গোড়ার দিকে নয়, এমন কি ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সময়েও নয়; মৃত্যুর মাত্র এক দশক আগে ১৯২৭ সালে লু স্যুন প্রথম পাই হুয়া নামক একটি কথ্য ভাষাকে তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন। এবং সেটা কোন আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। তখন লু স্যুন রাজনৈতিক সচেতনতার মণিকোঠায় পৌঁছে গেছেন। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তিনি ভাষাকে সর্বজনীন রূপ দেবার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সমন্বয় সাধনের জন্য, মুখের ভাষার মধ্যকার ভেদাভেদের বিলোপসাধনের জন্য এক সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ডে ব্রতী হয়েছিলেন। তার ফলেই চীনদেশে ১৯৪৯ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর কিছুকালের মধ্যেই সমগ্র চীনে দুটিমাত্র কথ্যভাষার প্রচলন সম্ভব হয়, একটি হল পিকিং ডায়ালেক্ট অর্থাৎ শহরের মানুষের মুখের ভাষা আর অপরটি হল ক্যান্টন ডায়ালেক্ট অর্থাৎ মফঃস্বল এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষের ভাষা। অতি সম্প্রতি এই দুটি ডায়ালেক্টের মধ্যেও সমন্বয় সাধন করে দেশব্যাপী একটি মাত্র কথ্য ভাষার প্রচলন সম্ভব হয়েছে। এখন চীনদেশে প্রায় ষাট কোটি মানুষ একটি মাত্র ডায়ালেক্ট ব্যবহার করছেন, সমগ্র জনসমাজকে এইভাবে গোড়া থেকে সমভাবে শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। বুর্জোয়া দেশসমূহের ভাষাবিজ্ঞানীরাও এই কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। তাই বলছিলাম যে, এই অনন্য কৃতিত্বের উদ্গাতা লু স্যুনের নাম পৃথিবীর সকল ভাষা বিজ্ঞানীই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন।

কিন্তু লু স্যুনের কৃতিত্ব তো শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি নিঃসন্দেহে চীনদেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে গণ্য হয়ে থাকেন। আগের পরিচ্ছেদে বলেছি যে, ভাষার দিক দিয়ে চীনদেশ এই শতকের গোড়ার দিকেও পিছিয়ে ছিল। কথাপ্রসঙ্গে লু স্যুন একবার এডগার স্নোকে সে-কথা বলেও ছিলেন। 'সমগ্র পৃথিবী যখন হাওয়াই জাহাজে চড়ছে তখনও চীনসাগরের গায়ে ঢাকা লাগানো স্টীমার চালানো যায় নি। এ-কথাটা কর্মক্ষেত্রে যতটা সত্যি শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ততটা।' চৈনিক ভাষার পশ্চাৎপদতাজনিত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও চীনা সাহিত্য যথেষ্ট গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করছে। এদিক দিয়ে চৈনিক সাহিত্যের বিকাশের ধারা লক্ষণীয়।

খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ছ'শো বছর আগে থেকেই চৈনিক সাহিত্যে একটা প্রতিবাদী রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। বিপ্লবোত্তর চীনদেশের গবেষকরা অনুসন্ধান চালিয়ে এ সম্পর্কে কালানুক্রমিক তথ্য-প্রমাণ আবিষ্কার করেছেন। সুতরাং সেই প্রগতিশীল, ঐতিহ্যবাহী চৈনিক সাহিত্যে যখন লু স্যুনকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বলা হয়, তখন তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানও যে অপরিসীম, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

আঙ্গিকের দিক দিয়ে লু স্যুনের সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল, লু স্যুনের রচনা অদ্যাপি অননুকরণীয়। যে স্টাইলে তিনি লেখেন, যে ভঙ্গীতে তিনি বাক্‌প্রতিমা রচনা করেন, শ্লেষ এবং ঘৃণার যুগল মিলনের সাহায্যে যেভাবে যুক্তিজাল বিস্তার করেন, পৃথিবীর কোন সাহিত্যে তার তুলনা মেলে না। লু স্যুনের রচনা লু স্যুনেরই মত। আজ পর্যন্ত আর কোনো লেখক তাঁর ভঙ্গীতে লিখতে পারেন নি। তাঁর রচনাভঙ্গী অনুসরণ করা যায় না, অনুকরণ করা যায় না, শুধু অনুধাবন করতে হয়। যতই পড়া যায়, তাঁর রচনা পাঠকের কাছে ততই নতুন নতুন অর্থ এবং ভাব এনে হাজির করে। তাই তাঁর বেশীর ভাগ রচনা মূলতঃ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মাধ্যমে তির্যক ভঙ্গীতে রচিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তা সহজবোধ্য ও সহজপাঠ্য, কারণ তিনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বক্তব্য বিষয়কে বোধগম্য করে তোলার জন্য চৈনিক প্রবাদ ও প্রচলিত উপকথার সাহায্য নিয়েছেন।

সাম্রাজ্যবাদীদের পুতুল (কম্প্রাডর) চৈনিক শাসকদের সম্পর্কে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, "যখনই ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে একজন লোক হেঁটে যায়, কোলে-বসা আদুরে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ওঠে, যদিও তার প্রভু হয়ত তাকে এরকম কিছু করতে বলে নি। কোলে-বসা কুকুরগুলি তাদের প্রভুদের চেয়েও অনেক সময়ে বেশী কঠোর (উন্ভট কল্পনা, সেপ্টেম্বর ১৯২৭)।

চীনদেশের সমকালীন ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই চালাবার লক্ষ্য স্থির করে নিয়েই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছাত্র লু স্যুন ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার হবার মোহ ছুড়ে ফেলে দিয়ে সাহিত্য-অঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন। নিছক সাহিত্যিক হবার মনোবৃত্তি নিয়ে তিনি কলম ধরেন নি। তাই তাঁর যাবতীয় রচনা শ্রেণীসচেতনতায় ভাস্বর। তৎকালীন চীনদেশের ডি এনুজিও, ক্রিসেন্টমুন সোসাইটি প্রমুখ বিশুদ্ধ অরাজনৈতিক তথা নিরপেক্ষ সাহিত্যিক গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে তিনি তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন। "কোনো শ্রেণীসমাজে বাস করে এমন লেখক হওয়া যায় না, যিনি শ্রেণীঊর্ধ্বে বিরাজ করবেন।—এটা যেন ফ্রয়েডের সেই কথার মত যে আপনি নিজের কান ধরে নিজেকে মাটির উপরে তুলবেন" (সাহিত্য ও বিপ্লব, এপ্রিল ১৯২৮)। তবে নিছক প্রতিবাদ বা বিপ্লবের কাহিনী হলেই তা সাহিত্য পদবাচ্য হয় না একথা তিনি বারে বারে বলেছেন। বিষয়বস্তুকে সমৃদ্ধ করা ও সূক্ষ্ম কলাকৌশলকে রপ্ত করার জন্য বামপন্থী লেখক লীগের বিভিন্ন সভায় তিনি আবেদন রেখেছেন। তিনি বলতেন, শাসকশ্রেণীর অনুগ্রহপুষ্ট লেখকদের কলমের জোরেই হটিয়ে দিতে হবে, জনগণের দোহাই দিয়ে নয়। সেই রকম জোর, সেই রকম দক্ষতা অর্জন করার জন্য, সেই রকম যোগ্য হয়ে ওঠার জন্য তিনি বামপন্থী লেখকদের ত্রুটিগুলি সম্পর্কে সজাগ করে দিয়েছেন। এক জায়গায় তিনি লিখছেন, "আমাদের লেখকদের অপ্রাসঙ্গিক শ্লোগান ব্যবহার করার ঝোঁক আছে, কিন্তু তা এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আসছে না যে, আমার সাহিত্য শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার, বরং দেখা যাচ্ছে তার মধ্য দিয়ে ঐ লেখকদের যে মনোভাব ফুটে বেরোচ্ছে তা হ'ল, শ্রেণীসংগ্রামকে আমার সাহিত্যের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবো। তার মানে হল, ঐ লেখক সাহিত্যিক হবার জন্য শ্রেণীসংগ্রামের মাথায় কাঁঠাল ভাঙবেন" (সাহিত্যের শ্রেণীচরিত্র)। তাঁর অনুরূপ চিন্তার প্রকাশ

[শেষাংশ ১৪ পৃষ্ঠায়]

এই মন, এই দাহ

সরোজেন্দ্রমোহন ঘোষ

আজকাল দেখে শুনে মনে হচ্ছে, আমরা প্রত্যেকেই কমবেশি খানিকটা পাগল। অবশ্য পাগল কথাটি এভাবে বলা হয়তো ঠিক নয় বরং বলা উচিত, আমরা প্রত্যেকেই খানিকটা বাতিকগ্রস্ত অর্থাৎ পাগলামির প্রথম সোপানে পা দিয়ে রেখেছি। যাই হোক মানসিক ব্যাপার নিয়ে কথা প্রসংগে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের ধ্যানধারণার কথা কিছু বলা দরকার।

বহুদিন আগে বিশেষজ্ঞরা বলতেন, মানসিক রোগগ্রস্ত হওয়ার 'কারণ', শারীরিক অসংগতি অর্থাৎ দেহের ভেতরকার কোনো গণ্ডোগোলের দরুনই মনের গণ্ডগোল শুরু হয়। সেইজন্য মনের রোগ সারাতে হলে খুঁজে-খুঁজে দেহের সব যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোথায় গড়বড় হয়েছে। আরো দেখতে হবে শরীরের ভেতরে কোনো ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেছে কিনা।

এ সম্পর্কে আজকের মনোভাব হচ্ছে, হ্যাঁ, কিছু কিছু মানসিক রোগের কারণ শারীরবৃত্তীয় ঘটনা নিশ্চয়ই, তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে মনের বিভিন্ন গঠনমূলক অংশের মধ্যে ভারসাম্যের গণ্ডগোলও 'কারণ' হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এজন্য মানসিক রোগকে চারটি মুখ্য গ্রুপে ভাগ করেছেন। এক, কঠিন মনোবিকার বা উন্মাদ রোগ। এই রোগাক্রান্তদের মনোজগতে একধরনের প্রচণ্ড সর্বনাশা বিপর্যয় ঘটে যায়। তখন এটা সবার চোখেই ধরা পড়ে, নজর এড়িয়ে যায় না। এ ক্ষেত্রে রুগীর মধ্যে সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। নিজের অসুখ সম্পর্কে রুগীর কোনো জ্ঞান থাকে না। কেউ চুপ করে থাকতে ভালবাসে, কেউ চীৎকার করতে ভালবাসে, কেউ কাঁদতে ভালবাসে, কেউ আবার কখনো হাসে কখনো কাঁদে ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন কি খাওয়ার কথা পর্যন্ত খেয়াল থাকে না, প্রায়ই জোর করে খাইয়ে দিতে হয়। এদের পাগলামি ভয়ংকর পর্যায়ে পেৌঁছে গেলে বেঁধে রাখার দরকার হয় অথবা উন্মাদ আশ্রমে স্থানান্তরিত করতে হয়। অনেক সময় পরিবেশ বদল করিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত করলে এবং প্রথম প্রথম চিকিৎসার আওতায় আনলে খানিকটা উপকার হয় বলে মনে হয়।

দুই, মানসিক ঘাটতি (Mental deficiency)। স্বাভাবিকের চেয়ে এদের বুদ্ধিতে বিশেষ ঘাটতি লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ মনে হয় এদের ধী শক্তিতে (Intellectual ability) ত্রুটি থাকে। বাস্তবের সংগে মিল খাইয়ে চলাটাই হচ্ছে স্বাভাবিক ধী শক্তির লক্ষণ। সাধারণতঃ এটা অর্জন করতে হয়। কিন্তু যাদের বুদ্ধি স্বাভাবিকের চেয়ে কম, তারা বাস্তবের সংগে নিজেকে ঠিকমত খাপ খাওয়াতে পারে না। এদের মনের বিকাশ খুব ধীরে ধীরে ঘটে এবং কিছুদিন বাদে মনের বিকাশ আর আদৌ ঘটে না। মনোবিকাশের তারতম্য অনুসারে এদেরকে কয়েকটি গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে, যেমন, সবচেয়ে নীচের গ্রেড হল ইডিয়ট (Idiot) অর্থাৎ নিরেট মূর্খ। এরা স্বাভাবিক ছোটখাটো বিপদ থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। পরবর্তী গ্রেড হচ্ছে ইমবেসাইল (Imbecile) অর্থাৎ মূর্খ। এইসব মূর্খদের মধ্যে কোনোকিছু শেখার ক্ষমতা থাকে না। তবে ছকবলে দিলে দু'-একটি ঘরের কাজ করতে পারে। কিন্তু বুদ্ধির বহর সব সময়েই তিন থেকে সাত বছরের ছেলেমেয়েদের মতো হয়। এর পরের গ্রেডে পড়ে দুর্বলচিত্তরা অর্থাৎ ফিবল্ মাইণ্ডেড (feeble minded) ও মরোন (Moron) রা। এরা কিছুদিন পর্যন্ত, যেমন, সেভেন-এইট পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। এর পরে আর এগোতে পারে না। নিজেদেরকে ঠিকমতো ম্যানেজ করতেও পারে না। তবে 'ইডিয়ট, ইমবেসাইল' সনাক্ত করা যতটা সহজ হয়, Moron সনাক্ত করা ততটা সহজ নয়। অবশ্য অধুনা কতকগুলি বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে এই গ্রেডগুলি সনাক্ত করা সহজসাধ্য হয়েছে।

তিন, মৃদু মনোবিকার (Minor Mental disease or Psychoneurosis)। জীবনের চলতি পথের পরিবেশের সংগে যারা নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না অর্থাৎ পরিবার, সমাজ বা কর্মক্ষেত্রের পরিধির মধ্যে যারা নিজেকে মেলাতে পারে না অর্থাৎ বেমানান হয়, তারাই সাধারণতঃ মৃদু মনোবিকারের শিকার হয়। অন্যের সংগে ঠিকমতো মিলিয়ে চলার অক্ষমতার জন্য কোনো ক্ষতি হচ্ছে কি না, এটা বুঝতে প্রথম প্রথম অসুবিধা হয়। পরে যখন এই অসুবিধা প্রবলভাবে মনের ওপর চেপে বসে তখন ওটা একটা রোগে পরিণত হয়। এইসব রুগীদের 'মন' আংশিকভাবে আক্রান্ত হয়। ফলে এরা কিন্তু সম্পূর্ণ উন্মাদ হয় না, আধাপাগলা গোছের হয়। এরা নিজেরাই নিজেদের অসুবিধার কথা বোঝে এবং স্বাভাবিক হতেও চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

চার, Delinquent অর্থাৎ কর্তব্যে অবহেলাকারী। সমাজ জীবনের সংগে বিশেষ ধরনের বিরোধ ঘটলে, এরা Delinquent হয়ে পড়ে। মনের অস্বাভাবিক পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে এরা তখন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। সমাজের প্রতি একটা তীব্র ধিক্কার নিয়ে এরা অসৎ পথে পা বাড়ায়। এ-সব ক্ষেত্রে আমরা যদি ওদের সংগে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার এবং কথাবার্তা বলে সাহায্য করতে পারি তা হলে ওদেরকে আবার সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতে পারে।

এখন প্রশ্ন, 'মানসিক স্বাস্থ্য' বলতে আমরা কি বুঝি। স্বাভাবিক মানুষ এবং অস্বাভাবিক মানুষের মধ্যে পার্থক্যটা কিন্তু খুব বেশি নয়। বলা চলে মাত্র ডিগ্রীর পার্থক্য। অস্বাভাবিকদের যে বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে, সেগুলি কমবেশি স্বাভাবিকদের মধ্যেও থাকে, অপরপক্ষে স্বাভাবিকদের কিছু বৈশিষ্ট্য যখন বিস্তৃত আকার ধারণ করে তখনই সেটি অস্বাভাবিকের পর্যায়ে পেৌঁছে যায়। সেইজন্য মানসিক স্বাস্থ্য প্রত্যক্ষভাবে ব্যাখ্যা করা খুবই মুস্কিল। সেইজন্য দেখতে হবে শারীরিক সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য আছে। এক, শারীরিক সুস্থরা নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আদৌ উদ্বিগ্নবোধ করে না। দুই, সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহ বোধ করে। তিন, এদের শারীরিক ক্ষমতা স্বাভাবিক থাকার জন্য কাজে-কর্মে গাফিলতি আসে না এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এই মাপকাঠিতে 'মন'কেও যাচাই করা যায়। যদি দেখা যায় উপরের গুণাবলী মনের মধ্যে বর্তমান আছে, তা হলে বুঝতে হবে মানসিক স্বাস্থ্য স্বাভাবিক পর্যায়েই রয়েছে। 'মন' সুস্থ থাকলে, 'শরীর' এবং 'মন' দুইয়ে মিলে চলতি পথের যে কোনো কাজে সাফল্যের নিদর্শন রেখে এগোতে পারে।

যেহেতু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, অতএব তাকে সামাজিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকতেই হবে। মনের ধর্ম হচ্ছে প্রগতিশীলতা। মনকে যত কাজে লাগানো যাবে, ততো উপযোগী হয়ে মনটি গড়ে উঠবে। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হলে এর উল্টোটা ঘটতে থাকবে। অনেক সময় সুযোগের অভাবে মনের বিকাশ বিলম্বিত হয় বা পিছিয়ে (retarded) পড়ে। এটা ঘটলে ধরে নেওয়া যেতে পারে মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপের দিকে এগোচ্ছে।

ব্যক্তিবিশেষে অনুসারে মানসিক স্বাস্থ্যের মান (Standard) ভিন্নতর হয়। একজনের ক্ষেত্রে যেটি স্বাস্থ্যসূচক অন্যের ক্ষেত্রে সেটি স্বাস্থ্য পরিপন্থী হওয়া বিচিত্র নয়। সেইজন্য মানসিক স্বাস্থ্যের গড় 'মান' নির্ণয় করা যায় না বললেই চলে। প্রত্যেককে বিচার করতে হবে তার নিজস্ব স্বাভাবিক অথবা অর্জিত ক্ষমতা অনুসারে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। ব্যক্তিবিশেষের মানসিক স্বাস্থ্য বিচার করার জন্য প্রয়োজন হয় পারিবারিক তথ্য, জন্মসংক্রান্ত তথ্য, শারীরিক গঠন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা। শুধু তাই নয়, তার সামাজিক এবং আবেগময় বৈশিষ্ট্য-

গুলিও তাঁকে পর্যবেক্ষণের দরকার হয়। সর্বোপরি তার মানসিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষারও সাহায্য নিতে হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এক, সুশিক্ষার উপর। দুই, শিশুপালনের প্রকৃষ্ট বিধি-ব্যবস্থার উপর। তিন, সুস্থ গৃহ-পরিবেশের উপর। চার, আদর্শ সামাজিক পরিবেশের উপর। সেইজন্য মনোবিকার প্রতিরোধের জন্য এদিকটাতে বেশি জোর দিতে হবে।

কোনো ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে মনোবিকারের লক্ষণ টের পেলেই সংগে সংগে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে চিকিৎসার অভাবে পরবর্তী সময়ে সেটা উন্মাদের পর্যায়ভুক্ত না হয়।

মনোবিকার প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে ভাবতে হলে, এক, যদি এটা উত্তরাধিকার সূত্রের ব্যাপার হয়, তা হলে জন্মসংক্রান্ত ব্যাপারটি নিয়ে নাড়াচাড়া করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে অর্থাৎ বংশের মধ্যে উন্মাদগ্রস্ত কেউ থাকলে সে বংশের ছেলেমেয়ের জন্ম ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। এ-সব ক্ষেত্রে সুপ্রজনন সংক্রান্ত (Selective breeding) প্রশ্ন আসে। এটা আমাদের দেশে সম্ভব নয়। কারণ পৃথিবীর মাত্র অল্প কয়েকটি দেশে এই ব্যবস্থা চালু আছে। তবে জনসাধারণ আজো এ ধরনের ব্যবস্থা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিতে অভ্যস্ত হয় নি। তাছাড়া এটাই যে বংশগত উন্মাদ রোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায় সেটাও আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় নি।

দুই, মানসিক স্বাস্থ্য শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। বিশেষ কোনো অংগ-প্রত্যংগে, যেমন—চোখ, কান, মুখ, নাক, হৃদ্‌যন্ত্র ইত্যাদিতে কোনো ত্রুটির জন্য বা বেশি খাটুনির জন্য স্বাভাবিক কারণেই স্নায়ুকে বাড়তি কাজ করতে হয়। ফলে স্নায়ু উত্তেজিত হয়। পরবর্তী সময়ে এটাই মনোবিকারের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেইজন্য শরীরটাকে সুস্থ রাখার ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। অতিশয় অবসাদও মনোবিকারের কারণ হতে পারে। এ থেকে রেহাই পেতে হলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিকল্পনার মাধ্যমে জীবন কাটানো ও বিশ্রাম গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ত্রুটিপূর্ণ এবং অত্যধিক খাটুনিতে উত্তেজিত অংগপ্রত্যংগের চিকিৎসা ও যত্ন পরিপূর্ণভাবে নিতে হবে।

তিন, জীবনযাত্রার পথে কখনো যাতে মানসিক সংঘাতের শিকার হতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। দেখা যায় এটা সাধারণত শিশু বয়স থেকেই শুরু হয়। কেন শুরু হয় এবং সংঘাতের স্বরূপই বা কি সেটি বুঝতে হবে এবং যাতে এটা না ঘটে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সন্তানপালনের স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে পিতামাতাকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে; যেমন, শিশু যেন ভালবাসা থেকে কখনো বঞ্চিত না হয়। শিশুজীবনে ভালবাসার অভাববোধ ঘটলে সে শিশুর উত্তরজীবন অর্থাৎ ভবিষ্যৎ খানিকটা অস্বাভাবিক হতে বাধ্য। স্বাভাবিক পথে এবং নিয়মে শিশুকে গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান উপায় সঠিক ভালবাসা প্রদর্শন। শিশুদের সংগে ব্যবহারের মধ্যে যেন কোনো গলতি না থাকে। জোর করে শিশুদের থেকে বেশি কিছু আদায় করার প্রচেষ্টা অশুভ ফলদায়ক। শিশু ধাপে ধাপে বয়সের বেড়া ডিঙিয়ে বড় হয়। এই সময়ে বিভিন্ন বয়সে, ওদের চাহিদার ও পরিবেশের মধ্যে তারতম্য ঘটে, যেমন চার বছর বয়সে যে চাহিদা থাকে বারো বছর বয়সে সে চাহিদা এবং সে পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। এই যে পরিবর্তন এটা গার্জিয়ানদের বুঝতে হবে এবং সেইমতো সহানুভূতি, সাহায্য এবং উৎসাহ জুগিয়ে শিশুকে তার চাহিদা মেটাতে হবে এবং পরিবেশের সংগে খাপ খাইয়ে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে শিশুরা সমালোচনা আদৌ পছন্দ করে না। ওদের সমালোচনা করলে ওরা আরো খারাপ পথে এগোয়।

চার, প্রত্যেকেরই কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। সে সেভাবে চলতে ফিরতে অভ্যস্থ হয়। এ ব্যাপারে শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ বা সমাজ যদি তার অভ্যস্থ জীবনে বিরোধিতার ভূমিকা নেয়, তা হলে ফল বিপরীত হতে বাধ্য। সেইজন্য পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবকে সব ব্যাপারেই ধৈর্যশীল হতে হবে। প্রত্যেকের সংগে প্রত্যেককে মিলেমিশে বুঝেসুঝে চলতে হবে।

পাঁচ, যে যতটুকু ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়, সেই ক্ষমতার বাইরে অনবরত অতিরিক্ত কিছু দাবী করলে ভয়ানক মানসিক পীড়ন শুরু হয়। এজন্য মনোবিকারের লক্ষণ দেখা দিলে বলার কিছু থাকে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, আমরা নিজেদের ছেলেমেয়েকে খুব বড় একটা কিছু তৈরী করার জন্য লেখাপড়া ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের স্বাভাবিক ক্ষমতার বিচার না করে সর্বদাই চাপ দিতে থাকি। আমাদের উচিত ক্ষমতার বহর পরিমাপ করে সম্ভবপর কিছু দাবী করা, তার বেশি নয়।

ছয়, এক বিষয়ের অক্ষমতা অন্য বিষয়ের পারদর্শিতা দিয়ে পূরণ করতে পারলে মানসিক পীড়ন কম হতে পারে। প্রত্যেকেই কমবেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হয়। যার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ নেই সে জীবনপথে স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে না। তাই কোনো বিষয়ে যদি সে অক্ষম হয়, তখন স্বভাবতই সেজন্য তার মধ্যে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, যেমন—সবাই পড়াশুনা করছে, আমি করতে পারছি না অথবা এ বিষয়ে আমার ক্ষমতা নেই। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের উচিত, তাকে অন্য বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার সুযোগ দেওয়া। এ অনেকটা ভর্তুকি দেওয়ার মতো ব্যাপার। এটা করতে পারলে পড়াশুনা না করার গ্লানিটা মনের উপর আর তেমন চাপ দিতে পারবে না। অন্য বিষয়ে মনোসংযোগের দরুন স্বভাবতই তার চিন্তায় কোনো অসংগতি ঘটার সুযোগ থাকবে না। সেইজন্য ভেবেচিন্তে এক বিষয়ের অক্ষমতা পূরণের জন্য অন্য কিছু খুঁজে বের করে তাকে সেই বিষয়ে পারদর্শী করা সম্ভব হলে মনোবিকারের কবল থেকে তাকে রক্ষা করা যায়।

সাত, ব্যক্তির অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অসামাজিক মানসিকতাকে কৌশলে সামাজিক পথে নিয়ে আসার জন্য সুপরিকল্পিত পথ বেছে বের করতে হবে।

আট, যৌনবিষয় সম্পর্কে আমাদের পুরানো ধ্যানধারণা এবং শালীনতাবোধের ঘোমটাকে কিছুটা আলগা করতে হবে। ছেলেমেয়েদের যৌনকৌতূহল জেনে হতভম্ব এবং অবাক হয়ে তাদের প্রতি অকথ্য কোনো ব্যবহার করলে পরবর্তী সময়ে তার ফল বিষময় হতে পারে। বরং ধৈর্যসহকারে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

নয়, প্রায়ই দেখা যায় মনোবিকারের কারণ লুকিয়ে থাকে পেছনে ফেলে আসা দিনগুলির মধ্যে। শিশু বয়সের বা তরুণ বয়সের কোনো অসংগতিই পরিণত বয়সে মনোবিকারের ইন্ধন জোগায়। সাধারণতঃ এ ধরনের লক্ষণ ছোট বয়সের কাজে-কর্মের মধ্যে বোধ করি প্রকাশ পায়। কর্তৃপক্ষকে এটা লক্ষ্য করতে হবে। যদি শুরুতেই মনোবিকারের লক্ষণ খুঁজে বের করা যায় এবং মনস্তাত্ত্বিক পথে তার সমাধান খুঁজে বের করা যায়, তা হলে বড় একটা অঘটনের কবল থেকে তাকে বাঁচানো যায়। যখনই ছোটদের ব্যবহারের মধ্যে বা কথাবার্তার মধ্যে অসংগতি নজরে পড়বে, তখনই পিতামাতা, শিক্ষক, চিকিৎসক বা সমাজকর্মীকে সে কেসটি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে তার অসংগতি দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য 'চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিকের' স্মরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে।

ব্লকস্তরে, মহল্লায় মহল্লায়, অঞ্চলে অঞ্চলে যে-সব শিক্ষক এবং সমাজসেবকরা ছোটদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পাচ্ছেন, মানসিক রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ'রা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যদি ছোটদের সব কার্যকলাপ, ব্যবহার, ইচ্ছা-অনিচ্ছার হিসাব রাখেন এবং কোনো অস্বাভাবিক লক্ষণ চোখে পড়লেই তাকে তখন তখনই আলাদা করে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন, তা হলে মানসিক রোগ প্রতিরোধের পরিকল্পনাকে আরো অনেকটা পথ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

কেঁদুলির বাউল দিন

প্রতি বছর এই সময়টায় একটু বৃষ্টি-বৃষ্টি থাকে। এ বছর আকাশ টিপ্‌টপ্ পরিষ্কার। পৌষ সংক্রান্তির তাজা রোদ্দুরে চক্‌চক্ করছে শীতের রোগা নদী অজয়। দেখে ভাবাই যায় না, এই ক্ষীণ নদীই কিছুকাল আগে, সেই ভয়াল বন্যার দিনে রেগে-মেগে, ফুলে-ফেঁপে একটা আস্ত রেল ব্রিজকেই গিলে খেয়েছিল কোথায় যেন! স্বাস্থ্য-হীন নদীর দু' পাশে ধু ধু সাদা বালিয়াড়ি, মাথার ওপর টক্‌টকে নীল আকাশ—সব মিলিয়ে একটা সুন্‌সান্ সুন্দর পরিবেশ। সেই সুন্দর সকালে অজয়ের তীরে বীরভূমের কেঁদুলি গ্রামে অজস্র মানুষের সমাবেশ। পৌষের কন্‌কনে ঠান্ডা বাতাসকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ রোদ্দুর গায়ে মেখে ঝুপ্‌ঝাপ্ ডুব দিচ্ছে অজয়ের হাঁটু জলে।

পৌষ সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু করে তিন দিনব্যাপী কবির বাসস্থান কেঁদুলি গ্রামে এক বিরাট মেলা বসে, সাধারণভাবে যা 'জয়দেব মেলা' নামেই বিখ্যাত। বাংলাদেশের প্রাচীনতম মেলাগুলির মধ্যে এটি একটি। পৌষ মাস বাঙ্গালীর কাছে, বিশেষত গ্রামীণ বাঙ্গালীর কাছে এক বিরাট আনন্দের সময়। পৌষে চাষীর ঘর ভরে যায় ফসলের হিল্লোলে। মহাজনের গোলায় অনেকটা তুলে দিয়ে, নিজের ভাগের অল্প ধানেই সুখের বান ডাকে কৃষকের ঘরে ঘরে। শ্রমের পর শ্রমের সাফল্য উপভোগ করার সুসময় এই পৌষ। সারা বছরের দুঃখ-দারিদ্র্যের গ্লানি ক'টা দিনের জন্যে ভুলে থাকতে চায় তারা। সেই হিসেবে পৌষের মর্যাদাই আলাদা। মূলত এই আনন্দ-উল্লাসের কারণে পৌষে বাংলাদেশের নানা গ্রামেই পুজো-পার্বণ মেলার বিবিধ আয়োজন হয়ে থাকে। বীরভূমের কেঁদুলি মেলাও সে রকম একটি। কেঁদুলির মানুষের কাছে তো বটেই—সারা বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা, এমন কি সম্প্রতি কলকাতার মানুষের কাছেও জয়দেব মেলা এক অমূল্য আকর্ষণের ব্যাপার। ধর্ম এবং আনন্দ এখানে ভীষণভাবে ওতপ্রোত হ'য়ে যায়। তাই আনন্দ অথবা ধর্মের টানে নানা জেলা থেকে, কখনো বা ভিন্ প্রদেশ থেকেও, ছুটে আসেন বহু ভক্ত-বৈষ্ণবের দল, আউল-বাউল, সুফি, সহজিয়া, চাষীমানুষ, বাবু-বিবি বা অসংখ্য নাগা সন্ন্যাসীর দল। আসে কাঁখে বাচ্চা নিয়ে নতুন শাড়ি জামা পরে মণ্ডলির মা, লাঙ্গলের ফলা বা জালের সুতো-কাঠি কিনতে পরাণ মাঝি, নাগরদোলা বা ভানুমতির খেল্ দেখতে ঝল্‌মলে ঝিমুলি, সুবল বা বাবুলাল। আসে নাগরদোলা, সার্কাস কোম্পানী, মিঠাইমন্ডা, চুলের ফিতে, পুঁতির মালা, লাঙ্গলের ফলা, রাক্ষুসে রাক্ষুসে লোহার ড্রাম, কড়িবর্গা, জানলা-কপাট, জালের কাঠি, মাছর ঘাই, বাসন-কোসন, হাঁড়িকুড়ি, ধামাকুলো, হাঁস-মুর্গি, নামাবলী, জুয়ার আসর, ধর্মগ্রন্থ—সব। আর আসে, একটু বেশি করেই আসে, পাকা পাকা স্বাস্থ্যবান, কাঁদি-কাঁদি কলা। পাকা কলার গন্ধে ম' ম' করে মেলার বাতাস। এরকম কলার পাহাড় কোলে মার্কেটেও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ভাতের হোটেলও অজস্র। আছে অস্থায়ী থানা, হাসপাতাল আর কয়েকটা সুসজ্জিত সরকারী প্যাভেলিয়ন্—পঞ্চায়েত, মৎস্য-বিভাগ আর তথ্য-সংস্কৃতি দফতরের। গ্রামের মানুষের কাছে ছবি, লেখা আর হাতে-কলমে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং নানা উদ্যোগ-অসুবিধার কথা পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সেথায়ও ভিড় কম্‌তি নয়। যেমন ভিড় আছে সার্কাস এবং ম্যাজিক-ট্যাজিকের আসরে, ইলেক্‌ট্রিক নাগর-দোলায়। এক অস্থায়ী আশ্রমে দেখলাম জনৈক সন্ন্যাসী, মারীচ সংবাদের বাল্মীকির মতো তর্জনীতে যাঁর দামী সিগারেট ধরা, এক ভদ্রমহিলাকে সামনে বসিয়ে বিপুল যাগ-যজ্ঞে ব্যস্ত। ভদ্রমহিলা বেশ সুসজ্জিতা, এবং সোনাদানা পরা। যজ্ঞের ধোঁয়ায় তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়াচ্ছিল। সন্ন্যাসী তাঁকে কি দেবেন? এক বেদে

গৌতম ঘোষদস্তিদার

গ্রামের লোককে মাত্র দু' টাকায় চুটিয়ে রক্ষাকবচ, বশীকরণ মাদুলি, ইচ্ছাপূরণের শেকড়-বাকড় বিক্রি করছে। দু' টাকায় এইসব দুর্লভ বস্তু পাওয়ার সুযোগ কেই-বা হারাতে চায়!

এইসব সাত-সতের জিনিস-পত্র, আয়োজন বিছিয়ে প্রায় মাইলখানেক ধরে এই মেলার বিস্তার। দূর মাঠের আলপথ দিয়ে সকাল থেকেই লোক আসছে তো আসছেই। হুস্ হুস্ করে লাল-নীল মানুষ নিয়ে ছুটে আসছে মোটর গাড়ি। ঘন-ঘন বাসগুলোও ধুলো উড়িয়ে উঠে আসছে একেবারে মেলার বুকের ওপর। মেলায় আসবার বেশ কয়েকটা বাস-পথ আছে। দুর্গাপুর স্টেশন থেকে বাসে শিবপুর পর্যন্ত এসে সেখান থেকে হেঁটে বা মাথাপিছু এক টাকায় গরুর গাড়িতে নদীর কংকাল পেরিয়ে এ পাড়ের মেলায় যেমন আসা যায়, তেমনই আবার বোলপুর থেকে বাসে চেপে সোজা চ'লে আসা যায় মেলায়। দুবরাজপুর স্টেশন থেকেও বাস রাস্তা আছে একটা। বীরভূম আর বর্ধমানের সীমান্তে এই মেলার অবস্থান বলে মোটামুটিভাবে সব পথই সমানভাবে কেঁদুলিতে এসে মেলে।

আমরা এসেছিলাম বোলপুরের বুড়ি ছুঁয়ে। এক কবির তীর্থ ছুঁয়ে আরেক কবির কাছে। যখন বোলপুরে পৌঁছলাম, তখন ঘড়িতে খুব বেশি রাত না হ'লেও, বোলপুরে শীতের মধ্য-রাত।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই খুব তাড়া-তাড়ি তৈরি হ'য়ে নিয়ে বাস-স্ট্যান্ডে পৌঁছে গিয়ে দেখলাম, এলাহি কান্ড! বাসওয়ালারা অবিরাম হাঁকছে—'জয়দেব, জয়দেব, জয়দেব চললো, জয়দেব'। কাল রাতে খাওয়া জোটে নি কিছু। তবু সময় নষ্ট করা চলে না। কোনও রকমে একটু চা গলায় ঢেলে একটা পছন্দমতো বাস বেছে নিয়ে উঠে বসা গেল।

তাল, তমাল আর শালবনের নিচে লুকিয়ে আছে লালধুলোর মেঠো পথ, অ্যাস্‌ফল্টের মসৃণ রাস্তা। দু'পাশে বীরভূমের রুক্ষ ফসলহীন অঢেল মাঠ-ঘাট বিষণ্ণ বিছিয়ে র'য়েছে। জানলায় কাঁচ নেই, হু-হু হাওয়া আসছে। বাসে হরেক যাত্রী—সাঁওতাল, আদিবাসী, চাষী-পরিবার, ইস্কুল মাস্টার, মুদি-ব্যবসায়ী, যুবক, আউল-বাউল, ফকির, বৈষ্ণব—দু' এক জন, হিন্দু-মুসলমান।

ঘন্টাখানেক বৈরাগীর মতো আপনমনে মাঠ-ঘাট, জল-জঙ্গল পেরিয়ে বাস এসে গেল জয়দেবের প্রাঙ্গনে। বাসের ছোট্ট 'সহিস' ছেলেটি একসময় হঠাৎ 'জয়দেব মোড়, জয়দেব মোড়' ব'লে চেঁচাতেই আগ্রহে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলাম। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল ভাঙ্গনধরা অজয় নদ।

রোদ্দুর তখনো ততো ছড়িয়ে পড়ে নি। তবে ইতিমধ্যেই অজস্র মানুষ এসে গেছে, আসছে হু-হু ক'রে। মেলার পাতলা ভিড় কাটিয়ে একেবারে নদীর কাছে চ'লে গেলাম। স্নানের ধুম নাকি শুরু হয়েছে সেই কাকভোর থেকেই। সংকীর্ণ নদী গরুর গাড়িতে পার হ'য়ে ওপার থেকে আসছে বর্ধমানের যাত্রীরা। স্নানের জন্য শুধু যে বুড়োবুড়িরাই এসেছেন, তাই নয়—যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা সব বয়সের মানুষ। স্নানের ভিড়ে মানুষের কোন আলাদা ব্যক্তিত্ব নেই, শ্রেণী-ভাগ নেই, সব একাকার। একপাশে সরে গিয়ে তিন বালক বীর ঐ কন্‌কনে ঠান্ডায়, তেলে, জলে, সাবানে, বালিতে, আনন্দে কী ভীষণ হুটোপুটি ক'রছে একটি দৃশ্যের পূর্ণতা তৈরি ক'রে। ক্যামেরা বাগাতেই কি রকম জড়সড় হ'য়ে গেল। ওদের স্বাধীন রেখে তাড়াতাড়ি সরে এলাম।

সূর্য তখন অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। রোদ্দুর প'ড়ে চিক্‌চিক্ ক'রছে নদী আর বালিয়াড়ি। সেই বিস্তৃত সাদা বালুচরে সাদা পোশাকের এক সন্ন্যাসী মেয়ে একা-একা নতমুখী হ'য়ে বালি দিয়ে যেন অরূপদেবের ধূলী গুহা তৈরি ক'রছে। দৃশ্যটা মুহূর্তে আমার কাছে অমর হ'য়ে গেল!

জনসমাবেশ থেকে ঈষৎ দূরে ব'সে দেখছিলাম স্নানের অনুষ্ঠান। দমকা বাতাসে উড়ছিল ঐ সন্ন্যাসিনীর শাড়ির আঁচল অলংকৃত পতাকার

মতো। সেই দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম এক অপার মগ্নতায়। আমাদের সেই উন্মনা বসে থাকার দিকে তাকিয়ে একটি ছোট্ট বাউলদলের মধ্য থেকে এক উজ্জ্বল যুবতী বাউল নিষ্পাপ মুখে ব'লে গেল, 'এমন সার্থক মানব জনম হেলায় হারাস না রে, বাছারা'!...ব'লে হাসতে হাসতে নদীর দিকে চলে গিয়ে, জয়দেব-পদ্মাবতীর জয়ধ্বনি দিতে দিতে স্নানের প্রস্তুতিতে ডুবে গেল।

আমরা পাপী নই, তাই স্নান করি নি। শুধু আন্তরিক আঙুলে একবার ছুঁয়েছিলাম নদীর ঠান্ডা শরীর। নদী থেকে ফিরে এসে বাউল আখড়ার খোঁজে গেলাম। বাউল মেলায় বাউল খুঁজে পেতে হয়, এটা কি রকম ব্যাপার? অবশ্য একথাও ঠিক, বাউল সাধনা নিভৃতের সাধনা। বাউলেরা আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী। আপন আত্মার অন্তস্তলে ডুব দিয়ে নিজের মনের মানুষকে উপলব্ধি করতে চায় তারা। বস্তুত, বাউল সাধনা যেমন রহস্যময়, তেমনই এর সাধন-ভজন পদ্ধতিও গূঢ় গোপন। এখন অনেকেই অবশ্য রেকর্ড, রেডিও এবং সাহেবদের হাততালির মোহে সেই নিবিড় সাধনাকে বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরাই বোধহয় সব নয়। তাই এই বিখ্যাত বাউল মেলায় ক্যামেরায় চকমকি, রেকর্ডারের ষড়যন্ত্র, বাবুদের আদিখ্যেতা গত কয়েক বছরে এত বেড়ে গেছে যে, আপনমগ্ন বাউলেরা তা থেকে দূরে থাকাই বোধহয় পছন্দ ক'রছে।

—'ওসব তত্ত্ব-টত্ত্ব দিয়ে তো আর পেট ভরে না, বাবু। এখন মোরা পেটের ধান্দায় মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। গান গেয়ে দিন চলে নাগো, গোঁসাই। পেটের ধান্দায় বাউল অখন নেউল হইছে। অখন আমরা ট্রেনের ফিরিয়ালা থেকে ক্ষেতের মজুর —সবই হয়ছি গো বাবু। অই পেটের ধান্দায়ই তোমরা শহরের ভদ্দরনোকেরা যেমুন গান চাও, যেমুনটি ফরমেশ করো তেমুনি গাই! এ-সব গানে প্রাণ নাই গো!'—বলতে গিয়ে বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল বীরভূমের প্রধান বাউল নারায়ণ দাসের গলা।

আমি তাঁকে চা খাওয়ালাম, সে আমায় কোঁচর থেকে বিড়ি বের করে দিল অশেষ কুণ্ঠায়। খুব বিষণ্ণ লাগছিল তাঁকে। তাঁর বিষণ্ণতা আমাতেও সংক্রামিত হয়ে যায়। ভাবছিলাম, যে লোক-সংস্কৃতি অশিক্ষিত স্বার্থকতায় আমাদের উন্নাসিক বাবু-সংস্কৃতির কাছে একটি বিনয়ী চপেটাঘাতের মতো, তা আজ নানা সামাজিক অবক্ষয়তার কারণে হারিয়ে যেতে বসেছে। আমাদের তথাকথিত সংস্কৃতি-মনস্কতা ওই শিল্প-প্রয়াসকে কখনোই ততো সঠিক প্রযত্ন দেয় নি। আমরা কেউ-কেউ কোন গ্রাম্য মেলা থেকে কিছু স্যুভেনির কিনে এনে ড্রয়িং-রুম সুসজ্জিত করেছি, ব্যস্, ওই পর্যন্ত, তার বেশি কিছু নয়। এবং যেহেতু যে-কোন শিল্প প্রয়াসই পেশার সাথে যুক্ত না হলে খুব স্বাভাবিক কারণেই এক সময় বিলীন হয়ে যায়, যেহেতু স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পচর্চা এ যুগে নিছক সোনার পিতল মূর্তি ছাড়া আর কিছু নয়; আমাদের অনেক গ্রাম্য শিল্পই আজ মুমূর্ষ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। তাই বাউলেরা আজ হিন্দী সিনেমার সুরে গান গায়, পটুয়ারা কারখানায় লোহা পিটতে ছোটে। এই রুগ্ন লোক-শিল্পকে শুশ্রূষার স্পর্শ দেবে কে?

নদী থেকে উঠে মেলায় আসার পথের দু' পাশে দেখলাম, সারি সারি ঠাকুর-দেবতার চেনা-অচেনা অজস্র মূর্তি বসানো। তাঁদের সামনে ভক্তেরা চাল, ডাল, আলু, পয়সা ফেলে যাচ্ছে অকাতরে ভক্তিভরে। দেবতাগণের মালিকদের দেবতার সাথে একসাথে দেখা গেল না। আমার নাস্তিক বন্ধু এই জায়গাটার নাম দিল 'ঠাকুর কলোনী'। মন্দির চত্বরেও দেখা গেল এ রকম মালিকহীন বিছানো কাপড়ে একইভাবে চাল, ডাল, পয়সা পড়ছে অবিরল। দিনশেষে মালিকেরা এসে তুলে নেবেন এ-সব। একেবারে পশ্চিমা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা!

রাধামাধবের মন্দির প্রাঙ্গণেও বেশ ভিড়। নদী থেকে স্নান সেরে ভক্তেরা মন্দিরে পুজো দেবেন। প্রবেশ দরজায় মৃদু ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে, হবেই। সবাই ঈশ্বরের কাছে আগে পৌঁছতে চায়। এই মন্দির চত্বরেই জয়দেবের ভিটে ছিল, কবি এই মন্দিরে বসে 'গীতগোবিন্দ' লিখেছেন, চোখ বুজে সেই দূর অতীত কথা ভাবতে গেলে কিছুটা মানসিক শিহরণ হয়ই। এই মন্দিরেই নাকি গীতগোবিন্দের মূল পুঁথি আছে। অন্তত বাইরে সে-রকমই লেখা আছে। পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে আলো ফেলতে পারেন। যদি থেকেই থাকে, তাহলে কি পুঁথিটি সেখানে খুব নিরাপদ? 'গীতগোবিন্দ' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে পুজনীয় ব্যাপার। কিন্তু তা তো নিছক ধর্মগ্রন্থই নয়—ভারতীয় সাহিত্যের ঐ অমূল্য গ্রন্থটির বোধহয় আরো নিরাপদ সংরক্ষণ দরকার।

জুতো খোলার ভয়ে মন্দিরে ঢোকা হল না। ব্রাত্যজনের মতো বাইরেই বসে রইলাম। মন্দিরের দেওয়ালে অজস্র শিল্পকাজ দেখে মুগ্ধ হতেই হয়। অবশ্য খুব দ্রুত সেই মুগ্ধতা বিষণ্ণতায় রূপ নিয়ে নেয়। সম্পূর্ণ মন্দিরটিরই খুব ভগ্নদশা। বহুদিন সে কোন সেবাযত্ন পায় নি, বোঝাই যায়। এ-সব দিকে কারো চোখ নেই। এ-সব কাদের দেখার কথা? এতদিন মেলা এবং মন্দির পরিচালনা করে আসছিলেন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মহান্তরা। মেলা থেকে অর্জিত যাবতীয় আয় তাঁদের ধর্মভাণ্ডারেই জমা পড়তো। এ বছর নতুন কমিটি হয়েছে—তাতে জেলার বড় আমলা, মেজ আমলা, ছোট আমলা, রাজনৈতিক নেতা, কিছু সাধু মহারাজ, মহান্ত—অনেকেই আছেন। এবার কি আশা করা যায় বছরে একবার কলি ফেরানো ছাড়াও আরো একটু বেশি কিছু হবে? অবশ্য, এবার নাকি নতুন কমিটিকে পুরনো কমিটির সাথে কোর্ট-কাছারি করতেই অনেকটা সময় ব্যয় করতে হয়েছে। আগামী বছর হয়তো নতুন কিছু হবে।

বহুক্ষণ রোদ্দুরে ঘুরে-ঘুরে একটু ক্লান্ত হয়েছিলাম। চট-ত্রিপলে ঘেরা বড় বড় বৃহৎ খাওয়ার হোটেলের আয়োজন। তারই একটায় ডাল-ভাতের মতো দেখতে একটা কিছু দু'জনে দশ টাকার বিনিময়ে খেয়ে নিয়ে একটা ছায়াঘেরা মাঠে শুয়ে রইলাম বহুক্ষণ। সামনের আলপথ দিয়ে তখনো চলে যাচ্ছে মেলার দিকে বহু গ্রাম্য মানুষ। সব সেরা শাড়ি-জামাটা পরে আসছে কৃষ্ণকলি মেয়েরা।

শীতের দুপুর হুট্ করে ফুরিয়ে যায়। সূর্য দ্রুত নদীর দিকে নামতে শুরু করেছে। ক্রমশই ভিড় বাড়ছে। মাইকের আওয়াজ অনুসরণ করে একটা আখড়ায় গিয়ে বসলাম। তখনো আখড়াগুলি তেমন জমে নি। তারই মধ্যে শম্ভুদাস বাউলের আখড়ায় বেশ জমাটি পরিবেশ। গুপি-যন্ত্র হাতে নেচে নেচে, দুলে দুলে গান গাইছে মধ্যবয়স্ক শম্ভু বাউল। হাতের যন্ত্রে, পায়ের ঘুঙুরে, ঠোঁটে, জিভে বিচিত্র সব বোল উঠছে। বেশ বোঝা যায়, সে যেন কিসের এক ঘোরে রয়েছে। সমস্ত শরীর, মন পাপড়ির মতো মেলে দিয়ে একেবারে কোন্ গভীর থেকে তুলে আনছে গানের কথা, মুখ এবং আনুষঙ্গিক শব্দাবলী। ওই শীতেও তার শরীরে ফুটে উঠছে স্বেদচিহ্ন। পরপর কয়েকটা গান গেয়ে তাকে যেন একটু ক্লান্ত লাগছিল। বয়েস হয়েছে, এখন আর আগের মতো পারে না। চুলে-দাড়িতে অজস্র রূপোলি রেখা। ওকে সাময়িক বিশ্রাম দিতে তরুণ বাউল পবন দাস কিছুক্ষণ ঠেকা দিল। খুব একটা জমলো না। তবু গুণগ্রাহী শম্ভু ওর পিঠ চাপড়ে দিল। কিন্তু সকলেই শম্ভুকে চায়। সুতরাং ওর আর বিশ্রাম নেওয়া হল না। শম্ভু আবার গুপিযন্ত্রে সুর তুলল। পবন গলা মেলালো। নিমিষে আসর ভরভরাট। শম্ভু আর পবনের যুগলবন্দী অনেকটাই কবির লড়াইয়ের চাপান-উৎরানের মতো লাগছিল। পবন রাধার পক্ষে আর শম্ভু কৃষ্ণের পক্ষে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে দোষারোপ করছিল। অনেকটা বৈষ্ণব কাব্যের মান ও কলহান্তরিতা পর্যায়ের মতো। কিন্তু সবটাই গ্রাম্য এবং সেজন্যেই প্রাণময়। ওই-রকম উত্তর-প্রত্যুত্তরের গানের আসর যখন দুর্দান্ত জমাটি হয়ে গেছে, তখনই গানের আসর, মনের মানুষ, আগ্রহী শ্রোতা—সব ফেলে রেখে হুট্ করে পবন দাস এক লালমুখো সাহেবের হাত ধরে কোথায় চলে গেল। কে জানে, সাহেবই ওর মনের মানুষ কি-না!

গানের গভীরতায় শ্রোতারা ভীষণভাবে নিমগ্ন হয়ে গেছে। বিশেষতঃ, গান শুনে গ্রামের অজস্র কালো কালো সরল মানুষের মুখে যে স্বর্গীয় হাসি ফুটছিল, তার কোন তুলনাই হয় না। এবং গায়কেরও তাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। অবশ্য হাসি ছাড়াও কেউ কেউ শম্ভুর জোব্বায় বুকে পিন্ দিয়ে টাকা-কড়িও আটকে দিচ্ছিল নগদ বিদায় হিসেবে। তবে, কলকাতার বাবুদের রেকর্ড গানের ফরমাশ শম্ভুকে যে খুব বিরক্ত এবং বিব্রত করছে, তা টের পাচ্ছিলাম।

ওই আখড়ায়ই দূরে থেকে দেখছিলাম, খড়দার স্বপন বাউলকে। খুব চকমকি ধরাচুড়ো পড়ে তৈরি হচ্ছে। পেশায় স্বপন একজন 'মুখশুদ্ধি' প্রস্তুতকারক। শিয়ালদা মেন লাইনের ট্রেনে ওঁর ব্যবসার খুব রমরমা। অথচ পেশায় ব্যবসায়ী হলেও মনেপ্রাণে ও আদ্যোপান্ত বাউল। স্বপনের গান খুব ঘনিষ্ঠ পরিবেশে শোনার অভিজ্ঞতা আছে, তাই নতুন প্রেক্ষিতে ওঁর গান শোনার জন্যে উৎসুক হলাম। কিন্তু যতোক্ষণ ছিলাম, ওঁকে আর

খুঁজেই পেলাম না।

শম্ভু দাসের আখড়ায় বিভোর হয়ে গান শুনছিলাম। রাগ-রাগিনীর ব্যাকরণ বুঝি না, তবু বাউল গানের গতিবিধি বোঝার চেষ্টা অন্ততঃ করছিলাম। শম্ভুর স্বরগ্রাম আমাকে আক্ষরিক অর্থে মুগ্ধ করছিল। যেন, সেই অশিক্ষিত, অকৃত্রিম হৃদয়ের সরলগান' আমাকে সকল অহংকার ধুলোয় লুটিয়ে এক নিবিড় অসীমতার সন্ধানে তৎপর করছিল। শম্ভু দুলে দুলে তখনো গাইছিল—'সে প্রেম করতে গেলে মরতে হয়। আত্মসুখীর মিছে সে প্রেমের আলয়। যার আমি মরেছে তার সাধন হয়েছে। কোটি জন্মের পুণ্যের ফল তার উদয় হয়েছে......' (পাঠক, মাফ করবেন, সঙ্গে রেকর্ডার ছিল না। তবে পংক্তিগুলো বোধহয় এ রকমই।) ইত্যাদি। ভাবছিলাম, সত্যিই তো মৃতের আবার মৃত্যুর ভয় কি! বস্তুত, এক অশিক্ষিত গ্রাম্য বাউল যে-ভাবে ঠুনকো 'আমি'-র মুখে পদাঘাত করে সমুদ্রের সন্ধান দিচ্ছিল, তাতে অসাড় থাকে কোন্ পাষন্ড? তাই স্বভাবতই বাউলে বিলীন হতে চাইছিলাম।

কিন্তু সব ইচ্ছে কখনোই পূরণ হয় না। সেই সাবলীল গানের আসরে কলকাতার কিছু দাক্ষিণী, তথাকথিত সংস্কৃত নারী পুরুষ এমন অশোভন আচরণ করছিলেন যে, গান এবং মেলার জান্তব সরলতাটুকু একেবারেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

তারপর ঘুরে-ফিরে আরো কয়েকটা বাউল আড্ডায় গেলাম। সকলেই পূর্ণ দাসের খোঁজ করছিল। কি ব্যাপার, বাউল মানেই পূর্ণ দাস নাকি? পূর্ণ দাস মহান শিল্পী সন্দেহ নেই—কিন্তু বিলেত যায় নি, সাহেবদের হাততালি পায় নি, রেডিও-টি.ভি. করে নি বলে অন্যেরা বাউল নয়? কে জানে! পূর্ণ দাস বোধহয় এ-সব ভেবেই গত কয়েক বছর আর মেলায় আসেন না, শহরে গান শোনান।

ঘুরে ঘুরে দেখলাম, মেলায় কিছু সাধু-বাবারাও বেশ চৌরসীপাট্টা করে আসর গেড়ে বসেছেন। যাদের দলবল, নাম-ডাক আছে তাঁদেরই আখড়া আছে, সিংহাসন আছে। তাছাড়া এখানে-সেখানে গাছের তলায় কাঠের আগুন জ্বালিয়ে কিছু ধ্যানমগ্ন রক্তচক্ষু একলা সন্ন্যেসীও দেখা গেল। তবে সামীয়ানা খাটিয়ে প্রতিষ্ঠিত বাবাদের সুসজ্জিত অবস্থানের কারণ ঠিকঠাক বোধগম্য হল না। অবশ্য, এ'দের জন্যে মেলার গ্ল্যামার বেড়েছিল অনেকটাই। গাঁজার ধোঁয়া, লাল আগুন, লাল চোখ, লাল পোষাকাষাকে সাধু বাবাদের দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল। ভয়ংকর সুন্দর আর কী। যদিও, দূর থেকে যতোটা ভয়ংকর লাগে, কাছে এলে ততোটা কিছু নয়। সব কিছুই যেন কি রকম সাজানো, কাগুজে।

সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে। অজয়ের তীরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বালিয়াড়িতে একটা অনির্দিষ্ট বেদনার ছায়া। মেলা বেশ জমে উঠেছে। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পাচ্ছিলাম মাইকে পরিত্রাহী 'সাধের লাউ' গোছের তেলেভাজা বাউল সঙ্গীত, কিম্বা হিন্দী সিনেমার সর্বগ্রাসী 'পেয়ার মহব্বতের' অসহ্য চিৎকার। সারাদিন চেঁচিয়ে তখনো ক্লান্ত হয় নি প্রতিমা বিড়ির অবিরাম ঘোষণা—'ফিরিতে বিড়ি খান, ফিরি বিড়ি, ফিরি...'। অন্নসত্রগুলিতে তখনো হটোপুটি। দোকানপাটে বিক্রি-বাট্টা চমৎকার। চারদিক আলো ঝলমল।

ফেরার আগে চা খেতে গিয়ে আলাপ হ'ল জীবন ওঝা আর তার বৌ মালতীর সাথে। ইলামবাজার থেকে মেলায় এসেছে। সারারাত মেলায় থাকবে বলে কৌটোতে বেঁধে এনেছে চিঁড়ে, মুড়ি আর বাতাসা। মেলা থেকে সস্তায় কিনে নেবে দু' ফানা কলা। কাচ্চাবাচ্চাগুলোকে রেখে এসেছে ঘরে, তাদের ঠাকুমার কাছে। তাদের জন্যে কিনে নিয়ে যেতে হবে খেলনাপত্র, নাকছাবি আর কানপাশা। বুড়ো বাপের জন্যে ভালো তামাক আর সস্তায় পেলে একটা গড়গড়া। মায়ের জন্যে আলতা-সিঁদুর, আর চিরুণী। জিগ্যেস করলাম 'রাতে ঠান্ডায় কষ্ট হবে না'? চট্ ক'রে মুখের ওপর জবাব দিল, 'কষ্ট কিসের গো বাবু, সারা-রাত্তির গান শুনবো তার দাম দিতে হবেক্ নাই'?...

বটেই তো। আমাদের মতো এরা তো আর ছুটির দিনের সখের শ্রোতা নয়। এরা আসে প্রাণের তাগিদে। এই গান এদের রক্তের ব্যাপার। এই মেলাই যে এদের সারা বছরের একমাত্র আনন্দ, যে জন্যে তারা সারা বছর প্রতীক্ষায় অধীর হ'য়ে থাকে। এই মেলার আশ্রয়ে থেকে ক'টা দিনের জন্যে ভুলে থাকতে চায় সারা বছরের দুঃখ-দারিদ্র্যের গ্লানি। গোলায় সবে নতুন ধান উঠেছে। শোধ হয়েছে মহাজনের ধারদেনা। পেট পুরে ক'দিন খাওয়া নিশ্চিত। তবে আর কষ্ট কিসের? সারারাত দু'জনে মিলে গানের, মেলার সবটুকু রূপ-রস শুষে নিয়ে ভোরবেলা জ্বলজ্বলে চোখ-মুখ নিয়ে ঘরে ফিরবে, ঘরে ফিরে গপ্পো করবে মেলার—তাতে যে সুখ, তার কাছে আমাদের সব বানানো কষ্ট তো প্রকৃতই তুচ্ছ হ'য়ে যায়!

আমার শহুরে নিশ্বাস থেকে ওদের বাঁচাতে গোপনে সেখান থেকে উঠে এলাম। বাস ছাড়তে শেষবারের মতো পেছন ফিরে তাকালাম। ক্রমশই চাপ-চাপ হারিয়ে যেতে থাকলো কেঁদুলির বাউল রাত।

[ভারতবর্ষের আলোকে লু সুন : ৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

দেখি আরেক জায়গায়—"যখন শ্রমিক শ্রেণীর লেখকরা বিশ্বৎজগতে নিজেদের বসার জন্য একটুখানি আসন পেয়েছেন, হয়ত একটা পাণ্ডু-লিপির জন্য কয়েকটি মুদ্রা পেয়েছেন, অমনি তাঁরা সর্বহারা সাহিত্যের জয়ধ্বনি দিয়ে সটকে পড়েছেন" (বামপন্থী লেখক লীগের সভায় প্রদত্ত ভাষণ, মার্চ, ১৯৩০)। ঐ একই ভাষণে তিনি আরেক জায়গায় সাবধান করে দিয়ে বলছেন, "প্রতিক্রিয়াশীলরা ইতিমধ্যেই জোটবন্ধ হয়েছেন, কিন্তু আমরা এখনও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তুলি নি। বস্তুতঃ এই ঐক্য গড়ে তুলতে না পারাটাই প্রমাণ করছে যে লক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। আমাদের কেউ কেউ কোনো চক্রের (কোটারি) হয়ে কাজ করছেন আবার একটা অংশ কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্য।"

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হয়েও লু সুন একজন আদর্শ কমিউনিস্টের মত জীবনযাপন করে গেছেন। চীনদেশের সাহিত্য আন্দোলনের তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠক। তাই লু সুনের কর্মীসত্তাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। জীবনের শেষভাগে, যখন তিনি জনপ্রিয়তার সুউচ্চ শিখরে অবস্থান করছিলেন, তখনও আন্দোলন-সংগঠনের কাজে প্রচন্ড পরিশ্রম করতে দেখা গেছে। সভা সমাবেশের আয়োজন করা থেকে শুরু করে একেবারে নতুন লেখকদের অত্যন্ত কাঁচা লেখাও মনোযোগ সহকারে পড়ে তার জবাব দেওয়া, ডেকে এনে আলোচনা করা ইত্যাদি ধরনের তথাকথিত ছোটখাটো কাজ তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে করতেন। ১৯৩৭ সালে, মৃত্যুর কয়েক মাস আগে, তিনি যখন যক্ষ্মায় আক্রান্ত, সেই সময় গোর্কী তাঁকে চিকিৎসার জন্য মস্কোতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। জবাবে তিনি বলে-ছিলেন, "এদেশে যখন কমরেডরা লড়ছেন, যুদ্ধ করে প্রাণ দিচ্ছেন, সেই সময়ে আপনি আমাকে মস্কোয় গিয়ে শুয়ে থাকতে বলছেন?" তাঁর এই কর্মীসত্তার উল্লেখ করতে গিয়ে আমাদের সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথা মনে পড়ে যায়।

লু সুন তাঁর কর্মমুখর জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলিকে তাঁর গল্পে-উপন্যাসে বস্তুনিষ্ঠভাবে এবং শিল্প-সম্মতভাবে পরিবেশন করেছেন। পাশাপাশি, সামাজিক অন্যায়-অবিচার, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ কৌতুকে এবং অপূর্ব শক্তিমত্তার সাহায্যে রচিত তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যদিও চীনদেশের অক্টোবর বিপ্লবের অনেক আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তথাপি, চীন বিপ্লবের অন্যতম রূপকার হিসাবেই তাঁর যথার্থ পরিচিতি। তাই মাও সেতুঙ তাঁকে 'মহান বিপ্লবী ও চিন্তানায়ক' আখ্যা দিয়ে তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে বলেছিলেন, "আমাদের ইতিহাসে এই বীরের কোনো তুলনা নেই। তিনি যে পথ নিয়েছিলেন, সেই পথই চীনের নতুন জাতীয় সংস্কৃতির পথ।"

আমাদেরর দেশে লু সুন-চর্চা প্রায় কিছুই হয় নি এযাবৎ, চীনদেশের অন্যান্য সাহিত্যিকদের তো নয়ই। ইংরাজী সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিলেও আমরা ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকার সাহিত্যের খবর যতটা রাখি, প্রতিবেশী দেশের সাহিত্যের খবর তার সিকিভাগও রাখি না। লু সুনের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কেবলমাত্র আনু-ষ্ঠানিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে আমরা যদি লু সুন-চর্চায় মনোনিবেশ করতে পারি তাহলে এদেশে শোষণ-বঞ্চনার অবসানের লড়াইতে অনেক প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করতে পারবো বলেই বিশ্বাস।

এক ঢিলে

(অন্তন চেখভের "না দাচে"র বঙ্গানুবাদ)

"তোমায় আমি ভালবাসি, তুমি আমার প্রাণেশ্বর, আমার আনন্দ—তুমি আমার সবকিছু! আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। লক্ষ্মীটি, আজ ঠিক সন্ধ্যে আটটায় পুরানো গ্রীষ্মাবাসটায় থেকো, আমার নাম জানালাম না। শুধু এটুকু জেনে রেখো যে আমি একজন যুবতী—সুন্দরীও বটে। খুশী তো?"

সাধাসিধে সংসারী পাভেল ইভানোভিচ্ চিঠিটা দেখে তো আকাশ থেকে পড়ল।—আমি একজন বিবাহিত লোক, আর আমার কাছে কিনা হঠাৎ এমন একটা আশ্চর্যজনক, হাস্যকর চিঠি!—চিঠিটা লিখল কে?

আট বছর হল পাভেল হভানোাভচের বিয়ে হয়েছে—এর মধ্যে অভিনন্দনপত্র ছাড়া আর কোনো চিঠি পেয়েছি বলে তো পাভেলের মনে পড়ছে না।

স্বভাবতঃই চিঠিটা পেয়ে ও খুব চঞ্চল হয়ে পড়ল। ঘণ্টাখানেক ধরে ডিভানে গা এলিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগল "যাই হোক না কেন—এ বয়সে এই ছেলেমানুষি ব্যাপারে সাড়া দেওয়াটা আমার কোনোমতেই উচিৎ হবে না।"

কিন্তু.........চিঠিটা লিখল কে?—এটা তো জানতেই হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটা এক মহিলার হাতের লেখা। এমন একটা আন্তরিক চিঠি—এটা কোনোমতেই ঠাট্টা হতে পারে না।—বোধহয় এটা কোনো বিধবার লেখা।—বিধবারা সাধারণতঃ একটু না ভেবেচিন্তেই এই সব কাজগুলো করে ফেলে কিন্তু.........চিঠিটা লিখলো কে?

হঠাৎ পাভেল ইভানোভিচের মনে পড়ল—ঠিক তো, কাল আর পরশু যখন ও গ্রীষ্মাবাসটার কাছে ঘোরাঘুরি করছিল—তখন সাদা-নীল পোষাক পরা সোনালী চুলওলা সেই যুবতী মেয়েটা—সে তো তার দিকে বার কয়েক তাকিয়েছিল বটে। যখন ও বেঞ্চিতে গিয়ে বসল সেই সময় মেয়েটাও তো ঠিক ওর পাশে এসেই বসেছিল।—সেই মেয়েটার চিঠি নয়তো?—কে জানে?

খেতে খেতে গিন্নীর দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগল। মেয়েটা লিখেছে যুবতী—সুন্দরীও বটে।—হুম্—সত্যি বলতে কি—আমি এখনও তেমন কিছু একটা বুড়ো হয়ে যাই নি।—বা দেখতেও খুব একটা খারাপ নই—এখনও কেউ আমার প্রেমে পড়তে পারে। আমার গিন্নীও তো আমাকে ভালবাসে।

—তুমি আবার কিসের চিন্তায় পড়লে? জিজ্ঞাসা করল গিন্নী।

—না—এমনি—মাথাটা ভীষণ ধরেছে কিনা—তাই। পাভেল ইভানোভিচ উত্তর দিল।

আবার ভাবল এই প্রেমপত্রটাকে এত গুরুত্ব দেওয়াটাও নিছক বোকামি ছাড়া আর কিছুই না। চিঠিটা যে লিখেছে তার কথা ভেবে তার হাসি পেল। কিন্তু......মুশকিল হল এই যে, এই চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে ঐ একই চিন্তা ওর মাথায় কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর পাভেল ইভানোভিচ খাটের ওপর শুয়ে ভাবতে লাগল "ও হয়তো আশায় আশায় আছে যে আমি আসব।" যা-ই বল না কেন, এই কৌতূহল কোনোমতেই দমন করা যায় না। তাছাড়া মেয়েটা কে?—দূর থেকে এটা দেখার একটা ইচ্ছা মনে জাগছে বৈকি!—কিন্তু না, গ্রীষ্মাবাসে যাওয়ার অবশ্যই আকাশ-পাতাল কোনো মানে হয় না।

ভাবতে ভাবতে পাভেল ইভানোভিচ শেষ পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠে জামা কাপড় পরতে আরম্ভ করল।

—কোথায় চললে?—পাটভাঙ্গা সার্ট আর নতুন টাই পরতে দেখে গিন্নী ওকে জিজ্ঞাসা করল।

গোরা বসু

—এমনি......একটু ঘুরে আসি। মাথাটা বড় ধরেছে। একটু বাইরে থেকে ঘুরে এসে দেখি।

পাভেল ইভানোভিচ বেরিয়ে পড়ল। ঐ তো রাস্তার শেষে পুরানো গ্রীষ্মাবাসটা দেখা যাচ্ছে।

সেই সোনালী চুলওলা মেয়েটার সামনে ও দাঁড়িয়ে আছে—এই কথা ভেবে ওর বুকটা হঠাৎ ধুকধুক করে উঠল।—"বোধ হচ্ছে ওখানে কেউ নেই", গ্রীষ্মাবাসের দিকে যেতে যেতে ও ভাবতে লাগল। আরে, ঐ তো কে যেন বসে আছে। কিন্তু এ তো দেখছি একজন পুরুষমানুষ। লোকটা আর কেউ না, পাভেলের কলেজে পড়া শ্যালক মিতিয়া, যে ওদের সাথেই থাকে।

—আরে তুমি এখানে? টুপিটা খুলে বসতে বসতে বেশ অসন্তুষ্ট হয়েই ও জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ, কেন? মিতিয়ার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

মিনিট দুয়েক চুপচাপ কাটল।

—কিছু মনে কোরো না পাভেল ইভানোভিচ্। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।.........আমার থিসিসটা নিয়ে খুব চিন্তায় পড়েছি, বুঝলে, গাদা গাদা কঠিন সব প্রশ্ন। মানে, এখন আমার কাছে কারও উপস্থিতি এত অস্বস্তিকর যে কি বলব, মিতিয়া জানায়।

—"তাইতো, তুমি বরং ওই ফাঁকা রাস্তায় চলে যাও, খোলা আবহাওয়ায় মাথাটা খেলবে ভাল, আর আমি একটু ঐ বেঞ্চিতে গা এলিয়ে দিই। এখানে তেমন গরম নেই"—বলল পাভেল ইভানোভিচ।

—"থিসিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ", মিতিয়া বলে। আবার দুজনেই চুপ।

পাভেল ইভানোভিচ্ কোনোমতেই আর ঐ জায়গা থেকে মিতিয়াকে সরাতে পারছে না।

—"আমি অনুগ্রহ করে বলছি মিতিয়া, জীবনে আমার এই প্রথম অনুরোধ তোমার কাছে। আমার সোনা ভাইটি। আমার কথা শোনো। সত্যি বলছি, আমার শরীর খারাপ, একটু বিশ্রাম করব। সত্যি কি তুমি যেতে পারবে না?"

—মিতিয়া গেল না।

—দেখ মিতিয়া, আমি এই শেষবারের মত তোমায় অনুরোধ করছি। দেখিয়ে দাও তো একবার এখান থেকে চলে গিয়ে তুমি কেমন বিচক্ষণ, দয়ালু, শিক্ষিত লোক।

মিতিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিল, কোনোমতেই না! আমি যখন বলেছি যাব না তখন যাব না, ব্যাস্।

ঠিক এই সময় দরজার কাছে দেখা দিল এক নারীমূর্তি, কিন্তু দুজনকে অবাক করে দিয়ে সাথে সাথেই অদৃশ্য হল।

—"যাঃ, চলে গেল।" ভাবল পাভেল ইভানোভিচ্। এই ইতরটাকে দেখেই চলে গেল। হা ভগবান, আর তো ফিরে আসবে বলে মনে হচ্ছে না।—কিছুক্ষণ বসে থেকে পাভেল ইভানোভিচ্ উঠে দাঁড়ালো। টুপিটা পরল আর মিতিয়াকে ডাক করে ঝাঁঝিয়ে উঠল, "ইতর, বুন্ধু, তোমার সাথে আমি আর কোনো সম্পর্কই রাখছি না। তোমাকে আর বেশী কিছু বলার নেই আমার।"

—খুব ভাল কথা—মিতিয়ার জবাব।

—তুমিও জেনে রাখো—এইখানে বসে থেকে তুমি যে নোংরা প্যাঁচটা খেললে সেটা আমিও সারা জীবন ভুলব না।

পাভেল ইভানোভিচ্ কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে, গ্রীষ্মাবাস থেকে বেরিয়ে পড়ে পা বাড়ালো সোজা নিজের কুটিরের দিকে।

রাত্রে খাবার টেবিলে আবার দুজনে মুখোমুখি হল। কারও মুখে কোনো কথা নেই। কিন্তু এমন তাদের হাবভাব যেন পারলে একে অপরকে আস্ত গিলে খায় আর কি!

পাভেল ইভানোভিচের গিন্নী ওদের দিকে তাকিয়ে তো হেসেই ফেলল। জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁগো, আজ সকালে তুমি কি চিঠি পেয়েছো গো?

—আমি......? মানে, কৈ, না তো। গিন্নী বুঝতে পেরে গেছে দেখে ভয়ে ভয়ে বলল পাভেল ইভানোভিচ।

—আহা বলেই ফেল না বাপু। তুমি বোধহয় জান না চিঠিটা আমিই লিখেছি।

—সত্যি কথা বলতে কি, আমার আর কিছু করার ছিল না। আজ আসলে আমার বাড়িঘর ধুয়ে মুছে পরিস্কার করার কথা ছিল। তোমাকে বাড়ির বাইরে পাঠানোর এছাড়া আর কি উপায় ছিল বল?

[শেষাংশ ২২ পৃষ্ঠায়]

শালগাছ

অমল চক্রবর্তী

ফরাসপাতা গদীতে, পুরুন্টু নরম চেয়ারে অথবা ঝকমকে সিংহাসনে
অমুকবাবু বসে থাকেন। চারপাশের শশব্যস্ততাকে বৃদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদের
মত দেখতে দেখতে তিনি বেলের পানা, গরম কফি বা দ্রাক্ষারস খান।
ঠিক এমনি সময় একে একে তারা ঢোকে। প্রথমে কবাবু খানিক
ঘ্যাঙরঘোঙর ক'রে অমুকবাবুর পায়ের বুড়ো আঙুল চেটে দিয়ে
চলে যায়। তারপর খবাবু ঢুকে ঘোঁৎঘোঁৎ ক'রেট'রে পায়ের
পাতা চাটতে থাকে। সে চলে গেলে গবাবু ঢুকে হুপহাপ ক'রে
অমুকবাবুর আস্ত পা-খানাই চেটে দেয়। তারপর ঘবাবু তারপর
ঙবাবু তারপর চবাবু ছবাবু জবাবু এবং এইভাবে বর্ণমালার
সমস্ত বর্ণের বাবুরা এসে বিচিত্র ভাষায় শব্দ করে চেটে চলে
গেলে অমুকবাবু গা ঝাড়া দিয়ে ওঠেন। সেজেগুজে তিনি
তখন তমুকবাবুর কাছে যান এবং বর্ণমালার বাবুদের মতই
লাইনে দাঁড়িয়ে তিনি তমুকবাবুর শরীরের কোনো একটা
অংশ চেটে দিয়ে চলে আসেন। তখন তমুকবাবু গা ঝাড়া
দিয়ে উঠে সমুকবাবুকে চাটতে যান। সবার চাটা হলে সমুকবাবু
আবার নমুকবাবুকে চাটার জন্যে লাইনে দাঁড়ান। এইভাবে
উপরে উঠতে উঠতে তারা ভারতবর্ষের মাথা ছাড়িয়ে চাটতে চাটতে
বিদেশী বাজারে চলে যান। এই অবারিত গতিশীল অদ্ভুত চাটার
প্রক্রিয়া ভারতবর্ষের লজ্জাহরণ করে চলেছে। এবং সংবাদে প্রকাশ
নিজের বস্ত্রহরণের আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ আপাতত ফেরার।

শুকনো রোঁয়াওঠা দীর্ঘ অন্ধকার গায়ে মেখে শুয়ে আছে ভারতবর্ষ।
তার মাথার ওপরে শিস বাজিয়ে গান গাইছে, উড়ে বেড়াচ্ছে
উত্তরপশ্চিম আর দক্ষিণ থেকে উড়ে-আসা শাদা সম্ভ্রান্ত শকুনের দল।
তার চুলে হাহা করে উড়ছে বরফের কুচি,
পায়ের নখ ছুঁয়ে ফণা তুলে ফিরে যাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ
তবু তার চোখ অদৃশ্য বর্শায় গেঁথে দিচ্ছে নীল আকাশকে।
আকাশভরা সূর্য-তারায় এ বড় করুণ শয্যা।

থানার বড়বাবু মেজবাবু সেজবাবুরা ওয়াগন-ভাঙার হিস্যা চাটতে চাটতে
হলদে-চোখে ভোর দেখার আগেই রঙীন চশমায় চোখ ঢাকে। সারা সন্ধ্যা
গঙ্গার হাওয়া খেয়ে বাজারের প্রোথিতকীর্তি সাহিত্যিক ভাড়াটে মেয়েমানুষের
শরীর চেটে চেটে রাত কাবার করে। ফুটপাথে শুয়ে-থাকা রমণীর পেটের
জল খুবলে খেয়ে হেলেদুলে চলে যায় মুক্ত নাগর। অফুরন্ত জনসম্পদ চাটতে
চাটতে ভারতীয় পুঁজিপতিরা সকালে সন্ধ্যায় অম্লশূলের ওষুধ খেয়ে ঢেকুর তোলে।
জনগণের দুর্দশায় সারাদিন ব্যস্ত থেকে রাতের-ঘুমে মন্ত্রী স্বপ্ন দেখে, একটা
কুকুর তার গদিঅলা আসন চেটে চেটে পরিস্কার করছে। এদিকে সারাগায়ে
লালা মেখে ক্রমশ ছোটো হচ্ছে ভারতীয় মুদ্রা, আর ঋণ বাড়ছে সুদখোর
দাদাদের ঘরে। তবু বন্ধুগণ, শান্তিতে পেরোতে চাই স্বর্গের সিঁড়ি।

ডাস্টবিনে শালপাতা চাটছে আশ্চর্য শুকনো ফুলের মত শিশু।
ওর নাম নচিকেতা হতে পারত, হয় নি।
শালপাতায় খাদ্য নেই, কুকুরেরা প্রায়-মহাজন, কিছুই রাখে নি।
শিশুর চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছে, অনিবার্য সূর্যালোকে সেই জলে
ঝলসে উঠছে ঘৃণা, ক্রোধ, আক্রোশ এবং প্রদ্যত বোবা গর্জন।
শালপাতার বুক থেকে তার অস্তিত্ব ছড়িয়ে পড়ছে
'দূরে কোথায়, দূরে দূরে'।

অফুরন্ত শালগাছ বেড়ে উঠছে অরণ্যে অধীর অধিকারে।

খবর

সুকুমার ভট্টাচার্য

কখন যাওয়া, কখন আসা—
কেমনতরো ভালবাসা?
দেওয়ালে পিঠ রেখে শাসায় ঘড়ি!
তামাম আকাশ কবে থেকে,
চাঁদ নিয়েছে নিলেম ডেকে?
আষাঢ় কবে দিল গলায় দড়ি!

ঘুম কুরে খায় কি-ছার পোকা,
জ্বালায় মাকে দুষ্টু খোকা;
গুমোট বাড়ে ঘরে, গলির বুকে।
দুপুর রাতে ডাকাডাকি—
চোখের-মাথা-খাওয়া পাখি,
জোছ্না দেখে ঘাবড়েছে উজবুক-এ।

সামনে রোখো,—মায়াপরী!
দু'হাত আড়াল রাত-প্রহরী—
সারি সারি দাঁড়িয়ে জোয়ান তরু।
তার কাছে যে খবর আছে,
অঝোর শ্রাবণ ঝরিয়ে গাছে—
শরৎ আকাশ বাজাবে ডম্বরু।

যেখানে যেমন

অমিতাভ বিশ্বাস

যে চাবুকের আঘাত
যৌবন দ্রুণে আছড়ে পড়ে
নির্দয় অকস্মাৎ—
তাকে আমি চিনি।
যে বিবেকের তৃষ্ণায়
চিরে যায় স্বরনালী
কালক্ষেপে
তাকে আমি জানি
যে হাতে কাঁটার আঁচড়—রক্ত
ফুল তুলতে গিয়ে
বিষধর দংশন
তাকে আমি চিনি
যে সুরে, কাব্যে, নৃত্যে
শুধু অশ্রু; রোমাঞ্চ আর রোমাঞ্চ
যুগান্তর
চিনি তাকেও—
সম্বিৎ হারা বিদগ্ধ গন্ধ বায়ুদের
পাষাণের মৃত প্রাণ
চিনিনি নিজেকে আজও;—
—একটা মিউজিয়ামে।

ফিল্মোৎসব '৮২

filmotsav 82

(ভূমিকা, তথ্য, পরিচিতি ও মন্তব্য)

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

সেদিন দুপুরে একটা বিশেষ কাজে এসপ্ল্যানেড থেকে পার্ক স্ট্রীটের দিকে চৌরঙ্গি রোড ধরে হে'টে যেতে যেতে চারপাশের পালিশ-করা চকচকে তৈলমসৃণ চেহারাটা দেখে খালি খালি মনে হচ্ছিল—এ কোথায় আছি? সমস্ত কলকাতার রক্ত গিলে খেয়ে যেন এ-অঞ্চল তার ঠোঁটে তা জমা করে রেখেছে। তার লাল বর্ণের দ্যুতিই আলাদা। সেদিনই কেন জানি না, হঠাৎ খেয়ালে এসেছিল—চতুর্দিকের অনটন আর খরচের হাহাকারে যেন কড়ায়গণ্ডায় মূল্য-উশুল-করা নিরুত্তাপ নিষ্ঠুর সঞ্চয়ের এক ঠাণ্ডাকঠিন আর শৌখিন সিন্দুকের মধ্যে কয়েদীর মত নিজের শেষ পুঁজি—জীর্ণ বুকের হাড় ক'খানা—বাজিয়ে চলেছি আরো ঘৃণ্য কোনো দাসখৎ লিখে দিতে। খুব অস্বস্তি হচ্ছিল।...দেশটা যে ভারতবর্ষ, সেটা ভুলে যাবার দশাপ্রাপ্ত হয়েছিলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।...পায়ের অদূরেই শুয়ে-থাকা নিশ্চিন্ত গরু আর কাছাকাছি দার্শনিকের মত দাঁড়িয়ে-থাকা বৃষ এবং যাবতীয় 'ইত্যাদির' মত মানুষে-টানা-রিক্সা থেকে শুরু করে গায়ে-খড়ি-ওঠা দিগম্বর ভিকিরি শিশু পর্যন্ত আড়াআড়ি একই দৃশ্যে-ধরা এইসব দেখতে দেখতে, বেলা বারোটায় চৌরঙ্গি রোডের ফুটপাথের ওপর দিয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে, বিশ্বাস হচ্ছিল না—এটা ভারতবর্ষেরই একটা ছাপমারা শহর কি না!

যাই হোক, সেদিনকার কথা বলতে হল, কারণ কলকাতা শহরেই দেখা ঐ বিসদৃশ ছবিগুলির সঙ্গে—আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সূত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন উঁচুনিচু অসমান রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক কাঠামোয় তৈরী নানা আদর্শের শাসন-নিয়ন্ত্রিত দেশগুলির পারস্পরিক তুলনাও একই ভঙ্গিতে করা চলে অনায়াসে। সমস্ত কলকাতার তুলনায় যেমন ঐ বিশেষ অঞ্চলটি অনেক বেশি স্বার্থপর ও সুবিধাভোগী, তেমনই সামগ্রিক বিচারে গোটা পৃথিবীর মধ্যেও মাত্র হাতে-গোণা কয়েকটি দেশ কায়েমী স্বার্থের চক্রান্তে সংগৃহীত তাবৎ মুনাফার একচেটিয়া অংশীদার।—এই বিশ্রী তারতম্য আর অসামঞ্জস্যের বিস্তৃত রূপটা হুবহু ধরা পড়ে, যদি একটানা কোনো প্রদর্শনীর মাধ্যমে অনেকগুলি দেশের শুধু চলচ্চিত্রকর্মই পরপর প্রত্যক্ষ করা যায়। অবশ্যই, সেইসব সৃষ্টির প্রথম শর্ত হল—দেশ-অনুসারে সেগুলি মৌলিক এবং প্রতিনিধি-স্থানীয় হওয়া চাই।

এ বছর কলকাতায় জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত প্রায় একপক্ষকাল-ব্যাপী যে আন্তর্জাতিক ফিল্মোৎসব হয়ে গেল, তাতে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে আরো একবার। তাই সাধারণ সামাজিক মূল্যায়নে চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে প্রথমেই দু-চার কথা আলোচনা করে নিলে ভাল হয়।

অনেকদিন ধরে ফিল্ম-সমালোচনার সূত্রে অনিবার্য কারণে—দেখতে-দেখতে 'ফিল্ম দেখাটা' এখন আমার চোখ-সওয়া হয়ে গেছে। প্রায় কর্তব্যের পর্যায়ে পৌঁছেচে কাজটা। এ-ব্যাপারে আনন্দ আর বিরক্তির পাশাপাশি উপস্থিতি অহরহ টের পাই। সাধারণ দর্শকের জন্য সাধারণ ভারতীয় ছবি সাধারণতই যে কি বিরক্তিকর সেটা বলাই বাহুল্য। সুকুমার রায়ের সেই ব্যাজারমুখো রাজাকে মনে পড়ে, যে ঠোঙাভরা বাদামভাজা খেতো, কিন্তু গিলতো না। সেই রকমই এখনকার প'চানব্বুই ভাগ ভারতীয় ফিল্ম—চিবোতে শেখায়, গিলতে নয়। 'সরল হিন্দি ফাইটিং চিত্র' (পোস্টারে যেমন ছাপা থাকে) কিংবা ধার্মিক, সামাজিক আর 'সঙ্গীতবহুল' ভারতীয় ফিল্মে ঐ একটাই অঘোষিত শ্লোগান পয়সাওয়ালা প্রযোজকরা ছড়িয়ে যাচ্ছে—সবই দেখাও, কিন্তু সাবধান, শক্ত পরিণতি না পায় যেন কিছু। অর্থাৎ তম্বিঝম্বি-মারামারি পর্যন্ত হয়ে-হয়ে-হয়ে দুম করে ফ্রিজ শট্...রক্তফক্ত আর বেরুল না। ব্র্যাকটিকিটে বেমালুম সাফ্‌সাফ টেকনিকালারে মাখামাখি সুন্দর খেলু-তামাশা। আবার, যদিও বা মরলো-টরলো, কিন্তু জন্মান্তর ঠেকায় কে?—টাকা থাকলে খেলাতে খেলাতে বৃহস্পতিঠাকুরকেও থাকলে খেলাতে খেলাতে বৃহস্পতিঠাকুরকেও টিম-বদল রাজনীতিবদল করিয়ে কিনে নেওয়া যায়। যায় না কি? একেই তো বলে বোধহয় বেস্পতির দশা! ভারতবর্ষে তাই এখনকার অবস্থাটা বেশ জমেছে।...বটুক'দার (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র) 'মধু বংশীর গলি' নামক দীর্ঘ কবিতার মধ্যে এক জায়গায় আছে (সঠিক স্মৃতিতে নেই): "ওরা আছে বেশ/এ যাত্রায় অবশ্যই শেষ।"—সেরকমই আর কি! যাত্রা শেষ হয়ে এল বলে। 'প্রেম-ফাইট-যাদু'র (এ-ও পোস্টারে ছাপা থাকে) মার্কামারা বোম্বাই ফিল্মের ঘোলাটে, নেশাচ্ছন্ন দিন আর রাত শেষ হয়ে এবার নতুন চলচ্চিত্রের চরাচর খুলে টুটাফাটা কিন্তু টকটকে লাল রোদ্রের সবুজ-জাগানো ঢেউ নেমে আসার সময় হল।—এরই জানান্ দিয়েছে সর্বভারতীয় 'নতুন সিনেমা' তার দৃঢ় অবধারিত আবির্ভাবে (ফিল্মোৎসব '৮২-তেও 'ভারতীয় প্যানোরমা' বিভাগে এই 'নতুন সিনেমা'র বহু ছবি দেখানো হয়েছে)।

'দি পাইওনিয়ার ইন দি রেভলিউশ্যনারী আরমি'—চীনের একটি ছবি থেকে স্থির চিত্র

একটু আগেই জানিয়েছি, নানা শ্রেণীর ফিল্ম আমাকে দেখতে হয়। এইসব দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ফিল্মগুলির মধ্যে বলতে পারি, নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় ফিল্মের মান অধিকাংশই উৎকৃষ্ট নয় (এবার, ফিল্মোৎসব '৮২-তেই এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখেছি)। আন্তর্জাতিক ফিল্মের বেশির ভাগই কিন্তু উঁচুমানের। সেটা অবশ্য খুব নতুন কথা নয়, কেননা ফিল্ম-তৈরীর সব রকমের যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশলের সুবিধা ওখানে হাতের পাঁচ। তবুও, আশ্চর্যের ব্যাপারটা হল—বিদেশের ঐ 'ভাল' ফিল্মগুলির প্রায় সিংহভাগ আসে তৃতীয় বিশ্বের সদ্যজাগ্রত বা মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত ছোট-ছোট দেশগুলো থেকে (যদিও তৃতীয় বিশ্বের সব ছবিই 'ভাল' নয়)। আর, সেদিক থেকে বিচার করলেই দেখা যাবে, আমাদের দেশেও ফিল্মের বাৎসরিক উৎপাদন সূত্রে গোটা-সংখ্যার গড়-হিসাবে যদি আট-দশ শতাংশও হয় সুস্থ ও বাস্তবিক, তবে তাই আপাতত যথেষ্ট।...কলকাতার যে দৃশ্যটির উপমা দিয়ে এই রচনাটি শুরু করেছি তা সমস্ত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, সুতরাং এরকম নৈরাশ্যজনক আর দূষিত শিল্পপরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ আট-দশ শতাংশ 'ভাল' ছবির জন্মটাকেও খুবই অসম্ভব মনে হয় না কি? এবং এ-ও দেখতে পাচ্ছি, গড়পরতা হিসাবে ভাল ছবির সংখ্যা যমের মুখে

ছুড়ি মেরে আরো বাড়ছে। তার প্রমাণ, ভারতীয় ফিল্মজগতের বর্তমান চেহারা, যা ফিল্মোৎসব '৮২-তেও দেখা গেছে।

আসল কথা হল, সিনেমা-বায়োস্কোপে দলে-দলে মানুষ যায় কিছু দেখতে। তারা নতুন কিছু দেখতে পেলে খুশি হয় ঠিকই, কিন্তু বোধহয়, আরো বেশি খুশি হয় যদি একেবারে নিজেদের পছন্দমত কিছু পায় তারা পর্দায়। দিনের পর দিন মিথ্যে উল্টোপাল্টা দেখিয়েই শুধু ভুলিয়ে রাখা যায় না তাদের। তারা ছবি দেখতে যায় সত্যের সহজ সুন্দর প্রকাশে নিজেদেরই নতুন করে চিনে নেবার জন্য, নিজেদের সুখদুঃখ সংগ্রামের সবটাকেই—জীবন্ত চলমান দৃশ্যের সার্থক আঙ্গিকে ও বাস্তবতায় নানাভাবে দেখবার জন্য। তাই বক্তব্য আর ভাষাকে তারা দেয় অসীম গুরুত্ব। সাহিত্যের ভাষায় সাহিত্য আর ফিল্মের ভাষায় ফিল্মকে তারা ঘরোয়া স্পষ্টতায় পেতে চায়।

অর্থাৎ, শিল্পের মৌলিক ব্যাপারটা সাধারণ দর্শক-মানুষও বোঝে।...ঠিক এরই জের টেনে প্রয়াত ঋত্বিককুমার ঘটকের একটি বিশেষ রচনার আংশিক উদ্ধৃতি এখানে না-দিয়ে পারছি নাঃ "কথাটা হচ্ছে সর্বশিল্পকর্মেরই সত্যকারের শিল্প পদবাচ্য হতে হবে, সর্বপ্রথম হতে হবে সত্যবাদী। এই হচ্ছে শিল্প বিচারের দৃঢ়তম মানদন্ড, এবং যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত। যুগে যুগে সত্যের সংজ্ঞা পালটিয়েছে কিন্তু আপেক্ষিকভাবে এই মানদন্ড থেকেই গেছে। মিথ্যা শিল্পাভিমানী যে সৃষ্টিকর্ম, তা যতই মনোহারী হোক, তাকে কঠোরভাবে বর্জনের অবকাশ আছে। বুজরুকি আর ধোঁকা-বাজি, অথবা আপাতসত্যের প্রলেপে ঢাকা মিথ্যা-চরণ, একে ক্ষমা করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তার মানে এই নয় যে সত্যবাদী হলেই মহৎ শিল্প হবে। তার মানে শুধু এই, মহৎ শিল্প হলে সে সত্যবাদী হবেই। অর্থাৎ সত্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে নন্দন-তত্ত্বগত একটা উৎকর্ষে উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই মহৎ শিল্প জন্মায়।"

সব শিল্পমাধ্যমগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হল চলচ্চিত্র। এ সিদ্ধান্ত এখন তর্কের অতীত। কেননা, নান্দনিক দিক থেকে যাবতীয় শিল্পের (সাহিত্য-চিত্রকলা-চারুশিল্প ইত্যাদি) শাখা প্রশাখার সাহায্যে ও সমন্বয়ে যথার্থ পরিপুষ্টির ফলে এটি হয়ে উঠেছে একটি সার্থক আধুনিকতম শিল্পমাধ্যম। তাই চলচ্চিত্রেরও নিজস্ব নিয়মের ভাষায় যে-কোনো সংশ্লিষ্ট বক্তব্য বা বিষয়কে দর্শকবুদ্ধির দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হয় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ আঙ্গিকে। স্বভাবতই সেটা উৎকর্ষে যতই মসৃণ ও সহজ হবে ততই দর্শকের মগজে ঢেউ তুলতে পারবে বেশি।

আসলে তিনটি গোড়ার প্রশ্ন দরজা আগলে থাকে—'কী, কেন, কার জন্য'! এর উত্তর পেলেই যে কোনো ভারি সমস্যারও প্রাথমিক বা অনেক-সময়ে পুরোপুরি সমাধান পাওয়া যায়। তাই এই কটি চাবি হাতে থাকলে, তাবৎ শিল্পের আদত চেহারাচরিত্রটা একেবারে সোজা নজরে ঠাহর করে

ভারতীয় ছবি 'বারা'-র একটি দৃশ্য।
পরিচালনা এম. এস. সাথ্যু

দেখলেই—'ভাল কি মন্দ' বলে দিতে দেরি হবে না। আলোচনা-পর্যালোচনা-তর্কবিতর্ক পরের কথা। আর, কখনো কখনো সেটা অহেতুক কিংবা উদ্বৃত্তও মনে হয়, যদি খতিয়ানটা অমন সহজেই হয়ে যায়।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, বিষয় ও তার বক্তব্য প্রকাশে স্বচ্ছহীন যে ছবির ধারা তা দর্শককে টানে যদি সেখানে সত্যের প্রকাশও, সাংগঠনিক অর্থে, স্বচ্ছহীন হয়ে ওঠে।

৫.

১৯৫২ সালে ভারতবর্ষে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। কিন্তু নিয়মিত-ভাবে এই উৎসবের সূচনা হয় জানুয়ারি ১৯৭৫ থেকে। একটি বিশ্ব-সংস্থা যার নামঃ "চলচ্চিত্র প্রযোজক-সংঘের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন"—তার পক্ষ থেকেই এরকম অনুষ্ঠানের সরকারী অনুমতি দেওয়া হয় সেইসব দেশকে, যারা এই বিশ্ব-সংস্থাটির সদস্যপদ গ্রহণ করে। এই সংস্থাটির কেন্দ্রীয় দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিস শহরে। তাই চুক্তি-মত প্রতি বছর ৩রা থেকে ১৭ই জানুয়ারি, একটি করে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ভারতবর্ষে আয়োজিত হয়। এর আবার দুটি ভাগ আছেঃ প্রথমটি হল 'আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবং দ্বিতীয়টি 'ফিল্মোৎসব'। প্রতি এক বছর বাদ দিয়ে এই ফিল্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজে ১৯৭৮, বাঙ্গালোরে ১৯৮০ এবং এবার কলকাতায় ১৯৮২-তে। মধ্যবর্তী বছরগুলিতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ব্যবস্থা থাকে, যেমন দিল্লীতে একটি হয়ে গেল ১৯৮১ সালে। ঐ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অন্যান্য সব বিভাগের সঙ্গে থাকে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, যেটি হল—'প্রতিযোগিতামূলক ছবির প্রদর্শনী এবং তার বিচার ও পুরস্কার-প্রদান সংক্রান্ত অনুষ্ঠান'। এধারে, ফিল্মোৎসবের সমগ্র অনুষ্ঠান সূচীতে কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক কোনো বিভাগ থাকে না। শুধুমাত্র প্রদর্শিত হয় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ধরনের ছবি যা চলচ্চিত্র জগতে বিভিন্ন কারণে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বা করতে পারে।

এবারে ছিল কলকাতার পালা, তাই ফিল্মোৎসব '৮২-র আয়োজন ছিল কলকাতায়। বিভিন্ন শাখায় একত্রে আনুমানিক দুশো ফিল্ম প্রদর্শিত হয়েছে—যা কলকাতারই গর্ব করার বিষয়। কেননা, সংখ্যায় এত বেশি ছবি আজ পর্যন্ত এদেশের কোনো চলচ্চিত্র উৎসবেই দেখানো হয় নি।...অনেকগুলি শাখার দ্বারা সংগঠিত ছিল ফিল্মোৎসবের অনুষ্ঠানসূচী, সেগুলি হল—বিদেশী ছবি, (প্রধান শাখা), বিদেশী ছবি (রেট্রোসপেক্টিভ), স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি (বিদেশী ও ভারতীয়), ভারতীয় প্যানোরমা, ভারতীয় রেট্রোস্-পেক্টিভ, বিদেশের ১৬ মিলিমিটারের অনেকগুলি ছবি, পরিচালক-প্রযোজক-অভিনেতৃদলের সঙ্গে দৈনিক সাংবাদিক সম্মেলন, উদ্বোধন ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ইত্যাদি, বড় একটি আলোচনাচক্র এবং একটি ফিল্ম-বিক্রীর বাজার (ফিল্ম মার্কেট)।

বিদেশী ফিল্মের প্রধান শাখায় ছবির সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০। কূটনৈতিক সম্পর্কসূত্রে আনু-

সোভিয়েত ইউনিয়নের 'বডিগার্ড' থেকে
একটি স্থির চিত্র

মানিক ১৪৪টি দেশের মধ্যে প্রায় ৩৬টি দেশের ছবি এবারে আসে। এই বিভাগে যে সকল বিখ্যাত পরিচালকদের ছবি প্রদর্শিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেনঃ ইতালির ফ্রানসেসকো রোসি, সাওরো বোলোগনিনি, সার্জিও চিট্টি ও লুইগি কমেনসিনি; সুইজারল্যান্ডের অ্যালান ট্যান্নার ও মার্কাস ইসহুফ; স্পেনের কার্লো সাউরা; চেকো-শ্লোভাকিয়ার কারেল কাসিনা; ব্রাজিলের হেক্টর বেবেঙ্কো; আর্জেন্টিনার ফার্নান্দো আইয়ালা; অস্ট্রিয়ার টিটাস লেবের; পোল্যান্ডের ক্রীস্টফ জানুসি ও ফেলিক্স ফল্ক; ফ্রান্সের ক্লাদ লেলুচ; পশ্চিম জার্মানির মার্গারেট ভন ট্রোট্টা, বার্নহার্ড সিঙ্গেল ও রেইনহার্ড হফ; হাঙ্গেরীর ইসভান জাবো; জাপানের ক্যানেটো শিন্ডো, ওজি ইয়া-সাদা ও শোহেই ইসাসুরা; ফিনল্যান্ডের রাউনি মোল্লবার্গ; ইরাণের রফিগ পুয়া; সেনেগালের আউসমেন সেমবেন; আমেরিকার জন হাস্টন, মিলোস ফরম্যান, মার্টিন স্কোরসেসে, সি ভনি লুমে ও জন বুরোরম্যান; ব্রিটেনের ওট্টো প্রেমিং-গার, কেন লোচ, ডেভিড গ্ল্যাডওয়েল, জন শ্লেসিংগার ও নিকোলাস রেগ। এই বিদেশী

ছবিগুলির সঙ্গেই দেখানো হয়েছে আনুমানিক ১৪টি দেশের ৩০টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি।

ব্রিটেনের ছবি 'এ পোর্টেট অব দি আর্টিস্ট এস. এ. ইয়ম্যান'-এর একটি দৃশ্য

বিদেশী রেট্রোসপেক্টিভ (এক-একজন পরিচালকের গুচ্ছছবি) বিভাগে তিনজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক যথাঃ জাঁ-লুক গদার (১৪টি), মিকলোস জানসো (৬টি) ও ইলম্যাজ গুন্যে (বা, গণি?)-র ৪টি, অর্থাৎ একত্রে সর্বমোট ২৪টি ছবি। এ'দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইলম্যাজ গুন্যে।

ভারতীয় প্যানোরমায় ছিল সম্প্রতি-প্রস্তুত ২১টি ছবি। ভাষাভিত্তিকভাবে সেগুলিঃ মারাঠী, কানাড়া, হিন্দি, বাংলা, মালয়ালম, তামিল, তেলেগু, ইংরাজি ও মণিপুরী। যেসব প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় পরিচালকদের ছবি দেখানো হয়েছে, তাঁরা হলেনঃ সত্যজিত রায়, মৃণাল সেন, এম. এস. সথ্যু, উৎপল দত্ত, শ্যাম বেনেগাল, কে. বালাচন্দর, জি. অরভিন্দন ও মুজাফ্ফর আলি। এছাড়া, নতুন উল্লেখযোগ্য পরিচালকদের নাম ঃ অমল পালেকর, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন, নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ভিক্টোর ব্যানার্জি ও অশোক আহুজা।

১৬ মিলিমিটার ক্যামেরায় গৃহীত কয়েকটি বিদেশী ছবির একটি পৃথক প্রদর্শন ব্যবস্থা ছিল। এটি ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (যাঁদের তত্ত্বাবধানে এই উৎসবগুলি আয়োজিত হয়)-এর কর্তৃপক্ষের একান্তই অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা বলব। এ বিভাগটিতে ছিল ব্রিটেন, সেনেগাল, কিউবা, কামেরুন, কঙ্গো, আমেরিকা ও ফ্রান্সের ১৬ মিলিমিটারের কয়েকটি ছবি। এই ছবিগুলি—গবেষণা ও চলচ্চিত্র-অধ্যয়নকর্মে লিপ্ত সকল উৎসাহীজনের কাছে খুবই প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে।

ভারতীয় রেট্রোসপেক্টিভ-এ প্রদর্শিত হয় ১৯৩০-'৪০-এর কিছু স্মরণীয় ভারতীয় ছবি, যার মধ্যে আবার একটি ভাগ ছিল প্রয়াত শিল্প-নির্দেশক ও স্রষ্টাপুরুষ বংশী চন্দ্রগুপ্তের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কয়েকটি পুরনো ছবি যথাঃ ফণী মজুমদারের 'স্ট্রীট সিঙ্গার', ভি. শান্তারামের 'আদমী', জ্ঞান মুখার্জির 'কিসমৎ', সত্যজিত রায়ের 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' এ শাখায় ছিল।

গর্কিসদনে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাচক্রটি। বিষয় ছিলঃ '২০০০ খ্রীষ্টাব্দে সিনেমা।' এই অসাধারণ আলোচনাচক্রটির সূচনা ও সম্পাদনা করেছিলেন শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী। সমাজ, সভ্যতা, রাজনীতি ও মানুষের ওপর চলচ্চিত্রের ব্যাপক প্রভাব প্রসঙ্গে এই আলোচনাটিতে এ শতাব্দীর শেষে ফিল্ম ও ভি. ডি. ও'র নানাদিক বিভিন্ন বক্তারা উত্থাপন করেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন দেশী ও বিদেশী আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা, যথাঃ বি.বি.সি'র জন ওয়ারিংটন, গার্ডিয়ান পত্রিকার ডেরেক ম্যালকম, সুইস চিত্রপরিচালিকা প্যাট্রিসিয়া মোরাজ, আমেরিকার দুই বিশেষজ্ঞ জোসেফ বেলফোর্ড ও জিন মসকোইজ, লন্ডনের কেন্ লাসিন, কার্টুনিস্ট আর. কে. লক্ষ্মণ, মৃণাল সেন, অমিতা মালিক, এস. ভক্তবৎসলম প্রমুখ আরো কয়েকজন।

পশ্চিম জার্মানীর 'পুট অন আইস'-এর একটি স্থির চিত্র

৬.

বিদেশী ও ভারতীয় ছবিগুলির মধ্যে যেগুলি বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে সেগুলির আলোচনা বারান্তরে করবার ইচ্ছা থাকলো। সংক্ষেপে এটুকু শুধু বলে রাখি আপাতত যে, বিদেশী ছবিগুলির চরিত্র ও চেহারা (কয়েকটি বাদে) এবার প্রায় নিরাশ করেছে। একমাত্র গুচ্ছ-ছবির প্রদর্শনীতে, ইলম্যাজ গুন্যে ভারতীয় দর্শকদের মধ্যে প্রচণ্ড আগ্রহের সৃষ্টি করেছেন। ইনি তুরস্কের একজন অসমসাহসী পরিচালক।
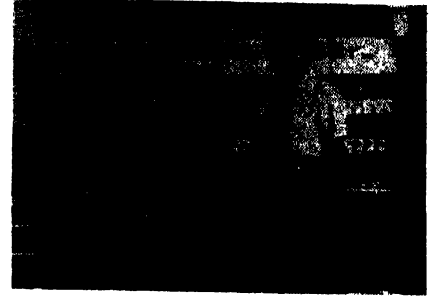
হংকং-এর ছবি 'ফাদার এ্যান্ড সন'-এর একটি মুহূর্ত

এ'র বিষয়েও পরবর্তী সুযোগে আলোচনা করব। আর, গৌরব বোধ করেছি ভারতীয় প্যানোরমার ছবি দেখে। এতে সদ্যনির্মিত প্রায় ২১টি ছবির মধ্যে ১৪টি ছবিই উৎকর্ষের দিক থেকে প্রশংসনীয়। এখানে শুধু সংকেতটুকু জানিয়ে রাখলাম মাত্র।

অসঙ্গতির একটা ব্যাপার চোখে পড়েছে। এত বড় উৎসবে কিন্তু কোথাও ভারতীয় চলচ্চিত্রের 'নতুন সিনেমা'র পথিকৃৎ অনন্য চিত্রপরিচালক ও স্রষ্টা প্রয়াত ঋত্বিককুমার ঘটকের নামোল্লেখ পর্যন্ত পেলাম না! এই অসামান্য ত্রুটির বোধ-করি কোনো জবাবদিহি-ই থাকতে পারে না। শুধু বিস্ময়কর নয়, এটাকে বিলক্ষণ বিসদৃশ বলে মনে হয়েছে।

৭.

ফিল্মোৎসবের এই পরিচিতিমূলক নিবন্ধটির পরিসমাপ্তি টানার পূর্বে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কাজটা সেরে নিতে চাই। উৎসবে যে ছোটখাট অন্যান্য ভুলত্রুটি ঘটেছে তা আকারে-প্রকারে এত বিস্তৃত একটি উৎসবের তুলনায় কিছু নয়। তাই ফিল্মোৎসব '৮২কে সর্বসার্থক করার জন্য স্থানীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সযত্ন ব্যবস্থা, দর্শক-সমালোচক-সাংবাদিক ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ধৈর্য ও আগ্রহ এবং সর্বোপরি ফিল্মোৎসব কর্তৃপক্ষ-কর্মীদের (এ'দের মধ্যে উল্লেখ্য হলেনঃ সর্বশ্রী এম. ভি. কৃষ্ণস্বামী, এইচ. বি. লাল, মহম্মদ মোইজুদ্দিন, পি. এন. পরঞ্জন এবং সুব্রত নাগ) সদাতৎপর সহযোগিতার দৃষ্টান্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

স্থিরচিত্রগুলির জন্য কৃতজ্ঞতাঃ প্রেস ইনফরমেশান ব্যুরো

লোকচিত্রকলা

একদিন প্রতিদিন

শিল্পী : ওয়ালেকুজ্জা

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

কয়লা

শক্তি উৎসগুলির মধ্যে কয়লা হল সবচেয়ে বেশী পরিচিত। কয়লা এমন একটি জৈব জড় পদার্থ যা থেকে সরাসরি তাপশক্তি পাওয়া যায়। জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও কয়লা থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় পদার্থ পাওয়া যায়।

আজ আমরা পৃথিবীকে যেমন দেখছি, পৃথিবীর চেহারা চিরকালই এরকম ছিল না। নানারকম প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে পৃথিবী আজকের এই অবস্থায় এসেছে। পৃথিবীতে এক সময় বহু বহু গাছ ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং সাধারণভাবে ঝরে পড়া গাছের পাতা এবং কান্ড এক সময় আস্তে ভূপৃষ্ঠের নীচে চলে যায় এবং জমতে থাকে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে সেলুলোজ, লিগানিন, মোম এবং রজন এই চারটি রাসায়নিক পদার্থ হল গাছ বা উদ্ভিদ দেহের প্রধান উপাদান। উদ্ভিদের দেহাবশেষ থেকে সেলুলোজ পদার্থটি সবার আগে জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে লিগানিন, মোম ও রজন জাতীয় উপাদানগুলিও হিউমিক এসিডে রূপান্তরিত হয়। পলিমারাইজেশন ও অক্সিডেশন প্রক্রিয়ার ফলে হিউমিক এসিড থেকে হিউমাস নামক একটি পদার্থ সৃষ্টি হয়। হিউমাস হল কাদার মত থকথকে একটি পদার্থ। হিউমাস থেকে জলীয় পদার্থ অন্তর্হিত হলে অর্থাৎ হিউমাস শুকিয়ে গেলে পিট নামক একটি পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই পিটকে বলা যায় কয়লার প্রাথমিক অবস্থা। বহুযুগ আগে পৃথিবীর উপরকার উদ্ভিদের দেহাবশেষ থেকে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় পিট্ উৎপন্ন হয়। পরবর্তী সময়ে এই পিট্-এর উপর জমা পলির স্তরের চাপ, পৃথিবীর ভিতরের প্রচন্ড উত্তাপ, বায়ুর অভাব এবং বদ্ধজলের উপস্থিতিতে পিট্ জাতীয় পদার্থের অঙ্গারীভবন (carbonisation) শুরু হয়। অঙ্গারীভবনের প্রাথমিক অবস্থায় তৈরী হয় বিটুমেন। উদ্ভিদদেহের প্রোটিন জাতীয় উপাদানের সঙ্গে মোম ও রজনজাতীয় উপাদানগুলির একত্রীভবনের ফলেই বিটুমেন তৈরী হয়। অঙ্গারীভবন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয় কয়লা। কয়লার জন্মবৃত্তান্ত থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে কয়লা মাটির নীচে থাকে। প্রথম কবে মাটি খুঁড়ে মানুষ কয়লা আবিষ্কার করেছিল তা জানা যায় না। তবে প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং চীনে কয়লার ব্যবহার হত বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। থিওফাস্ট-এর রচনা থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে গ্রীস দেশে কয়লার প্রচলন ছিল। যতদূর জানা যায় মাটি খুঁড়ে কয়লা আহরণের কঠিন কাজটি প্রাচীন যুগে সম্পাদিত হত না। মাটি ধ্বসে গিয়ে অথবা ক্ষয় হয়ে কয়লার স্তর অনাবৃত হয়ে পড়লে সেই কয়লা কেটে নিয়ে ব্যবহৃত হত। সুতরাং বলাই বাহুল্য সে যুগে কয়লার ব্যাপক ব্যবহার হত না। অঞ্চলভিত্তিক সামান্য ব্যবহার ছিল। ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর আশেন Aachen) সহরের অগাস্টিন চার্চের পাদ্রীরা প্রথম কয়লার খনি চালু করেন। অর্থাৎ সংগঠিত উপায়ে কয়লার খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের কাজ শুরু হল। এর কিছুদিনের মধ্যেই ইংলন্ডেও কয়লা খনির কাজ শুরু হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও দ্বাদশ শতাব্দীতে কয়লা খনির কাজ শুরু হয়। তবে শিল্প-বিপ্লবের আগে পর্যন্ত কয়লার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। শিল্প-বিপ্লবের আগে জ্বালানী ছাড়া অন্যান্য কাজে কয়লা ব্যবহারের বিস্তৃতি হয় নি। তবে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে ডডলেই নামক জনৈক ইংরেজ আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশনের জন্য কয়লা ব্যবহার করেন। এর আগে পর্যন্ত আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশনের কাজে কাঠকয়লা ব্যবহৃত হত। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল সাধারণ কয়লা ব্যবহার করে নিষ্কাশিত লোহার মান কাঠ-কয়লার সহায়তায় নিষ্কশিত লোহার চেয়ে খারাপ। সুতরাং গবেষণা চলতে লাগল। অবশেষে ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডার্বি কর্তৃক কোক কয়লা আবিষ্কারের পর দেখা গেল আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশনের জন্য কোক্ কয়লা ব্যবহার করা ভাল। কারণ, এভাবে নিষ্কাশিত লোহা অনেক উৎকৃষ্ট। তারপরে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে জেমস্ ওয়াট কর্তৃক বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর কয়লার ব্যবহার অনেক বেড়ে যায়। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কয়লা থেকে প্রাপ্ত কোল-গ্যাসের সাহায্যে বাতি জ্বালানো হয়। ডুয়োডোনাল্ড এই পদ্ধতির স্রষ্টা। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডের বার্মিংহাম শহরের কাছে দোহো নামক একটি জায়গায় প্রথম কোল গ্যাস তৈরীর কারখানা স্থাপিত হয়। কোলগ্যাসের আলোয় রাস্তা আলোকিত করার কাজ শুরু হয় ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে। সাইমন কার্ভস কোকচুল্লী জার্মানীর গেলসেনকির্সেন-এ হুদেনার কর্তৃক ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১৮৮২তে কোকওভেন ব্যাটারী প্রবর্তিত হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক কর্তৃক কোলগ্যাস থেকে বেঞ্জল আবিষ্কৃত হয়।

কয়লা থেকে কোলগ্যাস, আলকাতরা, কোক-বেঞ্জল, অ্যামোনিয়া টলুয়িন প্রভৃতি বহুবিধ পদার্থ পাওয়া গেলেও কয়লার মূল প্রয়োজন জ্বালানী ক্ষেত্রে। রান্না অথবা বাষ্পীয় ইঞ্জিনের জ্বালানীর কাজে কয়লা ব্যবহার পুরনো হলেও আধুনিক যুগে কয়লা ব্যবহারের প্রধান ক্ষেত্র হল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান উপাদান কয়লা। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলা যাবে। আপাততঃ কয়লার শ্রেণীবিভাগটুকু জানা যাক।

বিজ্ঞানী রেনো (Regnault) কয়লাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। ১। অ্যানথ্রাসাইট (Anthracite); ২। লিন বা ছোট শিখার বিটুমিনাস (Lean or short flame bituminous); ৩। বিটুমিনাস্ স্মিথি (Bituminous Smithy); ৪। দীর্ঘশিখার বিটু-মিনাস্ (Long flame bituminous); ৫। শুষ্ক দীর্ঘশিখা (Dry long flame)

পরবর্তীকালে অধ্যাপক বোন (Bone) কয়লাকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন—

১। লিগনাইটঃ এই জাতীয় কয়লা কোক তৈরীর অনুপযোগী। রিভার্বাটারি ফার্নেসে এই কয়লা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

২। বিটুমিনাস্ঃ এই কয়লা জ্বালালে দীর্ঘ-শিখা হয়। এই কয়লা কোক তৈরীর জন্য আদর্শ। এই ধরনের কয়লা থেকে কোলগ্যাসও পাওয়া যায়। বয়লারে (বাষ্পীয় ইঞ্জিনে বা বাষ্পের প্রয়োজন আছে এমন যন্ত্রে জলকে বাষ্পে পরিণত করা হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে অর্থাৎ যে যন্ত্রে জল ফুটিয়ে বাষ্প করা হয়) এই ধরনের কয়লা ব্যবহৃত হয়।

৩। সেমিবিটুমিনাস্ঃ ছোট শিখা সৃষ্টিকারী। এই ধরনের কয়লায় কোক তৈরী হয় না তবে বয়লারে কাজে লাগে।

৪। এনথ্রাসাইট্ঃ এই কয়লা থেকেও কোক তৈরী হয় না তবে সাধারণ জ্বালানী হিসাবে এই জাতীয় কয়লা বহুল ব্যবহৃত হয়।

মার্কিন যুক্ত স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এ্যাসো-সিয়েশন কিন্তু কয়লাকে প্রধান চারভাগে ভাগ করেছে। এগুলি হলঃ ১। অ্যানথ্রাসাইট্, ২। বিটুমিনাস্, ৩। সাব বিটুমিনাস্ ও ৪। লিগনাইট্।

অ্যানথ্রাসাইটকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ (ক) মেটা অ্যানথ্রাসাইট্, (খ) নর্মাল অ্যানথ্রাসাইট্, (গ) সেমি অ্যানথ্রাসাইট্।

বিটুমিনাসকে পাঁচভাগে ভাগ করে নাম দেওয়া হয়েছেঃ (ক) লো ভোলাটাইল, (খ) মিডিয়াম ভোলাটাইল, (গ) হাই ভোলাটাইল-এ, (ঘ) হাই ভোলাটাইল-বি এবং (ঙ) হাই ভোলা-টাইল-সি।

বিটুমিনাস্ জাতীয় কয়লাকে এ, বি ও সি এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে।

লিগনাইটকে দুভাগে যথাক্রমে ব্রাউন কোল ও লিগনাইট্-এ ভাগ করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের একটি

সংস্থা কোল গ্রেডিং বোর্ড কয়লাকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। এগুলি হলঃ ১। সিলেক্টেড, ২। ফার্স্ট, ৩। সেকেন্ড, ৪। থার্ড। প্রতিটি ভাগকে আবার কম ও বেশী উদ্বায়ী হিসাবে দুটি শ্রেণীতে (লো ভোলাটাইল ও হাই ভোলাটাইল) ভাগ করা হয়েছে।

আধুনিক যুগে কয়লার প্রধান প্রয়োজনীয়তা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে,—একথা আগেই বলেছি। আর বিদ্যুতের চাহিদা যেভাবে বাড়ছে তাতে কয়লার সঞ্চয় দিন দিন অতি দ্রুত হারে ফুরোচ্ছে। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পল এভারিট পৃথিবীতে ব্যবহারযোগ্য, অব্যবহারযোগ্য, উত্তোলনযোগ্য, অনুত্তোলনযোগ্য সমস্ত প্রকার কয়লার মজুতের যে হিসাব দিয়েছেন সেই অনুযায়ী মোট ১৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৪০০ কোটি টন কয়লা সারা পৃথিবীতে আছে। এই হিসাব সর্বজনস্বীকৃত। তবে এই কয়লার কতটুকু ব্যবহার করা যাবে সেই নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহল দ্বিধাগ্রস্ত। তবে সর্বনিম্ন যে পরিমাণ সম্পর্কে সবাই একমত তা হল—পৃথিবীতে মোট ৭ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টন ব্যবহারযোগ্য কয়লা আছে। আর ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ হল—১১ হাজার ৫০০ কোটি টন নন্ কোকিং কয়লা (যে কয়লা কোক হিসাবে ব্যবহৃত হয় না) এবং ১৮০ কোটি টন কোকিং কোল।

মাটির নীচে ৩০ সেন্টিমিটার থেকে ১৮০০ মিটার গভীরতায় কয়লা থাকে। অতএব কয়লা সংগ্রহ করতে গেলে খনন প্রক্রিয়া অপরিহার্য। কয়লা সাধারণতঃ দুভাবে খনন করা হয়। যে জায়গায় মাটির নীচে কয়লা থাকে সেখানে একটা পুকুরের মত করে মাটি কেটে তারপর কয়লা কাটা শুরু হয়। অর্থাৎ কয়লা কাটতে কাটতে ভূগর্ভে প্রবেশ করা হয়। এই ধরনের খননকার্য সাধারণতঃ যেখানে কয়লা মাটির সামান্য নীচে থাকে সেখানেই করা হয়। পুকুর কাটার সময় যেমন ঝুড়ি করে মাটি পাড়ে ফেলা হয় এখানেও তেমনি কয়লা কেটে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উপরে পাঠান হয়। এই ধরনের খনিতে নিরাপত্তা বেশী থাকে।

দ্বিতীয় ধরনের কয়লার খনিতে মাটির নীচে সুড়ঙ্গ করে কয়লা কাটতে কাটতে এগোন হয় এবং গভীরে প্রবেশ করা হয়। উপরের মাটির স্তরকে ধরে রাখার জন্য মধ্যে মধ্যে কয়লারই স্তম্ভ রেখে যেতে হয়। এই ধরনের কয়লা খনিতে নিরাপত্তার দরকার বেশী। প্রথমতঃ, একটা বদ্ধ জায়গায় কর্মীদের কাজ করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, কয়লা কাটতে কাটতে এগোনর সময় অনেক সময় কয়লার স্তরে ধ্বস নামে। তৃতীয়তঃ, অনেক সময় ভূগর্ভের কয়লার স্তরের নীচে থাকা জল খনির মধ্যে প্রবেশ করে বিপদ ঘটায়। এছাড়া যান্ত্রিক ত্রুটির ফলেও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা এই ধরনের খনিতে বেশী। উদ্ভিদের পরিবর্তিত আকৃতি ও প্রকৃতি হল কয়লা। কয়লা সংগ্রহ যতই শক্ত হোক, কয়লা মানব সভ্যতার এক প্রধান ভিত্তিস্বরূপ। শুধুমাত্র শক্তি উৎস ছাড়াও কয়লার ব্যাপক ব্যবহার কয়লার গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে এবং কয়লার ব্যবহার যেভাবে বাড়ছে তাতে পৃথিবী কয়লাশূন্য হতে খুব বেশী সময় লাগবে না।

প্রসঙ্গতঃ জেনে রাখা ভাল, ১ মেট্রিক টন অ্যানথ্রাসাইট বা বিটুমিনাস জাতীয় কয়লা থেকে ৭০ লক্ষ ৪০ হাজার কিলো-ক্যালরি তাপশক্তি পাওয়া যায়। আর লিগনাইট জাতীয় কয়লার ক্ষেত্রে প্রতি টনে ৩৫ লক্ষ ১০ হাজার থেকে ৪৭ লক্ষ কিলো-ক্যালরি তাপ পাওয়া যায়।

[২,০০০ সালের মধ্যে সবার স্বাস্থ্য : ৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

উত্তরপ্রদেশ কেরল থেকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে থাকলেও কেরল থেকে উত্তরপ্রদেশে গড় মৃত্যুহার বেশী। স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাদের চেতনার অভাব ও শিক্ষার অনগ্রসরতাই এর মূল কারণ। ভারতবর্ষে প্রতি বছর ২৫০০০ শিশু 'ভিটামিন এ' অভাবে অন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এ ছাড়া ৫ বছরের আগে শতকরা ২৮ জন শিশুর মৃত্যু ঘটেছে। শুধু অপুষ্টিই একমাত্র কারণ নয়—পরিসংখ্যানে জানা গেছে ১০টি গ্রামের মধ্যে ভারতবর্ষে ১টি মাত্র গ্রামের বেশী বিশুদ্ধ পানীয় জল পানের সুযোগ পায় না।

স্বাস্থ্য রক্ষার প্রচলিত যে শর্ত "সুষম খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল, পরিধেয়, বাসস্থান, খেলাধুলা" ইত্যাদি বোঝায় এসব সুযোগ ভোগের প্রায় কোনকিছুই এদের নাগালের মধ্যে নেই।

ভারতবর্ষের বেশ কয়কটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এইসব সমস্যার সমাধান তো করতে পারেই নি বরং সময়ের ব্যবধানে আরো তীব্রতা দান করেছে। তাই বর্তমান এই অবস্থায় অর্থনৈতিকভাবে পেছিয়ে পড়া, অশিক্ষিত, নিয়তিনির্ভর, অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে স্বাস্থ্যের অধিকার দিতে হলে দেশের সাত লক্ষ গ্রামে বসবাসকারী জনসাধারণের প্রতি জাতীয় পরিকল্পনায় সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবেই শ্লোগান কাজে রূপায়িত হবে অন্যথায় নয়।

শুধু স্বাস্থ্যনীতির ক্ষেত্রেই নয়—জনজীবনের মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে এই হতাশাজনক অভিজ্ঞতা প্রতিটি নাগরিক জীবনের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন-সম্ভাবনা ও পরিকল্পনাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে—তাই দেখা গেছে—সমাজতন্ত্রের শ্লোগানে উৎপাদক ভোগের অধিকার থেকে উৎখাত হয়েছে ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েছে। 'জনশিক্ষার' শ্লোগানে নিরক্ষরতা কমেনি। 'সবুজ বিপ্লব' নিরন্নের মিছিলকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করেছে। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি কল্যাণকর শ্লোগান জনবিরোধী রূপ পেয়েছে বাস্তব প্রয়োগ ও রূপায়নের ক্ষেত্রে।

তাই "২০০০ শতাব্দীর মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য"—একে বাস্তব রূপ দিতে হলে অতীতের ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। জনস্বাস্থ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার—

ক। স্বাস্থ্য সম্পর্কে গণউদ্যোগ সংহত করে প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলা।

খ। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটান।

গ। দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির নব মূল্যায়ন ঘটিয়ে তার প্রয়োগ সাধন।

ঘ। জীবনদায়ী ওষুধ সুলভে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা।

ঙ। স্বাস্থ্যের অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা।

চ। খাদ্য, বস্ত্র, পানীয় জল ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করা।

ছ। জাতীয় স্বাস্থ্য-নীতি প্রণয়ন করা ইত্যাদি।

এইসবগুলিই জনস্বাস্থ্য রক্ষার অনিবার্য শর্ত হিসেবে ধরা যেতে পারে। তাই স্বাস্থ্য রক্ষার শ্লোগানকে এইসব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যায় না। "২০০০ শতাব্দীতে সকলের জন্য স্বাস্থ্য" এই শ্লোগানকে বাস্তব রূপ দিতে হলে শুধু সরকারী উদ্যোগের উপর ভরসা করলে চলবে না সচেতন ও সংগঠিত গঠনমূলক গণ আন্দোলনের ধারার সঙ্গে একে যুক্ত করতে হবে এবং সকলকে সক্রীয়ভাবে সেই আন্দোলনের শরীক হতে হবে। অন্যথায় অতীতের আর দশটা শ্লোগানের মতো এই শ্লোগানও দিনের পর দিন বিবর্ণ ও রক্তশূন্য হয়ে পড়বে।

[এক চিঠে : ১৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

যাই হোক, আমার ওপর তুমি যেন আবার রাগ কোরো না। গ্রীষ্মাবাসে তোমার যাতে একঘেয়ে না লাগে আমি তার ব্যবস্থাও তো করে দিয়েছি। আমি মিতিয়াকেও একই চিঠি দিয়েছিলাম। কিরে, মিতিয়া, গ্রীষ্মাবাসে যাস নি?

মিতিয়া হেসে উঠল। সেইসঙ্গে হাল্কা হয়ে গেল ঘরের থমথমে আবহাওয়াটাও।

সময়ের অরণ্যে একলব্য/বীরেশ ঘটক
স্বপ্নদীপ, ৭ই শীতলা লেন, কলকাতা-৫
মধ্যরাতের গান/সমর চন্দ
একলব্য, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর-৩

সত্তরের দশক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি ধারাকে নতুন করে প্রাণপ্রবাহী করেছে। বিদগ্ধজন হয়তো বা ভ্রূকুঞ্চন করতে পারেন—কবিতার ব্যাকরণে এরকমটি হয় কিনা চিন্তা করতে বসতে পারেন—কিন্তু 'এখন ছন্নছাড়া কবিতারা/খালি পায়ে হাঁটে।' এইসব ছন্নছাড়া কবিতা খালিপায়ে হাঁটতে হাঁটতে কখনো দেখে নেয় বুকের আগুন ঠিক আছে কিনা—কেননা ঝড়ে-জলে-বৃষ্টিতে-ঝাপটায় নিরুৎসাহ শৈত্যের প্রবাহে তাকে দরকার। কখনো বা বিদ্রূপ করে অট্টহাসে ফেটে পড়তে তার ইচ্ছা হয়ঃ 'বাপু হে, বিপদগ্রস্ত হবার আগেই/বাসপ্রস্থের রাস্তাটুকু/দেখে রাখা ভালো'। এই ধারাকে আমরা একটু সহজ করে বলতে পারি প্রতিবাদী ধারা। যে ধারা জীবনের রূঢ় সত্যের মধ্য দিয়ে মাথা উঁচু করে হাঁটে—চারপাশের ঘটে-যাওয়া সব কিছুকে আত্মস্থ করে জন্ম দেয় নতুন অবয়ব। 'সময়ের অরণ্যে একলব্য' সেই ধারারই একটি পরিণত ফসল।

ছেচল্লিশটি কবিতার সবগুলিই হয়তো রসোত্তীর্ণ নয়। কিন্তু সমগ্র কাব্যগ্রন্থটি একটি আবেদন তুলে ধরে। প্রতিবাদী কবিতার ধারায় একটি নেতিবাচক দিক আছে তা কোনো ড্রয়িংরুমে বসে বিপ্লবের বুলি কপচানোর অভ্যেস। সুন্দর শব্দচয়ন, রূপকল্প, নিখুঁত ছন্দ, সমাজ বদলানোর কাব্যসম্মত আহ্বান—সবকিছু আছে কিন্তু সবশেষে মনে হয় 'আকাশে আকাশে ধ্রুবতারায়' বিদ্রোহে পথ মাড়াবার মতো হয়ে যাচ্ছে না তো! আলোচ্য কবি সেদিকে পুরোপুরি অসচেতন নন। 'লিখতে আর বলতে গিয়ে' তার নিশ্চিত সমর্থন। এই সমস্ত বিপ্লববাজদের কথা মনে রেখে তাঁর এই তীব্র শ্লেষাত্মক কবিতাটি এই কাব্যগ্রন্থের অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা। 'অসুখ', 'আমি পারি', 'সময়ের অরণ্যে একলব্য' 'ঘুণপোকা' যে কোনো প্রতিষ্ঠিত কবিতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে অনায়াসে।

আবার সহজচালে লেখা ব্যঙ্গকবিতাতেও লেখক পিছপা নন। 'তিনটি ছটরা', 'অর্থবিহীন' বা 'মুখোশ' মনে রাখার মতো।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিবেদিত 'যাবার সময়' বারবার পড়ার মতো। কিন্তু মাও সে তুং ও স্তালিনকে নিবেদিত কবিতা দুটি নিষ্প্রাণ এবং যান্ত্রিক। 'অথচ বাধা কেবল/তোমাকে সম্পূর্ণ জানতে/আর যথাযথ রোপণ করতে/তোমার চিন্তার উর্বর বীজ' (মাও সে তুং-কে নিবেদিত 'তোমার চিন্তার বীজ')। কিসের বাধা—সম্পূর্ণ জানতেই বা বাধা কোথায়—কোথায়ই বা রোপণ করতে বাধা—এসব প্রশ্নগুলি আচমকা উত্থাপিত হলে পাঠকের মনেও প্রশ্ন উঁকি দেয়—তিনিও মিলিয়ে নিতে চান জীবনের সঙ্গে এবং না মিললে হোঁচট খান। স্তালিনকে নিবেদিত কবিতাটিও সেই অর্থে দুর্বল। কবিতাটির তলায় যদি 'স্তালিনকে নিবেদিত' না বলে লেনিন বা হো চি মিনকে নিবেদিত বলে লেখা হোতো কোনোই অসুবিধে হোতো না।

সবশেষে দুটি কথা। অগ্রজ বিশিষ্ট কবিদের প্রভাব রচনার ওপর পড়া দূষণীয় না হলেও বাঞ্ছিত নিশ্চয় নয়। এই কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় স্পষ্টতঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে মনে পড়ে যায়। 'ঘুণপোকা' বা 'নিরালম্ব' কি সুভাষের পরিচিত রচনার কথা মনে পড়ায় না?

আর শব্দচয়নের ব্যাপারে আরো সতর্ক হওয়ার অবকাশ রয়েছে। আজকের কবিতায় শব্দ আসে প্রতিদিনের জীবনচর্যার মধ্য থেকে—তার ব্যাপ্তির উৎসও সেই জীবন। 'স্বপ্নের বৃক্ষ' 'বুকের অরণ্য', 'দুরভাষ'—সংশ্লিষ্ট কবিতার অবাধ গতিময়তায় বাধার কারণ।

তবে এইসব কথা মনে রেখেও এটা স্বীকার করতেই হবে সমগ্র গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে কবি নিজের কণ্ঠস্বরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। সুন্দর প্রচ্ছদ (দিব্যেন্দু ভদ্র), ঝকঝকে ছাপার মধ্য থেকেও তাই আমাদেরও মনে বেদনাবোধ সঞ্চারিত হয়ঃ 'রক্তাল্পতায় ভুগছে আমার মা,/অথচ যা যা করণীয়/করতে পারিনি তা'। এই 'অসুখের' মূলকে উৎপাটন করতেই কবির পরিক্রমণঃ 'আমরা কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে.../হাঁটতে হাঁটতে......' (হাঁটতে হাঁটতে)—।

তুলনায় 'মধ্যরাতের গান' দুর্বল। কবির আন্তরিকতা ধরা পড়ে ছত্রে ছত্রে। তারই মাঝখান থেকে হঠাৎ চমকে দেয় 'মধ্যরাতের গান' যখন কবি বলে ওঠেন 'আমার নিরাপত্তা তোমার হাতে ...প্রিয়তমা...'। অথবা 'শেফালিকাকে দুছত্র'র মতো কবিতা। এলোমেলো কবিতা নির্বাচনের ফলে সমগ্র কাব্যগ্রন্থটিতে কোনো চরিত্র দানা বেঁধে ওঠেনি। অবশ্য কবিও এতসব ভাবেননি। 'মনে যখন যে ভাব এসেছে তাকেই কাগজে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি' (কবির নিজের কথায়)। কিন্তু পাঠককে তো ভাবতে হয়—এটাই যে মুশকিল। আশা করবো পরবর্তী গ্রন্থে কবি এ বিষয়ে সচেতন হবেন।

রজত বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্পগুচ্ছ
লু সুন জন্মশতবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা/
শীত ১৩৮৮

প্রথিতযশা কোন কোন ব্যক্তিত্বের জন্মশতবার্ষিকী পত্র-পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয় অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রণালী আর কৌশল যথার্থ কৌতুক ও বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'গল্পগুচ্ছ' কিন্তু সেদিক দিয়ে ব্যতিক্রম হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। টানা
সেদিক দিয়ে ব্যতিক্রম হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। টানা
চার বছর ধরে যাঁরা এই পত্রিকাকে চেনেন সেই পাঠক হিসেবে 'লু সুন জন্মবার্ষিক বিশেষ সংখ্যা' পেয়ে গর্ববোধ করবেন।

পূর্বসূরীদের গল্প—এই পর্যায়ে প্রয়াত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের 'আগুন' গল্পের পুনর্মুদ্রণে সম্পাদক দায়িত্বসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া আছে আরও দুটি গল্প। যার মধ্যে নন্দ চৌধুরীর 'অথ বন্ধুবান্ধব কথা' এক কথায় অসাধারণ। অদ্ভুত নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে কথা বলেছেন লেখক, যার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত মানসিকতার বিভিন্ন টানাপোড়েন নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। গল্পটিকে অনেক দিন মনে থাকবে। তৃতীয় গল্প 'চোরের গল্প'। লেখক মধু গোস্বামী। লেখার বাঁধুনি ও ভাষা উভয় দিক দিয়েই বেশ দুর্বল।

অন্তত চারটি প্রবন্ধ এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য ফসল। সেইসঙ্গে লু সুনের জীবন ও সাহিত্য-পঞ্জী। সুরেশচন্দ্র মৈত্রের 'তত্ত্ব ও কর্মের দ্বন্দ্বের নিরসনে লু সুন' লেখকের গভীর অনুসন্ধানী এবং বিশ্লেষক মানসিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। প্রবন্ধ রচনার ভঙ্গী যে কতটা চিত্তাকর্ষক হতে পারে এ রচনাটি তারই প্রমাণ। যার মধ্যে আমরা পেয়ে যাই তৎকালীন চীনের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ১৯৮১ সালের ঝে-জিয়াং
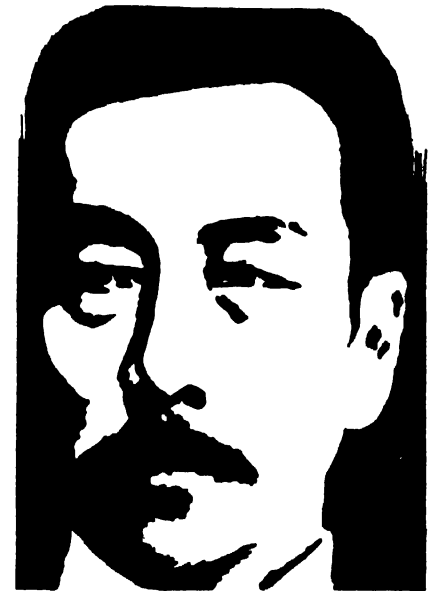
[শেষাংশ ২৭ পৃষ্ঠায়]

বিভাগীয় সংবাদ

যুবমানস আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র 'যুবমানস' আয়োজিত 'শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাষানীতি' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার দু'টি বিভাগে ছ'জন বিজয়ীকে নগদ টাকা ও মানপত্র প্রদানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন বিভাগীয় সচিব শ্রীঅজিতকুমার দত্ত চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুবকল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন অর্থমন্ত্রী ড. অশোক মিত্র।

প্রধান অতিথির ভাষণে ড. মিত্র বলেন—প্রায় পাঁচ বছর সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও জনগণের কল্যাণে অনেক ভালো কাজও করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ মানুষের আত্মউন্নয়নে এবং স্বার্থরক্ষায় বামফ্রন্টের ভাষা ও শিক্ষানীতি তার মধ্যে অন্যতম। তিনি বলেন—দেশের অধিকাংশ জনগণই দরিদ্র—যারা শিক্ষার অভাবে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিমজ্জিত। তারা নিজের অধিকারও আদায় করতে পারছে না। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিই এর জন্য দায়ী। এই বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে চেতনা দরকার। তার জন্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটান প্রয়োজন। গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষ যারা শিক্ষার আলো থেকে অনেক দূরে রয়েছে তাদের উপর বিদেশী ভাষা চাপিয়ে দিলে জনশিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হবে না এবং এক্ষেত্রে মাতৃভাষার বিকল্প কিছু ভাবাও সরকারের পক্ষে অন্যায়। বামফ্রন্ট সরকার জনস্বার্থে সেই নৈতিক দায়িত্ব পালন করেছে মাত্র। তিনি উল্লেখ করেন, শ্রেণীস্বার্থে কিছু লোক এর বিরোধিতা করছে। কিন্তু যারা সাধারণভাবে অজ্ঞতার কারণে এই কল্যাণকর উদ্যোগকে ভুল বুঝছে তাদের বিনম্রভাবে গণমুখী এই শিক্ষানীতির সপক্ষে আনার জন্য ধৈর্যের সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে।

সভাপতির ভাষণে শ্রীকান্তি বিশ্বাস বলেন, 'আমাদের সরকার চায়—কোন বিশেষ বিষয়ে শুধু সমাজের একটা অংশের মানুষ চিন্তার অধিকারী হবেন না—গোটা দেশের মানুষ তার সঙ্গে যুক্ত হবেন।' যেমন শিক্ষার কথা শুধু বুদ্ধিজীবীরা ভাববেন না তার সঙ্গে যুক্ত হবে ছাত্র-যুব-মহিলা-কৃষক-শ্রমিক সর্বস্তরের মানুষের সুচিন্তিত অভিমত। তিনি বলেন—সমাজে সবথেকে উজ্জ্বলতম সৃজনশীল, গতিময় ও অনুভূতিসম্পন্ন যুবসমাজ যাতে সমাজ জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারে, তাদের নিজস্ব মতামত প্রদান করতে পারে, যুবকল্যাণ বিভাগের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা তারই একটা সরকারী স্বীকৃতির দৃষ্টান্ত। তিনি দাবী করেন, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-যুব সমাজ অনেক সংগ্রামী ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। যার ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যখন সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, বিচ্ছিন্নতার আগুন জ্বলছে পশ্চিমবঙ্গে তার কোন প্রভাব নেই। তিনি সতর্ক করে বলেন—সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে—তার বিরুদ্ধে যুবসমাজকে সচেতন থাকতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করার যে প্রচেষ্টা আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সমগ্র মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সবাইকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা শ্রীরঞ্জিতকুমার মুখার্জী। সভাশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আবৃত্তি করে শোনান শ্রীরঞ্জত বন্দ্যোপাধ্যায়।

জলপাইগুড়ি জেলা ছাত্র-যুব উৎসব

প্রভূত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী থেকে ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলা ছাত্র ও যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হল। এই উৎসবের খেলাধুলো, মিছিল, নাটক, বক্তৃতা, আলোচনা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি ছাত্র-যুবদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। উৎসবের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান হয় মশাল দৌড় দিয়ে; এই অনুষ্ঠানে ৩৫ জন যুবক অংশগ্রহণ করে। এর পরই ঐ দিনের প্রধান অনুষ্ঠান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে ১৩৫ জন ছাত্র ও যুবক এবং ১২৬ জন ছাত্রী ও যুবতী অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতার অন্যতম আকর্ষণ ছিল ভলিবল প্রতিযোগিতা। স্থানীয় টাউন ক্লাবের মাঠে প্রচুর দর্শক উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতাকে আনন্দমুখর করে রাখে।

৫ই ফেব্রুয়ারী স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলের ১২০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর শহর পরিক্রমা দিয়ে শুরু হয় প্রভাতী অনুষ্ঠান। মধ্যাহ্নে মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীঅশোক মিত্র জেলা ছাত্র-যুব উৎসবে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই প্রদর্শনী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগ, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, সেচ বিভাগ, যুবকল্যাণ বিভাগ, দুগ্ধ প্রকল্প ইত্যাদির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। বিকালে ও সন্ধ্যায় প্রতিদিন রবীন্দ্র-ভবন মঞ্চে ও গণেশ রায় মঞ্চে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ব্লকের ২৪টি সংস্থার মধ্যে স্থানীয় সদর বালিকা বিদ্যালয় প্রথম স্থান অধিকার করে। এছাড়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নৃত্য ও সঙ্গীত উপস্থিত দর্শকদের প্রভূত আনন্দ প্রদান করে। সমাপ্তি দিবসের বিশেষ আকর্ষণ ছিল আসামের বিহু নৃত্য ও গণসংগীত। এই উৎসবে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৫ হাজার দর্শক সমাগম হয়।

জলপাইগুড়ি জেলা ছাত্র-যুব উৎসবের উদ্বোধন করছেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ড. অশোক মিত্র

ব্লক যুবকরণ সংবাদ

পুরুলিয়া জেলা

বান্দোয়ান ব্লক যুবকরণ—বান্দোয়ান পঞ্চায়েত সমিতির অধীনস্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তাগুলির দুর্গমতার জন্য (লতাপাড়া, চিরুডি ও বান্দোয়ান—এই তিনটি অংশে ভাগ করে) লতাপাড়া মাঠে গত ৩রা জানুয়ারী ফুটবল, কবাডি ও ভলিবল প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করেন জেলা যুব আধিকারিক শ্রীপুরজিৎ কর। ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীরবীন্দ্র মণ্ডল, স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির শ্রীদেবীদাস মাহাতো এবং আরো অনেক বিশিষ্ট অতিথিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মেদিনীপুর জেলা

দাসপুর-১—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের কর্মসূচী অনুযায়ী দাসপুর-১ ব্লক যুবকরণের তত্ত্বাবধানে গত ২১শে জানুয়ারী থেকে ২৬শে জানুয়ায়ী, '৮২ পর্যন্ত ব্লক যুব উৎসব কলোড়াতে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব স্থানীয় এলাকার ছাত্র-যুব ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই উৎসবে সকল শ্রেণীর মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়।

এই যুব উৎসবে খো-খো, কবাডি, ভলিবল ও ক্যারাম প্রভৃতি দলগত ক্রীড়ানুষ্ঠানে কয়েক শ' যুবক-যুবতী ও ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় যুব সংস্থা সুজানগর শীতলামাতা স্পোর্টিং ক্লাব, ডিহিপলসা নবারুণ সংঘ, টালিভাটা বানী ব্যায়াম সংঘ, চাঁদপুর রামকৃষ্ণ স্পোর্টিং ক্লাব ও টালিভাটা ভগবতী বালিকা বিদ্যালয় দলগত প্রতিযোগিতাগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহযোগিতা করে।

ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতীদের জন্য একক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাগুলিতে প্রায় এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল ৬ কিমি. দৌড় প্রতিযোগিতা ও নদীবক্ষে সাঁতার। এই প্রতিযোগিতাগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়। ২১শে জানুয়ারী বিকাল ৩টায় পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে ও পাঁচটি পায়রা উড়িয়ে ও তোপধ্বনিসহ উৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসুভাষ মাইতি। যুব উৎসবের পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য শ্রীসুনীল অধিকারী। এই দিনের সন্ধ্যায় আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান কলিকাতাস্থ রুশ বাণিজ্য প্রতিনিধির সৌজন্যে ও মস্কো নিউজ ক্লাবের উদ্যোগে মস্কো অলিম্পিকের ছায়াচিত্র প্রদর্শনী হাজার হাজার মানুষ উপভোগ করেন।

সমাপ্তি দিবস ও পুরস্কার বিতরণী উৎসব ২৬শে জানুয়ারীর বিশেষ আকর্ষণ আদিবাসীদের জন্য তীর ছোঁড়া, ভারসহ দৌড় ও আদিবাসী নৃত্যে কয়েক শ' আদিবাসী পুরুষ ও মহিলার যোগদান। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধান সভা সদস্য শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ফদিকার, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জেলা পরিষদ সদস্য শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র মাইতি। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীমন্মথ সামন্ত ও কলোড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল উৎসবকে সফল করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্থানীয় কলোড়া রবীন্দ্র মিতালী সংঘ ও বাড়জালালপুর নবারুণ সংঘের সদস্যরা উৎসবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। উৎসব কমিটির সদস্য শ্রীশিবপ্রসাদ সরকার উৎসবের পরিকল্পনা রচনায় প্রশংসনীয় ভূমিকা নেন। উৎসবের সমাপ্তি লগ্নে ব্লকের সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষে ধন্যবাদ জানান যুব আধিকারিক শ্রীহিরণ্ময় চক্রবর্তী।

হুগলী জেলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের সহযোগিতায় এবং পোলবা-দাদপুর ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী মহানাদ রামকৃষ্ণ নগর কলোনী ফুটবল ময়দানে এক আড়ম্বরপূর্ণ যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়।

৫ তারিখ সকাল ন'টার সময় স্থানীয় বিধান-সভার সদস্য শ্রীব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় 'মশাল দৌড়ের' মাধ্যমে এই উৎসবের শুভ সূচনা করেন।

স্থানীয় জনসাধারণের সীমাহীন সহযোগিতার ফলে এই উৎসব জীবন্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন স্কুল ও ক্লাবের ছেলেমেয়েরা এই উৎসবের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় আদিবাসী যুবক-যুবতীবৃন্দ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় (যেমন খেলাধুলা, নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক, বিতর্ক ও অঙ্কন) মোট ছয়শত প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিদিন উৎসব ময়দানে বিপুল জনসমাবেশ হয়।

উৎসবের সমাপ্তি দিবসে পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মাননীয় শ্রীশম্ভু টুডু মহাশয় (সভাপতি পোলবা-দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতি)।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রীভবানী মুখার্জী মহাশয়।

শ্রীআশুতোষ মুখার্জী মহাশয় (হুগলী জেলা পরিষদের সদস্য) এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে স্থানীয় জনসাধারণকে আরও বেশী করে যুব উৎসবের ব্যাপারে উৎসাহী হবার আবেদন রাখেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের ব্যাপক কর্মসূচী সম্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণকে জ্ঞাত করেন। এবং প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সব শেষে ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসুভাষচন্দ্র দাস সভাপতি, প্রধান অতিথি ও উপস্থিত সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং স্থানীয় জনসাধারণের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

২৪-পরগণা জেলা

মথুরাপুর-২—গত ১লা জুলাই ১৯৮১ প্রয়াত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মলগ্নে মথুরাপুর ২নং ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে নিউ কল্যাণ সংঘ, কুমড়াপাড়ায় ১৫ জন বেকার তরুণ-তরুণীদের নিয়ে ৬ মাসের এক টেলারিং বৃত্তি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন মথুরাপুর-২নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী এইচ. বি. পাল। গত ৬ই জানুয়ারী ১৯৮২ তারিখে এই প্রশিক্ষণের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্থানীয় ব্লক যুব আধিকারিক সহ উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, রায়দিঘী শাখার প্রতিনিধি ও অন্যান্য স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি অতিরিক্ত কর্ম-সংস্থান প্রকল্পের অধীন ১৫ খানি সেলাই মেশিন দেওয়ার আশ্বাস দেন এবং ব্লক যুব আধিকারিকও মার্জিন মানি দেওয়ার আশ্বাস দেন। এই প্রশিক্ষণে শিক্ষাদান করেন শ্রীমতী মীনারাণী নাটুয়া।

গত ৫ই আগস্ট '৮১ কাশীনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছের একটি ময়দানে মথুরাপুর ২নং ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের ১৪ থেকে ১৬ বৎসরের ৩০ জন কিশোরীদের নিয়ে ৩০ দিনের এক কবাডি প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাশীনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এবং প্রশিক্ষক শ্রীচিত্তরঞ্জন দত্ত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। প্রশিক্ষণ শেষে গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর চক্রতীর্থ শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি প্রাঙ্গণে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ৩০ জন কিশোরীকে মানপত্র দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণকালে ৩০ জন কিশোরীকে ব্লক যুব আধিকারিক গেঞ্জি বিতরণ করেন। বিভিন্ন ক্লাব, মহিলা সমিতি ও শিশু সংগঠনের সদস্যরা এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীখগেন্দ্রনাথ পুরকাইত।

গত ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৮২ তারিখে মথুরাপুর ২নং ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়তের দারিদ্র্য-সীমার নীচে বাস করেন এমন ৩০ জন তপশিলী জাতীয় বেকার যুবকদের নিয়ে ৬ মাসের এক টেলারিং প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করা হয় রায়দিঘীতে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে বর্তমান জনপ্রিয় সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীগোবর্ধন দাস গোস্বামী। এই অবহেলিত সুন্দরবন এলাকায় এরূপ প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়ে তপশিলী যুবকরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন শ্রীমতী মীরা মণ্ডল।

সাগর ব্লক যুবকরণ—নদী এবং সমুদ্র বিধৌত মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ২৪ পরগণা জেলার দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত এই ব্লকে খেলাধুলার প্রচার এবং প্রসারের জন্য সাগর ব্লক যুবকরণ একটি অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও এই ব্লকের ৫৮টি ক্লাবকে ফুটবল, ভলিবল এবং ভলিনেট এবং জার্সি

[২৭ পৃষ্ঠায় শেষাংশ]

পাঠকের ভাবনা

ডিসেম্বর সংখ্যার প্রতিবেদন প্রসঙ্গে

যুবমানস ডিসেম্বর '৮১ সংখ্যাতে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা "লিটল ম্যাগাজিনের প্রকৃতি ও গতি" লেখাটির সম্পর্কে কিছু বলছি—যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল।

লেখক বলেছেন—কেউ প্রসবাগার কেউ সূতিকাগার আবার অধিক অংশই অন্নপ্রাশন পর্যন্ত এগোয়। এই বক্তব্যের সম্পর্কে বলতে চাই—অন্নপ্রাশন অবধি যারা পৌঁছায় তাদের তিরোধান হয় না বললেই চলে, মুমূর্ষ রোগীর মত থাকে তাদের জীবন। দেখা যায় দীর্ঘদিন পর সামান্য সুস্থ হয়। অর্থাৎ দু'একটি সংখ্যা প্রকাশ হয়। আবার রোগী হয়। আবার সুস্থ হয়... । এইভাবেই চলে। কিন্তু প্রসবাগার বা সূতিকাগার পর্যন্ত যারা পৌঁছায় তাদের পত্রিকা প্রকাশের বাসনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলেয়ার আলোর মতন, এই বাসনা সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য থাকে মর্যাদা প্রত্যাশার লালসা। যেমন আজকাল রাজনৈতিক চাল।

লেখক খানিকটা মেনে নিয়েছেন—দু'একজন নামী লেখকের লেখা না থাকলে—পত্রিকা বিক্রি হতে চায় না। আমি একটি লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক হয়ে বলছি—কথাটা ঠিক নয়। কেন না কয়েকটা লিটল ম্যাগাজিন বাদে (লেখক উল্লেখ করেছেন) যে সকল পত্রিকা প্রকাশ হয় সেগুলি কোন বুক স্টলে বিক্রি হয় না বললেই চলে। যা বিক্রি হয় তার সবই push করে বিক্রি করা হয়। সুতরাং লেখকের নামের প্রয়োজন হয় না, তবে লেখক বলেছেন অনেকক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের বাতিল লেখাগুলি লিটিল ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। একথাতে আমি একমত।

কনিষ্ঠ পত্রিকাগুলিকে যে সাহিত্যের আড্ডা বসবার কথা লেখক বলেছেন এবং তার দ্বারা যে ব্যাধি প্রতিকারের উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ও আমি একমত কেন না—আমি নিজেই মহারোগী থেকে একটু সুস্থ হয়েছি গুরুজনেরা বলেন।

লেখক এক জায়গাতে বলেছেন—"গ্রামের দিকের পত্রিকাগুলি প্রেসের ক্ষমতার কথা বলেন কিন্তু এটিও তো সত্য—স্নো পাউডার না থাকলেও শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ভোলাতে পেরেছিল।"

এ প্রসঙ্গে বলতে চাই—শকুন্তলা গরীব থাকতে পারে, কিন্তু তার রূপ ছিল, দীনতার বেড়াজাল থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই বলছি ছোট পত্রিকাগুলো ছাপা হয় ছোট প্রেস থেকে। সুতরাং রুচিবোধ থাকলেও অনেক সময় তার প্রকাশ ঘটান যায় না। যেমন—র-ফ-লা (এ) রস্-সু-(জ) করে, দ্দী-র-গু-ু) করে প্রভৃতি টাইপগুলি যদি নির্দিষ্ট অক্ষরের সংগে না দিয়ে কাটাকাটা দেওয়া হয় তাহলে পত্রিকার পরিচ্ছন্নতা নিঃসন্দেহে বহুলাংশে লাঘব হয়।

এ ছাড়া ব্যক্তিগত পত্রিকার একটা বানান ভুলের ঘটনা বলি—পত্রিকা প্রকাশের পর দেখলাম বেশ বানান ভুল। তার মধ্যে যে ভুলটি আমায় গভীরভাবে পীড়া দিল সেটি একটি কবিতার নামের একটি যুগ্ম অক্ষর। ন্ট-র স্থানে ন্ট হয়েছে। প্রুফ দেখবার ভার যার উপর দিয়েছিলাম তাকে প্রশ্ন করতেই বলল—"ন্ট টাইপ নেই।" আমি অবাক, প্রেসে গিয়ে জেনে দেখলাম সত্যিই নেই। টাইপ কেসের আরো বেশ কিছু ঘর ফাঁকা আছে। তাছাড়া আমি যে প্রেসে কাজ করাই সেখানে ১৮ পয়েন্টের উপর কোন অক্ষর নেই, ঐ ছাড়া আমার কাছে কয়েকটি পত্রিকা আছে যার ১৮ পয়েন্টগুলি দেখলে মনে হবে কোন শিশু নতুন অ-আ-ক-খ লেখা শিখছে।

সুতরাং যে সকল পত্রিকাগুলি প্রেসের ক্ষমতার কথা বলে সেগুলির মধ্যে কিছু পত্রিকা অবশ্যই সত্য বলে।

আর একটি বিষয় লেখক আলোচনা করেন নি। যে কারণটার জন্য লিটল ম্যাগাজিন পাঠক অনেক ক্ষেত্রে অসহ্য বোধ করেন। বিষয়টি হল—কিছু সম্পাদক আছেন, যাঁরা পত্রিকার বিভিন্ন স্থানে নিজের নাম অলংকৃত করেন এবং একাধিক লেখার লেখক হন। (আমার কাছে একটি পত্রিকা আছে যে পত্রিকাতে সম্পাদকের নাম ১২ (বার) জায়গাতে ছাপা আছে এবং আরো একটি পত্রিকা আছে তাতে সম্পাদকের নাম সাত জায়গাতে উল্লেখ আছে এবং তিনি একাই ৪টি গদ্য ও পদ্যের রচয়িতা।) সুতরাং পত্রিকা এককেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। সম্পাদকদিগের বলব দৃষ্টিকটু কোন কাজ থেকে বিরত থাকতে।

পরিশেষে বলি—লিটল ম্যাগাজিনের উপর লেখা এই প্রতিবেদনটি লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে যাঁরা আছেন তাঁদের অনেক উপকারে লাগবে।

গৌরাঙ্গ দাস
মহিষা, পোঃ—কুমড়া কাশীপুর
২৪ পরগণা

যুবমানস : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

যুবকল্যাণ দপ্তরের মাসিক মুখপত্র 'যুবমানস'কে সামগ্রিক যুবসমাজের মুখপত্র বলতে বাধা কোথায়? একে গ্রাম-বাংলার তরুণ সাহিত্য-সংগ্রামীদের দুর্গ হিসাবে অভিহিত করলেও বুঝি ভুল হবে না। সকল রকম অপসংস্কৃতি ও ভাবালুতাকে টেক্কা দিয়ে বর্তমান কঠিন-কঠোর বাস্তব সমাজব্যবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং এর থেকে মুক্তিলাভের পথনির্দেশে 'যুবমানসের' ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তবে শুধু লেখক-শিল্পী গঠনই নয়, প্রকৃত, সুস্থ, স্বাভাবিক ও সুন্দর যুবমানস গঠনের জন্য সামনের দিনগুলিতে তাকে বিশেষভাবে প্রয়াসী হতে হবে এবং এর সুদূরপ্রসারী ফলই তাকে এনে দেবে যুবসমাজের একমাত্র আদর্শ মুখপত্র হিসাবে পরিগণিত হবার মর্যাদা ও সম্মান। এই মর্যাদা ও সম্মান অর্জনের যোগ্যতা বর্তমান 'যুবমানস'-এর আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রসঙ্গান্তরঃ (১) গদ্য ও পদ্যের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা' সবারই জানা কথা। কিন্তু পদ্য বা কবিতার (একই ধরে নিচ্ছি) মনের কথা কী? গদ্যের গাদাগাদি পদ্যের একেবারেই অপছন্দ। সে চায় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। কিন্তু গদ্যের শরীর যা দিয়ে তৈরী হয় কবিতারও তাই। সেজন্য অন্তত তার অবস্থানের পারিপার্শ্বিকটি সে চায় খোলামেলা। এবং তা'তেই কবিতা নিজেও যেমন খুশী হয় তেমন পাঠকদের তা' পড়তে চোখের তৃপ্তি হয় ও হৃদয়ঙ্গম করতে সহজ হয়। তাই বলছিলাম, কবিতার পাতাটি শুধু তিনটি না করে দু'টি স্তম্ভে ভাগ করাই শ্রেয়। তাছাড়া ডিসেম্বর সংখ্যায় অন্যান্য পরিবর্তন যথাযথ ও সুন্দর মনে হয়েছে। (২) গত বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিভাগ পুস্তক প্রকাশের জন্য যেসব লেখকদের আর্থিক অনুদান প্রদান করেছেন তাঁদের নাম, বইয়ের নাম, বিষয়, প্রকাশিত হয়েছে কিনা, প্রাপ্তিস্থান প্রভৃতি উল্লেখসহ একটি তালিকা 'যুবমানসে' প্রকাশ পেলে আমার মতো অনেক সাহিত্যানুরাগী পাঠক উপকৃত হবেন।

'যুবমানস'-এর প্রকাশ নিয়মিত করা হোক—শেষে প্রিয় সম্পাদক মহাশয়ের কাছে এই আমার বিনীত আবেদন।

শুভাশিস হালদার
'আটঘর পল্লী', পশ্চিম মাসুন্দা
নববারাকপুর, ২৪ পরগণা
পিন : ৭৪৩২৭৬

যুবমানসের ফসল

বর্তমানে এই রাজ্যে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা শিল্প-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাকে বহন করে, গ্রামীণ যুবমনের বিকাশের দায়িত্বকে মাথায় করে এগিয়ে চলেছে এদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র 'যুবমানস' অন্যতম।

গত ডিসেম্বর '৮১ সংখ্যার প্রবন্ধ, আলোচনা থেকে শুরু করে শিল্প-সংস্কৃতি পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই সার্থক। তবু সবকিছুর মধ্যেও 'লিটল ম্যাগাজিনঃ প্রকৃতি ও গতি' প্রতিবেদন এক অন্য স্বাদ বহন করে। লিটল ম্যাগাজিনের সংগে বিভিন্নভাবে যুক্ত থাকার এবং লিটল ম্যাগাজিনের সুখ-দুঃখের একজন হিসেবে প্রতিবেদনটি পড়ে ভীষণ ভালো লাগলো। তবে প্রতিবেদনটি আরও

দীর্ঘ হলে ভালো হোত। ভালো হোত, আরও বেশ কিছু ভালো লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে আলোচনা করলে। যাই হোক, আগামী দিনে 'যুবমানস'-এর প্রতিটি সংখ্যাতেই লিটল ম্যাগাজিনের উপর একটি করে প্রতিবেদন কি প্রকাশ করা যায় না? সম্পাদকমহাশয় নিশ্চয়ই ভাববেন। বর্তমান সংখ্যার কবিতা বিভাগটি অন্যান্য সংখ্যার চেয়ে বেশ বলিষ্ঠ। বলিষ্ঠ কাজলবাবুর প্রচ্ছদটিও।

পাঁচুগোপাল হাজরা
সম্পাদকঃ দুর্বার সাহিত্য সংসদ
১০০৮/১৫, কল্যাণগড় (হাবড়া)
২৪ পরগনা

কয়েকটি প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র 'যুবমানস' পত্রিকাটি চিত্তাকর্ষক-রূপে আমাদের হাতে তুলে দেবার জন্যে সম্পাদক, প্রকাশক, সংশ্লিষ্ট কর্মী ও লেখকবৃন্দকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

মূল্যবান রচনা ও ছবিতে সমৃদ্ধ অবিশ্বাস্য স্বল্পমূল্যের এই পত্রিকা বাস্তবিক প্রশংসার দাবী রাখে।

পত্রিকাটিকে ভালবেসেছি বলেই কয়েকটি ছোট-খাট ত্রুটি সংশোধন করবার জন্যে মাননীয় সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১। পত্রিকা প্রকাশের অস্বাভাবিক বিলম্ব বন্ধ করুন।
২। এক একটি লেখার শেষে বেশ অনেকটা জায়গা শূন্য পড়ে থাকে...বড্ড দৃষ্টিকটু লাগে...দয়া করে পাদপূরণ হিসাবে নানাবিধ তথ্যে সমৃদ্ধ করুন শূন্যস্থানগুলি।
৩। পাঠকের ভাবনা বিভাগে চিঠিপত্র সম্পাদনা করে মূল বিষয় প্রকাশ করলে ভাল হয়। তাহলে আরও অনেক পাঠকের ভাবনা একই সংখ্যায় প্রকাশ করা যেতে পারে।

দিবাকর গোস্বামী
৬২ কে. এম. শা রোড
শ্রীরামপুর, হুগলী

[**বইপত্র** : ২৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

প্রদেশের ঝো ফু রেন-কে ক্রমশ লু স্যুনরূপে ভাস্বর হয়ে উঠতে দেখি। এছাড়াও জ্যোতির্ময় ঘোষের 'প্রলয়ের সৃষ্টি ঃ লু স্যুনের গল্প পাঠের ভূমিকা', রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের 'গল্পকার লু স্যুন' এবং জয়ন্ত রায়ের 'শিল্প চেতনায় লু স্যুন' নামক প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য লেখা এবং সিরিয়াস পাঠকের কাছে যথেষ্ট মূল্যবান বলে মনে হবে।

এসব ছাড়াও রয়েছে লু সুনের একটি গল্প। একটি গদ্য-কবিতা এবং একটি প্রবন্ধের চমৎকার অনুবাদ। বিশেষ করে অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় কৃত 'আমি কেমন করে গল্প লেখা শুরু করেছিলাম'—পড়তে গিয়ে এর ঝরঝরে ভাষা পাঠককে প্রতারিত করতে পারে। পাঠক ভাবতে পারেন যেন লু স্যুন চীনা নন বাংলাদেশেরই বুঝি একজন লেখক ছিলেন।

নির্মাল্য নাগ অলংকৃত 'গল্পগুচ্ছের প্রচ্ছদ' বাঁধিয়ে রাখার মতন। শেষে একটা বাড়তি লাইন লিখতে ইচ্ছে হল তা হচ্ছে প্রতি মাসে বিদগ্ধজন-সহ গল্পগুচ্ছের গল্প পাঠের আসরের নিমন্ত্রণ-লিপি ঘোষণা—সাহিত্যের প্রেরণাকে উজ্জ্বল করার সেতুবন্ধন—এটাও কম পাওনা কি!

অধীর বিশ্বাস

[**বিভাগীয় সংবাদ** : ২৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

প্রদান করা হয়েছে। এই অফিসের অনুপ্রেরণায় এবং সঠিক নেতৃত্বে সাগরভিত্তিক একটি ব্লক স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের সৃষ্টি হয়েছে। এই স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় এবং ব্লক যুবকরণের সাহায্যে আন্তঃসাগর নক্ আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা সম্প্রতি সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়েছে এবং ভলিবল প্রতিযোগিতা সুরু করার আয়োজনও চলছে।

এখানে গত ২৮শে আগস্ট থেকে ১৬ই অক্টোবর পর্যন্ত ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। ৩০ জন তরুণকে প্রশিক্ষণ দেন শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ হালদার। অত্যন্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যে এই প্রশিক্ষণ শিবিরটি চলে রুদ্রনগর জনকল্যাণ সংঘ বিদ্যানিকেতন ময়দানে। সমাপ্তি দিনে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ডহারবার স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীসন্ন্যাসী ব্যানার্জী। ফুটবল প্রশিক্ষণের পরে ভলিবল প্রশিক্ষণ শিবির চলে। স্থানীয় বামনখালি এম. পি. পি. হাইস্কুল ময়দানে ৩১শে অক্টোবর থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর, '৮১ পর্যন্ত। প্রশিক্ষক শ্রীনিমাই চাঁদ গায়েন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ৩০টি তরুণকে ভলিবলে প্রশিক্ষণ দেন সরকারী উদ্যোগে। ফুটবল এবং ভলিবলে এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির সাগর ব্লকে এই প্রথম।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা

ইটাহার ব্লক যুবকরণ—যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং ইটাহার ব্লক যুবকরণের ব্যবস্থাপনায় ও যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় গত ২৭ থেকে ২৯শে জানুয়ারী '৮১ পর্যন্ত ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে জানুয়ারী উৎসবের উদ্বোধন করেন ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির শ্রীসুব্রত মজুমদার। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিনেল শ্রীসুব্রত ঘোষ ও তপেশচন্দ্র লাহিড়ী। এর পর ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। ২৭ তারিখ বিকাল ৩টায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল—আবৃত্তি, বিতর্ক, স্বরচিত কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, বসে আঁকো, বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদি। অনুষ্ঠানের ব্যাপকতা স্থানীয় ছাত্র-যুবকদের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে।

উৎসবের সমাপ্তি দিবসে (২৯শে জানুয়ারী) রাত্রি ৭-৩০টায় শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। ইটাহার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅজিত ঘোষ এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শ্রীসুব্রত ঘোষ ও শ্রীতপেশচন্দ্র লাহিড়ী। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন যথাক্রমে শ্রীসুব্রত মজুমদার ও শ্রীসুব্রত ঘোষ। উৎসবে প্রভূত জন-সমাগম হয়। পরিশেষে ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীদুর্গাশংকর প্রহরাজ একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে উৎসবের সাফল্যের জন্য জনসাধারণের সহযোগিতার প্রশংসা করেন।

১৯৭৩ সালে আমাদের দপ্তরের যাত্রা শুরু। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গের ৩২৭টি ব্লকে আমাদের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে পেরেছি। রাজ্যের প্রাণবন্ত যুবসমাজের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে। বর্তমানে যুবকল্যাণ বিভাগ যুবসমাজের জন্য নিম্নলিখিত কার্যসূচী রূপায়ণে সচেষ্টঃ

বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প।
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্প।
তপসিলী জাতি ও উপজাতি যুবক-যুবতীদের জন্য বিশেষ আঙ্গিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্প।
কমিউনিটি হল ও মুক্তাঙ্গন মঞ্চ স্থাপন।
প্রতি বছর ব্লক, জেলা এবং রাজ্যস্তরে যুবউৎসবের আয়োজন।
খেলাধুলার সাজসরঞ্জাম বিতরণ ও আর্থিক সাহায্য দান।
গ্রামীণ ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিবির।
খেলার মাঠ ক্রয় ও উন্নতি সাধনে আর্থিক সাহায্য দান।
জিমন্যাসিয়াম তৈরী ও জিমন্যাস্টিকের সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য অর্থ সাহায্য।
স্বল্প খরচে বিশেষ বিশেষ স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান।
পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যুব আবাস।
শিক্ষামূলক ভ্রমণঃ

(ক) **স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য দান।**

(খ) অ-ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য দান।

বহুমুখী জেলা যুবকেন্দ্র প্রকল্প।
পাঠ্যপুস্তক ঋণ দান।
ব্লক তথ্যকেন্দ্র স্থাপন।
বিজ্ঞান আলোচনা চক্র প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন।
বিজ্ঞান ক্লাব গঠন ও আর্থিক সাহায্য দান।
ছাত্র সমবায় সমিতি গঠন ও আর্থিক সাহায্য দান (স্কুল-কলেজে)।
পর্বতারোহণ অভিযানে অনুদান, স্বল্প ভাড়ায় পর্বতারোহণের সাজসরঞ্জাম সরবরাহ এবং পর্বতারোহণ ও স্কি প্রশিক্ষণে বৃত্তি প্রদান।
বিভাগীয় মাসিক পত্রিকা "যুবমানস" প্রচার।

আরও বিস্তারিত জানতে আপনি যে ব্লকে বাস করেন সেখানকার যুব আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

গ্রাহক হতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৭ টাকা। ষাণ্মাসিক চাঁদা সডাক ৩·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যার দাম ৪০ পয়সা।

বিশেষ সংখ্যার জন্য কোন অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না। পত্রিকা প্রেরণের জন্য ডাক ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করবে।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

সহ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ০০১।

এজেন্সি নিতে হ'লে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০%
১৫০০-এর উর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০%
৫০০০-এর উর্ধ্বে	৪০%

১০টি সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

সহ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবি করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিক-গুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য বিজনেস ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

Reg. No. 32875/78

Postal Reg. WB/CC-15

৮ই ফেব্রুয়ারী ব্যাণ্ডেলে নবনির্মিত ই. এস. আই. হাসপাতাল উদ্বোধনের পর অপারেশন থিয়েটার পরিদর্শন করছেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ। পাশে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ

এপ্রিল, '৮২

শিয়ালদহে নবনির্মিত উড়ালপুল
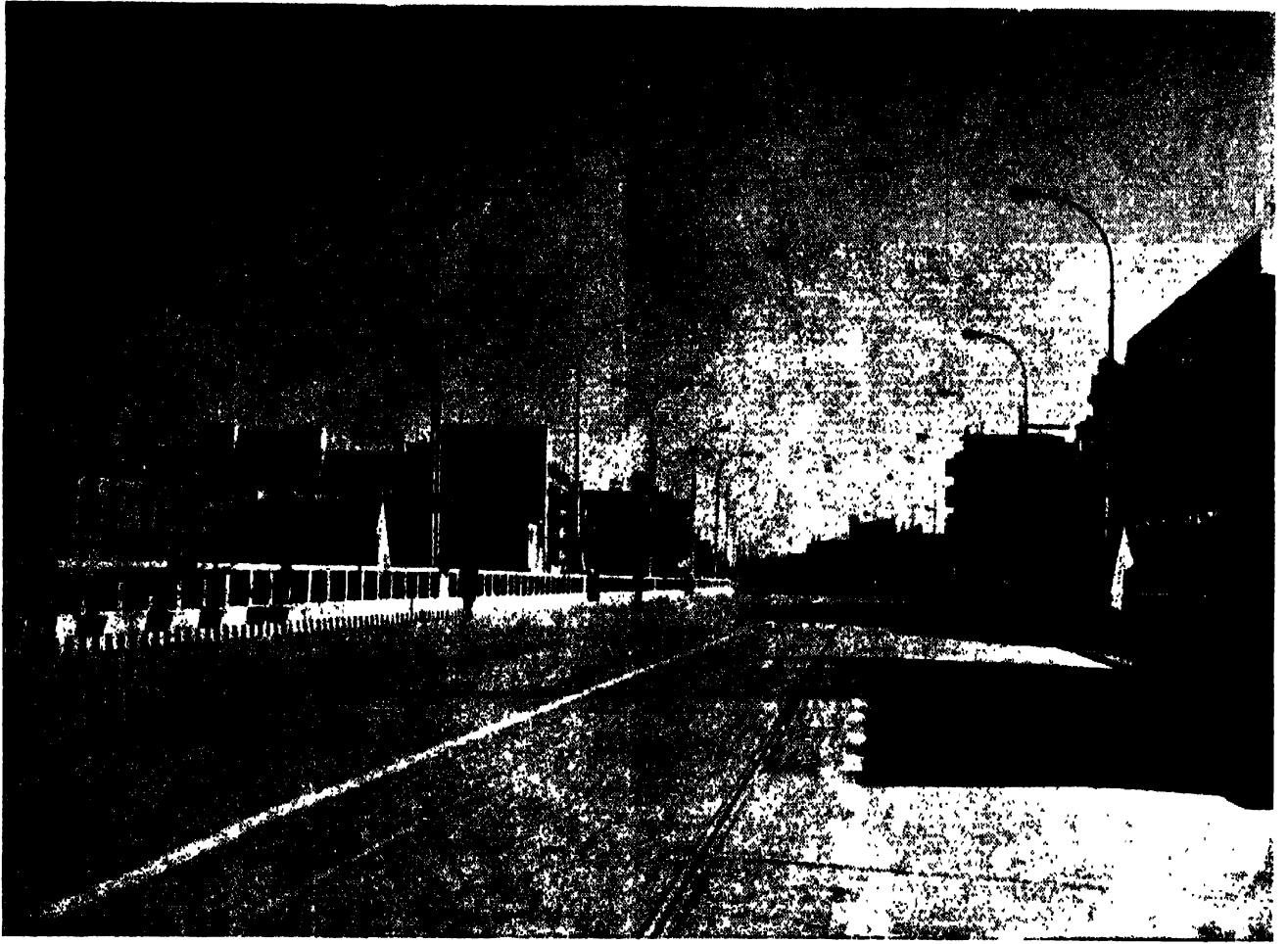
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
এপ্রিল, '৮২

উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি এবং পত্রিকা সম্পাদক ঃ কান্তি বিশ্বাস

প্রচ্ছদ ঃ সজল রায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা-৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—চল্লিশ পয়সা

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

আলোচনা

প্রতিবেদন

গল্প

কবিতা

শিল্প-সংস্কৃতি

লোকচিত্রকলা

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

বইপত্র

বিভাগীয় সংবাদ

পাঠকের ভাবনা

ইন্‌স্যাট-১এ

গত ১০ই এপ্রিল শনিবার ভারতীয় সময় দুপুর ১২টা ১৭-য় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেপ ক্যানাভেরাল থেকে ভারতের উপগ্রহ ইন্‌স্যাট-১এ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। বহুমুখী কার্যকারিতা-সম্পন্ন এই উপগ্রহটি দেশের বহুবিধ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। ইন্‌স্যাট-১এ উৎক্ষিপ্ত হবার পর ভারত পৃথিবীর সেই ছয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম হল যারা বাণিজ্যিক পর্যায়ে জাতীয় স্বার্থে উপগ্রহ ব্যবহার করতে সক্ষম। ইতিপূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া এবং জাপান এ ধরনের উপগ্রহ ব্যবহার শুরু করেছে। ভারতীয় জাতীয় উপগ্রহ প্রকল্পের প্রথম অবদান ইন্‌স্যাট-১এ। ইংরেজীতে ভারতীয় জাতীয় উপগ্রহ প্রকল্পকে বলা হয়,—ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্যাটেলাইট সিস্টেম (Indian National Satellite System) প্রকল্পের নামের সংক্ষিপ্তকরণের মাধ্যমেই এই উপগ্রহটির নামকরণ হয়েছে। আর প্রকল্পের প্রথম অবদান হবার জন্য উপগ্রহটির ক্রমিক সংখ্যা ১। এই উপগ্রহটির আরেকটি পরিপূরক উপগ্রহ আছে। সেই কারণে আলোচ্য উপগ্রহটি ইন্‌স্যাট-১এ অর্থাৎ INSAT-1A এই নামে অভিহিত হচ্ছে।

ইন্‌স্যাট-১এ-র যাবতীয় নক্সা ভারতীয় বিজ্ঞানীরা প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু এ দেশে উপগ্রহ নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি না থাকায় ১৯৭৮-এর জানুয়ারী মাসে দুনিয়াজোড়া টেন্ডার ডাকা হয়। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ইন্‌স্যাট-১এ-র কিছু কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ কয়েকটি ভারতীয় সংস্থা সরবরাহ করেছে।) ১৯৭৮-এর জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ফোর্ড অ্যারোস্পেস্ কমিউনিকেশনস্ কর্পোরেশন' নামক একটি উপগ্রহ নির্মাণকারী সংস্থার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। সে সময় কথা ছিল যে, ফোর্ড অ্যারোস্পেস কমিউনিকেশনস্ কর্পোরেশন আটাশ মাস সময়ে উপগ্রহটি তৈরী করে দেবে। বিভিন্ন কারণে, তা সম্ভব হয় নি। মহাশূন্যে ভূ-সমলয় (Geo-Staionary) কক্ষপথে ৭৪ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমারেখার উপর, পৃথিবী থেকে ৩৬ হাজার কিলোমিটার দূরে এই আয়তাকার উপগ্রহটি অবস্থান করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেপ ক্যানাভেরাল-এ অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল অ্যারোনটিক অ্যান্ড স্পেস্ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্'-এর (সংক্ষেপে যা নাসা (NASA) নামে পরিচিত), উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে ডেল্টা-৩৯১০ রকেটের সাহায্যে ইন্‌স্যাট-১এ মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ডেল্টা-৩৯১০ রকেট ১৬০বার উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। ইন্‌স্যাট-১এ উৎক্ষেপণের জন্য ১৬১তম ডেল্টা-৩৯১০ রকেটটি ব্যবহৃত হয়। এ যাবৎ উৎক্ষেপণের কাজে ব্যবহৃত ডেল্টা রকেটের শতকরা ৯৩ ভাগই সাফল্য দেখিয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ইন্‌স্যাট-১এ-র পরিপূরক উপগ্রহ ইন্‌স্যাট-১বি মহাকাশফেরি (Space Slmttle) কলম্বিয়ার মাধ্যমে মহাকাশে পাড়ি দেবে; আগামী বছর এই উৎক্ষেপণ পর্বটি ঘটবার কথা।

মহাশূন্যে ভেসে বেড়ানো উপগ্রহগুলির কাজ-কর্মের ধরন অনুযায়ী, কাঠামো বিন্যাস করা হয়। এছাড়া মহাশূন্যে পরিভ্রমণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সব উপগ্রহেই থাকে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি নিয়ে সহজভাবে ভাবা যায়। চশমা, অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি কমে এলে যে যন্ত্রটির সহায়তা মানুষকে নিতে হয় তার মূল অংশ দুটি। চশমার ফ্রেম এবং লেন্স। এখন মানুষের মুখের মাপ অনুযায়ী ফ্রেমের আকার ছোট-বড় হতে পারে আবার বিভিন্ন রুচির মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফ্রেম তৈরী হয়। আর দৃষ্টিশক্তির ঘাটতি অনুযায়ী লেন্সের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহলে বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে এই, ফ্রেম এবং লেন্স সব চশমাতেই লাগবে। আর দৃষ্টিশক্তিকে জোরালো করার জন্য যার যতটুকু প্রয়োজন তাকে ঠিক সেই ক্ষমতার লেন্স ব্যবহার করতে হয়। এই একই ব্যাপারটি ঘটে উপগ্রহের ক্ষেত্রে। উপগ্রহকে সচল অবস্থায় মহাশূন্যে পরিভ্রমণরত রাখবার জন্য কিছু ন্যূনতম যন্ত্রপাতি অবশ্যই দরকার। এর পর উপগ্রহের উপযোগিতা অনুযায়ী তাতে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি সংস্থাপিত হয়। সুতরাং ইন্‌স্যাট-১এ-তে সাধারণ যে-সব একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আছে সেগুলির প্রসঙ্গে না গিয়ে বরঞ্চ বিশেষ যন্ত্রাংশগুলির খোঁজ-খবর করাটাই সময়োপযোগী হবে।

ইন্‌স্যাট-১এ-র যে-সব যন্ত্রপাতিগুলি তাকে বিশেষ কয়েকটি কাজের জন্য উপযোগী করে তুলেছে সেগুলি হল,—ট্রান্সপন্ডার, (Transponder) ভেরি হাই রেজোল্যুশন রেডিও মিটার বা ভি.এইচ.আর.আর. (Very High Resolution Radiometer) এবং ডেটো-চ্যানেল (Data Channel)।

ট্রান্সপন্ডার যন্ত্রটি একই সঙ্গে বেতার তরঙ্গ অথবা মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ গ্রহণ এবং প্রেরণ করতে সক্ষম। আমাদের নিত্য ব্যবহৃত রেডিও বা ট্রানজিস্টর সেট কেবলমাত্র বেতার তরঙ্গ গ্রহণ করতে সক্ষম। আবার আকাশবাণী কেন্দ্রে বসানো ট্রান্সমিটার শুধুমাত্র বেতার তরঙ্গ প্রেরণ করতে পারে। আর ট্রান্সপন্ডার এই দ্বিবিধ কাজ একত্রে করতে পারে এবং তা বেতার তরঙ্গ ছাড়াও মাইক্রোওয়েভের তরঙ্গের ক্ষেত্রেও একইভাবে কার্যকর। মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক (frequency) উচ্চ স্পন্দনের বেতার তরঙ্গের (shortwave) চেয়ে তিনশো থেকে চারশ' গুণ বেশী। ফলশ্রুতি—মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ একই সঙ্গে একাধিক চ্যানেল পরিবহন করতে পারে।

ভি.এইচ.আর.আর. আসলে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রেডিওমিটার। রেডিওমিটার যন্ত্রটি ভূপৃষ্ঠ থেকে বিচ্ছুরিত বিভিন্ন ধরনের রশ্মি বিশ্লেষণ করে বলে দিতে পারে যে ঐসব রশ্মি কোন্ কোন্ বস্তু থেকে উদ্ভূত হচ্ছে।

ডেটো-চ্যানেল মূলতঃ একটি তথ্য সংগ্রাহক যন্ত্র। ভূপৃষ্ঠে সংস্থাপিত তথ্য সংগ্রাহক মঞ্চ বা ডেটা কালেকশন প্ল্যাটফর্ম সংক্ষেপে ডি.সি.পি. (Data Collection Platforms, DCP) কর্তৃক প্রেরিত তথ্যাদি আহরণ করাই হল ডেটা চ্যানেলের কাজ। উল্লিখিত যন্ত্রগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে ইন্‌স্যাট-১এ কি কি কাজ করবে এবার তা দেখা যাক।

ইন্‌স্যাট-১এ তিনটি কাজ করবে এবং একই সঙ্গে। অর্থাৎ ইন্‌স্যাট-১এ একই সময়ে তিনটি কাজ করতে সক্ষম। প্রথমতঃ, আবহাওয়াসংক্রান্ত তথ্য-নির্দেশ প্রেরণ; দ্বিতীয়তঃ, দূরদর্শন এবং আকাশবাণীর সম্প্রচার ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করা। তৃতীয়তঃ, টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ এবং সুগ্রথিত করা; একে একে এবার উপযোগিতার বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে দেখা যাক।

আবহাওয়া সংক্রান্ত বিষয়—আবহাওয়ার পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে ইন্‌স্যাট-১এ-র ভূমিকা হবে অনবদ্য। ইন্‌স্যাট-১এ-তে সংযুক্ত ভি.এইচ.আর.আর. প্রতি তিন মিনিট অন্তর নিরবচ্ছিন্নভাবে ভারতীয় উপমহাদেশ ও সন্নিবিষ্ট সমুদ্রের বিভিন্ন অবস্থার খবর সংগ্রহ করবে। অর্থাৎ সাইক্লোন, তুষার এলাকার বিস্তৃতি, সমুদ্র ও মেঘশীর্ষের তাপমাত্রা, মৌসুমী বায়ুর গতিবেগ প্রভৃতি খবর সংগ্রহ করবে। আর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়া সংক্রান্ত খবরাখবর সংগ্রহের জন্য সংস্থাপিত শতাধিক ডেটো কালেকশন প্ল্যাটফর্ম বা ডি.সি.পি. কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি ইন্‌স্যাট-১এ-র ডেটো-চ্যানেল আহরণ করবে। ভারতীয় উপ মহাদেশের সন্নিবিষ্ট সামুদ্রিক অঞ্চলে উন্নত যন্ত্রপাতি সজ্জিত মোট ৩৬টি বয়া ভাসানোর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। এদেরও কাজ হবে আবহাওয়া সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ। এই-ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে সংগৃহীত সংবাদ ইন্‌স্যাট-১এ আহরণ করে যাবে এবং এইসব সংবাদ সরাসরি পাঠিয়ে দেবে নতুন দিল্লীতে অবস্থিত 'মেটেরোলজিক্যাল ডেটা ইউটিলাইজেশন সেন্টার' বা এম. ডি. ইউ. সি.-তে। এম. ডি. ইউ. সি.-তে আবহবিশেষজ্ঞরা দুটি ডি. ই. সি-১১৭০

(DEC—1170) কম্পিউটারের সহায়তায় ইন্‌স্যাট-১এ প্রেরিত আবহাওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। যদিও ইন্‌স্যাট-১এ প্রতি তিন মিনিট অন্তর উল্লিখিত বিভিন্ন উপায়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করবে কিন্তু এম. ডি. ইউ. সি. বেশী তথ্য বিশ্লেষণে আপাততঃ পারদর্শী নয়। সুতরাং এখন সারাদিনে ইন্‌স্যাট-১এ মাত্র তিনবার আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি পাঠাবে। বিশ্লেষিত তথ্যাদি থেকে প্রয়োজনীয় পূর্বাভাস বিভিন্ন আবহাওয়া দপ্তরে অথবা যে-সব স্থানে সংবাদ পাঠানো প্রয়োজন সে-সব জায়গায় ইন্‌স্যাট-১এ-র মাধ্যমে খবর পাঠানো হবে। ইন্‌স্যাট-১এ-র ট্রান্সপন্ডার এই কাজটি করবে। এম. ডি. ইউ. পি. নির্দেশ-পূর্বাভাস পাঠিয়ে দেবে ইন্‌স্যাট-১এ-তে। আবার ইন্‌স্যাট-১এ তার ট্রান্সপন্ডারের সাহায্যে এই সংবাদ প্রয়োজনীয় অঞ্চলে পাঠিয়ে দেবে। আবহাওয়া দপ্তর এইজন্য বিভিন্ন দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় আরও ১০২৩টি নতুন সংবাদগ্রাহক যন্ত্র বসাবার পরিকল্পনা নিয়েছে।

দূরদর্শন ও আকাশবাণী—দূরদর্শন ও আকাশবাণীর জন্য ইন্‌স্যাট-১এ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ইন্‌স্যাট-১এ-র চোদ্দটি ট্রান্সপন্ডারের মধ্যে মাত্র দুটি ব্যবহৃত হবে দূরদর্শনের ও আকাশবাণীর জন্য। দূরদর্শনের জন্য ইন্‌স্যাট-১এ দু'ভাবে কাজ করে। প্রথমতঃ, ইন্‌স্যাট-১এ প্রেরিত দূরদর্শনের প্রচারসূচী এক ধরনের বিশেষ টেলিভিশন সেট বা ডি. আর. এস.-এর (Direct Reception Set, DRS) মাধ্যমে সরাসরি দেখা যাবে আর প্রচলিত টেলিভিশন সেটের মাধ্যমে সেগুলি দেখতে হলে ইন্‌স্যাট-১এ কর্তৃক সম্প্রচারিত প্রচারসূচী দূরদর্শন কেন্দ্রর মাধ্যমে প্রচার করতে হবে। অর্থাৎ কোন একটি দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে কোন অনুষ্ঠান ইন্‌স্যাট-১এ-তে পাঠালে ইন্‌স্যাট-১এ-র দুটি ট্রান্সপন্ডার তা তক্ষুণি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করবে। এই সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান হয় ডি. আর. এস.-এর মাধ্যমে সরাসরি দেখতে হবে অন্যথায় স্থানীয় দূরদর্শন কেন্দ্র যদি ঐ অনুষ্ঠান আহরণ করে প্রচার করে তবে তা প্রচলিত টেলিভিশন সেট-এর মাধ্যমে দেখা যাবে। দ্বিতীয়তঃ, ইন্‌স্যাট-১এ সারাদেশে দূরদর্শনের ক্ষেত্রে একটি প্রচার সংযোজন যোগসূত্র বা নেটওয়ার্ক (Network) গড়ে তুলতে পারবে। ভারতের মত বিরাট দেশে এই ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, শ্রীনগর যেখানেই দূরদর্শন অনুষ্ঠান প্রচার করুক না কেন অন্য যে কোন দূরদর্শন কেন্দ্র তা ইন্‌স্যাট-১এ মারফত সংগ্রহ করে স্থানীয় দর্শকদের জন্য তা সম্প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল ইন্‌স্যাট-১এ-র মাধ্যমে দূরদর্শন প্রচার ব্যবস্থা জোরালো করার জন্য সারাদেশব্যাপী এক বিস্তারিত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশ এই ছয়টি রাজ্যের প্রত্যেকটির তিনটি করে জেলায় দূরদর্শন অনুষ্ঠান সরাসরি দেখাবার জন্য ৮ হাজারটি ডি. আর. এস. বসানো হবে; ইন্‌স্যাট-১এ প্রেরিত দূরদর্শনের অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য নাগপুর ও রাজকোটে ৪টি প্রেরককেন্দ্র স্থাপন করা হবে; দিল্লী ও শিলং-এর মধ্যে একটি আপলিঙ্ক (Uplink) স্থাপিত হবে। টেলিভিশন আপলিঙ্ক ব্যবস্থার জন্য একটি ভ্রাম্যমান দূরদর্শন কেন্দ্র বসানো হবে; প্রতিটি দূরদর্শন কেন্দ্রে ইন্‌স্যাট-১এ প্রেরিত অনুষ্ঠানসূচী গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ইন্‌স্যাট-১এ সারাদেশে দূরদর্শনের একটি যোগসূত্র তৈরী করবে এবং দেশের দূরতম প্রান্তেও দূরদর্শন প্রচারের ব্যবস্থা করতে সাহায্য করবে। ইন্‌স্যাট-১এ-র ট্রান্সপন্ডারের সাহায্যে সারাদেশে আকাশবাণীর যে ৯৪টি কেন্দ্র আছে তাদের মধ্যেও যোগসূত্র গড়ে উঠবে। আকাশবাণীর প্রচার ব্যবস্থাও দূরদর্শনের মতই হবে। আকাশবাণী ইন্‌স্যাট-১এ-র মাধ্যমে যেসব কেন্দ্র থেকে সরাসরি আকাশবাণীর অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা আপাততঃ করছে সেগুলি হল,—অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্ণুল, হায়দ্রাবাদ ও মেহবুবনগর; বিহারের রাঁচি, পালামৌ ও সিংভুম; গুজরাটের রাজকোট, জামনগর ও জুনাগড়; মহারাষ্ট্রের নাগপুর, ভান্দারা ও চন্দ্রপুর; ওড়িশার বেলাঙ্গির, সম্বলপুর ও ঢেনকানল; উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর, আজমগড় ও বস্তি। আর অন্যান্য আকাশবাণী কেন্দ্রগুলির মধ্যেকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ইন্‌স্যাট-১এ অনেক সাবলীল ও সহজ করে দেবে।

টেলি যোগাযোগ—দূরতম প্রান্তে অবস্থিত মানুষের টেলিফোনের সাহায্যে কথা বলার বিষয়ে ইন্‌স্যাট-১এ প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ হবে। ইন্‌স্যাট-১এর ১২টি ট্রান্সপন্ডার শুধু এই কাজেই ব্যস্ত থাকবে। কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং শিলং-এ পাঁচটি বড়, অন্যান্য ১৩টি শহরে মাঝারি, ১৩টি ছোট এবং সাগরে দুটি ভূ-কেন্দ্র এই কারণে স্থাপন করা হবে। টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইন্‌স্যাট-১এর সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে এই ভূ-কেন্দ্রগুলির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। দূরবর্তী স্থানে টেলিফোন করা মাত্রই একটি সংকেত নিকটতম ভূ-কেন্দ্রে ধরা পড়বে এবং নিকটতম ভূ-কেন্দ্র তক্ষুণি সেই সংকেত ইন্‌স্যাট-১এ-র মাধ্যমে যে স্থানে যোগাযোগ করা হয়েছে সেই জায়গার ভূ-কেন্দ্রে খবর দেবে। দ্বিতীয় ভূ-কেন্দ্র এবার নির্দিষ্ট টেলিফোন গ্রাহকযন্ত্রে সংযোগ স্থাপন করে দেবে। ধরা যাক কলকাতা থেকে মাদ্রাজে কথা বলতে চাইলে যে নম্বরটি ডায়াল করা হল সেই নম্বরটি কলকাতার ভূ-কেন্দ্র হয়ে ইন্‌স্যাট-১এ মারফত মাদ্রাজের ভূ-কেন্দ্রে পৌঁছে যাবে। আর মাদ্রাজের ভূ-কেন্দ্র তক্ষুণি নির্দিষ্ট টেলিফোনের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেবে কলকাতার টেলিফোনটির। আপাততঃ ইন্‌স্যাট-১এ দূরতম প্রান্তের মধ্যে ১৪০০ টেলিযোগাযোগ একই সাথে করতে পারবে। তবে ভবিষ্যতে ইন্‌স্যাট-১এ একই সঙ্গে ৮০০০ টেলিযোগাযোগ করে দিতে পারবে। ফলে ইন্‌স্যাট-১এ ভারতের যে কোন দুই দূরতম প্রান্তকে টেলিফোন সংযুক্ত করতে পারবে; এ ব্যবস্থায় একসঙ্গে ৮০০০ জন উপকৃত হবেন। অত্যন্ত অগম্য স্থানের সাথেও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় ইন্‌স্যাট-১এ সহায়ক হবে। ইন্‌স্যাট-১এ-র সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রধান ভূ-কেন্দ্রটি কর্ণাটকের হাসান-এ অবস্থিত।

ইন্‌স্যাট-১এ এবং ইন্‌স্যাট-১বি এই দুটি উপগ্রহসহ সমস্ত ইন্‌স্যাট-১ প্রকল্পটির খরচ হবে ২৭৫ কোটি টাকা। উপগ্রহ দুটির উৎক্ষেপণ, নিয়ন্ত্রণ, বীমা ইত্যাদির জন্য খরচ ১১৩ কোটি টাকা। টেলি যোগাযোগের জন্য ৩১টি ভূ-কেন্দ্রসহ মোট খরচ পড়বে ৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রাহক কেন্দ্র এবং এই কাজে আনুষঙ্গিক ব্যয়সহ মোট খরচ হবে ১২ কোটি টাকা। টেলিভিশন যোগসূত্র স্থাপনে ব্যয় হবে ৮৫ কোটি টাকা। আকাশবাণীর জন্য প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ কাজে ব্যয় হবে ২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন 'ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা' বা 'ইসরো' (Indian Space Research Organisation, ISRO), কেন্দ্রীয় পর্যটন ও অসামরিক পরিবহণ মন্ত্রকের আবহাওয়া সংক্রান্ত বিভাগ, কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রকের ডাক ও তার বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও প্রচার মন্ত্রকের দূরদর্শন ও আকাশবাণীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ইন্‌স্যাট-১ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির যৌথ কর্মপদ্ধতির অবদান ইন্‌স্যাট-১ প্রকল্প।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহৃত ভারতের প্রথম জাতীয় উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। ইন্‌স্যাট-১এ-র আয়ু কিন্তু ৭ বছর। এর কার্যকাল শেষ হবার আগেই আশা করা যায় এর পরিবর্ত কোন উপগ্রহ আমাদের জাতীয় জীবনে আরও বৈচিত্র্যময় প্রভাব ফেলতে উৎক্ষিপ্ত হবে।

তত্ত্ব ও প্রয়োগের জীবন্ত সত্তা—লেনিন

গৌতম দেব

বিশ্ব শ্রমজীবী জনগণের মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, তাত্ত্বিক ও অবিসংবাদিত নেতা ও শিক্ষক লেনিনের একশ' বার-তম জন্মদিবস পালিত হল সারা পৃথিবীতে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি মহাসমারোহে উৎসব করল, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য ত্বরান্বিত করতে; সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বনিয়াদ সুদৃঢ় করে তুলতে তারা লেনিনকে স্মরণ করল। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের চৌহদ্দীর মধ্যে সংগ্রামরত জনগণও লেনিনকে স্মরণ করলেন ঔপনিবেশবাদ ও আধা-ঔপনিবেশবাদের হাত থেকে জাতীয় মুক্তি অর্জনের সংগ্রামকে আরও বেশী কার্যকরী, বেগবতী করে তুলতে। অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার মহান ব্রতে দীক্ষিত জনগণ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে আগুয়ান শ্রমিক-শ্রেণী লেনিনকে স্মরণ করল স্ব-স্ব বিপ্লবী যুদ্ধের বিজয়কে সুনিশ্চিত করতে। লেনিন ছাড়া সংগ্রাম-বিপ্লব এসব ভাবাই যায় না। বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতিটি আঁকেবাঁকে তাইতো প্রত্যেককে ছুটে যেতে হয় ভ্ল্যাদামির কাছে; সাহায্য পরামর্শ নিয়ে নামতে হয় কর্মযজ্ঞে।

ভারতবর্ষের, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার যুব-ছাত্রসমাজ লেনিনকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে স্মরণ করে থাকে। যারা সংগ্রামের প্রতি আস্থাশীল, যারা সমাজ বিকাশের গতিপথের বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন সমূহ বুঝতে ও ত্বরান্বিত করতে বদ্ধপরিকর তাদের কাছে লেনিনকে স্মরণ করাটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়। সংগ্রামরত মানুষকে প্রতিদিনই লেনিনকে স্মরণ করতে হয়। কার্যতঃ, সংগ্রামটা কি, চালু সংগ্রামের সাথে পরবর্তী সংগ্রামের সম্পর্ক কি, সংগ্রামের বন্ধু কে আর শত্রুই বা কে, সংগ্রামকে সফলতার দিকে নিয়ে যাওয়ার পূর্বশর্তই বা কি—এসব প্রশ্নে আমাদের ধারণা, চেতনাকে শানিত করে মহামতি লেনিনের অমূল্য শিক্ষা। আর বাস্তবক্ষেত্রে অসংখ্য সংগ্রামে লেনিনের যোগ্য নেতৃত্ব, কৌশল উদ্ভাবনী ক্ষমতা, তীক্ষ্ন বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রতা আমাদের বাস্তব কার্যক্রম নির্ধারণে সবিশেষ সাহায্য করে। শুধু শানিত তত্ত্বই লেনিন দিয়ে যাননি; তিনি কোন্ অবস্থায় কোন্ কাজটি কি ভাবে কাকে নিয়ে করতে হবে তাও নিজে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে শিখিয়ে গেছেন দেশে দেশে সংগ্রামী জনসাধারণকে। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব-ছাত্র সমাজ, গণতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলবার সংগ্রাম করে আসছে। শিক্ষা জগতের তথা যুবজীবনের জীবন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে আমরা সদাই মুখর। আন্দোলন-সংগ্রাম করে অনেক দাবি আদায়ও আমরা করেছি। কিন্তু আমরা সন্দেহাতীত ভাবে এ সত্য অনুধাবন করি যে দেশ যে ভাবে চলছে বা যারা চালাচ্ছেন তারা ছাত্র-যুবসহ কোটি কোটি জনসাধারণের বেঁচে থাকার দাবিগুলি মেটাবে না। অর্থাৎ যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে এম. এ. পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক হল, বইপত্র বিনামূল্যে দেওয়া হল—তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়—চাকরির কি হবে? স্বাধীন ভারতবর্ষে তিন দশকের অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ মানুষও বলতে পারেন যে উত্তরটা কি হবে।

দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানো, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পত্তি কুক্ষিগত হওয়ার বিষয়ে কি হবে? সেই জন্য প্রগতিশীল যুব-ছাত্র সমাজ তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা ঘোষণা করেছে। বর্তমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থার শোচনীয় সীমাবদ্ধতা, অপদার্থতা থেকেই জন্ম নিয়েছে নূতনকে বরণ করার উদগ্র বাসনা। আর এই একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে গ্রহণ করার সমগ্র প্রক্রিয়াতে যার কাছে আমরা সর্বাপেক্ষা বেশী ঋণী, তিনি কমরেড লেনিন। লেনিনের স্বচ্ছ, সাবলীল যুক্তিনিষ্ঠ "রাষ্ট্র ও বিপ্লব"-এর দর্পণে ভারত রাষ্ট্রের চরিত্র, সীমাবদ্ধতা ও শ্রেণীনীতি আমাদের নিকট দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়। লেনিনের 'রাষ্ট্র' পড়ার সাথে সাথে আমাদের দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের কাজকর্মের দিকে লক্ষ্য রাখলে মনে হয় না যে রুশ বিপ্লবের কদিন পূর্বে রুশ বিপ্লবকে সঠিক খাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি এই মহামূল্যবান দলিল রচনা করেছিলেন। এ যেন ভারতের মাটিতে ভারতীয় বিপ্লবের জরুরী তাগিদেই রচিত বিপ্লবী মহাকাব্য। বিশ্বের প্রতিটি দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে সংগ্রামী মানুষের অভিজ্ঞতা একই রকম। এখানেই লেনিনের অমর প্রতিভা। এখানেই বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।

আমরা লেনিনকে যথার্থ শ্রদ্ধা জানাব কি ভাবে? যথার্থ এ কথাটা ব্যবহার করতে হচ্ছে এই কারণে যে পুঁজিবাদী, এমন কি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিতেও লেনিন মূর্তি স্থাপিত হয়; লেনিন স্মরণে এমন অনেকেই শ্রদ্ধাঞ্জলী উপহার দেন যাঁরা প্রাত্যহিক কাজ হিসাবে লেনিনবাদকে হত্যা করতে প্রয়াসী। তাঁরা যখন লেনিন স্মরণে ভাষণ দেন, শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে যথার্থ শব্দের যাথার্থতা কোথায়। লেনিনের কাজ, শিক্ষা ও সংগ্রাম যাদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিনিধিরাও শুধু মাত্র আজ লেনিন-সভায় উপস্থিত নয়; উপস্থিত এমন অনেকেই যারা মুখে লেনিনবাদের শিক্ষাকে মেনে নিয়েও প্রকৃতপক্ষে তার সারবত্তাকে বাতিল করতে উদ্যত। সকল বিপ্লবের স্বার্থে, শোষিত জনগণের মুক্তির স্বার্থেই লেনিন তার জীবদ্দশায় এক বিরাট সময় ব্যয় করেছেন নানা ধরনের সংশোধনবাদী ধ্যান-ধারণাকে ধূলিস্যাৎ করতে। প্লেখানভ, কাউটস্কি, ট্রটস্কী থেকে শুরু করে অসংখ্য সংশোধনবাদী নেতা ও তত্ত্বের বিরুদ্ধে লেনিনের আপোষহীন সংগ্রাম ব্যতিরেকে আজকের বিপ্লবী সংগ্রামের সুমহান ঐতিহ্য ভাবাই যায় না। দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ ও "বামপন্থী শিশুসুলভ বিশৃংখলার" বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে লেনিনবাদের। এদের সাথে সামান্যতম আপোষের অর্থই ছিল বিপ্লবকে ছুরিকাঘাত করা। তাই তো দেশে দেশে বিপ্লবী সংগ্রামের, লেনিনবাদের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে সংশোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালু রাখা।

আজ যখন সমাজতান্ত্রিক শিবির অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত, যখন "ইউরো কমিউনিজমের" কুহেলিকা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চলছে, যখন একের পর এক বামপন্থী হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, তখন প্রশ্ন ওঠে বৈকি লেনিনকে

যথার্থ শ্রদ্ধা দেখাব কি করে? এ-সবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামই তো লেনিন।

আমরা যখন লেনিনবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার কথা বলি তা কোন অন্ধ আনুগত্য থেকে প্রকাশ পায় না। আমরা এ-কথা বলি কারণ আমরা সমাজটা বদলাতে চাই; আমরা বিপ্লবের সফল পরিসমাপ্তি চাই। আমরা ইন্দোনেশিয়া বা চিলির মত বিপর্যস্ত হতে চাই না বলেই বিপ্লবী মতবাদকে দুর্বল করার সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সজাগ, সতর্ক নির্ভয় হবার তাগিদ অনুভব করি। এসব জানা কথা যে সঠিক মতবাদ ও বিপ্লবী সংগঠন ব্যতিরেকে বিপ্লব সফল হতে পারে না। আর বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার ভিত্তিই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ। লেনিন যখন 'পার্টি তত্ত্ব' সম্পর্কে নিরবচ্ছিন্ন, আপোষহীন সংগ্রাম পরিচালনা করেন তখনই বোঝা যায় মতবাদ ও সংগঠনের জীবন্ত, প্রত্যক্ষ সম্পর্ক।

আমরা যারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে সমাজ পরিবর্তনের ঐতিহাসিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার অনন্দ অনুভূতিতে শিহরিত, একটা বিশাল কর্মযজ্ঞে নিজেদের ভূমিকা রাখতে সদা সচেষ্ট এবং গৌরবান্বিত, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে সমগ্র পৃথিবীর মুক্তির প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করুক এটা আশা করা খুবই অসমচীন কাজ নয়। কিন্তু উল্টোটা যখন ঘটে আমরা দুঃখ পাই। সময়ের তালে দুঃখ ক্ষোভে পরিণত হয়।

আমরা দেশের যুব-ছাত্র সমাজের সার্বিক উন্নতি চাই, আমরা চাই ভারতবর্ষের বুকে সমাজতন্ত্রের বিজয় কেতন; আমরা চাই বিশ্বের দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি ও সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের দ্রুত বিজয় লাভ। তাই সঙ্গত কারণেই সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রশ্নটাও সংগ্রামী যুব-ছাত্র সমাজকে আলোড়িত করে। ঐক্য চাই বলেই আমরা খুঁজে ফিরি অনৈক্য কেন এল? কিভাবে এল?

তাইতো যখন সমাজতান্ত্রিক চীনের নেতৃবৃন্দ মিলিত হয়ে আত্মানুসন্ধান করেন, অতীতের ভুল ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন তখন আমরা ভরসা পাই, উৎসাহিত হই। ত্রুটিমুক্ত হবার সংগ্রামকে আমরা অভিনন্দন জানাই। প্রশ্নটা হচ্ছে ইতিবাচক প্রক্রিয়াটা শুরু করা। প্রশ্নটা হচ্ছে অন্ধকার কাটবে এই ভরসা দেওয়া। দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সংগ্রামে চীন সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ বিশ্ব মুক্তি আন্দোলনের স্বার্থে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব গড়ে তোলার স্বার্থেই আর একবার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবেন, এটা বিশ্বের বিপ্লবী শক্তির সাথে সাথে আমাদের দেশের যুব-ছাত্র সমাজও আশা করে। অবশ্য এসব এখনও আশার কথা, কারণ বিরোধের যে সুউচ্চ প্রাচীর দুই দশকে গড়ে উঠেছে তা অতিক্রম করে ওঠার প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এসবই খুব সামান্য।

কিন্তু বিষয়টা একতরফা নয়; বিশেষ করে অনৈক্য কার্যতঃ যারা সৃষ্টি করলো তাদের ভূমিকা সকলেই বেশী বেশী করে আশা করেন। আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমরা নতুন করে যে ঐক্য গড়ে তুলতে চাই তা স্থায়ী, সুদৃঢ় ও নীতিনিষ্ঠ হবে। স্থায়ী, সুদৃঢ় ঐক্য আনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শর্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা; সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শকে গ্রহণ ও প্রয়োগ করা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে সংশোধনবাদী ও সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতি, যা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিভক্ত করে তুলতে এগিয়ে এসেছে, সে সম্পর্কে কি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হবে? সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণ, জনগণের রাষ্ট্র, জনগণের পার্টি, যুদ্ধ ও শান্তির তত্ত্ব এসব কিছুকেই লেনিনবাদের শিক্ষা আত্মস্থ করে বিশ্লেষণ করা জরুরী কর্তব্য। উৎস মূলে যদি আঘাত হানা না যায় তাহলে ইউরো কমিউনিজম বা ভবিষ্যতের আরও জঘন্য বিকৃতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির জন্য দায়ী সোভিয়েত-চীন নেতৃত্ব এগিয়ে আসতে প্রস্তুত কিনা? তাদের যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে লেনিনবাদকে হত্যা করে তা বাতিল করতে তারা প্রস্তুত কিনা? দু' দেশের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে সামান্য হলেও যে ইতিবাচক ভূমিকা দেখা যাচ্ছে তা সযত্নে গ্রহণ করে আরও বিকশিত করার ক্ষেত্রে যোগ্য ভূমিকা পালন তারা করবে কিনা? সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে মতবিরোধ মেটাবার পদ্ধতি হিসাবে আলাপ, আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক সবই চলতে পারে। কিন্তু তা কোন অবস্থাতেই বর্তমান যে চেহারা নিয়েছে সেই দিকে মোড় নিতে দেওয়া যায় না। বিপ্লবী দলগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও অন্যান্য শোষণভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক বিষয়ে লেনিনের অমর শিক্ষা এক্ষেত্রে পথ নির্দেশক হবে।

ভারতবর্ষের যুব-ছাত্র সমাজ, বিশ্বের মুক্তিকামী জনসাধারণ লেনিনবাদকে স্মরণ করে এই আহ্বানই রাখে যে সমাজতান্ত্রিক শিবির অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ হোক; দেশে দেশে মুক্তির আন্দোলন নতুন গতিবেগ লাভ করুক।

"আমরা শুরু করে দিয়েছি। কখন, কোন্ তারিখে এবং কোন্ সময়ে কোন্ দেশের সর্বহারা এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করবে তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল—বরফ ভাঙা হয়েছে, রাস্তা খোলা হয়েছে এবং পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

—লেনিন

কেন্দ্রীয় বাজেট ১৯৮২-৮৩

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, তাঁর বাজেট অন্যান্য বাজেট থেকে ভিন্ন। তাঁর মতে, তাঁর বাজেটের প্রধান বিশেষত্ব হোল—

(ক) পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বাড়ানো হয়েছে ২৭·৬ শতাংশ।

(খ) ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র ১,৩৬৫ কোটি টাকা, যা যে কোন উন্নতকামী অর্থনীতিতে বহনযোগ্য।

(গ) বাজেট আই. এম. এফ. ঋণ সংক্রান্ত সকল প্রকার অভিযোগ থেকে মুক্ত।

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে আমরা দেখব, অর্থমন্ত্রীর এই দাবি কতটা গ্রহণযোগ্য।

অর্থমন্ত্রী দাবী করেছেন, এই বাজেট পরিকল্পনা খাতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১৯৮১-৮২ সালে বাজেটে পরিকল্পনা খাতে ব্যয়বরাদ্দ ছিল ৮,৬১৯ কোটি টাকা। এই বাজেটে (১৯৮২-৮৩) পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ১১,০০০ কোটি টাকা। পরিসংখ্যানমত এটা ২৭·৬ শতাংশ বৃদ্ধি। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির পরিকল্পনা বরাদ্দ একত্র করলে সর্বমোট পরিকল্পনা বাজেট দাঁড়ায় ২১,১৩৭ কোটি টাকা। গত বছরের তুলনায় এটা ২১ শতাংশ বৃদ্ধি। পরিকল্পনা খাতে এ বছরের বরাদ্দ বেড়েছে সত্য, কিন্তু এর জন্যে বাজেটের অবদান কতটা? ১৯৮২-৮৩ সালের কেন্দ্রের বার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ১১,০০০ কোটি টাকার মধ্যে ৭,৩৪৩ কোটি টাকা হোল এই বাজেটের অবদান। শতাংশের হিসাবে এটা দাঁড়ায় ১৬·৪ শতাংশ বৃদ্ধি। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১৫·৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা খাতে এ বছর রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন সংস্থাগুলি থেকে বাকী ৩,৬৫৭ কোটি টাকা আসবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই অর্থ তো রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ এবং তা সেই সংস্থাগুলিতেই বিনিয়োগ হবে। গত বছর এই রকম অর্থের পরিমাণ ছিল ২,৩১০ কোটি টাকা। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ বাদ দিলে দেখা যাবে পরিকল্পনা বরাদ্দ এ বছর মোটেই বাড়ে নি। হিসেব করলে দেখা যায়, পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ সর্বমোট বাজেট বরাদ্দের ৩৮·৮ শতাংশ। গত বছর তা ছিল, ৩৯·৩ শতাংশ।

অ-পরিকল্পনা খাতে কিন্তু বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে। পরিকল্পনা খাতে বাজেট বেড়েছে ১৬·৪ শতাংশ। অ-পরিকল্পনা খাতে বাজেট বেড়েছে ১৮·৪ শতাংশ। প্রতিরক্ষা খাতে খরচ ধরা হয়েছে মোট ৫,১০০ কোটি টাকা। এটা ১৯৮১-৮২ সালের বাজেটের ২১·৪ শতাংশ বেশি। অপরদিকে, সাধারণ সেবা (শিক্ষা ইত্যাদি), সমাজ ও সমষ্টি সেবা প্রকল্পে এই বাজেটে বরাদ্দ ধরা হয়েছে মোট ১,৩৫৪ কোটি টাকা। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় কমানো হয়েছে। কমানো হয়েছে জনস্বাস্থ্য প্রকল্পে বরাদ্দ। ১৯৮০-৮১ সালে প্রতিরক্ষা খরচ ছিল মোট বাজেটের ১৬ শতাংশ, ১৯৮১-৮২ সালে তা গিয়ে দাঁড়াল ১৬·৯ শতাংশে; প্রণববাবু তাঁর বাজেটে বাড়ালেন ১৭·৪ শতাংশ।

১৯৮২-৮৩ সালের বাজেটে মোট ঘাটতি ব্যয় ঘোষিত হয়েছে ১,৩৬৫ কোটি টাকা। ১৯৮১-৮২ সালে ঘাটতি ছিল ১,৭০০ কোটি টাকা। প্রতি বছরেই, ঘোষিত ঘাটতি ব্যয় শেষ পর্যন্ত এক বড় অঙ্কের ঘাটতিতে পরিণত হয়। এ বছর যে এর তারতম্য ঘটবে তার কোন লক্ষণ নেই। গত বছর বাজেটে ঘোষিত হয়েছিল ১,৫০০ কোটি টাকার ঘাটতি। পরে তা গিয়ে দাঁড়ায় ১,৭০০ কোটিতে। এবারে কিন্তু, প্রণববাবু কেন্দ্রীয় ঘাটতিতে রাজ্য সরকারগুলির ঘাটতি ধরেন নি। রাজ্য সরকারগুলির ঘাটতি প্রায় ১,১০০ কোটি টাকা। কেন্দ্র যদি রাজ্যগুলির এই ঘাটতি ব্যয় গ্রহণ না করে, রাজ্যগুলিকে তার পরিকল্পনায় নানান কাটছাঁট করতে হবে। অথচ রাজ্যগুলির বর্ধিত ঘাটতির প্রধান কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের দাম ও করনীতি, যার ফলে প্রকল্পগুলির খরচ ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে।

রাজাগোপাল ভি. চক্রবর্তী

এ বছরের বাজেটে নতুনভাবে মোট ৫৮৭ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে পরোক্ষ করের মাধ্যমে। এর সবই গিয়ে পড়বে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। অথচ প্রত্যক্ষ করের সুবিধা নতুন করে বাড়ানো হচ্ছে। এবারে আয়করে নানান পরিবর্তনের ফলে মোট ক্ষতি হবে ৪৮ কোটি টাকা। স্ট্যানডার্ড ডিডাকশনের কতিপয় সর্ত ছাড়া সাধারণ মানুষের কিন্তু বিশেষ লাভ হচ্ছে না। আয়কর, সম্পদকর, দানকর এবং মূলধনভিত্তিক করের (Capital Gains Tax) সকল ছাড়ই গ্রহণ করবে ধনিক সম্প্রদায়। গত বছরের Special Bearer Bonds' এর মতন এ-বছরেও নতুন এক Capital Investment Bond বাজারে ছাড়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য একই—নানান ধরনের করছাড়ের মাধ্যমে কালো টাকাকে সরকারী কাজে লাগানো। স্বল্পমেয়াদী সম্পদ সংগ্রহে এই ধরনের প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করলেও, জাতীয় অর্থনীতিতে এর দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া কিন্তু গুরুতর।

আই. এম. এফ. ঋণের একটি প্রধান সর্ত ছিল, রেল, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ ইত্যাদি 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিস' থেকে অধিক পরিমাণে শুল্ক ধার্য করা। আই. এম. এফ. লোন পাওয়ার পরদিন থেকেই রেল ও ডাক-তার বিভাগ বেশ পরস্পরকে পাল্লা দিয়েই শুল্ক বাড়িয়ে চলেছে। গত ডিসেম্বরে কেদার পাণ্ডে বসিয়েছিলেন ৩০০ কোটি টাকার কর। পি. সি. শেঠী বসালেন নতুন ২৬১·৪৫ কোটি টাকা। এই বাজেট চলাকালীন আরও নতুন কর বসানোর সম্ভাবনা রয়েছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ, কেন্দ্রীয় বাজেটে একটা রাজনৈতিক চাতুরী লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মূল বাজেটে (যার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ খুব আগ্রহী) বেশি কর বসানো হচ্ছে না। পরে, সরকারী অর্ডিনান্সের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন শুল্ক বসছে। রেলমন্ত্রী বলেছেন, "যাতে রেলে মানুষ কম চড়ে তার জন্যেই এই নতুন শুল্ক।" যোগাযোগ মন্ত্রী বলেছেন, যোগাযোগের মাধ্যমগুলির কম ব্যবহারই সরকারী শুল্কের লক্ষ্য। হয়ত এর পর প্রধানমন্ত্রী বলবেন, যাতে দেশে মানুষ না থাকে তার জন্যে তিনি কর বসাচ্ছেন। নতুন নতুন শুল্ক বসানোর অর্থ, রেল ও যোগাযোগ দপ্তরে যে প্রচেষ্টা, মনে হয়, এর পর দাড়ি, চুল, গোঁফ ইত্যাদির ওপর কর বসবে। শুনলে হয়ত হাসি পায়, কিন্তু এটাই বাস্তব চিত্র।

অর্থসংগ্রহের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে কর বসানো নিতান্তই মস্তিষ্কের অভাব। সর্বোপরি দেশপ্রীতি ও জনপ্রীতি। আজ দেশের বড় বড় কয়েকটি রেল স্টেশন ছাড়া কোথাও টিকিট চেকিং হয় না। এর জন্যে রেলমন্ত্রী কি ব্যবস্থা নিলেন? ব্যবসায়ীরা ওয়াগনের মাল খালাশ করতে চায় না। মাল খালাশ করলে তা তো গুদামে রাখতে হবে। তার তো খরচ আছে। ওয়াগনকে গুদাম হিসাবে ব্যবহার করলে কোন মাশুল দিতে হয় না। তাছাড়া, মাল খালাশ করলে তা বাজারে ছাড়তে হবে। ওয়াগনে রাখলে ফাটকাবাজী করা যায়। ইচ্ছামত, বাজার দাম বাড়লে মাল খালাশ করা যায়। রেলমন্ত্রী এসব দিকগুলো এড়িয়ে যাত্রী ও মাল পরিবহনে কর বসালেন।

আই. এম. এফ. ঋণের আরেকটি সর্ত ছিল রপ্তানী বাড়ানো এবং আমদানী নীতিকে আরও উদার করা। অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, কোনও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের Export Turnover (রপ্তানীর হার) বাড়লে কর রেহাই দেওয়া হবে। মোট করের দশ শতাংশ পর্যন্ত এই কর রেহাই দেওয়া হবে। বিগত টাকার বৈদেশিক মুদ্রামান হ্রাসের ঠিক পূর্বে এরকম একটা স্কীম এদেশে চালু ছিল। তখন ২ থেকে ১৫ শতাংশ কর রেহাই দেওয়া হোত। পরে টাকার বৈদেশিক মুদ্রামান হ্রাস করে (devaluation) এ ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হয়। এবারও কি সেই অবস্থা হবে?

দেশের সীমিত সম্পদকে বিদেশে পাঠিয়ে দেশের মানুষকে বঞ্চিত করে দেশের অর্থনীতিকে "প্রগতির পথে" নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা বহুদিনের। বহু সরকারী সাহায্য ও কর ছাড় প্রকল্প এদেশে বহুদিন চালু রয়েছে। ১৯৮০-৮১ সালের বাজেটে এই রপ্তানী উন্নতি প্রচেষ্টায় খরচ হয়েছিল ৪২৪·৪২ কোটি টাকা। ১৯৮১-৮২ সালের সংশোধিত বাজেটে খরচ ছিল ৫০৯·৪২ কোটি টাকা। এই খরচের মধ্যে পড়ে প্রত্যক্ষ সরকারী সাহায্য ও কর-ক্ষতি। এই বাজেটে বলা হোল, মোট রপ্তানি উন্নতিতে খরচ হবে ৫৪৫·৪০ কোটি টাকা। কিন্তু অন্য বছরের মতন এবার, বাজেটে কর-ক্ষতি আলাদাভাবে দেখানো হোল না। আই.এম.এফ. লোন সংক্রান্ত দেশব্যাপী বিতর্ক এড়াতে অর্থমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত কি পিছন পথ গ্রহণ করলেন? এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন, অর্থকরী সাহায্য ও কর রেহাই দিয়ে

রপ্তানি বাড়ে না। রপ্তানি বাড়ানোর প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত উৎপাদন বাড়ানো এবং মূল রপ্তানি প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও জোরদার করা। আজকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে রপ্তানি বৃদ্ধির প্রধান কারণ দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিরাট রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত। একচেটিয়া জাহাজী প্রতিষ্ঠানগুলির হাত থেকে রপ্তানি বাণিজ্যকে বাঁচানোর কোন চেষ্টা নেই বাজেটে। নেই প্রশাসনিক গাফিলতি বা লাল ফিতার দুর্বিসহ থেকে মুক্তির কোন পন্থা। এইসব প্রচেষ্টায় উপকৃত হবে কতিপয় অসাধু রপ্তানি লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ী। বিদেশী কোম্পানীর নামে তারা একে অপরের মাল কিনে দেখাবে রপ্তানি বাড়ছে আর সেই সঙ্গে সুযোগ নেবে কর রেহাই এর।

দেশে বিদেশী পর্যটকদের আগমন বাড়ানোর ছুতোয় সরকার পাঁচতারা হোটেল থেকে Hotel Receipts Tax তুলে নিলেন। এর ফলে বছরে সরকারের ৬ কোটি টাকা ক্ষতি হবে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পাঁচতারা হোটেলে সত্যিকারের পর্যটক কেউ থাকে না। থাকে শুধু দেশী ও বিদেশী পর্যটকের দল। ব্যবসায়ীদের আরও নতুন কিছু সুবিধে তুলে দেওয়াই হোল বাজেটের লক্ষ্য।

এ ছাড়া, অবাধ বাণিজ্য অঞ্চলের (Free Trade Zone) উৎপাদিত দ্রব্য দেশে বিক্রয় করার অবাধ সুবিধে ঘোষণা করা হয়েছে এই বাজেটে। এই বাণিজ্য অঞ্চলগুলি যা খুশী আমদানী করতে পারে। এতদিন পর্যন্ত তারা আমদানীকৃত দ্রব্যের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিয়ে বিদেশে পুনরায় রপ্তানি করত। অবশ্য, চোরাপথে বিদেশী দ্রব্যকে দেশীয় বাজারে চালান দিত। এবার, এই মুক্ত ব্যবসা অঞ্চলগুলিকে দেশী বাজারে বিক্রীর সুবিধে দিয়ে সরকার স্মাগলিং-এর বৈধকরণ করলেন মাত্র।

নতুন আমদানী রপ্তানি নীতিতে আই. এম. এফ. ঋণের অপ্রকাশিত সর্তগুলি আরও প্রকট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সরকার ঢালাও ভাবে আমদানি করার সুযোগ দিয়েছে। যেখানে ইতিমধ্যেই ৫,৫০০ কোটি টাকার বাণিজ্য-ঘাটতি রয়ে গেছে, সেখানে নতুন করে উদার আমদানির সুযোগ অনেক সন্দেহেরই উদ্রেক করে। আমদানি করার ঢালাও বাণিজ্যনীতিতে অনেক নতুন জিনিসের নাম ঢোকান হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমদানি করার পরিমাণও বেড়েছে ভীষণভাবে। মুদ্রাস্ফীতির দোহাই দিয়ে সঠিকভাবে লাইসেন্সের সদ্ব্যবহার করেন এমন আমদানিকারীদের আমদানির পরিমাণ ১০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। আর এইসব লাইসেন্স প্রাপকদের যারা ১০ শতাংশ রপ্তানি বাড়াতে পারবে তারা ২০ শতাংশ আমদানি বেশি করার সুযোগ পেয়েছে। এ ছাড়া আন্তঃশুল্কও রেহাই দেওয়া হয়েছে বিরাটভাবে। আগে আন্তঃশুল্ক রেহাই-এর একটা ন্যূনতম স্তর বাঁধা ছিল। আন্তঃশুল্ক মোট এফ. ও. বি. রপ্তানি মূল্যের ৫ শতাংশ দিতেই হত। এখন এই ন্যূনতম স্তরও তুলে দেওয়া হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তির নামেও আমদানি করার বিরাট সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আর. ই. সি. লাইসেন্সধারীরা এখন উদ্যোগী সংস্থার অনুমোদন ছাড়াই ২০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি আমদানি করতে পারবে। আবার কোন প্রতিষ্ঠান যদি তার মোট উৎপাদনের ২৫ শতাংশ গত তিন বছর ধরে রপ্তানি করে থাকে, সে পাবে সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকার আমদানির সুযোগ। আর যারা উৎপাদনের ৫০ শতাংশ রপ্তানি করে, তারা পাবে সীমাহীন আমদানীর সুযোগ। আমাদের বর্তমান কর কাঠামোয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কখনও তার আসল উৎপাদনের হিসাব দেখায় না। এখন সে আরও উৎপাদন কম দেখাবে। কেননা এতে শতাংশেরও হিসেব সহজ হবে আর প্রযুক্তি উন্নতি করার নামে আনা যাবে নানান বিদেশী দ্রব্যসামগ্রী। আর সেগুলো চড়াদামে বিক্রী করা যাবে দেশের বাজারে। নতুন বাণিজ্য নীতিতে এটা পরিষ্কার—আই. এম. এফ. এর সর্তগুলি সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষের অভিযোগ সরকার খণ্ডন করতে পারে নি। আই. এম. এফ. এর সর্ত না থাকলে এত বিরাট বাণিজ্য ঘাটতি রেখে নতুন উদার আমদানি নীতি ঘোষিত হোত না। হতে পারে, নতুন আমদানিতে রপ্তানি বাড়বে। কিন্তু বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া না হলে কখনই এত বড় ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হোত না। দেশ এক বিরাট ঋণ-ফাঁদের মধ্যে পড়েছে। প্রথমতঃ মেটাতে হবে বর্তমান বাণিজ্য ঘাটতি। দেশের সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রা ক্রমশঃ কমছে। এবছরে বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় গত পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম। দ্বিতীয়তঃ মেটাতে হবে আই. এম. এফ. ঋণের সুদ ও আসল। শেষতঃ মেটাতে হবে নতুন আমদানির খরচ। এইসবের প্রতিক্রিয়া এখন বোঝা যাবে না। ঋণ মেটাতে গেলে রপ্তানি বাড়াতে হবে। রপ্তানি বৃদ্ধির হার দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির হারের বেশি হলে, দেশের মানুষের ভাতে টান পড়বে। দাম বাড়বে জিনিসপত্রের। আর তার ভার বইতে হবে সাধারণ মানুষকে।

"একধারে সর্বকিছু থাকে, আর একধারে কোন কিছুই নেই, এই ভারসামঞ্জস্যের ব্যাঘাতেই সভ্যতার নৌকো কাত হয়ে পড়ে। একান্ত অসাম্যেই আনে প্রলয়।...আজ বিশেষ করে মনে রাখবার দিন এসেছে যে, যারা বিশিষ্ট সাধারণ বলে গর্ব করে, তারা সর্বসাধারণকে যে পরিমাণ বঞ্চিত করে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে নিজেকেই বঞ্চিত করে—কেননা শুধু কেবল ঋণই যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা নয়, শাস্তিও উঠছে জমে।"

—রবীন্দ্রনাথ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে পঞ্চায়েতের ভূমিকা

রতন ঘোষ

গান্ধীজীর পঞ্চায়েত রাজের মূল কথা ছিল পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে গড়ে তোলা। পশ্চিমবঙ্গে সেই পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচন হয়ে গেল ১৯৭৮ সালের জুন মাসে। প্রায় ১৮ বছর পরে এই নির্বাচন হল। প্রায় ১০টি গ্রাম সভা নিয়ে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত বা অঞ্চল এবং ১০টা গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে একটি পঞ্চায়েত সমিতি। এই সমিতি সাধারণত একটি ব্লকের সমান।

১৯৭৮-এর আগে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম চলত ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে। তখন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সম্পদ ছিল ১০ হাজার টাকার মত। পাঁচ হাজার টাকার মতো কর বাবদ এবং পাঁচ হাজার টাকার সরকারী অনুদান। এই অর্থ সাধারণত খরচ হতো গ্রামের উন্নতির জন্য। কিন্তু যেহেতু মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী লোক বেশির ভাগ ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালনা করত, তাই বেশির ভাগ অর্থই হয় অপব্যবহার নয় চুরি হতো। সেইজন্যই ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এই পঞ্চায়েতের কোনো নির্বাচন হয় নি। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম সিদ্ধান্ত নিল এই পঞ্চায়েতগুলিতে নির্বাচন করার। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩২৪২টা গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩২৪টা পঞ্চায়েত সমিতি এবং ১৫টা জেলা পরিষদ আছে। ১৯৭৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক দলগুলির অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংগঠিত হল এবং বামফ্রন্টের দলগুলি এই ত্রিস্তরের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় বেশীর ভাগ আসন লাভ করতে সক্ষম হল। এইবার এই পঞ্চায়েতে সমাজের বিভিন্নস্তরের সংখ্যার দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন বিভাগ ১০০টা গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়েছে। এই সমীক্ষা অনুসারে সাধারণ গ্রামের চাষী ছেলেরা মোট সদস্যের প্রায় অর্ধেক। শতকরা প্রায় ১৪জন ছিল শিক্ষক, গ্রামের খেতমজুর ও ভাগচাষী ছিল শতকরা ৮জন এবং বেকার ছিল শতকরা ৮জন।

বামফ্রন্ট সরকার এই পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার উপর গ্রামের উন্নয়নের সমস্ত দায়দায়িত্ব দিয়েছিল। এখন একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে টাকা এবং গম অথবা চাল নিয়ে প্রায় ৫০ হাজার টাকার মতো আছে। কিন্তু বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই টাকাটা গ্রামের মধ্যে কি ভাবে খরচ হবে সেটা ঠিক করবে গ্রাম পঞ্চায়েত। সাধারণত নিয়ম আছে, যদি কোনো পরিকল্পনা ৫০০০ টাকার বেশী হয়, তবে পঞ্চায়েত সমিতির পরামর্শ নিতে হবে, অথবা যদি ৫০,০০০ টাকার বেশী হয় তবে জেলা পরিষদের পরামর্শ নিতে হবে। কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতি অথবা জেলা পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকা কি ভাবে খরচ হবে, সে সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ ব্যতীত অন্য কিছুই করতে পারে না। ধরা যাক, কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত ঠিক করল তাদের টাকা নিয়ে তারা গ্রামের মধ্যে একটা মন্দির করবে, তাহলে সেটা তারা করতে পারে, অথবা ঐ টাকা রাস্তা বা অন্য উন্নয়নে ব্যবহার করতে ইচ্ছে করলেও তারা তা পারে। এক কথায় পঞ্চায়েতেই পরিকল্পনা করবে এবং কাজে রূপায়িত করবে। অর্থাৎ যে কোনো জনসদস্যের পরামর্শ অনুসারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, গ্রামসভার সদস্যরা গ্রামের লোকের সাধারণ সভা ডেকে এই পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করে। প্রথম দু' বছরে প্রায় সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি গ্রামের রাস্তা উন্নয়ন অথবা নতুন রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা নেয় এবং বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত খাল কেটে সেচের উদ্যোগও গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনাগুলি সাধারণত প্রত্যহ কাজের বদলে খাদ্য এবং গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে রূপায়িত হয়। এই কার্যসূচিগুলিতে শ্রমের মজুরী টাকা ও গম অথবা চালে দেওয়া হয়। মজুরীর হার সাধারণত দু' টাকা নগদ এবং তিন কেজি গম অথবা দু' কেজি চাল।

এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পঞ্চায়েতকে অর্থ সম্পদ ও দায়িত্ব দিয়ে শেষ হয়ে যায় নি। উদ্দেশ্য ছিল (১) শাসনক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, কারণ বিস্তারিত আঞ্চলিক জ্ঞানের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কোথায় কাজ হবে, কি কাজ হবে। এই সিদ্ধান্ত উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে গ্রামের প্রয়োজনের সাথে গ্রাম উন্নয়নের কর্মোদ্যোগের এক নিবিড় সম্পর্ক থাকছে, যা এর আগে ছিল না। এ ব্যবস্থায় ভুল কি হচ্ছে না? নিশ্চয়ই হচ্ছে, সব ব্যবস্থাতেই হয়। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ভুল যাই হোক, নানা কাজকর্মের মধ্যদিয়ে অভিজ্ঞতা বাড়ছে এবং ভুলের সম্ভাবনা কমছে। (২) গ্রামীণ ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ, পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে আজ গ্রামের মানুষ নানা ব্যাপারে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে পারছে।

উন্নয়নমূলক কাজ পঞ্চায়েতের কর্মসমিতির অন্তর্গত।

এইবার দেখা যাক, গত তিন বছরে পঞ্চায়েতরাজ গ্রামের উন্নয়নের জন্য কি করেছে। প্রথমেই বলা যায়, গ্রামের মানুষ এই প্রথম তাদের ক্ষমতার কথা বুঝতে পারল। পরিকল্পনা তৈরি করা এবং তাকে রূপায়িত করার মধ্যে দিয়ে গ্রামগুলির মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত যে টাকাটা পায়, সেই টাকাটা প্রয়োজন অনুপাতে বিভিন্ন গ্রামসভার মধ্যে বণ্টন করে। এইবার একটা গ্রাম সভার (একটা বা দুটো গ্রাম নিয়ে একটা গ্রামসভা) কথা ধরা যাক। সাধারণত একটি গ্রামসভা ৫ হাজার টাকার মতো টাকা এবং গমে পায়। এই গ্রামসভায় ঐ টাকার ভিতর কোন্ কোন্ পরিকল্পনাগুলি নেওয়া হবে সেটা ঠিক হয় সাধারণত গ্রাম পঞ্চায়েতে বসে, ঐ গ্রামসভার ব্যাপারে আজ পঞ্চায়েতকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে—কোন রাস্তা হচ্ছে, ধর্মগোলা হচ্ছে না কেন? নলকূপ এখানে বসছে, ঐ গ্রামে নয় কেন, কাজের বদলে খাদ্যের টাকা এইভাবে খরচা হ'ল ইত্যাদি। আজ বহু পঞ্চায়েতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, সমর্থন চলছে। কোনো সিদ্ধান্তই একতরফা হতে পারছে না।

(৩) গণশ্রম ও স্বনির্ভরতা, বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পঞ্চায়েত আজ কাজ সৃষ্টি করতে পারছে। তবে এই কর্মসূচির পরিমাণ শুধু টাকার মূল্যে হওয়া সম্ভব নয়, আজ অনেক জায়গাতেই গ্রাম উন্নয়নের কাজে মানুষ এগিয়ে আসছে, অল্প সময়ে, একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে অনেকখানি কাজ করে ফেলেছে। একটা উদাহরণ দিই,—বর্ধমানের একটি ছোটো বাঁধ নির্মাণের জন্য সরকারী হিসেব ছিল প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। সেই কাজ টাকা ও গম যোগ দিয়ে মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় সমাধা হয়েছে। আর একটা উদাহরণ দিই, ২৪-পরগণার সোনারপুরের পশ্চিম দিকে একটি খালের প্রয়োজন ছিল বহু দিনের। সরকারী হিসেবে ৩ লক্ষ টাকার কমে এ খাল করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ১৯৭৯ সালে গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই খাল কাটা হয়েছে, টাকা ও গম মিলিয়ে মোট খরচ পড়েছে তিরিশ হাজার টাকা।

কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচি বা গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রথম দু'বছরের মধ্যেই রাজ্যের প্রায় সমস্ত পঞ্চায়েতগুলিতে প্রায় সবগুলি পুরানো রাস্তা মেরামত অথবা নতুন রাস্তা তৈরির কাজ সমাধা হয়েছে এবং বেশ কিছু পঞ্চায়েতই কিছু বাঁধ ও খাল কাটার কাজ সমাধা করেছে। এবং প্রায় সর্বত্রই দেখা গেছে পূর্বের উদাহরণের মতো সরকারী হিসাবের থেকে কম খরচেই কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন এটা নয় যে পঞ্চায়েত কতগুলো কাজ বা কত রাস্তা করল। কাজের বদলে খাদ্য এবং গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচির অন্য আর একটা দিক আছে। যার ফল সুদূরপ্রসারী। এই কর্মসূচিগুলি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, বিশেষ করে খরাক্লিষ্ট এলাকাগুলিতে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীদের কাছে এক বিরাট আশীর্বাদ হিসেবে এসেছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে যখন মাঠে সাধারণত ধান থাকে না দিনমজুরদের তখন বসে থাকতে হয়। এর ফলে গ্রামের জোতদার এবং ধনী চাষীদের কাছে তারা এই সময় খাবার জন্য ধান ধার নেয়। যার ফল পরের ধান তোলার সময় অল্প মজুরীতে বড় চাষীদের জমিতে তারা চাষ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু কাজের বদলে খাদ্য এবং গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের ফলে গ্রামের বড় লোকদের ওপর ক্ষেতমজুর এবং গরীব চাষীদের নির্ভরশীলতা বেশ কিছু পরিমাণে কমতে থাকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই দুটো কর্মসূচি কিন্তু বামফ্রন্টের আমলের নয়। এটা বহু বছর ধরে কংগ্রেসী আমলেই প্রচলিত ছিল। কেন্দ্রের জনতা সরকারের সময় প্রথম এই কর্মসূচি রূপায়ণের উপর জোর দেওয়া হয়। এবং পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারই

ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে সবচেয়ে সার্থকভাবে এই কর্মসূচিগুলিকে রূপায়ণ করে। কিছুটা অর্থনৈতিক লাভ হল। তাদের রাজনৈতিক সচেতনতাও কিছুটা বৃদ্ধি পেল।

একনজরে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী
এবং
জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থানের কর্মসূচী
রূপায়ণের হিসাব

পশ্চিমবঙ্গ

খরচ	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১
(১) নগদ টাকা (লক্ষ টাকা হিঃ)	৩,৯০৫·৫০	১,৩৭৬·৮৩	১,৪৫৮·৮৬
(২) খাদ্যশস্য (টন হিঃ)	১,২৬,৩৫৬	১,৪৯,৫৯৭	৮৩,২৫০
সাফল্য			
(১) শ্রম-দিবস সৃষ্টি (লক্ষ হিঃ)	৫৩৩·৪৪	৫৪০·৫০	৩২৮·৫১
(২) সেচ (হেক্টর হিঃ)	৪৫,২১০	১২,১৮০	৩৪,৯৬৩
(৩) বন্যা নিয়ন্ত্রণ (হেক্টর হিঃ)	৭৫৮	২৫,৫৪৩	১৭,০৭৬
(৪) রাস্তা নির্মাণ (কিলোমিটার)	৩৫,৫৩০	২২,৭০৮	১৩,১২১
(৫) ভূমি সংরক্ষণ (হেক্টর হিঃ)	৫,৭৫৪	১,৮৯০	৪,০২২

(সূত্রঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থনৈতিক পর্যালোচনা, ১৯৮১-৮২)

১৯৮০-৮১ সালে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য খাদ্যশস্য সরবরাহ ৫ শতাংশ হ্রাস না করলে শ্রম-দিবস সৃষ্টির সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেত।

এই কর্মসূচিগুলির মাধ্যমে ১৯৭৮-৭৯ সালে প্রায় ৫ কোটি শ্রমদিবস গ্রামাঞ্চলে তৈরি হয়। এবং ১৯৭৯-৮০ সালে এই সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৫ কোটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। এর অর্থ, এই কর্মসূচিগুলি রূপায়ণের মাধ্যমে গরীব চাষী এবং ক্ষেতমজুররা সাড়ে ৫ কোটি শ্রমদিবস বাড়তি কাজ পেল।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১ সালের আদমসুমার অনুযায়ী প্রায় ৩০ লক্ষ ক্ষেতমজুর আছে এবং ২৬ লক্ষ গরীব চাষী পরিবার আছে যাদের জমি ১ একর বা ৩ বিঘার কম; সুতরাং দেখা যাচ্ছে যদি ধরেও নিই এই সমস্ত পরিবারগুলি এই গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করেছে, তা হলে বছরে গড়ে পরিবার পিছু ২০ শ্রমদিবস অতিরিক্ত তাদের কাজের সংস্থান হয়েছে। কিন্তু আসলে এই কর্মসূচিগুলিতে গড়ে জনপ্রতি প্রায় ৫০ শ্রমদিবসের সৃষ্টি হয়। এর ফলে ক্ষেতমজুরদের মজুরীর ক্ষেত্রে দর কষাকষি আগের থেকে অনেক বেশী বেড়েছে, যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় (১৯৮০-৮১) দেখতে পাচ্ছি, ক্ষেতমজুরদের গড় মজুরি ১৯৭৬-৭৭ সালে ছিল ৫·৬৫ পয়সা তা ১৯৭৯-৮০তে বেড়ে হ'ল ৬·৭৫ পয়সা। সাধারণ ভাবে ক্ষেতমজুর এবং গরীব চাষী পরিবারের

পঞ্চায়েতের অন্য দিক নিয়ে আলোচনা করার আগে ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরের অভূতপূর্ব বন্যায় পঞ্চায়েতের ভূমিকার কথা কিছুটা বলা যাক। এই বন্যায় সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল প্রায় দেড় কোটি মানুষ। ৮০০-র ওপর মানুষ এবং প্রায় দুই লক্ষ গবাদি পশু প্রাণ হারিয়েছে। প্রায় ১৯ লক্ষ বাড়ি ধ্বংস অথবা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তখন সবেমাত্র গঠিত পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি বন্যার্তদের উদ্ধার এবং ত্রাণকার্যে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে তা চিরদিন স্মরণ রাখার মতো। "নিজে বাঁচবো, অপরকে বাঁচাবো" এই ছিল পঞ্চায়েতের প্রধান স্লোগান। পঞ্চায়েতগুলি গ্রামের জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও যৌথ চেতনা সৃষ্টি করতে বিশেষ ভাবে সফল হয়েছে।

গৃহনির্মাণের জন্য ২৪ কোটি টাকা এবং ১৮,৭৫০ টন গম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিলি করা হয়। ক্ষতির পরিমাণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। যাদের বাড়িঘর একেবারে ভেঙে পড়েছিল, তারা পেয়েছিল ৪০০ টাকা ও ৩০ দিনের শ্রমদিবসের মজুরী। অর্থাৎ নগদ ৬০ টাকা ও ৯০ কেজি গম। উল্লেখ্য, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে এই শ্রম ব্যবহার করা হয়েছে। 'নিজের বাড়ি নিজে তৈরি কর', এই স্লোগান গ্রামের জনগণের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এই বিধ্বংসী বন্যা এবং তার পুনর্গঠনের কাজে পঞ্চায়েত সাধারণ মানুষের অনেক কাছাকাছি এসেছে।

এসব দেখে মনে হয় যে, পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা একেবারে দোষত্রুটি মুক্ত। কিন্তু পঞ্চায়েতের কাজকর্মের ভিতর কিছু কিছু ভুলত্রুটির ঝোঁকেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। পঞ্চায়েত সদস্যদের সাধারণ মানুষের সাথে যোগসূত্র রেখে গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনাগুলির নির্ধারণ এবং রূপায়ণ সব সময় সম্ভব হচ্ছে না। যেখানে সম্ভব হচ্ছে না সেখানেই পঞ্চায়েত সদস্যদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর ঝোঁক বাড়ছে। তার ফলে পরিকল্পনাগুলি সবক্ষেত্রে সার্থক হয়ে উঠছে না। জনগণের সাথে যোগসূত্র ছিন্ন হলেই দুর্নীতির সম্ভাবনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই পঞ্চায়েতগুলিও পূর্বের কংগ্রেসী আমলের ইউনিয়ন বোর্ডের মত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করছে। যেখানে যেখানে পঞ্চায়েতের কাজকর্মের উপর স্থানীয় জনসাধারণ এবং রাজনৈতিক দলগুলির সজাগ দৃষ্টি থাকছে না সেখানে এই দুর্বলতাগুলি দানা বাঁধতে সুযোগ পাচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে তাদের নিজস্ব পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বলেই একথা ভাবলে চলবে না সবক্ষেত্রে তারা সঠিক পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করতে পারছে। পঞ্চায়েতগুলির পরিকল্পনা-গুলি দেখার সর্বক্ষণের কর্মীর অভাবে কিছু কিছু জায়গায় এই পরিকল্পনাগুলি সার্থকভাবে রূপায়িত হচ্ছে না। পঞ্চায়েতের কাজকর্মের কিছু ত্রুটির জন্যে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাকে সাধারণভাবে দোষ দিলে চলবে না। আমরা কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটার পরিবর্তে যদি নিজেদের পা কেটে ফেলি, তাহলে দোষ আমাদের, কুড়ুলের নয়।

একথা স্বীকার করতেই হবে, পঞ্চায়েতরাজের শাসন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রামীণ ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ, গণশ্রম ও স্বনির্ভরতার উপর ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন আজকে সার্থক রূপ নিতে যাচ্ছে। কিছু দোষত্রুটি থাকলেও, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা শুধু-মাত্র গ্রামীণ অর্থনীতিকে কিছুটা চাঙ্গা করেছে তাই নয় গরীবদের আত্মসম্মানের সাথে বড়লোক-দের উপর নির্ভরতাকে কমিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। তাই যখনই পুঁজিপতি ও জোত-দারের প্রতিনিধি ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ঠিকমতো না চালানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছে তখনই মনে হয়, সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েত সঠিক পথেই চলছে।

এল সালভাদোর ও তুরস্কে গণহত্যার প্রতিবাদে

পশ্চিমবঙ্গের লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা এল সালভাদোর ও তুরস্কের গণহত্যার প্রতিবাদ করেছেন। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ এক বিবৃতিতে বলেছেন—ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানপর্বে এশীয় ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "দৈত্যরা জেগে উঠেছে মানুষের সমাজে। মানুষের প্রাণ যেন তাদের খেলার জিনিস।" তারপর অনেকগুলি দশক অতিক্রান্ত। পৃথিবীর দেশে দেশে প্রাণঘাতী অস্ত্র হাতে দৈত্যশক্তির আস্ফালন আমরা দেখেছি। আমরা শুনেছি হাজার লক্ষ শহীদ জীবনের অন্তিম ঘোষণা—মুক্তির সংকল্প। দেখেছি দেশে দেশে দৈত্যশক্তির নির্মম পরাজয়। মুক্তিকামী মানুষের বিজয় অভিযান। কিন্তু তবু সাম্রাজ্যবাদী ও স্বৈরতান্ত্রিক শক্তিগুলি পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রধান বিপদ হিসাবে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

মধ্যপ্রাচ্যের দুটি দেশ এল সালভাদোর ও তুরস্কের বুকে সাম্প্রতিককালে ব্যাপক গণহত্যার যে সব খবর সংবাদপত্র মারফৎ প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে যে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই উদ্বিগ্ন হবেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ্য প্ররোচনা এবং সব রকম মদতে পুষ্ট দুটি দেশের সামরিক জুন্টা সরকার দেশের মানুষের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে এমন এক হত্যালীলায় মেতে উঠেছে যা ইন্দোনেশিয়া, চিলি ও ইরাণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। "গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট স্বৈরতান্ত্রিক জুন্টা সরকারের গণহত্যা অভিযানের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করছে এবং রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সনদ ও গণতন্ত্রের মৌল শর্তগুলি মেনে নিয়ে অবিলম্বে সালভাদোর ও তুরস্কসহ অন্যান্য দেশে ঘাতকী অভিযান বন্ধ করার দাবী জানাচ্ছে।

এল সালভাদোরের বুকে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র পদদলিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তায়, শ্রমিক ব্যারাকে চলছে গণহত্যার স্রোত। সামরিক দমন-পীড়ন মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছে। এ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল সাম্প্রতিক বিবৃতিতে বলেছে "এল সালভাদোরের জুন্টা সরকার পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা ও অত্যাচার চালাচ্ছে।" মিলিটারী হেলিকপ্টার থেকে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে নিরপরাধ শিশু ও নারীদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হচ্ছে। চলছে গুপ্ত হত্যা। একমাত্র ১৯৮১ সালে ৩০ হাজারের বেশী মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছে। '৮২ সালের বর্তমান সময় পর্যন্ত পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে ২০ হাজারের মতো শ্রমিক, কৃষক, যুবক, নারীশিশুকে, রোমান ক্যাথলিক, পাদ্রী, চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনবিদ, সাংবাদিক, লেখক, শিল্পী, গায়কসহ সর্বস্তরের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ সেনাবাহিনীর হত্যাভিযানের শিকার হচ্ছেন। বিনাবিচারে হাজার হাজার মানুষকে বন্দী করা হচ্ছে, খুন করা হচ্ছে বন্দীশালার অন্ধকারে। সংবাদপত্রের ওপর কড়া সেন্সরব্যবস্থা, সত্য সংবাদ প্রকাশের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। অসংখ্য সাংবাদিক কারান্তরালে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি কার্যত জুন্টা সরকার ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মুখপত্র হয়ে সংবাদ পরিবেশন করে বিশ্বের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সচেষ্ট। সেনাবাহিনী ও মার্কিন যুদ্ধবাজদের জন্য খাদ্য মজুত করার ফলে দেশব্যাপী চরম খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। সালভাদোর-এর মুক্তিকামী মানুষের বিজয় অভিযান ঠেকাতে বিপুল অস্ত্রসম্ভার গড়ে তোলার জন্য শাসকগোষ্ঠী চরম অর্থনৈতিক শোষণ নামিয়ে এনেছে শ্রমজীবী মানুষের ওপর।

তুরস্কের ঘটনাবলীও কম উদ্বেগজনক নয়। তুরস্কের নির্বাচিত সংসদ ভেঙে দিয়ে, গণতান্ত্রিক সংবিধান বাতিল করে, বিরোধী রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করে ক্ষমতাসীন সামরিক সরকার লাগামহীন শোষণ ও অত্যাচারে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। জুন্টা শাসনের গত এক বছরে ন্যূনপক্ষে ১৫ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে পরিকল্পনা অনুসারে। ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেসের রিপোর্টে দেখা যায় সামরিক শাসকদের "দেখামাত্র গুলি করো" নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্কের রাজপথে গড়ে প্রতিদিন ২০ জনকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হচ্ছে। ১৯৮০ সালে জুন্টা শাসন কায়েম হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ মানুষ বিনাবিচারে বন্দী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। এ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, "বন্দীদের অধিকাংশই বিরোধী রাজনৈতিক দলের ও গণসংগঠনের সদস্য। বন্দীদের ওপর চলছে অমানুষিক অত্যাচার। বৈদ্যুতিক শক দিয়ে বহু বন্দীকে চিরকালের মতো পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে, উলঙ্গ করে বন্দীদের ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য।" ঐ রিপোর্টেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বন্দীদের ওপর নির্যাতনের ফলে গত বছরে প্রায় ১০০ জনের মৃত্যু ঘটেছে বন্দীশালার অন্ধকারে। তুরস্কের জুন্টা সরকার ফাঁসি ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে ইতিমধ্যে ৪ হাজার জনকে ফাঁসি দিয়েছে। ফাঁসির মৃত্যুদণ্ডাদেশ নিয়ে প্রহর গুণছেন আরও ৩ হাজার বন্দী মানুষ। এর মধ্যে রয়েছেন তুরস্কের বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন কনফেডারেশন অব্ রেভ্যেলুশনারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ৫২ জন নেতা। সালভাদোরের মতোই তুরস্কের সংবাদপত্রের সমস্ত স্বাধীনতা ও অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অসাবধানতাবশতঃ যাতে একটি সত্য কথাও প্রকাশ না পায় তার জন্য সামরিক সেন্সর কর্তৃপক্ষ চোখে আতস কাঁচ লাগিয়ে সেন্সর ব্যবস্থাকে কার্যকরী করেছে। ইস্তাম্বুলের বহুল প্রচারিত দৈনিক 'মিলায়েত'-এর সাংবাদিক মমতাজ সোয়েসালে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—"সাংবাদিকদের পক্ষে এখন কিছু লেখাটাই আতঙ্কের ব্যাপার।" তুরস্কের সমাজ সচেতন লেখক শিল্পীদের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা আজ লুপ্ত। সৃজনশীল সাহিত্য, যা গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধে উদ্ভাসিত, তাকে খর্ব ও লুপ্ত করার সমস্ত আয়োজন গ্রহণ করা হয়েছে। পুস্তক নিষিদ্ধ করা হচ্ছে, পত্র-পত্রিকায় কড়া সেন্সর ব্যবস্থা, সন্দেহভাজন মনে হলেই হয় জেল নয় গুপ্ত হত্যা। তুরস্কের বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক ইয়ালমাজগুণে বাধ্য হয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করে বিদেশে নির্বাসিত। তাঁর সমস্ত ছবি তুরস্কে প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তুরস্কের জুন্টা সরকারের স্বরূপ সম্পর্কে ব্রিটিশ লেবার পার্টির এম. পি. টমাস ডরউইন সম্প্রতি তুরস্ক থেকে ফিরে এসে বলেছেন, "গণতন্ত্র বলে সেখানে কিছু নেই। মৌলিক মানবাধিকার প্রতিনিয়ত লঙ্ঘন করা হচ্ছে।" তাঁর ভাষায়—"তুরস্কে এমন একটা সরকারের শাসন চলছে, যাকে দেশের অধিকাংশ মানুষ ঘৃণা করে।"

আশার কথা, সালভাদোর ও তুরস্কের শ্রমজীবী গণতান্ত্রিক মানুষ আজ অকুতোভয়ে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার অর্জন ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে সংগ্রাম করে চলেছেন। এটাই ইতিহাসে জ্বলন্ত সত্য। এই মুক্তিকামী মানুষের বিজয় অভিযান প্রত্যক্ষ করে এদেশের জুন্টা সরকার ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হৃদ্‌কম্পন শুরু হয়েছে। তুরস্কের শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মানুষ দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই করছেন। আই.এম.এফ. ঋণের শর্তে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অবাধ অনুপ্রবেশের মার্কিন কৌশল আজ বিশ্বের মানুষ ক্রমশঃ ধরে ফেলছে। ভারতের স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী শর্তাধীনে আই. এম. এফ. ঋণ গ্রহণ করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতে চাইছে। ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মার্কিন অনুপ্রবেশ-গ্রাস বিস্তার লাভ করছে। গণতান্ত্রিক অধিকার অপহৃত হচ্ছে। সালভাদোর ও তুরস্কে গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামে সামিল হওয়ার জন্য গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ সর্বস্তরের লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে।

অথচ সমস্যাটা কেবল বেড়েই চলেছে। যদিও দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান আমলা পর্যন্ত সকলেই তাঁদের বক্তৃতা-ভাষণ-বাণী প্রদানের সময় বিষয়টি বারংবার উল্লেখ করছেন, আকুল আবেদন জানাচ্ছেন,—কিন্তু যাঁদের উদ্দেশ্যে আহ্বান তাঁরা নির্দ্বিধায় হৃষ্টচিত্তে, আত্মসন্তুষ্টিতে ডগমগ হয়ে স্বর্ণসুখের সন্ধানে দেশের মায়া কাটিয়ে বিদেশের দুয়ারে হাজিরা দিচ্ছেন। এবং দেশীয় বিজ্ঞানী. প্রযুক্তি-বিজ্ঞানী, চিকিৎসক তথা বিভিন্ন বিশিষ্ট বিদ্যায় পারদর্শী মানুষের উন্নত দেশে যাত্রার হার দিন দিন বাড়ছে। ফলশ্রুতি,—দেশের সামগ্রিক ক্ষতি, আর উন্নত দেশগুলির আরও উন্নতি।

এহেন সমস্যায় ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত দেশই আজ জর্জরিত। দারিদ্র লাঞ্ছিত তৃতীয় বিশ্বের দেশে জন্মগ্রহণ করে. সে দেশের কষ্টার্জিত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে শিক্ষিত করে বিদেশের সেবা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়; বরং লজ্জাজনক। স্বদেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের রক্তের বিনিময়ে উপার্জিত অর্থের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিপালিত করে বিদেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ কি দেশদ্রোহিতার সমতুল্য নয়? এসব প্রশ্নের জবাবে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞের দল অনেক যুক্তির অবতারণা করেন। যেমন,—বিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানীর সুযোগ এ দেশে নেই। উন্নত দেশে বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ অনেক বেশী। বিজ্ঞানের উন্নতির অর্থ সামগ্রিকভাবে সমাজ-সভ্যতার উন্নতি। দেশকে যথেষ্টভাবে বৈদেশিক মুদ্রায় পুষ্ট করা যায়। ইত্যপ্রকার বিভিন্ন যুক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী সন্দেহ নেই। কিন্তু এইসব সদাশয় মহাশয় ব্যক্তিদের কাছে সবিনয় নিবেদন,—

আপনাদের গবেষণায় উদ্ভাবিত পণ্য-সামগ্রীর বিক্রয়ের মাধ্যমে কোন্ সংস্থা তথা কোন্ দেশ লাভবান হচ্ছে! আপনাদের বিজ্ঞানচর্চা মানব-সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে কি? আপনাদের পরিশ্রমের ফলে কি আপনার স্বদেশেই বহুমূল্যে বিক্রীত হচ্ছে না? আপনি স্বীয় নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করে যে দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন অথবা করবেন বলে ভাবছেন সে দেশ কি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বহুমূল্যে বাতিল প্রযুক্তিগত কলাকৌশল (scrap technology) বিক্রী করছে না? এ জাতীয় অসংখ্য প্রশ্নবাণে দেশান্তরী বিশেষজ্ঞদের জর্জরিত করার বদলে (কারণ, 'চোরা না শোনে ধর্মকাহিনী') দেখা যাক প্রতিনিয়ত 'মগজ চালান' (brain drain) কি অবস্থার সৃষ্টি করছে? হিসেব কষা যাক আমরা কতটুকু হারাচ্ছি আর ওরা কত লাভবান হচ্ছে। আর তার সঙ্গে দেখা যাক বিশেষজ্ঞদের দেশত্যাগ কিভাবে বন্ধ করা যেতে পারে।

"রাষ্ট্রসংঘের প্রযুক্তি-বিজ্ঞান ও উন্নয়ন সংক্রান্ত

মগজ চালান ঃ কার ক্ষতি কে লাভবান

সম্মেলন", সংক্ষেপে আংক্‌টাড (United Nations Conference on Technology And Development) তাদের সমীক্ষায় বলেছে, "উন্নয়নশীল দেশগুলির ৪ লক্ষ ২০ হাজার বিশেষজ্ঞ ১৯৬০ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত পনের বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন।" অবশ্যই এদের বেশীর ভাগই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু আজকেই নয় দীর্ঘদিন ধরেই অন্যান্য দেশের মানুষদের নিজের প্রয়োজনে আশ্রয় দিয়ে আসছে। ইতিহাসের পাতায় নজর দিলে দেখা যাবে যে সময় আমেরিকার প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ব্যাপারে প্রচুর শ্রমশক্তির প্রয়োজন ছিল সেই সময় অর্থাৎ সপ্তদশ শতকেও সেখানে অন্য দেশ থেকে বিশেষতঃ আফ্রিকা থেকে মানুষ আমদানি করা হত। পরবর্তীতেও এই ব্যবস্থা চালু থেকে যায়। কৃষিকার্য ও বিভিন্ন শিল্পসংস্থা সংস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণ বিদেশীকে নাগরিকত্ব প্রদান করে। নিজের দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদেশ থেকে বিভিন্ন কাজের উপযোগী লোকের সংগ্রহ-প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল ধরেই চালু রেখেছে। আজ কেবল সেই ধারাবাহিকতাই রক্ষিত হচ্ছে।

অমিতাভ রায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ১৯৩০-এর দশকে প্রায় ৬ লক্ষ ইয়োরোপীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। হিটলারের নাজী পার্টির অত্যাচারে আক্রান্ত এই সব মানুষের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া প্রাণ বাঁচানোর অন্য কোন উপায় ছিল না। অবশ্যই এই সব মানুষের মেধা-শ্রম ব্যবহার করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিধা করে নি। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, এনরিকো ফের্মি, এমিলিও সেগ্রে, লিও শিলার্ড, হ্যান্স বেথে, জেমস্ ফ্র্যাঙ্ক, পিটার ডিবে, লুডউইগ ভন মিসেস, ইউজিন উইগনার, নীলস্ বোর, হেরম্যান মার্ক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বীয় ক্ষেত্রের অবদান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। আজও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সব নাগরিক নোবেল পুরস্কারে পুরস্কৃত হন তাঁদের শতকরা ৩০ ভাগ জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিক নন। আর পদার্থ-বিজ্ঞান এবং রসায়নে নোবেল পুরস্কার পাওয়া বৈজ্ঞানিকদের ৪০ শতাংশ মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। ডক্টরেট এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পাওয়া মার্কিন বিশেষজ্ঞদের ৫৭ শতাংশ জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিক নন। জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকদের মাত্র ৩০ শতাংশ ডক্টরেট অথবা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ডিগ্রী লাভ করেন। এটা একেবারে সাম্প্রতিক চিত্র।

১৯৪৯ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত এই ২৮ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদেশ থেকে ২ লক্ষ ৭০ হাজার সুশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ আমদানি করেছে, তার মধ্যে ১ লক্ষ ২৮ হাজার প্রযুক্তি বিজ্ঞানী (ইঞ্জিনিয়ার), ৮৫ হাজার চিকিৎসক (ডাক্তার), ৪৭ হাজার বিজ্ঞানী, এবং অন্যান্য শাখার ১০ হাজার গবেষক ছিলেন। এইসব বিশেষজ্ঞ-গবেষকদের মেধা-পাণ্ডিত্য-গবেষণা প্রভৃতি অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্যই তাঁরা নিজের দেশের চেয়ে অনেক বেশী ব্যক্তিগত সুখের উপকরণ-সুযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেয়েছেন। এবং আত্মসন্তোষের আরকে জারিত এইসব মানুষেরা কখনোই ভাববার সুযোগ পান নি যে তাঁদেরই বাপ-ঠাকুর্দার দেশের মানুষের বিন্দু বিন্দু রক্তর বিনিময়ে এইসব সুখ সংগৃহীত হচ্ছে। হয়তো তাঁদের অনেকেই এইটুকু খবর রাখারও সময় পান না যে তাঁদের উদ্ভাবিত বিষয়বস্তু প্রয়োগে নির্মিত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তাঁদের জন্মভূমি ও দেশবাসীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে।

. সত্তর দশকের গোড়ায় মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণকারী একজন বিজ্ঞানীর মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ডলার অর্থাৎ প্রায় ২০ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। আর ঐ সময় এই ধরনের একজন ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে ২ লক্ষ ৫৩ হাজার ডলার অর্থাৎ ২১ লক্ষেরও বেশী টাকা এবং একজন ডাক্তারের মাধমে ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার ডলার অর্থাৎ প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুনাফা লুটেছে। লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স-এর অধ্যাপক টিথমাজ্-এর মতে, ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৭ এই আট বছরে মাত্র দেড় লক্ষ দেশান্তরী (এবং মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণকারী) ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এবং বিজ্ঞানীর মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫০০ কোটি ডলার বা প্রায় ৪৩ কোটি টাকা লাভ করেছে। এবং প্রতি বছর এই লাভের অঙ্ক বাড়ছে। অবস্থাটা এমনই দাঁড়িয়েছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে তাদের নাগরিকত্ব গ্রহণকারী মানুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রসংঘের একটি সমীক্ষায় জানা যায় যে লেবানন থেকে যাওয়া ৮৯ জন থেরাপীস্ট এবং সার্জন, ১২ জন দাঁতের ডাক্তার এবং ৬২ জন নার্সের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগের ফলে সে দেশের স্বাস্থ্য বিভাগে

বিরাট অসুবিধা দেখা দেয়। অর্থাৎ মাত্র ১০১ জন চিকিৎসক এবং ৯২ জন নার্স অন্ত উন্নত একটি দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটাবার জন্য যথেষ্ট।

তবুও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তার অনুগামী দেশসমূহ তৃতীয় বিশ্ব থেকে বিশেষজ্ঞ আমদানি কমায় না। তারা কখনই ভেবে দেখে না যে তৃতীয় বিশ্ব এতে কত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি ৫৫০ জন নাগরিকের জন্য একজন ডাক্তার নিযুক্ত রাখবার জন্য পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন অনুন্নত-উন্নয়নশীল দেশ থেকে ডাক্তার আমদানী করে। অথচ পূর্ব আফ্রিকার ১৭ হাজার ৫০০ জন লোকের জন্য একজন ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। ইউনেস্কোর প্রতিবেদন মতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিজ্ঞান-চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতির জন্য প্রতি ১০ লক্ষ মানুষের জন্য ১০০০ জন এ জাতীয় বিশেষজ্ঞ দরকার। কিন্তু ইউনেস্কোর (রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত সংস্থা বা United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization অর্থাৎ UNESCO) গত ২২শে মার্চ ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ভারতে প্রতি ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪৭ জন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিজ্ঞানের জন্য নিযুক্ত আছেন; ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে পাকিস্তানে ৬৩ জন, ইন্দোনেশিয়ায় ৫৭ জন, উত্তর কোরিয়ায় ৪১৮ জন, ফিলিপিন্সে ৯৭ জন এবং শ্রীলঙ্কায় ১৬১ জন নিযুক্ত আছেন।

উন্নত এবং অনুন্নত-উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে প্রাচুর্য এবং অভাবের মূল কারণ অর্থনীতিতে নিহিত আছে। উন্নয়নশীল অথবা অনুন্নত দেশে অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের যে কোন দেশে একজন বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তি বিজ্ঞানী কিংবা চিকিৎসক অথবা কারিগর অর্থাৎ বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, টেকনিশিয়ান তৈরী করতে যে অর্থ ব্যয় হয় ঐ ধরনের একজন বিশেষজ্ঞ তৈরী করতে উন্নত দেশের খরচ অনেক বেশী। সুতরাং উন্নত দেশগুলি বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আমদানীকে অনেক সহজ মনে করে। দরিদ্র দেশগুলিতে প্রতিপালিত বিশেষজ্ঞদের গুণগত মান যথেষ্ট না হলে তারা নিশ্চয়ই উন্নত দেশগুলিতে আমন্ত্রিত হতেন না। সুতরাং দেশের শিক্ষার চেয়ে বিদেশের শিক্ষার মান উন্নত অতএব বিদেশ যাত্রা এ হেন যুক্তি নিশ্চয়ই ধোপে টেঁকে না।

দেশগুলি স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশী অর্থ গবেষণা এবং উন্নয়ন খাতে (Research & Development) ব্যয় করতে সক্ষম। তৃতীয় বিশ্বর দেশগুলি বছরে সর্বমোট ২৮০ কোটি ডলার অর্থাৎ প্রায় ২,৪০০ কোটি টাকা গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যবহার করে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই বছরে ৬ হাজার কোটি ডলার বা ৫১ হাজার কোটি টাকা গবেষণা এবং উন্নয়ন খাতে ব্যয় করে।

অতএব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা উন্নত দেশে গবেষণার সুযোগ বেশী। অতএব গরীব দেশের মেধাবী ছাত্ররা দেশ ছাড়লেন। কিন্তু গরীব দেশগুলিতেও সীমিত সুযোগের মধ্যেও যে কিছু কাজ করা যায় সে-কথা তাঁরা কখনই খেয়াল রাখবেন না। অবস্থা এখন এমন একটা পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে ভারত কিছু সুবিধা পাবার জন্য একটি "মস্তিষ্ক ব্যাঙ্ক" স্থাপনের প্রচেষ্টা চলেছে। যাতে বিদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণকারী এ দেশের মহান সন্তানেরা এই গরীব দেশের জন্য কিছু কাজ করে দেবার জন্য সচেষ্ট হন সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রকল্প রচিত হয়েছে।

চমৎকার! ঘরের খেয়ে বড় হয়ে ভিন্ন হয়ে যাওয়া ছেলের কাছে ভিক্ষা করার নবতম অছিলা! এবং এতে নাকি দেশের উপকার হবে।

কিন্তু গরীব দেশগুলি বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একদম পিছিয়ে আছে এমন ভাববার বাস্তব কারণ আছে কি? সুযোগ-সুবিধা সীমিত, এ-কথা সত্য। কিন্তু গরীব দেশের বিশেষজ্ঞদের গুণগত মান কম নয় এ-কথা আগেও বলেছি। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য গরীব দেশগুলিতে উৎপাদিত কিছু কিছু পণ্য কিন্তু উন্নত দেশও কিনে থাকে। অবশ্যই সে-সব পণ্যের মান যথার্থ হলেই এই ক্রয়-বিক্রয়ের প্রশ্নটি আসে। সামগ্রিকভাবে ব্যাপারটি চালু হওয়া কখনই সম্ভব নয়। কারণ গরীব দেশগুলি কখনই আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের কলাকৌশল ব্যবহারের সুযোগ পায় না। তাদের বিভিন্ন কারণে বাতিল প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে কিনতে বাধ্য করা হয়, ফলশ্রুতি প্রাচুর্য আর অভাবের মধ্যেকার ফারাকটা যায় বেড়ে। আর বাড়ে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া বিশেষজ্ঞর সংখ্যা।

এক্ষেত্রে গরীব দেশগুলি কয়েকটি কাজ করতে পারে। প্রথমতঃ, বিদেশী মুদ্রায় পাঠানো দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া বিশেষজ্ঞদের অর্থে কর বসান যায়। সরকারী লোকেরা এতে হয়তো ক্ষুব্ধ হবেন। তাঁরা হয়তো বলবেন পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা যা পাওয়া যায় তাই লাভ; কর বসালে আর এটুকুও পাওয়া যাবে না। বেশ তো শুধুমাত্র যাঁরা নতুন করে দেশ ছাড়তে উদ্যত হচ্ছেন তাঁদের পাঠানো অর্থের ওপর কর বসান না। তাহলে অনেকের উদ্যোগ বন্ধ হয়। আর দরকার গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় বাড়ানো। আবার শুধু ব্যয় বাড়ালেই চলবে না। তার সঙ্গে কাজকর্মের প্রশাসনিক ব্যবস্থাটিও সহজ সরল হওয়া দরকার। কারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার কল্যাণে অনেক সময়ই মঞ্জুরীকৃত টাকাও ব্যয় হতে পারে না। একজন বৃত্তিধারী গবেষককে যদি বৃত্তির অর্থের জন্য শিক্ষা দপ্তর অথবা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বৃত্তির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় তখন কিন্তু তার কাছে ভাল কাজ পাওয়া দুষ্কর। সব মিলিয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের দিকে একটু নজর দেওয়া উচিত। যাতে দেশের বিশেষজ্ঞরা বিদেশের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। তা না হলে একই অবস্থা চলবে। প্রতি বছর দলে দলে শিক্ষিত ছেলেমেয়ে কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে বিদেশের মোহভরা হাতছানিতে ঘর ছাড়বে আর দেশ পরিচালকরা তাদের জন্য চোখের জল ফেলবেন। আর আমরা আজকের মতই সমস্ত অবস্থাটার নীরব দর্শক হব।

তথ্যসূত্র

১। Physics Today, August 1970, p. 56.
২। Estimated according to scientists and Engineers from Abroad. Washington, National Science Foundation, 1977. p. 1.
৩। Statistical Abstracts of the United States. 1975, Washington, p. 55.
৪। Statistical Abstracts of the United States, 1979, Washington, p. 628.
৫। National Patterns of Science & Technology Resources, 1980, Washington, p. 12.
৬। Nature, July 26, 1976, p. 262.
৭। The Statesman, Calcutta, 18.1.82. p. 9.
৮। The Statesman, Calcutta, 6.3.82, p. 9.
৯। Backgrounder, Calcutta. 24.1.82.
১০। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সংবাদ ও অভিমত, ২৪-১০-৮১।
১১। আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২২-২-৮২, পৃ-১২।
১২। আজকাল, কলকাতা, ২৪-৩-৮২, পৃ-৮।

মৌমাছি চাষ : স্বনির্ভরতার একটি মাধ্যম

মৈনাক মুখোপাধ্যায়

চৈত্রের দুপুর। শিয়ালদা থেকে বনগাঁ লোক্যালে যখন গোবরডাঙ্গা পেঁছিলাম, বেলা প্রায় দেড়টা। স্টেশন থেকে বেরিয়েই শচীবাবুর মিষ্টির দোকান, বটতলায়। এক মহিলা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মিষ্টি খাচ্ছিলেন, তাঁকে জল এগিয়ে দিতে এসে আমার দিকে চোখ পড়ল শ্রীশচীসুন্দর দাসের। পাতলা, রোগা চেহারা, মাথায় কোঁকড়া চুল। কি কাজে এসেছি জানাতেই সহাস্যে স্বাগত জানালেন। ভাইকে কাউন্টারে বসিয়ে, আমার সঙ্গে এসে বসলেন দোকানেরই একটা বেঞ্চে।

আজ প্রায় ১৩ বছরের ওপর মৌমাছি পালন করছেন শচীবাবু, গোবরডাঙ্গা ও তার আশপাশের এলাকায়। প্রথম কাজ শুরু করেন ১৯৬৯ সালের ১২ই ডিসেম্বর। ২-৩ বছর নিজে কাজ করার পর, কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে চাঁদপাড়া যুবকল্যাণ কেন্দ্রে যোগ দেন, প্রশিক্ষণ নেবার জন্যে। ১৯৭৮ সালে গোবরডাঙ্গা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক থেকে ৬৫০ টাকা লোন নিয়ে বৃহত্তর আকারে মৌ-পালন শুরু করেন। আজ তাঁর সংগ্রহে মৌমাছি-বাক্সের অর্থাৎ চাকের সংখ্যা তিরিশের ওপর। নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাঙ্ক লোন শোধ করে দিয়েছেন, গত বছর মধু বিক্রী করে লাভ করেছেন প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা।

—মৌমাছি পালনের পদ্ধতিটা যদি একটু সংক্ষেপে বলেন?

—প্রথমে একটা ট্রেণিং নিতে হয় এ ব্যাপারে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ও খাদি কমিশনের আন্ডারে এ ট্রেণিং দেওয়া হয়। তারপর মৌমাছি পালনের জন্যে তৈরি 'আই. এস. আই.'র ছাপ মারা বিশেষ রকমের বাক্স কিনতে হয়। একটা 'স্ট্যান্ডার্ড' বাক্স কিনে পরে সেইমত আরও বাক্স তৈরি করে নেওয়া চলে। তারপর মৌমাছি সংগ্রহ করতে হয় বা কিনতে হয়। মাছি চাকশুদ্ধ কিনতে পাওয়া যায়, যাঁরা প্রথম শুরু করবেন, তাঁরা আমাদের কাছ থেকেই ৩০-৭০ টাকার মধ্যে কিনতে পারেন। আর আমরা মাছি সংগ্রহ করি 'নেচার' থেকে। বিশেষ পদ্ধতিতে মাছি ধরে ওই দোতলা কাঠের বাক্সের মধ্যে চাকশুদ্ধ মাছি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। নিচের তলায় এরা থাকে, বংশবৃদ্ধি করে, নতুন চাক বানায়। একে বলে 'ব্রুড চেম্বার'। আর, ওপরের তলায় অর্থাৎ 'সুপার চেম্বারে' মাছি মধু সংগ্রহ করে। নিজেদের প্রয়োজন মেটার পর যা মধু বাড়তি থাকে, তা এরা 'সুপারে' সঞ্চয় করে। এই সুপারের মধুই আমরা নিই। বাক্সগুলো কোনও খোলা জায়গায় যেমন বাড়ির উঠোনে বা ছাদে রেখে দিই। 'সুপারে' মধু জমলে, 'এক্সট্রাক্টর' নামে একরকম যন্ত্রে মধুটা চাক থেকে বের করে নিই। এটা এমনভাবে করা হয়, যে মধু নিষ্কাশনের ফলে কখনোই চাক নষ্ট হয় না, তখন খালি চাক আমরা আবার 'সুপারে' রেখে দিই।

—মধু সংগ্রহ করার পর কিভাবে বিক্রী করেন?

—আমি বেশির ভাগ মধুই 'লোক্যালি' বিক্রী করি। গোবরডাঙ্গা এবং আশপাশের অঞ্চলের লোকেরাই মধু কিনে নিয়ে যান। 'সুপার' থেকে মধু ছেঁকে নিয়ে খালি শিশিতে ভর্তি করি অথবা খরিদ্দার জায়গা নিয়ে আসেন। সীল করা বা লেবেলিং—ও-সব আমরা করি না, তাতে শুধু শুধু খরচ বাড়ে। যাঁরা মধু কেনেন, তাঁরা বেশির ভাগই পরিচিত, বিশ্বাস করেন। অবশ্য, বাজারে বিক্রী করতে হলে সীল করতে হত, তাতে দাম বেড়ে যেত প্রায় ৪-৫ টাকা।

—এখন আপনি কি দামে মধু বিক্রী করেন?

—২৬-৩০ টাকা কেজি।

—আপনার সব মধুই তাহলে স্থানীয় মানুষের কাছে বিক্রী হয়ে যায়?

—হ্যাঁ, 'সিজনে' ১০০ কেজির ওপর মধু আমি বাড়িতে বসেই বিক্রী করি।

—'সিজন'টা কি?

—মধু সারা বছর হয় না। কার্তিক থেকে চৈত্র—এই কয় মাস ফুলের সময়, এই সময় মধুটা সবচেয়ে বেশি হয়। এইটাই আমাদের মধুর 'সিজন'। বছরের অন্য সময়ে যা 'মধু' হয়, তা ওদেরই কাজে লাগে বেঁচে থাকার জন্যে, আমরা বাড়তি কিছু পাই না।

বাক্সের মধ্যে মৌমাছি পালনের পদ্ধতি

—কি কি গাছ থেকে এই অঞ্চলে মধু পাওয়া যায়?

—কুল, সরষে, সজনে, আম, দেশি আমড়া, লিচু। আর একটু দূরে, মেদিনীপুরের দিকে গেলে করঞ্জা, হিজল, তেঁতুল।

—তা আপনি যে মৌমাছি নিয়ে এখন এত ব্যস্ত, তাতে আপনার ব্যবসার ক্ষতি হয় না?

—দেখুন, মৌমাছি আমার নেশা। দোকান দেখে যা সময় পাই, সেই সময়েই আমি মৌমাছির কাজ করি। বাড়ির কাজ ভাইয়েরা দেখে। আমার আর কিছু নেশা—সিনেমা, থিয়েটার, আড্ডা—কিছু নেই। ব্যবসা দেখতে আর কতক্ষণ লাগে? তা বাদে সারাদিনই হাতে। আর, আমার বাড়ির পাশেই দোকান, যাতায়াতও করা যায় সব সময়। আমি কাজ ভালবাসি, কাজ নিয়েই থাকি সারা-দিন। অবশ্য, যখন শুরু করেছিলাম, '৬৯ সালে, তখন এরকম কাজপাগল ছিলাম না, বরং একেবারে উল্টো। তখন দোকানেও বসতাম না। সেদিন এটা না ধরলে, এতদিনে হয়ত বনগাঁ লাইনের 'ওয়াগন ব্রেকারের' দলে নাম লেখাতে হত। সঙ্গটা সে-সময় সেরকমই ছিল।

—মৌমাছি তাহলে আপনাকে নতুন জীবন দিয়েছে বলুন? তা এই যে ১৩ বছর আপনি এ কাজ করছেন, এর মধ্যে কি কি অসুবিধের সামনে পড়তে হয়েছে বা হচ্ছে?

—অসুবিধে অনেক। ১০ বছর আগে এখানে যা গাছ ছিল, আজ তা অনেক কমে গেছে। এত গাছ কাটা হলে মৌ-চাষ বাঁচতে পারে না। কাটা হয়েছে, গাছ কিন্তু লাগানো হয় নি একটিও। কীটনাশক ওষুধে মৌমাছি মরে যাচ্ছে। বর্ষায় খাদ্যাভাবে মাছি কমতে থাকায় চাকে মথের আক্রমণ বাড়ে, এ সময় কৃত্রিম খাদ্য দিয়ে অবস্থা সামাল দিই। তারপর, অনেক চাষী পরাগযোগের আসল ব্যাপারটাই বোঝে না। তাদের ধারণা, মৌমাছি মুখ দিয়ে ফুলের মাথা কেটে দেয় বা মধুটা চুষে খেয়ে নেওয়ার ফলে ফুল মরে যায়। একবার বিষ্ণুপুরে সরষে ক্ষেতে বাক্স নিয়ে গেছি, সে চাষীরা আমাকে বাক্স রাখতেই দেবে না। শেষে অনেক বুঝিয়ে মাত্র তিন দিন ৯টি বাক্স রাখতে পেরেছিলাম। দেখা গেল, সে বছর গড়ে বিঘা প্রতি ৮ মণ সরষে বেশি ফলন হল। এখন, প্রতি বছর আমাদের ডেকে নিয়ে যায়।

—তার মানে, আপনারা বাক্স নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতেও যান?

—হ্যাঁ, এর নাম মাইগ্রেশন। যেখানে কুলগাছ

[শেষাংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়]

হার কি জীত

সুশীলা, সুন্দরী এবং সুশিক্ষিতা স্ত্রী পেয়ে যে কোন পুরুষই আপন ভাগ্যকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারবে না। আমি আনন্দে বিভোর হয়ে গেলাম। লজ্জার কুসুমিত বাগিচায় গোলাপের মনমাতানো সৌরভের সাথে শ্যামলিমার শীতল স্নিগ্ধতার অপরূপ সংমিশ্রণ হয়েছিল। মৃদু সমীরণের তরঙ্গের সাথে মেশানো ছিল পাখীর মধুর কূজন। সে নিজেও সাম্যবাদের ভক্ত ছিল। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা এবং এই রকম আরও কত বিষয় নিয়ে তার সাথে আমার কতবার আলোচনা হয়েছে। কিন্তু অধ্যাপক ভাটিয়ার মতো সে কেবল-মাত্র মতবাদের ভক্তই ছিল না, তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতেও চাইত। তার অন্তরের টানটুকু কেশবের দিকেই ছিল, যদিও জানতাম যে, সে তার বাবার ইচ্ছাকে কখনোই ঠেলে সরিয়ে দিতে পারবে না, তবুও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে প্রণয়িনী হিসেবে ভাবতে প্রস্তুত ছিলাম না। এই ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগত মতামতের মূল্য দেওয়ার স্বপক্ষে ছিলাম। এবং এই কারণেই কেশবের বিরক্তি এবং

মুন্সি প্রেমচাঁদ

অনুবাদ—সৌরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ক্ষোভের জন্য আমার যে আশাতীত আনন্দ হওয়ার কথা তা ভোগ করতে পারলাম না। বেদনা আমাদের দুইজনেরই ছিল কিন্তু এই প্রথম কেশবের জন্য আমার সহানুভূতি হল। আমি লজ্জাবতীকে কেবলমাত্র এটাই জিজ্ঞেস করতে চেয়েছি যে তার চোখে আমি কেন ছোট হয়েছি। কিন্তু ওর সামনে এই রকম একটা তুচ্ছ প্রশ্ন করতে ভীষণ সংকোচ হত, আর এটাতো খুবই স্বাভাবিক যে, কোনো মেয়েই তার আপন মনের রহস্য সকলের সামনে প্রকাশ করতে চায় না। কিন্তু লজ্জাবতী নিজেই এই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করাটা নিজের কর্তব্য বলে মনে করছিল। এর সুযোগও সে খুঁজত। খুব তাড়াতাড়ি একদিন তার সুযোগ ও পেয়ে গেল।

সময়টা ছিল সন্ধ্যাকাল। কেশব 'রাজপুত হোটেলে' সাম্যবাদের উপর একটি আলোচনা সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়েছিল। প্রফেসর ভাটিয়া ছিলেন ঐ আলোচনা সভার সভাপতি। লজ্জা নিজের বাংলোতে একলাই বসেছিল। এমন সময় আমি আমার অশান্ত হৃদয়ের ভাব লুকিয়ে রেখে, দুঃখ এবং নৈরাশ্যের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে তার কাছে এসে বসে পড়লাম। লজ্জা আমার দিকে একটা চকিৎ দৃষ্টি হেনে সহানুভূতির সঙ্গে

কেশবের সাথে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা বেশ পুরোনোই। লেখায়, বলায়, আমোদে, প্রমোদে সব ক্ষেত্রেই সে আমাকে ছাড়িয়ে যেত। ওর গুণের চন্দ্রালোকে আমার প্রদীপ শিখা কখনোই ভাস্বর হয়ে উঠতে পারে নি। ওকে আমার থেকে অন্ততঃ একবার নিষ্প্রভ দেখার ইচ্ছেটা আমার জীবনের সব থেকে বড় বাসনা ছিল। এটা আমি তখন স্বীকার করতাম না। তার উপর ভগবান আমাকে ওর মত ধীশক্তি দেন নি। তাছাড়া নিজের এ ত্রুটি কেই বা প্রকাশ্যে মেনে নেয়। যদি আমার কিছু মাত্র সান্ত্বনা পাওয়ার ব্যাপার থেকে থাকে তো সেটা ছিল এই যে, আমি ভাবতাম পড়াশুনার জগতে ওর সমকক্ষ হওয়া ভাগ্যে না থাকলেও ব্যবহারিক জগতে জয়মাল্য আমার গলাতেই শোভা পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ও যখন প্রণয়-সাগরে আমার সাথেই ডুব দিল আর অরূপ রতন ওর হাতেই ধরা দিল, তখন আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। আমাদের দুই জনেরই এম.এ.তে বিষয় ছিল 'সাম্যবাদ'। আমরা দুইজনেই সাম্যবাদী ছিলাম। আর এটা কেশবের পক্ষে খুব স্বাভাবিক বিষয় ছিল। ওর বংশের মর্যাদা খুব একটা প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং অবস্থাও এতটা স্বচ্ছল ছিল না যা দিয়ে সেই ফাঁকটা ভরাট করতে পারত। আর আমার অবস্থা ছিল এর বিপরীত। আমি ছিলাম সম্ভ্রান্ত বংশের উত্তরাধিকারী এবং ধনী। আমার সাম্যবাদ চর্চার উপর লোকের একটা বিরূপ কৌতূহল ছিল। আমাদের সাম্যবাদের অধ্যাপক বাবু-হরিদাস ভাটিয়া সাম্যবাদের সূত্রগুলির বিশেষজ্ঞ হলেও অর্থকে কখনোই অবহেলা করতে পারতেন না। তাঁর নিজের মেয়ের জন্য তিনি তীক্ষ্ণধী কেশবকে পছন্দ না করে আমাকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার ঘরে এসে খুব চিন্তান্বিতভাবে তিনি বললেন, "শারদাচরণ, আমি ভীষণ এক দুশ্চিন্তায় পড়েছি। আমার আশা আছে যে, তুমিই এর উপায় করতে পার। আমার কোন ছেলে নেই। তুমি আর কেশব—এই দুই-জনকেই ছেলের মতো দেখে এসেছি। যদিও কেশব তোমার থেকেও বুদ্ধিমান তথাপি আমার এই বিশ্বাস আছে যে, বিস্তৃত সংসার প্রাঙ্গণে তোমার যে সাফল্য লাভ হবে, তা কেশব কখনোই অর্জন করতে পারবে না। তাই আমি তোমাকেই আমার মেয়ে লজ্জাবতীর জন্য নির্বাচন করেছি। এখন তুমিই বল আমার মনবাসনা পূর্ণ হওয়ার আশা কি করতে পারি?

আমি বরাবর একাই ছিলাম। কৈশোরেই আমার বাবা-মা আমাকে ছেড়ে স্বর্গে চলে গিয়েছিলেন। আমার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও এমন কেউ ছিল না যার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারত। লজ্জাবতীর মতো

আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছুটা চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে?' আমি খানিকটা কৃত্রিম উদাসীনতার সুরে বললাম, 'তোমার জন্যই।' লজ্জা জিজ্ঞেস করল, 'কেশবের বক্তৃতা শুনতে যাও নি?' আমার দু' চোখ জ্বালা করে উঠল। সামলে নিয়ে বললাম, 'মাথাটা একটু ধরেছিল।' একথা বলতে বলতেই আমার চোখ থেকে ক'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আমি আমার মনের বেদনা প্রকাশ করে ওর করুণা-প্রার্থী হতে চাই নি। আমার বিচারে কাঁদাটা মেয়েদেরই স্বভাবসিদ্ধ। আমি তাঁর উপর আমার ক্রোধ প্রকাশ করতে চাইলাম আর গড়িয়ে পড়ল অশ্রু। মনের ভাব ইচ্ছার অধীন হয় না।

আমাকে কাঁদতে দেখে লজ্জার চোখ থেকেও জল গড়িয়ে পড়ল।

আমি শত্রুতা পুষে রাখি না, সংকীর্ণমনাও আমি নই, কিন্তু বুঝতে পারলাম না লজ্জাকে কাঁদতে দেখে তখন আমার মনে কেন আনন্দের সঞ্চার হয়েছিল। ঐ মানসিক অবস্থাতেও ওকে ব্যঙ্গ করার লোভ সামলাতে না পেরে বললাম—তোমার চোখে জল কেন?

লজ্জা আমাকে চোখ দিয়ে শাসন করে বলল, "আমার চোখের জলের রহস্য তুমি বুঝবে না, কারণ তুমি কখনো বোঝার চেষ্টা করো নি। আমাকে কটু কথা শুনিয়ে নিজের হৃদয়কে শান্ত করেছ। আমি কাকেই বা বলব? তুমি কি করে জানবে যে, আমি কত অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করে, হৃদয়কে কতখানি পীড়ন করে, কত বিনিদ্ররাত কাটিয়ে, আর কত চোখের জল ফেলে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমার বংশমর্যাদা, তোমার জমিদারী আমার পথের উপর প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে। এ প্রাচীরের বাধা সরাতে আমি অক্ষম। আমি জানি এই মুহূর্তে বংশ মর্যাদার, সম্পত্তির বিন্দুমাত্র অভিমান তোমার মধ্যে নেই। কিন্তু এ-ও জানি যে, কলেজের নিস্তরঙ্গ ছায়ায় লালিত সাম্যবাদ সাংসারিক জীবনের ঘূর্ণাবর্তে বেশী দিন টিঁকে থাকতে পারবে না। তখন তুমি তোমার এই সিদ্ধান্তের জন্য অনুশোচনা করবে আর দোষারোপ করবে আর আমি তখন তোমার সুখের পথে বাধা এবং হৃদয়ের কণ্টকে পরিণত হব।"

আমি কিছুটা নরম হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "যে কারণে আমার সাম্যবাদের বিলুপ্তি ঘটতে পারে সেই একই অবস্থায় তোমার সাম্যবাদ কিভাবে জয়যুক্ত হবে?"

লজ্জা—"হ্যাঁ, এ বিশ্বাস আমার আছে যে আমার উপর সে সবের বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়বে না। আমাদের কখনো কোনো সম্পত্তি ছিল না আর বংশের কথা তো তুমি ভালভাবেই জানো। বাবা কেবলমাত্র নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের ফলে এই পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

আমি তো সেদিনের কথা ভুলতে পারি না, যখন আমার মা বেঁচেছিলেন এবং বাবা রাত ১১টার পর প্রাইভেট টিউশানি করে ঘরে ফিরতেন। সম্পত্তি আর বংশ গৌরবের অভিমান আমার যেমন কোনদিন হওয়ার উপায়ই নেই, ঠিক তেমনিই তোমার হৃদয় থেকে ঐ অভিমান কোনদিন মুছে যেতে পারে না। একমাত্র স্মৃতিবিভ্রম ঘটলেই আমার সে অভিমান হতে পারে।" আমি ঔদ্ধত্যের সাথে বললাম, "বংশের প্রতিষ্ঠা তো আমি মুছে দিতে পারব না কারণ ওতে আমার হাত নেই, কিন্তু আজ তোমার জন্য আমার বৈভবের জলাঞ্জলি দিতে আমি প্রস্তুত।" লজ্জা নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলল, "আবার সেই ভাবালুতা। তুমি যদি একথা কোন অবোধ কিশোরীকে বলতে তাহলে সে হয়তো খুব খুশী হতো। দুজন নরনারীর সারা জীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে এমন একটা গভীর বিষয়ে আমি ভাবাবেগের আশ্রয় নিতে পারব না। বিয়ে মানুষকে দেখানোর জন্য নয়। ভগবান জানেন, আমি আর ভাবতে পারছি না; আমি এখনও নিজেই জানি না যে আমার ভাগ্যতরী আমাকে কোন দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমি তোমার জীবনকে কণ্টকাকীর্ণ করে তুলতে পারব না।" আমি ওখান থেকে যতটা না হতাশ হয়ে ফিরলাম, তার থেকে অনেক বেশী চিন্তিত হয়ে ফিরলাম। লজ্জা আমার সামনে একটা নূতন সমস্যা উপস্থাপিত করল।

এরপর আমরা দুজন একসাথেই এম.এ. পাশ করলাম। কেশব প্রথম শ্রেণীতে আর আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে। কেশব নাগপুরে একটি কলেজে অধ্যাপকের পদ পেয়ে গেল। আর আমি বাড়ি ফিরে নিজের সম্পত্তির দেখাশুনা শুরু করলাম। যাওয়ার সময় দুজনে আলিঙ্গন করে চোখের জলে বিদায় নিলাম। হিংসা-দ্বেষকে কলেজেই ফেলে রেখে এলাম।

আমার এলাকায় আমিই ছিলাম প্রথম এম.এ. পাশ করা জমিদার। প্রথম প্রথম রাজন্যবর্গ আমাকে খুব সমাদর দেখিয়েছিলো, কিন্তু যে মুহূর্তে তারা আমার সামাজিক মতবাদ সম্পর্কে জানতে পারল, অমনি তাদের আদরে ভাঁটা পড়ল। আমিও তাদের সাথে মেলামেশা প্রায় ছেড়েই দিয়ে-ছিলাম। আমার অধিকাংশ সময়ই চাষী-প্রজাদের মধ্যেই কেটে যেত।

তারপর পুরো একটা বছরও কাটতে না কাটতেই একজন তালুকদারের মৃত্যুতে কাউন্সিলের একটি আসন খালি হল। আমি কাউন্সিলে যাওয়ার জন্য নিজের তরফ থেকে কোনো প্রচেষ্টা চালাই নি। কিন্তু নানান কারণে প্রতিনিধিত্বের ভার আমার নিজের স্কন্ধেই চাপলো। বেচারী কেশব তখন কলেজে কেবল লেকচার দিচ্ছিল। কেউ খবরও রাখত না সে কোথায় আছে এবং কি করছে। আর ওদিকে আমি ধন-সম্পত্তির সুবাদে কাউন্সিলের সদস্য হয়ে গেলাম। আমার প্রশ্নগুলির বিশেষ প্রশংসা হতে লাগল। কাউন্সিলে আমার বিশেষ সম্মান হতে লাগল। কিছু কিছু এমন লোক পাওয়া গেল যারা জনতাবাদের সমর্থক। প্রথম দিকের পরি-স্থিতিতে তারা অবদমিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু ক্রমে তারা সোচ্চার হল। আমরা, যারা গণতন্ত্রের সমর্থক, তারা সবাই মিলে একটা পৃথক দল সৃষ্টি করে কৃষকের অধিকার প্রভৃতি জোরের সংগে ব্যক্ত করতে শুরু করলাম। বেশীর ভাগ ভূস্বামীই আমার বিরোধিতা করল। কিছু কিছু 'সজ্জন' ব্যক্তি হুমকিও দিল। কিন্তু আমি আমার নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত হই নি। সেবা করার এতবড় সুযোগ কিভাবে হাতছাড়া করা যায়? অতএব দ্বিতীয় বৎসর শেষ হতে না হতেই জাতির প্রথম সারির নেতা বলে পরিগণিত হতে লাগলাম। এরজন্য আমাকে প্রচণ্ড পরিশ্রম, প্রচুর পড়াশুনা, প্রচুর লেখার কাজ এবং বক্তৃতা দিতে হত, কিন্তু তার জন্য একটুও পিছিয়ে পড়ি নি। এই পরিশ্রম করার ক্ষমতার জন্য আমি কৈশবের কাছে ঋণী। ও-ই আমাকে এতে অভ্যস্ত করে তুলেছিলো।

কেশব আর প্রফেসর ভাটিয়ার চিঠি আমার কাছে নিয়মিতভাবেই আসত। কখনো কখনো লজ্জাবতীও আমাকে চিঠি লিখত। ওর চিঠির মধ্যে শ্রদ্ধা এবং প্রেমের প্রকাশ দিন দিন বৃদ্ধি হচ্ছিল। সে আমার দেশের সেবাকে খুব উদার এবং উৎসাহব্যঞ্জক ভাষায় ব্যাখ্যা করত। আমার সম্পর্কে ওর যা আশঙ্কা ছিল, তা-ও দিন দিন মুছে যাচ্ছিল। আমার সাধনা আমার স্বপ্নের দেবীকে আকর্ষণ করতে শুরু করেছিল। কেশবের চিঠিপত্রে একটা ঔদাসীন্য প্রকট হয়ে উঠছিল। ওর কলেজের চাকুরিতে অর্থের অভাব ছিল। তিন তিনটে বছর কেটে গেলেও ওর কোনো পদোন্নতি ঘটে নি। চিঠিপত্রে মাঝে মাঝে এমন মনে হতো যে, বোধহয় ওর বর্তমান জীবন নিয়ে ও সন্তুষ্ট নয়। কখনো কখনো এর প্রধান একটা কারণ ছিল যে, ওর জীবনের সুখস্বপ্নগুলি তখনো চরিতার্থ হয় নি।

তৃতীয় বৎসর গরমের সময় প্রফেসর ভাটিয়া আমার সাথে দেখা করতে এলেন এবং সন্তুষ্ট হয়েই ফিরে গেলেন। এর ঠিক এক সপ্তাহ পরেই লজ্জাবতীর চিঠি এল। এতদিনে যেন আদালতের রায় বেরোল। আমি ডিক্রী পেয়ে গেলাম। এই প্রথম কেশব আমার কাছে প্রতিযোগিতায় হেরে গেল। আমার আনন্দ-উচ্ছ্বাস সকল সীমা অতিক্রম করে গেল। প্রফেসর ভাটিয়ার ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করার একটা কথা ছিল। উনি সাম্যবাদের উপর যে বই লিখছিলেন তাতে ভারতের সব বড় বড় শহরগুলোতে কিছু কিছু খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। উনি সেই সাথে লজ্জাকেও নিয়ে যেতে চাইলেন। ঠিক হলো তারা ফিরে আসার পর আগামী চৈত্র মাসে আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হবে। বিরহের এই দিন-গুলো আমার ভীষণ অসহিষ্ণুতার মধ্যে কাটতে লাগল। যতদিন আমি জানতাম কেশবই এখানে বিজয়ী, ততদিন হতাশ হয়েও সেটা মেনে নিলেও মনে একটা প্রশান্তি ছিল। আর আজ যখন আশার আলো দেখলাম তখনই সাথে সাথে মনে ঘোরতর অশান্তিও ঘনিয়ে এল।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে মার্চ মাস এল। কঠোর পরিশ্রমের দিন শেষ হয়ে লক্ষ্মীকে ঘরে আনার লগ্ন এসে গেল। কিন্তু হঠাৎ প্রফেসর ভাটিয়া ঢাকা থেকে লিখলেন অনিবার্য কারণে মার্চ মাসে ফেরা সম্ভব হচ্ছে না, মে মাসে ফিরবেন। আর এদিকে কাশ্মীরের দেওয়ান লালা সোমনাথ কাপুর এলেন নৈনিতালে। বাজেট অধিবেশন চলছিল। ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছিল। গভর্নরের তরফ থেকে দেওয়ান সাহেবকে পার্টি দেওয়া হলো। সভার প্রতিনিধিদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কাউন্সিলের তরফ থেকে অভিবাদন জানানোর সৌভাগ্য আমার উপরেই বর্তে ছিল। আমার বক্তৃতা দেওয়ান সাহেবের খুব পছন্দ হল। যাওয়ার সময় আমার সাথে কয়েক মিনিট কথা বলে তাঁর বাসায় যাওয়ার জন্য বলে গেলেন। ওঁর সাথে ওঁর মেয়ে সুশীলাও ছিল। সে পিছনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন মাটির উপর কিছু লেখা পড়ছে। আমিও আমার চোখের দৃষ্টিকে বশে রাখতে পারি নি। ওইটুকু সময়ের মধ্যে একবার নয়, বার কয়েক আমার দৃষ্টি তার উপর পড়ল, কিন্তু ছোট বাচ্চারা যেমন অপরিচিত লোক দেখলে চমকে উঠে তার দিকে তাকিয়ে দেখে এবং তারপরেই মায়ের কোলে মুখ লুকায় তেমনি সেই দৃষ্টি ভয়ে মাঝপথ থেকে ফিরে ফিরে এল। লজ্জা যদি পুষ্পিত কানন হয় তবে সুশীলা যেন সেই কাননের শীতল সলিলধারা যেখানে বৃক্ষরাজি কুঞ্জ রচনা করে আছে, যেখানে আনন্দিত মৃগযূথ, বিহগকুলের অনন্ত সৌন্দর্য আর সরোবরের তরঙ্গরাশির মধ্যে মধুর সংগীত বিরাজমান।

আমি বাসায় ফিরে এতটা পরিশ্রান্ত বোধ করলাম যেন কত বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এলাম। সৌন্দর্য তো জীবন-সুধা। কিন্তু জানি না কেন এর প্রভাব এত হৃদয়বিদারক হয়। শুয়ে শুয়েও সেই মুখই দেখতে পেলাম। তাকে সরিয়ে দিতে চাইলাম। আমার ভয় ছিল যে, এক মুহূর্তও ওই আবর্তে পড়লে আমি আমাকে সামলে রাখতে পারব না। আমি তো এখন কেবলমাত্র লজ্জাবতীর। সেই এখন আমার হৃদয়েশ্বরী। এখন আমার হৃদয়ের উপর আমার আর কোন অধিকার নেই। কিন্তু আমার সকল সংযম, সমস্ত প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল। জলোচ্ছ্বাসের সময় নৌকাকে ঢেউয়ের হাত থেকে কে রক্ষা করতে পারে? শেষে হতাশ হয়ে সব প্রচেষ্টা ত্যাগ করে অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিলাম। কিছুদূর পর্যন্ত নৌকা বেগবতী নদীর স্রোতের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটে অবশেষে সেই প্রবাহেই বিলীন হয়ে গেল।

একটি বালক যেমন বিদ্যুৎ চমকানোর সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে ফেলে যাতে সে চমকে না যায়, আমি ততটাই শশঙ্কচিত্তে পরদিন দেওয়ান সাহেবের বাসায় নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে পৌঁছলাম। একটা গ্রামের সাদাসিধা চাষীও আদালতের সামনে আমার মত অতটা ভীত হয় না। সত্যি বলতে কি আমার হৃদয় সেখানে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে-ছিল, আর আমার প্রতিকারের কোন ক্ষমতা ছিল না।

দেওয়ান সাহেব আমার সাথে করমর্দন করলেন এবং কয়েক ঘণ্টা ধরে আর্থিক ও সামাজিক

প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। আমি ওঁর বিরাট অভিজ্ঞতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এতটা বাক্‌-পটু মানুষ আগে দেখি নি। বয়স ষাট বছর হলেও কিন্তু তিনি হাস্যরসের যেন একটি ভাণ্ডার ছিলেন। না জানি কত শ্লোক, কত কবিতা আর কত 'শের' ওঁর মুখস্থ ছিল। কথায় কথায় কোন না কোন উদ্ধৃতি দিচ্ছিলেন। দুঃখ হয় যে, এই ধরনের লোক এখন প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তখনকার শিক্ষাদান পদ্ধতি না জানি কেমন ছিল যার ফলে এমন সব রত্ন তৈরী হয়েছিল। এখন তো প্রাণের এমন সজীবতা কোথাও দেখাই যায় না। এখন প্রায় সকলেই নানারকম চিন্তার প্রতিমূর্তি, হাসি আর কারুরই মুখে নেই। দেওয়ান সাহেব প্রথমে চা, তারপর ফল আর মেওয়া আনালেন। আমি থেকে থেকেই উৎসুক নয়নে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছিলাম। আমার শ্রবণেন্দ্রিয় অন্য এক-জনের স্বরমাধুরী পান করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল আর নয়ন দ্বারপ্রান্তে নিবদ্ধ ছিল। আশঙ্কাও ছিল সাথে আকাঙ্খাও ছিল, অস্বস্তি ছিল কিন্তু আকর্ষণও ছিল। ঠিক বাচ্চারা যেমন দোলনায় ভয় পেলেও তাতেই বসতে চায়। কিন্তু এইভাবে রাত ন'টা বেজে গেল, আমার ফেরার সময় হয়ে এল। দেওয়ান সাহেব মনে মনে কি ভাবছেন এই ভেবে খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম। হয়ত ভাবছেন, এর কি কোন কাজ নেই? যাচ্ছে না কেন, বসে বসে দু'-আড়াই ঘণ্টা তো হয়ে গেল!

সব আলোচনাই শেষ হয়ে গেল। তাঁর গল্পও ফুরিয়ে গেল। এরপর এমন একটা নীরবতা বিরাজ করতে লাগল যার একটাই মানে হয় যে, 'এখন আসুন, আবার পরে দেখা হবে।' কিন্তু তখনও প্রেমিকার সাথে মিলন হয় নি। আমি কতবার উঠার চেষ্টা করেছি, কিন্তু, হায়! অপেক্ষাতে প্রেমিকের প্রাণ যায় না এবং মৃত্যুকেও অপেক্ষা করে থাকতে হয়। এইভাবে সাড়ে ন'টা বেজে গেল এবং মন ভেঙ্গে গেলেও আমার আর উঠে আসা ছাড়া উপায় রইল না।

আমি যাকে ভয় বলে মনে করেছিলাম, আসলে তা ভয় ছিল না, তা ছিল ঔৎসুক্যের চরম অভিব্যক্তি।

ওখান থেকে চলে আসার সময় এমন অবসন্ন আর নির্জীব লাগছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন আমি মরে গেছি। নিজেকে ধিক্কার দিলাম। আমার ক্ষুদ্রতার জন্য লজ্জা হচ্ছিল। "তুমি নিজেকে একটা কেউকেটা ভাব কিন্তু এখানে কেউ তোমার কোনো খবরই রাখে না। তোমার মরা বাঁচার জন্য কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। মেনে নিলাম এটা কুমারীদের প্রকৃতি। কিন্তু সংসারে তো কুমারী মেয়ে কম নেই। সৌন্দর্যও এমন দুর্লভ বস্তু নয়। তাছাড়া সংসারের প্রতিটি রূপবতী কুমারী মেয়েকে দেখেই যদি তোমার এমন অবস্থা হয়, তাহলে একমাত্র ভগবানই তোমাকে বাঁচাবেন।"

হয়ত সে-ও মনে মনে এই চিন্তাই করছে। প্রতিটি রূপবান যুবকের প্রতি তার দৃষ্টি কেন পড়বে? সৎ বংশের মেয়েদের প্রকৃতি এমন নয়। পুরুষের পক্ষে রূপতৃষ্ণা যদি লজ্জাজনক হয় তবে মেয়েদের পক্ষে সেটা সর্বনাশের কারণ।

এর পরদিন আমি বারান্দায় বসে চিঠিপত্র দেখছিলাম এবং ক্লাবে যাওয়ার ইচ্ছেও ছিল। মন কিছুটা উদাস ছিল। হঠাৎ দেওয়ান সাহেবকে ফিটন গাড়িতে চড়ে আসতে দেখলাম। উনি মোটরগাড়িকে ঘৃণা করতেন। ওগুলোকে তিনি পৈশাচিক 'উড়ন খাটোলা' বলতেন। ওর পাশে সুশীলাও ছিল। আমার বুক ভীষণ কাঁপতে আরম্ভ করল। ওর দৃষ্টি আমার উপর পড়ুক আর নাই পড়ে থাকুক, আমার অপলক দৃষ্টি যতক্ষণ না ফিটনটি অদৃশ্য হল ততক্ষণ পর্যন্ত তার অনুসরণ করল।

তৃতীয় দিনেও আমি আবার বারান্দায় এসে বসলাম। দৃষ্টি পড়ে রইল রাস্তার উপরে। ফিটন-গাড়িও এল আবার চলেও গেল। এখন থেকে ওটাই ওর প্রতিদিনের নিয়মে পরিণত হল। আমারও সারাদিন বারান্দায় বসে থাকাই কাজ হয়ে দাঁড়াল। কি জানি ফিটন কখন চলে যায়। বিশেষ করে বিকেলে তো জায়গা থেকে নড়ার নামও নিতাম না।

এইভাবে একমাস কেটে গেল। কাউন্সিলের কাজে আর উৎসাহ পেতাম না। সমাচার পত্র, উপন্যাসে মন লাগত না। কোথাও বেড়াতে যেতেও ইচ্ছে করত না। প্রেমিকরা কি করে জানি না জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় বা কাঁটায় নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করার আশ্চর্য ইচ্ছের বশবর্তী হয়। আমার দুই পা যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে পড়েছিলো। শুধুমাত্র বারান্দাটা ছিল আর ছিল সেখানে বসে ফিটনের প্রতীক্ষা। আমার বিচারশক্তিও যেন সম্পূর্ণ অপসৃত হয়েছিল। আমি দেওয়ান সাহেবকে আর ইংরেজী শিষ্টাচার মতে সুশীলাকেও আমার এখানে নিমন্ত্রণ করতে পারতাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে আমার ভয় ছিল। তখনও পর্যন্ত লজ্জাবতীকে আমার প্রণয়িনী বলে মনে করতাম। কোনও দ্বিতীয় নারীর প্রভাব পড়ুক আর নাই পড়ুক সে তখনও পর্যন্ত আমার হৃদয়ের রানী।

এক মাস আরও কেটে গেল, কিন্তু লজ্জাকে কোন চিঠি দেওয়া হল না। ওকে এই অবস্থায় চিঠি লেখার সামর্থ্যও ছিল না। সত্যি বলতে কি, ওকে পত্র লেখাটা আমার নৈতিক অত্যাচার বলে মনে হচ্ছিল। আমি ওর সাথে মিথ্যাচার করেছি। নিজের মলিন অন্তঃকরণে ওকে অপবিত্র করার কোন অধিকার আমার ছিল না।

এর পরিণতি কি? এই চিন্তাই দিনরাত আমার মনে মেঘের মতো ছায়া ফেলে রেখেছিল। জীবনটা মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করত। চিন্তার আগুন দিনের পর দিন পুড়িয়ে খাঁক করে দিচ্ছিল। আত্মীয় পরিজনেরা মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করত, 'আপনার কি হয়েছে'। মুখ নিস্তেজ ও শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল। খাওয়ার জিনিস ওষুধের মতো লাগত। শুতে গেলে মনে হত আমায় যেন কেউ একটা খাঁচায় বন্দী করে রেখেছে। কেউ দেখা করতে আসলে মন পালিয়ে বেড়াত। একটা অদ্ভুত অবস্থা হয়েছিল।

একদিন বিকেলে দেওয়ান সাহেবের ফিটন আমার দরজায় এসে দাঁড়াল। তিনি নিজের বক্তৃতার একটা সঙ্কলন প্রকাশ করেছিলেন। উনি তার একটা সংখ্যা আমাকে উপহার দিতে এসেছিলেন। আমি তাকে বসবার জন্য খুব অনুরোধ করলাম, কিন্তু তিনি বললেন যে, সুশীলা এখানে আসতে সঙ্কোচ বোধ করবে আর ফিটনে একা থাকতে ভয় পাবে। উনি যখন গেলেন তখন আমিও তার পিছনে পিছনে ফিটন অব্দি গেলাম। যখন তিনি গাড়িতে উঠছিলেন তখন আমি সুশীলাকে নিঃশঙ্কচিত্তে দু'চোখ ভরে দেখলাম, ঠিক যেমন-ভাবে গ্রীষ্মকালে পিপাসার্ত পথিক পরান ভরে জলপান করে এই আশঙ্কায় যে, কি জানি আবার কখন জল পাওয়া যাবে। আমার সেই দৃষ্টিতে এতটা উগ্রতা, এতটা আকাঙ্খা, উদ্বেগ, এতটা করুণা, এত শ্রদ্ধা, অসীম আগ্রহ ও এতটা দীনতা মেশানো ছিল যে, তা পাথরের মূর্তিকেও আর্দ্র করে দিতে পারত। সুশীলা তো কেবল একজন নারী। সে-ও তার নির্মল সরল চোখ দিয়ে আমাকে দেখল, তাতে বিন্দুমাত্র কম্পন ছিল না, ছিল না বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ। আমার পরাজয়ের যেটুকু বাকী ছিল, তা-ও সম্পূর্ণ হয়ে গেল। মনে হল এরই মাধ্যমে সে আমার উপর অমৃতবারি সিঞ্চন করল। আমার হৃদয়ে মনে একটা নূতন শক্তির সঞ্চার হল। যেন কল্পতরুর সন্ধান মিলেছে। সেই আনন্দ নিয়ে আমি ফিরে এলাম। পরের দিনই আমি প্রফেসর ভাটিয়াকে পত্র লিখে জানিয়ে দিলাম যে, আমি কিছুদিন হলো কোন একটা অজানা রোগে আক্রান্ত হয়েছি। মনে হচ্ছে এটা ক্ষয়রোগের সূচনা এবং সেজন্য এই মে মাসে বিয়ে করাটা উচিৎ হবে বলে মনে করি না। আমি এই-জন্য লজ্জাবতীর প্রতি বিমুখ হয়েছিলাম যে, তার দৃষ্টিতে আমি যেন ছোট হয়ে না যাই। মাঝে মাঝে নিজের স্বার্থপরতার জন্য রাগ হতো। লজ্জার সাথে এই ছলনা, কপটতা, এই বিশ্বাসঘাতকতা আমাকে নিজের চোখেই ছোট করে দিয়েছে। কিন্তু মনের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সেই অবলা নারীর দুঃখের পরিমাণের কথা ভেবে কত কেঁদেছি। তখনও পর্যন্ত সুশীলার স্বভাব, ধ্যান-ধারণা ও মনোবৃত্তির সাথে বিন্দুমাত্র পরিচিত ছিলাম না। কেবলমাত্র তার রূপলাবণ্যের যূপ-কাষ্ঠে আমার লজ্জার বহুদিনের সঞ্চিত কামনাকে বলি দিয়েছিলাম। অবোধ শিশুর মত মিঠাই পাওয়ার লোভে দুধ-ভাতকে সরিয়ে রেখেছিলাম। আমি প্রফেসর সাহেবকে লিখেছিলাম যে, তিনি যেন লজ্জাবতীর কাছে আমার রোগের কথা না বলেন। কিন্তু প্রফেসর সাহেবের অতটা গভীরতা ছিল না। চতুর্থ দিনেই লজ্জার কাছ থেকে চিঠি এল।—তাতে সে তার হৃদয়কে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। সে আমার জন্য সব কিছু এমন কি বৈধব্যের যন্ত্রণা সহ্য করতেও প্রস্তুত। তার মত হল আমাদের বিয়ের এক মুহূর্তও দেরী করা উচিৎ নয়। এই পত্র পেয়ে আমি প্রায় এক ঘণ্টা হতচেতন অবস্থায় বসে থাকলাম। এই আত্ম-ত্যাগের সামনে আমার ক্ষুদ্রতা, আমার স্বার্থপরতা, আমার দুর্বলতা কতটা ঘৃণ্য।

সাবিত্রী কি সব জেনেশুনেই সত্যবানকে বিয়ে করে নি? তাহলে আমার ভয় কিসে? নিজের কর্তব্যের পথ থেকে পিছিয়ে পড়ব? আমি তার জন্য ব্রত পালন করব, তপস্যা করব। ভয় আমাকে তার থেকে আলাদা করতে পারবে না। ওঁর প্রতি আগে এতটা ভালবাসা ছিল না। কখনো এতটা অধীরতা ছিল না। এখনই আমার পরীক্ষার সময়, আর আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। বাবা কেবলমাত্র পরিভ্রমণ সেরে ফিরেছেন, কপর্দক শূন্য হাতে কোনো প্রস্তুতিই করতে পারবেন না। হয়ত দুই-চার মাস দেরী হলে তার পক্ষে প্রস্তুত হওয়ার অবসর মিলত, কিন্তু আমি এখন আর বিলম্ব করতে রাজী নই। এই মাসেই আমি আর সে একে অপরের হয়ে যাব, আমাদের আত্মার চির-মিলন ঘটবে। এবার কোনো বিপত্তি বা কোনো দুর্ঘটনা আমাকে ওর থেকে আলাদা করতে পারবে না।

আমার আর একদিনের দেরীও সহ্য হচ্ছে না। প্রথা ও সামাজিক আচারের দাস ছিলাম না। সে-ও এ-সবের অনুরক্ত ছিল না। বাবাও এ-সব 'প্রথা'র ভক্ত নন। তাহলে কেন নৈনিতালে যেতে দেরী করব। আমি ওর সেবা-শুশ্রূষা করব, ওকে সান্ত্বনা দেব। ওকে আমি সমস্ত চিন্তা থেকে, সব বাধা-বিঘ্ন থেকে মুক্ত করে দেব। এলাকার সমস্ত কাজ নিজের কাঁধে নিয়ে নেব। কাউন্সিলের কাজে এতটা জড়িয়ে পড়ার জন্যই ওর এই অবস্থা। কাগজে কাগজে ওর প্রশ্ন, ওর আলোচনা, ওর বক্তৃতার উল্লেখই বেশী থাকে। কিছুদিন কাউন্সিলের কাজ বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ করব। উনি আমার গান কত মন দিয়ে শুনতেন। তাঁকে আমি গান শুনিয়ে প্রসন্ন রাখব, গল্পের বই পড়ে শোনাব, ওঁকে শান্ত রাখার সব রকম চেষ্টা করব। এদেশে এ রোগের ওষুধ পাওয়া যায় না। আমি তাঁর পায়ে ধরে প্রার্থনা করব যেন তিনি কিছুদিনের জন্য য়ুরোপের কোনো স্বাস্থ্য-নিবাসে গিয়ে বিধিমত চিকিৎসা করান। কালকেই কলেজের গ্রন্থাগার থেকে এই রোগের উপর লেখা বই নিয়ে আসব এবং সব খুঁটিয়ে পড়ে দেখব। দু-চারদিনের মধ্যেই কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে। আজই আমি বাবাকে নৈনিতাল যাওয়ার জন্য অনুরোধ করব।

হায় রে! আমি তো তাঁকে দেখে চিনতেই পারি নি। কি সুন্দর রক্তিম বর্ণ ছিল, কি পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য! মনে হতো যেন চেহারায় লাল আভা ফুটে বেরোচ্ছে। দেহসৌষ্ঠব কত সুন্দর ছিল। শৌর্যশালী ছিলেন। তিন বৎসরেই শরীরের এতটা পরিবর্তন? মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, শরীর শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে। খাওয়া তো অর্ধেকও নেই, আর রাতদিন কিসের চিন্তায় মগ্ন। চলাফেরা করে বেড়াতেও দেখা যায় না। এতগুলো কাজ করার লোক, এত সুন্দর সুরম্য বাসস্থান। বিলাস উপকরণ সবই তো হাতের কাছে। কিন্তু তবুও কেন তার জীবন এত অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়? পোড়ারমুখো রোগ ধ্বংস হোক। যদি এতটাই লোভ তাহলে রোগ তো আমাকেই ধরলে পারত। আমি হাসি মুখেই বরণ করে নিতাম। এমন কোন উপায় কি নেই যাতে এ দুষ্ট রোগ তাঁকে ছেড়ে আমাকে ধরে। আগে আমাকে দেখে কেমন খুশী হতেন আর আমারও হাসি ফুটত। প্রতিটি অঙ্গ খুশীর হিল্লোলে হিল্লোলিত হয়ে উঠত। সে সব অতীতের ঘটনা বলে মনে হয়। একবারের জন্যও তার মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখলাম না। আমি যখন বারান্দায় পা রাখলাম, তখন তিনি হেসে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তা কত নিষ্প্রাণ। বাবাও নিজের চোখের জল চাপতে পারেন নি। পাশের ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন। লোকে বলে, কাউন্সিলে মানুষ কেবল সম্মান লাভের লোভেই যায়। তাদের উদ্দেশ্য কেবল নাম কেনা। বেচারী সভ্যদের উপর এটা কি অবিচার, কি কৃতঘ্নতা। এখানে জাতির সেবায় শরীরকে ক্ষয় করতে হয়। রক্ত শুকিয়ে যায়। আর জাতি-সেবার এই পুরস্কার!

এখানে বাড়ির চাকরদেরও কিছুমাত্র চিন্তা-ভাবনা নেই। বাবা দু'চার জন অভ্যাগতের সাথেও এই রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেসাবাদ করেছিলাম, কিন্তু কারও কোনো মাথাব্যথা ছিল না। বন্ধুদের সহানুভূতিরও ঐ এক অবস্থা। সবাই যে যার খেয়ালে মগ্ন, অপরের দিন কি করে কাটছে তার খবর কেউ রাখে না। যদিও আমার মনে হয় যে ওঁর ক্ষয় রোগ কেবল মনের ভুল। এর কোনো লক্ষণ তো দেখি না। ভগবান করুন আমার অনুমান যেন ঠিক হয়। অন্য কোন রোগ হয়েছে বলে মনে হয়। বার বার টেম্পারেচার নিয়ে দেখেছি দেহের তাপ সাধারণই আছে। তাতে কোন আকস্মিক পরিবর্তনও হচ্ছে না। যদি এই রোগই হয়, তবে এখন একেবারে প্রথমাবস্থা, উপযুক্ত সেবাযত্নে না সেরে যাওয়ার কোন কারণই নেই। আমি কাল থেকে ওকে বেড়াতে নিয়ে যাব। মোটর গাড়ির দরকার নেই, ফিটন করে ঘুরতে পারলেই উপকার বেশী হবে। আমার তো ওকে নিজে কিছুটা অসাবধানী বলে মনে হচ্ছে। এই ধরনের রোগীকে খুব সাবধানে থাকতে হয়। এ ধরনের রুগীর দেহের তাপ দিনের মধ্যে অনেক বার থার্মোমিটার দিয়ে দেখে রাখতে হয়। খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার করতে হয়। ফল, দুধ এবং অন্যান্য পুষ্টিকারক খাদ্য খেতে হয়। কিন্তু তার বদলে কাজের লোক যা-খুশী খাওয়ার জিনিস নিজের ইচ্ছে মত বানিয়ে সামনে এনে ধরবে আর তাই দু'চার গ্রাস খেয়ে উঠে গেলে তো চলবে না। আমার তো মনে হচ্ছে যে, এর অন্য কোন কারণ আছে। যদি কিছুটা সময় পাই তো এর খোঁজ করব। কোনো দুশ্চিন্তা নেই তো? সম্পত্তির উপর ঋণের বোঝা চাপে নি তো? অল্প কিছু ঋণ তো হতেই পারে। সে তো বড়লোকেদের পক্ষে স্বাভাবিক। যদি ঋণই এর কারণ হয়, তাহলে তা নিশ্চয়ই বড় রকমের।

বিচিত্র সব চিন্তায় মন এতটা দমে আছে যে কিছু লিখতে আর ইচ্ছে করছে না। আমার জীবনের সমস্ত কামনা-বাসনা আজ ধুলোতে মিশে গেছে। হা, হতোস্মি! আমি নিজেকে কতটা সৌভাগ্যবতী বলে ভাবতাম। আর আজ পৃথিবীতে আমার থেকে হতভাগিনী কেউ নেই। যে অমূল্য-নিধি আমি সারা জীবনের তপস্যা আর সাধনার ফলে লাভ করেছিলাম, তা এই মৃগনয়না সুন্দরী অনায়াসে পেয়ে গেল।...শারদা ওকে এই সেদিন মাত্র দেখেছে। পরস্পরের মধ্যে সামান্য কথা বলার সুযোগটুকুও হয় নি। তবুও সে তার প্রতি কতটা অনুরক্ত। তার প্রেমে কেমন উন্মত্ত হযে গেছে। পুরুষ জাতিকে ভগবান হৃদয় দেন নি, কেবল চোখ দিয়েই পাঠিয়েছেন। তারা হৃদয়ের মূল্য দিতে জানে না, কেবল রূপের হাটে বিকিয়ে যায়। কোনোক্রমে এ বিশ্বাস যদি আমার হয় যে সুশীলা ওঁকে আমার থেকে বেশি প্রসন্ন রাখতে পারবে, ওঁর জীবনকে আরও বেশি সার্থক করে তুলতে পারবে, তাহলে জায়গা খালি করে দিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকবে না। ও এতটা অহংকারী, এতটা হৃদয়হীন যে আমার ভয় হয় পাছে শারদাকে পস্তাতে না হয়।

কিন্তু এ সব তো আমার স্বার্থপ্রসূত কল্পনা-মাত্র। সুশীলা অহংকারী হতে পারে, হৃদয়হীনা হতে পারে, বিলাসিনী হতে পারে, কিন্তু শারদা তো তাকেই সব কিছু অর্পণ করে বসে আছে। শারদা বুদ্ধিমান, চালাক এবং দূরদর্শী। নিজের লাভক্ষতি বিচার করার ক্ষমতা আছে। সে নিশ্চয়ই সব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার মনে যখন একথা একবার ঠাঁই নিয়েছে, তখন তার সুখের পথে কাঁটা হওয়ার কোন অধিকার আমার নেই। নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে, মনকে সব বুঝিয়ে হতাশ, নিরাশ হয়ে এবং ভগ্ন হৃদয় নিয়ে এখান থেকে বিদায় হয়ে যেতে চাই। ভগবান ওকে সুখে রাখুন এইটুকুই প্রার্থনা। আমার বিন্দুমাত্র ঈর্ষা বা বিন্দুমাত্র দম্ভ নেই। আমি তো তারই ইচ্ছার দাসী। সে যদি আমাকে বিষ দিয়ে সুখী হয় তাহলে আমি আনন্দের সাথে সেই বিষের পাত্রে চুমুক দেব। প্রেমই জীবনের প্রাণ। আমি এই জন্যই বেঁচে থাকতে চাই। যদি এর জন্য মরতেও পারি তাও ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেব। যদি আমি সরে গেলে সব কিছু ঠিক হয়ে যায় তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। ভগবানের ইচ্ছা বলে মেনে নেব। কিন্তু মনুষ্য জীবনে মায়া-মোহ থেকে কে কবে মুক্তি পেয়েছে? যে প্রেমলতাকে এতদিন ধরে পালন করেছি, চোখের জলে বারি-সিঞ্চন করেছি, তারই নিচে নিজেকে দলিত হতে দেখতে পারব না। হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ছিন্নপত্রের মতো ভেসে যাচ্ছি মনে হচ্ছে, চোখের জল বাধা মানছে না, মনকে কি বলে প্রবোধ দেই। হায়! যাকে সব থেকে নিজের বলে ভেবেছি, যার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করেছি, যার জন্য জীবনলতা পল্লবিনী হয়ে উঠেছিল, যাকে হৃদয় মন্দিরে পুজো করেছি, যার ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকা জীবনের সব থেকে প্রিয় কাজ ছিল, তার কাছ থেকে সারা জীবনের মত বিচ্ছিন্ন হতে যাচ্ছি। হায় কপাল! আমি কার কাছে নালিশ করব? কার কাছে গিয়ে কাঁদব? নিজের দুঃখের কথা কাকে বলব? আমার অবলা হৃদয় এই বজ্রাঘাত সহ্য করতে পারছে না। এই

আঘাত আমার মৃত্যুর কারণ হবে। ভালই হবে। প্রেমবিহীন চিত্তের কাছে এই সংসার নৈরাশ্য আর অন্ধকারময় কাল-প্রকোষ্ঠ। আমি জানি যে, বাবা যদি আজ বিয়ের জন্য জোর করেন, তাহলে তিনি হয়ত সৌজন্যের বশে রাজী হয়ে যাবেন। কেবল-মাত্র আমার মন রাখার জন্য নিজের জীবন নিয়ে হয়ত ছিনিমিনি খেলবেন। তিনি ওই ধরনের রুচিবান পুরুষ যারা না বলতে শেখে নি। এখনও পর্যন্ত দেওয়ান সাহেবের সাথে তিনি সুশীলার বিষয় নিয়ে কোন কথাবার্তা বলেন নি। তিনি কেবল আমার অভিব্যক্তির প্রতি নজর রাখছিলেন। এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা তাঁকে এই দশায় পোঁছে দিয়েছে। তিনি আমাকে এখন সব সময় প্রসন্ন রাখার চেষ্টা করবেন। আমার মনে যাতে আঘাত না লাগে তার জন্য সুশীলার কথা ভুলেও করবেন না। আমি তো তাঁর স্বভাব জানি। তিনি মনুষ্য-রত্ন। কিন্তু আমি তাঁর পায়ের বেড়ী হতে চাই না। যা হওয়ার তা আমার উপর দিয়েই হোক, ওঁকে কেন এর মধ্যে টানব। যদি ডুবতেই হয় তাহলে নিজেই ডুবি, ওঁকে কেন নিজের সাথে

আমি এও জানি যে, যদি এই আঘাত আমাকে তিলে তিলে ক্ষয় করে দেয় তাহলে সে নিজেকে কখনো ক্ষমা করবে না। সারাটা জীবন ক্ষোভ আর গ্লানিতে ভরে যাবে, কোন দিনও শান্তি পাবে না। কি জটিল পরিস্থিতি! আমার মরারও স্বাধীনতা নেই। ওকে প্রসন্ন রাখার জন্য নিজেকে প্রসন্ন রাখতেই হবে। ওঁর সাথে কিছুটা নিষ্ঠুরতা করতেই হবে। মেয়েদের চরিত্র কেমন, তা তাঁকে জানাতে হবে। এটাই প্রকাশ করতে হবে যে, রোগের জন্য এখন বিয়ের কথা হতে পারে না। কথা ভাঙ্গার অপবাদ নিজের কাঁধেই নিতে হবে। এছাড়া উদ্ধারের আর কোনো রাস্তা নেই। ভগবান এই কঠিন পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার শক্তি দাও।

এক দৃষ্টিপাতেই সব স্থির হয়ে গেল। লজ্জারই জিৎ হলো। এক নজরেই সুশীলাও আমাকে জয় করেছিল। সেই দৃষ্টিতে প্রবল আকর্ষণ ছিল, ছিল এক মনোহর সারল্য. যেন একটা আনন্দোচ্ছ্বাস যা মনের ভাব লুকিয়ে রাখতে দেয় না। একটা শিশুসুলভ-উল্লাস যেন সে একটা খেলনা পেয়েছে। লজ্জার মনোরাজ্য জুড়ে ছিল ক্ষমা, আর ছিল করুণা, ছিল নৈরাশ্য, ছিল বেদনা। সে আমার ইচ্ছের কাছে আত্মোৎসর্গ করতে যাচ্ছিল। নিজের বিষয়ে সে সচেতন ছিল। নিজের বুদ্ধিমত্তার জোরে সমস্ত পরিস্থিতি উপলব্ধি করে সে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে পোঁছল। আমার সুখের পথে বাধা হতে চায় না। এর সাথে এও বোঝাতে চায় যে, আমার পরোয়াও সে করে না। কিন্তু তুমি যদি আমাকে সামান্য আকর্ষণ কর সেটাই আমার কাছে বিরাট আকর্ষণ। মনোবৃত্তি সুগন্ধের মতোই, একে লুকিয়ে রাখা যায় না। ওর নিষ্ঠুরতার মধ্যে নৈরাশ্যের বেদনা লুকিয়ে আছে, আছে হাসির মধ্যে অশ্রুর আভাষ। আমার দৃষ্টি এড়িয়ে মাঝে মাঝে রান্নাঘরে গিয়ে আমি খেতে পছন্দ করি এমন কিছু রান্না করে কেন নিয়ে আসতো? আমার চাকরদের কেন শেখাতো কি করে আমাকে আরামে রাখা যায়? সমাচার পত্রগুলোকে আমার নজরের আড়ালে কেন লুকিয়ে রাখত? আমাকে সন্ধ্যার সময় বাইরে বেড়াতে যেতে কেন বাধ্য করত? ওর প্রতিটা কথা, হৃদয়ের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে দিত। একথা ও ভাল করেই জানতো যে, আত্ম-গরিমা রমণীদের বিশিষ্ট গুণ নয়। সেদিন যখন প্রফেসর ভাটিয়া কথা বলার সময় আমাকে ব্যঙ্গ করে আমাকে সম্পত্তির, বৈভবের দাস বললেন এবং আমার সাম্যবাদের প্রতি ভক্তি নিয়ে ঠাট্টা করতে চাই-ছিলেন, তখন লজ্জাবতী বুদ্ধি করে কথা ঘুরিয়ে দিল। আমি জানি না সে তার বাবাকে কি বলেছিল কিন্তু সেদিন বারান্দায় বসে বসে শুনছিলাম যে বাগানে বসে বাপে আর মেয়ের মধ্যে কিছু একটা নিয়ে উত্তেজিতভাবে আলোচনা হচ্ছিল। এমন হৃদয়হীন কে আছে যে এই নিষ্কাম সেবার বশীভূত হবে না? লজ্জাবতীকে আমি অনেক দিন ধরেই চিনি। কিন্তু এবারের দেখাতে ওর আসল রূপ প্রতিভাত হল। প্রথমে আমি তার রূপের, তার উদার মনোবৃত্তির এবং মৃদু ভাষণের ভক্ত ছিলাম। তার উজ্জ্বল, দিব্য আত্মোজ্যোতি আমার চোখে ধরা দেয় নি। ওর প্রেম যে কতটা প্রগাঢ়, কতটা পবিত্র এবং কতটা গভীর তা আমি এখনই জানতে পারলাম। এই অবস্থায় অন্য যে কোন মেয়ে ঈর্ষায় পাগল হয়ে যেত, আমার প্রতি না হলেও সুশীলার প্রতি তো নিশ্চয়ই জ্বালা থাকত, দোষারোপ করত এবং ওকে ব্যঙ্গ করে বিদ্ধ করত। আর আমাকে ধূর্ত, কপট, পাষাণ ইত্যাদি কত কি না বলত। আর লজ্জা যে বিশুদ্ধ ভালবাসা নিয়ে সুশীলাকে স্বাগত জানিয়েছে—তা আমি কখনোই ভুলতে পারব না। এর মধ্যে মালিন্য, সংকীর্ণতা, নীচতার লেশমাত্রও ছিল না। যেভাবে হাত ধরাধরি করে ঘুরে ফিরে বেড়াতো তাতে মনে হয়েছে ওর ছোট বোন ওর অতিথি হয়ে এসেছে। সুশীলা এই ব্যাপারে মোহিত। লজ্জাবতীর বিদায়ের মুহূর্তটিই চিরস্মরণীয়। প্রফেসর ভাটিয়া মোটরে বসে ছিলেন। কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েই উনি তাড়াতাড়ি চলে যেতে চেয়ে-ছিলেন। লজ্জা এক গাঢ় রঙের শাড়ি পরে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। প্রেমে উৎসর্গীকৃত জীবন এক তপস্বিনীর মত, দেবী প্রতিমার পায়ে অর্পিত এক শ্বেতপুষ্পের মালার মত প্রতিভাত হচ্ছিল। আমাকে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল—'মাঝে মাঝে চিঠি দিও—এটুকু কৃপা তো আশা করতে পারি?' আমি সহাস্যে বললাম—'নিশ্চয়ই।'

লজ্জাবতী আবার বলল—'এই আমাদের শেষ দেখা। জানি না কোথায় কখন থাকব, কোথায় কোথায় যাব, কখনো এখানে আসতে পারব কিনা। আমাকে একেবারে ভুলে যেও না। যদি মুখ থেকে এমন কথা কখনও উচ্চারিত হয়ে থাকে যাতে তুমি দুঃখ পেয়েছ তাহলে ক্ষমা করো—আর নিজের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রেখো।'

এই বলতে বলতে সে আমার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিল। হাত কাঁপছিল। দুচোখ বেয়ে জলের ধারা ঝরে আসছিল। সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইছিল। নিজের শক্তির উপর আর আস্থা রাখতে পারছিল না। আমার দিকে চোখের জল চেপেই তাকিয়ে দেখল। কিন্তু ঐ দৃষ্টিতে চেপে রাখা অশ্রুর প্রবাহ প্রতীয়মান হচ্ছিল। সেই কান্নার আবেগে আমিও আর স্থির থাকতে পারি নি। এই অশ্রুসজল দৃষ্টিই হারিয়ে যাওয়া ধন খুঁজে পেল, আমি ওর দুই হাত জড়িয়ে ধরে গদগদ স্বরে বললাম——'না লজ্জা, এখন আর তোমার আমার মধ্যে বিচ্ছেদ সম্ভবপর নয়।'

সহসা চাপরাশী সুশীলার একটা চিঠি আমার সামনে এনে দিল। তাতে লেখা ছিল—

প্রিয় শারদাচরণজী,

আমরা কাল এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আজ আমার অনেক কাজ থাকায় দেখা করতে পারছি না। আমি গত রাত্রে আমার কর্তব্যকর্ম স্থির করে ফেলেছি। আমি লজ্জাবতীর নিজের হাতে গড়া ঘর ভেঙ্গে দিতে চাই না। প্রথমে একথা জানা ছিল না—তাহলে এতটা ঘনিষ্ঠতা হতো না। আপনার কাছে আমার একটাই অনুরোধ যে আপনি লজ্জাকে আপনার কাছ থেকে চলে যেতে দেবেন না। সে একটি নারীরত্ন। আমি জানি হয়ত আমার রূপ ওঁর থেকে সামান্য বেশী, আর আপনিও হয়ত তার প্রলোভনে পড়েছিলেন, কিন্তু আমার সেই ত্যাগ, সেই সেবাপরায়ণতা, ওই আত্মোৎসর্গ নেই। আমি আপনাকে সুখী হয়ত রাখতে পারি, কিন্তু আপনার উৎকর্ষবৃদ্ধি ঘটাতে পারব না, আপনাকে পবিত্রতর এবং যশমণ্ডিত করতে পারব না। লজ্জা দেবী-প্রতিম; ও আপনাকে দেবতায় পরিণত করবে। আমি নিজেকে আপনার যোগ্য বলে মনে করি না। কাল আমার সাথে দেখা করার চেষ্টা করবেন না। কেঁদে এবং কাঁদিয়ে লাভ কী? ক্ষমা করবেন।

আপনার
সুশীলা

আমি এই চিঠি লজ্জার হাতে দিলাম। সে চিঠিটা পড়ে বলল—"আমি আজই ওর সাথে দেখা করতে যাব।"

আমি মনের অবস্থা বুঝে বললাম—"ক্ষমা করো। তোমার উদারতার দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করতে চাই না।"

এই বলে আমি প্রফেসর ভাটিয়ার কাছে গেলাম। উনি মোটর গাড়িতে মুখ গম্ভীর করে বসেছিলেন। আমার বদলে যদি লজ্জাবতী আসতো তাহলে তার উপর রেগেই উঠতেন।

আমি তাঁর পদস্পর্শ করে বিনম্রভাবে বললাম—"আপনি আমাকে বরাবর পুত্রবৎ দেখেছেন। এখন সেই ধারণাকে আরও সুদৃঢ় করার সুযোগ দিন।"

প্রফেসর ভাটিয়া তো প্রথমে আমার দিকে অবিশ্বাসের সাথে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন—"এতো আমার জীবনের সব থেকে বড় আশা।"

চাঁদ

মুকুলদেব ঠাকুর

বন্দীশালায় কয়েদীর হাতে
পোড়া, গোল রুটি
চাঁদ।

মাটির ওপরে শেকড়ের পরিণতিঃ
তাই কবিদের কল্পনাতেও
চাঁদ।

ভিখারীর পেটে জ্বলন্ত ব্রণঃ
আরো বহুগুণ খিদের আগুন—
ঝলসিয়ে ওঠে
চাঁদ।

মৃতবৎসার স্বপ্নে-মায়ায়
এবং প্রেমিক প্রাণের ছায়ায়
তিথি-বিম্বিত
চাঁদ॥

তারুণ্য

গৌতমকুমার হাজরা

শৈশবে সবুজ ঘাসে শিখার মতন
জ্বলে ওঠে যখন আগুন,
জটিল আলোছায়া ছিঁড়ে ফেলতে চায়
তারুণ্যের উদ্দীপিত পলাশ ফাগুন;
তখন, নির্জন হ্রদের নগ্ন কালো জল,
আকাশের তারা
পাতার বেদনা নিয়ে কেঁপে ওঠে
ভুবনডাঙ্গার পথে
দিগন্তে উড়ে যায় ঘুঘুর পালক।
রাত্রি গাঢ় হলে হ্রদে ভাসে অরণ্যের
জ্বলন্ত পলাশ।
দ্যাখো, বাতাসে বাতাসে গাছে ঝড়
ওঠে, ঝরাপাতা ওড়ে
ঘুঘু ডাকে রাত্রিশেষে প্রচন্ড প্রহরে
ছিন্নভিন্ন করে ফেলে হৃদয়ের অশান্ত পলাশ
অন্ধকারে অরণ্য হাসে॥

অবনী জেগে আছো তো?

অলকেশ বসু

(শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাকে মনে রেখে)

আমার ঘুম ভেঙেছিল,
তৃষ্ণায় কাতর হয়েছিলাম আমি।
ভবিষ্যৎকে ভাবার সময় ছিল না,
রূঢ় বর্তমানের কঠিন সময়
অতিক্রমের ঝড় বইছিল মনে।
আকাশ যাদের একমাত্র আড়াল
তাদের কথা ভেবে
আড়াল খুঁজি নি কোনোদিন।
ধবধবে নরম বিছানা
ততোধিক নরম স্পর্শ
সেদিন মনে হোত যেন
আমার জন্য নয়।......
তারপর আমার হাতঘড়ি
অজস্রবার বন্ধ হয়েও
সময়কে থামাতে পারে নি......

আজ যেন বিছানা, মাথাধরা,
আচ্ছাদন, বুড়ো বয়েস—
শব্দগুলো ঘুরে ফিরে মনে আসে
বাসা বাঁধতে চায়,
বেঁধেও ফেলে......

কাকের বাসা যখন ভাঙতে যাই
বুড়ী ঠাকুমা বারণ করেন
দুর্বল মন কাকছানাদের ওপর
আমার মমতা বাড়ায়।
দুর্বল হই, মমতা বাড়ে, আর
ঘুম ভেঙে চমকে উঠি মাঝরাতে
একটা আকণ্ঠ জিজ্ঞাসা
আমার বুকের কড়া নেড়ে
দরজা খোলায়,
আমার কোমল হৃদ্‌যন্ত্রকে
হাপরে হাপিয়ে
সে জিজ্ঞাসা শিরা বেয়ে
ছড়িয়ে যায় সমস্ত দেহে—
অবনী বাড়ি আছো জানি,
কিন্তু জেগে আছো তো?

বিজয়ে বিদায় দিও

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
মাঝে মাঝে সব কিছু 'ছেড়ে' যাব ভাবি
কিন্তু যেতে পারি নি এখনও
কিছু কাজ বাকি থেকে যায়
হাজার কাজের মধ্যে আজও।

সর্বদাই ব্যস্ত থাকি এটা সেটা নিয়ে
ছেড়ে দিতে পারি না মাঝপথে—
সময় চলেছে দ্রুত—পাক ধরে চুলে
এ এক অদ্ভুত নেশা ক্রমে ক্রমে জটিল জড়ানো।

জীবনের মধ্যপথে তাই আজও
পারি না ফেরাতে দৃষ্টি নিজের ভিতরে
ধান্দাবাজ কলমের সঙ্গে কোনো মিতালি আপোসে
চাই না এমন বাঁচা বিজ্ঞাপনে নকল শরীরে।

এই আর একবার রুখে দাঁড়ালাম
সামান্যই হাতিয়ার নিয়ে
এ-যুদ্ধেই হবে বাঁচা-মরার সংগ্রাম—
দেখা যাবে ঐ পোষমানাদের, যদি আসে মাঠে।

বিজয়ে বিদায় দিও
সব কিছু 'ছেড়ে' চলে যেতে।

কেঁপেছে পায়ের মাটি

মধু গোস্বামী

সময়ের জ্বালামুখে জেগে ওঠে আগ্নেয় পাহাড়,
প্রতীক্ষা চঞ্চল তপ্ত আমরা যে গলিত লাভা তার।
যতই সতর্ক হও শেষ রাত্রে প্রমত্ত পম্পাই,
কেঁপেছে পায়ের মাটি ভূকম্পনে, পাবে না রেহাই।

বিকল দূরবীনে মিছে চোখ রেখে খুঁজে ফের দিক,
বিপন্ন জাহাজে বসে তুমি আজ বিধ্বস্ত নাবিক,
প্রলয় মানে না তীর, জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত পৃথিবী.
উদ্ধত পর্বতমালা তখন নিমগ্ন উইঢিবি।

উৎপলেন্দু ও গৌতম : অবারণ যৌবনের প্রতিশ্রুতি

সম্প্রতি প্যারিসের নিকটবর্তী আমিয়াঁ সহরে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর 'ময়না তদন্ত' ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের আন্তর্জাতিক পুরস্কার নিয়ে উৎপলেন্দু চক্রবর্তী দেশে ফিরেছেন। এর আগে পরিচালকের প্রথম ছবির শ্রেষ্ঠতায় তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। গৌতম ঘোষ পরিচালিত 'দখল' ছবি শ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় সম্মান বা পুরস্কার এই রাজ্যের ছবির জগতে খুব একটা বড় কথা নয়। বাংলা ছবির অনেক পরিচালকই এ পর্যন্ত এই সম্মান বা পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। সেই তালিকায় উৎপলেন্দু ও গৌতম সংযোজন মাত্র। কিন্তু তাঁরা আজ অন্য অর্থে অর্থবহ।

মনে নেই, কেউ একজন বলেছিলেন, একদিকে অপসংস্কৃতি ও অন্যদিকে অতিসংস্কৃতি—এই নিয়েই বর্তমান সিনেমা জগৎ। কথাটা একদম উড়িয়ে দেবার নয়। অতিশয়োক্তি থাকলেও।

জনগনমনে পৌঁছবার জন্য চলচ্চিত্র নিঃসন্দেহে সব চাইতে শক্তিশালী মাধ্যম। এই মাধ্যমকে কে কিভাবে ব্যবহার করবেন তার উপর নির্ভর করে ছবির ভালমন্দ। এই ভাল বা মন্দও কিন্তু পুরোপুরিভাবেই সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচারযোগ্য।

গৌতম ঘোষ

সেই বিচারে চলচ্চিত্রে বিষয়বস্তু বা বক্তব্যের ভূমিকাই কিন্তু প্রধান। সেই বক্তব্যকে উপজীব্য করেই ফর্ম বা আঙ্গিক গড়ে ওঠে। বক্তব্য ও আঙ্গিক পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বহু আলোচিত কথাটির পুনরুল্লেখ এই কারণেই প্রয়োজন যে আজকাল ফর্ম নিয়ে বড় বেশী হৈ-চৈ হচ্ছে। কে চিরাচরিত ফর্মকে ভেঙ্গে চুরমার করে নতুন ফর্ম সৃষ্টি করলেন, কে বহুমাত্রিক ফর্ম-এর চরম মুন্সীয়ানা দেখালেন, সেই আলোচনায় ও তার তারিফে আমরা বড় বেশী ব্যস্ত। ফলে, ফর্ম-এর উৎকর্ষ ও অনুৎকর্ষের ভিত্তিতেই ছবির ভাল-মন্দ বিচারের ঝোঁক সিনেমা জগতের এক শ্রেণীর মাতব্বরদের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে প্রকট। এই ঝোঁক নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মারাত্মক। আসলে, ফর্ম-এর চিরাচরিত কোন আলাদা রূপ নেই। বক্তব্য ও আঙ্গিক তো পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্পূরক। চলচ্চিত্রের ভাষা আলাদা। সেই ভাষার সুষ্ঠু প্রকাশে যে ব্যাকরণ সফল, তাই-ই তো গ্রহণীয়।

সত্যজিৎ রায় বা ঋত্বিক ঘটকের ছবি যখন আমরা দেখি, তখন কিন্তু এই ব্যাকরণের কথা আমাদের মনে হয় না। কারণ, সেই ব্যাকরণ সেই কাহিনীর মধ্যে এমনভাবেই আত্মস্থ যে তার কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। বিষয়বস্তুর অভিনব উপস্থাপনায় আমরা মুগ্ধ হই। উদ্বুদ্ধ হই। ব্যথিত বা আনন্দিত হই।

উৎপলেন্দু ও গৌতম এই অর্থে সত্যজিৎ ও ঋত্বিকের উত্তরসূরী। ফর্ম-এর হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চিত্তকে ঝলমল করে বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করতে তাঁরা রাজী নন। বক্তব্যকে সুতীক্ষ্ন করার প্রশ্নে তাঁরা 'কমিটেড' বা সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ।

'ময়না তদন্ত' শ্রেণীবিভক্ত ভারতবর্ষের যন্ত্রণার ছবি। তথাকথিত অন্ত্যজদের এক নিদারুণ সামাজিক নিপীড়নের ছবি। যে নিপীড়নে তারা ক্রীতদাসে পরিণত। সমাজের সমস্ত রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত। আর, সেই বঞ্চনাকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে তারা বাধ্য হয়। তবুও সেই ক্রীতদাস বিদ্রোহী হয়। মৃত্যু দিয়ে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়। দেশের সোঁদামাটির গন্ধনিঃসৃত এই ছবি একান্তভাবেই আমাদের নিজস্ব। এই ছবি দেখার অভিজ্ঞতা মর্মান্তিকভাবে করুণ। যে কারুণ্য আমাদের উদ্দীপিত করে। কঠোর করে।

নীহার দাশগুপ্ত

'ময়না তদন্তে'র কাহিনীকার উৎপলেন্দু নিজে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র সমালোচকদের অন্যতম কয়েকজন এই ছবির প্রশংসায় বলেছেন, ছবিটি অত্যন্ত শক্তিশালী, ব্যঞ্জনাধর্মী। অথচ সহজ-বোধ্য চলচ্চিত্র শৈলীর উপর তৈরী। উৎপলেন্দুর প্রথম ছবি তথ্যচিত্র 'মুক্তি চাই' এদেশে প্রচণ্ড-ভাবে সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁর পরবর্তী ছবি 'চোখ'-এর প্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

ভ্রাম্যমাণ কাকমারা উপজাতি সম্প্রদায়ের একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে গৌতমের 'দখল'-এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর এই 'অন্ত্যজ' মেয়েটি স্থানীয় জমিদারের চক্রান্তের শিকার হয়। মেয়েটির বাঁচবার একমাত্র সম্বল তার জমিকে কুক্ষিগত করার চক্রান্ত। এই ছবির রচনায় গৌতম কঠোর নিদ্বির্ধায় সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে। দুর্বলের পক্ষে।

'দখল'-এর কাহিনীকার সুশীল জানা। গৌতমের প্রথম ছবিও তথ্যচিত্র—'হাংরি অটাম'। তাঁর প্রথম কাহিনী চিত্র 'মা ভূমি', আমাদের মাটি। তেলেগু ছবি। কৃষণ চন্দরের 'যব ক্ষেত জগে' গল্প অবলম্বনে। ভূমিহীন চাষীর ছেলের জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে।

উৎপলেন্দু চক্রবর্তী

উৎপলেন্দু ও গৌতম চলচ্চিত্রের আকাশে এক নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করেছেন। তারুণ্যের নিষ্করুণ দীপ্তিতে সেই দিগন্ত উজ্জ্বল। ভাস্বর।

উৎপলেন্দু ও গৌতমের প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিশেষ করে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্বভাবতঃই আনন্দিত। উৎপলেন্দুর 'ময়না তদন্ত' ছবির জন্য রাজ্য সরকার দেড় লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন। গৌতমের 'দখল' সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টাকাতেই তৈরী।

বর্তমান ভারতের বৃহত্তম চিত্রপ্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্পে এক দিগ্‌নির্দেশক। মৃতপ্রায় এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনে এবং চলচ্চিত্রকে জনমুখী করার প্রচেষ্টায় রাজ্য সরকারের কাজের পরিধি আজ বহু বিস্তৃত। নিজস্ব প্রযোজনায় ও অনুদান প্রদানে এই সরকার একদিকে যেমন দেশের প্রথম সারির চলচ্চিত্রকারদের দ্বারা সৎ সিনেমা তৈরীর কাজে ব্রতী, অন্যদিকে নতুন প্রতিভাকে সুযোগ ও সুবিধাদানে তার নিরলস প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পকে এক নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শক্তির উৎস : জল

জলের সাথে জন্ম থেকে আমাদের পরিচয়। জলের জীবনের সাথে সম্পর্কের নিবিড়তা আমরা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে পেয়ে থাকি। আবার জলের মারণ লীলার সাথেও আমাদের পরিচয় আছে। বন্যার তাণ্ডব সৃষ্টিতে জলের অবদান নতুন করে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। বেঁচে থাকার জন্য শারীরিক প্রয়োজনে জলের উপযোগিতা ছাড়াও জলের প্রবল স্রোতকে মানবসভ্যতার প্রয়োজনে প্রয়োগের পদ্ধতিও মানুষ অনেকদিন থেকে ব্যবহার করে আসছে। তবে জলের স্রোতের ধর্ম প্রথম উদ্ভাবন করেন ড্যানিয়েল বারনৌলি। বারনৌলির আগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের আগেও জলস্রোত মানবসভ্যতার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলেও তার সুষ্ঠু ও ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব ছিল না। সেন্ট পিটার্সবুর্গ অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স-এর অধ্যাপক বারনৌলি জলস্রোতকে তিনটি বিশেষ ভাগে ভাগ করেন। জলগতিবিদ্যা সম্পর্কিত তার সমীকরণ-এর উপর ভিত্তি করেই জলের ক্ষমতার ব্যবহার এত এগোতে পেরেছে।

প্রবাহিত জলস্রোতের শক্তির তিনটি অংশ আছে। গতিশক্তি, স্থিতিশক্তি এবং জলের মধ্যে স্থিতিশীল চাপের জন্য সৃষ্ট গতিশক্তি। বারনৌলির সমীকরণ অনুযায়ী প্রবাহিত জলের সামগ্রিক শক্তি এই তিনটি অংশের যোগফলের সাথে সমান।

প্রবাহিত জলশক্তিকে প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরের কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রবাহিত জলস্রোতের শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সরল। যান্ত্রিক শক্তি ও চৌম্বকশক্তির সমন্বয়ে এই দুই প্রকার শক্তিকে অত্যন্ত সহজে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। কোন নির্দিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে যদি যান্ত্রিক শক্তির প্রয়োগে কোন বিদ্যুৎ পরিবাহীকে ঘুরান যায় তবে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়। যে যান্ত্রিক অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবাহীকে বলের সাহায্যে ঘুরিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যায় তাকে বলে জেনারেটর। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এই যান্ত্রিক শক্তি সংগ্রহ করা হয় প্রবাহিত জলস্রোত থেকে। আর প্রবাহিত জলস্রোত থেকে যান্ত্রিক শক্তি অপহরণের কাজটি করা হয় যে যন্ত্রের মাধ্যমে তার নাম টারবাইন।

টারবাইন এমন একটি যন্ত্র যা বলের প্রয়োগে ঘুরতে পারে। টারবাইন একটি চাকার আকৃতি-সম্পন্ন যন্ত্র যা একটি অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরতে পারে। এর গায়ে বেশ কিছু ব্লেড কেন্দ্রের সাথে নির্দিষ্ট কোণে বসান থাকে। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জল এই ব্লেডগুলির উপর পড়লে টারবাইন ঘোরে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য টারবাইন ঘুরাবার জন্য প্রয়োজনীয় বল পাওয়া যায় প্রবাহিত জলস্রোত থেকে। টারবাইন সংযুক্ত থাকে জেনারেটরের সাথে। জেনারেটরের মধ্যে থাকে চৌম্বকক্ষেত্র তৈরীর ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের বর্তনী। টারবাইন প্রবাহিত জলস্রোতের আঘাতে ঘুরতে শুরু করলেই তার সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য জেনারেটরের মধ্যে অবস্থিত তারের বর্তনী ঘুরতে শুরু করে। বর্তনীর ঘুরবার ব্যবস্থা থাকে। এদিকে জেনারেটরের অপর অংশে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরীর ব্যবস্থা থাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। জলস্রোত থেকে যে পরিমাণ বল পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করেই কোন নির্দিষ্ট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের টারবাইন ও জেনারেটর নির্মাণ করা হয়। টারবাইন ঘুরলে জেনারেটর ঘুরবে আর জেনারেটর ঘুরলেই পাওয়া যাবে বিদ্যুৎ,—এ ব্যাপারটি সরল হলেও, বিষয়টি অনুধাবন করা সহজ হলেও টারবাইন ঘুরানোর জন্য জলশক্তি ব্যবহারের ব্যাপারটি কিন্তু সহজ নয়।

প্রথমতঃ যে কোন জলস্রোতের সাহায্যে টারবাইন ঘুরান যায় না।

দ্বিতীয়তঃ যেখানে জলস্রোতের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব সেই জায়গাটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে যথার্থ নাও হতে পারে। বিষয়টা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

সমতলে বয়ে যাওয়া জলস্রোত থেকে অনেক বেশী বল সৃষ্টি করে পতনশীল জলপ্রবাহ। আর যত বেশী বল জলস্রোত থেকে সংগ্রহ করা যাবে তত জোরে ঘুরান যাবে টারবাইন। আবার বেশী বলের সাথে সমতা রেখে অনেক বড় মাপের টারবাইন ঘোরান যেতে পারে। আর জেনারেটর যেহেতু টারবাইনের আকার এবং ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল অতএব বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা নির্ভর করবে প্রবাহিত জলের বলের উপর। অর্থনৈতিক দিকটার দিকে দেখার প্রয়োজন দ্বিবিধ। এমন কোন জলপ্রবাহর উপর ভিত্তি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রর স্থান বেছে নেওয়া হয় যেখানে জলপ্রবাহের গতি কম। ফলে টারবাইন, জেনারেটর ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির জন্য ব্যয় করে কম বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। সুতরাং উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম যাবে বেড়ে। আবার যে জায়গায় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন জলপ্রবাহ ব্যবহারের সুযোগ আছে সেই জায়গায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে তাকে ব্যবহৃত হবে এমন অঞ্চলে পরিবহনের জন্য যদি ব্যাপক ব্যয় হয় তাহলেও বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাবে। সুতরাং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বের কাজ। প্রাথমিক পর্যায়ে মাথায় রাখা হয় ন্যূনতম ব্যয় সর্বোচ্চ কার্যক্ষমতা। কোন নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে পতনশীল জলস্রোত থেকে বেশী বল সংগ্রহ করা যায়। যে জায়গা থেকে জল নীচে পড়ে এবং যেখানে পতিত হয় এই দুই জায়গার মধ্যবর্তী দূরত্বকে বলে জলের হেড্। হেড্ বেশী হলে জলস্রোতের থেকে বেশী বল সংগৃহীত হয়। সাধারণতঃ পাহাড়ী অঞ্চলে জল উঁচু জায়গা থেকে নীচে পড়ে। কিন্তু সব সময় প্রাকৃতিক এই সুবিধে পাওয়া সম্ভব নয়। তখন ভাবতে হয় কৃত্রিম উপায়ের কথা, কৃত্রিম উপায় হল বাঁধ। বাঁধ দিয়ে যদি জল আটকান যায় সেই জলকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ব্যবহারের সুযোগ থাকে।

বাঁধের ধারণা অথবা বাঁধের ব্যবহার কিন্তু আধুনিক নয়। সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানব সমাজে বাঁধের প্রচলন আছে। প্রথমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পরবর্তীতে সেচের কাজেই প্রধানতঃ বাঁধ ব্যবহৃত হতে থাকে। আরও পরে বাঁধের দ্বারা সঞ্চিত জল জলসরবরাহের কাজেও ব্যবহৃত হয়। তারপর জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত ধারণা-ভাবনা সক্রিয় হবার পর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজেও বাঁধের প্রচলন শুরু হয়। বাঁধের প্রধান প্রয়োজন হল প্রবাহিত জলরাশির গতিরোধ করা। প্রবাহিত জলরাশির গতি রুদ্ধ হলেই সেই জলরাশি বাঁধের
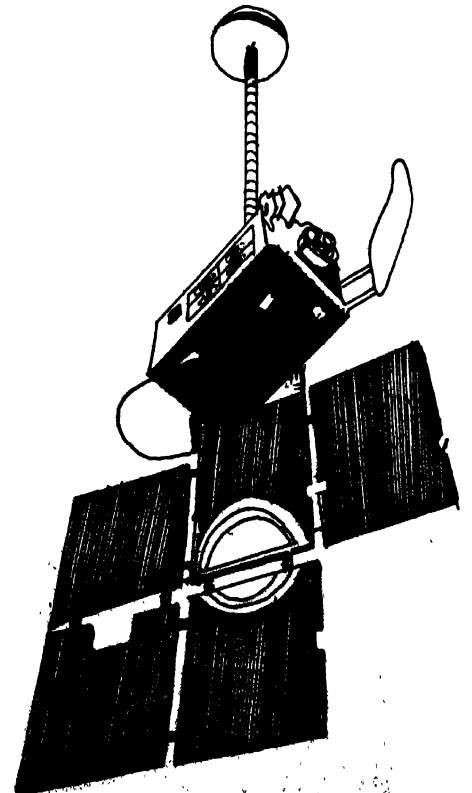
পাশে সঞ্চিত হতে থাকবে। বাঁধের পাশে এই জল জমতে জমতে বাঁধের উচ্চতাকেও অতিক্রম করে যেতে পারে। সুতরাং বাঁধ তৈরীর সময় দেখতে হয় যে, যে জায়গায় বাঁধ তৈরী হচ্ছে সেই এলাকায় বাঁধ তৈরীর আগের একশ বছরে কি পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছিল। খেয়াল রাখতে হয় প্রবাহিত জলস্রোতের পরিমাণ কত। যেহেতু বাঁধের প্রধান কাজ প্রবাহিত জলস্রোতের গতিরোধ করা, অতএব বাঁধ নির্মাণের সময় নজর রাখতে হয় প্রবাহিত জলস্রোত এবং সঞ্চিত জলস্রোত কি পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং বাঁধ তৈরীর মালমসলা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও নজর রাখতে হয়, খেয়াল রাখতে হয় বাঁধের উচ্চতা, কারণ বাঁধের সঙ্গে খুব সঙ্গত কারণেই জলাধার সংশ্লিষ্ট। যেখানে বাঁধ দেওয়া হয় তার পাশে সঞ্চিত জলের পরিমাণ পূর্ববর্তী তথ্য থেকে হিসাব করে জলাধারের আয়তন নির্ধারণ করা হয়। জলাধার বাঁধের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। কারণ জলাধারে সঞ্চিত জলই নিয়ন্ত্রিত গতিতে ব্যবহার করা হয়। তা সে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ হোক বা সেচের কাজেই হোক, হোক না তা জল সরবরাহের কাজ কিংবা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ।

ব্যবহারের কথা সামনে রেখে বাঁধের পরিকল্পনা হয়। কোন বাঁধ শুধুমাত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণে অথবা কেবলমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্মাণ করা যায়। আবার একই বাঁধ বহুমুখী কার্যে ব্যবহার করা যায়। যেমন ভারতের ডি. ভি. সি.র বাঁধগুলি। এই বাঁধগুলি একাধারে দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণে, সেচের কাজে এবং পাঞ্চেৎ, মাইথনে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে আবার দুর্গাপুর অঞ্চলে জল সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাঁধের নির্মাণ কৌশল, তার প্রয়োজনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বাঁধের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করা হয়। তবে সে প্রসঙ্গে আপাততঃ না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পর্যাপ্ত হেড-বিশিষ্ট জলপ্রবাহ। এই জলপ্রবাহ সরাসরি নদী থেকে অথবা বাঁধের জন্য সৃষ্ট জলাশয়ের জল থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। ব্যবহারযোগ্য জলকে 'ইনটেক' এবং 'ফোরবে'র মাধ্যমে পেনস্টকে পাঠানো হয়।

ইনটেকের কাজ হল ব্যবহারযোগ্য জলকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জেনারেটারের দিকে পাঠানো। ইনটেকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল জলের সঙ্গে আসা পাথর, বালিসহ আসা বিভিন্ন দ্রব্য এবং শীতের দেশে বিশেষ করে বরফের টুকরোকে আটকানো। ফোরবে হল ইনটেকের ঠিক উপরে অবস্থিত জলের আয়তন বিবর্ধনকারী একটি ব্যবস্থা অর্থাৎ জল যেখান থেকে যেভাবেই আসুক না কেন ফোরবে সেই জলের আয়তনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। জল যদি খুব সরু হয়ে আসে তা হলেও ইনটেকে জল যে আকারে যাবে মোটা হয়ে এলেও জলের আয়তন একই থাকবে। ফোরবে জলের আয়তনের সমতা রক্ষা করে। ফোরবে এবং ইনটেকের মাধ্যমে আগত জলকে টারবাইনে নিয়ে যাবার জন্য একটি সুসংবদ্ধ পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই ব্যবস্থাকে বলে পেনস্টক। পেনস্টক নির্মাণের সময় জলের গতি সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয় কারণ জল কি রকম চাপে ব্যবহার করা হবে অর্থাৎ উচ্চ চাপে কিংবা নিম্নচাপে তার উপর নির্ভর করে পেনস্টকের গঠনপ্রণালী এবং নির্মাণ সামগ্রী। জলকে যদি নিম্নচাপে টারবাইনে প্রয়োগ করতে হয় তবে মোটা পেনস্টক আবার জলকে উচ্চচাপে ব্যবহার করলে সরু পেনস্টক ব্যবহার করা হয়। নিম্নচাপের ক্ষেত্রে পাকা নালা দিয়ে পেনস্টক তৈরী করা হয়। কিন্তু উচ্চচাপের ক্ষেত্রে ইস্পাতের নল অপরিহার্য। বিষয়টি অত্যন্ত সাধারণ। একই পরিমাণ জলকে সরু নল দিকে পাঠালে তা জোরে যায় কিন্তু মোটা নল দিয়ে পাঠালে তার গতি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। পেনস্টক জলকে নির্দিষ্ট চাপে পরিবহন করে।

টারবাইন প্রধানতঃ দু ধরনের হয়, রি-অ্যাকশন টারবাইন (Reaction Turbine) ও ইমপাল্স টারবাইন (Impulse Turbine)। রি-অ্যাকশন টারবাইন জলের প্রচন্ড চাপে প্রযুক্ত হয়। জলের চাপে সরাসরি ঘুরতে থাকে। টারবাইন ঘুরিয়ে দেওয়ার পর জল ড্রাফ্‌ট্ টিউব মারফৎ বেরিয়ে যায়। কিন্তু ইমপাল্স টারবাইনে জলের চাপ নজ্‌লের মাধ্যমে গতিতে পরিবর্তিত হয়ে টারবাইনে আঘাত করে। টারবাইন ঘুরিয়ে দেওয়ায় জল সরাসরি বেরিয়ে যায়। কোন ড্রাফ্‌ট্ টিউব দরকার হয় না। টারবাইনে কতটুকু জল প্রবেশ করবে তা নিয়ন্ত্রিত হয় নজ্‌লের মধ্যে থাকা নিড্‌ল্ বা থ্রটলিং-এর মাধ্যমে। টারবাইনের সঙ্গে সংযুক্ত জেনারেটার এর ফলে ঘুরতে থাকে। বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। সংশ্লিষ্ট ছবিটি প্রস্থচ্ছেদ ছবি বা cross section diagram ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলেই বিষয়টি বোধ হয় আরও ভালভাবে অনুধাবন করা যাবে। ছবির ১ এবং ২ চিহ্নিত অংশটি হল ইনটেক, ৩ চিহ্নিত অংশটি হল পেনস্টক, ৭ চিহ্নিত অংশটির নাম টারবাইন, ৪ চিহ্নিত অংশ হল জেনারেটার। যদি কখনও প্রয়োজন হয় তখন ৬ চিহ্নিত অংশটি যাকে বলে 'ইমারজেন্সী গেট' খুলে দেওয়া হয়। মধ্যবর্তী যেসব যন্ত্রাংশের প্রস্থচ্ছেদ দেখান হয়েছে সেগুলি অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ। জলের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া টারবাইন ও জেনারেটার সহ সমস্ত উৎপাদন কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এইসব যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয়। HWL এবং TWL এদের বলে হেড্ ওয়াটার লেভেল এবং টেল ওয়াটার লেভেল। HWL হল জল প্রবেশের মাত্রা আর TWL হল জল বেরিয়ে যাবার মাত্রা। অর্থাৎ TWL থেকে HWL-এ জল যেতে যে কাজটুকু করে তা হল জলের শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিবর্তন। এবার বিবেচনা করা দরকার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের স্থান নির্ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় সর্ত কি কি হওয়া উচিত। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এতক্ষণ যে ধারণা পাওয়া গেল তা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য যথেষ্ট জল দরকার এবং সেই জলের যেন পর্যাপ্ত হেড্ থাকে। জলের যোগান যথেষ্ট রাখার জন্য যে জলাধারটি দরকার তা নির্মাণের জায়গা যেন পাওয়া যায়। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাঁধ, জলাধার এসব গড়ে তোলার জন্য জায়গা যেমন দরকার তেমনি এগুলি তৈরীর মশলা যেন সহজপ্রাপ্য হয়। নির্বাচিত স্থানটিতে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত থাকা উচিত। আর দেখা উচিত যে এলাকায় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কথা ভাবা হচ্ছে সেখান থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহার করার জায়গার দূরত্ব খুব একটা বেশী না হয়। তাহলে খরচ বেড়ে যাবে। প্রধানতঃ এই সর্তগুলির উপর নজর রাখলেও সবচেয়ে বেশী যে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা দরকার তা হল আর্থিক দিক। অর্থাৎ এহেন একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র অর্থনৈতিক দিক থেকে সফল হবে কিনা সেটা পাশাপাশি সব সময়ই দেখতে হয়।
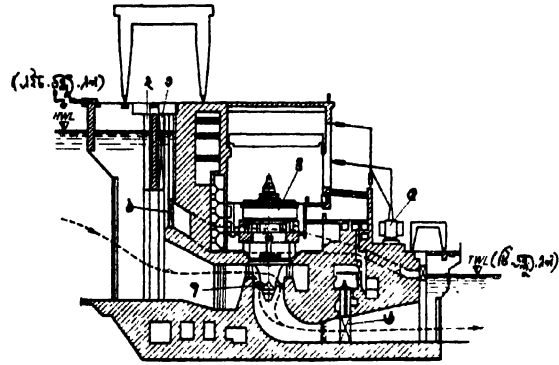
জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি ভাগে বিভক্ত। একটিকে বলে সাবস্ট্রাকচার বা ভিত্তি অপরটিকে বলে সুপারস্ট্রাকচার বা উপর-কাঠামো। সাবস্ট্রাকচারে থাকে জল আসার ব্যবস্থা সহ যন্ত্রপাতি থাকার ব্যবস্থা। অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদনের যাবতীয় ব্যবস্থা থাকে সাবস্ট্রাকচারে আর সুপারস্ট্রাকচারে থাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা। একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ব্যয় কত? আজকের বাজার অনুযায়ী একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত ১ কিলোওয়াট বিদ্যুতের দাম মোটামুটিভাবে ৩০০ থেকে ১০০০ টাকা পড়ে। বিদ্যুতের দাম সে তুলনায় অনেক কম কারণ একটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র চলে দীর্ঘদিন। আর উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ১ কিলোওয়াট-এর চেয়ে অনেক বেশী। তাই

[শেষাংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়]

বইপত্র

পাকে পদ্মে। চিত্ত ভট্টাচার্য। সারস্বত লাইব্রেরী। পাঁচ টাকা।

দিগন্ত। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। নব সাহিত্য প্রকাশনী। ছ' টাকা।

তাঁর পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিতাকে নির্বাসন দিতে চেয়েছিলেন প্লেটো। অথচ, তবু, পৃথিবীতে কবিতা রচিত হয়। তাই শতছিন্নতার মধ্যেও বারবার উঠে আসে পংক্তির পর পংক্তি। বেঁচে থাকার পক্ষে কবিতা ভীষণ অপরিহার্য না হলেও, কবিতাহীন বেঁচে থাকা আরো দুঃসহ। কবিতাতে আছে সেই প্রেরণা, যার সাহায্যে এই খরাখর্বুটে জীবনটার সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে পারি আমরা। আর তখন প্লেটোকে উড়িয়ে দিতে পারি অনায়াস ফুৎকারে।

এ-সব কথা নতুন করে মনে হল দু'টো কবিতার বই হাতে পেয়ে যা থেকে ফুসফুসে সঞ্চারিত করতে চাইলাম একটু তাজা হাওয়া।

কবিতা দু'রকমের—কোহল-জাতীয় এবং ক্যালোরি-জাতীয়। কোহল-জাতীয় কবিতার ফলন অধিক পরিমাণ। নামী-দামী কবিদের কলম দিয়ে বেরিয়ে তা ততোধিক নামী-দামী পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা আলোকিত করে থাকে। কোহলের প্রতি আমাদের একটু আদিম আকর্ষণ থাকেই। তাই অনামী, অ-বাজারী অথচ সৎ পত্র-পুস্তকে প্রকাশিত ক্যালোরি-জাতীয় কবিতার কাছে আমরা ততো পৌঁছতে পারি না। বৃহৎ প্রচার-যন্ত্র কখনোই আমাদের স্বাস্থ্য কামনা করবে না—আমাদের উদ্যোগী হয়ে খুঁজে নিতে হবে সৎ, শুদ্ধ রচনাকে। ঠিক সেরকমই দু'টি বই হাতে পেয়ে তাই নতুন করে কবিতাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

চিত্ত ভট্টাচার্য 'ছাড়া যায় না বলেই এখনো মাঝে মাঝে কবিতা' লিখে থাকেন। তাঁর তৃতীয় কাব্য-গ্রন্থ 'পাকে-পদ্মে' ৫০টি নিজস্ব এবং ৬টি অনুবাদের মাধ্যমে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতিকে পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। কবিতা মানে শুধু যে অর্থহীন, আরোপিত, জীবন-বোধহীন শব্দচর্চা নয়, কবিতা মানে শুধু যে বায়বীয়তা নয়; কবিতা মানে আরো অনেক কিছু সেই বোধে কবির আয়ত্ব ঠিকঠাক। গ্রন্থভুক্ত প্রতিটি কবিতায়ই তিনি মানুষের কথা, চারপাশের কথা, স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যতের কথা খুব আপোষহীনভাবেই বলতে চেয়েছেন। অনেকানেক তাঁর কবিতার বিষয়—স্মৃতি, প্রেম, প্রকৃতি, অর্থনীতি, মিছিল, মৃত্যু, আর্তি, রাজনীতি, রবীন্দ্রনাথ। আর এ-সব কিছু মিলিয়েই তো মানুষ। মানুষের সত্যতা।

কিন্তু বিষয়গত সত্যতার অন্য নামই তো কবিতা নয়। কবিতা তো বক্তৃতা নয়, স্লোগান যা পোস্টারও নয়। কবিতা কবিতাই। কিন্তু সেই প্রকাশ-কৌশল কতোটা আয়ত্ব কবির, ২টি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের পরও? কিছু ইতস্তত পংক্তি উদ্ধৃত করে ব্যাপারটা বোঝা যেতে পারেঃ

তোমাকে দেখিতে পাই। মেঘে-রৌদ্রে-শিশির বর্ষণে। কর্মে-ধর্মে-প্রসন্নতায়। প্রান্তরের শত-প্রান্তরের শতঝুরি বটের ছায়ায়/, খেলিব রঙ্গিনী কিশোর সঙ্গিনী। অলকে জড়াতো বকুল মাল্য/, ঘন বর্ষণে ভাসমান জলবিন্দু কণায়/ রোদের খেয়াল ইন্দ্রধনু না ফুটতে পারে/, কেউ না জানুক আমি তো সব জানি/সে যে আমার অশোক বনের সীতা/, বুকের মধ্যে বিষাণ বাজে ঈষাণে ওঠে ঝড়/, শক্তিমত্ত প্রেত ঘোরে কোটরে কন্দরে নয়/আলোকিত রাজপথে বন্দরে প্রান্তরে/, ঘাড়ের ওপর হাত রেখেছে মহাকাল সে সর্বনাশী/, মলয় বাতাস নাকি জানি না। শিহরায় হৃদয়ের উদাম।—এ রকম সব পংক্তিগুলিতে শব্দ নির্বাচন, বাক্যবন্ধ, সাধু ক্রিয়াপদ, চিত্রকল্প ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেই এক ধরনের মধ্যযুগীয় গন্ধ লেগে থাকে। অথচ, ভূমিকালিপিতে কবি জানিয়েছেন, তিনি নিয়মিত কবিতা পড়ে থাকেন। তাহলে বাংলা কবিতার অশেষ অগ্রগতি কি করে তাঁর চোখ এড়িয়ে গেল? কিছু কবিতায় তিনি ছন্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। তা-ও খুব পোক্ত-প্রয়াস নয়। অন্ত্যমিলযুক্ত ছড়া তো কবিতা-পদবাচ্য নয়। অনূদিত কবিতাগুলির বিষয়ে মন্তব্য করা, মূল পড়া না থাকায়, অনধিকার হবে।

পূর্ণেন্দু পত্রীর দৃষ্টি-নন্দন প্রচ্ছদের অন্তর্গত পৃষ্ঠাগুলি আমাদের মন ভরাতে পারে নি। বরং নিজস্ব দিনযাপন এবং তাঁর পরিপার্শ্ব অনেক বেশি গভীরতায় আঁকা হয় তরুণ কবি অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিগন্ত'-এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। কবি তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সাবলীল ছুঁতে পেরেছেন বলেই তাকে প্রকাশ করতে, তার দ্বারা পাঠককে সংক্রামিত করতে ব্যর্থ হন নি তিনি। সেজন্যেই তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি এক গভীর শৈল্পিকতায় হয়ে উঠেছে নৈর্ব্যক্তিক, সার্বজনীন। তাঁর প্রেম, তাঁর দ্বন্দ্ব, তাঁর স্বপ্ন, তাঁর হতাশা, তাঁর বেঁচে থাকা তখন হয়ে ওঠে আমারও। সৎ কবিতার সার্থকতা তো এখানেই। প্রথম কাব্য-গ্রন্থেই তিনি যথেষ্ট সাবালক বিষয়ে, বিন্যাসে, ছন্দে, চিত্রকল্পে, বোধে, বিশ্বাসে—সমগ্রতায়। একজন তরুণতর কবির কাছে এটা আমাদের খুব ছোট-পাওয়া নয়।

কবিতার বিষয়, এক কথায়, মানুষ—ব্যক্তি-মানুষ। না, একা বিচ্ছিন্ন মানুষ নয়, একা-মানুষকে সমগ্র মানুষের মিছিলে সামিল করেছেন কবি। বস্তুত, তথাকথিত সার্থক এবং জনপ্রিয় কবিতার বিষয় নিয়ে কবি যেমন হানাহানি করেন নি, তেমনই কোন আরোপিত বিশ্বাস কবিতায় স্থান দেন নি তিনি। আমাদের এই বিবর্ণ বেঁচে থাকা এবং পাশাপাশি বুকের মধ্যে জাগ্রত একটা লাল স্বপ্ন তাঁর কবিতায় এসেছে খুব স্বাভাবিক, সহজ, সাবলীল প্রক্রিয়ায়। আর সেজন্যেই তাঁর কবিতায় প্রেম, দ্বন্দ্ব, মৃত্যু, স্বপ্ন—সব কিছু আমাদের তীব্রভাবে ছুঁয়ে যায়। 'লিখে দিয়েই খালাস' হতে তিনি পারেন না আত্মতৃপ্ত পদ্যকারদের মতো। 'কি', 'কেন' আর 'কার জন্য'—এই তিনটে প্রশ্নের কাঁটা তাঁকে অনুক্ষণ বিদ্ধ করে। আত্ম-সমালোচনায় রক্তাক্ত হন তিনি। তিনি তাই হতে থাকুন, আমরা তাই চাই। তবে সেই সাথে আরো একটা প্রশ্ন তাঁকে বিঁধুক—'কি ভাবে'—তাহলেই তিনি পেয়ে যাবেন পরিপূর্ণ সফলতা। কেন না, শব্দ-নির্বাচন বা অন্বয়-গঠনে তিনি কখনো খুব স্মার্ট হলেও, কখনো আঁতুর ঘরে। এটা কাটিয়ে উঠতেই হবে। পদ্য-বন্ধ পংক্তির পাশাপাশি তিনি একজাতীয় ঠাসা কবিতার মতো গদ্য লিখেছেন, যা খুব দর্শনীয় মনে হবে যে-কোন তরুণ কলম-জীবীর কাছে। প্রচেষ্টাটি নতুন না হলেও, সার্থক। আবারও প্রমাণিত হল, একমাত্র কবিরাই পারেন সার্থক গদ্য লিখতে। ঈষৎ ভাবালুতা এবং প্রাচীন-গন্ধ গা থেকে মুছে ফেলতে পারলেই তিনি পৌঁছে যাবেন কাঙ্ক্ষিত উত্তরণে।

রাহুল চট্টোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদটি বৈপ্লবিক হতে পারে, শৈল্পিক নয়। মুদ্রণ বেশ পরিপাটি। গ্রন্থ-প্রকাশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অর্থানুকূল্য ব্যর্থ হয় নি।

গৌতম ঘোষদস্তিদার

বিভাগীয় সংবাদ

হুগলী জেলা বিজ্ঞান মেলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার সহযোগিতায় গত ১৩ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত হরিপাল বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে হুগলী জেলা বিজ্ঞান মেলা '৮২ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন হরিপাল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীঅশোকেন্দু রায়। এই বিজ্ঞান মেলায় ৬২ জন প্রতিযোগী ৮৬টি বিভিন্ন ধরনের মডেল নিয়ে যোগদান করে। এই প্রতিযোগীদের মধ্যে ৩৬ জন ছাত্র-ছাত্রী জেলার বিভিন্ন স্কুল থেকে এবং ২৬ জন বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব থেকে যোগদান করে। ছাত্র-ছাত্রী ও ক্লাব সদস্যদের আরও উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে মেলা কমিটি গত ১৪ ফেব্রুয়ারী একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেন। ঐ আলোচনা সভার বিষয়বস্তু ছিল 'মানবসমাজের উপর কৃষিকার্যে যথেচ্ছ কীটনাশক ব্যবহারের প্রভাব।' এই আলোচনা সভাতেও অনেক ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান ক্লাবের সভ্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতাতেও সফল তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়।

বিজ্ঞান মেলার তিন দিনই হুগলী জেলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিজ্ঞান ক্লাব থেকে বহু ছাত্র-ছাত্রী ও সভ্যবৃন্দ উৎসাহ ভরে প্রদর্শনী দেখার জন্য জমায়েত হন। এই মেলা হরিপালে এক বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। মেলার শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণ করেন যুবকল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রীবলাই বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞান মেলায় বিজয়ী স্কুল এবং বিজ্ঞান ক্লাবসহ ৭ জন প্রতিযোগী গত ২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কলিকাতায় বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালায় অনুষ্ঠিত 'পূর্ব ভারত বিজ্ঞান শিবিরে' যোগদানের জন্য নির্বাচিত হয়।

হুগলী জেলা

হরিপাল—বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি, যুব সংগঠন ও ক্লাবগুলির যৌথ সহযোগিতায় গত ৬, ৮ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী '৮২ হরিপালে ব্লক যুব উৎসব হয়ে গেল। এই উৎসবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া বিভাগে ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় এক হাজার উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া সাংস্কৃতিক বিভাগেও আবৃত্তি, সঙ্গীত, বিতর্ক ও একাংক নাটক প্রভৃতি প্রতিযোগিতাগুলিতেও ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারী সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার ও মানপত্র বিতরণ করেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রীবলাই বন্দ্যোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে **জঙ্গীপাড়া ব্লক যুবকরণ** ও জঙ্গীপাড়া ব্লক যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবারের মত এইবারেও জঙ্গীপাড়া ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে ২০শে ও ২১শে ফেব্রুয়ারী জঙ্গীপাড়া দ্বারকানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যুব উৎসবের অঙ্গ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় জঙ্গীপাড়া ব্লকের প্রায় ৫০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ২০শে ফেব্রুয়ারী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমস্ত বিষয়ের হিটগুলি অনুষ্ঠিত হয়, ২১শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টায় প্রতিযোগীদের মার্চপাস্ট এবং পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অঙ্গ হিসাবে শিশুদের বসে আঁকা, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুল সংগীত, বিতর্ক, যেমন খুশী সাজো প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই সব প্রতিযোগিতায় জঙ্গীপাড়া অঞ্চলের প্রায় ২০০ প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে।

সর্বশেষে এই ব্লকের বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতি কর্তৃক যোগব্যায়াম ও জিমন্যাস্টিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

২৭শে ফেব্রুয়ারী ভারতী সংঘ কর্তৃক "ভাবীকাল" নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

২৮শে ফেব্রুয়ারী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জঙ্গীপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও ব্লক যুব উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীঅমল সিংহ রায় ও প্রধান অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন রাজ্য বিধান সভার সদস্য শ্রীমণীন্দ্রনাথ জানা মহাশয়, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলার জেলা পরিষদের সদস্য শ্রীনন্দলাল বাহরি ও হুগলী জেলা জেলাপরিষদের সদস্য শ্রীঅজিত মিত্র মহাশয়। সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে যুবকল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন প্রয়াসকে অভিনন্দিত করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এই ব্লকের ভারপ্রাপ্ত ব্লক যুব আধিকারিক। সর্বশেষে প্রধান অতিথি মহাশয় সকল সফলকাম প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। পরিশেষে সর্বতোভাবে সহযোগিতার জন্য সকলকে ভারপ্রাপ্ত যুব আধিকারিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ধনিয়াখালি—গত ১৪ই আগস্ট '৮১তে এই ব্লকের পরিচালনায় বেলমুড়ি ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশনে ব্লক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ জন ছাত্রছাত্রী এতে অংশ নেয়।

১৮ই সেপ্টেম্বর '৮১ গোপীনগর মহিলা সমিতিতে এই যুব অফিসের পরিচালনায় মণিপুরী ব্যাগ প্রস্তুতকরণ প্রশিক্ষণ শিবির ৪ মাস ধরে চলে। ৩৫ জন দুঃস্থ মহিলা প্রশিক্ষণ নিতে এগিয়ে আসেন। গত ২০শে জানুয়ারী '৮২ প্রশিক্ষান্তে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে গেছেন এই মহিলারা।

১৯শে অক্টোবর স্থানীয় ৪০ জন তরুণ ফুটবলারকে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে সামিল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২৫ দিনের এই শিবির ৪০ জনকে বিভিন্ন ক্রীড়াকৌশল রপ্ত করতে সাহায্য করে।

গত ১১ জানুয়ারী থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত একটি ভলিবল প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হয়। ১৪ই জানুয়ারী ২১ জন তপশীলি তরুণদের জন্য সাইকেল মেরামতী প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রীভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সিবনশিল্প ও কাঠের কাজের দুটি প্রশিক্ষণ শিবিরও শ্রীমুখোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন।

ব্লক যুব উৎসবকে এবার আরও গণমুখী করার উদ্যোগ নেয় এই যুব অফিস। প্রাথমিক স্তরে ব্লকটিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিযোগীদের বাছাই করা হয় এবং গত ৬-৮ই ফেব্রুয়ারী মূল প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের সামিল করা হয়। ক্রীড়া বিভাগে ১০৬১ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। সাংস্কৃতিক বিভাগে অংশ নেয় ৫১৩ জন প্রতিযোগী। প্রায় ৫/৬ হাজার দর্শক প্রতিদিন উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের অভিনন্দিত করেন। এছাড়া তুষারশীল (মি. এশিয়া-৩য়' ৮০-৮১) সম্প্রদায়ের ব্যায়াম প্রদর্শনী দর্শকদের মুগ্ধ করে। ২৭টি বিজ্ঞান মডেল প্রশংসা পায়। ১৮ই মার্চ জয়দেব কর্মকারের কাঠের কারখানাটি অনুমোদন লাভ করে। এতে ৪ জন যুবকের কর্ম সংস্থান হয়।

বর্ধমান জেলা

মেমারী-২—গত ১৪ই ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ পাহাড়হাটী গোলাপমণি হাই স্কুল প্রাঙ্গণে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও ১৬ই এবং ১৭ই

ফেব্রুয়ারী '৮২ সাতগাছিয়া মেঘমালা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সাড়ম্বরে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়হাটী হাই স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বর্ধমান জিলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং সাতগাছিয়া মেঘমালা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যুব উৎসবের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বর্ধমান জেলা পরিষদের শিক্ষা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে খেলাধুলার মধ্যে ছিল কবাডি, ভলিবল প্রতিযোগিতা, দৌড় প্রতিযোগিতা, তীর-ধনুক নিক্ষেপ ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, গণসংগীত, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, কুইজ ও শিশুদের 'বসে আঁকো প্রতিযোগিতা'। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৪টি বিভাগ ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৩টি বিভাগ ছিল। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিভাগে মোট ৮৫০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় ক্লাব, পাঠাগার, উচ্চ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ মোট ৬৩টি প্রতিষ্ঠান এতে অংশগ্রহণ করে। ভলিবল প্রতিযোগিতায় ১৪টি ক্লাব এবং কবাডি প্রতিযোগিতায় ১০টি ক্লাব অংশগ্রহণ করে। প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার দর্শক উপস্থিত থেকে যুব উৎসব উপভোগ করেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'যুব উৎসবের গুরুত্বের' উপর এক ঘণ্টাব্যাপী বক্তব্য রাখেন শ্রীঅরিন্দম কোঙার মহাশয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারী সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও মানপত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন মেমারী ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীঅমিতাভ সিংহ রায় এবং প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও মেমারী ২নং পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহি আধিকারিক এ. সুকুর মহাশয়। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার ও মানপত্র তুলে দেন শ্রীমুখোপাধ্যায়।

দু'টি প্রশিক্ষণ শিবির (ফুটবল—১৯শে জুলাই থেকে ১৮ই আগস্ট '৮১ এবং ভলিবল—১৫ই ডিসেম্বর '৮১ থেকে ২০শে জানুয়ারী '৮২) সম্প্রতি কিছুদিন আগে শেষ হয়। প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন হরিনারায়ণ দাস (এন.এস.আই)। ফুটবলে ৪৪ জন এবং ভলিবলে ৩৮ জন প্রশিক্ষান্তে মানপত্র লাভ করে। এই যুব অফিসের উদ্যোগে এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির প্রথম হওয়ায় বিশেষ উদ্দীপনা প্রশিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

কেতুগ্রাম-২ ব্লকে তফশিলী জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীদের জন্য সাইকেল মেরামতী শিক্ষণ শিবির গত ৩রা ডিসেম্বর '৮১ থেকে চালু হয়। চারমাসব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবির চলবে। এখন নিয়মিত ছয়জন তফশিলী ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় বি.ডি.ও শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য মহাশয় এটি উদ্বোধন করেন এবং জেলা পরিষদ সদস্য শ্রীতারক দত্ত মহাশয় পরিপূর্ণভাবে ব্লক যুব আধিকারিকের সঙ্গে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করায় ব্যাপারে সহযোগিতা করছেন।

আসানসোলে বর্ধমান জেলা যুব উৎসবে এই ব্লকের ২ জন ছাত্র ও ১ জন ছাত্রী বিশেষ সাফল্য অর্জন করে।

গত বর্ধমান জেলা বিজ্ঞান মেলায় কেতুগ্রাম ২নং ব্লকের বিল্বেশ্বর বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে।

গত ১২ই থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী '৮২-তে কেতুগ্রাম হাই স্কুল প্রাঙ্গণে কেতুগ্রাম ২নং ব্লকের যুব উৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় সাত শত। তিরিশটি ক্লাব ও ৮টি বিদ্যালয় এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন স্থানীয় বিধানসভার সদস্য শ্রীরাইচরণ মাঝি। পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদিলীপ মণ্ডল উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এল. এন. গণ, স্থানীয় বি.ডি.ও. শ্রীসঞ্জয়কুমার ভট্টাচার্য ও কাটোয়ার পৌরপিতা শ্রীশশাঙ্কশেখর চট্টোপাধ্যায়। সকলকে ধন্যবাদ জানান ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীরঞ্জিত রায়। অনুষ্ঠানের ক্রীড়া বিভাগে ভলিবল প্রতিযোগিতা ছাড়াও বিভিন্ন মিটারের দৌড়, ক্রিকেট-বল নিক্ষেপ, হাইজাম্প, লংজাম্প, জ্যাভলিন, ডিসকাস, মিউজিক্যাল চেয়ার, ভারসাম্য দৌড় ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। বালক-বালিকাদের জন্যও পৃথক বিভাগ ছিল। সাংস্কৃতিক বিভাগে শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সংগীত প্রতিযোগিতা, (রবীন্দ্র-সংগীত ও নজরুল সংগীত), বাউল, আবৃত্তি, কার্টুন, পোস্টার, স্বরচিত ছোটগল্প প্রতিযোগিতা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়।

তথ্যকেন্দ্র এখন নিয়মিতভাবে কেতুগ্রাম ২নং ব্লকের যুবক-যুবতীর সেবায় নিয়োজিত। বিভিন্ন দিনে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করে। যুবমানস পত্রিকাও বিভিন্ন ক্লাবে বিলি করা হয়।

কালনা-১ ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে মেদগাছী উচ্চ বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন বিজন গোপাল পার্কে ২৩শে থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারী '৮২ কালনা-১ ব্লক 'যুব উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে ও প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রায় ৮০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগীদের মার্চপাস্ট অভিবাদন গ্রহণ করেন কালনা মহকুমা শাসক শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন কালনা-১ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, শ্রীপংকজ মুখোপাধ্যায়। বিধান সভার অধ্যক্ষ মাননীয় আবদুল মনসুর হবিবুল্লাহ ২৪শে ও ২৫শে তারিখে সারাদিন উপস্থিত থেকে সবাইকে উৎসাহিত করেন। এই তিন দিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাত্রা, নাটক, চলচ্চিত্র, গণসংগীত, নৃত্যনাট্য, জীমন্যাস্টিক প্রদর্শনী প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে ব্লকের বিভিন্ন ক্লাব অংশগ্রহণ করে। জীমন্যাস্টিক প্রদর্শনীতে বাংলার বহু ব্যায়ামবিদ্ অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া মেদগাছী অঞ্চলের মহিলাদের

কালনা ব্লক যুব উৎসবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দ্বারা পরিচালিত ও অভিনীত নাট্যানুষ্ঠান দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়। আদিবাসী দল কর্তৃক যাত্রানুষ্ঠানও সবাইকে প্রভূত আনন্দ দেয়। দুইটি মঞ্চে (রবীন্দ্র ও নজরুল মঞ্চে) প্রতিদিন প্রায় সারা রাত্রি ধরে চলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উৎসবের সমাপ্তি দিনে কালনা-১ ব্লক যুব-আধিকারিক, শ্রীশশাংক মুখোপাধ্যায় যুব উৎসব প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাওড়া জেলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুবকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে **আমতা-১** ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও যুব উৎসব কমিটির সহযোগিতায় গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী '৮২ পর্যন্ত চারদিনব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে যুব উৎসব '৮২ অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামাঞ্চলের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে খেলাধুলার চর্চা বাড়িয়ে তোলা, সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলা, ছাত্র-যুব ঐক্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই ব্লক যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। এবারের যুব উৎসবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও

আমতা-১ ব্লক যুব উৎসবের ক্রীড়া অনুষ্ঠান

যুব সংস্থা থেকে ৭১৮ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ও যুব সংস্থার সংখ্যা যথাক্রমে ১৫ এবং ৬৫।

১৭ই ও **১৮ই ফেব্রুয়ারী '৮২ আমতা** স্পোর্টিং মাঠে **ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৭ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১০টায় ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন হাওড়া জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ১৯শে ও ২০শে ফেব্রুয়ারী** '৮২ আমতা বালিকা বিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০শে ফেব্রুয়ারী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সফলকাম প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রী এস. এস. মির্জা মহাশয়, জেলা যুব-আধিকারিক, হাওড়া। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীনিমাই মান্না, কর্মাধ্যক্ষ, শিক্ষা স্থায়ী কমিটি, পঞ্চায়েত সমিতি, আমতা-১ ব্লক এবং শ্রীমতী পার্বতী দেব, প্রধান শিক্ষিকা, আমতা বালিকা বিদ্যালয়। এই অনুষ্ঠানে যুব উৎসব সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন শ্রীবিকাশ মণ্ডল, ব্লক যুব-আধিকারিক, আমতা-১ ব্লক।

উলুবেড়িয়া-১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকার যুবক-যুবতীদের খেলাধুলায় উৎসাহ দান এবং সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ গড়ে তোলার প্রয়াসেই ব্লক যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। দলগত খেলাধুলাগুলি ফুলেশ্বর, বহীবা বীরশিবপুর এবং সোমরুক এই চারটি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে মোট ৩২টি কবাডি এবং ২৪টি ভলিবল দল যোগদান করে। চূড়ান্ত খেলা ২৮শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে যদুরবেড়িয়া হাই স্কুল মাঠে এবং নিমদীঘি হাসপাতাল মাঠে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী গরুহাটা থেকে বাগণ্ডা ব্রীজ পর্যন্ত সাইকেল রেস এবং ১লা মার্চ ৩ কিঃ মিঃ রোড রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই দুটি প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ৩১ জন এবং ২৮ জন যুবক অংশগ্রহণ করে।

অন্যান্য ক্রীড়ানুষ্ঠান হয় ১৪ই ফেব্রুয়ারী উলুবেড়িয়া স্টেডিয়াম মাঠে। এতে মোট ৩৩৮ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে আবৃত্তি, বিতর্ক, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বিষয়ে মোট ৮৪ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতাগুলি ৭ই ফেব্রুয়ারী ফালীনগর হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়।

যুব উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০শে মার্চ ঘড়িয়া ময়নাপুরে শ্রীদুর্গা মণ্ডে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৮৩ জন সফল যুবক-যুবতীকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীদেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাধিপতি, হাওড়া জেলা পরিষদ। এ ছাড়া মণ্ডে উপস্থিত ছিলেন শ্রীত্রিনাথকৃষ্ণ সিনহা, মহকুমা শাসক, উলুবেড়িয়া, ডঃ বালা এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীঘটকৃষ্ণ দাস, সভাপতি, উলুবেড়িয়া-১ পঞ্চায়েত সমিতি। সমস্ত উৎসবটি সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়। এই অনুষ্ঠান সমস্ত অঞ্চলের যুবক-যুবতী এবং অধিবাসীদের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রতি বৎসর এই ধরনের উৎসবের প্রয়োজনীয়তার কথা সকলে স্বীকার করেন।

বাগনান-২—সম্প্রতি ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারী নওপালা চন্ডচড় ময়দানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ১৪ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারী কাজীভূয়ারা ময়দানে সংস্কৃতি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব প্রাঙ্গণের বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৬১৬ জন যুবক-যুবতী ও ছাত্র-ছাত্রী এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ২৯৮ জন তরুণ-তরুণী ও বালক-বালিকা অংশগ্রহণ করে। নানা ধরনের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে দৌড়ঝাঁপ, আবৃত্তি, সংগীত, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে আদৃত হয়। প্রতিদিন প্রায় ৩০০০ দর্শক অনুষ্ঠানগুলি উপভোগ করে।

যুব উৎসব জানুয়ারীতে করার পক্ষে সকলে মত প্রকাশ করেন।

পুরুলিয়া জেলা

মানবাজার-২ যুবকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এবং মানবাজার-২ ব্লক যুবকরণ ও ব্লক যুব উৎসব কমিটির যৌথ ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় ব্লক যুব উৎসব গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই যুব উৎসব স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। যুব উৎসবের প্রধান প্রধান অংগ হিসাবে ছিল বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে মানবাজার-২ ব্লকের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যগণ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যবৃন্দ যোগদান করে। মানবাজার-২ পঞ্চায়েত সমিতির অধীনস্থ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির আন্তরিক সহযোগিতা এই উৎসবকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলে।

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সকালে দিঘী হাই স্কুল প্রাঙ্গণে যুব উৎসবের শুভ উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধান সভার সদস্য শ্রীসুধাংশুশেখর মাঝি মহাশয়। এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার দু'টি বিভাগে ৬৮ জন প্রতিযোগী এবং বিতর্ক অনুষ্ঠানে ২৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল, "বর্তমানে যুব সমাজ ঠিক মত এগিয়ে এসেছে" (পক্ষে এবং বিপক্ষে)। আবৃত্তির বিষয়বস্তু ছিল, জুনিয়ার বিভাগে সুকুমার রায়ের "সৎপাত্র" এবং সিনিয়ার বিভাগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"।

এই উৎসবের ২৭শে ফেব্রুয়ারী শনিবার 'বসে আঁকো', 'রবীন্দ্রসংগীত', 'লোকসংগীত', 'নজরুল-গীতি', 'তীর ছোঁড়া' আরম্ভ হয়। সর্বমোট প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক প্রতিযোগী প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করে। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী প্রতিযোগীদের অভিজ্ঞান পত্র দেওয়া হয়।

এই উৎসবের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে, 'ধরম নাচ', 'ছো নাচ' ও সাঁওতালি নাচ স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, এবং প্রতিদিন প্রায় তিন সহস্রাধিক জনসমাগম হয়।

২৮শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দিঘী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীপতিতপাবন মাহাত এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শ্রীমণীন্দ্র গোপ, বিধানসভার সদস্য শ্রীসুধাংশুশেখর মাঝি ও মানবাজান-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীকালিপদ মাহাত। প্রতিযোগিতার সফলকামী প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেন পুরুলিয়া জেলা সহ-সভাধিপতি শ্রীমণীন্দ্র গোপ।

এই উৎসবে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে যুব উৎসবের উদ্দেশ্য ও সার্থকতার উপর বক্তব্য রাখেন পুরুলিয়া জেলা সহ-সভাধিপতি শ্রীমণীন্দ্র গোপ। বিধান সভার সদস্য শ্রীসুধাংশুশেখর মাঝি, যুব উৎসব কমিটির সম্পাদক ও ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসনৎকুমার পট্টনায়ক। যুব উৎসব কমিটির সভাপতি এবং মানবাজার-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীকালীপদ মাহাতও তাঁর বক্তব্য রাখেন।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা

বংশীহারী—কয়েক মাস আগে (১৬ই সেপ্টেম্বর '৮১) একটি সাইকেল মেরামত প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীঅরবিন্দ চক্রবর্তী। মোট ২০ জন এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেয়। এ'রা সবাই তফসিলী শ্রেণীভুক্ত। এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের স্থানীয় কর্মক্ষম বেকার যুবকদের মধ্যে এক বিশেষ আনন্দ সংবাদ হিসাবে অভিহিত করা হয়। মোট ১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী চার মাস ব্যাপী এই শিবিরে থেকে প্রয়োজনীয় মেরামতী হাতে কলমে শিখে নেন। মোট ১৬ জন প্রশিক্ষান্তে মানপত্র লাভ করে। এই শিবিরের প্রশিক্ষক ছিলেন শ্রীনগেন্দ্রনাথ সরকার। সমাপ্তি দিবসের অনুষ্ঠানে ৪নং অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান এবং অন্যান্য অতিথিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মালদা জেলা

যুবকল্যাণ বিভাগের **হরিশ্চন্দ্রপুর-২** ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে এবং দৌলতনগর গ্রাম পঞ্চায়েত ও দৌলতনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনায় গত ২৭ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী দৌলতনগর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খুব সমারোহের মাধ্যমে যুব উৎসব উদ্‌যাপিত হল।

২৭শে ফেব্রুয়ারী সকাল ১০-৩০ মিনিটে প্রদর্শনী উদ্বোধনের মাধ্যমে যুব-উৎসবের কর্মসূচী শুরু হয়। উদ্বোধন করেন স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীঅপূর্বশংকর মৈত্র মহাশয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত

ছিলেন মালদা জেলার সহ-সভাধিপতি সামশুল হক মহাশয়, স্থানীয় এম.এল.এ. শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মৈত্র এবং বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়গণ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে সামশুল হক মহাশয় যুব উৎসবের

হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক যুব উৎসবে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য

তাৎপর্য বর্ণনা করেন। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীঅপূর্বশংকর মৈত্র, এম.এল.এ. শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মৈত্র, দৌলতনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্রদীপরঞ্জন পোদ্দার, যুব-আধিকারিক শ্রীবিপুলরঞ্জন চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে। প্রথম দিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল তিনটি বিভাগে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। শিশুদের জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বামফ্রন্ট সরকারের ভাষা নীতির উপর আলোচনাচক্র, বিকালে ভলিবল প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যায় গীতিনাট্য, ঋতুরঙ্গ এবং সব শেষে পঃ বঃ সরকারের তথ্য বিভাগ দ্বারা প্রদর্শিত চলচ্চিত্র।

২৮শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ৮-৩০ মিনিটে। প্রথমে ক্রীড়ানুষ্ঠানের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। তারপর শুরু হয় রবীন্দ্রসংগীত এবং নজরুলগীতি প্রতিযোগিতা।

বিকালে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সফল পরিচালনায় স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা ব্রতচারী নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। তারপর বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা শাড়ী নৃত্যও প্রদর্শিত হয়।

এরপর সমস্ত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীঅপূর্বশংকর মৈত্র মহাশয় এবং রাত্রে "সেমসাইড" নাটকটি অভিনীত হয় স্থানীয় যুবক-যুবতীদের দ্বারা।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল মোট ৩৪৪ জন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি স্থানীয় এলাকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করে।

কোচবিহার জেলা

কোচবিহার-২ ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে বানেশ্বর খাবসা হাই-স্কুল প্রাঙ্গণে ২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শ্রীদীনেশচন্দ্র ডাকুয়া, এম.এল.এ. মহাশয় ও সভাপতিত্ব করেন শ্রীনগেন রায়। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমতী অপরাজিতা গোপ্পী। ২৬শে

কোচবিহার-২ ব্লক যুব উৎসবের উদ্বোধনী ছাত্র-যুব মিছিল

ফেব্রুয়ারী এক সুসজ্জিত যুব-ছাত্র মিছিলের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা করা হয়।

বিভিন্ন দিন বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী অপরাজিতা গোপ্পী, এম.এল.এ., শ্রীদীনেশচন্দ্র ডাকুয়া, এম.এল.এ., শ্রীমনোজ রায়, শ্রীদ্বিপেশ বৈশ্য, ডাঃ দিগ্বিজয় দে সরকার, শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ মহাশয় প্রমুখ।

এই অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৪০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে একাংক নাটক প্রতিযোগিতাই সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়। ১২টি দল এতে অংশ নেয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা যুব আধিকারিক শ্রীগণেশ দেবরায় এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীবিমলকান্তি বোস, এম.এল.এ. ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইনুদ্দিন মিয়া, সভাধিপতি, জেলা পরিষদ, কোচবিহার।

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কোচবিহার-২ ব্লক যুব উৎসব শেষ হয়। পরিশেষে ব্লক যুব উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রদীপ নাথ ও সম্পাদক এবং ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গিরি মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলা

গত ৫ই, ৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে **সুতি-১** ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হল জঙ্গীপুর (আহিরণ) ব্যারেজ ময়দানে। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীআসরাফুল ইসলাম মহাশয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মাধ্যমে এই উৎসবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীদের সংখ্যা ছিল ৬০০ জন। এ ছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের 'ওয়ার্ক' এডুকেশন'-এর মডেল-এর উপর প্রদর্শনী স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। অনুশীলনরত জিমন্যাস্টদের ও মির্জাপুরস্থ নব ভারত স্পোর্টিং ক্লাবের আমন্ত্রিত জিমন্যাস্টদের প্রদর্শনী জনসাধারণকে বিশেষ আনন্দ ও পরিতৃপ্তি প্রদান করে। বসে আঁকো, আবৃত্তি, সংগীত প্রতিযোগিতাও দর্শক সাধারণকে মোহিত করে। এই উৎসব প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ করেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতির

সুতি-১নং ব্লক যুব উৎসবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীসুকুমার গনাই এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীশেঠী, বাস্তু নির্বাহীকার, ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্ট, জঙ্গীপুর বিভাগ ও বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ সদস্য শ্রীরমাপতি দাস।

মহকুমা তথ্যকেন্দ্র কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

আনন্দঘন পরিবেশে ব্লক যুব উৎসব '৮২ স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগায়।

কান্দি—গত ২৬শে থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ পর্যন্ত মহালন্দি কলোনী ও নবগ্রাম কিশোর সংঘ প্রাঙ্গণে কান্দি ব্লকের যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করলেন কান্দি রাজ হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীবৈদ্যনাথ দে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব-আধিকারিক শ্রীঅধীররঞ্জন ঘোষ। উৎসবের বিভিন্ন দিনগুলিকে শিশু-ছাত্র-যুব-দিবস, শিক্ষা ও সংস্কৃতি দিবস ও শ্রমিক-কৃষক-মৈত্রী-দিবস হিসাবে পালন করা হয়। উৎসবে বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সাংস্কৃতিক বিভাগে ছিল—শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, তাৎক্ষণিক ভাষণ প্রতিযোগিতা। এ ছাড়াও ব্রতচারী, লোকগীতি ও নৃত্যানুষ্ঠান, গণসংগীত, নাটক, ছায়া প্রদর্শনী ও বিচিত্রানুষ্ঠান ইত্যাদি। উৎসবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে ছিল ক্রীড়া বিভাগে ছেলেদের ও মেয়েদের যোগাসন প্রতিযোগিতা ও একদিনের ভলিবল প্রতিযোগিতা।

উৎসবের সমাপ্তি দিবসে প্রধান অতিথি হিসাবে পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীনিমাই করণ, উপ-সমাহর্তা মহাশয়। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—শ্রীআরাজেল্লাহ, সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতি, শ্রীবিশ্বেশ্বর মাইতি, বি.ডি.ও., শ্রীমতী সুধা মিশ্র, পৌরপতি, কান্দি মিউনিসি-প্যালিটি, শ্রীরণজিতকুমার দত্ত চৌধুরী, জুডি-সিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও আরো অনেকে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় মোট ১৫০ জন প্রতিযোগী এবং ভলিবল প্রতিযোগিতায় ১৫টি দল অংশ গ্রহণ করে। প্রতিদিন গড়ে পাঁচ থেকে সাত হাজার দর্শক এই উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করে। উৎসবে বিভিন্ন বক্তারা যুব উৎসবের প্রয়োজনীয়তা এবং যুবসমাজের উপর এর প্রতি-ফলন ইত্যাদি নিয়ে বক্তব্য রাখেন। ব্লক যুব-আধিকারিক শ্রীতুহিন রায় যুবকল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন। উৎসবের সমাপ্তি দিবসে বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

জলংগী—এখানকার ব্লক যুব উৎসব ২৬ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বসে সাগরপাড়ায়। ২৬শে ডি. ওয়াই. এফ.-এর জেলা সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি দে উৎসবের উদ্বোধন করেন। মিছিল ও ব্রতচারীনৃত্যের ছন্দে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে। শুরু হয় একদিনের নক-আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। বিকেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলার সভাধিপতি শ্রীনির্মল মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই উৎসবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া বহরমপুর আবৃত্তি সংসদের পক্ষে কবির লড়াই পরিবেশন গ্রামবাসীদের প্রভূত আনন্দ দেয়। প্রতিযোগী শিশু, পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা ছিল ২৩৫ জন। এরা ৩০টি সংস্থা থেকে অংশ নেয়।

সামসেরগঞ্জ—সম্প্রতি ২৩ থেকে ২৫ জানুয়ারী এই যুবকরণের পরিচালনায় ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ধুলিয়ান শহর পরিক্রমা করে উৎসব প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। শ্রীআবুল হাসান খান (এম.এল.এ.) অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এ ছাড়া আরো অনেক মাননীয় অতিথিবর্গ এই উৎসবের শুভারম্ভে উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৫০০। এবারের অনুষ্ঠানকে বিশেষভাবে গণমুখী করার চেষ্টা করা হয়। বৈচিত্র্য এবং স্বাদেও এবার-কার যুব উৎসব বিশিষ্টতার দাবী রাখে। একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়। আসরের বড় আকর্ষণ ছিল মালদহের 'গম্ভীরা গান'—এতে সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরা হয়।

২৫শে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীনির্মল মুখোপাধ্যায়, সভাধিপতি, জেলা পরিষদ। শ্রীমুখোপাধ্যায় যুব উৎসবের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বর্ণনা করেন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ আফসার আলি সমবেত যুব-

সামসেরগঞ্জ ব্লক যুব উৎসবে অংশগ্রহণকারী দু'জন শিশু প্রতিযোগী

সম্প্রদায়কে যুবকল্যাণ বিভাগের কর্মসূচির সফল রূপায়ণে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানান।

লালগোলা—১২ থেকে ১৬ মার্চ এখানকার ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠান-এর সঙ্গে ১৯৮১-র প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি দিবসও পালন করা হয়। মহেশ একাডেমীর (উৎসবের স্থান) প্রধান শিক্ষক শ্রীমদনমোহন রায় যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মহম্মদ সাইদুর রহমান, সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক উৎসব কমিটি। নক-আউট ভলিবল, ধীরগতি সাইকেল রেস, বসে আঁকো, কবিতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, যোগব্যায়াম, একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতা উৎসবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৫০০ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতায় সামিল হয়।

সফলকাম প্রতিযোগী ও সংস্থাকে পুরস্কার ও মানপত্র প্রদান করেন মহঃ নজরুল ইসলাম মহাশয়, সহ সভাধিপতি, জেলাপরিষদ। এই যুব উৎসব স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিপুল আলোড়ন ও সাড়া জাগায় এবং সকলের সহযোগিতার ফলে উৎসব সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়।

২৪-পরগণা জেলা

জয়নগর-২ ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে ২৪-পরগণা (দক্ষিণ) জেলার জয়নগর-২ ব্লকে সম্প্রতি একটি ছয়মাসব্যাপী সীবন শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী জয়নগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোঃ আবদুল ওহাব হালদার মহাশয় এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জয়নগর-২ ব্লকের তপসীল সম্প্রদায়ভুক্ত ৩০ জন যুবক-যুবতী ছয় মাস ধরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানে যুব-আধিকারিক শ্রীমতী আরতি চক্রবর্তী এই ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করার যৌক্তিকতা এবং উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমতী চক্রবর্তী বলেন যে, প্রশিক্ষণ শেষে যাতে শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করে স্ব-নির্ভর হতে পারেন, সে ব্যাপারেও যুবকল্যাণ বিভাগের লক্ষ্য আছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেবেন স্থানীয় সরকারী ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শ্রীসুনীলকুমার দাস।

জয়নগর-২ ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে গত ২০শে জানুয়ারী থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী '৮২ পর্যন্ত একমাসব্যাপী কবাডি ও গত ৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৭ই মার্চ পর্যন্ত ভলিবল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কবাডি প্রশিক্ষণ চলে স্থানীয় বৈদ্যের চক্ তেঁতুলবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ ময়দানে। ভলিবল প্রশিক্ষণ চলে নিমপীঠ বি.ডি.ও. অফিসের সংলগ্ন ময়দানে। এই শিবির স্থানীয় যুবকদের মধ্যে প্রভূত সাড়া এনে দেয়। শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল নিজদায়িত্বে কবাডি শিক্ষার্থীদের টিফিন সরবরাহ করেন। কবাডি ও ভলিবল প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন শ্রীকানাইলাল ঘোষ। শ্রীতারকনাথ দে শিবির দুটি পরিচালনা করেন। সুষ্ঠুভাবে শিবির চলার জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও বি.ডি.ও. শ্রীশিবপ্রসাদ দাশগুপ্তের সহ-যোগিতা প্রশংসার দাবী রাখে। এ ছাড়া ৪৫টি স্থানীয় ক্লাব ও সংস্থাকে খেলাধুলার সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়।

মন্দিরবাজার—গ্রামীণ যুবসমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনার প্রসার এবং সৃজনীশক্তি বিকাশের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব-কল্যাণ বিভাগ আয়োজিত এবং যুব উৎসব কমিটি পরিচালিত মন্দিরবাজার ব্লক যুব উৎসব '৮২ সম্প্রতি (১৩-১৬ ফেব্রুয়ারী) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। উৎসব উদ্বোধন করেন শ্রীনলিনীরঞ্জন ঘোষ, সহ সভাধিপতি, জেলা পরিষদ। দু'শ-এর বেশি প্রতিযোগীরা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করে। প্রতিদিন প্রায় এক হাজার দর্শক এইসব অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

শেষদিনের আমন্ত্রণমূলক প্রদর্শনীর মধ্যে ছিল বাঁশবেড়িয়া হিন্দু মিলন মন্দিরের লাঠিখেলা ও ছোরা খেলা। এছাড়া 'তিতাস' ক্লাব-এর সদস্যবৃন্দ 'নরক গুলজার' নাটকটি পরিবেশন করে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন।

সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীওমর আলি পুরকাইত। স্থানীয় জনসাধারণ এই ধরনের রুচিশীল সুষ্ঠু অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে খুশী হন।

বসিরহাট-২—সম্প্রতি ২১ থেকে ২৪শে মার্চ ব্লক যুব উৎসব '৮২ এই ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন

করা হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আসর বসে শ্রীঅরবিন্দ তপোবন পাঠমন্দির প্রাঙ্গণে। এ ছাড়া একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আসরেও বেশ কিছু প্রতিযোগী অংশ নেয়। উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে যারা অংশ নেয় তাদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ তপোবন পাঠমন্দিরের কর্মশিক্ষার প্রদর্শনী, লোকশিক্ষা

বসিরহাট-২ ব্লক যুব উৎসবের প্রদর্শনীতে শ্রীঅরবিন্দ তপোবন পাঠমন্দিরের কর্মশিক্ষাবিষয়ক মণ্ডপ

পরিষদের প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রদর্শনী, বসিরহাট উচ্চ-বিদ্যালয়ের ও বি. আই. টি. এম.-এর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনী ও ভারতীয় যাদুঘরের ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুগ্ধ প্রকল্প বিষয়ক বিপণি ও দীপক দাসের কাঁচে তৈরী গৌড়ীও মঠটি দর্শকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

২৪শে মার্চের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীআবদুল্লা সিদ্দিকির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি লোকশিক্ষা পরিষদের (রামকৃষ্ণ মিশন, নরেন্দ্রপুর) অধিকর্তা শ্রীশিবশংকর চক্রবর্তী সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করেন।

নদীয়া জেলা

তেহট্ট-২—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং তেহট্ট-২ পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় ব্লক যুব উৎসব '৮২ অনুষ্ঠিত হয় পলাশীপাড়া এম. জি. এস. বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে। উৎসব অনুষ্ঠিত হয় দু'টি পর্যায়ে। ক্রীড়ানুষ্ঠানটি হয় গত ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ই জানুয়ারী পলাশীপাড়া এম. জি. এস. বিদ্যাপীঠের ক্রীড়া প্রাঙ্গণে। ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা যুব-আধিকারিক শ্রীগোপেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা ক্রীড়া আধিকারিক শ্রীসোমেন চৌধুরী মহাশয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বি. ডি. ও., শ্রীশিবচন্দ্র বিশ্বাস, সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতি, তেহট্ট-২ ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যবৃন্দ। ক্রীড়ানুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৫০০ জন বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। ক্রীড়ানুষ্ঠানের মধ্যে ছিল ভলিবল, কবাডি, খো-খো, এ্যাথলেটিকস্ ইত্যাদি।

গত ৬, ৭ ও ৮ই ফেব্রুয়ারী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় পলাশীপাড়া এম.জি.এস. বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে। উৎসবের মূল অংশে ছিল সঙ্গীত, আবৃত্তি, বিতর্ক, বাউল গান, আলোচনা-চক্র, লোকনৃত্য, ব্রতচারী প্রভৃতি। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীপরিমল বাগচী মহাশয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রায় ৩৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন রকম প্রদর্শনী এই যুব মেলাকে মুখর করে তোলে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে উভয় বিভাগের বিজয়ীদের মানপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্রীশান্তিভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়। এই যুব মেলায় প্রচুর জনসমাগম হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও কৃষ্ণনগর-১ ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় ২৯ মার্চ থেকে তপসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত যুবক-যুবতীদের জন্য ৬ মাসের 'বাংলা টাইপরাইটিং' শিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীপরিমল বাগচী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কৃষ্ণনগর সদর (দক্ষিণ) মহকুমা শাসক শ্রী এম. এ. আলম। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কৃষ্ণনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ। এ ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসাধন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণনগর-১ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীঅতুলচন্দ্র টিকাদার ও বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত-এর প্রধানগণ।

এই টাইপরাইটিং শিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষার্থী-দের উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপস্থিত অতিথি-বৃন্দ বক্তব্য রাখেন। প্রশিক্ষণ শিবিরে মোট ২৪ জন যুবক-যুবতী প্রশিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান করেন এবং প্রত্যেক প্রশিক্ষার্থী মাসিক ৩০ টাকা হারে স্টাইপেন্ড পাবেন।

তেহট্ট-১—বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে এই যুবকরণের উদ্যোগে এবং তেহট্ট-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় গত ২২ থেকে ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত স্থানীয় উচ্চ-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যুব উৎসব '৮২ অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসতীশচন্দ্র বিশ্বাস। বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী উৎসবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৭০০ জন প্রতিযোগী এইসব অনুষ্ঠানে অংশ-গ্রহণ করে।

২৬শে জানুয়ারী সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীপরিমল বাগচী। এই ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠান স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড সাড়া জাগায়।

করিমপুর—যুব উৎসব '৮২ সম্প্রতি ১৪ থেকে ১৭ জানুয়ারী এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পরিচালনায় ছিল যুব উৎসব কমিটি। জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য শ্রীঅবনীমোহন বিশ্বাস উৎসব উদ্বোধন করেন। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ৩০টি বিষয়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ক্রীড়া বিভাগে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৮০০। সাংস্কৃতিক বিভাগে প্রতিযোগী ছিল ৫০০। এই

করিমপুর ব্লক যুব উৎসবে মেয়েদের দৌড় প্রতিযোগিতা

বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগীর মহড়া ছাড়াও ছিল জারী গান, পদ্মপুরাণ এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। চারদিনব্যাপী এই সব অনুষ্ঠান প্রায় কয়েক সহস্র দর্শক উপভোগ করেন। প্রদর্শনী মঞ্চে তথ্য দপ্তরের প্রচারপত্র দেখার জন্য প্রচুর ভিড় হয়।

শেষ দিনের (১৭ই জানুয়ারী) পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতি পান্না দেবী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২৫০টির মত

পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলার সভাধিপতি শ্রীপরিমল বাগচী মহাশয়। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন জেলা যুব-আধিকারিক ও মহকুমা তথ্য আধিকারিক (সদর-উত্তর) প্রভৃতি। ব্লক যুব-আধিকারিক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গত ১৫ই ডিসেম্বর '৮১ থেকে ১৪ই জানুয়ারী '৮২ পর্যন্ত এই যুব অফিসের তত্ত্বাবধানে ভলিবল ও ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। ফুটবলে ও ভলিবলে প্রশিক্ষণ দেন যথাক্রমে শ্রীশান্তনু রায় (এন.আই.এস.) এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথ কর্মকার ও শ্রীসুশীলকুমার বিশ্বাস। ১০০ জনের মধ্যে ৬১ জন সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করে। করিমপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসমররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সফল শিক্ষার্থীদের মানপত্র দেন।

রানাঘাট-২—যুব উৎসব '৮২ সম্প্রতি ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারী এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। উৎসবের উদ্বোধন করেন রানাঘাট (পশ্চিম) বিধান সভা কেন্দ্রের সদস্য শ্রীগৌরচন্দ্র কুণ্ডু। সাড়ম্বর বর্ণাঢ্য পরিবেশ উৎসব প্রাঙ্গণকে মুখর করে তোলে।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আসর প্রতিযোগীদের মুহুর্মুহু আনাগোনায় সদাব্যস্ত থাকে। এ ছাড়া দলগত প্রতিযোগিতার মধ্যে একাঙ্ক নাটকের মঞ্চটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। গ্রামের বিভিন্ন স্তরের মানুষের উপস্থিতি উৎসব প্রাঙ্গণকে কর্মচঞ্চল করে তোলে। দু'দিনে প্রতিযোগিতার সব বিষয় শেষ করা সম্ভব না হওয়ায় ১৭ তারিখেও গুটি কয়েক (ভলিবল ও নাটক) অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। ১২ ফেব্রুয়ারী সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসত্যভূষণ চক্রবর্তী যুব উৎসবের উপর বক্তব্য রাখেন। শ্রীকার্তিকচন্দ্র মণ্ডলও (বি-ডি-ও) তাঁর বক্তব্য রাখেন। ব্লক যুব-আধিকারিক শ্রীদেবপ্রসাদ হালদার সমাগত অতিথিবৃন্দ ও জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানান।

মেদিনীপুর জেলা

দাসপুর-১—রেডিও তৈরী ও মেরামতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের কর্মসূচী অনুযায়ী স্থানীয় এলাকার কর্মহীন যুবকদের স্ব-নিযুক্তিতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে গত ২১শে সেপ্টেম্বর '৮১ থেকে ছয়-মাসব্যাপী রেডিও তৈরী ও মেরামতি বিষয়ে যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছিল তা গত ২৩শে মার্চ '৮২তে শেষ হয়। মোট ২৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১২ জন শিক্ষার্থী সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষণ কর্মসূচীতে উত্তীর্ণ হয়। সমাপ্তি দিনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ব্লক যুব-আধিকারিক শ্রীহিরন্ময় চক্রবর্তী সফল শিক্ষার্থীদের মানপত্র প্রদান করেন। শিক্ষাশেষে শিক্ষার্থীরা যাতে সরকারী ও ব্যাংকের সহায়তায় মেরামতি কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে সেজন্য ব্লক যুব-আধিকারিক প্রচেষ্টা শুরু করেছেন। এই শিক্ষণসূচী পরিচালনার ব্যাপারে স্থানীয় যুব সংস্থা কৃষ্টি সংসদ ও প্রশিক্ষক শ্রীতুলসীচরণ দাস-এর সহযোগিতা প্রশংসনীয়।

সাইকেল তৈরী ও মেরামতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ : তপসীল জাতি ও উপজাতি যুবকদের অর্থনৈতিক সমস্যা মিটাতে এবং স্ব-নিযুক্তির দ্বারা জীবিকার সংস্থানে সাহায্য করার জন্য যুবকল্যাণ বিভাগের অর্থানুকূল্যে দাসপুর-১ ব্লকের রাজনগর গ্রামে গত ২৪শে মার্চ চারমাসব্যাপী সাইকেল তৈরী ও মেরামতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু হয়। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০ জন তপসীল সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মাসিক ৩০ টাকা হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। প্রশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত আছেন শ্রীগণেশচন্দ্র হাইত। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ব্লক যুব-আধিকারিক, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও জেলা পরিষদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের অর্থানুকূল্যে অ-ছাত্র যুবকদের জন্য ভ্রমণ-সূচী অনুযায়ী দাসপুর-১ ব্লক যুবকরণ পরিচালিত ভ্রমণ গত ৬ ও ৭ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। এই ভ্রমণে ৬৭ জন অ-ছাত্র যুবক বাসযোগে শান্তিনিকেতন, বক্রেশ্বর, ম্যাসাঞ্জোর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন।

সরকারের এই কর্মসূচী স্থানীয় যুবসমাজে বিশেষতঃ গ্রামীণ যুবকদের মধ্যে প্রভূত আগ্রহ সৃষ্টি করে। আনন্দদায়ক ও অভাবিত এই সুযোগ-দানের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ যুব অফিসকে ধন্যবাদ জানান।

চন্দ্রকোণা-১—গত ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চন্দ্রকোণা-১ ব্লকে ব্লক যুব উৎসব প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে রামজীবনপুরে বাবুলাল বিদ্যাভবন প্রাঙ্গণে শেষ হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধান সভার সদস্য শ্রীউমাপতি চক্রবর্তী। ঐ অনুষ্ঠানে

চন্দ্রকোণা-১ ব্লক যুব উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

সভাপতির আসন অলংকৃত করেন রামজীবনপুর পৌরসভার পৌরপিতা শ্রীগোবর্ধন দাস মহাশয় ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এন. এন. দাস, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ঘাটাল ও রামজীবনপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আগে দু'জন যুবক যুব-কল্যাণ দপ্তর, ক্ষীরপাই থেকে রামজীবনপুর পর্যন্ত মশালসহ দৌড়ে যান এবং রামজীবনপুর পৌর এলাকা এক বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে প্রদক্ষিণ করা হয়।

উৎসবের চারদিনই ক্রীড়া ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আদিবাসীদের জন্য তীর নিক্ষেপ, মহিলাদের মাটির কলসিসহ ব্যালান্স দৌড়, লাঠিখেলা, কবাডি, ভলিবল, একাঙ্ক নাটক, সংগীত, আবৃত্তি প্রভৃতি প্রতিযোগিতা জন-সাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রায় ৮০০র মত প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

যুব উৎসবের শেষ দিন অর্থাৎ ১২ই ফেব্রুয়ারী পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি শ্রীদীপককুমার সরকার, সভাপতি, জেলা স্কুল বোর্ড। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসুধাংশুভূষণ কারক।

ঘাটাল-১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এবং খড়ার রেনবো ক্লাব প্রাঙ্গণে ঘাটাল ব্লক যুব উৎসব-১৯৮২ অনুষ্ঠিত হল। ১৯ এবং ২০শে ফেব্রুয়ারী এই দু'দিন ভগবতী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠিত হয় খড়ার রেনবো ক্লাব প্রাঙ্গণে ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। যুব উৎসবে সাংস্কৃতিক বিভাগে প্রতিযোগিতা ও অ-প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতিযোগিতা-মূলক বিষয়গুলির মধ্যে ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, লোকসঙ্গীত, গণসঙ্গীত, বিতর্ক, আবৃত্তি ও একাঙ্ক নাটক। ব্রতচারী, তুষুগান, আদিবাসী গান ও নাচ, পীরের গান, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, মণিমেলা অভিপ্রদর্শনী, যোগব্যায়াম, মূকাভিনয়, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি অপ্রতি-যোগিতামূলক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয়। ঘাটাল থেকে বীরসিংহ পর্যন্ত (১৫ কিলোমিটার) মশাল দৌড়ের (রিলে পদ্ধতি) মধ্য দিয়ে যুব উৎসবের সূচনা হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধানসভা সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র মণ্ডল। ঘাটাল স্পোর্টিং ইউনিয়ন, দেশবন্ধু ব্যায়াম সমিতি, চকুলচিপুর আজাদিয়া ক্লাব, নোতুক বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, ঈশ্বরপুর মারাংবুরু ক্লাব, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, ঘাটাল মণিমেলা, মিতালী ক্লাব প্রভৃতি সংস্থা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এবারের যুব উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অঞ্চল ও পৌর এলাকাভিত্তিক যুব উৎসবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যাঁরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন তাঁরাই ব্লক যুব উৎসবে অংশ-গ্রহণ করেছেন। উৎসব কমিটির জনৈক মুখপাত্রের মতে, এই পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে ব্লক যুব উৎসব সার্থক হয়েছে কারণ এই বছরের যুব উৎসবে প্রতিযোগীর সংখ্যা অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশী। অন্যান্য বছর যেখানে ৫০০-র মতন হয় এ বছরে সেখানে প্রতিযোগীর সংখ্যা প্রায় ৭০০তে (পুরুষ-৪০০, মহিলা-৩০০) দাঁড়িয়েছে। ২৩শে ফেব্রুয়ারীর পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব

করেন বিধানসভা সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র মণ্ডল এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীমানসকুমার মণ্ডল। আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিদিন বেশ কয়েক হাজার লোক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত থেকে কর্তৃপক্ষকে উৎসাহ জুগিয়েছেন।

চন্দ্রকোণা-২—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং চন্দ্রকোনা-২ ব্লক যুবকরণ ও ব্লক যুব উৎসব কমিটির যৌথ পরিচালনায় চন্দ্রকোনা-২ ব্লক যুব উৎসব-১৯৮২ ঝাঁকরা হাই-স্কুল ময়দানে ৩ থেকে ৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ঘাটাল মহকুমা শাসক শ্রীসুশান্তকুমার সেন এবং স্থানীয় বিধান সভার সদস্য শ্রীউমাপতি চক্রবর্তী। প্রথম দু'দিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোট ২৪টি বিভাগে ৩৫০ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। আদিবাসী ক্রীড়ার দুইটি বিভাগে মোট ৩০ জন আদিবাসী যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। ছোটদের "বসে আঁকো" প্রতিযোগিতাসহ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ১২টি বিভাগে মোট ৩১৫ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া ভলিবল ও একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা ছিল উৎসবের প্রধান আকর্ষণ। উৎসবে আমন্ত্রণমূলক কাঠিনাচ, আদিবাসী নৃত্যগীত এবং মূকাভিনয় পরিবেশিত হয়। উৎসবের শেষদিনে পুরস্কার বিতরণ করেন চন্দ্রকোণা-২ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীসুজয় বাগুই। চারদিনের এই উৎসবে আনুমানিক পাঁচ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

গড়বেতা-২ ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে এবং ব্লক যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় ২৪শে থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী '৮২ পর্যন্ত পাঁচদিন-ব্যাপী হুমগড়ে ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন হুমগড় চাঁদাবিলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীগোলকবিহারী পণ্ডা। ভলিবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় কালচারাল সোসাইটি, গোয়ালতোড়, বিজিত—আনন্দম ক্লাব, গোয়ালতোড়। বিভিন্ন রকম দৌড়, জ্যাম্প, থ্রো এবং আদিবাসীদের জন্য তীর-ধনুক ছোঁড়ার

গড়বেতা-২ ব্লক যুব উৎসবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতা হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দলগতভাবে বিজয়ী হয় ধামচা ছাগুলিয়া সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুল। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন গান, বিতর্ক, কবিতা, প্রবন্ধ, একাঙ্ক নাটক ও আদিবাসীদের জন্য আলাদাভাবে গান, বিতর্ক, প্রবন্ধ, কবিতা, নাচ ও একাঙ্ক নাটকের ব্যবস্থা করা হয়। একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করে কালচারাল সোসাইটি, গোয়ালতোড়। আদিবাসীদের একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় দোবাটী অশেখা। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোট ৫৩৫ জন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মোট ৪২০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করে পুরস্কার বিতরণ করেন স্থানীয় বিধান সভার সদস্য শ্রীসন্তোষ বিষই এবং সভাপতিত্ব করেন হুমগড় চাঁদাবিলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীগোলকবিহারী পণ্ডা। এ ছাড়া যুব উৎসব সম্বন্ধে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন গড়বেতা ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীশান্তনু ভট্টাচার্য। এই উৎসব গ্রামাঞ্চলে প্রভূত উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

এই যুবকরণের উদ্যোগে ছয়মাসব্যাপী তপসীল জাতিভুক্ত শ্রেণীর জন্য সীবন শিল্পের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শিবির স্থানীয় গোয়ালতোড়ে "ড্যাফোডিল" ক্লাবে গত ৮ মার্চ থেকে আরম্ভ হয়। এতে ৩০ (ত্রিশ) জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছেন।

কেশপুর—এই যুবকরণের উদ্যোগে এবং যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় কেশপুর লক্ষ্মীনারায়ণ বিদ্যালয় ময়দানে ২৫ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী ব্লক যুব উৎসব '৮২ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতায় (ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক) আটশ' প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারীর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শ্রীঝাড়েশ্বর সিং। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শ্রীঝাড়েশ্বর সিং, কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও যুব উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীমিশকিন খান, জেলা পরিষদের সদস্য শ্রীহিমাংশু কুণ্ডর ও শ্রীআনন্দমোহন বসু, ব্লক যুব-আধিকারিক।

ডেবরা ব্লক যুবকরণের ব্যবস্থাপনায় এবং যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় গত ৬ই থেকে ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বালিচক হাইস্কুল মাঠে "ডেবরা ব্লক যুব উৎসব '৮২" খুবই উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধানসভার সদস্য শ্রীমোয়াজ্জম হোসেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীকালিদাস রায় বি.ডি.ও. ডেবরা ব্লক। যুব-উৎসবে ব্লকের প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ে যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সে জন্য ডেবরা ব্লকের ১৪টি অঞ্চলের প্রত্যেকটিতে ছোট করে যুব-উৎসব পালন করা হয়।

অঞ্চল-ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী প্রতিযোগীগণ মূল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীরা সরাসরি ব্লকের মূল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

উৎসবের দিনগুলিতে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। যুব-উৎসব চলাকালীন ব্লকের ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়।

কাঁথি—এই যুবকরণের উদ্যোগে ব্লক যুব উৎসব '৮২ সম্প্রতি (২৫—২৭ ফেব্রুয়ারী) শেষ হল। প্রাথমিক স্তরে ৮টি গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাই করে মূল ব্লক প্রতিযোগিতার আসরে সামিল করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাথমিক স্তরে প্রতিযোগীর সংখ্যা ক্রীড়া বিভাগে হয় ২৩৫০ জন। জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য অধ্যাপক শ্রীবরুণ গুছাইত যুব-উৎসব উদ্বোধন করেন। সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীঅনন্ত দাস। ইনি ছাত্র-যুব উৎসব কমিটির সভাপতিও ছিলেন।

শেষ দিনের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শ্রীঝাড়েশ্বর সিং। প্রধান অতিথি ছিলেন কাঁথি-৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীচিত্ত সাহু। শ্রীসিং সাংস্কৃতিক বিভাগের এবং শ্রীসাহু ক্রীড়া বিভাগের সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। দু'টি বিভাগের ব্লক

কাঁথি ব্লক যুব উৎসবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

স্তরে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ২৮০০ জন—এর মধ্যে ১৬২ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। ক্রীড়া বিভাগে নামাল কালীপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ ৩৮ পয়েন্ট পেয়ে বিজয়ী হয়। তথ্যচিত্র প্রদর্শনী এবং স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক নৃত্যনাট্য প্রদর্শিত হয়। এছাড়া পঞ্চায়েত সমিতির যাত্রানুষ্ঠানও বিশেষ আকর্ষণীয় হয়।

গত বছর ('৮১) জুলাই মাস থেকে পাঁচটি প্রশিক্ষণ শিবির (১৪ বছর পর্যন্ত) চালু করা হয়। এর মধ্যে তিনটি ফুটবল ও দু'টি কবাডির উপর। গত ৩০শে নভেম্বর '৮১ শিবির শেষ হয়। প্রশিক্ষণ দেন ফুটবলে শ্রীঅজয় গিরি, শ্রীবিশ্বম্ভর বেরা ও শ্রীকাঞ্চন জানা। কবাডিতে ছিলেন শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস। প্রত্যেকটি শিবিরে ৩৫ জন করে শিক্ষার্থী অংশ নেয়। শিক্ষার্থীদের প্রশংসাপত্র বিতরণ করা হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবির সুষ্ঠুভাবে চলার বিষয়ে স্থানীয় সংস্থাগুলি বিশেষভাবে সাহায্য করে।

মোহনপুর—অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও

[শেষাংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়]

পাঠকের ভাবনা

লিটল ম্যাগাজিন প্রসঙ্গে

যুবমানস, ডিসেম্বর '৮১ সংখ্যায় রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কিত প্রবন্ধটি সত্যই চিন্তার খোরাক যোগায়। এক্ষেত্রে আমরা (বিহার প্রবাসীরা) যদিও এখানে সংখ্যা-লঘু; তবুও রাঁচী, পাটনা, জামসেদপুর, ঘাট-শীলা, গোমো, ভাগলপুরে, ধানবাদ এসব জায়গায় বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতি যেরকম ভাবে হু-হু করে বাড়ছে, তাতে আমাদের আশান্বিত হবার কথা।

আমি বিহার ও অন্যান্য প্রবাসীদের সঙ্গে (অন্যান্য প্রদেশের) বঙ্গ সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে বিশেষভাবে যুক্ত। তবে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে কলকাতার দিকে। এর আনন্দে আমরা বিহ্বল হই, পুলকিত হই; আর কিছুমাত্র অবনতিতে আমাদের মাথা নিচু করতে হয় বিষাদে বা/এবং অপমানে। প্রবাসী বাঙালীরা এ ব্যাপারটি যথার্থ রূপে উপলব্ধি করবেন।

আমরা হাতে লেখা পত্রিকা, কবিতাবাসর, বাঙালী মনীষীদের জন্মজয়ন্তী পালন, বাংলা নাটক, উৎকৃষ্ট হিন্দী গল্পের বাংলায় অনুবাদ ও একটি দ্বি-মাসিক বাংলা পত্রিকা বের করে থাকি।

আমাদের এসব ব্যাপারে সুযোগ যদিও কম, তবুও আমরা হাল ছাড়ি নি কারণ, এখানে বাংলা বই ও পত্র-পত্রিকার ভীষণ অভাব (যদিও আমরা একটি ছোট বাংলা লাইব্রেরী শুরু করেছি)। পশ্চিমবাংলা ও অন্যান্য জায়গার লিটল ম্যাগাজিন, আমরা পেতে আগ্রহী অবশ্যই তা উপযুক্ত বিনিময়ের মাধ্যমে। সকলের সহযোগিতা, আশা করি আমাদের সহায় হবে।

যুবমানস যদি প্রবাসীদের পত্রিকাগুলির দোষ-ত্রুটি সমালোচনা করে, সঠিকপথে পরি-চালিত হবার সুযোগ দেয়, সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের পত্রিকা পাঠাতে রাজী আছি।

পার্থসারথি চক্রবর্তী
৩৮৭, তেঁতুলতলা কলোনী
ধানবাদ ৮২৬০০১
(সম্পাদক : জোনাকী)

রাজনৈতিক থিয়েটার

জানুয়ারী '৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রাজনৈতিক থিয়েটার কি ও কেন' শীর্ষক আলোচনাটির জন্য আলোচক দীপক চক্রবর্তীকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আসলে 'কলা হি কেবলম্' তত্ত্বের বুর্জোয়া প্রবক্তারা যতই তারস্বরে চিৎকার করুন না কেন, পৃথিবীর সমস্ত শিল্পকলাই কোন না কোন সামাজিক শ্রেণীর পক্ষে বা বিপক্ষে কথা বলে, সব শিল্পকলার মধ্যে Propaganda কখনও উচ্চকিত কলস্বরে কখনও বা অন্তঃসলিলা নদীর মতই প্রবহমান যা মানুষের বৌদ্ধিক বা আবেগ বৃত্তিকে ধাক্কা দিয়ে সচকিত করে ঘটনার প্রতি নিবিষ্ট করে রাখে—এই অর্থে শিল্প-সংস্কৃতি অবশ্যই আবশ্যিকভাবে সমাজ ভাবনা সম্পৃক্ত ও রাজনৈতিক, কেননা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের বহিঃস্থ ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব নেই, সমাজনীতি বা রাজনীতির অন্তঃপ্রবাহে বিধৌত হয়েই ব্যক্তি মানুষ তার সরব অস্তিত্ব ঘোষণা করে। মর্গান রাষ্ট্রভিত্তিক আধুনিক সমাজকে বলেছেন, Political Society, রাজনীতিকে এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে যেমন বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই, পক্ষান্তরে তেমনই এও বলা যায় রাজনীতি-নিরপেক্ষতার অর্থ existing system-এর সাথে অষ্টপ্রহর 'hobnobbing' করে তাকে অটুট অস্তিত্বে টিকিয়ে রাখা, যা এক ধরনের প্রবঞ্চনা তথা ভন্ডামি ছাড়া কিছুই নয়।

থিয়েটারের উদ্দেশ্য কী? ব্রেখট্ বলেছেন যে খণ্ডিত জীবনের চিত্র এঁকে মোহ সৃষ্টি করা থিয়েটারের উদ্দেশ্য নয়—বরং দর্শকদের মোহ-মুক্তি ঘটিয়ে বৃহত্তর সত্যের সন্ধানে নিয়ে যাওয়াই থিয়েটারের লক্ষ্য, মানুষকে তাদের অগ্রগতির পথ দেখিয়ে দিতে হবে এবং সেই অগ্রগতি যে আসবেই তেমন প্রত্যয়ও দর্শকদের মনে এনে দেওয়া দরকার, মোহ সৃষ্টি করে তা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ব্রেখ্টের মত পৃথিবীখ্যাত নাট্যকার পর্যন্ত অক্লেশে স্বীকার করেছেন যে থিয়েটারের প্রচারধর্মিতা অপরিহার্য, ব্রেখ্ট স্বয়ং বলেছেন— The theatre is the vehicle of social change.

নাজিম হিক্‌মত বলেছেন, "সেই শিল্প খাঁটি শিল্প, যার দর্শনে জীবন প্রতিফলিত হয়, তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে যা কিছু সংঘাত, সংগ্রাম আর প্রেরণা, জয় ও পরাজয় আর জীবনের ভালবাসা, খুঁজে পাওয়া যাবে একটি মানুষের সব কটি দিক, সেই সৃষ্টি, খাঁটি শিল্প যা জীবন সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা দেয় না"। পক্ষান্তরে, বিবরবাদী, বুর্জোয়া শিল্প প্রবক্তারা যা করছেন তা হচ্ছে নিছকই মানুষকে লোভাতুর করে হতাশায় আচ্ছন্ন করে নগ্ননারী দেহের বেসাতি, ফ্রয়েডীয় অবচেতনার তমসালোকে কামনার সুর-সুড়ি, যার উৎস রয়েছে পুঁজিবাদী বিশ্বের সামাজিক নীতি ও ন্যায়নীতির গভীর সংকট-মুখে—আর এটা করা হচ্ছে 'কলা হি কেবলম্' তত্ত্বের নিরিখে, ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই পেড়ে। কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপারটা কী? কড্‌ওয়েল তাঁর 'Studies in a Dying Culture' গ্রন্থে বলেছেন— Burgeoisdom crucifies liberty upon a cross of gold, and if you ask in whose name it does this, it replies, "In the name of personal freedom"—

ব্যক্তি স্বাধীনতা মানে ব্যক্তি পুঁজিভিত্তিক পণ্যোৎ-পাদন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার স্বাধীনতা, ব্যক্তি-মালিকানা ভিত্তিক শোষণ নিপীড়ন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার পক্ষে ওকালতি। আসলে ওটা প্রমাণিত সত্য যে, শিল্প-সংস্কৃতির কৃষ্টির মূলে ছিল শ্রমজীবী মানুষ, কিন্তু যেদিন থেকে সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটলো এবং কোনক্রমে তা বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ঘটালো, সেদিন থেকেই শিল্প-সংস্কৃতি পণ্যমূল্যে বিক্রিত ও বিকৃত হতে শুরু হলো আর শ্রমজীবী মানুষের স্থলে বুর্জোয়া শ্রেণীই শিল্প-সংস্কৃতির একচ্ছত্র নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ালো এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার মতবাদ হিসাবে তারা তাকে ব্যবহার করতে লাগল।

অভিনন্দন সহ
জাকির হোসেন
বর্ধমান

অভিনন্দন

'যুবমানস' শুধুমাত্র যুবসমাজের মুখপত্র নয়, প্রৌঢ় ঋতুর ফসল নয়, বর্তমান সমাজব্যবস্থার দর্পণ। শুধুমাত্র বিভিন্ন জেলার ক্রীড়ানুষ্ঠান নয়, যুব উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, সমস্ত কিছুরই নির্ভুল তথ্য প্রকাশের জন্য অভিনন্দন জানাই। সর্বোপরি তরুণ এবং নবীন লেখক-লেখিকাদের বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রকাশ এবং সুচিন্তিত মতামত প্রকাশের কলম 'পাঠকের ভাবনা'—যুবমানসের সার্থক প্রয়াস। আগামী দিনে 'যুবমানস' আরও বেশী আমাদের কথা ভাববে এই আশা রাখি।

মীরা মুখোপাধ্যায়
হিন্দু মহাবিদ্যালয়, গোবরডাঙ্গা,
২৪ পরগণা

[মৌমাছি চাষ : ১৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

আছে, সেখানে অক্টোবর মাসে বাক্স রাখলাম। আবার ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে চলে এলাম সরষে ক্ষেতে, তারপরে গেলাম সজনের জায়গায়......... এরকম।

—আচ্ছা, এইসব ফুল, সরষে, সজনে তো শহরে বেশি নেই। তা শহরে বা শহরতলীতে কি মৌমাছির চাষ সম্ভব?

—না, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সম্ভব নয়, শখ করে দু-একটা ছোট বাক্স করা চলতে পারে। আমি নিজে শহরে বাক্স দিয়েছিলাম, কিন্তু তা আবার ফেরৎ আনতে হয়েছে।

—তা, আপনি নিশ্চয়ই আপনার চাষ আরও বাড়াবার কথা ভাবছেন?

—হ্যাঁ, গতবার ঠিক সময় ঋণ শোধ করে দেওয়ায় ব্যাঙ্কের লোকেদের আমার ওপর একটা আস্থা এসেছে। আমি ভাবছি, এবার হাজার পাঁচেক টাকা ঋণ নিয়ে ফার্ম আরও অনেক বড় করব। এবং সেখানে আমার গ্রামের বেকার ছেলে-মেয়েদের কাজ দোব। মৌমাছি পালন এখন বিরাট লাভ-জনক, হাঁস-গরু পালনের থেকে ঝক্কিও কম। গ্রামে মানুষ দিন দিন গরীব হচ্ছে। ছেলেরা তবু ট্রেনে ফিরি করেও দু'চার পয়সা কামাতে পারে, কিন্তু মেয়েদের অবস্থা খুবই খারাপ। আমি আমার বোনকে এবং এই গ্রামেরই আরও ৭।৮ জন অবিবাহিতা মেয়েকে নিয়ে কাজ করে দেখেছি, এরা বাড়ির কাজ সামাল দিয়েও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মৌ-পালন করতে পেরেছে। এইভাবে, গ্রামে গ্রামে বেকার ছেলেমেয়েদের এই কাজে জড়াতে পারলে তাদেরও কিছুটা আর্থিক সুবিধে হয়, আর চাষের ফলনও বাড়ে। শুধু মৌমাছি পালনের মাধ্যমেই ফল (আম, জাম, লিচু) বা শস্যের ফলন ৪০ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে বাড়তি সার ছাড়াই।

—সরকার আপনাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারেন?

—সরকার কম সুদে (৩-৪%) গ্রামের গরীব ছেলেমেয়েদের ঋণ দিন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, মৌ-পালকরা ঋণ শোধ করে দিতে পারবেন; সেরকম লাভ এতে হয়। মৌমাছি চাষের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে কম দামে বাক্স সরবরাহ করুন, কম খরচে মাইগ্রেশনের ব্যবস্থা করে দিন (আজকাল লরি বা টেম্পোতে বাক্স নিয়ে মাইগ্রেশনে যাওয়া অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার) এবং পরিকল্পিতভাবে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগান। এছাড়া, কীটনাশক ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার, চাষীদের মধ্যে মৌমাছি সম্পর্কে ভুল ধারণা—এ-সব দিকেও নজর দেওয়া দরকার, ভালো প্রচার দরকার। এইসব কিছু কিছু হলে, শুধু মৌমাছি পালনেই গ্রামাঞ্চলে একটা লোকের সুন্দর জীবিকা হতে পারে এবং আগেও বলেছি, এতে ফসলের উৎপাদনও বাড়ে বহুগুণ।

(শক্তির উৎস জল : ২৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দামে এত তারতম্য। ভারতে এখন মোট ৮৭টি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। এদের মোট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা ১০ হাজার ৮৩২ মেগা-ওয়াট। সবচেয়ে বেশী নিহিত ক্ষমতা কর্ণাটকের সরাবতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রর, ৮৯১ মেগাওয়াট।

১৯৭৮-এ সম্পন্ন সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতে বছরে প্রায় ৪ হাজার কোটি ইউনিট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

[বিভাগীয় সংবাদ : ৩২ পৃষ্ঠার পর]

ব্লক যুব-উৎসব '৮২ বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হয়। উৎসব চলে ২৪ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। উৎসব উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুশীলকুমার দে। প্রধান অতিথি ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীবিভূপদ আচার্য। ক্রীড়া বিভাগে প্রতিযোগী ছিল ৯৬৬ জন এবং সাংস্কৃতিক বিভাগে ২৩৫ জন। এছাড়া ১৮টি দল একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করে। দু' বিভাগে প্রায় ১১০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার দেন শ্রীসুশীল কুমার দে। দলগত নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠদল, অভিনেতা ও অভিনেত্রীকেও পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীবিভূপদ আচার্য।

পুরস্কার বিতরণের পর বিভিন্ন বক্তা তাঁদের বক্তব্য রাখেন এবং স্থানীয় যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যুবকল্যাণ বিভাগের কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

গ্রাহক হতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৭ টাকা। ষাণ্মাসিক চাঁদা সডাক ৩·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যার দাম ৪০ পয়সা।

বিশেষ সংখ্যার জন্য কোন অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না। পত্রিকা প্রেরণের জন্য ডাক ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করবে।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

সহ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০০০১।

এজেন্সি নিতে হ'লে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০%
১৫০০-এর উর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০%
৫০০০-এর উর্ধ্বে	৪০%

১০টি সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

সহ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবি করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিক-গুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য বিজনেস ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

Reg. No. 32875/78

Postal Reg. WB/CC-15

গত ৩১শে মার্চ শিয়ালদহ উড়ালপুলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণদানরত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু

গত ১৭ই জুলাই মহাকরণে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ, দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনীগ্রন্থের জন্য শ্রী কৃষ্ণকৃপালনীর হাতে রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার তুলে দেন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
জুলাই, '৮২

উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি এবং পত্রিকা সম্পাদক :
সুভাষ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ : শংকর সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা-৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—চাঁরশ পয়সা

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

আলোচনা

প্রতিবেদন

কবিতা

শিল্প-সংস্কৃতি

লোকচিত্রকলা

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

খেলাধুলো

বইপত্র

বিভাগীয় সংবাদ

পাঠকের ভাবনা

কেন এই অবিচার ?

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণ ক্রমশঃই আমাদের কাছে বিসদৃশ ঠেকছে। সংসদের চলতি বর্ষাকালীন অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত বামপন্থী সদস্যরা এই সমস্ত অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই সময় বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর এবং দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর আলোচনাকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বক্তব্য থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে খুব একটা আগ্রহী নয়।

প্রথমতঃ ধরা যাক্ রাষ্ট্রপতির সম্মতির অপেক্ষায় ঝুলে থাকা বিভিন্ন বিলগুলির কথা। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গৃহীত অনেকগুলি বিল আজ অবধি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেল না। এই বিলগুলির মধ্যে 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ১৯৮০-র' মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিলও আছে। বিলটি ১৯৮০ সালের জুন মাসে কেন্দ্রের কাছে পাঠান হয়। কিন্তু দু' বছরের বেশী হয়ে গেল এখনও অনুমোদন মেলে নি। অথচ আলোচ্য বিলে এমন কয়েকটি ধারা আছে যার সাহায্যে পুরাতন কংগ্রেসী সরকারের শাসনে আইনের শিথিলতার সুযোগ নিয়ে জমির বৃহৎ মালিকেরা নানান কৌশলে অসৎভাবে যে বিপুল পরিমাণ জমি লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল সেই সব উদ্বৃত্ত জমির বেশ কিছু অংশ সরকারের হাতে ন্যস্ত হবে।

একদিকে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ২০-দফা কর্মসূচীতে সিলিং বহির্ভূত ন্যস্ত জমি বণ্টনের কাজ ত্বরান্বিত করার কথা বলছেন, অন্যদিকে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক্ষেত্রে সবচাইতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তার উদ্যমকে এইভাবে পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সহযোগিতা মোটেই আশানুরূপ নয়। কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে রাখা যেতে পারে। যেমন—

(১) বামফ্রন্ট সরকার রেলমন্ত্রকের কাছে পশ্চিমবঙ্গের নতুন রেলপথ নির্মাণ, চালু রেলপথের সম্প্রসারণ ইত্যাদি সম্পর্কে ঊনিশটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ রেলমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যসভায় জানালেন—দশটি প্রস্তাব আর্থিক অস্বচ্ছলতার অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সাতটি প্রস্তাব কার্যকর করা যায় কিনা তাই নিয়ে সমীক্ষা চলছে; একটা মঞ্জুর হয়েছে এবং মাত্র একটার কাজ শুরু হয়েছে।

(২) দ্বিতীয় হুগলী সেতু প্রকল্প আমাদের পরিবহণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। কিন্তু কেন্দ্র এই প্রকল্পের জন্য বর্ধিত খরচ ঋণ হিসাবে বহন করতে রাজী হয় নি। ফলে প্রকল্পটির ভবিষ্যত এখন অনিশ্চিত। কলকাতার লবণ হ্রদ এলাকায় ভারত ইলেকট্রনিকস্ লিঃ-এর একটি ইউনিট স্থাপনের উপরও কেন্দ্রীয় সরকার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নি।

(৩) হলদিয়ায় জাহাজ নির্মাণ প্রকল্প স্থাপনের জন্য সরকারী কমিটির দ্ব্যর্থহীন সুপারিশ কেন্দ্র নাকচ করে দিয়েছে। জাহাজ মেরামত প্রকল্প স্থাপনের জন্য দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকেও এখন কেন্দ্র দূরে সরে যাচ্ছে।

তৃতীয়তঃ, সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের নির্লিপ্ততা এখানকার জনগণকে একটা উদ্বেগজনক অবস্থায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। গত ২১শে জুলাই রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত বামফ্রন্টের সদস্যগণ পশ্চিমবঙ্গের উদ্বেগজনক খাদ্যপরিস্থিতির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, খাদ্যশস্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ক্রমবর্ধিত ব্যবধান পশ্চিমবঙ্গের বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা বিপন্ন করতে পারে।

উল্লেখ্য, সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী বণ্টন ব্যবস্থাই সব চাইতে বেশী সংগঠিত। রাজ্যের প্রায় এক কোটি মানুষ বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। বাকী মানুষের অধিকাংশকে সংশোধিত রেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। অনেক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকার সারা রাজ্যে সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা চালু রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই ব্যবস্থা না থাকলে খাদ্যের দাম আরও বাড়ত। সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার সাহায্যে বামফ্রন্ট সরকার খোলা বাজারে খাদ্যশস্যের দর কিছুটা আয়ত্বে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা চালু রাখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। অথচ কেন্দ্র সে দায়িত্ব পালন করছে না। শুধু তাই নয়, ১৯৮০ সালে কেন্দ্রে নতুন সরকার আসার পর পশ্চিমবঙ্গের সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার জন্য খাদ্যশস্য সরবরাহ নির্মমভাবে ছাঁটাই হয়েছে। চাহিদা ও বরাদ্দের মধ্যেই শুধু ব্যবধান বাড়ে নি, বরাদ্দ ও প্রকৃত সরবরাহের মধ্যে ব্যবধানও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তা ছাড়া নিকৃষ্ট মানের চাল সরবরাহ তো আছেই। কেন্দ্রের বরাদ্দ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক মাসে ১,৭৫,০০০ টন চাল ও ১,০০,০০০ টন গম পাবার কথা। এছাড়া ময়দা কলগুলির জন্য ৫৫,০০০ টন গম। অর্থাৎ এক মাসে মোট খাদ্যশস্য পাবার কথা ৩,৩০,০০০ টন। ১৯৮০ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত এই পরিমাণ খাদ্যশস্যই সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু তার পর থেকেই সরবরাহ কমতে শুরু করল।

গত দু'মাসে কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য সরবরাহ হয়েছে—চাল ১,৪০,০০০ টন; গম—৬০,০০০ টন এবং ময়দা কলগুলির জন্য গম—৩৫,০০০ টন; মোট—২,৩৫,০০০ টন। বরাদ্দের তুলনায় বিগত দু'মাসে মোট প্রকৃত সরবরাহ ১,৯০,০০০ টন কম।

একদিকে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যখন প্রচণ্ড খরা চলছে এবং তার ফলে খাদ্যশস্য সহ অত্যাবশ্যক সমস্ত জিনিসপত্রের দর হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে তখন কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরনের আচরণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আরও সংকটের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। খরাজনিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণ সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার উপর আরও বেশী করে নির্ভরশীল হচ্ছেন। রাজ্য সরকার নিজস্ব সংগতির ভিত্তিতেই খরা কবলিত জেলাসমূহে সংশোধিত রেশন দোকানগুলির জন্য খাদ্যশস্য সরবরাহ ১০ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রতি যে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছেন তাতে রাজ্যের এই সংকট আরও জটিল আকার ধারণ করছে। খরাক্লিষ্ট মানুষের দুর্গতিরোধে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সরবরাহ এবং আর্থিক সাহায্য করবেন বলে আমরা আশা রাখি। সেই সঙ্গে এ রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরী। আর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গৃহীত বিলগুলিরও অচিরেই রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ প্রয়োজন।

ভারতে বেকারী সমস্যার কয়েকটি দিক

১৯৭৭-৭৮ সালের মধ্যে কর্মপ্রার্থী শ্রমিক-সংখ্যা প্রতি বছর ৬৫ লক্ষ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে—কিন্তু আলোচ্য কালে এই বাড়তি কর্মপ্রার্থী-দের ১২ শতাংশ মাত্র সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ পেয়েছে, বাকি অংশ হয় কৃষিতে, নয় অন্য অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে থেকে গেছে, নয় বেকার-বাহিনীর কলেবর স্ফীত করেছে।"

কৃষিতে নিযুক্ত হবার অর্থ কৃষির ওপর চাপ বৃদ্ধি করা এবং কৃষিতে উদ্‌বৃত্ত শ্রমের সমস্যা ব্যাপকতর ও তীব্রতর করা।

ষষ্ঠ যোজনার সংশোধিত খসড়ায় সঠিক-ভাবেই মন্তব্য করা হয়েছে (পৃঃ ১৩২-৩৩) ১৯১১ এবং ১৯৭১ সালের মধ্যে সবগুলি আদমসুমারীর রিপোর্ট-এর প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, বৃহৎ ও সহায়ক কাঠামো ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও মোট শ্রম-শক্তিতে কৃষির অংশ আদৌ হ্রাস পায় নি—১৯১১ সালে এটা ছিল ৭১ শতাংশ এবং ১৯৭১ সালে ৭৩ শতাংশ।

১৯৮১ সালের সর্বশেষ আদমসুমারীর রিপোর্টে এই অনুপাত ৭২·১১ শতাংশ দেখানো হয়েছে।

দীনেশ রায়

সংশোধিত খসড়া আরও মন্তব্য করছে, প্রায় সমস্ত দেশেই অর্থনৈতিক বিকাশের তালে তাল রেখে কৃষিতে শ্রমশক্তির তাৎপর্যপূর্ণ হ্রাস ঘটেছে। ১৯৬৫-৭৫ সালে ১৩টি এশীয় দেশে এই অংশ হ্রাস পেয়েছে কিন্তু ভারতে বিগত ২৫ বছরের পরিকল্পিত বিকাশকালে অ-কৃষি-ক্ষেত্রের মোটামুটি দ্রুত অগ্রগতি সত্ত্বেও শ্রম-শক্তির বণ্টনের ওপর তার কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে নি। "৬ দশক ধরে মোট শ্রমশক্তিতে খনি ও কারখানা শিল্পের অংশ ৯·১০ শতাংশ থেকে গেছে।"

১৯৮১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে তৎকালীন যোজনা মন্ত্রী এন. ডি. তেওয়ারী দেখানোর চেষ্টা করেছিলেনঃ দেশের মোট শ্রমিক-সংখ্যার অ-কৃষি শ্রমিকের অনুপাত ১৯৫১ এবং ১৯৮১ সালের মধ্যে বেশকিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে—২৮·৩ শতাংশ থেকে ৩৩·৩ শতাংশ। বলা-ই বাহুল্য, মন্ত্রীর এই পরিসংখ্যান বিভ্রান্তিকর। উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই এমন কর্মীদেরও তিনি অ-কৃষি শ্রমিক হিসাবে গণ্য করেছেন। এদের মধ্যে আছে পুলিস, সেনাবাহিনী, ব্যবসা ও বাণিজ্য, পরিবহণ, স্টোরেজ ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত কর্মী, সরকারী আমলা ইত্যাদি। আমরা বলছি উৎপাদনশীল অ-কৃষি শ্রমিকের কথা—যার মধ্যে আছে কারখানা শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং খনি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারী—মোট শ্রমিক সংখ্যায় এই তিন অংশের অনুপাত ১৯৮১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ১১·২০ শতাংশ মাত্র।

শতাংশ হিঃ

খনি শিল্প	০·৫১
কারখানা শিল্প	৫·৯৪
অসংগঠিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	৩·৫২
নির্মাণকার্য	১·২৩
মোট	১১·২০

অর্থাৎ ৩৫ বছরে কারখানা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং খনিশিল্প মিলিয়ে কর্মসংস্থানের অনুপাত ৯—১১·২০ শতাংশ রয়ে গেছে।

যোজনা কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, কৃষির ওপর প্রধান জোর দেওয়া হয়েছে, তবে অ-কৃষি ক্ষেত্রকেও অবহেলা করা হয় নি। কিন্তু কৃষিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে—এ কথা কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃবৃন্দ বলতে পারেন কি? না, তা বলতে পারেন না।

ভারত সরকারের শ্রম দপ্তরের সমীক্ষা অনুযায়ী, ১৯৬৩-৬৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে দেশের খেতমজুরদের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পেয়েছে এবং কাজের সুযোগ সংকুচিত হয়েছে। এমন কি তথাকথিত "সবুজ বিপ্লব" এলাকাতেও বহু খেতমজুর উদ্বৃত্ত ঘোষিত হয়েছেন। দেশের ৭ কোটি খেতমজুরের বছরের ১২ মাসের মধ্যে ৬ মাসই কোনো কাজ থাকে না—বেকার জীবন-যাপন করতে হয়।

পরবর্তী বছরগুলিতে অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে।

যোজনা কমিশনের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনার সংশোধিত খসড়া কর্মসংস্থানের অবস্থার সঠিক বর্ণনা দিয়েছে। কিন্তু যোজনার জন্য সহস্র-সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করা সত্ত্বেও কাজের সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে কেন, বেকারীর ভয়াবহ প্রসার ঘটছে কেন—তার কোনো বিশ্লেষণ কমিশন দিতে পারে নি। সম্ভবত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ কারণে কমিশনের সদস্যগণ মনের কথা খুলে বলতে পারেন নি।

প্রকৃত ঘটনা হলো—১৯৬৫-৬৬ সালের পর থেকে শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল লগ্নীর হার আদৌ উল্লেখযোগ্য নয় এবং তার ফলেই শিল্প অর্থনীতিতে অচলাবস্থা চলছে—উৎপাদনের হার হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৫০ এবং ১৯৬০ দশকে উৎপাদনের বার্ষিক গড় হার ছিল ৮ শতাংশ, ১৯৭০ দশকে এটা ৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বৃহৎ ও ভারি শিল্প প্রকল্পগুলিকে কেন্দ্র করে সহায়ক পরিপূরক শ্রমনিবিড় শিল্প গড়ে তোলার যে সুযোগ ছিল তার এক-পঞ্চমাংশকেও কাজে লাগানো হয় নি। অনুন্নত এলাকাগুলিতে শিল্পের প্রসার ঘটানোর কোন একটি সংগঠিত ও সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা হয় নি এবং ফলে দেশের শিল্প বিকাশে আঞ্চলিক ভারসাম্য-হীনতার সমস্যা ব্যাপকতর ও তীব্রতর হয়েছে—

"কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চিত্র আদৌ সন্তোষ-জনক নয়। বিগত দশকে বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যার তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি ঘটেছে। অতএব উক্ত পটভূমিতে আমাদের কর্মসংস্থানের নীতির দুটি প্রধান লক্ষ্য হবেঃ লাভজনক কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্ধবেকারী হ্রাস করা এবং চিরা-চরিত স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে, সাধারণভাবে পরিচিত প্রকাশ্য বেকারী হ্রাস করা" (যোজনা কমিশনঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনা, ১৯৮০-৮৫—মুখবন্ধ)।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩৫ বছর এবং তথাকথিত পরিকল্পিত অর্থনীতির ৩২ বছর বাদে পরি-কল্পনার রচয়িতাদের স্বীকার করতে হচ্ছে যে, বেকারী ও অর্ধবেকারীর উদ্বেগজনক প্রসার ঘটেছে। অথচ বেকারী ও অর্ধবেকারী হ্রাস এবং অবশেষে সমাজজীবন থেকে পূর্ণ বিলোপ ছিল প্রত্যেকটি পঞ্চবার্ষিকী যোজনার ঘোষিত লক্ষ্য। পুঁজিবাদী যোজনার সীমাবদ্ধতা এবং ব্যর্থতা এই স্বীকৃতির মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

আমরা এ বিষয়ে সচেতন যে, বর্তমান বুর্জোয়া-ভূস্বামী-রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সমাজ-জীবন থেকে বেকারীর পূর্ণ উৎখাত সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়, তা আমরা একাধিক রচনায় দেখিয়েছি। কিন্তু সেই সাথেই আমরা এ-কথাও মনে করি যে, প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ইচ্ছা থাকলে বর্তমান কাঠামোতেও অতিরিক্ত কাজ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারী ও অর্ধ-বেকারী হ্রাস করা এবং জনসাধারণের চরম দুর্দশার কিছুটা লাঘব করা সম্ভব। ভারত সরকারের কর্ম-সংস্থানের নীতি ও কার্যক্রম আমরা এখানে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখার চেষ্টা করছি।

কাজের ক্ষেত্র ও সুযোগ সংকুচিত

যোজনা কমিশন একটি দলিলে আরও স্বীকার করেছে, বেকার সংখ্যার আপেক্ষিক ও সামগ্রিক বৃদ্ধিই শুধু ঘটে নি, কাজের ক্ষেত্র ও সুযোগও প্রভূত সংকুচিত হয়েছে।

জনতা শাসনকালে রচিত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনার সংশোধিত খসড়া, ১৯৭৮-৮৩, বলছেঃ ১৯৬১ এবং ১৯৭৬ সালের মধ্যে আধুনিক কারখানার ক্ষেত্রে লগ্নী বেড়েছে ১৩৯ শতাংশ, উৎপাদন বেড়েছে ১৬১ শতাংশ, কিন্তু কর্ম-সংস্থান বেড়েছে মাত্র ৭১ শতাংশ। "অতএব এক ইউনিট মোট উৎপাদন-প্রতি, এবং এক ইউনিট মূলধন লগ্নী-প্রতি কর্মসংস্থান যথাক্রমে শতকরা ৩৪ ভাগ ও শতকরা ২৮ ভাগ হ্রাস পেয়েছে" (যোজনা কমিশন ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনার সংশোধিত খসড়া, ১৯৭৮-৮৩, পৃঃ ১৩২)।

উৎপাদন বৃদ্ধি পেল, লগ্নীও বৃদ্ধি পেল, কিন্তু এই উৎপাদন ও লগ্নী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংগঠিত কারখানা-ক্ষেত্রে কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধি পেল না, বরং তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেল। যোজনা কমিশন এই ঘটনার কোনো বিশ্লেষণ দেয় নি।

ষষ্ঠ যোজনার সংশোধিত খসড়ায় আরও স্বীকার করা হয়েছেঃ "১৯৬৭-৬৮ এবং

শিল্পের বিকৃত বিকাশ ঘটেছে। সামগ্রিক ফল হিসাবে সংগঠিত এবং অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রেই কাজের সুযোগ সংকুচিত হয়েছে।

শিল্পের বিকাশে আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধির বাস্তবতা যোজনা কমিশনকেও স্বীকার করে নিতে হয়েছে। অনেক সরকারী কমিশন এবং কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে। এরা অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমর্থনযোগ্য সুপারিশও করেছে। কিন্তু কোনো কাজ হয় নি। ভারসাম্যহীন অবস্থার ওপর এই সব সুপারিশ কোনো রেখাপাত করে নি।

কৃষির ক্ষেত্রেও বহু সহস্র কোটি টাকা বিভিন্ন যোজনাকালে ঢালা হয়েছে। কিন্তু এই আর্থিক সম্পদের বড় অংশটাই কব্জা করেছে বৃহৎ ভূস্বামিদল। ফলে কৃষিরও একপেশে অগ্রগতি হয়ে, কৃষির ওপর চাপ বেড়েছে এবং কৃষিতে উদ্‌বৃত্ত শ্রমের সমস্যা তীব্রতর ও ব্যাপকতর হয়েছে। এক কথায়, গ্রামাঞ্চলে মূলতঃ অর্ধ-বেকারীর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে গ্রামীণ বেকারী হ্রাসের বিভিন্ন কর্ম-সূচীর জন্য যে শতশত কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে তার বড় অংশটাই হয় জলে নয় দুর্নীতির গহ্বরে গেছে। বেকারেরা যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেছেন।

একটিমাত্র যেটিকে বেকারীর বিরোধী প্রকল্প —কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী (যা ১৯৮০-৮১ সাল থেকে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্ম-সূচী নামে পরিচিত), তাকেও সংগঠিত ও সুপরিকল্পিতভাবে বাতিল করার তোড়জোড় চলছে।

এই কর্মসূচী রূপায়ণের মাধ্যমে সারা দেশে শ্রমদিবস সৃষ্টির সংখ্যা (লক্ষ হিঃ):

১৯৭৭-৭৮—	৪৪৪·৩৪
১৯৭৮-৭৯—	৩৫৩৮·৪৬
১৯৭৯-৮০—	৫৮১৭·২৮
১৯৮০-৮১	৩২৮৪·৮৪
১৯৮১-৮২—	৬৭৫·৪০

(রাজ্যসভা : প্রশ্নোত্তর, ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮২।

১৯৭৭-৭৮, ১৯৭৮-৭৯ এবং ১৯৭৯-৮০ এই তিন বছরে প্রতি-বছরই শ্রমদিবস সৃষ্টির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ১৯৭৯-৮০ সালের পর থেকে কেন্দ্র কর্তৃক খাদ্যশস্য সরবরাহ হ্রাস করার দরুন শ্রমদিবস সৃষ্টির সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮১-৮২ সাল থেকে কেন্দ্র খাদ্যশস্য সরবরাহ কার্যতঃ বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ যোজনা কমিশন ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় (১৯৮০-৮৫) ঘোষণা করেছে, যোজনার ৫ বছরে ৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৮০ হাজার নতুন কাজ সৃষ্টি করা হবে—এবং এই যোজনার শেষে ১ কোটি ২০ লক্ষ ২ হাজার যুবক বেকার থাকবেন।

আমরা কেন্দ্রীয় সরকার এবং যোজনা কমিশনের কাছে জানতে চাই, যোজনার কোনো অস্তিত্ব আছে কি? বস্তুত, ষষ্ঠ যোজনায় ঘোষিত অনেক লক্ষ্য ইতিমধ্যেই অবাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী বলেছেন, ষষ্ঠ যোজনায় ঘোষিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণ হবে না। বিরতিহীন মুদ্রাস্ফীতি অনেকগুলি প্রকল্পের খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে। যোজনার নামে জনসাধারণের ওপর বোঝার পর বোঝা চাপিয়ে যে সম্পদ সংগ্রহ করা হচ্ছে তার একটা বড় অংশ যোজনা-বহির্ভূত খাতে, প্রধানত রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক এবং আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা জোরদার করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে রেজেস্ট্রিভুক্ত বেকারের সংখ্যার উদ্বেগজনক প্রসার ঘটছেঃ ১৯৭১-এ ৫১ লক্ষ, ১৯৮১ সালের মার্চ মাসের শেষে—১·৭৮ কোটি, অর্থাৎ ১০ বছরে সাড়ে তিনগুণ বৃদ্ধি। ১৯৮১ সালে কর্মনিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে নতুন ১৬ লক্ষ যুবক তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেন। একই বছরে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে মাত্র ৪ লক্ষ যুবক কাজ পেয়েছেন। কাজের সুযোগ কীভাবে সংকুচিত হচ্ছে তার এটা একটা দৃষ্টান্ত।

১৯৮১ সালে ভারতের সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মীর সংখ্যা ছিল ২২৯·১৮ লক্ষ; এর মধ্যে কারখানা শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ৬০·৪০ লক্ষ মাত্র। যোজনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, ১৯৮০ সালে বেকার ও অর্ধবেকারের মোট সংখ্যা ৩,২৭,৬০,০০০। বেসরকারী হিসাব অনুযায়ী এই সংখ্যা ৬ কোটির কম হবে না। ১৯৮০ সালে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাধারী বেকারের সংখ্যা ছিল ৮১ হাজারেরও বেশি।

কেন্দ্রীয় সরকার যে রাস্তায় চলেছে তাতে আগামী দিনে বেকারী সমস্যা আরও তীব্র আরও ব্যাপক হবে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনা বেকারী সমস্যার প্রান্তভাগও স্পর্শ করবে না

এতক্ষণ ভারতের বেকার সমস্যার কয়েকটি দিক্‌ তুলে ধরা হ'ল। এখন ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় (১৯৮০-৮৫) সমস্যার মোকাবিলার যে দাওয়াই বাতলানো হয়েছে তার ওপর কয়েকটি সমালোচনামূলক মন্তব্য করা হচ্ছে।

সমাজতন্ত্রই একমাত্র সমাজজীবন থেকে বেকারী ও দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন করতে সক্ষম এটা নিছক তত্ত্বগত বক্তব্য নয়। শোষণ-মুক্ত, বেকারী-মুক্ত, দারিদ্র্য-মুক্ত এবং মুদ্রাস্ফীতি-মুক্ত সমাজব্যবস্থা কায়েম করে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এটা সুপ্রমাণিত করে দিয়েছে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্‌ ও রাজনীতিবিদ্‌দের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং অপপ্রচার ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে আরও উন্নত, আরও বিকশিত সমাজজীবন গঠনের পথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে।

আমরা এখানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কীভাবে দারিদ্র্য ও বেকারী উৎখাত করেছে তা নিয়ে আলোচনা করছি না। বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর চৌহদ্দির মধ্যেও বেশ কিছু সংখ্যক অতিরিক্ত কাজ সৃষ্টি করা এবং তার মাধ্যমে জনসাধারণের চরম দুর্দশা কিছুটা লাঘব করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। কিন্তু সেটা করতে হলেও কায়েমী স্বার্থকে আঘাত করতেই হবে। তা ছাড়া, উন্নয়নমূলক কর্ম-তৎপরতার প্রক্রিয়ায় জনসাধারণকে সক্রিয়ভাবে টেনে আনতে হবে। দেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত উন্নয়নমূলক কাজে এমনভাবে লগ্নী করতে হবে যাতে উন্নয়নমূলক কর্মতৎপরতার সুফলের একটা বড় অংশ জনসাধারণের হাতে গিয়ে পৌঁছায়। এই উন্নয়নমূলক কর্মতৎপরতার সুফল যাতে ক্রমবর্ধিত হারে দেশের অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে তাও সুনিশ্চিত করতে হবে। এক কথায় অর্থনৈতিক বিকাশে ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের সুদৃঢ় ব্যবস্থা নিতে হবে। যোজনা কমিশন তার একটি দলিলে (ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনার সংশোধিত খসড়া, ১৯৭৮-৮৩) স্বীকার করেছে, পঞ্চবার্ষিকী যোজনাগুলি দেশের ধন-সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস করতে সক্ষম হয় নি, মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে ধন-সম্পদ কেন্দ্রীভবনের গতি রোধ করা যায় নি। যোজনা কমিশন অবশ্য এই অবস্থার গভীরে প্রবেশ করে নি—প্রবেশ করা বিভিন্ন কারণে তার পক্ষে সম্ভবও নয়, কারণ তাকে এক বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চৌহদ্দির মধ্যে যোজনা রচনা করতে হয়।

অর্থনৈতিক বিকাশে ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা এবং এই বৈষম্য হ্রাসের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি যোজনা দলিলেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বৈষম্য বেড়েই চলেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও যোজনা কমিশনের অনুসৃত ভ্রান্ত অর্থনৈতিক নীতিসমূহ এবং লগ্নী, সঞ্চয় ইত্যাদির অগ্রাধিকার সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাসমূহ (যার কারণগুলি বুর্জোয়া-ভূস্বামী-রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে), দেশের অর্থনৈতিক বিকাশকে বিকৃত করেছে।

ষষ্ঠ যোজনা ও বেকার সমস্যা

উপরোক্ত পটভূমিতেই বেকার সমস্যার মোকাবিলার প্রশ্নে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় ঘোষিত যোজনা কমিশন এবং কেন্দ্রের শাসক-দলের ধ্যানধারণাগুলি আমাদের বিবেচনা করতে হবে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনা, ১৯৮০-৮৫তে, বেকার সমস্যার প্রশ্নে যে কথাগুলি বলা হয়েছে তার সঙ্গে জনতা শাসনে রচিত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনার সংশোধিত খসড়া ১৯৭৮-৮৩-র শতকরা ৯৯·৯ ভাগই মিল আছে।

ষষ্ঠ যোজনায় বেকারীর মোকাবিলা সম্পর্কে যে দাওয়াই বাতলানো হয়েছে এবারে আমরা তা পরীক্ষা করে দেখতে চাই। এই পরীক্ষার ভিত্তিতেই উক্ত দাওয়াই সম্পর্কে আমাদের সমালোচনামূলক বক্তব্য উপস্থিত করার চেষ্টা হবে।

দেশের বেকারী সমস্যার পরিমাণ

বেকারদের কোনো নির্ভরযোগ্য সামগ্রিক পরিসংখ্যান নেই। ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত যোজনা কমিশন প্রত্যেকটি যোজনা চালু করার প্রারম্ভে দেশে মোট বেকারের এক হিসাব প্রকাশ করত। কিন্তু হিসাব নির্ভরযোগ্য নয়, এই কারণে ১৯৬৫-৬৬ সালের পর তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যোজনা কমিশন এক বিশেষজ্ঞ-কমিটি (দান্তেওয়ালা কমিটি) নিয়োগ করে। কমিটিও অভিমত দেয়, বেকারী সম্পর্কে প্রকাশিত পরিসংখ্যান নির্ভরযোগ্য নয়—এই পরিসংখ্যান হয় সমস্যাকে বড় করে নয় ছোট করে দেখায়। পরিসংখ্যান তৈরির পদ্ধতি উন্নত করার জন্য কমিটি কয়েকটি সুপারিশ করে এবং বলে, উন্নততর পদ্ধতি তৈরি সাপেক্ষে বেকারীর পরিসংখ্যান প্রকাশ বন্ধ রাখা হোক।

সেই অনুযায়ী যোজনা কমিশন ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ বন্ধ রেখেছিল। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, ৩২তম পর্যায়ের ভিত্তিতে ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে যোজনা কমিশন বেকারীর নতুন পরিসংখ্যান প্রকাশ শুরু করে। এই প্রসঙ্গে আসার আগে, সমস্যার গভীরতা ও ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার শেষ থেকে শুরু করে পঞ্চবার্ষিকী যোজনার শেষ অবধি বেকারীর কিছু পরিসংখ্যান নিচে উপস্থিত করা হচ্ছে।

যোজনার শেষে বেকারের সংখ্যা

প্রথম যোজনা (১৯৫৬)—৫৩,০০,০০০; দ্বিতীয় যোজনা (১৯৬১)—৭১,০০,০০০; তৃতীয় যোজনা (১৯৬৬)—৯৬,০০,০০০; (রিজার্ভ ব্যাংক বুলেটিন, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ২১শে নভেম্বর, ১৯৮০।

তিনটি বার্ষিক যোজনা (১৯৬৮)—১,২৬,০০,০০০; চতুর্থ যোজনা (১৯৭৩)—১,৭১,০০,০০০; পঞ্চম যোজনা—২,২১,০০,০০০। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনা শেষ হবার পর বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ বা নির্দেশ অনুযায়ী যোজনা ছুটি ঘোষণা করা হয়—১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮—এই তিন বছর পঞ্চবার্ষিকী যোজনার স্থান গ্রহণ করে বার্ষিক-যোজনা। উল্লেখ্য, এই তিন বছর ছিল চরম মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতির বছর। মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা পাশাপাশি চলেছিল।

১৯৭৩ পর্যন্ত সরকারী অথবা যোজনা কমিশনের হিসাব নির্ভরযোগ্য নয় বলে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৮ সালের হিসাবটি যোজনা কমিশন কর্তৃক জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, ২৭তম পর্যায়ের ভিত্তিতে রচিত। ১৯৭৮ সালের হিসাবে অর্ধবেকারীর পরিসংখ্যানও পড়ে। উপরোক্ত হিসাব নির্ভরযোগ্য না হলেও বেকারী বৃদ্ধির একটা মোটামুটি চিত্র এর মধ্যে পাওয়া যায়। পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী যোজনা এবং তিন বছরের তিনটি বার্ষিক যোজনাকালে দেশে বেকারের সংখ্যা ৫৩ লক্ষ থেকে বেড়ে ২ কোটি ২১ লক্ষ হয়েছে, অথবা ৪ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এবারে আমরা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনা, ১৯৮০-৮৫, দেশের বেকার সমস্যার যে মূল্যায়ন করেছে তা বিচার-বিবেচনা করে দেখতে চাই।

যোজনা কমিশন বেকারদের তিন ভাগে ভাগ করেছেঃ (১) চিরাচরিত স্ট্যাটাস; (২) সাপ্তাহিক স্ট্যাটাস; এবং (৩) দৈনিক স্ট্যাটাস।

(১) প্রকাশ্য অবথা পূর্ণ বেকারদের চিরাচরিত স্ট্যাটাসের বেকার বলা হচ্ছে; (২) সাপ্তাহিক স্ট্যাটাসের বেকার তাঁরাই যাঁরা সমীক্ষা পরিচালনার সপ্তাহে ১ ঘণ্টার কাজও সংগ্রহ করতে পারে নি; (৩) দৈনিক স্ট্যাটাসের বেকার তাঁরাই যাঁরা সমীক্ষার সপ্তাহে একদিন বা একাধিক দিন বেকার ছিলেন।

বোঝার সুবিধার জন্য আমরা চিরাচরিত স্ট্যাটাসের বেকারদের পূর্ণ বেকার এবং সাপ্তাহিক স্ট্যাটাসের ও দৈনিক স্ট্যাটাসের বেকারদের অর্ধ-বেকার আখ্যা দিচ্ছি। যোজনা কমিশনও এটাই বোঝাতে চেয়েছে।

১৯৮০ সালে বেকারীর ব্যাপকতা

(১) মোট শ্রমিকশক্তি— ২৬,৮০,০৫,০০০
(২) পূর্ণ বেকার— ১,২০,০২,০০০
(৩) অর্ধ-বেকার (১)— ১,২১,৮০,০০০
(৪) অর্ধ-বেকার (২)— ২,০৭,৪০,০০০

১৯৭৭-৭৮ এবং ১৯৮০ সালের মধ্যে মোট শ্রমশক্তিতে পূর্ণ বেকারের অনুপাত ৪·২৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪·৪৮ শতাংশ হয়েছে।

(যোজনা কমিশন, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনা, ১৯৮০-৮৫)। অতএব দেখা যাচ্ছে ১৯৭৭-৭৮ সালের পরও বেকারী বৃদ্ধির গতি অব্যাহত আছে। ১৯৮০ সালে মোট শ্রমশক্তিতে অর্ধ-বেকারের (১+২) অনুপাত ছিল ১২·২৮ শতাংশ। এই হিসাব অনুযায়ী ১৯৮০ সালে দেশের মোট শ্রমশক্তির শতাংশ হিসাবে বেকার ও অর্ধবেকারের মোট অনুপাত ১৬·৭৬ শতাংশ। সংখ্যা নিম্নরূপঃ

পূর্ণ বেকার— ১,২০,০২,০০০
অর্ধ বেকার (১+২)—৩,২৯,০২,০০০
মোট বেকার— ৪,৪৯,০৪,০০০

অর্থাৎ বুর্জোয়া-ভূস্বামীদের শাসকদলগুলির অর্থনৈতিক নীতিসমূহের দৌলতে দেশের মোট শ্রমশক্তির মধ্যে প্রায় ৪·৫ কোটি মানুষ হয় সম্পূর্ণ বেকার, নয় অর্ধ বেকার। ৩২ বছরের তথাকথিত "পরিকল্পিত অর্থনীতির" এটাই হলো ব্যালেন্স শিট।

আমরা বলছি, এ পরিসংখ্যানও নির্ভরযোগ্য নয়। দেশের কয়েক কোটি ক্ষেতমজুর, বর্গাদার, হস্তশিল্পী এবং সমাজের অন্যান্য দুর্বল অংশের মানুষের বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১৫০-২২৫ দিনের বেশি কাজ থাকে না। আমরা মনে করি, এ'দেরকেও অর্ধ-বেকার হিসাবে গণ্য করা উচিত। শহরাঞ্চলেও পূর্ণ বেকার সমস্যাই শুধু নেই—অর্ধ-বেকারের সমস্যাও রয়েছে। কারখানা ক্লোজার, ছাঁটাই ও লে-অফের দরুন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী মাঝে-মাঝেই সাময়িক কালের জন্য বেকার জীবনযাপন করেন; এ'দের অর্ধ-বেকার বলা হবে না কেন? সব কিছু মিলিয়ে এটা বলা অতিশয়োক্তি হবে না যে, দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা অন্ততঃ ৩০ ভাগই হয় বেকার, নয় অর্ধ-বেকার।

তবে এখানে আমরা যোজনা কমিশন পরিবেশিত পরিসংখ্যানকেই ভিত্তি করছি। কারণ পরিসংখ্যানের এই একটিই মাত্র উৎস; এই উৎসকেই সম্বল করতে হবে।

ষষ্ঠ যোজনা কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে?

এখন (১৯৮০), দেশের, কর্মক্ষম শ্রমিক-সংখ্যা ২৬ কোটি ৮০ লক্ষ ৫ হাজার; ১৯৮০-৮৫ সালের মধ্যে ৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৪০ হাজার অতিরিক্ত কর্মক্ষম লোক চাকুরির বাজারে প্রবেশ করবেন। ১৯৮০ সালে পূর্ণ বেকারের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ ২ হাজার। অতএব পূর্ণ বেকারীর উৎখাতের জন্য ষষ্ঠ যোজনাকালে ৪ কোটি ৬২ লক্ষ ৬০ হাজার অতিরিক্ত কাজ সৃষ্টি করতে হবে। যোজনা কমিশন ৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৮০ হাজার অতিরিক্ত কাজ সৃষ্টির লক্ষ্য রেখেছে। অতএব ষষ্ঠ যোজনার শেষেও ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৮০ হাজার কর্মক্ষম লোক বেকার থেকে যাবেন। এক কথায়, ষষ্ঠ যোজনার লক্ষ্য যদি পূরণও হয় (যার আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই) তাহলেও যে সংখ্যক পূর্ণ বেকার নিয়ে যোজনা শুরু হয়েছিল, যোজনার শেষে প্রায় সেই সংখ্যক লোকই বেকার থেকে যাবেন।

১৯৮৫ সালের শেষে যে চিত্র দাঁড়াবে

পূর্ণবেকার (মিলিয়ন হিঃ;
১ মিলিয়ন=১০ লক্ষ)

(১) ১৯৮০ সালে পূর্ণ বেকারের সংখ্যা—১২·০২
(২) নতুন কর্মপ্রার্থী (১৯৮০-৮৫) —৩৪·২৪
(৩) মোট বেকার (১+২)—৪৬·২৬
(৪) অতিরিক্ত কাজ সৃষ্টির লক্ষ্য (১৯৮০-৮৫)—৩৪·২৮
(৫) যোজনার শেষে (১৯৮৫) বেকারের সংখ্যা—১১·৯৮

যোজনা কমিশন বলছেঃ অতিরিক্ত কাজ সৃষ্টিতে কৃষির অবদান থাকবে ৪৩·৫ শতাংশ; বাণিজ্য, পরিবহণ, যোগাযোগ এবং সার্ভিস ক্ষেত্রের অংশ ৩৩·৩ শতাংশ এবং খনি, কারখানা শিল্প ও নির্মাণকার্যের অংশ ২৩·২ শতাংশ।

উল্লেখ্য, এখন দেশের সংগঠিত ক্ষেত্রের মোট কর্মীর শতকরা ১২ জন মাত্র খনি, কারখানা-শিল্প এবং নির্মাণকার্যে নিযুক্ত। এই অনুপাত

[শেষাংশ ৯ পৃষ্ঠায়]

রামেন্দ্রসুন্দর ঃ আদর্শবাদী বিজ্ঞান সাধক

ডঃ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাসম্ভার একালেও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে বিপুল জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছিল তার থেকে রামেন্দ্রসুন্দর যেন অনায়াসে জ্ঞানের বিষয়-গুলি সংগ্রহ করে বাংলা ভাষায় সুচারুরূপে পরিবেশন করে দিয়েছেন। এই দুরূহ কর্তব্যভার গ্রহণ করার মত ক্ষমতা এবং যোগ্যতা তাঁর ছিল। এই কারণেই বাংলা ভাষার যেমন শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, তেমনি বাঙালীর জীবনসাধনায় এসেছে গভীরতা।

'প্রকৃতি' (১৮৯৬), 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪), 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০ সালে প্রকাশিত) ও 'জগৎ-কথা' (১৯২৬ সালে প্রকাশিত)—এই চারখানি সৃজনধর্মী বিজ্ঞানগ্রন্থ রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-সাধনার সার্থক ফসল। এছাড়া বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত না হলেও প্রবন্ধগুলির বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। রামেন্দ্রসুন্দরের এই বিপুল রচনাসম্ভারের যথার্থ মূল্যায়ন আজও আমরা দায়িত্ব নিয়ে করতে পারি নি। বিজ্ঞান-দর্শনের জটিল বিষয়গুলিকে উপমা-রূপকে, হাস্যে-পরিহাসে রস-ঘন করে তোলবার আশ্চর্য দক্ষতা তাঁর ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর জানতেন যে কেমন করে গুরুগম্ভীর বিষয়কে হাল্কা করে তুলতে হয়। কেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি ঘটনা কার্যকারণের সূত্রে নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সে সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দরের বিবরণ হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত আমাদের হৃদয়-মনকে আবিষ্ট করে তোলে:

"জগতে কিছু-না-কিছু ঘটিতেছে, এটার পর ওটা ঘটিতেছে, যাহা যেরূপ ঘটিতেছে তাহাই নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়মের আর কোনো তাৎপর্য নাই। এই নিয়ম দেখিয়া বিস্ময়ের কোন হেতু নাই। এই ঘটনাই বরং আশ্চর্য—একটা কিছু যে ঘটিতেছে, ইহাই বিস্ময়ের বিস্ময়। জগৎ ঘটনার প্রয়োজন কি ছিল, ইহা ঘটেই বা কেন, ইহাই বিস্ময়ের বিস্ময়। ইহার উত্তরে অজ্ঞানবাদী বলেন, জানি না; ভক্ত বলেন, ইহা কোন অঘটন-ঘটনা পটুর লীলা; বৈদান্তিক বলেন, আমিই সেই অঘটন-ঘটনায় পটু—আমার ইহাতে আনন্দ; বৌদ্ধ একেবারে চুকাইয়া দেন ও বলেন, কিছুই ঘটে নাই।" (নিয়মের রাজত্ব ঃ জিজ্ঞাসা)

রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক সত্তার স্বরূপ সন্ধান করলে এটুকু বুঝতে পারি যে তিনি আজীবন বিজ্ঞানচর্চায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। তবে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহাকে আমরা যে অর্থে বৈজ্ঞানিক হিসাবে জানি ও বুঝি, রামেন্দ্রসুন্দর সেই অর্থে বৈজ্ঞানিক নন। এ-সব মনীষীরা প্রকৃতিতে বিদ্যমান নানা বিষয়, বস্তু ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে নানা ধরনের পরীক্ষা চালিয়েছেন, নতুন নতুন প্রকল্প ও সিদ্ধান্ত টেনেছেন; নতুন আবিষ্কারের পথপ্রদর্শক হিসাবে তাঁদের খ্যাতি। প্রকৃতিতে বিদ্যমান বিষয় ও বস্তু-গুলি সম্পর্কে তাঁরা যে উচ্চতর তাত্ত্বিক জ্ঞানের সৌধ গড়ে তুলেছিলেন তাতে বৈজ্ঞানিক মূল-নীতি, স্বীকার্য ও নিয়ম প্রামাণিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে রামেন্দ্রসুন্দর এই গৌরবের অংশীদার নন। তবে বিজ্ঞানসাধকের মূল লক্ষ্য যদি হয় উন্নত জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতি জগতের স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং বিজ্ঞান বিদ্যার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিজগতের রূপান্তর সাধন তাহলে রামেন্দ্রসুন্দরকে আমরা বিজ্ঞানী বলতে পারি। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষালব্ধ প্রামাণিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জগৎ ও জীবনের সত্য অনুসন্ধান করতে রামেন্দ্রসুন্দর যে সদা-সতর্ক তা তাঁর লেখায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠে:

"বিশ্বজগতের মধ্যস্থলে আমি বসিয়া আছি, এবং বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে সহস্র সমাচার আমার ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রবেশ করিয়া আমার অভিজ্ঞতা বর্ধিত করিতেছে। আমি নিরীক্ষণ করিতেছি; আমি সাক্ষী; আমি যাহা দেখিতেছি তাহা চিত্ত-পটে আঁকিয়া রাখিতেছি—এবং প্রয়োজনমত তাহা আমার কাজে লাগাইতেছি। কাজ কি না, জীবন-রক্ষা। রূপরসাদি প্রবাহ আমার চিত্তপটে রেখা টানিয়া যাইতেছে। তাহার সাহায্যে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট করিয়া লইতেছি। অতএব আমি বৈজ্ঞানিক।" (মায়াপুরী ঃ জিজ্ঞাসা)

সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, বৈজ্ঞানিক যে পদ্ধতি অবলম্বন করে গবেষণা চালিয়ে জগৎ ও জীবনের নানা বিষয় ও বস্তুর মর্মলোক উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হন, রামেন্দ্রসুন্দর সেই পদ্ধতি গ্রহণ করেই জগৎ ও জীবনের তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। প্রকৃত অর্থে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করার জন্যে রামেন্দ্র-সুন্দর আজীবন সাধনা করেছেন। এই বৈজ্ঞানিক মানসিকতাই রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনসাধনার প্রকৃত ঐশ্বর্য। আইনস্টাইন মন্তব্য করেছিলেন:

"Of course, not everybody who has learnt to use tools and methods which, directly or indirectly, appear to be "scientific" is to me a man of science. I refer only to those individuals in whom scientific mentality is truely alive."

তাই বিজ্ঞান সাধনার মর্মলোকে অনুপ্রবেশ করে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই রামেন্দ্রসুন্দরকে আমরা বিজ্ঞানসাধক বলতে পারি।

বিচার্য এই নয় যে রামেন্দ্রসুন্দর একজন প্রথমশ্রেণীর বিজ্ঞান লেখক। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সুসজ্জিত হয়ে, নিজের দৃষ্টিভঙ্গীকে বৈজ্ঞানিক মননশীলতায় শাণিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান ও জীবনের সাধনাকে একই আলোকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রশ্ন হল, আমরা কিসের জন্য আকাঙ্ক্ষা করব, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোন্ মনোভাব অবলম্বন করব? আমরা জানি মানুষের জীবন সমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ে বিবর্ধিত হয়। আমরা এও জানি মানুষের সামাজিক সত্তা মানুষকে সামাজিক করতে বাধ্য করেছে। তাহলে জগতের প্রতি মানুষের ব্যবহারিক মনোভাব বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে অন্বিত। রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনদর্শনে এই সত্তাই জাগ্রত হয়ে উঠেছিল:

"বিজ্ঞান-বিদ্যা কাজে লাগানো বিদ্যা, কর্মের বিদ্যা, আদান-প্রদানের বিদ্যা, জীবন-যাত্রায় সফলতা লাভের বিদ্যা।" (বাঙ্ময় জগৎ ঃ বিচিত্র-জগৎ)

বাস্তবজীবনে সফল হতে গেলে বিজ্ঞানবিদ্যা চর্চা যে অপরিহার্য এই সামাজিক চেতনায় রামেন্দ্রসুন্দর সদা-সতর্ক ছিলেন। এই সামাজিক চেতনায় উদ্দীপ্ত ছিলেন বলেই রামেন্দ্রসুন্দর বুঝতেন বিজ্ঞানকে জনমুখী করে তুলতে হবে। তবুও তিনি এ কথাটা বুঝেছিলেন যে একটা ঔপনিবেশিক দেশে বিজ্ঞানচর্চার অবাধ সুযোগ-সুবিধা মেলে না। পরিবেশ এমনই থাকে যেখানে প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক উন্নতি ঘটাতে গেলে বারে বারে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ একটু-আধটু যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল তাতে ছিল তার নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং পরাধীনের পক্ষে বিজ্ঞানবিদ্যা চর্চার কোনো যথার্থ সুযোগ-সুবিধা ছিল না। কিন্তু যে দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে বলীয়ান, উন্নত ধরনের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্যে যাদের পরিচ্ছন্ন মেধা ও প্রতিভা রয়েছে, শ্রম দেবার মত বিপুল জনবল যেখানে মজুত ভাণ্ডার সেখানে জীবনমানের উন্নতি-সাধনের জন্যে বিজ্ঞানবিদ্যাচর্চার প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিতে বাধ্য। সুতরাং দেশের মানুষকে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানবিদ্যাচর্চায় অনুরাগী করে তোলার এক বিরাট দায়িত্ব রামেন্দ্রসুন্দর নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। এক-দিকে বিজ্ঞানবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিদের উৎসাহ দান করেছেন, অন্যদিকে নিজের সাধ্যমত দায়িত্ব নিয়ে দেশ ও জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। বিজ্ঞান সাধক রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশ চেতনা বৈজ্ঞানিক ভাবনায় সমৃদ্ধ। বিজ্ঞানসাধক রামেন্দ্রসুন্দর আক্ষেপের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে বলেছেন, 'ইংরেজ জাতিটা বড় ভাগ্যবান'। কেন না বিজ্ঞানের নানা শাখায় ইংরেজ মনীষীদের দান যথার্থ অর্থে স্মরণযোগ্য; রামেন্দ্রসুন্দর কোনো ধরনের জাতীয় সংকীর্ণতা না নিয়ে নিউটন, ফ্যারাডে প্রমুখ ইংরেজ বিজ্ঞানীদের দান শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গ্রহণ করেছেন। তবে পরাধীনতার জ্বালা কখনও ভুলতে পারেন নি। তাই জগদীশচন্দ্র বসু জড় ও জীবের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক যে-সব চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটন করে যখন বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করে দিলেন, তখন পরাধীন ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে রামেন্দ্রসুন্দর জানালেন সাদর অভিনন্দন,

জানালেন জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার দেশমাতার লজ্জা ও গ্লানিকে অনেকখানি মুক্ত করতে সাহায্য করবে। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের মর্ম-কথাটিকে ফুটিয়ে তুলে রামেন্দ্রসুন্দর জানালেনঃ

"জীবদেহের মত জড়দেহ বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়, জীবদেহের ন্যায় জড়দেহ বিষপ্রয়োগে অবসন্ন হয়, আবার ঔষধে তাহার অবসাদ নষ্ট হয়, এই সকল নূতন তত্ত্ব অধ্যাপক জগদীশ-চন্দ্রের পূর্বে কোনো বৈজ্ঞানিকেরই কল্পনায় আসে নাই। জড়ের জীবন আছে কি না, এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা বিজ্ঞানশাস্ত্রের একটা প্রকাণ্ড সমস্যা। অনেক বড় বড় পণ্ডিত মীমাংসা অসাধ্য বলিয়া একেবারে নিরাশ হইয়া বসিয়া আছেন। কোন্ পথে চলিলে এই সমস্যার পূরণ হইতে পারে, তাহার নির্দেশেও এ পর্যন্ত কেহ সাহসী হয়েন নাই। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়া-পরম্পরা সেই সমস্যার পূরণে কতদূর সফল হইবে, তাহার নির্দেশে আমরা অসমর্থ। কিন্তু তিনি যে নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হস্তে অজ্ঞানের তমোময় রহস্যাবৃত প্রদেশাভিমুখে একাকী অগ্রণী হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার সাহস ও অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব বিস্ময় উৎপাদন করিবে সন্দেহ নাই। তাঁহার মাতৃভূমির বিষাদক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে তিনি আনন্দের রেখাপাতে সমর্থ হইয়াছেন;—তাঁহার জননীর আশীর্বচন তাঁহার জয়যাত্রায় রক্ষা কবচ হউক।" (বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩০৮)

রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানগ্রন্থগুলি ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিকে মূলতঃ দুটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। ভৌত প্রকৃতির রূপ ও রূপান্তরের কথা যে-সব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-গুলিতে বর্ণিত হয়েছে সেখানে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা শুনিয়েছেন। যেমন 'প্রকৃতি', 'জগৎ কথা' গ্রন্থ দুখানি এবং এ ধরনের অন্যান্য আলোচিত প্রবন্ধগুলিতে রয়েছে তত্ত্বকথার ঠাসবুনুনি। এগুলি বিজ্ঞান পাঠের প্রাথমিক ভূমিকা হিসাবে অবশ্যই বিবেচিত হবে। বিষয়-বৈচিত্র্য পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়গুলি, ভূতত্ত্ব ও প্রাণিবিদ্যার প্রয়োজনীয় অংশগুলি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন। বিশেষ করে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর থেকে বিজ্ঞানের যে বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সাফল্যে উড্ডীন হয়েছিল, রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের সেইসব শর্তাবলী, নিয়ম ও সূত্র-গুলিকে বাংলাভাষায় পরিবেশন করেছেন। কিন্তু আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকলে শেষ পর্যন্ত স্বরূপ রহস্যের আবরণ উন্মোচন করা যাবে না অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে উঠবে নাঃ

"বিজ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পদে পদে সাবধান হইয়া চলা উচিত। অর্জিত জ্ঞানের কতটুকু বিচার লব্ধ, আর কোন্‌টুকু পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষালব্ধ, তাহা পদে পদে সাবধানে নির্ণয় করিয়া যাওয়া উচিত। নচেৎ বিজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে না।" ('ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া' ঃ জগৎকথা)

সুতরাং রামেন্দ্রসুন্দর এটুকু বুঝেছিলেন যে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে হলে বৈজ্ঞানিকবোধের একটা মজবুত ভিতের দরকার। তবে পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গড়ে তোলার একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। কেন না রামেন্দ্রসুন্দর যথার্থই বুঝেছিলেন প্রকৃতি বিজ্ঞানের অসামান্য সাফল্যের ফলে বিজ্ঞানরূপের সামাজিক চেতনা গড়ে উঠছে। সমান-বোধ দিয়েই রামেন্দ্রসুন্দর বুঝেছিলেন জগৎ ও জীবনের মর্মবস্তুতে প্রবেশ করতে গেলে বিজ্ঞানসম্মত ধারণাকে পুষ্ট করতে হয়। তিনি যথার্থভাবে দেখেছিলেন যে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকেরা যে প্রভূত জ্ঞান সংগ্রহ করেছিলেন আধুনিক দর্শন তার থেকেই উপকরণ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। এই কারণেই দর্শনচিন্তায় প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান যেমন ভৌত বিষয়গুলিকে ভৌতরূপের সাহায্যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিচ্ছে, তেমনি আধুনিক দর্শনও সেই পথে এগিয়ে চলেছে। তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক মানসিকতা দিয়ে বুঝেছিলেনঃ

"যে আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত......" (জড় ও চৈতন্য ঃ প্রদীপ, মাঘ-ফাল্গুন, ১৩০৮)

প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তনের ক্ষেত্রে রামেন্দ্র-সুন্দর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করেছেন, অকুতোভয়ে সংগ্রাম করেছেন অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে। রামেন্দ্রসুন্দর ভালোভাবে জানতেন ও বুঝতেন যে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা, একটা সামগ্রিক বোধ, বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যকজ্ঞান পেতে গেলে একটা সুবিন্যাসযুক্ত সমাজচেতনায় পৌঁছতে হবে। দর্শনচিন্তার মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর সমাজচেতনার এই বিশেষ রূপটির সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই দেখা যায় 'জিজ্ঞাসা', 'বিচিত্র জগৎ' ও এ ধরনের অন্যান্য প্রবন্ধগুলিতে বিজ্ঞান-দর্শনের এক সুষমামণ্ডিত সৌধ তিনি গড়ে তুলেছেন। আসলে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর কাছে রামেন্দ্রসুন্দর জগৎ ও জীবন সম্পর্কের বিভিন্ন সমস্যাবলীর বিজ্ঞানসম্মত মীমাংসা চেয়েছিলেনঃ

"কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্যা ব্যবহারিক বিদ্যা, কেবল বিশ্লেষণে আর স্বরূপ নির্ণয়ে ক্ষান্ত থাকিলে বিজ্ঞানবিদ্যার চলিবে না। বাহ্যজগৎটা জীবনের কাজের জন্যই রহিয়াছে এবং যাহাতে উহা ভাল করিয়া জীবনের কাজে লাগে, বিজ্ঞানবিদ্যাকে সেই চেষ্টায় থাকিতে হইয়াছে।" (জড় জগৎ ঃ বিচিত্র জগৎ)

রামেন্দ্রসুন্দর যথার্থভাবেই মনে করতেন যে বিজ্ঞান সত্যকে অনুসন্ধান করে এবং সত্যের সাধনাই হল বৈজ্ঞানিকের জীবন অন্বেষা। সুতরাং মানবকল্যাণ বিজ্ঞানের লক্ষ্য। আর এই কারণেই বিজ্ঞানচর্চায় অনুরাগী সাধকের হৃদয়বেদনা উৎসারিত হয়ে উঠেছে, যখন দেখেছেন বিজ্ঞানকে ব্যক্তি, দল বা লুঠেরা জাতীয়তাবাদীরা নিজ নিজ স্বার্থে ব্যবহার করছে। তারা স্বার্থসিদ্ধির উন্মাদনায় বিজ্ঞানের কল্যাণমুখী ভূমিকাকে খর্ব করে মারণাস্ত্রের উপাদান সংগ্রহে ব্যস্ত। প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনকারী, ধনলিপ্সু ও মুনাফালোভীদের বিরুদ্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ঘৃণায় ফেটে পড়েছেন; বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন যারা বিজ্ঞানের কল্যাণমুখী দিককে খর্ব করে রক্তলোলুপ হয়ে উঠছেঃ

"এই বৈজ্ঞানিকতা-স্পর্দ্ধি-মানব-সভ্যতার মধ্য-স্থলেও যখন সবল মানব ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্বল মানবের শোণিতপানে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, তখন জীবন-যুদ্ধের ভীষণতা যে বৈজ্ঞানি-কতার প্রভাবে মৃদুতা ধারণ করিবে, মানব-সমাজের বর্তমান অবস্থায় তাহার কোন আশ্বাস নাই। এই ক্রূর সংগ্রামে অশান্তির মধ্যে যদি কিছুতে চিত্তক্ষেত্রে শান্তির বারি বর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে উপরে যে আনন্দের কথা উল্লেখ করিতেছি, সেই আনন্দ কতকটা সমর্থ হইবে। বৈজ্ঞানিকের গর্ব এই ও গৌরব এই যে, তিনি ধরাধামে এই আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন; আমরা অঞ্জলি ভরিয়া উহার ধারাপানে তৃপ্ত হইয়াছি।" (মায়া পুরীঃ জিজ্ঞাসা)

বিজ্ঞানের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখেই রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনসাধনা বিকশিত ও বিবর্ধিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা অর্জন করতে পেরেছিলেন বলেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যথার্থ অনুসন্ধানী দৃষ্টি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। সামাজিক বৈষম্য, শোষণ, স্বার্থ-লোলুপতা কেমনভাবে বিজ্ঞানকে কলুষিত করে তার দিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। জীবনমুখী দৃষ্টিভঙ্গীতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলেই তথা-কথিত নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করার দিকে তাঁর দৃষ্টি সংকীর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি। বরং বিজ্ঞান চেতনার মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের সুষমামণ্ডিত সৌন্দর্যময় রূপের অন্বেষণে বিজ্ঞান-সাধক রামেন্দ্রসুন্দরের প্রগত পদক্ষেপের বলিষ্ঠ ছন্দ স্পন্দিত হয়েছে।

ইকেবানা—শৈল্পিক ঐতিহ্য

পুষ্প বিন্যাসে জাপানী ইকেবানা আমাদের সকলেরই মন কাড়ে। ইকেবানার অর্থ হল 'সতেজ ফুলের বিন্যাস'। ভারতবর্ষ ও সমস্ত পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বর্তমানে পুষ্পসজ্জায় জাপানী ইকেবানার স্থান সবার উপরে।

আমাদের চৌশট্টিটি কলার মধ্যে একটি প্রধান কলা পুষ্প বিন্যাস। ইকেবানার উৎস ভারতের মাটিতে। মঙ্গলঘট স্থাপনের মধ্যে দিয়ে ভারতে পুষ্প বিন্যাসের প্রথম সূত্রপাত বলা যেতে পারে। ভারতবাসী জলপূর্ণ মঙ্গলঘটকে শক্তির উৎস হিসেবে কল্পনা করে এসেছেন অনাদি অনন্তকাল থেকে। যজুর্বেদীয় ঘট স্থাপনের স্তুতি থেকে ভারতবাসীর কাল্পনিক শক্তি পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

ওঁ আজিঘ্র কলসং মহ্যা ত্বাং বিবশ্বিন্দশঃ।
পুনরূর্জা নিবর্তস্ব, সা নাঃ সহস্রাং
ধুক্ষোরুধারা পয়স্বতী পুনর্মাবিশতাদ্রয়িঃ।
(শুক্ল যজুর্বেদ ৮।১০)

—অর্থাৎ হে মহি, হে ধেনু তুমি দ্রোণ কলসস্থ সোমরস আঘ্রাণ কর। এই রস (শক্তি) তোমাতে প্রবিষ্ট হউক। তুমি বিশিষ্টরূপে অধিকতর দুগ্ধবতী হইয়া আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন কর।

আর এই ঘটে প্রাণ-প্রাচুর্যের ও ধনের প্রতীক হিসেবে স্থাপন করা হল পত্রপল্লব। যজুর্বেদীয় পরের স্তুতিটি থেকে পত্রপল্লব স্থাপনের হেতুটি আরও স্বচ্ছভাবে ধরা পড়ে।

ওঁ অরমূর্জবতো বক্ষ উজ্জীব ফলিনী ভব।
পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ।

—অর্থাৎ হে বনস্পতি তুমি বহুতেজ সম্পন্ন উদুম্বর বৃক্ষের ন্যায় ফলশালী হও। হে বনস্পতি তুমি স্বকীয় পত্র পুনঃ পুনঃ সঙ্কলিত করিয়া ধন প্রদান কর।

কাজেই ভারতবর্ষে প্রতি ঘরে ঘরে পত্রপল্লবে জলপূর্ণ মঙ্গলঘট মাঙ্গলিক আচারের প্রধান অঙ্গ। এর সাথে যজুর্বেদীয় নিয়ম অনুসারে ভারতবাসী বিভিন্ন দেবদেবীকে বিভিন্ন ফুলে আরাধনা করতেন। যা এখনও নানা ফুল নানা দেবদেবীর প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ ফুল ফল অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধিশালিনী। আদিম কাল থেকেই ভারতের নরনারী সেই সম্পদকে কখন দেবতার উদ্দেশ্যে কখনও বা প্রিয়ার তুষ্টি সাধনে ব্যবহার করেছেন। সুগন্ধ ফুলকে যত্ন করে কেউ পত্রপুটে কেউ বা স্বর্ণ, রৌপ্য পাত্রে সংগ্রহ করে রেখেছেন। গৃহসজ্জা ও অঙ্গসজ্জায় ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল থেকেই ফুলের ব্যবহার চলে আসছে। প্রাক্ আর্য যুগেও যে ফুলের চর্চা হত তার নিদর্শন মেলে দ্রাবিড় ভারতের 'পু' কথা থেকে। (পুষ্প অর্থে 'পু' কথার ব্যবহার দ্রাবিড় সভ্যতা থেকে আর্যরা পুষ্প নিবেদনের মধ্যে দিয়ে ব্যবহার করে এসেছে।)

নানা আচার অনুষ্ঠানে বহুলভাবে ফুলের ব্যবহারে ভারতীয় পুষ্প বিন্যাসে শৈল্পিক দিক যে একেবারে ছিল না সে কথা বলা যায় না। দাক্ষিণাত্যের মঙ্গল উৎসবে ফুলের আলপনা, নানারকম উৎসবে অঙ্গভূষণে পুষ্প বেণী বহু যুগ আগে থেকেও পুষ্পসজ্জার বিশেষ অঙ্গ হিসেবে স্থান পেয়ে এসেছে। মোগল যুগে মুসলমানদের ধর্মীয় স্থানে বা কবরে ফুলের গালিচা ব্যবহারের প্রচলন যা আজও চলে এসেছে। উড়িষ্যার পুরীর মন্দিরে নানা ফুলের গহনার সাজ, ফুলের চামর, ফুলের পাথার, নানা ফুল সাজের প্রচলন রয়েছে। বসন্ত উৎসবে নানা রঙ-বেরঙের ফুলের ব্যবহার ঐ পুষ্প ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

শিপ্রা দাশ

পুষ্পসজ্জায় বাঙালী যে কত নিপুণ ছিল পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'নায়ক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ফুলদোল' থেকে তার পরিচয় মেলে। একবার তিনি রাজা ইন্দ্রসিংহের হ্যারিংটন স্ট্রীটের বাড়ীতে 'ফুলদোল' উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে যান। ঐ দিন বৈঠকখানায় উপস্থিত হওয়ামাত্রই এক ভৃত্য তাঁকে যূথিকা ফুলের টানাপোড়েনে তৈরী একটি ধুতি এবং বেল ফুলের একটি চাদর দিলেন। তারপর তাঁকে সুতার কাপড় ছেড়ে ফুলের কাপড় ও চাদর পরে ভিতরে যাবার জন্য অনুরোধ করা হলো। ভিতরে গিয়ে তিনি দেখলেন সকলের দেহে ফুলের চাদর, ফুলের ধুতি, ফুলের উষ্ণীষ, ফুলের আভরণ। কীর্তনীয়ার দল দুই ইঞ্চি মোটা নানা রঙের ফুলের তৈরী কার্পেটের ওপর বসে নাম কীর্তন করছেন। এ ধরনের ফুল-দোলের বাহার বাঙালীর অনেক ঘরে-ঘরেই ছিল। বাঙালীর পুষ্প বিন্যাসে শিল্প নৈপুণ্য যে কত চমৎকার ছিল তা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন রাখে না। তবে এই পুষ্প বিন্যাস শুধু ঘরের আচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ ধরনের পুষ্প বিন্যাসে কোন পাশ্চাত্য প্রভাব ছিল না। ভারতীয় নিজস্ব সৌন্দর্য বোধে এ-সব পুষ্পসজ্জা করতো। তাই বলে এটা শিল্প হিসেবে পুষ্প বিন্যাসের মর্যাদা পাবে না এটা তো ঠিক নয়!

এবার আসা যাক জাপানী ইকেবানার কথায়। এর সাথে বৌদ্ধধর্ম এবং ভারতবাসীর মাঙ্গলিক আচারে ঘট স্থাপনের একটি যোগসূত্র রয়েছে। ৫৫২ খৃষ্ট অব্দে প্রথম বৌদ্ধধর্ম জাপানে যায়। তারপর ৬০৭ খৃষ্ট অব্দে কোরিয়া থেকে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী কয়েকজন জাপানের কিয়োটোতে প্রিন্স সোতোকুর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের কাছ থেকেই সোতোকু বুদ্ধের মূর্তি দেখে ও বাণী শুনে অনুপ্রাণিত হলেন। তখন তিনি তাঁর বিশেষ বন্ধু আনো নো ইমোকে-কে বিশদভাবে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য চীনে পাঠালেন। চীন থেকে ফিরে এসে আনো নো ইমোকো কিয়োটো রোক্কাকুদো মন্দিরে প্রথম জলপূর্ণ পত্রপল্লবিত মাঙ্গলিক ঘট ফুলসহ ভগবান বুদ্ধের সামনে স্থাপন করলেন। সেই থেকেই বুদ্ধ মূর্তির সামনে পত্রপল্লবে ফুলসহ জলপূর্ণ ঘট স্থাপনের রীতির প্রচলন হয়।

বুদ্ধমূর্তির সামনে মঙ্গল কলসের ব্যবহারের প্রচলন আমরা ভারতে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের শিল্পকলায় প্রভূত পরিমাণে দেখতে পাই। যেমন সাঁচী, অমরাবতী (কলকাতা মিউজিয়াম) ভারুত (কলকাতা মিউজিয়াম) প্রভৃতির অলঙ্করণে মঙ্গলঘটের চিত্র সব সময়ে প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতের পূর্ণঘটে প্রাণ প্রতিষ্ঠার রীতি বৌদ্ধধর্মের সাথেই প্রথম জাপানে পৌঁছায়।

জাপানে বৌদ্ধ পুরোহিতরা তখন থেকেই এই ঘটের তাৎপর্যকে নানাভাবে পুষ্পসজ্জার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে শুরু করেন। যেমন আমাদের দেশের মূর্তিশিল্পীরা বিভিন্ন দেবশক্তির ভাবকে নানা মূর্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন, তেমনি জাপানের বৌদ্ধসাধকবৃন্দ এই ঘটে নানা বিশ্বশক্তির রূপ দেবার চেষ্টায় মগ্ন হলেন।

জাপানীদের কাছে যে কোন পুষ্পসজ্জা একটি পবিত্র আচার। আগে তাঁরা যে কোন পবিত্র অনুষ্ঠানে 'রুক্কা' ('রুক্কা' কথাটি এসেছে বৌদ্ধ থেকে) রীতিতে পুষ্প বিন্যাস করতেন। মঙ্গলঘটের মতো ফুল পাতা রেখে যে ফুলসজ্জাটি প্রথম প্রচলিত হয়েছিল তাকেই 'রুক্কা' রীতিতে পুষ্প বিন্যাস বলে। জাপানী-দের যে কোন পুষ্প বিন্যাসে তাঁরা বিজোড় সংখ্যক (১, ৩, ৫, ৭,...) ভাবে ফুলের ব্যবহার করেন। এটা ঘটের উপর স্থাপিত পত্র পল্লবের অনুরূপ বিকাশ হিসেবে ধরা যেতে পারে। এই পুষ্প সজ্জাটিকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁরা উচ্চ-স্থানে স্থাপন করেন। জাপানী পুষ্প রসিকদের কয়েক শতাব্দীর মিলিত প্রচেষ্টায় ঘটে ইকেবানার সজ্জার এক নতুন দিগন্তের পথ। পুষ্পবিন্যাসে জাপানী ইকেবানায় পূর্ণ বিকশিত সহস্র জল-পদ্মের মতো প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়।

শতাব্দীতে বিশ্বের প্রতীকরূপে রূপায়ণ হল প্রথম ক্ল্যাসিক্যাল স্টাইলে 'রিক্কা'।

পুষ্পবিন্যাসে 'রিক্কা' পদ্ধতিটি নিয়মগত, আচার-গত, ব্যবহারগত দিক থেকে যেমন পরিশ্রমের তেমনই সময়সাপেক্ষ। তবে সৌন্দর্যগত দিক থেকে এটা ভারী সুন্দর। এর পর থেকে জাপানী ইকেবানা শিল্প হিসেবে প্রসার লাভ করে। বিন্যাসগত দিক থেকে ক্ষমতা বজায় রেখে ইকেবানা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'রিক্কা'র অনুসরণে সহজতর ফুলসজ্জার রূপ নেয় 'শোকা'। ঐ সময়কালীন উঁচু, লম্বা ফুলদানীতে 'নাগেইরে' (ইন্‌ফরম্যাল স্টাইল) ফুলসজ্জার মাধ্যমে ফুলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার রীতি খুব সমাদৃত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জাপানে পুষ্পবিন্যাসে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে। এই-জন্য এই সময়টাকে জাপানী ইকেবানার 'স্বর্ণময় যুগ' বলা যেতে পারে। এর পর 'চাবানা', 'কাকি-বানা', 'মোরিবানা', 'মোরিমোনো', 'উকিবানা', 'জেন ইবানা' প্রভৃতি নানা ধরনের পুষ্প বিন্যাসের মাধ্যমে ইকেবানার বিকাশ ঘটে। জাপানীরা শুধুমাত্র 'আধুনিক' পুষ্পবিন্যাসের ক্ষেত্রে ধর্মীয় রীতির পরিবর্তে শিল্পরীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন বেশী। এখানে শিল্পী তাঁর স্বাধীনতা অনুযায়ী পুষ্পবিন্যাসের মাধ্যমে আপন শিল্পী-সত্তাকে ফুটিয়ে তোলেন। বহুক্ষেত্রে অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনের মতো পুষ্পবিহীন. পুষ্পসজ্জার আধুনিকতম দিকটি সকলকে আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানী ইকেবানার প্রভাব ভারতবর্ষ এবং সমস্ত পাশ্চাত্য দেশ-গুলোতে পড়ে। শিল্প হিসেবে জাপানী ইকেবানা শীর্ষস্থানে সমাদর লাভ করে। এর মূলে ইকেবানা ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানটির অনেক অবদান রয়েছে।

পাশ্চাত্য রীতিতে পুষ্পসজ্জার ব্যাপারটি এখানে একটু উল্লেখ করছি। পাশ্চাত্য দেশ-গুলোতে পুষ্পবিন্যাস প্রধানত গৃহসজ্জার অঙ্গ-রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাচীন মিশরের শিল্পকলায় পুষ্পবিন্যাসের নিদর্শন রয়েছে অনেক। রোমান এবং বাইজান্টিয়ান সভ্যতায় বিভিন্ন পুষ্পবিন্যাস তাঁদের মোজেকশিল্পে এবং দেওয়াল চিত্রায়নে দেখা যায়। প্রাচ্যের মতো পাশ্চাত্যেও বিভিন্ন যুগে নানা ধরনের পুষ্প-বিন্যাসের চর্চা হয়ে এসেছে। এইসব দেশ-গুলোতে সমসাময়িক কালের প্রভাব বেশী পড়ে। যেমন 'বাইজানটিয়ান পিরিয়ড', 'রিনাই-সেনস্ পিরিয়ড', 'জর্জিয়ান পিরিয়ড', 'ক্লাসিকাল পিরিয়ড', 'রিভাইভাল পিরিয়ড' ও 'মডার্ণ'। এই সব সময়ে তাদের নিজস্ব রীতিতে পুষ্প-সজ্জার রূপ বদলেছে। ফুল ও ফল দিয়ে যে পুষ্পবিন্যাস রীতি পাশ্চাত্যে আছে তা গ্রীক ও রোমের ভোজসভার (ব্যাঙ্কোয়েট) অলংকরণ থেকেই উদ্ভব হয়েছে।

সমস্ত দেশেই নিজস্ব রীতিতে কিছু কিছু ফুলসজ্জা রয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যে পুষ্প-বিন্যাস রীতি রয়েছে তাকে বর্তমান যুগপো-যোগী করে তোলার জন্য তেমন কোন চিন্তা করা হয় নি। যদিও ইকেবানার মতো বিশেষ ফুল-সজ্জাটির মূল সূত্র ভারতবর্ষের বুক থেকে সংগৃহীত। ভারতবর্ষের জলপূর্ণ মঙ্গল ঘট থেকে সৌন্দর্য ও প্রাণশক্তি আহরণ করে আজকের জাপানী ইকেবানা সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠ শিল্পের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তাহলে আমাদের ভারত-বর্ষের মতো শিল্পকলায় সমৃদ্ধিশালিনী দেশে পুষ্পরসিকদের নানা চর্চার মাধ্যমে পুষ্পবিন্যাস শিল্পটির ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে নতুন দিগন্তের সন্ধান মিলতে পারে।

তথ্যাদি সংগ্রহ :

১। ফ্লোরাল আর্ট—ব্যাচেল ই. কার।

২। দি সোল অব জাপানীজ ফ্লাওয়ার এ্যারেঞ্জমেন্ট—ফুজিওয়ারা ইউটুকু।

৩। জাপানীজ ফ্লাওয়ার এ্যারেঞ্জমেন্ট—নরম্যান স্পার-ন্যান।

৪। উমা বসুর ডায়েরীর সংগ্রহ থেকে কিছু।

[ভারতে বেকারী সমস্যার কয়েকটি দিক : ৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

আগামী ৫ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩·২ শতাংশে দাঁড়াবে—যোজনার রচয়িতাদের এই হিসাবের ওপর আমাদের কোন আস্থা নেই। কারণ সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র, বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র শিল্পপ্রকল্প মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম রুগ্নতার শিকার হয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

যোজনা কমিশন ঘোষিত লক্ষ্য অনুযায়ী কৃষিতে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটবে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই, বরং বিপরীত ইঙ্গিত রয়েছে। কৃষিতেও কাজের সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে। ভূমি সংস্কারের মৌলিক প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে শুধু কিছু সেচের জল সরবরাহ, কিছু উচ্চ ফলনশীল বীজ সরবরাহ বা সার সরবরাহ কৃষির স্থায়ী ও সুদৃঢ় অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে না—স্থায়ী ও সুদৃঢ় অগ্রগতি না হলে কৃষিতে কর্মসংস্থানের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে অতিরিক্ত কাজ সৃষ্টির বিশেষ কর্মসূচীগুলি এখন কার্যতঃ মৃত।

যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রকল্পগুলিতে বহুলক্ষ মানুষ কাজ করেন, কাঁচামালের অভাবে, পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে সে সব শিল্প প্রকল্পের একটা বড় অংশ এখন মৃতপ্রায়। অথচ অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের প্রশ্নে এগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম।

যোজনা কমিশন নিজেই স্বীকার করেছে, ষষ্ঠ যোজনাকালে শিক্ষিত বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই শিক্ষিত বেকারদের জন্য, বিশেষ করে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাধারী বহুসহস্র ইঞ্জিনীয়ার, চিকিৎসক ও বিজ্ঞান কর্মীদের জন্য সরকারের কোনো সুনির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ কর্মসূচী নেই।

ষষ্ঠ যোজনার শেষে তাই বেকারের সমস্যা আরও ব্যাপক, আরও তীব্র হবে।

প্রতিবেদন

উত্তরবঙ্গের পত্রপত্রিকা এবং কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

জীবন সরকার

মালদহ, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, দার্জিলিঙ এই ৫টি জেলা নিয়ে উত্তর বাংলা। দেশ ভাগ হওয়ার পর এই জেলাগুলিতে পূর্ব বাংলার মানুষ উপচে পড়ে। কারণ এই জেলাগুলি পরিবেশের দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় কিছুটা পূর্ব বাংলার মতন। নদী, পাহাড়, সবুজ গাছপালা নিয়ে এই অঞ্চল। সব ঋতুই বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, যা কিনা অন্য কোন অঞ্চলে পাওয়া যায় না। এখানকার জমি উর্বর। একটু পরিশ্রম করতে পারলে ভাল ফসল হয়। ফলে এই জেলাগুলির মানুষদের সুকুমার শিল্পের প্রতি স্বাভাবিক কারণেই একটু ঝোঁক বেশী। যুবক-যুবতীদের মধ্যে গল্প-কবিতা লেখা, পত্রিকা প্রকাশ করা, সাহিত্য নিয়ে হৈ চৈ করা এদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে; এবং এটা হয়েছে বিভিন্ন জেলার লোকজনের মিশ্রিত সংস্কৃতির মধ্যেই।

এখানকার সাহিত্যকর্মীরা নিজেদের লেখাপত্র নিয়ে প্রায় নিয়মিতই ঘরোয়া পরিবেশে আলোচনা করেন। এই নিয়মটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ধরা যাক আলিপুরদুয়ারের কথা। রেল শহর, সুন্দর জায়গা। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। এখানে অনেকেই সাহিত্যে নিবেদিত প্রাণ। কাজের পর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ও পত্রিকা প্রকাশ করেন। এদের পত্রিকার নাম 'নোনাই'। এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। সম্প্রতি তাঁর গ্রন্থ 'সাহাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ' প্রকাশিত হয়েছে। ওখান থেকে চলে আসুন নিউ টাউনে। এখান থেকে পত্রিকা প্রকাশ হয় 'বিনিদ্র', 'রাঙার', 'মাটির ছোঁয়া' এবং আরো কয়েকটি। আলিপুরদুয়ার থেকে চলে যান কোচবিহারে। ওখানেই থাকেন অমিয়ভূষণ মজুমদার, বিখ্যাত গল্পকার। কোচবিহারের উল্লেখযোগ্য কাগজ 'ত্রিবৃত্ত' এবং 'ঋতুপত্র'। এছাড়া 'কোচবিহার সমাচার', 'বল্মীক', 'রোবট' ও আরো কয়েকটি পত্রিকা। চ্যাংরাবান্দা থেকে প্রকাশিত হয় 'অরণ্য'। এই কাগজটা নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে সীমান্ত শহর থেকে। ধুপগুড়ি থেকে প্রকাশ হয় 'পাহাড়তলী', 'শব্দ', 'সোধ', 'শালবনী', 'লাল নক্ষত্র', 'বুদ্ধদেব', 'গদ্য দিনের অহংকার' ও আরো কয়েকটি কাগজ। 'বনভূমি' উত্তর বাংলার একটি বিশিষ্ট কাগজ। বীরপাড়া থেকে নিয়মিত প্রকাশ করে যাচ্ছেন কবি তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়।

জলপাইগুড়ি শহরের পত্রিকাগুলোর মধ্যে রয়েছে 'জনমত', 'আমাদের কথা', 'সীমান্তিক', 'উত্তর দেশ' ও আরো কয়েকটি কাগজ।

শিলিগুড়ির দেওয়ালে একটি কাগজের পোস্টার দেখেছিলাম—'ধৃতরাষ্ট্র'। এটি সম্পাদনা করেন মনোজ রাউৎ। নারায়ণ ভট্টাচার্য প্রকাশ করেন 'হিমালয়বার্তা'। এই পত্রিকায় রয়েছেন গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, ডঃ বিমলেন্দু দাম। 'এই শতক' পত্রিকায় রয়েছেন হরেন ঘোষ, সৈয়দ কওসর জামাল। 'গদ্য-পদ্য' এটিও ভাল কাগজ। সম্প্রতি এই শহর থেকে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' নামে। নকশালবাড়ী থেকে একটি কাগজ বেরোয় —'বাতারিয়া'। বিধান নগর থেকে বের হয় 'পৌঁহাতিতারা'।

পশ্চিম দিনাজপুরের একটি কাগজ খুব উল্লেখযোগ্য। 'মধুপর্ণী'র কথা বলতে চাইছি। এই কাগজটি সম্পাদনা করেন অজিতেশ ভট্টাচার্য। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' বলে একটি ঢাউস কাগজ বের হয়, যার পাতায় কলকাতার লেখকদের লেখা বেশী দেখতে পাওয়া যায়। মালদা থেকে প্রকাশিত হয় 'গৌড়ভূমি', 'উত্তর মেঘ', 'উত্তর দিগন্ত'। এছাড়া আরো কয়েকটি কাগজ রয়েছে এই জেলাগুলিতে যেমনঃ

কোচবিহার জেলায়—সৈকত, অনন্যা, পরমাণু, নবলিপি, স্বর্ণমৃগ, হরিণ, কোচবিহার সাহিত্য সভাপত্রিকা, উত্তরায়ণ, নিবেদন, প্রভাতী, বিচিত্রা, আহ্বায়ক, মহাকাল, উত্তরবার্তা, দেশবার্তা, রায় ডাক, জ্যোতি, সংস্কার, গ্রামের ভাষা, পঞ্চানন, নাগরিক, নববার্তা, নর্দান রিভিউ, ফুলঝুরি, ভাবনা ও তারপর, জিরাফ, উত্তর সীমান্ত বঙ্গ, মশাল, মন্দিরা, অভিযান, রাজধানীর বাইরে, নাড়িভুঁড়ি প্রভৃতি।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলায়—অভিযান, কুন্তন, তরঙ্গ, ঝংকার, সমকাল, সাইরেন, দিশারী, পাখীডাকা বিকেল, অয়ন, ইঙ্গিত, বরেন্দ্রভূমি, শঙ্খপত্রিকা, আত্রেয়ী, চেতনা, আলেখ্য, নির্ঝরিনী, জলস্রোত, সমাজবাণী, ইসক্রা, শিঞ্জিনী, পাঞ্চজন্য, দধীচি, ফসল।

মালদহ জেলায়—শতাব্দী, অম্বর, মুক্তমেঘ, হুল্লোড়, শিশু আলেপন, মালদার খবর, মালদহ সমাচার, গৌড়বার্তা, গৌড়ভূমি, গৌড়বঙ্গ, গৌড়দূত, জোয়ার, তিস্তা থেকে গঙ্গা।

দার্জিলিং জেলায়—ঢেউ, ঝিনুক, নির্ঝর, সংঘট, শিলিগুড়ি পত্রিকা, তরাই দর্পন, সাপ্তাহিক আর্যাবর্ত, হিমালয়ান অবজারভার, নর্থ বেঙ্গল টাইমস, হিমালয়, কথকতা, বালুকা, প্রান্তরেখা, ঝর্ণা, কর্ণিক।

জলপাইগুড়ি জেলায়—আহ্বান, জলার্ক, কনিষ্ঠ, নান্দীমুখ, নতুন সীমান্ত, উত্তরের হাওয়া, পাবক, হাতুড়ি, অভিযান, কবিতা দর্পণ, তরাইয়ের কল্লোল, ঐকতান, উৎস, শতক, গান্ধার, রায় ডাক, দোলনা, এই শতক, কাঞ্চনজঙ্ঘা, সোচ্চার, বনমহল, সময়, আবিষ্ট, ডুয়ার্সের চোখ, লোকশিল্প, চন্দ্রমাস যাত্রীক, ডেস্‌পাচ্ প্রভৃতি।

উত্তর বাংলায় যে সমস্ত লেখক থাকেন, তাঁদের বহু অভিযোগ আছে। দক্ষিণবঙ্গের কাগজগুলির প্রতি ওদের ধারণা, দক্ষিণবঙ্গের পত্রিকায় উত্তর বাংলার লেখকদের লেখা প্রকাশিত হয় না। ডাকে লেখা পাঠালে পড়ে না। এই অভিযোগ সবক্ষেত্রে সমান নয়। দেবেশ রায়ের প্রথম গল্প ডাকে পাঠিয়েছিলেন তা 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সমীর রক্ষিৎ, শিবরাম চক্রবর্তী, মিহির আচার্য, সমরেশ মজুমদারের বেলায় সেই কথাই খাটে। আর লেখা যদি ভাল হয় বড় কাগজে লেখা নাই বা ছাপলো?

অমিয়ভূষণ মজুমদার তো বড় কাগজে খুব কম লিখেছেন। আসলে লেখাটাই আসল। ভাল লিখতে পারলে যে কোন কাগজে বের হলেই হয়। একদিন না একদিন সকলের কাছেই লেখক পরিচিত হয়ে যাবেন। উত্তর বাংলার প্রতিটি জেলায় আমি গিয়েছি। যাঁরা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। সেইজন্যে স্বভাব-অভিযোগ সম্পর্কে আমি কিছুটা ওয়াকিবহাল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি কিছু কথা বলতে চাই। অবশ্য এ সব কথা সকলের কাছেই গ্রহণীয় হবে তা আমি বলছি না; তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। গ্রহণ-বর্জন পাঠকদের ওপর নির্ভর করছে।

প্রথমেই বলে রাখি আমার এই বক্তব্য যাঁরা ছোট পত্রিকা করতে ভালবাসেন, লেখালেখি করতে ভালবাসেন, সমষ্টিগতভাবে তাঁদেরকেই। কারণ এই সমস্যা শুধু উত্তর বাংলায় নয় গোটা পশ্চিমবঙ্গে। মফস্বলের সাহিত্য কর্মীরা ভাবেন কলকাতার কয়েকজন নামী লেখকদের লেখা এনে ছাপলে কাজ হবে। তাঁদের ধারণা ঐ সব বড় লেখকেরা নিজেদের লেখার পাশে ছোটদের লেখা আগ্রহ সহকারে পড়বেন। পড়ে যদি ভাল লাগে তাহলে হয়তো বড় কাগজের জন্য লেখা চাইবেন। অনেকে আবার বড় লেখকদের লেখা ছাপান পত্রিকার মান বাড়াবার জন্যে। বাস্তবে কিন্তু তা হয় না। প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা খুব কম জনই নতুন লেখা দেন। পুরানো বাক্সে লেখাটাই অন্য কারোকে দিয়ে কপি করিয়ে দেন। লেখা ছাপা হলে পত্রিকা উল্টিয়ে দেখেন না। অনেকে আবার না পড়েই মন্তব্য করেন। এই মন্তব্য কখনোই খারাপ হয় না।

এটাই হচ্ছে মজা। সেইজন্যে ছোট ছোট

পত্রিকা যাঁরা করেন তাঁদেরকে অনুরোধ, বড় লেখকদের লেখা নাই বা ছাপলেন! নিজেদের ভাল লেখা দিয়েই সমৃদ্ধ করুন না অনেক পরিশ্রমের ফসলগুলিকে।

ছোট ছোট পত্রিকার লেখকবৃন্দ মনে করেন প্রতিষ্ঠিত লেখকদের ভালবাসা পেলে তাঁদের করুণায় কোথাও না কোথাও স্থান পাওয়া যাবে। তা কিন্তু কখনোই হয় না। বরং এঁদের পাল্লায় পড়ে শতকরা নব্বইজন ঠকেন। তরুণ লেখকরা এঁদের হাতে গল্প জমা দিলে কখনোই প্রকাশ হয় না। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ঐ তরুণ লেখকের গল্প একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ লেখকের নামে বড় কাগজে ছাপা হয়েছে।

এই কাগজগুলির আর একটা অসুবিধা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা। ছোট ছোট দোকানগুলি বিজ্ঞাপন দিলেও তার মূল্য সামান্যই। আবার দোকানের নাম ছাপার সঙ্গে মালিকের নাম না ছাপলে টাকা পাওয়া যায় না। এই টাকা আদায় করতে শরীরের রক্ত জল করতে হয়। অনেক সময় বাজে মন্তব্যও শুনতে হয়। বড় কোম্পানীগুলি বিজ্ঞাপন দেন পাতা জুড়ে। অনেকদিন যাওয়ার পর মালিক একটা চেক দিলেন। ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখা গেল একাউন্টে টাকা নেই। এতদিনের পরিশ্রম বিফলে গেল। তার মানে, ছোট কাগজ করতে গিয়ে অনেক কিছু ঝামেলা পোহাতে হয় নি এই রকম সম্পাদক একটিও পাওয়া যাবে না। তারপর তো আছে ভাল লেখা সংগ্রহ। ভাল লেখা, মনের মত কোন লেখা পাওয়া কঠিন ব্যাপার। এরপর মফস্বলে আবার ভাল প্রেস নেই। প্রেস যে ভয়াবহ স্থান তা মফস্বলের কোন প্রেসে কাজ না করালে বিশ্বাস করা যাবে না। প্রেসের মালিক তো একটি কথাই শিখেছেন। তাদের কখনোই বলতে শুনবেন না কালকে আপনার সব কাজ হয়ে যাবে। কাল-কাল করতে করতে যে কত কাল হয়ে যায় তার কোন ইয়ত্তা নেই। তারপর মলাটের ছবি। ব্লক মেকার। অনেকে আবার টায়ার কেটে ব্লক তৈরী করেন। কেউ কেউ কাঠের ব্লক করে নিয়ে যান কলকাতা থেকে। মফস্বলের অনেক ছোট পত্রিকা আছে যা কলকাতা থেকে ছাপিয়ে নেওয়া। অনেকে পুরো পত্রিকাটাই ছাপান। এতে তো যাতায়াতের অনেক ঝক্কি থাকে। চিঠি লেখা-লেখি, লোক পাঠানো সে এক কাণ্ড। এতসব করেও সাহিত্যসেবীরা কাগজ বার করেন নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য। এই অস্তিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে অনেকের পারিবারিক জীবনে পর্যন্ত নানা অশান্তি লেগেই থাকে। এত বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও ছোট কাগজ এখনো বের হয়। এবং তাদের সংখ্যা বেড়েই চলে।

আসলে একদল তরুণের রক্তে সাহিত্যের নেশা থেকে যায় কিছু একটা সৃষ্টির তাগিদে। কোন কাগজে লেখা বের হলে তা সর্বসাধারণের ব্যাপার হয়ে যায়। এটা কখনোই ধারণা করা উচিত নয় যে ছোট কাগজ হলেই লোকে পড়ে না। ছোট কাগজ অনেকেই পড়েন। যদি কারুর পড়ে ভাল লেগে যায় তাহলে সে চিরদিন মনে রেখে দেবে। এই রকমই হয়েছে অমিয়ভূষণ মজুমদার, অশ্রুকুমার সিকদার, হরেন ঘোষ, দেবেশ রায়, সমীর রক্ষিৎ, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, অর্ণব সেন, সমরেশ মজুমদার, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ দেবের বেলায়। আসলে লেখাটা ভাল লিখতে হবে। ভাল লিখতে গেলে পড়াশুনাও চাই। দেশের লোকদের লেখা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের লোকেদের লেখাও পড়তে হবে। তারপর আছে অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা এক জায়গায় বসে হয় না। বহু লোকজনদের সঙ্গে মিশতে হয়। যদিও এইসব ধারণা নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবে আমার। আমার উপলব্ধি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। যাঁরা ছোট পত্রিকা বের করবেন তাঁদের ধৈর্যশক্তি থাকা দরকার। লেখা পড়তে হবে। লেখা নিয়ে সমালোচনা করতে হবে।

নিজের চারপাশে সাহিত্য আবহাওয়া গড়ে তোলা একান্ত দরকার। এইজন্যে সমবেতভাবে নিজেদের উন্নয়নে অংশীদার হওয়া একান্তভাবেই কর্তব্য। মার স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে শিশুর স্বাস্থ্য ভাল হতে পারে না। সেইজন্যে আমাদের সুস্থ ও প্রগতিশীল এবং বৈজ্ঞানিক চেতনায় সাহিত্য ভাবনা অত্যন্ত জরুরী।

মফঃস্বলে অনেক পত্র-পত্রিকা বের হয়। সেই পত্রিকা খুব সহজে প্রকাশ হয় না। প্রকাশের পেছনে আছে দুঃখের ইতিহাস। এটা সকলেই জানেন এবং এও সকলে জানেন এই পত্রিকাগুলো ঘিরে কিছু সরলমতি তরুণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গিয়ে সমাজের নানা স্তরের মানুষের কাছে হামেশাই হেয় হন।

যদি দেখা যায় কোন পত্রিকা সাধারণ মানুষের জীবনের সপক্ষে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির জন্যে সাহিত্য মাধ্যম বেছে নিয়েছেন এবং সেই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, সেই সমস্ত কাগজ এবং সংস্থাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আমাদের সবার একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। তাদের যদি সরকারী অনুদান, সরকারী প্রচার সংস্থার মাধ্যমে প্রচার করার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে মনে হয় ব্যাপারটা একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। শুধু প্রচার কেন, সরকার বিজ্ঞাপন দিয়ে, ক্রয় করে অনেক সাহায্য করতে পারেন। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, ছোট ছোট পত্রিকা ঘিরে যে সমস্ত তরুণ-তরুণীরা জড়ো হন তাঁদেরও সংগঠিত হতে হবে। কারণ সুস্থ সুন্দর সংস্কৃতির ইমারত গড়তে তাঁরাই আগামী দিনের শক্ত শ্রমিক।

হাসপাতালে

অজিত মণ্ডল
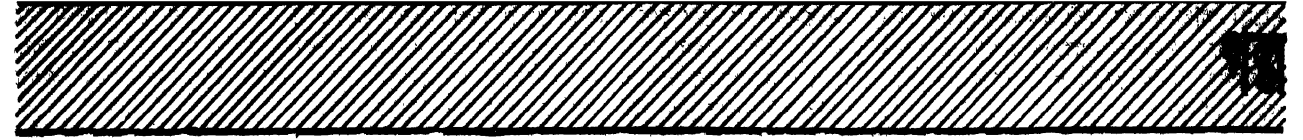
প্রথমে শরীরটা সঙ্কুচিত হল। লোহার পুরনো খাট। ছেঁড়া পচা ছোবড়ার গদির ওপর পুরনো ধোয়া একখানা চাদর বিছানো। চাদরটার গায়ে স্থানে স্থানে ওষুধের দাগ বা ধুলেও ওঠে না। পুরনো রোঁয়া ওঠা তুলোর লাল কম্বল, পায়ের কাছে পরিপাটি।

কিশোর বেডে ওঠার আগে একটু দাঁড়ালো। বাঁ হাতের কয়েকটি আঙুলে শয্যা স্পর্শ করল। তার হাতের আঙুল বেয়ে শিহরণ ছড়িয়ে পড়ে শিরা উপশিরায়।

যাওয়ার সময় ছোটবোনের হাতটা ধরে কিশোর বলল—'লালি আমার ভীষণ ভয় করছে রে।' লালি অসহায়ের মত চুপ করে তাকিয়ে থাকল। কিছুই বলল না প্রথমে। বাবার ডাকে সে একটু মাথা নাড়ল। আস্তে আস্তে বলে গেল—'সব ঠিক হয়ে যাবে কিছু ভেবো না।'

একটা উটমুখো ক্ষত-ব্রণ হাফপ্যান্ট পরা জমাদার তার বেডের কাছে এসে প্রস্রাব কফ রক্ত ব্যান্ডেজ ভর্তি প্যানটা টেনে নিয়ে নির্বিকার দৃষ্টিতে একবার কিশোরের দিকে তাকিয়ে চলে গেল। তার গায়ের গন্ধ, রক্তচোখ দেখে কিশোরের গা গুলিয়ে উঠল।

কোথা থেকে ঢং ঢং করে ঘণ্টা পেটানোর শব্দ শোনা যায়। বাড়ীর লোকেরা যে যার ঘরে ফিরে গেল। দু'একজন তখনো বসে অসুস্থ আত্মীয়-দের পাশে।

কিশোরের বুক-পেটের মাঝামাঝি যন্ত্রণা শুরু হয়। প্রথমে চিন চিন করতে থাকে। কিশোর জানে এটা ক্রমশঃ বাড়বে। হাসপাতালে আসার আগের দিন যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়েছিল সে। ডাক্তারের ওষুধে প্রথমে কাজ হত, এখন আর হয় না। বেশ কিছুদিন ধরে ডাক্তার অপারেশনের কথা বলছে। অপারেশনের কথা মনে হ'তে কিশোরের শরীর শির্ শির্ করে ওঠে। সেসময় পৃথিবীটাকে মনে হয় শীতের রাতে ফুটে ওঠা অচেনা এক গ্রহ। বন্ধুরা প্রিয়জনেরা হয়ে যায় দীর্ঘ ছায়ার মত।

তর ক্রমশ শরীরটাকে ভারী এবং শরীরের ভেতরটাকে হাল্কা করে দেয়। বুকের মধ্যে হাল্কা মেঘ বিস্তারিত হয়ে শৈশবের দিকে ছুটে যায়। তার শৈশব মানেই ত গ্রাম—গাছপালা, দীঘি, ধানক্ষেত। সহুরে ছেলেমেয়েদের মতন নয়। শিশুদের জগৎ কী ভীষণ সংকুচিত সংক্ষিপ্ত এখানে!

এক তরুণী বধূ তার স্বামীর শয্যাপাশে বসে। তার চোখের দৃষ্টিতে শূন্য জলাশয়, নিদাঘের বৈরাগ্য। তার মলিন আঁচলের আড়ালে লোকটির শীর্ণ মুখের কিছু অংশ ঢাকা পড়েছে। কিছুদিন আগে হয়তো ছিল তারুণ্যে ভরপুর! কিশোর চমকে ওঠে। বিছানায় মিশে যাওয়া প্রায় একটা কঙ্কালসার দেহ। একটু গভীর নজরে ধরা পড়ে সচল হৃদ্‌পিণ্ডের ঢেউ তার পাতলা বুকের চামড়ায়।

মেয়েটি নিঃসংকোচে স্বামীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। দারোয়ানের বারবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে সংকুচিত হয়ে স্বামীর মাথাটা সযত্নে বালিশের ওপর রেখে উঠে দাঁড়ালো।

রুগ্ন লোকটি তাকিয়ে আছে নিস্পলক দৃষ্টিতে। তখনও তার হাত মেয়েটির হাতের মুঠোয়। দরজার চৌকাঠের আড়ালে দারোয়ানের লালচে পাকানো গোঁফের প্রান্ত পুনরায় দেখা দিতেই মেয়েটি চঞ্চল হয়ে উঠল। লোকটি তখনো হাত ছাড়ে না। দারোয়ান এবার কাছে এসে দাঁড়ালো। তার লোমশ হাত, ভাঁটার মত চোখ নিয়ে কর্কশ স্বরে বলল,—'মাইজী আভি যাইয়ে।'

এই সময় লঘুপদ-সঞ্চারিণী এক নার্স রোগী-দের বড়ি ক্যাপসুল বিতরণ করতে করতে আসে। সিসটারটির মাথায় শ্বেত কপোতের মত শুভ্র ঝুঁটি; তার স্কার্টটা সঙ্কুচিত পেখমের মত দোদুল্যমান। পায়ের নিখুঁত সাদা কেট্‌সের মত তার মমতামাখানো দু'চোখ। মাঝে মাঝে তার দু'সারি দাঁতের জ্যোৎস্না ঝরে ঝরে পড়ে।

কিশোরের পাশের বেডে বছর তিরিশের এক সুদেহী যুবক। তার মাথায় রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল এলোমেলো। সে গুন গুন করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছিল। পায়ে হাঁটু অবধি সাদা ব্যান্ডেজ। ফুটবল খেলতে গিয়ে দুর্ঘটনা। একটা অপারেশনের ধকল গেছে তার ওপর। একটু ভাবুক, আবেগপ্রবণ। প্রায় দু'মাস ধরে হাস-পাতালে আছে। এই দু'মাসে রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা থেকে শেলী, কিট্‌স বাদ রাখেনি। খুব বেশী কথা বলতে ভালবাসে। কিছুক্ষণ আগেও তার সামনের এক মধ্যবয়সী কিডনীর রোগীর সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল। আত্মীয়স্বজনের সান্নিধ্য তার বেশীক্ষণ সহ্য হয় না। ওর যত ভাব অচেনা লোকের সঙ্গে। ছেলেটির নাম প্রকাশ। পোস্টগ্রাজুয়েটের ছাত্র।

সিসটার কিশোরের কাছাকাছি এসে প্রকাশের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে। উজ্জ্বল মুখখানায় ক্রমশ ফুটে ওঠে সতেজ গোলাপী আভা। এক অচেনা আড়ষ্ট অনুভূতি তার পাতলা দু'ঠোঁটে, তার টানা দু'চোখের কোণে আলোছায়া সৃষ্টি করে—কিশোর স্পষ্ট দেখতে পায়। প্রকাশের দৃষ্টি স্থির, তীরের ফলার মত তীক্ষ্ণ। সিসটারের লঘুপদে অস্থিরতা। সে পালিয়ে যায়। কিশোরের শয্যার কাছে এসে বড়ির বদলে এক ঝিলিক হাসি বিতরণ করে চলে গেল। তার আর একপাশে পঞ্চাশোর্ধ এক বৃদ্ধ, একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দু'দিন আগে হার্ণিয়া অপারেশন হয়েছে, আস্তে ফিস ফিস করে বলে ওঠেন—'মেয়েটিকে দেখলেই ভাল লাগে।'

কিশোর এখন একা। কেউ কেউ বসে আত্মীয় পরিজনদের দেওয়া ফল খাচ্ছে। কেউ এরই মধ্যে শুয়ে পড়েছে চোখ বুজে। অলসভঙ্গী, পিঠে বালিশ রেখে কোন বয়স্ক লোক নাক টিপে রেচককুম্ভক করছে। প্রকাশ তার বালিশের নিচে থেকে একখানা গল্পের বই বের করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

প্রকাশ। আপনার কি হয়েছে?

কিশোর। ঠিক জানিনে, সম্ভবত গ্যাসটিক...।

প্রকাশ। অপারেবুল্?

কিশোর। বোধহয়, সেইরকম শুনছি।

কিশোরের মাথার কাছে জানালা। জানালার ওপারে একটা ছোট্ট বাগান—এখন মরশুমী ফুল আলো করে আছে। ওয়ার্ডে হাউসস্টাফ ইন্‌টারনরা স্টেথো গলায় ঝুলিয়ে ঘোরাফেরা করছে। এখন করিডোরে ম্লান আলো। ইতিমধ্যে বড় ডাক্তারবাবু রোগীদের দেখে গেলেন। সঙ্গে হাউসস্টাফ আর ইন্‌টারনদের জটলা। তারা রোগীদের বুক, পেট, গলা, ঠ্যাং টিপেটুপে উল্টেপাল্টে দেখল। স্টেথো বসাল নানান জায়গায়। সঙ্গে কয়েকজন সিসটার দ্রুত চলাফেরা করছে।

কিছুক্ষণ বাদেই রাতের খাবার। কিশোরের এ আর এক অভিজ্ঞতা। হাসপাতালের খাবার সম্পূর্ণ এক ভিন্ন প্রণালীর। এর স্বাদগন্ধই আলাদা—সুস্থ মানুষের কাছে পরিত্যাজ্য।

সারাটা রাত প্রায় কিশোর ঘুমুতে পারল না। রোগীদের কাতরানিতে মাঝে মাঝে সে চমকে ওঠে। চোখ দুটো টন টন করে। সামনের লোকটির নাকে অক্সিজেনের নল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটু আগেই সিসটার আর হাউসস্টাফদের ছুটোছুটি দেখে সে ভয় পেয়েছিল। লোকটার দুটো চোখ ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। হেঁচকি উঠছে ঘন ঘন। একজন ছোকরা ডাক্তার তাড়াতাড়ি একটা ইনটারভেনাস ইনজেকশন দিল। একজন বড় ডাক্তার এসে নাড়ি টিপে দেখলেন। অক্সিজেনের নলটাকে একটু ঠিকঠাক করে দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাথা নেড়ে চলে গেলেন। ডাক্তার ছাত্র এবং সিসটাররাও চলে গেল একে একে।

কিশোর বুঝতে পারল লোকটির অন্তিম অবস্থা। বিকেলবেলা তার জ্ঞান ছিল। পাশে

ছিল যুবতী স্ত্রী। আসন্ন বিচ্ছেদের আশংকায় তারা কি গভীর আশ্লেষে আচ্ছন্ন ছিল তখন। কিশোর এ দৃশ্য কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। সে উপুড় হয়ে দু'চোখ বন্ধ করে।

তখন রাত্রি কত? কে জানে। একটু তন্দ্রার মত দু'চোখে ধূসর পর্দা। হঠাৎ চাপা স্বরে ঘুম ভেঙে যায়। একটুখানি তাকিয়ে পরক্ষণেই চোখ বুজে ফেলে সে কানদুটো খাড়া রাখে।

আপনি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছেন।

আপনার কাছে বাড়াবাড়ি হতে পারে, আমার কাছে নয়।

আর দিনতিনেক বাদেই আপনার রিলিজ...

কিন্তু আমাদের নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে।

না।

না কেন?

জানি না।

একটুখানি চুপ। কয়েকটা জিনিস নিয়ে সিসটার দ্রুত চলে যায়। আবার নিঃশব্দ প্রহর। মাঝে মাঝে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর গোঙানির শব্দ—হেঁচকি। কিশোরের পাশে আর একটি খাটে বৃদ্ধটির সমানে নাক ডাকছে। কিশোর চোখ বুজেই ঘরখানার অস্তিত্ব অনুভব করে।

একি এখনো জেগে আছেন?

ঘুম আসছে না।

ইস্—।

এই শুনুন, মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবেন?

আহ্ ছাড়ুন, কি ভেবেছেন......, কেউ দেখে ফেললে কি হবে জানেন? আমার চাকরিটা যাবে। আপনার কি?

—তা'হলে আমার কপালে একটু হাত রাখবেন না?

একটুখানি নীরবতা। বাইরের একটা ঘড়িতে রাত্রি তিনটে বাজল।

বেশ, যান আমি ঘুমুব।

কিশোরের খুব ইচ্ছে হল একটুখানি চেয়ে দেখে। সাহস হল না।

আচ্ছা, কিন্তু একবার।

না না কিছু দরকার নেই। আমি কালকেই চলে যাব। আপনার চাকরি যাবে না ভয় নেই।

আবার নিস্তব্ধতা। সামনের বেড থেকে গোঙানি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। খস খস শব্দে সিসটার দ্রুত চলে গেল। একটু বাদে দু'জন হাউসস্টাফ এল। তাদের অনুচ্চ স্বরে কিশোর বুঝতে পারল লোকটির আয়ু শেষ অংকে।

কিশোর বেডের ওপর উঠে বসল। সে দেখতে পেল একই সময় আরও দু একজন উঠে বসেছে। একজন তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো। ডাক্তারের নিষেধকে সে প্রায় আমলই দিল না। কিশোরের পাশের বেডের বৃদ্ধটি হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাপা গলায় বলে উঠল: হায় ভগবান। ছেলেটা মরে গেলে ওর কচি বউ আর মেয়েটা কোথায় দাঁড়াবে কে জানে।

নতুন আর একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার এনে বসানো হল তার মাথার কাছে। একজন ডাক্তার লোকটির নাড়ী টিপে বসে আছে। সিসটারটির মুখে উদ্বেগ, চোখদুটো স্থির। -সে লোকটির মুখের ওপর ঝুঁকে লক্ষ্য করছে। মাঝে মাঝে সিলিন্ডারের নলটা ঠিক করে দিচ্ছে।

তখন রাত্রি প্রায় শেষ। লোকটির গলায় ঘড় ঘড় আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসছে। পৃথিবীর স্পন্দনও বুঝি গেছে থেমে। ধারে কাছে একটা পাখি উড়ে গেল ডাকতে ডাকতে। আবার নিস্তব্ধতা। একজন ডাক্তার ইনটারকার্ডিয়া ইনজেকশান দিল। উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে আর দু'জন হাউসস্টাফ আর সিসটার। যারা উঠে বসেছিল তাদের অনেকেই ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে।

কিশোরের চোখে ঘুম নেই। এমন প্রিয় পরিজন বিচ্ছিন্ন কোন মৃত্যুর কল্পনা তার কোনদিন ছিল না। লোকটার পাণ্ডুর শীর্ণ মুখখানা দেখা যায়। চোখের পাতা খুলে থেকে থেকে সে কাউকে খুঁজছে কিশোরের মনে হয়। তার একখানা হাত কঙ্কালের হাতের মতন বেরিয়ে আছে কম্বলের প্রান্তে।

কয়েকটা মুহূর্ত। একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় কিশোর। হঠাৎ সে সচকিত হয়ে দেখে হাউসস্টাফ-ডাক্তাররা চলে যাচ্ছে। সিসটার লোকটার আপদমস্তক ঢেকে দেয়। একজন জমাদার গোছের লোক এসে বেডটা ঘিরে দিল সাদাপর্দায়।

অনেকেই জানতে পারল না একটা মৃত্যুর ঘটনা নিঃশব্দে ঘটে গেল ঘরটাতে। পাশের বৃদ্ধ লোকটার নাক ডাকছে পূর্ববৎ। অপর পাশের পাভাঙা ছেলেটি চোখ বুজেই বলে উঠল—'ফিনিশড্!'

কিশোর নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার ঠিক সামনে শায়িত মৃত লোকটির দিকে, যার চারপাশে সাদা পর্দার ঘেরাটোপ। তার চোখের সামনে লোকটার অল্পবয়সী বউটির মুখ ভেসে উঠল, বিকেলবেলা স্বামীর মাথাটা কোলে নিয়ে যে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। ওদের একটা ছোট মেয়ে আছে। সে তার বাবাকে আর কোনদিনই দেখবে না।

একটু একটু করে সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। আকাশ থেকে রাজপথে, বাড়ির কার্নিসে। কিশোরের জানালায় একটা বুড়ো তালগাছ। সহরের বুকে তালগাছের কোন শ্রী থাকে না। যেন খাপছাড়া এক ভিনদেশী পথিক পথ হারিয়ে পথ খুঁজছে মনে হয়।

কিশোর বাথরুমে যেতে যেতে দেখতে পেল প্রকাশ আর সিসটারটিকে। নির্জন করিডোরের একপ্রান্তে প্রকাশ দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উদাস চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে। সিসটার মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে কি-সব বলছে। তার হাতে ওষুধ, সাদা ব্যান্ডেজ, সিরিঞ্জ ইত্যাদির একটা ছোট ট্রে।

কিশোর বেডে ফিরে এল যখন, তার পেটের মধ্যে আবার যন্ত্রণার চিন চিন করে উঠছে। জানালার গ্রিলে হাত রেখে ঝুঁকে একটু সময় সে দাঁড়ালো। কিশোর দেখতে পায় হাসপাতালের একটা বাড়ি থেকে সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা ডেডবডি নিয়ে কিছু লোক বেরুলো। একটা সস্তা খাট, কিছু ফুল আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নারত এক বৃদ্ধ—

হাসপাতালের দিনের শুরু এমনি করেই কিশোরের চোখে ধরা পড়ে। এখানে আকাশে বসন্ত নেই। গাছের সতেজ পাতায় বিষণ্ণ রোদ্দুরের রঙ।

হাসপাতালের প্রশস্ত চত্বরে সিসটার আর স্টাফনার্সদের মনে হয় জীবনের প্রতীক। চারিদিকের রোগাতুর মানুষের আর্তনাদ আর মৃত্যুর হাহাকারের মাঝখানে তারা যেন প্রাণের আরাম। কিশোর দেখতে পায় শ্বেত কপোতের মত সোনালী রোদ্দুরে সাঁতার কেটে কিছু সিসটার হাসপাতালের পথে মিলিয়ে গেল। দিনের ডিউটি শুরু হল এদের। একই পথে রাতের ক্লান্তি বহন করে সিসটাররা চলেছে নিজের নিজের ঘরের দিকে।

মৃদু শীতল হাওয়া এসে কিশোরের চোখে-মুখে পরশ দিয়ে যায়। পেছনে ফিরে দেখতে পায় সাদা পর্দার ঘেরাটোপের ভেতর থেকে সদ্যপ্রয়াত লোকটির মাথার একটুখানি অংশ। তার দীর্ঘ অযত্নবর্ধিত কয়েকটা চুল বাতাসে নড়ছে। ঘেরাটোপের সাদা পর্দাটা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে সকালের আলোয়।

এ সময় প্রকাশ দ্রুত এসে বেডে শুয়ে পড়ল। তার দু'চোখ দিশেহারা ম্লান। সে কালকেই বলেছে হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যাবে। হাসপাতালে আর সে থাকতে চায় না।

কিশোরের শরীরে আবার যন্ত্রণার গুঞ্জন। তার চোখ লাল, নাকের পাটা ফুলে উঠছে। প্রকাশ ওর দিকে তাকাল। প্রকাশের চোখে অভিমানের নীল পর্দা। এ সময় পৃথিবীর রোদে ঝলমল।

ক্রমশ হাসপাতালের নির্মম হৃদ্‌যন্ত্র দ্রুত হয়। গাড়ি, মানুষজন, ছাত্রছাত্রী, রেডক্রশ ভ্যান, রোগী, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, ডাক্তার, নার্স, দালাল—নানান পোশাক আর পেশার মানুষের ভীড়ে জমজমাট এর চত্বর।

একটা বুকফাটা কান্না ক্রমশ স্পষ্ট হয়। কয়েকজন লোক এসে কিশোরের সামনের বেড থেকে স্ট্রেচারে করে মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে গেল। কিশোর মুখ ফিরিয়ে নেয়। কান্না ক্রমশ স্তিমিত, গুমরে ওঠা চাপা সুরের মত ছড়িয়ে পড়ে মিলিয়ে যায়। এমনি করে কিছু সময় বিদীর্ণ হয়ে ফুটে থাকে শোকের উচ্ছ্বাস।

কিছুক্ষণ ধরে প্রকাশ পা'টাকে টেনে টেনে ঘরবার করেছে। দুপুরের দিকে তার সঙ্গে একজন ছেলে এসে ব্যাগে ভরে নিল ওষুধ জামাকাপড়। কিশোরের দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে প্রকাশ বলল—'চলি...'

কিশোরের পাশের বিছানা শূন্য। সামনের বিছানা শূন্য। ক্রমশ বিকেলের আলো মিলিয়ে গিয়ে ঘরে-বাইরে ফুটে ওঠে বিজলী আলো। ঝলমলে পরিপাটি পোশাকে সিসটারের চেনা-মুখ উঁকি দেয়। পাশের ছোট্ট ট্রলিতে ওষুধ।

[শেষাংশ ১৮ পৃষ্ঠায়]

রাত্রি শেষের আকাঙ্ক্ষা

মৈনাক হাসান

ক্লেদাক্ত অন্ধকার রাত্রির পরে
খসে খসে পড়ে প্রতিটি অঙ্গের জীবন
পূবের আকাশে রক্তাক্ত সজীবতার প্রতিচ্ছবি
ভেসে ওঠে জীবন হয়ে...........

আশার পোতা বীজ মহীরুহ হয়ে
মনের অঙ্গনে দাপাদাপি করে জ্বলন্ত প্রাণ
ছিনিয়ে আনবে চেতনার আকাশ
দুর্বার, অক্ষয় এক প্রশস্ত ফসলের জমিতে
উষ্ণতা দেবে হিমঘরের বারান্দা থেকে......
প্রাণের সঞ্চার হয় রঙিন আকাশে
অন্ধকারের ক্লীবতা ক্ষুণ্ণ করে—পথচলা
উন্দাম কলরবে পচাগলা বীভৎস সময়ের—
পর্দা ঢাকা মুখের উপরে ছোড়ে চাবুক—
হিংস্রতা নয়—আনে শান্তির ললিতবাণী
পাতা ঝরা শেষ—আসে গুঞ্জন
অম্লান গতিধারাতে দুর্বার সেই পদক্ষেপ
নতুন প্রভাতের আকাশে এঁকে দ্যায় পদচিহ্ন।

কবে তিলোত্তমা হবে?

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

কলকাতা ভিজে গ্যাছে,
এইমাত্র একপশলা মেঘ
ওর বুক ভিজিয়েছে।
ট্রাম লাইনের দুপাশের ঘাসগুলো
সবুজে সবুজ।
তবুও এখানে-ওখানে কিছু প্যাচপেচে কাদা
আমার মনটাকে কেন যেন খুবলে দেয়।

মিনিগুলো বাদুরঝোলা,
প্রাইভেট মানুষের খোঁয়াড়
আর ট্যাক্সি আমার পাজামায় কাদা ছিটিয়ে
কাটা হাত সুন্দরী দিদিমণি বয়ে নিয়ে গেল।
হায় রুপসী কলকাতা
কবে তুমি তিলোত্তমা হবে?

পুরমন্ত্রীর ঘাম জমে জমে,
বাবুদের দশলাখি প্যাঁচ হতে
গা-হাত পা ঝাড়া হয়ে
কবে জীবনানন্দ হবে?
বিশাল সুবিশাল সৌধের পাশেই
টালি ছাওয়া বস্তির মা
শীর্ণ বুক খুলে স্তন দ্যায় সন্তানেরে,
হায়রে কলকাতা, বর্ষা এসে গেল
ঘরে জল পড়ে,
খিদের জ্বালায় ভিজে কাঁথায় শুয়ে শিশু
মহাত্মারে ডাকে?
কলকাতা, এ সমাজ
এখন তো বাবুদের তাবে।

কলকাতার শুকানো ডালে ডালে
এ বর্ষণে পাতা ছড়াবে কি?
বৃক্ষরোপণ উৎসবে কলকাতা আমাব
সবুজের ওড়না জড়াবে কি?
শ্রমিকের কালো আত্মা
যক্ষ্মাকীট বুকে, চিমনীর কালো ধোঁয়া
বর্ষার ছিটেয় কেমন থেকে-থেকে কাঁপে
হায় রুপসী কলকাতা,
কবে তুমি আমাদের জীবনের হবে?

যিশু

মুকুলেশ বিশ্বাস

আজকাল বুঝিনা আমি
হৃদয়কে আড়াল করে—
আত্মহত্যার মসৃণ খোলস
কেমন করে জড়িয়ে আছে
পা থেকে মাথা—আদিগন্ত শরীর।
নেকড়ের থেকে হিংস্র-সাপের মতো
জুড়ে আছে প্রকাশ্য রাজপথ;
চলন্ত ট্রেনের গতিতে বেগবান
আকাঙ্ক্ষায় ভরা নদীর মতো,
কোনমতেই বুঝি না—এসব।
চোখের 'পরে চোখ রেখে
আজকাল কেউ কথা বলে না;
যদি গোপন পথে ঢুকে পড়ে
সূর্যের আলো—
হৃদয়েও ঘটতে পারে অগ্ন্যুৎপাত!
তাই হিংসা বর্জন করে
আমি তাবৎ শান্তির প্রবক্তা—যিশু;
তবু যদি চাও—বলে দিতে পারি
কোন্ মণিকোঠায় গোপন রয়েছে
আমার মৃত্যুবাণ—
বুকের মধ্যে আছে সবুজ উন্দাম
বিবেকের সুরম্য লাশকাটা ঘর
সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র জহ্লাদের দল;
তাদের হাতে অমৃত পান করে
শেষবারের মতো নীলকণ্ঠ হতে চলেছি আমি।

আছেন

অর্ধেন্দুশেখর দেব

মাননীয়গণ, এইমাত্র শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরে এলাম।
কতিপয় বালক-মুণ্ডিত-মস্তকের ভিড়ে নিজেকে সম্রাট কণিষ্ক মনে
করতে করতে নিজেরই লম্বমান কামিজের ঝুলে আত্মরক্ষা বেঁধে নিয়েছি।

আমাদের কেউ-কেউ গিয়েছিল বিহারের জৈন-মন্দিরে ছুটির সৌন্দর্য
ভোগ করতে।

অথবা, তারা শিখিয়েছিল সমুদ্রগামী জাহাজে একদা ঘোড়া ব্যবসায়ীরা
কি মানবিক ঠাট্টায় বিশুদ্ধ তেজী ঘোড়াগুলোকে জলে ফেলে দিত

এবং সৌরশক্তির মোহে ওই সব বালকেরা মহালক্ষ্মীর মণ্ডপে
শ্বেত-আলপনা দিতে ব্যস্ত অমহিলার কাছে ভালোবাসা জানিয়েছিল

তারাই যাদুঘরে গিয়ে কি দারুণ শব্দে ও শারীরিকতায় আদর
জানিয়েছিল পঞ্চচূড় যক্ষিণীদের;

একদিন দ্বিতীয় প্রহরের প্রাক্কালে তারাই অশরীরী রসের সন্ধান
শিখতে গিয়ে গেছেলের কাছে নতজানু হয়েছিল

আজও তাঁরা আছেন স্বাদেশিক এই পলিমাটিতে, সামাজিক
স্বাস্থ্যে, এক একটি বিরাট দালানের পিতা হয়ে

তিনি, যিনি প্রত্যহ কত শব্দ বললেন নোটবুকে টুকে রাখতেন, তিনিও

যিনি মাংস-বিক্রেতা এবং স্বর্ণ-বিক্রেতার স্বাস্থ্যের মাসান্তিক
পরিমাপ সংগ্রহ করতেন

তিনিও আছেন

তাঁদের চারপাশে নির্মল ভুলগুলো আজ খা-খা করছে।

শিল্প-সংস্কৃতি

ফিরে দেখা চ্যাপলিন এবং প্রাসংগিক কয়েকটি প্রশ্ন

দেবাশীষ দত্ত

আবার চার্লি চ্যাপলিন কলকাতায় ফিরে এলেন। এলেন এবং কাঁপিয়ে গেলেন। ঠিকভাবে বলতে গেলে, নাড়া দিয়ে গেলেন কলকাতার দর্শকমানসকে। হাস্যরসের অফুরন্ত প্রস্রবনে বলীয়ান চ্যাপলিনের অগণিত ছবি হয়ত কলকাতার মানুষ দেখেছে সংখ্যাতীতবার, কিন্তু এবারের মতোন চিন্তার ভিত নাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন, অথচ সহজ সুরের ছবি দেখার সুযোগ হয়ত কলকাতার দর্শকসমাজ আগে পায় নি। এই প্রথম সেই ছবি কলকাতায় বাণিজ্যিক মুক্তি পেল। এর আগে ফিল্ম সোসাইটির সদস্যরা বছর পনেরো আগে এ-ছবির স্বাদগ্রহণে সফলকাম হয়েছিলেন। কিন্তু অতীতের ধূসর স্মৃতির ঢাকনা সরিয়ে তাঁরাও এ ছবিকে নতুন চোখে দেখার সুযোগ পেয়ে গেলেন বাণিজ্যিক মুক্তির কল্যাণে। সেবার যেমন অনন্য সুযোগের ব্যবহারে অনুস্বেগচিত্ত ছিলেন তাঁরা নির্দিষ্ট প্রদর্শনীর সুবাদে, এবার তাঁদেরও জনারণ্যের ভিড়ে মিশে গিয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছে একটি টিকেটের জন্য যার চাহিদা সময়ের অগ্রগতিতে ক্রমবর্ধমান।

এই সেই চ্যাপলিনের 'আধুনিক সময়ের' ছবি। আক্ষরিক অর্থেই। নাম 'মডার্ন টাইমস্'। আশ্চর্য, ১৯৩৫-৩৬এর সেই আধুনিক সময় এখনও তো সাদৃশ্যকরভাবে তেমনই 'আধুনিক'। সময়ের দর্পণে যা প্রতিভাত হয়েছিল তাঁর ছবিতে, তার আগাপাশতলা ছায়াপাত কি আমরা এখনও দেখি না সমসাময়িক সমাজে, রাষ্ট্র-কাঠামোয় আর শিল্পবাণিজ্যের আমূল চেহারায়? এত তীব্রভাবে 'আধুনিক' ছবি গত প'য়তাল্লিশ বছরের মধ্যে আর ক'টাই বা তৈরী হয়েছে। হয়তো ভারতবর্ষের মতো কিছু দুর্ভাগ্য দেশে সে-ধরনের ছবি তৈরি হয়েও ক্যানবন্দী হয়ে পড়ে থাকতে পারে, কিন্তু সরল সত্য যা, তা হল দর্শকরা তার হদিশ পায় নি।

চ্যাপলিনের এ-ছবি তৈরী সবাক চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরুর ব্রাহ্মমুহূর্তে। নির্বাক চলচ্চিত্র নির্মাণের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে চ্যাপলিন এ-ছবি তৈরি করলেন। আর কে না জানে, চ্যাপলিনের যে কোন নতুন ছবিই নতুনতর ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত হয়েই দর্শকের দরবারে হাজির হয়। হাস্যরসের প্রদর্শনী চ্যাপলিনের সব ছবিতেই সমাজভাবনার স্তর ছুঁয়ে যায়, ব্যক্তিভাবনার সীমারেখা ছাড়িয়ে দর্শকমানসকে সেগুলো ব্যক্তি-অতীত ভাবনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের ফাঁক ও ফাঁকির দিগ্‌দর্শনে প্ররোচিত করে। এ-ছবিতে সেই সিদ্ধির এক নতুনতর দ্যোতনা যোজিত হল। চ্যাপলিন আঘাত করলেন যন্ত্রসভ্যতার বুদ্ধিহীন বর্বরতাকে, শিল্প প্রয়াসের যান্ত্রিকতা হল তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। ব্যক্তিগত উদ্যোগের মুনাফালালসা, তার সংগে কাঁচামাল-প্রতিম শ্রমজীবী মানুষের হৃদয়হীন শোষণ আর মানবিক মূল্যবোধের অপহ্নব-জনিত মোটাদাগের ডামাডোলগুলো তাঁর ছবিতে স্বচেহারায় আত্মপ্রকাশ করল। সে-চিত্রায়ণ দেখে শ্রেষ্ঠীকুল সভয়ে চোখ বুজলেন, চ্যাপলিনের প্রতি বিদ্বেষে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন আর নিপীড়িত মানুষজন নিজের চেহারা পর্দায় দেখে সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত হয়ে নতুন ভাবনায় ভাবিত হলেন। চ্যাপলিনের ছবি বিবেকী মানুষের চিন্তার রাজ্যে স্থায়ী স্থান দখল করে নিল অনায়াসেই। সেলুলয়েডের শক্তি নতুন শক্তিতে বলীয়ান হল, নতুন অর্থে অন্বিত হয়ে তা মানুষকে পথ দেখানোর কাজে নিয়োজিত হল শিল্পেরই অমোঘ নির্দেশে।

চ্যাপলিন যখন 'মডার্ণ টাইমস্' তৈরি করলেন, তখন চলচ্চিত্রে শব্দের আবির্ভাব ঘটে গেছে। এ ছবির জন্য তিনি একটি কেন্দ্রীয় সুর রচনা করলেন যা ছবিতে ঘুরে-ফিরে এসেছে, এ ছাড়া টুকরো টুকরো সুরের ব্যবহার তো আছেই। একটা গানও গাইলেন তিনি নিজেই যা এক ধরনের মজা এনে দেয়। গানটি ছদ্ম ফরাসী, ইতালীয় এবং স্পেনীয় ভাষার সংমিশ্রণে তৈরি। এ গানটির আপাত-অর্থহীনতা চাপা পড়ে যায় মূকাভিনয়ের দুর্দান্ত সফলতায় ও কৌশলে। নির্বাক চলচ্চিত্রের কবি চ্যাপলিন এভাবেই সবাক চলচ্চিত্রকে এক-হাত নিলেন। তা না হলে এ ছবিতে শব্দ বলতে তো শুধু তাঁর কৃত সংগীত এবং বিশেষ শব্দের সমাহার। এ ছবিতে তিনি এবং অন্যান্য চরিত্রগুলো তো নির্বাক, শুধু দৃশ্যের সংগঠনে এবং ঘটনার রূপারোপে শব্দহীন মুহূর্তগুলো প্রচন্ড রকমের সবাক ও মূর্ত হয়ে ওঠে। চ্যাপলিন বোধহয় বুঝেছিলেন এবং আন্তরিকভাবে ভেবেও ছিলেন, সবাক চলচ্চিত্রে তাঁর চিরপরিচিত ভবঘুরে চরিত্রটি যথোচিত প্রাণ পাবে না, তাই চলচ্চিত্রের সবাক মুহূর্তেও নিঃশব্দ অভিনয়কে তিনি অংগীকার করেছেন এতখানি আন্তরিকতার সংগে। হৃদয়হীন শিল্পায়ণের চলচ্চিত্ররূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁর ছবিতে সাব-টাইটেলেরও দরকার পড়ে না এবং শব্দের অনুপস্থিতি তাঁর ছবির রসগ্রহণে এতটুকু বাধার সৃষ্টি করে না।

এ-ছবির মেজাজ স্থির হয়ে যায় একপাল ভেড়ার দৃশ্য কাট্ করে কারখানার দিকে ধাবমান মজুরের রূপচিত্র দেখানোর সংগে সংগেই। কারখানার মালিক শুধু তার অফিসে বসে শ্রমিকদের হুকুমই করে যায়, আর চ্যাপলিন তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে যান্ত্রিক নিয়মে নাট-বল্টু-স্ক্রুর রাজ্যে ঘর্মাক্ত পরিশ্রম দিয়ে চলে, একটা মাছি পর্যন্ত তাড়ানোর সময় পর্যন্ত তাদের জোটে না। কর্মহীন অবস্থাতেও চ্যাপলিন অজান্তে নাট-বল্টু টাইট্ করার মূকাভিনয় করে চলেন। এমনই নিদারুণ, নিষ্পেষণকারী অস্তিত্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মজুরের! কি দক্ষ, অনুভূতিময় অথচ শৈল্পিক চিত্রায়ণ সারা ছবি জুড়ে! আজ চলচ্চিত্রের এই সর্বব্যাপী প্রগতি ও বিকাশের যুগে কি অমোঘ তাঁর উপস্থিতি—কি চিন্তায়, কি প্রয়োগে এবং কি অভিনয়ে! কারখানায় নিয়ম-মাফিক খাওয়ার অবসরটুকুও মনে হয় জোর করে খাওয়ানোর পর্ব—সময়ের অভাবহেতু আর মুনাফার প্রয়োজনে নিশ্ছিদ্র কর্মপ্রয়াসের তাগিদে। চ্যাপলিন বারবার জেলে যাচ্ছেন আর বেরুচ্ছেন, এমন কি এক অনাথিনীর সংগে তাঁর প্রণয়পর্বটুকুও এর মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছে। খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্তের সমাহারে রচিত এ-ছবিকে কখনোই পারম্পর্যহীন মনে হয় না, কখনোই মনে হয় না টেনেটুনে এ-ছবিকে নব্বুই মিনিটের চেহারা দেওয়া হয়েছে। এতদিন পরেও এ-ছবি সমান উজ্জ্বল, সমান চিত্তবিনোদনকারী।

এ ছবি জার্মানী ও ইতালিতে নিষিদ্ধ হয়েছিল কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন হওয়ার অজুহাতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পপতিরা এ ছবি দেখে রুষ্ট হয়েছিলেন। চ্যাপলিনের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল এক মজুরের আশা-আকাঙ্খা, তার মোহভংগও এ ছবিতে বিধৃত হয়েছে অসামান্য শিল্পভাষায়। বণিক সভ্যতার ধ্বজাধারীরা তো কুপিত হবেনই। সেটাই তো স্বাভাবিক। আর শিল্পীর নবজন্ম তো এরকম ছবির মধ্য দিয়েই হয়। 'মডার্ণ টাইমস্'-এর পথ বেয়ে তাই চ্যাপলিন পরবর্তীকালে যুদ্ধের পটভূমিকায় তৈরী করলেন 'দি গ্রেট্ ডিক্টেটার' (১৯৪০)। যে চ্যাপলিন বলেছিলেন তাঁর 'ভবঘুরে' চরিত্রটি সম্বন্ধে 'মডার্ন টাইমস্' তৈরী করার পরে—

'I am sharpening the edge of his character so that people who have liked him vaguely will have to make up their minds',

তা পূর্ণতার রূপ নিল তাঁর পরবর্তী চিত্ররাজিতে। কিন্তু এই অন্তর্লীন ভাবনার বীজ নিহিত ছিল এই 'মডার্ন টাইমস্'-এর মধ্যেই।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার 'মডার্ন টাইমস্'-এর সূত্র ধরেই এবার হদিশ নেওয়া যাক আমাদের দেশের চলচ্চিত্র ভাবনার। কি অপরিসীম চিন্তার দৈন্য, কি ভাবনার অগভীরতা, কি সাহসের অভাব এই প্রসংগে আমাদের পীড়িত করে তোলে। ভাবতে কষ্ট হয়, চলচ্চিত্র-মাধ্যমের এত সম্ভাবনা

থাকা সত্ত্বেও কত দীন আমাদের উপলব্ধির জগৎ, কি দারিদ্র্যহীনতার কেন্দ্রে আমাদের দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অবস্থান। চিরকালই কি সত্যজিৎ 'Cinema's India' র থেকে যাবেন? তাঁর ব্যাপক শিল্প-সাফল্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর অসম্পূর্ণতার ফাঁক ভরাট করতে 'মডার্ন টাইমস্'-এর মতো সার্বিক প্রত্যয়ে উজ্জ্বল চলচ্চিত্র কি এই ভারতবর্ষের মতো নিষ্পেষণে জর্জরিত দেশে, এই দুঃখভারাক্রান্ত পরিমণ্ডলে জন্ম নেবে না? সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণালের উত্তরাধিকার আমাদের আছে, নবীন চলচ্চিত্রকার-দের মধ্যে নতুন চিন্তার দোলাচলও আমরা লক্ষ্য করছি, সথ্যু-বেনেগাল-মীর্জাও আমাদের আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-ও তো সত্যি, চলচ্চিত্র-রাজধানী বোম্বাই-এ 'নতুন ভাবধারা আর চেতনা'র কারবারী এক চিত্র পরিচালক তিন বৃদ্ধের যৌন-লালসার রগরগে কাহিনী-কেন্দ্রিক বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র তুলতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন না—এবং সেই বোম্বাইতে বসেই, যে বোম্বাই-এ সুতা-কল শ্রমিকরা দীর্ঘকালের ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন অনমনীয়, প্রতিহিংসাপরায়ণ মালিকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ঔপনিবেশিক শিল্পকাঠামোর উচ্ছিষ্ট-ভোগকারী এই ধরনের চিত্র পরিচালকরাই আবার চলচ্চিত্রে 'নতুন রীতি' আনার শ্লোগান তুলে গলা ভেঙে ফেলেন, ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের শরিক হোন, তার পরে বাণিজ্যিক সাফল্যের মুখ দেখে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পকর্মের জন্ম দেন। এই অপশিল্পের অচলায়তন ভাঙার 'মডার্ন টাইমস্' আমাদের দেশের সৎ, প্রগতিশীল চিত্র-নির্মাতাদের প্রেরণা জোগাক—এই আশাতেই শেষ করছি।

ঋত্বিক-এর "মা"

ম্যাক্সিম গোর্কীর অমর উপন্যাস 'মা' (The Mother) অবলম্বনে বের্টোল্ট ব্রেশ্‌টের নাটক Die Mütter প্রথম অভিনীত হয় বিপ্লবী রোজা লুক্সেমবর্গের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে, ১৯৩২ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে বার্লিনে। নাজী জার্মানীর শাসকশ্রেণীর সংবাদপত্রে এই নাটকটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়: "দেশের শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে...আইনশৃঙ্খলা বিলুপ্ত...অবিলম্বে এই নাটক বন্ধ হওয়া দরকার: নচেৎ সর্বনাশ।" খুব সঠিকভাবেই বুর্জোয়া সংবাদপত্রের সমালোচক আঁচ করতে পেরেছিলেন এই নাটকের প্রচণ্ড ক্ষমতাকে। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের পর থেকেই সারা ইউরোপ কমিউনিজমের ভূত দেখতে শুরু করেছিল। জার্মানীর নাজী-কর্তারাও তার থেকে আলাদা ছিলেন না।

'ঋত্বিক' সংস্থা আয়োজিত 'মা' নাটকের একটি দৃশ্য

পৃথিবীর সব দেশেই পুঁজিবাদের মূল চরিত্র কমবেশী একই রকম। ভারতেও পুঁজি-সামন্তবাদী মিশ্র অর্থনীতি ও সমাজযন্ত্রের নিয়ামকরা দুঃস্বপ্ন দেখছেন, সচেতন শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের প্রবল প্লাবনে ভেসে যাবার ভয়। শ্রমজীবী মানুষের সংগঠিত শক্তি ক্রমশঃই একটা দিগন্তের দিকে এগোচ্ছে। এই সময় ব্রেশ্‌টের নাটকটির মূল জার্মান ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত ও মঞ্চস্থ করার যে সাহসিক প্রয়াস ঋত্বিক দেখালেন, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। ব্রেশ্‌ট চর্চা এদেশে একেবারে নতুন কিছু নয়। কিন্তু যে ক'টি স্বল্প-সংখ্যক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছেন, ঋত্বিক সেই তালিকায় একটি উজ্জ্বল সংযোজন।

সাধারণতঃ অনুবাদ সাহিত্য বা নাটকের ক্ষেত্রে যা দেখা যায়, সেই ভাষাগত আড়ষ্টতা এক্ষেত্রে একেবারেই অনুপস্থিত। নাটকের দৃশ্যগুলিও বেশ স্বচ্ছন্দপ্রবাহী। শঙ্খ ঘোষের অনূদিত গান-গুলির প্রয়োগ ও সুর-সংযোজনা প্রশংসার দাবী রাখে, যদিও তা সর্বাংশে সঙ্গীত নয়। দৃশ্যপট রচনায় পরিচালকের মৌলিক চিন্তাভাবনার ছাপ আছে। বিশেষ করে ভ্লাসোভার ঘর। সুকলি-নভের কারখানা, জেলখানা, শ্রমিকদের মিছিল, তাদের সংগ্রহ কেন্দ্র প্রভৃতি দৃশ্য সুগ্রথিত। কিন্তু স্লাইডের এত ঘনঘন প্রয়োগ কতখানি অপরিহার্য ছিল তা পরিচালককে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। রুস্তভে ভেসভ্‌চিকভ-এর বাড়িতে গোপনে শ্রমিকদের শিক্ষাদানের পরি-কল্পনাটি বেশ আকর্ষণীয়। অভিনয়াংশে মূল চরিত্র ভ্লাসোভা এবং পাভেলের ভূমিকায় অত্যন্ত সাবলীল অভিনয় মনে দাগ কাটে। ভেসভচিকভের ভূমিকায় পরিচালক প্রণব চট্টো-প্যাধ্যায় স্বয়ং অভিনয় করেছেন যদিও, সে অভিনয় যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ হয় নি বলেই মনে হয়েছে। ক্র্যাচের ব্যবহার এবং সেই অনুযায়ী হাঁটাচলা মোটেই মানানসই হয় নি। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় অত্যন্ত সাধারণ স্তরের। তবে চর্চা এবং নিষ্ঠা থাকলে এ'রা প্রত্যেকেই ভালো অভিনয় করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। এক কথায় বলা চলে নাটকের অভিনয়ে, সংগীতে, ব্যবস্থাপনায় কোন বিশেষত্ব না থাকলেও মঞ্চ পরিকল্পনা, দৃশ্যগ্রন্থনা এবং আলোর ব্যবহার নাটকটিকে একঘেয়েমি কাটিয়ে ওঠার অবকাশ দিয়েছে।

কিংশুক রায়

এগিয়ে চল সর্বহারার দল...

শিল্পী : গৌতম ঘোষ দস্তিদার

শক্তির উৎস : গ্যাস
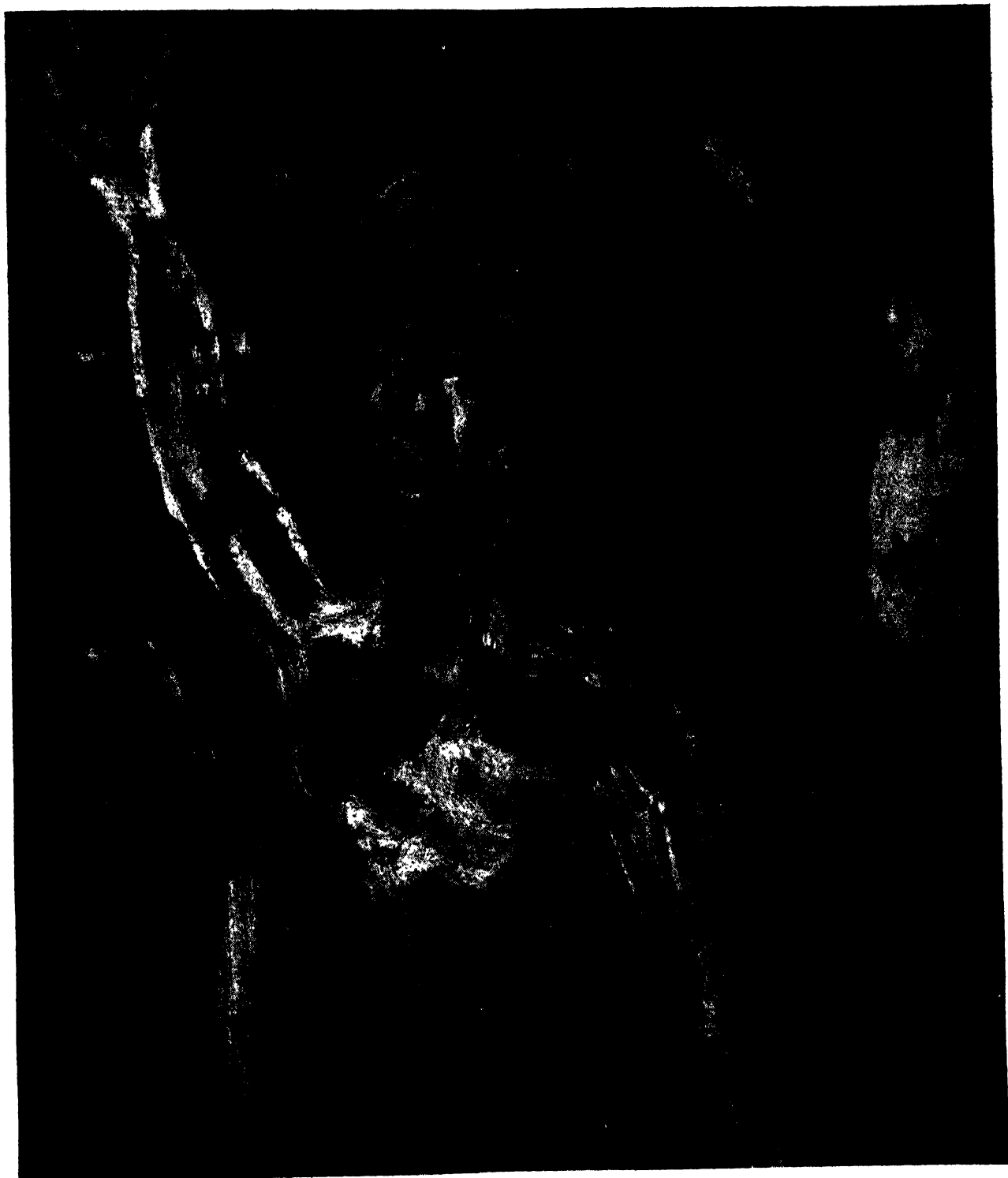
গ্যাস যদিও একটি পরিচিত শক্তি উৎস কিন্তু উন্নত দেশগুলিতেই এর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশী। শিল্পায়নের সুযোগ-সুবিধা যে-সব দেশ পাচ্ছে সেই সব দেশেই গ্যাস অন্যতম শক্তি উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গ্যাস মূলতঃ জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়ে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, গ্যাসের ব্যবহার খুব সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, গ্যাস ব্যবহারে কোন ছাই সৃষ্টি হয় না। তৃতীয়তঃ, জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের সময় গ্যাসের প্রজ্জ্বলনক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সহজ। চতুর্থতঃ, গ্যাস খুব সহজেই পরিবহণযোগ্য। পঞ্চমতঃ, গ্যাসের তাপীয় শক্তি অত্যন্ত বেশী। কঠিন ও তরল জ্বালানী ব্যবহারের সময় যত তাপ পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশী তাপ গ্যাসীয় জ্বালানী থেকে পাওয়া যায়। ষষ্ঠতঃ, গ্যাসের দহন অপেক্ষাকৃত কম অক্সিজেনেও সম্ভব। সপ্তমতঃ, গ্যাস ব্যবহারে পরিবেশ অপেক্ষাকৃত কম দূষিত হয়। অষ্টমতঃ, কৃত্রিম উপায়ে গ্যাস উৎপাদনের জন্য নিম্নতম মানের কঠিন জ্বালানীও ব্যবহারযোগ্য। গ্যাসীয় জ্বালানীকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১। প্রাকৃতিক গ্যাস, ২। প্রডিউসার গ্যাস (যে গ্যাস কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা হয়), ৩। বাই-প্রোডাক্ট গ্যাস (উপজাত গ্যাস অর্থাৎ যে গ্যাস অন্য সামগ্রী উৎপাদনের সময় পাওয়া যায়।)

প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় ভূগর্ভ থেকে। বিভিন্ন খনিজ পদার্থের মত প্রাকৃতিক গ্যাসও পৃথিবীর অভ্যন্তরেই থাকে। পৃথিবীর ভিতরের প্রচন্ড চাপ এবং তাপই এই ধরনের গ্যাস সৃষ্টির মূল কারণ। সুগভীর কূপ খনন করে প্রাকৃতিক গ্যাস সংগ্রহ করা হয়। এ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে সমস্ত কূপ থেকে পেট্রোলিয়াম আহরণ করা হয় তার সব ক'টি থেকেই কিছু পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাসও পাওয়া যায় কিন্তু তা বলে সমস্ত গ্যাস উত্তোলনকারী কূপ থেকে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক গ্যাসকে রাসায়নিক ধর্মের দিক দিয়ে বিচার করলে মিথেন গ্যাস হিসাবে অভিহিত করতে হয়। ভূগর্ভের যে-সব স্তরে কেবলমাত্র গ্যাসই থাকে তেল থাকে না সেই সব স্তরের গ্যাসে শতকরা ৬০ থেকে ৯৫ ভাগ পর্যন্ত মিথেন গ্যাস থাকে। বাদ বাকীটুকু ইথেন। তবে এই ধরনের প্রাকৃতিক গ্যাসে ইথেন সর্বোচ্চ পর্যায়ে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত থাকতে পারে। বাদ-বাকীটা কোন উচ্চমানের হাইড্রো কার্বন থাকে। এই অনুপাত মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে। এই ধরনের প্রাকৃতিক গ্যাস বর্ণবিহীন এবং বিষাক্ত নয়। এই ধরনের গ্যাসে এক হাজার ঘনমিটার ব্যবহার করে ৯৩ লক্ষ ৫০ হাজার কিলো ক্যালরি তাপশক্তি পাওয়া যায়। বহুদূর পর্যন্ত এই গ্যাস পরিবহণ করা যায়।

আর যে সব তৈলকূপে তেলের স্তরের উপরে গ্যাস থাকে সেই ধরনের প্রাকৃতিক গ্যাস-এ মিথেন প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক বেশী পরিমাণে থাকলেও পরে তার অনুপাত কমতে থাকে।

এখনও পর্যন্ত সংখ্যাতত্ত্বর হিসাব অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে মোট প্রাকৃতিক গ্যাস মজুতের পরিমাণ হল ৭২ লক্ষ ৩৬০ হাজার কোটি ঘন মিটার। এখনও পর্যন্ত যে হারে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে এই গ্যাসে আরও ২৫০-৩০০ বছর চলে যাবার কথা। কিন্তু খেয়াল রাখা দরকার যে উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন গ্যাসের ব্যবহার ক্রমশঃই বাড়ছে (তথ্য সূত্রঃ এম. কিং হুবার্ট, দি এনার্জি রিসোর্সেস্ অব দি আর্থ, সায়েন্টিফিক আমেরিকান, সেপ্টেম্বর ১৯৭১)। প্রোডিউসার গ্যাস বলতে বুঝায় কৃত্রিম জ্বালানী গ্যাস। প্রোডিউসার গ্যাস-এ কার্বন-মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন এবং সামান্য কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে। যে সমস্ত কঠিন পদার্থে শতকরা ৫০ ভাগ বা তারও বেশী পরিমাণ কার্বন থাকে সেই সমস্ত পদার্থ বাতাসে আংশিক দহন করলে প্রোডিউসার গ্যাস পাওয়া যায়।

উপজাত গ্যাস বা বাইপ্রোডাক্ট গ্যাস পাওয়া যায় মূলতঃ ব্লাস্ট ফার্নেস এবং কোক ওভেন থেকে। ব্লাস্ট ফার্নেস-এ আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশনের সময় বাইপ্রোডাক্ট গ্যাস পাওয়া যায়। এই ধরনের গ্যাস দাহ্য। ব্লাস্ট ফার্নেসে কয়লা ব্যবহৃত হয়। ব্লাস্ট ফার্নেসে ব্যবহৃত প্রতি কিলো-গ্রাম কয়লায় ০·৬ ঘন মিটার গ্যাস পাওয়া যায়। কোক ওভেনে কয়লা থেকে কোক প্রস্তুতের সময় কয়লার ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপজাত উপাদান হিসাবে কোল গ্যাস পাওয়া যায়। এই গ্যাস দাহ্য। কোল গ্যাসের মূল উপাদান মিথেন ও হাইড্রোজেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ভারতে ৮ হাজার ৯৫২ ঘন মিটার প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চিত আছে বলে অনুমান করা হয়।

[হাসপাতালেঃ ১৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

চার্ট দেখে দেখে রোগীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। তাদের রুগ্ন শরীরে পিঠে স্নিগ্ধ হাত রেখে ওষুধ খাওয়ায় সাহায্য করছে। কিশোরের কাছে এসে একটু থমকে পাশের শূন্য বেডটাতে চোখ বুলিয়ে নেয় সে। মুখে বেদনা আর প্রশান্তির আলোছায়া। চোখ দুটো নম্র শান্ত আর অনুজ্জ্বল। কিশোরের হাতে একটা ক্যাপসুল দিয়ে জলের গ্লাসটা ধরতে সাহায্য করল।

কিশোরের নির্বাক দৃষ্টির সামনে সিসটার কিঞ্চিৎ চঞ্চল হয়। একটু হেসে বিষাদক্লিষ্ট চোখের ওপর থেকে একগাছি অসতর্ক চুল সরিয়ে চলে গেল সে।

খেলাধুলা

এবারের এশিয়ান গেমস
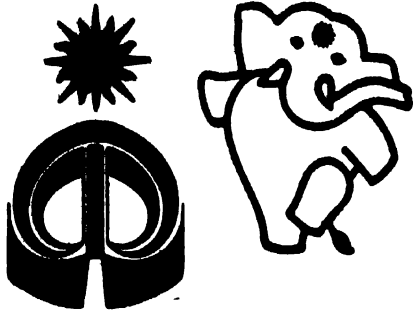
খেলাধ‌ুলার আসরে ভারতবাসীদের কাছে এখন সব থেকে বড় খবর হল দিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য নবম এশিয়ান গেমস্।

এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতে পারস্পরিক একতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় ও এই মহাদেশও যাতে খেলাধুলায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যেতে পারে—সেইজন্যই তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধান-মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু মুখ্য উদ্যোক্তা হয়ে পাঁচটি দেশকে নিয়ে 'এশিয়ান গেমস্ ফেডারেশন' তৈরী করেন ১৯৪৯ সালে। এবং ঠিক হয় যে এশিয়ান গেমস্ ফেডারেশনের দেশগুলি একটি পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে চার বৎসর অন্তর একবার মিলিত হয়ে অলিম্পিকের আদর্শে বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতা করবে।

এই প্রতিযোগিতা আবার আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত করার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে খেলাধুলা সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং যাতে তারা বিভিন্ন রকম খেলা-ধুলায় তাদের সর্বোচ্চ দক্ষতা দেখাবার সবরকম সুযোগ দেওয়া।

যে পাঁচটি দেশকে নিয়ে প্রথমে 'এশিয়ান গেগস্ ফেডারেশন' তৈরী হয়েছিল তারা হল ভারতবর্ষ, বার্মা, আফগানিস্থান, পাকিস্থান ও ফিলিপাইনস্। আর প্রথম এশিয়ান গেমস্ অনুষ্ঠিত হল এই দিল্লীতেই ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে। তাতে যোগ দিয়েছিল মোট ১১টি দেশ এবং সবশুদ্ধ প্রতিযোগী ছিল ৪৮৯ জন ও বিষয় ছিল ৬টি।

ঠিক একত্রিশ বছর বাদে এই দিল্লীতেই আবার হতে চলেছে নবম এশিয়ান গেমস্ আগামী নভেম্বর মাসের ১৯ তারিখ থেকে ডিসেম্বরের ৪ তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু এবারে যোগ দিচ্ছে ৩০টিরও বেশী দেশ যেখানে প্রতিযোগীর সংখ্যা হবে ৫,০০০ হাজার-এর মত আর প্রতিযোগিতার বিষয় থাকছে মোট ২১টি। এগুলি হল আর্চারি, এ্যাথ্‌লেটিকস্, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, বক্সিং, সাইক্লিং, ইকোয়েস্ট্রিয়ান বা ঘোড়ায় চড়ার খেলাধুলা, ফুটবল, জিমন্যাস্টিক, গলফ্, হ্যান্ডবল, হকি, শ্যুটিং, সাঁতার, টেবল্ টেনিস, টেনিস, ভলিবল, ভারত্তোলন, মল্লযুদ্ধ, ইয়টিং বা পালতোলা নৌকার প্রতিযোগিতা ও রোয়িং বা নৌকা বাইচ। এবারের গেমস্-এ গতবারের তুলনায় যে চারটি নতুন বিষয় প্রতিযোগিতায় আনা হয়েছে তা হল গল্ফ্, হ্যান্ডবল, ইকোস্ট্রিয়ান ও রোয়িং। এই সব বিষয়গুলি ছাড়াও দুটি অন্য খেলাধুলা এবারে ডেমনস্ট্রেসন গেম হিসাবে দেখান হবে তা হল কবাডী ও মালয়েশিয়ার খেলা 'সেপাক্ টাকরো।' সেপাক টাকরো অনেকটা ভলিবলের মত --তবে শুধু হাতের পরিবর্তে হাত ও পা দিয়ে খেলা হয়।

প্রথম এবং নবম এশিয়ান গেমস্-এর মধ্যে বাকী ৭টি এশিয়ান গেমস্ যে-সব বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা হল—১৯৫৪

মানিক ব্যানার্জী

সালে ম্যানিলা, ১৯৫৮ সালে টোকিও, ১৯৬২ সালে জাকার্তা, ১৯৬৬ সালে ব্যাঙ্কক, ১৯৭০ সালেও ব্যাঙ্কক, ১৯৭৪ সালে তেহরান ও ১৯৭৮ সালে আবার ব্যাঙ্কক।

গেমস্-এর দুটি বিষয় হবে দিল্লীর বাইরে যেহেতু ইয়টিং ও রোয়িং প্রতিযোগিতা চালাবার মত আন্তর্জাতিক মানের জলাশয় দিল্লীতে নেই। তাই ঠিক হয়েছে ইয়টিং হবে বোম্বের সমুদ্র উপকূলে ও রোয়িং হবে রাজস্থানের জয়পুরের কাছে রামগড় লেকে।

এতবড় খেলাধুলার আসরকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য দিল্লী সহরকে ঢেলে সাজান হচ্ছে। তৈরী হচ্ছে সর্বাধুনিক আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিভিন্ন আউটডোর ও ইনডোর স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, সাইক্লিং ভেলোড্রোম, শুটিং রেঞ্জ, গলফ্ কোর্স। এ ছাড়াও দিল্লীতে যে-সব স্টেডিয়াম রয়েছে সেগুলোকেও প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিবর্ধিত করা হচ্ছে। এ ছাড়াও এ সময়ে যে-সব ট্যুরিস্ট ও গেমস্ ও Femous official রা আসছেন তাঁদের থাকবার জন্য পাঁচ তারার বিভিন্ন হোটেল, রাস্তাঘাট চওড়া করা হচ্ছে, যাতে কোন জ্যাম না হয় তার জন্য তৈরী হচ্ছে বিচ্ছিন্ন উড়াল পুল।

এবারে যে নতুন স্টেডিয়ামগুলি হচ্ছে তার মধ্যে প্রধান হল লোদী রোডে জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম। প্রায় ২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯০ একর জমির ওপর তৈরী হচ্ছে এটি যেখানে অনুষ্ঠিত হবে এ্যাথ্‌লেটিক্স্ ও অন্যান্য ফিল্ড ইভেন্টস্ এবং ফুটবল। এখানে প্রতিযোগিতার ও আনুষঙ্গিক সমস্ত কিছুর সর্বাধুনিক ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে নৈশ আলোর ব্যবস্থা। প্রতি-যোগিতার মূল প্রেস সেন্টারটি এইখানেই থাকবে আর উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানও হবে এখানে। এই স্টেডিয়ামে এ্যাথ্‌লেটিক্স্-এর জন্য ৪০০ মিটার-এর এক সিন্থেটিক ট্র্যাক্ বসানো হয়েছে।
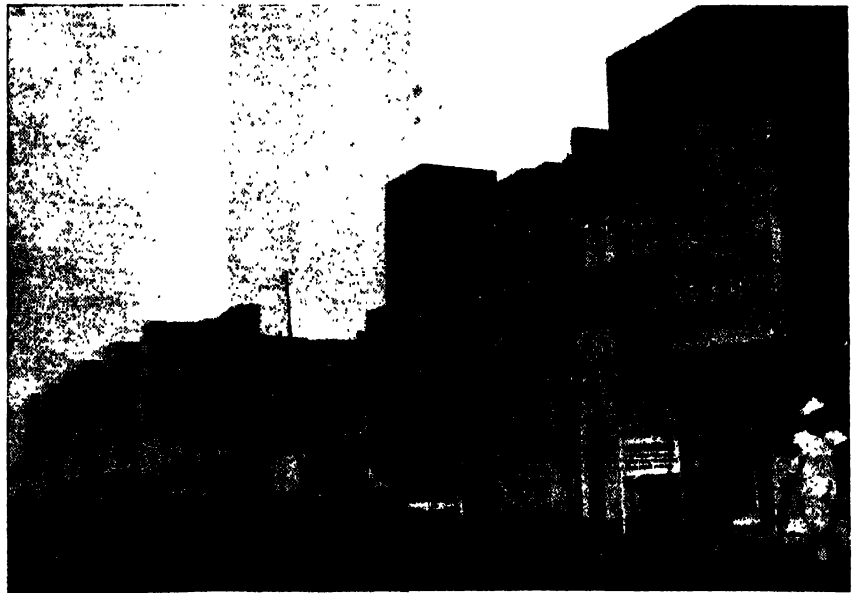
এশিয়ান গেমসের জন্য তৈরী ভিলেজ কমপ্লেক্স

লোধী রোডে জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম

সাঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটারপোলোর জন্য বিশেষভাবে নির্মিত হচ্ছে 'তালকোটরা সুইমিং পুল কম্প্লেক্স' যার চারধারে থাকবে ৬,০০০ দর্শকের আসন। পুলের জলকে সব সময় ২৪° তাপমাত্রায় রাখা হবে। এই কমপ্লেক্সে থাকবে তিনটি বিভিন্ন পুল। এগুলি হল ৫০ মিটার লম্বা ২৬ মিটার চওড়া ও তিন মিটার গভীরতা-সম্পন্ন মেইন পুল যেখানে চলবে আসল প্রতিযোগিতা। এর সঙ্গে আরও থাকবে অনুশীলনের জন্য ৫০ মিঃ লম্বা, ১১ মিঃ চওড়া ও ২ মিঃ গভীর আর একটি পুল ও ডাইভিং-এর জন্য ২৫ মিঃ লম্বা ২৫ মিঃ চওড়া ও ৫ মিঃ গভীর আর একটি পুল।

নানারকম ইন্ডোর গেমস্-এর জন্য যে বিশাল ও অত্যাধুনিক ইন্ডোর স্টেডিয়াম-এর তৈরীর কাজ প্রায় শেষ সেটি হল ইন্দ্রপ্রস্থ এস্টেটে—ইন্দ্রপ্রস্থ স্টেডিয়াম। প্রায় ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫,০০০ দর্শকের উপযোগী। এই স্টেডিয়ামটির খেলার জায়গা হল ৪৬৮০ বর্গমিটার। পুরোপুরি এয়ার কন্ডিশন্‌ড এই স্টেডিয়ামে এবারে শুধু ব্যাডমিন্টন, জিম্‌নাস্টিক ও ভলিবল অনুষ্ঠিত হলেও ভবিষ্যতে এতে যে কোনও প্রয়োজনমত এই স্টেডিয়ামকে দু' ভাগ করে প্রত্যেক ভাগে ভিন্ন ধরনের খেলা খেলান যেতে ইন্ডোর গেমস্ই অনুষ্ঠিত হতে পারবে। পারবে। এটাই হবে এশিয়াতে সবচেয়ে বড় ইন্ডোর স্টেডিয়াম।

এই তিনটি বাদে অন্য যে দুটো খেলাধুলার জায়গা দিল্লীতে তৈরী হয়েছে তা হল তুঘলকাবাদে শ্যুটিং রেঞ্জ ও রাজঘাটের কাছে সাইক্লিং-এর জন্য যমুনা ভেলোড্রোম। আমাদের দেশে সাইক্লিং-এর ভেলোড্রোম এই প্রথম। এ ছাড়া দিল্লীতে যে-সব বিভিন্ন খেলাধুলার জায়গা বা স্টেডিয়াম রয়েছে সে-সবগুলিকেই প্রয়োজনমত বদলে নেওয়া বা নবীকরণ করা হচ্ছে।

সমস্ত স্টেডিয়াম বা প্রতিযোগিতার জায়গাগুলিতেই থাকবে আন্তর্জাতিক মানের সব রকম ব্যবস্থা। রেডিও, টেলিভিশন ও খবর পাঠানোর সু-বন্দোবস্তও এতে থাকছে।

এই সুবিশাল কর্মযজ্ঞে শুধু প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেই ত হবে না। এতে যে-সব প্রতিযোগীরা আসবেন তাঁদের ত থাকবারও ব্যবস্থা করতে হবে। আর সেইজন্যই বানান হচ্ছে বিরাট এক 'গেমস্ ভিলেজ কম্প্লেক্স' যেখানে থাকবেন ৫,০০০ প্রতিযোগী ও অফিসিয়ালসরা। এই গেমস্ ভিলেজে থাকছে আধুনিক জীবনযাত্রার ব রকম সু-ব্যবস্থা। Furnished Residential Flat ছাড়াও এখানে থাকবে একটি রিসেপশন্ সেন্টার, অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ্ ব্লক, অনুশীলনের ব্যবস্থা, কালচারাল সেন্টার, মিনি হাসপাতাল ও ৫৩ মিটার উঁচু একটি ঘুরন্ত রেস্তোরাঁ; সেখান থেকে চারদিকের মনোরম দৃশ্য দেখা যাবে।

এ সবকিছুর কাজ কিন্তু গত বৎসর বা তারও আগে থেকে শুরু হয়ে প্রতিযোগিতার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত বা প্রায় শেষ হবার মুখে। মূল প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগে প্রায় সব জায়গাতেই সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ট্রায়াল হিসেবে হয় জাতীয় বা কোন আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতা হবে।

এই এশিয়ান গেমস্-এর কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তার জন্যে দুটি কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রথমটি হল ভারতের শিক্ষামন্ত্রীকে চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটি ও আর একটি 'স্পেশাল অরগানাইজিং কমিটি' যার চেয়ারম্যান হল কেন্দ্রীয় জাহাজ ও পরিবহণ মন্ত্রী সর্দার বুটা সিং। এই কমিটিতে রয়েছে ছয় জন ডেপুটি চেয়ারম্যান। এঁরা হলেন শ্রীরামনিবাস মির্ধা, শ্রী কে. শংকরণ নায়ার, শ্রীচরণজিৎ সিং, ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টার কে. পি. সিং দেও, জেনারেল কে. ভি. কৃষ্ণরাও ও সর্দার উমরাও সিং। এ দুটি কমিটি ছাড়াও রয়েছে নানা কাজের জন্য ও প্রতিযোগিতার প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য আরও বিভিন্ন ধরনের কমিটি ও সাব-কমিটি। প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার জন্যও থাকছে প্রায় তিন হাজার টেকনিকাল অফিসিয়াল।
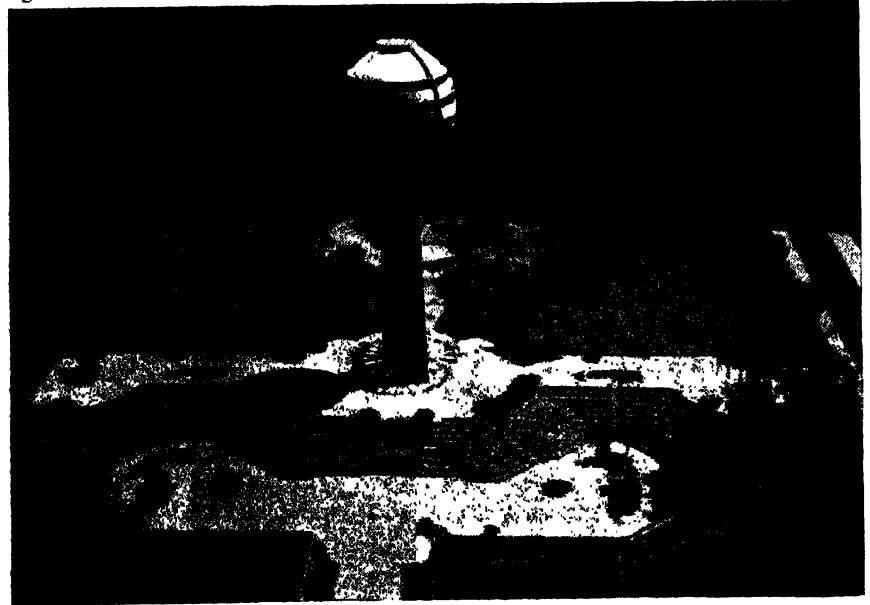
ভারতবর্ষের সবচাইতে উঁচু জলাধার (১৮৫ ফুট) এশিয়ান গেমস উপলক্ষে তৈরী হয়েছে

তালকাটরা বাগানে সুইমিং পুল তৈরীর শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে

গেমস্‌-এ যে সব বিভিন্ন সঙ্গীত বাজান বা গাওয়া হবে—সব কিছুরই সুর উনিই সৃষ্টি করছেন।

গেমস্‌-এর টিকিটের দামও কম রাখা হয়েছে যাতে সবার পক্ষেই গেমস্‌ দেখা সহজসাধ্য হয়। সব থেকে কম দামের টিকিট হল ৩ ও ৫ টাকা। কোঃ ফাইনাল পর্যন্ত। সেঃ ফাইনাল, ফাইনাল এবং উদ্বোধন ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানের টিকিটের দাম কিছু বেশী রাখা হয়েছে। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধাজনক হারেও টিকিটের ব্যবস্থা থাকছে।

ভারতবর্ষের দূর-দুরান্তের সবার পক্ষে দিল্লীতে গিয়ে গেমস্‌ দেখা সম্ভব নয় তাই ব্যবস্থা রয়েছে বেতারে ধারাবিবরণী ও টেলিভিশন-এর ব্যবস্থা যাতে দেশের সবাই কিছু-না-কিছু ভাবে এই বিশাল ক্রীড়াযজ্ঞের আনন্দের ভাগ নিতে পারে।

একেবারে সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও এই গেমস্‌ অনুষ্ঠানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের খরচ পড়বে ৬৫ কোটি টাকার মত। এতে অবশ্য বিভিন্ন হোটেল, রাস্তা মেরামত বা উড়াল পুল তৈরীর খরচ এবং স্টেডিয়াম তৈরীর ব্যাপারে বৈদেশিক সাহায্য ধরা হয় নি।

নবম এশিয়ান গেমস্‌-এর Emblem . . . . করা হয়েছে দিল্লীতে ১৬শ শতাব্দীতে তৈরী যন্তর-মন্তর মান মন্দির Which represents the knowledge and perfection.

আর ম্যাসকট্‌ (Mascot) করা হয়েছে জ্ঞান, শক্তি ও বিশ্বাস্যতার (Loyalty) প্রতীক। নৃত্যরত করি শাবক (বাচ্চা হাতী) যার কপালে রয়েছে লাল তিলক্‌। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'আপ্পু'। True spirit of sportsmanship আপ্পু অ প্রতীকও বটে।

এবারের এশিয়াডের Theme Hymn সৃষ্টি করছেন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্কর।
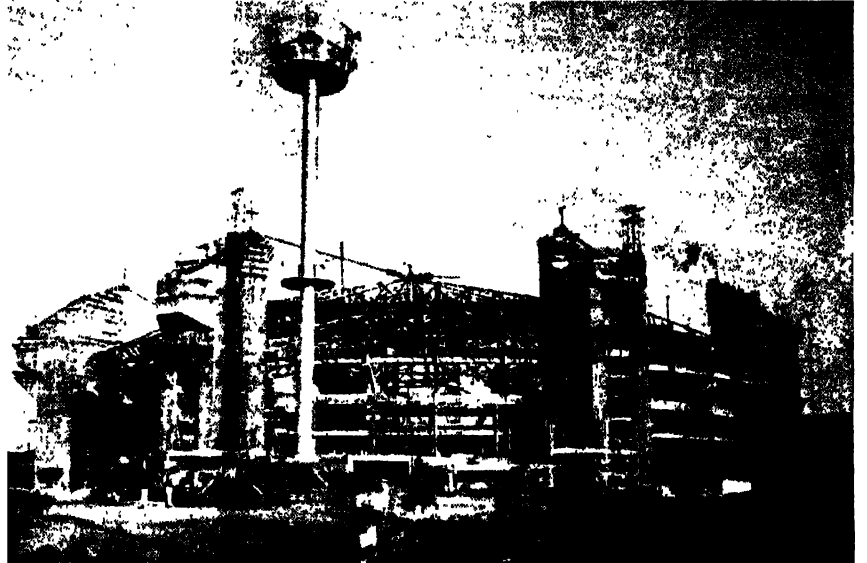
ইন্দ্রপ্রস্থ স্টেডিয়াম তৈরীর কাজ শেষ হওয়ার মুখে

শিকার-কাহিনীঃ শৈলেন চৌধুরী। পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। দামঃ আট টাকা।

ছোটগল্পের মূলে ভিত্তি হল মোটামুটি মানুষকেন্দ্রিক একটি মাত্র ঘটনা, একটি কাহিনী। চলমান জীবনের মন্থর প্রবাহের মধ্য থেকে সযত্ন-আহরিত একটি-দুটি মুহূর্তকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে তোলেন গল্পকার, তার অতল অভিজ্ঞতে বিম্বিত করেন অখণ্ড জীবনের প্রতিবিম্ব। এ কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁর একমাত্র হাতিয়ার। মানব-ইতিহাসের মর্মোৎসারী সংগ্রামের তীব্রতা ও যথার্থতা, বস্তুজীবন সম্পর্কে লেখকের ধারণার ব্যাপকতা ও গভীরতার সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে গল্পের বিষয়-ছোঁয়ার সম্ভাবনাকে। বুননের সংহতি, বিশ্লেষণের একমুখীনতা এবং সমাপ্তিতে অসাধারণ চমক ছোটগল্পের মূল বৈশিষ্ট্য। পাঠকের অসাড় অনুভবের কেন্দ্রবিন্দুতে ঘা মেরে-মেরে হৃদয়তন্ত্রীতে জাগিয়ে তোলে একটি মাত্র সুর, একটি অনুরণন, সমালোচকের ভাষায় যা বিচিত্র বীণার অর্কেস্ট্রা নয়, বাউলের একক একতারার সঙ্গেই তুলনীয়।

আলোচ্য সংকলনের বারোটি গল্পে ছোটগল্পের এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় পুরোপুরি উপস্থিত। বিগত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন সময়ে নানান পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত গল্পগুলিকে একত্রিত করে এটাই লেখকের প্রথম সংকলন গ্রন্থ। টানটান মেদবর্জিত শরীরের দুরন্ত আকর্ষণে গল্পগুলি একেবারে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় পাঠকের মনকে। অতীত-বর্তমান হারানো যে মানুষগুলো শুধুমাত্র বেঁচে থাকার আগ্রহেই বেঁচে থাকছে হাটে-মাঠে-বস্তিতে, সময়, সমাজ এবং সংস্কারের সাথে লড়াই করে জীবন দেবতার অর্ঘ্য সাজাচ্ছে নিজেদেরই প্রাণের মূল্যে, যান্ত্রিক জীবনের চাপে নিরন্তর পিষে যাচ্ছে যে মানুষেরা, স্টেটাস বজায় রাখার অলীক স্বপ্নে বিভোর মধ্যবিত্ত যে পণ্য করছে তার নিজের সন্তানকে, পরিজনকে, তার ভালবাসাকে, প্লাবিত সময়ের মধ্য থেকে ভবিষ্যৎকে উদ্ধার করে আনবার প্রয়াসে রত যারা, সেই সমস্ত বাস্তুহারা, বস্তিবাসী, বেকার যুবক, মস্তান, দেহোপজীবিনী, চোর, বাস কণ্ডাক্টর, চায়ের দোকানের ছোকরা, ভবঘুরে প্রভৃতিকে নিয়ে গল্প বলেছেন লেখক। অত্যন্ত ঘরোয়া সংবেদনশীল ভঙ্গিতে বলা প্রত্যেকটি গল্প তাদের অনাড়ম্বর ভাষা সরল বর্ণনা এবং আর্থ-সামাজিক কারণ বিশ্লেষণের পাশাপাশি সহৃদয় মনোবিশ্লেষণে পাঠককে আকৃষ্ট করে। গল্পকারের সব থেকে বড় গুণ—শিল্পী হিসেবে, বর্ণনাকার হিসেবে কিংবা ব্যাখ্যাতা হিসেবে তিনি নিজে কিছু বলার চেষ্টা করেন নি কখনও। নির্ভেজাল ঘটনাটি যেমন ঘটেছে ঠিকঠাক তেমনটা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে অথচ মনোজ্ঞ ভাষায় পরিবেশন করেছেন তিনি। গল্পের মূল নিয়ন্ত্রক হয়েও এই দূরে-থাকা বা Detachment ছোটগল্পকারের মুন্সীয়ানার পরিচায়ক।

আয়তনিক সংযম এবং চরিত্রগঠনেও গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য, আদর্শ স্থানীয়। উৎকর্ষের বিচারে বামপন্থী শিবিরের সাহিত্যসাধনা নেহাতই শূন্য-প্রসূ, এই কথাটা উচ্চৈস্বরে বলে বেড়ান যাঁরা, তাঁরা পড়ে দেখতে পারেন গল্পগুলি। উচ্চকণ্ঠ সংগ্রামের কথা না বলেও যে দৈনন্দিন জীবনের ওতপ্রোত আন্দোলনকে ফ্রেমে ধরা যায় গল্পগুলি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

অদীপ ঘোষের চোদ্দটি কবিতাঃ অদীপ ঘোষ। কোয়ালিটি পাবলিশার্স, ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দামঃ এক টাকা।

চোদ্দটি কবিতা—নাকি মস্তমগজের কিছু অস্থির শব্দসঞ্চালন। উদ্ভট, চিত্রকল্প ও মোটা-দাগের দুর্বোধ্য শব্দযোজনায় 'বেহায়া বমন' করেছেন কবি। কি এমন অপরাধ করেছিলেন বাংলা কবিতার পাঠক যার জন্যে কবি তাঁদের বোধের প্রতি এতটা নিষ্ঠুরতা দেখাতে পারলেন? সমসাময়িক সমস্ত কিছুর ওপরে কবির বিতৃষ্ণা ও যন্ত্রনাবোধ বোঝা যায়, কিন্তু তা পূর্বাপর অনুভূতিহীন। দুটি মাত্র কবিতায় নামোল্লেখ আছে। মাত্র গোটা তিনেক কবিতা শেষ পর্যন্ত পড়া যায়। প্রারম্ভিক উন্মোচনেই কবিতা সম্পর্কে যে অনুভব ব্যক্ত করেছেন কবি, তা পাল্টাতে পারলে কবি সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবেন বলে আশা করা যায়।

অচিন চক্রবর্তী

এবং সংহতি : সূর্য নন্দী। ক্লান্তিক প্রকাশনী। বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলিকাতা-৭৩। দাম—চার টাকা।

'এবং সংহতি' সূর্য নন্দীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। স্বাভাবিকভাবেই একজন তরুণ কবির আন্তরিক প্রয়াসকে যথাযথভাবে আলোচনা করা উচিত যখন কবি স্পষ্ট এক কমিটমেন্ট নিয়েই কবিতা লিখে চলেন কবিতায় সত্যকে উপলব্ধি করা ও তাকে পাঠকের কাছে বিশুদ্ধ দায়িত্ব নিয়েই পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

চল্লিশটি কবিতার সংগ্রহ 'এবং সংহতি'। স্থির উদ্দেশ্য নিয়েই কবি কাব্যগ্রন্থের নামটি রেখেছেন। শুধুমাত্র শব্দটির অভিধানিক অর্থের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে বিস্তৃত করেছেন তাৎপর্যকে। মোটামুটিভাবে সমস্ত কবিতার বয়সকাল দশ-এগারো বছর। এক বিশেষ সময়ের ঘটনা প্রবাহে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন কবিতা। তাই সময়ের বাস্তবতাকে অনুভব করা যায় কবিতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু কখনো অস্পষ্টতার মোহে আবদ্ধ হতে দেখি না। অত্যন্ত সতেজ গলার আওয়াজ শুনতে পাই 'আমি হাঁটতে পারি অন্ধকার মাড়িয়ে'। কিংবা অত্যন্ত ঘৃণায় ব্যক্ত হয় 'কুকুরের মুখে উচ্ছিষ্ট স্বদেশ। অপ্রেম জনিত ভালোবাসা'। সূর্য নন্দী সমগ্র কাব্যগ্রন্থে অল্প পরিসরের মধ্যেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন কবিতার শরীর নিয়ে। 'টুকরো কবিতা'গুলোকে লেখার চেষ্টা করেছেন নতুন আঙ্গিকে। কিন্তু সব মিলিয়ে মাঝে মধ্যে অনেক কবিতায় ছন্দ কিংবা শব্দের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। চিত্রকল্পের দারিদ্র্যতা কিছু কিছু জায়গায় কবিতা পাঠে ক্লান্তি এনে দেয়। তবু আশ্চর্যভাবে অবাক করে দেয় 'মাঝে মধ্যে ভুল হয়। সময়ে নোঙর নেই'-এর মতো কিছু লাইন। এ সবকিছুই প্রত্যাশিত একজন তরুণ কবির কাছে আগামী দিনের জন্য।

বইটির ছাপার কাজ সুন্দর। তবে দু'চারটি ভুল চোখে লাগে। বইটির নাম 'এবং সংহতি' হলেও প্রচ্ছদের সঙ্গে মূল ছাপা বইয়ের সংহতি বড় কম।

রামপ্রসাদ রায়

বিভাগীয় সংবাদ

নদীয়া জেলা
হাঁসখালি ব্লক যুবকরণ—

১৪ই জুন। হাঁসখালি ব্লক যুবকরণের উদ্‌যোগে কিশোরীদের খো-খো, কিশোরদের জন্য ভলিবল ও ফুটবলের ওপর তিরিশ দিনের তিনটি প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন হলো বগুলায়। এই প্রশিক্ষণ-সূচি উদ্বোধন করে স্বাগত ভাষণে হাঁসখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় বলেন—যে কোনো শিক্ষা মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে হয়। দেহ মনের গঠনতন্ত্রে এসব প্রশিক্ষণ ক্রীয়াশীল। হাঁসখালি ব্লক যুবকরণ বিভিন্ন বিচিত্র কাজের মধ্যে গত বৎসরের ন্যায় এবারেও এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে ধন্যবাদার্হ হয়েছে।

জেলা পরিষদ সদস্য শ্রীসুবোধ মণ্ডল মহাশয় বলেন, আমরা যখন কিশোর ছিলাম, এই সব সুযোগ ছিল না। বামফ্রন্ট সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে শিক্ষাকে বাস্তবমুখী করে তোলার জন্য ক্রীড়ানুশীলনকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। আর আমাদের এই ব্লক যুবকরণটি যথার্থ ভাবে যুব সমাজের মধ্যে শিক্ষামূলক কাজের অনুসরণ ও অনুভাবনে সহযোগী হয়েছেন; উদ্যমশীল হয়েছেন। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ আমাদের দেশে ক্রীড়ানুশীলনের ওপর অধিক জোর দেওয়ার কথা বুঝিয়ে বলেন কিশোর-কিশোরীদের। অধ্যাপক মুকুন্দ বিশ্বাস বলেন যে, শরীর গঠনের যে চর্চা জীবনভোর করা উচিত, তোমাদের জন্য এখানে তার সুরু করা গেল। আশা করি তোমরা তা অব্যাহত রাখবে। এর পর তিনি ব্লক যুবকরণের কর্মিবৃন্দ ও যুব আধিকারিক শ্রীরণজিৎকুমার সমাদ্দারের প্রশংসা করে বলেন, কল্যাণমূলক কাজের চর্চায় এই ব্লক যুবকরণটির অগ্রণী ভূমিকার জন্য আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ফুটবলে ৫০ জন, ভলিতে ২৪ জন কিশোর এবং খো-খোতে ৪০ জন কিশোরী প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছে।

২৪-পরগণা জেলা

সন্দেশখালি ২নং ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় ১৯৮১-৮২ বর্ষের যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় খুলনা পি. সি. লাহা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। ২৭শে মার্চ প্রভাতে স্থানীয় ছাত্রীদের শঙ্খধ্বনি এবং প্রতিযোগীদের মার্চ পরিক্রমার মাধ্যমে শুরু হয় যুব উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। পতাকা উত্তোলন করেন জেলা পরিষদ সদস্য রাজকুমার সিং। ২৭-২৮-২৯শে মার্চ তিনদিনব্যাপী যুব উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার আহ্বান জানিয়ে প্রথম দিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু করা হয়।

যুব উৎসবকে কেন্দ্র করে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষের সমাগম হতে শুরু করে। সন্দেশখালি ২ নং ব্লকের মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক বিভাগে প্রায় ৭০০-এর মত প্রতিযোগী অংশ-গ্রহণ করে।

সন্দেশখালি-২ ব্লক যুবকরণের যুব-উৎসব প্রাঙ্গণে 'যেমন খুশী সাজো' প্রতিযোগিতায় একজন প্রতিযোগী

প্রতিযোগিতার শেষ দিনে সফল প্রতিযোগী-দের পুরস্কার এবং মানপত্র বিতরণ করেন স্থানীয় বিধানসভার সদস্য কুমুদরঞ্জন বিশ্বাস। যুব উৎসব কমিটির সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যুব উৎসবের সার্থক রূপায়ণে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ব্লক যুব আধিকারিক ত্রিলোকেশ দত্ত বলেন, যুব উৎসব শুধুমাত্র আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান নয়, যুব উৎসব গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর আন্দোলন। আগামী দিনে এই কথা মনে রেখে যুব উৎসবের প্রস্তুতি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে যুব উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মেদিনীপুর জেলা

পাঁশকুড়া-২—গ্রামাঞ্চলে অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিশেষ করে তপসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীরা যাতে হাতে-কলমে কাজ শিখে স্বনির্ভরশীল হয়ে নিজেদের আর্থিক মান বজায় রাখতে পারেন তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে গত ৫ই এপ্রিল '৮২ পাঁশকুড়া ২ নং ব্লকের অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণবচক ৩ নং গ্রাম পঞ্চায়েত মহিলা সমিতির গৃহে একটি সুন্দর ভাবগম্ভীর পরিবেশে সীবন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীসতীশ জানা। সভাপতির ভাষণে ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান জানান যে, তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপ-জাতিদের জন্য এই ধরনের প্রকল্প এই ব্লকে প্রথম। সুতরাং উল্লিখিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি আরো জানান যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ৩০ জন দুঃস্থ মহিলাকে বাছাই করে নেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেককে মাসের শেষে হাতখরচ হিসাবে ৩০ টাকা করে দেওয়া হবে এবং ছয় মাস পরে প্রশিক্ষণ শেষে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের মাধ্যমে যাতে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থিনীরা স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে ছোটখাটো ব্যবসা করে নিজেদের জীবিকা অর্জন করতে পারেন সেদিকে যুবকল্যাণ বিভাগ সজাগ দৃষ্টি দেবে। ছয় মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চলাকালীন সমস্ত খরচ-খরচা সরকার বহন করবেন বলে শ্রীদেওয়ান জানান। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মহিলা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী মিশ্র এই প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করে স্বাগত ভাষণ দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মহিলা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী আঙ্গুরবালা দেবী। সভার শেষে মহিলা সমিতির সদস্যাবৃন্দ ও স্থানীয় তরুণরা একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

বর্ধমান জেলা

জামুড়িয়া-১—ব্লক যুবকরণ-এর উদ্যোগে তফসিলী জাতিভুক্ত প্রার্থীদের জন্য ৪ মাসের

জামুড়িয়া ব্লক যুবকরণ পরিচালিত তপসিলী যুবক-দের সাইকেল সারানো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ এগিয়ে চলেছে

একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (সাইকেল রিপেয়ারিং) খোলা হয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয় ১৫ নভেম্বর ১৯৮১। শেষ হয় ১৪ মার্চ ১৯৮২। ২০ জন শিক্ষার্থী এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসে ৩০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রীবিকাশ চৌধুরী মহাশয় এবং ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীশংকরকুমার পাল। শিক্ষার্থীরা যাতে ব্যাঙ্ক থেকে স্বল্প অনুদান লাভ করে স্বনির্ভর হতে পারে তার জন্যেও বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে।

হুগলী জেলা

যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে গঙ্গাধরপুরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গত ২৫শে এপ্রিল রবিবার গঙ্গাধরপুর বিষফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে চণ্ডীতলা-১ পঞ্চায়েত সমিতির যুবকল্যাণ বিভাগের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান হয়। দুপুর ২টা থেকে হেঁড়িয়াদহ সুধাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ে আবৃত্তি, নজরুলগীতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

গঙ্গাধরপুর, শিয়াখালা, মশাট, কুমীরমোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ৬৬ জন আবৃত্তি, ১৭ জন সংগীত এবং ৫ জন "মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান" সম্পর্কে বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

মূল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি, চণ্ডীতলা-১ পঞ্চায়েত সমিতি। পুরস্কার বিতরণ করেন বিধায়ক শ্রীমলিন ঘোষ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন—শ্রীমলিন ঘোষ, চিত্র মিত্র, দিলীপ সানকী—সদস্য, হুগলী জেলা পরিষদ ও সুকোমল বোস—যুব আধিকারিক, চণ্ডীতলা-১ পঞ্চায়েত সমিতি।

বিভিন্ন বক্তা সমাজ বিকাশের বাধা অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তীব্র সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং প্রসারের দায়িত্ব নিতে সাংস্কৃতিক কর্মী ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। জনসাধারণের সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার সপক্ষে বামফ্রন্ট সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রতিফলনের ওপর বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা নৃত্য পরিবেশন করে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সংস্কৃতি সংসদ শাখা গণসংগীত ও "হিসাব নেবার পালা" নাটক পরিবেশন করেন। দেড় হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে সমগ্র অনুষ্ঠানটি এলাকায় বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলা

রঘুনাথগঞ্জ-১ঃ এই যুবকরণের উদ্যোগে ১২ জানুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী '৮২ পর্যন্ত স্থানীয় সেবাশিবিরে পাওয়ার লিফটিং-এ প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ হাতে নেন অরুণকুমার সরকার (স্টেট চ্যাম্পিয়ন)। ১৮ জন এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

ফুটবল প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতাল মাঠে। ১লা এপ্রিল থেকে ৩০শে মে '৮২—দুই মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরে সামিল হয় ৪৬ জন তরুণ। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু সুবোধকুমার দাস প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকেন।

রঘুনাথগঞ্জ-১ যুবকরণ আয়োজিত তপসিলী মেয়েদের স্বনির্ভর কর্মশিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন বিডিও শ্রীনিখিল দাস ও বি ওয়াই ও মহিউদ্দিন আহমেদ

সম্প্রতি একটি সন্তরন প্রশিক্ষণ শিবিরে ১৭ জন সাঁতারের উন্নত কলাকৌশল রপ্ত করে। অধিরকুমার বিশ্বাস (এন. আই. এস.) প্রশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। স্থানীয় মির্জাপুর দীঘিতে এই প্রশিক্ষণ চলে।

এছাড়া তপসিলী মেয়েদের জন্য স্বনির্ভর হওয়ার প্রশিক্ষণ শিবির বসে বাদুরাইল কলোনীতে। এখানে ৩৫ জন মহিলা তাঁতের কাজ সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা নেন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের পরিচালনায়।

পশ্চিমদিনাজপুর জেলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এবং করণদীঘি ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় ডালকোলা হাইস্কুল ময়দানে গত ১৪ই জুন '৮২ থেকে ১৩ই জুলাই '৮২ এক মাসব্যাপী ফুটবল প্রশিক্ষণ হয়। এই প্রশিক্ষণের শিক্ষার্থীদের বয়সসীমা ছিল ১৭ বৎসর পর্যন্ত। প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন শ্রীতপন দাসমুন্সী ও শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য। ১৩ই জুলাই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন পশ্চিমদিনাজপুর জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শ্রীযুক্ত নির্মল মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডালকোলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅরুণ ঘোষ। এদিনের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল করণদীঘি ব্লক ফুটবল কোচিং শিক্ষার্থী বনাম ইসলামপুর ব্লক ফুটবল কোচিং শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রদর্শনী খেলা। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এবং স্থানীয় ৩।৪ হাজার দর্শকদের সামনে এই খেলা খুবই উপভোগ্য হয়। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে করণদীঘি ব্লকের হেমরঞ্জন মণ্ডলের দেওয়া একমাত্র গোলে ইসলামপুর ব্লক পরাজিত হয়। সফল শিক্ষার্থীদের প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। যুবকল্যাণ বিভাগের এই ধরনের প্রচেষ্টাকে বিভিন্ন বক্তা স্বাগত জানান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এবং বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী (ভারত সরকার)র সহযোগিতায় গত ১৪ই জুলাই করণদীঘি হাইস্কুলে করণদীঘি ব্লক বিজ্ঞান আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা চক্রে করণদীঘি ব্লকের দু'টি বিদ্যালয় থেকে পাঁচজন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে করণদীঘি হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীঅনিল বর্মন এবং দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীবিনয়কান্তি সরকার। তৃতীয় স্থান অধিকার করে ডালকোলা হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীসুদেব মজুমদার। বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন রায়গঞ্জ কলেজের পদার্থ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীচিত্তরঞ্জন আচার্য এবং অধ্যাপক শ্রীঅশোক ঘোষ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন করণদীঘি হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীকিরণগোপাল দে সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রচেষ্টাকে উপস্থিত সকলে স্বাগত জানান। ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীঅচিন্ত্য ব্যানার্জী আন্তরিক সহযোগিতার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

পশ্চিমদিনাজপুর করণদীঘি ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় তফসিলী জাতি/উপজাতিদের ছয় মাসব্যাপী "বাংলা টাইপ ট্রেনিং" সেন্টারের উদ্বোধন গত ১৫ই জুলাই ব্লক যুবকরণে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন করণদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীশহীদ আলি বিশ্বাস এবং প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমদিনাজপুর জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শ্রীনির্মল মুখোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন করণদীঘি ব্লকের তফসিলী জাতি/উপজাতি পরিদর্শক শ্রীবুদ্ধদেব আচার্য। উপস্থিত বক্তারা যুবকল্যাণ বিভাগের এই সাধু প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান এবং শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। মোট শিক্ষার্থী ছিল ২৪ জন। যুব আধিকারিক শ্রীঅচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পাঠকের ভাবনা

হার কি জীত প্রসঙ্গে

যুবমানস এপ্রিল-৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত মুন্সী প্রেমচাঁদ রচিত, সৌরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অনূদিত 'হার কি জীত' গল্পটা খুব ভাল লাগলো। তাই এ-সম্পর্কে দু-একটা কথা না বলে পারলাম না।... প্রেমই জীবনের প্রাণ। তিল তিল মরলেও মানুষ তাই এর জন্যই বেঁচে থাকে। আবার প্রেমাঘাতই সম্ভাবনাময়, সৃজনশীল, সুস্থ সত্তার অপমৃত্যু ঘটাতে পারে। প্রেমের গতি সর্বদাই ঊর্ধ্বমুখী—সমগ্র মানবজাতির পক্ষে যা মঙ্গলময়। প্রেম মানুষকে মহান করে তোলে—প্রেমে উৎসর্গীকৃত জীবন এক তপস্বিনীর মত, দেবী প্রতিমার পায়ে অর্পিত এক শ্বেতপুষ্পের মালার মত—দয়িতা-দয়িত নিজেরাই একে অপরের দেবদেবী। তাই, দেখলাম ভাল লাগলো—অমনি সব ঠিক হয়ে গেল —ব্যাপারটা অত সহজে হয় না। তিল তিল উপাদানের সাযুজ্যকরণেই সৃষ্টি হয় তিলোত্তমার। তার জন্য প্রয়োজন—কামনা, আরাধনা, সাধনা—ছোট-বড় অসংখ্য ঝড়-ঝাপটা মোকাবিলা করার সৎসাহস। কাঙ্খিতজনের সঙ্গে কোন বিষয়ে অবস্থাবৈষম্যহেতু সংকোচের বিহ্বলতা সত্ত্বেও ছোট-খাটো নানা ঘটনা-কথাবার্তার উপরেই গড়ে ওঠে—বিপুল সম্ভাবনার ইমারত। মনের মধ্যে সব সময়েই চলে—পাওয়া-না-পাওয়ার জয়াশা-নিরাশার দোদুল্যমানতা। নিজের শত দুঃখ-কষ্ট-বেদনা তীব্র দহন-জ্বালা সত্ত্বেও দয়িতার (বা দয়িতের) জন্য আত্মোৎসর্গই হচ্ছে প্রেমের মূলমন্ত্র।......এই সব কিছুই প্রতিভাত হয়েছে ছোট্ট পরিসরের এই গল্পটাতে।

লজ্জাবতীর রূপ, তার উদার মনোবৃত্তি এবং মৃদু ভাষণের ভক্ত শারদাচরণ কামনা করলেও এবং সঙ্গত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও লজ্জাবতীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে প্রণয়িনী হিসেবে ভাবতে প্রস্তুত ছিল না এবং সে তার মনের বেদনা প্রকাশ করে লজ্জাবতীর করুণাপ্রার্থীও হতে চায় নি—এটা বড় কম কথা নয়। মিথ্যা ভাবনার, হীনমন্যতার শিকার শারদাচরণ লজ্জাবতীকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছে যে তার চোখে সে কেন ছোট হয়েছে, কিন্তু সংকোচে পারে নি—খুবই স্বাভাবিক।......লজ্জাবতীর চিঠিতে সে পেয়েছে জয়ের ইংগিত; আর বুঝেছে—'আমার সাধনা আমার স্বপ্নের দেবীকে আকর্ষণ করেছে।' তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দিয়েছে লজ্জাবতীর হাতের দোলে। কোনো দ্বিতীয় নারীর প্রভাব পড়ুক আর না-ই পড়ুক লজ্জাবতীই তখন থেকে তার হৃদয়রাজ্যের রানী হয়ে পড়েছে। ...শারদাচরণের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ লজ্জাবতীর সঙ্গে সুশীলার রূপ-মোহাবিষ্ট শারদাচরণের ছলনা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা শারদাচরণকে অনুতাপানলের অন্তর্দাহে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত শারদাচরণ তার সারা জীবনের কামনার ধনকে আর হারাতে পারলো না, সে আকুতি করে উঠেছে—'না লজ্জা, এখন আর তোমার আমার মধ্যে বিচ্ছেদ সম্ভবপর নয়।'...

আসলে, শারদাচরণের হৃদয়ের যা কিছু ছিল জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে তা সবই লজ্জাবতীকে দিয়ে ফেলেছিল—সুশীলাকে দেওয়ার কিছুই ছিল না। আগে লজ্জাবতী—পরে সুশীলা। লজ্জাবতী যদি হয় পুষ্পিত কানন তবে সুশীলা যেন সেই কাননের অন্তর্গত ছোট্ট সলিলধারা। তাই লজ্জাবতীকে পেলেই সুশীলাকে পাওয়া হয়—কিন্তু সুশীলাকে পেলে লজ্জাবতীকে পাওয়া হয় না।

আত্মকথা-রীতিতে বর্ণিত কাহিনীর প্রতিটি চরিত্রই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। 'লজ্জাবতীর কথা'-র দু-এক জায়গা কোনো কোনো পাঠকের কাছে ঠিক স্পষ্ট না-ও মনে হতে পারে। (জানি না এটা অনুবাদকের ত্রুটি কিনা।) সুশীলার ছোট্ট চিঠিতেই অনেক কিছু বলা হয়েছে। আর কাহিনী যদি এত নিটোল না-ও হোতো তবুও গল্পটা পাঠকের মন জয় করতে পারতো—এর বেশ কিছু ভাল কথার জোরে।

স্বপনকুমার পোদ্দার
গ্রাম—সরকারপাড়া
ডাকঘর—গোবরডাঙ্গা
২৪-পরগণা—৭৪৩ ২৫২

শুধু অবসর বিনোদন নয়

গত জুন সংখ্যায় শ্রীনিতাই দত্ত 'উৎপলেন্দু ও গৌতমের আবরন যৌবনের প্রতিশ্রুতি' লেখাটির জন্য কিছু বিক্ষিপ্ত সমালোচনা করেছেন যার থেকে কোন নির্দিষ্ট বক্তব্য বেরিয়ে আসে না।

প্রথমতঃ, সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য। নিতাইবাবু আর্ট ফিল্ম বলতে আজকে আমরা যা বুঝি সে সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায় নামক ভারতীয় তথা বিশ্ব চলচ্চিত্র জগতের বিশাল ব্যক্তিত্বটির প্রসঙ্গে এসে পড়াটা কি অবশ্যম্ভাবী নয়? আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যেমন লেখকের কলমের ডগায় এসে যান, চলচ্চিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটে। কাজেই 'ভদ্রলোককে সম্মান দেখানো' না দেখানোর প্রশ্নটি এখানে অবান্তর নয় কি? আর নীহার দাশগুপ্ত উৎপলেন্দু এবং গৌতমের ছবির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে তো লেখেন নি কাজেই ইতিহাস এখানে অনুপস্থিত থাকতেই পারে। তাতে করে ইতিহাসকে ব্যাঙ্গ করার প্রশ্নটি আসে কি করে? সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক এবং মৃনাল সেন-কে কি একই আসনে বসান যায়। এজন্য আপনার আশংকিত হওয়ার কোন কারণ নেই। ভবিষ্যতে হয়ত বসান যেতেও পারে!

দ্বিতীয়তঃ, আপনি বলেছেন উৎপলেন্দু এবং গৌতম পরিচালক হিসাবে এই দুজনই শুধু ('তুলনাহীন') কমিটেড। আবার পরের বাক্যেই পরিচালকের কমিটমেন্ট সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। আপনার বক্তব্যের ধরণ-ধারণে আমাদেরও সন্দেহ জাগে নিজের কমিটমেন্ট(?) সম্পর্কে আপনি কতখানি আস্থাশীল।

এ প্রশ্ন আরও দৃঢ়মূল হয় যখন আপনি আখ্‌তার মীর্জার উদ্ধৃতি তুলে বোঝাতে চান সরকারী সাহায্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে।

তাই, নীহারবাবুকে নয়, আপনাকে বলছি, শুধু চলচ্চিত্র সমালোচনা নয়, যে কোন সমালোচনাই 'শুধু অবসর বিনোদনের খোরাক নয়'—তার জন্য একটু পরিশ্রম দরকার এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন।

অশোক চক্রবর্তী
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭৩ সালে আমাদের দপ্তরের যাত্রা শুরু। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গের ৩২৭টি ব্লকে আমাদের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে পেরেছি। রাজ্যের প্রাণবন্ত যুবসমাজের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে। বর্তমানে যুবকল্যাণ বিভাগ যুবসমাজের জন্য নিম্নলিখিত কার্যসূচীগুলি রূপায়ণ করে চলেছে :

বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্প।

তপসিলী জাতি ও উপজাতি যুবক-যুবতীদের জন্য বিশেষ আঙ্গিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্প।

কমিউনিটি হল ও মুক্তাঙ্গন মঞ্চ স্থাপন।

প্রতি বছর ব্লক, জেলা এবং রাজ্যস্তরে যুব উৎসবের আয়োজন।

খেলাধুলার সাজসরঞ্জাম বিতরণ ও আর্থিক সাহায্য দান।

গ্রামীণ ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিবির।

খেলার মাঠ ক্রয় ও উন্নতি সাধনে আর্থিক সাহায্য দান।

জিমনাসিয়াম তৈরী ও জিমনাস্টিকের সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য অর্থ সাহায্য।

স্বল্প খরচে বিশেষ বিশেষ স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ :

(ক) স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য দান।

(খ) অ-ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য দান।

পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যুব আবাস পরিচালনা।

বহুমুখী জেলা যুবকেন্দ্র প্রকল্প।

পাঠ্যপুস্তক ঋণ দান।

ব্লক তথ্যকেন্দ্র স্থাপন।

বিজ্ঞান আলোচনা চক্র প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন।

বিজ্ঞান ক্লাব গঠন ও আর্থিক সাহায্য দান।

ছাত্র সমবায় সমিতি গঠন ও আর্থিক সাহায্য দান (স্কুল-কলেজে)।

পর্বতারোহণ অভিযানে অনুদান, স্বল্প ভাড়ায় পর্বতারোহণের সাজসরঞ্জাম সরবরাহ এবং পর্বতারোহণ ও স্কি প্রশিক্ষণে বৃত্তি প্রদান।

বিভাগীয় মাসিক পত্রিকা "যুবমানস" প্রকাশনা।

আরও বিস্তারিত জানতে আপনি যে ব্লকে বাস করেন সেখানকার যুব আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

গ্রাহক হতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৭ টাকা। ষাণ্মাসিক চাঁদা সডাক ৩·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যার দাম ৪০ পয়সা।

বিশেষ সংখ্যার জন্য কোন অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না। পত্রিকা প্রেরণের জন্য ডাক ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করবে।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

সহ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ০০১।

এজেন্সি নিতে হ'লে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০%
১৫০০-এর ঊর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০%
৫০০০-এর ঊর্ধ্বে	৪০%

১০টি সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

সহ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবি করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিক-গুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য বিজনেস ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

Reg. No: 32875/78 Postal Reg. WB/CC-15

এস. এফ. আই. আয়োজিত দ্বিতীয় বামপন্থী ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সম্বর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখছেন যুবকল্যাণ, ক্রীড়া ও দুগ্ধ সরবরাহ দফতরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী

১৩ আগস্ট নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে প্যালেস্তাইন প্রতিনিধিদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু
ফোটো: রতন দাশগুপ্ত

যুবমানস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
আগষ্ট, '৮২
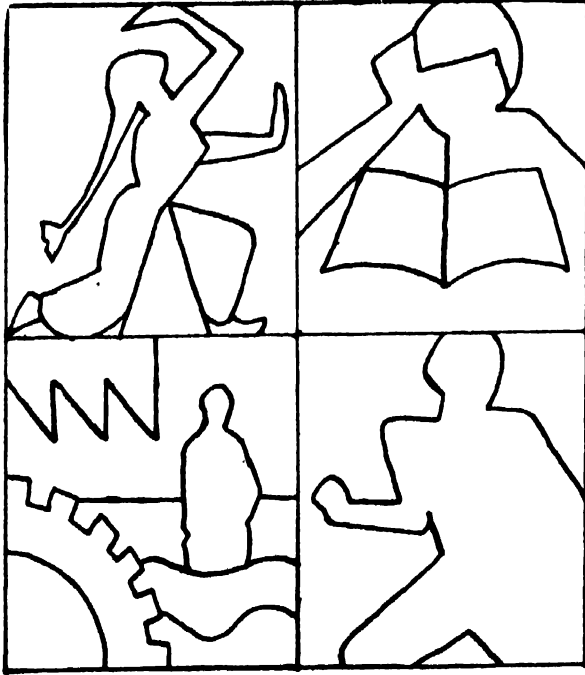
উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি এবং পত্রিকা সম্পাদক :
সুভাষ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ : কমল আইচ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা-৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—চাল্লশ পয়সা

সম্পাদকীয়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার বিশ বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে সামরিক ও অসামরিক মানুষের মৃত্যু সংখ্যা চার কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তার দেড় গুণ মানুষের জীবন নষ্ট হয়েছিল—পৃথিবীর ইতিহাসে এই দু'টি যুদ্ধ বিভৎসতার, নগ্নতার, হিংস্রতার যে সকল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিল তা আজও সভ্য মানুষ শঙ্কিত মন নিয়ে স্মরণ করে।

যুগ-যুগের যুদ্ধের উন্মাদনা, পররাজ্য গ্রাসের ভয়াবহ মধ্যযুগীয় আকাংখা, সমরাস্ত্র নির্মাণ ও যথেচ্ছ প্রয়োগের বিলাসিতার মধ্য দিয়ে সভ্যতা ধ্বংসের মহা যজ্ঞ যেমন একদিকে আমরা দেখতে পাই—তেমনি মানব সভ্যতার শত্রু যুদ্ধকে বন্ধ করার এবং নরহত্যার ধ্বংসলীলাকে স্তব্ধ করার প্রয়াসও আজকের মানুষের মধ্যে অনেক বেশী। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ শ্মশানের শান্তির অন্তরালে শান্তি প্রচেষ্টা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনও ক্রমে ক্রমে বেশী বেশী করে শক্তিশালী হয়েছে। তাই আমরা দেখি যুদ্ধের কারণগুলো এখনো পুরোপুরি বিদ্যমান থাকা সত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় চল্লিশ বছর গত হলেও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া বা ইরাণ-ইরাক, সৌদী আরব বা প্যালেস্তানীয়দের বিভিন্ন সময়ে ও বিষয়ের যুদ্ধগুলো এখনও পর্যন্ত আঞ্চলিক রূপ নিয়েই আছে।

যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলন বা সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে দেশে দেশে মানুষের মুক্তি আন্দোলন আজ এক নব পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আমাদের এই উপ-মহাদেশ আধুনিক যুদ্ধের ভয়াবহতাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে নি। ইউরোপ বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্য যেভাবে আধুনিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা পেয়েছে—আমরা সে ভাবে পাই নি। আমরা যুদ্ধের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ার আবর্তে আবর্তিত হয়েছি মাত্র।

যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করে—তার কাঁচামাল সংগ্রহ ও শিল্পে ব্যবহৃত পণ্যের রপ্তানি বাজারের জন্য। শিল্পবিপ্লবোত্তর পৃথিবীতে সকল যুদ্ধের উৎসই হলো—সাম্রাজ্যবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্য-বাদ বুঝেছিল—আর তার পক্ষে সরাসরি পররাজ্য গ্রাস সম্ভব নয়, তাই তারা নয়া ঔপনিবেশবাদের আশ্রয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই হল সব চাইতে বড় সাম্রাজ্যবাদী-শক্তি এবং এখন পর্যন্ত সকল যুদ্ধের হোতা ও সৃষ্টিকর্তা।

যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়ানো, সমরাস্ত্র নির্মাণের ব্যাপক অভিযান, বিশ্বপ্রতিক্রিয়াশীল শিবিরকে সংহত করার প্রয়াস চালিয়ে যাবার মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে আরও একটি ভয়াবহ যুদ্ধ তান্ডবের সম্মুখীন করতে চাইছে। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে চরম আর্থিক সংকট, উৎপাদনে মন্দা, মুদ্রা-স্ফীতি, বেকারী, দারিদ্র্য প্রভৃতি সমস্যাগুলোকে মোকাবিলা করার প্রশ্নে সংগঠিত গণ-আন্দোলনের পথে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়েই সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের পরিকল্পনা রচনা করে থাকে।

ঘোষিত লক্ষ্য এ বিষয়ে খুব স্পষ্ট : এক কথায় তারা পরিষ্কার করে বলে সমাজতন্ত্রের প্রসারের পথে তারা বাধা দিতে চায়—অর্থাৎ সমাজ-তান্ত্রিক রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধিকে কেবল বাধা দেওয়া নয় তার প্রভাবকে তারা সংকুচিত করতে চায়—এটা তাদের গণতন্ত্রের স্বার্থে একটি অনিবার্য কর্তব্য বলে মার্কিন রাষ্ট্র-প্রধানরা ঘোষণা করে চলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট রেগন পর্যন্ত মার্কিন রাষ্ট্র-প্রধানদের কমবেশী একই বক্তব্য। কিন্তু তাঁদের আসল উদ্দেশ্য হলো মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির সেবা করা এবং তা করতে গিয়ে ইউ-রোপের শিল্পোন্নত দেশসমূহের পুঁজিপতিদের একজোট করা। আর্থিক ও সামরিক দিক থেকে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড় করানো, সমরনীতির পক্ষে আর অর্থনীতির প্রশ্নে দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধ করা।

যুবমানসের এই সংখ্যা যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখন সারা পৃথিবীতে ভারতসহ বিশাল বিশাল যুদ্ধবিরোধী-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে এবং সমগ্র মার্কিন মুলুকে এই যুদ্ধবিরোধী অভিযানে সামিল হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ শিল্পী-সাহিত্যিক, শ্রমিক-কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী। সমবেত হয়েছে সব চাইতে বেশী করে যুবসমাজ, ছাত্রসমাজ, কারণ এই তরুণরাই সব চাইতে বড় বলি হয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের। তাই দেখে দেশে যুবসমাজের যুবমানস থেকে স্বোচ্চারিত হচ্ছে আজ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুদ্ধ-বিরোধী ধিক্কার ধ্বনি। দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ যুব-সমাজের সাথে একাত্ম হয়ে আমরাও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে চাই, ঘৃণা বর্ষণ করতে চাই, নতুন জীবন নতুন সভ্যতার স্বার্থে বিজ্ঞাননির্ভর সমাজের অগ্রগতির স্বার্থে আমরাও লক্ষ কণ্ঠে যুদ্ধের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে চাই—সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক! মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!

স্বাধীনতা দিবসে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আহ্বান

আমাদের দেশের স্বাধীনতার ৩৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ১৯৮২ তারিখে অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শনের কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু "গণতন্ত্র রক্ষার্থে এবং আমাদের দেশের মানুষের বিশেষ করে জনগণের বঞ্চিত অংশগুলির মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে" সদা সতর্কতা ও উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ-সব কর্তব্য সমাধার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের মানুষকে সক্রিয় ও গৌরবময় ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিনি বলেন—আমাদের স্বাধীনতার ৩৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে আপনাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে অগণ্য দেশপ্রেমিক ও শহীদ আত্মোৎসর্গ করে গেছেন। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে আবার আমরা আজ শ্রদ্ধা জানাই। সারা বিশ্বের পটভূমিতে ভারতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের স্বাধীনতা ও শক্তিবৃদ্ধির দায়িত্ব দেশের মানুষেরই। গণতান্ত্রিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ স্বাধীনতা আমাদের এনে দিয়েছে। কোটি কোটি মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য কাজ করার সুযোগও স্বাধীনতার মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখেছি যে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, দেশের মানুষের, বিশেষ করে বঞ্চিত মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য, সদা সতর্ক প্রহরা ও প্রচেষ্টা অপরিহার্য। অসংখ্য যে-সব কর্তব্য আমাদের পালন করতে হবে, জনগণ তাতে নীরব দর্শক থাকবেন না। সেই সব ক্ষেত্রে তাঁদের সক্রিয় ও গৌরবময় ভূমিকা পালন করে যেতে হবে।

আমাদের দেশের কিছু কিছু অংশে বিভেদকামী বিভিন্ন শক্তি সক্রিয়। প্রায়শঃই এদের পেছনে আছে বিদেশী উস্কানি। ধর্ম, ভাষা ও জাতের ভিত্তিতে এরা আমাদের বিভক্ত করে দিতে চায়। স্থানে স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, হরিজন ও আদিবাসীরা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির আক্রমণের শিকার হচ্ছে। এ ধরনের সংহতিবিরোধী শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে মানুষ নিজেদের গণতান্ত্রিক সচেতনতা, রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন। এটি খুবই প্রশংসনীয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে পথে আমরা চলেছি তা থেকে আমরা কখনই ভ্রষ্ট হব না।

পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতার পর বিপুল জনসমর্থন নিয়ে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৭ সাল থেকে আমাদের সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে থেকেও কর্মসূচী রূপায়িত করার জন্য সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। জনগণের বিভিন্ন অংশের আস্থা নিয়ে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে প্রশাসন পরিচালিত হয়ে এসেছে। আমাদের সাফল্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি। আমাদের ন্যূনতম ৩৪ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের মধ্য দিয়ে শহর ও গ্রামের মানুষের স্বার্থে আরও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার আমরা করছি। ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং পশ্চিমবঙ্গের আটটি জেলায় পরপর দু'বছর খরা এই দুয়ের সমন্বয়ে কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সর্বশক্তি দিয়ে এ পরিস্থিতির মোকাবিলায় আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অর্থনৈতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে এবং খরা পরিস্থিতির মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার ও অর্থসংস্থান প্রতিষ্ঠানগুলি এগিয়ে আসবেন—এ আশা আমরা করি।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আজ খুবই সঙ্কটপূর্ণ। পরিকল্পনার সুফলগুলিও বেশিরভাগ লোকের নাগালের বাইরেই রয়েছে—এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। শিল্প ও কৃষিতে কিছু অগ্রগতি সত্ত্বেও বেকারী ও দারিদ্র্যের সমস্যা রয়েই গেছে। বিপুল সংখ্যক মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাব এবং জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণগুলির অনুপস্থিতির দরুন পরিস্থিতির কোন সুরাহা হয় নি। পরিকল্পনায় মৌলিক পরিবর্তন না ঘটলে, অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন না হলে, জনগণের মূল সমস্যাগুলির সমাধান কিছুতেই হবে না। আমাদের সকলের এই লক্ষ্যেই এগোন দরকার। বাইরের দুনিয়ার দিকে আজ ফিরে তাকালে দেখতে পাই, যুদ্ধকামী শক্তিগুলি বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। তাদের হুকুম যারা অমান্য করেছে, তাদের তারা ভয় দেখাচ্ছে। আমরা শান্তিকামী জাতি। সুতরাং এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার থাকতেই হবে। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অসংখ্য শান্তিকামী মানুষের সঙ্গে আমাদের কণ্ঠ মেলাতে হবে। তার পারমাণবিক যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে এঁরা বিশাল বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ গড়ে তুলছেন।

আমাদের লক্ষ্য প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধশালী ভারত। সামনের পথ অতি বন্ধুর। তা সত্ত্বেও এ বাধা অতিক্রম করার জন্য আমাদের দেশের মানুষ অধিকতর সচেতনতার সঙ্গে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন, এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

তেইশ বছর আগের কথা। তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় এবং খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন। ১৯৫৯ সালের ৩১শে আগস্টের গ্রাম-বাংলা খাদ্যের অভাবে ধুঁকছিল। খাদ্য চাই দাবিতে গ্রাম-বাংলায় প্রতিদিন বিক্ষোভ চলছিল। বিক্ষোভ চলছিল শহরে শহরে—খোদ কলকাতায়। গ্রামে খাদ্য নেই, শহরেও খাদ্যের টান, ফলে গ্রাম-শহরের মানুষ খাদ্যের জন্যে এক হয়ে লড়াই করছিলেন।

'৫৯ সাল-এর খাদ্য সঙ্কট এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যার তুলনা করা খুবই কঠিন। এই কঠিন খাদ্য সঙ্কটের মুখে শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-মহিলারা এক অভিন্ন সংগ্রামের সাথী হয়ে উঠেছিলেন। আর তারই প্রতিফলন ঘটলো ৩১শে আগস্ট। বামপন্থী দলগুলি এবং কৃষকসভার যুক্ত আহ্বান পৌঁছে গেল গ্রামে গ্রামে। ৩১শে আগস্ট ১৯৫৯ সাল—গ্রাম-বাংলার মানুষ খাদ্য চাইতে কলকাতায় আসবেন। গ্রামের মানুষ খাদ্য চাইতে কলকাতায় আসবেন শুনে কলকাতার খেটে-খাওয়া মানুষ যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। গ্রাম-বাংলার বুভুক্ষু মানুষের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে খাদ্য দাও, নয়তো গদি ছেড়ে দাও—আওয়াজে কলকাতার মানুষ কলকাতাকে কল্লোলিত করে তোলার প্রতিজ্ঞা নিলেন। প্রতিজ্ঞা নিলেন গ্রামের মানুষকে কিছুতেই না খেয়ে মরতে দেবো না।

এলো সেই প্রতীক্ষিত ৩১শে আগস্ট। অন্নদাতা—যাঁরা মানুষের মুখে খাদ্য তুলে দেন, আজ তাঁরাই কলকাতার পথে পথে। এক মুঠো খাদ্য চাইতে এসেছেন। রাজ্য চাইতে আসেন নি গ্রামের বুভুক্ষু মানুষ। এসেছেন একমুঠো খাদ্য চাইতে।

বেলা বাড়ছে। গ্রামের মানুষের ভিড়ও বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে একেবারে লক্ষাধিক। গ্রামের সেই লক্ষাধিক মানুষের সাথে কণ্ঠ মিলাতে মিছিল করে আসছেন কল-কারখানার শ্রমিক, অফিসের কর্মচারী, স্কুল-কলেজের ছাত্র, মহিলা।

সভার বহু পূর্বে হতে যখন শহীদ মিনারকে কেন্দ্র করে চৌরঙ্গীর পূর্ব-উত্তরের রাস্তাগুলির—বিশেষ করে গলির ভিতরে ও মুখে মাথায় গামছা বাঁধা সাদা পোশাকের পুলিসের ছয়লাপ দেখে চমকে গিয়েছিলাম এবং বুঝেছিলাম—একটা সাংঘাতিক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে এই খাদ্য চাওয়া মানুষগুলিকে।

হ্যাঁ, ঘটলো তাই। মিছিল বের হবার পূর্বেই আকাশে কালো মেঘ জমেছে। চৌরঙ্গী এলাকা তখন অন্ধকারে পরিণত। এদিকে লক্ষাধিক মানুষের গর্জনে গোটা এলাকা তোলপাড় হয়ে উঠেছে। হাজার হাজার মানুষ যাঁরা মিছিল দেখার জন্যে চৌরঙ্গী এলাকায় এসেছিলেন—তাঁদের ভারের চাপে যেন চৌরঙ্গী এলাকাও হাঁপিয়ে উঠেছে। মানুষের ঢেউ। কালো পিচের রাস্তা মানুষের পদভারে তখন ভরপুর।

৩১শে আগস্টের বিকেল। শহীদ মিনার হতে (তখন বলা হতো গড়ের মাঠের মনুমেন্ট ময়দান) সেই বুভুক্ষু মানুষের মিছিল গগন বিদীর্ণ আওয়াজ তুলে রাস্তায় নেমে পড়েছেন। স্রোতের মতো মানুষ ছুটে চলেছে চৌরঙ্গী রাস্তা জুড়ে

স্মরণীয়: ৩১শে আগস্ট

কার্জন পার্কের দক্ষিণের রাস্তা যা আজকের রাণী রাসমণি রোড ধরে। ডালহৌসী অভিযান। মিছিলকে আটকাবার পরিকল্পনা ছিল হত্যা—

ব্যাপক হত্যার মধ্য দিয়ে। রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। মিছিলের দুটো মুখ যখন প্রথম পুলিস বেষ্টনী ভেদ করে ডালহৌসীর দিকে অগ্রসরমান তখন রাজভবনের পূর্ব দিকের গেটের সামনে সশস্ত্র পুলিস বেষ্টনী করে দাঁড়িয়ে। তখন আমরা কয়েক জন রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার ফুটপাতের ওপর পুলিশ বেষ্টনীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। লাঠিধারী কিছু পুলিশ মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার নামে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র বুভুক্ষু মানুষগুলোর ওপর। সাথে সাথে শুরু হলো টিয়ারগ্যাস। রাইফেল গর্জন করছে। সাদা পোশাকের সেই মাথায় গামছা বাঁধা পুলিশ হাতের ব্যাটন নিয়ে এলোপাথারীভাবে পিটাতে আরম্ভ করেছে।

বীভৎস এক ভয়ঙ্কর তাণ্ডবের মধ্যে ছুটোছুটি করছি। আর দেখছি গুলি খেয়ে মানুষগুলোকে রাস্তার উপর পড়তে। লাঠির ঘায়ে মাথা চৌচির করে দেওয়া মানুষগুলি যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলেন—তখন সেই মানুষগুলির ওপর চলছে অকথ্য নির্যাতন। সেই ১৯৫৯ সালের ৩১শে

শৈলেশ চৌধুরী

আগস্টের সেই বীভৎস দিনটির কথা যখন স্মরণ করি তখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে সমস্ত ঘটনাটি। ভেসে ওঠে সেই গ্রামের মহিলাদের কথা—যাঁরা গুলিতে লুটিয়ে পড়ে আছে রাস্তার ওপর, সেদিনের সেই নরপশুর দল মুমূর্ষু মহিলাদের উলঙ্গ করে লাঠিপেটা করছে।

এলো ১লা সেপ্টেম্বর। কলকাতা তখন রাগে ক্ষোভে টগবগ করছে। ছাত্ররা এই বুভুক্ষু মানুষকে খুনের প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন। ডাক দিলেন স্কুল-কলেজে ধর্মঘটের। প্রতিবাদ মিছিলের। ছাত্ররা স্কুল-কলেজে ধর্মঘট করে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সমবেত হন—সেখান হতে মিছিল বের করেন ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করেই। মিছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর হতে বের হয়ে কলেজ স্ট্রীট ধরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে ডাঃ বিধান রায়ের বাড়ির কাছে আসামাত্র সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো ছাত্রদের ওপর। ঘন ঘন রাইফেলের গুলি। ছাত্ররা গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আহত ও গুলিতে নিহত ছাত্রদের ওপর চললো লাঠিপেটা। পুলিসের গুলিতে লুটিয়ে পড়লেন শিক্ষক চুনীলাল দত্তও।

আগের দিনের বুভুক্ষু মানুষের হত্যার প্রতিবাদে কলকাতা ক্রোধে পরের দিনে ছাত্র-শিক্ষক টগবগ করছে। সারাদিন—রাত্রিভর কলকাতা যুদ্ধের নগরীতে পরিণত হলো। কলকাতার এই ঢেউ গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লো হাওড়াতেও। হাওড়াতে সশস্ত্র পুলিসের তাণ্ডব দেখে মানুষ শিওরে উঠলেন। সশস্ত্র পুলিসের এই নারকীয় তাণ্ডব দেখে সেদিনকার হাওড়ার মানুষ হাওড়াকে নাম দিলেন অবরুদ্ধ জালিয়ান-ওয়ালা বাগ। তদানীন্তন সরকার খাদ্যের বদলে বুভুক্ষু মানুষকে দিল গুলি, ছাত্র-শিক্ষককে দিল গুলি তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে, মানুষ খুন করার প্রতিবাদে বামপন্থী দলগুলি, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা, ছাত্র সংগঠনগুলি ৩রা সেপ্টেম্বর সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানালো।

সেই আহ্বানের প্রতি পশ্চিমবাংলার মানুষ শুধু সাড়াই দিলেন না, সেই সময় পর্যন্ত (৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) পশ্চিমবাংলার সাধারণ ধর্মঘটের এক ঐতিহাসিক নজীরও স্থাপন করলেন। পশ্চিমবাংলার ১৫ লক্ষ শ্রমিক সেদিন ধর্মঘটে অংশ নিলেন, অংশ নিলেন কর্মচারীরা, ছাত্ররা, শিক্ষকেরা। দোকানী হতে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ। যানবাহন চললো না। অবাধ্যতার ঢেউ যেন পশ্চিমবাংলার সর্বত্র।

৩১শে আগস্ট হতে ৩রা সেপ্টেম্বর—এই কয়দিনে কংগ্রেসী শাসকেরা ৮০ জন মানুষকে খুন করেছিলো। গুলিতে, লাঠিতে আহত করেছিল ৩ হাজার মানুষকে। আর গ্রেপ্তার করেছিল ২১ হাজার মানুষকে।

সেই খাদ্য আন্দোলন কিন্তু ৩রা সেপ্টেম্বরের সাধারণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়েও থামলো না। খাদ্য আন্দোলন চলতে লাগলো। প্রতিদিনই সভা চলছে। বিক্ষোভ মিছিল হচ্ছিল। ৮ই সেপ্টেম্বর স্কুল-কলেজে শহীদ দিবস পালিত হলো।

আর কলকাতা প্রত্যক্ষ করলো ১০ই সেপ্টেম্বরের দিনটিকে। সেদিন ছিল মৌন মিছিল। মৌনমুখর মহাসমুদ্রের মতো এক মিছিল। মৌন মিছিলের পুরোভাগে যে ব্যানার পোস্টারটি ছিল তা এখনও মনের কোণে নাড়া দিয়ে যায়। সেই

[শেষাংশ ১০ পৃষ্ঠায়]

আমাদের মাতৃভূমিতে আমরা আমাদের পতাকা ওড়াবই

—সাদেক-আল্-শফী

গত ১৪ই আগস্ট প্যালেস্তাইন মুক্তিসংস্থার প্রতিনিধিদ্বয়কে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হয় জনাকীর্ণ নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানে। সংবর্ধনার উত্তরে প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে সাদেক আলি শফী বলেন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ঐতিহ্যশালী মহান কলকাতার মহান জনগণের সমর্থন আমাদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে আরও প্রত্যয় ও প্রেরণা যোগাবে। সভাপতির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন, প্যালেস্তাইনের সংগ্রাম আমাদেরও সংগ্রাম। পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে-কোন সংগ্রামে সংগ্রামী পশ্চিমবংগ কখনই পিছিয়ে থাকবে না।

বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিপুল করতালি ধ্বনির মধ্যে পুষ্প-স্তবক দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান। এর পর পুষ্পস্তবক ও অর্থসাহায্য দিয়ে সংবর্ধনা জানান বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণের পক্ষ থেকে এবং বাম-ফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলেন, আমরা গর্বিত যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে রত প্যালেস্তাইনী মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতিনিধিদের আমরা এখানে পেয়ে স্বাগত জানাবার সুযোগ পাচ্ছি। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে আমাদের দেশের মানুষের, পশ্চিমবঙ্গের জনগণের অনেক আত্মত্যাগ ও অবদান আছে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের চেতনায় জনগণকে আরও সমৃদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।

সাম্রাজ্যবাদীরা বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব যুদ্ধের হুমকী দিচ্ছে, বিধ্বংসী মারণাস্ত্র, সমর সম্ভার ও পারমাণবিক বোমা তৈরী করে যাচ্ছে। যুদ্ধ এক জায়গায় বাধলে তার আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গোটা বিশ্বের মানুষ যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-সংগ্রাম করছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দিতে হবে। সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী লড়াইয়ে ব্যস্ত প্যালেস্তাইনবাসীদের সব সময় সমর্থন ও সাহায্য দেওয়া আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্য। সাম্রাজ্যবাদীরা আলোচনা চালিয়ে ভণ্ডামি করছে, প্যালেস্তাইনবাসীদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। ইজরায়েল আক্রমণ চালালেও এর পেছনে মদত যোগাচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ভারত পি এল ও-কে স্বীকৃতি দেওয়ায় আমরা আনন্দিত। কিন্তু জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দায়িত্ব অনেক বেশি। সংসদে যখন লেবাননের যুদ্ধ নিয়ে প্যালেস্তাইনবাসীদের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন, তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, কে এর পেছনে আছে? প্রথমে উনি বলেন নি যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই এর জন্য দায়ী। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করেছিলেন শুনলাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় লেবাননের যুদ্ধ নিয়ে রেগনের সাথে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কী আলোচনা হয়েছে, আমরা জানতে চাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সংসদে এ সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন অন্য একজন মন্ত্রী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সাংবাদিকরা জানতে চেয়েছিলেন, লেবাননের যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে ভারতের বক্তব্য কী? প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন, রেগন এখন যা করছেন, সেটা আগে করলেই ভাল করতেন। বসু বলেন, রেগন এখন কোন্ ভাল কাজটি করছে আমরা বুঝতে পারছি না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তো বর্বর অত্যাচারে শত সহস্র নর-নারী, শিশু হত্যা ও বিপুল সম্পত্তি ধ্বংস করে চলেছে।

শান্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে যাঁরা ভাল-বাসেন, তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পক্ষপুষ্ট ইজরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন, পৃথিবীকে যুদ্ধে জড়িয়ে দেবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা উঠে পড়ে লেগেছে, এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এখনই। ভারতে দু'টি রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আছে। তারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানিয়ে চলবে। তিনি প্যালেস্তাইন মুক্তিসংস্থার উত্তরোত্তর বিজয় ও সাফল্য কামনা করেন।

পি এল ও প্রতিনিধিদ্বয় হলেন, সাদেক আল্-শফী এবং আব্দুল করিম মুস্তাফা।

নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে শফী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, কলকাতার ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অভিনন্দন জানান। প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের কাছে এবং ইনডোর স্টেডিয়ামে সংবর্ধনার উত্তরে শফী বলেন, প্যালেস্তাইন মুক্তিসংস্থার বিরুদ্ধে মার্কিনী অপপ্রচার চলছে। শফী বলেন, অনেক সংবাদপত্রে মার্কিনী প্রচারই স্থান পাচ্ছে। আসল ঘটনা প্যালেস্তাইনবাসীরা প্রচণ্ড লড়াই করে আগ্রাসকদের মোকাবিলা করছেন। ইজরায়েলী আগ্রাসকরা ও তার মদতদাতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করেছিল সামান্য দু'চার দিন যুদ্ধ করলেই প্যালেস্তাইনী মুক্তি যোদ্ধারা ধ্বংস হয়ে যাবেন। ৬৯ দিন ধরে যুদ্ধ চলছে—এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়, ওদের পরি-কল্পনা প্রচার সব অসত্য। আমরা এসেছি সংগ্রামে ঐতিহ্যবাহী পশ্চিমবঙ্গের সমর্থন নিতে এবং পি এল ও নেতা ইয়াসের আরাফতের শুভেচ্ছা ও প্রতিশ্রুতি আপনাদের জানাতে যে, চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত শেষ রক্ত-বিন্দু দিয়ে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব। সতের বছর ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের ওপর বর্বর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, আমাদের স্থির বিশ্বাস, স্বাধীন প্যালেস্তাইন আমরা গঠন করতে পারব। প্যালেস্তাইনের মুক্তিযুদ্ধ পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সারা পৃথিবীর জনগণের, গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশ-গুলির ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিশেষতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন যুদ্ধে বিজয়ে আমাদের আত্মবিশ্বাস অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে।

ইজরায়েলী আগ্রাসকরা প্যালেস্তাইনী মুক্তি-যোদ্ধাদের ধ্বংস করতে পারবে না, অবরুদ্ধ বেইরুট ধ্বংস করেও না। আরাফাত বলেছেন, যতক্ষণ একটি প্যালেস্তাইনী শিশুও জীবিত থাকবে, সে আমাদের পতাকা নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে যাবে।

পি এল ও-কে ধ্বংস, লেবাননে তাবেদার সরকার কায়েমসহ সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত লক্ষ্যই ব্যর্থ হয়েছে। এখন ইজরাইলের মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে। ইজরায়েলী সৈন্যদের মনোবল ভেঙেছে, তারা আর যুদ্ধ করতে চাইছে না। তারা দ্বিধা সংশয়ে পড়েছে, ১৬ হাজার ইজরাইলী সৈন্য ও অফিসার নিহত হয়েছে। আমাদের শক্তিশালী প্রতিরোধ ও প্রত্যাক্রমণই ওদের মধ্যে ভাঙন ও বিক্ষোভ ধরিয়েছে। মুসলমান, খ্রীস্টান, ইহুদী যে-ই হোক, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক প্রতিটি দেশের জনগণ আমাদের সক্রিয় সমর্থন জানাচ্ছে, সক্রিয় সমর্থন পাচ্ছি। আরব দেশগুলিকে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ খেলতে শুরু করেছে। আরব দেশগুলির জনগণ আমাদের পক্ষে, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শাকরা দোদুল্যমান ও সাম্রাজ্য-বাদী চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছে। আরব জনগণ জানেন, সে-সব দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের ভূমিকা আরব দুনিয়ার স্বার্থের পরিপন্থী, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই প্রধান শত্রু। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের উৎখাতে সমুচিত শিক্ষা সে-সব জনগণই দেবেন, যে জনগণকে তারা এখন আটকে রাখছে।

তিনি বলেন, আমরা শুধু প্যালেস্তাইনের মুক্তির জন্য লড়াই করছি না, শুধু আরব জন-গণের জন্যই লড়াই করছি না, বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের বিশিষ্ট অঙ্গ হিসেবে লড়াই করছি।

ইতিহাস জনগণের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। আপনারা আজ যে মর্যাদা দিয়েছেন, তার যোগ্য অধিকারী হবার জন্য লড়াই চালিয়ে যাব। আমাদের 'মাতৃ-ভূমিতে আমরা আমাদের পতাকা ওড়াবোই।' সেদিনই শুধু আপনাদের মর্যাদার প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শিত হবে।

বিহার প্রেস বিল—পশ্চিমবঙ্গে প্রতিক্রিয়া

সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মীদের প্রতিবাদ মিছিল

৩১শে আগস্ট—বিহারের প্রেস বিলের বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হয়েছেন সাংবাদিক ও সংবাদপত্রকর্মীরা। কলকাতার সমস্ত সংবাদপত্রের ও সংবাদ সরবরাহ সংস্থার সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মীরা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকে ধিক্কার জানিয়ে ফেস্টুন-প্ল্যাকার্ড হাতে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মৌন মিছিলে রাজভবনের সামনে এসপ্লানেড ইস্টে আসেন।

এসপ্লানেড ইস্টের সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সাংবাদিক হীরেন মিত্র।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টাকে নিন্দা করে এবং বিহারের প্রেস বিল বাতিলের দাবি জানিয়ে বিভিন্ন সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মীদের সংগঠন এবং বিশিষ্ট সাংবাদিকরা বক্তব্য রাখেন। পশ্চিমবঙ্গ সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষে সুবোধ বসু বলেন, বিহার সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণে যে বিল পাশ করেছে, তা শুধু বিহারের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, গোটা দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও দেশের গণতন্ত্রের কাছে এটা মারাত্মক বিপজ্জনক হুমকি। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার থাকলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষিত হবে, কিন্তু ভবিষ্যতে কোন জনবিরোধী সরকার এলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ হবে—অতীতের অভিজ্ঞতাও তা-ই। গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আই জে এ-র পক্ষে রণেন মুখার্জি বলেন, সংগ্রামী পশ্চিমবঙ্গে আমরাও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনে শামিল হয়েছি। ঐক্যবদ্ধভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে হবে।

ডবলিউ বি ইউ জে-র অরুণ বাগচি বলেন. শুধু বিহারেই নয়—যেখানেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা হোক, সেখানেই আমাদের প্রতিবাদ জানাতে হবে তার বিরুদ্ধে।

পি টি আই ডবলিউ ইউ-র পক্ষে যতীন চক্রবর্তী বলেন, বামফ্রন্ট সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করছে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা হলে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। বিহারের প্রেস বিলে সংবাদপত্রের যে স্বাধীনতা হরণ করার চেষ্টা হচ্ছে, বামফ্রন্ট সরকারও তার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম করেই রক্ষা করতে হবে। এছাড়া প্রেসক্লাবের পক্ষে বক্তব্য রাখেন মৃদুল দে এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক হেমেন বসু, কৃষ্ণ ধর, অনিল ভট্টাচার্য, কুমুদ দাশগুপ্ত এবং এন ই ইউ, ফটো জার্নালিস্ট ক্লাব, ক্যালকাটা জার্নালিস্ট ক্লাব, ভেটেরান জার্নালিস্টস এ্যাসোসিয়েশন, প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সিয়েশন, প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিনিধিরা, গণশক্তি পত্রিকার পক্ষে বার্তা-সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, কালান্তর পত্রিকার পক্ষে নিতাই দাস।

বিহারের সাংবাদিকদের ওপর লাঠি চার্জের নিন্দা করে এবং বিহার প্রেস বিল সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লিখিত এক স্মারকলিপি রাজ্যপালের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এজন্যে রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান আই জে এ-র পক্ষে রণেন মুখার্জী ও মিহির গাংগুলী, পশ্চিমবঙ্গ সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষে আদ্যনাথ ভট্টাচার্য ও দেবাশিস বসু, প্রেস ক্লাবের পক্ষে মদন প্রামাণিক, পি টি আই ডবলিউ ইউ-র পক্ষে যতীন চক্রবর্তী, ডবলিউ বি ইউ জে-র পক্ষে ভোলা রায় প্রমুখ। বিভিন্ন পত্রিকার প্রবীণ ও বিশিষ্ট সাংবাদিকরা মিছিলে অংশ নেন।

গত ২৮শে আগস্ট বিহার প্রেস বিলের বিরুদ্ধে যুব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক বরেন বসু

সরকারী কর্মচারীদের সমর্থন

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষে সুকোমল সেন এক বিবৃতিতে ৩রা সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানান। বিবৃতিতে পাটনায় সাংবাদিকদের ওপর অত্যাচারের নিন্দা করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকারী বিহার প্রেস বিল প্রত্যাহারের এবং এই বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি না দেবার দাবি জানানো হয়েছে। দেশের সরকারী কর্মচারীদের সংবাদপত্র কর্মীদের ন্যায়সংগত আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় সোচ্চার হতে বিবৃতিতে আহ্বান জানানো হয়।

ছাত্র-যুব মিছিল

কলকাতার সচেতন ছাত্র-যুব সমাজ এই ধর্মঘট ও সাংবাদিকদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানাতে এবং এই কালা প্রেস বিলের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। ২৮শে আগস্ট এই সমাবেশ আহ্বান করে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও ভারতের ছাত্র ফেডারেশন।

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে ছাত্র-যুবকদের এই বিক্ষোভ মিছিল নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট প্রভৃতি পথ পরিক্রমা করে মিশন রো-তে এসে শেষ হয়। এখানে এক সংক্ষিপ্ত সভা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি আশিষ দে। রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরিত বিহার প্রেস বিলের বিরুদ্ধে "কলকাতার ছাত্র-যুব সমাজের প্রতিবাদ" প্রস্তাবটি উত্থাপন করে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক বাদশা আলম বলেন—ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপ যাতে সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশিত না হয়, তার জন্যই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধকারী এই বিল আনা হয়েছে।

প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের, কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক আশিষ চ্যাটার্জি এবং ডি ওয়াই এফ আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক বরেন বসু বিভিন্ন রাজ্যে গণতান্ত্রিক কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য যে সমস্ত নির্যাতনমূলক বিলগুলি

আনা হচ্ছে, তাও উল্লেখ করেন। তাঁরা সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে একত্রিত করে এই বিলগুলির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সভায় ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রণেন মুখার্জি বিহারে সাংবাদিকদের উপর যে ধরনের অত্যাচার চলছে, তার বিবরণ দিয়ে এর প্রতিবাদে সকলকে এগিয়ে আসতে বলেন,

এই বিক্ষোভ-সমাবেশ থেকে এক প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের কাছে গিয়ে প্রতিবাদপত্র পেশ করে আসেন।

ছাত্র-যুবদের এই বিক্ষোভ মিছিলে শামিল হয়েছিলেন বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিক ও কর্মচারিবৃন্দ।

রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত প্রস্তাব

৪ঠা সেপ্টেম্বর পশ্চিমবংগ রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বিহার প্রেস বিলে সম্মতি না দেবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে বলতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। প্রস্তাবের উত্থাপক বামফ্রন্টের সদস্য শ্যামল চক্রবর্তী, মতীশ রায়, নিরঞ্জন মুখার্জি, শচীন সেন, সুমন্ত হীরা ও সরল দেব।

বিধানসভায় বামফ্রন্টের আনীত এই বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপনের সময় কংগ্রেস (ই) সদস্যরা বাধা দেন। কংগ্রেস (ই) দলের নেতা আব্দুস সাত্তার বলতে থাকেন, কোন রাজ্য বিধানসভায় পাশ করা বিল অন্য কোন রাজ্যের বিধানসভায় আলোচনা করা সংবিধান-বিরুদ্ধ ও বেআইনী। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এর জবাবে বলেন, বিহার প্রেস বিলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে। এটা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। সারা দেশের ওপর এর প্রতিক্রিয়া হবে। সারা দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এতে ক্ষুণ্ণ হবে। কাজেই এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। এটা অসাংবিধানিকও নয়, আইনবিরুদ্ধও নয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ গণতন্ত্রের ওপরই আক্রমণ। কংগ্রেস (ই) এবং কংগ্রেস (এস) সদস্যরা আগে বিজনেস পরামর্শ দাতা কমিটিতে আলোচনার পর প্রস্তাবটি আনার কথা বললে সরকার পক্ষ বলেন, সেই চেষ্টাতে কংগ্রেস (ই) ও কংগ্রেস (এস) সাড়া দেয় নি। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন, যেখানে কংগ্রেস (ই) র নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলছেন, বিহার প্রেস বিলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে আন্দোলন হচ্ছে সেটা 'বোগাস' বা ভূয়া, সেক্ষেত্রে এখানে কংগ্রেস(ই) সদস্যদের আলোচনা করার কোন সাহস আছে?

বসু বলেন, বিশ্বের কোন জায়গায় যুদ্ধ বাধলে অন্য দেশে আলোচনা হয়। কারণ তার প্রতিক্রিয়া বিশ্ব জুড়ে হয়, তেমনি বিহার প্রেস বিলে দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের বিপদ দেখা দিয়েছে। তাছাড়া, আমরা প্রস্তাবে শুধু চেয়েছি, রাষ্ট্রপতি যেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকারী বিহার প্রেস বিলে সম্মতি না দেন।

স্পীকার হাসিম আব্দুল হালিম সি পি আই (এম) সদস্য শচীন সেনকে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য বললে কংগ্রেস (ই) ও কংগ্রেস (এস) সদস্যরা বামফ্রন্ট সদস্যদের ধিক্কার ধ্বনির মধ্যে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

এস ইউ সি প্রস্তাব সমর্থন করে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য কেন্দ্রীভূত করে। আলোচনায় অংশ নেন রাম চ্যাটার্জি (মা ফ ব), সরল দেব (ফ ব), মতীশ রায় (আর এস পি), সি পি আই-র কামাক্ষ্যা ঘোষ এবং জবাবী ভাষণ দেন শচীন সেন। তাঁরা বলেন, স্বৈরাচারী কংগ্রেস (ই) দেশে গণতন্ত্রের উপর একের পর এক আঘাত হানছে। এখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করছে। অন্যান্য কয়েকটি কংগ্রেস (ই) শাসিত রাজ্যেও এই ধরনের চেষ্টা হয়েছে সাংবাদিকরা সেখানে নিগৃহীত লাঞ্ছিত। বিহার প্রেস বিলের পরিণতি ভয়ঙ্কর। তাঁরা এর বিরুদ্ধে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মীদের আন্দোলনের প্রতি সংহতিও জানান।

গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "বিধানসভা মনে করে ভারতীয় দণ্ডবিধি (বিহার সংশোধন) বিল এবং ক্রিমিনাল প্রসিডিওর ল' (বিহার সংশোধনী) বিল সংবাদপত্রের সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করবে এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক আত্মত্যাগের মধ্যে অর্জিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যাবে। এই দানবীয় আইন কার্যকর করা হলে এটা শুধু বিহারের সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেই যাবে না, জাতীয় পর্যায়ে সংবাদপত্রের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত গোটা অংশের বিরুদ্ধেই যাবে।

জনজীবনের স্বার্থসম্বলিত সংবাদ ধামাচাপা দেবার উদ্দেশ্যে এই বিল পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। এই বিল কার্যকর করা রোধ করতে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ ব্যাপক আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

সেজন্য এই বিলে সম্মতি না দেবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে বলতে এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে।"

লেখক-শিল্পীদের প্রতিবাদ

বিহার প্রেস বিল শুধুমাত্র সংবাদপত্রের উপর বা সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ নয়, এটা হচ্ছে ইন্দিরা সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমণের একটি পদক্ষেপ। তাই এর বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের পক্ষে দেশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। গড়ে তুলতে হবে দেশব্যাপী জোরদার আন্দোলন।

২রা সেপ্টেম্বর গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে বিহার প্রেস বিল বিরোধী এক সভায় বিভিন্ন বক্তা উপরের আহ্বান জানান। স্টুডেন্টস হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক কল্পতরু সেনগুপ্ত।

সভার শুরুতে বিহার প্রেস বিলের বিরুদ্ধে ও ৩রা সেপ্টেম্বরের সংবাদপত্রে একদিনের প্রতীক ধর্মঘটের সমর্থন জানিয়ে এক প্রস্তাব পাঠ করেন সংঘের তরফে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার শেষে এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় সংসদ সদস্যা ও "একসাথে" পত্রিকার সম্পাদিকা কনক মুখার্জী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, আজ সাংবাদিকরা যে আন্দোলন করছেন তা শুধুমাত্র তাঁদেরই আন্দোলন নয়—এ আন্দোলন হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের আন্দোলন। তিনি বলেন, রেডিও, টি ভি প্রভৃতি বৃহৎ প্রচার মাধ্যম শাসকশ্রেণীর

বিহার প্রেস বিলের বিরুদ্ধে কলকাতায় সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মীদের সমাবেশ

হাতে থাকা সত্ত্বেও কেন সংবাদপত্রের উপর আক্রমণ তা আমাদের দেখতে হবে। ভারতবর্ষে শাসকশ্রেণীর নিজেদের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে, দুর্বার হয়ে উঠেছে মেহনতী মানুষের আন্দোলন। একে ঢাকা দেওয়ার জন্য এই প্রেস বিল। পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী মানুষ তাঁদের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে নিয়ে সাংবাদিকদের আন্দো-লনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সাংবাদিকদের আন্দোলনের সমর্থনে বামফ্রন্ট সরকার বাজেট পেশের দিন পিছিয়ে দিয়ে এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করেছে সারা ভারতবর্ষে।

তিনি জানান, এই বিলের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা সংসদের উভয় সভায় প্রতিবাদ জনাচ্ছি। ওরা জোর করে সমস্ত কিছু মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু জোর করে মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। মানুষ এর বিরুদ্ধে অন্দোলনে নামবেই।

সভার অপর বক্তা 'গণশক্তি' পত্রিকার বার্তা সম্পাদক অনিল বিশ্বাস তাঁর ভাষণে বলেন, বিহার প্রেস বিল কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। কং(ই) নতুন করে ক্ষমতায় আসার পরই গণতন্ত্র ধ্বংসের যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে এটা তারই একটা অঙ্গ। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় বসার পর শ্রীমতী গান্ধী এক বিদেশী সাংবাদিককে বলেন যে, জরুরী অবস্থায় সংবাদপত্রে সেন্সারশীপের ব্যাপার অতিরঞ্জিত করা হয়েছিল। এটা ছিল শ্রীমতী গান্ধীর একটি ধাপ্পা। এর ঠিক দু'তিন সপ্তাহ পরে শ্রীমতী গান্ধীর সরকার জনতা আমলে গঠিত প্রেস কাউন্সিল ভেঙ্গে গঠন করলেন নতুন কাউন্সিল।

তিনি বলেন, জরুরী অবস্থার মত কাজ করে সারা বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে আর নতুন করে ঘৃণা কুড়তে চান না বলে শ্রীমতী গান্ধী নতুন মাধ্যম—রাজ্যে রাজ্যে কং (ই) সরকারগুলির দ্বারা সংবাদপত্রের উপর আঘাত হানছেন। তিনি বলেন, শ্রেণী বিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অর্থহীন কথা। তবুও আমাদের এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে জোরদার করে তুলতে হবে। এখনো পর্যন্ত কিছু সাংবাদিক বিহারের জগন্নাথ মিশ্র'র কং (ই) সরকারকে ও এ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে এই পর্যায়ে ফেলে আক্রমণ চালাচ্ছে। তিনি এদের এই প্ররোচনায় পা না দিতে অন্যান্য সাংবাদিকদের কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেন, আজ সংবাদপত্রের উপর আক্রমণে দেশের মেহনতী মানুষ যেমন সাংবাদিকদের সাথে ও সমর্থনে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি মেহনতী মানুষের আন্দোলনের সমর্থনে যেন সাংবাদিকরা এগিয়ে আসেন।

সভায় প্রবীণ সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, ভারতবর্ষে সংবাদপত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ভিতর দ্বন্দ্ব বহুদিনের। সাংবাদিকের বিবেকের উপর আক্রমণ চলছে বহু-দিন ধরে। ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের জন্ম থেকে এই আক্রমণ, যেমন হয়েছিল হিকি সাহেবের উপর। তিনি বলেন, জগন্নাথ মিশ্রের এই বিলের সাফাই গাইতে গিয়ে ওরা বলছে, "আইনের উপরে কেউ নয়।" এটা কোন নতুন কথা নয়। আমি বিশ্বাস করি এবং অন্যান্য সাংবাদিককে বলি যে, ব্যক্তিগত আক্রমণ, কুৎসা ও অসত্য কথা কখনও প্রচার করা উচিত নয়।

তিনি বলেন, এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড ফাঁকিবাজী। সারা দেশ দুর্নীতিতে ভরে গেছে। বিহার তার মধ্যে একটি পীঠস্থান। তিনি বলেন, আমাদের আনন্দের কথা যে আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আছে। যদি কংগ্রেস (ই) সরকার থাকত তাহলে কি হত বলা যায় না।

পরিশেষে তিনি বলেন, এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের একমাত্র রাস্তা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এবং আমাদের সেই রাস্তায় এগুতে হবে।

সভায় বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক প্রশান্ত সরকার তাঁর ভাষণে বলেন, সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রকর্মীদের এই রকম আন্দোলন আগে কখনও হয় নি। শ্রীমতী গান্ধী এই বিলের সমর্থনে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত কথা বলেছেন।

তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার বুকে যে আগ্রাসন নীতি চালাচ্ছে তাতে সে ভারতকে অংশীদারী করতে চাইছে। আমার মনে হয় এই প্রেস বিল ও সমস্ত কালা কানুন সাম্রাজ্যবাদীদের জন্যই রচিত হচ্ছে। তাই এই আন্দোলন সংগ্রামের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে।

সভায় অপর এক প্রবীণ সাংবাদিক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত বলেন, ব্রিটিশ আমলে সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল, ছিল কড়াকড়ি। দেশ যখন স্বাধীন হলো ভাবলাম এবার আমরা বন্ধনমুক্ত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখলাম তা নয়। তাই সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের যেটুকু স্বাধীনতা আছে তাকেও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে, একে অভিহিত করতে হবে আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে।

এ ছাড়া সভায় কল্পতরু সেনগুপ্ত, বার্তা জীবী সমিতির পক্ষে রণেন মুখার্জি, স্টেটসম্যান পত্রিকার সাংবাদিক হেমেন বসু ও যুগান্তর পত্রিকার কবি সাংবাদিক কৃষ্ণ ধর ভাষণ দেন।

শ্রমজীবী মানুষের চেতনায় বিপ্লবী-কবি সুকান্ত

সলিল আচার্য

সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি। বিপ্লবী কবি সুকান্ত সেই ধরনের কবি। কবি হিসেবে পরিচিত বটে কিন্তু সেটাই তাঁর সার্বিক পরিচিতি নয়; তিনি খেটে-খাওয়া মানুষের কবি, সর্বহারার কবি। সমাজ-বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ যে কথাটি কার্ল মার্কস বলেছিলেন—"পুঁজি হল ঘনীভূত শ্রম, বা রক্তচোষা বাদুড়ের মত শ্রমকে শুষে বেঁচে থাকে—সে যতই উদরস্থ করে, ততই তার স্ফীতি। যতক্ষণ ধরে শ্রমিক কর্মরত, ততক্ষণ ধরেই পুঁজিপতি তার শ্রম কিনে আত্মসাৎ করে।" এ কথার অর্থ আত্মস্থ করে সুকান্ত তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প রচনা করেছেন। তিনি জানতেন—শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে অবক্ষয়িত পুঁজিবাদ শেষ কথা নয়, শেষ কথা বলেন জনগণ। সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রেণী বৈষম্য ধ্বংস করতে শ্রমিক-কৃষকের সুদৃঢ় শপথের ঔজ্জ্বল্যে সংগ্রামের ময়দানেই আনবে নতুন দিন, সোনালী সূর্যের দিন এবং সেটাই সকল জাতির প্রশান্তির পথ এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের শক্তিশালী সোপান। কবির হৃদয়ের এই প্রত্যয় জন্মেছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দীক্ষা থেকেই। ১৯৪১-৪২-এর দিকে কিশোর সুকান্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দীক্ষিত হয়ে লেখনীকে শাণিত তরবারিতে রূপায়িত করে তিনি শ্রেণীসংগ্রামকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছেন। রক্তলাল পলাশের দাউ-দাউ রং-এ জ্বলা মাত্র ২১টি বসন্ত ছিল কবির জীবনের "সাময়িক-সঞ্চয়"। তাও আবার কাব্য-জীবনের পরিধি আরও সংকীর্ণ ১৯৪০-'৪৭ সাল। এই সীমাবদ্ধ প্রেক্ষাপটে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে ক্লান্তির সংলাপে মুখর আর কোন কবি কি পেরেছেন তাঁর মত করে বুভুক্ষু নিপীড়িত মানুষের জন্য কাঁদতে কিম্বা অসম সমাজের নির্যাতনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে কিম্বা শাসক শ্রেণীর প্রতি ঘৃণার বারুদকে জনমনে সঞ্চারিত করতে কিম্বা অন্ধকার শেকড়ের জাল কেটে সূর্যের রক্তিম ফুল ফোটাবার প্রত্যয়িত ঘোষক হতে? সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার স্রোতে কবির চিন্তা-চেতনার জগত আলোড়িত হয়েছে; সামাজিক চেতনাবোধ বা শ্রেণীচেতনাই কবিকে ধাবিত করেছে মুক্তির মুক্ত আঙিনার দিকে। ফলশ্রুতিস্বরূপ গতানুগতিকতা আসেনি তাঁর কাব্যের জমিনে, আসেনি লঘু প্রেম-প্রিয়া-ফুল নৈসর্গিক রূপে চাপল্য অথবা তন্বী দেহের বহ্নিকে কাব্যিক মর্যাদা না দিয়ে তিনি পদচারণা করেছেন কাব্যের ভিন্ন খাত ধরে—যা শোষিত শ্রেণীর জীবন সংগ্রামে উত্তরণের পাথেয়। ধর্ষিতা সমাজের জঠর থেকে চেতনার নতুন যে বীজটি ক্রমশঃ অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটাচ্ছিল, মুক্তি সেনানী সুকান্ত সেই উত্তাল, কল্লোলিত যুগে, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ জীবন সমুদ্রে চেতনার পাল টাঙিয়ে কম্পাসের মত যথাযথ পথ নির্দেশিকা প্রচার করেছেন। নতুন দিনের যুগদেবতার শ্রুতিরোচক আগমন রথ-ঘর্ঘর তিনি শুনতে পেরেছিলেন কাজেই আসন্ন স্বপ্নের জয়শঙ্খ বাজাবার গুরু-দারিদ্র স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন।

সময়টা ছিল সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়ের এবং সাম্রাজ্যবাদের পতনের কাল। ফিনান্স পুঁজির সবচাইতে প্রতিক্রিয়াশীল, সবচাইতে জাতিদাম্ভিক, সবচাইতে সাম্রাজ্যবাদী অংশের নগ্নরূপে বীভৎসতম সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্ব হচ্ছে ফ্যাসীবাদ। সেই ঘৃণ্য ফ্যাসীবাদ, নাৎসিবাদ তখন হিংস্রতম রণকল্লোলে বিশ্বগ্রাসে উদ্যত। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতেই বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের বলিষ্ঠ প্রতিরোধে ঘোষিত হয়েছে অন্তিম-স্বীকৃতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মানবতা বিরোধী ভয়াল রূপ, যুদ্ধের সংঘাত, বিপর্যয়ের বীভৎসরূপ, দুর্ভিক্ষ পীড়িত নিরন্ন বাংলার লেলিহান হাহাকার, ৫০ লক্ষ অসহায় মানুষের অকাল মৃত্যু, সাম্প্রদায়িক-দাঙ্গা, চাষীদের উত্তাল তেভাগা আন্দোলন, উন্নত চেতনার বিকাশ, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, ডাক-তার ধর্মঘট, নৌ-বিদ্রোহ, সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতী মানুষের সংগ্রামী সংগঠন ও চিন্তার বিকাশধারা ইত্যাদি অগ্নিক্ষরা কাহিনী এবং শব্দে সংযোজিত হাতিয়ার তার কবিতার শরীরকে শাণিত করেছে। চিন্তাবিদ্ রোঁমা রোঁলা বলেছেন : "ধনিকগোষ্ঠী সাপের চেয়েও হিংস্র, ঘাতক অপেক্ষাও নিষ্ঠুর। ক্ষমা করে এদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো যায় না। এদের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে না পারলে এরা চিরকাল মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে—পৃথিবীতে যুদ্ধ, অনাহার অশান্তি লেগেই থাকবে।" এই দর্শন উপলব্ধি করেছেন সাম্যবাদী কবি সুকান্ত। মাটির পৃথিবীর জনারণ্যের ধূলি-কণার সাথে ছিল তাঁর গভীর নৈকট্য নিবিড় সান্নিধ্য। অধ্যাপক শিশির চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন : "He belonged this earth. He was intimately connected with the soil." কবির প্রতিটি কবিতাতেই রয়েছে মননের স্বীকৃতি যা পাঠককুলকে জীবন-সংগ্রামে এগিয়ে দেয়। তাঁর কবিতায় অফুরন্ত উদ্দীপনা, প্রতিবাদী মানসিকতা, প্রাণচাঞ্চল্য, প্রত্যয়দীপ্ত পায়ে শ্রেণীসংগ্রামে অংশ গ্রহণের অঙ্গিকার ঘোষিত হয়েছে অক্ষরে-অক্ষরে, শব্দে-শব্দে।

সমাজের নগ্ন বাস্তবতার সাথে তাঁর রক্তের সম্পর্ক ছিল। মানুষকে নিয়েই তাঁর কারবার। হৃদয়হীন শোষণের অধিকর্তা, শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধি কায়েমী স্বার্থের নির্লজ্জ আস্ফালনের বিরুদ্ধে তিনি হেনেছেন বজ্রনির্ঘোষ :

'আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।'

শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক দাবীর রূপকার বিপ্লবী কবি, শ্রেণীসংগ্রামের কাব্যিক বিশ্লেষক সুকান্ত জীবন পরিক্রমায় পথপ্রদর্শক, কাজেই শোষণহীন সমাজের হাতছানির পেছনে ধনিক প্রভুর শ্রেণীক স্বার্থ চরিতার্থতার অন্তিম পরিণতি সুললিত ছন্দে তিনি বিবৃত করেছেন :

'মুখে মৃদু হাসি অহিংস বুদ্ধের
ভূমিকা চাই না, ডাক ওঠে গণযুদ্ধের।'

স্বাভাবিকভাবেই সুকান্তের বাস্তববাদী অসাম্যের চিত্র। সভ্যতার রাজপথে যারা শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অন্তজ, অপাংক্তেয় তাদের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে চলেছেন বলেই কবি-হৃদয়ের সংবেদনশীলতা কবিতায় বিশ্লেষিত :

'প্রত্যহ যারা ঘৃণিত পদানত
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত।
তাদের এই দলের পিছনে আমিও আছি
তাদের মধ্যে আমিও মরি বাঁচি।'

কবি সচেতনভাবে অনুভব করেছেন মেহনতী মানুষের শ্রমে-ঘামে, ক্ষেতে-খামারে, পথে-প্রান্তরে, কারখানার নিশ্ছিদ্র কালিমামণ্ডিত পরিসরে দুঃসহ যে জীবন, সেই প্রকৃত জীবন। কবিতাকে জীবনমনস্ক করতেই লিখলেন :

'প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।'

এক বিশেষ পরিস্থিতিতে কবি কাব্যিক মূর্ছনায় ব্যক্ত করলেন : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বড় গ্যারান্টি হচ্ছে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং এই সচেতনতা অশুভ শক্তি প্রতিরোধে শাণিত হাতিয়ার। শাসকশ্রেণীর শোষণ যন্ত্রটাকে অটুট রাখতে শ্রেণীস্বার্থেই ওরা সাম্প্রদায়িক ঐক্যে ফাটল ধরাতে সচেষ্ট। "আমাদের সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।" কবি শোনালেন বিকশিত চেতনালব্ধ অভিজ্ঞতা :

'হাজার জীবন বিকশিত এক রক্ত-ফুলে
পথে-প্রান্তরে নূতন স্বপ্ন উঠেছে দুলে।
অভিজ্ঞতার আগুনে শুদ্ধ অতীত পাতক
এখানে সবাই সংঘবদ্ধ যে নবজাতক।'

কবির ব্যক্তিগত ক্ষণস্থায়ী জীবনে বেদনার ঘাটতি ছিল না কিন্তু সেই ব্যথার পীড়নে তিনি আহত হতেন না কারণ লক্ষ কোটি ব্যথাতুর মানুষের মুক্তি মিছিলে শ্লোগান ছিল তাঁর অমর-কাব্য। হৃদয়ের কোষে-কোষে বজ্রকঠিন জেহাদের অনুরণন ছিল কবির স্বভাবজাত রূপ। তথাপি তিনি অবুঝ বালকের মত বিস্ময়ে হত-বাক, সমাজের বিষাক্ততা, অস্বাস্থ্যকর অভিজ্ঞতার ভারে অবনত, তিক্ত উন্মাদনায় কবি : "জন্মেই

দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি।" "এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম/অবাক পৃথিবী সেলাম তোমাকে সেলাম।" তিনি এই পরিস্থিতিকে মেনে নিতে পারেন নি উন্নত চিন্তার পথ বেয়ে দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তি কামনায় উৎসর্গীকৃত হৃদয়ে মুহূর্তেই দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন :

'অসংখ্য দিন কেটেছে প্রাণের বৃথা রোদনে
নরম সোফায় বিপ্লবী মন উদ্বোধনে;
আজকে কিন্তু জনতা জোয়ারে দোলে প্লাবন
নিরুপম মনে রক্তিম পথ অনুধাবন।'

আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ কবি সেই বাণীকে শব্দের স্তবক বেয়ে কবিতার শরীরে প্রোথিত করেছেন শৈল্পিক নৈপুণ্যে। শোষণহীন চির আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর পৃথিবী একদিন সমস্ত মানুষদের মুক্তি দেবে এই প্রত্যয় প্রচ্ছন্ন নয়। তাঁর কবিতায় কিশোরদের জন্য লেখা কবিতায় কবির সাবলীল চিত্রাঙ্কনে প্রার্থিত স্বাপ্নিল বিশ্বের রূপোলী ঝিলিক :

'শান্ত স্নিগ্ধ, বিবাদ-বিহীন
জীবন, সেখানে, তাই
সকলেই সুখে বাস করে আর
সকলেই ভাই ভাই;
এক মনে প্রাণে কাজ করে তারা
বাঁচাতে মাতৃভূমি,
তোমার জন্যে আমি, সেই দেশে,
আমার জন্য তুমি।'

পরাধীন ভারতবর্ষেই সুকান্তের জীবনাবসান। তারপর স্বাধীনতা, পেরিয়ে গেছে তিন-তিনটি দশক। আজ আমাদের অভিজ্ঞতা তিক্ততায় জমাট বাঁধা কালো বরফ। এই অভিজ্ঞতাজাত অনুভূতিই দু'ভাগে ভাগ হওয়া বিশ্বের অবস্থানকে জড়িয়ে ভাবিত করে। পুঁজিবাদী দুনিয়ার মন্দা, সাম্রাজ্যবাদী আণবিক যুদ্ধের দামামা বাজছে বিশেষত যুদ্ধবাজ আমেরিকার নেতৃত্বে, প্রশ্রয়ে ও অহমিকায়। বিকাশকামী দেশগুলির উপর উত্তরোত্তর চাপ বৃদ্ধি, সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ—ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা—সর্বত্র পুঁজিবাদী সংকট বিরোধী, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ক্রমবর্ধিষ্ণু। ভারতবর্ষের মিশ্র অর্থনীতি শোষণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার দ্বন্দ্বগুলি থেকে উদ্ভূত সংকট কৃষি, শিল্পের জগতে সমস্যাকে ঘনীভূত করছে। মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, বেকারী, ঘাটতি বাজেট, ঘাটতি বাণিজ্য সব মিলিয়ে আদর্শবোধের অবনমন ঘটিয়ে মানবতাকে ক্ষত-বিক্ষত করছে। পচনশীল অর্থনীতির মূলকে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ৫২২০ কোটি টাকার অধীনতামূলক ঋণে চিকিৎসাধীন করে সমস্যাকে জটিল থেকে জটিলতর করছে। উদ্বেগজনক কৃষি সংকট, শিল্প সংকট মুষ্টিমেয়র হাতে পুঁজির কেন্দ্রীভবন মানুষের দুর্বিসহ জীবন যন্ত্রণাকে আরও তীব্র করছে। কেন্দ্রীয় সরকার স্বৈরাচারীরূপে উদ্ঘাটিত করেই সংসদীয় গণতন্ত্রকে বিপন্ন করছে রাষ্ট্রপতি প্রধান রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে ঝুঁকেছে, উপেক্ষিত হচ্ছে সংসদ, উপেক্ষিত ভারতের বিচার বিভাগ, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে কাঁপছে ভারতবর্ষের মানচিত্র, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হরিজন নিগ্রহ ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামগ্রিক সংকটের বোঝা শ্রমজীবী মানুষের উপর চাপাতে এবং গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণাকে বিধ্বস্ত করতে—প্রতিবাদের কণ্ঠরোধের আইনী ব্যবস্থা 'ন্যাসা', 'এ্যাসমা' ইত্যাদি ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। আর এক দিকে পশ্চিমী কায়দায় অপসংস্কৃতির ঢালাও ব্যবসা চলছে সংস্কৃতির অঙ্গনে যা জীবন বিমুখ করে তুলছে সভ্যজগতের মানুষকে। আমরা সংস্কৃতি বলতে বুঝি 'পরিশীলিত কর্ম'। সংস্কৃতির জগত শিল্পী-সাহিত্যিকের উন্নত চেতনার ফসল যা জীবনকে সুন্দর সাবলীল প্রাণস্পন্দনে পরিপূর্ণ করে সমাজকে অগ্রগামী করে তোলে। কমরেড মাও সে-তুঙ্ বলেছেন : "একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতির আদর্শগত প্রতিফলন।"

পৃথিবীর অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশ বলে প্রচারিত ভারতবর্ষে জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করা হয় শ্রেণীস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই; তাই ব্যাপক অগণতান্ত্রিকতা, দমন-পীড়ন, নির্যাতনের আয়োজন। এ দেশে আজও ধনীক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে ন্যূনতম মজুরী স্থিরীকৃত হয় নি অথচ মুনাফা শিকারের সর্বোচ্চ সীমা নেই।

টাটা-বিড়লাদের শিল্প-সাম্রাজ্য

(কোটি টাকা হিঃ সম্পত্তি)

	১৯৬৪	১৯৭৯
বিড়লা	২৯২·৭২	১৩০৯·৯৯
টাটা	৪১৭·৭২	১৩০৯·০৮

১৯৭৯ সালে দেশের ২০টি সর্ববৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠীর মোট সম্পত্তিতে টাটা-বিড়লাদের অংশ ছিল ৪৫% ভাগ। বর্তমানে টাটা-বিড়লাদের সম্পদের পরিমাণ ৩ হাজার কোটি টাকা। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সম্পদের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়ছে আর দেশব্যাপী বাড়ছে ক্ষুধার নগ্ন-হাহাকার। ঘোষিত সরকারী হিসেব অনুযায়ী শতকরা ৪৮ জন মানুষ অর্থাৎ ৩০ কোটিরও বেশী মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছেন। এটা প্রকৃত চিত্র নয়। ১৯৬৮-৬৯ সালের হিসেবে ৪৩% ভাগ, ১৯৭৩-৭৪ সালের হিসেবে ৬১% ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছেন বর্তমানের চিত্র আরও ভয়াবহ। দেশের সার্বভৌমত্ব সাম্রাজ্যবাদের কাছে 'বন্ধক' রেখে আই. এম. এফ.-এর কাছ থেকে ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশী ঋণ নেওয়া হয়েছে, তা ছাড়াও বিদেশী ঋণের পরিমাণ ২৮ হাজার ৬৫৩ কোটি টাকা। অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে—স্বাধীনতার বিপদ আসন্ন। আজকের সামাজিক চাহিদা হল—কাঙ্ক্ষিত উত্তরণের শৈল্পিক বিকাশে লক্ষ কোটি সুকান্ত।

এই যখন কবির দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক বাতাবরণ আর সেখানে আপনার আমার প্রত্যেকের কাঁধে রয়েছে বিপ্লবী কবির উত্তরাধিকারীত্ব। আমরা কবির শ্রেণীচেতনার প্রতি স্বভাবতই দায়বদ্ধ। বিশ্লেষণী ক্ষমতা, সমালোচনার তীক্ষ্ণতা, ভাষা ও ছন্দের যথার্থ প্রয়োগ রয়েছে তাঁর অমর কাব্যের আগ্নেয় লাভার প্রলেপের মধ্যে। ম্যাক্সিম গোর্কী বলেছিলেন : "শ্রমিক শ্রেণীর মানসিকতা চায় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি, পুঁজিপতি ও তাদের দালালদের ক্ষমতার প্রতি, পরাশ্রয়ী, ফ্যাসিস্ত কসাই ও শ্রমিক শ্রেণীর বেইমানদের প্রতি যাহা কিছু দুঃখ সৃষ্টি করে তাহার প্রতি, যে কেহ কোটি কোটি মানুষের দুর্দশাকে উপজীব্য করিয়া বাঁচিতে চায় তাহার প্রতি বিদ্বেষের এক অনির্বাণ অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠুক।" শোষণহীন জীবন, সুস্থ সংস্কৃতি, গণজাগরণের জন্য সুকান্ত ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ। যৌবনের জলতরঙ্গের যে সুরমূর্ছনা তাঁর হৃদয়বীণার তারে ঝঙ্কার তুলেছিল সেই ঝংকার হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে বিকশিত করার ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা প্রসঙ্গে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মাও-সে-তুঙ : "লেখক আর শিল্পীদের কাজ হল দৈনন্দিন ব্যাপারটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুসংযতভাবে তীক্ষ্ণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলে সেটাকে একটা ঘনীভূত রূপ দান করা। এমন সাহিত্য শিল্পই জনগণকে সচকিত করে তুলতে পারে, তাদের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, সুসংগঠিত সংগ্রামের মারফত নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করবার জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে প্রেরণা দিতে পারে।" এ দিকে লক্ষ্য রেখেই কিশোর সুকান্ত কবিতার ফসলে শরীক হয়েছিলেন, কাজেই সেখানে রোমান্টিক ভাববাদী আদর্শের প্রতিফলন ঘটে নি। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস মানেই রক্ষণশীলতা, কায়েমী স্বার্থ, গোলামীর বিরুদ্ধে স্তরীভূত মুক্তির ইতিহাস। শত-সহস্র অত্যাচার, নির্যাতন, দুর্বহ নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই-এর মধ্য দিয়েই রচিত হয় ইতিহাস আর এই ইতিহাস রচনা করতে মানুষ মরেও বেঁচে থাকে; এই মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষের জয়গান গাওয়া নয়, এই অজেয় অমর অক্ষয় মানুষের হাতে হাত ধরে ইতিহাস রচনায় সুকান্ত ছিলেন একাত্মতায় ভরপুর। সুকান্ত অমর তাঁর কাব্যে, তাঁর কবিত্বে, তাঁর মানবতাবাদে, তাঁর বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে, সংস্কৃতির জগতে লড়াকু ইতিহাসে এবং আজকের শ্রমজীবী মানুষের কঠিন-কঠোর সংগ্রামে। যথার্থই বলা হয় : 'সুকান্তের কবিতা খুবই স্পষ্ট, যেমন স্পষ্ট প্রতিদিনের সূর্যালোক, যেমন স্পষ্ট জননীর ভালবাসা, যেমন স্পষ্ট ক্ষুধার্ত মানুষের কান্না।' আজকের জীবন-সংগ্রামে সর্বহারার বেদনা বুকে নিয়ে রুক্ষ, শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বাস্তবতায় প্রতিটি বাঁক ও মোড়ে কবির অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নেবার মধ্য দিয়েই কবিকে স্মরণ করার প্রকৃষ্ট পথ।

"হরতাল" গ্রন্থে গল্পকার সুকান্ত

কবি সুকান্ত শুধু একটি নাম নয়। সুকান্ত আজ একটা ইতিহাস। আমাদের দুর্ভিক্ষ মহামারী বন্যাক্লিষ্ট জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য তপ্ত অশ্রুবেদনার ইতিহাস।

অতি অল্পস্থায়ী জীবনে বৃহৎ কবি প্রতিভার সার্থক স্ফুরণ বড় একটা চোখে পড়ে না। তবু অল্প স্থায়ীত্বের মাঝেই কবি সুকান্তের কাব্য প্রতিভার বিরাট সম্ভাবনা পরিপূর্ণ সাফল্যের ইঙ্গিত দেয়,—একথা আশা করি কেহই অস্বীকার করবে না। বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন যুগকে চিহ্নিত করে দিয়ে গেছেন তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য।

কিন্তু কবি সুকান্ত একজন বিশিষ্ট গল্পকার। তিনি বেশ কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছিলেন। সেগুলির প্রায় এখনও কোথাও না কোথাও আত্মগোপন করে আছে। ১৯৪০-৪২-এর মধ্যে সুকান্ত বেশ কিছু গল্প লিখেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অধুনালুপ্ত 'অরণি' পত্রিকায় তাঁর গল্প ছাপা হ'ত। [নন্দন—শ্রাবণ, ১৩৭৭]

কবি সুকান্তর কবিতায় যেরূপ অধিকার রক্ষার প্রাত্যহিক আন্দোলন, শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করবার দুর্জয় শপথ, সমাজতন্ত্র নির্মাণের সুদৃঢ় প্রত্যয়—প্রত্যহই নতুন জীবন—নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। ঠিক তেমনি তাঁর ছোট গল্পগুলির মধ্যেও সেই ভাব, সেই সুর পরিলক্ষিত হয়।

এখানে গদ্যকার সুকান্তের 'হরতাল' ছোট-গল্পের বইটি সম্বন্ধে সামান্য আলোকপাত করছি।

গদ্যকার সুকান্ত তাঁর 'হরতাল' বইতে শব্দের মধ্যে ধ্বনি তুলেছেন। এই বইতে 'হরতাল', 'লেজের কাহিনী', 'ষাঁড়-গাধা-ছাগলের কথা', 'দেবতার ভয়' ও 'রাখাল ছেলে' এই কয়টি ছোট-গল্প রয়েছে। 'হরতাল' গল্পে সভাপতি হ'ল ইঞ্জিন। মানুষরা যখন হরতাল করে তখন রেলের যন্ত্রপাতি চাকা এমনকি সিগ্‌নাল পর্যন্ত মিলিত হ'ল। আর দালালরা মানে ঘড়ি আর বাঁশী কর্ম-কর্তাদের কার্য সব মাটি করে দিল।

সুভাষচন্দ্র পাল

তাই গল্পে আমরা পাই—ইঞ্জিনের চাকাগুলো বলল—'ধর্মঘট হলে আমরা এক পাও নড়ছি না, দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে থাকবো সকলে।'

সিগ্‌ন্যাল সাহেব বললো—'মানুষ-মজুর আর আমাদের বড়বাবু ইঞ্জিন মশাইরা তবু কিছু খেতে পান। আমরা কিছুই পাই না, আমরা খাঁটি মজুর। হরতাল হলে আমি আর রাস্তার পুলিশদের মত হাত ওঠান-নামান মানব না; চোখ বন্ধ করে হাত গুটিয়ে পড়ে থাকবো।'

তেমনি 'লেজের কাহিনী'তে মাছির লোভের কাহিনী এত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন তা আর অন্য কোন ছোটগল্পে পরিলক্ষিত হয় না। এ কাহিনীতে এটাই বোঝা যায় অতি লোভ করতে নেই। লোভের বশে মানুষ বড় হতে পারে না। মাছি যেমন বড় হতে পারলো না। তার আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হ'ল। এই গল্পে গদ্যকার সুকান্ত নিগূঢ় সত্যকে প্রকট করে দেখিয়েছেন। সত্যকে অলঙ্ঘন করলে তার পরিণাম যে কি হয় তা 'মাছির' দশা দেখলে বোঝা যায়।

মাছি বলছে—'আমি লোকটা সোজা করবোই। যতক্ষণ না সে আমায় লেজ করে দেয় আমি তাকে কষ্ট দেব।' তারপর মাছি যখন গরুর কাছে যায় তার লেজ রাখার কারণ জানতে তখন গরু তার লেজের চাট্‌ জানিয়ে দিল লেজ রাখার কারণটা। মাছির শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

এই গল্পটি সোভিয়েট শিশুসাহিত্যিক ভি. বিয়াঙ্কির 'টেইলস' গল্পের অনুবাদ। গদ্যকার সুকান্তের অনুবাদও খুব স্বচ্ছন্দ। তাঁর তৃতীয় গল্প 'ষাঁড়-গাধা-ছাগলের কথা।' এই গল্পে সকলেই স্বাধীনতার চেষ্টা করে পরিশেষে ষাঁড়-গাধার আর মুক্তি হ'ল না। ছাগলটা আর ফেরেনি। কারণ অনেক মহাপুরুষের মত তারও একটু দাড়ি ছিল। এই গল্পে আমরা পাই নিজের কাজের মীমাংসা করতে অন্যের কাছে কখনো যেতে নেই। আর 'রাখাল ছেলে' গল্পটি একটি সুন্দর কবিতা। কবিতাই হচ্ছে ছোটগল্প। সুন্দর সরল সাবলীল ভাষা। গদ্যকার সুকান্তের গদ্যরচনাশৈলী সকলের চিত্তমুগ্ধ।

[স্মরণীয় ৩১শে আগস্ট : ৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ব্যানারটিতে লেখা ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতার অংশবিশেষ—

> "বীরের এ রক্ত স্রোত
> মাতার এ অশ্রু ধারা
> এর যত মূল্য সে কি
> ধরার ধুলায় হ'বে হারা?"

দেখতে দেখতে ২৩টা বছর পার হয়ে গেল। সেই ৩১শে আগস্ট যখন ঘুরে ফিরে আমাদের মধ্যে আসে তখন মনে পড়ে সেই ৩১শে আগস্টের কথা। ১লা, ৩রা, ১০ই সেপ্টেম্বরের কথা। মনে পড়ে সেই গ্রামের মানুষের মুখগুলি, গুলি খাওয়া রমণীর কথা। মনে পড়ে শিক্ষক চুনীলাল দত্তের কথা। চৌদ্দ বছরের বালক সরোজের মুখটা যেন এখনও চোখে চোখে ভাসছে। গোবর্ধন দাস, দেবেন মণ্ডল, অভিমন্যু সাহা, হরিপদ গুপ্ত, মহম্মদ বসির, ধনরাজ গুপ্ত, প্রকাশ রায়ের কথা। মনে পড়ে আরও জানা-অজানাদের কথা। সেদিনের কয়েকটা দিনের ঘটনা আজও মনকে তোলপাড় করে তোলে। চুনীলাল দত্ত'র পুত্রবধূর সেই কথা আজও কানে বাজে। "এতো বড় অন্যায় সইবে?" কিংবা হারান পালের মায়ের সেই মর্মস্পর্শী জবানী—"শ্মশানে আমার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দেখি—মাথায় দশ জায়গায় আঘাতের ক্ষত। কপাল ফাটা চার জায়গায়। আমার ছেলেকে ওরা পিটিয়ে মেরেছে।"

খাদ্য আন্দোলন আরও দু'সপ্তাহ চলার পর সরকার খাদ্য আন্দোলনের আংশিক দাবি মেনে নেওয়ার পর খাদ্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। সেই খাদ্য আন্দোলন চলাকালীনই আজকের সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার সে দিনের ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ৩১শে আগস্ট-এর আন্দোলনের শহীদ স্মরণে একটা শহীদবেদী স্থাপিত হয়।

১৯৬৭ সাল। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের সভায় ৩১শে আগস্টের সেই শহীদ স্মৃতিটি সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ২রা মার্চ প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা রাজভবনে মন্ত্রগুপ্তি পাঠ করে চলে আসেন এই খাদ্য আন্দোলনের শহীদ স্মৃতি স্তম্ভের কাছে, এসে মাল্যদান করেন।

১৯৭৭ সালে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অবস্থিত খাদ্য আন্দোলনের অমর শহীদের স্মৃতি স্তম্ভটিকে আরও ভালভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

সেই ৩১শে আগস্ট আবার ফিরে এসেছে '৮২ সালে। খাদ্য আন্দোলনের সেই অমর শহীদদের স্মরণে আবার শহীদ স্তম্ভটি ফুলে মালায় ভরে ওঠে। অমর শহীদদের স্মৃতিতে আওয়াজ ওঠে—খাদ্য আন্দোলনের অমর শহীদ তোমাদের আমরা ভুলি নি ভুলবো না।

রক্তেরাঙ্গা ৩১শে আগস্ট—আমরা কি তোমায় ভুলতে পারি?

কেমন করে ভালো নেগেটিভ তৈরী করতে হয়

সন্তোষ সেন

"ভালো ছবির করণ কৌশলের রহস্য লুকিয়ে আছে নেগেটিভ-এর মধ্যে। ভালো নেগেটিভ হলে সব কিছুই সম্ভব; ভালো নেগেটিভ না হলে সব কিছু অসম্ভব।" (William Morteusen.)

অতএব প্রত্যেক আলোকচিত্র শিল্প-নবীশকে ভালো ছবি তৈরী করার জন্য নেগেটিভ তৈরী করার পদ্ধতি, ডেভেলাপিং, ফিক্সিং ইত্যাদি সম্বন্ধে ভালোভাবে বিস্তারিত জানতে হবে। আমরা প্রত্যেকে জানি এক্সপোজড ফিলম্‌কে ডেভেলাপিং, ফিক্সিং করার মাধ্যমে নেগেটিভে রূপান্তরিত করা হয়। তাই ডেভেলাপারের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে না পারলে কখনোই ভালো নেগেটিভ তৈরী করা সম্ভব না। প্রসঙ্গক্রমে বলি ভালো নেগেটিভের প্রাথমিক স্তর কিন্তু ন্যূনতম সঠিক এক্সপোজার। তবে সঠিক এক্সপোজার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা কিছু সুবিধা ভোগ করি ফিল্‌মের এক্সপোজার ল্যাটিচুড থাকার জন্য। এক্সপোজার ল্যাটিচুড সামান্য ওভার বা আন্ডার এক্সপোজারের ত্রুটি সহজেই দূর করে দেয়। কিন্তু সামান্য ডেভেলাপিংয়ের হেরফের হলে তার ফল আমাদের ভোগ করতেই হয়।

বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সমন্বয়ে তৈরী হয় ডেভেলাপার। একটা ডেভেলাপারের থাকে বিভিন্ন স্তর।

১। **ডেভেলাপিং এজেন্ট** (Developing Agent):

ডেভেলাপিং এজেন্টের কাজ হলো ফিলম্ ইমালশনের সিলভার হলাইডকে মেটালিক (বস্তুগত) সিলভারে রূপান্তরিত করা। সুতরাং সেই সকল দ্রব্যকেই আমরা একমাত্র ডেভেলাপিং এজেন্ট বলতে পারি, যারা এক্সপোজড ফিল্‌মের এক্সপোজড অংশকে মেটালিক সিলভারে রূপান্তরিত করতে পারে কিন্তু এক্সপোজড না হওয়া অংশে কোন ক্রিয়া করে না। আলোক-চিত্রের কাজে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ডেভেলাপিং এজেন্ট ব্যবহার করা হয় কিন্তু সাধারণত ব্যাপক হারে ডেভেলাপিং এজেন্টরূপে ব্যবহার করা হয় মেটল এবং হাইড্রোকুইনন।

মেটল (Metal):

মেটল মন্থর ক্রিয়াশীল, অল্পশক্তিসম্পন্ন ডেভেলাপিং এজেন্ট। এই জন্য মেটল মেটালিক সিলভারের গ্রেনকে সূক্ষ্ম করে এবং ধীরে ধীরে কাজ করে বলে সবচেয়ে বেশী ছায়া অংশের বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারে। মূলতঃ এই কারণে, মেটল ব্যাপকভাবে ফাইন গ্রেন ডেভে-লাপারে ব্যবহার করা হয়।

হাইড্রোকুইনন (Hydroquinone):

হাইড্রোকুইনন উচ্চশক্তিসম্পন্ন এবং দ্রুত ক্রিয়াশীল ডেভেলাপিং এজেন্ট। এইজন্য হাইড্রো-কুইনন রৌদ্র অংশ (হাইলাইট) দ্রুত কাজ করে এবং নেগেটিভের কনট্রাস্ট বাড়ায়।

২। **প্রিজারভেটিব্** (Preservative):

সংরক্ষণ করা

বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে তৈরী ডেভেলাপারের—যাতে বাতাস লেগে সহজে নষ্ট না হয়ে যায় এবং দ্রুত কার্যক্ষমতা না হারায় এজন্য ডেভেলাপারে প্রিজারভার রূপে সোডিয়াম সালফাইট ব্যবহার করা হয়।

৩। **অ্যাক্সিলেটার** (Accelerator):

সক্রিয় করা

ডেভেলাপারে মিশ্রিত সকল রাসায়নিক দ্রব্য-গুলি যাতে ভালোভাবে মিশে যায় এবং সক্রিয় হয় তার জন্য **সোডিয়াম কারবোনেট** এবং **বোরেক্স** ব্যবহার করা হয়।

৪। **রেইস্‌ট্রেনার** (Restrainer):

সংযত করা

ডেভেলাপারে মিশ্রিত প্রতিটি রাসায়নিক দ্রব্যের কর্মক্ষমতা যাতে আগাগোড়া সমান ও একই থাকে তার জন্য **পটাসিয়াম ব্রোমাইড** ব্যবহার করা হয়। পটাসিয়াম ব্রোমাইড ফিলম্‌কে রাসায়নিক ফগের হাত থেকে রক্ষা করে।

৫। **জল** (Water):

উপরোক্ত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যগুলো জলে নির্দিষ্ট পরিমাণ মিশিয়ে তৈরী করা হয় ডেভেলাপার। ডেভেলাপারের জলরূপে 'ডিশটিল ওয়াটার' ব্যবহার করা ভালো। কিন্তু পরিষ্কার জল একটু ফুটিয়ে এবং ভালো করে ফিলটার করে নিলে ডিসটিল ওয়াটারের মতই ফল পাওয়া যায়।

ডেভেলাপার তৈরী করার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। ভালো ফল পাওয়ার জন্য অবশ্যই নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। ডেভেলাপার তৈরীর জন্য প্রথম নির্দিষ্ট পরিমাণ জল নিয়ে তার মধ্যে একটু সোডিয়াম সালফাইট গুলে নিতে হবে। (কেন না, প্রায় প্রতিটি ডেভেলাপিং এজেন্ট জলে মিশে কিছুটা অক্সিডাইজড (oxidaised) হয়ে যায় সংরক্ষণ-কর দ্রব্যের অভাবে)। এর পর ধারাবাহিক, পরপর মিশিয়ে নিতে হবে মেটল, সোডিয়াম সালফাইট, হাইড্রোকুইনন, সোডিয়াম কার্বোনেট, পটাশিয়াম ব্রোমাইড।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, যে পরিমাণ জলে ডেভেলাপার তৈরী করা হবে তার ৩/৪ ভাগ প্রথমে বোতলে নিয়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী রাসায়নিক দ্রব্য-গুলো মেশাতে হবে। সব সময় মনে রাখতে হবে একটা দ্রব্য জলে ভালোভাবে মিশে যাবার পর যেন দ্বিতীয় দ্রব্যটা মেশানো হয়। এভাবে সব দ্রব্যগুলো মেশানোর পর বাকি ১/৪ ভাগ জল মিশিয়ে নিতে হবে। এবার বোতলটা ঠান্ডা এবং অন্ধকার জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। কালো বা গাঢ় রঙের বোতল ব্যবহার করা উচিত। কেন না, তাহলে বোতলের ভিতর আলো প্রবেশ করতে পারবে না। এজন্য ডেভেলাপার দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে। সহজে নষ্ট হবে না। কাজ শুরু করার, কমপক্ষে ১২ (বারো) ঘণ্টা আগে ডেভেলাপার তৈরী করে রাখা উচিত।

কোন ফিলম্ ডেভেলাপ করার সময় কত-গুলো বিষয় বিবেচনা করতে হয়। তা না হলে কখনোই ভালো ফল আশা করা যায় না।

১। **সময়** : ফিলম্‌টা কতক্ষণ ডেভেলাপ করতে হবে সেটা নির্ভর করে, উত্তাপ, ডেভেলাপার ও জলের মিশ্রণের অনুপাত, ফিলম্ স্পিড, ডেভেলাপিংয়ের পদ্ধতির উপর।

উত্তাপ : প্রতিটি রাসায়নিক দ্রব্যের মত ডেভেলাপারও তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। এইজন্য তাপমাত্রার ২° ফারেন-হাইট বাড়লে বা কমলে ডেভেলাপিংয়ের সময় ৫% কমবে বা বাড়বে। তাপমাত্রা বাড়লে সময় কমবে এবং তাপমাত্রা কমলে সময় বাড়বে।

ডেভেলাপার ও জলের মিশ্রণের অনুপাত : এটা আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝতে পারি ডেভেলাপারের সাথে জল মেশালে ডেভেলাপার পাতলা হয়ে যাবে এবং সেই সঙ্গে ডেভেলাপারের কার্যক্ষমতা কমে যাবে। এইজন্য ডেভেলাপারের সঙ্গে যত বেশী পরিমাণ জল মেশাবো ডেভেলাপিংয়ের সময় তত বেশী লাগবে। সাধারণত ডেভেলাপারের সাথে ১ (এক) ভাগ জল মেশালে ডেভেলাপিংয়ের সময় ২০% বাড়াতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে বলি, যদি কোন ডেভেলাপারে একটা ফিলম্ ডেভেলাপ করার পর আর একটা ফিলম্ ডেভেলাপ করতে হয় তবে সময় ২৫% বাড়াতে হবে। কেন না, প্রথম ফিলম্ ডেভেলাপ করার জন্য ডেভেলাপার কিছুটা কার্য-ক্ষমতা হারিয়ে দুর্বল হয়ে যাবে।

ফিলম্ স্পিড : ফিলম্ স্পিড যত বাড়বে ততই সেলুলয়েডের উপর ইমালশান বেশী পরিমাণে থাকবে। অর্থাৎ ফিলম্‌টা পুরু হবে।

অতএব ডেভেলাপিংয়ের সময়ও বেশী লাগবে। সাধারণত ফিলম্ স্পিড বাড়লে বা কমলে ডেভেলাপিংয়ের সময় ২০% বাড়বে বা কমবে। অর্থাৎ ফিলম্ স্পিড বেশী হলে সময় বেশী লাগবে আর ফিলম্ স্পিড কম হলে সময় কম লাগবে।

ডেভেলাপিং পদ্ধতি ঃ দুইভাবে ফিলম্ ডেভেলাপ করা যায়। ডিসে এবং ট্যাঙ্কে। ডিসে ডেভেলাপ করলে যে সময় লাগবে ট্যাঙ্কে ডেভেলাপ করলে তা থেকে ২০% সময় কম লাগবে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন ফিলম্‌টা নাড়াচাড়ার উপরও ডেভেলাপিংয়ের সময় নির্ভর করে। কারণ, ডেভেলাপিংয়ের সময় ফিলম্‌টা নাড়াচাড়া করতে হয়। তা না হলে ফিলমের হাই-লাইট অংশে ডেভেলাপার তাড়াতাড়ি কাজ করবে কিন্তু ছায়া অংশ আস্তে আস্তে কাজ করবে অর্থাৎ ডেভেলাপিংয়ে অসংগতি দেখা দেবে।

একটা ফিলম্‌কে নেগেটিভে রূপান্তরিত করার সময় নানান কারণে কতগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অবশ্য সাধারণত যে অসুবিধাগুলো দেখা দেয় তা আমরা অনায়াসে দূর করতে পারি। অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা যেতে পারে।

১। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফিলম্‌টা ডেভেলাপ করার পর, ফিলম্‌টাকে ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড (Stop Bath)-এ ট্রিটমেন্ট করা উচিত। ফিলম্‌টা (Stop Bath)-এ দেওয়ার সাথে সাথে ডেভেলাপারের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং ওভার ডেভেলাপ হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

STOP BATH Solution

Glocial Acetic Acid ... 20 c.c.
জল (Water) — ১০০০ সি.সি.

২। আমরা জানি ফিলমের ইমালশান জিলোটিন দিয়ে সেলুলয়েডের ফিতের সাথে আঁটা থাকে। খুব স্বাভাবিক কারণে অতিরিক্ত গরমে জিলোটিন গলে যায় এবং ফিলম্‌টা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য ডেভেলাপিংয়ের সময় ফিলম্‌টা (Stop Bath)এ ট্রিটমেন্টের পর ৩ থেকে ৫ মিনিট Hardener-এ ট্রিটমেন্ট করতে হয়। Hardener ফিলমের জিলোটিন গলা বন্ধ করে দেয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন Hardener-এ ট্রিটমেন্ট করার পর ফিলম্‌টা ভালোভাবে ১ (এক) মিনিট জলে ধুয়ে পরবর্তী কাজ করতে হবে।

HARDENER Solution

Chrome Alum — ৩০ গ্রাম
জল (Water) — ১০০০ সি.সি.

ফিলম্ ডেভেলাপ করার পর প্রয়োজন হয় ফিক্সিং করা। কেন না, ডেভেলাপার ফিলমের এক্সপোজড না হওয়া অংশে কোন ক্রিয়া করে না। তাই ডেভেলাপ হয়ে যাওয়ার পর আমরা যদি ফিলম্‌টাকে আলোতে আনি তবে এক্সপোজড না হওয়া অংশগুলো এক্সপোজড হয়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। ফিক্সারের কাজ হলো ফিলমের এক্সপোজড না হওয়া অংশের ইমালশান ধুয়ে দিয়ে ফিলম্‌টা পরিষ্কার করে স্থায়ী নেগেটিভ তৈরী করা। একটা ফিলম্‌কে কমপক্ষে ৩ থেকে ৫ মিনিট ফিক্স করা উচিত।

Fixing Solution

Hyo — ৪০০ গ্রাম
Pot Metalisulphite — ২৫ গ্রাম
Water — ১০০০ গ্রাম

এবার আমরা আলোচনা করবো ফিলম সম্বন্ধে। সাধারণত একটা ধারণা, ফিলম হলো সেলুলয়েডের একটা রাসায়নিক ফিতে। যদিও খালি চোখে ফিলম'কে সাধারণ রাসায়নিক সেলুলয়েডের ফিতে মনে হয়, আসলে কিন্তু একটা ফিলমের মধ্যে থাকে বিভিন্ন রকম রাসায়নিক পদার্থ এবং পর পর কতকগুলি স্তর।

SUPER COAT	1
EMULSION	2
BASE	3
ANTI-HALATION LAYER	4

Super Coat হলো পাতলা, স্বচ্ছ ও শক্তিশালী একটা আচ্ছাদন। সহজে ফিলম্ ইমালশনের উপর যাতে আঁচড় না পড়ে এই জন্য এটা ইমালশনের উপর দেওয়া হয়।

সাধারণত ফিলম্ ইমালশন রূপে সিলভার হ্যালাইড ব্যবহার করা হয়। এই সিলভার হ্যালাইড হলো আসল আলোক স্পর্শকাতর পদার্থ। এটার উপরই ইমেজ সৃষ্টি হয়। এই ইমালশনকে জিলেটিন নামক এক প্রকার দামী আঠা জাতীয় পদার্থ দ্বারা ফিলম্ BASE-এর উপর স্থায়ী ভাবে ধরে রাখা হয়।

ফিলম্ বেস হলো শক্ত, পুরু, স্বচ্ছ সেলুলয়েডের ফিতে।

Anti-Halation Layer হলো এক প্রকার গাঢ় রঙের প্রলেপ। ফিলম্ বেসের নীচে এই প্রলেপ ব্যবহার করা হয়, যাতে ফিলমের উপর আলোক সম্পাত হলে ফিলমে কোন প্রকার আলো প্রতিফলিত না হয়। ফিলম্ জলে ধুলেই এই প্রলেপ উঠে যায়। একেক ধরনের ফিলমে একেক রঙের Anti-Halation Layer ব্যবহার করা হয়।

FINAL NEGATIVE

এবার স্থায়ী নেগেটিভটা 'নেগেটিভ এ্যালবামে' ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

ভালো নেগেটিভ পেতে হলে ছবি তোলার সময় কতগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হয়। এ বিবেচনার উপর নির্ভর করে আমরা কি ধরনের নেগেটিভ পাবো। ভালো নেগেটিভ পাবার জন্য প্রথমে আমাদের বিবেচনা করতে হবে আমরা কি ধরনের ফিলম্ ব্যবহার করবো। দ্বিতীয়ত

ফিলম্ ডেভেলাপিংয়ের সময়
কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে একটা ভালো নেগেটিভ তৈরী করা যায় তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া হলো
এক্সপোজড্ ফিলম্

১। ২ থেকে ৩ মিঃ ভালো করে পরিষ্কার জলে ফিলমটা প্রথমে ধুয়ে নিতে হবে।	রিংসিং Rinsing	১। এতে ফিলমের পশ্চাৎপটের রাসায়নিক দ্রব্য ধুয়ে যাবে এবং ফিলমটা ভিজে যাবার দরুন ভালোভাবে (ফিলমের সর্বাংশে) ডেভেলাপার কাজ করবে।
২। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ডেভেলাপারে ট্রিটমেন্ট করা।	ডেভেলাপিং Developing	২। ফিলমের অদৃশ্য প্রতিবিম্বকে দৃশ্য প্রতিবিম্বে রূপান্তরিত করে।
৩। ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড ফিলমটা স্টপ বাতে রাখা উচিত।	স্টপ বাত Stop Bath	৩। ডেভেলাপারে কাজ বন্ধ করে দেয়।
৪। গরমকালে ৩ থেকে ৫ মিঃ ফিলম্‌টা হ্যাডেনারে রাখা প্রয়োজন।	হার্ডেনিং Hardening	৪। হার্ডেনিংয়ের ফলে ফিলমের ইমালশান গলা বন্ধ হয়।
৫। ২ থেকে ৩ মিঃ পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে।	রিংসিং Rinsing	৫। রাসায়নিক দ্রব্যের অবশিষ্ট অংশ পরিষ্কার হয়ে ধুয়ে যায়।
৬। ৩ থেকে ৫ মিঃ ফিক্স করতে হবে।	ফিক্সিং Fixing	৬। ফিলম থেকে এক্সপোজ না হওয়া ইমালশান ধুয়ে পরিষ্কার করে স্থায়ী নেগেটিভ তৈরী করে।
৭। ২০ থেকে ৩০ মিঃ পরিষ্কার জলে ভালোভাবে ধুতে হবে।	ওয়াসিং Washing	৭। ইমালশান, হাইপো এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের অবশিষ্ট অংশ ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়।
৮। ২ মিঃ ৪% গ্যালিক অ্যাসিড সলিউশনে ধুয়ে নিতে হবে।	ক্লিনিং বাত Cleaning Bath	৮। ফিলমের উপর জলের সাদা চক্রাকার দাগ পরিষ্কার করে দেয়।
৯। ৩ থেকে ৪ মিঃ পরিষ্কার জলে ধুতে হবে।	সর্ট ওয়াস Short wash	৯। ক্লিনিং বাত এবং অন্য কোন অংশ ফিলমের গায়ে লেগে থাকলে ধুয়ে যাবে।
১০ কয়েক ফোঁটা ওয়েটিং এজেন্ট (জনসন-৩২৬) মেশানো জলে ১ মিঃ ধুয়ে নিতে হবে।	ওয়েটিং এজেন্ট Waiting Agent	১০। সহজেই ফিলমের গায়ের জল গড়িয়ে পড়ে যাবে এবং তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে ও ফিলম্‌টা কুচকাবে না।
১১। ছায়া, ঠাণ্ডা, ধুলোহীন পরিষ্কার জায়গায় ফিলম্‌টা ঝুলিয়ে দিতে হবে।	ডায়িং Daying	১১। ফিলমের ইমালশান থেকে জল গড়িয়ে পড়ে যাবে এবং ফিলম্‌টা সহজে শুকিয়ে যাবে।

ন্যূনতম সঠিক এক্সপোজার। তৃতীয়ত কি ধরনের ডেভেলাপার ব্যবহার করবো।

ফিলম্ স্পিড—ফিলম্ অর্থাৎ সেল্যুলয়েডের বেসের উপর যে ইমালশান থাকে সেগুলো অসংখ্য ক্রিস্টালের (গ্রেন বা দানার) সমষ্টি। তাই আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝতে পারি যে হাই-স্পিড ফিলমের ইমালশান দানা বা গ্রেনের আকার লো-স্পিড ফিলমের ইমালশানের দানা বা গ্রেন থেকে অনেক বড়। এখন আমাদের জানা প্রয়োজন আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে ইমালশানের এই দানা বা গ্রেন কি অসুবিধা করে। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিটি নেগেটিভ থেকে বিভিন্ন আকারের এনলার্জমেন্ট করা হয়। যদি নেগেটিভে গ্রেন বা দানার আকার বড় থাকে, তবে তা থেকে বড় এনলার্জমেন্ট করলে তা অস্পষ্ট, অমসৃণ হয় এবং দেখতে খারাপ লাগে। এই কারণে, আমরা এমন ফিলম্ ব্যবহার করবো যে, তা সর্বদিক দিয়েই (আলোকচিত্র শিল্পের পক্ষে উপযুক্ত) অর্থাৎ ১০০ বা ১২৫ ASA ফিলম্। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে আমরা কেন লো-স্পিড ফিলম্ ব্যবহার করবো না? লো-স্পিড ফিলম্ দিয়ে ছবি তুললে সঠিক এক্সপোজার রক্ষা করতে হলে বড় অ্যাপারচার ব্যবহার করতে হবে এবং এতে ছবি তার উজ্জ্বলতা এবং তীক্ষ্ণতা হারাবে ও বিশেষ ক্ষেত্রে Depth of Field এর অসুবিধা দেখা দেবে। এ জন্য খুব কম স্পিডের ফিলম্ ব্যবহার করা যায় না বা অসুবিধা দেখা দেয়।

ন্যূনতম সঠিক এক্সপোজার : যে এক্সপোজার দ্বারা বিষয় বস্তুর ছায়া অংশের (সর্বাধিক অংশের) বিস্তারিত বিবরণ সর্বাধিক পাওয়া যায় তাকে বলে ন্যূনতম সঠিক এক্সপোজার। যদি আমরা তিন ধরনের এক্সপোজড করা তিনটি নেগেটিভ পরীক্ষা করি তাহলে দেখবো যে, ওভার এক্সপোজড নেগেটিভের গ্রেনের আকার সবচেয়ে বড়, তারপর সঠিক এক্সপোজড নেগেটিভের গ্রেনের আকার এবং সব শেষে আন্ডার এক্সপোজড নেগেটিভ গ্রেনের আকার। তা হলে একমাত্র আন্ডার এক্সপোজড নেগেটিভ থেকে আমরা সর্বাধিক বড় এনলার্জমেন্ট পেতে পারি? কিন্তু আন্ডার এক্সপোজড নেগেটিভ থেকে যে এনলার্জমেন্ট পাওয়া যাবে তা ফ্যাকাশে হবে এবং ছায়া অংশের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে না। এই জন্য আমরা ছবি তোলার সময় ন্যূনতম সঠিক এক্সপোজার ব্যবহার করবো। যার দ্বারা আমরা সব সময় একটা আদর্শ নেগেটিভ পেতে পারি।

ডেভেলাপার—আমরা জানি ডেভেলাপার ফিলমের এক্সপোজড অংশকে মেটালিক সিলভারে রূপান্তরিত করে। মেটালিক সিলভার কতগুলো (ক্রিস্টাল) দানা বা গ্রেনের সমষ্টি রূপে ফিলম্ বেসের উপর স্থায়ী হয়। যদি আমরা একটা এক্সপোজড ফিলম্‌কে সাধারণ ডেভেলাপারে ডেভেলাপ করে নেগেটিভে রূপান্তরিত করি, তবে তা থেকে একটা নির্দিষ্ট আকারের পর যে এনলার্জমেন্ট কপি পাবো তাতে ছবি অস্পষ্ট এবং উজ্জ্বলতাহীন হবে। কেননা, সাধারণ ডেভেলাপার ইমালশানের দানা বা গ্রেনগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণ ফাইন করতে পারে না। এ ছাড়া একটা সাধারণ ডেভেলাপার নেগেটিভে প্রতিবিম্বের টোনাল গ্রেড পুরোপুরি বজায় রাখতে পারে না। এই জন্য আলোকচিত্র শিল্পের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশের প্রয়োজনে ফিলম্ সব সময় ফাইন গ্রেন ডেভেল্পারে ডেভেলাপ করা উচিত। ফাইন গ্রেন ডেভেলাপারের বিশেষত্ব হলো ফাইন গ্রেন ডেভেলাপার ফিলম্ ইমালশানের উপর ধীরে ধীরে ক্রিয়া করে গ্রেনকে খুব সূক্ষ্ম করে মেটালিক সিলভারে রূপান্তরিত করে। এর ফলে খুব বড় এনলার্জমেন্ট করলেও ছবি গ্রেনী হয় না এবং উজ্জ্বলতা ও তীক্ষ্ণতা হারায় না।

ফাইন গ্রেন ডেভেলাপারের একটি উপাদান মেটল ফিলম্ ইমালশানে খুব ধীরে ধীরে ক্রিয়া করে বলে নেগেটিভের মধ্যে টোনাল গ্রেডেশন বজায় থাকে এবং নেগেটিভ মাঝারি কনট্রাস্ট হয়।

সকল প্রকার পিকটোরিয়াল কাজের উপযোগী একটা ফাইন গ্রেন ডেভেলাপার হলো P.A.D./B.S.-4

মেটল—	৭ গ্রাম
সোডিয়াম সালফাইট	৭০ „
জল—	১০০০ সি.সি.

ডেভেলাপিংয়ের সময়—১০০ ASA ফিলম্ ২০°C (৬৮°F) তাপমাত্রায় ৭০৬° সেকেন্ড (ডেভেলাপার ও জলের মিশ্রণের অনুপাত ১ঃ২) Temperature Co-efficient: ১·৫৬ (1·56) P.A.D./B.S.-4 এর বিশেষত্ব হলো, এটা ছায়া অংশের সর্বাধিক বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারে। একটু লক্ষ্য করলে দেখবো এই ফাইন গ্রেন ডেভেলাপারে অন্যান্য ডেভেলাপারের তুলনায় মেটলের পরিমাণ একটু বেশী। পাহাড়, ভাস্কর্য, গাছের গুঁড়ি ইত্যাদি ছবির জন্য ফিলম P.A.D./B.S.-4 এ ডেভেলাপ করলে খুব ভালো ফল পাওয়া যাবে। ছবিতে টেকশ্চার এবং বর্ণক্রম পুরোপুরি বজায় থাকবে।

নেগেটিভের চরিত্র

আমরা জানি আলোকচিত্র তৈরী করার জন্য প্রথমে ক্যামেরার মধ্যে ফিলম্ ভরে সেটাকে এক্সপোজড করতে হয়। তারপর এক্সপোজড ফিলম্ ডেভেলাপমেন্ট করে সেটাকে নেগেটিভে রূপান্তরিত করা হয়। নেগেটিভ থেকে একটা সঠিক পজেটিভ প্রিন্ট পাবার জন্য সর্বপ্রথম অনুধাবন করা প্রয়োজন নেগেটিভের চরিত্র। নেগেটিভের চরিত্র সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে কখনোই নেগেটিভ থেকে সঠিক পজেটিভ প্রিন্ট পাওয়া

P.A.D./B.S.-4

ডেভেলাপিংয়ের সময়

ফিলম স্পিড—১০০ জল ও ডেভেলাপার—২ঃ১
ASA

তাপমাত্রা (ডিগ্রী ফারেনহাইট)	সময়/সেকেন্ড
৬৮	৭০৬
৭০	৬৭১
৭২	৬৩৮
৭৪	৬০৬
৭৬	৫৭৬
৭৮	৫৪৭
৮০	৫২১
৮২	৪৯৩
৮৪	৪৬৮
৮৬	৪৪৫
৮৮	৪২১
৯০	৪০০
৯২	৩৭৯
৯৪	৩৬১
৯৬	৩৪৪
৯৮	৩২৮
১০০	৩১১

সম্ভব নয়। কেননা, নেগেটিভের চরিত্র আমাদের বলে দেয় প্রিন্টের জন্য কি ধরনের নেগেটিভে কি ধরনের পেপার প্রয়োজন।

নেগেটিভের চরিত্র বলতে বোঝায় নেগেটিভের মধ্যে সাদা কালো অংশের পার্থক্য, নেগেটিভ পাতলা বা ঘন ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে বলা যায় ফিলমের উপর আলোকসম্পাত এবং ফিলম্ ডেভেলাপমেন্টের ফলে ফিলমের চরিত্রের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে তারই চেহারা। আমরা সকলেই জানি একমাত্র ন্যূনতম সঠিক এক্সপোজার এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ডেভেলাপমেন্ট আমাদের সঠিক বা তারম্যাল নেগেটিভ উপহার দেয়। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক এক্সপোজার এবং ডেভেলাপমেন্টের তারতম্যের জন্য নেগেটিভের চারিত্রিক পরিবর্তন হয়। নেগেটিভের সাদা কালো অংশের পার্থক্যকে বলে কনট্রাস্ট এবং নেগেটিভের সাদা অংশের ঘনত্ব থেকে কালো অংশের ঘনত্ব পর্যন্ত বর্ণের যে বিভিন্ন স্তর বিন্যাস বা পর্যায় থাকে তাকে বলা হয় বর্ণক্রম বা টোনাল গ্রেড।

নিম্নলিখিত তালিকায় আমরা জানতে পারব এক্সপোজার এবং ডেভেলাপমেন্টের তারতম্যের ফলে নেগেটিভের চারিত্রিক পরিবর্তন যে বিভিন্ন রূপ হয় তারই ফলাফল।

এক্সপোজার	ডেভেলাপমেন্ট কম	সঠিক	বেশী
কম	ডিটেলসহীন এবং খুব পাতলা	ছায়া অংশের ডিটেলস নেই এবং পাতলা	খুব কনট্রাস্ট
সঠিক	পাতলা কিন্তু ডিটেলস আছে	পরিপূর্ণ ডিটেলসসহ সামঞ্জস্যপূর্ণ কনট্রাস্ট	কিছু ডিটেলসহীন কনট্রাস্ট
বেশী	খুব ফ্ল্যাট	ঘন কিন্তু ফ্ল্যাট	কনট্রাস্টসহ ঘন

একটি বই ও চলচ্চিত্র-ভাবনার কিছু সূত্র

দেবাশীষ দত্ত

কিছুদিন হল একটা বই হাতে এসেছে, চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত বই। চলচ্চিত্র বলতে রূপোলী জগতের মায়াবী কাহিনীর সালংকার বর্ণন-চিত্র নয়, উপলব্ধির গভীরতায় উজ্জ্বল ও বিশ্লেষণের গরিমায় প্রখর একটি অনুসন্ধানী কেতাব। লেখিকা প্রখ্যাত চলচ্চিত্র-সমালোচক শ্রীমতী পলিন কায়েল। ভদ্রমহিলা বর্তমানে 'নিউ ইয়র্কার' পত্রিকার সংগে যুক্ত। আমাদের দেশের পরি-প্রেক্ষিতে 'চলচ্চিত্র সমালোচক' অভিধা কোন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে না। আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় চলচ্চিত্র-সমালোচনার নামে যে ধরনের যথেচ্ছাচার ও অজ্ঞতার মূঢ় শব্দমিছিল চোখে পড়ে, তার ভিত্তিতে যদি কেউ চলচ্চিত্র সমালো-চনার সংগে যুক্ত কারও সম্পর্কে সবিশেষ উচ্চ ধারণা পোষণ করে উঠতে না পারেন, তাহলে তাকে কোনও দোষ দেওয়া যায় না। এই বাংলায় অনেকগুলি দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক-ত্রৈমাসিক পত্রিকায় চলচ্চিত্রের জন্য আলাদা বিভাগ বরাদ্দ আছে, পরিসরও কিছু কম নয় তাদের। কিন্তু এই সমস্ত পত্রিকাগুলির বিভাগীয় আলোচনার সমবেত তারল্যের প্রস্রবণে এবং অশিক্ষিত পাণ্ডিত্যের অত্যাচারে এ প্রশ্ন স্বতই সোচ্চার হয়ে ওঠেঃ কবে সাবালক হয়ে উঠবে আমাদের চলচ্চিত্র সমালোচনার ধারা? নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণী সমীক্ষার কথা বাদই দিলাম, মাধ্যমগত বিষয়ে ন্যূনতম আন্তরিকতার চিহ্নও চোখে পড়ে না বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। আসলে এ কথাই বোধ হয় সঠিক, সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই চলচ্চিত্র-সমালোচনার ক্ষেত্রেও অনধিকারীদের দাপট বহুধা-বিস্তৃত, ব্যাপক। যারা অন্য কোথাও কিছু করে উঠতে পারলেন না, তারাই হয়ত বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীর ছত্রচ্ছায়ায় পালিত কোন সাময়িকীর চলচ্চিত্র-সমালোচক হয়ে গেলেন রাতারাতি এবং গণ্ডমূর্খামির নিরাবরণ প্রকাশে সচেতন পাঠকের মর্মযন্ত্রণার কারণ হলেন। এহেন চলচ্চিত্র-সমালোচকদের কলমে যে ধরনের সমালোচনার নিদর্শন চোখে পড়ে, তা থেকেই আমাদের দেশের চলচ্চিত্র-সমালোচনার চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বেশি দিন আগের ঘটনা নয়, চ্যাপলিনের 'কিড্' আবার কলকাতায় এসেছে, আগের আগের বারের মতই এবারও ছবিটির সংগে লরেল-হার্ডির স্বল্পদৈর্ঘ্যের কৌতুকী প্রদর্শিত হচ্ছে। কি আশ্চর্য, একটি চালু বাংলা দৈনিক পত্রিকার সাপ্তাহিক চলচ্চিত্র-পাতায় লেখা হল, চ্যাপলিন-নির্দেশিত ছবিটির মূল দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন লরেল এবং হার্ডি! গণ্ড-মূর্খামিরও তো একটা সীমা থাকা দরকার। একই পত্রিকাগোষ্ঠীর উদ্যোগে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিকে বেশ কয়েক বছর আগে লেখা হয়েছিল, 'ইনোসেন্ট সরসারার্স' ছবিতে বৈষ্ণব প্রেমকাব্যের আদল চোখে পড়ে, ছবি দেখতে দেখতে সমালোচকের কানে বেজে ওঠে, 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে'! আর একজন 'সমালোচক' একটি বিদেশী ছবিতে খুঁজে পান একটি ওড়িয়া ছবির কাহিনীর ছায়া! না, কোন satirical রূপকল্পনার প্রয়োগ নয়, খুবই গম্ভীর চালে এসব কথা লেখা হয়, তা-ও এবার স্বাক্ষরিত রচনায়। বাজার-চালু, রঙিন চিত্রজালে সমৃদ্ধ, স্টুডিও রিপোর্টের নামে অনাবিল কেচ্ছা-লাঞ্ছিত সিনেমা-পত্রিকাগুলির কথা আমি তুলছিই না। তারা তাদের স্বনির্মিত কল্পনার জগতে বন্দী হয়ে থাকুক, রৌপ্যমুদ্রার ঝনঝনানিতে মুখরিত হোক তাদের ভাণ্ডার, অনুগত পাঠকের বশ্যতায় তাদের শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত থাকুক, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ইদানিং আবার 'নতুন চিন্তার মোড়কে ভয়ংকরী চেহারা নিচ্ছে পত্র-পত্রিকাগুলির চলচ্চিত্র-দিগ্‌দর্শন, অসংখ্য ভ্রান্তির যোগফলে এবং অশিক্ষিত পাণ্ডিত্যের দ্যোতনায় উৎসাহী পাঠকরাও প্রতারণার শিকার হচ্ছেন, এটাই চিন্তার কথা। এত কথা লিখলাম শুধু এই কারণে যে, 'চলচ্চিত্র-সমালোচনা' ব্যাপারটা বিদেশে কি মূল্যে নিরূপিত হয়, সেটা ভালভাবে পাঠকের গোচরে আনার জন্য, গুণমূল্যের কতটা ফারাক এদেশে আর ওদেশে, সেটাও ভালভাবে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য।

বইটার নাম, Kiss Kiss Bang Bang' সতিনই চমকে দেওয়ার মত নাম। আসলে বইটার নামের পেছনেও একটি ইতিবৃত্ত আছে, লেখিকার জবানী তাই জানায় আমাদের। এই নামের একটা ছায়া-ছবির কথাও সম্ভবত অনেকের জানা, মূল ব্যাপারটা তার সংগেই জড়িত। বই-এর শুরুর আগে লেখিকা 'A note on the title' শিরোনামায় সেটা পরিষ্কার করেছেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে। মূল ইংরেজিই তুলে ধরছি, তীক্ষ্ণতম অনুবাদও যেহেতু নিষ্ফল হতে বাধ্য বোধগম্যতার দিক থেকেঃ The words "Kiss Kiss Bang Bang" which I saw on an Italian movie poster, are perhaps the briefest statement imaginable of the basic appeal of movies. This appeal is which attracts us, and ultimately what makes us despair when we begin to understand how seldom movies are more than this. সামান্য কতকগুলি কথার মধ্য দিয়ে লেখিকা সরাসরি পাঠকের বোধে সাড়া জাগান, চলচ্চিত্র-সমালোচনায় তাঁর যোগ্যতা এবং ক্ষমতা সম্পর্কেও আমরা শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠি পাশাপাশি। লেখিকার আগের বই 'I lost it at movies' বর্তমান লেখকের আগেই দেখার সুযোগ হয়েছিল, তারই পরবর্তী প্রকাশনা এই বইটি। বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনারই সংকলন এই বইটি, আগের বইটির মতই। আগের বইটিতে ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত কতকগুলি বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-কর্মের সমালোচনা এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ধারার বিশ্লেষণের ছবি ফুটে উঠেছিল। বর্তমান বইটিতে পরবর্তী পর্যায়ের চলচ্চিত্র-কর্মের মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন চলচ্চিত্র-আন্দোলনের পর্যালোচনা বিধৃত হয়েছে। মূল্যবান তথ্য এবং সরস অথচ বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় উজ্জ্বল আগের মত এই বইটিও। পাঁচটি মূল পরিচ্ছেদে বিভক্ত বইটিতে যেমন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ছবির 'রিভিউ' সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তেমনি চলচ্চিত্রের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অন্তরঙ্গ ও বিচারনিষ্ঠ আলোচনাও বাদ যায় নি, বাদ যায় নি সাড়া-জাগানো আন্দোলনের গোত্র-বিচার এবং টেলি-ভিশন ও ছায়াছবির সম্পর্কের মৌল প্রসঙ্গগুলিও।

বইটির প্রথম পরিচ্ছেদেই 'সৃষ্টিশীল ব্যবসা' শিরোনামায় লেখিকা চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের বৃহৎ কাণ্ডারীদের ভঙ্গীসর্বস্ব আচরণ এবং মূলগত অর্থান্বেষণী প্রবৃত্তির একটা সরস রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন। হাওয়ার সাথে তাল রেখে হলিউডের মুভি মোগলরাও যে 'ভিন্নধর্মী' হবার প্রাণান্তকর অভিনয়ে মেতে উঠেছেন, এটা আমরা টের পেয়ে যাই তাঁর লেখা থেকে। অথচ কতটা হাস্যকর বকমের অন্তঃসারশূন্য এই সমস্ত বৃহৎ চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীর প্রচেষ্টা, তা খুব ভালভাবেই তুলে ধরেন লেখিকা। কতকগুলি ঘটনা কৌতুকের ছোঁয়ায় যা অসামান্য উজ্জ্বল, তা অর্থকরী চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ের ধূর্ত ভণ্ডামিতে বেআব্রু করে দেয়, আমরা ভেবে ফেলতে পারি আমাদের দেশের চলচ্চিত্র-রাজধানী বোম্বাইয়েও হুবহু একই নাটকের অভিনয় হয়ে চলেছে প্রতিদিনই, যদিও আরও কদর্য এবং ক্লান্তিকর তার উপস্থাপনা এই প্রান্তে। ভাবা যায় না লেখিকার পর্যবেক্ষণী শক্তির অন্তর্নিহিত ক্ষমতা কতদূর বিস্তৃত এবং গভীর। যখন লেখিকা লেখেনঃ Being creative includes knowing how to exploit other people's ideas or earlier works you remember; being creative justifies ignorance and ruthlessness, indifference to and finally even contempt for art. Being creative is having something to sell, or knowing

how to sell something, or having sold something.

শ্রীমতী কায়েল আরও লেখেন, এইসব বৃহৎ চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীরা যত বেশি করে ডলারের মুখ দেখেন, ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত হয়, তত বেশি করে এরা সিস্টেমের দোহাই পাড়েন, খুব চিন্তাশীল ব্যক্তির নিখুঁত অভিনয় করে বলে বেড়ান, তারাও সিস্টেমের শিকার! এরা সর্বদাই চলচ্চিত্র-জাত লাভের সিংহভাগ আদায় করে নেন, স্বভাবতই শিল্পগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিংবা নতুনত্বের ধারে কাছে তারা ঘেঁষতে চান না, বিশেষতঃ তাদের ছবির বাজার যখন বিশ্বজোড়া, দেশে দেশে আহ্লাদে দর্শকরাই যখন এদের বড় ভরসা। সুতরাং ছবি জুড়ে দেখাও দ্রুতগত গাড়ির মিছিল, সুদৃশ্য অ্যাপার্টমেন্ট, রঙিন ভাবালু প্রণয় এবং আরও কত কি!

তরুণ মার্কিন চলচ্চিত্রকার সম্পর্কে শ্রীমতী কায়েলের মন্তব্যগুলি খুবই আন্তরিক। সহানুভূতি এবং সহমর্মিতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এদের সমস্যা ও প্রবণতাগুলি যাচাই করে এদের সম্পর্কে খুবই খোলাখুলি মূল্যায়ন করেন তিনি। সব দেশেই যা হয়ে থাকে, বিশেষ করে যে সব দেশে কমার্শিয়াল ছবির একচ্ছত্র রাজত্ব, তরুণ চলচ্চিত্রকাররা হলিউডী রীতি ও আদব-কায়দার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন, স্বতন্ত্র বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে কাজে লাগিয়ে এরা প্রথা-বিরোধী চলচ্চিত্র নির্মাণে উঠেপড়ে লেগে গেছেন।

কিন্তু প্রথাবিরোধিতার মূল ব্যাপারটিই মাধ্যম-গত বিষয়ে নৈরাজ্যও ডেকে এনেছে, এটা লেখিকার পর্যালোচনায় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে লেখিকার মন্তব্য 'সমান্তরাল সিনেমা'-র অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তোলে: The basic ideas among young American film-makers are simple; the big movies we grew up on are corrupt, obsolete or dead or are beyond our reach (we can't get a chance to make Hollywood films) —so we'll make films of our own, cheap films that we can make in our own way. পাশাপাশি এটাও উল্লেখ করতে ভোলেন না: For some this is an attempt to break into the "industry"; for others it is a different approach to movies, a view of movies not as a popular art or a mass medium but as an art form to be explored.

মাধ্যমগত বিষয়ে বিচ্যুতি ও অমনযোগই যে শুধু একটা চলচ্চিত্র-উদ্যোগকে ভিন্নধর্মিতায় চিহ্নিত করে দেয় কখনো-সখনো সেটাও কৌতুকের ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তোলেন তিনি: They and many in their audiences, may prefer the messiness—the uneven lighting, awkwared editing, flat camera work, the undramatic succession of scenes, unexplained actions and confusions about what, if anything, is going on—because it makes their movies seem so different from Hollywood films.

হলিউডের ছবির আঙ্গিক কারুকৃতি এবং আপাত-শোভন চেহারা সম্পর্কে একটা শ্রদ্ধার ভাব আমরা অল্পবিস্তর পোষণ করে থাকি, শ্রীমতী কায়েল সে illusion টাকে খুব ভালভাবেই আঘাত করেন। পুরোনো রীতির অনুবর্তন, প্রচলিত ধারার দাসত্ব, এবং অর্থহীন বাহ্যাড়ম্বরের বাইরে হলিউডের ছবি এখনো বেরিয়ে আসতে পারছে না, এর কারণ হিসেবে শ্রীমতী কায়েল দায়ী করেছেন সেই system বা ব্যবস্থাকে যা Executives বা কার্যনির্বাহী ব্যক্তিবর্গকে বৃহৎ ব্যবসার নিয়ামক শক্তির মত শুধু ব্যবসায়িক খাতিরেই অবশ্যমান্য করে রাখতে চায়। শুধু তাই নয়, শ্রীমতী কায়েল এ-ও লেখেন, যখন হলিউডের আলোকচিত্রগ্রাহক ও সম্পাদকরা নতুন কিছু করতে চান তাদের ছবিতে তখন তারা অনিবার্যভাবে জাপানী কিংবা ইয়োরোপীয় কলাকুশলীদের কাজ-কর্মের অন্ধ অনুকরণই করেন, যদিও উচ্চস্বরে তারা বলে বেড়ান, "দ্যাখো, হলিউডেও আমরা এ সমস্ত কাজ দেখাতে পারি।" তরুণতর চলচ্চিত্র-কারদের অবশ্য এদের সম্পর্কে মাথাব্যথা নেই। এই আপাত-নিস্পৃহতা থেকেই জন্ম নিয়েছে 'Movie Brutalists' এর দল। এরা চলচ্চিত্রের ব্যাকরণে বিশ্বাস করে না, গদার এদের গুরু। এদের কাছে সবচেয়ে সৃষ্টিমূলক ব্যাপার হল তাৎ-ক্ষণিক চিত্রগ্রহণের কাজটা, কোন বাঁধাধরা চিত্র-নাট্যের বাঁধন নয়, আগে থেকে তৈরি করা চলচ্চিত্রের সংলাপের অর্থহীন উচ্চারণ নয়. শ্রীমতী কায়েল যাকে বলেছেন automatic writing with camera, তা-ই এদের অন্বিষ্ট। এই প্রসঙ্গে অবশ্য শ্রীমতী কায়েল গদারের একক বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেন, শুধুমাত্র 'পরিচালক' এই লেবেলের অর্থহীন চাতুর্যের জাল ছিন্ন করে তিনি যে 'film maker' বা 'চলচ্চিত্রকারের' মহিমায় উন্নীত হয়েছেন, এটাও উল্লেখ করতে ভোলেন না তিনি। তিনি তরুণ সম্প্রদায়ের এত কাছাকাছি কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি মোক্ষম কথাটাই বলেন বেশ জোরের সঙ্গে: আসলে গদারের সমস্ত চরিত্রই শিকড়হীন অস্তিত্বের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে, এদের কোন ভবিষ্যত নেই, এরা career-এর পেছনে ঘোরে না, প্রাত্যহিক প্রতিটি ঘটনায় এরা সঙ্গে সঙ্গেই react করে, ভাবনাচিন্তার জন্য বেশি সময় খরচ করে না। এমন কি যখন 'আলফাভিল'-এ গদার ভবিষ্যতের ছবি আঁকার চেষ্টা করেন, তখনো সেটা হয়ে দাঁড়ায় বর্তমান প্যারিসেরই চলচ্ছবি, একেবারে ডকুমেন্টারির আদলে।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনার স্তরে শ্রীমতী কায়েলের কলমে ওথেলো চরিত্রে লরেন্স অলিভিয়ারের অভিনয়ের এবং শিল্পী-ব্যক্তিত্ব হিসেবে মার্লন ব্র্যানডোর মূল্যায়ন বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। অলিভিয়ারকে তিনি বলেছেন "most physical Othello imaginable" উনি এ-ও লেখেন, আসলে অভিনয়ের সপ্রাণ অস্তিত্বেই অলিভিয়ারের মহত্ব, তা না হলে পরিচালক হিসেবে তাঁকে শুধু "excellent and intelligent"ই বলা যায়, ছবি হিসেবে তো "ওথেলো" মূলত নাটকেরই চলচ্চিত্র-রূপ। ব্র্যানডোকে তিনি বলে "self-parodying comedian", যদিও শ্রীমতী কায়েলের লেখা জুড়ে তাঁর অভিনয়ের জোর ও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবের কথা সুনিপুণ ভাষায় বিধৃত হয়েছে।

শ্রীমতী কায়েলের বইটি আমাদের দেশের চলচ্চিত্রনির্মাতা-দর্শক-সমালোচকদের পথ দেখাক, এই আশা প্রকাশেই বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার টানছি।

অনিমেষ চলে গেছে

অনিমেষ আমার আবাল্য বন্ধু। কাজে, ভাবনায়, জ্ঞানে, এমন কি প্রেমেও ও আমার চেয়ে অনেক আগুয়ান। অনিমেষ জানে কেমন করে সামান্য কথায় বৃহৎ সম্ভাবনাকে প্রকাশ করতে হয়। তার চেয়ে বেশী জানে নীরবতা দিয়ে নিজেকে উন্মুক্ত করে দিতে। দুর্লভ যোগ্যতা। অনিমেষ সেই যোগ্যতার উপযুক্ত মানুষ।

দীর্ঘকাল ওর সাথে কথা বলেছি। তার অনেক বেশী ওর নীরবতা অনুভব করেছি গভীর ভাবে। আমার বহু লেখার উপাদান সংগ্রহ করেছি অনিমেষের কথা ও নীরবতা থেকেই।

অনিমেষকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে এখন আর কোন বাধা নেই।...

প্রথম সন্তান জন্মের অনেক পরে নমিতা চোখ মেলে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল, 'কি হয়েছে?'

পাশের বেবী-কটের প্রতি ইঙ্গিত করে অনিমেষ উত্তেজিত কণ্ঠে বলেছিল—'ছেলে। তুমি কেমন আছো?'

স্ত্রীর ঠোঁটের কোণে তৃপ্তির একটা রেখামাত্র যেন ফুটেছিল। আবার চোখ বন্ধ করেছিল। অনিমেষ স্ত্রীর হাতে চাপ দিয়ে উচ্চারণ করেছিল—

'এ পৃথিবীকে এ শিশুর বাসযোগ্য
করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'

শৈশবের বান্ধবী, বর্তমানে স্ত্রী এবং চির-কালের কমরেড নমিতা চোখ খুলে হাসে। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

নার্স এগিয়ে এসে বলে, আপনি এখন বাইরে যান। ওনার এখন ঘুমের প্রয়োজন।

অনিমেষ সারা রাত হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

মেয়ের জন্মের আগেই অনিমেষ বলেছিল, গ্রামে প্রাইভেট লেডী ডাক্তারের বড়ই অভাব। আমার মেয়ে হলে তাকে ডাক্তারী পড়াবো। দরিদ্র মানুষকে সেবা করার লোকের বড়ই অভাব।

কথাটা শুনে নমিতার চোখের হাসি ঠোঁটে-মুখে নেমে এলো। বলে, ছেলেকে ইনজিনিয়ার করবে বলে গোড়া থেকেই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াচ্ছ। পড়াও। এটা মধ্যবিত্তসুলভ মনোভাব। ছেলে-মেয়ের ক্যারিয়ারের কথা ভাবলে, মানুষ হবার কথা নয়! শোষক শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন সামিল হতে তুমি বক্তৃতা দাও তখন মনে রেখো, নিজের ছেলে-মেয়েকে ক্যারিয়ার তৈরীর জন্য আলাদা করে রাখতে পারবে না।...আমি মেয়েকে বাংলায় পড়াবো। রবীন্দ্রসংগীত শেখাবো। সে তার নিজের পছন্দ মত কাজ করবে।...

হাসপাতালের রোগ শয্যায় শুয়ে অনিমেষ হাড়ে হাড়ে টের পায় মধ্যবিত্তের ক্যারিয়ারিস্ট হবার বাস্তব চিত্রটা কি ভয়ংকর অবক্ষয়ী স্রোতে ভেসে চলেছে।...

নমিতা তার অকাট্য যুক্তি হাজির করেছিল উদাহরণ সমেত। স্যার নীলরতন, বিধান রায়, ললিত বাঁড়ুজ্জ্যে, জগদীশ চন্দ্র, সত্যেন বসু বা মেঘনাদ সাহা কি পৃথিবী-খ্যাত হতে পারেন নি? বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথের কথা না হয় বাদই দিলাম। যে কোন জাতির জীবনে অমন মানুষ হাজার বছরে মাত্র জনা কয়েক জন্মায়। এরা কি ইংলিশ মিডিয়ামের প্রোডাক্ট?

যুক্তিহারা অনিমেষ মাথা চুলকে শুধু বলতে পেরেছিল, ওই সব ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকরা কোন্ মিডিয়ামে লেখা-পড়া শুরু করেছিলেন, আমার সঠিক জানা নেই।...

বসু

...সে সব 'কবেকার অন্ধকার বিদিশার স্মৃতি...'।

হাসপাতালে জেনারেল ফ্রী-ওয়ার্ডের ময়লা বিছানায় শুয়ে, ডাক্তার-নার্স-মেথরদের অবহেলা আর অবজ্ঞা ভুলে থাকতে অনিমেষ ঠিক করেছিল ডায়রি লেখার মধ্যেই সে নিজের রোগ যন্ত্রণা ও পরিবেশকে ভুলে থাকবে। লিখতে গিয়ে দেখল স্মৃতি বড় ক্ষীণ। অনেক কথা লিখতে হবে। কত কাজ যা তার করা উচিত নয় কিন্তু করেছে, কত প্রতিজ্ঞা ছিল যা' সে পালন করে নি। মনের অগোচরে পাপ নেই। নিজেকে শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত ভাবতে পারলেও কোথায় যেন মধ্যবিত্তসুলভ দুর্বলতা তার যুক্তিবাদকে অচল করেছে কখনও কখনও।

ভাবনা বন্ধ করতে হল নার্স কমলার কর্কশ ডাকে—'খাবার খেয়ে আমাদের উদ্ধার করুন। আজ রেসিডেন্ট সার্জেনের স্পেশাল ভিজিট আছে'।

ডাক শুনে রোগ-জর্জর অনিমেষের মনে যেন দুষ্টু-সরস্বতী একটু চিরিক দিয়ে ওঠে।—ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, বেশ তো, তিনি এসে দেখুন কি খাবার, কেমন খাবার? খাওয়াটা সুখের মিষ্টি বা চোখের জলের নুন মেশানো!—কথাটুকু উচ্চারণেও সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।—আবারও নিজেকে শাসায়, 'অনিমেষ তুমি এখনও মধ্যবিত্ত রয়ে গেলে।'

কমলা ঝিঁক দেয়, ফ্রী-বেডে কি আর কোর্মা-পোলাও মেলে দাদু! ভিক্ষের চাল, কাঁড়া না আঁকাড়া!

পেছন ফিরে নার্স রাধাকে উদ্দেশ্য করে, এই বুড়োদের ছেলেমানুষী বায়না শুনলে গা জ্বলে যায়।

মন্তব্য শুনে অনিমেষের মন অন্তর্মুখী ডুব দিল।...নমিতা কত কাল আগে চলে গেছে... তিরিশ...প'য়ত্রিশ বছর...না...মনে পড়ছে না... হ্যাঁ, খবর এলো জেলে। কয়েক ঘণ্টার জন্যে 'প্যারোলে' আসতে পেরেছিল হাসপাতালে।... সামনের রাস্তায় কয়েক হাজার মানুষ মুহুর্মুহু শ্লোগান দিচ্ছে...লাল পতাকা আর ফুলের পাহাড় দিয়ে ঢেকে ওরা তুলে নিয়ে গেল নমিতাকে।...

এক বুক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অনিমেষ ভাবে, এক যাত্রায় পৃথক ফল! বিপ্লবী নেত্রীর সম্মান —কমরেড নমিতা, লাল সেলাম—নিয়ে চলে গেল। অনিমেষের জন্য রেখে গেল দুটি শিশুকে মানুষ করার দায়-দায়িত্ব-প্রাত্যহিকতা।

সাহায্য করার কেউ ছিল না ঘরে। নমিতার চাকরির টাকাটা শূন্য। গোদের ওপর বিষ ফোড়া, তার নিজের চাকরিটাও খোয়াল। ইউনিয়ন থেকে ট্রাইবুনাল, হাই কোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট ইত্যাদি বহু বছর চেষ্টা করেও তার চাকরিটা বাঁচাতে পারল না। সেই সময়ে সে মাঠে-কারখানায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় শ্রমিক শ্রেণীর কর্তব্য ইত্যাদি পাঠ-ক্রমের ক্লাস করে ঘুরতো। সতীর্থরা বলতো অনিমেষের কথায় আগুন ঝরে!

কিছুকাল স্কুলে মাষ্টারি করেছে! সেদিন ক্লাসে ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস পড়াচ্ছিল।—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারতে জমি-সংক্রান্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, কিছু জমিদার ও রাজা শ্রেণীর ভূস্বামী তৈরী করে। অন্যদিকে কিছু ভারতীয় সিবিলিয়ান অফিসার তৈরী করে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তোলে। যারা বৃটিশের স্বার্থে দেশের সম্পদ শোষণ করে তাদের প্রভুকে নিবেদন করতো। স্বাধীন ভারতও এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে নি। বৃটিশ পদলেহী সিবিলিয়ানদের মনে হয়ত একটু পরাধীনতার জ্বালা ছিল। তাদের কেউ কেউ সাধারণ মানুষের উপকার করার কথাও ভেবেছেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতের আমলাতন্ত্র বল্গাহীন স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই শেখে নি। এই তথাকথিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী হচ্ছে শোষক গোষ্ঠীর সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ও কার্য-করী হাতিয়ার, শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে...।'

হেডমাষ্টারের রিপোর্টে স্কুলের চাকরিটা

গেল। জীবিকার জন্যে অনিমেষ আরো নানা কাজ করেছে। ঘরে দুটি শিশুর দায়িত্ব, জীবিকার সংগ্রাম, পার্টি-ইউনিয়নের কাজ। প্রচণ্ড পরিশ্রম। নিজের শরীরের কথা ভাবতে সময় পায় নি।

মাঝে মাঝে অনিমেষ আশ্চর্য হত এই ভেবে যে, ওই ক্ষীণজীবী স্বাস্থ্য নিয়ে নমিতা কি করে এইসব কাজ সামলাতো! তার পরেও ছিল স্বামী ও সামাজিকতা। শেষের দুটির সঙ্গে অবশ্যই অনিমেষ'এর কোন সম্পর্ক ছিল না।

এ নিয়েও অনিমেষ ভাবতো। নিশ্চয় নারীর শরীর সৃষ্টিতে এমন কোন উন্নত মানের উপাদান আছে, যা পুরুষের নেই। একে শুধু সন্তান-ধারণের যোগ্যতা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মেয়েরা মানসিক দিক থেকেও পুরুষের চেয়ে পরিণত হয়। বিশেষ করে যে সব মেয়েদের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে রিসার্চ করা দরকার। নারী স্বাধীনতার কারণেই। এ কাজটা করা দরকার। কথাটা সে তার মেয়ে, ডাক্তার অণিমাকেও বলেছিল।...অণিমা চলে গেছে আমেরিকায়।... অনিমেষ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিল, তোকে ডাক্তারী পড়াতে আমার ভিটেটুকুও বেচতে হয়েছে। আশা করেছিলাম তুই গ্রামে গিয়ে দরিদ্র মানুষের সেবা করবি। যাক্, মনে রাখ শুধু, তোর বাবা মরে গেছে।...তারপর অণিমার চিঠি এলে অনিমেষ কখনও তা খুলেও দেখে নি।...সেও তো কত-দিন হল...।

ছেলের কথা মনে পড়লেই তার বুকের বাঁ-ধারে একটা তীব্র ব্যাথা সারাক্ষণ ডানা ঝাপটায়। ডাক্তার যাই বলুক, অনিমেষ জানে, এ ব্যথার কারণ 'প্রমিথিউস'। ছেলের ওই নামই সে দিয়েছিল। যদিও স্কুলের খাতায় নমিতা সেটার বদলে 'প্রমথেশ' করে দিয়েছিল।...'প্রমিথিউস'... স্বর্গের আগুন এনে মানুষের সামাজিক বিপ্লব-এর ভিত্তি গড়েছিল। তার ছেলেও দেশের নতুন ইতিহাসের পথিকৃত হবে...।

ছেলেটা দিনরাত ডুবে থাকতো বাবা-মায়ের সংগৃহীত বইএর মধ্যে।...নমিতা বেঁচে থাকলে, নিশ্চয় ঠাট্টা করতো, শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লব করবে আর তোমার ছেলেমেয়ে ক্যারিয়ার তৈরী করতে ইনজিনিয়ার-ডাক্তার হতে থাকবে'!... নমিতার ঠাট্টা, শুনতে অপ্রিয় হলেও, নির্মম সত্য।

কত কাগজে, ম্যাগাজিনে ছেলেটার লেখা ছাপা হত। আবেগ-দীপ্ত কণ্ঠে বলতো, বাবা, তোমাদের প্রতিজ্ঞা আমরা পুরণ করবো। কলেজে ঢুকেই ছেলেটা ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজ-নৈতিক সংগ্রামে। না, সে ইনজিনিয়ার হবার কথা ভাবে নি। সাহিত্য পড়তো। তার দৌলতে ওদের বাড়ীটাই হয়ে উঠল, স্থানীয় রাজনীতি, ইউনিয়ন, আর সাহিত্যের আড্ডা। বুক ফুলিয়ে বলতো, বাবা তুমি দেখো, ওই সব ভাড়াটে-দালাল লেখকদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেবো আমরা মালিক-গোষ্ঠীর কাম্য সমাজ-ব্যবস্থার জন্যেই ওরা সাহিত্যের নামে মালিকের ব্যবসার মুনাফা বাড়ায়।...সত্যি, ছেলেটার জন্যে, ওর গর্ব বোধ হত। এখনও গর্বিত।...তারপর—না... ভাববো না...প্রমিথিউস হারিয়ে গেল। কেউ কোন খবর এনে দিতে পারলো না। পুলিশ নিষ্ক্রিয় রইল।...ছেলেটা যেন রক্তকরবীর রঞ্জন ...না অনিমেষ ভাববে না...অনিমেষ যুক্তিবাদী। অনিমেষ জানে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব ছেলের হাতের মোয়া নয়...কিন্তু তবু প্রমিথিউস, আমার ছেলে—নমিতা নিশ্চয় বলতো, অনিমেষ তুমি এখনও মধ্যবিত্ত! কিন্তু সত্যি কি নিজের ছেলের সম্বন্ধে নমিতা এ' কথা বলতে বা ভাবতে পারতো?...অনিমেষ তো পারছে না...

ছেলেকে হারিয়ে সর্বস্নেহ দিয়ে সে মেয়েকে মানুষ করতে চেয়েছিলো...কে জানে নমিতার মেয়ে এখন হয়ত সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে লক্ষ কোটি মানুষ মারার কোন নতুন রাসায়নিক অস্ত্র বানাতে রিসার্চ করছে...না তার কোন মেয়ে নেই। কোনকালে ছিল না...না...

নমিতা শুনতে পাচ্ছো—আমি অনিমেষ বলছি। আমার প্রমিথিউসের কাজ আমি এগিয়ে নিয়ে যাবো...তুমি তো আমায় সেই রকমই দেখতে চেয়েছিলে! আজ তো আমি 'সর্বহারা' —সম্পত্তি, রোজগার, এমন কি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা হারা...প্রমিথিউস...আঃ...

নার্স ছুটে এলো। একাত্তর নম্বরের বুড়োটার গলার বিচ্ছিরি ঘরঘর আওয়াজ। ভাবলো, এই বেয়াক্কেলে বুড়োগুলো মরেও না, শুধু আমাদের জ্বালায়। বুড়োর আছে বলতে তো ওই কুলি-মজুর কয়েকটা বন্ধু, মাঝে মাঝে দেখতে আসে...

অনিমেষ তখন ভাবছিল, নমিতা বল, আমি কি হেরে গেছি?...হেরে গেছি...? নমিতা...

ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে একাত্তর নম্বরের কথা-গুলো বোঝার চেষ্টা করছিলেন। কথা শেষ। ডাক্তার কাঁধে শ্রাগ্ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। নার্সকে ইঙ্গিত করলেন। ফিরে যাবার সময় বলেন, একাত্তর নম্বরের কার্ডে কোন একটা পার্টী না ইউনিয়নের ঠিকানা আর ফোন নম্বর আছে। তাদের খবর দাও। আর বারান্দায় কোণে যে পেসেন্টটা আছে, তাকে একাত্তর নম্বরে ট্র্যান্সফার কর।

আপাদ-মস্তক লাল কম্বলে ঢাকা অনিমেষের কট্‌টা দু'জন ডোম ঠেলে নিয়ে চললো বারান্দার দিকে।...

অনিমেষ কি চলে গেছে! শ্রমিক শ্রেণীর সহ-যোদ্ধাদের ইতিহাসে অনিমেষ তুমি বেঁচে থাকবে। অনিমেষ!...তুমি কি শুনতে পাচ্ছো! ওই যে হাসপাতালের সামনের রাস্তায় হাজার হাজার শ্রমিক তোমার জয়ধ্বনি দিচ্ছে...লাল সেলাম। লাল সেলাম। অনিমেষ! ওরা তোমায় ভোলে নি। ওদের কাছ থেকে আরো হাজার-লক্ষ মানুষ তোমার কথা শুনবে।...অনিমেষ! আমি তোমায় ভুলবো না...। অনিমেষ...

স্বাধীনতা তোমার আমার

দেবেশ ঠাকুর

স্বাধীনতা—বাছা আমার—গালার পুতুল—
আমুল বেবি
বোত্রিশে যার পেট ফুলেছে ম্যালেরিয়ায়
সুস্থ সবল দুর্বা ঘাসে ছড়িয়ে গা এলোমেলো
বাঁচার জন্য বঞ্চনাকেই আগাম জানি।

আমি জানি ওরাও জানে এই পনেরোর স্বাধীনতা
শান্তিবাদী গোলা-গুলির বেলুন ফাটা তত্ত্বকথা
জানি বলেই প্রতিবছর কন্টে-সৃষ্টে চেপে ধরি
উদ্‌গত এই কাশির সংগে হৃদয়টাকে

জানি বলেই অলস হাতে প্রতিদিনই ওষুধ দিয়েও
চোখের লোনা পানি দিয়ে
ভিজিয়ে রাখি পচা ঘা'টা।

ইস্তেহার

সুভাষচন্দ্র পাল

নীলডি রোড ধরে
মনে ক্ষুধা নিয়ে অর্গলহীন
ঘরে মরেছি, মানুষের গহন অরণ্যে
ইজেলের প্রকীর্ণ অলিন্দ থেকে
ভেসে আসছে বসন্তের ডাক
এসো খেলা করি
হৃদয়ের গরীয়সী উদ্যানে......
এখানে অন্তর্নীল অসুখের পত্রপুটে
সজাগ অভাবিত স্বরাজ
লোকালয় ভুলে নিরপত্তার পিছু
নিয়েছে জীবন, রক্ত ও সংগ্রাম
সবই প্রতীকী প্রচ্ছদের মানুষ
নির্বাসিত পতাকার মত ওড়ে
সৌখিন যত ইস্তেহার।

প্রতিজ্ঞা

সুজয় চক্রবর্তী

যদুভবিষ্য ঘৃণিত স্বপ্ন হোক
চাইনা কুহেলী শান্তি, মায়াবী রম্য
সুমানবতার হয় যদি অন্তক
ধ্বস্ত, ধ্বান্ত, বিদারিত শুভ নম্য॥

প্রার্থনা করি গণদেবতার কাছে
হে কালপুরুষ শত অগ্নির দাহ্যে
হোক ক্ষীণ চেতনার মৃত্যু, যা আজ আছে
সমবেত হোক ছিন্ন শক্তি বাহ্যে॥

বিগতস্পৃহ দ্বীপ শিলাসর্বস্ব
দিক উত্তাল যবে জাগরণে ভাইরে
প্রতিহার্যের যক্ষায় যারা হ্রস্ব
তার দিকে ফিরে চাইবার ক্ষণ নাইরে॥

নই মোরা পুনর্বাসনে নিস্পৃহ শরণার্থী
প্রত্যয় আজি সঙ্ঘবন্ধ গোষ্ঠীজাত সাম্যে
ভেবোনা জন্মউদাসী আমরা কড়ি গুণে করি আর্তি
অধিকার জিনি জীবন-মূল্যে, পরিণত হই
"শাম্বে"॥

প্যালেস্টাইনের ঝড়

কল্যাণ দে

মানুষ মানুষের কাছ থেকে এখন হলুদ কার্ড দেখছে ক্রমশঃ
মাঠের মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে রক্তমাখা ঘাসে
আজ খেলার ছলে সৈন্য নামিয়ে দিচ্ছে মানুষ বিবেকের দোরে
গোলাকার পদার্থটি অপদার্থতার সিঁড়ি ধরে যেন নামছে তো নামছেই
অজস্র গ্যালন ঘাম শুকিয়ে জমছে ইতিহাসের প্যাপিরাসের পাতায়
এখন মানুষ ধীরে ধীরে নিজের দেয়ালে বন্দী হয়ে ফিঙের রঙ খুঁজে নিচ্ছে নিজস্ব সংসার জীবনে..
তবুও অন্বেষণ চলছে সৌহার্দ-প্রীতি-প্রেম-শুভেচ্ছার
এগিয়ে যেতে যেতে করোটি-কংকালের জঞ্জাল দু'পায়ে ঠেলতে ঠেলতে
হয়ত একদিন মানুষ মানুষের বুকে পেয়ে যাবে বাঞ্ছিত সবুজ ভূমি
সেদিনের প্রত্যাশায় প্রত্যহ কঠিন হৃদয়ের রুক্ষতায় লাঙল চালায় বাঙলার প্রেমিক কিষাণ
যার সংসারে ডিম পেড়েছে প্যালেস্টাইনের ঝড়...

সেন্‌সর

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

রাতের উচ্ছিষ্ট ক্ষুধা ভোরেই সুতীব্র
বিনিদ্র উলঙ্গের চোখ চলে বয়েসের সাথে
ঘরে ঘরে বাসির আশে ময়লার পাশে।
ভোরের ঠান্ডা বাতাস ঘুমে রাখে
পাইপের কোলের অবাঞ্ছিত শিশু।
গরু চরায় কিশোর হরিণঘাটার পথে,
কৃষকের যৌবন আনে সবুজ বিপ্লব।
চিনির বলদ পায় নি খামারের চাবি,
স্বর্গের দ্বারে লক-আউটের তালা।
স্নেহধন্য মহিষাসুরের দিবালোকে তান্ডব
রাজপথে মারা পড়ে পঞ্চ-পান্ডব।
কুঁড়িগুলি ঝরে পড়ে প্রচন্ড খরায়।
কাব্যের অচলতা কেটেছে সেন্‌সর শেষে,
সংস্কৃতির আনন্দ-লোক প্রভাতী-সন্দেশে।

'গণকণ্ঠের' দু'টি নাটক

চল্লিশের দশকে গণনাট্যের যে কুলপ্লাবী জোয়ারের উর্বর পলিমাটিতে জন্ম নিয়েছে হাজার হাজার গ্রুপ থিয়েটার, সমকালীন মানুষ ও ভাব ভাবনাকে সার্থক ভাবে তুলে ধরতেই এই সব গ্রুপ থিয়েটারের সার্বিক প্রকাশ। 'গণকণ্ঠ' এই সামগ্রিক আন্দোলনের এক বিশ্বস্ত সৈনিক। গত ২রা জুলাই, বিজন থিয়েটারে এরা মঞ্চস্থ করলেন দু'টি ভিন্ন স্বাদের একাংক নাটক 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' ও 'শরৎবাবুর জন্মদিনে'। নাট্যকার ও মাধ্যমে এ'রা একদিকে যেমন খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের ইতিহাস, তাদের জোটবদ্ধ প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধকে তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে তেমনি সুস্থ সংস্কৃতির এক সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক বিরাট আঘাত হেনেছেন। প্রতিটি শিল্পীই অত্যন্ত সংযমের সাথে নিজ নিজ চরিত্রগুলিকে মূর্ত ও প্রাণবন্ত করে তোলেন।
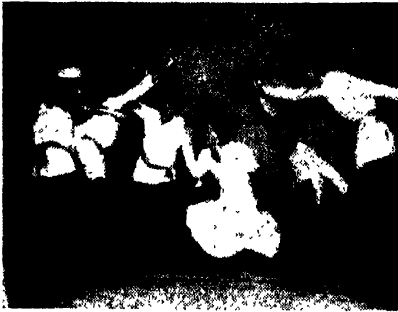
'গণকণ্ঠ' আয়োজিত "ক্রমশঃ প্রকাশ্য" নাটকের একটি বিশেষ মুহূর্ত

বিজয় বসু, বলাই পাল, সঞ্জয় বসু, প্রদীপ রায় ও সঞ্জয় শ্যামের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও সঞ্জয় ভট্টাচার্য, তারক মুখার্জী, উজ্জ্বল চ্যাটার্জী, দেবাশীষ দাশগুপ্ত, অপূর্ব নন্দী, তাপস দাস, বিপ্লব ভট্টাচার্য ও ঝর্না সরকারও অভিনয়গুণে সামগ্রিক ভাবে নাটকের টীম স্পিরিটকে এক কাঙ্খিত জায়গায় এনে নাটকের প্রয়োজনকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে পেরেছেন। আবহসংগীত বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে মানানসই ছিল না। আলোর ব্যবহার যথাযথ হলেও মঞ্চসজ্জা ও রূপসজ্জার দিকে আর একটু নজর দেওয়া উচিত ছিল। তাপস রায় ও শুভেন্দু কুণ্ডু শব্দ-প্রক্ষেপণের দায়িত্বে ছিলেন এবং সচেতন ছিলেন।

এই নাটক দু'টি কোলকাতা তথা গ্রাম শহরের দর্শকের কাছে মনোগ্রাহী প্রযোজনা হয়ে উঠবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

অঞ্জন লাহিড়ী

রঙ্গভূমির 'বিছন'

নাটকে সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন বাংলা নাট্যধারার উষালগ্ন থেকেই ঘটে আসছে। চল্লিশের দশকে গণনাট্যের জন্মকাল থেকে বাস্তবধর্মী, জনবাদী, সমাজ সচেতন ও সমাজ-বদলাকাঙ্ক্ষী বিষয় ভাবনা ও ধ্যানধারণা নিয়ে দেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সেই থোড়-বড়ি খাড়ার গতানুগতিকতার পাশাপাশি সংগ্রাম নির্ভর নাট্য প্রযোজনা হয়ে চলেছে আজও। এমন সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গণনাট্যের সাথে এক পংক্তিতেই হেঁটে চলেছে একাধিক গ্রুপ থিয়েটার সংগঠন। এমন এক সংগ্রামনিষ্ঠ গ্রুপ থিয়েটারের নাম রঙ্গভূমি। সংগঠনের পঞ্চবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তারা ১৬ই আগস্ট শিশিরমঞ্চে মহাশ্বেতা দেবীর গল্প অবলম্বন 'বিছন' নাটক মঞ্চস্থ করে দর্শকমণ্ডলীর অভিনিবেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন।

বিহারের এক সুদূরতম আদিবাসী মানুষ-জন অধ্যুষিত অঞ্চল। সমাজের বিভিন্ন অন্তজ-শ্রেণীর মানুষ পরস্পর পরস্পরের ভালোবাসার নির্ভরে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে আকণ্ঠ নিমগ্ন। মালিকের জমিতে রক্ত ঢেলে ফসল তৈরী করেও তারা সম্বছরই উপোসে কাটায়। এমন ছিন্নমূল নামগোত্রহীন একদল মানুষ আর সেই গ্রামেই ডাকসাইটে জমিদার লছমন সিং তার পাইক-বরকন্দাজ, পোষা থানা-পুলিশ, বি.ডি.ও, মস্তান-জনপ্রতিনিধি সব মিলেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর একটা দিক। আচার্য বিনোবাভাবের ভূদান আদর্শের আহ্বানে ভূমি-হীনদের মধ্যে জমিদান করে পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনা অদম্য হয়ে উঠলো জমিদার লছমন সিংহের। তার অগাধ ভূসম্পত্তির মধ্যে একেবারে করার জন্য গ্রামের প্রাচীন ক্ষেতমজুর দুলন অকেজো নিষ্ফলা পাথুরে একটুকরো জমিদান গঞ্জুকে ঠিক করা হোল। নিষ্ফলা হলেও জমির স্বপ্নে ডুবে গেলো দুলন। মালিকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় দুলন একেবারে বিহ্বল যদিও সেও জানতো যে ঐ জমিতে বুনো এলা গাছের জঙ্গল ছাড়া কোন ফসলই ফলে না। অন্ন-সম্পর্কহীন জীবনগন্ধহীন এক টুকরো জমি তবু তো জমিই। ন্যায্য মজুরির আন্দোলন ক্রমশই দানা বাধতে থাকলো গ্রামে-গঞ্জের প্রত্যন্তে। জমিদার-থানা-পুলিশগুণ্ডাশারীর হিসেব গরমিল হয়ে যায় মানুষকে সংবদ্ধ হতে দেখে। দিশেহারা জোতদার-পুলিশ ও প্রতি-ষ্ঠানিক মহলের যোগসাজশে মজুরি আন্দো-লনের নেতাদের জোড়ায় জোড়ায় হত্যা করে রাতের অন্ধকারে পুঁতে দেওয়া হতো দুলন গঞ্জুর মালিকের দয়ার দান সেই নিষ্ফলা জমিতে। যার একমাত্র সাক্ষী দুলন।

মাটির নিচে শুয়ে থাকা করুণা-আশাবাদী নিজের ছেলে ধাতুয়াদের লাশ পাহারা দেয় দুলন। মালিকের কাছে দেওয়া প্রতিজ্ঞা ভেঙে দুলনই একদিন ঐ জমিতে চাষা-আবাদ শুরু করলো, বিছন বুনলো দুলন। নব যুগের ও নতুন সত্যের বার্তাবহ নতুন মানুষের রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জার পুরুষ্ট বীজের বিছন পেয়ে পেয়ে

[শেষাংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়]

রঙ্গভূমির 'বিছন' নাটকের একটি বিশেষ মুহূর্ত

'বাহবা সময় তোর সার্কাসের খেলা......'

শিল্পীঃ সুশান্ত চক্রবর্তী

পেট্রোলিয়াম

আজকের সমাজ-সভ্যতায় খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম-এর ভূমিকার স্বপক্ষে যুক্তিতর্ক বিস্তারের অবকাশ নেই। বটতলার আটচালা থেকে শুরু করে আধুনিকতম পরিবহন ব্যবস্থা সর্বত্রই এর সমান গতিবিধি। মোটর গাড়ী যাবার পাকা রাস্তার পীচ্ আর মোটর গাড়ী চলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী পেট্রল দুই-ই নিষ্কাষিত হয় পেট্রোলিয়াম থেকে। গাঁ-ঘরে রাতের সাথী কেরোসিন আর চাষের রাসায়নিক সার সবই পাওয়া যায় পেট্রোলিয়াম থেকে। পরিধানের টেরিলিন, পলিয়েস্টার, ক্যাশমিলন আর প্রসাধনের সামগ্রীর আকর বস্তু কিন্তু সেই-ই পেট্রোলিয়াম। পেট্রোলিয়ামের এ হেন বহুবিধ ব্যবহার সত্ত্বেও, এর মূল উপযোগিতা কিন্তু জ্বালানী বা শক্তির উৎস হিসাবে। পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রীর ব্যবহারের প্রধান ক্ষেত্র হল বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক শক্তি আহরণ।

ল্যাটিন শব্দ পেট্রোলিয়ামকে বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় পেট্রো ও অলিয়াম। পেট্রো অর্থাৎ পাথর আর অলিয়াম এর বাংলা অর্থ তেল। দুয়ে মিলে দাঁড়ায়, পাথরের তেল অর্থাৎ পাথরের মধ্যে সঞ্চিত তেল। পেট্রোলিয়ামের জন্মবৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে এর নামকরণ কত সার্থক।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর স্থলভাগের অনেকাংশেই গরম সমুদ্র জলের নীচে ছিল,—এ ধারণা আজ সর্বজন স্বীকৃত। সে সময় বড় বড় গাছ-গাছড়ার অভাব ছিল না। প্রচুর সামুদ্রিক প্রাণীও বিচরণ করত সাগরে। টার্শিয়ারি যুগে—অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচ-ছয় কোটি বছর আগে সমুদ্রের তলদেশে সৃষ্টি হল পাললিক শিলা। মাটি ও বালি জমেই স্তরে স্তরে সৃষ্টি হল পাললিক শিলা। একটা স্তরের উপর আরেকটা স্তর তৈরী হবার আগে তার উপর যে সব প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ দেহাবশেষ এসে পড়ল খুব স্বাভাবিক-ভাবেই তা পরবর্তী স্তরের আবরণে আবৃত হল। এইভাবে বিভিন্ন সময়ে পাললিক শিলা তৈরীর সময় পাললিক শিলার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ দেহাবশেষ সঞ্চিত থেকে গেল। তারপর প্রকৃতিতে আবার শুরু হল ভাঙ্গাগড়ার খেলা, বহু স্থলভূমি চলে গেল সাগরের তলায়। সমুদ্র তলদেশ থেকে উদ্ভূত হল নতুন স্থলভাগ। এদিকে পাললিক শিলার মধ্যবর্তী স্তরগুলিতে আটকে পড়া প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ দেহাবশেষে বিক্রিয়া বন্ধ হল না। প্রাণীজ উদ্ভিজ্জ দেহাবশেষ মূলত জৈব পদার্থ। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ দেহাবশেষে বিবর্তন ঘটল। জৈব পদার্থগুলির বিবর্তনে সৃষ্টি হল হাইড্রোজেন ও কার্বন ঘটিত যৌগিক পদার্থ,—হাইড্রোকার্বন। পরবর্তীকালে এই হাইড্রো-কার্বন পরিণত হয় পেট্রোলিয়ামে। প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ দেহাবশেষের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন অপসারণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে ব্যাক্টেরিয়া। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনমুক্ত দেহাবশেষ ক্রমাগত চাপ ও তাপের প্রভাবে পেট্রোলিয়ামে পরিণত হয়েছে। ভূগর্ভস্থ তাপ ও উপরের পাললিক শিলা এবং ক্ষেত্রবিশেষে সমুদ্রের জল প্রয়োজনীয় চাপ যোগান দিয়েছে। পেট্রোলিয়াম-এর উৎপত্তি সংক্রান্ত ধারণা নিয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য থাকলেও অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই এই ধারণাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ভূগর্ভে দুটি অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের মধ্যবর্তী সছিদ্র শিলাস্তর হল পেট্রোলিয়াম-এর প্রকৃতিতে অবস্থানের আদর্শ জায়গা। সছিদ্র শিলাস্তরে পেট্রোলিয়াম সঞ্চিত থাকে আর তার নীচে অপ্রবেশ্য শিলাস্তর থাকার জন্য পেট্রোলিয়াম সুরক্ষিত থাকে। অপ্রবেশ্য শিলাস্তর বা সছিদ্র শিলাস্তর শব্দগুলি নতুন শোনালেও এদের প্রাথমিক ধর্মগুলি কিন্তু শব্দগুলির মধ্যে পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট। আর এ ধারণা তো আমাদের সবার আছে,—তরল পদার্থ শক্ত আবরণে আবদ্ধ না থাকলে তরলের সংরক্ষণ সম্ভব নয়। অপ্রবেশ্য শিলাস্তর দিয়ে ঢাকা থাকার ফলে পেট্রোলিয়াম সছিদ্র শিলাস্তরে মজুত থাকে। অন্যথায় পেট্রোলিয়াম ভূগর্ভে কোথায় গিয়ে পৌঁছাত তা চিন্তা করাও কষ্টকর।

ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক গঠন প্রণালীর ফলে কিছু কিছু জায়গা সৃষ্টি হয় যে সব জায়গায় পেট্রোলিয়াম জমা হলে আর বেরোতে পারে না। প্রাকৃতিক স্তর বিন্যাসের ফলশ্রুতি এ ধরনের জায়গায় পেট্রোলিয়াম একবার সঞ্চিত হলে সেখানেই সুরক্ষিত থাকে। এগুলিকে পরিভাষায় বলে তেলের খাঁচা বা অয়েল ট্র্যাপ। যে নির্দিষ্ট শিলাস্তরে পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হয় সেই শিলাস্তর থেকে কৈশিক চাপ (Capillary pressure), পেট্রোলিয়ামের প্লাবতা (buoyancy), মাধ্যাকর্ষণ ইত্যপ্রকার কারণে অনেক সময় পেট্রোলিয়ামের স্থান পরিবর্তন ঘটে। অয়েল ট্র্যাপে এইভাবেই পেট্রোলিয়াম এসে পৌঁছায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে আবার উৎপত্তিস্থলই অয়েল ট্র্যাপ হিসাবে কাজ করে। উৎপত্তিগত কারণেই পেট্রোলিয়াম শুধুমাত্র স্থলভাগের নীচে পৃথিবীর অভ্যন্তরেই নয় সমুদ্রের নীচে পৃথিবীর অভ্যন্তরেও থাকে। এবার দেখা যাক ভূগর্ভস্থ পেট্রোলিয়াম কিভাবে আহরিত হয়।

পেট্রোলিয়াম আহরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জটিল কাজ পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের উন্নয়নের ফলে ভূগর্ভে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানের কাজটি সহজ হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখনও এমন কোন প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয় নি যার সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট জায়গার ভূগর্ভস্থ পেট্রোলিয়ামের অবস্থান ও তার পরিমাণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানের প্রচলিত পদ্ধতি হল,—

প্রথমে সমুদ্রজাত পাললিক শিলা অন্বেষণ। উৎপত্তিগত কারণেই পেট্রোলিয়াম সমুদ্রজাত পাললিক শিলাস্তরের অভ্যন্তরে অবস্থিত অয়েল ট্র্যাপে থাকে। সমুদ্রজাত পাললিক শিলার খোঁজ পাওয়ার পর ঐ এলাকার এক বিস্তারিত মানচিত্র তৈরী করা হয়। এবার ঐ মানচিত্র ধরে ঐ এলাকার মাটি, শিলাস্তর প্রভৃতির গঠন বৈচিত্র্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সমীক্ষা চলে, ঐ অঞ্চলের শিলার গঠন বিন্যাস অনুধাবন করতে হয়। আকাশ থেকে তোলা ফোটো বা এরিয়েল ফোটোগ্রাফ পদ্ধতিতে শিলার গঠন বিন্যাস সম্পর্কে সহজ ধারণা করা যায়। পাশাপাশি চলে ঐ এলাকার ভূগর্ভের গঠন বিন্যাস নিয়ে তথ্য সংগ্রহ।

গ্র্যাভিমিটার, ম্যাগনেটোমিটার আর সিস্মোগ্রাফ এই তিনটি যন্ত্র হল ভূগর্ভের গঠন বিন্যাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রধান উপকরণ। গ্র্যাভিমিটার দিয়ে মাধ্যাকর্ষণ পরিমাপ করা হয়, ম্যাগনেটোমিটার ব্যবহৃত হয় চৌম্বকশক্তি নির্ণয়ের জন্য আর সিস্মোগ্রাফ হল ভূকম্পন পরিমাপক যন্ত্র। পাললিক শিলা, আগ্নেয় শিলা বা রূপান্তরিত শিলার চেয়ে অনেক হাল্কা। অতএব পাললিক শিলার মাধ্যাকর্ষণ ও চৌম্বক শক্তি অনেক কম। ভূগর্ভে ডিনামাইট বিস্ফোরিত হলে কম্পন সৃষ্টি হয়। ভূকম্পনের ফলে সৃষ্ট কম্পনতরঙ্গ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু যে মুহূর্তে এই কম্পনতরঙ্গ প্রতিহত হয় তক্ষণি তা ফিরে আসে। প্রতিহত কম্পনতরঙ্গের তীব্রতা সিস্মোগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়ে। বিষয়টি অত্যন্ত সহজ। ভূগর্ভে কঠিন স্তর থাকলে কম্পনতরঙ্গ দ্রুত ফিরে আসবে এবং তার তীব্রতা বেশী হবে। কিন্তু ভূগর্ভে পাললিক শিলা থাকলে কম্পনতরঙ্গ প্রতিহত হবার বদলে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ বেশী পায়। এইভাবে বিভিন্ন উপায়ে বারংবার পরীক্ষা করে কোন জায়গায় ভূগর্ভস্থ পাললিক শিলাস্তর সম্বন্ধে একটা অনুমান করা যায় মাত্র। এর পর তেল উত্তোলন তারপর নিষ্কাশন।

ভূগর্ভস্থ জল সংগ্রহের জন্য কূপ বা কুয়ো খুঁড়তে হয়। এ তথ্য মানুষ অনেকদিন আগে থেকেই জানে। পরবর্তীকালে এ ধরনের কুয়োর উন্নয়ন ঘটেছে। কম পরিশ্রম করে বেশী জল সংগ্রহের বিভিন্ন ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। চালু হয়েছে নলকূপ বা টিউব ওয়েল। পেট্রোলিয়ামও তরল পদার্থ। পেট্রোলিয়ামও ভূগর্ভেই থাকে। অতএব পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের জন্য কূপ খনন

একান্ত প্রয়োজনীয়। আর পেট্রোলিয়াম যেহেতু ভূগর্ভে অনেক নীচে থাকে অতএব নলকূপের পদ্ধতি ছাড়া অন্য উপায়ের কথা চিন্তা করাও দুষ্কর। সাধারণতঃ মাটির নীচে ৩ হাজার থেকে ৬ হাজার ৫০০ মিটার অর্থাৎ তিন থেকে সাড়ে ছয় কিলোমিটার নীচে অয়েল ট্র্যাপ বা পেট্রোলিয়ামের প্রাকৃতিক সংরক্ষণাগার থাকে। এত সুগভীর কূপ খননের জন্য লাগে ড্রিলিং রিগ। এই যন্ত্রটি মাটি খুঁড়বার কাজে ব্যবহৃত হয়। শুধুমাত্র মাটিই নয় পাথর কাটতেও এই যন্ত্রটি সক্ষম। ৩ কিলোমিটার গভীর কূপ খননের জন্য ২০০ টনের ড্রিলিং রিগ লাগে; ১৫ হাজার থেকে ১৭ হাজার ফুট ড্রিল পাইপ এই গভীরতার কূপ খননে প্রয়োজন। এই জাতীয় কূপ খননে আরও লাগে ১৪ হাজার থেকে ১৬ হাজার ফুট কেসিং পাইপ, ৬০ থেকে ১০০টি ড্রিলিং বিট, ৫০০ থেকে ১ হাজার টন ড্রিলিং মাড্ কেমিক্যাল (বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ), ২ হাজার থেকে ৫ হাজার বস্তা সিমেন্ট, ৪৮ হাজার ব্যারেল জল এবং ৩ হাজার ব্যারেল জ্বালানী তেল। যেখানে পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের জন্য কূপ খনন করা হবে বলে ঠিক করা হয় সেখানে একটি সুউচ্চ ইস্পাতের স্তম্ভ বসান হয়। এই স্তম্ভের নাম ডেরিক। ডেরিক থেকে ড্রিলিং পাইপ ঝুলিয়ে দিয়ে তাকে আস্তে আস্তে হাতে কাটা একটি অগভীর গর্তে প্রবেশ করান হয়। ড্রিলিং পাইপের সামনে বসান থাকে ড্রিলিং বিট। এইবার মোটরের সাহায্যে ড্রিলিং বিটসহ ড্রিলিং পাইপ মাটির নীচে ঘুরতে ঘুরতে মাটি কাটতে কাটতে নীচে প্রবেশ করে। একটি ড্রিলিং পাইপ সম্পূর্ণভাবে ভূগর্ভে প্রবেশ করলে আর একটি পাইপ জুড়ে দেওয়া হয় এবং এইভাবে পর পর ড্রিলিং পাইপ আস্তে আস্তে ভূগর্ভে প্রবেশ করান হয়। ড্রিলিং পাইপকে ঘিরে একটি কেসিং পাইপও ভূগর্ভে প্রবেশ করান হয়। ভূগর্ভে ড্রিলিং বিট যত গভীরে এগোতে থাকে ততই তার ধার কমতে থাকে। ধার কমে গেলে ড্রিলিং বিট বদলিয়ে দেওয়া হয়। ড্রিলিং বিট বদলানো কিঞ্চিৎ শ্রমসাধ্য। কারণ পুরো ড্রিলিং পাইপ তুলে না আনলে ড্রিলিং বিট বদলানো যায় না। একবার পুরো ড্রিলিং পাইপ তুলে এনে নতুন ড্রিলিং বিট বসিয়ে আবার তা ভূগর্ভে পাঠানো সময় সাপেক্ষও বটে। তবে ড্রিলিং বিট মাঝে মাঝেই পরিবর্তন করতে হয়। যে কারণে ভূগর্ভে তিন হাজার মিটার যেতে ৬০ থেকে ১০০টি ড্রিলিং বিট প্রয়োজন হয়। ড্রিলিং চলবার সময় আরেকটি বিশেষ কাজ অবশ্যই সম্পন্ন করা হয়, তা হল ড্রিলিং পাইপের মধ্য দিয়ে ড্রিলিং মাড্ কেমিক্যাল ভূগর্ভে প্রবেশ করান হয়। ড্রিলিং মাড্ নামক এই রাসায়নিক পদার্থটি ভূগর্ভে প্রবেশ করানোর উদ্দেশ্য ত্রিমুখী। প্রথমতঃ ড্রিলিং মাড্-এর সাহায্যে নীচের পাথরের নমুনা সংগ্রহ সহজ; দ্বিতীয়তঃ এই পদার্থটি বিট-এর পাশ দিয়ে গিয়ে বিট নতুন পাথর কাটার পূর্বমুহূর্তেই পাথরের উপর একটা প্রলেপ হিসেবে ছড়িয়ে যায়; এতে ড্রিলিং বিট পাথর কাটবার সময় চার পাশের পাথর ধ্বসে পড়তে পারে না; তৃতীয়তঃ এর প্রভাবে ড্রিলিং বিট ঠান্ডা থাকে। কারণ ড্রিলিং বিট পাথর কাটবার সময় প্রচন্ড গরম হয়ে যায়।

ড্রিলিং-এর কাজ অর্থাৎ খনন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে পেট্রোলিয়াম-এর স্তরে পৌঁছান মাত্র একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ভূগর্ভে পেট্রোলিয়াম যেখানে থাকে সেখানে পেট্রোলিয়ামের উপরে থাকে প্রাকৃতিক গ্যাস, এই গ্যাস প্রচন্ড চাপে থাকে। তাই হঠাৎ করে বহির্গমনের পথ পাওয়া মাত্রই সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে পড়তে চায়, সেই পথ হল ড্রিলিং পাইপ। ড্রিলিং মাড্-এর প্রয়োজনীয়তা এই সময় আর একবার অনুভূত হয়। ড্রিলিং মাড্ গ্যাসের যাত্রাপথ বন্ধ করে। ফলে প্রচুর গ্যাস অপচয় বন্ধ হয়।

এইবার শেষ পদক্ষেপ। ড্রিলিং পাইপ তুলে ফেলে সেখানে বসানো হয় লম্বা-সরু নল। এই পাইপটিতে অনেক ভাল্‌ভ থাকায় পাইপটি সুনিয়ন্ত্রিত হয়। এই পাইপটির নাম ক্রিসমাস ট্রি। ক্রিসমাস ট্রি প্রকৃতপক্ষে পেট্রোলিয়াম কূপ থেকে পেট্রোলিয়াম উত্তোলক যন্ত্র। প্রথম পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোলিয়াম স্তরে থাকায় গ্যাসের চাপেই পেট্রোলিয়াম উপরে উঠে আসে। কিন্তু গ্যাস নিঃশেষিত হলে একটু সমস্যা সৃষ্টি হয়। তখন হয় পাম্পের সাহায্যে না হয় বাইরে থেকে গ্যাস ভূগর্ভে পাঠিয়ে চাপ সৃষ্টি করে পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়।

ভূগর্ভ থেকে সংগৃহীত পেট্রোলিয়াম সম্পূর্ণ অপরিশোধিত। এই অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম বা ক্রুড অয়েল জলের চেয়ে হাল্কা। ক্রুড অয়েলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ০·৭৬ থেকে ০·৯৮। ক্রুড অয়েল হাল্কা সবুজ, হলুদ, গাঢ় বাদামী, কালো বিভিন্ন রং-এর হয়। ক্রুড অয়েল, অর্থাৎ অন্ধকারেও চকচক করে। ক্রুড অয়েল শুধুমাত্র কার্বন এবং হাইড্রোজেনের যৌগিক পদার্থ নয়, এর সঙ্গে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, নিকেল প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এইসব পদার্থ অপসারণ করা হয়। আংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় ক্রুড অয়েল পরিশোধনের সময় বিভিন্ন ধাপে পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল প্রভৃতি পাওয়া যায়। পরিশোধনের সময় তলানি হিসাবে সাধারণতঃ প্যারাফিন ও ন্যাপথা জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। তলানির উপর ভিত্তি করে পেট্রোলিয়ামের শ্রেণী বিভাগ হয়। প্যারাফিন জাতীয় পেট্রোলিয়াম বেশী সুবিধাজনক। কারণ পরিশোধন সহজ এবং উপজাত সামগ্রী তৈরীর সুযোগ এই জাতীয় পেট্রোলিয়ামে বেশী থাকে। সব ধরনের অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামে কিছুটা (শতকরা ১০ ভাগ) বেন্‌জিন থাকে।

প্রাকৃতিক গ্যাস সংগ্রহের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। তাছাড়া ভূগর্ভে কোন স্তরেই গ্যাস এককভাবে থাকে না। সব সময়েই প্রাকৃতিক গ্যাস থাকে পেট্রোলিয়ামের উপরে। সুতরাং পেট্রোলিয়াম পরিশোধনের সময় যেটুকু গ্যাস পাওয়া যায় তা সঞ্চয় করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন। এ ছাড়া কিছু ইথেন, প্রপেন বিউটেন প্রাকৃতিক গ্যাসে থাকে। সামান্য পরিমাণে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং কিছু বিরল গ্যাসও প্রাকৃতিক গ্যাসে থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোলিয়ামের উপরে থাকলেও কিছু প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোলিয়ামে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। পৃথিবীতে মোট ২০ লক্ষ ৯ হাজার কোটি ব্যারেল [১ ব্যারেল=১৬০ লিটার (প্রায়)] পেট্রোলিয়াম মজুত আছে বলে মনে করা হয়। তার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে ৩০ হাজার কোটি ব্যারেল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে ৫০ হাজার কোটি ব্যারেল, আফ্রিকায় ২৫ হাজার কোটি ব্যারেল, ল্যাটিন আমেরিকায় ২২ হাজার ৫০০ কোটি ব্যারেল, ২০ হাজার কোটি ব্যারেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ৯ হাজার ৫০০ কোটি ব্যারেল কানাডায় ও ২ হাজার কোটি ব্যারেল ইউরোপে এবং বাদ বাকী ২০ হাজার কোটি ব্যারেল দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির ভূগর্ভে আছে বলে মনে করা হয়। [তথ্য সূত্রঃ দি এনার্জি রিসোর্সেস্ অফ্ দি আর্থ, এম. কে. হুবার্ট সায়েন্টিফিক আমেরিকান, ২২৪ খন্ড, তৃতীয় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৬৪।]

প্রসঙ্গতঃ জেনে রাখা ভাল, এক মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল বা অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম থেকে ৯১ লক্ষ কিলো ক্যালরি তাপশক্তি পাওয়া যায়। আর এক মেট্রিক টন পেট্রোল, ফার্নেস অয়েল প্রভৃতি থেকে ১ কোটি ৫ লক্ষ ৫০ হাজার কিলো ক্যালরি তাপশক্তি পাওয়া যায়।

টারস্যান্ড বা অয়েল সেল থেকে কিছু তেল পাওয়ার সুযোগ আছে, টারস্যান্ড হল এক ধরনের বালি। কানাডার অ্যালবার্টায় এবং ভেনিজুয়েলার বিস্তীর্ণ এলাকায় এই বালি ছড়ানো আছে। কানাডার দুটি কারখানায় এই বালি থেকে বছরে ১ কোটি টন পেট্রোলিয়াম নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অয়েল সেল হল জৈব পদার্থ কোরাজেনযুক্ত এক প্রকার শিলা। ৩০০ থেকে ৪০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কোরাজেন তেল ও গ্যাসে ভেঙ্গে যায়। এই তেল পেট্রোলিয়ামজাত তেলের মত ব্যবহারযোগ্য, তবে অবশ্যই পরিশোধন প্রয়োজন। ইটালীতে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই তেল দিয়ে রাস্তার আলো জ্বালানো হত। ফ্রান্সে ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে অয়েল সেল নিষ্কাশন করে তেল সংগ্রহের কারখানা স্থাপিত হয়। স্কটল্যান্ডেও অয়েল সেল থেকে তেল সংগৃহীত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে ব্যাপক পরিমাণে অয়েল সেল তেল ব্যবহৃত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনে অয়েল সেল পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। অনুমান করা হয়,—পৃথিবীতে যে পরিমাণ কোরাজেনযুক্ত পাথর অর্থাৎ অয়েল সেল আছে তা থেকে হয়ত ভূগর্ভে সঞ্চিত পেট্রোলিয়ামের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ ব্যবহারযোগ্য তেল পাওয়া যাবে। কিন্তু অয়েল সেল থেকে ব্যবহারযোগ্য তেল নিষ্কাশনের পদ্ধতি জটিল এবং যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং অয়েল সেলের ব্যাপক ব্যবহারের কথা এখনও চিন্তার বাইরে।

ক্রীড়াক্ষেত্রে যুবকল্যাণ দফতরের উদ্যোগ

যুবকল্যাণ কথাটা মাত্র কয়েক বছর আগেই আমাদের কাছে নতুন বলে মনে হয়েছিল এবং এর মধ্যে বিশেষ কোন তাৎপর্যও আমাদের কাছে ধরা পড়ে নি, কেউ কেউ হয়ত বা এই গালভরা নামকরণে নাসিকা কুঞ্চিত করেছিলেন, কিন্তু গত কয়েক বৎসরে যুবকল্যাণ কথাটি অনেকের কাছেই পরিচিত হয়ে উঠেছে। আসলে কর্মীদের নিরলস আন্তরিকতাই এত তাড়াতাড়ি দফতরটিকে তার শৈশব থেকে যৌবন প্রান্তে নিয়ে এসেছে। ছোট বড় শাখা-প্রশাখায় আজ সারা পশ্চিমবঙ্গে এর ব্যাপ্তি। বেকারদের অর্থ-নৈতিক প্রকল্প দিয়ে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা থেকে শুরু করে, বিদ্যায়তনগুলিকে শিক্ষামূলক ভ্রমণে অর্থনৈতিক সাহায্য, নামমাত্র ভাড়ায় ইউথ হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিভাগটি পশ্চিমবঙ্গের যুবক-যুবতীর কাছে একটি পরিচিত কর্মকেন্দ্র। কিন্তু এই বিরাট কর্মযজ্ঞের মধ্যেও যুবমানসের যে দিকটায় তাঁরা সযত্নে জলসিঞ্চন করে চলেছেন তা হল, খেলা-ধুলার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য অনুদান। অথচ ক্রীড়াদফতর একটি পৃথক বিভাগ—এ যুক্তিতে যদি যুবকল্যাণ দফতর খেলাধুলার সাহায্যে এগিয়ে না আসতেন তো দোষের কিছু ছিল না। কিন্তু আসলে এই দফতরের কর্ণধাররা বুঝে-ছিলেন যে, এদিকটা যদি একই সঙ্গে দেখা না হয় তবে এই কল্যাণকামী প্রচেষ্টায় একটা বিরাট ফাঁক থেকে যাবে। সব মিলিয়ে এই যে বিরাট পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ন যেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায়, সেখানকার দায়িত্বশীল মানুষগুলির কি অপরিসীম উদ্বেগ ও ব্যস্ততায় দিন কাটে। কিন্তু কি আশ্চর্য! সাধারণতঃ সরকারী অফিস বলতে যে গম্ভীর বিষণ্ণ পরিবেশ আমাদের চোখে ভেসে ওঠে, এখানকার ছবি কিন্তু তার ব্যতিক্রম। Catch them young শ্লোগানটা শুনেই আসছিলাম—যুবকল্যাণ দফতরের আনুকূল্যে ধীরে ধীরে তা বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। বিদেশে যে বয়সে আজ কোন খেলোয়াড় তার সক্ষমতার তুঙ্গে উঠে যাচ্ছে তারপর অবসর নিচ্ছে তার উত্তরসূরীর আবির্ভাবে, সেই বয়সে আমাদের ছেলেমেয়েরা হয়ত খেলা শুরু করছে। ক'জন বাবা-মা আজ ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ফাঁকে খেলাতে উৎসাহ দেন—বললে, উত্তর—'পড়াশুনা করে মানুষ হোক, তবে তো!' বিদেশে খেলোয়াড়রা কি পড়াশুনো করেন না? বরং বলা যায় খেলাধুলার সঙ্গে অধ্যয়ন তাঁরা সমান তালে চালিয়ে যান। আসলে আমরা মনে মনে সেই ঘরকুনো হয়েই রয়েছি, মুখে যতই প্রগতির কথা বলি না কেন, খেলাধুলা করেও যে কেউ জীবনে উন্নতি করতে পারে, সেটাই মেনে নিতে পারি না। ছেলেমেয়েরা মুক্ত বাতাসে মানুষ হোক তাতেও আপত্তি। তাই আজ সুযোগের, উৎসাহের অভাবে ফুটে না ওঠা ছেলেমেয়েদের কাছে যুব-কল্যাণ দফতর একটি সহযোগী সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। স্বভাবতই যুবকল্যাণ বিভাগের এই পদক্ষেপ সঠিক এবং যুগোপযোগী। সারা দেশের বেকারী, হতাশা এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে ধ্বংসমুখী চিন্তাধারা, তার মূল প্রাণশক্তিকে সার্থক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে খেলাধুলার ক্ষেত্রে সুস্থ প্রতিযোগিতা।

ডাঃ শেখর চৌধুরী

ব্যক্তিগতভাবে যদিও আমি ক্রিকেট খেলি এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে আম্পায়ার করার যোগ্যতাও অর্জন করেছি, তবু ইচ্ছা থাকলেও ক্রিকেটকে সাধারণের খেলায় পরিণত করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র সেটা বুঝি, কারণ শতকরা বেশীর ভাগ মানুষ যেখানে দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন, সেখানে এ খেলার খরচই প্রতিবন্ধক, তাই এমন খেলার প্রসার ঘটান প্রয়োজন যাতে কম খরচে বেশী সংখ্যায় ছেলে-মেয়েকে আকর্ষণ করা যায়। আজ যে যুবকল্যাণ দফতর গ্রামে-গঞ্জে খেলাধুলার সুযোগ করে দিতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন, স্বাভাবিক-ভাবেই তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ফুটবল, ভলিবল, নেটবল, কবাডি, খো-খো ইত্যাদি। এগুলি কম খরচসাপেক্ষ, প্রতিযোগিতামূলক, বেশী সংখ্যায় ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সর্বোপরি প্রত্যেকটিতে প্রচুর পরিমাণে পেশী সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। খেলাগুলির প্রসার ঘটাতে যুব-কল্যাণ বিভাগ প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করছেন, শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্প করে আরও আকর্ষণীয় করে তুলছেন এবং বিভিন্ন স্বীকৃত সংস্থাকে খেলার মাঠ, জিমনাসিয়াম ইত্যাদির জন্য অকৃপণ হাতে আর্থিক সাহায্যও করছেন। সব মিলিয়ে চারিদিকে একটা উৎসাহের ছোঁওয়া, কিন্তু একজন খেলার মাঠের মানুষ হিসাবে সবচেয়ে যেটা প্রশংসা করার মতো বলে মনে করি, তা হলো মূল খেলা অ্যাথলেটিক্সকেও তাঁরা অবজ্ঞা করেন নি।

চিকিৎসক হিসাবে গ্রামে ও শহর ক'লকাতার বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালে যুক্ত থাকার জন্য, এবং বিশেষ করে স্পোর্টস মেডিসিনে জড়িত থাকার সুবাদে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েকে চিকিৎসার বা কলাকৌশল ও প্রয়োগবিধি নিয়ে উপদেশ দিতে হয়েছে। কিন্তু যে দিকটা সবচেয়ে দুঃখজনক বলে মনে হয়েছে তা হল, আজ বেশীর ভাগ যুবক-যুবতীই অপুষ্টিতে আক্রান্ত। সাধারণ যুবসমাজের অসুস্থতার মূল কারণই হল প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব, অর্থাৎ তাদের ততটা দরকার নয় ওষুধের, যতটা প্রয়োজন সুষম খাদ্য। শহর থেকে শুরু করে সুদূর গ্রামাঞ্চলের সর্বত্রই যুবকল্যাণের কর্মক্ষেত্র, কিন্তু যে অগণিত ছেলেমেয়েকে যুববিভাগ মাঠে টেনে নিয়ে যেতে চাইছেন, তাদের অধিকাংশই অপুষ্টিতে ভুগছে। সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে খেলার বাড়তি চাপ তাদের কোন্ দিকে নিয়ে চলছে, তা সহজেই অনুমেয়। এতদিন যে পুষ্টির অভাব চাপা পড়ে ছিল, সেটা এখন প্রকটরূপে পরিস্ফুট অর্থাৎ মূল লক্ষ্য আমাদের নাগালের বাইরেই রয়ে যাবে। খাদ্য তারা পায় না কেন অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণেই বা নয় কেন, এ-সমস্ত সমস্যার সমাধানের বিষয় আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হবে অপেক্ষা-কৃত সহজলভ্য খাবার দিয়ে কেমন করে এ-সমস্ত ছেলেমেয়েকে বাড়তি শক্তি যোগান যায়, যার ফলে মাঠে মাঠে হাজারো ছেলেমেয়ের নির্মল আনন্দের সাথে তাল মিলিয়ে এক সুস্থ সবল কর্মঠ প্রজন্ম হিসাবে গড়ে উঠতে পারে, অর্থাৎ একদিকে যেমন খেলাধুলার প্রসার ঘটানোর গুরুদায়িত্ব যুব দফতর গ্রহণ করেছেন, যারা অংশগ্রহণ করছে, তাদের পুষ্টিকর খাদ্যের পথনির্দেশ করার বাড়তি দায়িত্বও তাঁদের তুলে নিতে হবে। আজ এই বিশাল সংগঠন শহর থেকে গ্রামে—ব্লকে ব্লকে ছড়িয়ে গিয়েছে, বিভাগের তৎপর কর্মীদের নিয়ে এই একান্ত প্রয়োজনীয় দিকে এগিয়ে যেতে হবে—নয়তো জাতিগঠনের এই মহৎ পরিকল্পনাটাই বানচাল হবার সম্ভাবনা। প্রয়োজনমত স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এ অভিশাপকে নির্মূল করতে হবে।

গ্রামের বিভিন্ন সংস্থার সাংগঠনিক কাজে সক্রিয়ভাবে অনেকদিন হল যুক্ত আছি এবং খেলোয়াড়দের এ সমস্যা আমাকে বারে বারে বিব্রত করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় খাবার উপাদান সম্পর্কে বোঝান সম্ভব হলেও, সুষম খাদ্য বলতে কি বোঝায়, অপেক্ষা-কৃত সহজলভ্য খাবার দিয়েও কি করে সেটা পাওয়া যেতে পারে, সারা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সেটা প্রচার করার জন্য প্রয়োজন জন-সংযোগ।, সরকারীভাবে আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা যায় বিভিন্ন ব্লক পর্যায়ে, রেডিও, টি. ভি. অথবা তথ্যচিত্রের মাধ্যমে প্রচার করলে আরও বেশী মানুষ উপকৃত হবে।

সুষম খাদ্য খরচসাপেক্ষ নিশ্চয়ই, এবং সে কারণে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ছেলেমেয়ের পক্ষে সে খাদ্য পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু খরচটাই কি একমাত্র কারণ? মনে হয় না। কারণ, তাহলে সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে অপুষ্টিজনিত রোগ দেখা যেত না। বাস্তবে সেটাও ঘটে, সে সকল ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থাটা আসল সমস্যা নয়। মূল সমস্যা হল অজ্ঞতা। তথাকথিত শিক্ষিতকেও আজ শিক্ষা দেবার সময় এসেছে এ বিষয়ে। ভাবতে দুঃখ হয় যে, কত সামান্য উপাদানের অভাবে আজ পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে অন্ধ ছেলে-মেয়ের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে অথচ প্রয়োজনীয় খাদ্যটা হাতের সামনেই পড়ে আছে শুধু তুলে নেবার অপেক্ষায়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, একটা সুষম খাদ্য-তালিকা তৈরী করা বুঝি খুবই কঠিন কাজ, বিশেষজ্ঞ, ডাক্তারের প্রয়োজন, কিন্তু আসলে তা মোটেই নয়। একজন সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ সহজেই তার প্রয়োজনীয় খাদ্য বেছে নিতে পারেন। মানুষের শরীর যে সমস্ত উপাদান দিয়ে তৈরী, তার সমস্ত কিছুই গুনে গুনে খাবারের মধ্যে সরবরাহ করতে হয় না। মোটামুটিভাবে কয়েকটা প্রধান উপাদান খাবারে পরিমাণজনিত থাকলে মানুষের শরীরই বাকি-গুলি নিজস্ব পদ্ধতিতে তার থেকে তৈরী করে নেয়। শরীরের কি কি প্রয়োজন এবং কত পরিমাণে, এটাই বিচার করে নিতে হবে। নিক্তি মেপে বিচার করলে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সেজন্য চিন্তার কিছু নেই। যখনই আমরা একটা বিশাল জনসংখ্যার কথা চিন্তা করব, সেখানে সাধারণভাবে একটা খাদ্যের খসড়া তৈরী করে নেব যাতে একজন সাধারণ ছেলে অথবা মেয়ের জন্য এমন পরিমাণ খাদ্য থাকবে যা দিয়ে সে তার দৈনন্দিন জীবনের সাথে দু-এক ঘণ্টা খেলাধুলো করলেও শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে না! সাধারণতঃ একজন বাড়ন্ত পুরুষ মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন—সমবয়সী একজন মহিলার চেয়ে বেশী, কিন্তু শুরু করার জন্য একজন পুরুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যই হিসাব করতে হবে, কারণ খাদ্য কম হওয়ার চেয়েও বেশী হওয়াই ভাল।

খাদ্য থেকে মানুষ শক্তি আহরণ করে এবং কাজকর্মের মধ্য দিয়ে সেই শক্তি ব্যয় হয়। সুতরাং গড়ে একজন মানুষ যত শক্তি খরচ করে, সেটাই তার খাদ্যের মধ্যে প্রয়োজন। মানুষ যখন শারীরিক এবং মানসিকভাবে বিশ্রাম নিচ্ছে, তখনও কিন্তু তার শক্তিক্ষয় হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত-সঞ্চালন, তাপমাত্রা বজায় রাখা ইত্যাদি কাজের মধ্যে দিয়ে। এ ছাড়া পেশী সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে তার প্রচুর শক্তি ব্যয় হচ্ছে। সুতরাং এই দুইভাবে খরচ করা শক্তিকেই খাদ্য দিয়ে পরিপূরণ করতে হবে। একজন বাড়ন্ত ছেলে, ধরে নেওয়া যায় কিছু দৈহিক শ্রম করবে এবং পড়াশুনোও করবে। সুতরাং আমরা খাদ্য জোগান দেওয়ার সময় শুধু শরীরের পেশীর কথাই চিন্তা করব না, মস্তিষ্কের পুষ্টিও যাতে হয়, সেদিকেও নজর দেব। তবে সুখের বিষয় সমস্ত রকম উপাদানের মধ্যে গ্লুকোজই মস্তিষ্কের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন—যেটা বাঙালীর খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান।

যেসব খোলামাঠের খেলাধুলার প্রসার আজ ঘটছে বহু দফতরের সহায়তায়, তাতে শরীরের প্রায় সমস্ত পেশী জড়িয়ে পড়ছে—এবং তাদের শক্তিক্ষয়ও হচ্ছে পর্যাপ্ত। মানুষ যেসব পেশীকে ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করতে পারে, তাদের কোনটি বেশ মোটা কোনটি বা সরু। কোন পেশী জমায় গ্লাইকোজেন, কেউ বা জমায় ফ্যাট, আবার প্রয়োজনমত এই গ্লাইকোজেন বা ফ্যাটকেই শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এ ছাড়া প্রতিনিয়ত কিছু সেল বা কোষ মরে যাচ্ছে এবং কিছু নতুন মুখ তার জায়গা নিচ্ছে। সুতরাং এই ক্ষয়কে পূরণ করতে দরকার কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন—এই তিনটিই খাদ্যের প্রধান উপাদান। পরিমাণগতভাবে কতটা খাদ্য প্রয়োজন তা প্রকাশ করা হয় তাপের একক-ক্যালোরিতে।

১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট তৈরী করে ৪ ক্যালোরি তাপ।

১ গ্রাম প্রোটিন তৈরী করে ৪ ক্যালোরি তাপ।

১ গ্রাম ফ্যাট তৈরী করে ৯ ক্যালোরি তাপ।

প্রধানতঃ কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাটকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং এ থেকে পাওয়া শক্তি বিভিন্ন কাজে খরচ করা হয়, আর প্রোটিন দিয়ে প্রধানতঃ শরীরের পেশী, অন্যান্য তন্তু এবং রক্তের প্রয়োজনীয় ঘাটতি মেটান হয়।

কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট ছাড়াও মানুষ খাদ্যের মধ্যে দিয়ে আরও কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান আহরণ করে—যেমন,

ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, ইলেকট্রোলাইট (তড়িৎ বিশ্লেষ্য) এবং জল।

প্রোটিন: প্রোটিনই হ'ল শরীরের সমস্ত কোষের প্রধান উপাদান। এ ছাড়া বিভিন্ন জারক রস এবং সংক্রামণ প্রতিরোধক অ্যান্টিবডিও প্রোটিন দিয়েই তৈরী। প্রায় সকল প্রকার খাবারেই প্রোটিন আছে, তবে কোথাও কম, কোথাও বেশী। শরীরের প্রোটিন অংশ তৈরী হয় অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে। মোট ১০টি একান্ত প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড আছে, যেগুলো শরীর সরাসরিভাবে খাদ্য থেকে আহরণ করে—বাকী আটটি অ্যামিনো অ্যাসিড শরীর তৈরী করে নেয় ঐ দশটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এই দশটি অ্যামিনো অ্যাসিডের আপেক্ষিক পরিমাণ দিয়েই খাবারের প্রোটিনের গুণাগুণ বিচার করা হয়।

সেই বিচারে প্রাণীজ খাবারে পাওয়া প্রোটিনের গুণগত মান অনেক বেশী—তাই এদের প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন বলা হয়। যেমন ডিম, মাছ, মাংস, দুধ। ডিমের মধ্যে দশটি অ্যামিনো অ্যাসিডের সব ক'টিই প্রায় নিখুঁতভাবে উপস্থিত—তাই ডিমের প্রোটিনকে আদর্শ ধরে নিয়ে অন্যান্য প্রোটিনের গুণ বিচার করা হয়।

আবার নিরামিষ খাবারে সে হিসাবে নীচুমানের প্রোটিন পাওয়া যায়। কিন্তু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন দামে সস্তা এবং দুই বা তিনটি এরকম প্রোটিন মিশিয়ে খেলে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন পাওয়া যায়। যেমন, আটাতে একটি অ্যামিনো-অ্যাসিড (লাইসিন) অপেক্ষাকৃত কম আছে। মটর-শুঁটিতেও আর একটি অ্যামিনো অ্যাসিড (মিথিওনিন) কম আছে। কিন্তু আটা ও মটরশুঁটি একসঙ্গে খেলে একে আরেকটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে এবং অনেকটা পরিমাণে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন পাওয়া যায়। এ ছাড়াও সয়াবীনে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আছে এবং ডাল, বাদাম, চাল, শাকপাতা, ফল ইত্যাদিতেও প্রোটিন পাওয়া যায়।

মোটামুটিভাবে প্রোটিন প্রয়োজন—প্রতি কেজি শরীরের ওজনের জন্য ১ গ্রাম, তবে বাড়ন্ত ছেলে-মেয়েদের ২ গ্রাম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ফ্যাট: আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ফ্যাট আমরা পাই বিভিন্ন তেল, ঘি ও মাখন থেকে। এ ছাড়া বাদাম, সরিষা, সয়াবীন থেকেও প্রয়োজনীয় ফ্যাট পেতে পারি। খাবারের শতকরা কত ভাগ ফ্যাট হওয়া উচিত তা ঠিক নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে দেখা গেছে মোট ক্যালোরির শতকরা ১৫ ভাগ পর্যন্ত খেলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু তার বেশী পরিমাণ ফ্যাট খাবারে থাকলে রক্তে কোলেস্টেরল বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে এবং তার ফলে রক্তবাহী নালিগুলো সরু হয়েও শক্ত হয়ে যেতে পারে এবং তার ফলে হৃদ্‌রোগ দেখা দিতে পারে। তবে সাধারণতঃ এ-কথা যাঁরা বসে কাজ করেন, তাঁদের জন্য প্রযোজ্য, খেটে খাওয়া মানুষ অর্থাৎ যারা কায়িক পরিশ্রম করে, তাদের ক্ষেত্রে পরিমাণে ফ্যাট একটু বেশী হলেও কোলেস্টেরল বাড়ে না। বিশেষ করে প্রাণীজাত ফ্যাট অর্থাৎ ঘি, মাখন ইত্যাদি সম্বন্ধেই এ বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত কারণ বাদাম তেল বেশী পরিমাণে খেলেও এ সমস্যা দেখা দেয় না। সুতরাং ফ্যাট দু'ভাবেই মানুষের খাদ্যে থাকা মঙ্গল।

ফ্যাট থাকে বলে খাবারে স্বাদ ও গন্ধ থাকে, এবং খাবার ইচ্ছাও সৃষ্টি হয় ও বিশেষ কয়েক রকমের ভিটামিনও শরীরে সহজে আহরণ করা যায়।

কার্বোহাইড্রেট—এই শ্রেণীর খাবার হল গ্লুকোজ, চিনি, স্টার্চ ইত্যাদি। শষ্য থেকে তৈরী খাবারে প্রচুর পরিমাণে স্টার্চ আছে; তাছাড়া আখের চিনি ও গ্লুকোজ পুরোটাই কার্বোহাইড্রেট। জ্বালানি হিসাবে কার্বোহাইড্রেট সবচেয়ে সস্তা এবং পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে—ফলে আমাদের খাবারে কার্বো-হাইড্রেটের আধিক্য।

সহজ-পাচ্য কার্বোহাইড্রেট ছাড়াও ফাইবার জাতীয় কার্বোহাইড্রেটও প্রয়োজনীয়। যদিও ফাইবার হজম হয় না, অক্ষত অবস্থায় থাকে, তবু এটা অন্য খাবার হজম হতে সাহায্য করে এবং ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য হবার সম্ভাবনা খুবই কমে যায়। সেজন্য শাকপাতা প্রচুর পরিমাণে খাবারে থাকা উচিত।

সুষম খাদ্যের পরিকল্পনা করার সময় প্রথমে

ফ্যাট, প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ— এ সবের প্রয়োজনমত পরিমাণ হিসাব করতে হবে—তারপর প্রয়োজনীয় ক্যালোরি কার্বোহাইড্রেট দিয়ে পূরণ করা হবে।

ভিটামিন—খাবারে বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবের ফলে প্রায়ই নানা রকম অসুখ দেখা দেয়। অথচ পরিমাণের দিক থেকে সেগুলো এত কম যে, একটু সতর্ক থাকলে কোন ভিটামিনের অভাব ঘটা উচিত নয়।

ভিটামিন 'এ'—প্রয়োজন দিনে ৩০০০-৪০০০ আন্তর্জাতিক একক—পাওয়া যায় সব খাবারেই, কিন্তু বিশেষ করে দুধ, আম, কমলালেবু, টোম্যাটো, কড্ ও শার্কলিভার তেল, কুমড়ো ও বিভিন্ন শাকপাতায় পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। অথচ এই ভিটামিন 'এ'-র অভাবেই আজ সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে এত ছেলেমেয়ে দৃষ্টিহীন।

ভিটামিন 'বি'—ঢেঁকি-ছাঁটা চালের বদলে মেসিনে ছাঁটা চাল খাবার ফলে 'বি' ভিটামিন খাদ্যে বেশ কমে গেছে। কারণ চালের খোসাতেই এই ভিটামিন বেশী থাকে। তবে ডাল অথবা বাদাম খেলেও সেটুকু পূরণ করা চলে। কম জল দিয়ে ভাত রান্না করে ফেন না ফেলে ভাত খেলেও উপকার পাওয়া যায়। প্রয়োজন—দিনে মাত্র ১ মিগ্রা।

ভিটামিন 'সি'—শাকসবজি ও ফলে ভিটামিন 'সি' প্রচুর পরিমাণে আছে, তাছাড়া কলা-বেরোন ছোলাতেও পর্যাপ্ত ভিটামিন 'সি' আছে। দিনে প্রয়োজন ৩০-৫০ মিগ্রা।

ভিটামিন 'ডি'—যদিও এই ভিটামিন বিভিন্ন লিভার তেল, ডিমের কুসুম, দুধ ইত্যাদি খেলে পাওয়া যায়, কিন্তু এ সব না খেলেও যে রিকেট হয় না তার কারণ—চামড়ার নীচে জমানো এক রকম উপাদানে সূর্যরশ্মির স্পর্শ হলে শরীরে ভিটামিন 'ডি' তৈরী হয়।

ভিটামিন 'ই' ও 'কে'—প্রয়োজনীয় পরিমাণ পেতে গেলে বিশেষ কোন খাবারের দরকার হয় না।

খনিজ পদার্থ—প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস মানুষের শরীরে হাড় ও দাঁত শক্ত করার কাজে লাগে। দুধ, ভাত, ডাল, সবজী এ সবে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পাওয়া যায়।

লৌহ—যার দৈনিক প্রয়োজনীয়তা ১৫-৩০ মিগ্রা। মাংস, চাল, আটা, ডাল এ সবে পাওয়া যায়। লৌহের অভাবে হিমোগ্লোবিন তৈরী হতে পারে না ফলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়।

ইলেকট্রোলাইটস্—সোডিয়াম ও পটাসিয়াম শরীরের তরল অংশের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। ঘাম হলে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম শরীর থেকে নষ্ট হয়—খাবার লবণই সোডিয়ামের প্রয়োজন মেটায়। পটাসিয়াম বিভিন্ন খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

তাহলে এতক্ষণে আমরা খাদ্যে প্রয়োজনীয় উপাদান সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিতে পেরেছি কিন্তু এই পরিমাণ মত খাদ্য হিসাব করলেও, জলে সিদ্ধ অথবা তেলে ভাজবার ফলে কিছু ভিটামিন নষ্ট হয়। কিন্তু সবজীগুলো বড় টুকরো করে খোসা না ছাড়িয়ে যদি রান্না করা হয় তবে নষ্ট কম হয়। সুতরাং এজন্য কিছু বেশী পরিমাণ খাদ্য তালিকায় রাখা উচিত।

একটা সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরী করতে গেলে দেখতে হবে যেন বিভিন্ন ধরনের খাবার এমন পরিমাণে থাকে যাতে প্রয়োজনীয় ক্যালোরি, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন এবং অন্যান্য উপাদান পরিমাণ মত থাকে। এটাও অবশ্য বিচার করতে হবে—বিভিন্ন এলাকাতে কি কি খাবার পাওয়া যায়। নিচে একটি তালিকা দেওয়া হল—

প্রধান খাদ্য—চাল, আটা।

আনুষঙ্গিক খাদ্য—

(ক) ডাল, বাদাম, মটরশুঁটি।
(খ) সবুজ পাতাওয়ালা সবজী ও শাক-পাতা—নটেশাক, ছোলাশাক, মটরশাক, পালংশাক, লাউশাক, মূলাশাক, কলমীশাক, পুঁইশাক, ধনেশাক, ডুমুর ইত্যাদি।
(গ) মূল-সবজী—আলু, রাঙ্গা আলু, ওল, কচু, মূলা ইত্যাদি।
(ঘ) অন্যান্য সবজী জাতীয় খাদ্য—থোড়, মোচা, লাউ, ছত্রাক, কচি বাঁশের মুকুল ইত্যাদি।
(ঙ) ফল—আম, পেঁপে, টোম্যাটো, জাম, জামরুল, কমলালেবু, পেয়ারা ইত্যাদি।
(চ) দুধ, দই, ছানা।
(ছ) চিনি, গুড়।
(জ) সরিষার তৈল, বাদাম তৈল, ঘি ও মাখন।
(ঝ) মাছ—পুঁটি, রুই, মৃগেল ইত্যাদি।
(ঞ) গেঁড়ি, গুগলী।
(ট) মাংস—পাঁঠা, মুরগী, শূকর, গরু।
(ঠ) ডিম—হাঁসের ও মুরগীর।

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কম ও বেশী সব রকম দামের খাবারেই প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে। কিন্তু কোন্ খাদ্যে উপাদানগুলির উপস্থিতি কত পরিমাণে সেটা জানবার জন্য নীচে আরেকটি তালিকা দেওয়া হল—যার সাহায্যে উপাদানের পরিমাণ অনুসারে একটা সুষম খাদ্য তালিকা পাওয়া যেতে পারে। হাজার রকমের খাদ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণভাবে পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ মানুষের খাদ্য—এমন নামগুলিই হিসাবে রাখা হয়েছেঃ

উপরের তালিকাভুক্ত বিভিন্ন খাদ্যের সংমিশ্রণে একটা সুষম খাদ্য পাওয়া যেতে পারে। কিছু খরচসাপেক্ষ হলেও উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের পক্ষে এটা উপযোগী। দৈনন্দিন কাজকর্ম ছাড়া তাদের খেলাধুলার জন্যও একটু বেশী খাদ্য দেওয়া উচিত, যাতে তারা ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় এবং বাড়তি পরিশ্রমের ফলে তারা অসুস্থ না হয়ে পড়ে। এ সমস্ত চিন্তা করে তাদের কিছু বেশী ফ্যাট ও প্রোটিন দেওয়া হয়েছে এবং বাকীটা কার্বোহাইড্রেট দিয়ে ক্যালোরি পূরণ করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য উপাদানও পরিমাণ মত দেওয়া হয়েছে।

খাদ্য	গ্রাম
চাল অথবা আটা	৪০০
ডাল, বাদাম, সরিষা	৮৫
সবুজ পাতা সবজী	১১৫
মূলজাতীয় সবজী	৮৫
অন্যান্য সবজী	৮৫
ফল	৮৫
দুধ, দই, ছানা	২৮৫
চিনি, গুড়	৫৫
তেল, ঘি	৫৫
মাছ, মাংস	৮৫
ডিম	৪০

খাদ্যের নাম	খাবারযোগ্য অংশের শতকরা পরিমাণ	প্রতি ১০০ গ্রাম খাবারযোগ্য অংশে পাওয়া যাবে প্রোটিন গ্রাম	ফ্যাট গ্রাম	খনিজ পদার্থ গ্রাম	ফাইবার গ্রাম	কার্বোহাইড্রেট গ্রাম	ক্যালোরি
১। চাল	১০০	৬·৪	০·৪	০·৭	০·২	৭৯	৩৪৫
২। আটা	১০০	১২·১	১·৭	২·৭	১·৯	৬৯·৪	৩৪১
৩। সয়াবীন		৪৩·২	১৯·৫	৪·৬	৩·৭	২০·৯	৪৩২
৪। ডাল	১০০	২২·৩	১·৭	৩·৫	১·৫	৫৭·৬	৩৩৪
৫। শাকপাতা	৩৯	০·৪	০·৫	২·৭	০·১	৬·৩	৪৬
৬। আলু	১০০	১·৬	০·১	০·৬	০·৪	২২·৬	৯৭
৭। বাদাম		২৬·৭	৪০·১	১·৯	৩·১	২০·৩	৫৪৯
৮। ফল		০·৬	০·১	০·৪	১·৮	১০·২	৪৫
৯। মাছ (ছোট)		১৮·১	২·৪	১·৪	—	৩·১	১০৬
,, (সিঙ্গি)		২২·৮	০·৬	১·৭	—	৬·৯	১২৪
,, (বড়)		১৯·৫	০·৮	১·৫	—	৩·২	৯৮
১০। মাংস (পাঁঠা)		২১·৪	৩·৬	১·১	—	—	১১৮
,, (মুরগী)		২৫·৯	০·৬	১·৩	—	—	১০৯
,, (গরু)		২২·৬	২·৬	১	—	—	১১৪
১১। ডিম (হাঁস)		১৩·৫	১৩·৭	১	—	০·৮	১৮১
,, (মুরগী)		১৩·৩	১৩·৩	১	—	—	১৭৩
১২। গুগলী		১২·৬	০·১	৩·৮		৩·৭	৭৪
১৩। তৈল	১০০		১০০			—	৯০০
১৪। মাখন	১০০		৮১	২·৫		—	৭২৯
১৫। ঘি			৯২			—	৮২৮
১৬। দুধ (গরু)		৩·২	৪·১	০·৮	—	৪·৪	৬৭
,, (ছাগল)		৩·৩	৪·৫	০·৮	—	৪·৬	৭২
,, (মোষ)		৪·৩	৮·৮	০·৮	—	৫·১	১১৭

এতে মোট পাওয়া যাবে (মোটামুটিভাবে)

ক্যালোরি	৩,০০০	
প্রোটিন	৯০	গ্রাম
কার্বোহাইড্রেট	৪৫০	„
ফ্যাট	৯০	„
ক্যালসিয়াম	১·৫	„
ফসফরাস	২	„
ভিটামিন এ	৮,৪০০	(আন্তর্জাতিক একক)
লৌহ	৪৫	মি.গ্রা.
ভিটামিন বি-১	২	„
ভিটামিন বি-২	২	„
নিকোটিনিক অ্যাসিড	২২	„
ভিটামিন সি	২৫০	„

(বিঃ দ্রঃ—মাছ, মাংস, ডিম যদি খাওয়া সম্ভব না হয়, তবে দুধ, ডাল, বা বাদামের ভাগ বাড়িয়ে দিলেও সুষম খাদ্য পাওয়া যাবে।)

এখন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রতিটি উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েকে একটি আদর্শ সুষম খাদ্য দেওয়া। কিন্তু তার জন্য অর্থনৈতিক অবস্থা, মূল্যবৃদ্ধি এবং খাদ্যের যোগান সবকিছুতে সামঞ্জস্য আনা প্রয়োজন—যেটা এখনই সম্ভব নয়। মোটামুটি কাজ চালাবার মত একটা তালিকা নিচে দেওয়া হল এ উদ্দেশ্যে যে, প্রয়োজনমত খাদ্যের তালিকা অদল-বদল করে একটা প্রায়-সুষম খাদ্য পাওয়া সম্ভব।

ভাত ও রুটি	৪০০	গ্রাম
দুধ	১৭০	„
ডাল	৮৫	„
শাকপাতা	১১৫	„
অন্যান্য সবজী	৮৫	„
তেল, ঘি	৩০	„
চিনি, গুড়	৫৫	„
মাছ, মাংস, ডিম	৩০	„
ফল, বাদাম	৫৫	„

এই খাদ্য তালিকায় থাকবে মোটামুটিভাবে

ক্যালোরি	২,৫০০	
প্রোটিন	৭০	গ্রাম
ফ্যাট	৫০	„
কার্বোহাইড্রেট	৪৪০	„
ক্যালসিয়াম	১	„
ফসফরাস	১·৫	„
লৌহ	৪০	মি.গ্রা.
ভিটামিন বি-১	২	„
ভিটামিন সি	২০০	„
ভিটামিন এ	৭,০০০	(আন্তর্জাতিক একক)

এখন ইচ্ছা করলে খাদ্যতালিকায় আর একটু পরিবর্তন করলে আরও প্রোটিন, ফ্যাট পাওয়া যেতে পারে—যেমন, রুটির সঙ্গে মটরশুটি তরকারি করে খেলে উন্নতমানের প্রোটিন পাওয়া যাবে। গুগলী খেতে প্রথমে ইচ্ছা না করলেও, পরিমাণ মত আনাজ, তেল, ঘি দিয়ে রান্না করলে খেতে খারাপ লাগবে না। সয়াবীন খেতে পারলেও খুবই ভাল। সয়াবীনের দুধ, দইও খাওয়া চলে। এছাড়া মিলে ব্যবহার করা বাদামের অংশ যেটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ (উঠতি বয়সের জন্য বাড়তি কিছু দেওয়া তো দূরের কথা) সচরাচর কি খায়? সে খাদ্য যে প্রয়োজনীয় উপাদান বিচার করলে কত নিচু মানের—সেটা নিচের হিসাবে বোঝা যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে, আমাদের ছেলেমেয়েরা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিযোগিতা করতে পারে না কেন।

চাল অথবা আটা	৪৭০	গ্রাম
দুধ	৮০	„
ডাল	৭০	„
শাকপাতা	২০	„
অন্যান্য সবজী	৯০	„
তেল, ঘি	১৫	„
চিনি, গুড়	২০	„
মাছ, মাংস, ডিম	১৫	„
ফল, বাদাম	৫	„

এতে তারা উপাদান পাচ্ছেঃ

ক্যালোরি	২,১০০	
প্রোটিন	৬০	গ্রাম
কার্বোহাইড্রেট	৪০৫	„
ফ্যাট	৩০	„
ক্যালসিয়াম	০·৫	„
ফসফরাস	১·৫	„
লৌহ	৩০	মি.গ্রা.
ভিটামিন বি-১	১·৫	„
ভিটামিন সি	৫৫	„
ভিটামিন এ	১,২০০	(আন্তর্জাতিক একক)

তাহলে কি খাদ্য পাওয়া উচিত এবং ছেলে-মেয়েরা কি পায়, তার তফাতটা সত্যিই বিরাট। এ খাদ্য পেয়ে ঘরে বসে থাকা চলে, কিন্তু খেলাধুলো কিংবা বাড়তি পরিশ্রমসাধ্য কাজ করা চলে কি? খাবারে লক্ষণীয়ভাবে কম রয়েছে প্রোটিন ও ফ্যাট এবং কার্বোহাইড্রেটও। আর কমেছে ভিটামিন এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহও পরিমাণে কম পাচ্ছে। অন্যান্য ভিটামিন যেমন নিকোটিনিক অ্যাসিড বা রাইবোফ্লাভিন আমাদের খাদ্যে থাকছেই। তৈল তৈরী করে বাদাম খৈল হিসাবে বিক্রি হয়, এতেও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন ও ফ্যাট পাওয়া যায়—তাও রান্না করে খাওয়া চলে।

কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কার্বো-হাইড্রেটের অংশ বেশী না খাওয়া হয়। কারণ এতে অপ্রয়োজনীয় মেদবৃদ্ধি ঘটবে—কোন সুফল ফলবে না—বরং তাতে ক্ষমতা কমে যাবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক খেলায় ভারত আজ পেছিয়ে পড়ছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে কোচিং ক্যাম্প চালান হচ্ছে, বিদেশ সফর হচ্ছে, কিন্তু আমাদের জাতীয় কোচ-দের প্রতি কোন অসম্মান না দেখিয়েও প্রশ্ন করি, কতটা উন্নতি হয়েছে? হকিতে সোনা বাঁধা ছিল আমাদের—এখন কোন. পদক পাওয়াই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফুটবল—দেয়ালে পিঠ দিয়ে চেষ্টা করে চলেছি যাতে গোল কম হয় আমাদের বিপক্ষে। ক্রিকেটে ধরাশায়ী বিদেশে গেলেই। আর ভলিবল, বাস্কেটবলের কথা কি বা বলা যায়। অ্যাথলেটিকসেও আশা কই? এ সবের কারণ কি, সেটা কেউ খুঁজে দেখেছেন কি? আজ আমাদের জাতীয় কোচরা যাদের নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের কতজন শৈশব থেকে সুষম খাদ্য পেয়েছে কেউ ভেবে দেখেছেন কি? সুতরাং ভবিষ্যৎ যদি ভাবতে হয় তাহলে এখন থেকেই কচি-কাঁচাদের দিকে নজর দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গই এ ব্যাপারে পথিকৃত হোক, হয়ত সারা ভারতবর্ষই একদিন তাকে অনুসরণ করবে।

মানভূমী কবিতা/সম্পাদনা—সুবোধ বসু-রায়। ছত্রাক প্রকাশনী, গিরীন্দ্র মুখার্জী লেন, পুরুলিয়া। তিন টাকা।

পশ্চিম বাংলার প্রান্তিক অঞ্চল থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন 'ছত্রাক' নিরলস প্রচেষ্টায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে চলেছে। নবতম প্রয়াস মানভূমী কবিতা তারই অন্যতম নিদর্শন। দশজন কবির দশটি কবিতা মানভূমে প্রচলিত বাংলা উপভাষায়। শব্দচয়ন, বাগধারা, উচ্চারণ ও লিপিকরণের বৈচিত্র্য প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে রসগ্রহণে বিন্দুমাত্র অন্তরায় সৃষ্টি করে না। ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ-ঘটিত কারণে গড়ে ওঠা দৃষ্টিভঙ্গি ও মেজাজের মধ্যে কবিমন তাঁদের বক্তব্য রাখতে চেয়েছেন আঞ্চলিক ভাষার নিজস্ব সম্পদে। এই বক্তব্য সম্পূর্ণ জীবননিষ্ঠ ও সদর্থক। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার ছবি একাদিক্রমে এ'কে গেছেন কবিরা আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে। একইরকম সততায় ঘোষিত হয়েছে মানবিক মূল্যবোধ। আঞ্চলিক ভাষা ও পল্লীবাসীর নিরাভরণ সরলতায় আশ্চর্য প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়েছে ছত্রে ছত্রে। মিথ্যা কান্না বা মিথ্যা আস্ফালনের ধারকাছ মাড়ান নি কবিরা। প্রগতি যে বুলিমাত্র নয়, সুস্থতা যে দরিদ্র খেটে-খাওয়া গ্রামের মানুষের মধ্যে এখনো আছে মানভূমী কবিতা তারই দলিল। সঙ্গত কারণেই অনুমান করা যায় লোকসাহিত্যের স্বভাবকবিত্ব ও জীবননিষ্ঠা মানভূমী কবিদের প্রেরণা জুগিয়েছে। গৌরীশঙ্কর দাস, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অনিল মাহাত, সত্য গুপ্ত, অরুণপ্রকাশ সিংহ, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর দরিপা, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, সুবোধ বসুরায়ের প্রত্যেকটি কবিতাই এক একটি বিস্ফোরণ। অজস্র অবিস্মরণীয় বাক্যবন্ধ পাওয়া যাবে ছত্রে ছত্রেঃ

খট-খটা রদে হাফা, ডভা, লদী, পুখর
সব শুখাই যায়। বড়ই জলের কষ্ট ব,......
আর তার লাগেই কত মন্ত্রী, এমেলে, বাবু ভায়া
কলকাতালে হামদের গাঁয়ে খরা দেখতে আসে
লঙ্গরখানা করে, রটি তরকারী দেয়,
খেঁচড়ী খাওয়ায়
কত ফট তুলে, হামদের লাগেই ন।

—'পুরুল্যার বারমাস্যা'

দেখ্‌ন ভাল্যা, হামার বাড়্যির নাময়
ক্যালেন আইসছ্যে
খাড়ি লাগাব, পুই কইরব আর বড় ছোয়ার লাগ্যে
কাল্যা

—'হারান্যা'

ত হে আ'জ্ঞা ইট কি রকম পরব বটে?
পেটটই ন পহিলে।
পেটটই যদি ভখে রহিল্য,
ভিখারী যদি ভিখমাঙ্গাই রহে গেল
ত শুখা ঝাণ্ডিট উঠাই' কি শুধু ফট তুলা হবেক।
ইট হামদের মাথায় নাই আসে আ'জ্ঞা
টুকু বুঝাই দিবে?

—'ভিখমাঙ্গা'

লড়াইয়ে জান দিয়ে' জিত নাই রে বাপ,
জী না থাক, বাঁইচে থাকাটাই দুনিয়াতে মস্ত জিত।
অভিরামে খুদিরামে কন্ জিতটা জিতল বল?
জিতটত পাইল যারা লড়াইয়ে নামহেই নাই।

—'একটা দেশপ্রেমবিমুখী কবিতা'

বাবুর বেটা বাদশা সাজে মড়ল ইখন কেমন আছ?
দেখতে পাছ পৃথিমীটা ঘুরছে কেমন
নাগর দোলায়
মড়ল তুমার বিচার হবেক—
উলটা বাগে ঘুরছে চাকা,
বিরাই যাবেক সব ফুটানি—
দেখছি তুমার কপাল ছুলা।

—'মড়ল তুমার বিচার হবেক'

হ' আইজ্ঞা কবে তক্ক বেটা আমার আইসবেক
জেলের কপাটগুলান ছুটু বটে নকি...
ত চারিধারের পাঁচিলটোই ভাইঙে দেন কেনে...

—'পাঁচিলটোই ভাইঙে দেন'

ঢের দিয়েছিস রক্‌ত ঘাম
কড়ায় গণ্ডায় বুঝে লে দাম
যাহার ভখ অন্ন তার,
সুয়াও যার তার অধিকার।

—'আজকের ছড়া'

কিন্তুক বাপ, স্বাধীন ত হ'য়েছে গটা দেশটই।
বটে কি ন? ন কি প্যাঁদাই বললি?
যা ন ইঁড়কে থাবা উঁচায় ভাঙে লিয়ে খাঁচাট,
দেখবি তখন পভুরা সব সামাই গেছে গাড়াতে।

—'পাখা আর খাঁচার গল্প'

একক দিন
উলফা দিয়ে হাঁক্‌কাই আসে বিরুল,
হুর্‌র্‌র্ হুর্‌র্‌র্ দৌড়তে থাকে ধুলা,
ভগতা পরব লাগে যায় হে।
ই সময়
সবখনই শালা, বুকভিতর ট গুরুগুরায়;
ঝড়গাজাড়ে
বুড়া ভালুকেও হুদকে উঠে।

—'ই সময়টয়'

মানভূমী কবিতার মনোরম প্রচ্ছদ এ'কেছেন তপন কর। মানভূমের প্রচলিত লোকচিত্রকলা—গ্রামীণ মহিলাদের আঁকা দেয়ালচিত্র।

-দিলবাহার

বিভাগীয় সংবাদ

পশ্চিম দিনাজপুরঃ

হিলি—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং হিলি ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় পঞ্চাশটি ক্লাবকে ফুটবল বিতরণ করা হয়। ব্লকের প্রত্যেকটি ক্লাবে যাতে খেলাধুলার মান উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রাম-গঞ্জে ক্রীড়া সরঞ্জাম বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত ১৫ই জুন '৮২ থেকে (একমাসব্যাপী) যথাক্রমে হিলি হাই স্কুল ময়দানে ফুটবল এবং হিলি ব্লকের অন্তর্গত তিওড় হাই স্কুল ময়দানে ভলিবল প্রশিক্ষণ শিবির আরম্ভ হয়। ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরে ৪৮ জন এবং ভলিবল প্রশিক্ষণ শিবিরে ৩২ জন যুবক অংশগ্রহণ করে। গত ১৪ জুলাই সাফল্যের সঙ্গে প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হয়। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে মানপত্র প্রদান করা হয়।

গত ২৪শে জুন '৮২ এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিলি ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় তপশীল জাতিভুক্ত ২৪ জন যুবক-যুবতীদের জন্য টাইপ (ইংরাজি) শেখানোর জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন শ্রীহৃষিকেশ গায়েন, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, হিলি ব্লক এবং সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রীসন্তোষকুমার বসাক, সভাপতি, হিলি পঞ্চায়েত সমিতি। অনুষ্ঠানে ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীশঙ্করকুমার দত্ত এই প্রশিক্ষণ শিবির যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হয় তার জন্য হিলি ব্লকের জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

হিলি ব্লকে সরকারী উদ্যোগে এ রকম শিবির এই প্রথম। যুবকরা যাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে পারে তার জন্যই এই প্রচেষ্টা।

গত ২৫শে জুলাই '৮২ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় অ-ছাত্র যুবকদের একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। এতে ৪০ জন অ-ছাত্র যুবক অংশগ্রহণ করে।

গত ১৭ জুলাই '৮২ যুবকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এবং বিড়লা কারিগরী শিক্ষা ও সংগ্রহশালার সহযোগিতায় এই ব্লকের স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি বিজ্ঞান আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'মহাকাশ ও মানব জাতি'। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীহৃষিকেশ গায়েন, বি-ডি-ও, হিলি, ব্লক এবং সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রীঅমূল্যকুমার সরকার, প্রধান শিক্ষক, তিওড় হাই স্কুল। অনুষ্ঠান শেষে সভাপতি মহাশয় অংশগ্রহণকারী কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মানপত্র প্রদান করেন এবং সভার সমাপ্তি ঘোষণা

কালিয়াগঞ্জ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও কালিয়াগঞ্জ ব্লক যুবকরণের ব্যবস্থাপনায় কালিয়াগঞ্জ ব্লকের তপশীলী জাতিভুক্ত বেকার শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের জন্য ৬ (ছয়) মাসব্যাপী বৃত্তিমূলক বাংলা মুদ্রাঙ্কণ প্রশিক্ষণ শিবির গত ৫-৭-৮২ তারিখে ব্লক যুবকরণ কালিয়াগঞ্জে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয় শ্রীননীগোপাল রায় মহাশয় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রী এস. টি. মলমু সাহেব, বি-ডি-ও, কালিয়াগঞ্জ ব্লক। স্থানীয় সভাপতি, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে মোট ২৪ (চব্বিশ) জন (সরকারী নির্দেশানুযায়ী) শিক্ষানবীশ প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক শ্রীগোপেনচন্দ্র পাল বাবুর কাছে। প্রতি মাসে শিক্ষানবীশদের বৃত্তি হিসাবে ৩০ (ত্রিশ) টাকা করে দেওয়া হবে। যুবকল্যাণ দপ্তর তপশিলী জাতিভুক্ত বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছেন, সেই সুযোগের সুষ্ঠুভাবে সদ্ব্যবহার করার আহ্বান রাখেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সভাপতি।

প্রধান অতিথি, বি-ডি-ও মহাশয় বিদেশী ভাষার উপর নির্ভর না করে মাতৃভাষা প্রসারের অঙ্গ হিসাবে সীমিত অর্থের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বাংলা মুদ্রাঙ্কন প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করেছেন, তা কিভাবে সুব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে মতপ্রকাশ করেন।

ইটাহার—পঃ বঃ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার সহযোগিতায় ও ইটাহার ব্লক যুবকরণের ব্যবস্থাপনায় এই ব্লকের মাধ্যমিক স্কুলগুলির (দশম শ্রেণী পর্যন্ত) ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান-চেতনার প্রসার ও সৃজনশীল প্রতিভা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ২০-৭-৮২ তারিখে ইটাহার হাই স্কুলে একটি "প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞান আলোচনা-চক্র" অনুষ্ঠিত হয়। এবারের আলোচ্য বিষয় ছিল 'মহাকাশ ও মানবজাতি'। ঐদিন বেলা ১২টায় এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শ্রীঅজিত কর্মকার, প্রধান শিক্ষক, ইটাহার হাইস্কুল ও প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীচিত্তরঞ্জন আচার্য, প্রধান অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, রায়গঞ্জ কলেজ ও শ্রীরঞ্জিতকুমার রায়, শিক্ষক (পদার্থবিদ্যা) রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুল। এ ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ও স্থানীয় জনসমাগম ঘটে। বিভিন্ন উচ্চ-বিদ্যালয় থেকে মোট ৮ (আট) জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে ও ছয় জনকে পুরস্কার ও প্রশংসা-পত্র প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি শ্রীচিত্তরঞ্জন আচার্য মহাশয় এই বিষয়টির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ও এই ধরনের উদ্যোগের জন্য এই বিভাগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অন্যান্য উপস্থিত অতিথিবৃন্দও এ সম্পর্কে ভাষণদান করেন।

হেমতাবাদ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে পশ্চিম দিনাজপুর জেলাভিত্তিক আবাসিক ভলিবল 'প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির' অনুষ্ঠিত হয় রায়গঞ্জে গত ২০শে জুন '৮২ তারিখ থেকে ৩রা জুলাই '৮২ তারিখ পর্যন্ত। এই আবাসিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবিরে পঃ দিনাজপুর জেলার ১৬টি ব্লকের মোট ৩৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এই ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে এখানকার শিক্ষার্থীরা ভলিবল প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা তৈরী করে নিয়ে তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় কিশোর খেলোয়াড়দের তালিম দিয়ে তাদের ক্রীড়ামানকে উন্নত করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণ দেন প্রখ্যাত এন. আই. এস. ভলি কোচ ও জাতীয় রেফারী শ্রীসুপ্রভাত সরকার। প্রশিক্ষক অত্যন্ত কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ও আন্তরিকতার সাথে তালিম দিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা তেমনি ক্লান্তিহীনভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তালিম নিয়েছেন।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধনী দিনে শিক্ষার্থীদের সাথে পরিচিত হন জেলা যুব-আধিকারিক বৈদ্যনাথ মিশ্র, রায়গঞ্জ মহকুমার ক্রীড়া আধিকারিক সলিল সরকার, মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক দিলীপ বোস প্রমুখ। সকলে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

সমাপ্তি দিনে ৩১ জন শিক্ষার্থীকে সার্টিফিকেট ও একটি করে জার্সি দেওয়া হয়। সার্টিফিকেট বিতরণ করেন রায়গঞ্জ মহকুমা সমাহর্তা অমলেন্দু ঘোষ।

ইসলামপুর—এই যুবকরণের পরিচালনায় সম্প্রতি সপ্তাহব্যাপী (২৪ থেকে ৩০শে জুন) একটি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় (ফুটবল)। প্রতিটি ব্লক থেকে দুজন করে প্রতিনিধি এই শিবিরে অংশ নেন। শ্রীআশীষ চট্টোপাধ্যায়, এন. আই. এস. এবং কলকাতার স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। এ ছাড়া মহকুমাভিত্তিক ২১ দিনের একটি ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৩০শে জুন প্রশিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতা উপলক্ষে বহু ক্রীড়ামোদি উপস্থিত

ছিলেন। প্রধান অতিথিস্বরূপ শ্রীমেওয়ালাল ও শ্রীরমণী সরকার বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে ছিলেন।

ইসলামপুর ব্লক যুবকরণ আয়োজিত হাতে-কলমে টাইপ রাইটিং শেখানোর জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে

শিবিরের কাজকর্মের প্রশংসা করেন। এই ধরনের প্রয়াস অব্যাহত রাখার আবেদন রাখেন শ্রীমেওয়ালাল। পরিচালনা কমিটির সভাপতি স্থানীয় মহকুমা শাসক শ্রীদিলীপ চৌধুরীর সক্রিয় সহযোগিতা উৎসব প্রাঙ্গণকে মুখর করে তোলে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকদের মানপত্র প্রদান করেন শ্রীমেওয়ালাল।

গত ১লা জুলাই তপঃ উপজাতি যুবক-যুবতীদের জন্য ৬ মাসের একটি মুদ্রাক্ষণ প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করা হয়। উপ-মহকুমা শাসক শ্রী এস. কে. পি. টোপ্পো অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীআবদুস সামাদ, সভাপতি, ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতি ও শ্রী এন. ভুটিয়া, স্থানীয় বি-ডি-ও মহাশয়। উপস্থিত সকলে প্রশিক্ষণ শিবিরের সাফল্য কামনা করেন।

২০শে জুলাই থেকে একমাসব্যাপী একটি ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করা হয়। এই যুবকরণের পরিচালনায় এই শিবিরের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে। শিবির উদ্বোধন করেন শ্রী এন. ভুটিয়া, বি-ডি-ও মহাশয়। শিক্ষাস্থায়ী কমিটির কর্মাধ্যক্ষ শ্রীনিতাইপদ সাহা শিক্ষার্থী-দের যুবকল্যাণ বিভাগের কর্মসূচী রূপায়িত করার বাস্তবমুখী উপদেশ দেন। পরিশেষে ব্লক যুব-আধিকারিক শ্রীশক্তিপদ দত্ত শিবিরের সাফল্য কামনা করেন এবং উপস্থিত সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

রায়গঞ্জ—বিগত ৮-৭-৮২ তারিখে রায়গঞ্জ ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে 'রায়গঞ্জ ব্লকের তফশিলী জাতিভুক্ত যুবক-যুবতীদের বাংলা টাইপরাইটিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের' উদ্বোধন করা হয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রাণনাথ দাস। এ ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন সভাপতি প্রাণনাথ দাস, বি-ডি-ও শ্রীনবনী দে, ব্লক যুব-আধিকারিক শেখর পাল।

রায়গঞ্জ ব্লক ছাত্র-বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারী জনৈক প্রতিযোগী

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিয়মাবলী, সময়সূচী ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেন, প্রশিক্ষক শ্রীসমীর দত্ত। শিক্ষার্থীরা মাসিক ৩০, টাকা হিসাবে ভাতা পাবেন।

এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রায়গঞ্জ ব্লকের ১৩টি গ্রাম-পঞ্চায়েতের মোট ২৪ জন শিক্ষার্থী ছয়-মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন এবং এ ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালানোর জন্য দপ্তর থেকে ১৯,১৫০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রাণনাথ দাস তাঁর ভাষণে আরো বলেন যে, যুবকল্যাণ দপ্তরের এ ধরনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে শিক্ষার্থীরা কেবল চাকরীর জন্যই এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন, এটা ভাবলে চলবে না। কেননা বেকার সমস্যা এক জাতীয় সমস্যা, সুতরাং তাদের প্রশিক্ষণ শেষে এই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে স্বনির্ভর হবার বিষয়ে ভাবতে হবে।

রায়গঞ্জ ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে বিগত বছরের মত এ বছরও 'রায়গঞ্জ ব্লকভিত্তিক ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' গত ১৮-৬-৮২ তারিখ থেকে চালু করা হয়েছিল। বিগত ১৮-৭-৮২ তারিখে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমাপ্তি ঘটে। যেহেতু রায়গঞ্জ ব্লক দৈর্ঘ্যে অত্যন্ত বেশী সেদিকে বিবেচনা করে এবার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি দুটি মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। যথা-ক্রমে মহারাজা জগদীশনাথ হাই স্কুলের মাঠে এবং লক্ষনীয়া নজরুল স্মৃতিচক্রের মাঠে। বিগত ১৮ জুলাই নজরুল স্মৃতিচক্রের মাঠে সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়। সমাপ্তি দিনে দুটি কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক 'প্রীতিমূলক' খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলার পর মোট ৫২ জন শিক্ষার্থীকে যুবকল্যাণ দপ্তর থেকে প্রশংসাপত্র বিতরণ করা হয়। প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন রায়গঞ্জ মহকুমার ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক দিলীপ বোস। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন ব্লক যুব-আধিকারিক শেখর পাল, প্রশিক্ষক শিশির (তিনু) গুহ ও দিলীপ বোস। এই একমাস যাবৎ শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন স্থানীয় প্রবীণ খেলোয়াড় শিশির গুহ এবং সহকারী প্রশিক্ষক হিসাবে সহযোগিতা করেছেন তরুণ খেলোয়াড় তপন দেব।

বিগত ২০শে জুলাই '৮২ তারিখে স্থানীয় সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র স্কুলে 'রায়গঞ্জ ব্লকভিত্তিক ছাত্র-বিজ্ঞান আলোচনাচক্র '৮২' অনুষ্ঠিত হয়। এবারের আলোচ্য বিষয় ছিল 'মহাশূন্য ও মানবসমাজ'। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এস. ডি. পি. ইউ. বিদ্যাচক্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত। এই প্রতিযোগিতামূলক আলোচনাচক্রে রায়গঞ্জ করো-নেশন হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীতপন ব্রহ্ম ১ম স্থান এবং বিন্দোল হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীঅসীম রায় ২য় স্থান অধিকার করে 'জেলা ছাত্র-বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে' অংশ-গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে।

অনুষ্ঠানে বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ যথাক্রমে ডঃ হরিদাস ঘোষ, ডঃ সুধাময় দেবমল্লিক ও অধ্যাপক চিন্ময় বসু। প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার এবং প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন জেলা যুব আধিকারিক বৈদ্যনাথ মিশ্র। বিভিন্ন স্কুলে

পরীক্ষা থাকার দরুণ এবার প্রতিযোগীর সংখ্যা খুব নগণ্য ছিল।

রায়গঞ্জ ব্লক ও পৌরসভা এলাকাভুক্ত যে সমস্ত ক্লাবগুলিকে যুবকল্যাণ দপ্তর থেকে জিমন্যাসিয়াম কেন্দ্র তৈরী ও খেলার মাঠ প্রকল্প রূপায়ণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয় তাদের নাম নীচে দেওয়া হলঃ

১। স্বাস্থ্য শক্তি ব্যায়ামাগার, মিলনপাড়া—
টাঃ ৯,২০০ (জিমন্যাসিয়াম বাবদ)।
২। বসিরান মিলন সংঘ, বসিরান—
টাঃ ১৬,৫০০ (খেলার মাঠ বাবদ)।
৩। রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব—
টাঃ ৩৭,৫০০ (খেলার মাঠ বাবদ)।
৪। খেয়ালী সব পেয়েছির আসর, দেবীনগর—
টাঃ ৮,০০০ (জিমন্যাসিয়াম বাবদ)।

মেদিনীপুরঃ

কেশিয়াড়ী—গত ২৪শে জুলাই '৮২ মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী ব্লকে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে "মহাকাশ ও মানবজাতি"-শীর্ষক '৮২ বিজ্ঞান আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হলো স্থানীয় কেশিয়াড়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। এর উদ্যোক্তা ছিল কেশিয়াড়ী ব্লক যুবকরণ ও বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা, ভারত সরকার। এই ব্লকের বিভিন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন। বহু ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও পঞ্চায়েত সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট অতিথির ভাষণে শ্রীগিরীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন যে, বিজ্ঞানীদের কেবলমাত্র মহাকাশের গবেষণায় ব্যস্ত থাকলেই চলবে না। তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের ফসলকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করতে হবে। তিনি একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বুঝিয়ে বলেন যে, কবি শুধু কল্পনা করেন, কবির কল্পনাকে শিল্পীরা তুলির টানে প্রস্ফুটিত করেন। আর এই দুইজনের সৃষ্ট রূপকে বাস্তুকাররা রূপায়িত করেন বাস্তবে। সভাপতির ভাষণে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী বলেন যে, ছাত্র-ছাত্রীদের, বিশেষ করে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের এইরূপ আলোচনাচক্রে যোগ দিতে আহ্বান জানান। তিনি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, প্রত্যেক স্কুলের উচিত বিজ্ঞান আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান করা। তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা আরো ভালভাবে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবে। ব্লক যুব আধিকারিক বলেন যে, প্রতিভা ও সৃজনশক্তির উন্মেষকল্পে বিজ্ঞান আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এই অনুষ্ঠানে বর্তমান বিজ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনা প্রসঙ্গে মূল্যবান আলোচনা করেন। এছাড়া কয়েকজন শিক্ষক বিদ্যালয়ভিত্তিক আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠানের জন্য বক্তব্য রাখেন। তিনি আরো বলেন যে, সরকারী সহযোগিতায় বিভিন্ন স্কুলে এই অনুষ্ঠান হলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে। সভাপতি ও প্রধান অতিথি বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

সাঁকরাইল—গত ২৩শে জুলাই মেদিনীপুর জেলার সাঁকরাইল ব্লকে সাঁকরাইল ব্লক যুবকরণ আয়োজিত এবং বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা, ভারত সরকারের সহযোগিতায় "মহাকাশ ও মানবজাতি" বিষয়ে বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান রোহিণী সি. আর. ডি. হাইস্কুলে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঐ ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠানে ব্লকের ভারপ্রাপ্ত ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরও বলেন, গ্রাম বাংলার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে যে সৃজনশীল বিজ্ঞান প্রতিভা আছে তা খুঁজে বার করাই এর মূল লক্ষ্য। ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সভাপতির আসন অলংকৃত করে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী, বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্থানীয় অধিবাসী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।

নয়াগ্রাম—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব-কল্যাণ বিভাগ এবং বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার যৌথ উদ্যোগে এবং নয়াগ্রাম ব্লক যুবকরণের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় বালিগেড়িয়া এস. সি. হাই স্কুলে—"মহাকাশ ও মানব জাতি" বিষয়ক এক বিজ্ঞান আলোচনা প্রতিযোগিতা হয়ে গেল।

মোট এগারজন প্রতিযোগী ছাত্র এতে অংশগ্রহণ করে। প্রায় দেড়শত ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞানানুরাগী অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীহলধর মাহাত, প্রধানশিক্ষক, বালিগেড়িয়া এস. সি. হাই স্কুল এবং প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় বি. ডি. ও. শ্রীনিরঞ্জন মাহাত।

অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান ব্লক যুব-আধিকারিক শ্রীনিতাই পাল।

কাঁথি-১—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব-কল্যাণ বিভাগ এবং বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার যৌথ উদ্যোগে এবং কাঁথি ১নং ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় ১৯৮২ সালের ব্লক ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাচক্র ২১শে জুলাই কাঁথি ক্ষেত্রমোহন বিদ্যাভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্ষেত্রমোহন বিদ্যাভবনের প্রধান শিক্ষক শ্রীপুলিন দাস এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমনোরঞ্জন বর্মন মহাশয়। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'মহাকাশ এবং মানবজাতি'। সর্বমোট ১০ জন ছাত্র এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রধান অতিথি-মহাশয় ছয় জন বিজয়ী প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করেন। সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিচারকমণ্ডলীর পক্ষে ডঃ রামপদ মিশ্র প্রভাতকুমার কলেজ, অধ্যাপক প্রদীপ ভট্টাচার্য খাজুরী কলেজ, প্রতিযোগিতার বিষয়ের উপর এবং ছাত্রদের বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষের জন্য সুদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন ক্ষেত্রমোহন বিদ্যাভবনের শিক্ষক এবং কাঁথি-৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীবঙ্কু চিত্র সাহু মহাশয়। ব্লক যুব-আধিকারিক শ্রীপ্রভুবনন্দ সান্যাল এই আলোচনা সভার উদ্দেশ্য এবং গ্রাম বাংলার প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তায় উৎসাহ দানে যুবকল্যাণ বিভাগের কর্মপন্থা বিশ্লেষণ করেন।

রামনগর-২—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং এই ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় মালঞ্চ অভিযাত্রী সংঘের খেলার মাঠে গত ২৫।১২।৮১ থেকে ২৬।১।৮২ পর্যন্ত এক মাসব্যাপী একটি ফুটবল কোচিং ক্যাম্প সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়। ৫০ জন শিক্ষার্থীকে এই অনুষ্ঠানে মানপত্র প্রদান করা হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিরূপে যথাক্রমে শ্রীমনোরঞ্জন মাইতি বি. ডি. ও., শ্রীঅজিত কুমার ভুঞ্যা সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি ও শ্রীপাণ্ডুচরণ হাঁসদা যুব-আধিকারিক মহাশয়গণ উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। অভিযাত্রী সংঘের সম্পাদক শ্রীকুলরঞ্জন দাস সংঘের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রশিক্ষক শ্রীহরিপদ গিরি ও শ্রীবিপিনবিহারী পাণ্ডা সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

মালঞ্চ অভিযাত্রী সংঘ গৃহে পশ্চিমবঙ্গ যুব-কল্যাণ বিভাগের আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টায় গত ২১।৩।৮২ থেকে ২০।৬।৮২ পর্যন্ত তিন মাসব্যাপী টেলারিং ও এমব্রয়ডারি বিষয়ে প্রশিক্ষণ শেষ হয়। ১২ জন শিক্ষার্থীকে দক্ষতার জন্য মানপত্র দেওয়া হয়। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ব্লক যুব-আধিকারিক শ্রীপাণ্ডুচরণ হাঁসদা, সম্পাদক শ্রীকুলরঞ্জন দাস, প্রশিক্ষিকা শ্রীমতী আরতি দাস, গ্রামসভার সদস্য শ্রীমুক্তেশ্বর পণ্ডা ছাড়াও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য সকলেই যুবকল্যাণ বিভাগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পাঁশকুড়া-২—গত ৩১শে জুলাই '৮২ পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে পাঁশকুড়া ২ নং ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় জেলা ইউনিয়ন হাই স্কুলে দশম শ্রেণী ছাত্রছাত্রীদের জন্য "মহাকাশ ও মানব সভ্যতা"র উপরে প্রতিযোগিতা-মূলক এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অধিকাংশ স্কুলে অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা অথবা বর্ষাকালীন ছুটি থাকায় প্রতিযোগীর সংখ্যা নগণ্য হলেও উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব ছিল না। মোট ছয়জনকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রথম ও তৃতীয় হন কোলা ইউনিয়ন যোগেন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদ্বয় কুমারী স্মৃতিকণা ঘোষ ও কুমারী কাকলী ঘোষ। দ্বিতীয় হন কোলা ইউনিয়ন হাই স্কুলের ছাত্র শ্রীঅতুন গুচ্ছাইত। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি যথা-

ক্রমে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীবীরভদ্র গোড়ী ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "মহাকাশ ও মানব সভ্যতা"র উপরে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও পরিচালক শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান মহাশয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের আর্থিক সহায়তায় পাঁশকুড়া ২ নং ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে কোলা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত মহিলা সমিতির পরিচালনায় সমিতি গৃহে ছয়-মাসব্যাপী মহিলাদের সীবন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে গত ১লা জুন '৮২ থেকে শুরু হয়েছে। ৩৫ জন দুস্থ অল্পশিক্ষিতা মহিলারা এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রচন্ড উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করছেন। স্থানীয় ব্লক যুব-আধিকারিক শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান এই সমস্ত কেন্দ্রের সফল শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমবায় ভিত্তিতে স্বনির্ভরশীল প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। তিনি ইতিমধ্যে জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে দাবী জানিয়েছেন যে, এই সমস্ত প্রশিক্ষণকেন্দ্রের সফল শিক্ষার্থীদের আই. আর. ডি. পি. প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়নে সাহায্য করা হোক। এ ব্যাপারে জেলা পরিষদের সভাধিপতি মহাশয় সুবিবেচনার আশ্বাস দেন।

নেতাজী ইয়ুথ ক্লাব, দিগলাবাড় সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র ও মহারুদ্র স্পোর্টিং ক্লাবের সক্রিয় পরিচালনায় সিন্ধা শশী শ্রীপতি বিদ্যাভবন মাঠে সিন্ধা ১ নং, সিন্ধা ২ নং, সাগরবাড়, জুলশিটা ও বৃন্দাবনচক পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বিভিন্ন যুব সংগঠনের ১৫ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক ৫০ জন কিশোরকে নিয়ে ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করা হয় গত ২১শে জুলাই। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা কমিটির সভাপতি তথা সিন্ধা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীমদন মহাপাত্র মহাশয়। সভাপতি মহাশয় পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শিক্ষার্থীদের টিফিন বাবদ কিছু আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। নেতাজী ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি তথা স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক শ্রীশম্ভুচরণ মাইতি মহাশয় গোলাপ ফুলের গুচ্ছ দিয়ে ৫০ জন শিক্ষার্থীকে এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্মচারী ও নিয়মিত খেলোয়াড় তথা প্রশিক্ষক শ্রীমনোজ ত্রিবেদীকে স্বাগত জানিয়ে যুব-কল্যাণ বিভাগের এই ধরনের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ফুটবল প্রশিক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক তথা স্থানীয় ব্লক যুব-আধিকারিক শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান জানান যে, এই ধরনের আরো ৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পাঁশকুড়া ২ নং ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে সংগঠিত করা হবে আসন্ন দুর্গাপূজার পূর্বে ও পরে। তিনি বলেন শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় এই ধরনের প্রকল্প সফল হয় না। চাই স্থানীয় যুবকদের ও জনসাধারণের আন্তরিক প্রয়াস ও সহযোগিতা। তিনি আরো জানান যে, এই সমস্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে সফল শিক্ষার্থীদের নিয়ে সত্বর জেলাভিত্তিক আবাসিক প্রশিক্ষণ সুরু করা হবে।

দাসপুর-১—ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় বিজ্ঞান আলোচনা চক্র, গত ২১।৭।৮২ তারিখে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে কলোড়া হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। এ বৎসরের আলোচনার বিষয় ছিল 'মহাকাশ ও মানুষ'। স্থানীয় এলাকার আটটি উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১২ জন প্রতিযোগী আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করে। বিচারকমন্ডলীর রায়ে সেরা প্রতিযোগী নির্বাচিত হয় বাসুদেবপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠের দশম শ্রেণীর ছাত্র সমীর চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কলোড়া হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র চরনকুমার ভট্টাচার্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য প্রথম স্থানাধিকারী সমীর চট্টোপাধ্যায় আগামী ১০।৮।৮২তে মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিতব্য জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে।

বিগত ২৪।৩।৮২ তারিখে রাজনগর গ্রামে যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু হয় সম্প্রতি তা সুষ্ঠু-ভাবে শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণ শিবিরে ১৮ জন তপশীলী যুবক শিক্ষণ শেষ করেছে। শিক্ষণ শেষে সফল শিক্ষার্থীদের প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়েছে।

সুরতপুরে পোল্ট্রী ফার্মে ৪ মাসব্যাপী শিক্ষা-কার্যক্রম সমাপ্তির পথে। আগামী ২০শে আগষ্ট এই শিক্ষণ মেয়াদ শেষ হবে। এই শিক্ষাক্রমে ছাত্র সংখ্যা ১৬ জন।

অভূতপূর্ব উৎসাহের মধ্যে দাসপুর-১ ব্লকে গত ২৩ ও ২৪ জুলাই দুটি ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির ও একটি খো-খো, কবাডি প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির বসেছে সাগরপুর ও টালিভাটা গ্রামে। সাগরপুর শিবিরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৭ জন। এখানে প্রশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত আছেন শ্রীতপন মিত্র। এই শিক্ষণ শিবির পরিচালনায় সহযোগিতা করছেন ফ্রেন্ডস্ ইউনিয়ন। টালিভাটা শিবিরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫২ জন। এইখানের প্রশিক্ষক বাগ্‌বুল ইসলাম। স্থানীয় যুব সংস্থা বাণী ব্যায়াম সংঘ এই কর্ম-সূচীতে সহযোগিতা করছে।

কবাডি ও খো-খো শিবিরটি তেমুয়ানী সবুজ সংঘের সহায়তায় তেমুয়ানী ফুটবল মাঠে ৪৭ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে শুরু হয়েছে। এখানে প্রশিক্ষক হিসাবে আছেন শ্রীঅনন্ত খামরুই। সমস্ত ক্রীড়া প্রশিক্ষণগুলিই ১৪ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য এবং মেয়াদ ১ মাসের।

পাঁশকুড়া ২নং ব্লকের সীবন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের ছবিতে দেখা যাচ্ছে

সুতাহাটা-২—যুব-কল্যাণ বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে তপসিলীভুক্ত যুবকদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে বৃত্তিমূলক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে সুতাহাটা ২ নং ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় সাইকেল মেরামতী প্রশিক্ষণ শিবিরে সম্প্রতি ১৫ জন তপসিলী যুবক চারমাসব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলো।

এই ব্লকের পরিচালনায় গত ১৩ই জুলাই স্থানীয় চকদ্বীপা উচ্চতর বিদ্যালয়ে 'মহাশূন্য ও মানবপ্রকৃতি' বিষয়ক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট এই শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানটির প্রতি অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলিই ঠিকমত সাড়া দিতে পারে নি।

নদীয়া

কৃষ্ণনগর-২—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব-কল্যাণ বিভাগের কর্মসূচী অনুযায়ী স্থানীয় এলাকার কর্মহীন তরুণ ও তরুণীদের স্বনিযুক্তিতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণনগর ২ নং ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় ১৮ই জুন ১৯৮২ থেকে তপশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত যুবক ও যুবতীদের জন্য

সুতাহাটা ২নং ব্লকের সাইকেল মেরামতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৬ মাসের ইংরাজী ও বাংলা টাইপ রাইটিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন কৃষ্ণনগর ২ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীআনন্দমোহন তরফদার। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে মোট ২৫ জন যুবক ও যুবতী প্রশিক্ষনার্থী হিসাবে যোগদান করে। প্রত্যেকে প্রতি মাসে ৩০ টাকা হারে স্টাইপেন্ড পাবে।

অন্যান্য বছরের মত এ বছরও যুব-কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালা ভারত সরকারের সহযোগিতায় এবং কৃষ্ণনগর ২ নং ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় প্রতিযোগিতামূলক ব্লক বিজ্ঞান আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠানটি গত ২০শে জুলাই '৮২ ধুবুলিয়া সুভাষচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শ্রীমতী লিলি সাহা, প্রধান শিক্ষিকা সুভাষচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, ধুবুলিয়া। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীআনন্দমোহন তরফদার, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, কৃষ্ণনগর-২, ধুবুলিয়া, নদীয়া। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসনজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মহকুমা তথ্য আধিকারিক, কৃষ্ণনগর, সদর। বিজ্ঞান আলোচনায় ৮ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। 'মহাকাশ ও মানবজাতি' বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে আলোচনা হয়। উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার প্রসার ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধন করা। ব্লক যুব-আধিকারিক শ্রীসিতাংশুশেখর জানা সমাগত অতিথিবৃন্দ ও শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রেষ্ঠ দুইজন প্রতিযোগী জেলা বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে প্রতিনিধিত্ব করবে।

কৃষ্ণনগর-২ নং ব্লকের তরুণ ও তরুণীদের সুস্থিত, সুশৃংখল ক্রীড়াকৌশল নৈপুণ্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব-কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং কৃষ্ণনগর ২ নং ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় গত ২১শে জুলাই ১৯৮২, ৩০ দিনের ফুটবল ও খো খো (বালক ও বালিকাদের জন্য) প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ধুবুলিয়া 'সব পেয়েছির আসর' প্রাঙ্গণে। ঐ অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীআনন্দমোহন তরফদার, কার্যনির্বাহী আধিকারিক কৃষ্ণনগর ২নং পঞ্চায়েত সমিতি। উদ্বোধনী ভাষণ দেন মনসুর আলি নস্কর, সহ-সভাপতি কৃষ্ণনগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি ধুবুলিয়া, নদীয়া। কার্যনির্বাহী আধিকারিক এবং সহ-সভাপতি তরুণ ও তরুণীদের ভবিষ্যৎ নিয়ম শৃংখলা ও জাতির গঠনের কাজে ক্রীড়া নৈপুণ্যের কথা বিশদভাবে আলোচনা করেন। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীশিশিরকুমার মন্ডল ও শ্রীপঙ্কজকুমার বিশ্বাস (ফুটবল) এবং শ্রীক্ষুদিরাম দাস ও শ্রীমতী তন্দ্রা রায় (খো খো)।

ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫০ জন তরুণ অংশগ্রহণ করে। খো খো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বালক বিভাগে ৫০ জন ও বালিকা বিভাগে ৩০ জন।

প্রশিক্ষণ শিবিরে ১৪টি ক্লাবের সদস্য অংশগ্রহণ করে।

ব্লক যুব আধিকারিক ক্লাবের সম্পাদক অতিথিবৃন্দ ও তরুণ-তরুণীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব-কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং কৃষ্ণনগর ২ নং ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় গত ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮১ থেকে ১৪ই এপ্রিল ১৯৮২ পর্যন্ত তপশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত ৪ মাসের জন্য সাইকেল মেরামতী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মনসুর আলি নস্কর, সহ-সভাপতি কৃষ্ণনগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি। ঐ প্রশিক্ষণ শিবিরের ২০ জন যুবক অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেককে ৩০ টাকা করে মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়।

চার মাস প্রশিক্ষণের পর দুইজন বেকার যুবক সাইকেল মেরামতী কাজে নিজস্ব দোকান করেছে। প্রতি মাসে প্রত্যেকে ৩০০ (তিনশত টাকা) করে রোজগার করছে। তাঁদের নাম ও ঠিকানা নীচে দেওয়া হলঃ

(১) শ্রীদুলালচন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম—বেলপুকুর, পোঃ—বেলপুকুর, জেলা—নদীয়া। সাইকেল মেরামতীর দোকান বেলপুকুর বাজার।

(২) শ্রীঅনিলচন্দ্র তাফালি, গ্রাম—তাতলা, পোঃ—তাতলা, জেলা—নদীয়া। সাইকেল মেরামতীর দোকান তাতলা বাজার।

অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও **নবদ্বীপ ব্লক যুবকরণ** আয়োজিত যুব-কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ও বিড়লা শিল্প কারিগরী সংগ্রহশালার যৌথ উদ্যোগে নবদ্বীপ ব্লকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক বিজ্ঞান আলোচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলে গত ২৭শে জুলাই, ১৯৮২ তারিখে। আলোচনার বিষয় ছিল "মহাকাশ ও মানব জাতি"।

এই আলোচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে কুমারী রত্না রায় ও কুমারী বর্ণালী মজুমদার। উভয়েই জেলা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে। দুজনেই নবদ্বীপ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীকরুণাময় পাল। বক্তব্য রাখেন নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীমুকুলবিকাশ সাহা মহাশয়। পুরস্কার বিতরণ করেন ডাঃ কানাইলাল সাঁই। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন শ্রীতরুণবিমান চট্টোপাধ্যায়, ব্লক যুব-আধিকারিক, নবদ্বীপ, নদীয়া।

২৪-পরগণা

মথুরাপুর-২—সমষ্টি যুবকরণ, যুব-কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহালয়ের (ভারত সরকার) যৌথ উদ্যোগে বাড়ীভাঙ্গা বামাচরণ বিদ্যাপীঠ, কোম্পানীর ঠেক-এর ব্যবস্থাপনায় বাড়ীভাঙ্গা বামাচরণ বিদ্যাপীঠে ইংরাজী ৩রা জুলাই অনুষ্ঠিত হল প্রতিযোগিতামূলক ছাত্রদের বিজ্ঞান আলোচনাচক্র। আলোচ্য বিষয় ছিল "মহাকাশ ও মানবজাতি"।

আলোচনাচক্রে প্রথম স্থান অধিকার করে অরুণকুমার মন্ডল এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পার্থ দাসগুপ্ত। দুইজনই খাড়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। বিচারকরূপে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ইনস্টিটিউসনের শিক্ষক শ্রীতাপসকুমার দাস, কাশীনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীঅজিত কুমার মিদ্যে এবং শ্রীঅঞ্জন দত্ত মহাশয়।

ছাত্র, শিক্ষক, সরকারী আধিকারিক ও অন্যান্য শিক্ষানুরাগী প্রায় ৩০০ জন শ্রোতা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদের প্রতিযোগিতামূলক আলোচনাচক্র শেষে বিচারকবৃন্দ

এবং আগ্রহী শিক্ষক শ্রীহরিসাধন মণ্ডল এই বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন।

সভার প্রধান অতিথি মথুরাপুর-২ নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীনির্মলকুমার মণ্ডল পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন এবং সভার সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীপতিতপাবন গাতাইত এরূপ অনুষ্ঠানের জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন এবং মথুরাপুর-২ নং সমষ্টি যুব-আধিকারিক শ্রীগোবর্ধনদাস গোস্বামী সবাইকে অভিনন্দন জানান।

বিষ্ণুপুর-২—পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে, ভারত সরকার শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার সহযোগিতায় এবং বিষ্ণুপুর ২নং ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় বিষ্ণুপুর শিক্ষা সংঘে ১৪ই জুলাই ১৯৮২ 'মহাকাশ ও মানব' সম্বন্ধে এক বিজ্ঞান আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জে. এন. সিংহ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ স্বপন সুর, অধ্যাপক বিদ্যানগর কলেজ। বিষ্ণুপুর ১নং পঞ্চায়েতের সভাপতি মণিমোহন ব্যানার্জী, বিষ্ণুপুর ১নং ও ২নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকদ্বয়ও উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী, ১০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ১৫ জন অভিভাবক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করে। আমতলা নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী তাপসী মণ্ডল প্রথম, বিদ্যানগর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী বনানী চ্যাটার্জী দ্বিতীয় ও উদয়পুর পল্লীশ্রী শিক্ষায়তনের ছাত্র কৌশিক মাইতি তৃতীয় স্থান অধিকার করে। আরও ৩ জন ছাত্রীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রধান বিচারক ডঃ দেবেশ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক, ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ, তাঁর বক্তব্যে বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন এবং স্থানীয় গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এ ধরনের সুন্দর আলোচনা চক্রের ব্যবস্থাপনার জন্য বিভাগীয় প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসুনীলকুমার চ্যাটার্জী তার বক্তব্যে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার প্রসারকল্পে বিভাগীয় প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। প্রথম ৬ জনকে পুরস্কার ও মানপত্র দেওয়া হয়।

এই ব্লকে গত ২১.৭.৮২ তারিখে বুড়ির-পোলে (বাখরাহাট) বিবেকানন্দ ব্যায়াম সংসদের গৃহে ৩ মাসের কাপড় ছাপার এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন বিষ্ণুপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীবৈদ্যনাথ মণ্ডল। এই কেন্দ্রে ২২ জন তপশীল পুরুষ ও মহিলা শিক্ষাগ্রহণ শুরু করেন। ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসুনীলকুমার চ্যাটার্জী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে তপশীল জাতির আর্থিক উন্নয়নে সরকার তথা যুবকল্যাণ বিভাগের প্রচেষ্টার বিবরণ দেন।

হাসনাবাদ—ব্লক যুবকরণ, হাসনাবাদ, ২৪ পরগণা পরিচালিত এক মাসব্যাপী একটি ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির গত ২৬.৪.৮২ তারিখ শুরু হয়। রাজাপুর লোটাস ক্লাব ময়দানে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে মুরারীশাহা, মাখালগাছা, ভেবিয়া প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েত হতে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় মুরারীশাহা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনাব মহঃ মশীহর রহমান সাহেবের সক্রিয় সহযোগিতায় এক ম্যাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবির এতদাঞ্চলের ফুটবলপ্রেমী কিশোর, যুবক, ছাত্রদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

হুগলী

সিঙ্গুর—গত ১৪ই জুলাই '৮২ সারদাপল্লী কন্যা বিদ্যাপীঠে সিঙ্গুর ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় 'মহাকাশ ও মানবজাতি' বিষয়ে ব্লক পর্যায়ের বিজ্ঞান আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ল। পাঁচটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ব্লক যুব আধিকারিক নারায়ণচন্দ্র দাশ বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। আগামী দিনের আলোচনা চক্রগুলিতে যাতে আরও বেশী সংখ্যক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে তার অনুরোধ জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, যুবকল্যাণ বিভাগের জনসংযোগ আধিকারিক শ্রীসৌমিত্র লাহিড়ী। প্রধান অতিথি চন্দননগর কলেজের অধ্যক্ষ বসন্তকুমার সামন্ত সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী যথাক্রমে শ্রীমতী বর্ণালী রায় ও শ্রীমতী শুক্লা মৈত্র হুগলী জেলা বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করবে। ঐদিন বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রীহরিনারায়ণ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক শ্রীঅভয়পদ ভট্টাচার্য।

গত ১৭ই জুলাই খলিসানী গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে রেডিও মেরামত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন হুগলী জেলা পরিষদ সদস্য শ্রীবলাইচন্দ্র সাঁবুই। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা-স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শ্রীবলদেব ঘোষ। প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাস। প্রশিক্ষণের জন্য ২০ জন শিক্ষার্থীকে মনোনীত করা হয়। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছয় মাস। প্রশিক্ষণ শেষে সফল শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে সুযোগ দানের ব্যবস্থা করা হবে বলে ব্লক যুব আধিকারিক জানান।

গত ১৩ই জুলাই ১৩-১৬ বৎসর বয়সের গ্রামীণ যুবকদের এক মাসের ভলিবল প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হয় দলুইগাছা বালী সংঘের মাঠে। ২০ জন যুবক এতে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন এন. আই. এস. কোচ শ্রীসীতারাম ঘোষ।

গত ১৭-৭-১৯৮২ তারিখে শনিবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে চণ্ডীতলা ১নং ব্লকের অন্তর্গত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিজ্ঞান আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় জঙ্গলপাড়া কে. ডি. হাই স্কুলে। এই আলোচনা চক্রে ব্লকের ৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫টি বিদ্যালয়ের ৬ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। আলোচনা চক্রে বিচারকের আসনে উপস্থিত ছিলেন চণ্ডীতলা ২নং ব্লকের অন্তর্গত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চণ্ডীতলা ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমকুলেশ্বর চ্যাটার্জী। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, চণ্ডীতলা-১।

প্রতিযোগিতার শেষে পুরস্কার বিতরণী সভায় ডানকুনি রামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রমের সহকারী শিক্ষক শ্রীআশুতোষ মুখার্জী মহাশয় এরূপ উদ্যোগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিজ্ঞান আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে সহজ ও সাবলীল ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তিনি মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। গ্রামাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের এই আলোচনায় আগ্রহী হয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। সভার সভাপতি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা খুবই আশার কথা। সকল ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ভবিষ্যতে ব্যাপক ভাবে অংশগ্রহণ করে তার জন্য তিনি আহ্বান জানান। সভায় প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম দুজন, কুমারী রত্না মিত্র ও শান্তনু সরকার হুগলী জেলা বিজ্ঞান আলোচনায় যোগদান করার জন্য নির্বাচিত হয়।

বীরভূম

দুবরাজপুর ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে ২৪শে জুলাই '৮২ শনিবার, দুবরাজপুর গার্লস হাই স্কুলে বিজ্ঞান আলোচনাচক্র প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিল 'মহাকাশ ও মানবজাতি'। এই অনুষ্ঠানে এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন যথাক্রমে শ্রীমতী নিবেদিতা দত্ত (প্রধান শিক্ষিকা দুবরাজপুর গার্লস হাই স্কুল) এবং ডাঃ এ. কে. গুপ্ত (নিরাময় হাসপাতাল, দুবরাজপুর)। বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগোপাল মজুমদার, হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীদীপ্তিসাধন বসু মহাশয়। বিজ্ঞান আলোচনাচক্র প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে শ্রীবিশ্বজিৎ দে, দ্বিতীয় শ্রীমতী মনিষা আশ এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা চন্দ্র। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীরা এই আলোচনা চক্রে উপস্থিত ছিলেন। সর্বোপরি দুবরাজপুর গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রীরা অনুষ্ঠান শুরুতে যুবকল্যাণ বিভাগকে বিভিন্ন ব্যাপারে সহযোগিতা করে। অনুষ্ঠানে

বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি ডাঃ এ. কে. গুপ্ত, অধ্যক্ষ শ্রীগোপাল মজুমদার ও ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীশক্তিশংকর ভট্টাচার্য। সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে সভার কাজ শেষ হয়।

জলপাইগুড়ি

গত ৪ঠা জুলাই ১৯৮২ তারিখে স্থানীয় ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয়ে জলপাইগুড়ি জেলা বিজ্ঞান আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শ্রীত্রিভঙ্গ দত্ত, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) মহাশয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শ্রীদীগেন খাসনবিশ, সভাধিপতি, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ ও শ্রীসুকুমার দাস, অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা, জলপাইগুড়ি মহাশয়দ্বয়।

অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়ি জেলার ১১টি ব্লকের ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ২২ জন ছাত্র-ছাত্রী "মহাকাশ ও মানবজাতি" বিষয়-এর উপর আলোচনাচক্র প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীগণ দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

পুরস্কার বিতরণী সভায় অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা শ্রীসুকুমার দাস মহাশয় তাঁর তথ্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন এবং সফল ৬ জন প্রতিযোগীর হাতে পুরস্কার ও মানপত্র তুলে দেন।

নিম্নে সফল প্রতিযোগীদের নামের তালিকা দেওয়া হলো—

১। শ্রীঅভিজিৎ দেব—মেটেলি উচ্চবিদ্যালয় —প্রথম
২। শ্রীঅরুণ শ্রীবাস্তব—কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, হাসিমারা—দ্বিতীয়
৩। শ্রীমতি জয়ন্তী ভট্টাচার্য—সুভাষিণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, মাল—তৃতীয়
৪। শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ—শক্তিগড় বিদ্যাপীঠ —চতুর্থ
৫। শ্রীমতি স্বর্ণালী রায়—মেটেলি উচ্চ বিদ্যালয় —পঞ্চম
৬। শ্রীকৌশিক দত্ত—শক্তিগড় বিদ্যাপীঠ—ষষ্ঠ

মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর ব্লকের কতবেলতলায় মেসার্স কল্পনা ডায়ার্স এণ্ড প্রিন্টার্স-এ ব্লকের ২৩ জন তপশিলী যুবক/যুবতী কাপড় ছাপার কাজ শিখছেন। প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে গত ১৮.৬.৮২ থেকে। চলবে ১৯.১০.৮২ পর্যন্ত। মোট চার মাসের প্রশিক্ষণ। শিক্ষার্থীরা মাসে ত্রিশ টাকা হিসাবে স্টাইপেণ্ড পাবে। কাজ শেখার প্রতি এদের খুবই উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এরা সবাই বেকার। এই প্রশিক্ষণ ভবিষ্যতে এদের স্বনির্ভুক্তির পথ সুগম করবে।

কাবাডি প্রশিক্ষণ শিবির—বহরমপুর ব্লকের গোয়ালজান পল্লীশ্রী ক্লাবের মাঠে গত ১১.৫.৮২ হতে ৯.৬.৮২ পর্যন্ত ১ মাস যাবৎ ৩৬ জন ছেলে কাবাডি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। সফল শিক্ষার্থীদের মানপত্র প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষক ছিলেন শ্রীপ্রকাশ দাস, Under Study Coach.

যোগাসন প্রশিক্ষণ শিবির—গোয়ালজান পল্লীশ্রী ক্লাবের গত ১৪.৬.৮২ হতে ২৮.৬.৮২ পর্যন্ত ১৫ দিন যোগাসন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ৫৩ জন ছেলে ও মেয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

মানপত্র প্রদান করা হয় ৩২ জনকে। প্রশিক্ষক ছিলেন সর্বভারতীয় যোগাসন সংস্থার সদস্য শ্রীঅজয় মাঝিঠিয়া।

ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির—বহরমপুর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ভবন (Central State Welfare Home) মাঠে গত ১৫.৬.৮২ হতে ১৪.৭.৮২ পর্যন্ত ১ মাস ফুটবল প্রশিক্ষণ চলে। ৬৯ জন ছেলে এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। মানপত্র দেওয়া হয় ৪৮ জনকে। মানপত্র প্রদান করেন জেলা যুব আধিকারিক শ্রীঅধীররঞ্জন ঘোষ মহাশয়।

প্রশিক্ষক ছিলেন শ্রীদুর্গাপদ গাঙ্গুলী, N.I.S.

পুরুলিয়া

গত ২৮শে জুলাই '৮২ **পুঞ্চা ব্লক** পর্যায়ের বিজ্ঞান আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান লোলাড়া আর. সি. একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। ব্লকের সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করলেও অনুষ্ঠানটি ছাত্র-ছাত্রীদের তথা স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রভূত সাড়া জাগায়। উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী, আমন্ত্রিত অতিথি ও জনসমাগমে বিদ্যালয়ের জিমনাসিয়াম হল পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় লোলাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীশংকরপ্রসাদ ঘোষ আলোচনা সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পঞ্চায়েৎ সমিতির সদস্য শ্রীনকুল পাত্র মহাশয়। বিচারক-মণ্ডলীর তরফ থেকে লোলাড়া আর. সি. কলেজের অধ্যাপক অশোক ব্যানার্জী আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীপ্রফুল্ল দাস এ ধরনের আলোচনাচক্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিজয়ী সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন—ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা বিকাশে এ ধরনের আলোচনাচক্রের ব্যাপক বিস্তার প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষানুরাগীদের কাছে এই প্রতিযোগিতা খুব আকর্ষণীয় হয়।

বাঁকুড়া

বড়জোড়া—গত ১৫ই জুলাই বড়জোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে (দশম শ্রেণী পর্যন্ত) ব্লক বিজ্ঞান আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। বড়জোড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকমহাশয় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। বি. ডি. ও., পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও স্থানীয় যুব-ছাত্র সংস্থাগুলিকে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিষয়বস্তু ছিল—'মহাকাশ ও মানবজাতি'। ৭ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম দুজন কান্তিরাম লাড়ুই (দধিমুখা উচ্চ বিদ্যালয়) ও দেবাশীষ মিত্র (বড়জোড়া উচ্চ বিদ্যালয়) জেলা প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য নির্বাচিত হয়।

হাওড়া

বাগনান-২—অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও মহাসমারোহে ব্লক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হ'ল সম্প্রতি যুব-কল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে (২২শে জুলাই)। ৭টি বিদ্যালয় থেকে 'মহাকাশ ও মানবজাতি' বিষয়বস্তুর উপর আলোচনায় যোগ দেয় ৯ জন। ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্য প্রায় ৫০০ জন শ্রোতা আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন। যুগকল্যাণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সামতা শরৎচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী জয়ন্তী মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বিচারক হিসাবে ছিলেন শ্রীগৌর দত্ত (অধ্যাপক, শ্যামপুর মহাবিদ্যালয়), শ্রীহরিহর চৌধুরী (শিক্ষক, পানিত্রাস বিদ্যালয়) এবং শ্রীমনোজ মান্না (শিক্ষক, যুগকল্যাণ বিদ্যালয়)। প্রথম দু'জন প্রতিযোগীকে জেলা বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে যোগদান করার জন্য মনোনীত করা হয়। সব প্রতিযোগীকেই মানপত্র দেওয়া হয়।

আকুপাংচার চিকিৎসা সম্পর্কে

'যুবমানস' জুন '৮২ সংখ্যার আলোচনা বিভাগে ডাঃ বিজনকুমার মজুমদার-এর 'আকুপাংচার—চীনে ও ভারতে' শিরোনামের নিবন্ধটির জন্য ধন্যবাদ। লেখক বেশ সুন্দর-ভাবেই 'আকুপাংচার'—এই চিকিৎসা পদ্ধতিটি সম্পর্কে এক মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন।

'আকুপাংচার' কথাটি বেশ পরিচিত হলেও এ সম্পর্কে আমার জ্ঞানের বহর খুব কমই। তাই বলতে পারি যে এই আলোচনাটি আমার জিজ্ঞাসু মনের খোরাক অনেকটাই মিটিয়েছে।

উপরোল্লিখিত নিবন্ধটি পড়ে এটুকু জানতে পারলাম যে, অনেক ক্ষেত্রে 'আকুপাংচার'-এর কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হলেও এর কর্মপদ্ধতি বা কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য এখনও জানা যায় নি। তবে এই চিকিৎসা-পদ্ধতিটি গোটা বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞান মহলে সাড়া জাগিয়েছে এবং এর ওপর ব্যাপক গবেষণাও চলছে। সীমিত জ্ঞানে আমার এটুকুই মনে হয় যে, 'আকুপাংচার' সম্পর্কে নানান তথ্য অজ্ঞাত থাকার (বিশেষ করে এর কর্মপদ্ধতি) বা স্পষ্ট-ভাবে না জানা যাওয়ায় বেশ কিছু মানুষের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস দেখা দিচ্ছে যার ফলে আমাদের দেশে এই চিকিৎসার জনপ্রিয়তা কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। যদিও লেখক এর পিছনে আমাদের ভারত সরকারের উদাসীনতা ও অন্যান্য কারণও তুলে ধরেছেন। একদিকে যখন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড প্রভৃতি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলি চীন থেকে আকুপাংচার সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষা নিচ্ছে ঠিক তখন আমরা এ সম্বন্ধে চীনের উন্নত জ্ঞান থেকে কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছি তা একটি ছোট্ট পরিসংখ্যানের মধ্য দিয়ে লেখক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। এটা সত্যিই আমাদের কাছে দুঃখের বিষয়। কেননা আকুপাংচার চিকিৎসা-পদ্ধতি আমাদের দেশের মত গরীব দেশের কল্যাণকরই বটে। আকুপাংচার-এর গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা উল্লেখ করে লেখক বলেছেন যে, এই পদ্ধতি সহজ, সরল ও সুলভ এবং সর্বোপরি পোলিওমায়েলাইটিস প্যারালিসিস প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। অর্থাৎ এই চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রতিবন্ধীদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ একথাও বলা যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে বিচার করে পরিশেষে তাই বলছি, আমাদের দেশেও অবিলম্বে আকুপাংচার-এর ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও ব্যাপক গবেষণা এবং দেশের প্রতিটি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি চিকিৎসাকেন্দ্রে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। আর এ জন্য সরকারের যেমন দায়িত্ব থাকা দরকার তেমনই সাধারণ মানুষেরও এই 'আকুপাংচার' পদ্ধতি প্রসারের ক্ষেত্রে সমদায়িত্ব-বোধ থাকা দরকার।

রাজীবকুমার দাস
প্রযত্নে, অনিমা বিশ্বাস
২/৫৬ মহাজাতি নগর
বিরাটি, কলকাতা ৫১

[বিহন : ২০ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

অমন পতিত নিষ্ফলা জমিতেও একদিন হেসে উঠলো শরের রক্ত-মাংসের অস্তিত্বের মতো অমোঘ ধান, গম, নানা শস্যদানা। ক'টি তাজা জীবনের বিনিময়ে অগণ্য মানুষের বেঁচে বর্তে থাকার নিশ্চয়তা হতে দেখে কায়েমী স্বার্থ-বাজরা দুশ্চিন্তায় পড়লো। বৃদ্ধ দুলনের নির্ভুল টাঙির ঘায়ে আরও একটা লাশ লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। সে লাশ জমিদার লছমন সিংয়ের। দুলন তার সেই সংগ্রামী মানুষের লাশ পোঁতা পবিত্র শ্রেণী শত্রুর লাশ পুঁততে দিল না। শেয়াল-শকুনের ছিঁড়ে খাবার জন্য ফেলে দেওয়া হল মানুষের রক্তচোষা দেহটাকে।

নাট্যরূপ ও নির্দেশক বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে নাটকে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। নাটকের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চরিত্র এবং সূত্রধর মঞ্চের নাট্য গতিধারা থেকে মাঝে মাঝে সরে এসে দর্শকদের কাছে বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যমে 'নাট্য' মুহূর্ত সৃষ্টির চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই তেমন তাৎপর্যবহ হতে পারে নি। যাত্রার বিবেক অর্থাৎ অপেরা রীতির এই প্রয়োগ নাটকে কতখানি গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে নির্দেশকের চিন্তার অবকাশ আছে। আজকের নাটকে এমন সরল বোধ্যতা সৃষ্টির প্রয়াস কিছুটা ক্লান্তি-করও বটে। দলীয় অভিনয়ের মান আরও উন্নত করার সুযোগ আছে। আবহসংগীত ও নেপথ্য-কণ্ঠ সংগীত নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টির বিশেষ সহায়ক হয়েছে। মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনটা পারম্পর্যগত ভাবে নাটকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলার প্রয়োজন আছে। মঞ্চ পরিকল্পনা এই নাটকের একান্ত প্রশংসার দিক। নাটকের পরি-বেশের সাথে দর্শক সাধারণ সহজেই সম্পৃক্ত হয়ে যাবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অভিনয়ে দুলন গঞ্জুর ভূমিকায় কল্লোল মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শক সহজে ভুলতে পারবেন না। নাট্যকাহিনীর সাথে তিনি নিজেকে একাত্ম করতে পেরেছেন। লছমন সিং চরিত্রে বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুটা টাইপ ধর্মী। অন্যান্য ভূমিকায় পীযূষ চক্রবর্তী, শৌভিক মিত্র, রঞ্জিৎ বিশ্বাস, সুব্রত দাশগুপ্ত ও মহুয়া চক্রবর্তীর অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য।

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

গ্রাহক হতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৭ টাকা। ষান্মাসিক চাঁদা সডাক ৩·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যার দাম ৪০ পয়সা।

বিশেষ সংখ্যার জন্য কোন অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না। পত্রিকা প্রেরণের জন্য ডাক ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করবে।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

সহ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০০০১।

এজেন্সি নিতে হ'লে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০%
১৫০০-এর উর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০%
৫০০০-এর উর্ধ্বে	৪০%

১০টি সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

সহ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবি করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিক-গুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য বিজনেস ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে

Reg. No. 32875/78 Postal Reg. WB/CC-15

নাগরিক সম্বর্ধনায় উদ্বেলিত দুই স্তাহন প্রতিনিধি সাদেক-আল-সাফ এবং আবদুল করিম মুস্তাফা
ফোটোঃ রতন দাশগুপ্ত
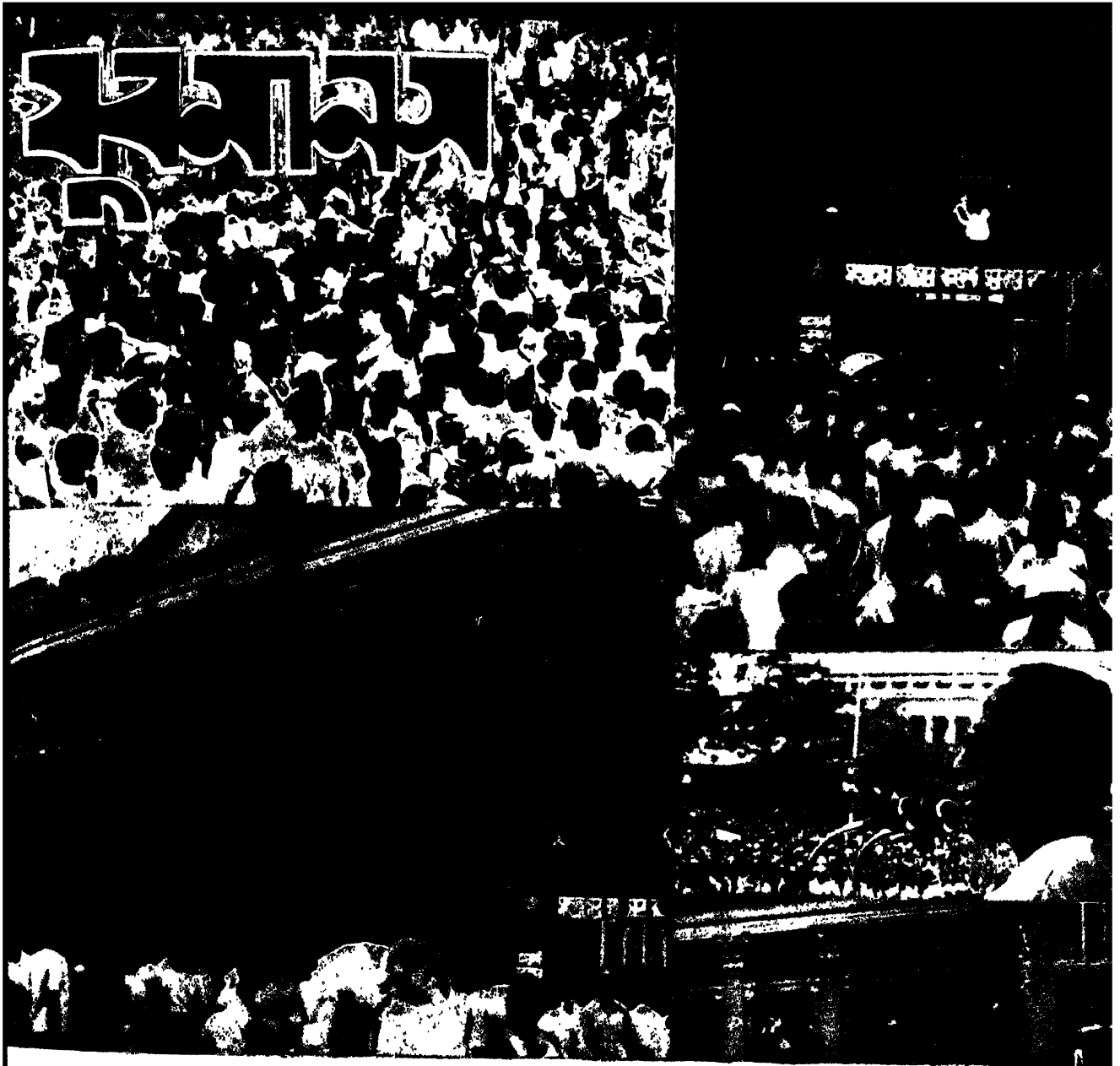
আমাদের চলার পথে জনগণই বড় শক্তি

২৬শে জুন দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রীজ্যোতি বসুকে শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন রাজ্যপাল শ্রীভৈরবদত্ত পান্ডে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
জুন, '৮২

উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি এবং পত্রিকা সম্পাদক :
সুভাষ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ ঃ সুব্রত দত্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা-৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—চল্লিশ পয়সা

প্রবন্ধ

আলোচনা

প্রতিবেদন

গল্প

কবিতা

শিল্প-সংস্কৃতি

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

খেলাধুলা

বইপত্র

বিভাগীয় সংবাদ

পাঠকের ভাবনা

বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট রায়

গত ১৯শে মে-র বিধান সভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচকমন্ডলী বামফ্রন্টের পক্ষে তাঁদের বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট রায় দিয়েছেন। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার কার্যভার গ্রহণ করেছে। এ বিজয় প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের, যাঁরা কুৎসা প্রচারকে উপেক্ষা করে, কুৎসা প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে ফ্রন্টকে দ্বিতীয়বার রাজ্য শাসনের দায়িত্বে বসিয়েছেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর পাঁচটি বছর ধরে বামফ্রন্টের মত একটি বিকল্প শক্তির একটি রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন ও গৌরবময় ঘটনা।

বিগত নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিজয় হলো তার জনস্বার্থে, মেহনতী মানুষের স্বার্থে ৩৬-দফা কর্মসূচীর বলিষ্ঠ রূপায়ণের বিজয়। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্টের পক্ষে কিছু নেতিবাচক ভোট পড়েছিল। কিন্তু এবারে বামফ্রন্টের পক্ষে প্রদত্ত ভোটের সবটাই ইতিবাচক। নির্বাচকমণ্ডলী আবার দুই শক্তি—স্বৈরতন্ত্রের শক্তি ও গণতন্ত্রের শক্তির মধ্যে দ্বিতীয় শক্তিকে অর্থাৎ গণতন্ত্রের শক্তিকেই বেছে নিয়েছেন। তাঁরা বামফ্রন্টকেই কংগ্রেসী অপশাসনের একমাত্র বিকল্প হিসাবে দেখেছেন।

পশ্চিমবাঙলায় বামফ্রন্টের এই জয় খুবই তাৎপর্যবাহী ঘটনা। নির্বাচনের সময় প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের নীতি ও কাজগুলি ছিল মানুষের সামনে। এই সরকারের পাঁচ বছরের কাজের চুলচেরা বিচার করেছিলেন মানুষ। এই সব কাজ কোন্ গতিপথে চলেছে তা-ও উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা প্রথম সরকারের প্রতিশ্রুতি ও কাজের মধ্যে বিপুল ঐক্য ও মিল দেখতে পেয়েছিলেন। এ-কথা ঠিক, পশ্চিমবাংলার জন-জীবনের সব সমস্যার সমাধান হয় নি। কিন্তু এই সমস্যাগুলি কারা সৃষ্টি করছে এবং দূর করার পথে রাজনৈতিক ও সামাজিক বাধাগুলি কারা হাজির করছে সে বিষয়ে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার জনগণকে সব সময় সচেতন করেছিলো। তাই উন্নত চেতনার পরিচয় দিয়ে বামফ্রন্টকে আরও বিপুলভাবে ফিরিয়ে এনেছেন এ রাজ্যের মানুষ।

এ রাজ্যের নির্বাচনী ক্ষেত্রে মানুষের সামনে ছিল বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতার মধ্যে বামফ্রন্টের সরকার পরিচালনার মূল্যায়ন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার মূল্যায়ন। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস না হলে একটি রাজ্যের সরকারের পক্ষে তার নীতি, দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী জনগণের স্বার্থে সরকার পরিচালনার অসুবিধা নিয়ে জনগণকে শিক্ষিত করার দিকে নজর রেখেই বামফ্রন্ট তার নির্বাচনী ইশতেহার নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। একদিকে এই ইশতেহার বর্তমান অবস্থার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে সামগ্রিক উন্নয়নের প্রশ্নটিকে তুলে ধরেছে, অন্যদিকে যে দাবীগুলি এই উন্নয়নের সমস্যাগুলি সমাধানের পথকে প্রশস্ত করবে তা-ও গ্রন্থীবদ্ধ করেছে। বিগত পাঁচ বছরের কাজের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট দেখিয়েছে কিভাবে সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকে গরীব মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করা যায়। গণতন্ত্রের প্রশ্নটিকে আর্থ-সামাজিক বিকল্প নীতির প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করার ফলে মেহনতী মানুষের সমস্ত স্তরই একটি নতুন চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছে, গ্রাম-শহরে ঘটেছে রাজনৈতিক শক্তির পুনর্বিন্যাস। একদিকে গোটা দেশ যখন জ্বলছে সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক, জাতপাতের দাঙ্গায়, পশ্চিমবঙ্গে তখন গড়ে উঠেছে সম্প্রীতির গ্রানাইট; বামফ্রন্টের নেতৃত্ব জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা; স্বপ্নের প্রতিনিধি। স্বভাবতঃই এ চিত্রও নির্বাচনী সংগ্রামে প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তদের পাশাপাশি ছাত্র, শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার, গায়ক, অধ্যাপক সহ সমস্ত স্তরের বুদ্ধিজীবীরাও ব্যাপকভাবে নির্বাচনী সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় ওঁরা বুঝেছেন বামফ্রন্ট সরকার ওঁদের নিজের সরকার। তাই বামফ্রন্ট সরকারকে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে ওঁরা ছিলেন বদ্ধপরিকর। মানুষই মানুষের ভবিষ্যত নির্ধারণ করবেন—বিগত পাঁচ বছরের এ শিক্ষাকে পুঁজি করে, নতুন এক সংগ্রামের ইতিহাস রচনার স্বপ্নে ওঁরা ছিলেন বিভোর, শপথে হয়েছিলেন ইস্পাত।

সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এবারের ভোটের হার। এত বেশী সংখ্যায় ভোট অতীতে কোন নির্বাচনে পড়ে নি। 'ভোটের অধিকার একটি মৌলিক অধিকার'—এই উপলব্ধি পাঁচ বছরের গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং বামপন্থী ফ্রন্টের আদর্শগত প্রচারের ফলশ্রুতি। এবারে প্রদত্ত মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা ২ কোটি ২৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৬০৭টি। ৫৫টি কেন্দ্রে ভোটের হার ৮০ শতাংশের বেশী। মোট ভোটের ৫৬·৪৪ শতাংশ অর্থাৎ ১ কোটি ২৬ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৫৮ ভোট পেয়েছে বামফ্রন্ট। '৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২৩০টি আসন পেয়েছিল বামফ্রন্ট আর এবার পেয়েছে ২৩৮টি আসন। কিন্তু এবারের জয় অনেক বেশী ব্যাপক। আগের বারের ২৩০টি আসনের মধ্যে ১৬৫টি আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের ভোট কংগ্রেস এবং জনতার মিলিত ভোটের চাইতে বেশী ছিল। আর এবার অধিকাংশ বামফ্রন্ট প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন ৫০ শতাংশের বেশী ভোট পেয়ে। '৭৭-এর নির্বাচনে বামফ্রন্ট ভোট পেয়েছিল ৪৬·৩০ শতাংশ। সুতরাং এবার ভোটের বৃদ্ধির হার ১০·১৪ শতাংশ। পাঁচ বছর শাসন পরিচালনার পর এই ভোট তাই নেতিবাচক ভোট নয়, জনগণের আস্থাসূচক ইতিবাচক ভোট। এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) ভোট পেয়েছে ৩৫·৬৯ শতাংশ এবং আসন পেয়েছে ৪৯টি। এছাড়া তার সহযোগী কংগ্রেস (স) পেয়েছে ৪টি আসন এবং গোর্খা লীগ ১টি আসন। '৭৭-এর নির্বাচনের তুলনায় কংগ্রেস (ই)-র আসন বেড়েছে ২৯টি এবং ভোট বেড়েছে ১২ শতাংশের কিছু বেশী। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে '৭৭-এর নির্বাচনে জনতা পেয়েছিল ২৯টি আসন এবং ভোট পেয়েছিল ২০ শতাংশের মতো। অর্থাৎ বাম বিরোধী ভোট এবং আসন সংখ্যা প্রায় অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছে। '৭৭-এর নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেসের সহযোগী শক্তি গোর্খা লীগ পেয়েছিল দুটি এবং মুসলীম লীগ একটি আসন। এই নির্বাচনে গোর্খা লীগ পেয়েছে ১টি আসন এবং মুসলিম লীগ কোন আসনই পায় নি।

এই প্রথম ভারতবর্ষে কেন্দ্র বা রাজ্যে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে একটি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। এখনো কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যে যে মন্ত্রীসভাগুলি চলছে তা 'ফেলের মধ্যে ফার্স্ট'দের মন্ত্রীসভা।

কেউ কেউ, যারা বামফ্রন্টের জয়ে দুঃখিত, বলছেন, কয়েকটি কেন্দ্রে কিছু মন্ত্রীর পরাজয় নাকি বামফ্রন্টের কয়েকটি নীতির প্রতি জনগণের অনাস্থার প্রমাণ। সাধারণ বুদ্ধিতেও বোঝা যায় এটা হল একটা খুবই ভুল কথা। বামফ্রন্টের কোন নীতিই কোন একটি বিশেষ কেন্দ্রের জন্য রচিত হয় নি। তাই কোন বিশেষ কেন্দ্রে পরাজয়ের জন্য বামফ্রন্টের নীতি দায়ী হতে পারে না।

৩৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে বিগত পাঁচ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার যে জনস্বার্থবাহী কর্মতৎপরতা চালিয়ে গেছে তার থেকে শিক্ষা নিয়ে এক নতুন কর্মসূচী, ৩৪-দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রের কাছেও ১৮-দফা দাবি সনদ পেশ করা হয়েছে। ৩৪-দফা কর্মসূচী এবং কেন্দ্রের কাছে পেশ করা ১৮-দফা দাবি সনদই হবে বামফ্রন্ট সরকারের আগামী দিনের কর্মতৎপরতার ভিত্তি। জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এ কাজটি সরকারের একার পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে আরও সমর্থন, আরও সহযোগিতা চায়।

আমরা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, এবারেও জনগণের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়া যাবে; জনগণই বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় এনেছে, তারাই তাদের সরকারকে রক্ষা করেছে ও করে চলবে। আমরা বিশ্বাস করি জনগণই ক্ষমতার উৎস।

বামপন্থীরাই একমাত্র বিকল্প

—মুখ্যমন্ত্রী

পাঁচ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার যেসব জনকল্যাণমূলক কাজ করেছে, গণতন্ত্রের সপক্ষে যেভাবে সংগ্রাম করেছে, তারই অভিজ্ঞতায় জনগণ এবার আরও বিপুল রায়ে আমাদের জয়যুক্ত করেছেন। জনগণের সার্বিক সহযোগিতা নিয়েই আমরা সরকার পরিচালনা করেছি। সাধারণ মানুষের এই ভালোবাসা ও সমর্থনের কথা মনে রেখে আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করে ধীর স্থির হয়ে আরও বেশি দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের কাজ করতে হবে। কেন না, বিপুল জনসমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দায়িত্বও বেড়ে গেল। জনগণ নির্বাচনে চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। এটাই আমাদের গর্ব ও প্রত্যয়। আমাদের চলার পথে জনগণই হচ্ছেন বড় শক্তি।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর জনগণের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাতাত্তরের নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করার পরে কেউ কেউ বলেছিলেন, কংগ্রেসের প্রতি নেতিবাচক ভোটেই বামফ্রন্ট জয়ী হয়েছে। এবারে আর তাঁরা সেকথা বলতে পারবেন না। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সব অংশের মানুষের স্বার্থে আমরা বিগত বছরগুলোতে সরকার পরিচালনা করেছি। পশ্চিমবঙ্গকে নতুনভাবে গড়ার দিকে নজর দিয়ে আমরা কাজ করেছি। জনগণ এ সাফল্য উপলব্ধি করেছেন বলেই আরও সচেতনভাবে মত প্রকাশ করেছেন। এই সরকারের বিরুদ্ধে কত ষড়যন্ত্র কুৎসা-বদনাম ও মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করা হয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বিপথগামী করা যায় নি। এত কষ্ট স্বীকার করেও তাঁরা বিপুল সমর্থন জানিয়েছেন, কারণ তাঁরা বুঝেছেন বামপন্থীরাই একমাত্র বিকল্প।

এই প্রসঙ্গে শ্রীবসু আরও বলেন, দায়িত্ব পালনে জনগণের আরও বেশি সহযোগিতা আমাদের কাম্য। ভারতের শোষিত-নিপীড়িত-গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার যোগ্য হবার ভূমিকা আমাদের পালন করতে হবে। শত্রুর সমস্ত আক্রমণের মোকাবিলা করে বামপন্থী আন্দোলনের দুর্গ পশ্চিমবঙ্গকে আমরা সকলে মিলে আরও শক্তিশালী করে তুলবই। সব সময় সতর্ক থাকতে হবে, যাতে এই দুর্গ দুর্বল না হয়, শত্রু যেন কোনোভাবে এই দুর্গে ফাটল ধরাতে না পারে। গণতন্ত্র বিপন্ন, তার প্রমাণ নির্বাচনোত্তর হরিয়ানা। গণতন্ত্রকে হত্যা করে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিলেন রাজ্যপাল। গণতন্ত্র হত্যার এই অভিযান যখন চলেছে তখন গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্বও আমাদের অনেক বেড়ে গেল।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের পূর্বে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিষ ছড়ানো হয়েছিল। দু-একটি দল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে গাঁটছড়াও বেঁধেছিলেন; তাঁরা আমাদের এই রাজ্যকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে চান। তবু মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় নি। কিন্তু মানুষকে এর বিরুদ্ধে সাবধান থাকতে হবে। এই বিপুল জয়ের মধ্যে শত্রুর ক্ষতিকারক ভূমিকাকে আমরা কোনোভাবেই যেন ছোট করে না দেখি।

১৯৮২-র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ

মোট আসন —	২৯৪	
ঘোষিত আসন —	২৯৪	
মোট ভোটার —	২,৯৯,৫৮,৪৮৪	
মোট প্রদত্ত ভোট—	২,২৯,৭৮,৬৯০	(৭৬·৭০%)
বৈধ ভোট —	২,২৪.৮১,৮৫১	(৭৫·০৪%)
বাতিল ভোট —	৪,৯৬,৮৩৯	(২·১৬%)

ক্রঃ সং	দল	নির্বাচন কেন্দ্র	নির্বাচিত	বৈধ ভোট	শতকরা হার
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.
ক.	জাতীয় দলসমূহ				
	১। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আই. এন. সি.)	২৪৯	৪৯	৮০,২৫,৬৯৭	৩৫·৭০
	২। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আই. এন. সি -এস)	২৮	৪	৮,৮৫.৮৩৫	৩·৯৪
	৩। জনতা পার্টি (জে. পি.)	৯৫	—	১.৮২.৪০৮	০·৮২
	৪। লোকদল (এল. ডি)	১৬	—	২২,৩৬১	০·১০
	৫। ভারতের কমুনিস্ট পার্টি (সি. পি. আই.)	১২	৭	৪,০৭.৬৬০	১·৮১
	৬। ভারতের কমুনিস্ট পার্টি—মার্কসবাদী (সি. পি. আই -এম)	২০৯	১৭৪	৮৬.৫৫.৩৭১	৩৮·৫০
	৭। ভারতীয় জনতা পার্টি (বি. জে. পি.)	৫৪	—	১,৫৫,০৭৩	০·৬৯
খ.	রাজ্য দলসমূহ				
	১। সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক (ফঃ ব্লঃ)	৩৪	২৮	১৩,২৭,৮৪৯	৫·৯১
	২। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (আর. এস. পি)	২৩	১৯	৯.০১,৭২৩	৪·০১
গ.	রেজেস্ট্রিকৃত অস্বীকৃত দলসমূহ				
	১। সোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া (এস. ইউ. সি. আই.)	৩৪	২	২,৩২,৫৭৩	১·০৩
ঘ.	নির্দল	৪৫১	১১	১০.৮৫.৬০১	৭·৪৯
	মোট—	১,২০৫	২৯৪	২,২৪,৮১,৮৫১	১০০·০০

দ্বিতীয় বামফ্রণ্ট সরকারের কর্মসূচি

বামফ্রন্ট বিগত সাধারণ নির্বাচনে সাধারণ মানুষের কাছে ৩৪ দফার একটি কর্মসূচি পেশ করেছিল। তাছাড়া ফ্রন্টের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কথা মনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১৮ দফার একটি দাবী সনদ রচনা করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ বামফ্রন্টের এই ৩৪-দফা কর্মসূচি এবং কেন্দ্রের কাছে ১৮-দফা দাবির পক্ষে দ্ব্যর্থহীনভাবে তাঁদের রায় দিয়েছেন। এখন ২য় বামফ্রন্ট সরকারের কাজ হবে সর্বশক্তি দিয়ে উপরোক্ত কর্মসূচিকে রূপায়িত করা এবং কেন্দ্রের কাছে সুপারিশগুলি যাতে সত্বর গৃহীত ও কার্যকর হয় তার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে যাওয়া।

নিম্নলিখিত দাবিগুলি কেন্দ্রের কাছে উত্থাপন করতে বামফ্রন্ট রাজ্যের জনগণের কাছে নির্দেশ চেয়েছিল।

১। নিজস্ব কর্মসূচিগুলি সঠিক রূপায়ণ করতে রাজ্যগুলির হাতে আরও বেশি আইনগত এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা ও বাড়তি সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার জন্য কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস, মুদ্রা-ব্যবস্থা, পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক সমন্বয়, বৈদেশিক নীতি এবং বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখা; পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা এবং সম্পদ সংগ্রহ সহ অন্যান্য যৌথ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারগুলিকে জড়িয়ে নেওয়া; যে ধারার সাহায্যে একটি নির্বাচিত রাজ্য সরকারের পতন ঘটিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা যায়, সেই ৩৫৬ নম্বর ধারার সংবিধান থেকে বিলোপ সাধন, রাষ্ট্রপতির সম্মতির অপেক্ষায় রাজ্য বিধানসভায় পাস হওয়া বিলগুলি যাতে আটকে না থাকে তা সুনিশ্চিত করা।

২। সংসদের ক্ষমতা হ্রাস করার এবং তার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার প্রক্রিয়াকে বন্ধ করা; বহিঃশত্রুর আক্রমণ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থা জারি করার সাংবিধানিক অবস্থা বাতিল করা; এসমা এবং জাতীয় নিরাপত্তা আইনের মত দমনমূলক আইনগুলিকে বাতিল করা।

৩। চটসহ কিছু মূল শিল্পের জাতীয়করণ; যে চা-বাগানগুলি মালিকদের জন্য ধ্বংসের মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলির উন্নয়ন এবং অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ চা উন্নয়ন পর্ষদের প্রচেষ্টার সাহায্যের জন্য এবং চা-শিল্পের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও ভারতীয় টি ট্রেডিং কর্পোরেশনের আবশ্যিকভাবে এগিয়ে আসা; হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যাল প্রকল্প, সল্ট লেকে ইলেকট্রনিক প্রকল্প, ফারাক্কা শিল্পনগরী, আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লাভিত্তিক শিল্প সহ পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প লাইসেন্স প্রদান এবং কেন্দ্রীয় আর্থিক সংস্থাগুলি কর্তৃক মূলধন বিনিয়োগের ব্যবস্থা, বন্ধ এবং রুগ্ন শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার এবং আরও লক-আউট ও ক্লোজার বন্ধে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ। আই ডি অ্যান্ড আর আইনের সংশোধন—যাতে, শিল্প লাইসেন্স এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলির বক্তব্য আরও গুরুত্ব পায়।

৪। সরকারি বণ্টন-ব্যবস্থা কার্যকরী করতে এবং জিনিসপত্রের দামকে বেঁধে রাখতে ১৪টি অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের সরবরাহ সুনিশ্চিত করা; এই ১৪টি সামগ্রী প্রধান প্রধান দানাশস্য, ডাল, নুন, চিনি, কাপড়, ভোজ্য তেল, কেরোসিন, ডিজেল তেল, দেশলাই, কাগজ, কাপড় ধোওয়ার সাবান প্রভৃতি।

৫। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে প্রতি বছরের বাজেট ঘাটতির সমবণ্টন।

৬। আয়কর এবং অন্যান্য মৌলিক আবগারি শুল্কের চরিত্র এবং হার, যা কেন্দ্র নির্ধারণ করে, কিন্তু যার একটি বড় অংশ রাজ্য সরকার রাজস্ব হিসেবে পায়, তা নিয়ে রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা করা।

৭। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাবিত রাজ্য সরকারের নিজস্ব ব্যবসায়িক ব্যাংক স্থাপনের প্রস্তাবে কেন্দ্রের অনুমোদন।

৮। বাড়তি আবগারী শুল্কের (বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের) এবং অন্যান্য সম্পর্কযুক্ত বিধিবদ্ধ সংস্থানের বিলোপ, যাতে রাজ্য সরকারের তামাক ও তামাকজাত পণ্য, চিনি এবং কাপড়ের ওপর কর বসানোর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

৯। রপ্তানির ওপর কর বসানোর ক্ষেত্রে সংবিধানগত বাধার দরুন যে রাজস্ব ঘাটতি রাজ্য সরকারগুলির হয় কেন্দ্র কর্তৃক তার ক্ষতিপূরণ; সংবিধানের ২৬৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী কয়েকটি বিশেষ শুল্ক এবং কর কেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত এবং আদায় করা হলেও তা জমা পড়ে সরাসরি রাজ্য সরকারের ভাণ্ডারে—এই ধারার ব্যবহারকে আরও সুনিশ্চিত করা।

১০। লৌহ, ইস্পাত, কয়লার মতো অন্যান্য মূল পণ্যের ক্ষেত্রে সমহারে পরিবহণ মাশুলের নীতি নির্ধারণ; সারা দেশে এই ধরনের প্রত্যেকটি মৌলিক এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের একই দাম ধার্য করা।

১১। উৎপাদকের স্বার্থরক্ষা করতে এবং অভাবজনিত বিক্রি রোধ করতে সমস্ত কৃষিপণ্য বিশেষতঃ পাট প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের ন্যায্য দাম ধার্য করা।

১২। উপযুক্ত আইনের সাহায্যে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের স্বার্থরক্ষা।

১৩। সংসদ সহ সকল নির্বাচিত সংস্থার জন্য ভোটদাতার বয়স ১৮ বছরে নামিয়ে আনা।

১৪। যুগ্ম তালিকা থেকে শিক্ষাকে রাজ্য তালিকাভুক্ত করা; শিক্ষা ও নগর উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

১৫। সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে সুরক্ষিত করতে শিল্প-সম্পর্ক সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় আইনগুলির উপযুক্ত সংশোধন।

১৬। সকলের জন্য কাজ, সামাজিক বীমা এবং সকল বেকারের জন্য বেকারভাতার ব্যবস্থা করা।

১৭। নেপালী ভাষাকে সংবিধানের তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা এবং পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের অর্থবহ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংবিধানের সংশোধন।

১৮। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিটির প্রস্তাবমত উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-বরাদ্দ এবং সরকারি ও জবরদখল কলোনিগুলির জমির মালিকদের অধিকার ও টাইটেল ডিডকে সুনিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ।

কর্মসূচি

মানুষের সহায়তায় প্রথম বামফ্রন্ট সরকার তার ৩৬-দফা কর্মসূচির অধিকাংশই পুরোপুরি অথবা আংশিক কার্যকরী করতে পেরেছিল। সেই সাফল্যের উপরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার নিম্নলিখিত ৩৪-দফা কর্মসূচিকে রূপায়িত করার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে

১। রাজ্য প্রশাসনের কাঠামো এবং কাজকর্মের সংস্কারের সুপারিশ করতে একটি উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন; পুলিস রেগুলেশন সংশোধন।

২। যৌথ কাজকর্ম, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও দক্ষতা, ফাইলের চলাচলের গতি বাড়ানো, ঠিক সময়ে অফিসে হাজিরা এবং জনগণের ক্ষোভগুলির প্রতি বাড়তি মনোযোগদানের জন্য কর্মচারী সংগঠনগুলির সাহায্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ; দুর্নীতির অভিযোগগুলির সম্পর্কে আরও দ্রুত এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভিজিলেন্স ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো।

৩। উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ: নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের হাতে উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্র আরও বেশি ক্ষমতা-সহ রাজ্য ও জেলাস্তরে সরকারি বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলির উন্নয়ন।

অর্থনৈতিক কাঠামো

৪। বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বণ্টনের নির্ধারিত প্রকল্পগুলির নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ করা; কোলাঘাট, বাস্মাম এবং টিটাগড় প্রকল্পকে সম্পূর্ণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাকে ১৯৮৬-৮৭'র মধ্যে ৩,৫০০ মেগাওয়াটে নিয়ে যাওয়া; নতুন প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা ও কেন্দ্র

কর্তৃক এগুলির অনুমোদন লাভ; বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পুনর্গঠন।

৫। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই জন-পরিবহণের উন্নতির পথে বাধাগুলি দূর করতে নতুন আইন প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ; প্রয়োজনীয় এবং নিয়মিত পরিবহণের জন্য বেসরকারি মালিকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ; আভ্যন্তরীণ জল-পরিবহণের উন্নতি সাধন।

৬। গ্রামাঞ্চলে নতুন শিল্পকেন্দ্র, আদিবাসী অধ্যুষিত ও পার্বত্য এলাকার জন্য আরও বেশি এবং আরও ভাল রাস্তাঘাট নির্মাণ।

৭। গরিবদের জন্য বিনামূল্যে বাস্তুজমি, কম খরচে বাসস্থানের ব্যবস্থা।

৮। পার্বত্য, আদিবাসী এবং পশ্চাদপদ অঞ্চলের শিল্পোন্নয়নের মূল ভিত্তিকে বিস্তৃত করাকে গুরুত্ব দেওয়া; পরিবেশ রক্ষা, জল দূষণ এবং বনাঞ্চল ধ্বংস রোধ করতে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন।

শিল্প ক্ষেত্রে

৯। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় এ রাজ্যের বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পুনরুজ্জীবন এবং পুনর্গঠনের ব্যবস্থা, শিল্পগুলি চালু রাখতে ও রুগ্ন হয়ে যাওয়া ঠেকাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশেষ সংস্থা গড়ে তোলা।

১০। জেলাগুলিতে নতুন শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দান, শিল্পোন্নয়ন ও বিনিয়োগ এবং উদ্যোগ গ্রহণের রাজ্য সরকারি সংস্থার কাজকর্মের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গতি এবং পরিচ্ছন্নতা এনে দেওয়া; শিল্পগুলির সম্প্রসারণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে বাধাগুলিকে দূর করতে সাহায্য করা; ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে বিনিয়োগ, কাঁচামালের যোগান এবং বাজারের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বিশেষ মনোযোগ ও সাহায্যকে অব্যাহত রাখা।

১১। সরকারি সংস্থায় শ্রমিকদের আরও অর্থবহ অংশগ্রহণের মাধ্যমে আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থা চালু করা।

গ্রামীণ ক্ষেত্রে

১২। ভূমি সংস্কার আইনের কঠোর প্রয়োগ, জমির পুনর্বণ্টন এবং উপযুক্ত রেকর্ডের ব্যবস্থা, রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনীতির স্বার্থে গ্রাম-শহরে জমির উপযুক্ত ব্যবহারের ব্যবস্থা করা, ন্যূনতম মজুরি সুনিশ্চিত ও অধিকতর ঋণ মকুবসহ বর্গাদার ও কৃষি মজুরের আর্থিক অধিকার রক্ষায় আরো বেশি সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৩। কৃষি উৎপাদনের উপকরণের সুলভ সরবরাহ সুনিশ্চিত করা; বাড়তি উৎপাদনের জন্য কৃষককে অধিক আর্থিক উৎসাহদান; কৃষি উৎপাদনের জন্য ন্যায্য দাম; বাজার ও গুদামজাত করার সুব্যবস্থা; বিশেষতঃ খরা অধ্যুষিত অঞ্চলসহ অর্থকরী ফসলের উৎপাদনের উৎসাহদান; আলু চাষী, পান চাষী, মৎস্যজীবী প্রভৃতিদের সাহায্য করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৪। পাট উৎপাদকদের স্বার্থ রক্ষা করতে রাজ্য পাট কর্পোরেশন গঠন করা; নতুন পাটজাত পণ্য এবং তার বাবসায়িক উৎপাদনের গবেষণায় উৎসাহদান।

১৫। কৃষিক্ষেত্রে মোট সেচ এলাকাভুক্ত অঞ্চলের পরিমাণকে ৩০% থেকে বাড়িয়ে অন্ততঃ ৫০% করা; বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ প্রকল্পকে বিশেষ অগ্রাধিকার দান।

১৬। মৎস্য, হাঁস মুরগী, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদনের উন্নয়নে বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাকে বাস্তবায়িত করা। বনাঞ্চলের সম্প্রসারণ এবং তার অর্থনৈতিক সম্ভাবনাগুলি কাজে লাগান।

পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি এবং সমবায়

১৭। জনগণের অংশগ্রহণকে আরও সুনিশ্চিত করতে ও সরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করতে পঞ্চায়েত রাজ্য আইন ও পঞ্চায়েতের কর্মতৎপরতার একটি পর্যালোচনা করা।

১৮। মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে তাদের ও তাদের চারপাশের উন্নয়নমূলক কাজগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে উৎসাহ দান; দরিদ্র অংশের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে সি. এম. ডি. এ.র কাজকর্মগুলি চালিয়ে যাওয়া, মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের আরও উন্নত প্রকল্প গ্রহণ।

১৯। সমবায়গুলিকে কায়েমী স্বার্থের কব্জা থেকে মুক্ত করা এবং ক্ষুদ্র শিল্প, কৃষি সংক্রান্ত কাজ, মৎস্যপালন, পশুপালন প্রভৃতি কাজে এগুলির আরও অধিকতর ব্যবহার।

২০। কৃষিপণ্যের জন্য আরও নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপন। পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটির নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে নতুন বাজার স্থাপনে উৎসাহদান।

শিক্ষা, সমষ্টি ও সমাজসেবা

২১। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সমস্ত শিশুর অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করা এবং বিনামূল্যে টিফিন, স্কুলের জামা-কাপড়, চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাহায্য এবং পাঠ্যপুস্তক বিতরণের ব্যবস্থা; তফসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসী ছাত্রদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ সৃষ্টির জন্য বিনা পয়সায় হোস্টেলের ব্যবস্থা এবং আর্থিক সাহায্য দান, বয়স্ক শিক্ষা এবং প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষাসহ নিরক্ষরতা দূর করার সমস্ত কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া, সাধারণ মানুষের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা।

২২। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গণতান্ত্রিকীকরণের কাজকে অব্যাহত রাখা; ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবকদের সহায়তায় শিক্ষা পরিস্থিতি বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ।

২৩। শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষার নীতিকে বাস্তবায়িত করা এবং এর জন্য উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি, এই সূত্রে উর্দু, নেপালী এবং সাঁওতালী ভাষার ক্ষেত্রে উৎসাহদান; মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলক ইংরাজী শিক্ষার যথাযথ গুরুত্ব প্রদান এবং ভাষা শিক্ষার পদ্ধতির উন্নয়ন।

২৪। জনসংখ্যার আরও বৃহত্তর অংশকে সরকারি চিকিৎসা-ব্যবস্থার আওতায় আনা এবং হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্যরক্ষার আরও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ; সমস্ত গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির জন্য চিকিৎসক এবং চিকিৎসা-কর্মীর নিয়োগ; হাসপাতালগুলিতে ওষুধপত্র এবং খাবারের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং তার সরবরাহ ও মান উন্নয়ন; গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বকে অব্যাহত রাখা, স্বেচ্ছা-পরিবার পরিকল্পনা এবং শিশুকল্যাণ প্রকল্পগুলিকে সাহায্যদান।

২৫। বেকারভাতা প্রদানের প্রকল্পকে চালিয়ে যাওয়া; শুখা মরসুমে কৃষিমজুর এবং অন্যান্য গ্রামীণ গরিবদের কাজের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া; সরকারি এবং আধা সরকারি সংস্থাগুলিতে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে চাকরি দেওয়ার নীতিকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা এবং বেসরকারি মালিকদেরও এই নীতি অনুসরণ করানোর চেষ্টা করা; বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে শূন্য পদ পূরণ এবং সেই পদগুলিতে বেকারভাতা প্রাপকদের অগ্রাধিকার দান; সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে দরখাস্ত ফী তুলে দেওয়া।

২৬। গ্রামের গরিবদের যৌথ বীমা প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা, বিভিন্ন দুর্বল অংশের মানুষ যেমন বয়স্ক, অক্ষম ব্যক্তি, বিধবা প্রভৃতিদের জন্য সামাজিক বীমা প্রকল্পের এবং শস্যবীমা প্রকল্পের কাজ সম্প্রসারণ ও চালিয়ে যাওয়া।

২৭। নারীকল্যাণের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ এবং তাকে বাস্তবায়িত করা; মহিলাদের সামাজিক অধিকার রক্ষা এবং সম্প্রসারণ, যুব কল্যাণমূলক কাজ ও খেলাধুলার সুযোগকে গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারণ।

সংখ্যালঘু এবং পিছিয়ে-পড়া অংশ

২৮। ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষা এবং সম্প্রসারণের প্রচেষ্টাগুলিকে দৃঢ়ভাবে চালিয়ে যাওয়া। চাকরি এবং শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার ওপর জোর দিয়ে তফসিলী সম্প্রদায় এবং আদিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে দৃঢ়তার সঙ্গে বাস্তবায়িত করা।

২৯। পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে স্বায়ত্ত-শাসন অর্জনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া এবং একটি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পাহাড়ী অঞ্চলের উন্নয়নের কাজকে জোরদার করা।

ভাষা এবং সংস্কৃতি

৩০। বাংলা এবং যেখানে প্রযোজ্য সেখানে নেপালী ভাষার মাধ্যমে সরকারি কাজ চালানোর জন্য একটি কার্যকরী এবং সময় নির্ধারিত কর্ম

[শেষাংশ ৮ পৃষ্ঠায়]

জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি —জর্জি ডিমিট্রভ

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩। জার্মানীর রাজধানী বার্লিন সহরের অন্য অনেক সান্ধ্য আসরের মত ভর্সত্রাস-এর হেরেন ক্লাব-এর আসর এবং গোয়েবল্স্-এর বাড়ীর অনুষ্ঠান তখন আনন্দ-স্ফূর্তিতে জমজমাট। অভিজাত হেরেন ক্লাব-এ জার্মানীর অস্তগামী রাষ্ট্রপতি হিন্ডেনবার্গ, ভাইস চ্যান্সেলার পাপেন-এর কাছে স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন কিনা জানি না, তবে জার্মানীর নতুন রাষ্ট্রনায়ক অ্যাডলফ হিটলার যে গ্রামোফোনের গান শুনতে শুনতে আগামী দিনের সুখ-স্বপ্নে বিভোর ছিলেন এ সম্পর্কে ইতিহাস সায় দেয়। গোয়েবল্স্-এর ভাষায় "হঠাৎ ডঃ হ্যান্‌ফস্টাঙেগেল-এর কাছ থেকে 'রাইখস্টাগে আগুন' খবরটি টেলিফোনে এল" (ভন কাইজারহফ্—জোসেফ গোয়েবেল্স মিউনিখ, ১৯৩৬, পৃষ্ঠা—২৬৯)। রাষ্ট্রপতি হিন্ডেনবার্গ এবং পাপেন হেরেন ক্লাব-এর জানলায় দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত রাইখস্টাগকে প্রত্যক্ষ করেন। ধোঁয়া আর আগুনে পরিবৃত রাইখস্টাগ চতুর্দিকে বিষাদপূর্ণ এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে গাড়ী চালিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন হিটলার এবং গোয়েবলস। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা আবিষ্কার করলেন এই সাংঘাতিক ঘটনা "কমিউনিষ্টদের কীর্তি।" ঘটনাস্থলে কিছুক্ষণ পরেই পাপেন উপস্থিত হন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় এই ঘটনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন, "গোয়েরিং রাগে ঘামতে ঘামতে উত্তেজিত স্বরে বলছিলেন, নতুন সরকারের বিরুদ্ধে এটা কমিউনিস্টদের চক্রান্ত। নতুন গেস্টাপো অধিনায়ক রুডলফ্ ডায়েল্স্‌কে লক্ষ্য করে "গোয়েরিং চীৎকার করে বলে উঠলেন- এটা কমিউনিষ্টদের বিপ্লবের শুরু। আমাদের এক মুহূর্তও দেরী করা উচিত নয়। আমরা কোন রকম দয়া দেখাব না। প্রতিটি কমিউনিষ্ট নেতাকে দেখামাত্র গুলি করা উচিত। প্রতিটি কমিউনিষ্ট ডেপুটিকে আজ রাত্রেই ফাঁসী দেওয়া উচিত।" (ফ্রাঞ্জ ফন পাপেন মেময়ার্স নিউইয়র্ক, ১৯৫৩ পৃষ্ঠা -২৬৮)।

পরবর্তী ঘটনাবলী আমাদের সম্যক পরিচিত। ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ গভীর রাতে জার্মান রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয় যে, রাইখস্টাগে আগুন লাগানোর অভিযোগে ম্যারিনাস ভ্যান ডার লুব নামক জনৈক "ওলন্দাজ কমিউনিস্ট"কে (?) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরের দিন প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং নাৎসী পার্টির নেতা গোয়েরিং-এর উদ্যোগে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয় যে, রাইখস্টাগে আগুন কমিউনিস্টদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রথম সঙ্কেত। এর অব্যবহিত পরেই একটি বিশেষ ডিক্রী জারী করা হয়। জার্মানীর সংবিধান থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ বাতিল করা হয়। কমিউনিষ্ট এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা হয়। গোয়েরিং-এর নির্দেশে জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির বহু জঙ্গী কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাইখস্টাগে আগুনের ঘটনাকে নাৎসী পার্টি, জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এবং জার্মানীর গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে।

কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে এই সব মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য জার্মানীর কমিউনিষ্ট পার্টির সংসদীয় গোষ্ঠীর নেতা আর্নস্ট টর্গলার পার্টির নির্দেশ ব্যতিরেকে পুলিশের সামনে উপস্থিত হন। কিন্তু পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। জার্মানীর জনগণ এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা আইনে জার্মানীর গণ আন্দোলনের বহু নেতা ও বহু কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৩রা মার্চ আর্নস্ট থেলম্যান গ্রেপ্তার হলেন। এই সবই ঘটল হিটলারের চ্যান্সেলার হবার দিন ৩০শে জানুয়ারী ১৯৩৩-এর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই।

অমিতাভ রায়

জার্মানীর সংসদ ভবন রাইখস্টাগে আগুন লাগানোর অভিযোগে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যসূচক ঘটনাটি ঘটে ৯ই মার্চ ১৯৩৩। ঐদিন বার্লিনের বেরিশার হফ্ রেস্তোরাঁ থেকে বুলগেরিয়ান তিন জন কমিউনিষ্ট বি পোপেভ, ভি টানেভ এবং জর্জি ডিমিট্রভকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রাইখস্টাগে আগুন লাগানোর অভিযোগে জর্জি ডিমিট্রভকে গ্রেপ্তারের পর ঘটনার গতি ত্বরান্বিত হয়। এবং অবশেষে ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ জার্মানীর লীপজিগ-এ ইম্পিরিয়াল কোর্টের চতুর্থ পেনাল ডিপার্টমেন্ট একটি মামলার কাজ শুরু করে। এই মামলা লীপজিগ ট্রায়াল নামে সর্বাধিক পরিচিত। এই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছিল জার্মানীতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে কমিউনিষ্টরা সুচতুরভাবে জার্মানীর সংসদ ভবন অর্থাৎ রাইখস্টাগে আগুন লাগিয়েছে। এই মামলায় ডিমিট্রভের শুনানী এবং জবানবন্দী ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। ডিমিট্রভের এই ঐতিহাসিক শুনানী এবং জবানবন্দী শুধুমাত্র তাঁদের (ডিমিট্রভ এবং তার সহকর্মীদের) বিচারে বেকসুর খালাস করেছে তাই নয় এই মামলায় ডিমিট্রভের ভূমিকা, কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে যে সব অপপ্রচার চালানো হয় তাদেরও নস্যাৎ করেছে।

লীপজিগ ট্রায়াল দেখবার জন্য ৮২ জন বিদেশী সাংবাদিক এবং ৪২ জন জার্মান সাংবাদিককে অনুমতি দেওয়া হয়। কমিউনিস্ট, সোশ্যাল ডেমোক্রাট এমন কি বামপন্থী বুর্জোয়া পত্রিকার সাংবাদিকদেরও এই মামলায় দর্শক আসনে বসবার অনুমতি দেওয়া হয় নি। প্রথমে সোভিয়েট সাংবাদিকদেরও এই আদালতের আঙ্গিনায় প্রবেশের অনুমতি ছিল না। পরে সোভিয়েত সরকার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়ায় শুনানীর দ্বিতীয় পর্বে সোভিয়েত সাংবাদিকরা যোগদানের অনুমতি পায়। নাৎসী পার্টি পরিচালিত জার্মান সরকার এই মামলা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করে কিন্তু মামলার তৃতীয় দিনে ডিমিট্রভ মামলায় সম্পূর্ণ নতুন অবস্থা সৃষ্টি করেন। নাৎসী সরকার চিন্তিত হয়ে উঠল। সরকারী প্রচার যন্ত্রগুলি লীপজিগ ট্রায়াল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেল। ডিমিট্রভের যুক্তির তীব্র কশাঘাতে বারেবারে আক্রান্ত হয়েছেন গোয়েরিং, গোয়েবেল্স প্রমুখ নাৎসী নেতৃবৃন্দ। সময়ে সময়ে বিচারক নিজে পক্ষপাতিত্ব করেছেন। বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ, শ্লেষ এবং সর্বোপরি যুক্তির তীক্ষ্ণতায় বারে বারে নাৎসী সরকারের মন্ত্রীরা, তাদের সাক্ষীরা এমনকি সরকারী আইনজীবীরাও ধরাশায়ী হয়েছেন। লীপজিগ ট্রায়ালের সবচেয়ে তাৎপর্যমণ্ডিত দিক হল এই যে, এই বিচার চলাকালীন সমস্ত বিবৃতি শুনানী বা সওয়ালের সময় ডিমিট্রভ সব সময় কমিউনিজমের পতাকাকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। তিনি কখনও অসত্য সংবাদ পরিবেশন করেন নি; তিনি কখনও ভেঙ্গে পড়েন নি, সর্বোপরি ডিমিট্রভ নাৎসী জার্মানীর অন্ধ কমিউনিষ্ট বিরোধিতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সর্বদা ফ্যাসিজম তথা স্বৈরাচারকে আক্রমণ করে গেছেন। একজন প্রলেতারীয় বিপ্লবীর আচরণ কি রকম হওয়া উচিত, ডিমিট্রভ দুনিয়ার সামনে তার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করছি একজন অভিযুক্ত কমিউনিষ্টরূপে। আমি আমার কমিউনিষ্ট বিপ্লবী মর্যাদার পক্ষ সমর্থন করছি। আমি আমার জীবনের তাৎপর্য ও সারবস্তুর পক্ষ সমর্থন করছি।" অবশেষে ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৩৩ লীপজিগ ট্রায়ালের রায় প্রকাশিত হয়। সেই রায়ে জর্জি ডিমিট্রভ এবং তাঁর সাথীরা বেকসুর খালাস পান। ভ্যান ডার লুব-এর মৃত্যুদণ্ড হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে হিটলারের জন্মদিনে মধ্যাহ্ন ভোজে গোয়েরিং বলেন, 'রাইখস্টাগ পোড়ানোর ব্যাপারে যদি কেউ কিছু জানে তবে সে হল আমি, কারণ আমিই রাইখস্টাগে আগুন দিয়েছি।" প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়াম শিরার এ কথা নিজের কানে শুনেছেন বলে দাবী করেছেন। (দি রাইজ এন্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ- উইলিয়াম এল শিরার লন্ডন ১৯৬১—পৃষ্ঠা ১৯৩)।

লীপজিগ ট্রায়ালে ডিমিট্রভের আত্মপ্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত অনেক কথার খানিকটা এই সুযোগে শোনা যাক।

"ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং বুলগেরীয় কমিউনিষ্ট পার্টি এই অগ্নিকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা বার বার করেছি, আমরা কমিউনিষ্ট, সন্ত্রাসবাদী নই। আমার দৃঢ় ধারণা হচ্ছে এই যে, রাইখস্ট্যাগের অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা হয় কোন

উন্মাদের কাজ নয়তো জার্মানীর শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে এটা কোন কমিউনিষ্ট বিরোধীদের চক্রান্ত। যাই হোক আমি কিন্তু পাগলও নই কিংবা কমিউনিষ্ট বিরোধীও নই।

হঠকারিতা নয়, গণ সংগঠন, গণ উদ্যোগ এবং যুক্তফ্রন্ট এটাই হচ্ছে কমিউনিষ্টদের প্রকাশ্য কর্ম-কৌশল।

আমি নীতিগতভাবে সমস্ত প্রকার ব্যক্তি-সন্ত্রাসের বিরোধী। কারণ, এই ধরনের কাজ অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক গণ-আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গণভিত্তিক কমিউনিষ্ট মতাদর্শ ও কর্মকৌশলের পরিপন্থী। কমিউনিষ্ট লক্ষ্যের পথে পরিচালিত সর্বহারার মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে এটা ক্ষতিকারক।

আমি আমার কমিউনিষ্ট মতাদর্শের সপক্ষে আত্মসমর্পণ করতে দাঁড়িয়েছি, আমি আমার সমগ্র জীবনের মর্মবস্তুর সপক্ষে আত্মসমর্পণ করতে দাঁড়িয়েছি।"

এই হলেন জর্জি ডিমিট্রভ, বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মহান যোদ্ধা। একটানা পাঁচশো বছর ধরে শোষণ চালাবার পর তুর্কীরা বুলগেরিয়া থেকে হাত উঠাল ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে। নিঃস্ব, রিক্ত বুলগেরিয়া তখন ইউরোপের গরীব দেশগুলির অন্যতম। বুলগেরিয়ার দারিদ্র্যের চরমতম সময়ে এক দরিদ্র পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণীর অন্যতম পথিকৃত জর্জি ডিমিট্রভ। তারিখটা ছিল ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জুন অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে। বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ার কাছাকাছি রাডমির জেলার কোভা-সিভিসিতে তখন বাস ছিল ডিমিট্রভ পরিবারের। বাবা মিখাইলভ মা পেরেসকোভা ডোসিভা আর চার ভাই দুই বোনকে নিয়ে ছিল ডিমিট্রভদের সংসার। দারিদ্র্য যে পরিবারের চিরসঙ্গী সেই পরিবারের সন্তানের পক্ষে বিদ্যালয়ে গমন বাতুলতা মাত্র। বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না পাওয়ার জন্য মোটেই দুঃখিত ছিলেন না জর্জি। তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে পরবর্তী কালে তিনি বলেছেন, "আমার গ্রাজুয়েট পদবী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেয় নি, সংগ্রামের ময়দান থেকেই তা আমি সংগ্রহ করেছি। সব সময়, সব জায়গায় আমি নিজেকে শিক্ষিত করে তোলার কাজ করে গিয়েছি, শিখেছি ছাপাখানার শ্রমিক হিসাবে কাজের মধ্যে শিখেছি জেলের বন্ধ সেলে বসে, শিখেছি লীপজিগ বিচারের পর্ব থেকে পর্বান্তরে।" মাত্র বারো বছর বয়সেই জর্জিকে গ্রহণ করতে হয় ছাপাখানার কাজ। কম্পোজিটরের শিক্ষানবীশ হিসাবে শুরু হল কর্মজীবন।

এদিকে এক ভাই তখন ট্রেড ইউনিয়নের কাজে ব্যস্ত। ১৯১২ সালের বলকান যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হ'ল। মেজো ভাই ওডেশায় বলশেভিক সংগঠনের কাজে নিযুক্ত। সে মারা যায় ১৯১৫ সালে। সেজ ভাইও বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। সে মারা গেল ১৯২৫ সালে বুলগেরীয় পুলিশের হাতে। এই সময়ের সরকার বিরোধী এপ্রিল অভ্যুত্থানে তার অবদান অনস্বীকার্য। ভায়েদের মত জর্জির দুই বোনও ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। অন্যায়, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে এবং সততা ও মানবিকতার সপক্ষে সংগ্রামে শিক্ষা ডিমিট্রভ ও তাঁর ভাই বোনেরা লাভ করেন তাঁদের মা-বাবার কাছ থেকেই। পরবর্তীকালে এই পারি-বারিক শিক্ষাই তাঁদের সহজাত শিক্ষা এবং শক্তি হিসাবে বিপ্লবী জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাবা মিখাইলভ মারা যান ১৯১৩ সালে। মা পেরেসকোভা ডোসিভা নিজেকে মিশিয়ে দিলেন ছেলেমেয়ের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে।

জর্জি ডিমিট্রভ তাঁর ছাপাখানা শ্রমিক জীবন শুরু করেন বুলগেরীয় লিব্যারাল পার্টির পত্রিকার প্রেসে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ঐ প্রেসেরই মালিক আইনজীবী রাডিস্লাভফ্। ১৮৯৮ সালের মে দিবসের শ্রমিকদের মিছিল উপলক্ষে ঐ পত্রিকার জন্য যে সম্পাদকীয় লেখা হয়, তাই নিয়ে পত্রিকা মালিক রাডিস্লাভফ্-এর সঙ্গে বিতর্ক হয়। জর্জি ডিমিট্রভের মতে, এটাই ছিল তাঁর জীবনের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ নিয়ে প্রথম প্রতিবাদ অর্থাৎ মাত্র ১৬ বছর বয়সেই জর্জি ডিমিট্রভ লড়তে শিখেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর সপক্ষে। তার কুড়ি বছর বয়সে তো তিনি রীতিমত শ্রমিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। ছাপাখানার শ্রমিকের কাজও চলছে সমান তালে মাত্র বাইশ বছর বয়সে জর্জি অর্জন করলেন বুলগেরীয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপদ, এই দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রখ্যাত বুলগেরীয় মার্কসবাদী ডিমিটার বজাগয়েভ্। এই সময় থেকে সোফিয়ার পার্টি অফিসই হল জর্জির দ্বিতীয় বাসগৃহ।

বুলগেরিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা এই সময়ে বুর্জোয়া মতাদর্শ ও সুবিধাবাদী নীতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত রেখে-ছিলেন। জর্জি ডিমিট্রভের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটল এই মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্যে। অভিজ্ঞতা, সংগ্রামী মানসিকতা ও রাজনৈতিক জ্ঞান তাঁকে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বামপন্থী শিবিরে সামিল করল। ইতিমধ্যে ছাপাখানার শ্রমিকদের সংগঠনের একজন দক্ষ সংগঠক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর সংগ্রামী তৎপরতা ছাপাখানা শ্রমিকদের নেতৃত্বের স্বীকৃতি এনে দিল। মাত্র [illegible] বছর বয়সে জর্জি ছাপাখানা শ্রমিকদের ধর্মঘটের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি থেকে শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে নিজেকে তৈরী করার যে প্রেরণা পেয়েছিলেন, সেই অনুপ্রেরণায় নিজেকে মিশিয়ে দিলেন শ্রমিক আন্দোলনে। শীঘ্রই তিনি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ছাপাখানা শ্রমিক সোসাইটির অন্যতম নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তাঁরই নেতৃত্বে শ্রমিকরা সংগঠন ও আন্দোলনের জোরে আদায় করে নিল ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, তাঁরই প্রচেষ্টায় ছাপাখানা শ্রমিক সোসাইটি আন্ত-র্জাতিক ছাপাখানা শ্রমিক ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯০৯ সাল। এই বছরটি জর্জি ডিমিট্রভের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছর তিনি "বুলগেরীয়ান ওয়ার্কার্স সিন্ডিকেলিস্ট ইউনিয়নের" সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। এই বছরই তিনি নির্বাচিত হলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। আমৃত্যু তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯১৫ সালে জর্জি ডিমিট্রভ বুলগেরিয়ার সংসদে নির্বাচিত হলেন। এই বছরই সেন্সর আইনের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন "শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ও মর্যাদা বিরোধী এই সেন্সর আইনের বিরুদ্ধে আমার কণ্ঠ কেউ স্তব্ধ করতে পারবে না।" তখন বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাডিস্লাভফ্ মাত্র বারো বছর বয়সে জর্জি যার ছাপাখানায় নিজের কর্মজীবন শুরু করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বুলগেরিয়ার যোগদানের বিরুদ্ধে জর্জি হয়ে উঠেন মুখর। পার্লামেন্টে সোফিয়া মিউনিসিপাল কাউন্সিলের [illegible] এবং অসংখ্য সভা-সমিতিতে তিনি যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য রেখে জনমত সংগ্রহ অভিযান শুরু করলেন। মহান অক্টোবর বিপ্লব এক নতুন যুগের আলো বয়ে আনলো বুলগেরিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টির জীবনে। পার্টির বামপন্থী অংশ অভি-নন্দন জানালো লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টি পরিচালিত মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে। সোভিয়েত ইউনিয়নে বলশেভিক পার্টিও এই সময় বামপন্থী সোশ্যালিষ্টদের নিয়ে তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যোগ শুরু করল। স্ট্যালিনের উপর দায়িত্ব পড়ল ইউরোপের বামপন্থী সোশ্যালিষ্টদের সঙ্গে মিলিত হবার। সাড়া মিলল বুলগেরিয়া থেকে। বুলগেরিয়ার বামপন্থী সোশ্যালিষ্টরা ছিল কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এই বামপন্থী সোশ্যালিষ্টরাই পরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে বুলগেরীয় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করে। জর্জি ডিমিট্রভ তাঁর সমস্ত শক্তি, উৎসাহ ও প্রতিভার সাহায্যে বুলগেরিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র পার্টি বুলগেরীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হলেন। মার্কসবাদের তত্ত্বগত পড়াশুনা শুরু করলেন "কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার" এবং "ক্যাপিটালের" সহজ সংস্করণ বই দুটির পড়ার মাধ্যমে।

মার্কসবাদ আয়ত্ত করার সাথে সাথে তিনি গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চাও শুরু করলেন। ১৯০৬ সালে তিনি লিউক ইভ-সিভিচকে বিবাহ করেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর জর্জির কঠোর সংগ্রামী জীবনের সহকর্মিণী ছিলেন লিউক ইভসিভিচ। ১৯৩৬ সালে লিউকের মৃত্যু হয়।

সাম্রাজ্যবাদী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বুলগেরিয়ার সামাজিক জীবনে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপর্যয় টেনে আনলো, তার ফলে ক্ষুধা আর অনাচারের পটভূমিকায় "দি এগ্রেরিয়ান লীগের" নেতৃত্বে দেখা দিল কৃষক বিদ্রোহ। পার্টি এই বিদ্রোহের রাজনৈতিক তাৎপর্যকে গুরুত্ব দিল না। এমন কি যখন জাতীয় জীবনে বিপর্যয়

সৃষ্টিকারী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সৈনিকরা পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করল, সেই সময়ে ১৯১৮ সালে পার্টির মনোভাবে দেখা গেল নিষ্ক্রিয়তা ও নেতিবাচক মনোভাব। জর্জি তখন জেলে। জেলের ভিতর থেকে জর্জি ডিমিট্রভ বিদ্রোহী "কৃষিলীগ" ও সৈনিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন। কিন্তু বাইরের পার্টি নেতৃত্ব বিদ্রোহীদের রাজনৈতিক যোগাযোগের ব্যাপারে ডিমিট্রভের পরামর্শ ও নির্দেশকে অগ্রাহ্য করলো। কারামুক্ত হলেন ডিমিট্রভ, সারা দেশে শুরু হল রেল ধর্মঘট, নেতৃত্ব দিলেন ডিমিট্রভ। রেল ধর্মঘটের সমর্থনে শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটে গোটা দেশ হয়ে উঠল উত্তাল।

বিপ্লবী আন্দোলনের মুখে বেসামাল সরকার যে কোন মূল্যে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকট-এর মোকাবিলার জন্য হিংসাশ্রয়ী ষড়যন্ত্র আঁটলো। ধর্মঘটী রেল কর্মীদের অতি প্রিয় ও অবিসম্বাদী নেতা ডিমিট্রভ করলেন আত্মগোপন।

আত্মগোপন অবস্থায় তিনি যাত্রা করলেন 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকে'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগদানের উদ্দেশ্যে। মাছ ধরা নৌকায় ব্ল্যাক সি পার হবার সময় ধরা পড়ে গেলেন রুমানিয়ার জল পুলিশের হাতে। রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার শ্রমিকশ্রেণী এবং সোভিয়েত সরকারের প্রচন্ড প্রতিবাদে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল রুমানিয়ার শাসকশ্রেণী।

১৯২১ সালে ডিমিট্রভ গেলেন মস্কোয়, মিলিত হলেন লেনিনের সঙ্গে। এই সাক্ষাৎকার তাঁর এবং বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির কাছে এক নূতন যুগের সূচনা ঘটালো। ১৯২২ সালে ঘোষিত লেনিনের "যুক্তফ্রন্ট রণকৌশল" এর তত্ত্ব গৃহীত হল বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে। বুলগেরিয়ায় ১৯২৩ সালে বৃহৎ বুর্জোয়া গোষ্ঠী সামরিক চক্রের সাহায্যে কায়েম করলো স্বৈরাচারী শাসন, যদিও আঞ্চলিকভাবে "এগ্রেরিয়ান লীগ" এবং কমিউনিস্টরা এর বিরুদ্ধে শুরু করলো সশস্ত্র প্রতিরোধ তবুও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এ ব্যাপারে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করলো। এইভাবে স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ হাতছাড়া হল। অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টি এই ভুল কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলো। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটির সম্পাদক বুলগেরীয়ান কমিউনিস্ট 'ভেসিলকোলা' স্বদেশে ফিরে এলে, আলোচনার মাধ্যমে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রমিক-কৃষকের যুক্তফ্রন্ট গড়া এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে সেই যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে সামিল করার আশু কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। সেটা ছিল আগস্ট ১৯২৩। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গণ-অভ্যুত্থানের দিন ঘোষণা করলেন,—১৯২৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর। নবগঠিত বিপ্লবী সামরিক কমিটিতে পার্টির তরফে নির্বাচিত হলেন কোলারভ ও ডিমিট্রভ। অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে চব্বিশ ঘন্টাব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হল রাজধানী সোফিয়ায়। কিন্তু ব্যাপক গ্রেপ্তারের ফলে শিল্পগুলিতে এই ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়তে পারলো না। ফলশ্রুতি, সামগ্রিকভাবে এই অভ্যুত্থান সংঘটিত হতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বর অভ্যুত্থান পরাস্ত হলো। অবশেষে মৃত্যুদন্ডাদেশ মাথায় নিয়ে ডিমিট্রভ দেশত্যাগ করলেন। দেশত্যাগের আগে "বুলগেরিয়ার শ্রমিক-কৃষকের প্রতি খোলা চিঠিতে" অভ্যুত্থান ব্যর্থ হবার কারণ সবিস্তারে বর্ণনা করে "বিপ্লবের মতাদর্শের প্রতি অনুগত ও বিপ্লবের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরার" আবেদন জানালেন ডিমিট্রভ।

দেশত্যাগের প্রথমদিকে ডিমিট্রভ বিভিন্ন ছদ্মনামে ঘনঘন আশ্রয়স্থান পাল্টিয়ে এলেন ভিয়েনায়। ১৯২৩ সালে ভিয়েনায় গঠন করলেন বুলগেরীয়ান কমিউনিস্ট পার্টির প্রবাসী কমিটি।

প্রবাসী জীবনে ডিমিট্রভ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন নেতা হিসাবে পরিচিত হলেন। ভিয়েনায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি 'বলকান কমিউনিস্ট ফেডারেশনের' সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। এই সময় তিনি লেনিনবাদ বিরোধীদের সঙ্গে এবং ট্রটস্কীপন্থীদের সঙ্গে মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু করেন। ১৯২৯ সালে তিনি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পশ্চিম ইউরোপীয় ব্যুরোর কার্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে বার্লিন যাত্রা করলেন।

"রাইখস্ট্যাগ অগ্নিকান্ড"জনিত মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর নিজস্ব দৃঢ়তা ও বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনে তিনি ১৯৩৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী মুক্ত হন। মুক্তি পাবার পর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে যান। নাৎসী কারাগারে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি স্ট্যালীন প্রদত্ত সোভিয়েত নাগরিকত্বের অধিকার অর্জন করেন। ১৯৩৫ সালে অনুষ্ঠিত হল তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস। এই কংগ্রেসের সামনে তিনি উপস্থিত করলেন ফ্যাসিবাদবিরোধী বিশ্ববিখ্যাত তত্ত্ব,—"শ্রমিক ঐক্য—ফ্যাসিবাদবিরোধী দুর্গ"। যাতে তিনি ঘোষণা করলেন "ফ্যাসিজম হল শ্রমজীবী জনতার উপর লগ্নী পুঁজির হিংস্রতম আক্রমণ; ফ্যাসিজম নিরঙ্কুশ সংকীর্ণতাবাদ আর পররাজ্য হরণের যুদ্ধ; ফ্যাসিজম—জঘন্যতম প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিপ্লব; ফ্যাসিজম হল শ্রমজীবী ও প্রত্যেকটি মেহনতকারী মানুষের ক্রূরতম শত্রু।"

১৯৩৭ সালে তিনি সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্য নির্বাচিত হলেন।

আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের কঠিন ও জটিল দায়িত্ব পালনের সময়ে এক মুহূর্তের জন্যও কিন্তু ডিমিট্রভ স্বদেশ বুলগেরিয়াকে ভুলে যান নি। সব সময় তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন বুলগেরিয়ার সংগ্রামী জনগণের সাথে। ১৯৪৩ সাল থেকে বুলগেরিয়ার জনগণের উপর কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৯৪৪ সালের ২৭শে আগস্ট বুলগেরিয়ার বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ডিমিট্রভ তাঁর ঐতিহাসিক নির্দেশ পাঠান। একুশ বছর আগে যাকে বিফল গণ-অভ্যুত্থানের নেতা হিসাবে শত্রুর মৃত্যুদন্ডাদেশ মাথায় নিয়ে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল সেই ডিমিট্রভ দেশে ফিরলেন ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪। নাৎসী বিজয়ী স্ট্যালিনের লাল ফৌজের সক্রিয় সহযোগিতায়, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী এবং বুলগেরীয় সৈন্যবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের যৌথ আক্রমণে চুরমার হল, ফ্যাসিস্ট শাসনের তাসের প্রাসাদ।

জর্জি ডিমিট্রভ নির্বাচিত হলেন জনগণতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

অবশেষে ১৯৪৯ সালের ২রা জুলাই জনগণতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী, বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম মহান সংগ্রামী নেতা এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক জর্জি ডিমিট্রভ-এর জীবনাবসান ঘটল। বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণী আজও তাদের এই সংগ্রামী বন্ধুকে শ্রদ্ধা জানায়।

(দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচি : পঞ্চম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সূচি গ্রহণ। সমস্ত সংখ্যালঘু ভাষার উন্নয়নের জন্য সরকারি উদ্যোগের ব্যবস্থা করা।

৩১। সেই সংস্কৃতির কাজকর্মের প্রসার ঘটানো, যার মধ্যে এই রাজ্যের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়; অপসাংস্কৃতিক প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচার চালান; সাধারণ মানুষের জন্য কম খরচে ভ্রমণের ব্যবস্থা।

৩২। শ্রমজীবী এবং মেহনতী জনগণের সমস্ত ধরনের ন্যায়সঙ্গত এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করা; শিল্পবিরোধগুলির দ্রুত মীমাংসা ও শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শিল্প-সম্পর্কিত আইনগুলির আরও সংশোধন করা।

৩৩। ন্যূনতম মজুরি আইনের পরিপূরক আইনগত এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এর ধারাগুলিকে মালিকদের জন্য বাধ্যতামূলক করা, রাজ্য শ্রমিক উপদেষ্টা পর্ষদগুলিকে আরও কার্যকরী ভূমিকা পালনের সুযোগ করে দেওয়া; কর্মচারী রাজ্য বীমা প্রকল্পকে প্রসারিত করা ও তাদের কাজকর্মের ধারার উন্নয়ন ঘটানো।

অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসমূহ

৩৪। সরকারি বন্টন-ব্যবস্থার সুযোগ এবং কর্মদক্ষতাকে বাড়ানো; রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহকে নিশ্চিত করা; আবশ্যিক পণ্যের সরকারি বাণিজ্য-ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত করা; আবশ্যিক পণ্যের পরিবহণ এবং তা গুদামজাত করার বিশেষ বাধাগুলিকে দূর করা; মজুতদার এবং কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশাসন এবং মানুষের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ।

শ্রেণীসংগ্রাম ও বুদ্ধিজীবী

'We are the hollowmen
We are the shiffed men
Leaning together
Head piece filled with straw. Alas!
Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats' feel over broken glass
In our dry cellar.'
(T. S. Eliot, *The Hollow Men*)

বহুদিন আগে এলিয়ট এরকম ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ দিয়ে সাজিয়েছিলেন বুদ্ধিজীবীর চরিত্র। এরপর বহুদিন চলে গেছে, কিন্তু এখনও ভল্গা মিসিসিপিতে রয়ে গেছে অনেক স্রোত, শ্রেণী-সংগ্রামের চেতনা ঝড় তুলেছে বহু সমাজের বুকে কিন্তু আজও বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা (Role) সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায় অথচ প্রসঙ্গটাকেও হিসাবের খাতা থেকে বাদ দেওয়াও সম্ভব হয় না।

নতুন করে বুদ্ধিজীবী নামক জটিল সংবেদন-শীল মানুষগুলির বর্ণনা দেওয়ার আগে বুদ্ধি-জীবী কাকে বলবো এ ধারণাটা পরিষ্কার থাকা উচিত। নানা মুনির নানা মত থাকলেও দুটি সংজ্ঞা তুলে নিচ্ছি। রবার্টো মিচেলসের মতে বুদ্ধিজীবী তাঁরা যাঁরা বিচার বিশ্লেষণ চিন্তা-শীলতা ও মননশীলতার পরিচয় দেন বেশী এবং সাধারণ মানুষের তুলনায় প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর জ্ঞানের ওপর কম নির্ভরশীল মানে বিনয় ঘোষের আটপৌরে ভাষায় বলা যায় চোর পালালে যাঁদের বুদ্ধি বাড়ে তারা নন চোরের চিন্তায় যাদের বুদ্ধি বাড়ে এবং চুরির দুর্ভোগ ভোগেন না তারাই বুদ্ধিজীবী। কিন্তু এ ধরনের সংজ্ঞা আরোপেও কেমন ফর্মাল ফর্মাল গন্ধ থেকেই যায়। বরং কার্লম্যানহাইমের সহজ বক্তব্য—In every society there are special groups whose special task it is to provide an interpretation of the world for that society, we call these the intelligentsia." (মুর্মুষু) অর্থাৎ সামাজিক প্রগতির জন্যই সমাজের 'dying culture' কে উলঙ্গ করে বিদ্রূপ এবং সমাজের 'elemental force' গুলোকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া—এই কাজ যারা করেন তাঁরাই বুদ্ধিজীবী।

বুদ্ধিজীবী কাকে বলব এ সমস্যা আপাততঃ মিটে গেলেও বুদ্ধিজীবীর শ্রেণীসংগ্রামের অব-স্থানের সমস্যা এত সহজে মেটে না। তাই এ নিয়ে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা।

একদম শ্রেণী থেকেই শুরু করা যাক। মার্ক্সের দর্শন অনুসারে উৎপাদন ব্যবস্থায় অর্থ-নৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে সমাজকে যে দুটি বর্গে ভাগ করা হয় তাকেই বলে শ্রেণী। এখন বর্তমান সমাজে বুর্জোয়া কিংবা প্রলেতারিয়েত ব্যাপক অর্থে শোষক এবং শোষিত এই শ্রেণী-দ্বয়ের মধ্যে বুদ্ধিজীবীর অবস্থান কোথায়? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া সম্ভব না হলেও এটুকু বলা যায় বুদ্ধিজীবীরা কোনো বিশেষ শ্রেণী নন। শোষক শ্রেণীর প্রতিটি ব্যক্তিই যে শোষকশ্রেণীর আদর্শে আস্থাশীল হবে এমন কথাকেও মরিসকর্নফোর্থ খুব সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন। বস্তুত বুদ্ধিজীবীরা বেশির ভাগই শোষকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত 'পেটি-বুর্জোয়া' স্তর থেকে আগত। (যা আমাদের কাছে মধ্যবিত্ত বা মাধ্যমিক সংঘ বলেই পরিচিত) শোষকশ্রেণীর সাথে তাদের মূল পার্থক্য বিচারবুদ্ধিতে। কেননা একদিকে যেমন বুদ্ধিজীবীরা কিছু পুঁজিরও মালিক অন্যভাবে তারা আর এক পুঁজির মালিক—সেটা হলো বুদ্ধি বা (Intellect)।

এখন জন্মগত সূত্রে কেউ বিপ্লবী হয়ে জন্মায় না। শ্রমিক চাষী বুদ্ধিজীবী সকলের ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য। মিহির আচার্য তাঁর বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজ ভাবনা' বইটির এক প্রবন্ধে বলেছেন, রাজনৈতিক জ্ঞানই শ্রেণী চেতনা আনে। একজন mob আর প্রলেতারিয়াতের মধ্যেকার পার্থক্য এই সচেতন জ্ঞানের পার্থক্য।

জয়ন্ত ঘোষাল

সুতরাং বুদ্ধিজীবীর শ্রেণীসংগ্রামে বিভিন্ন প্রকার অবস্থানের সম্ভাব্যতা থাকে। এবং বুদ্ধি-জীবীর সংগঠনে যেমন প্রলেতারিয়াত আসতে পারে তেমন আসতে পারে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া। রুশ মার্কসবাদী ভোরোভস্কি ব্যাপারটাকে এভাবে উপস্থিত করেছেন যে, বুদ্ধি-জীবী সম্প্রদায় "একটা মতাদর্শগত পার্লামেন্টের মত যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীরা যেসব প্রতিনিধি পাঠিয়েছে তাদের স্বার্থ একত্রে মিশে নানা রকম জোট তৈরী করে?"

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী যেহেতু সবচেয়ে বেশী এই জোটে বাসা বাঁধে সেহেতু তাদের কথাই বলা যাক। Communist manifesto তে মার্কস বলেছেন—এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বুর্জোয়ার সঙ্গে সংগ্রাম করে শুধু নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার স্বার্থ নিয়ে। এইজন্যই এ'রা বিপ্লবী নন, প্রতিবিপ্লবী রক্ষণশীল। মাওসেতুং এদের বলেছেন--বিপ্লবের সহযাত্রী কিন্তু বিপ্লবী নয়। আর সেইজনাই উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপন হলেই শ্রেণীসংগ্রাম শেষ হয়ে যায় না।

পুঁজিবাদী সমাজের সঙ্কট যখন ক্রমশই বাড়ে, over production যখন শ্রেণীদ্বন্দ্ব ক্রমশঃ বাড়িয়ে তোলে তখন অ-সর্বহারা বুদ্ধিজীবীরা ক্রমশঃ শ্রেণীগত বিচ্যুতির দ্বারা সর্বহারা শ্রেণীতে এসে পড়ে। অর্থাৎ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী দুটো কারণে দল ভেঙে সর্বহারা শ্রেণীতে এসে পড়ে।

প্রথমতঃ বুর্জোয়াদের সাথে প্রতিযোগিতায় জেতার মত মূলধন তাদের থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ বর্তমান উৎপাদন প্রণালীর নিষ্পেষণে তাদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের দর যায় কমে।

এছাড়া আর এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী থাকেন যারা চিরকাল বুর্জোয়া তত্ত্বকে জপ করে চলেন, নিজেদের directive elite কিংবা originative intellectual ভাবেন আর ভাবেন তাদের হাতেই ছিল এ সমাজের মোক্ষ-ভাঁড়ারের চাবিকাঠি। অথচ কিছুই করতে পারলাম না। ফাসট্রেশান্। রিপ্রেশান্। অতএব পত্রিকা অফিসের ঠাণ্ডাঘরে বসে মদ্য সেবন করে নৈরাশ্য মেলানকোলিয়ার জ্বালা ভোলা।

আর এক ধরনের বুদ্ধিজীবী যারা সরল বিশ্বাসে বুর্জোয়াতত্ত্বকে জীবন দিয়ে প্রয়োগ করে চলেন। জীবনের অনেকটা সময় যেমন করেছিলেন এইচ. জি. ওয়েলস, রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয়, রাসেল, সার্ত্রে যদিও ইনারা সমাজকে দিয়েও গেছেন অনেকখানি। সুতরাং একটা দ্বন্দ্ব অনেকটা ঘরেও নহে পারেও নহে যেমন আছে মাঝখানে' গোছের একটা দোদুল্যমানতা এদের মধ্যে প্রবল।

আমাদের সমাজে পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টিকালের একটা ছোট্ট ঘটনার কথা ভাবি। ১৮৫৭ সাল। সিপাহী বিদ্রোহের হুহুঙ্কারে বিলাতি সাহেবের দল ল্যাজ গুটিয়ে রাতের অন্ধকারে জাহাজে চড়ে বসেছিল একেবারে ঠিক সে সময়--বিশ্বস্ত নাগরিকদের সভা হচ্ছে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের হল ঘরে। বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ভারত সরকারের সেক্রেটারির কাছে ১৮৫৭—১৩ই মে পাঁচদফা আনুগত্য জানিয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ—সেদিন স্বাক্ষর-কারীদের মধ্যে ছিলেন—রাধাকান্ত দেব, কালী-কৃষ্ণ বাহাদুর, প্রতাপচন্দ্র সিংহ আরো অনেকে। আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন তাঁর উপাসনার ব্যাঘাতের জন্য মনের চঞ্চলতা নিবারণের জন্য হিমালয় ভ্রমণে গেলেন—এসব কথা আমরা সকলেই জানি।

সুতরাং এ ধরনের বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন। এখনও আছেন। ঐতিহাসিক নিয়মেই আছেন। ওয়াশিংটনে প্যোলান্ডের সলিডারিটি আন্দোলনের সমর্থনে আয়োজিত এক বুদ্ধিজীবী জমায়েতে সপ্তাহ পাঁচেক আগে কিছু মার্কিনী সমালোচক পোল্যান্ডদের শ্রমিকদের জন্য দারুন দুঃখ প্রকাশ করলেন। সবিশেষে বললেন, সাম্যবাদ=ফ্যাসিবাদ। ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে সবলরূপ। মনুষ্যত্বের মুখোশ-পরা ফ্যাসিবাদ। সুতরাং এ রকম প্রতি বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী থাকবেই। যারা শ্রেণী সংগ্রামের মিত্র নয় শত্রু বলেই চিহ্নিত হবে।

কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের মিত্র বুদ্ধিজীবী তারাই চৌএনলাইয়ের ভাষায় যারা যুগপৎ বুদ্ধিজীবী হয়েও শ্রমিক, শ্রমিক হয়েও বুদ্ধিজীবী। শ্রেণী-সংগ্রামে এ ধরনের বুদ্ধিজীবীকেই আজ প্রয়োজন।

এখন শ্রেণীসংগ্রামে বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব কি?

আমরা আগেই বলেছি বুদ্ধিজীবী সমাজের দর্শন সমাজের কাছে প্রতিষ্ঠিত করবেন। জনগণের জন্য জনগণের কথাই লিখবেন তারা। মাওসেতুঙের ভাষায় 'ফ্রম দ্য মাসেস, ব্যাক টু দ্য মাসেস'। অর্থাৎ জনগণের শিক্ষক তাঁরা, যদিও জনগণের ছাত্রও তাঁদের হতে হবে। যেমন কোন এক সময় রুশো ভলটেয়ার মন্টেস্কু এ দায়িত্ব পালন করেন, বলা বাহুল্য, তাঁদের অবদান তাঁদের যুগের স্বাপেক্ষে বিচার করতে হবে। আর আজকের বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব আজকের পটভূমিকায় বিচার্য। 'Individual thinking is the personification of social thinker' স্ট্যালিন বোধ হয় কথাটা বলেছিলেন। আজকের সমাজ চেতনাও ব্যক্তিকরণ হবে বুদ্ধিজীবীর মধ্যে, তারপর হবে তার প্রকাশ। মরিসকর্নফোর্থের ভাষায়, Every class which is active in the arena of history finds its own INTELLECTUAL REPRESENTATIVES who express its social tendencies, its sentiments and views. It is evident, therefore, that in times of profound social change when all classes are brought into activity a great creative ferment of ideas always take place.' এই idea, এই sentiment কে নিয়েই বুদ্ধিজীবী সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করবে এটাই তার দায়িত্ব।

বুর্জোয়া সমাজে বুদ্ধিজীবীরা সামাজিক সমস্যাগুলো স্পষ্ট করে দেখাবে এবং সমাজের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি যা সমাজের বাহ্যরূপের অন্তরালে কাজ করে লেনিন যাকে বলেছেন elemental force, সেই elemental force কে প্রকাশ করা। সুতরাং বুদ্ধিজীবী শুধুমাত্র সচেতন স্তরে নয়, অবচেতন বা প্রাক্-চেতন স্তরেও তার দায়িত্ব থাকে, super structure এর পরিবর্তন বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবেও তার ভূমিকা থাকে অনেকখানি।

এতখানি পড়ে অনেকে বলতে পারেন বুদ্ধিজীবীরা অনেকটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্যাটালিস্টের মত। নিজের গায়ে আঁচড়টি না লাগিয়ে তারা বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে চান। ঠিক এ রকম ক্যাটাগরিক্যালি এ রকম যান্ত্রিক ভাবে দেখলে শ্রেণীসংগ্রামে বুদ্ধিজীবীর সমস্যা বোঝা অসম্ভব।

বুদ্ধিজীবীদের প্রধান সমস্যা—চিরপুরাতন তবুও নিত্য নতুন—সেটা হলো অন্ন সমস্যা, বুদ্ধিতে পেট ভরে না, বরং অন্নে বুদ্ধি বাড়ে—তাই অন্যান্য সূক্ষ্ম চিন্তার সাথে অন্নের জীবিকার স্থূল চিন্তাটি করতে হয়, ভাবতে হয় এই existing সমাজে বাঁচার লড়াইয়ের কথা। দ্বিতীয় সমস্যাটি মানসিক। বিচারবুদ্ধি আছে বলেই বুদ্ধিজীবীর দ্বন্দ্ব আছে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের নোঙর খোলার দ্বিধা আছে। সামাজিক শ্রেণী না হলেও বুদ্ধিজীবীর আত্মচেতনার প্রাখর্য খুব বেশি তাই নির্দিষ্ট খাতে চিন্তাধারাকে পরিচালিত করার প্রবণতা বেশি। সমাজমানসের সাথে ব্যক্তিমানসের দ্বন্দ্ব এ স্তরেই তাই সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ Contradiction of Superstructures, যেখানে পুরোনো মূল্যবোধ আর নতুন মূল্যবোধের লড়াই বাধে। 'লড়াই বাধে মিথ্যা এবং সাচ্চায়।' তাই নানান আপোস নানান সমঝোতা—লোভের কাছে নতিস্বীকার। বিদ্যা-বুদ্ধির Capital খাটিয়ে 'সারপ্লাস' লাভের জন্য তৎপরতা, খোলাবাজারে চড়ামূল্যে বিদ্যার বিনিময়—এসব তো আছেই। যাই হোক এইভাবে নানান টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে নানা ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলা। একথা ঠিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্রায়সই ক্ষণিক আবেগ দিয়ে আন্দোলন করেন তারপর সব ছেড়েছুড়ে বাড়ি গাড়ি টেলিফোন ফ্রিজ টিভির মধ্যেই, জাগতিক সাফল্যের চোরাবালির মধ্যেই ডুবে যান। এভাবে বুদ্ধিজীবীরা নতুন জেনারেশনের কাছে আদর্শ স্থাপন করেছেন আদর্শহীনতার। সচেতনার পর এ ধরনের আকস্মিক appalling শ্রেণীসংগ্রামে উপকারের চেয়ে অপকার করে অনেক বেশি। অতি বামপন্থী বিচ্যুতি, কৃষক-শ্রমিক থেকে দূরে সরে আবেগ নামক বিপ্লবতা, মনীষীদের মর্মর মূর্তির গলা-কাটা—এসব কিছুই বুদ্ধিজীবীর সমস্যা। সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যাখ্যা নয়, এগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে পুরো সমাজের ঐ সময়ের পটভূমিকায় কেননা সেটাই হবে মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ এবং যথার্থ বিশ্লেষণ।

সবশেষে বলব বুদ্ধিজীবীরা সমাজের প্রয়োজনীয় অঙ্গ যদিও তাঁদের ক্ষতি করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। স্টালিন ও ওয়েলসের কথোপকথনে যেটা স্টালিন বলেছেন এইভাবে যে —The 'technical intelligentsia can under certain conditions perform miracles and greatly benefit mankind. But it can also cause great harm.'

তাই বুদ্ধিজীবীদেরও চালনা করার একটা সংগঠিত জাতীয় নেতৃত্ব প্রয়োজন হয়, বিভ্রান্ত নেতৃত্বে যদিও অনেক সময় বুদ্ধিজীবীরাও আলোকবার্তা পাঠায় আবার অন্যভাবে বিভ্রান্ত নেতৃত্বে অনেক সময় বিভ্রান্তও তারা হয়ে পড়েন, এক্ষেত্রে তাই সংগঠন ও বুদ্ধিজীবী একে অন্যের পরিপূরক। সেটা বিপ্লবের আগে কিংবা পরে সকল সময়ই। সবশেষে বলব সেই গল্পটা যেখানে এক ভদ্রলোক আবহাওয়া দপ্তরের অফিসারকে গালিগালাজ করছেন কেননা আবহাওয়া দপ্তর ঘোষণা করেছে সন্ধ্যেবেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহকারে ঝড়বৃষ্টি হবে এবং ঐ ভদ্রলোকের সেদিন একমাত্র কন্যার শুভবিবাহ।

আজকের বুদ্ধিজীবীকে এ ধারণায় স্থিতপ্রাজ্ঞ হতে হবে যে ঝড়বৃষ্টি হবেই, আবহাওয়া দপ্তরের অফিসারকে গালিগালাজ করা শিশুসুলভ অর্থহীনতা। নিউটনের লাল আপেল যেমন সেদিন নিউটন বিকেলবেলা বাগানে না গেলেও পড়ত, শ্রেণীসংগ্রাম তেমন বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় 'কাজ করে যায় গোপনে গোপনে'। negation of negation -এর তত্ত্ব মেনে সে একটা দৃশ্যপট থেকে আর এক নতুন দৃশ্যপটে ছুটে চলে। বুদ্ধিজীবী নতুন দৃশ্যপটের নতুন খবর পৌঁছে দেবে মানুষের কাছে।

গণমুখী সাহিত্য : লেখক ও পাঠক

ঋতব্রত চক্রবর্তী

আমাদের দেশে একটা প্রচলিত কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে আমরা সাহিত্যের চর্চা করি অবসর বিনোদনের জন্য। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর দেহের অথবা মনের ক্লান্তি দূর করার জন্য অথবা কিছুটা অবসর সময় ব্যয় করার জন্যই যেন সাহিত্যের সৃষ্টি। মনের খোরাক বা চিন্তা কোনো উপাদান সাহিত্যে আছে বলে যেন মনে হয় না। এই মারাত্মক ধারণাটা বেশ কিছু মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে যেতে বসেছে। এই ধরনের ধারণা যদি ছোটবেলা থেকে মনের ভিতর বদ্ধমূল হয়ে যায় তাহলে সেটা মানবসমাজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। সাহিত্য যে মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য সেই বোধটাই এর ফলে লুপ্ত হয়ে যাবে। ফলে মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাহিত্য এমন একটা রূপ নেবে যেটা সাহিত্যের অবলুপ্তি ঘটাতেই সাহায্য করবে। সেটা সমাজের পক্ষে হবে বিষতুল্য। কারণ, প্রতিটি বোধ-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষই বিশ্বাস করে যে সমাজ পরিবর্তনে সাহিত্যের দান অপরিসীম। শুধু তাই না সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ারও সাহিত্য। একথা আজ পরীক্ষিত এবং ঐতিহাসিক। ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করে পৃথিবীর যেখানে বিপ্লব ঘটেছে সব জায়গাতেই সাহিত্য অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এ হেন হাতিয়ারকে যদি শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের সামগ্রী হিসেবে দেখতে শুরু করা হয় তাহলে সেটা যে কতো মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে এটা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা অনেক সময় দেখি যে কিছু মানুষ তাদের নিদ্রার আগে বইয়ের পাতায় খানিকটা চোখ বুলিয়ে নেয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার গর্বের সঙ্গে বলে থাকে যে যতো রাতই হোক ঘুমোবার আগে তাকে দু-এক পাতা বই পড়ে নিতেই হয়। তা না হলে নাকি তার ঘুমই আসে না। এটা কোনো সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ না। এটা একটা নেশা। সন্ধ্যার অন্ধকার নামলেই কেউ কেউ মাদকদ্রব্যের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন যে কোনো মূল্যে বা যে কোনো উপায়ে মাদকদ্রব্য সংগ্রহ করে তারা নেশা করে থাকে। ঘুমের আগে বই পড়াটা ঠিক তাই। সেই কারণেই এতে না আছে সুস্থ চিন্তা—না আছে কোনো বোধবুদ্ধি। সুতরাং যারা ঘুমের বটিকা হিসেবে বইকে ব্যবহার করে তারা আর যা-ই হোক না কেন কিছুতেই সুস্থ চিন্তাসম্পন্ন মানুষ না। কারণ, এদের কোনো বাছবিচার থাকে না। হাতের সামনে ছাপার অক্ষরে যা পায় নেশার জন্য পাগলের মতো তাই পড়ে। ক্রাইম, সেক্স অথবা নিছক কোনো কোনো উপন্যাস কিছুই বাদ দেয় না। এই কারণে এদের চিন্তাশক্তির বিকাশ তো ঘটেই না বরং চিন্তার অবলুপ্তি ঘটে। বর্তমানে এই ধরনের পাঠকের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে এই ধরনের বইয়ের চাহিদাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছু কিছু লেখক এই সুযোগ গ্রহণ করে সেক্স, ক্রাইম অথবা নিছক কোনো কিছু প্রেমের উপন্যাস বাজারে চালু করছে যার মধ্যে চিন্তা-ভাবনার কোনো ব্যাপার নেই। মানুষের জীবনে প্রেম এমন একটি জিনিস যাকে বাদ দিয়ে সুস্থ জীবনযাপন একেবারে অসম্ভব। প্রেম মানুষকে করে মহৎ। প্রেমকে বিষয়বস্তু করে পৃথিবীতে অনেক মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। মহাকাব্য-গুলোতেও প্রেম-ভালোবাসার একটা বিরাট ভূমিকা আছে। প্রেমহীন জীবন তো মরুভূমির মতো। এবং কোনো মানুষেরই সে রকম জীবন কাম্য হতে পারে না। মানুষের জীবনের এই রকম একটি মূল্যবান ও একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার নিয়ে যে কি রকম অবাস্তব ও হাস্যকর বই লেখা হয় সেটা কল্পনা করা যায় না। আবার কিছু তথাকথিত শিক্ষক ও প্রগতিশীল ব্যক্তি এই সব বই পড়ে তাদের নিদ্রার আরাধনা করে থাকে। এবং গর্বের সঙ্গে সেই কথা সর্বসমক্ষে প্রচার করে থাকে।

গ্রন্থাগারগুলোতে যখন দেখি দিনের পর দিন হেডলীচেজ আর নিককার্টার-এ ছেয়ে যাচ্ছে, মুখ লুকোচ্ছে ধ্রুপদী সাহিত্য তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে হয়। শিক্ষিত মানুষের হাতে যখন এই সব সেক্স আর ক্রাইম মার্কা বই দেখতে পাওয়া যায় এবং বাসে-ট্রামে ভীড়ের মধ্যে বেশ গর্বের সঙ্গে সেই সব বই খুলে পড়ে আবার তারাই যখন নিজের মতো দেশের ও জাতীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নেতিবাচক মন্তব্য প্রকাশ করে মানুষের নৈতিক অধঃপতনের কথা বলে তখন এইসব সুবিধাভোগী তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা ছাড়া অন্য কোনো পথ আছে বলে মনে হয় না। এরাই মন্তব্য করে যে ধ্রুপদী সাহিত্য পড়ার সময় কোথায়? সারাদিন পরিশ্রমের পর একটু রিলাক্স করার জন্য এই ধরনের বই-ই একমাত্র উপযুক্ত। রিলাক্সেশন ও রিক্রিয়েসন এই দুটো শব্দ ব্যবহার করে এরা খুব সুচতুরভাবে নিজেদের আড়াল করে রাখতে চায়। এরা জেনেও না জানার ভান করে যে বর্তমান শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যেখানে প্রতিক্রিয়াশীলচক্র খুব সুচতুরভাবে সামাজিক বৈষম্যের সত্যিকারের কারণটা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চায় সেখানে রিলাক্সেসন ও রিক্রিয়েসনের নাম করে প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা প্রচারিত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখানোটা প্রকারান্তরে প্রতিক্রিয়াশীলদেরই স্বার্থ চরিতার্থ করা হয়। এরা জেনেশুনেই নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিকে জোরদার করে। স্বাভাবিকভাবেই তাতে সাধারণ মানুষের সর্বনাশ হয়। নিজেদের পক্ষ সমর্থনের জন্য এরা সব দোষ সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থচরিতার্থ করে।

একথা অবশ্য সত্যি যে বেশির ভাগ মানুষকেই সমস্ত দিন জীবিকার প্রয়োজনে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়। আরও সত্যি যে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সকলকেই নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়—বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। কিন্তু একথা কখনোই সমর্থনযোগ্য নয় যে এই কারণেই সাহিত্য নামধারী ওই সব বিকৃত রুচির বই পড়ে সময় কাটাতে হবে। একটা কথা স্মরণ রাখার প্রয়োজন আছে যে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় সেটাই খাদ্যবস্তু না। খাদ্যের নাম করে অখাদ্য বস্তু ভক্ষণের পরিণতি সুখকর হতে পারে না। আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার যে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সমস্যা আছে বলেই আমরা এই সমাজটাকে বদলে একটা নতুন সমাজ গড়তে চাইছি। তাই বিভিন্ন সমস্যার নাম করে সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড়ো প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গী। সাহিত্যের আসরে যে যৌনতা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রচলন চলছে সেটা কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলচক্র খুব সচেতনভাবেই করছে। এই বোধটাই সকলের আগে আমাদের আনতে হবে। বিকৃতরুচির সাহিত্য পাঠে এই বোধ কখনোই আসবে না। এই বোধ আসবে সমস্ত রকম সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, বাস্তবকে স্বীকার করে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরেও প্রগতিশীল তথা গণমুখী সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে।

এটাও স্বীকার করতে হবে যে আমাদের দেশে গণমুখী সাহিত্যের সংখ্যা খুব বেশী নেই। তেমনি এ কথাও সত্যি যে গণমুখী সাহিত্য আমাদের দেশে আছে। খুবই সুখের কথা যে বর্তমানে গণমুখী সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার এটাও ঠিক যে ঝোঁক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কিছু বেনো জলও ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা আছে। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে কোন সাহিত্যকে আমরা গণমুখী সাহিত্য বলবো। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের চরিত্রকে অবলম্বন করে লিখলেই যে সেটা গণমুখী বা প্রগতিশীল সাহিত্য হবে, আর ধনিকশ্রেণীর চরিত্র নিয়ে লিখলেই সেটা প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য হবে তা কখনোই হতে পারে না। আসল কথা হলো, লেখক কি বলতে চেয়েছে সেটাই বিচার করে দেখতে হবে। উত্তরণের কোন রাস্তা দেখিয়েছে সেটাই বড়ো কথা। কোনো লেখক যদি খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনের দুঃখকে তার লেখায় চিত্রিত করে পরিণতিতে মানুষের দুঃখের সত্যিকার কারণটা না দেখিয়ে অথবা উত্তরণের কোনো রাস্তা না দেখিয়ে বর্তমান দুঃখকে অদৃষ্টের দান হিসেবে দেখায় এবং মরণোত্তর কোনো কাল্পনিক সুন্দর জীবনের অবাস্তব চিত্র এঁকে ধর্মের জয়গান করে তাহলে সেই লেখা নিঃসন্দেহে প্রতিক্রিয়াশীল। আবার কোনো লেখক যদি ধনিকশ্রেণীর জীবনের চিত্র চিত্রিত করে তাদের কদর্য রূপটা তুলে ধরে সাধারণ মানুষের ওপর তাদের শোষণের চিত্র আঁকে এবং মানুষের উত্তরণের পথ দেখায় তাহলে সে সাহিত্য নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল এবং গণমুখী সাহিত্য

বলে বিবেচিত হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আসল ব্যাপারটা হলো কমিটমেন্ট। লেখক কিসের প্রতি কমিটেড সেটাই বিবেচ্য। বর্তমান সমাজের শোষণ ও নির্যাতনের আসল রূপটা তুলে ধরে সামাজিক বৈষম্যের সঠিক কারণটা মানুষের সামনে প্রকাশ করে যে লেখক উত্তরণের রাস্তার সঠিক সন্ধান দিতে পারে অর্থাৎ বর্তমান সমাজটাকে বদলে নতুন এক সুন্দর ও সুখী সমাজের কথা বলতে পারে এবং সেই সমাজে পৌঁছোবার সঠিক রাস্তার সন্ধান দিতে পারে সেই লেখকই গণমুখী লেখক এবং তার সৃষ্ট সাহিত্যই গণমুখী সাহিত্য।

কিন্তু লেখকই শুধু কমিটেড হবে, এটা তো হতে পারে না। লেখকের সঙ্গে পাঠককেও কমিটেড হতে হবে। সকলের আগে পাঠককে বেছে নিতে হবে যে কোন্‌টা সত্যিকারের সাহিত্য। কোন সাহিত্য সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। শুধুমাত্র সেক্স আর ক্রাইম কিংবা ধর্মীয় কুসংস্কারের জয়গানে মুখরিত বাজার চলতি কিছু বইকে যদি পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হয় তাহলে সেটা শুধু সমাজের পক্ষেই না পাঠকের নিজের পক্ষেও ক্ষতিকর। কারণ, প্রতিটি মানুষকে নিয়েই সমাজ। আর পাঠকও সমাজেরই একজন। তিনি স্বতন্ত্র কোনো ব্যক্তি নন। তাই সামাজিক শোষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে তারও রেহাই নেই। তাই শুধুমাত্র লেখকরা গণমুখী সাহিত্য লিখছে বলে চিৎকার করে হেডলী চেজ আর নিককার্টার কিংবা জোলো বই পড়লেই পাঠকের দায়িত্ব শেষ হবে না। পাঠককে এগিয়ে এসে বাজারী সাহিত্য বর্জন করে গণমুখী সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। লেখক তখনই বাধ্য হবে সাধারণ মানুষের স্বপক্ষে কলম ধরতে। তখন স্বাভাবিক-ভাবেই গণমুখী সাহিত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। লেখক আর পাঠক বিচ্ছিন্ন কোনো শ্রেণী না। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টাতেই সত্যিকারের গণমুখী সাহিত্যের সৃষ্টি হবে। এ কথাটা খুবই সত্যি যে, লেখক যেমন পাঠক তৈরি করে তেমনি পাঠকও লেখক তৈরি করে। তাই এই মুহূর্তে একটা কথা বুঝতে হবে যে বর্তমান শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অবসর বিনোদন বলে কিছু নেই। রিক্রিয়েশন বা রিলাক্সেশনের নাম করে সেক্স ও ক্রাইমের পৃষ্ঠপোষকতা করলে প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থটাই চরিতার্থ করা হবে। আজকের দিনে লেখক ও পাঠকশ্রেণীকে হাতে হাত মিলিয়ে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে গণমুখী সাহিত্য সৃষ্টিতে এগিয়ে আসতে হবে। উভয়ের দায়ই সমান। তাই প্রতিটি সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন মানুষকে এক-সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে হবে। যারা খুব সচেতনভাবে সেক্স ও ক্রাইম-মার্কা সাহিত্যের প্রচার করে তারা ঐক্যবদ্ধ। তাই যারা এদের বিরোধী অর্থাৎ যারা সুস্থ সমাজের কথা চিন্তা করে তাদেরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে হবে। এ ছাড়া বর্তমানে অন্য কোনো পথ নেই।

[গতিপথ : ১৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ঠিক সামনে। মাটির নিচ থেকে নয়। কণ্ঠ-স্বরটা এতক্ষণে উঠে এসেছে উপরে।

তুমি কেডা?

আসাদ মল্লিক, নাম শুনিস নি বাপ।

ছিলে কোথায়?

এহেনে এই মাটির নিচে, গোরস্তানডা বেচি দিলি বাপ!

এহেনে এই মাটির তলে শুই আছি কতকাল, সেই দশ গণ্ডা যে আর মানষে নে নিল, দে দিলি গোরস্তানডা!

গোরস্তান দে দিলি, আমি এহন যাই কোথা বাপ।

চারপাশের বন্ধ গুমোট পৃথিবীতে পচা মাটির গন্ধ ছড়ায়। ভক ভক করে পচা মাংসের গন্ধ ওঠে। সে দ্যাখে গোরস্তান ভেদ করে উঠে আসছে আদিপুরুষ।

আমি কী করব, এ ছাড়া আমার যে ব্যাচার আর কিছু নাই গো!

বাপ আমার, এহন আমি যাই কোথা, হায় পীরসায়েব!

কাদের মল্লিক সেই বুক চাপা অন্ধকারে ঘুর-পাক খায়। রাত গভীরে মানুষের গতিপথ থমকে দাঁড়ায়। কোন্‌ সুদূর অতীতে বেঁচে থাকার জন্য তারা প্রবাহ বদলে নিয়েছিল। এখন সে প্রবাহেও বিরাট চড়া। কাদের মল্লিক চড়ায় আটকে হাসফাস করতে থাকে। তখন দূর থেকে পীর গোরাচাঁদের গান করতে করতে কারা যেন গাঁয়ে ফিরছিল।

[বইপত্র : ২২ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

এবং একথা অনস্বীকার্য দেবদাসীদের প্রতি এক অকৃত্রিম ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই পর্বগুলির মধ্যে মিশে যায় নি। সূচীপত্রের দিকে একবারটি চোখ রাখলেই বোঝা যাবে আলোচনার উদ্দেশ্য। সূচনা বিশ্বপটভূমি; প্রাচীন ভারতে দেবদাসী-প্রথা; অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদপট; ধর্ম-বিপর্যয়ের যুগ; দেবদাসী প্রথার বর্তমান প্রেক্ষাপট; দেবদাসী সংগ্রহ ও সমাজ বিন্যাস; দেবদাসী প্রথা এবং ইহার নিরীক্ষা; অচলায়তন ভাঙ্গার বোধ; দেবদাসী প্রথার বিবর্তন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে যতটা সম্ভব আলোচনার পরিধি বেড়েছে এবং প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাই সুলিখিত তথ্যবহুল এবং সমস্যার প্রতি তন্নিষ্ঠ। ভূমিকাতে বলা হয়েছে কিভাবে এই প্রথা বাংলাদেশে বিলুপ্ত হয়েছে অথচ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধে নানা আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে। কিন্তু আরো বহু তথ্য প্রয়োজন। আলোচনায় কিন্তু বেশ কিছু ফাঁক থেকে গেছে। উল্লিখিত প্রসঙ্গে বলা যায় তত্ত্বের দাবী ততটা নয়; প্রয়োজন বিশ্লেষণমুখী যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী। সমগ্র পুস্তকটির পরি-প্রেক্ষিতে অনুভূত হয় যে লেখিকার চিন্তার দারিদ্র্য এক্ষেত্রে দায়ী নয়। দায়ী বিষয় বস্তুর প্রতি তার বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা। আশা করা যায় পরবর্তীকালে পুস্তকটির নবতম সংস্করণে এ প্রসঙ্গে চিন্তার অবকাশ থাকবে।

সমস্যাটির ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথা ধর্মীয় প্রেক্ষাপটকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং খুব সংক্ষেপে হলেও ভাববাদী চিন্তাধারার প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে এবং এদিক দিয়ে বলা যায় লেখিকার সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপণ সঠিক এবং সচেতন। তাছাড়া পুস্তকের শেষ মলাটে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পুস্তকটির উদ্দেশ্য আরো পরিষ্কার করে তোলে। দেবদাসীদের সমস্যাটি নিয়ে বিভিন্ন সমাজসচেতক কাজ করেছেন এবং প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল প্রথাটির মূলোচ্ছেদ। সমাজ এদের কিভাবে গ্রহণ করবে বা পর্বান্তরে সমাজে এদের স্থান কোথায় এ প্রসঙ্গে কোন গঠনমূলক চিন্তাধারার হদিস এমন কি আলোচ্য পুস্তক-টিতেও মিলল না। নবরূপে সমাজে কিভাবে প্রথাটিকে চালু রাখার প্রচেষ্টা চলেছে বা লোকসংস্কৃতির নামে কিভাবে লাম্পট্যের সাধনা চলেছে—লেখিকা সে বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছেন। ধন্যবাদার্হ কিন্তু দুষ্ট ব্যাধির মতন এই 'প্রথা' সমাজের গঠনে কেন থেকে যাবে সেই সম্বন্ধে পরিষ্কার মতামত রাখেন নি। তা হলেও প্রসঙ্গটির প্রতি লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গীর সাহসিকতা আমাদের চিন্তা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে—নিছক মনোরঞ্জনের জনাই যে তার পরিশ্রম নয় সে কথা তিনি না বল্লেও চলত। সিদ্ধার্থ হোমের রেখা পুস্তকটির অলঙ্কার। প্রচ্ছদ সুন্দর—এবং একটি কথা খুব ভয়ে ভয়ে জানতে ইচ্ছা করে দামটা কি সচেতনভাবে স্থির করা হয়েছে?

অরুণ রায়

আকুপাংচার—চীনে ও ভারতে

ডাঃ বিজনকুমার মজুমদার

'আকুপাংচার' কথাটা এখন আস্তে আস্তে আমাদের দেশের মানুষের কাছে পরিচিত শব্দ হয়ে যাচ্ছে, বিশেষতঃ শহরাঞ্চলের মানুষের কাছে। আকুপাংচার কথাটার মানে হল 'আকুস' অর্থাৎ সূঁচ এবং পাংচার অর্থাৎ ফোটানো। চীনা ভাষায় বলা হয় 'চেন-চিউ' অর্থাৎ আকুপাংচার ও মক্সিবাশ্চান। এই চিকিৎসার উৎপত্তিস্থল চীন। চীনে এটি বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। প্রায় চার হাজার বছর আগেকার চীনা গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী পর্যায়ে চীনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এই পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছে এবং আস্তে আস্তে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর প্রচলন হয়েছে। আকুপাংচার একটি ফলিত বিজ্ঞান, অর্থাৎ মানুষ ব্যবহারিক জীবনে বিভিন্ন ফল প্রত্যক্ষ করে সেগুলিকে সূত্রবদ্ধ করে এই পদ্ধতির সৃষ্টি করেছেন। কথিত আছে চীনে আগে যুদ্ধ বিগ্রহের সময় অস্ত্র বা তীরের আঘাতে মানুষের দেহে যে ক্ষত সৃষ্টি হত তার ফলে দেহের কিছু কিছু রোগ বা যন্ত্রণা উপশম হত। এর পরে পরীক্ষামূলকভাবে দেহের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্র প্রবেশ করিয়ে দেখা হত কি কি রোগ ভালো হয়। এই অস্ত্রই ক্রমশঃ সূঁচ ফোটানোর রূপ পায়। এই সূঁচ প্রথম দিকে পাথরের (প্রস্তর যুগ) ছিল। পরে বাঁশ, তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপা থেকে তৈরী হত। বর্তমানে স্টেনলেস স্টীলের সূঁচ ব্যবহার করা হয়। আগুনের ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকে মক্সিবাশ্চান অর্থাৎ এক ধরনের গাছের পাতা জায়গায় অবস্থিত এবং বর্তমানে শরীর বিজ্ঞানের সময়ে আবিষ্কৃত হয়ে বর্তমানে সারা দেহে প্রায় ৩৬০টি নিয়মিত আকুপাংচার বিন্দুর অবস্থান পাওয়া গেছে এবং এ ছাড়াও কছু কিছু সংবেদনশীল বিন্দু আবিষ্কৃত হচ্ছে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। আকুপাংচারের এই বিন্দুগুলি দেহের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত এক বর্তমানে শরীর বিজ্ঞানের (anatomy) জ্ঞান দিয়েই এই অবস্থানগুলিকে প্রকাশ করা হয়। প্রাচীন চীনা দর্শন অনুযায়ী এই বিন্দুগুলি দেহের মধ্যে নিয়মিত ২৬টি নালীর (channel) উপর অবস্থিত এবং ঐ নালীগুলি দেহের আভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ দেহ-যন্ত্রগুলির সঙ্গে বাইরের যোগসূত্র। ঐ নালী দিয়ে জীবনীশক্তি ('ছি'), রক্ত ও দেহরস প্রবাহিত হয়। শুধু তাই নয় ঐ নালীগুলি দুইটি বিপরীত ধর্ম সম্পন্ন 'ইন' এবং 'ইয়াং', প্রকৃতি ও পুরুষ এইভাবে বলা যেতে পারে। স্বাভাবিক-ভাবে এই দুই বিপরীতধর্মী দেহযন্ত্র এবং নালী-গুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, ভারসাম্যও রয়েছে—তার ফলেই দেহের সুস্থতা বজায় থাকে। যদি এই ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটে তাহলেই রোগের উৎপত্তি হয়। এবং আকুপাংচারের কাজ হল ঐ ভারসাম্যহীন নালীগুলিতে সূঁচ ফুটিয়ে 'ছি', রক্ত ইত্যাদির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা।

প্রাচীন চীনা দর্শনের মধ্যে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক দিক থাকলেও এই দর্শন দিয়ে আকুপাংচারের কার্যকারণ পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না। যে নালীগুলির কথা বলা হল তার বস্তুগত অবস্থানও এখনও দেহের মধ্যে পাওয়া যায় না অর্থাৎ শব ব্যবচ্ছেদ করে বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে না। অনেকটাই কাল্পনিক। তবে এটা দেখা গেছে যে অনেক সময় একটি দেহযন্ত্রের রোগ হলে (যেমন ফুসফুস), দেহের কতকগুলি বিন্দুতে (হাতে ও বুকে) ব্যথার সৃষ্টি হয় অথবা গুটির (nodule) সৃষ্টি হয়। ঐ বিন্দুগুলিকে রেখায় যোগ করলে আকুপাংচারে বর্ণিত নালীর সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। চীনে এই নালীর অস্তিত্ব নিয়ে দু'রকমের মত আছে। বর্তমানে এই নালীর অস্তিত্ব নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে চীনসহ পৃথিবীর বহু দেশে। আপাততঃ যেটুকু হদিশ পাওয়া গেছে তাতে বলা যায় যে আকুপাংচারের বিন্দুগুলি কোন না কোন স্নায়ুর (nerve) উপর অবস্থিত। কিন্তু শুধু স্নায়ুগত অবস্থান দিয়ে আকুপাংচারের কার্যকারিতার পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আকুপাংচারে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা করা হয়। সাধারণতঃ যে সমস্ত রোগ অ্যালোপ্যাথিতে বিশেষ ভাল করা যায় না সেগুলোতেই আমরা বেশী প্রয়োগ করে থাকি। চীনে এখন আকুপাংচারের প্রভূত উন্নতি হচ্ছে। চীনের ১০টি প্রদেশের ১৪টি বড় বড় হাসপাতালের প্রত্যেক জায়গায় আকুপাংচারের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে এবং এ নিয়ে গবেষণার ব্যবস্থাও আছে। শুধু তাই নয় চীনের প্রত্যেকটি ছোট বড় হাসপাতালে প্রাচীন চীনা চিকিৎসা বিভাগ (আকুপাংচার ও গাছ-গাছড়ার ওষুধ) খোলার জন্য চীন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শুধু আকুপাংচার নয়, গাছ-গাছড়ার ওষুধকেও চীনে জনপ্রিয় করা হচ্ছে এবং গবেষণা করে উন্নত করা হচ্ছে। তার ফলে চীনে চিকিৎসা ব্যবস্থায় অপূর্ব সাফল্য আসছে। আকুপাংচার দিয়ে (কিছু কিছু ক্ষেত্রে গাছ-গাছড়ার ওষুধ সহ) গলব্লাডার থেকে পিত্তপাথর (gall stone) বের করে দিচ্ছেন—এর জন্য রোগীর মল থেকে সংগৃহীত বেরিয়ে যাওয়া পিত্তপাথর কিডনী স্টোন, অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস ইত্যাদি রোগও আকুপাংচারে চিকিৎসা করা হচ্ছে, যার ফলে আর অপারেশন করতে হচ্ছে না অথবা আরও সুস্থ অবস্থা আসা পর্যন্ত অপারেশন স্থগিত রাখা যাচ্ছে। নানকিং-এর একটি হাসপাতালে আকুপাংচার দিয়ে অ্যাকিউট বেসিলারী ডিসেন্ট্রীও ভাল করা হচ্ছে। এই রোগে আকুপাংচার করে শতকরা ৯৫ ভাগ রোগীকেই ভাল করে দেওয়া হচ্ছে কোন ওষুধ ছাড়াই। ভাবুন তো আমাদের মতন গরীব দেশের গ্রামে এই রকম চিকিৎসা কত উপকারী। আকু-পাংচার দিয়ে আরও অনেক রোগের চিকিৎসা করা হচ্ছে—হার্টের রোগও। এ-সবই হচ্ছে অধিকতর প্রয়োগ ও গবেষণা দ্বারা লব্ধ আকু-পাংচারে নতুন নতুন সংযোজন। আকুপাংচার অ্যানেস্থেসিয়া হল আর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। মাত্র ১৯৫৮ সালে এই পদ্ধতি শুরু হয় চীনে। দেহের কয়েকটি জায়গায় সূঁচ ফুটিয়ে দেহের বিভিন্ন জায়গায় বেদনা অনুভূতি কমিয়ে ফেলা যায় ফলে ঐ স্থানে অস্ত্রোপচার করলে রোগীর যন্ত্রণা অনুভূতি প্রায় থাকে না বললেই চলে। এইভাবে বিভিন্ন অপারেশন করা হচ্ছে এমন কি হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, মস্তিষ্কের অপারেশনও সফলভাবে করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে সুবিধা হল যে রোগী সম্পূর্ণ জেগে থাকে, তার ফলে অজ্ঞান অবস্থার প্রতিক্রিয়াগুলো হয় না। এছাড়া যে সমস্ত রোগীর হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, লিভার বা কিডনি দুর্বল থাকে এবং এজন্য অজ্ঞানকারী গ্যাস সহ্য করতে পারে না, তাঁদের পক্ষে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী। এ ছাড়াও এই পদ্ধতি সহজ ও নিরাপদ এবং খরচ নেই বললেই চলে। ভারতে কয়েকটি স্থানে এই পদ্ধতিতে কিছু কিছু অপারেশন শুরু হয়েছে।

এটা ঠিকই যে আকুপাংচার দিয়ে সব রোগ সারানো যায় না অথবা যে সব রোগের চিকিৎসা করা হয় সেই সমস্ত রোগই ম্যাজিকের মতন সারিয়ে ফেলা যায় না। কিন্তু এই চিকিৎসায় তথাকথিত দুরারোগ্য রোগগুলিতে যে উপশম পাওয়া যায় (অনেক ক্ষেত্রে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত করে) তা রোগীর পক্ষে খুবই সহায়ক। সারা চীনেই দেখেছি প্রাচীন দেশীয় চিকিৎসা ও আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসার সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চলেছে। দুই পদ্ধতিরই ভালো দিকগুলোকে একত্রীকরণ করার প্রক্রিয়া চলছে। এক্ষেত্রে বিশেষ কোন পদ্ধতির প্রতি চিকিৎসকদের গোঁড়ামি দেখি নি। বরং দেখেছি প্রত্যেক পদ্ধতির প্রতি চিকিৎসকদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সেই সঙ্গে নিজ পদ্ধতিকে আরও আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক করে তোলার প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সমন্বয় করার প্রক্রিয়া। চীনে এইভাবে সৃষ্টি হচ্ছে "নিউ মেডিসিন" যা সমগ্র চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে মনে করি।

ভারতবর্ষে আকুপাংচার শুরু হয় ১৯৫৯ সালে। ১৯৩৮ সাল থেকে চীনের বন্ধু ডাঃ বিজয়কুমার বসু ১৯৫৮ সালে চীনে যান আকুপাংচার শেখার জন্য এবং ফিরে এসে ভারতে এই চিকিৎসার প্রবর্তন করেন। কুড়ি বছর হয়ে গেল ভারতে আকুপাংচার শুরু হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে এখনও এই চিকিৎসা আমাদের দেশে সরকারী স্বীকৃতি পায় নি এবং বহুল প্রসারিত হয় নি। আর মাত্র ১৯৭২ সালে আমেরিকার তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি নিক্সনের চীন সফরের পরে আমেরিকায় আকুপাংচার শুরু হয়। নিক্সনের সঙ্গী কিছু চিকিৎসক চীনে আকুপাংচার প্রয়োগ (বিশেষতঃ অ্যানেস্থেসিয়া) দেখে মুগ্ধ হন এবং এর সম্ভাবনা সম্পর্কে আশান্বিত হন। বর্তমানে আমেরিকার কয়েকটি প্রদেশে আকুপাংচারের স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এর উপর রীতিমত উচ্চস্তরের গবেষণা চলছে।

ডাঃ বসু ভারতে বেশ কিছু ডাক্তারকে এই পদ্ধতি শিখিয়েছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে আরও বেশী সংখ্যক ডাক্তার এই পদ্ধতি শিখেছেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে চিকিৎসা করছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, বোম্বাই ও উত্তরপ্রদেশে এই চিকিৎসা চলছে। ডাক্তার ছাড়াও কিছু সাধারণ মানুষকেও এই পদ্ধতিতে শিক্ষিত করেছেন ডাঃ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির মতন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান যাদেরকে 'বেয়ার ফুট ডাক্তার' বলা যায়। এঁরা সাধারণতঃ কিছু সাধারণ রোগের চিকিৎসা আকুপাংচার দিয়ে করতে পারেন। এই বেয়ার ফুট ডাক্তাররা সমাজসেবা মনোভাবসম্পন্ন। তাই ব্যাপক সাধারণ মানুষের কাছে এই চিকিৎসাকে পৌঁছে দিতে পারছেন গ্রামাঞ্চলেও। এর ফলে এই চিকিৎসার জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা বাড়ছে।

কিছু ডাক্তার জাপান, তাইওয়ান, হংকং, সিংহল ইত্যাদি জায়গা থেকে সাম্প্রতিককালে আকুপাংচার শিখে এসেছেন। তাঁরাও বিচ্ছিন্নভাবে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এই চিকিৎসা করছেন। কিন্তু সব মিলিয়েও এটা সত্যি যে ভারতে আকুপাংচারের উপযুক্ত প্রসারের জন্য সক্রিয় আন্দোলন এখনও গড়ে ওঠে নি। এর প্রথম কারণ হিসাবে বলতে পারি আমাদের দেশের সরকার চরম উদাসীন। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত (আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জাপান, ফ্রান্স, রাশিয়া ইত্যাদি) ও উন্নতিশীল দেশ এই চিকিৎসার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছে এবং সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। তার ফলে ঐসব দেশের জনগণই উপকৃত হচ্ছেন! কিন্তু আমাদের দেশের সরকারকে বারংবার জানানো সত্ত্বেও এবং সরকার নিজে এ সম্বন্ধে জানা সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপই নিচ্ছেন না।

দ্বিতীয় কারণ—আমাদের দেশের চিকিৎসক সমাজের বিরাট অংশের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমের প্রতি দাসত্বের মনোভাব এবং সেই সঙ্গে নতুন কিছুকে স্বাধীনভাবে জানার মানসিকতার অভাব। আকুপাংচার সম্বন্ধে আমাদের দেশে বেশ কিছু প্রচার হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসকদের কোন সংগঠনই এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখান নি। এর একটি কারণ হতে পারে যে তাঁরা মনে করেন আকুপাংচার কার্যকরী চিকিৎসা নয়, তাহলেও তাঁদের উচিত এই চিকিৎসার অকার্যকারিতাকে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে অনুসন্ধান করে মতামত প্রকাশ করা। এঁরা কিন্তু তাও করছেন না। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে যে এঁরা আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বার্থে নতুন কিছু করা উচিত এ রকম ভাবনা-চিন্তা বেশী করেন না।

তৃতীয় কারণ—ভারত ও চীন এই দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের অভাব। তাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে যে সব বিষয়ে উপকৃত হচ্ছে আমরা তার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। ১৯৭৮ সালে যখন আমরা ডাঃ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির চারজন ভারতীয় ডাক্তার নানকিং-এ উচ্চতর শিক্ষা নিচ্ছিলাম, তখন পিকিং, সাংহাই ও ক্যান্টনে অনেক দেশের ডাক্তার এসে আকুপাংচার শিখছিলেন। শুধু নানকিং-এ গত দু'বছরে ৪০টি দেশ থেকে ৫৮ জন ডাক্তার শিখে গেছেন। আর ভারতবর্ষের মতন একটি বিশাল দেশ থেকে আমরা মাত্র কয়েকজন। সম্প্রতি চীনের আমন্ত্রণে সরকারীভাবে ভারত থেকে প্রত্যেক বছর দু'জন করে ডাক্তার চীনে যাচ্ছেন আকুপাংচার শেখার জন্য। তাও আমাদের সরকার নিয়মিতভাবে পাঠাতে পারছেন না। এর ফলে ভারতবাসীরাই আকুপাংচার সম্বন্ধে চীনের উন্নত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

চতুর্থ কারণ—ভারতবর্ষে আকুপাংচার শেখাবার জন্য এখনও কোন নিয়মিত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নেই। যদিও সরকারী ঔদাসীন্য এর কারণ, তা হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে বেসরকারীভাবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট মানের আকুপাংচারিস্ট গড়ে তোলা সম্ভব। এ ব্যাপারে সম্প্রতি গঠিত (১৯৭৭) আকুপাংচার অ্যাসোসিয়েশন অব্ ইন্ডিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

আকুপাংচার মানুষেরই সৃষ্টি। রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসেই আকুপাংচারের আবির্ভাব। আকুপাংচার সর্বরোগহর বিদ্যা নয়, এরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গেই পরস্পর পরিপূরক হিসাবে এই পদ্ধতির ব্যবহার হওয়া উচিত মানবকল্যাণের স্বার্থেই। শুধু তাই নয়, অন্যান্য পদ্ধতির মতনই এর বিকাশ ও গবেষণার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়ে ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন ক্রমবিকাশমান, এই চিকিৎসাকে ভারতের মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে। সেই সঙ্গে এই সহজ, সুলভ কল্যাণকর পদ্ধতি ভারতে প্রসারের জন্য ব্যাপক সাধারণ মানুষকেও সোচ্চার হতে হবে।

বিষ্ণুপুরের মাদুলিশিল্প

শম্ভু চট্টোপাধ্যায়

কুটিরে বা গৃহে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যকেই যদি আমরা কুটিরশিল্প বলি, তবে মাদুলিশিল্পকেও কুটিরশিল্পের মর্যাদা দিতে হবে। সুপ্রাচীন বিষ্ণুপুর শহরে রেশম-বয়ন-মটকা-তাঁত; কাঁশা-পিতল, বেলখোলার মালা বাঁশ ও বেত, শোলা, দশাবতার তাশ, শাঁখ ও চুন, অনতিদূরে পাঁচ মুড়ার মৃৎশিল্প প্রভৃতি আজ সারা বাংলা তথা ভারতের গৌরব তো বটেই, ভারত ছাড়িয়ে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সভ্য রাষ্ট্রেরই আদরের বস্তু।

মাদুলি শব্দের অর্থ চলন্তিকা অভিধানে বলা হয়েছে 'ছোট মাদলের তুল্য করচা—একে তাবিজও বলা যায় (আ. তাবী. জ.) অর্থাৎ, 'বাহুলে অলঙ্কার।' সরল বাংলা অভিধান অনুসারে কবচ শব্দের অর্থ 'বিঘ্ননিবারক মন্ত্র ভূর্জপত্রে লিখে শরীরে ধারণ করলে নানাপ্রকার বিঘ্ন নিবারিত হয়।' [ক শব্দ (বায়ু) বনচ্+ক কর্তৃ ঃ অথবা কু (শব্দ করা) অচ্ কর্তৃ। আ—'কবজ্] আর মাদুলি অর্থ কণ্ঠভূষণ।

তাবিজ কবচের যুগ শেষ। কিন্তু এখনও মানুষের সংস্কারাচ্ছন্ন মনকে আশ্রয় করে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার বেশ কয়েকটি পরিবার জীবন ও জীবিকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এই বিংশ শতাব্দীতেও, যখন মানুষ চাঁদামামাকে হাতের মুঠোয় এনে চলে গেলে মঙ্গলগ্রহে। ঈশ্বরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তৈরী করতে চলেছে কৃত্রিম সূর্য; তখন সংস্কারাচ্ছন্ন মন মাদুলি, কবচ, তাবিজে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ফুল, বেলপাতা, মাটি ভরে গলায়, হাতে বা কোমরে বেঁধে রেখে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক উন্নতির আশায়।

মাদুলি তৈরীর প্রণালী মোটেই জটিল নয়, লাগে না বেশী যন্ত্রপাতিও। প্রথমে বাজার হতে একটি টিনের প্লেনসিট কিনে এনে কিছু পিতল মিশিয়ে ভালভাবে পেটাতে হয়। যারা বাক্স তৈরির কাজ করেন, তাদের কাছেই এই প্লেন-সিট কিনতে পাওয়া যায়। পোড়ান শেষ হলে, যে সাইজের মাদুলি তৈরী করতে হবে; সেই সাইজ মতো কেটে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গোল চোঙা তৈরী করা হয়। পৌনে এক ইঞ্চি বা তারও ছোট, পাঁচ জ' এক ইঞ্চি প্রভৃতি দশ/বারো রকমের সাইজের মাদুলি তৈরী হয়। এরপর তপলা বা ঐ জাতীয় যন্ত্র দিয়ে পাশের 'টিকলি' প্রস্তুত করা হয়। লোহার গোল সরু দণ্ড টিনের ওপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলেই 'টিকলি' বেরিয়ে আসে। পরে তৈরী করতে হয় 'আংটা। ঐ টিকলী, আংটা প্রভৃতি সুতো দিয়ে মাদুলির সাথে ভালভাবে বেঁধে সোহাগা, পিতল ও ময়দা দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়, কাগজ ও সুতো দিয়ে প্রতিটি মাদুলি আলাদাভাবে করা হয় প্যাকিং। শেষে মাটি দিয়ে 'মুচি' অর্থাৎ গোল ফাঁপা ফুটবলের মতো তৈরী করে সমস্ত মাদুলি তাতে ভরে কাঠকয়লার আগুনে ভালভবে পোড়াতে হয়। সোহাগায় সাহায্যে পিতল গলে টিকলী ও আংটা মাদুলির সাথে দৃঢ়ভাবে এঁটে যায়। লোহার শিক দিয়ে আগুন নাড়তে হবে এবং হাপর দিয়ে আগুনকে জ্বালাতে হবে ভালভাবে। সবশেষে, বড় সাঁড়াশী দিয়ে বলটাকে বাইরে নিয়ে এসে খুলে দিলেই বেরিয়ে আসবে ইপ্সিত ধন।

দেড় কেজি লোহার সাথে একশ' গ্রাম পিতল মেশালেই প্রায় এক হাজার মাদুলি তৈরী হয়।

অবশ্য চাকি, বক ও চোঙ কাটার পর কিছু লোহা অপচয় হয়। বর্তমানে, পিতলের দাম বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় এসেছে যে, হয়তো ভবিষ্যতে এই শিল্প একদিন মহাকালের স্রোতে পড়ে যাবে মিলিয়ে।

বিষ্ণুপুর শহরে মাদুলিশিল্পী আছেন প্রায় পনের কুড়ি ঘর। গোটা বিষ্ণুপুর মহকুমায় প্রায় দু/আড়াইশো' পরিবার এ কাজ করেন। মাদুলি-শিল্পীদের অধিকাংশেরই উপাধি কর্মকার। অনেকেই পুরুষানুক্রমে এই কাজ করে আসছেন। এতে পরিবারের ছোট বড় সকলেই সমানভাবে শ্রম বিনিয়োগ করেন একজন দক্ষ শিল্পী দৈনিক দু/আড়াই হাজার মাদুলি তৈরী করতে পারেন। এর উপরেই অনেক পরিবার নির্ভরশীল। এর সাইজ অনুসারে দাম। বর্তমানে দাম গেছে পড়ে। হাজার প্রতি ষোল টাকা থেকে ছাব্বিশ টাকা পর্যন্ত মোটামুটিভাবে দাম পড়ে পাইকারীভাবে কিনতে গেলে। ১৩৮৫ সালের আষাঢ় মাসে দাম ছিল হাজার প্রতি ত্রিশ টাকা। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে দাম ছিল গড়ে বাইশ টাকা।

অভাব-অভিযোগ বা অসুবিধা বহু আছে। সংসার তো সমরাঙ্গণ। প্রথম ও প্রধান অসুবিধা কয়লা বা কাঠকয়লার। সাঁওতালদের কাছ হতে নগদমূল্যে কাঠকয়লার বস্তা কিনতে হয়। ধার চলবে না। সাঁওতালদেরও তো সংসার চালাতে হবে! কয়লার মূল্যসূচক তো ক্রমাগতই উর্দ্ধ-মুখী, সরকার সংরক্ষিত জঙ্গল হতে পারমিটে কাঠ আনার ঝঞ্ঝাট ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। দ্বিতীয়তঃ পিতল ও প্লেনসিটের দাম সুপার-সোনিক বেগে অগ্রসরমান কিন্তু, অপর দিকে সে অনুপাতে মাদুলির দাম বাড়ছে না। তৃতীয়তঃ শিক্ষাব্যবস্থার প্রচার ও প্রসারের ফলে সাধারণ মানুষ প্রচলিত সংস্কার ও ধ্যান-ধারণাকে ক্রমে ক্রমে বর্জন করছে। চতুর্থতঃ পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় মাদুলির চাহিদা বেশী। সেখানেই রপ্তানি হয় এই শিল্পকর্ম। বর্তমানে বছরাবধি কাল ধরে বাঙ্গালী হটাও আন্দোলনের ফলে রপ্তানি সম্পূর্ণ বন্ধ। বিহার ও উড়িষ্যাতেও বিদ্বেষের ফলে রপ্তানি ব্যাহত হচ্ছে? মার খাচ্ছে শিল্পীরা। উপোস দিচ্ছে তাদের পরিবার। পঞ্চমতঃ এদের নিজস্ব কোন সমিতি নেই এবং মাদুলিশিল্প সরকার কর্তৃক অননুমোদিত হওয়ায় ব্যাঙ্ক বা সমবায় হতে ঋণ পাওয়ার অসুবিধা। ষষ্ঠতঃ সুষ্ঠুভাবে বিক্রী বা বণ্টনের সুবন্দোবস্ত না থাকায় দালালের হাতে পড়ে লাভের গুড় খেয়ে যায় পিঁপড়েতে।

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সহ বহুবিধ সমস্যার সমাধান হওয়ার জন্য সরকার শিল্পীদের নানাভাবে সাহায্য করেন ও উৎসাহ দেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতেও মাঝে মধ্যে এই খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু, মাদুলিশিল্পীদের মনে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত এই কারণে যে আজ পর্যন্ত মাদুলিশিল্পের প্রচার, প্রসার ও উন্নতিকল্পে সরকার, ব্যাঙ্ক বা সমবায় কোন রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় নি। ফলে দারিদ্র্য এদের নিত্যসঙ্গী। অভাব ও সমস্যা এদের ঘরের আনাচে-কানাচে মহানন্দে নেচে বেড়াচ্ছে। সরকার যদি এ বিষয়ে এদের দিকে একটু দৃষ্টি দেন, তা হলে বহু পরিবারের সাথে একটি শিল্পকর্ম অপমৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পাবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—শ্রীঅনিল বংশী ও তুলসী কর্মকার এবং মধুচক্র সাহিত্যগোষ্ঠী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়ার সভ্যবৃন্দ।

গল্প

গতিপথ

অমর মিত্র

সব মুশকিল আসান করে পীর গোরাচাঁদ—পুরো গ্রামটা উঠে গেছে গোরাচাঁদের মেলায়। মেলায় নয়, ভাঁটির টানে সমুদ্রে। বিদ্যেধরীর কূলে কূলে জনসমুদ্রে জোয়ার নেমেছে।

গ্রাম বলতে যে সুশ্রী সুন্দর রূপ আমার তোমার মনে, তা এখানে পাবে না। যে বাতাস সারাদিন সমুদ্র নেচে স্থলভূমিতে আসে, তার অংশ এখান দিয়ে বয়ে যায়। পচা ডোবা আর আগান বাগানের গন্ধ বয়ে নিয়ে বাঁশবনে ধাক্কা খায়। তার ভিতরে মল্লিকপুর ধুঁকতে থাকে।

বাতাসে বিষগন্ধ যত প্রকট হবে, তুমি ততো গাঁ'র কাছে আসছ। কাদের ঝুঁকে পড়েছিল হাঁটতে হাঁটতে। মাথাটা ঘাড়ের উপর নড়বড় করছে। হাঁটু মাঝে মধ্যেই দুমড়ে ভেঙে যাচ্ছে। নৈঃশব্দ্যে অন্ধকার গভীরতর।

খালপাড়ে ওর পথ। খাল গিয়ে পড়েছে ওই বিদ্যেধরীর বুকে। এখান থেকে বড়জোর মাইল আড়াই। নদী যেমন অনেককালের, খালও তেমনি। বুড়ি বিদ্যেধরীতে জোয়ার এলে, দূর দক্ষিণ সমুদ্রের জল নদী হয়ে ঘোলাটে চলচ্ছক্তিহীন বুড়োর মত ঢুকে পড়ে এই খালে। পাকিয়ে পাকিয়ে জল মজা খালের সবটা অধিকার করে চারপাশে নিঃশ্বাস ছাড়তে থাকে। নিঃশ্বাসে নদীর গন্ধ।

বাপঠাকুদ্দা বলত নদী নয় এককালে সমুদ্রের চেহারা ছিল বিদ্যেধরীর। আর তারও আগে এ মাটি উঠেছিল সমুদ্র থেকে। তা সে, গোরাচাঁদেরও আগের কথা। এখন সেই নদী যেন নব্বুই বছরে বুড়ি, গায়ে শুধু হাড় ক-খানা। এগোতে এগোতে যেন মুখ থুবড়ে পড়েছে জলপ্রবাহ। পাঁকে পলিতে নদীর বুক এইয়া উঁচু। পাড়ে পাড়ে ঝোপ-জঙ্গল। ফাল্গুনের বাতাসে পাঁক আর ভাটফুলের গন্ধ মেশামেশি।

শীর্ণ কাদের মল্লিক আবছা অন্ধকারে খালপাড় দিয়ে হাঁটছিল। লুঙ্গির উপরে খাঁকি শার্ট, মাথায় উড়ু উড়ু রঙচটা ফেজটুপি। খাল গেছে উত্তরে, বাঁক আছে পশ্চিমে। বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে কাদের জলে চোখ রাখে। জল যায় সমুদ্রে। অন্ধকার নদীর বুক ঘন গভীর। কাদের পশ্চিম আকাশে তাকায়। সন্ধ্যের বড় তারাটা কোথায় গেল। বেশ জ্বলজ্বলে শুক্রগ্রহ! সে দ্যাখে আকাশের পশ্চিম বলো আর উত্তর বলো, কোথাও কেউ নেই। কেমন যেন ধূমসী ছায়াঢাকা অন্ধকার। আকাশের আলাদা কোন অস্তিত্বই দেখা যায় না।

ও কাদের, বাপ আমার।

কাদের চমকে মাথা নামিয়ে সামনে তাকায়। পিছনে ফেরে। কই, কেউ না তো! সে থমকে দাঁড়ায়। গুমোট অন্ধকারে সব অস্পষ্ট। কেউ কোথাও নেই, তবু কে যেন ডাকল! ভুল শুনল নাকি! মনের বিভ্রম।

কেডা গো?

জবাব হয় না। কাদের মল্লিক এগোয়। ওর শরীরে কাঁটা দেয়। গা ছমছম করে। আবার কে যেন ডেকে উঠল। ওই! হ্যাঁ, ঠিক ডাকল। আবার, আবার যেন। সে হালুকচালুক অন্ধকারে তাকায়। বড় গভীর অতলস্পর্শী। কে কোথায় কিভাবে আছে বুঝি কি করে। সব যেন গোরস্থান হয়ে গেছে।

ওই দশ গণ্ডার গোরস্থান। কে জানত ও জমির নিচে শুয়ে আছে তোমার আমার পূর্ব-পুরুষ। আর ওই তেঁতুল গাছটা। ও আকাশে মাথা তুলেছে গোরস্থানের রস নিয়ে। মানুষের অস্থির ভিতরে গাছের শিকড়।

গ্রামটা হিন্দু মোছলমানের। খালের এপার ওপার। সব হাড়জিরে হলুদ চোখের ছায়া ছায়া মানুষের বাসভূমি। বুঝি বা মানুষের জাতিপ্রবাহ অনেককাল ধরে বইতে বইতে এখানে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

সাঁকো পার হতে গিয়ে কাদের আবার শুনল, ও বাপ, এটডু শোন! মিঞা কেডা? কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করতে করতে কাদের পার হয়ে যায়।

কুথায় গিইলি বাপ?

রেস্ট্রি আপিসে, জমি বেচ্‌তি। কাদের বলে ফেলে হাঁপাতে থাকে।

অন্ধকারে সব নিথর। কীটপতঙ্গরাও থেমে আছে যেন। কাদের চমকে গেল নিজের ভিতরে। হায় আল্লা! সে কারে বলে দিল জমি বেচার কথা। যদি এখন রটে যায়। রটতে রটতে মেলায় চলে গিয়ে খবর সাত কান হয়ে পীর সায়েবের কানে পৌঁছে যায়। হায় হায়, আজ তো তিনি মাজার থেকে উঠে দাঁড়াবেন।

কাদের মল্লিক মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এগোয়। অভাবী মানুষ। সমস্ত জীবনই পেটের টান। তাই অংশ মোতাবেক জমিজমা ব্যাচে না। খুব দরকারে অন্য লোকের জমিও বেচে আসে। নিজের সব সম্পত্তি বেচে খেয়ে ও ছাড়া আর কীই বা করার আছে।

তারা বিশ পঞ্চাশ বছর আগের জমির খতিয়ান দলিল বার করে সূত্র খোঁজে কীভাবে নিজের অংশ বার করা যায়। সবই কাগজ-কলমের ব্যাপার। আসেন মৌলবী। আঁক কষেন। ফরাজী অংশ বার করেন। চাচির অংশ, নানির অংশ দাদি ফুফুর অংশ থেকে ক ক্রান্তি ক তিল ক দন্তি অংশ তোমার পাওনা। তখন সেই ফরাজ নিয়ে সে চলে রেজিস্ট্রি আপিসে। সঙ্গে খদ্দের।

কাদের কী তাই করে এল!

ও কাদের বাপ আমার, বেচলি, তোর এটটু মায়াও হল না!

কাদের মাথা ঝাঁকাতে থাকে। হায় শালা, গাঁয়ে একটা মানুষও নেই। সব উজাড় হয়ে গেছে গোরাচাঁদের মেলায়। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। গোরের মানুষগুলোও উঠে বোধয় মেলায় চলে গেছে। মানুষ বিনে সব ঠান্ডা! সে জোরে হাঁটতে চেষ্টা করে। তখন আবার শুনল—

ও কাদের, দাদি চাচা নানির কথা মনে হল না। দাদি নানি চাচা, আমি কারুরি দেখিছি নাকি। কবে ছিল কবে মাটি গেছে তার ঠিক আছে? কোথায় মাটি নেছে তার ঠিক আছে! এসব কথা মনে ঢোকানো কেন? আমি মরি নিজির জ্বালায়। দুদিন পরে ভিটে ছেড়ে পথে বসতি হবে, তখন দ্যাখবো কেডা?

কেডা কেডা কেডা? কাদের মাটিতে লাথি মারতে মারতে হাঁটতে থাকে।

কাঠাচারেক জমির উপর কেল্লার মত গাছ। আকাশে উঠে সে নিঃশ্বাস ছাড়ে। জমিটা যে কার তা হিসেব ছিল না। বেওয়ারিশ সরকারী খাস জমি। মুহুরী মতলুব্বার খুঁজে পেতে খতিয়ান দেখে বার করল এ জমির মালিক আছে।

চারকাঠায় একুশজন। সেই একুশজনের আবার জনাদশেক মাটি নিয়েছে। মরা মানুষগুলোর ওয়ারিশ জনা পঞ্চাশ। ছেলেমেয়ে বউ ভাইবোন সব ফরাজী অংশ পাবে। সুতরাং চারকাঠার অংশীদার এখন অনেক। পুরো দুপাতা লেগে যাবে তাদের নাম লিখতে।

দশ গণ্ডা অংশ কাদের মল্লিকের আব্বার। আব্বা এখন নেই। দশ গণ্ডা আট ভাগে ভাগ হবে। দুই ভাই ছ বোন। মা নেই। বোন ছটার ভিনগাঁয়ে বিয়ে হয়েছে। তারা জানেও না তাদের আব্বার নতুন সম্পত্তি বেরিয়েছে। আগের সম্পত্তি তো সব বেচে খেয়ে নিরালম্ব। কাদের এর পরের ভাই। সামসের গেছে বর্ধমানে জন খাটতে! এই সুযোগে একা দশ গণ্ডার মালিক সে। মোট সম্পত্তির বত্রিশ ভাগের এক ভাগ।

গাঁয়ে মানুষ নেই। সব গেছে হাড়োয়ায় গোরাচাঁদের মেলায়। বেচতে গেছে মুরগি ছাগল। মেলাতে জমি বিক্রি হয় না বটে, বিক্রির বন্দোবস্ত হয়। কাদের হাঁটতে হাঁটতে একটু দাঁড়ায়। মুখ ফসকে বলে ফেলল জমি বেচার কথা। রটে গেলে! এ পুরুষ ও পুরুষ পূর্বপুরুষ অবধি সবার কানে গেলে! হায় আল্লা!

তোরেব আলি বলেছিল, খুব সাবধান, কেউ যেন না জানে।

জানবে কি করে হা।

সামনে মেলা, মেলার কথাবার্তা চালাচালি হচ্চি হাতি কার না কার কানে যায়, খপর রটি গেলি তুমার বুন ভগ্নীপোত ছুটি আসপে।

তোরের আলিই নগদ পঞ্চাশ টাকায় অংশটা কিনল। বোন ভাইয়ের সব অংশ একা বেচে ফিরল কাদের মল্লিক। কিন্তু খবরটা যেন বোন ভাই থেকেও আরো দূরে চলে যাচ্ছে। যাক, না বেচলি আমার ভিটেটা ছাড়াব কি করে?

কাদের হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। ওই কোণে কার একটা ছাগল দাঁড়িয়ে না! অন্ধকারও তো পৃথিবী পুরো আঁধার হয় না। আল্লার সৃষ্টি! পৃথিবীর গা থেকে নূর নিঃসৃত হয়। সেই আলোয় সব ঠাহর হয়।

কার ছাগলগো, হায় হায় মেলায় গেলে সব, এরে নি গেলে না।

চীৎকার করতে গিয়ে বুকে হাঁপ ধরে যাচ্ছে। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ উঠছে। ছাগলটা ঠিক দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। একেবারে স্থির নিষ্কম্প। ওর কালো রঙ ক্রমশঃ অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে।

ছাগলডা কার গো?

ভক ভক করে পচা মাটির গন্ধ উঠছে কোত্থেকে যেন। গাঁ একেবারে জনশূন্য। মানুষের সাড় নেই।

হেই হেই হেই...। কাদের ছাগলটাকে তাড়ায়। কই অন্ধকারে তো কিছু নেই। থাকবে কোত্থেকে, ধুলোমাটি নিয়ে সব চলে গেছে বিদ্যেধরীর কূলে, গোরাচাঁদের মেলায়। এতক্ষণে পীর সায়েব মাজার থেকে উঠে ঘোড়ায় চেপে বসেছেন। সাদা ঘোড়া ফাল্গুনের রাতে দৌড়চ্ছে। যদি পীর সায়েবের ঘোড়া এদিকে আসে! বিদ্যেধরী বেয়ে জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায় সাদা ঘোড়াটা যদি এদিকে চলে আসে! কাদের-এর গা ছমছম করে। সে যেন শুনতে পায় অশ্বক্ষুর ধ্বনি।

সব মুস্কিল আসান করে পীর গোরাচাঁদ।

মহাবীর সত্যসাধক পীর গোরাচাঁদ আলো দিয়েছিলেন অন্ধজনকে। উচ্চবর্ণের ক্ষিদে মেটাতে চাঁড়াল, পোদ, চামার জনে জনে সব সাফ হয়ে যাচ্ছিল। দেশ ছাড়ছিল একে একে। কেউ নদীতে নৌকো ভাসিয়ে বাঘের মুখে যায়। কেউ হাঁটা-পথে সর্বস্ব খোয়ায়। চাঁড়াল, পোদ সব মরা মানুষ হয়ে থাকে।

তখন এলেন গোরাচাঁদ সায়েব।

তিনি বললেন, আমি তোমাদের মান দেব।

দলে দলে মানুষ পীর সায়েবের গা ছুঁয়ে থাকল।

পীর সায়েব বললেন, আমি তোমাদের জাত দেব।

মান আর জাত মিলে সব মানুষ জান পেয়ে গেল। মুস্কিল আসান করেন পীর গোরাচাঁদ। হাজার হাজার মানুষ হয়ে গেল মুসলমান।

রাত অন্ধকারে গাঁয়ে গাঁয়ে পীর সায়েবের গান গপ্প শোনা যায়। গপ্প কাহিনীতে অন্ধকার গাঢ় হয়। তখন কারা যেন খালের ওপারে তাকায়। মজা বিদ্যেধরীর বাতাস এসে ঘা মারে ওদের ওপর। হলদেটে চোখ স্থির অন্ধকারে জেগে। কবে, সেই কতকাল আগে সব মুস্কিল আসান হয়ে গিয়েছিল। ওরা মানুষ হয়ে উঠেছিল পীর গোরাচাঁদের হাতে। যাদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল তারাও এ গাঁয়ে আছে। খালের ওপারে। মনে হয় এই রক্তপ্রবাহ হৃৎপিণ্ডের শব্দ ওপারেও আছে। ধুকপুক ধুকপুক করছে। মানুষের এই জীবন বশ্যতার। বেঁচে থাকতে বড়মানুষের। আজ এর কাল ওর। আর মৃত্যুর পরে অন্য কারোর। ওরা সেই পরের প্রভুটাই বদলে নিয়েছে। বদলে নেয়ার পর কোন এক আসাদ মল্লিক পুরো গ্রামটার মালিক হয়েছিল। এই সব মানুষ সেই বড় নদী আসাদ মল্লিকের শাখা-প্রশাখা।

কাদের মল্লিক অন্ধকারে হঠাৎ যেন লাফ দিয়ে ওঠে, হেই বাবা পীর সায়েব আমার গুনাহ মাফ করো, হেই বাবা।

সে লাফাতে লাফাতে চলে অন্ধকারে, আর পারতিছি নে গো, পেট বাঁচাতি ভিটে যায়, ভিটে বাঁচাতি এসব করতি হয়, না হলি যে মরি যাব গো, তাই বেচি আসলাম গোরস্থান ডা, আব্বার দশ গণ্ডাই বেচিছি।

ও কাদের বাপ আমার!

আব্বার! কে ডাকে? কাদের থমকে দাঁড়ায়। নিঃঝুম হয়ে গেছে সব। শুধু সে, কাদের মল্লিক, যেন বহুরাত আধোঘুমে জেগে আছে।

কেডা কথা বল?

তোর বাপের বাপ, গোলাম মল্লিকেরে মনে আছে?

দেখি নাই, শুনিচি।

নবী মানুষ ছিল সে, পুণ্যবান, বেহেস্তে যাবে কেরামতের দিনে। এই গোরস্থানে শুয়ে আছে।

তো! আমি যে ভিটে ছাড়া।

বাপ মনে কর সে সব, এ হেন থেকে সে যাবে বেহেস্তে।

কেন শুনোচ্চো গো, আমি যে আর পারিনে পারিনে পারিনে—! বলতে বলতে কাদের বসে পড়ে মাটিতে।

টুকরো জমিটার একদিকে মেঠো পথ, একদিকে একটা ডোবা, বাঁশবাগান, অন্য দুটো দিক ঝোপ-ঝাড়ে জঙ্গলে ভর্তি। বড় তেঁতুলগাছটা যে আকাশে মাথা তুলেছে সেখানে তারার চিহ্নমাত্র নেই। সব যেন ছাইঘষা।

ওই জমির উপর পুঁটুলি অন্ধকার হয়ে এতক্ষণ একজন বসেছিল। বসে বসে শুনছিল কে যেন কতকাল ধরে ওকে ডেকে যাচ্ছে। ও চার কাঠা জমির উপর এবার লম্বা হয়। চোখ স্থির অন্ধকারে নিবদ্ধ।

এই জমির মালিকানা বের হলে সবাই মিলে বলেছিল, বরং এ জমিতে একটা ডোবা কাটা যাক। জলে চাষ হবে, আর মাছের ভাগ হবে অংশ অংশ মত। কিন্তু মাটি কয়েক ফুট কাটতেই মরা মানুষের হাড় উঠে এল।

হেই গো, এযে দেখি গোরস্থান।

আগের মানুষের বুকি কোদাল মারলাম!

সবকটা মানুষ হাঁ করে চেয়ে থাকে জমির দিকে। এ কতকালের গোরস্থান!

রাত বাড়লে নানিচাচিরা বলে, ও কী আজকের ভূঁই, ও জমির বয়সের গাছপাথর নেই, পীরের আমলের।

সবচেয়ে বুড়ো সিরাজুলও ঘাড় নাড়ে, হতি পারে, ও হল আসাদ মল্লিকের আমলের, যার নিজির ছিল গাঁখানা।

অন্ধকারে গুমোট আকাশে চোখ রেখে হাঁ করে শুয়ে আছে একটা মানুষ। একেবারে স্থির নিশ্চল। তার নিচে পৃথিবীর মাটি, তার নিচে মানুষ, তার নিচে মানুষ। গোরস্থানে একের পিঠে এক, মানুষ শুয়ে আছে।

ও কাদের বাপ আমার!

কাদের চমকে উঠে বসে। মাটির নিচ থেকে খনখনে কণ্ঠস্বর পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। সে সভয়ে গোরস্থানের দিকে চেয়ে থাকে।

কেডা গো! কাদের-এর সভয় কণ্ঠস্বর।

গোরস্তান ডা তুই বেচি এলি!

কাদের সরে বসে। মাটির থেকে যেন হিম হাওয়া উঠছে। সেই হাওয়ার কণ্ঠস্বর।

কী করব, এছাড়া আর উপায় নেই, ভিটে না বন্ধক ছাড়ালি দাঁড়াই কোথা, বিবি বাচ্চা নে বিদ্যেধরীতে নৌকোয় চাপলে বাঘের মুখি যাব, মানুষির আর অন্ন নেই, মান নেই, জেবন নেই। ভিটে বাস্তুডা পর্যন্ত নেই।

কী করব, গোরাচাঁদেরে ডাকি, সম্বচ্ছর ডাকি, তুমি আমাদের মান দেছলে, জাত দেছলে, এহনও মান দ্যাও অন্ন দ্যাও, এ বছরে আমার বউডা যেন ক্ষেতের বিষ না খায়, আর বচ্ছরে বিষ খেয়ে সে মরমর হয়েছলো।

কী করব, মানষের ঘরে সম্বচ্ছর অভাব, অভাবে মতিগতি ঠিক থাকে না, পুরুষ মানুষ বাইরির অপমান গিলতি গিলতি ঘরে এসে ভাত না পেয়ে বউবিবিরে ধরি পিটায়, বউ বিষ খেয়ে জ্বালা জুড়োয়। ডাক্তার ডাকতি ভিটে বন্ধক হয়, তাতে বিবি হয় বাঁচে না হয় মরে।

বাইরির অপমান! কেনে দেখতি পাও না এত-কাল ধরি যা যা আমাদের ছিল এহন তা আমান্দের নাই, জমি নাই পানি নাই আলো নাই বাতাস নাই, সুখ নাই স্বাস্থ্য নাই। দেহে বল নাই, আঁখিতি আলো নাই গো!

বলতে বলতে কাদের মল্লিক উঠে দাঁড়ায়। ঘুরপাক খায়। বিড় বিড় করতে থাকে, গাভীন ছাগল বোশেখ মাসে বাচ্চা দেবে, কিনবা কেউ?

ছাগলটা ঐ ঝোপের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। আর বছরে পীরের মেলায় গাভীন অবস্থায় বেচে এসেছিল, তখন দশ বছুরে ছেলেটার বুকের দোষ ধরা পড়েছিল।

ও কাদের বাপ আমার!

[শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায়]

উলঙ্গ—আধিঁয়ারে

শুভময় মণ্ডল

প্রত্যহের পৃথিবীতে—আমাদের আকাশদ্বীপে, উলঙ্গ আঁধিয়ারে
সব মরা পথ—শীতার্ত পথ—শিলেয় পথ জড়াজড়ি করে
মিশে গেছে কোন এক আলোকভূক গহ্বরে,
শঙ্খ-বন্ধ মৃত সর্প-সর্পিণীর মতো। বাতাসের ঢেউ—
প্রশান্ত মহাসাগরের নৈশ-অতিথি অন্ধকারে,
শিশ্নোদরপরায়ণ স্রোত, অদ্ভুত নিস্তেজ, লম্পট নাবিকের মতো
বন্দর-বারবণিতার নিস্খোলস ক্রোড়ে।
ব্রাত্য আলোক। কুলীন অন্ধকারে কিলবিল শুওরের ফণা।
মাটির সজ্জা থেকে, পৃথিবীর সমস্ত চোখের প্রান্তর হতে
মুছে গেছে রৌদ্রের রস, চেতনার কবোষ্ণ কণা।
পৃথিবীর—মাতা ধরিত্রীর—জাতেদের হাতে,
আমাদেরই তুলে দেওয়া শিধু—শিরার আহার।
আরও এক পরিশীলিত বিকার,
আমাদের জীবনের প্রাণে, আমাদের সৃজনের ঘ্রাণে।
উজ্জ্বলা আঁধারের অবৈধ প্রণয়ে, মাকড়সা মিথুনে—
বাতাসের বর্তুল স্তনে, উপাঙ্গে, অধরে, জঘনে
কেঁপে ওঠে সূর্যের'ও শীৎকার?!

বিজ্ঞাপন

অমিতাভ বিশ্বাস

স্তরে স্তরে নেমে আসা
রাত্রির স্তনে পুষ্ট একটা ঘূর্ণি—ও।
তখন পূব আকাশের স্তিমিত নিশীথের বাতাসে
শুকতারার গন্ধ।—
এ দিকে লাগামহীন বল্গা ঘোড়ার পরিক্রমা—
ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি কণায় তার খুরের ফোটা,
শুরু হল অশ্বমেধ যজ্ঞ।
কে এক তুরিয়ানন্দ সে, নিঃসীম
অনন্তের অধীশ্বর—
আজ তার অভিষেক।
তামাম্ এ পৃথিবীতে সে এক বিস্ফোরক
রাত্রির আকাশে সে এক ফেরার
শীতের যন্ত্রণার উল্কাপিণ্ড;
সাম্যের ছাড়পত্র সে
এ পাড়ার (পৃথিবীতে) বিপ্লব;
উপসংহারে—সেই সাদা পায়রা।

আমরা এখন

সমর চন্দ

আমার হাত পাতা রইল
তোমার হাত উপুড়
এমনি ভাবেই রাত কাটছে
প্রজ্জ্বলন্ত দুপুর।

আমার কপাট আলতো রাখা
তোমার কপাট খোলা
হাওয়া হাসছে উড়ুম দাড়ুম
বসন্ত পথ ভোলা।

আমার হাতে হাত রইল
তোমার পাশে পা
ধুলোয়-কাদায় পথ গড়াচ্ছে
রক্ত খাবি খা।

এখন শুধুই ঘাম ঝরাচ্ছি
এটাই সমীচীন
ফুট-ফুটে এক ফুলের মত
কুঁড়ি-বন্ধ দিন।

খরার বিরুদ্ধে

কাজী মুরশিদুল আরেফিন

মন্থর দুপুরবেলা পথঘাট নির্জন—
কোথাও কাক ডাকছে
একটা শকুন চক্রাকারে আকাশে উড়ছে
পুকুরে জল নেই, নদীতে জল নেই
মানুষের ভিতরে আছে উত্তাপ
সূর্যের আলোয় আছে তাপের আগুন
খরায় পুড়ছে এখন ফসলের ক্ষেত,
বন্ধুরা এদিকে কেউ এসো না—
গ্রীষ্মের তাপ লেগে যেতে পারে।
সমস্ত উষ্ণতা এখানে জমে থাক
আগুন জ্বালাতে তাপ চাই,
এসো, প্রত্যেকের বুকের ভিতরে
তীব্র খরার মতো, আগুনের মতো
উত্তাপ সঞ্চয় করে রাখি।

খরার বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ
শক্ত পাথরের সঙ্গে
আমাদের নিদারুণ সংগ্রাম;
আমাদের সব রস শুষে নেয় খরা;
এসো, জীবনের সবটুকু তাপ নিয়ে
শোষণের বিরুদ্ধে, খরার বিরুদ্ধে
বৃষ্টির জন্যে লড়ে যাই।

কবি তো অনেক এই দেশে, সার্থক
জনমদের মহতীসভায়
ছড়ায় বিদ্বেষী বাক্
যখন হাজার শিশু রক্তকর্দমের মতো
পড়ে থাকে প্রকাশ্য রাস্তায়

'আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ'—
এ বছরের রবীন্দ্র পুরস্কারের শিরোপা পাওয়া কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম মনে হতেই মনে পড়ে গেল এই পরিচিত পংক্তিটি।

কবির তো অভাব নেই। কবিতা প্রকাশেরও এখন ঢালাও সুযোগ। অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখি বুক ঠুকে লিট্ল্ ম্যাগাজিনগুলি গ্রুপ থিয়েটারের মতনই একবগ্গা।

কিন্তু অভাব সাহসের। কেউ মাথা নিচু করেন বহুল প্রচারিত পত্রিকার চোখরাঙানির সামনে—আবার কেউ বা রাষ্ট্রশক্তির উদ্যত মুষ্টি দেখে শংকিতচিত্ত।

একজন কিশোর ছিল, একেবারে একা
আরও একজন ক্রমে বন্ধু হল তার।
দুয়ে মিলে একদিন গেল কারাগারে;
গিয়ে দ্যাখে তারাই তো কয়েক হাজার।

তবে তার মাঝেও কলমকে শাণিত অস্ত্রের মতো ব্যবহারে টংকার তোলেন অনেকে। যদিও সংখ্যায় তাঁরা বিপুল নন্—হয়তো বা মার্জনার অভাবে কিছুটা অপুষ্টও অনেক সময়।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই সাহসী বাতাসের প্রতীক। সমাজে বা দেশে কোনো অন্যায়—কোনো অশুভ কিছু ঘটলেই গর্জে ওঠেন বীরেন্দ্র। রিএ্যাক্ট্ করেন। হয়তো অনেক সময় তাঁর প্রতিক্রিয়া বেশীর ভাগ মানুষের কাছে সঠিক বলে মনে হয় না। কিন্তু তিনি রিএ্যাক্ট্ করেন এটাই আসল কথা। অনেক তাবড় তাবড় জনপ্রিয় কবি যখন পত্রিকা মালিকের কাছে বিবেককে বন্ধক রাখেন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন

বীরেন্দ্র তখন নিঃশঙ্কচিত্তে শত্রুর দিকে সুস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশে দ্বিধান্বিত হন্ না।

'গ্রহচ্যুত' বা 'তিন পাহাড়ের স্বপ্ন'-তে আমরা আবার অন্য বীরেন্দ্রকে দেখতে পাই। তরল প্রেম। নরম সুর। মিষ্টি ভাষা। সব ছাপিয়ে এক নিবিড় অন্তরঙ্গতা। তারপর ধীরে ধীরে এল 'বাবুর জন্য', 'মৃত্যুত্তীর্ণ' 'লখিন্দর', 'জাতক', 'মহাদেবের দুয়ার' ইত্যাদি। রসজ্ঞ পাঠক কবির ক্রমবিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্য করবেন। বদলে যাচ্ছে কবির শব্দ-চয়ন, রূপকল্প, বিষয়বস্তু। এলো '৬৬-র খাদ্য আন্দোলন। কবি সরব হলেন। অনেক সময় তাঁর লেখা শ্লোগান বলে মনে হয়েছে। কিন্তু তা মানুষকে উদ্দীপিত করেছে বারংবার। 'কার মুখ দেখে ভোর হবে,/ডিসেম্বর? কোন ঘোষ অথবা সেনের?/ঘোষ তো অনেক।'—মনে হতে পারে কবিতা কোথায়? কিন্তু সাম্প্রতিকতা কবিতায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে যখন কবি মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করেনঃ

তুমি কি এদেরই মুখ দেখে আজ ভোরবেলাকে
নরকের মতো জানবে, ডিসেম্বর? নাকি.....

ঐ টকটকে নিশান
....
বুকের মধ্যে নিয়ে.....
চৌমাথার মোড়ে এসে দাঁড়াবে নির্জন! চারদিকে
নক্ষত্র ধ্যানাসীন
একটি সূর্যের স্তবে। জয় হবে। নতুন জন্মের।
মানুষের।

সত্তরের দশকে যখন প্রখ্যাত কবিকুল বৃহন্নলা—বীরেন্দ্র তখন তলোয়ারের মতন ঝিকিমিকি।

অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা;
অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা।
অন্ন চিন্তা অন্ন গান অন্নই কবিতা,
অন্ন অগ্নি বায়ু জল নক্ষত্র সবিতা॥
অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার
অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওঙ্কার।
সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে
ধ্বংস করো ধ্বংস করো ধ্বংস করো তারে॥

সন্ত্রাসের ছবি ঘৃণার আগুনে জ্বলে তাঁর হাতে কবিতায় রূপান্তরিতঃ

তীব্র ঘৃণায় তীক্ষ্ম ব্যাঙ্গে তাঁর হাতে জন্ম নেয় 'আমার সন্তান যাক প্রত্যহ নরকে', 'স্বদেশ-প্রেমের দীপ্ত মহিমায়', 'মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে' বা 'যা লেখ 'কবিতা লেখ'-র মত রচনা। সহজ ভঙ্গীতে তিনি উচ্চারণ করতে পারেনঃ চোখ রাঙালে নাহয় গ্যালিলিও/লিখে দিলেন- পৃথিবী ঘুরছে না/পৃথিবী তবু ঘুরছে ঘুরবেই/যতই তাকে চোখ রাঙাও না।' গভীর প্রত্যয়ে তিনি স্থিতধী হনঃ

তুমি মাটির দিকে তাকাও, মাটি প্রতীক্ষা করছে;
তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু বলতে চায়।

আবার এই কবিই দোটানার মধ্যে পড়ে মাঝে মধ্যে দোলাচলতায় আবদ্ধ। তাঁর কাছে মনে হয় সব এক—লাল পতাকা নীল পতাকা সবই হরেদরে এক। সব সরকারই এক। তফাৎ নেই। 'রাজা আসে যায়' তাঁর সেই দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করেছে তীব্রভাবে।

তবে ভরসার কথা এটাই যে তিনি পথ খোঁজেন। নাক উঁচু করে পালিয়ে বেড়ান না। আশ্চর্য ভাতের গন্ধে তিনি সারা রাত জেগে থাকেন প্রার্থনায়। জন্মদিনের কবিতায় তাই তাঁর ঘনিষ্ঠ প্রত্যয়ঃ তুমি জেগে থাকো। নিজেকে কঠিন করো। তুমি/হাঁটো! সামনে..যতদূর চোখ যায়..

বীরেন্দ্র দৃপ্তভাবে আরো পথ হাঁটুন—অভিনন্দনের সঙ্গে সঙ্গে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

রজত বন্দ্যোপাধ্যায়

ইস্তাহারের—'স্বাধীনতার বর্ণমালা'

ইস্তাহার গত ১১ই জুন ১৯৮২ 'শিশির মঞ্চে' "স্বাধীনতার বর্ণমালা" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

স্বাধীনতা বিষয়টি বহুল আলোচিত। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ নানা মহলে নানাভাবে উপস্থিত। গরীব মানুষের কাছে খাওয়া-পরার প্রশ্নে, মেয়েদের কাছে নারীমুক্তির প্রশ্নে (অবশ্য খাওয়া-পরার প্রশ্ন বাদ দিয়ে নয়), আবার উচ্চ-বিত্ত মানুষের কাছে স্বাধীনতার বিষয়টি সামাজিক মানসিক দ্বন্দ্বে নতুন নতুন প্রশ্ন নিয়ে হাজির হচ্ছে। গোটা নাটক জুড়ে স্বাধীনতার প্রশ্ন আছড়ে আছড়ে পড়েছে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে নারীমুক্তির প্রশ্নকে মর্মবস্তু করে নাটকীয় দ্বন্দ্ব বিকশিত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক পরিমণ্ডলে নারীকে অন্তঃপুরচারিণী রেখে তার সত্তাকে "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম"—তত্ত্বের অনুসারী রাখা হয়, অন্যদিকে পুঁজিবাদী আধুনিক সভ্যতায় (!) নারীকে পণ্য করায় তার স্বাধীন সত্তা বিপন্ন। সমকালীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা, নারীমুক্তি ও রুটিরুজির প্রশ্নে খেটে-খাওয়া গ্রামীণ মানুষের সংগ্রামের একটি চালচিত্র "স্বাধীনতার বর্ণমালা।" সৎ ও পরিশ্রমী মানুষ সামাজিক শ্রমদান ও সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের দিয়ে প্রকৃত স্বাধীনতা ও নারীমুক্তির পথে অগ্রসরকে সম্ভব করে তুলতে পারে এই উপ-সংহারের সুন্দর ব্যঞ্জনায় নাটক শেষ হয়েছে।

এই কঠিন বিষয়কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুক্ষ্মভাবে নাটকে রূপদান করার কাজ নিঃসন্দেহে কঠিন। নাট্যকার শ্রীশিব শর্মা বিষয়টিকে নানা কৌশলে রসোত্তীর্ণ নাটকে রূপায়িত করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন। বলা যায় তিনি সফল। কিন্তু অভিনেতাদের সামগ্রিক অভিনয়ের মান এখনো সেই স্তরে পৌঁছয় নি যাতে এই জটিল বিষয়কে দর্শকদের সার্বিক মনোগ্রাহী করা যায়।

পরিচালক শ্রীতরুণ মুখোপাধ্যায় আন্তরিক-ভাবে বিষয়টি কম্যুনিকেট করার নানা পরিকল্পনা করেছেন। পরিকল্পনাগুলির মধ্যে শিল্পশৈলীর ছাপ স্পষ্ট, বিশেষ করে গল্পের প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ স্থানে flash back করা। কিন্তু কোথাও বাড়াবাড়ি হয় নি। এ বিষয়ে নাট্যকার ও পরিচালকের পরিমিতিবোধ তারিফ করার মত। কিন্তু দলের সামগ্রিক অভিনয় নাট্যকার ও পরি-চালকের দাবী মেটাতে পারে নি। লাটু, মালতি ও শম্ভুর ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীজীবন সেন, শ্রীমতী অঞ্জলি চক্রবর্তী ও শ্রীদেবদাস গাঙ্গুলী সফল হলেও শেষোক্ত জনকে কথোপকথনের সময় অযথা জোর দেওয়ার ত্রুটি সংশোধন করতে হবে। শ্রীমতী অঞ্জলির অভিনয় প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ।

মূল positive চরিত্র প্রণব প্রচণ্ড উদ্দীপনাপূর্ণ। প্রণবের ভূমিকায় শ্রীস্বরাজ রায়কে কখনই গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথী মনে হয় নি। বলা যায় অতিনাটকীয়তা তার চরিত্র চিত্রণের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করেছে। লম্পট মনোরঞ্জন ও ব্যভিচারী অনিন্দ্যর ভূমিকায় জয়ন্ত দত্ত ও সুশীল মুখার্জীর অভিনয়ে জড়তার ছাপ স্পষ্ট। বিকাশের ভূমিকায় অনুপ ভট্টাচার্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সফল হতে গেলে তাঁর দক্ষতা বাড়াতে হবে। আধুনিক বুর্জোয়া সভ্যতায় উচ্চবিত্ত যুবকদের বিচ্ছিন্নতাবোধ, যৌন বিকৃতির মানসিক গ্লানি, সর্বোপরি যুগযন্ত্রণা পরিস্ফুট করা অনায়াসসাধ্য নয়, এটাই তাঁর অভিনয়ে ব্যক্ত হয়েছে। বাকি চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে পরিচালকের দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া দরকার। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংলাপ রচনায় নাট্যকার মূল-ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে হাল্কা বাক্য প্রয়োগ করেছেন। কারো কারো অভিনয়ে কৃত্রিমতার ছাপ দূর করার বিষয়টি নাট্যকার ও পরিচালককে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। অনুশীলন সাপেক্ষে সামগ্রিক অভিনয় অবশ্যই উন্নত মানে পৌঁছবে এবং নাটকের গতিকে বাড়ানো সম্ভব হবে। আবহ ভালো। আলোর দিকে নজর দেওয়া দরকার। পরিশেষে, ইস্তাহার গোষ্ঠীর এই প্রয়াস ভবিষ্যৎ নাট্যামোদীদের মন কাড়তে পারবে এই আশা রাখছি।

গৌতম দাসগুপ্ত

'স্বাধীনতার বর্ণমালা' নাটকের শেষ দৃশ্যে মালতি তার স্বামী শম্ভুর সাথে মুক্তির সন্ধানে। মানসিক দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত অনিন্দ্য, বিকাশ ও আধুনিকা নিতু একপাশে দাঁড়িয়ে

মাইক্রোপ্রসেসর

[মাইক্রোপ্রসেসর। মাত্র ৬ মিলিমিটার লম্বা ও ৬ মিলিমিটার চওড়া অর্থাৎ ৬ বর্গ মিলিমিটারের এই বিশেষ ধরনের সিলিকন চিপের নাম মাইক্রো-প্রসেসর। আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার মাইক্রোপ্রসেসর মানব সভ্যতায় বিরাট প্রভাব ফেলবে। এটি ১৯৭৩ নাগাদ আবিষ্কৃত হয়; ভারতবর্ষে মাইক্রোপ্রসেসর সম্পর্কিত গবেষণা ও তার ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে খুব সামান্য জায়গায় কাজ-কর্ম হচ্ছে। পূর্বাঞ্চলে শিবপুর বি. ই. কলেজ, খড়্গপুর আই. আই. টি. এবং সায়েন্স কলেজে মাই-ক্রোপ্রসেসর নিয়ে কাজ হচ্ছে। লেখক শিবপুর বি. ই. কলেজের মাইক্রোপ্রসেসর ল্যাবরেটরীর প্রোজেক্ট অফিসার]

গোড়ার কথা

অবশেষে ঘটনাটি ঘটল। কম্পিউটর বিপ্লব। সত্তর দশকের গোড়ার দিকে। হ্যাঁ, বিপ্লবই বলা যায় এটাকে। কারণ প্রত্যেকটি বিপ্লবেই আছে দুর্দমনীয় গতি। এখানেও তার ব্যতিক্রম নয়। এইতো মাত্র কটা বছর তার মধ্যেই কত ডালপালা। অবশ্য এ সমস্তই ঘটেছে এল-এস-আই-র (লার্জ-স্কেল-ইনটিগ্রেশন) দৌলতে। অর্থাৎ এক বর্গ ইঞ্চিতে এক কোটিরও বেশী ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্ কম্পোনেন্ট (যন্ত্রাংশ) দিয়ে তৈরি একটি সিলি-কন্-চিপ বা ছোট এক টুকরো সিলিকন পাত।

মাইক্রোপ্রসেসর এ রকমই একটি সিলিকন চিপ। দাম একশো টাকার কাছাকাছি। এই মাইক্রোপ্রসেসরকে বলা হয় সি. পি. ইউ. (সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট), যা অধুনা অতি পরিচিত কম্পিউটরের প্রধান অংগ। এই রকম একটি মাইক্রোপ্রসেসর চিপের সংগে অন্যান্য আরও কতগুলি চিপ জুড়ে দিলেই মাইক্রোকম্পিউটর তৈরী। যে যে আনুষংগিক চিপ মাইক্রো-কম্পিউটর জগতের সংগে বাইরের জগতের আদান-প্রদান করার ব্যবস্থা, যাকে বলা হয় ইনপুট/আউটপুট পোর্ট। আয়তন ভীষণভাবে ছোট আর তার সংগে দাম খুব কম হওয়াতে মাইক্রোকম্পিউটর অন্যান্য মিনি-ও-লার্জ কম্পিউ-টরের বাজার অনেকটাই নিয়ে নিয়েছে; এবং যন্ত্রটির ব্যবহার বাড়তির পথে।

বড় বড় ক্ষেত্রেও আজকাল দেশে বিদেশে মাইক্রোকম্পিউটর ব্যবহার হচ্ছে। যেমন পাওয়ার সিস্টেম (বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা), অটোপাইলট ইত্যাদি। এ সমস্ত বিশাল বিশাল ক্ষেত্রে প্রচুর ডাটা (তথ্য) প্রসেস (Process) করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাই যে কোন কম্পিউটরের নিজস্ব কাজ শুরু করার আগে আছে আরেকটি সিঁড়ি। তা হল ডাটা এ্যাকুজিশন' সিস্টেম। অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা। সোজা ভাষায় বাইরের জগতের ডাটা (তথ্য) কম্পিউটরের ডাটায় (তথ্যে) পরিণত করে সেই বিশাল সংখ্যক ডাটা (তথ্য) সংরক্ষণ করা হয় মেমরীতে। তারপর মাইক্রো-কম্পিউটরের কাজ—ডাটা প্রসেসিং এর পরে আবার কম্পিউটরের থেকে প্রোসেসড্ ডাটা বাইরের জগতে যায়। টেলিমিটারিং বা টেলিমেট্রি সিস্টেমে মাইক্রোপ্রসেসর কাজে লাগানোর ব্যাপারেও আমাদের দেশে নানা প্রচেষ্টা চলছে।

শোভন মুখোপাধ্যায়

এর সংগে যোগ হয়েছে রিমোট কন্ট্রোল। মনে করা যাক্ ইনস্যাট উপগ্রহ থেকে এই কৃত্রিম উপগ্রহটিরই কক্ষপথে নানা সময়ে নানা অবস্থানের বিভিন্ন পরিবর্তনশীল বা ভ্যারিয়েব্‌ল্ ডাটা বা সংবাদ পৃথিবীতে আসছে। এখন এইসব ডাটা মাইক্রোপ্রসেসরের মাধ্যমে মেমরীতে সংরক্ষণ করা হল; এবার এই সমস্ত ডাটা প্রসেস করা হল মাইক্রোপ্রসেসর-এর সাহায্যে, সুতরাং এই প্রোসেসড্ ডাটাকে বা সোজা কথায় পরিবর্তিত সঠিক ডাটাকে কৃত্রিম উপগ্রহটিতে পাঠাতে হবে টেলিকমিউনিকেশন (টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা মারফত)-এর সাহায্যে, যাতে ঐ কৃত্রিম উপগ্রহটি তার কক্ষপথে সঠিকভাবে চলতে পারে। অর্থাৎ এখানে আমরা দেখলাম যে, সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে কয়েকটি বিভাগ বা বৈশিষ্ট্য।

(ক) ডাটা এ্যাকুজিশন (তথ্য সংগ্রহ)

(খ) ডাটা প্রোসেসিং (তথ্যকে ব্যবহারোপ-যোগী করা)

(গ) ডাটা ট্রান্সফার (তথ্য প্রেরণ)

এই তিনের সমন্বয়ে রিমোট কন্ট্রোল।

এইসব তো গেল নানান্ ব্যবহারিক জগত যেখানে মাইক্রোপ্রসেসর ভীষণভাবে কাজে লাগে। এছাড়া আধুনিক কম্পিউটর বিজ্ঞানে "ইমেজ প্রোসেসিং" একটি আধুনিকতম শাখা। এখানেও মাইক্রোপ্রসেসরের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার হয়েই চলেছে।

আবার কৃত্রিম উপগ্রহর কথায় ফেরা যাক। মনে করা যাক কৃত্রিম উপগ্রহের শক্তিশালী ক্যামেরার সাহায্যে আকাশে ভাসমান মেঘের ছবি তোলা হল এবং ফলে বিভিন্ন প্রকার মেঘের আকৃতি ছবিতে ধরা পড়ল। এই ছবি পৃথিবীতে পাঠানো হল টেলিকমিউনিকেশন মারফৎ। এখন মাইক্রোপ্রসেসর-এর সাহায্যে ছবিগুলি প্রসেসিং করা হল—পরিভাষায় যাকে আগেই বলা হয়েছে ইমেজ-প্রসেসিং। এহেন ইমেজ-প্রসেসিং-এর সাহায্যে আবহাওয়াবিদরা সহজেই জানতে পারেন কোন মেঘের কি রকম চরিত্র। তাই আবহাওয়া সংক্রান্ত কাজেও মাইক্রোপ্রসেসর-এর ব্যবহার সাংঘাতিক।

ব্যবহারিক জগত

সেদিন মোটেই বেশী দূরে নেই, যখন দেশের দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী যে কোন অসুস্থ মানুষ অনেক দূরে বসে থাকা ডাক্তারের কাছে নিজের চিকিৎসা ঘরে বসে থেকেই করতে পারবে। এইসব ক্ষেত্রেই মাইক্রোপ্রসেসর সম্বলিত যন্ত্র-পাতির ব্যবহার অপরিসীম। ভারতের বেশ কয়েকটি টেকনোলজিক্যাল ইন্‌স্টিটিউশনেই মাইক্রোপ্রসেসর সম্বলিত ইলেক্ট্রো-কার্ডিয়ো-গ্রাফী নিয়ে গবেষণা চলছে। পূর্বাঞ্চলে আই. আই. টি. খড়্গপুর ও কলকাতার সায়েন্স কলেজ এই বিষয়ের উপর কাজে বেশ অগ্রগণ্য।

ব্যবসা-বাণিজ্যেও মাইক্রোপ্রসেসর-এর ক্রমবর্ধ-মান ব্যবহার ঘটছে। কারণ মাইক্রোপ্রসেসর খুব সহজেই যে কোন হিসাবনিকাশ নির্ভুলভাবে এবং সবচেয়ে দ্রুত করতে পারে—মাইক্রোপ্রসেসর সম্বলিত পে-রোল (Pay role) সিস্টেম বা কর্ম-চারীদের বেতন নির্ধারণ ব্যবস্থায় তো আজকাল প্রায় প্রত্যেক সংস্থাতেই ব্যবহৃত হয়। বিদেশে মাইক্রোপ্রসেসর সম্বলিত টাইপরাইটার চালু হয়েছে—যার সামনে শুধু বলে গেলেই আপনা-আপনি টাইপ হয়ে যাবে।

আস্তে আস্তে তাই দেখা যাচ্ছে যতই দিন যাচ্ছে ব্যবহারিক জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাইক্রো-প্রসেসর তথা মাইক্রোকম্পিউটরের ব্যবহার প্রচন্ড গতিতে বেড়ে চলেছে। পৃথিবীর সর্বত্রই এই ছবি; ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়।

খেলাধুলা

দাবা এবং কিছু কথা

মানিক ব্যানার্জি

এপ্রিল মাসের যে সন্ধ্যায় দূরদর্শনে "সদ্‌গতি" দেখানো হয়েছিল, ঠিক তার পরেই সত্যজিৎ রায় পরিচালিত আরেকটি ছায়াছবি দর্শকরা দেখলেন। এর নাম "শতরঞ্জ কী খিলাড়ী"। বাংলা ভাষায় তর্জমা করলে যার মানে দাঁড়ায় দাবা খেলোয়াড়। কিন্তু ছায়াছবি এই প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। প্রসঙ্গ দাবা। শোনা যায় দাবা খেলাটির জন্ম এই ভারতে। আবার কেউ কেউ বলেন এর জন্ম ভারতে নয়, ইরানে। কারণ সেখানে শতরঞ্জ নামে এক খেলোয়াড় এই খেলা আবিষ্কার করেন। এই কথাটির প্রতিবাদ করেও কেউ বলেছেন হয়ত ইরানের সেই খেলোয়াড় ভাল দাবা খেলতেন বলেই তার নাম রাখা হয়েছিল শতরঞ্জ; কারণ শতরঞ্জ কথাটি ইরানের নয়; এ কথাটি ভারতীয়। দাবা নিয়ে এই বাদানুবাদের কোন মীমাংসা হয় নি, কোন চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি কেউ। কে জানে কবে এই কৌতূহলের

নিরসন হবে; ইরান বা ভারতের মধ্যে কে বলতে পারবে "এ খেলা আমাদের"।

কথায় বলে, "তাস, দাবা, পাশা, তিন সর্বনাশা"। প্রবাদটির সত্যতা কতখানি তা নিয়ে বিতর্ক না করে বলা যেতে পারে তিনটি খেলাই সময়সাপেক্ষ। হয়ত সেই কারণেই এগুলিকে সর্বনাশা বলা হয়। এই তিনটি খেলার মধ্যে পাশার প্রচলন উঠে গেছে। তাস হয় তবে তা দাবার মত বিরাট পরিধি জুড়ে নয়। দাবা চলছে বেশ ভালভাবেই। লেভ ইয়াসিন, স্ট্যানলি ম্যাথুজ, পেলে, গ্যারিঞ্চার মতই আবালবৃদ্ধ-বণিতা জানে ববি ফিশার, বরিস স্প্যাসকি, আনাতোলি কারপভ, ভিক্টর কর্চনয়ের নাম। আর জানে কোন এক সময়ের সোনার বাংলার সোনার ছেলে দিব্যেন্দু বড়ুয়ার নাম। ওর প্রসঙ্গে পরে আসছি। দাবা ফুটবল, ক্রিকেটের মত জনপ্রিয় নয় ঠিকই, কিন্তু খেলাটির চাহিদা এবং ঝোঁক আছে। কয়েক বছর আগে ববি ফিশার এবং বরিস স্প্যাসকির নাম যখন দাবানলের মত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো তখন এই কল্লোলিনী কলকাতার দোকানে দোকানে ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড় দেখেছি, দেখেছি দাবা বোর্ড কিনতে। হয়ত সেই ঘটনাই প্রথম যা এখানে দাবার প্রসার বাড়িয়ে দিলো। বাড়ীর বৈঠকখানা থেকে দাবা এল বাইরে। স্কুলে, কলেজে, বিভিন্ন ক্লাবে, পুজো প্যান্ডেলে সময় কাটানো আর রাত জেগে পাহারা দেবার জন্য ছেলেরা পেল তাস ছাড়া আরও একটি উপকরণ, দাবা। খেলা হয়, প্রতিযোগিতা হয়, সময় কাটে, বুদ্ধি খোলে, পুরস্কার আসে।

এবার আসা যাক সেই সোনার ছেলে দিব্যেন্দু প্রসঙ্গে। এই বয়সে দিব্যেন্দু বিশ্বের কোথায় পৌঁছেছে তা পাঠকদের আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করি না। তবে বলতে পারি

অন্যান্য খেলায় আমরা যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়ছি, যেভাবে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি তাতে আমরা হতাশ হয়ে পড়েছি, ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছি। তখন দিব্যেন্দু আমাদের আশার আলো দেখায়। ও এমন ছেলে যাকে নিয়ে শুধু বাঙ্গালীরা নয় সমগ্র ভারতবাসী গর্ব করতে পারে। বলতে কোন দ্বিধা নেই এমন প্রতিভা যদি ফুটবলে জন্মাতো তবে তাকে নিয়ে হৈ-চৈয়ের সীমা পরিসীমা থাকত না।

পরিশেষে বলি দাবার জন্ম যেখানেই হোক না কেন ভারত বা ইরান কেউই কিন্তু বিশ্বের এক নম্বর নয়। রাশিয়া সেক্ষেত্রে নিজেদের আসন সর্বাগ্রে রেখেছে। গত বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বিজিত দুই খেলোয়াড়ই যথাক্রমে আনাতোলি কারপভ এবং ভিক্টর কর্চনয় ঐ রাশিয়ার। একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সেখানে যে পরিবেশে খেলা হয় এখানে তার একভাগ পরিবেশও হয় না। সেই কারণেই কারপভ বা কর্চনয়ের কাছে বয়সটা কোন বাধা নয়। তাই আমাদের প্রয়োজন রাশিয়া থেকে মাঝে মাঝে গ্র্যান্ড মাস্টার নিয়ে এসে উপযুক্ত প্রশিক্ষনের। তাতে হয়ত দিব্যেন্দু বা আনন্দ ঘোষের মত "কোটিতে গুটি" কথাটি ঘুচবে, দাবায় আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারবো। শুধু কাইজার স্ট্রীটের রাজ্য দাবা সংস্থা এবং গোর্কি সদনের অ্যালেখিন চেস ক্লাবই অনুশীলনের জায়গা হলে চলবে না; প্রয়োজন প্রশিক্ষণের কেন্দ্র ছড়িয়ে দেওয়া।

১৯৭৮ সালটাকে ১৬ বছরের এই কিশোর দিব্যেন্দু হয়ত কোনদিনই ভুলতে পারবে না। "হয়ত" কথাটি উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, খ্যাতির চাপে, যশের গর্বে অনেকেই তাদের প্রথম জীবনের কথা ভুলে যান, যা উচিত নয়। যাই হোক ১৯৭৮ সাল ওর জীবনে একটি স্মরণীয় বছর। সে বছর পশ্চিমবঙ্গের সাব-জুনিয়র, জুনিয়র এবং সিনিয়র তিনটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল; আলিবাবার চিচিং ফাঁকের মতই সাফল্যের এক একটি দরজা খুলে গেল দিব্যেন্দুর সামনে। এখানেই শেষ নয়; তারপর চ্যাম্পিয়ন হল জয়পুরের জুনিয়র জাতীয় প্রতিযোগিতায় এবং উদয়পুরের সাব-জুনিয়র প্রতিযোগিতায়। তখন থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে এই ছেলেটির মধ্যে যে প্রতিভা আছে তা নিয়ে আমরা শুধুমাত্র বাঙ্গালীরাই নই, তামাম ভারত-বাসী গর্ব করতে পারে।

সেই থেকে এখনও পর্যন্ত ঘরের ভেতর অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় সে প্রতিনিধিত্ব করেছে, সফল হয়েছে। ১৯৭৮ সালের মতই ১৯৭৯ সাল আরও একটি স্মরণীয় বছর। সে বছরই দিব্যেন্দু প্রথম বিদেশে যাবার স্বাদ পায়। মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত এক আমন্ত্রণী খেলায় দিব্যেন্দু তেমন সুবিধে করতে পারে নি। এর কারণ প্রধানতঃ প্রথমবার বিদেশ যাওয়া এবং যাবার আগে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য মানসিক চাপ। ১৯৮০ সালে দিব্যেন্দু গেল ফ্রান্স ও জার্মানীতে। ফ্রান্সে ১৭ বছরের কমবয়সী প্রতিযোগিতায় ও সফল হল, স্থান হল পঞ্চম। জার্মানীতে ছিল ২০ বছরের কম বয়সী ছেলেদের ওয়ার্লড জুনিয়র টুর্নামেন্ট। দিব্যেন্দুর স্থান ১৪তম। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে এই প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়ের সংখ্যা ছিল ৫৮। ১৯৮১ সালে আর্জেন্টিনার করডোভায় গেল ১৬ বছরের কম বয়সী ছেলেদের এক প্রতিযোগিতায়। এই পঞ্চম বিশ্ব ক্যাডেট দাবা চ্যাম্পিয়নশীপে ভারত থেকে একমাত্র দিব্যেন্দুই আমন্ত্রণ পেয়েছিল; ওর স্থান হল তৃতীয়। সেখান থেকে দেশে ফেরবার পথে ও লন্ডনে অনুষ্ঠিত লয়েডস ব্যাংক চ্যাম্পিয়নশীপে প্রতিনিধিত্ব করল। বিশ্বের ওপরের সারির ১১২ জন খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলে দিব্যেন্দু হয় ১৮তম। এর মধ্যে ছিলেন বেশ কয়েকজন গ্র্যান্ড মাস্টার ও ইন্টার-ন্যাশনাল মাস্টার। তবে ঐ প্রতিযোগিতার জুনিয়র বিভাগে সে প্রথম হয়েছে। ইতিমধ্যে সে লন্ডনের একটি আমন্ত্রণী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ডাক পেয়েছে। কয়েকদিন পরই তার রওনা হবার কথা।

এই অল্প বয়সেই দিব্যেন্দু ভারতের পাঁচজন ইন্টারন্যাশনাল মাস্টারের অন্যতম। বাকিরা হলেন ম্যানুয়েল আরন, পরমেশ্বরন, থিপসে এবং রবিশেখর। তবে দিব্যেন্দুকে বাহবা দিতে হয় তার বয়সের জন্য।

সাম্প্রতিক গল্প সংগ্রহ
সম্পাদনা—ভবানী মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক—২১ টেমার লেন, কলিকাতা-৯
মূল্য—আট টাকা।

আটজন লেখকের ছোট গল্পের সংকলন, মাথাপিছু গল্প একটি। লেখকদের বয়স ২৮ থেকে ৫১, অন্তত ৫ জন চল্লিশোর্ধ। পাক্কা চার পৃষ্ঠার ভূমিকাতে সম্পাদক ভবানী মুখোপাধ্যায় আবদ্ধ। ছাপার নিয়মে ভূমিকা থাকে আগে গল্প থাকে পরে। তবে সম্পাদনার নিয়মে গল্প লেখা হয় আগে, ভূমিকা তার পরে যখন লেখকরা সম্পাদকের কাছে অপরিচিত (অন্তত ভবানীবাবু স্বীকার করেছেন)। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত, কিন্তু সেভাবে ত ঘটনাটি ঘটে নি। কি এক দুর্বোধ্য কারণে গল্পগুলি যা তার ঠিক বিপরীত মন্তব্য করেছেন সম্পাদক। সম্পাদকের জবানীতে গল্পগুলোতে—"বিষয়বস্তু তুচ্ছ, বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ," মন্তব্যের প্রথম অংশটি সত্য হলেও, দ্বিতীয় অংশটি ভুল।

প্রথম গল্প জীবন সরকারের 'প্রাচীর'। বোধ হয় সাম্প্রদায়িকতা বিষয়টি ধরার চেষ্টা করেছিলেন, প্রাচীরটি তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী ধর্মের। আশ্রয়দাতা মিত্তির মশাইয়ের মেয়ে বাসু "গায়ের কাপড় বুকের মধ্যে" গুটিয়ে নায়ক রশীদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও রশীদ বাসুকে ফিরিয়ে দেয় "নেমকহারামী"র ভয়ে। এবং এর ফলে রশীদ সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে। এবং 'প্রাচীর' ভাঙ্গার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। কাগজ, কলম, লেখা এবং ছোট গল্পের মধ্যের "প্রাচীর" জীবন সরকারকে এখনও ভাঙ্গতে হবে।

দ্বিতীয় গল্প "হরতাল ও নিতাই" লেখক দীপক সরকার। সাড়ে আট পৃষ্ঠার গল্প। পাক্কা পৌনে আট পৃষ্ঠা পর্যন্ত হরতালের তীব্র বিরোধী গল্প শেষের ঠিক ১২ লাইন আগে নিতাই বুঝতে পারে "প্রতিবাদহীন হয়ে বেঁচে থাকার অর্থ কাপুরুষতা।" মোটামুটিভাবে সংগ্রামী, শ্রমিক নিতাই কেন যে হরতাল বিরোধী তা বোঝা গেল না। স্ত্রীর স্ফীত উদরের ওপর কান পেতে ভাবী সন্তানের অস্তিত্ব অনুভব করতে চেষ্টা করল এবং অতঃপর কেন যে নিশ্চিন্তে নিদ্রায় মগ্ন হোল এবং হরতালের দিন কাজে গেল না তাও বোঝা গেল না।

তৃতীয় গল্প "সেকেলে," লেখক শিশির ভট্টাচার্য। গল্প যখন লিখেছেন নিশ্চয়ই কিছু বক্তব্য আছে। কিন্তু এখানে তেমন কিছু পাওয়া গেল না।

"চর", লেখক শৈলেন চৌধুরী। আটটি গল্পের মধ্যে এই একটিতেই গল্প হওয়ার গুণগুলো কিছুটা বর্তমান। গল্পটি শেষ হয়েছে একটি ইতিবাচক জায়গায়। বস্তির মেয়ে সন্ধ্যামণির জীবনের সুখদুঃখ নিয়ে গল্প। একটি সুস্থ উজ্জ্বল জীবনের ইঙ্গিতে গল্পের পরিসমাপ্তি। ত্রুটিহীন গল্প নয়। প্রধান ত্রুটি যে জীবন নিয়ে শৈলেনবাবু গল্প লিখেছেন সে জীবন বোধহয় তাঁর কাছে অপরিচিত। কল্পনা সব ফাঁকা জমি ভরাট করে না। এখানেও করে নি। পাঠক অনেকবার হোঁচট খাবেন।

'লাল' লেখক সনৎ বসু। গল্পটির উপরে সমরেশ বসুর "মানুষ রতন" গল্পের প্রভাব যথেষ্ট। যদিও বাস্তবকে খুঁটিয়ে দেখার, বিবেচনা করার, বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন লেখক এখানে অনুভব করেন নি। গল্পের গতিকে তিনি অবাঞ্ছিত জায়গায় টেনে নিয়ে গেছেন। বেওয়ারিশ লাস অবশেষে 'রক্তশোষকদের' শিকার হিসাবে প্রমাণিত হয়। এই প্রমাণ করার পদ্ধতিটি প্রায় লেখকের নিয়ন্ত্রনহীন। অনাবশ্যক রকমের চরিত্র এসেছে, "রিলে রেসের মত গল্প এগিয়েছে এবং উদ্দেশ্যহীন ভাবেই। গল্প যে জ্যামিতিক কঠিন সমাধান নয় যেখানে সর্বস্ব দিয়ে প্রমাণ করতে হয়, এই ধারণাটি লেখকের হওয়া প্রয়োজন।

"ভয়" লেখক তাপস ভবাই। ছোট গল্পে কোন একটি 'ঘটনা' অবশ্যই ঘটতে হবে এ ধারণাটা বাতিল হয়ে গেছে। নিছক মানুষের মুহূর্তকে অনুবীক্ষণের তলায় দাঁড় করিয়ে লেখক সফলতম ছোট গল্প লিখতে পারেন এটা প্রমাণিত। আধুনিক ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য এটা। সুতরাং ভাষা এবং অনুভূতির ওপর চূড়ান্ত দখল ছাড়া ছোট গল্প লেখা যায় না—এ ঘটনাটি এখানে ভয়ানক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অবিনাশ কাশতে কাশতে মুখে রক্ত তুললে ভয়ের সুরু। শেষ যখন হলো গল্প যে ভয় গল্প পড়ার ওপরেই আরোপিত হয়েছে। সাহিত্যের আঙ্গিনায় এই ছোট গল্পের শাখাটিই সবচেয়ে কঠিন এ অনুভূতি আমাদের আসা উচিত।

"মানুষটার জন্য" লেখক দীপক চক্রবর্তী। রাধির স্বামী জেলে গেছে। স্বামীর জন্য রাধির প্রতীক্ষা গল্পের উপজীব্য। কিন্তু রাধির স্বামী ফেরে না। জোতদারের মাথা ফাটিয়ে জেলে গেছে রাধির স্বামী। কোন অর্থনৈতিক লড়াইয়ের ফল নয়, স্ত্রীর প্রতি অবাঞ্ছিত ইঙ্গিতের ফলে ঘটনাটি ঘটেছে। ফিল্মের মত গল্পেও দ্বান্দ্বিকতা বর্তমান বলে আমি মনে করি। এই দ্বান্দ্বিকতার ফলে উত্তরণ এবং অবতরণ। কিন্তু এ গল্পটি আটকে গেল প্রথম অংশেই বলে উত্তরণ এখানে অনুপস্থিত। পাঠকের কাছে কোনো বক্তব্য পৌঁছে দিতেও ব্যর্থ হলেন লেখক।

"সুমনের ঘরে ফেরা দিনকাল" লেখক বাবলা চক্রবর্তী। বেলঘরিয়াবাসী এই আঠাশ বছরের যুবক রাজনীতি বিরোধী গল্প লিখেছেন। গল্পের নীতি ঘর আগে পরে দেশ, এককালে রাজনীতি করা সুমনের চিন্তার উত্তরণ এ গল্পে তিনি দেখিয়েছেন। সুমন যখন রাজনীতি করত তখন সে প্রায় অমানুষ ছিল, মানবিক অনুভূতি ইত্যাদি ছিল না। অবশেষে সুমন রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। গ্রামীণ কর্মদ্যোগের বিজ্ঞাপনের মত, রাজনীতির ভয়াবহতা বোঝাতে জীবন্ত মানুষের কাটা হাত, এমনকি পোষা বিষাক্ত সাপ পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে। লেখক যে কাজ করতে চেয়েছেন সে কাজ মালিক পক্ষের লোক অন্যভাবে করে। তবে বাবলাবাবু একাজে যে খুব সফল হয়েছেন তা নয়। এরকম গল্প লিখে রাজনীতি সম্পর্কে ভীতি ধরাতে চাইলে যারা রাজনীতি করেন তাদেরই সুবিধা। বাংলাদেশের যুবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বাবলা চক্রবর্তী এটা প্রমাণিত। আসল বিষয় হোল যুবকদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে যাদের লাভ তাদের হয়ে হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন কেন সেটাই প্রশ্ন।

সুদীপ্ত শাহীন

প্রসঙ্গ দেবদাসী—আরতি গঙ্গোপাধ্যায়
প্রকাশক—রত্নাবলী, ১৭/৩ ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৭০০ ০০৯, মূল্য—বারো টাকা।

পুস্তকের শিরোনামই নির্দেশ করে যে এই বইটির উদ্দেশ্য গতানুগতিক নয়। দেবদাসীদের উপর বাংলা ভাষায় সীমিত সংখ্যক কাজ হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশরই উদ্দেশ্য ছিল নতুনত্বের ঝলকানিতে পাঠককে সচকিত করা, সমস্যাটির গুরুত্ব সেখানে হয়েছিল গৌণ। যে কোন সামাজিক উৎকেন্দ্রিকতাকে সমাধান সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীই সম্ভবায়িত করে—এবং প্রায় দ্বিধাহীন কণ্ঠেই স্বীকার করা যায়। আলোচ্য পুস্তকটি তার সংক্ষিপ্ত পরিসরে উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলেছে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে।

মননের কর্ষণে আমরা হয়তো সমাজের উচ্চস্তরে উঠে আসতে পেরেছি কিন্তু সারা ভারতের অগণিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষ এখনও কিভাবে ধর্মের কাছে শৃঙ্খলাবদ্ধ তা মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া বিলাসে সঠিকভাবে ধরা দেয় না। প্রাচীনকাল থেকেই কিভাবে নারীরা তাদের স্বাধীনতা হারাতে হারাতে ক্রমশ পণ্যের স্তরে নেমে এল তার এক যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার মাধ্যমে আমরা মানুষগুলোকে—তাদের চিন্তাধারাকে—জীবনযাপনকে এবং সামাজিকতাকে ছুঁতে পারি।

প্রসঙ্গ দেবদাসীকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে আলোচনার সুবিধার্থেই। পঁচাশী পৃষ্ঠার এই বইটিতে পর্বান্তর ঘটেছে দশবার

[শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায়]

বিভাগীয় সংবাদ

২৪-পরগণা জেলা

হাসনাবাদ ব্লক যুবকরণ আয়োজিত ব্লক-ভিত্তিক যুব উৎসব বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিগত ২৭, ২৮ এবং ২৯শে মার্চ শেষ হয়। কুমারপুকুর হাইস্কুল প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যুব উৎসবের সূচনা করা হয়। ২৮শে মার্চ স্থানীয় যুব ব্যায়াম সমিতির স্কাউট গ্রুপের মার্চ-পাস্টের মধ্য দিয়ে টাকী এরিয়ান ক্লাব ময়দানে খেলাধুলো অনুষ্ঠানের শুরু হয়। খেলাধুলো বিভাগে দৌড় প্রতিযোগিতা, উচ্চলম্ফন, দীর্ঘলম্ফন, সটপাট্, ভারসাম্য দৌড় প্রভৃতি এবং সাংস্কৃতিক বিভাগে সঙ্গীত, আবৃত্তি, বিতর্ক, একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি যুব উৎসবের অঙ্গীভূত হয়। যেমন পার সাজ এবং হাসনাবাদ সব পেয়েছির আসর কর্তৃক পরিবেশিত সর্বভারতীয় লোকনৃত্য দর্শকবৃন্দকে প্রভূত আনন্দ দান করে। বিভিন্ন বিভাগে স্কুল, কলেজ, সমিতি সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান, টাকী মিউনিসিপ্যালিটি। প্রতিটি ইভেন্ট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন করা হয়। উৎসাহী যুবক, যুবতী, ছাত্র, অধ্যাপক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্থানীয় সরকারী কর্মচারী এবং গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আগত কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে উৎসব শেষ হয়।

জয়নগর-২—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের কর্মসূচী অনুযায়ী জয়নগর-২ ব্লক-যুবকরণের তত্ত্বাবধানে ও ব্লক যুব উৎসব কমিটি '৮২-এর পরিচালনায় গত ২৭শে মার্চ থেকে ২৯শে মার্চ '৮২ পর্যন্ত ব্লক যুব উৎসব শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের বিবেকানন্দ ময়দানে ও বিধান-চন্দ্র প্যাভিলিয়নে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব স্থানীয় এলাকার ছাত্র, যুব ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই উৎসবে সকল শ্রেণীর মানুষের সক্রিয় অংশ গ্রহণে উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

এই যুব উৎসবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এই ব্লকের কয়েক'শ যুবক-যুবতী ও ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। স্থানীয় যুব সংস্থা সাহাজাদাপুর খেয়াগোষ্ঠী, কিল্লাদুর্গানগর আজাদ সংঘ, ফুটি-গোদা মিলন সংঘ, নিমপীঠ বিবেকানন্দ যুব সংঘ আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিমপীঠ আশ্রমের শান্তিবাহিনী যুব উৎসব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহযোগিতা করে।

ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতীদের জন্য একক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-গুলিতে প্রায় হাজার খানেক ছাত্র-ছাত্রী যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল তুলসীঘাটা সমাজ কল্যাণ সংঘের সদস্যগণ কর্তৃক ব্রতচারী, নৃত্য ও ক্যারাটে প্রদর্শনী। এ ছাড়া ২৮শে মার্চ নিমপীঠ হাসপাতালের কর্মিবৃন্দ কর্তৃক নাট্যানুষ্ঠান হয় ও ২৯শে মার্চ বি. ডি. ও. অফিসের কর্মিবৃন্দ ও কৃষি বিজ্ঞানের কর্মিবৃন্দ কর্তৃক নাট্যানুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু দর্শকের সমাগম হয়। ২৭শে মার্চ সকাল ৮টায় প্রদীপ জ্বালিয়ে শঙ্খধ্বনি ও মার্চপাস্টের মধ্য দিয়ে যুব উৎসবের পতাকা উত্তোলন করেন নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী কৃষ্ণানন্দজী মহারাজ।

২৯শে মার্চ সমাপ্তি দিবস ও পুরস্কার বিতরণী উৎসবে পুরস্কার বিতরণ করেন নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী বুদ্ধানন্দজী মহারাজ। তিনি যুব উৎসবের সাফল্যের জন্য প্রভূত প্রশংসা করেন ও যুব উৎসব কমিটির কর্মিবৃন্দকে অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এই পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আবদুল ওহাব হালদার, জয়নগর-২নং ব্লকের বি. ডি. ও. শ্রীশিবপ্রসাদ দাশগুপ্ত, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীসুকুমার হালদার ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। যুব উৎসবকে সফল করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন জয়নগর-২ বি. ডি. ও. অফিসের কর্মীবৃন্দ ও নিমপীঠ হাই স্কুলের শিক্ষকগণ ও বিভিন্ন সংঘের সদস্যবৃন্দ।

যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে জয়নগর-২ ব্লকে সম্প্রতি ছয় মাসব্যাপী একটি সীবন শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী '৮২ জয়নগর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আবদুল ওহাব হালদার এই প্রশিক্ষণ শিবিরটি উদ্বোধন করেন। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জয়নগর ২নং ব্লকের তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত ৩০ জন যুবক-যুবতী ছ'মাস ধরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। যুব আধিকারিক শ্রীমতী চক্রবর্তী জানান প্রশিক্ষণ শেষে যাতে শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত কর্ম-সংস্থান প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করে স্ব-নির্ভর হতে পারেন সে ব্যাপারেও তাঁদের লক্ষ্য আছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেবেন স্থানীয় সরকারী ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত সুনীলকুমার দাস। এই প্রশিক্ষণ শিবিরটি গ্রামের মধ্যে বিশেষভাবে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। শিবিরটি চলছে নিমপীঠ সংলগ্ন শ্রীঅহিভূষণ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে।

জয়নগর-২ ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে গত ২৬শে জানুয়ারী থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী '৮২ পর্যন্ত এক মাসব্যাপী কবাডি ও গত ৮ই ফেব্রু-য়ারী থেকে ৭ই মার্চ ভলিবল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কবাডি প্রশিক্ষণ চলে স্থানীয় বৈদ্যের-

জয়নগর-২ ব্লক যুব-উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শকদের ভীড়

চক তেঁতুলবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ ময়দানে। আর ভলিবল প্রশিক্ষণ চলে নিমপীঠ বি.ডি. ও. অফিসের সংলগ্ন ময়দানে। এই শিক্ষণ শিবির স্থানীয় যুবকদের মধ্যে সাড়া এনে দেয়। শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল নিজ দায়িত্বে কাবাডি শিক্ষার্থীদের টিফিন সরবরাহ করেন। কাবাডি ও ভলিবল প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন শ্রীকানাইলাল ঘোষ ও শ্রীতারকনাথ দে। সুষ্ঠুভাবে শিবির চলার জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং বি. ডি. ও-র প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে। ৪৫টি স্থানীয় ক্লাব ও সংস্থাকে খেলার সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলা

সামশেরগঞ্জ—বিগত বৎসরের ন্যায় এবারও সামশেরগঞ্জ ব্লকে, ৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। (১) ফুটবল, (২) জিমন্যাস্টিক (ছেলে) এবং (৩) জিমন্যাস্টিক (মেয়েদের) তিনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আরম্ভ হয় ৭ই এপ্রিল। ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হয় নিমতিতা হাই স্কুল-এর মাঠে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রর সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিলেন নিমতিতা স্পোর্টিং ক্লাব। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় সত্তর জন ছেলে এতে অংশ নেয়। ছেলেরা নিয়মিতভাবে কালিঘাট ক্লাবের প্রাক্তন খ্যাতনামা খেলোয়াড়-এর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করে।

ক্যাম্পে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল। এক মাস পরে গত ৯ই মে ক্যাম্প শেষ হয়। নিমতিতা স্পোর্টিং ক্লাবের রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের মাধ্যমে কৃতী ছাত্রদের প্রশংসা-পত্র প্রদান করা হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আফসার আলী এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা এবং যুবকল্যাণ দপ্তর-এর প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিমতিতা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীনীহাররঞ্জন চৌধুরী মহাশয়।

এই ব্লকের মাধ্যমে তপশিলীভুক্ত দরিদ্র মেয়েদের নিয়ে একটি ছয় মাসের সীবন শিল্পের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ শেষ হয়েছে। প্রত্যেককে বৃত্তি প্রদান এবং মানপত্র প্রদান করে উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যবনিকা টানা হয়।

মেদিনীপুর জেলা

পাঁশকুড়া-২ পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুবকল্যাণ বিভাগের আর্থিক সহায়তায় পাঁশকুড়া-২ ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় বিশেষ বাসযোগে গত ১২-১৩ মে '৮২ স্থানীয় যুব সংগঠনগুলির ৬০ জন অ-ছাত্র যুব প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হলো। বাঁকুড়া জেলার মুকুটমণিপুর পাহাড় ও রানীবাঁধের নিকট ঝিলমিল পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দৃশ্যগুলি যুবকরা উৎসাহের সঙ্গে উপভোগ করেন এবং ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুর শহরের মদনমোহনের মন্দির, রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ও প্রধান ফটক, রাসমঞ্চসহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলিও পরিদর্শন করা হয়। এ ছাড়া রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কামারপুকুরের জন্মস্থান ও জয়রামবাটীর সারদাদেবীর পীঠস্থানও পরিদর্শন করা হয়।

প্রতিটি যুবক উৎসাহের সঙ্গে স্থানগুলি পরিদর্শন করেন এবং তথ্য সংগ্রহ করেন। এই ধরনের বাস্তবমুখী তথা শিক্ষামূলক পরিকল্পনায় স্থানীয় যুবকরা বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়েছেন এবং অজানাকে জানার আগ্রহও তাঁদের বেড়ে গেছে।

স্থানীয় জনসাধারণ ও প্রতিনিধি যুবকরা এই পরিকল্পনাকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য ব্লক যুবকরণ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

গত ১৬ই মে '৮২ বিকেল ৪টায় কোলা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত মহিলা সমিতির ও আশুরালী নবারুণ সংঘের যৌথ উদ্যোগে নবারুণ সংঘ প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুবকল্যাণ বিভাগের পাঁশকুড়া ২নং ব্লকের আর্থিক সহায়তায় একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোলা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত মহিলা সমিতির অনুকূলে একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ সূচনা হয়। এ ছাড়া ছয় মাসব্যাপী বৈদ্যুতিক কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সফল শিক্ষার্থীদের মানপত্র প্রদান করা হয় এবং এক মাসব্যাপী রাইন নবদিগন্ত সংঘের পরিচালনায় ও কোলাঘাট প্রোগ্রেসিভ ওমেন এসোসিয়েশনের পরিচালনায় যথাক্রমে বালকদের ভলিবল ও বালিকাদের খো-খো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সফল শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিণীদের প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। বৃত্তিমূলক সীবন কেন্দ্রের শুভ সূচনা ও মানপত্র প্রদান করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীবীরভদ্র গোঁড়ী মহাশয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান। কোলা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত মহিলা সমিতির সভানেত্রী ও নবারুণ সংঘের সদস্য যথাক্রমে শ্রীমতী ইরা দাস ও শ্রীশংকর চক্রবর্তী স্বাগত ভাষণ দেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস ও খো-খো প্রশিক্ষক ও স্থানীয় কোলা হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীঅসিতরঞ্জন মাঝি।

সর্বশেষে আশুরালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পালন এবং কোলা ২নং মহিলা সমিতির সদস্যারা গীতি-আলেখ্য ও ভেরিয়াস ফেডারেশন-এর সদস্যরা মূকাভিনয় পরিবেশন করেন। রাত্রি সাড়ে দশটা পর্যন্ত দর্শককে পরিপূর্ণ ছিল এই অনুষ্ঠান।

ঘাটাল ব্লক যুবকরণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের আর্থিক সহযোগিতায় ও ঘাটাল ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে বিশেষ আঙ্গিক প্রকল্প অনুযায়ী তপশিলী জাতিভুক্ত মোট ২০ জন যুবককে সাইকেল মেরামতি এবং অপর ২০ জনকে কাপড় ছাপানো প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। উক্ত প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে তপশিলী জাতিভুক্ত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করেছে। বিশেষ আঙ্গিক প্রকল্প ছাড়াও সমাজের সাধারণ যুব-সম্প্রদায় যাতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ লাভ করতে পারেন তার জন্য রেডিও মেরামতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গত মার্চ মাস থেকে চালু করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ১২ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করছেন। প্রতিটি প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য—প্রশিক্ষণ শেষে যাতে শিক্ষার্থীরা স্ব-নির্ভর হতে পারেন। অবশ্য ব্যাঙ্কের আর্থিক সহযোগিতার ওপরেই প্রকল্পগুলির সাফল্য নির্ভর করছে।

ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির : গত ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছরে ঘাটাল ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের অনধিক ১৪ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের ফুটবলের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উক্ত আর্থিক বছরে মোট তিনটি প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয় এবং মোট ৭৫ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি শিবিরের মেয়াদ ছিল ১ মাস। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঘাটালের N.I.S. Coach শ্রীভগীরথ সামন্ত এবং বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক শ্রীঅলকরঞ্জন রায় মহাশয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়।

গোপীবল্লভপুর-১ ব্লক যুবকরণ—গত ৩রা ফেব্রুয়ারী সকাল ১০টায় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীরঞ্জিতকুমার মাইতি গোপীবল্লভপুর-১ যুব উৎসব ও মেলায় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। নেতাজী স্মৃতি সংঘের সভ্যরা মার্চ পাস্টে অংশগ্রহণ করেন।

প্রথমদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় আদিবাসী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা দিয়ে। এই প্রতিযোগিতায় সর্বমোট ৩০০ জন আদিবাসী পুরুষ ও মহিলা আবৃত্তি (একক), সংগীত (একক) ও নৃত্য (দলগত) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ঝাড়গ্রাম শাখার সৌজন্যে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী" ছবিটি দেখানো হয়।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান ছিল শিশুদের নিয়ে। সকাল থেকেই ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সর্বমোট তিনশো জন প্রতিযোগী। এই দিনও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী" ছবিটি দেখানো হয়।

তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান কিশোরদের নিয়ে। মোট ৫০০-র ওপর প্রতিযোগী এতে অংশ নেন। মেদিনীপুর পরিবার কল্যাণ আধিকারিকের সৌজন্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ দিনের অনুষ্ঠান সাধারণ বিভাগে। মোট সাতশর বেশী প্রতিযোগী যাঁদের মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যা ২০০-এর বেশী, বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। পঞ্চম ও শেষ দিনের প্রতিযোগিতায় সকাল থেকে দীর্ঘ দৌড়, ফুটবল, ভলিবল ও ক্যারাম-এর চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা হয় এবং যেমন খুশি সাজোর পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। সব শেষে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই যুব উৎসব শেষ হয়।

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ মাইতি, জেলা পরিষদ সদস্য। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর সৎপতী

ও সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রীবিশ্বম্ভর পানি, সভাপতি, গোপীবল্লভপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি।

বর্ধমান জেলা

ভাতার ব্লক যুবকরণ—সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ভাতার ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় বলগোনাবাটীতে চার

ভাতার ব্লক যুবকরণের তপশিলীদের জন্য সাইকেল মেরামত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মাস কালব্যাপী তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত দুস্থ ছেলেদের একটি সাইকেল মেরামতি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গত ৩।৪।৮২তে সমাপ্ত হয়।

গত ১৮।১১।৮১তে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন বর্তমান জেলা যুব আধিকারিক শ্রীস্বপন চক্রবর্তী মহাশয়। ২৫ জন দুস্থ তপশিলী ছেলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ চলাকালীন তাহাদের ৩০ টাকা মাসিক বৃত্তি Stipend দেওয়া হয়।

এই প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি দিনে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেদের অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন ভাতার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী শ্রীকুমার মণ্ডল মহাশয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি, স্থানীয় প্রধান-গণ এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একটি আলোকচিত্র পত্রিকায় প্রকাশনের জন্য পাঠালাম।

কাটোয়া ২ নং ব্লক যুবকরণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের কাটোয়া ২ নং ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে এবং কাটোয়া ২ নং ব্লক যুব-উৎসব কমিটির পরিচালনায় গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ পর্যন্ত মেঝিয়ারী চঞ্চলাবালা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এবং মেঝিয়ারী এস. সি. এস. হাই স্কুলের প্রাঙ্গণে বিপুল উদ্দীপনা ও উৎসাহের মধ্য দিয়ে ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন কাটোয়া ২ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীসুভাষচন্দ্র কুণ্ডু এবং উদ্বোধনী ভাষণ দেন যুব উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীদেবপ্রসন্ন বসু। প্রায় ৫০০ প্রতিযোগী উৎসবের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক নানা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের ছাত্র-যুবকদেরকে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে সচেতন করা। পুরস্কার বিতরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন মেঝিয়ারী চঞ্চলাবালা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী মিনতি রায়। বিধানসভার সদস্য মাননীয় শ্রীমনোরঞ্জন নাথ মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

জলপাইগুড়ি জেলা

কালচিনি ব্লক যুবকরণ—কালচিনি ব্লক যুব-করণের সহযোগিতায় ইউনিয়ন একাডেমী কাল-চিনিতে ২৫শে মে তারিখে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগী-দের সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নৃত্য প্রতি-যোগিতায় মোট ২২ জন অংশগ্রহণ করে। আবৃত্তি, সংগীত বিভাগের প্রতিযোগিতা উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শিক্ষকমহাশয়েরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন।

কালচিনি ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে এবং কাল-চিনি ব্লক যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় গত ৫ থেকে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হল। ৫ ও ৬ই যুব উৎসবের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সাতালী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে। মোট ২২৫ জন প্রতিযোগী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ১০০, ২০০, ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প,

রায়না-১ ব্লক যুব-উৎসবে তীর ছোঁড়া প্রতিযোগিতা

পুরুষ ও মহিলা সব বিভাগেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুরুষ ও মহিলা প্রত্যেক বিভাগে অন্যান্য পুরস্কার ছাড়া ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান পুরস্কার দেওয়া হয়।

৭ই এপ্রিল যুব উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও উৎসবের শুভ সূচনা করা হয় হাসিমারা সেন্ট্রাল ক্লাব প্রাঙ্গণে স্থানীয় যুবকগণের সাইকেল শোভাযাত্রার মাধ্যমে। যুব উৎসবের পতাকা উত্তোলন করেন হাসিমারা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকমহাশয়। যুব উৎসব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীরামপদ সিকদার মহাশয়। সাংস্কৃতিক বিভাগে আবৃত্তি, নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, স্বরচিত কবিতা, ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা বাদেও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একাংক নাটক প্রতিযোগিতার বিষয়টি। তা ছাড়া আদিবাসী লোকনৃত্যের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ১৫০ জন যুবক-যুবতী-কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করেছিল। একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় মোট ৭টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। হ্যামিলটনগঞ্জের সুভাষ স্মৃতি ব্যায়ামাগার কর্তৃক পরিবেশিত 'ভোমা' নাটকটি শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার জন্য পুরস্কার পায়। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে পুরস্কার পান হাসিমারা ভূমিকা নাট্যগোষ্ঠীর শ্রীঅমল মৈত্র। ভূমিকা নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক "লাস বিপণী" নাটকের পরিচালকও শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য পুরস্কার পান। একাংক নাটকের মধ্যে সব চাইতে আকর্ষণীয় ভার্নাবাড়ী চা বাগানের ছোট ছোট ছেলেরা "দেবরাজের কেবিনেট" বইটি মঞ্চস্থ করে। কয়েক হাজার দর্শকের সামনে সহজ ও সাবলীলভাবে নাটকটি মঞ্চস্থ করে তারা তাদের বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দেয়। যুব উৎসবের সমাপ্তি দিবসে প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে বিজয়ীগণের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কালচিনি পঞ্চায়েৎ সমিতির সভাপতি শ্রীজীবানন্দ ঝা মহাশয় এবং সেই সঙ্গে যুব উৎসবের অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয়।

কালচিনি ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে ক্রীড়া মানোন্নয়নের জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। অনাবাসিক ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির ১ মাসের জন্য সুরু করা হয়েছে হ্যামিলটনগঞ্জ ফুটবল মাঠে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক শ্রীশান্তি দামের নেতৃত্বে। ১২ থেকে ১৬ বৎসর বয়স্ক মোট ৫০ জন বালক এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছে। স্থানীয় ক্রীড়ামোদিগণ এই প্রশিক্ষণ শিবিরের সাফল্য কামনা করেছেন। এতদঞ্চলে এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির ২ বার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ফুটবল খেলা এতদঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়। ভালো খেলোয়াড় খুঁজে বের করা, তা ছাড়া প্রচুর সংখ্যক ছেলে এই খেলার প্রতি মনোনিবেশ করার দিকে এগিয়ে এসেছে। ১২.৫.৮২ তারিখে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হ্যামিলটনগঞ্জ জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং এই প্রশিক্ষণ শিবিরের সাফল্য কামনা করে প্রশিক্ষণ শিবির উদ্বোধন ঘোষণা করেন। যুবকল্যাণ দপ্তর থেকে ফুটবল ক্রয় করে দেওয়া হয়েছে এই প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনার জন্য।

নিমতিঝোড়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খোখো ও কবাডি বিষয়ের ১৫ দিনের জন্য প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে গত ৬.৫.৮২ তারিখে। ১২ থেকে ১৬ বৎসর বয়স্ক প্রায় ৬৫ জন বালক-বালিকা এতে অংশগ্রহণ করেছে। খোখো ও কাবাডি খেলাকে বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী যাতে এতদ্ বিষয়ক খেলা সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল হতে পারে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে তারই জন্য এই ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতদঞ্চলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই প্রশিক্ষণ শিবির যথেষ্ট উৎসাহ বর্ধন করেছে। ৬.৫.৮২ তারিখে এই শিবির উদ্বোধন করেন নিমতিঝোড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীহিরন্ময় চক্রবর্তী মহাশয়। ব্লক যুব আধিকারিক প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রশিক্ষক শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ ঘোষাল মহাশয়কে শিক্ষার্থীগণের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং যুবকল্যাণ দপ্তরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

জলপাইগুড়ি জেলা যুবকরণের উদ্যোগে গত ২৭শে মে থেকে জে.ওয়াই.এম.এ ময়দানে দশদিনব্যাপী ফুটবল, ভলিবল প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই শিবিরের প্রতি বিভাগে পর্যায়ক্রমে ১৮ ও ২৪ জন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শিবিরটি উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীদিগেন খাসনবীশ মহাশয়। এই অনুষ্ঠানে জেলা যুব আধিকারিক শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাস মহাশয় এই ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করার যৌক্তিকতা এবং উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। শিবিরে অংশগ্রহণকারী সমস্ত প্রশিক্ষার্থীদের সরকার থেকে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষক হিসাবে শিবিরটি পরিচালনা করেন ফুটবলে শ্রীমানিক দে ও শ্রীমন্টু সান্যাল, ভলিবলে শ্রীসুজিত বোস ও শ্রীবরুণ ভট্টাচার্য। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকগণ নিজ নিজ ব্লকে ১২ থেকে ১৬ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা শেখানোর জন্য ১ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

আগামী ৫.৬.৮২ তারিখে কবাডি ও খো খো খেলার জন্য অনুরূপ একটি প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শিবির দশ দিনের জন্য আরম্ভ হবে। ঐ একই দিনে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন ব্লকের কৃতী ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে একুশ দিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরও চালু হবে। উভয় শিবির জলপাইগুড়ি জে. ওয়াই. এম. এ-র ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে।

হুগলী জেলা

চণ্ডীতলা-১ ব্লক যুবকরণ—গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ ব্লক যুব উৎসব সমাপ্তির রেশ কাটতে না কাটতে আরও দুটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চণ্ডীতলা ১ নং ব্লকের আইয়া ও গঙ্গাধরপুরে। দুটি স্থানেই পাঁচটি করে গ্রাম পঞ্চায়েত অংশগ্রহণ করতে পেরেছিল। ১ নং ব্লকের দুটি অংশে অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্য—যাতে দূরবর্তী গ্রামের ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করতে পারে বা অনুষ্ঠান দেখতে পারে।

প্রথম অনুষ্ঠান হয় আইয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় আইয়া গ্রামে। এতে আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতা ছিল আর ছিল আলোচনা চক্র ও নাটক। ১ম নাটকটি "অথ অভিমন্যু কথা", পরিবেশনায় বিশালাক্ষী নাট্য মন্দির ও ২য় নাটকটি "তাহার নামটি রঞ্জনা" পরিবেশনায় আইয়া ধর্মতলা মিলন সংঘ। মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১৬৩ জন। বিপুল উৎসাহের সাথে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয় পুরস্কার বিতরণের মধ্যে। পুরস্কার বিতরণ করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীনকুলেশ্বর চ্যাটার্জী মহাশয়।

দ্বিতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি গত ২৫শে এপ্রিল রবিবার গঙ্গাধরপুর বিস-ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আবৃত্তি, সঙ্গীত ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ছিল এবং মোট অংশগ্রহণ করে ১৪৩ জন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন শ্রীনকুলেশ্বর চ্যাটার্জী, সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি ও প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধানসভার সদস্য শ্রীমলিন ঘোষ মহাশয় ও শ্রীচির মিত্র মহাশয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল সংস্কৃতি সংসদ শাখা কর্তৃক "হিসাব নেবার পালা" নাটকটি। বিপুল জনসমাগম এই অভিনয়অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলেছিল। এ ছাড়া বিপুল সংখ্যক দর্শক জায়গার অভাবে অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হয়।

গত ১লা মে তপশিলভুক্ত যুবকদের তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন বিধানসভার সদস্য শ্রীমলিন ঘোষ মহাশয়, এবং সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীনকুলেশ্বর চ্যাটার্জী মহাশয়। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রী ঘোষ মহাশয় বলেন যে, বামফ্রন্ট সরকারের যে সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে থেকেও সমাজের নিচু তলার মানুষের জন্য কিছু করার আন্তরিক চেষ্টা আছে তার প্রমাণ হিসেবে এই রকম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আয়োজন করা হচ্ছে—যা গত ৩০ বছরেও কংগ্রেস সরকার করতে পারে নি। সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে শিক্ষার্থীদের গভীর নিষ্ঠার সাথে শিক্ষাগ্রহণ করতে বলেন এবং শিক্ষালাভ সার্থক হলে পর যাতে কিছু আর্থিক সংস্থান করতে পারে এই কাজের মাধ্যমে তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করবেন। উপস্থিত স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বলেন যে, শিক্ষালাভের পর যে সকল শিক্ষার্থী তাঁতের সামগ্রী তৈরী করবেন তাঁদের সমস্ত সামগ্রী তন্তুবায় সমিতি ক্রয় করে নেবার আশ্বাস দেন। সবশেষে উপস্থিত সদস্যদের ধন্যবাদ জানান ব্লক যুব আধিকারিক এবং তিনি সেই সাথে জানান যে, মোট ৩০ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষাগ্রহণ করবে এবং প্রত্যেকে মাসে ৩০ টাকা করে ভাতা পাবেন। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ৪ মাস চলবে।

ওই দিন বেলা ৪টায় মশাট ফুটবল মাঠে আন্তঃ ক্লাব ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিধান সভার সদস্য শ্রীমলিন ঘোষ মহাশয় এবং

খেলাধুলোর সামগ্রী বিতরণ করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীনকুলেশ্বর চ্যাটার্জী মহাশয়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে, গত বছরে যে সমস্ত ক্লাব বিভিন্ন খেলাধুলোয় অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে সামগ্রী বিতরণ করা হলো—সেইমত মোট ২২টি ক্লাবকে ফুটবল, ভলিবল ও নেট দেওয়া হলো। ফুটবল প্রতিযোগিতায় মোট ২২টি ক্লাব অংশগ্রহণ করবে। যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয় তার জন্য উপস্থিত সমস্ত ক্লাবকে ব্যবস্থাপক ক্লাব, মশাট স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনকে সাহায্য করার আবেদন জানান ব্লক যুব আধিকারিক।

১৬ বছরের নিম্ন বালকদের ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হয় গত ২।৫।৮২ তাং বেলা ৪টায় বাঁদপুর ফুটবল মাঠে। উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত সভাপতি মহাশয়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে গ্রামীণ খেলাধুলোর উন্নতির জন্য বামফ্রন্ট সরকার গ্রামে গ্রামে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আয়োজন করছেন। চণ্ডীতলা ১নং ব্লকে এ রকম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৩টি হবে। তার ১মটির উদ্বোধন হলো আজ, ২য়টি হবে আগামী ১৫ই মে সিংজোর ফুটবল মাঠে এবং ৩য়টি হবে ২৫শে মে, গঙ্গাবীরপুর মাঠে। প্রশিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হলো জেলার বিশিষ্ট প্রবীণ খেলোয়াড় কাজী বসিরুল হক মহাশয়কে। এই কেন্দ্র ১ মাস ধরে চলবে এবং ৩০ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ লাভ করবে।

উত্তরপাড়া ব্লক যুবকরণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া ব্লকযুবকরণ ও পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় এবং বিভিন্ন যুব সংগঠন ও ক্লাবগুলির যৌথ সহযোগিতায় সম্প্রতি শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া ব্লক যুব উৎসব '৮২ হয়ে গেল শ্রীরামপুর ও নবগ্রামে। এই উৎসবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রায় এক হাজার উৎসাহী যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। এই ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা গ্রামের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সাড়া জাগায়। সাংস্কৃতিক বিভাগের বিতর্ক, আবৃত্তি, সংগীত, একাঙ্ক নাটক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন অনুষ্ঠান সর্বতোভাবে সফল হয়েছে। যুবক-যুবতীদের উৎসাহ উদ্দীপনাতে আগামী দিনের উজ্জ্বল আশার সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়।

এ ছাড়া মূল অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে আরও উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল রক্তদান ও চক্ষুদান শিবিরের মাধ্যমে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় লোকসভার সদস্য শ্রীঅজিত বাগ মহাশয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডাঃ আই. এস. রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় বিধানসভার সদস্য শ্রীশান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। এই ব্লকের যুবক-যুবতীরা আনন্দের সঙ্গে রক্তদান ও ২৮ জন ব্যক্তি চক্ষুদানের অঙ্গীকার করেন। যুব সমাজের মানসিকতার মান উন্নয়নের প্রতি নজর রেখেই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।

মাননীয় শ্রীবাগ ও ডাঃ রায় যুবশক্তিকে কুসংস্কার মুক্ত হয়ে সমাজের সেবায় এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন; এ ছাড়া উপস্থিত যুবক-যুবতীদের ও উৎসব কমিটিকে ধন্যবাদ জানান—এই ধরনের উৎসবের সঙ্গে রক্তদান ও চক্ষুদান শিবির করার জন্য।

পুরস্কার বিতরণী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের সদস্য মাননীয় শ্রীদিলীপ চ্যাটার্জী ও শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, "গ্রামীণ সংস্কৃতিকে রক্ষা করে যুব চেতনার বিকাশ ও যুব সমাজের মান উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার যে সকল পরিকল্পনামূলক কাজ শুরু করেছেন ও ভবিষ্যতে করবেন এই যুব উৎসব তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত"।
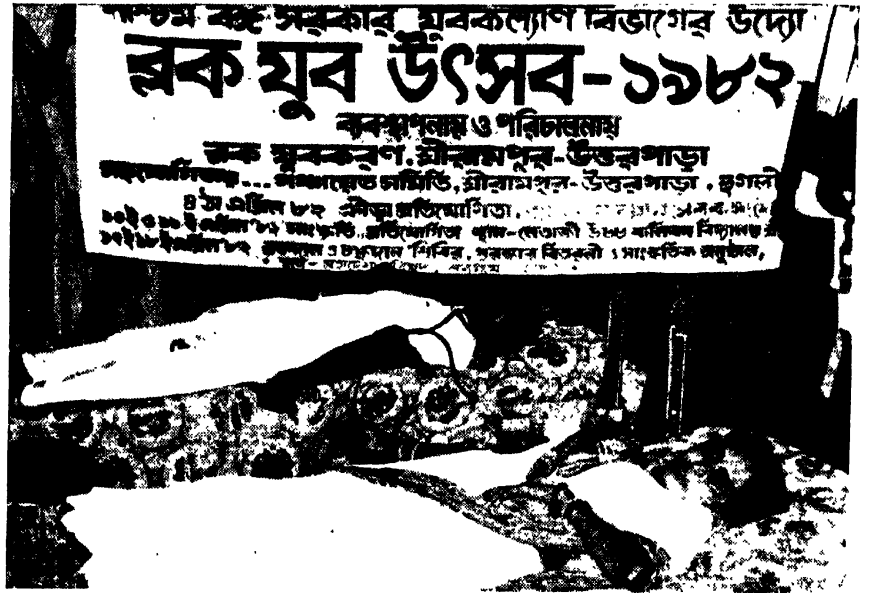
উত্তরপাড়া ব্লক যুব-উৎসবের রক্তদান শিবির

পাঠকের ভাবনা

প্রয়োজনে আইন সংশোধন করুন

এটা অত্যন্ত সুখের কথা যে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র জগতে এক ঝাঁক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা তাঁদের হাতের ক্যামেরাটিকে রাইফেলের মত ব্যবহার ক'রে সমস্ত প্রকার আর্থ-সামাজিক নিপীড়ন-বঞ্চনাকে অব্যর্থ লক্ষ্যে তাক ক'রে চলেছেন অকুতোভয় নিষাদের নিশানায়—এই সূত্রে প্রকৃত অর্থেই তাঁরা 'কমিটেড্' (প্রসঙ্গঃ 'উৎপলেন্দু ও গৌতমঃ অবারণ যৌবনের প্রতিশ্রুতি', এপ্রিল '৮২)। অক্টোবর বিপ্লবোত্তর কালেই লেনিন চলচ্চিত্র মাধ্যমটির অসীম ক্ষমতার কথা উপলব্ধি করেই বলেছিলেনঃ The cinema is for us the most important instrument of all arts. লেনিনের উপলব্ধি যে কোনমতেই অতিশয়োক্তি নয় আজকের চলচ্চিত্র মাধ্যমের বহুমুখী ও বহুমাত্রিক বিকাশই তার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বলতে গেলে বলা যায় যে যেহেতু সমগ্র জনগণের নগণ্য অংশমাত্র তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষিত, চলচ্চিত্র মাধ্যমটির দ্বারা তাদেরকে সচেতন বোধে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। পুডভকিন একসময় বলেছিলেনঃ The film is the greatest teacher because it teaches not only through brain, but through the whole body। কিন্তু আমাদের দেশে কখনই এই মাধ্যমটির যথাযথ ব্যবহারের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় নি, যেটুকু হচ্ছে সেটুকু নিয়ন্ত্রণ করছে অপ-সংস্কৃতি ও অতি-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক একদল মুনাফাখোর পুঁজিপতি। আর এর প্রভাব যে কি ভয়ংকর সম্ভাবনার জন্ম দিতে পারে তা আজকের ব্যাপক সাংস্কৃতিক অবক্ষয় আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, ফলতঃ বাবা-শোলে-জয় মা সন্তোষী-বাবা তারকনাথের মতন অপ-সৃষ্টির সঙ্গে অসম ও অক্ষম প্রতিযোগিতায় হটে যাচ্ছে 'পথের পাঁচালী' ও উৎপলেন্দু-গৌতম প্রমুখদের জীবন-ধর্মী সমাজসচেতক সৃষ্টি-প্রয়াসগুলি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর এক বিরাট দায়িত্ব অবশ্যই এসে পড়ে। আমার প্রশ্নঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি 'ভারতের বৃহত্তম চিত্র-প্রযোজক' হয়েই দায়িত্বমুক্ত হবেন? কেন তাঁরা তাঁদের নিজস্ব প্রযোজিত ছবিগুলি সহ অন্যান্য 'কমিটেড' ছবিগুলির আশু মুক্তির ব্যবস্থা করছেন না? তবে শুধুমাত্র মেট্রোর মত অভিজাত-বনেদী হলে মুক্তি হলেই চলবে না ছবিগুলিকে ব্যাপক-ভাবে গ্রামে-গঞ্জে-মাঠ-পাথারে সর্বত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ক'রে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক সহ আপামর জনসাধারণ ছবিগুলি দেখার সুযোগ পেতে পারেন এবং তার ফলেই, শুধুমাত্র তখনই অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটা সচেতন আন্দোলন সৃষ্টি হতে পারবে। (এইজন্য বোধহয় চ্যাপলিন বলেছিলেনঃ Great films should meet greater people) যদি প্রচলিত আইন-কানুন এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত আইন সংশোধন প্রণয়ন ক'রে বাস্তববোচিত কর্ম-সূচি গ্রহণ করা, এবং তা এখনই— better late, than never।

গাজী শহীদ
মশাগ্রাম, বর্ধমান

শ্রীমতী সুমিত্রা সেন-ও ছিলেন

'যুবমানস' ফেব্রুয়ারী '৮২ সংখ্যার 'বিভাগীয় সংবাদে' 'যুবমানস আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতি-যোগিতার পুরস্কার বিতরণ' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—(সভাশেষে সাংস্কৃতিক) অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আবৃত্তি করে শোনান শ্রীরজত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গতঃ জানাচ্ছি, ঐ অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত ছিলাম। আমরা নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্তে বলছি যে—ঐ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রীমতি সুমিত্রা সেন-ও ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন প্রথম শিল্পী; তারপর আবৃত্তি করেন শ্রীরজত বন্দ্যো-পাধ্যায়—তারপরের শিল্পী ছিলেন শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুতরাং ঐ প্রতিবেদনে শ্রীমতি সেনের নামও উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। যুবমানস পত্রিকার পক্ষে এমন একটা ত্রুটি বড় বেমানান। তাই আপনার অবগতির জন্য এই পত্রের আশ্রয় নিতে হোলো। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন- এই বিশ্বাস রইল।

কমলা দাস, বিকাশ দাস
ও
স্বপনকুমার পোদ্দার
গোবরডাঙা, ২৪-পরগণা

যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই

বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধে পারমাণবিক যুদ্ধের যে সম্ভাবনা আজ বিশেষভাবে বিশ্ববাসীর নজরে এসেছে তাতে এ সম্পর্কে তাঁরা সকলেই যে আতঙ্কিত তা সহজেই বোঝা যায়। তাইতো, পারমাণবিক যুদ্ধ বর্জনের জন্য বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে দেশে দেশে বিভিন্ন কায়দায় নাগরিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যা অত্যন্ত অভাবনীয় ব্যাপার। আমরাও এই রকম পারমাণবিক যুদ্ধ বাঁধানোর ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাই। ধিক্কার জানাই সেই সব মানবিক শত্রুদের—যারা আজ মানবের ধ্বংসসাধন কার্যে লিপ্ত।

আপনাদের মার্চ '৮২-এর 'যুবমানস' পত্রিকায় লোকচিত্রকলা বিভাগে অমিতাভ সেনের আঁকা 'আর যুদ্ধ নয়' ছবিটি তাই ভাল লেগেছে। আমাদের অনুরোধ, পারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য এবং এই যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য আপনারা আপনাদের 'যুবমানস' পত্রিকায় 'ছবি ও লেখা' প্রকাশ অব্যাহত রাখবেন।

পরিশেষে, আমরা আবার আমাদের 'প্রান্তিক' শিশু সংগঠনের অর্ধশতাধিক শিশুদের পক্ষ থেকে পারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাই। আহ্বান জানাই বিশ্ববাসীকে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা মুক্ত করার। শ্লোগান দিই—"যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।"

সুধীন সেন ও শান্তা সাহা
যুগ্ম সম্পাদক
'প্রান্তিক' শিশু সংগঠন
চাঁদপাড়া বাজার, ২৪-পরগণা

ছোটদের জন্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'যুবমানস' পত্রিকা একটি প্রগতি-শীল পত্রিকা যা সকল বয়সী পাঠক-পাঠিকাদেরই পড়বার উপযোগী। তা সত্ত্বেও আমরা 'প্রান্তিক' শিশু সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি আবেদন আপনাদের কাছে রাখছি। আমরা যুবকল্যাণ বিভাগ পরিচালিত যুব উৎসবে দেখেছি, সেখানে শুধু যুবক ও যুবতীরাই খেলাধুলো কিম্বা অন্যান্য বিষয়ে অংশগ্রহণ করে না। আট থেকে বার বছর বয়সী শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরাও যুব উৎসবে বিভিন্ন বিষয়েই অংশগ্রহণ করে থাকে। যাদের যোগদানের ফলেই যুব উৎসবের অনুষ্ঠান সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তেমনি আপনাদের 'যুবমানস' পত্রিকাতেও যদি 'ছোটদের জন্য' একটি বিভাগ খোলা হয় যাতে ছোটদের মানসিক, চারিত্রিক অবস্থার ক্রমোন্নতি ঘটাতে পারে এমন বাস্তবভিত্তিক লেখা প্রকাশিত হবে। সাথে সাথে এই বিভাগে তারাও লেখার সুযোগ পাবে। তবে 'যুবমানস' পত্রিকা যে আরও জন-প্রিয়তা লাভ করবে এ ব্যাপারে আমরা সুনিশ্চিত।

আশা করি, এখন এ ব্যাপারটি নিয়ে 'যুবমানস' কর্তৃপক্ষ ভাববেন।

সুধীন সেন ও শান্তা সাহা
যুগ্ম সম্পাদক
'প্রান্তিক' শিশু সংগঠন
চাঁদপাড়া বাজার, ২৪-পরগণা

প্রসঙ্গ : উৎপলেন্দু গৌতম

এপ্রিল '৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত নীহার দাশগুপ্তর 'উৎপলেন্দু ও গৌতম : অবারণ যৌবনের প্রতিশ্রুতি' প্রবন্ধটির জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে যুবকল্যাণে উৎসর্গীকৃত মাসিকপত্রে লেখার সময় প্রাবন্ধিক একটু সতর্ক হলে আনন্দিত হতাম।

চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু বা বক্তব্যের ভূমিকাকে প্রধান স্বীকার করে হঠাৎ সত্যজিৎ প্রসঙ্গ টানাটা অবান্তর। চলচ্চিত্র সমালোচনায় সত্যজিৎ-এর নাম না তুললেই কী ভদ্রলোককে যথেষ্ট সম্মান জানানো যায় না? আর ঠিক তার পরেই ঋত্বিক ঘটকের প্রসঙ্গ তোলাটা কিছুটা ইতিহাসকে ব্যঙ্গ করে। মৃণাল সেনের প্রসঙ্গ নেই দেখেই আমি আশংকা বোধ করছি।

উৎপলেন্দু ও গৌতমের যথাক্রমে 'ময়না তদন্ত' ও 'দখল' দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কমিটেড পরিচালক হিসেবে এই দুই যুবকের কোনো তুলনা নেই। তবে তথাকথিত বিশিষ্ট কমিটেড পরিচালকও যখন ছবি করতে গিয়ে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেন, নিজের কাজকে সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করান, তখন সন্দেহ জাগে পরিচালকের কমিটমেন্ট সম্পর্কে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সত্তর লক্ষ টাকা চলচ্চিত্রের জন্য খরচ করেছেন, ভালো পরিচালককে অনুদান দিয়েছেন—শুধুমাত্র এটাই যদি লেখকের মূল বক্তব্য হয়ে থাকে, তবে সৈয়দ আখতার মির্জার ('আলবার্ট পিন্টো কো গুস্সা কিঁউ আতা হ্যায়?'-এর পরিচালক) একটি বক্তব্য জানায়—'State help to new filmmakers is merely an escape valve in the government's intention (সেলুলয়েড—৩য় সংখ্যা, জানু-মার্চ, ১৯৮২)

নীহারবাবু, চলচ্চিত্র সমালোচনা করা আজকাল আর অবসর বিনোদনের খোরাক নয়, এক বিশাল কর্মযজ্ঞ—অন্ততঃ যখন যুবকদের আপনি দৃঢ়তার সঙ্গে কিছু কথা শোনাতে চান।

নিতাই দত্ত
বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল
পো+জেলা—বর্ধমান। পিন-৭১৩ ১০৪

মগজ চালান : কার ক্ষতি কে লাভবান

'যুবমানস' এপ্রিল, '৮২ সংখ্যার আলোচনা বিভাগে অমিতাভ রায়-এর 'মগজ চালান : কার ক্ষতি কে লাভবান' শিরোনামার নিবন্ধটির জন্য ধন্যবাদ। লেখক বেশ সুন্দরভাবে বেশ কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে 'মগজ চালান'—এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।

সত্যি এই সমস্যাটি আজ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নাগপাশে আবদ্ধ করে ফেলেছে। কি হারে বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার ইত্যাদির মতো প্রতিভাবানরা উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে শিল্পোন্নত দেশ অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন ইত্যাদি দেশগুলোতে চলে যাচ্ছে তা অমিতাভবাবুর নিবন্ধটিতে দেওয়া পরিসংখ্যানগুলোর দিকে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায়। বলা বাহুল্য এতে উন্নয়নশীল দেশগুলোই প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে,—দেশগুলোর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিনষ্ট হচ্ছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর রূপায়ণে ব্যাঘাত ঘটছে অর্থাৎ দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। অপরদিকে এর ফলে উন্নত দেশগুলোর বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও প্রযুক্তিগতদিকে আরও উন্নতি হচ্ছে—তারা বিপুল পরিমাণে মুনাফা লুটছে। তা-ও আবার ঐ উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছ থেকেই। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ঐ সমস্ত দেশত্যাগীরা নিজেরাই নিজেদের দেশকে উন্নত দেশগুলোর দ্বারা শোষণ করতে সাহায্য করছে। অমিতাভবাবুর সাথে গলা মিলিয়েই বলি—যাঁরা স্বদেশের উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটায়, নিজের দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে তাঁরা কি 'দেশদ্রোহী' নয়?

তাই আইন করে হোক আর যে করেই হোক অবিলম্বে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 'মগজ চালান' সমস্যাটির সুসমাধানের জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ তথা উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া অবশ্যই উচিত।

রাজীবকুমার দাস
২/৫৬, বিরাটি মহাজাতি নগর
কলকাতা-৫১

অভিনন্দন

'যুবমানস'—ঘুনধরা প্রাচীন জড়তার বন্ধন ছিন্ন করে যুবসমাজের কাছে সত্যিই নিয়ে আসছে এক নব চেতনার উন্মেষ; দিশেহারা যুবসমাজের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে এক আশার আলো। শুধু আশায় নয়, তাকে বাস্তবে রূপ দিতে আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়তই। যা যুবসমাজের তথা আপামর জনসাধারণের জীবন জীবিকার পাথেয়। মৈনাক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "মৌমাছি চাষ : স্বনির্ভরতার একটি মাধ্যম" প্রতিবেদনটি আমাদের প্রেরণা যোগায়, নূতন করে ভাবতে শেখায়। স্বনির্ভরতায় মাথা তুলে দাঁড়াতে আলোর বর্তিকা তুলে ধরে। মাঝে মধ্যে যুবমানসে এমনি করে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে অবশ্যই যুব সম্প্রদায় আশার আলো দেখতে পাবেন। আগামী দিনে যুবমানস আরও বেশী বেশী করে যুবসমাজের কথা ভাববে এই আমার আন্তরিক কামনা।

রঞ্জিত কুমার
গোবিন্দপুর, বাগমুন্ডি
পুরুলিয়া

১৯৮২-র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল

কোচবিহার

১। মেখলিগঞ্জ (তফঃ সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	১,০৩,৯৮১	
প্রদত্ত ভোট	—	৮০,৮০৭	(৭৭ ৭১)
বাতিল ভোট	—	২,১৫৩	
অরুণ রায়	এস ইউ সি আই	৬,৪২৬	(৮·১৭)
নীরেন চৌধুরী	আই সি (এস)	২৮,৫২৮	(৩৬·২৭)
মণীন্দ্রনাথ রায়	নিঃ	১,১১৪	(৩·৪৯)
শিবেন্দ্রনাথ রায়	নিঃ	১,৬২৮	
* সদাকান্ত রায়	ফঃ ব্লক	৪০,৯৫৮	(৫২ ০৭)

২। শীতলকুচি (তফঃ সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৯৫,৮৯১	
প্রদত্ত ভোট	—	৮২,৩৩২	(৮৫·৮৬)
বাতিল ভোট	—	২,০১৬	
কর্ণেশ্বর বর্মন	নিঃ	৪৫৬	(০ ৫৭)
বীরেন্দ্রনাথ রায়	আই এন সি	৩৪,৩৩৩	(৪২ ৭৫)
* সুধীর প্রামাণিক	সি পি আই (এম)	৪৫,৫২৭	(৫৬ ৬৮)

৩। মাথাভাঙা (তফঃ সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৯৫,৮৩৭	
প্রদত্ত ভোট	—	৮১,৫৬৪	(৮৫ ১০)
বাতিল ভোট	—	২,০৪৭	
কর্ণেশ্বর বর্মন	নিঃ	৭৪৭	(০·৯৪)
* দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া	সি পি আই (এম)	৪৪,৭২৫	(৫৬·২৫)
হিতেন্দ্রনাথ প্রামাণিক	আই এন সি	৩৪,০৪৫	(৪২·৮১)

৪। কোচবিহার (উত্তর)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	১,০১,২১৯	
প্রদত্ত ভোট	—	৮৩,২৬১	(৮২ ২৬)
বাতিল ভোট	—	১,৩৫৪	
* অপরাজিতা গোপ্পী	ফঃ ব্লক	৪৬,৮১০	(৫৭ ১৫)
ভবেশ্বর দাস	নিঃ	৪৫৮	(৪·১৯)
রবীন্দ্রনাথ সরকার	নিঃ	৭৬৬	
সুনীল কর	আই এন সি	৩৩,৮৭৩	(৪১·৩৬)

৫। কোচবিহার (পশ্চিম)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	১,০৮,৯৩৭	
প্রদত্ত ভোট	—	৯৩,৫২৪	(৮৫ ৮৫)
বাতিল ভোট	—	১,৭৯৯	
জনাবউদ্দীন ব্যাপারী	নিঃ	২২৭	
জহিরউদ্দিন মিঞা	নিঃ	৬১৭	(১ ৬২)
নীরেন্দ্রপ্রসাদ কাজি	নিঃ	৬৪৬	
* বিমলকান্তি বসু	ফঃ ব্লক	৫৩,১৭০	(৫৭ ৯৭)
শ্যামল চৌধুরী	আই এন সি	৩৭,০৬৫	(৪০·৪১)

৬। সিতাই

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	১,০৭,৬৪৬	
প্রদত্ত ভোট	—	৯৪,৩৯৬	(৮৭·৬৯)
বাতিল ভোট	—	১,৮৩৫	
* দীপক সেনগুপ্ত	ফঃ ব্লক	৫১,৩১২	(৫৫ ৪৪)
প্রশান্তকুমার বর্মন	নিঃ	১,০২৩	(১·১১)
ডাঃ মহঃ ফজলে হক	আই এন সি	৪০,২২৬	(৪৩·৪৫)

৭। দিনহাটা

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	১,০৮,৯১১	
প্রদত্ত ভোট	—	৯৪,৮৬৬	(৮৬·৪৬)
বাতিল ভোট	—	১,৭৯৮	
* কমল গুহ	ফঃ ব্লক	৫৩,৪৬০	(৫৭·৮৮)
রামকৃষ্ণ পাল	আই এন সি	৩৮,৬২৭	(৪১·৮২)
শ্যামলকুমার রায়	নিঃ	২৮১	(০·৩০)

৮। নাটাবাড়ি

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৯১,০৮৫	
প্রদত্ত ভোট	—	৮১,৬৯৮	(৮৯·৬৯)
বাতিল ভোট	—	১,২৯০	
ধীরেন্দ্রনাথ দাস	নিঃ	৩২০	(০·৪০)
* শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী	সি পি আই (এম)	৪৫,০৫৪	(৫৬ ০৩)
সন্তোষকুমার রায়	আই এন সি	৩৫,০৩৪	(৪৩·৫৭)

৯। তুফানগঞ্জ (তফঃ সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৯১,১৩৮	
প্রদত্ত ভোট	—	৮০,৮১৩	(৮৮ ৬৭)
বাতিল ভোট	—	১,৪৪৯	
মণীন্দ্রনাথ বর্মা	সি পি আই (এম)	৪২,৮৮৭	(৫৪·০৪)
শংকর সেন ইশোর	আই এন সি	৩৫,১৯২	(৪৪·৩৪)
সাধনচন্দ্র দাস	নিঃ	৫০৭	(০·৬৪)
সুরেন্দ্রনাথ রায় কোঙার	বি জে পি	৭৭৮	(০·৯৮)

জলপাইগুড়ি

১০। কুমারগ্রাম (আদিবাসী সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৯৩,২৫১	
প্রদত্ত ভোট	—	৭৫,১৭০	(৮০·৬১)
বাতিল ভোট	—	৩,১৪৬	
দুতসাই টোপ্পো	আই এন সি	৩১,৪৯৩	(৪৩·৭৩)
* সুবোধ ওরাঁও	আর এস পি	৪০,৫৩১	(৫৬·২৭)

১১। কালচিনি (আদিবাসী সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৮৩,৯৭৯	
প্রদত্ত ভোট	—	৬৩,০৫১	(৭৫·০৮)
বাতিল ভোট	—	৪,২৩৫	
ক্ষুদিরাম পাহান	আই এন সি	২৬,২১৬	(৪৪·৫৭)
* মনোহর টিরকে	আর এস পি	৩২,৬০০	(৫৫·৪৩)

১২। আলিপুরদুয়ার

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	১,০৬,২৫৫	
প্রদত্ত ভোট	—	৮৩,৬৬১	(৭৮ ৭৪)
বাতিল ভোট	—	১,৮৯২	
* ননী ভট্টাচার্য	আর এস পি	৫০,০২৫	(৬১·১৮)
পল্লব ঘোষ	আই এন সি	৩১,২২৬	(৩৮·১৯)
প্রভাত অধিকারী	নিঃ	৫১৮	(০·৬৩)

১৩। ফালাকাটা (তফঃ সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৯৩,২২৯	
প্রদত্ত ভোট	—	৭৩,৬৯০	(৭৯·০৪)
বাতিল ভোট	—	২,৬৭১	
নগেন্দ্রনাথ রায়	নিঃ	৮০১	(১·০৫)
*যোগেন্দ্রনাথ সিং রায়	সি পি আই (এম)	৩৮,৩০৬	(৫৩·৯৪)
যোগেশচন্দ্র রায়	আই সি (এস)	৩১,০৭৬	(৪৩·৭৬)
হরিকান্ত বর্মন	নিঃ	৮৩৬	(১·২৫)

১৪। মাদারিহাট (আদিবাসী সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৮৯,৬৫৮	
প্রদত্ত ভোট	—	৬৫,১৩২	(৭২·৬৪)
বাতিল ভোট	—	৪,১৯৯	
জগৎ বড়াল	আই এন সি	২০,৩৭৩	(৩৩·৪৪)
জুলিয়াস তপনো	নিঃ	২,২৬৫	(৬·২৯)
সঞ্জয়কুমার ওরাঁও	নিঃ	১,৪৫৮	
*সুশীল কুজুর	আর এস পি	৩৬,৮৩৭	(৬০·৪৫)

১৫। ধূপগুড়ি (তফঃ সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৮৭,০১৩	
প্রদত্ত ভোট	—	৭০,৩৩৩	(৮০·৮৩)
বাতিল ভোট	—	১,৭১৩	
জগদানন্দ রায়	আই এন সি	২৮,৩৪০	(৪১·৩০)
পঞ্চানন মল্লিক	নিঃ	২,৯৫৯	(৪·৭৭)
পরেশচন্দ্র রায়	জে পি	১,০৭৪	
বঙ্কিমচন্দ্র রায়	নিঃ	৩১৮	
*বনমালী রায়	সি পি আই (এম)	৩৫,৯২৯	(৫২·০৬)

১৬। নাগরাকাটা (আদিবাসী সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	১,০৮,০৮৯	
প্রদত্ত ভোট	—	৮১,৬১৭	(৭৯·৭৯)
বাতিল ভোট	—	৪,৬৩০	
তুনা ওরাঁও	আই এন সি	৩০,০১৬	(৩৮·৯৯)
*পুনাই ওরাঁও	সি পি আই (এম)	৪৬,৯৭১	(৬১·০১)

১৭। ময়নাগুড়ি (তফঃ সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৯৩,০৪৪	
প্রদত্ত ভোট	—	৭১,৬১৩	(৭৬·৯৬)
বাতিল ভোট	—	১,৬৫৩	
উপেন্দ্রনাথ রায়	নিঃ	২৬৮	
*তারকবন্ধু রায়	আর এস পি	৩৭,৪৯১	(৫৩·৫৯)
পঞ্চানন মল্লিক	নিঃ	২,১৬০	
মৃদুলেন্দ্র দেব রায়কত	আই সি (এস)	২৮,২৪০	(৪০·৩৭)
রেণু রায়	জে পি	১,৮১১	

১৮। মাল (আদিবাসী সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৯৪,৭৭৮	
প্রদত্ত ভোট	—	৭১,৪৪৯	(৭৫·৩৯)
বাতিল ভোট	—	৩,৯৬৯	
*মোহনলাল ওরাঁও	সি পি আই (এম)	৪৩,৪০৯	(৬৪·৩৩)
সুকুমার টিরকে	আই এন সি	২৪,০৭১	(৩৫·৩৭)

১৯। ক্রান্তি

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৮৬,৫১২	
প্রদত্ত ভোট	—	৭০,৬৭১	(৮১·৬৯)
বাতিল ভোট	—	২,০৫৬	
কমল ভৌমিক	নিঃ	১,৪২৫	(২·৬৪)
দেবপ্রসাদ রায়	আই এন সি	২৯,০৮০	(৪২·৩৮)
*পরিমল মিত্র	সি পি আই (এম)	৩৭,৯২০	(৫৫·২৬)
বিনয়ভূষণ দত্ত	নিঃ	১৯০	(০·৪০)

২০। জলপাইগুড়ি

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৯৩,৬৬১	
প্রদত্ত ভোট	—	৭৩,০৭৯	(৭৮·০৬)
বাতিল ভোট	—	১,৪৮৬	
অনুপম সেন	আই এন সি	৩৪,০৮৪	(৪৭·৪১)
দিলীপ ভট্টাচার্য	এস ইউ সি আই	১,৪১৯	(১·৯৭)
*নির্মল বসু	ফঃ ব্লক	৩৫,২২০	(৪৮·৯৮)
প্রবীররঞ্জন দত্ত	নিঃ	২৪১	(১·৬৪)
রুক্মিণীরঞ্জন রায়	নিঃ	৮৯৯	

২১। রাজগঞ্জ (তফঃ সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	১,১৩,৬৭৭	
প্রদত্ত ভোট	—	৮৪,৫৭৪	(৭৪·৪০)
বাতিল ভোট	—	২,৩৩৮	
জীবনকুমার রায়	আই এন সি	২৮,৩৩২	(৩৪·৪৫)
*ধীরেন্দ্রনাথ রায়	সি পি আই (এম)	৪৮,৭৪৭	(৫৯·৩০)
পুরেন্দ্রনাথ রায়	এস ইউ সি আই	১,১২৫	(১·৩৭)
বরমাদেব দাস	জে পি	১,২৬৩	(১·৫৪)
মনোমোহন রায়	বি জে পি	১,১৭৩	(১·৪৩)
হরেন্দ্রনাথ বর্মন	নিঃ	১,২৬৪	(১·৮৮)
হরেন্দ্রনাথ রায়	নিঃ	২৮৭	

দার্জিলিং

২২। কালিম্পং

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৮৮,২৭২	
প্রদত্ত ভোট	—	২৯,৭৬২	(৩৩·৭২)
বাতিল ভোট	—	১,২০৯	
আর বি কার্তিওয়ার	নিঃ	৪৭৮	
তাসি তাসিং লেপচা	নিঃ	১,৫৮৭	
বদ্রীনারায়ণ প্রধান	নিঃ	৫,৯৬০	
মোহনসিং রাই	সি পি আই	৫,০৪৪	(১৮·৭৪)
*রেণুলীনা সুব্বা	নিঃ	১৫,১৫৪	

২৩। দার্জিলিং

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	১,০১,০২৯	
প্রদত্ত ভোট	—	৬০,০১২	(৫৯·৪০)
বাতিল ভোট	—	১,৯৯১	
*দাওয়া লামা	সি পি আই (এম)	২৯,১৬৫	(৫০·২৬)
জে ডি এস রাই	নিঃ	২৮,৮৫৬	(৪৯·৭৪)

২৪। কার্শিয়াং

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৯৮,২০৯	
প্রদত্ত ভোট	—	৬১,৪০০	(৬২·৫০)
বাতিল ভোট	—	২,১৭০	
দাওয়া নারবুলা	আই এন সি	২৭,৮৮৯	(৪৭·০৯)
বিষ্ণু ঘট্টয়াদ	নিঃ	৩,১৭১	(৫·৩৫)
*এইচ বি রাই	সি পি আই (এম)	২৮,১৭০	(৪৭·৫৬)

২৫। শিলিগুড়ি

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	১,৪৯,৭০৬	
প্রদত্ত ভোট	—	৮৪,০৮১	(৫৬·০২)
বাতিল ভোট	—	২,০১২	
কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী	আই এন সি	৩৪,৮৬৪	(৪২·০৬)
প্রবোধ সরকার	নিঃ	৭৯১	
*বীরেন বসু	সি পি আই (এম)	৪৪,৯৩৫	(৫৪·৫৯)
মণিকুমার প্রধান	নিঃ	৪৬৫	
রণেন বর্মন	নিঃ	৩৯২	
রূপক মুখার্জি	নিঃ	৮৫৮	

২৬। ফাঁসীদেওয়া (আদিবাসী সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার		১,২৭,৮৫৪	
প্রদত্ত ভোট		৯৪,২০৩	(৭৩·৬৮)
বাতিল ভোট		৩,৮৩৩	
ঈশ্বরচন্দ্র টিরকে	আই এন সি	৩৬,০৭৬	(৩৯·৯২)
এডোয়ার্ড টিরকে	নিঃ	৩,১৭৩	
টেরেসা সরেং চাকো	জে পি	৫,১২০	(৫·৬৭)
ধর্মেন্দ্রনাথ বীরজ্	নিঃ	১,১১৪	
* পাব্রাস মিন্জ্	সি পি আই (এম)	৪১,৩৬২	(৪৫·৭৭)
শান্তি মুণ্ডা	নিঃ	২,৭২৫	

পশ্চিম দিনাজপুর

২৭। চোপরা

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার		৯১,৯৫৮	
প্রদত্ত ভোট		৭৩,০৬৯	(৭৯·৪৬)
বাতিল ভোট		১,৬৫৯	
* মহম্মদ বাচ্চা মুন্সী	সি পি আই (এম)	৩৭,২৭৯	(৫১·৯৯)
সেখ জালালুদ্দীন	আই এন সি	৩৩,৮৭২	(৪৭·২৩)
হরিপদ পুর্বে	নিঃ	৫৫৯	(০ ৭৮)

২৮। ইসলামপুর

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	১,০৩,৩১৯	
প্রদত্ত ভোট	—	৭০,৫৯২	(৬৮ ৩২)
বাতিল ভোট	—	১,৬৩৩	
গৌতম গুপ্ত	নিঃ	৯,৬৮৫	(১৪·০৪)
* চৌধুরী মঃ আবদুল করিম	আই এন সি	৩৩,৫০৮	(৪৮·৫৯)
মহঃ ফারুক আজম	সি পি আই (এম)	২৫,৭৬৬	(৩৭·৩৭)

২৯। গোয়ালপোখর

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার		১,১৩,৯১৪	
প্রদত্ত ভোট		৫৯,৫৬১	(৬১·০৬)
বাতিল ভোট		১,৮৪৯	
জোসেফ সোরেন	নিঃ	১,৩০৯	
নিজামউদ্দিন	নিঃ	১১,১৮৩	
পুরাণমল মহেশ্বরী	বি জে পি	১৪,৯৩৮	(২১·৮৬)
মহম্মদ ইসলামউদ্দীন	নিঃ	২৩৮	
মহম্মদউদ্দীন	নিঃ	৮৬৫	
মহম্মদ রমজান আলি	ফঃ ব্লক	২১,২০৬	(৩১·৩২)
সেখ শরাফৎ হোসেন	আই এন সি	১২,২৩৪	(১৮·০৭)
সফিউর রহমান	নিঃ	১,২৮৮	
হরেন্দ্রকুমার সিংহ	নিঃ	৫৯২	
সেকেন্দার আলি	নিঃ	৮৭৫	
সোহরাব আলি	নিঃ	২,৯৮৪	

৩০। করণদীঘি

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার		১,১২,৫৭৪	
প্রদত্ত ভোট		৮৩,২৫৯	(৭৩·৯৬)
বাতিল ভোট		১,৯২২	
রামকিঙ্কর সিংহ	নিঃ	৪৯৩	
শুদ্র সিংহ	বি জে পি	১,১৭১	
* সুরেশ সিংহ	ফঃ ব্লক	৪৪,৭০৬	(৫৪·৯৬)
হাজি সাজ্জাদ হোসেন	আই এন সি	৩৪,৮৪৯	(৪২·৮৫)
হাবিবুর রহমান	নিঃ	১১৮	

৩১। রায়গঞ্জ (তফঃ সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার		১,১৭,৬২৯	
প্রদত্ত ভোট		৯১,৩৮৮	(৭৭·৬৯)
বাতিল ভোট		২,১৬৮	
খগেন্দ্রনাথ সিং	সি পি আই (এম)	৪৩,৪৬৯	(৪৮·৭২)
* দীপেন্দ্র বর্মন	আই এন সি	৪৫,২২৭	(৪০·৬৯)
নিখিলচন্দ্র সরকার	নিঃ	৫২৪	(০·৫৯)

৩২। কালিয়াগঞ্জ (তফঃ সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার		৯৯,৬৫৮	
প্রদত্ত ভোট		৮১,৩২৫	(৮১·৬০)
বাতিল ভোট		১,৭২২	
গৌরহরি বর্মন	নিঃ	৯৬৪	(১·২১)
ননীগোপাল রায়	সি পি আই (এম)	৩৫,২৬৬	(৪৪·৩০)
* নবকুমার রায়	আই এন সি	৪৩,৩৭৩	(৫৪·৪৯)

৩৩। কুশমণ্ডী (তফঃ সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার		৯৯,২৬১	
প্রদত্ত ভোট		৮১,১৭৪	(৮১·৭৮)
বাতিল ভোট		১,৭৪৭	
আনন্দ রায়	নিঃ	৫৩০	(০·৬৭)
* ধীরেন্দ্রনাথ সরকার	আই এন সি	৩৯,৮৯৬	(৫০·২৩)
নর্মদা রায়	আর এস পি	৩৯,০০১	(৪৯·১০)

৩৪। ইটাহার

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার		৯৯,৪৬৮	
প্রদত্ত ভোট		৮১,৮৬৩	(৮২·৩০)
বাতিল ভোট		১,৮৬৮	
* ডঃ জয়নাল আবেদিন	আই সি (এস)	৪২,৪৯৭	(৫৩·১২)
বসন্তলাল চ্যাটার্জী	সি পি আই	৩৫,৩৩৯	(৪৪·১৮)
জিতেন্দ্রনাথ সরকার	এল ডি	৯৫৬	(১·২০)
স্বপন দাস	নিঃ	১,২০৪	(১·৫০)

৩৫। গঙ্গারামপুর

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার		১,১০,৬৪৩	
প্রদত্ত ভোট		৯০,০৬১	(৮১·৪১)
বাতিল ভোট		১,৯৫৫	
অরবিন্দ চক্রবর্তী	সি পি আই (এম)	৩৯,৯২১	(৪৫·৩১)
জগন্নাথ পাণ্ডে	নিঃ	১,৮৫৭	(৪·৯৮) (জগন্নাথ পাণ্ডে ও প্রহ্লাদ সরকার মিলিতভাবে)
প্রহ্লাদ সরকার	নিঃ	২,৫৩২	
* মোসলেউদ্দীন আমেদ	আই সি (এস)	৪৩,৭৯৬	(৪৯·৭১)

৩৬। তপন (আদিবাসী সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার		৯৯,৭৩১	
প্রদত্ত ভোট		৮৪,৪৩৯	(৮৪·৬৭)
বাতিল ভোট		১,৪৯৮	
* খারা সোরেন	আর এস পি	৪৪,৮২৬	(৫৪·০৭)
জাপান হাঁসদা	আই এন সি	৩৬,৩৭৯	(৪৩·৮৬)
পরেশ হাঁসদা	নিঃ	৯৬৭	(১·১৩)
মারাডি হাকাই	জে পি	৫৪০	(০·৬৫)
লক্ষ্মীরাম হেমব্রম	নিঃ	২২৯	(০·৩১)

৩৭। কুমারগঞ্জ

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার		১,১২,৬২৫	
প্রদত্ত ভোট		৯২,৯২৪	(৮২·৫০)
বাতিল ভোট		১,৩৪৪	
গোষ্ঠবিহারী বসাক	নিঃ	৩৮৭	(০·৪২)
* দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়	সি পি আই (এম)	৪৯,৯৮৪	(৫৪·৫৮)
শেখরকুমার দাশগুপ্ত	আই এন সি	৪১,২০৯	(৪৫·০০)

৩৮। বালুরঘাট

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৯২,৩৫২	
প্রদত্ত ভোট	—	৭৬,৬০৫	(৮২·৯৫)
বাতিল ভোট	—	১,১৩০	
আশিস রায়	আই সি (এস)	৩২,৩২৪	(৫৬·৮৩)
জহরলাল মাহাতো	নিঃ	১,৯৫৪	(২·৫৯)
*বিশ্বনাথ চৌধুরী	আর এস পি	৪১,১৯৭	(৫৪·৫৮)

মালদহ

৩৯। হাবিবপুর (আদিবাসী সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৯৬,৩৯৯	
প্রদত্ত ভোট	—	৭০,৪২০	(৭৩·০৫)
বাতিল ভোট	—	১,৯২৪	
গোপীনাথ সোরেন	নিঃ	২,৬০৬	(৩·৮০)
মসীচরণ টুড়ু	আই এন সি	৩২,৭০৩	(৪৭·৭৫)
*সরকার মুর্মু	সি পি আই (এম)	৩৩,১৮৭	(৪৮·৪৫)

৪০। গাজল (আদিবাসী সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৯৬,১০৩	
প্রদত্ত ভোট	—	৭৫,৮৩৯	(৭৮·৯১)
বাতিল ভোট	—	১,৮০৬	
বেঞ্জামিন হেমব্রম	আই এন সি	৩২,৮৮০	(৪৪·৪২)
শ্যাম মুর্মু	বি জে পি	৪,৭৯৩	(৬·৪৭)
*সুফল মুর্মু	সি পি আই (এম)	৩৬,৩৬০	(৪৯·১১)

৪১। খরবা

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৯৬,২৯৩	
প্রদত্ত ভোট	—	৮২,৭৬৪	(৮৫·৯৫)
বাতিল ভোট	—	১,৩৩৯	
নাজমুল হক	সি পি আই (এম)	৩৭,৪৫৫	(৪৬·০০)
*মহবুবুল হক	আই এন সি	৪০,১৬৫	(৪৯·৩৩)
শীতল চক্রবর্তী	বি জে পি	৩,৮০৫	(৪·৬৭)

৪২। হরিশচন্দ্রপুর

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৯৬,৬০০	
প্রদত্ত ভোট	—	৭৬,৫৮৪	(৭৯·২৮)
বাতিল ভোট	—	১,৮৫৩	
*আব্দুল ওয়াহেদ	আই এন সি	,২৬,০২৮	(৩৪·৮৩)
ইলিয়াস রাজি	নিঃ	১৪,৪৩৪	(২০·৫১)
গোপালজী কেডিয়া	নিঃ	৮০৬	
মহঃ নৌশাদ আলি	নিঃ	৮০২	
বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র	জে পি	১৫,৬৪১	(২০·৯৩)
রজ্জাক	নিঃ	২৭২	(০·৪২)
সুভাস চৌধুরী	ফঃ ব্লক	১৬,৭৪৮	(২২·৪২)

৪৩। রতুয়া

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৮৬,২৫৮	
প্রদত্ত ভোট	—	৭২,৩১৬	(৮৩·৮৪)
বাতিল ভোট	—	১,৬৮৯	
মহম্মদ আলি	সি পি আই (এম)	৩৫,০৯১	(৪৯·৬৮)
*সমর মুখার্জি	আই এন সি	৩৫,৫৩৬	(৫০·৩২)

৪৪। আড়াইডাংগা

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৮৩,৪৪৩	
প্রদত্ত ভোট	—	৭২,১৩২	(৮৬·৪৪)
বাতিল ভোট	—	১,৪৪০	
সাজ্জাদ আহমেদ	আই এন সি	৩৩,৯৬৪	(৪৮·০৫)
সুবোধচন্দ্র মিশ্র	বি জে পি	১,৭১৬	(২·৪২)
*হাবিব মোস্তাফা	সি পি আই (এম)	৩৫,০১২	(৪৯·৫৩)

৪৫। মালদা (তফঃ সং)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৯৮,০৮৩	
প্রদত্ত ভোট	—	৭৯,০৫৬	(৮০·৬০)
বাতিল ভোট	—	১,৮০৩	
দ্বিজেন রায়	বি জে পি	১,৪১৭	(১·৮৩)
প্রহ্লাদচন্দ্র সিং	নিঃ	১,৩৫১	(১·৭৫)
*ফণিভূষণ রায়	আই এন সি	৩৭,৯২৫	(৪৯·০৯)
শুভেন্দুকুমার চৌধুরী	সি পি আই (এম)	৩৬,৫৬০	(৪৭·৩৩)

৪৬। ইংলিশবাজার

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৯৮,০৭২	
প্রদত্ত ভোট	—	৭৮,৩৯৬	(৭৯·৯৪)
বাতিল ভোট	—	১,২৯৩	
*শৈলেন সরকার	সি পি আই (এম)	৩৬,০২৩	(৪৬·৭২)
স্বপন মিত্র	আই এন সি	৩৪,০২৬	(৪৪·৫২)
হরিপ্রসন্ন মিশ্র	বি জে পি	৬,৭৫৪	(৮·৭৬)

৪৭। মানিকচক

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৮৮,১৪১	
প্রদত্ত ভোট	—	৭১,৯০৪	(৮০·৯০)
বাতিল ভোট	—	১,৫৩৭	
আলি তফাজ্জুল	নিঃ	৩২৬	(১·৬২)
তাহিরুদ্দীন আহমেদ	নিঃ	৮০১	
*জখিলাল মণ্ডল	আই এন সি	৩৪,৫৫৫	(৪৯·৫৩)
সুবোধ চৌধুরী	সি পি আই (এম)	৩৪,০৮৫	(৪৮·৮৫)

৪৮। সুজাপুর

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৮৮,২০৮	
প্রদত্ত ভোট	—	৬৮,৫৮৩	(৭৭·৭৫)
বাতিল ভোট	—	৯১৬	
মমতাজ বেগম	সি পি আই (এম)	২৪,১৩৯	(৩৫·৬৭)
মহঃ মহিদুর রহমান মিঞা	নিঃ	৯৯৮	(১·৪৮)
*হুমায়ুন চৌধুরী	আই এন সি	৪২,৫৩০	(৬২·৮৫)

৪৯। কালিয়াচক

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	১,০৭,০৪৮	
প্রদত্ত ভোট	—	৮৯,৯৩০	(৮৪·০১)
বাতিল ভোট	—	১,৭০০	
আহমদ সামসুদ্দীন	আই এন সি	৩৯,০৫০	(৪৪·২৬)
*প্রমোদরঞ্জন বসু	সি পি আই (এম)	৪৮,২৮২	(৫৪·৭২)
লখীন্দ্র মণ্ডল	নিঃ	৮৯৮	(১·০২)

মুর্শিদাবাদ

৫০। ফরাক্কা

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
মোট ভোটার	—	৮৭,৭৭৯	
প্রদত্ত ভোট	—	৬৮,৫৮০	(৭৮·১৩)
বাতিল ভোট	—	১,৮০৫	
*আবুল হাসনত খান	সি পি আই (এম)	২৯,৭০২	(৪৪·৪৮)
মহঃ ইসরাইল	নিঃ	১০,৩৫২	(১৫·৫০)
জেরাত আলি	নিঃ	১৬,৪৩৪	(২৪·৬১)
ষষ্ঠীচরণ দাস	বি জে পি	১০,২৮৭	(১৫·৪১)

নির্বাচনকেন্দ্র এবং প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা
৫১। ঔরঙ্গাবাদ			
মোট ভোটার	—	৯৬,৪৪২	
প্রদত্ত ভোট	—	৭৫,৮৫১	(৭৮·৬৫)
বাতিল ভোট	—	১,৬৭১	
ইউসুফ হোসেন	নিঃ	১,৮৪৯	(২·৪৯)
তোয়াব আলি	সি পি আই (এম)	৩৩,০২৩	(৪৪·৫২)
*লুৎফল হক	আই এন সি	৩৫,৩৩৬	(৪৭·৬৪)
শশাঙ্ক পাল	বি জে পি	৩,৯৭২	(৫·৩৫)
৫২। সুতি			
মোট ভোটার	—	৯৮, ৭৭২	
প্রদত্ত ভোট	—	৭৭,৬১৪	(৭৮·৫৮)
বাতিল ভোট	—	১,৫৯৯	
*শীষ মহম্মদ	আর এস পি	৪০,১৭৫	(৫২·৮৫)
সমরেন্দ্র দাস	নিঃ	৮০৩	(১ ০৬)
সুধাংশুশেখর সরকার	বি জে পি	২,৮৯৭	(৩ ৮১)
মহঃ সোহোরাব	আই এন সি	৩২,১৪০	(৪২·২৮)
৫৩। সাগরদীঘি (তফঃ সং)			
মোট ভোটার	—	৯০,৬৭১	
প্রদত্ত ভোট	—	৭০,২৯৯	(৭৭·৫৩)
বাতিল ভোট	—	১,৭৮০	
নৃসিংহকুমার মণ্ডল	আই এন সি	৩৪,০৩৫	(৪৯·৬৭)
*হাজারি বিশ্বাস	সি পি আই (এম)	৩৪,৪৮৪	(৫০·৩৩)
৫৪। জঙ্গীপুর			
মোট ভোটার	—	১,০৬,১৬৪	
প্রদত্ত ভোট	—	৭৭,৫৪৭	(৭৭·৫৩)
বাতিল ভোট	—	১,৬৮৫	
অচিন্ত্য সিংহ	এস ইউ সি আই	১৩,৩৩৬	(১৮·২১)
আসরাফউদ্দীন বিশ্বাস	আর এস পি	৩,২৩৭	(৪·২৭)
বদরুদ্দীন আহমেদ	নিঃ	২৪,৭৭৮	(৩৩·২৬)
সেখ কামালুদ্দীন	নিঃ	৪৫৮	
*হবিবুর রহমান	আই এন সি	৩৪,৩৫৮	(৪৫·২৯)
৫৫। লালগোলা			
মোট ভোটার	—	৯৬,১৭৬	
প্রদত্ত ভোট	—	৮৩,৯০০	(৮৭ ২৪)
বাতিল ভোট	—	১,৩২০	
*আবদুস সাত্তার	আই এন সি	৪৬,৫০০	(৫৬·৩১)
ইয়ান আলি	সি পি আই (এম)	৩৫,৩৮০	(৪২ ৮৪)
নিরঞ্জন মুখার্জী	নিঃ	৪৭০	(০·৮৫)
শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য	নিঃ	২৩০	
৫৬। ভগবানগোলা			
মোট ভোটার	—	৯৪,৪১৭	
প্রদত্ত ভোট	—	৭৯,০৮৩	(৮৩·৭৬)
বাতিল ভোট	—	১,৪৯৯	
*কাজী হাফিজুর রহমান	আই এন সি	৩৬,০৮৭	(৪৬·৫১)
সামাউন বিশ্বাস	এম এল	৩০৬	(০·৩৯)
মহঃ মসারুরফ হোসেন	নিঃ	৩১৮	(৪৬·৮৬)
শৈলেন অধিকারী	নিঃ	৩৫,০৯১	
সইফুদ্দিন	নিঃ	৮৭৮	
সাধন রায়	এস ইউ সি আই	৪,৮৪৪	(৬·৩২)
৫৭। নবগ্রাম			
মোট ভোটার	—	১,০২,৮৮৬	
প্রদত্ত ভোট	—	৮১,১৮২	(৭৮·৯০)
বাতিল ভোট	—	১,৬২৩	
চিত্তরঞ্জন মজুমদার	নিঃ	১,৫১১	(১·৯০)
প্রদীপ মজুমদার	আই এন সি	৩৫,৭৩৭	(৪৪·৯২)
*বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	সি পি আই (এম)	৪২,৩১১	(৫৩·১৮)
৫৮। মুর্শিদাবাদ			
মোট ভোটার	—	১,১৪,৪৬৭	
প্রদত্ত ভোট	—	৯৪,১৪৫	(৮২·৫২)
বাতিল ভোট	—	১,৬৭৫	
অমিয় দত্ত	নিঃ	১৬৫	
আতাওর রহমান	নিঃ	৪৬৯	
*ছায়া ঘোষ	এঃ আইঃ ফঃ ব্লক	৫১,৩৫৩	(৫৫·৫৩)
তরুণকান্তি সরকার	নিঃ	১,২২৪	
দেদার বক্স	আই সি (এস)	৩৯,২৫৯	(৪২·৪৬)
৫৯। জলঙ্গি			
মোট ভোটার	—	১,৩০,৩৯৮	
প্রদত্ত ভোট	—	৯৯,৯৫৫	(৭৬·৬৫)
বাতিল ভোট	—	১,৩৪০	
অজিজুর রহমান	আই সি (এস)	৪৪,৯৬৬	(৪৫·৫৯)
*আতাহার রহমান	সি পি আই (এম)	৫২,১৭৫	(৫২·৯১)
প্রফুল্লকুমার সরকার	বি জে পি	১,৪৭৪	(১·৫০)
৬০। ডোমকল			
মোট ভোটার	—	১,০৯,২৮০	
প্রদত্ত ভোট	—	৯৬,৬৬৯	(৮৮·৪৬)
বাতিল ভোট	—	২,১৬৮	
আবদুল কাদের	নিঃ	৫৯৯	(০·৬৩)
*মহঃ আবদুল বারি	সি পি আই (এম)	৫১,৯৮৭	(৫৫·০১)
এ কে এম হাজেকুল আলম	এম এল	৪১,৯১৫	(৪৪·৩৬)
৬১। নওদা			
মোট ভোটার	—	১,০০,৬০৩	
প্রদত্ত ভোট	—	৯০,৮২৫	(৯০·২৮)
বাতিল ভোট	—	১,৪৩৫	
দেবেশ অধিকারী	বি জে পি	৩,৪২৬	(৩·৮৩)
*জয়ন্তকুমার বিশ্বাস	আর এস পি	৪৬,৬০৯	(৫২·১৪)
কাশীনাথ দত্ত	নিঃ	৮৯৪	
নাসিরউদ্দিন খান	আই এন সি	৩৮,২৩৭	(৪২·৭৮)
সেখ আলি মুরতুজা	নিঃ	২২৪	
৬২। হরিহরপাড়া			
মোট ভোটার	—	১,০০,৬৮৩	
প্রদত্ত ভোট	—	৮৭,৯৯৯	(৮৭·৪০)
বাতিল ভোট	—	১,৪৫৫	
আবদুল কাদের খোন্দকার	এস ইউ সি আই	১২,৯৪৬	(১৪·৯৬)
মজাম্মল হক মণ্ডল	সি পি আই (এম)	২৯,৬৭৩	(৩৪·২৯)
শুভেন্দু বিশ্বাস	বি জে পি	৯,১৮০	(১০·৬১)
*সেখ. ইমাজুদ্দিন	আই এন সি	৩৪,৭৪৫	(৪০·১৪)
৬৩। বহরমপুর			
মোট ভোটার	—	১,২১,৭০১	
প্রদত্ত ভোট	—	৯২,০৫০	(৭৫·৬৪)
বাতিল ভোট	—	১,৭৩৩	
ডঃ গোপাল ঘোষ	নিঃ	১৫৮	(০·১৮)
*দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়	আর এস পি	৪৫,১২২	(৪৯·৯৬)
প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বি জে পি	৪,০৭৫	(৪·৫১)
শঙ্করদাস পাল	আই এন সি	৪০,৯৬২	(৪৫·৩৫)
৬৪। বেলডাঙ্গা			
মোট ভোটার	—	১,১৪,৬০৯	
প্রদত্ত ভোট	—	৯৮,১৩৬	(৮৫·৬৩)
বাতিল ভোট	—	১,৫৭৪	
আবদুস সুকুর	নিঃ	৮০	(০·০৮)
তিমিরবরণ ভাদুড়ী	আর এস পি	৩৮,৫১৫	(৩৯·৮৯)
*নুরুল ইসলাম চৌধুরী	আই এন সি	৫৫,৪৫০	(৫৭·৪২)
বেণু সওদাগর	বি জে পি	২,৫১৭	(২·৬১)

Reg. No. 32875/78

Postal Reg. WB/CC-15

২৬শে মে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করার পর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু মহাকরণের সামনে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন।

ডিসেম্বর, '৮২

সি পি. আই(এম) রাজ্যদপ্তরে প্রমোদ দাশগুপ্তের মরদেহে মাল্যদান করছেন নেতৃবৃন্দ
ফোটো : তপন সেনগুপ্ত

যুবমানস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
ডিসেম্বর, '৮২
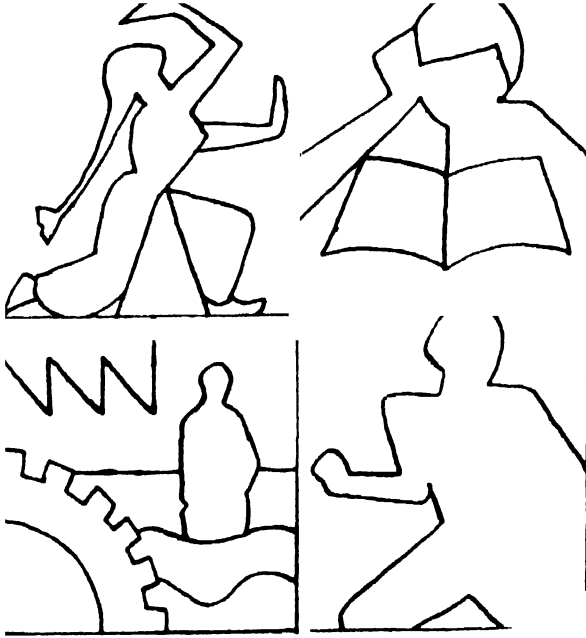
উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি এবং পত্রিকা সম্পাদক ঃ
সুভাষ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ ঃ ল্যান্ড এন্ড লাইফ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা-৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

ফোন ঃ ২৩-০৬২৬
২৩-৩৭৯৪

মূল্য ঃ চল্লিশ পয়সা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে

'এক জাতি এক প্রাণ একতা' এই বহুল প্রচলিত দেশমাতৃকার বন্দনা-সংগীত আজ আমাদের ভারতবর্ষের দিকে তাকালে সঠিক বলে মেনে নেওয়া কঠিন।

প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা সব মিলিয়ে এক কঠিন-জটিল পরীক্ষার মুখোমুখি আমাদের জাতীয় সংহতি।

এক দেশ—কথাটি সত্য হলেও এক জাতি-এক প্রাণ কথাটির তাৎপর্য বর্তমান ভারতের সামাজিক মানচিত্রের দিকে তাকালে কারোর পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব না। অথচ আমরা ঐক্যবদ্ধ সোনার ভারতবর্ষ চাই। স্বাধীন ভারতের একজন নাগরিক হিসেবে নিশ্চয়ই ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখা অবাস্তব নয়। কিন্তু বর্তমান বাস্তব চিত্র ভিন্নরূপ ভিন্ন প্রকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে।

পাঞ্জাবে আকালীদের আন্দোলন, আসামে বিদেশী বিতাড়নের নামে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ, অন্ধ্রে প্রায় ম্যাজিকের ন্যায় তেলেগু দেশমের পক্ষে ব্যাপক গণ সমাবেশ, মধ্যভারত ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বর্ণ-হাঙ্গামা এক নিত্যকারের ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে।

বহুজাতির দেশ এই ভারতবর্ষ। প্রায় তিন হাজার একশত জাতি-উপজাতির বাস এই দেশে। পাঁচশ'রও বেশী ভাষাভাষী মানুষ আমাদের দেশে বাস করেন। সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে প্রতি পদক্ষেপে এই বিভিন্নতার কথা জীবন্ত ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে এই জাতিগুলো সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছিল—একই লক্ষ্য নিয়ে। লক্ষ্য ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই দেশ থেকে চলে যাক। এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সাধারণভাবে জাতীয় সংহতি সৃষ্টি ও ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের পটভূমিকা রচনা করেছিল।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ এদেশ থেকে চলে যাবার সময় ভারতীয়দের হাতে শাসনদণ্ড পরিচালনার ক্ষমতা দিয়ে গেলেও তার সাথে অসংখ্য সমস্যা উপহার হিসেবে দিয়ে গেছে। দেশ-বিভাগের মতন বিষময় ফল-সহ ভাষাগত সমস্যা, ধর্ম-বর্ণের সমস্যা, জাত-পাতের সমস্যাসহ অসংখ্য সমস্যার পাহাড় তারা স্তূপীকৃত করে রেখে গেছে।

আমাদের রাষ্ট্র-প্রধানরা এই সকল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বাস্তব-নির্ভর বিজ্ঞানসম্মত পথ না নিয়ে সংকীর্ণ স্বার্থে, আঞ্চলিকতার প্রশ্নে প্রভাবিত হয়ে সামাজিক-আর্থিক সমস্যাগুলোর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তারই বিষময় ফল আজ সারা দেশে ফলতে শুরু করেছে। দেশের মধ্যে অনেক রাজ্যের মানুষ বিশেষ করে কতগুলো অঞ্চলে নির্দিষ্ট ভাষাভাষি মানুষ নিজেদের বঞ্চিত মনে করতে শুরু করে। বঞ্চনার প্রতিকারের গণতান্ত্রিক পথ না নিয়ে অ-গণতান্ত্রিক পথে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে—তারই ফলশ্রুতি আজ সারা দেশের সামাজিক মানচিত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে। বিচ্ছিন্নতার শক্তিগুলো আজ সারা দেশে সক্রিয়। তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট। এক ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় উগ্র প্রাদেশিকতার জিগির তুলে ভারতের জনমানসকে বিচলিত করছে।

এমতাবস্থায় গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সামনে কঠিন কর্তব্য হচ্ছে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। জাতীয় সংহতির সপক্ষে সোচ্চার হওয়া। পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় সংহতির পক্ষে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, ভাষা ও ধর্মগত বিভেদের ঊর্ধ্বে আজ সংহতির প্রশ্নটি তুলে ধরা দরকার। জনজীবনের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যাগুলোর কোন সমাধান হয় নি। তারই সুযোগ গ্রহণ করছে কায়েমী স্বার্থবাদীরা, শোষণের পক্ষের শক্তিসমূহ এবং বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদীরা। তাই আজকের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে নিজস্ব দাবীর আন্দোলনের সাথে সাথে এই সকল বিভেদের শক্তিগুলোকে পরাস্ত করার সংগ্রামের কথাও ভাবতে হবে—কার্যক্রমের মধ্যে রাখতে হবে। অন্যথায় বঞ্চিত মানুষকে যে কোন অজুহাতে বিপথে নিয়ে গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র গণতন্ত্রের উপর আক্রমণকে জোরদার করবে।

প্রমোদ দাশগুপ্ত

কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত চলে গেলেন। চীনের প্রখ্যাত চিকিৎসকগণ তাঁকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাঁচানো গেল না। আমাদের পার্টির রাজ্য কমিটির সম্পাদক সরোজ মুখার্জি সঠিকভাবেই চীন সরকার, চীনের চিকিৎসকগণ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও জনসাধারণকে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন।

আমাদের পার্টির প্রবীণ নেতাদের মধ্যে প্রথমে গেলেন কমরেড আবদুল্লা হালিম, তারপর কমরেড নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, কাকাবাবু (কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ) এবং কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার। এবারে গেলেন কমরেড পি ডি জি।

জেলান্তরেও অনেক প্রবীণ এবং নবীন পার্টি নেতার জীবনাবসান ঘটেছে। আমার ন্যায় আমাদের রাজ্যের পার্টি নেতৃত্বের অনেকেই অনুভব করেন যে, প্রমোদবাবুর জীবনাবসান একটা শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। এই শূন্যতা পূরণের জন্য একদিকে যেমন নবীন এবং নিষ্ঠাবান কর্মীদের নেতৃত্বে আনতে হবে, তেমনি প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ও মতাদর্শগত দৃঢ়তা ও পরিপক্কতার সাথে যুক্ত করতে হবে নবীনদের উৎসাহ-উদ্দীপনা, নিষ্ঠা এবং সৃজনশীল প্রতিভা। আমরা এই কাজ কয়েকবছর হলো শুরু করেছি।

প্রমোদবাবুর মৃত্যুতে আমি আমার একজন ৪০ বছরের সংগ্রামের সাথীকে হারালাম। আমাদের সমগ্র পার্টি হারালো একজন একনিষ্ঠ মার্কসবাদী ও প্রলেতারীয় বিপ্লবীকে।

ব্রিটিশ শাসনকালে ১৯৪২ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ ঘোষিত হবার পর তাঁকে আমরা দেখেছি প্রথমে পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র "জনযুদ্ধ" এবং পরে দৈনিক মুখপত্র "দৈনিক স্বাধীনতা'র পরিচালক ও সংগঠক হিসাবে। আমি তখন রেলওয়ে ইউনিয়ন করি। পার্টি পত্রিকা পার্টি-নীতির প্রচারকই শুধু নয়, পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার হাতিয়ারও বটে। তাঁর ওপর ন্যস্ত এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি তাঁকে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করতে আমি দেখেছি।

এই সময় কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত ছিলেন প্রাদেশিক কমিটির অন্যতম একজন সংগঠক (পি সি ও)—আমিও তাই ছিলাম। আমরা দু'জনই ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্মেলনে প্রাদেশিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হই।

১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ তৎকালীন বিধান রায় সরকার পশ্চিমবঙ্গে আমাদের পার্টিকে বে-আইনী ঘোষিত করে, ছাপাখানা আটক করে এবং পার্টির প্রাদেশিক কেন্দ্র (৮ই, ডেকার্স লেন) তালাবন্ধ করে দেয়। আমাদের অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রমোদবাবু তখন ৮(ই) ডেকার্স লেনে থাকতেন—তাঁর বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরওয়ানা ছিল। কিন্তু তিনি গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপন করতে সক্ষম হন। বেশ কিছুদিন তিনি পার্টির বে-আইনী ছাপাখানার যাবতীয় দায়িত্বে ছিলেন। বে-আইনী অবস্থায় এটা ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজ তিনি নিষ্ঠা, দক্ষতা ও দায়িত্ব নিয়ে পালন করে গেছেন।

বামপন্থী হঠকারী কার্যকলাপ শুরু হলে তৎকালীন পি বি ১৯৪৭ সালে নির্বাচিত রাজ্য কমিটি ভেঙ্গে দেয় এবং ৭ জনকে নিয়ে এক নতুন প্রাদেশিক কমিটি গঠন করে। আমি, সরোজবাবু, প্রমোদবাবু, কমরেড হালিম সবাই নতুন কমিটি থেকে বাদ পড়ি। ১৯৫০ সালে কমিনফরমের মুখপত্র "ফর এলাস্টিং পিস্‌, ফর এ পিপলস্‌ ডেমোক্র্যাসি"তে প্রকাশিত একটি লেখা বামপন্থী হঠকারী কার্যকলাপ বন্ধ করার সহায়ক হয়।

আলোচ্যকালে প্রমোদবাবু সহ আমরা কয়েকজন অনুভব করেছিলাম যে, ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

১৯৫১ সালে হাইকোর্টের এক রায়ে পার্টি আবার বৈধ ঘোষিত হয়। এর আগেই রীট আবেদন করলে হাইকোর্ট আমাকে মুক্তির আদেশ দেয়। কমরেড পি ডি জি (পি ডি জি তখন ডিটেনশনে ছিলেন) এবং বিনা বিচারে আটক অপর নেতৃবৃন্দ মুক্তি পান। যাঁরা আত্মগোপন করেছিলেন তাঁরা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসেন।

জ্যোতি বসু

১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে (সারা দেশেও) আমাদের পার্টির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। প্রমোদবাবু যে একজন উচ্চস্তরের সংগঠক ছিলেন প্রথম সাধারণ নির্বাচনেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৯৫২ সাল থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনেও তিনি প্রভূত সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দেন।

১৯৫৩ সালের রাজ্য পার্টি সম্মেলনে আমাকে সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়—প্রমোদবাবু, সরোজবাবু, কাকাবাবু, নিরঞ্জনবাবু এবং অপর কয়েকজন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্মেলনেও আমাকে আবার সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। আমার ইচ্ছা ছিল না, কারণ আমি মনে করতাম গণ-আন্দোলনের এবং বিধানসভায় বিরোধী পক্ষের নেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে হলে পার্টি সংগঠনের কাজ অবহেলিত হবে। সবাই মেনে নেন যে, পরবর্তী সম্মেলনে একজন নতুন সম্পাদক নির্বাচিত করা হবে।

১৯৬০ সালে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্মেলনে কমরেড পি ডি জিকে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদক নির্বাচিত করি।

কমরেড পি ডি জি যে শুধু সংগঠকই ছিলেন তা নয়, তিনি যে সুবক্তাও ছিলেন ১৯৬০ সাল থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তিনি শুধু জেলায় জেলায় পার্টি জি বি মিটিংই করতেন না, জনসভাগুলিতেও ভাষণ দিতেন। জনসভার বক্তা হিসাবে তাঁর প্রভূত চাহিদা ছিল। ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৭ এবং ১৯৮০ সালের নির্বাচনগুলিতে তিনি অজস্র নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন। ১৯৮২ সালের নির্বাচনকালে অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি অনেকগুলি জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন।

নিঃসন্দেহেই তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ পার্টি সংগঠক। কিন্তু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের ওপর দখল না থাকলে সুদক্ষ পার্টি সংগঠক হওয়া যায় না। তাঁর এটা ছিল বলেই তিনি সুদক্ষ সংগঠক হতে পেরেছিলেন। তিনি চিরায়ত মার্কসবাদী সাহিত্যই শুধু অধ্যয়ন করতেন না, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর দৈনন্দিন বিকাশ সম্পর্কেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন।

১৯৫৪ সাল থেকে সংশোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে যে আন্ত পার্টি সংগ্রাম আমাদের রাজ্যে চলেছিল তাতে প্রমোদবাবু উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৬৭ সালে আমাদের আবার নক্সালপন্থী নামধারী উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত অভিযান চালাতে হয়। এই অভিযানেও তিনি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

আমার সঙ্গে তাঁর রাজ্যের, সারা দেশের এবং বিশ্বের নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মূল প্রশ্নগুলির ওপর আমাদের মধ্যে কখনও মতপার্থক্য হয় নি, আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে এসেছি।

কমরেড পি ডি জি-র আর একটি গুণের কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত জেলার নেতৃস্থানীয় কমরেডদের জানতেন। পার্টি কর্মীদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট দরদ ছিল। নবীনদের পার্টির নেতৃত্বে নিয়ে আসতে তিনি সব সময়েই সচেষ্ট ছিলেন।

নিঃসন্দেহেই কমরেড পি ডি জি-র জীবনাবসান এক শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। রাজ্য কমিটি সরোজ মুখার্জিকে সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদক নির্বাচিত করেছে। সরোজবাবুর ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সরোজবাবু যৌথ কর্মতৎপরতা এবং যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন এবং আগামী দিনগুলিতে পার্টি আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, আমাদের পার্টি সংগঠন ও মতাদর্শ উভয় ক্ষেত্রেই আরও শক্তি অর্জন করবে।

আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আমাদের পার্টি সর্ববৃহৎ শক্তি। সর্বক্ষেত্রে এই শক্তিকে আরও বাড়াতে হবে। এটা করলেই প্রয়াত নেতা কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ সার্থক হবে।

ছাত্র-যুব আন্দোলন পরিচালনায় প্রমোদদা

সুভাষ চক্রবর্তী

একজন শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা সম্পর্কে যে কোন আলোচনাই কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের জীবনও অঙ্গাঙ্গিভাবে আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে আছে। স্তালিনের ভাষায় কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস হলো আন্তঃপার্টি সংগ্রামের ইতিহাস। আন্তঃপার্টি সংগ্রামের ইতিহাস বাদ দিয়ে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের রাজনৈতিক জীবনের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

পত্রিকামহল কমরেড প্রমোদদাকে একজন বড় সংগঠক বলে চিহ্নিত করেছেন, এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন নেই। কমিউনিস্ট আন্দোলনের তত্ত্ব ভালো না বুঝলে এবং তাত্ত্বিক না হলে ভালো সংগঠক হওয়া যায় না। কমরেড প্রমোদদা সদাই কোটেশন দিয়ে কোন বিষয় বোঝাতে চাইতেন না। কারণ তাঁর নিজের ব্যাখ্যা-শক্তির উপর ছিল সাবলীল আস্থা।

একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সমাজকে বোঝা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের কার্যকলাপকে অনুধাবন করা অর্থাৎ শ্রেণীসমূহের ভূমিকা ও শ্রেণী সংগ্রামগুলো সম্পর্কে একটি সঠিক মূল্যায়ন ও করণীয় নির্ধারণই হলো একজন তাত্ত্বিকের শ্রেষ্ঠ কাজ। পশ্চিম বাংলায় সমাজ বিকাশের ধারা ও গতি, বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের অনুসৃত ভূমিকা এবং তাকে শ্রেণী আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রেণী-সংগ্রামের ভারসাম্য কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে আনার ক্ষেত্রে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত ও জ্যোতি বসু এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছেন পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে।

বিগত তিন দশকের এ রাজ্যের গণ-আন্দোলনের বিস্তারকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে প্রতিটি ছাত্র আন্দোলন তার সাক্ষ্য দেয়। তিন দশকের গণ-আন্দোলন, গণসংগ্রামের ও শ্রেণীসংগ্রামের অনিবার্য ফল হিসেবেই এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের সৃষ্টিকে বাস্তব ও সম্ভব করতে সক্ষম হয়েছে। এই সমগ্র সংগ্রামের অন্যতম প্রধান সেনাপতি হিসেবে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তকে চিহ্নিত করা খুবই সঠিক মূল্যায়ন হবে। এই কাজ করতে গিয়ে যার মাধ্যমে একাজ করা সম্ভব—অর্থাৎ 'কমিউনিস্ট পার্টি'—তাকে তিনি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অসংখ্য শ্রেণী সচেতন, সর্বহারার শ্রেণী বিপ্লবের শিক্ষায় দীক্ষিত তরুণের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—এই পার্টিকে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য।

পশ্চিম বাংলার ছাত্র-যুব আন্দোলন—মূলে শ্রমিক ও কৃষকের আন্দোলনের গতিবেগকে বাড়াতে সাহায্য করবে—গণ-আন্দোলনের উচ্ছল প্রাণের শক্তিকে উদ্বেলিত করে তুলতে সক্ষম হবে—এ বিষয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ছিল একান্তভাবে স্বচ্ছ।

তিনি বলতেন, ছাত্র-যুবরা কোন শ্রেণী না, কিন্তু তাদের আন্দোলনের ধার আছে, সাময়িকভাবে তীব্র এবং তীক্ষ্ণ ক্ষমতা আছে—যা সমাজের মধ্যে স্পর্শকাতরতা সৃষ্টি করে সাময়িকভাবে ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

'৬০-এর দশকের ইউরোপের বিশেষ করে ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, পর্তুগালের ছাত্র আন্দোলন বিশ্বের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলন আয়ুবশাহীর শাসনের অবসান ঘটায়। ছাত্র আন্দোলনের সাধারণ ভূমিকা সাধারণভাবে জনগণের পক্ষে থাকে—কিন্তু প্রতিবিপ্লবী-শক্তির হাতের ক্রীড়নক হয়ে ছাত্র আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের বিরুদ্ধাচরণ করে, তেমন নজির ইন্দোনেশিয়ার '৬০-এর দশকেই ঘটেছে। প্রমোদদা ছাত্র-যুব আন্দোলনের নেতৃত্বকে বারে বারে একথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

নিরন্তর লাগাতার আন্দোলনের কার্যক্রম রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বারে বারে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতেন—বলতেন ছাত্ররা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মার্কটাইম করে না. তোমরা না গেলে প্রতিক্রিয়াশীলরা ওদেরকে বিপথে চালিত করবে। হয়ত তাঁর নির্দেশ ছিল ছাত্র-যুব আন্দোলনকে মৌলিক আদর্শের বুনিয়াদের উপর দাঁড় করাতে হবে।

মতাদর্শগত দিক থেকে চেতনার স্তরের দিক থেকে ছাত্র-যুব সমাজকে প্রস্তুত করার প্রশ্নটি তিনি বারে বারে উল্লেখ করতেন। প্রমোদদার সস্নেহ পরামর্শ ও নির্দেশের ফলে এ রাজ্যের ছাত্র-যুব আন্দোলন সংশোধনবাদ ও সংকীর্ণতা-বাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রমোদ দাশগুপ্ত : অশ্রুতে শপথে বিদায়

সৌমিত্র লাহিড়ী

চল্লিশ বছরের সংগ্রামের অবিচ্ছিন্ন সাথীর স্মৃতি-সভায় দাঁড়িয়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের মৌনতায় স্তোত্রের মত গম্ভীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শোনালেন বিষাদকে দূরে ঠেলে বেঁচে ওঠার গান : কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত বেঁচে থাকবেন জনগণের আন্দোলনের মাঝে, সংগ্রামের ময়দানে সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে উদ্ভাসিত হবেন, মৃত্যুঞ্জয়ী হবেন, নতুন করে বেঁচে উঠবেন কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত।

২৯শে নভেম্বর যার শুরু ৭ই ডিসেম্বর তাঁর প্রথম পর্যায়ের শেষ। দীর্ঘ ন'দিন জুড়ে পশ্চিম বাংলা এক ভয়ংকর মৌনতায় মুখর হয়েছে, এক বিষাদ ঠেলে ঠেলে শপথে রঙিন হয়েছে। এমন আশ্চর্য এক মানুষের মত মানুষ বিদায় নিলেন পর্ব থেকে পর্বান্তরে, তিনি বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতর হয়েছেন বোধে ও কর্মে। যিনি যন্ত্রণায় নীল হয়ে জীবনকে ভালবাসতে শিখেছেন ও শিখিয়েছেন। যিনি নিরাশা থেকে আশার আলোকবৃত্ত স্পর্শ করার জন্য ভাল-বাসতে বাসতে জীবন উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করে গেছেন। দীর্ঘ ছয় দশক ধরে, যিনি মৃত্যু নয়, জন্মে, অশ্রুর ভিতর দিয়ে বারুদে বুলেটে কাঁটাতারে মাথা তুলে আকাশে স্বাধীন। যিনি মৃত্যু নয়, জন্মে দৃপ্ত, মহীয়ান। মেহনতী জনতার সত্তার মর্মজভাই।

কি সেই আশ্চর্য জাদু যার স্পর্শে সারা পশ্চিম বাংলা,—পশ্চিম বাংলার সংকুচিত সীমানা ছাড়িয়ে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে, দ্বন্দ্ব, দ্বিধা দ্বেষ ভুলে দেশে দেশে শোকের কূল প্লাবিত উচ্ছ্বাসের সঞ্চার? কি সেই গুণ যার অনন্য মহিমায় একই মঞ্চে সমবেত হলেন বিপ্রতীপ মেরুর রাজনৈতিক আদর্শের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ?

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র 'The Telegraph' পত্রিকায়, মৃত্যুর সাথে সাথে তাৎক্ষণিক এক রচনা 'A Roughly Hewn Romantic Hero'-এর এক চমৎকার ভাষায় প্রয়াত প্রমোদ দাশগুপ্তর মূল পরিচয় দিয়েছেন : Promode Dasgupta had no other existence apart from his party existence, he had no other life apart from his party life. He breathed through the party, the party breathed through him. Here was a roughly hewn man, for the party's history is roughly hewn

২৯ নভেম্বর বেলা দু'টো নাগাদ ক'লকাতায় আলিমুদ্দিন স্ট্রীটের নবনির্মিত মুজফ্ফর আহমেদ ভবনে প্রথম বিষাদের ছায়া নামে বেডিং থেকে প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দূরভাষে আসা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে। মুহূর্তে বেতারতরঙ্গ চঞ্চল হয়, স্তম্ভিত হয় বাংলা। ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে দিক-দিগন্তে। শীতের বিকেল যেমন শুষে নেয় রোদ, মাঠের সোনালী ফসল লুণ্ঠন করে জোতদার যেমন করে নিরন্ন করে শস্য পিতাদের, ঘূর্ণমান কালের চাকা স্তব্ধ করে মালিক যেমন করে শ্রমিকের মাঠের প্রাচীর ভেঙ্গে দেয়, ঠিক তেমনি এলো এই মৃত্যু। পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক আকাশ হঠাৎ এক লহমায় খানিকটা দীন হয়ে গেল। সম্মানে শ্রদ্ধায় বিয়োগের স্মৃতির ভারে কাঁপতে কাঁপতে অর্ধপথ অতিক্রম করে থেমে এল রক্তিম বসন্তের স্বাদ যার সারা অঙ্গে লালিমা দিয়েছে সেই রক্ত পতাকা।

তারপর একটানা সাতদিনের অধীর অপেক্ষা। আলিমুদ্দিন স্ট্রীটের একত্রিশ নম্বর বাড়িটায় ভীড় আর ভীড়। শত সহস্র মানুষ, শত সহস্র

[শেষাংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়]

প্রমোদ দাশগুপ্ত-র সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রমোদ দাশগুপ্তের জন্ম হয় ১৯১০ সালের ১৩ই জুলাই বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার পালং থানার কুঁয়োরপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মতিলাল দাশগুপ্ত, মা চারুবালা দেবী। প্রমোদ দাশগুপ্তের বাবা ছিলেন সরকারী ডাক্তার। তাঁর তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যার মধ্যে প্রমোদ দাশগুপ্তই জ্যেষ্ঠ। তাঁর ডাক নাম ছিল খোকা।

প্রমোদ দাশগুপ্তের পিতামহ অপূর্বলাল দাশগুপ্ত একজন সংস্কারমুক্ত আদর্শবাদী জনসেবক। পিতামহের কাছ থেকেই শৈশবে প্রমোদ দাশগুপ্ত স্বদেশী গান শেখেন। তাঁর তত্ত্বাবধানেই নিয়মিত শরীরচর্চা ও সাঁতার কাটতেন। নিয়মিতভাবে গান ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। স্কুল জীবনের শেষের দিকে শরৎচন্দ্রের একটি নাটকে অভিনয় তাঁর শেষ অভিনয় ছিল। পিতামহের সাহায্যেই তাঁর শরীর ও মন ক্রমশঃ বিকশিত হয়ে ওঠে।

বাবার বদলির চাকরি এবং মায়ের অসুস্থতার জন্য প্রমোদ দাশগুপ্তকে সংসারের অনেক দায়িত্ব বহন করতে হতো। ছোট ছোট ভাই-বোনদের তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে রান্না করে খাইয়ে তাঁকে স্কুলে যেতে হয়েছে।

প্রথমে তাঁর নিজের গ্রামের বিদ্যালয়েই তিনি ভর্তি হন। পরবর্তীকালে ১৯২৫ সালে বাবার বরিশালে বদলি হবার সূত্র ধরে তিনি বরিশাল জেলা স্কুলে ভর্তি হন।

প্রমোদ দাশগুপ্তের শৈশবেই অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার আসে। স্কুলের ছাত্র প্রমোদ বরিশালের জনপ্রিয় নেতা শরৎ ঘোষ তাঁর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শীতের রাতে খালিগায়ে তাঁর বক্তৃতা ও অনাড়ম্বর জীবন তাঁকে মুগ্ধ করে। এদিকে বাড়িতেও তখন অসহযোগের হাওয়া। পিতা মতিলাল দাশগুপ্ত সরকারী চাকুরে হয়েও বাড়িতে সপরিবারে চরকা কাটেন নিজে খদ্দর পরেন। এই পারিবারিক এবং দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ তাঁকে ক্রমশঃ স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে টেনে আনে। নিজে চরকা কাটলেও ১৯২৪ সালে বিপ্লববাদী আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হন। নিরঞ্জন সেনের সংস্পর্শে এসে অনুশীলন পার্টির সাথে যুক্ত হন।

১৯২৮ সালে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় আসেন এবং ক্যালকাটা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিরঞ্জন সেন প্রমুখ বিপ্লববাদীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার মেছোবাজার বোমার মামলা শুরু করে। এই মামলা পরিচালনার জন্য প্রমোদ দাশগুপ্ত নিরঞ্জন সেনের ভাই প্রফুল্ল সেন ও অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেন।

১৯২৯ সালেই তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি কাজ করতে থাকেন। ১৯৩১ সালের শেষার্ধে তিনি বগুড়ায় যান। এখানেই তাঁকে সাদা পোশাকের পুলিস ঘোড়ার গাড়ি ঘিরে বি সি এল এ-তে গ্রেপ্তার করে। শুরু হয় বিনা বিচারে বন্দী জীবন। বহরমপুর, বকসার, দেউলি বন্দীশিবিরে ছয় বছর তাঁকে কাটাতে হয়। ১৯৩৭ সালে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর বগুড়া জেলার তালোরা থানায় তাঁকে অন্তরীণ-বন্দী থাকতে হয়। জেলখানায় তিনি মার্কসবাদ অধ্যয়ন করেন। এবং কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনের সভ্য হন। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়ে চলে এলেন কলকাতায়। দেখা করলেন কাকাবাবুর (মুজফফর আহমদ) সঙ্গে। কাকাবাবু তাঁকে ডক মজুরদের মধ্যে ইউনিয়নের কাজ করতে বলেন। এই সাত বছরে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তায় এসেছে অনেক পরিবর্তন। দেউলি ক্যাম্পে পরিচিত হয়েছেন মার্কসবাদী দর্শন, অর্থনীতির সঙ্গে। প্রশ্ন জেগেছে আরও অনেকের মতই বিপ্লববাদী আন্দোলনের পথ সম্পর্কে। শ্রমিক বিপ্লবের অপরিহার্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। জেল থেকে বেরিয়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী থেকে বই এনে পড়েছেন। এই সময় হাতে পড়ে স্তালিনের "লেনিনবাদের ভিত্তি"। এর পর থেকে পুর্ণোদ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ। ১৯৩৮ সালের ১লা মে পার্টির সদস্য পদ অর্জন করেন।

এরপর ১৯৪০ সালের শেষভাগে গোপন-সভায় কাকাবাবু প্রাদেশিক পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদকও গোপন কেন্দ্রে চলে যান। সেখানে সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ থাকতেন। কলকাতা জেলা কমিটির প্রকাশ্য কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রমোদ দাশগুপ্ত'র উপর। কিন্তু তিনি কিছুদিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার হন। ১৯৪১-৪২ তাঁকে হিজলী কারাগারে বিনা বিচারে আটক থাকতে হয়।

১৯৪২-এ জুলাই মাসে পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। পার্টির উদ্যোগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। এই সময় 'পিপলস ওয়ার' ও 'জনযুদ্ধ' প্রকাশিত হয়। ১৯৪২ সালের শেষে তিনি কারামুক্ত হন। তারপর থেকে তিনি পত্রিকা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেন।

১৯৪২ সালের শেষে স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের বাগানবাড়িতে বার্মার কমিউনিস্ট নেতা ঘোষালের কাছ থেকে প্রমোদ দাশগুপ্ত গেরিলা ট্রেনিং পেয়েছিলেন। অন্যান্যদের সঙ্গে দাশগুপ্তও পার্টির বাছাই করা কর্মীদের ট্রেনিং দিতেন।

১৯৪৩ সাল। দল বড় হচ্ছে, কাজের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাদেশিক কমিটির সদস্যরা সবদিক সামলে উঠতে পারছেন না। প্রমোদ দাশগুপ্ত'র উপর নতুন দায়িত্ব এলো বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির অন্যতম সংগঠক। এই বৎসর ভারতসভা হলে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম রাজ্য সম্মেলন হলো, অবশ্য গোপন অবস্থার দুটি সম্মেলন ধরলে এটি ছিল তৃতীয় সম্মেলন। প্রমোদ দাশগুপ্ত পার্টি পত্রিকা-দপ্তর পরিচালনায় প্রথম সারিতে এলেন। ১৯৪৫ সালে ২৫শে ডিসেম্বর "স্বাধীনতা" পত্রিকা প্রকাশিত হলো। এই পত্রিকার সম্পাদক সোমনাথ লাহিড়ী এবং ম্যানেজার প্রমোদ দাশগুপ্ত। প্রথমে "স্বাধীনতা" প্রেস ছিল ১২১, লোয়ার সার্কুলার রোডে। পরে ১৯৪৬ সালে ৮, ডেকার্স লেনে নিচের তলায়। দ্বিতলে পত্রিকা-দপ্তর এবং তিনতলায় পার্টি দপ্তর। এইখানে "স্বাধীনতা" পত্রিকা পরিচালনায় প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রধানতম সংগঠক হলেন।

১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি শুরু হয় ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। বৌবাজার ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউর সংযোগস্থলে পাশাপাশি কয়েকটি বাড়িতে থাকতেন কাকাবাবু, আব্দুল হালিম, বঙ্কিম মুখার্জি, প্রমোদ দাশগুপ্ত, আব্দুল মোমিন, নীরদ চক্রবর্তী প্রমুখ। এখানে তাঁরা প্রায় আটক অবস্থায় ছিলেন। তিনদিন পর প্রমোদ দাশগুপ্ত-সহ এ'দের সকলকে স্নেহাংশু আচার্য ঐ জায়গা থেকে অন্যত্র সরাবার ব্যবস্থা করেন।

১৯৪৭ সালে প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলেন। দুই বঙ্গের দুটি জোনাল কমিটি হয়—তিনি পঃ বঙ্গের কমিটিতে নির্বাচিত হন।

১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হলে রাজ্য দপ্তর ও স্বাধীনতা দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। নেতারা আত্মগোপন করলেন। কাকাবাবুসহ তিনশত নেতা ও কর্মী কারারুদ্ধ হলেন। ১৯৫০ সালে গ্রেপ্তার হলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, আব্দুল হালিম, সরোজ মুখার্জি, জ্যোতি বসু, নিরঞ্জন সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

প্রমোদ দাশগুপ্ত চল্লিশের দশকে পার্টির মধ্যে সংস্কারবাদী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন।

১৯৪৯ সালে আব্দুল হালিম এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত একটি গোপন কেন্দ্রে একত্র থাকেন এবং তাঁরা আবার ১৯৪৮-৪৯ সালের সংকীর্ণতাবাদী লাইনের স্বরূপ তুলে সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে একটি দলিল রচনা করেন।

১৯৫১ সালে তাঁর কারামুক্তির পর জ্যোতি বসুর সম্পাদনায় "স্বাধীনতা" নবপর্যায়ে প্রকাশিত হতে শুরু করে। প্রমোদ দাশগুপ্ত সম্পাদকীয় বোর্ডের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৬০ সালের বর্ধমানে রাজ্য সম্মেলন থেকে তিনি রাজ্য পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর থেকে রাজ্য সম্মেলন হয় পাঁচটি। একাধিক্রমে পাঁচটি সম্মেলনেই তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। দীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরে তিনি রাজ্য পার্টির সম্পাদক। ১৯৬১ সালে তিনি পার্টির জাতীয় পরিষদের সদস্য হন।

১৯৬৪ সালে সি পি আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর প্রতিটি পার্টি কংগ্রেসেই তিনি পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

(এর পর ১৭ পৃষ্ঠায়)

সেদিনের কয়েকটি সংবাদপত্র থেকে

GANASHAKTI সান্ধ্য দৈনিক EVENING DAILY

CALCUTTA 29th NOVEMBER, 1982

কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত'র জীবনাবসান

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

কলকাতা, ২৯শে নভেম্বর – ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)–র পলিটব্যুরো সদস্য, সি পি আই (এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক, বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত'র আজ পিকিং সময় বেলা ১টা ৪৫ মিনিটে পিকিং হাসপাতালে জীবনাবসান ঘটেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁর মরদেহ কলকাতায় আনা হচ্ছে। সমস্ত কর্মসূচি পরে ঘোষণা করা হচ্ছে। এই মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্র রাজ্য দপ্তর সহ রাজ্যে-র সর্বত্র পার্টির রক্ত পতাকা অর্ধনমিত করা হয়।

কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত চিকিৎসার জন্য গত ২৬শে অক্টোবর পিকিং যান। ২রা নভেম্বর থেকে তাঁর আকুপাংচার চিকিৎসা শুরু হয়। বারই নভেম্বর তাঁর হাঁপানী অনেকটা কমে যায়। ১৩ই নভেম্বর তাঁর খিদে কমে যায়। ১৬ই নভেম্বর থেকে তাঁর হাত পা এবং পেট ফুলতে শুরু করে। এদিনই বিকালে তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন থেকেই চীনের চিকিৎসকগণ তাঁকে সুস্থ করে তোলার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। ২২শে নভেম্বর তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং ঠিক হয় তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে আসবেন। ২৫ শে নভেম্বর রাতে তাঁর প্রচণ্ড জ্বর আসে। ২৬ শে নভেম্বর সকালে তিনি প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তখন থেকেই তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ২৮ শে নভেম্বর অবস্থার একটু উন্নতি হয়। কমরেড দাশগুপ্ত'র অবস্থার ক্রমাবনতির সংবাদ পেয়ে সি পি আই (এম) পলিটব্যুরো সদস্য এম বাসবপুন্নাইয়া ২৭শে নভেম্বর পিকিং ছুটে যান। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কয়েকদিন ধরে কার্যতঃ হাসপাতালেই অবস্থান করছিলেন।

কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত ১৯১০ সালের ১৩ই জুলাই ফরিদপুর জেলায় কুঁয়োরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ -২২ সালে যখন বিভিন্ন স্থানে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় তখনই তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯২২ সাল থেকে কমরেড দাশগুপ্ত'র রাজনৈতিক জীবন শুরু। তিনি নিজেকে বিপ্লববাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত করেন। অনুশীলন পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালের ১লা মে তিনি পার্টি সদস্যপদ অর্জন করেন। ১৯৪৫ সাল থেকেই সি পি আই রাজ্য নেতৃত্বে আসেন। ১৯৬০ সালে বর্ধমান সম্মেলন থেকে রাজ্য কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে সংশোধনবাদীদের পার্টি থেকে বিতাড়ন করে সি পি আই (এম) গঠিত হলে কমরেড দাশগুপ্ত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)–র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি কমরেড দাশগুপ্ত–র মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

যুগান্তর

সংগ্রামী ও সংগঠক প্রমোদ দাশগুপ্ত

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন থেকে একজন প্রথম সারির সংগ্রামী ও সংগঠকের তিরোধান হল। ভারতের বামপন্থী আন্দোলন হারাল একজন দূরদর্শী এবং অক্লান্তকর্মী প্রবীণ নেতাকে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি অল্প বয়সেই যোগদান করেন। পরে মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের শরিক হন। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতেও তিনি প্রধানত সংগঠকের ভূমিকা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে পার্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদ লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে গেলে তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। পার্টি ভাগ হবার পর তথাকথিত শোধনবাদী সি পি আইয়ের বিরুদ্ধে অবিরত লড়াই চালিয়ে ক্রমশ সি. পি. এমকে পশ্চিমবঙ্গে প্রধান কমিউনিস্ট পার্টিতে পরিণত করার কৃতিত্ব তাঁর সংগঠন শক্তির। পরে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠায় পৌঁছেও তিনি তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগান। প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের পর পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের মধ্যে নানা-রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সি পি এম থেকে একদল বেরিয়ে গিয়ে নকশালবাড়ি অঞ্চলে ভূমিহীন চাষীদের সংগঠন করে আন্দোলন শুরু করে যা পরে নকশালবাড়ির পথ নামে মার্কসীয় মহলে বিশেষ মর্যাদা পায়। প্রমোদবাবু দক্ষিণপন্থী এবং অতিবামপন্থীদের যুগপৎ আক্রমণ ও চাপ থেকে সি পি এম সংগঠনকে রক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শক্তির ঘাঁটি গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এটাই তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার ও সংগঠন শক্তির প্রধান কীর্তি।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনের সময়ও তিনি না তাঁর দল নিশ্চিত ছিলেন না যে জনগণের কতটা সমর্থন তাঁরা পাবেন। সে কারণে নির্বাচনে জনতা পার্টির সঙ্গে আপস রফা ; বিধানসভা নির্বাচনে জনতার সঙ্গে আসন রফা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বামফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচকদের সামনে দাঁড়িয়ে অভাবিতভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পান। প্রমোদবাবু ছিলেন স্পষ্টবাদী এবং আপাতদৃষ্টিতে আবেগবর্জিত। বামফ্রন্ট কমিটির সভাপতিরূপে তিনি বহু দুরূহ সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং স্পষ্ট বক্তব্যের জোরে। তিনি বামফ্রন্ট সরকারকে শক্তি যুগিয়েছেন। নির্বাচনে আসন বন্টনই হোক কিংবা মন্ত্রিসভার দপ্তর বন্টনই হোক যে কোনো কূট প্রশ্নে প্রমোদ দাশগুপ্ত নিজের বক্তব্যে অবিচল থেকে সমাধানের পথ প্রশস্ত করতে পেরেছেন একাধিক বার। তাঁর অবর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর দায়িত্ব বেড়ে গেল। জীবন চর্যায় তিনি ছিলেন পুরাতন গান্ধীপন্থীদের মতন সরল অনাড়ম্বর শৃঙ্খলা-পরায়ণ এবং আত্মনির্ভরশীল। পলিটব্যুরোর সদস্য হিসেবে তিনি ইদানীং অসুস্থতার জন্য খুব বেশি বৈঠকে যোগ দিতে না পারলেও সি. পি. এমের প্রবীণ নেতারা প্রমোদবাবুর মতামতের ওপর খুবই গুরুত্ব দিতেন। কারণ তাঁর সংগঠনের জোরেই পশ্চিমবঙ্গে দুদুটি সাধারণ নির্বাচনে বামফ্রন্ট শুধু জয়লাভ করেনি সি পি এম তার ভোটের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে চলেছে। ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে বামপন্থীদের অনুরূপ শক্তি বা সংগঠন নেই। বিদেশে তাঁর মৃত্যু অত্যন্ত শোকাবহ। কারণ তিনি তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বিদেশে খুব বেশি যাননি। এবার চিকিৎসার জন্য তাঁকে চীনে নিয়ে যাওয়া হয়। পাদপ্রদীপের আলোর চেয়ে নেপথ্যে সংগঠকের ভূমিকা পালনই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাঁর মৃত্যুতে বামফ্রন্ট এবং বিশেষভাবে সি পি এমের নেতৃত্বে যে শূন্যতা সৃষ্টি হল তা সহজে পূরণ হবার নয়। বাংলা রাজনীতি ও তাঁর মতো একজন মতাদর্শী ও অভিজ্ঞ রাজনীতিকের পরামর্শ ও নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হ'ল। আমরা দেশবাসীর সঙ্গে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আনন্দবাজার পত্রিকা

১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ মঙ্গলবার ৩০ নভেম্বর ১৯৮২ শহর সংস্করণ ৭০ পয়সা

বেজিংয়ে প্রমোদবাবুর জীবনাবসান

[illegible]

আজকাল

বর্ষ ১ সংখ্যা ২৪১ মঙ্গলবার ৯ অগ্রহায়ণ ১৯০৪ শকাব্দ
১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ ৩০ নভেম্বর ১৯৮২

আদর্শের জন্য নিবেদিত প্রাণ

মানুষ মরণশীল। একদিন না একদিন তার মৃত্যু ঘটবেই। এই নিশ্চিত সত্য জানা থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুতে মানুষ শোকবিহ্বল হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ মৃতের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আর যেসব মানুষ সাধারণত্বের সীমা অতিক্রম করে বিশেষত্ব অর্জন করেন তাঁদের মৃত্যুতে শোকের পরিধি বিস্তৃত হয়। আর মৃত ব্যক্তি যদি জন-কল্যাণে নিয়োজিত থেকে সারা জীবন ব্যাপী সাধনার ফলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করতে পারেন তাহলে তাঁর জন্য শুধু শোকপ্রকাশ করেই মানুষ ক্ষান্ত হয় না, মৃত ব্যক্তির জীবনাদর্শকে তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। মতবাদের পার্থক্য শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। সি পি আই এম পলিটব্যুরো সদস্য, সি পি আই এম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক এবং বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত সোমবার পেইচিং হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। তিনি এক মাস আগে তাঁর পুরাতন হাঁপানি রোগের চিকিৎসার জন্য চীনে যান। একমাস পরেই তাঁর ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু তিনি আর ফিরে আসতে পারলেন না। গতকাল চীনের পেইচিং শহরের হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রমোদবাবু তাঁর জীবনব্যাপী কর্মসাধনায় দেশবাসীর মনে একটা স্থায়ী আসন লাভ করেছেন বলেই দলমত নির্বিশেষে পশ্চিমবাংলার মানুষ তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছে।

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। বাড়ির আবহাওয়ায় কিশোর বয়সেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। যৌবনের প্রারম্ভেই তৎকালীন অগ্নিযুগের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে অনুশীলন দলে যোগ দেন। পরবর্তীকালে আরও অনেকের মতই বন্দীনিবাসে তিনি কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষা লাভ করেন। তারপর সারা জীবন ধরেই সমাজ বিপ্লবের সাধনায় নিজেকে ব্রতী রাখেন। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি পশ্চিম বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পশ্চিম বাংলায় তাঁর দল সি পি আই এম এখন সরকারে আসীন। এই কৃতিত্বের তিনি সব থেকে বড় অংশীদার। প্রমোদবাবু তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে চরকা, বুলেট এবং ব্যালটের প্রচলিত সব ধারাই অনুসরণ করে গেছেন। শেষোক্ত ধারা অর্থাৎ ব্যালটের মাধ্যমে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নীতি নিয়ে এখন কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। ভারতবর্ষের মত এক বিশাল দেশের একটি অঙ্গরাজ্যে বিপ্লব নয়, ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতালাভ করে সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব কি না তা নিয়ে তাঁর নিজের দলের মধ্যেও নানা প্রশ্ন আছে। আজ প্রমোদবাবুর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার সময় নয়। তবু এই প্রশ্ন উঠছে এ জন্যই ভোটের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠা করে তার স্থায়িত্ব দানের প্রধান রূপকার ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত।

প্রমোদ দাশগুপ্তের জীবনাবসানে তাঁর লক্ষ্যে তাঁর গড়া দল কতটা এগতে পারবে জানি না। ভোট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব কি না সে বিষয়ে প্রমোদবাবু নিজেও সন্দিহান ছিলেন। ভবিষ্যৎ প্রমাণ করবে কোন পথে প্রমোদবাবুর লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব কিন্তু আজ এই মুহূর্তে সকলেই স্মরণ করবেন যে প্রমোদ দাশগুপ্তের জীবনাবসানে শুধু যে একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি হল তা নয়। শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষে এমন কি বিশ্বেও একজন কমিউনিস্ট সংগঠকের অভাব ঘটল। পশ্চিমবাংলায়ত বটেই সারা ভারতে সি পি আই এম দলে তথা বামপন্থী আন্দোলনে যে শূন্যতা দেখা দিল তা পূরণ করা সহজসাধ্য নয়। প্রমোদ দাশগুপ্তের নিষ্ঠা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং সংগঠন শক্তিকে ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিরাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। চীন যাত্রার মাত্র কিছুদিন আগে জনৈক ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ শ্রী দাশগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মত প্রকাশ করেছিলেন যে শুধু কমিউনিস্টদের মধ্যেই নয়, বিশ্বের রাজনীতিবিদদের মধ্যেও প্রমোদবাবু বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। প্রমোদবাবুর মত নিষ্ঠাবান, শৃঙ্খলাপরায়ণ, বাস্তব রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নেতার অভাবে পশ্চিম বাংলার মত সমস্যাসঙ্কুল রাজ্যে সরকার কিভাবে চলে ভবিষ্যৎই তা প্রমাণ করবে। আমরা এই মুহূর্তে আদর্শের জন্য নিবেদিত প্রাণ প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

The Telegraph

TUESDAY 30 NOVEMBER 1982 VOL. I NO. 139

An honest man leaves us

If the Left Front government seems the natural party of power in West Bengal today, then a great deal of the credit must go to Mr Promode Dasgupta. It was he who was able to mould the West Bengal unit of the Communist Party of India (Marxist) into a unique force which, by the time he died, had matured into a virtually unassailable organisation in the state. The transition from the culture of opposition to that of power is never an easy one, and the problems are compounded for a communist party which has an inherent ideological conflict with "bourgeois democracy." The task must have seemed impossible in 1964 when the Communist Party of India split. There was the depression of harassment in the wake of the war with China; added to this was the confusion of a bitter civil war which broke the party into two.

The first struggle was for credibility, as the two communist parties laid claims to legitimacy. By 1967, the CPI(M) had more or less won that battle in West Bengal, with the CPI being reduced to a weak second and later to little more than a rump. But then came the equally difficult task of government. It was Mr Promode Dasgupta who saw the need of a general united front against the Congress as the first step towards an eventual leftist government. The internal contradictions of such an alliance soon destroyed that experiment, but Mr Dasgupta and his comrades were now ready for the next step in the evolution, the formation of a left and democratic front. That was the period when the CPI(M) had to fight, and fight hard against two enemies: the Congress and the insurgent and violent Naxalites. Came the long years in the wilderness, with the Congress(I) manufacturing a victory in the 1972 elections and the CPI(M) paying the price of defeat in blood. This was the true test of leadership. Mr Dasgupta was able to hold the cadre together at a time when both the carrot and the stick (and much more of the latter than the former) was being used to destroy it. The Emergency did not begin for the CPI(M) in 1975; it began in 1971. Steering the party through seven years of oppression and doubt was perhaps Mr Dasgupta's finest achievement. And his finest hour was surely on the day the election results of the 1977 West Bengal Assembly started pouring in. The March elections to Parliament that year could be described as part of the anti-Mrs Gandhi wave which swept most of the country. But the Assembly results of 1977 exposed the pretentiousness of the Janata as well as once again humiliating the Congress. Suddenly it was clear that the party structure that Mr Dasgupta had kept alive through the dark years was bringing in the results. And by now Mr Dasgupta had also been able to achieve the unity of a left front.

It is impossible to doubt the honesty and integrity of this man. His concern for the underprivileged was genuine. He understood power, and understood very well how it could corrupt. He kept his lifestyle deliberately simple. He may have been arrogant towards the privileged, but never towards the poor. His love for them was evident not only in his work at the party level, but also in his personal attitude towards those among the poor he came personally in contact with: he gave them something that they valued even more than money, he gave them respect.

Obituaries tend to use the word honest far too freely, but it is appropriate only to the handful who belong to Mr Dasgupta's category. He was not just honest in the sense of being free from financial corruption. He was also intellectually honest, and that is a quality which is even rarer than financial integrity.

Mr Dasgupta rarely left the soil he loved, the soil of Bengal, which makes it all the more ironic that he should die in Beijing. It was China to an extent which was the cause of the CPI(M)'s birth, and Mr Dasgupta lived long enough to see the nation veering towards peace with a country which left such a traumatic impression on its psyche in 1962.

Mr Dasgupta will not be easily replaced. The State, as much as his party, will miss his strength and wisdom. Only a very few people are chosen by destiny to play the kind of role he did. He started as a worker, became a leader, and died an institution.

মঙ্গলবার, ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯

প্রমোদ দাশগুপ্ত'র জীবনাবসান

[illegible]

সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ক্ষুধার্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে

ভারতের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি বারনসের সাথে এক সাক্ষাৎকারে "পরিবর্তন"-এর সংবাদদাতা প্রশ্ন করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে যে অস্ত্র দিচ্ছে তা যে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না সে রকম কোন নিশ্চয়তা আপনারা দিতে পারেন কি? বারনস সেদিন "দারুণ ক্লান্তির" অছিলায় এ প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলেও কয়েকদিন পরেই এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রশ্নেরই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে জবাব দিতে হয়ঃ পাকিস্তান এফ-১৬ জঙ্গী বিমানের অপব্যবহার করবে না এ ধরনের গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। কারণ এ ধরনের গ্যারান্টি কোনও কাজেই আসে না। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি একথাও স্বীকার করেন যে অতীতে মার্কিন অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

এক-কে অন্যের বিরুদ্ধে

গুয়েতেমালা, দক্ষিণ আফ্রিকা, চিলি ও দক্ষিণ কোরিয়ার অত্যাচারী শাসনই দেখিয়ে দিচ্ছে যে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র কাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। "সালভেডর জুন্টা" ৪০ হাজারেরও বেশী সালভেডরীয় নাগরিককে খুন করেছে আমেরিকান অস্ত্র ব্যবহার করে। আমেরিকান বিমানবহর থেকেই ইস্রাইল লেবাননের জনগণের উপর বোমা বর্ষণ করে। আমেরিকান বিমানবহর থেকেই তারা অতীতে ইরাকের উপর বোমাবর্ষণ করেছিল। অন্যদিকে আফ্রিকা আঙ্গোলার জনগণকে দমন করার জন্য জঙ্গী আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করছে। পাকিস্তানের মধ্যদিয়েই আফগানিস্থানে আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র প্রবেশ করছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে মহামারীর মত অস্ত্রশস্ত্রের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির সামরিক খাতে ব্যয় বিগত দশ বছরে শতকরা ১৬ শতাংশ বেড়ে বর্তমানে ৮০০ হাজার লক্ষ ডলারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার দেশগুলির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করার জন্য মরিয়া হয়ে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়া ও আফ্রিকার সমস্ত অঞ্চলকে তাদের "গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের অঞ্চল" বলে ঘোষণা করছে। সেখানে তারা সামরিক ঘাঁটির জাল বিস্তার করছে। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনা ও নৌবাহিনীকে মোতায়েন করছে, জাতি ও বর্ণবিদ্বেষী সরকারগুলিকে, একনায়কতন্ত্রী সরকারগুলিকে মদত দিচ্ছে। এইভাবে সংঘর্ষের উৎসস্থল তৈরী হচ্ছে। প্রমাণস্বরূপ আরব দেশগুলির সাথে ইস্রায়েল এবং এ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষকে উপস্থিত করা যেতে পারে।

যুদ্ধাস্ত্র বিক্রীর ফলাও কারবার

আমেরিকা যুদ্ধাস্ত্র বিক্রয়ের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলিকেই ভালো বাজার হিসাবে বেছে নিয়েছে। বর্তমানে যুদ্ধাস্ত্রের সবচেয়ে বড় বিক্রেতা আমেরিকা। 'ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের' হিসাবানুযায়ী এই আর্থিক বছরে আমেরিকা ২৫০ হাজার লক্ষ থেকে ৩৫০ হাজার লক্ষ ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র বিক্রীর পরিকল্পনা করেছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র "সাহায্য" হিসাবে সরবরাহ করা হতো। ১৯৭০-এর দশক থেকে আমেরিকা নগদে ও ধারে বিভিন্ন দেশে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। আগে আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্রের শতকরা ৮০ ভাগেরই ক্রেতা ছিল

অশোক বসু

জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি। বর্তমানে মধ্য ও নিকট প্রাচ্য দেশগুলিতে আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং আমেরিকা থেকে রপ্তানিকৃত অস্ত্রের পাঁচ ভাগের চার ভাগই এই দেশগুলি ব্যবহার করে থাকে।

দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা ও সামরিক ব্যয়

এই পৃথিবীর প্রতি ৫ জনে ১ জন চরম দারিদ্র্য, অপুষ্টি ও অশিক্ষার মধ্যে বাস করছে। একজন খ্যাতনামা আমেরিকান মহিলা অর্থনীতিবিদ আর সিউয়ার্ড-এর হিসাব অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত ২০,০০০ লক্ষ মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোনও সংস্থান নাই; ২,৫০০ লক্ষ মানুষ বাস করেন বস্তিতে। তৃতীয় বিশ্বের প্রতি ৩ জনে ১ জন ডাক্তারী চিকিৎসার কোনও সুযোগই পায় নাই। বর্তমানে দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলির শতকরা প্রায় ৫ জনই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। অথচ এই সমস্ত দেশগুলিতে সামরিকখাতে ব্যয় ক্রমশ বাড়ছে।

সামরিকখাতে বিপুল ব্যয় উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধরনের অপচয় বিশ্বপুঁজিবাদের সংকটের সাথে অঙ্গীভূত হয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতিক বিকাশকে রুদ্ধ করছে। তাদের ঋণের পরিমাণকে বৃদ্ধি করছে। এই সমস্ত দেশগুলির জঙ্গী বিমান অথবা অত্যাধুনিক জঙ্গী অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের ফলশ্রুতি হল শিল্পবিকাশ, কৃষি-উন্নয়ন ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, ঔষধ, জ্বালানী ইত্যাদির জন্য খুবই প্রয়োজনীয় খাতগুলিতে অর্থের বরাদ্দ সংকুচিত করা।

ক্ষুধার অবসানের জন্য, শিল্পবিকাশের জন্য, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য, জ্বালানী ও শক্তি সম্পদের সূত্রে আরও অধিক ব্যয় করার জন্য এবং গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলির আশু প্রয়োজন সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস ও মানবিকখাতে আরও অধিক অর্থের বরাদ্দ।

অতএব

এই কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে যুদ্ধের সমস্তরকম উত্তেজনা সৃষ্টির বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনায় যে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির শক্তিকে সংহত করার জন্য প্রয়াসী হতে হবে।

শেষ সংবাদ

২০শে অক্টোবর, ১৯৮২--রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিনিধি ব্যামোন আর্জার-এর হিসাব অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ৫০ কোটি, বর্তমান শতাব্দীর শেষে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে। এক সাক্ষাৎকারে আর্জার আরও জানান যে প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ সত্ত্বেও এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অসংখ্য মানুষ অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছেন।

ব্যামোন আর্জার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন বিশ্বে ভূখা মানুষের সংখ্যা আগামী ৫ বছরে ৬০ কোটি এবং ২০০০ সনে ৮০ কোটি থেকে ১০০ কোটি হেতে পারে।

"ফাও" পরিবেশিত তথ্য অনুযায়ী, চরম অপুষ্টিতে ভুগছেন এমন মানুষের সংখ্যা বেড়ে ১৯৭০ সালে ৩৬ কোটি ও ১৯৮০ সালে ৫০ কোটি হবে।

খবর-এর সূত্রঃ পি-এন. এ./পি. এল. পুল—হাভানা, ২০শে অক্টোবর, ১৯৮২।

সাহিত্য

"একটি মহাদেশের জীবন ও সংগ্রাম তাঁর সাহিত্যে চিত্রিত।" "তিনি সব সময়ই সুদৃঢ়ভাবে দরিদ্র ও দুর্বল মানুষের পক্ষে আছেন।" আমার কথা নয়। কোনও প্রশংসা-উদ্বেল বন্ধু-সমালোচকের আনন্দোচ্ছল ভাষণ নয়। পৃথিবীর সেরা সাহিত্যকীর্তিকে যাঁরা নিক্তির ওজনে মেপে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেন, এমন বক্তব্যর দাবীদার সুইডিশ একাডেমী এ বছরের (১৯৮২) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। জন্মসূত্রে ল্যাটিন আমেরিকার কলম্বিয়ার নাগরিক এবং বর্তমানে স্বেচ্ছা নির্বাসনে মেক্সিকোয় বসবাসকারী গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী চতুর্থ ল্যাটিন অ্যামেরিকান সাহিত্যিক। চিলির কবি গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, গুয়াতে-মালার ঔপন্যাসিক মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল অস্ত্রিয়াস ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং চিলির কবি পাবলো নেরুদা ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৭-তে প্রকাশিত "ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ্ সলিচুড" উপন্যাসের জন্য মার্কেজ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও তাঁর সাহিত্যের ব্যাপ্তি শুধুমাত্র এই একটি উপন্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের জন্য, জীবনের পক্ষে রচিত তাঁর প্রতিটি সাহিত্য-কীর্তিই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। স্প্যানীশ ভাষায় রচিত তাঁর গল্প-উপন্যাস ইতিমধ্যেই চিরায়ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রখ্যাত কবি পাবলো নেরুদার মতে "সারভান্টেস্ রচিত ডন কুইক্সোট্-এর চেয়েও মার্কেজ-এর রচনা অনেক শক্তিশালী।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য স্প্যানীশ ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসেবে ডন কুইক্সোট স্বীকৃত। সুতরাং এমন একজন সাহিত্যিক-এর নোবেল পুরস্কার বিজয় অবশ্যই বাস্তববাদীদের কাছে আনন্দজনক।

কলম্বিয়া রাষ্ট্রের রাজধানী বোগোটা শহরের কাছে আরকাটাকা নামক এক গ্রামে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন ডাক-তার বিভাগের একজন টেলিগ্রাফ অপারেটর। ১৬ ভাইবোনের বিরাট সংসারে শোচনীয় দারিদ্র্যের জন্য মার্কেজের জায়গা হল না। শিশু মার্কেজকে জীবনের প্রথম আট বছর পিতামহর আশ্রয়ে কাটাতে হল। মার্কেজ-এর পিতামহ ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী। মার্কেজ তাঁর বিখ্যাত 'নো ওয়ান রাইটস্ টু দ্যা কর্ণেল' গল্পে তাঁর পিতামহর স্মৃতিচারণ করেছেন। পিতামহর শাসনে এবং পিতামহীর কাছ থেকে বিচিত্র সব গল্পগাথা শুনতে শুনতে মার্কেজের শৈশব কাটতে লাগল। স্কুল জীবন শেষ করে মার্কেজ বোগোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে পড়াশোনা শুরু করলেন। কিন্তু আইনের যুক্তি-তর্কের বদলে সাংবাদিকতার বার্তা-সংগ্রহ তাঁর কাছে অনেক বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। সুতরাং তিনি বিভিন্ন ল্যাটিন অ্যামেরিকান

নোবেল পুরস্কার : ১৯৮২

সংবাদপত্রর সংবাদ সংগ্রাহক হিসেবে রোম, বার্সিলোনা, প্যারিস প্রভৃতি শহরকে কেন্দ্র করে সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলেন। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আলাপ হল কিউবার রাষ্ট্রনায়ক ফিডেল কাস্ত্রোর সঙ্গে। অচিরেই আলাপ পরিণত হল সখ্যতায়। আজও মার্কেজের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিউবার রাষ্ট্রপতি ফিডেল কাস্ত্রো। ফ্রান্সের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ফ্রাংকোইজ মিত্তেরাঁও মার্কেজের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই সুদীর্ঘ জীবনে মার্কেজ কিন্তু কখনোই অত্যাচারীর সুরে সুর মেলান নি, শোষকের সাথে হাত মেলান নি; তাঁর চলার ছন্দ সব সময়ই জীবনের স্পন্দনকেই অনুরণিত করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে মার্কেজ মুখর; চিলির সামরিক জুন্টার বিরুদ্ধে মার্কেজ প্রতিবাদীর ভূমিকায় এগিয়ে এসেছেন; ভেনিজুয়েলার সরকার যখন দেশের দরিদ্র মানুষের উপর অত্যাচার চালায় তখনও মার্কেজ থাকেন সেই গরীব মানুষদের সংগ্রামী সংগঠনের পাশে; তাঁর নিজের দেশ কলম্বিয়ার স্বৈরাচারী সরকার যখন আর তাঁকে সহ্য করতে পারছিল না ঠিক তখনই মার্কেজ মেক্সিকোয় স্বেচ্ছা নির্বাসন বেছে নেন। অসংখ্য পুরস্কারে

অমিতাভ রায়

মার্কেজ ভূষিত হয়েছেন। বহু লক্ষ ডলার অর্থ-মূল্যের পুরস্কারও তাঁর ঘরে অনেকবার এসেছে। কিন্তু পুরস্কারের অর্থ মার্কেজ কখনও ব্যয় করেছিল কলম্বিয়ায় রাজনৈতিক বন্দীদের প্রয়োজনে, কখনও ভেনিজুয়েলার কম্যুনিস্ট পার্টির জন্য, আর এবারে নোবেল পুরস্কারের অর্থ দিয়ে কলম্বিয়ায় গড়ে তুলবেন একটি বাম-পন্থী সংবাদপত্র। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য সম্প্রতি কলম্বিয়ার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে। নতুন ক্ষমতাসীন দল মার্কেজকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন এবং কলম্বিয়া যাবার ডাক নোবেল পুরস্কার পাবার আগেই এসেছে।

মার্কেজের 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ্ সলিচুড' উপন্যাস বহুল প্রচারিত। ইতিমধ্যেই ৩২টি ভাষায় অনুদিত হয়ে ১ কোটি কপি বিক্রী হয়েছে। এ ছাড়াও 'দি লিফ্ স্টর্ম অ্যান্ড আদার স্টোরিজ', 'দি অটাম্ অফ্ দ্যা প্যাটরিয়ার্ক', 'নো ওয়ান রাইটস্ টু দ্যা কর্ণেল' প্রভৃতি বইগুলিও যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছে। ৫৪ বছরেও জীবনের সপক্ষে এ যুগের অন্যতম সেরা সাহিত্যিক মার্কেজ মানুষের গল্প শুনিয়ে যাচ্ছেন। আশা করি, আগামী দিনেও তাঁর গল্প আরও অনেক, অনেকবার শুনব।

অর্থনীতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর ৭১ বছর বয়স্ক অর্থ-নীতিবিদ জর্জ স্টিগলার ১৯৮২-তে অর্থনীতির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। জর্জ স্টিগলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর একাদশ অর্থনীতিবিদ যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক জর্জ স্টিগলার সুদীর্ঘ ৪৬ বছর ধরে অধ্যাপনার সঙ্গে সংযুক্ত আছেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রেন্টন শহরে জর্জ স্টিগলার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা আদতে ছিলেন ইয়োরোপের ব্যাভেরিয়া প্রদেশের বাসিন্দা। পরে তিনি মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। স্টিগলার ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হন! পরে শিকাগোর নর্থ-ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি লাভ করেন। তাঁর অধ্যাপনা শুরু হয় আইওয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম বই 'প্রোডাকসন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউসন থিয়োরিস্' প্রকাশিত হয়। পরের বছর স্টিগলারের 'দি থিয়োরি অফ্ প্রাইস্' প্রকাশিত হয়। এই বইটি এখন সর্বত্র পাঠ্যপুস্তকের স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু 'শিল্প সংগঠন এবং শিল্পজাত বস্তুর দামের উপর সরকারী নীতির প্রভাব সংক্রান্ত' বিষয়ে সর্বজন স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ জর্জ স্টিগলারের শ্রেষ্ঠ বই হল 'রুফস্ অ্যান্ড সিলিংস্'। বইটি বহুপঠিত এবং বহুল প্রচারিত। স্টিগলারের প্রাক্তন সহকর্মী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থ-নীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান-এর সহযোগিতায় বইটি লেখা হয়েছে। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার অনেক আগেই স্টিগলার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। সেই প্রতিষ্ঠা এবং পান্ডিত্যের সঙ্গে নতুন সংযোজন ১৯৮২-র নোবেল পুরস্কার।

পদার্থবিজ্ঞান

পদার্থবিজ্ঞানে ১৯৮২-র নোবেল পুরস্কার পেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর কর্ণেল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক কেনেথ জি. উইলসন।

হার্ভার্ড-এর প্রখ্যাত রসায়নবিদ ই. বি. উইল-সনের ছেলে কেনেথ জি. উইলসন ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর ম্যাসাচুসেটস্ প্রদেশের ওয়ালথামে জন্মগ্রহণ করেন। ৬ ভাইবোনের সংসারে আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠা কেনেথ ৮ বছর বয়সে মুখে মুখে যে কোন সংখ্যার ঘনমূল (Cube root) বার করতে পারত। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হবার পর কেনেথ ক্যালটেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মারে জেল-মান-এর কাছে তাঁর গবেষণা শুরু করেন। মারে জেল-মান ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। নৃত্য পারদর্শী পদার্থ-বিজ্ঞানের এই তরুণ গবেষক পদার্থবিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন।

কেনেথ জি. উইলসন যে কারণে নোবেল পুরস্কার পেলেন তা হল—"ক্রিটিক্যাল ফেনো-মেনা ইন কানেকশন উইথ ফেজ ট্রানজিনস্"। তাপমাত্রা এবং চাপ-এর পরিবর্তনের ফলে বস্তুর

[শেষাংশ ১৩ পৃষ্ঠায়]

স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম

১৯৫১ সালে ১২ই আগস্ট প্রথম ছাত্রদের নিয়ে ছাত্রদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তখন দেশব্যাপী চলছে ছাত্র আন্দোলন। এই ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এক ছাত্রের বোনের টি বি হয়েছিল। বাড়িতে চিকিৎসার সামর্থ্য ছিল না। তাঁকে তখন প্রায় বাড়ি ছাড়তে হয়। এ অবস্থায় কিছু ছাত্র তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেয় এবং চাঁদা তুলে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। তিনি সেরে ওঠেন। তখন কিছু ছাত্রের মনে হয়েছিল যে যৌথভাবে যে কোন প্রচেষ্টাই অনেক সহজ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার থেকে। আর এই ভাবনা থেকেই হেলথ হোম করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৫২ সালে ২রা সেপ্টেম্বর হেলথ হোম প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মতলা স্ট্রীটের একটি ছোট বাড়ীতে শুরু হয় কাজ। ডাঃ নীহার মুন্সী তখন ছিলেন সভাপতি। আরো ছিলেন ডাঃ অমিয়কুমার বসু, ডাঃ এ বি মুখার্জী, ডাঃ এইচ শেঠী, ডাঃ এম এল বিশ্বাস, ডাঃ হৈমী বসু, ডাঃ মৃণালকান্তি পুরকায়স্থ (বর্তমান সভাপতি) প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ। এ'দের অনেকেই তখন ছাত্র ছিলেন।

এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে বৃহত্তর পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সর্বতোভাবে চেষ্টা চলতে লাগল। কথায় কথায় হেলথ হোমের সচিব জানালেন যে হেলথ হোম কোন দাতব্য চিকিৎসালয় নয়। ছাত্রদের দয়া করে না। কারণ এ প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের ভিক্ষুক মনে করে না। এ অধিকার তাদের নেই উদ্দেশ্যও তাই নয়। সম্পূর্ণ সরকারী সাহায্যেও প্রতিষ্ঠান নির্ভরশীল নয়। নিজে নিজেকে সাহায্য করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

এ প্রতিষ্ঠানের অর্থ আসছে কোথা থেকে? সেটিরও একটি ঘটনা জানালেন তিনি। সে সময় কিছু ছাত্র বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ছাত্রদের ওপর একটা সমীক্ষা চালায়। তখন এক ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়। অধিকাংশ ছাত্রই অপুষ্টিতে ভোগে এবং নানা রোগাক্রান্ত। এই সমীক্ষাটি ওয়ার্ল্ড স্টুডেন্টস নিউজ-এ ছাপা হয়। এবং সারা বিশ্বে ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজের এই দুর্দশার কথা প্রচার হয়। তখন অনেক দেশই স্টুডেন্টস হেলথ হোমে সাহায্যের হাত বাড়ায়। বিশেষ করে সাড়া মেলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে। ডাক্তারি যন্ত্রপাতি এবং তিন টন কর্ডলিভার অয়েল দেয় রুমানিয়া। একটি এম্বুলেন্স দেয় চেকোশ্লোভাকিয়া। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বছরে পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর করে। কলকাতা কর্পোরেশন দেয় সাতশ পঞ্চাশ টাকা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর পলিটেকনিক আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ ক'রে সাহায্য করে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানাভাবে সাহায্য করতে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে পণ্ডিত রবিশঙ্কর সাহায্য করেন। সত্যেন বসুও এখানে এসেছিলেন। মেদিনীপুর কলেজের ছাত্ররা রাস্তা তৈরী করে সেই মজুরী পুরোটা দান করে। আরো বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকেও সাহায্য আসতে থাকে।

প্রথম দিকে এ প্রতিষ্ঠান কোন সরকারী সাহায্য পায় নি কেন?

প্রথম দিকে সরকার কোন রকম সাহায্য করবে না সিদ্ধান্ত নেয়। তার কারণ হচ্ছে এখানে যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাবলম্বী। এটা সি পি আই-এর সংগঠন বলে অনেকের ধারণা ছিল। কাজেই তৎকালীন কংগ্রেস সরকার থেকে আপত্তি তোলা হয়। প্রথম আপত্তি জানান পদ্মজা নাইডু। তারপর বিধান রায়ের কাছে বলা হয়। যেহেতু বিধান রায় নিজে ডাক্তার, তিনি তাই ছাত্রদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছিলেন। তিনি সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৬২ সাল থেকে পাকাপাকিভাবে সরকারী সাহায্য পাচ্ছে হেলথ হোম। বছরে প্রায় এখন ছয় লক্ষ টাকা। এই সরকারী সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে তখন জ্যোতি বসু, হীরেন

শুক্লা ঘোষাল

মুখার্জী প্রমুখ ব্যক্তিদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৮ সালে কলকাতা কর্পোরেশন জমি দেয় মৌলালীতে। তখন একতলা বাড়ি তৈরী করার জন্যই ছাত্রসমাজ ও বহু সুধীজন এগিয়ে আসেন। ছাত্ররা রক্তদান ক'রে সাহায্য করেছে। ছাত্রদের রক্ত আর ঘামেই আজ এই ছয়তলা বাড়িটি তৈরী হয়েছে। ১৯৬৩ সালে রাশিয়া এক্স-রে প্ল্যান্ট দান করে। ১৯৬৭ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার ছাত্ররা একটা সম্পূর্ণ দাঁতের বিভাগ দান করে। ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিশেষ বিশেষ খাতে সাহায্য আসতে থাকে। ১৯৬৯ সাল থেকে শুধু বহির্বিভাগ নয় হাসপাতাল বেডেও ভর্তির ব্যবস্থা চালু হোল। শুরু হোল অপারেশন থিয়েটারে অপারেশন। এ ছাড়াও সাহায্য আসতে থাকে চীন, বুলগেরিয়া এবং ফ্রান্স থেকে।

আর শুধু কলকাতা নয় পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় ২০টি ক্লিনিক চালু হয়। সেখানে অবশ্য হাসপাতাল নেই। ভর্তির প্রয়োজন হলে কলকাতায় তাঁদের পাঠানো হয়। আর এখনও সংস্থাটি ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে হেলথ হোমের কর্মসূচী নিয়ে এগোতে পারে নি। তবে প্রচেষ্টা চলছে। আর ছাত্রছাত্রীরা রোজ কলকাতার এই কেন্দ্রটিতে বিভিন্ন জেলা থেকেও আসে।

এখন হেলথ হোমে বেডের সংখ্যা ৭০টি। মেয়েদের তিরিশটি ও ছেলেদের চল্লিশটি। ছাত্রছাত্রীর বেডের সংখ্যায় এই অসমতা কেন প্রশ্ন করলে বর্তমান সচিব জানালেন যে তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে ছাত্রীদের থেকে ছাত্ররাই বেশী ভর্তির জন্য আসে। সুতরাং এই ব্যবস্থা। বর্তমানে এখানে ৫০ জন সারাক্ষণের কর্মী, ৫০ জন ডাক্তার। আর এ'দের মধ্যে ১২ জন সিস্টার আছেন। আর আছেন অগণিত স্বেচ্ছাসেবী। ত্রিশ বছরে প্রায় দশ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর চিকিৎসা হয়েছে। গত বছরে হোম চালাতে ব্যয় হয়েছে ১৮ লক্ষ টাকা। কিছু ঘাটতি প্রায় প্রত্যেক বছরই হয়। মোট আয়ের এক তৃতীয়াংশ আসে ছাত্রছাত্রীদের চাঁদা থেকে। বিভিন্ন অনুদান এক তৃতীয়াংশ। বাকিটা সংগ্রহ করা হয় নানা অর্থদায়ী কর্মসূচী ও অনুষ্ঠানের মারফত।

১৯৭৩ সালে ভাইফোঁটার কর্মসূচীতে শুরু হোল পদযাত্রা পূর্ণতর জীবনের জন্য। ১৯৭৮ সালে পদযাত্রার শ্লোগান ছিল রক্তদান। ১৯৮০ সালের পদযাত্রার রোগ প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক। এ বছর '৮২তে ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পদযাত্রার শ্লোগান ছিল সকলের স্বাস্থ্য ও জীবনের অধিকার।

হেলথ হোমের কোন এমারজেন্সি বিভাগ নেই। কারণ, এ প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবীরা বিশ্বাস করেন রোগের চিকিৎসার থেকেও রোগ প্রতিষেধক ও রোগ প্রতিরোধে। ১৩ বছর আগেও ছাত্রছাত্রীদের ২৫ পয়সায় তিন দিনের ওষুধ দেওয়া হোত। এখন দৈনিক সেটা ৫০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। কলকাতা এবং জেলার আরো ২০টি ক্লিনিকে বছরে মোট ১ লক্ষ ৭০ হাজার ছাত্রছাত্রী বহির্বিভাগে চিকিৎসার সুযোগ পান। গড়ে দৈনিক সেটা ১৪০ থেকে ২০০তেও দাঁড়ায়। একটি ক্যান্টিনও আছে সদস্যরাই চালান, কোন রকম লাভ করে না আবার লোকসানেও নয়।

স্টুডেন্টস হেলথ হোমে প্রত্যেক বছরই সদস্য সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে হোমের খরচও। এই অগণিত স্বেচ্ছাসেবী ছাড়াও যাঁদের কথা না বললে অসমাপ্ত থেকে যায় তাঁরা হলেন কাঞ্ছা বাহাদুর, সূর্য বাহাদুর, হীরা বাহাদুরের মতই সাতজন ব্যক্তি। এ'রা এ প্রতিষ্ঠানে সর্বতোভাবেই আত্মনিয়োগ করেছেন। সেই সুদূর কাটমাণ্ডু থেকে এসেছেন। দু' বছরে একবার এক মাসের জন্য বাড়ী যান। এ প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য সহকর্মীদের মতই ছাত্রছাত্রীদের এ'রা প্রিয় বন্ধু।

গদাধর শর্মার ইংরাজী পাঠে উন্নতি

অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় আপনাদিগের চরণে নিবেদন করি মদীয় নাম গদাধর শর্মা। ১২৮৫ সনে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় আমার জন্ম। আমার ইংরাজী পাঠে উন্নতি দেখিয়া বঙ্গদর্শন পত্রিকা আমাকে ব্যঙ্গ করিয়াছিল। কলিকাতা দর্শনে আমি গ্রন্থাগার হইতে বাহির হইয়াছিলাম। এক মনোহর আশ্চর্য-জনক দৃশ্য দেখিলাম—কলিকাতার বুদ্ধিজীবীরা মাতৃভাষায় শিক্ষার বিরুদ্ধে মিছিল করিয়াছেন। এক্ষণে ইহারা গণ্যমান্য ব্যক্তি, কেউ কেউ সুলেখক, কবি, শিল্পী এবং বিচারপতি। আমাদিগের সময় বুদ্ধিজীবী শব্দ প্রচলিত ছিল না। এক্ষণে ইহারা বোধ হয় বুদ্ধি বিক্রয় করিয়া থাকেন বলিয়া বুদ্ধিজীবী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। কি ধরনের বুদ্ধি বিক্রয় হয় জানা থাকিলে গ্রামের লোক শহরে আসেন কিছু কিছু বুদ্ধি ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য। এক্ষণে নিশ্চয়ই বুদ্ধি ক্রয় বিক্রয়ের বাজার আছে।

আহঃ আমি দেখিলাম ইহারা মিছিল করিয়া আইন অমান্য করিলেন।

"আইন তামাসা মাত্র বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া দেখিয়া আসেন—" দেখিলাম স্বয়ং কমলাকান্ত উপস্থিত হইয়াছেন। কমলাকান্তকে নিশ্চয়ই আপনাদিগের স্মরণ আছে—মার্ক্স সাহেবের ক্যাপিটাল গ্রন্থ প্রচলনের আগে সাম্যের কথা বলিয়াছেন বিড়াল প্রবন্ধে। কমলাকান্তের আফিং সেবনের নেশা ছিল। তৎকালে গরীব দুঃখী আফিং সেবন করিতেন। চীন দেশকে বশে আনিবার জন্য কোম্পানী আফিং রপ্তানী করিত কলিকাতা বন্দর হইতে। আমাকে দেখিয়া স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অবাক হইলেন; আমার ইংরাজী পাঠে উন্নতির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কবুল করিলাম ইংরাজী পাঠে উন্নতি বিশেষ হয় নাই। বলিতে লজ্জা নাই, একসময় চাকুরীর জন্য ইংরাজী পাঠে বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ধৃতি দিলেন "যে সকল বাঙ্গালী ইংরাজী সাহিত্যে পারদর্শী তাহারা একজন লণ্ডনী কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না বা এতদ্দেশে অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালীদের সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে যে ইংরাজেরা বাঙ্গলা শিখিয়াছেন তাহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গলা গ্রন্থ বুঝিতে পারেন না।"

কোম্পানী যখন ব্যবসা করিবার জন্য মোগল দরবার হইতে সনদ পায়, তাহাদের রাজভাষা আয়ত্ব করিতে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইত। শুনিলে অবাক হইবেন পলাসী যুদ্ধে মাত্র ১০০০ জন ইংরাজ সৈন্য ছিল। অন্যদিকে ভারতীয় সৈন্য ছিল তাহাদিগের সপক্ষে ২৮৮০ জন। বুঝিতে বিলম্ব হয় না তাহারা চাকুরী করিতে গিয়াছিলেন। ভারতীয়দের সম্পর্কে কর্নওয়ালিস সাহেবের মন্তব্য স্মরণ করিবেন "every native of Hindusthan I verily believe is corrupt" অন্যদিকে মেকলে সাহেব উক্তি করিয়াছেন, "বিদেশী পদাশ্রিত থাকার উপযোগী দৈহিক গঠন ও মানসিক গড়নের দিক থেকে বাঙ্গালীর মত এমন যোগ্য জাতি বিশ্বের কোথাও নেই।" এই আত্মসর্বস্ব বাবু সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি ছড়া প্রচলিত ছিল

"নুনে ভণ্ড কার্পাসে চোর।
দেখ তোর না দেখ মোর॥"

"এক্ষণে উচ্চশিক্ষিত মাত্র বিদেশে গমন করিতে ইচ্ছুক। তৎকালেও সেইরূপ ছিল

"বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গৌড়ে
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে
বিনা হাটটা কোটটা শুধু ধূতি পিরহনে
মন রয় না
স্বদেশে গুরুজনবশে কিছু বয় না"

এক্ষণে উচ্চশিক্ষিত মাত্রেই বিদেশে গমন করেন, তৎস্থানে রহিয়া যান। তাই গ্রামে ডাক্তার নাই, ইনজিনীয়ার নাই। এমন কি গণ্য-চিকিৎসক নাই। সকলেই মস্তিষ্ক রপ্তানী করিতে ব্যগ্র। এমন উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন কি?

এই কারণেই আমার জনক বলিয়াছেন "সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলে লোক শিক্ষিত হয় এ কথা বাঙ্গালার সর্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। সুশিক্ষিত অশিক্ষিতে একাত্ম হওয়া চাই।" এতদুদ্দেশেই মধুসূদন 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ, 'একেই কি বলে সভ্যতা' রচনা করিয়াছিলেন। দুই শ্রেণী চরিত্রই অতিশয় কলঙ্কনীয় ছিল। গোস্তাকি মাফ করিবেন; বাইনাচ, দুর্গাপূজা, বিবাহ, পিতামাতার শ্রাদ্ধ যে কোন উৎসবেই মহামান্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাহেব কেরাণীকুল আমন্ত্রিত হইতেন। কেননা পারমিট, লাইসেন্স, দালালী তৎক্ষণে প্রচলিত ছিল এক্ষণেও আছে। সুতরাং যে কোন উৎসবেই সারারাত্র মদ্যপান বাইনাচ চলিত। আহঃ বিলাতী মদ্যপানে উৎসাহ আজো দেখি, তৎসময়েও ছিল। মহামান্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেকটরবর্গকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত টমাস রো সাহেব চিঠি লিখিয়াছিলেন There is nothing more welcome here nor did I ever see men fond of red wine......"

ধনীদের মদ্যপানে উৎসাহ ছিল; এক্ষণে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রবল।

সুতরাং সুশিক্ষিত অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই। এই কথা সর্বত্র পালিত হয় নাই। স্বীকার করি কিছু কিছু ভদ্রজনের সমবেদনা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন তাহার এইরূপ সমবেদনা ছিল—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

আহঃ এমন কথা বলে কে? দেখিলাম বিদ্যাসাগরের মুণ্ড কথা বলিতেছেন।

'এ কি প্রাজ্ঞ আপনার ধড় কোথায়?'

'মূর্খ তুমি জানো না আমার মূর্তির কতবার মুণ্ডছেদন হইয়াছে—!'

'কিন্তু এইরূপ দশা কেন হইল!'

'তোমাদিগের কাফি হাউস হইতে উৎপন্ন মুক্তির দশক নামক রাজনৈতিক আন্দোলনে এইরূপ দশা—, এক্ষণে প্রশ্ন করি শ্লোকের অর্থ কি?'

মাথা চুলকাইয়া বলিলাম অর্থ জানি না।

'যে ব্যক্তি দেবতাজ্ঞান রহিত হইয়া কর্ম করেন তিনি অন্ধকারে প্রবেশ করেন আর যারা কর্ম বিনা কেবল দেবজ্ঞানে রত হয়েন তাহারা সেই অন্ধকার হইতে আরো বৃহৎ অন্ধকারে প্রবেশ করেন।'

'আপনি দিবালোকে অন্ধকার দেখিতেছেন?'

'মূর্খ অন্ধকার দেখিতে দিবালোকের প্রয়োজন হয় না—'

তাহার মুণ্ড রাগে কাঁপিতে লাগিল। চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইল।

আমি বিস্তর স্তব স্তুতি করিলাম। প্রশ্ন করিলাম আপনি মাইলস্টোন দেখিয়া ইংরাজী শিখিয়াছেন, এখন বলুন তো কেন শিখিয়াছিলেন?

'অগ্রে সংস্কৃত শিখিয়াছিলাম গ্রামে, কিশোর বয়সে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করি। রাজভাষা শিক্ষণ আবশ্যক।'

'এক্ষণে রাজা নাই—'

'মূর্খ আমাদিগের সময়ে কোম্পানী রাজত্ব করিত। তোমাদিগের সময়েও কোম্পানী রাজত্ব করে! খণ্ডিত মুণ্ড হঠাৎ হাস্য করিয়া বলিলেন 'রাজভাষা শিক্ষালাভ কর চাকুরী পাইবে—'

'না, পাইবে না'—

দেখিলাম এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ চিৎকার করিয়া উত্তেজিত অবস্থায় বাধা দিলেন। চিনিতে অসুবিধা হইল না ইনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

'কেন পাইবে না—?' প্রশ্ন করিলাম।

'তাহা এক্ষণে চাকুরী পাইবার সূত্র নহে অর্থ-নীতি বজায় না করিলে চাকুরী পাইবে না।'

মূর্খ গদাধর তোমার ন্যায় আরো মূর্খ সৃষ্টি হইয়াছে—চিনিতে কষ্ট হইল না ইনি অক্ষয় দত্ত। দেখিলাম বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে বাহবা দান করিলেন। হাস্য করিয়া নবজীবন পত্রিকার ৫৭৮ পৃষ্ঠা চাকুরী প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃতি দান করিলেন।

"দেশভক্তির প্রধানত দুই প্রকার প্রকৃতি। অধিকাংশ দেশহিতৈষীই বিদেশী রাজার কার্যে যোগদান করিয়া দেশ হিতসাধন করিতে ইচ্ছুক, তাহাতে যদি বাধা পায়, তাহাতে যদি স্ফূর্তি না পায় তাহা হইলে সহস্রের মধ্যে একজন না এক-জন অন্য মূর্তির দেশভক্তির সেবা করে—"

আচার্য উল্লসিত হইলেন। চিৎকার করিয়া বলিলেন এই কারণেই আমি তোমাদিগে ব্যবসা করিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমরা হকার সৃষ্টি করিয়াছো, দেখিতে পাইবে আমার মূর্তি হকার দ্বারা পরিবেষ্টিত।

দেখিলাম একজন মুসলমান প্রতিবাদ করিলেন, সবিশেষ যত্ন লইয়া বুঝিলাম ইনি আবদুল হালিম সাহেব। তিনি বলিলেন 'ইহা দেশ বিভক্তের কারণ' অক্ষয় দত্ত প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন দেশ বিভক্ত হইল কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন 'অনুশীলন ধর্মতত্ত্ব' হইতে বিচ্যুত হইলে কেন? মহাসোরগোল উপস্থিত হইল দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের যে গান রচনা করিয়া গাহিয়া-ছিলেন সেই গান গাহিতেছেন

"আমরা মিলেছি মায়ের ডাকে—"

রবীন্দ্রনাথ গান থামাইয়া প্রশ্ন করিলেন সহজ পাঠ সম্পর্কে এত বিতর্ক—তাহা হইলে ভারতকে বিভক্ত করিলে কেন? বঙ্কিমচন্দ্র আরো ক্ষিপ্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন 'আমার বন্দেমাতরম্ ধ্বনি পরস্পরে হননে ব্যবহৃত হইল কেন?' সকলেই গালিগালাজ করিতেছেন এবং আমার ইংরাজী পাঠের দশা লইয়া চিৎকার করিতেছেন। আমি করোজোড়ে কহিলাম 'এই সকল বিষয়ে জানা নাই—এক্ষণে বুদ্ধিজীবীদের প্রশ্ন করুন।' ইহাতে বিদ্যাসাগর অতিশয় বিরক্ত হইলেন 'যাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে তাহাদের প্রশ্ন করিয়া লাভ কি?' বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে ইংরং বাঙ্গালীর সামাজিক বুদ্ধি প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃতি দিলেন

"সমাজ সংস্কার বলিলে বুঝায় যে সমাজটি যেমন আছে আদতে তেমনিটিই থাকিবে, আসলে যেন বিঘ্ন না হয়; বিপ্লবে বুঝায় আসলই বদলাইতে হইবে—"

বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করিলেন তোমাদের বিপ্লব দূরে থাক সমাজ সংস্কার কতদূর? হালিম সাহেব জানাইলেন সমাজ আদতে সেইরূপই আছে। কেবল বিবিধ ভারতী যোগ হইয়াছে—

দেখিলাম রাজশেখর বসু আলোচনায় যোগ দিয়াছেন—আমাকে প্রশ্ন করিলেন—

গদাধর আমার হনুমানের স্বপ্ন পড়িয়াছো—?

'হনুমানের স্বপ্ন পড়িয়া কি লাভ হইবে?'

'পড়িলে বুঝিতে, ভুল অনুমানের বৃত্তে তোমরা অনবরতই ঘুরিতেছো—'

'জার্মান জাতি, ফরাসী জাতি, রুশ জাতি সকলেই কি উচ্চশিক্ষার জন্য ইংরাজীর উপর নির্ভরশীল?'

কে প্রশ্ন করিল বুঝিলাম না। কিন্তু উত্তর দিতে সাহস হইল না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন—

'অগ্রে ইংলন্ড গমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত—এখন কি অবস্থা?'

'ইংলন্ডে নূতন আইন বলবৎ হইতেছে যাহাতে ভারতীয়রা প্রবেশ না করেন—'

'সেখানে ভারতীয়রা করেন কি?'

'শুধুমাত্র চাকুরি—!

এই কথা শুনিয়া সকলে বিরক্ত হইলেন অশরীরি ভাষায় বিস্তর গালিগালাজ করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগরের খণ্ডিত মুণ্ড প্রশ্ন করিলেন—

'ঐ স্থানে বাঙ্গালী পরিবারের সন্তানরা কি বর্ণপরিচয় পড়ে—?'

যতদূর স্মরণ হয় তাহারা বাংলা ভাষা জানে না—

আবদুল হালিম সাহেব বলিলেন। 'কলিকাতা শহরে ধনী এবং মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালীর সন্তানদেরও বাংলা ভাষায় পরিচয় নাই।'

আমি করজোড়ে কহিলাম 'তাহাতে সেই পরি-বারের কর্তাব্যক্তির গর্ব আছে।'

'গদাধর তোমার দুঃখ ঘুচিয়াছে, বঙ্গে মূর্খ পরিবারের সংখ্যাধিক্য হইয়াছে। এক্ষণে বল দেখি তাহারা কোন ভাষায় পারদর্শী হইয়াছে—? তাহারা কি 'সেক্ষপীয়র' কবির কাব্য সকল অনু-ধাবণ করিতে সক্ষম?

আমি উত্তরে কহিলাম—'ইহাদের কথোপকথন বোধগম্য নহে।—ছাত্রী সকলের ভুরু নাই, ছাত্ররা মহিলাদের সায়া সদৃশ এক অদ্ভুত আচ্ছাদন পরি-ধান করে কথোপকথনে প্রায়শঃই 'বাস্টার্ড' বলে।

সেকি? বাষ্টার্ড শব্দের অর্থ জারজ! ইহাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় না?—বঙ্কিমচন্দ্র রাগান্বিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন।

'কোম্পানীর আমলে এই শব্দ ব্যবহারে অনেক দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছে—হিকী সাহেবের গেজেটে তাহা বর্ণিত আছে—কিন্তু এক্ষণে তাহা হয় না।'

'কেন?'

'এক্ষণে সেই সমস্ত পরিবারে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী সকল কামবিষয়ক উত্তেজক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া কৃষ্ণ প্রেম করে—'

বঙ্কিমচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন, বিদ্যাসাগরের চক্ষু-দ্বয় রক্তবর্ণ হইল, অক্ষয় দত্ত রাগান্বিত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন, রবীন্দ্রনাথ ম্রিয়মান হইলেন, রাজশেখর বসু 'চলন্তিকা' অভিধান খুঁজিতে লাগিলেন, হালিম সাহেব জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সকলে একযোগে প্রশ্ন করিলেন—'তোমাদিগের বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ করে না কেন?'

মনে মনে বলিলাম এক্ষণে তাহারাও ঐ সকল কামবিষয়ক গ্রন্থের আলোচনা, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি ইত্যাদি দেখিয়া তৃপ্তি বোধ করেন। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন কেবল বিদ্যাসাগরের খণ্ডিত মুণ্ড প্রশ্ন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন 'মূর্খ গদাধর তুমি বিষ্ঠা দেখিয়াছো—?'

রহস্য বুঝিলাম না। স্মরণ আসিল ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"এদেশে বিষ্ঠা কোথায়—সবই গোবর দেখিতেছি, মনুষ্য কোথায় যে বিষ্ঠা দেখিবে?"

নোবেল পুরস্কার : ১৯৮২ (১০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অবস্থান্তর হয়। জল গরম হয়ে বাষ্পে পরিণত হয়; বরফ জলে পরিবর্তিত হয়; লোহা গলে গেলে তার চৌম্বক ধর্ম অন্তর্হিত হয়; অতিরিক্ত তাপে সুকঠিন পদার্থও কাদার মত নরম হয়। কিন্তু ঠিক কোন্ তাপমাত্রায় এবং চাপে পদার্থের অবস্থান্তর হবে তা জানা এতদিন পর্যন্ত সম্ভব ছিল না। অত্যাধুনিক কম্পিউটারও এই নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বা চাপ যা 'সংকট বিন্দু' (Critical point) নামে পরিচিত তা বার করতে পারে নি। 'রি-নর্মালাইজেশন গ্রুপ থিয়োরী'-র সহযোগি-তায় একটি নতুন সাংগঠনিক-গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে উইলসন এমন একটি নতুন গাণিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন যার সাহায্যে বস্তুর অবস্থান্তরের জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এবং চাপ সম্বন্ধে জানতে কোন অসুবিধা হবে না।

রসায়ন

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যারোন ক্লাগ এ বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার লিথুয়া-নিয়া-য় জন্মগ্রহণ করেন। পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা শেষ করে তিনি জীববিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। তাঁরেই তিনি জীববিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণের পর থেকেই তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল ল্যাবরেটরি অফ্ মলিকিউলার বায়োলজি"-র সঙ্গে সংযুক্ত আছেন। আজও ক্লাগ স্নাতক পর্যায়ে পদার্থবিজ্ঞান পড়ান।

অতি ক্ষুদ্র প্রাণিদেহের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণের জন্য 'ইলেকট্রন বীম' অনেকদিন ধরেই ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু প্রাণীদেহের ভিত্তি ডি.এন.এ. (DNA) এবং আর.এন.এ. (RNA) কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য কিন্তু এই পদ্ধতিতে অজ্ঞাতই থেকে যাচ্ছিল। ক্লাগ উদ্ভাবিত গাণিতিক সূত্র ক্রিস্টালোগ্রাফিক ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মান উন্নয়ন করেছে। এই যন্ত্রর সহায়তায় তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে দেহকোষ কিভাবে সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয় তা আবিষ্কার করেছেন। দেহকোষের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রকে অবস্থিত 'ক্রোমাটিন' যা বংশানুক্রমের সংকেত বহন করে তার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যও এই পদ্ধতিতে জানা যাচ্ছে। অ্যারোন ক্লাগ-এর আবিষ্কার মানবসভ্যতাকে বহু যুগ এগিয়ে দিয়েছে।

হারুপ মেলার প্রাণকেন্দ্র ইঁড়গুনাথ

গাজী মোহাম্মাদ আবুবকর

জ্যৈষ্ঠ শেষের বাগমুণ্ডিতে একটি মনোরম সকাল। সংক্রান্তির দিনে দেউলীর হারুপ মেলা দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গী সপ্রতিভ বিনয়ী যুবক নিকুঞ্জ মাঝি। বাগমুণ্ডির পাশে পাথরডি গ্রামে তার বাড়ি। শাল পলাশ কুসুম মহুয়া বনের বুক চিরে দুজনে সাইকেল নিয়ে ছুটেছি বাঁধানো পাকা রাস্তায়। মাথার উপরে উদার আকাশ, ডানপাশে রহস্যময়ী অযোধ্যা পাহাড়। পাহাড় খেয়ালী উঁচুনীচু, পাদদেশের জমিও স্বেচ্ছাচারী উঁচুনীচু। শিল্পীর ইজেলে চিত্রের মতো লগ্ন হয়ে আছে নৈসর্গিক শোভা। এ রাস্তায় বাস চলে কিন্তু আমরা বেছে নিয়েছি স্বাধীন দ্বিচক্রযান।

বাগমুণ্ডি থেকে সুইসা কুড়ি কিলোমিটার। সুইসা থেকে দেউলী কাছেই, বাংলা বিহারের প্রান্ত সীমায়। ফি বছর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির দিন মেলা বসে সেখানে। ইঁড়গুনাথ বা উরয়নাথের প্রাচীন মন্দিরে পুজা হয়। জ্যৈষ্ঠের গুরুতর গরমকে পরোয়া না করে মানুষ ছোটে হারুপ মেলা দেখতে।

পাহাড়ী রাস্তায় মনটা শেকলছেঁড়া কয়েদির মতো ছুটে চলেছে। সামনে চড়িদা গ্রাম। রাস্তার ধারে ছো-নাচের বিখ্যাত মুখোশ শিল্পীদের বসত। গ্রামের প্রান্তে খ্যাতিমান ছো-নর্তক পদ্মশ্রী গম্ভীর সিং মুড়ার কুঁড়ে ঘর। আমরা পথ সংক্ষেপ করতে পাকা রাস্তা ছেড়ে গাঁয়ের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া কাঁচা রাস্তা ধরেছি। পেরিয়ে যাচ্ছি ঘোড়াবান্ধা সিন্দ্রি গ্রাম। পথের ধারে বাঁধানো বেদীতে একটি ধুতিপরিহিত সুঠামদেহী মূর্তি। দেবতার নয়—বিগত দিনের প্রখ্যাত ছো-নৃত্যশিল্পী লাল মাহাতোর। গ্রামের মানুষ ভালোবেসে শিল্পীকে অমর করে রেখেছে মূর্তি তৈরী করে। বাগমুণ্ডি থানাটাই লোকসংস্কৃতির স্বর্ণখনি। তিন বছর এখানে থেকেছি, টুসু, ভাদু, করম, জাওয়া, ছাতা, ইঁদ পরব দেখেছি। প্রাণভরে ঝুমুর গান শুনেছি, রাত জেগে ছো-নাচ দেখেছি। আজ চলেছি হারুপ মেলায়।

রাস্তা চলে গেছে ক্ষীণতোয়া কাড়রু নদী পেরিয়ে। অযোধ্যা পাহাড় থেকে নেমে এসে কাড়রু মিশেছে সুবর্ণরেখায়। এরই তীরে প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে বসে সতীমেলা। বছর তিরিশেক আগে যুবতী বধু সরলা স্বামীর অকাল মৃত্যুতে শোকবিহ্বল হয়ে সহগামিনী হয়েছিলেন। সেই স্মৃতি অক্ষয় রাখতে সতী সরলার নামে মেলা বসে।

সুইসার কাছে পেঁছুতে দেখি জামশেদপুর গামী একটি ট্রেনকে মাঝ রাস্তায় জোর করে বেঁধে হাজারখানেক মেলা দর্শনার্থী নেমে পড়লো। লোক চলেছে মাঠের আলপথ দিয়ে, রেল সড়ক ধরে। আজ সব পথ হারুপ মেলায় গিয়ে মিশেছে।

'হারুপ' শব্দের অর্থ কি? শব্দতাত্বিক বলতে পারবেন। 'হর' থেকে হারুপ হওয়া অসম্ভব নয়। শুনেছি ইঁড়গুনাথের পুজা বস্তুত শিবেরই পুজা। যে স্থানে মেলা বসে সে স্থানের নাম দেউলটাঁড়। পাশের গ্রাম দেউলী। এখানে তিনটি দেবদেউল কতো যুগ ধরে পোড়ো অবস্থায় আছে তার হিসাব স্থানীয় মানুষেরা কেউ রাখে না। জিজ্ঞেস করেছি অনেককে, নির্ভরযোগ্য উত্তর পাই নি।

মেলায় ঢোকার মুখে স্ট্যান্ডে সাইকেল রেখে এগোচ্ছি। বেলা দশটার মধ্যে জোর মেলা বসেছে। চারিদিকে দোকানপশারির ছাউনি। সারি সারি ভাতের দোকান। মিষ্টি কাম চায়ের দোকান। পান-বিড়ি, তেলেভাজা, মেঠাইয়ের দোকান। বিক্রি হচ্ছে তালপাতার পাখা, রঙীন খেলনা। প্রচুর আম বিক্রি হচ্ছে, তোতাবুলি আম সাড়ে তিন টাকা কিলো। কেনা-কাটা চলছে সর্বত্র।

মেলার অদূরে সারি সারি খালি গরু-মোষের গাড়ি পড়ে আছে। বাহকদের চাকায় বেঁধে রাখা হয়েছে। গাড়ি বোঝাই করে দূরদূরান্ত থেকে দোকানী এনেছে মালপত্তর, গৃহস্থ এনেছে মেয়ে-বউকে।

তুমুল হৈচৈ জমজমাট মেলা। দলে দলে মেয়েরা আসছে। পরনে তাদের উৎসবের সাজ। সিন্থেটিক শাড়িতে রঙিলা বেশ, চুলের বিনুনীতে জরির ফিতে। দলে বালিকা যুবতী বৃদ্ধা বিগতযৌবনা বিবাহিত অবিবাহিত সকলেই আছে। দেহাতী মানুষেরা এসেছে, হাতে টাঙ্গি উঁচু করে ধরে। অনেকের হাতে ছাতা। যুবক বয়সী উঠতি ছোকরাদের পরনে প্যান্ট-শার্ট। কারো আবার প্যান্টের উপরে পাঞ্জাবী। গাঁদেহাত থেকেও ধুতি-টুতি পিছু হটছে। অনেকের মুখে পান, চোখে রোদ-চশমা। কারো হাতে আবার ট্রানজিস্টর। বেতারে গানের মজা আর মেলার মজা একই সঙ্গে লুটছে। মেলার ভিতর যেতে যেতে কতো না মানুষের ধাক্কা খেলাম, প্রখর রোদ সহ্য করলাম, মনুষ্যপদ সঞ্চারে ওড়া ধুলো খেলাম। মেলা দেখার নেশায় এখন সবই হজম হচ্ছে। কতো না বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ছে। দেহাতী যুবক অযথা যুবতীর আঁচলের ছোঁয়া পাবার চেষ্টা করছে। পান-খাওয়া লাল টুসটুসে গালে রসবতী সঙ্গীসঙ্গিনীদের সাথে রসালাপে মত্ত হয়ে হাঁটছে। রসিক পুরুষ মহিলা সেজে মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর কৌতূহলীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

মেলা প্রাঙ্গণে অনেকগুলি ছায়াদায়িনী অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ। তলে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মানুষের ভীড়। রোদ্দুর মেলার দর্শকদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে যদিও আকাশ মাঝে মাঝে মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে। অশথ ছায়ায় এক ঝুমুরশিল্পী গান গেয়ে ঝুমুর গীতের পুস্তিকা বিকচ্ছেন। তাঁর কণ্ঠটি আমার চেনা। গোবিন্দপুর গ্রামের বিশ্বনাথ কুমার যার গান বাগমুণ্ডির যুব উৎসবে কয়েকবার শুনেছি. আমাকে দেখতে পেয়ে গান না থামিয়ে কাছে ডাকলেন ইঙ্গিতে। তাঁর হাতের গোছায় ধরা বিশ-বাইশটা পুস্তিকা। টাটার বিপিনবিহারী মুখী গান রচনা করে দেন। বিশ্বনাথ কুমার তাতে সুর-সংযোগ করে হাটে-বাজারে-মেলায় তাঁর সুরেলা গলায় গেয়ে বেড়ান এবং সেগুলি ছেপে বিক্রি করেন। ঝুমুররসিক গীতিপিপাসু তাঁর গান শুনে আট আনা খর্চা করে একটি বই কেনেন।

বটবৃক্ষতলে আরো একদল ঝুমুরগাইয়ে ঢোল, তবলা, হারমোনিয়াম আর বাঁশী বাজিয়ে আসর জমিয়ে ফেলেছে। তারাও ঝুমুরপুস্তিকা বিক্রি করছে। আঁতকে ওঠার মতো কালো চেহারার এক জন গায়ক মধুর কণ্ঠে গান ধরেছেন—

শীতলি বাতাস বয়,
তারপর বিছাতির কামড়,
পলকি পলকি উঠে আমার নিভায় না আগুন,
বলি তোরে শোন—
বেরসিক লাগাই গেল আমার পাঁজরাতে ঘুণ।...

ঘণ্টা দেড়েক অনভ্যস্ত সাইকেল চালিয়ে গলদঘর্ম হয়ে পড়েছিলাম। গাছের শীতল ছায়ায় ঝুমুরের মোহনীয় সুর শুনে দেহমন জুড়ালো। নিকুঞ্জ এদিকে তাড়া দিলো, আগে ইঁড়গুনাথ দর্শন, পরে গান। বেলা যতো বাড়বে, ভীড় ততো বাড়বে। তখন আর দেবদর্শন হবে না। আমি বলি—না,

আগে গান, পরে দেবদর্শন। এরই মধ্যে আরো একটি গান শুরু হয়েছে—

বিদেশী বঁধুয়ার সনে
ওগো, প্রেম করোনা কোনো দিনে,
পীরিত করে মন মজায়ে
সেজন গেলো বা কোথায়,
হায়রে সাধের যৌবন আমার বিফলেতে যায়। .

গানটি শেষ হলে ইঁড়গুনাথ দর্শনে চললাম। যদিও ঝুমুরের সুর আমাকে চুম্বকের মতো টানছিল।

বটবৃক্ষের সারির দুপাশে দুটি বৃহৎ 'বাঁধ' বা পুষ্করিণী। লোকে বলে হারুপ পুকুর। মেয়ে-পুরুষরা সেখানে পাশাপাশি স্নান করছে। দেবতার পায়ে অর্ঘ্য নিবেদনের আগে স্নান। স্থানীয় লোকেরা বলে 'আষাড় সিনান'। কিংবদন্তী আছে, অসুরগণ একরাত্রেই ইঁড়গুনাথের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তারা কোনো যুদ্ধে জয়ী হয়ে ঘরে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে শিবপূজা করতে রাতারাতি এই মন্দির নির্মাণ করেন। সেযুগে নাকি অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতেন অসুরগণ। যাই হোক, তাঁরা দুটি পুষ্করিণী খনন করেন এবং সেখানে সিনান করে শিবপূজা সমাপন করে ঘরে ফেরেন। মন্দির রাতারাতি নির্মিত হয়েছিল বলে চূড়ার কিয়দংশ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

মূল মেলার ক্ষেত্র থেকে মন্দির প্রাঙ্গণ কিছুটা দূরে। সেখানেও জোর মেলা বসেছে। মোট তিনটি মন্দির। মধ্যস্থলে প্রধান মন্দির যার গায়ে বিশাল বটবৃক্ষ মাথা তুলেছে। মন্দির তিনটি চৌকো সাইজের পাথরে নির্মিত। আপাতদৃষ্টিতে বোঝা যায় না প্রস্তর খন্ড জোড়া লাগাতে চুন সুরকী বা সিমেন্ট জাতীয় কিছু ব্যবহৃত হয়েছে কি না। প্রধান মন্দিরের চূড়ার বেশ কিছুটা অংশের পাথর খসে ধ্বসে ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। মন্দিরের গর্ভদেশে ইঁড়গুনাথের বিগ্রহ। অপর দুটি মন্দিরে বিগ্রহ নেই।

ভীড় ঠেলে সুড়ঙ্গের মতো পথে প্রবেশ করলাম মন্দিরের গর্ভদেশে। ইঁড়গুনাথের মাথায় মেয়েরা ফুল চড়াচ্ছে, জল ঢালছে। সেই জল লিঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। সন্তানহীনতায় অভিশপ্তা নারী সেই জল পান করে সন্তান লাভের আশায়। সেজন্য মানত করে যায়, মনস্কামনা পূরণ হলে মানত আদায় দিতে আসে। পূজারী জনক সিং নায়াকে প্রসাদ বিলোতে দেখলাম। তিনি বাউরী সম্প্রদায়ের লোক। বর্ণ-হিন্দুরা ইঁড়গুনাথের পূজা করে না। মন্দিরের প্রৌঢ় ঢোলী কানাই কালিন্দির কাছে জানলাম, মানত আদায় দিতে এসে কেউ স্বর্ণছত্র, কেউ পাঁঠা, কেউ শাড়ি দিয়ে যায়। এগুলো পূজারী নাযার প্রাপ্য। পাঁঠা বলি হলে 'গতর' নিয়ে যায়, মুণ্ডু রেখে যায়। ভক্তরা আসে দূর-দূরান্ত থেকে —রাঁচী, টাটা, মুরি, চান্ডিল, বুণ্ডু, টামাড় থেকে।

বিগ্রহকে ভালো করে নিরীক্ষণ করলাম। প্রায় আড়াই ফুটের মতো ধ্যানগম্ভীর দিগম্বর মূর্তি। ভঙ্গিমায়, ছন্দে, রূপায়ণে অনুপম মূর্তিটি একটি নিটোল ভাস্কর্য। একটি খন্ড পাথরে খোদাই করে নির্মিত হয়েছে। কিন্তু এ-তো শিব-মূর্তি নয়—জৈন মূর্তি। মন্দিরের শৈলী দেখে জৈন মন্দির মনে হয়।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে ভাবতে লাগলাম, এই দেবালয়টি কত যুগ পরে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে তা আজ গবেষণার বিষয়। ইঁড়গুনাথ একজন তীর্থঙ্করের নাম ছিল। তিনি শিবরূপেই পূজিত হচ্ছেন। এককালে এসব অঞ্চলে জৈন ধর্মের প্রভাব ছিল—সে তথ্য ইতিহাস ঘাঁটলে বেরিয়ে পড়বে। পরেশনাথ পাহাড় এখান থেকে দূরে নয়। জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ সেখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। পুরুলিয়া জেলার বহু দেবস্থানেই হারুপের অনুরূপ চিত্র দেখা যায়। পুঞ্চা থানার পাকবিড়রার মন্দিরে জৈন মূর্তি এখন ভৈরব মূর্তি হিসেবে পূজিত হচ্ছে। দেউলঘাটার মন্দিরটিও জৈন মন্দির বলে প্রত্নতত্ত্ববিদ অনুমান করেন। পাড়া থানার মন্দিরগুলিও নাকি একই ধরনের। আমার সহচর নিকুঞ্জ জানালো, বাগমুণ্ডি থানার বুড়দা ও একড়া গ্রামে এখন দুটি গ্রামীণ মূর্তি রয়েছে। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনেও একটি মূর্তি রক্ষিত আছে। দেউলী থেকে খুব কাছে সুইসায় পুরাকীর্তি সংগ্রহশালে দেখেছি গোটা আঠারো প্রাচীন মূর্তি। এর মধ্যে বিষ্ণু, সিংহ-বাহিনী দুর্গা ও অন্যান্য দেবমূর্তির সঙ্গে কয়েকটি দিগম্বর জৈন মূর্তিও আছে। স্থানীয় মানুষেরা সেগুলির পূজো করেন। শুনেছি বাঁকুড়া জেলার ধরাপাট নামে একটি গ্রামে ন্যাংটা শ্যাম-চাঁদের মন্দিরের বিগ্রহটি কোন জৈন তীর্থঙ্করের। আজ পুরুলিয়া বাঁকুড়ার জনজীবনে জৈন ধর্মের কোন প্রভাব নেই। তবে এখানে বসবাসকারী রাজস্থানী ব্যবসায়ীরা ধর্মে জৈন। বাংলাভাষী সরাকদের আচার-অনুষ্ঠান অনেকটা জৈনদের অনুরূপ। অনুমান করা যায়, তাঁরা জৈনদের কোন শাখা গোষ্ঠী।

দেউলীর জৈন মন্দিরের পাশেই অধুনা-নির্মিত একটি ছোট শিবমন্দির। সেখানেও দর্শনার্থীর ভীড় জমেছে। পূজারী ব্রাহ্মণ ষষ্ঠী-প্রসাদ ব্যানার্জী ভক্তদের প্রসাদ বিলোচ্ছেন। তাঁকে

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা ব্রাহ্মণরা কেমন করে এই অরণ্যসংকুল আদিবাসী অধ্যুষিত সীমান্ত বাংলায় বসত শুরু করলেন? তিনি মানভূমী শব্দ ও টান বর্জিত বাংলায় বললেন, প্রায় পাঁচ পুরুষ আগে তাঁরা বর্ধমান থেকে এখানে এসেছেন। সুইসার মানকী রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। আদিতে তাঁরা ছিলেন শাঁখাবিক্রেতা। জৈন মন্দির সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে জানালেন, আগে মন্দিরের চারিপাশে পাঁচিল ছিল, ফটক ছিল। এখন সেসবের চিহ্নমাত্র নেই। তিনি আক্ষেপের সুরে বললেন, জৈন মন্দিরে এখন পশুহত্যাও চলছে।

মন্দির থেকে বেরুবার পর কয়েকটি চেনামুখের দেখা পেলাম। গুরুপদ মাহাতো, ধীরেন মাহাতো, নঈম আনসারি, আলম খাঁ, পান্ডব কুমার। এঁরা কেউই ভক্ত নয়, মেলার মজা লুটতে এসেছেন। পান্ডত কুমার পান-সিগারেট খাওয়ালেন। আলম খাঁ খাতির করে নুন-লেবুর শরবৎ খাওয়ালেন। দারুন গরমে কিছু লবণজল ভেতরে ঢুকলো। মাথার উপরে তপনদেব সাধ্যমত কিরণ দান করছেন, কিন্তু আমাদের তার কিছুমাত্র গ্রহণের ক্ষমতা নেই। রৌদ্রের খরতাপে কিছুক্ষণ ঘোরা-ঘুরি করলে উদরে অস্বস্তি, মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। অথচ এরই মধ্যে মানুষের উল্লাসের সীমা নেই। মাঠের দিকে চোখ ফেরালেই দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের দল, ছেলেদের দল মেলায় আসছে যাচ্ছে—তাদের মুখে গান। হারুপ মেলায় এসব গান গাওয়া হয়। কেউ বলে 'টাঁড়গীত',

[শেষাংশ ২০ পৃষ্ঠায়]

ধর্মের লাঠি

রাসবিহারী দত্ত

ঠাঁই-ঠাঁই-ঠনক-ঠনাই-ঠাক, ঢাকে বোল ফুটছে। আর লাঠি খেলায় ঠক-ঠকানি-ঠক, ঠক-ঠকানি-ঠক আওয়াজ উঠছে। ক্রমে ক্রমে। দ্রুত তালে। কেঁপে কেঁপে উঠছে দৌলতপুরের হাট। মেলা দেখতে আসা কাতারে কাতারে মানুষ উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। এমন জমাটি খেলা নাকি আর কখনো হয় নি। হয় নি হারজিতের রগড়। কি তুবড়ি ফোটানোর বাহার। যেন লাল লাল পলাশ, রজনীগন্ধার ঝাড়, তারার ফুল, ঝলকে ঝলকে চলকে পড়ছে চারদিকে। উথলে উঠছে দু পাশের দর্শক। এ পাশের খেলা জমলে, ও পাশের দর্শকরা চুপ। ঠিক তেমনি ও পাশের খেলা জমে উঠলে ঝিম মেরে যায় এ পাশের দর্শকরা।

এ সবের মাঝে ব্যতিক্রম শুধু মরিয়ম।

খিলাফৎ মিঞার মেয়ে মরিয়ম। প্রতিপক্ষ দলের জয়ে সেই কেবল নিভে যায়। সে চায় না আমীরের দলের পরাজয় হোক। নামটি মনে আসা মাত্র শিহরিত হল সে। এ পাশ ও পাশ চোখ বুলিয়ে নিলে। কেউ যদি দেখে ফেলে, জেনে যায়! নিজেকে গুটিয়ে নেয়। সে ভালো করেই জানে তাদের প্রত্যেকের এই বিশেষ নামটি উচ্চারণ করা পর্যন্ত বারন। তবুও।

এমনিতেই মরিয়ম ইদানীং সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠেছে। এর জন্য তাকে কত কটাক্ষ, কত শাসন হজম করতে হয়েছে। তবুও মরিয়ম মরিয়া। এই মেলায় আসার জন্য বা-জানের কঠিন নির্দেশ. সে অগ্রাহ্য করেই এসেছে। জানে না বাড়ী ফিরলে কি ধরনের লাঞ্ছনা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

বা-জান খিলাফৎ যে খোদাবক্সর দলে, যাদের সঙ্গে আমীরের দলের দ্বন্দ্ব। খোদাবক্সেদের কাছে আমীর দু-চোখের বিষ। ভেতরে ভেতরে দু-দলের দলাদলি চিরকালই ছিল। কিন্তু তা ছিল আড়ালে আবডালে। সুপ্ত অবস্থায়। আমীরের দল সব সময়ই অবশ্য কোণঠাসা থাকত। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পাশা উল্টে গেছে। খোদাবক্সের মতে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে কেবল ঐ আমীরের জন্য।

আমীর, ঠিক এই সময়ই অনার্স পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফিরেছে। অখন্ড অবকাশ। আর সেই সময়ই পঞ্চায়েত নির্বাচনের তোড়জোড় চলছিল। কলেজে ছাত্ররাজনীতি করত। প্রগতিশীল ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বও দিয়েছে। নম্র স্বভাবের জন্য পাড়ায় প্রশংসা পেয়ে এসেছে চিরটাকাল। পড়াশুনায় যে ভালো তা তার অনার্স নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া থেকেই বোঝা যায়। দৌলতপুর গ্রামসভায় কমিউনিস্টরা কখনোই প্রার্থী পেত না। এহেন অবস্থায় আমীরকে পেয়ে সবাই খুশী। কেন না খোদাবক্সের দাপটে কেউই দাঁড়ানোর সাহস রাখে নি।

খবরটা রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। এতদিনের অসহায় অবদমিত মনে প্রাণের জোয়ার আসে। উত্তেজনা ছড়িয়ে যায় সারা দৌলতপুরে। তার প্রভাব গিয়ে পড়ে পাশাপাশি এলাকায়। সবার লক্ষ্য এসে জড়ো হয় দৌলতপুর গ্রামসভার উপর।

খোদাবক্সের মাথা ঘুরে যায়। দীর্ঘদিন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সে। প্রায় একাদিক্রমে আঠার বছর। সেই কবে যে একবার জনসাধারণের রায়ে নির্বাচিত হয়েছিল আজ কারো খেয়াল নেই। তারপর কোর্টের ইনজাংশন শাসনের মৌতাতের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা করেছিল। আমীরের দাঁড়ানোর খবর এখন জনরব। এমন খবরও রটেছে 'বক্সিমেও করতে পারে বটে আমীর'!

খোদাবক্সের সেই মুহূর্তে কলেজগুলোর উপর ভীষণ রাগ হয়। যেন ক্ষমতা থাকলে তক্ষুণি সে কলেজগুলি বন্ধ করে দিত। কি যাদু কে জানে! উঠতি যুবকরা কলেজে গেলেই কমিউনিস্টদের দীক্ষা নিয়ে ফিরে আসে। আর সেই স্বাধীনতার যুগের মাস্টাররা কি আছে! দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে খোদাবক্সের।

না, শেষ পর্যন্ত আমীরকে আটকানো যায় নি! অথচ মসজিদে সকলেই অন্যান্য বারের মত আল্লার নামে তার সামনে শপথ নিয়েছিল। ভোট দেবে খোদাবক্সের দলকে। কিন্তু এবার খবরটা ফাঁস করে দিয়েছিল কে যেন। তা আজও বের করতে পারে নি খোদাবক্স। আমীর তো একেই মূলধন করে বাজীমাৎ করে শেষটা।

খোদাবক্সের জাত শত্রু এখন আমীর। আমীরকে কোনমতে আসর থেকে সরাতে পারলেই বাজীমাৎ। বুকে শেল বিঁধিয়ে এখন আমরাই গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রধান। চৌকিদার দফাদাররা আর খোদাবক্সকে দেখে আসতে যেতে প্রণাম তো ঠোকেই না, এড়িয়ে যায়। রাস্তাঘাটে মানুষ-জন মাথা নোয়ায় না। এ কোনমতেই সহ্য হয় না। একের পর এক প্যাঁচ কষেও ফসকে যাচ্ছে।

দাঁতে দাঁত পিষেছে খোদাবক্স, যখন তাজিয়ার ভাগ শুরু হওয়ার কথা শোনে। এ যেন খোদাবক্সের ভিত ধরে নাড়া দেওয়া। আত্মতৃপ্তির ছোট্ট কুঠরি মসজিদটাও তার জারিজুরি থেকে কেড়ে নিতে চায় আমীর। সমস্ত শরীর রী রী করে ওঠে খোদাবক্সের।

খোদাবক্স তাজিয়ার ভাগ রুখতে পারে নি। দৌলতপুর হাটে এই প্রথম একই দৌলতপুরের দু-দুটো তাজিয়া। দুদিকে দুজন। আমীর আর খোদাবক্স। দিকবিদিকে খবর রটে যায়। তাই এবারের মেলায় অসংখ্য লোকসমাগম হয়েছে রগড় দেখবার জন্য। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে তারা।

খেলা বেশ জমে উঠেছে। এ পক্ষের এ লাঠি-খেলা দেখায়, তো ও পক্ষের ও। মরণপণ খেলা দুপক্ষই দেখাচ্ছে। মুহুর্মুহু হাততালি পড়ছে দর্শকদের মধ্য থেকে।

কিন্তু উৎকণ্ঠায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে মরিয়মের মন। একটা আশঙ্কা তাকে অক্টোপাশের মত ঘিরে রেখেছে। কেন না কাল রাতে সে তার বা-জানকে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলতে দেখেছে খোদাবক্সের সঙ্গে। আর যতবারই এমন গোপন শলা-পরামর্শ হতে দেখেছে ততবারই কোন না কোন অঘটন ঘটতে দেখেছে মরিয়ম, এবারের মহরম নিয়ে এত কান্ড। তাও আবার ঠিক মহরমের আগের দিন এভাবে বা-জানের সঙ্গে...। আমীরকে কোনভাবে খবরটাও পাঠাতে পারে নি সে।

বা-জানের মুখে কতবার শুনেছে, খোদাবক্স করতে পারে না এমন কাজ নেই। আজ আবার দু-পক্ষকেই নেশায় পেয়েছে। এমন সর্বনেশে ঝোঁক নিয়ে রেশারেশিতে নেমেছে, কখন না জানি কি হয়। আশঙ্কায় শিউরে শিউরে উঠছে মরিয়মের শরীর।

এমন সময় হর্ষধ্বনি ও হাততালিতে খোদাবক্সের দল ফেটে পড়তেই মরিয়ম সচকিত হয়ে তাকাল। দেখল রেজ্জাকের কাছে আমীরের দলের কামাল হেরে গেছে। চরম অপমানিত হয়েছে কামাল।

ব্যাপারটা কি ঘটল দেখতে আমীরও এসে দাঁড়িয়েছে। আমীরকে দেখামাত্রই মরিয়মের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। অনাস্বাদিত আলোড়ন সৃষ্টি হল সর্বাঙ্গে। কিন্তু মরিয়ম দেখল ঠিক এই মুহূর্তে একটা কালির পোছ আমীরের মুখে কে যেন লেপে দিয়েছে।

এদিকে রেজ্জাক তখনও আস্ফালন করছে। আর কে আছে একবার এসে লড়ে যাক। এমন সময় খলিল পাকানো বাঁশের লাঠি নিয়ে এগিয়ে এল।

আবার খেলা শুরু হল। শুরু হল আস্ফালন। খেলা জমে উঠল। দর্শকরা থেকে থেকে হাততালি দিচ্ছে।

মরিয়মের চোখ কিন্তু আমীরের দিকে। শান্ত, ঋজু, দোহারা চেহারা। মাজা রং। চোখে মুখে দীপ্ত ভাব। সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে স্বাভাবিকভাবে কথা বলা কি দেখা করা সম্ভব হয় না। আগে আকছার মরিয়ম আমীরের

যেত পড়া বুঝতে। কারণ আমীর আগাগোড়াই পড়াশোনায় ভালো। তাই বা-জানই একদিন মরিয়মকে নিয়ে গিয়ে আমীরকে অনুরোধ করেছিল যেন সে মরিয়মকে মাঝে মাঝে লেখাপড়া দেখিয়ে দেয়। মরিয়মও লেখাপড়ায় ভালো। আমীর গররাজি হয় নি খাটতে কম হবে বলে। আমীর কখনোই মরিয়মকে ফেরায় নি। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার পূর্বেই এই নির্বাচন এসে পড়ে। আমীরকে ঘিরে প্রশ্ন জাগে। খোদাবক্স সরাসরি বারন করে বা-জানকে। যেন মরিয়ম আমীরের বাড়ী না যায়।

মরিয়ম এতদিন যেত আসতো কোনদিন তার মনে কোন প্রকার ভাবনা-চিন্তা আসে নি। কিন্তু যেই বা-জান বারন করল সেই মুহূর্তে এক অপূর্ব অনুভূতি সারা শরীরে খেলে যায়। ডুকরে কেঁদে ওঠে সারা অন্তর। দুর্বার টান অনুভব করে মরিয়ম। ইচ্ছে হচ্ছিল তখনই একবার ছুটে গিয়ে আমীরের বাড়ী ঘুরে আসে। কিন্তু বা-জানের সতর্ক চোখ তাকে শাসন করে।

মনে আছে, মরিয়ম দুদিন ফুরসৎ পায় নি দেখা করার। তৃতীয় দিন আমীর নিজেই খোঁজ খবর নিতে এসেছিল। রক্ষে, সেই সময় বা-জান ঘরে ছিল না। আমীরকে সবকিছু খুলে বলেছিল। তারপর চোরাগোপ্তা দেখা হত। কেউই টের পেত না। এমনকি মেয়েদের মহলে মরিয়ম আমীরের হয়ে গোপনে নির্বাচনী প্রচার করেছে। এ পারের সব গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছে আমীরের কাছে। নমাজের সময় মসজিদের সেই শপথ পর্যন্ত। আমীর সেই কথাটাই মিটিং-এ বলে সবার মন জয় করে ফেলে। কানাঘুষায় শুনেছে আমীর নাকি সুন্দর বক্তৃতা করতে পারে। মরিয়মের ভারি ইচ্ছে করে একবার বক্তৃতা শুনতে কিন্তু সম্ভব হয় না।

এমন সময় আবার হাততালি ও উল্লাসে মরিয়মের তন্ময়তা ভাঙলো। দেখা গেল খলিল এবারও পরাজিত হয়েছে। লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে গেছে হাতখানা। প্রায় লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছে মাটিতে, আমীর ছুটে এসে ধরে ফেলে। আর চিৎকার করে বলে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সটা নিয়ে আসতে।

আমীর পরিপাটি করে খলিলের ক্ষত বেঁধে দিল। অন্যদের নির্দেশ দিল খলিলকে ধরে নিয়ে যেতে। তারপর ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে চারদিক একবার দেখে নিল। তার সমস্ত শরীরে তখন তপ্ত রক্তপ্রবাহ চলেছে। এতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে রেজ্জাকের অন্যায় লাঠিখেলা। কষ কষ করছিল আমীরের সারা শরীর। লক্ষ্য করছিল খোদাবক্সের ধূর্ত আত্মতৃপ্তি।

এবার চকিতে গা থেকে জামা খুলে ফেলল আমীর। তুলে নিল পড়ে থাকা খলিলের লাঠিখানা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। আহ্বান জানাল রেজ্জাককে। রেজ্জাক যেন প্রস্তুতই হয়েছিল এমনি ভাব। লাফ দিয়ে লাঠি ঘোরাতে শুরু করল। ঢাকে বোল ফুটল ঠাই-ঠাই-ঠনক-ঠনাই-ঠাক। সোল্লাসে চিৎকার করে ওঠে আমীরের পক্ষের দর্শকরা।

আমীরের এভাবে লাঠি হাতে নেওয়া দেখে অজানিত আশঙ্কায় আঁৎকে ওঠে মরিয়ম। উৎকণ্ঠায় এদিক ওদিক চায়। তার চোখ চতুর্দিক খুঁজে বেড়ায়। এমন কেউ কি নেই যে আমীরকে বারন করে। অস্বস্তিতে তার সর্বাঙ্গ কাঁপে।

এমন সময় আমীরের বা-জান কোথায় ছিল শুনতে পেয়ে হুড়মুড় করে দর্শকদের উপর পড়তে পড়তে সর্ব শক্তি দিয়ে চিৎকার করে ওঠে, না, আমীর না। এ সর্বনেশে খেলায় তুই যাস নি বাপ। এ মহরমের মিলনমেলা নয় বাপ, আল্লাকে সাক্ষী রেখে হিস্যার হিস্ হিসানি। এসবে তোকে জড়াতে দুবনি বাপ।

আচমকা এমন কান্ড দেখে খোদাবক্সের তৃপ্তির আনন্দে ভাটা পড়ে। এতক্ষণ সে প্রস্তুত হয়ে এই মাহেন্দ্র ক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু বৃদ্ধ বাপের বাধা তাকে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করল। অকূলে কূল পেল মরিয়ম। এমনি একজন কেউ এসে বাধা দিক অসহায় দৃষ্টিতে এইটাই এতক্ষণ চাইছিল।

কিন্তু খলিলের খুন আমীরকে অশান্ত করে তুলেছে। লাঠি খেলার অন্যায় রণ তাকে যারপরনাই আহত করেছে। ইদানিং কলেজে পড়াকালীন আমীর এসব খেলা খেলে নি। কিন্তু কলেজে যাওয়ার পূর্বে অন্য সবার মতো সেও লাঠি খেলত। শুধু সেই সাহসের উপর ভর করেই সে খলিলের লাঠি হাতে নিয়েছে।

বা-জানকে আশ্বস্ত করে লাঠি হাতে পুরোনো অভ্যেসটা ঝালিয়ে নিল বিদ্যুৎবেগে লাঠি ঘুরিয়ে সামনে পেছনে মাথার উপর, পায়ের নীচ দিয়ে, ডান হাতে, বাম হাতে। রেজ্জাকও অনুরূপ কসরতে নিজের পরাক্রম প্রকাশ করতে থাকল।

আমীরের বা-জান আবার অসহায়ের মত চিৎকার করে বলতে থাকল, ওকে থামাও, ওকে থামাও।

অসহায় মরিয়মও এই সময় একবার আড়-চোখে তাকালো খোদাবক্সের দিকে। দেখল খোদাবক্সের সারা মুখে হায়েনার হাসি। যেন শিকার হাতের মুঠোয় এমনিভাব। মরিয়ম আর স্থির থাকতে পারছে না। অস্বস্তিতে তার সারা শরীর কাঁপছে।

এমন সময় জনতার মধ্য থেকে হর্ষধ্বনি ওঠে। শিহরিত মরিয়ম দেখে লাঠিখেলার ফাঁকে কখন আমীর বেকায়দায় রেজ্জাকের লাঠির উপর চরম ঘা দিয়েছে। ছিটকে পড়েছে রেজ্জাকের লাঠি। খেলা ঠিকমত শুরুই হয় নি। এমন সময় এই অঘটনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে রেজ্জাক। আমীর নিজের লাঠির প্রান্ত দিয়ে রেজ্জাকের লাঠিটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল। নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে রেজ্জাক লাঠি হাতে তুলে নেয়।

ঢাকে পুনরায় বোল ফুটতে শুরু করল। আবার খেলা শুরু হওয়ার মুহূর্তেই সমস্ত আব্রু ভেঙে প্রচন্ড শক্তিতে চিৎকার করে ওঠে মরিয়ম। না, না, এ খেলা এখনই বন্ধ করতে হবে। তারপর গাছকোমর বেঁধে মরিয়ম বাঁশের বেড়া টপকে একেবারে দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো।

হতচকিত সবাই এমন দৃশ্য দেখে মুহূর্তে নিষ্পন্দ হয়ে যায়। ঢাকের কাঠি থেমে যায়। খিলাফৎ মিঞা মেয়ের এই অনাসৃষ্টি কান্ড দেখে পড়িমরি করে ছুটে আসে। আমীর সামনে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মরিয়মকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।

কিন্তু মরিয়ম মরিয়া। সে চিৎকার করে বলতে থাকে। এ কি মহরমের মিলন! এ ধর্মের লাঠি-খেলা নয়। খুনের ষড়যন্ত্র। পঞ্চায়েত প্রধানকে মহরমের নামে ওরা মারতে চায়। কথাকটি বলে হাঁপাতে থাকে মরিয়ম।

চারিদিকে একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। চাঞ্চল্যের ভাব ফুটে ওঠে সবার চোখে-মুখে।

আর তখন সওকত মিঞার বিলিতি হ্যাজাকের জোরদার আলো যেন মুহূর্তে নিবে এল খোদাবক্স মিঞার চোখের উপর।

উপস্থিত দর্শকদের আরো কিছুটা সময় লাগলো সমস্ত ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝে নিতে।

প্রমোদ দাশগুপ্ত-র সংক্ষিপ্ত জীবনী—(৫ পৃষ্ঠার পর)

১৯৭৭ সালে পঃ বঙ্গে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার তৈরি হবার পর সরকারী নীতি নির্ধারণ করবার জন্য বামফ্রন্ট কমিটি তৈরি হয়। প্রমোদ দাশগুপ্ত তার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন।

দাশগুপ্ত বেশ কিছুদিন থেকেই অসুস্থ ছিলেন। চিকিৎসার জন্য তিনি চীনে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। গত ২৭শে নভেম্বর তাঁর অবস্থার অবনতির সংবাদ পেয়ে পলিট ব্যুরোর সদস্য এম, বাসবপুন্নাইয়া বেইজিং-এ যান। ২৯শে নভেম্বর বেইজিং-এর সময় ১টা ৪৫ মিঃ (ভারতীয় সময় ১১টা ৪৫ মিঃ)-এ প্রমোদ দাশগুপ্তর জীবনাবসান ঘটে।

কবিতা

ফুলডুংরির ঈশ্বর

দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

ফুলডুংরির গা থেকে
রাস্তাঘাট সব ঝুলন হ'য়ে গেছে!
কাটা কোঁদা রচনাকরা—
শামুকবর্ণের আকাশে সেপ্টেম্বরের আগুন।
গোল গোল গেরুয়া সোনার পাথর
আর মিছরিঅভ্রের সঙ্কর দানা
ফুলডুংরির গলায় স্ফটিক-রুদ্রাক্ষের মত দুলছে!
রোদ্দুরে বনতুলসীর গন্ধবাটা হলুদের স্মৃতি আনে।
ওমিক্রনসেটি কি এখানেই
চুপি চুপি নেমে আসতো—
এক মুঠো পুণ্য ধুলো তুলে মাথায় ছুঁইয়ে দিলাম।
ফুলডুংরির ঈশ্বরের পদরেণু
অযুত নিযুত পাবো কোথায়!—

ছোট্ট ছেলের সঙ্গী

শমীন্দ্র ভৌমিক

ছোট্ট ছেলের সঙ্গী এখন দুধের বাটি,
ফিক্ ফিকিয়ে হাসির সাথে দাঁত দুপাটি।
মায়ের কোলের আদর এবং বাপির চুমো—
বলবে দিদি ভাইটি আমার একটু ঘুমো।
এই ছেলেটাই যখন যাবে ইসকুলে আর;
বন্ধু হবে রহিম, তিলু, পিন্টু-গোরার।
তখন সে কী ভাববে জানো? শিশির নামা—
সবুজ মাঠের হাতছানি কি ডাকছে আমায়?
ডাকছে তাকে ক্ষেতের কিষাণ আয়রে খোকা—
সোনার দেশের কাস্তে-ধানের গান শুনে যা।
ডাকছে তাকে কলের মজুর আয়রে মানিক;
হাতুড়ি আর ছেনির আওয়াজ শোন তো খানিক।
সেই ছেলেটাই সঙ্গী এখন তাদের পাশে,
সবুজ দেশের চাদর গায়ে রোদ-বাতাসে॥

যুবক শোনেনি

বীরেশ ঘটক

'অন্তর্গত জীবনের অন্ধি-সন্ধি জেনেছ কী'—
—যুবক শোনেনি

সম্প্রতি ক্ষয়াটে বুড়ো আরো খুব মধ্যরাতে
সবিস্ময় প্রশ্ন তুলে ধরেছিল,
যুবক শোনেনি
উদ্দিষ্ট তর্জনী দেখে ফেরায়নি চোখ

সে তখন ব্যস্ত ছিল, তুমুল উল্লাসে
দুইহাতে যৌবনের বেপরোয়া শিরা-তন্তু
শিমুলের তুলো, ক্রমশ উড়িয়ে দিতে আকাশ-গঙ্গায়

ক্ষুব্ধ বুড়ো অস্ফুটে বলেছে তাকে
যুবক নিবন্ধ হবে আকাশ-গঙ্গার চোরা,
অন্তর্মুখী পাকে

যুবক শোনেনি

ফুল হয়ে ঝরুক

মুজতবা আল্ মামুন

এক পেয়ালা বিষের বিনিময়ে
সক্রেটিস্‌কে যদি অস্বীকার করা যেত
তাহলে পিটিশন কোনদিন প্রটেক্ট হত না।

এক টুকরো ঢিলের আঘাতে
জোয়ারের উচ্ছ্বাসকে যদি রোখা যেত
তা হলে রক্তের ফোঁটা কোনদিন আগুন হত না।

হেমন্তের ঝরঝরে শপথ নেবার লগ্নে
তাই—
সমস্ত অভিশাপ ফুল হয়ে ঝরুক পায়ে পায়ে।
পাহাড় ভাঙার গান তো বুকেই রয়েছে॥

হাজারো যীশাস্ মরছে

(বেইরুটে ইস্রায়েলী বীভৎসতার বোবা ব্যথা বুকে নিয়ে)

শুভময় মণ্ডল

ছবিটা রক্তে এখনও হাতুড়ি পিটছে—
বোমায় ঝলসানো ককিয়ে উঠে দমকে যাওয়া
ছেলে কোলে বাপ ছুটছে—ছুটছে—ছুটছে......

হেবড় দাঁত বার করে হাসছে
লকলকিয়ে উঠছে ধর্ম-আইন-শান্তিরক্ষীদের তীক্ষ্ণতর শ্বদন্ত
যোসেফ্ ছুটছে—ছুটছে—ছুটছে......
হাজারো যীশাস্ মরছে—
বেইরুটের রাস্তায়, প্যালেস্টাইনের শরণার্থী শিবিরে
গুয়েতেমালায়, নামিবিয়ায়, এলসালভাদরে
সুক্ষ্মতর সভাবসনা পৃথিবীর শাঁখমাজা শান্তি-শীতল ক্রুশে।

ভূমধ্যসাগরের হাঙরের দাঁতে
ফেনিল গোলাপী লালা
জর্ডনের জল ভীষণ নিরুপায়
ললিত শান্তির লালমুখো শ্বেতপায়রা কালো ধোঁয়াগোলা আকাশে
উড়ে উড়ে ঠোঁটবাঁকা শকুন হোলো।
গলগাথা দিগন্তে করোটি ছড়াচ্ছে
হাজারো যীশাস্‌কে হাতের মুঠোয় পাবে বলে।

রং বদলায়

প্রণব মাইতি

পৃথিবীকে অন্যভাবে অন্য রঙে সাজাবো—প্রস্তাব নিয়ে
যে যুবক পথ হাঁটে—গৃহভুক মানুষেরা তাকে জানে উদাস বাউল...

হরিৎ পাতার রাজ্যে অন্যমনস্কতা ছিল তাই
দু'চারটে নষ্ট পাতা ঝরে ঝরে পথে পথে শব্দের সুষমা
একলা যুবক জানে পথের দু'পাশে সংগী রক্ত কৃষ্ণচূড়া
উদাস বাউল নয় ঘনিষ্ঠ প্রেমিক জানে রক্তের রং
রক্তের উজানে বুকে বেজে ওঠে মেঘের দামামা
পৃথিবীকে অন্য রঙে সাজানোর সদিচ্ছায়
প্রকৃতি সাজিয়ে দেয় জবাকুঞ্জ কৃষ্ণচূড়া পলাশ উৎসব

ঝরাপাতা শব্দ তোলে মুহূর্তে ছড়িয়ে দেয় ক্রমিক স্ফুলিঙ্গ
আগুনের দেশে যারা নীরব বাসিন্দা ছিল
একে একে জড়ো হয়—যুবকের স্বপ্নের স্বদেশে।

কলকাতায় নয়া থিয়েটার

মিট্টি কা গাড়ি, চরণদাস চোর এবং লালা সোহরৎ রাই, এই তিনটি নাটক নিয়ে ছত্রিশগড়ী নয়া থিয়েটার কলকাতার নাট্যরসিক মহলকে বিশেষভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে গিয়েছে। এর পূর্বেও একবার সরকার আয়োজিত উৎসবে এ'রা নাটক অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু তা এতো নাড়া দেয় নি, সম্ভবতঃ প্রচারের সীমাবদ্ধতার জন্য। বস্তুতঃ একটা সুসংবদ্ধ প্রচারযন্ত্র যদি কোনো নাটক বা সঙ্গীতকলা পরিবেশনের পিছনে সক্রিয় থাকে, তবে রসিকমহলের পক্ষে সেটায় যোগ দেওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে, সমস্ত পটভূমি বা বৈশিষ্ট্য না জেনেও; আসল আগ্রহী যারা তারা অনেক সময় নকল আগ্রহীদের চাপে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতেই পারেন না। কিন্তু সে কথা থাক্।

ছত্রিশগড়ী নাটকের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমার নেই। ছত্রিশগড়ী লোকযান, বা তার জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে আমোদস্ফূর্তির পরিবেশ, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় থাকা দূরদেশবাসীর পক্ষে সম্ভবও নয়। তবে কলকাতা শহরের অনেক জায়গায় যেখানে ঐ সমস্ত অঞ্চল থেকে আসা দিনমজুরেরা থাকে, একত্রে কাজ করে, তারা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে, কখনো বা হোলি উপলক্ষে কথকতার আসর বা গানের আসর বসায়। এই আসরগুলির জগঝম্প শব্দ, তীব্র গতিতে ধুয়া গাইবার সঙ্গে সঙ্গে উতরোল সঙ্গীত, একটা পরিবেশগত আপাত-সাদৃশ্য নিয়ে আসে চোখের সামনে। তা থেকে নিশ্চয় নাটকগুলি বিচার করার অধিকার জন্মায় না, জন্মায় না তার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান প্রমাণ করার অধিকারও। তবে বর্তমানে আলোচ্য নাটক তিনটির মধ্যে সেই লোকযান প্রবণতা কতখানি সার্থক হয়েছে, তার ক্রমান্বয় স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে বহির্ভারতে 'চরণদাস চোর'-এর সার্থকতার ভিত্তিতে। গেঁয়ো যোগী এতদিন ভিখ্ পায় নি, বিদেশ থেকে ঘুরে এসেও সে ভিখ্ পেলো না, পেলো রাজমুকুট! এ কথাটা ভেবে দেখা দরকার। যাই হোক, হাবিব তনবিরের নয়া থিয়েটার যে তিনটি নাটক পরিবেশন করলেন গত অক্টোবরে তার একটা ব্যক্তিগত মূল্যায়নের প্রচেষ্টায় এই আলোচনার অবতারণা।

'মিট্টি কা গাড়ি' বা মৃচ্ছকটিক সম্ভবতঃ সবচেয়ে সার্থক প্রযোজনা। অবশ্য এই সার্থকতার সূচনা সুপ্রাচীনকাল থেকেই। চারুদত্ত-বসন্তসেনার প্রেমকে অতিক্রম করেও সে যুগের রূঢ় বাস্তব, রাজা আর্যকের কারাবাস, পালকের অত্যাচার, রাজশ্যালক শকারের যথেচ্ছাচার, তার সঙ্গে সঙ্গে নারীধর্ষণ, নারীহত্যার এক অরাজক অবস্থা কিভাবে জনগণমনে বিদ্রোহের সঞ্চার করেছে, তার একটা সুস্পষ্ট ছবি এই নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন শূদ্রক। বিভিন্ন যুগে এই নাটক অভিনীত হয়েছে, তার উপর কালোপযোগী মাত্রা-সংযোজনও হয়েছে। এই নাটকটির বাস্তব পটভূমি যে একালেও কার্যকরী হতে পারে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিছুদিন পূর্বেও কলকাতার অন্যতম, বা বলতে গেলে প্রধানতম নাট্যসংস্থা 'বহুরূপী' এই মৃচ্ছকটিক নাটককে সার্থকভাবে প্রযোজনা করেছিলেন। তাঁদের প্রযোজনায় অবশ্য পান থেকে চুন না খসার মতো মূল্যানুসরণ অবিকৃত ছিলো। বলা বাহুল্য, নাট্যামোদী জনগণ, যাঁরা সমগ্র জনগণের উপরিতলস্থায়ী ননীর মতো, তাঁরা এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বর্তমান নাট্যকার হাবিব তনবির এই নাটকটিতে যে নতুন মাত্রা এনেছেন, তা সত্যিই আশ্চর্য। দরকারমতো গানের মাধ্যমে বা নৃত্যের মাধ্যমে, কখনো বা সমকালীন শব্দ যোজনা করে সমগ্র পটভূমিটিকে প্রত্যক্ষ ঘটমান বর্তমানে এনে 'মিট্টি কা গাড়ি'তে সত্যই মাটিতে নামিয়ে এনেছেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে কোনো বিশেষ নাগরিক পরিশীলনের অপেক্ষা না রেখে, চেহারা নিয়ে বা রূপসজ্জা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা না ঘামিয়ে, নাগরিক শ্রেণীবৈষম্যকে নানা কায়দায় ফুটিয়ে তোলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে তিনি যে মৃচ্ছকটিককে মাটিতে নামিয়ে এনেছেন, এটা তাঁর মস্ত কৃতিত্ব। বসন্তসেনার তীব্র সুউচ্চ কণ্ঠস্বরও আমাদের কাছে নিতান্ত পরিচিত জগতেরই আভাস নিয়ে আসে, গণিকাশ্রেষ্ঠার অপরিচিত অপ্সরোলোকে নিয়ে যায় না। চারুদত্তের সাদামাটা চেহারায় আমাদের পরিচিত ভদ্রলোকেরই ছাপ, ঠীরোদাও নায়কের কোনো ছাপই তাঁর মধ্যে নেই। সর্বোপরি জনগণের সুউচ্চারিত প্রতিবাদ বিদ্রোহের ধ্বনিকে স্পষ্টতর করে এনেছে, রাজনৈতিক বিপ্লবের ইঙ্গিতটুকুকে মূল নাটকের সঙ্গে অভিন্ন রেখেই কালোপযোগী করে তোলা হয়েছে, এটা নাট্য প্রযোজনার একটা মস্ত সাফল্য।

'মিট্টি কা গাড়ি'র অভিনয়ের পাশাপাশি 'চরণদাস চোর', যা নাকি সকলের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ, তার মধ্যে এই লোকযানের প্রভাবটি কেমন যেন মেকি মনে হয়েছে। প্রথম কথা, 'চরণদাস চোরে'র পরিচয় যে মানুষটিকে সামনে এনে হাজির করে, তার খাঁটি মনুষ্যত্ব বিচিত্র পরিবেশে এক বিচিত্র মুখোস খোলার কাজে সার্থক। গুরুর কাছে শিষ্যরা মন্ত্র নিতে চাইছে, তার জন্য তাদের চরিত্রশুদ্ধির প্রয়োজন। কিন্তু মাতাল মদ খাওয়া ছাড়বে প্রতিজ্ঞা করেও মদ ছাড়ে না, জুয়াড়ী প্রতিজ্ঞা করেও জুয়াখেলা ছাড়ে না, গাঁজাখোর গাঁজা ছাড়ে না প্রতিজ্ঞা করেও! মানুষের দুর্বলতা এখানেই। সে ভালো কাজ করবে প্রতিজ্ঞা করেও দেখতে পায় ভালো কাজ করা তার পক্ষে সহজ নয়, বরং বলা ভালো অপরের দৃষ্টিতে যেটা মন্দ সেটা পরিত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করা সহজ, কিন্তু নিজের কাছে ভাবের ঘরে চুরি সম্ভব নয়। গুরুরও ব্যবসা তাই, সে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়, যদিও জানে, যে এ প্রতিজ্ঞা পালন করা হবে না। চরণদাস এমন একজন মানুষ, সে নিজের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সৎ। সে চুরি ছাড়ার প্রতিজ্ঞা নিতে পারে না, কারণ চুরি তার জীবিকা। তবে কয়েকটা অসম্ভব প্রতিজ্ঞা করে, সোনার থালায় খাবে না, হাতিতে চড়ে যাবে না, রানীর পাণিগ্রহণ করবে না। চতুর্থ প্রতিজ্ঞা অবশ্য গুরু করিয়ে নেন, 'সদা সত্য কথা বলিবে।' চরণদাস প্রতিজ্ঞা করেছিলো জেনেশুনেই, যে এসব ঘটনা তার জীবনে কখনো ঘটবে না। সুতরাং সেটা প্রতিজ্ঞা হিসেবে কঠিন ছিল না। কিন্তু দেখা গেল, তার জীবনে সব ঘটনাই আশ্চর্যভাবে ঘটল এবং তার খাঁটি মনুষ্যত্বের প্রমাণ সে দিল প্রতিটি প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

কাহিনীটি নাকি রাজস্থানী লোকগাথায় আছে। চরণদাস চোরের চুরি অনেকটা রবিনহুডের মতোই, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। এর মধ্যে সে সরকারী খাজনা পর্যন্ত লুঠ করেছে, অবশ্য ইতিমধ্যে পুলিশের সঙ্গে তার 'জিগরি দোস্তি' হয়ে গিয়েছে। পরে যখন তাকে রানীর সামনে হাজির করা হয়েছে ঢোল সহরৎ করে তাকে সম্মান জানাবার অঙ্গীকার করে, তখন সে অক্ষরে অক্ষরে তার প্রতিজ্ঞা পালন করেছে। রানী তার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে সে সবিনয়ে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, ফলে নিষ্ঠুরা রানীর আজ্ঞায় তার মৃত্যু ঘটেছে। শহীদ চরণদাস চোর, unsung, unlamented হয় নি অবশ্য, তবে এখানেই তার সমাপ্তি।

যদিও দাবি করা হয়েছে নাটকটি সম্পূর্ণ লোকনাট্য তবু উপস্থাপনার বৈচিত্র্য অসাধারণ নাগরিক পরিশীলনের পরিচয় দেয়। নাটকের শুরু ও শেষ হবার প্রাক্কালে যে নৃত্য পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার গতির ক্রমবর্ধমান তীব্রতা, যাকে বলে cresendo একটা পরিণতিতে আসতে পারে নি চেষ্টা সত্ত্বেও। চরণদাস চোর তার বিচিত্র আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও convincing হয়ে উঠতে পারে নি, সম্ভবতঃ নাটকটির এটাই ত্রুটি। চরণদাস চোর চুরি করে, চুরি করা ছাড়া আর কিছু সে শেখেনি বলে তাকে চুরি করতে হবেই। এ একটা instinct-এর মতো। দয়ালু পুরোহিতকে সে বলে, 'থাকতে দিলে তোমার লোকসান হয়ে যাবে, কার্যত ঘটেও তাই। এই ছোট ছোট চুরি ক্রমে বড়ো চুরিতে পর্যবসিত, শেষে খাজনা লুণ্ঠনে পরিণত হয় পুলিস ও গুরুদেবের সাহায্যে। সত্য কথা বলার ফলে তার চুরির উপর খাজাঞ্চির বাটপাড়ি ধরা পড়ে যায়। রানীর জেরায়

এবং রাজপুরোহিতের বুদ্ধিমত্তায় খাজাঞ্চির বাট-পাড়ি ধরা পড়লে সত্যবাদী চরণদাস চোর তীব্র ঘৃণার সঙ্গে বলে, 'চোর কাঁহিকা'। অবশ্য তারপর থেকেই নাটক চলে গেছে অবাস্তব ঘটনাবলীর স্তরে। চরণদাসকে হাতির পিঠে চড়িয়ে রাজ-দরবারে নিয়ে যেতে চাইলে সে রাজি হয় না, ফলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাণী আদর করে সোনার ভোজনপাত্রে খাবার নিয়ে এসেছেন, সে রাজি না হওয়ার ফলে হয়েছে বন্দী। তারপর রানীর হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ ও তাকে ডেকে বিবাহ প্রস্তাব দেবার পর সে অস্বীকার করায় ফল সদ্যই মৃত্যু। সমগ্র নাটকটিই কমেডির ধারা থেকে এক মুহূর্তেই ট্র্যাজিডির মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। এই Tragi-comedie অথবা Comi-tragedy তে কিন্তু শিল্পরূপের দিক থেকে একটা মস্ত ফাঁক থেকে গেছে।

লালা সোহরৎ রাই নাটকটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এবং মলিয়ের-এর নাটকের ছাঁচে রচিত। 'দি বুর্জোয়া জেন্টলম্যান'-এর রসবোধের পটভূমি নীলরক্তবাস আমীরকুলের স্বভাবসঞ্জাত আমীরীর অক্ষম অনুকরণস্পৃহা কিভাবে নব-বণিক সম্প্রদায়কে প্রলুব্ধ করে এক সাংস্কৃতিক অনু-করণে প্রবৃত্ত করেছিল, তার ইতিহাস। লালা সোহরৎ রাই ব্যবসাদার মানুষ। হঠাৎ-ই (?) তার মনে জেগে ওঠে রইস আদমী হবার ঝোঁক। এই রইস আদমী হবার ঝোঁকে সে ধুতি পাগড়ী ছেড়ে প্যান্টালুন কোট ধরে। স্ত্রীর গালমন্দ তাকে প্রতিজ্ঞায় অটল রাখে। পরে কন্যার প্রণয়ী ও তার সহচরের যাদু চিকিৎসায় তার উন্নতি ঘটে, তাতে সে সাহেব সাজার অনুকরণ প্রচেষ্টা থেকে বিমুক্ত হয়ে আরো বেশি ক্ষমতা অর্জন করে। কার্যতঃ কন্যার বিবাহ সেই ছদ্মবেশী প্রণয়ীর সঙ্গেই ঠিক করে এবং কন্যার সম্মতি, তথা কন্যার মাতার সম্মতি পেয়ে তার মনে হয় সবাইয়ের স্থিরবুদ্ধি ফিরে এসেছে, 'সবকে থাকল আ গয়া'। অর্থাৎ সকলেই তার যুক্তি বুঝেছে।

সোহরৎ রাই-এর ভদ্র হবার প্রচেষ্টা হাস্যকর অসঙ্গতিতে আরো তীব্র আঘাত করেছে সম-কালীন জীবনের অনুকরণ প্রবৃত্তির প্রতি। বস্তুতঃ নাটকটি রাগবহুল। তা ছাড়া বাক্য-বিন্যাসের সূক্ষ্মতাতেই নাটকটির প্রকৃত আবেদন। যখন সাহিত্যের পাঠ শুরু হলো, তখন সোহরৎ রাই আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সারা জীবন পদ্যেতে কথা বলে এসেছি, কী আশ্চর্য!' মলিয়ের-এর এই বিখ্যাত রসিকতাটি কিন্তু উপযুক্ত মর্যাদা পেল না। আসলে এই ধরনের প্রযোজনায় slap stick comedy-র আকর্ষণ আরো বেশী হতো। সূক্ষ্ম রসরসিকতার ক্ষেত্র বোধহয় খুবই সীমিত; গণমঞ্চে সূক্ষ্মতার চেয়ে স্পষ্টতার আবেদনই বেশি। সে হিসেবে সোহরৎ রাই-এর 'সাহেব সাজা'র হাস্যকর অসঙ্গতি যেটুকু হাস্য উদ্রেক করে, সূক্ষ্ম রসবোধের সবটাই থাকে অনাস্বাদিত।

লালা সোহরৎ রাই-এর উপস্থাপনা ভঙ্গীতে প্রযোজক যথেষ্ট নাগরিক পরিশীলনের সহায়তা নিয়েছেন। মুখোসের ব্যবহারে গানের মধ্য দিয়ে এই প্রযোজনা গত কয়েক বছর ধরেই ব্রেখ্টীয় প্রভাব অনুযায়ী বাংলা নাটকে প্রয়োগ করা হচ্ছে। সে হিসাবে হাবিব তনবিরের এই প্রচেষ্টাটি নূতন না হলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তবে 'লালা সোহরৎ রাই'-এর আবেদনের গভীরতা উপস্থাপনার দিক থেকে অন্য দুটি প্রযোজনার মতো সাফল্যলাভ করে নি, তার কারণ বোধ হয় দর্শক সাধারণের সঙ্গে মানসিক ঐক্যের অভাব। সাধ হয় গ্রামীণ পরিবেশে এই নাটকটি অভিনীত হলে দর্শকদের কি রকম প্রতিক্রিয়া হয় দেখতে! সেখানে এই প্রযোজনা তার উপযুক্ত সম্বর্ধনা পেত নিশ্চয়।

হাবিব তনবিরের প্রধান কৃতিত্ব যে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে, সে কথা সকলেই বলেছেন। সাধারণ মানুষ, খেটে-খাওয়া, নাগরিক শিক্ষার উজ্জ্বল আলোর স্পর্শবিহীন, এ'রাই অভিনেতা-অভিনেত্রী। এ'দের নিষ্ঠা অতুলনীয়। অভিনয়-ক্ষমতা আশ্চর্য! নারী ভূমিকায় ফিদাবাঈ-এর মতো আশ্চর্য অভিনেত্রী যে কোনো মঞ্চের সম্পদ। চরণদাস চোর, লালা সোহরৎ রাই ও চারুদত্তের সখার ভূমিকায় যে অভিনয়দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা প্রথম শ্রেণীর। অভিনয়কুশলতা যে নাগরিক জীবনের অপেক্ষায় থাকে না, তা লোকজীবনের অবিশ্রান্ত ধারার মধ্যেই গড়ে ওঠে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল আরো একবার। নয়া থিয়েটারের অন্যান্য প্রযোজনা দেখবার সুযোগ হয় নি, আগ্রাবাজার ও বাহাদুর কালারিস-এর অভিনয় হয় নি এখানে। তবে এই তিনটি নাটক কলকাতার নাট্যামোদী সমাজকে অনেকখানি উৎসাহ ও তার সঙ্গে অনেকখানি আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার প্রেরণা দিয়ে গেছেন। তার ফল ফলতে দেরি হবে না নিশ্চয়!

আরতি গঙ্গোপাধ্যায়

হারুপ মেলার প্রাণকেন্দ্র ইঁড়গুনাথ

(১৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কেউ বলে 'কবিগীত'। গানের সুরে উদাসভাব থাকে বলে 'উধুয়া'ও বলা হয়। মানভূমে প্রত্যেক পরবের আলাদা গান আছে। করমগীত, টুসুগীত, ভাদুগীত, বাঁদনাপরবের গান—এসব শুনেছি বিস্তর। হারুপের গানের সঙ্গে টুসু-গীতের সামঞ্জস্য বেশী। এখন সেসব অনেক কমে যাচ্ছে। মানভূমী উপভাষার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে গানের অর্থ উদ্ধার করতে হোঁচট খেতে হয়।

আমি একটি দলকে পাকড়াও করলাম। সন্দ্রা ওরাং তার দলবল নিয়ে এসেছে বিহারের ইচাগড় থানার বোঁদাল গাঁ থেকে। তাঁরা একটি দীর্ঘ গান মাদল, বাঁশি, মৃদঙ্গ সহযোগে দোহারী করে গাইছে যার প্রথম দুটি চরণ হলো—

হামদের মন ভালো নাই গো—দিব কি,
তদের মতন লক ঘরেই রাখ্যেছি।...

হারুপ মেলার বেশীর ভাগ গান ছোট। দুটি বা চারটি চরণের বেশী নয়। একটি দল গাইছে—

সইন্দা বেলা যাবো যমুনার ঘাটে,
ওটা কে বটে লো কে বটে।

আরেকটি গান তারা গাইলো—

জলের তরী ডাঙায় চলে না,
শিমল ফুলে মধু মিলে না।

পাতকোমের ঘনু কালিন্দি গামছা মাথায় একটি

খালি গরুর গাড়িতে বসে গান জুড়লো—

মাথে ভিজলো না মাথের বেণী,
কত জল ওলো ডুব দিলি ধনি।

তার সঙ্গে সঙ্গীরা যোগ দিল। একজন গানের সঙ্গে আড়বাঁশী বাজাতে লাগলো। তাদের আরো একটি গান গাইতে অনুরোধ করলে তারা গাইলো—

লাল শাড়ি ঝলমল
কালো গায়ে সাঝিছে ভাল।

গান শেষ হলো। এদিকে সূর্যের তেজ কমে আসছে। অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে গেছে। এবার ফেরার পালা। ফিরবার পথে দেখি অজ্ঞান অবস্থায় ধরাধরি করে এক যুবককে নিয়ে আসছে কয়েকজন। জিজ্ঞেস করে জানা গেলো, ছোকরাটি দারু পান করে জ্ঞান হারিয়েছে। মেলায় ঘোরাঘুরির সময় কয়েকজনকে টলায়মান অবস্থায় অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে বলতে যেতেও দেখেছি। নিকুঞ্জ বললো, এ মেলায় মদ ও জুয়া দুই-ই চলে। মাঠের মাঝখানে গাছের ছায়ায় মানুষের জটলা দেখিয়ে বললো, ওখানে জুয়ার আসর বসেছে। দেহাতী মানুষরা যা কিছু পয়সাকড়ি এনেছে, ওখানে সব খুইয়ে বাড়ি ফিরবে।

লোকচিত্রকলা

শিল্পী : আদিনাথ মুখার্জী

প্রতীক্ষা

প্রসঙ্গঃ রক্তদান

রক্তের পরিমাণ শরীরে অত্যধিক কমে গেলে, স্বভাবতই শরীর অচলাবস্থায় পৌঁছয়। রক্তাল্পতা বেশি না হলে, ওষুধ বা নির্দিষ্ট প্রকার খাদ্যগ্রহণ করে শরীরে রক্তের উৎপাদন বাড়িয়ে অবস্থার সামাল দেওয়া যায়। কিন্তু, দুর্ঘটনার ফলে বড় বড় শিরা বা ধমনী কেটে গিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণে বা বিশেষ বিশেষ অসুখে শরীরে রক্তের পরিমাণ অনেক কমে গিয়ে যে গুরুতর রক্তাল্পতা দেখা দেয়, তাকে প্রতিরোধ করার জন্যে শরীরে বাড়তি রক্তের যোগান দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেহেতু রক্তের এখনও কোনও কৃত্রিম বিকল্প নেই, সেজন্যে এই বাড়তি রক্তের যোগান কেবল আরেকজন মানুষের শরীর থেকেই আসতে পারে। এখানে অবশ্য, যিনি রক্ত দেবেন, তাঁর মধ্যে উল্টে রক্তাল্পতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে না: কারণ, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে, একজন মানুষের শরীর থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্তই নেওয়া হয়, যা তাঁর শরীরের মোট রক্তের পরিমাণের এক সামান্য অংশ এবং যা আবার খুব কম সময়ের মধ্যেই শরীরে তৈরি হয়ে যায়। যেখানে রোগীকে এর বেশি রক্ত দেওয়ার দরকার পড়ে, সেখানে অবশ্যই তা আসে যৌথ সূত্র থেকে, অর্থাৎ একাধিক জনের দেহ থেকে। এবং এখানেই ব্লাড-ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা।

মৈনাক মুখোপাধ্যায়

'রক্তদান' ব্যাপারটির সঙ্গে আমরা কমবেশি সকলেই পরিচিত। একজন মানুষের শরীরে রক্তের পরিমাণ যখন কোনও কারণে অনেকটা কমে যায়, তখন আরেকজন মানুষের থেকে কিছুটা রক্ত নিয়ে প্রথম জনের শরীরে ঢুকিয়ে তাঁর অভাব পূরণ করা সম্ভব। এ জাতীয় পরীক্ষা প্রথম করা হয় পশুদের মধ্যে। ১৬৬৫ খৃস্টাব্দে এক পশুর রক্ত আরেক পশুর শরীরে প্রবেশ করিয়ে ডাঃ রিচার্ড লোয়ার রক্তদান বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায়টির সূচনা করেন। এরপর পশুর রক্ত মানুষের শরীরে এবং অবশেষে মানুষের রক্ত মানুষের শরীরে দিয়ে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়। এই সব পরীক্ষার প্রথম সার্থক ফলিত প্রয়োগ হল দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে—বৃহত্তর ক্ষেত্রে। যুদ্ধে আহত সৈনিকদের দেহ থেকে যে বিপুল পরিমাণ রক্ত ক্ষয় হতে থাকল, তা পূরণ করার জন্যে আক্রান্ত দেশগুলিতে তৈরি হল ব্লাড ব্যাংক। সুস্থ লোকের রক্ত ব্লাড-ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সংগ্রহ করে সৈনিকদের চিকিৎসা চলল। এবং এরই ধারাবাহিকতায়, আজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সুস্থ মানুষের রক্তে অসুস্থ মানুষের রক্তের অভাব পূরিত হচ্ছে, ব্লাড-ব্যাঙ্ক ও ছোটবড় স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা 'স্বেচ্ছাসেবা প্রতিষ্ঠান'গুলির মাধ্যমে।

রক্তকে বিশ্লেষণ করলে প্রধানত দুটি অংশ পাওয়া যায়—(১) হালকা হলুদ রং-এর তরল জলীয় অংশ বা প্লাজমা এবং তার মধ্যে সঞ্চারমান; (২) বিভিন্ন ধরনের কোষ বা কণিকা। মানুষের রক্তকণিকা মূলতঃ তিন রকম—লোহিত কণিকা, শ্বেতকণিকা এবং অণুচক্রিকা বা প্লেটলেট। হাড়ের ভেতর যে মজ্জা থাকে, সেখানে এই কণিকাগুলি উৎপন্ন হয়। লোহিতকণিকার মধ্যে থাকে হিমোগ্লোবিন নামে এক পদার্থ, যার সঙ্গে প্রশ্বাসে গৃহীত অক্সিজেন যুক্ত হয়ে রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে ধমনী দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে যায়। (এই অক্সিজেনযুক্ত হিমোগ্লোবিনের লাল রং-এর জন্যেই রক্তের রং লাল)। আবার, শারীরিক কলার শ্বসনকার্যে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড এই হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়েই শিরার মাধ্যমে ফুসফুসে আসে ও মুক্ত হয়ে নিশ্বাসে নির্গত হয়। এইভাবে, শরীরের বিভিন্ন অংশে কোষের শ্বসনের জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও তার ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সংবহনই রক্তের প্রধান কাজ। কোষের এই শ্বসনের ফলে উৎপন্ন হয় শক্তি, যা বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে ব্যবহৃত হয়ে দেহযন্ত্রকে সচল রাখে। শ্বেতকণিকাগুলি শরীরকে বিভিন্ন রোগজীবাণুর হাত থেকে বাঁচায় এবং রোগের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করে। আর, রক্তের তঞ্চন বা জমাট বাঁধার কাজে অণুচক্রিকা গ্রহণ করে নির্দিষ্ট ভূমিকা।

কাজেই, রক্ত আমাদের শরীরে অসীম প্রয়োজনীয় এবং অত্যাবশ্যক একটি পদার্থ। এই রক্তদানের কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্ত আছে। যে কোনও জায়গায়, রক্ত দেওয়ার সময় দাতাকে এই শর্তগুলি মেনে চলতে হয়। এবং তাহলে, দাতার কোনও রকম ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। দাতার বয়েস যেন ১৮ বছরের বেশি হয় এবং দেহের ওজন ন্যূনতম ৪৭·৫ কিলোগ্রামের বেশি হয়। বিগত ৩ মাসের মধ্যে তিনি যেন কোথাও রক্তদান না করে থাকেন। এছাড়া, রক্তদানের আগে একজন চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা ক'রে দেখেন তাঁর এমন কোনও রোগ আছে কিনা, যাতে রক্তদানের ফলে তাঁর নিজের বা গ্রহীতার কোনও ক্ষতি হয়। প্রতিবার রক্তদানের সময়, দাতার শরীর থেকে ২৫০ সি. সি. রক্ত নেওয়া হয়। উল্লিখিত শর্তাবলীর মধ্যে, এই ২৫০ সি. সি. রক্ত, যা দেহের মোট রক্তের (৫০০০ সি. সি.) মাত্র $\frac{১}{২০}$ ভাগ, দেহ থেকে চলে গেলে দাতার কোনও ক্ষতি হয় না। এবং স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতিতে এই পরিমাণ রক্ত শরীরে আবার মাস দেড়-দুয়েকের মধ্যেই তৈরি হয়ে যায়। যদি রক্তদান নাও করা হয়, তাহলেও এই রক্ত তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াটি শরীরে চলতেই থাকে। কারণ, মজ্জা থেকে তৈরি হওয়ার নির্দিষ্ট সময় (শ্বেতকণিকার ক্ষেত্রে কয়েকদিন থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত এবং লোহিত কণিকার ক্ষেত্রে ১২০ দিন) পরে এই কণিকাগুলি শরীরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়। এইভাবে রক্তের ধ্বংস এবং পুনরোৎপাদন স্বাভাবিক অবস্থাতেই চলে। কাজেই, রক্তদান শরীরে কোনও অপূরণীয় ক্ষতির সৃষ্টি করে না।

তঞ্চন রক্তের একটি স্বাভাবিক ধর্ম। শরীরের বাইরে এলেই রক্তের তঞ্চন বা জমাট বাঁধা শুরু হয়। এই কারণেই, কোনও জায়গা কেটে গেলে, কিছুক্ষণ পর ক্ষতস্থানের রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু, রক্ত দেহান্তরের প্রশ্নে এই তঞ্চনকে প্রতিহত করতে হয়। ব্লাড ব্যাংকে অনেক দাতার রক্ত একই সঙ্গে বেশ কিছু সময়ের জন্যে সঞ্চিত রাখতে হয়। যখন দান এবং গ্রহণ অল্প সময়ের মধ্যে হয়, তখনও রক্ত দেহের বাইরে যে সময়টুকু থাকে, সেই সময় তাকে তরল রাখার ব্যবস্থা নিতে হয়। এটা দু'ভাবে করা যায়—(১) স্বাভাবিকের চেয়ে কম তাপমাত্রায় রক্তকে সংরক্ষণ ক'রে অথবা (২) অ্যান্টিকোঅ্যাগুল্যান্ট জাতীয় যৌগ রক্তের সংগে মিশিয়ে। এই জাতীয় যৌগেরা রক্তের তঞ্চন বন্ধ রাখতে সাহায্য করে। তঞ্চন বন্ধ করা ছাড়া, আর যে একটি প্রশ্নের দিকে আমাদের নজর রাখতে হয়, তা হ'ল রক্তের গ্রুপ নির্ধারণ। লোহিত কণিকা এবং প্লাজমায় এক ধরনের প্রোটিন (অ্যাগ্লুটিনোজেন ও অ্যাগ্লুটিনিন)-এর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ওপর ভিত্তি ক'রে রক্তকে চারটি গ্রুপ বা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—এ, বি, এবি এবং ও। দাতার গ্রুপ এবং গ্রহীতার গ্রুপ এক না হ'লে দুই গ্রুপের প্রোটিনের মধ্যে বিপরীতধর্মী বিক্রিয়ায় রক্ত নষ্ট হয়ে যায়। রক্তের এই গ্রুপ বংশগতভাবে নির্দিষ্ট হয় না। বাবার গ্রুপ এবং ছেলের গ্রুপ আলাদা হ'তেই পারে। সেক্ষেত্রে, বাবার প্রয়োজনের সময়, ছেলে নিজের রক্ত বাবাকে দিতে পারেন না। প্রয়োজন হয় ব্লাড ব্যাংকের সাহায্য।

আমাদের দেশে, রক্তদান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে অহেতুক ভয় ও সংস্কার ভীষণভাবে কাজ করে। এবং মূলতঃ এই কারণেই, কেবল উন্নত দেশগুলির তুলনাতেই নয়, উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যেও রক্তদানের তালিকায় ভারতের স্থান অনেক নিচে। ভারতের বিভিন্ন জায়গার তুলনায় আবার পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে বেশ কিছুটা পিছিয়ে। উপযুক্ত বিজ্ঞানসচেতনতা ও সমাজের অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববোধের অভাবই এর প্রধানতম কারণ। শুধু সমাজের অন্য মানুষই বা বলি কেন, অনেক সময় নিজের আত্মীয়স্বজনের প্রয়োজনেও অনেকে নিজে রক্ত দেওয়ার আগে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে দেখেন, যদি

[শেষাংশ ২৪ পৃষ্ঠায়]

পাকস্থলীর ঝুলি

সরোজেন্দ্রমোহন ঘোষ

আমরা সাধারণত সব জিনিসপত্র স্টোর রুমে জমা রাখি। ঠিক এমনি একটি স্টোর রুম আমাদের শরীরের মধ্যেও রয়েছে। যখন যা কিছু খাচ্ছি, সে সব কিছু ঐ স্টোর রুমে গিয়ে জমা হচ্ছে। বস্তুতঃ পাকস্থলীকে স্টোর রুম হিসাবে চিহ্নিত করা বোধ করি অযৌক্তিক নয়। এই স্টোর রুমে খাদ্যবস্তু জমা হওয়ার পরে সেগুলিকে হজম করার দায়িত্বও নেয় স্টোর রুম রূপী পাকস্থলী। তবে হজম করার ব্যাপারে পাকস্থলীর এক সাগরেদ, নাম ক্ষুদ্র অন্ত্র(Small Intestine) খুব সাহায্য করে। পাকস্থলীর কাজ-কারবার সাধারণত 'প্রোটিন'কে নিয়ে। প্রোটিনকে ভেঙে পলিপেপটাইড্স তৈরী করে। কিন্তু এখানেও শেষ কীর্তির নায়ক ঐ সাগরেদ ক্ষুদ্র অন্ত্র। শুধু তাই নয়, 'কার্বোহাইড্রেটস', 'ফ্যাটস' এবং অন্য-ধর্মী সব খাদ্যের যত্নও ক্ষুদ্র অন্ত্র নিয়ে থাকে।

এই পাকস্থলীর চেহারা কিন্তু তাকিয়ে দেখবার মতো নয়। বাইরেটা দেখতে চকচকে ফেকাসে লাল। বুকের ঠিক নীচে পাঁজরার লাইনের সোজাসুজি উদরের সঙ্গে লাগাম বেঁধে থাকে। পাকস্থলী যখন খালি অবস্থায় থাকে, চেহারাটি হয় একটা চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো। ভরা থাকলে উপরের দিকটা মোটা দেখায় আর নীচের দিকটা লম্বাটে মনে হয়। কতকটা বাংলা ৫ অক্ষরটির মতো। ২০ থেকে ৩০ আউন্স খাদ্যবস্তু ধারণ করার ক্ষমতা পাকস্থলীর থাকে।

আমাদের শরীরকে সুস্থ এবং আরামদায়ক রাখার জন্য পাকস্থলীকে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে অনেক খাটুনির কাজ করতে হয়। পাকস্থলীর সীমা-রেখার মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ গ্রন্থি (Glands) লুকিয়ে আছে। এই গ্রন্থিগুলির কেউ তৈরী করে পেপসিন এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, কেউ তৈরী করে অ্যালকালি (Alkali), কেউ তৈরী করে পাচক রস। তাছাড়া পাকস্থলীর অন্ত্রকে বীজাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য আছে Payer's patches. কুড়ি থেকে তিরিশটি গ্রন্থি মিলে এই Patch তৈরী হয়।

গ্রন্থিগুলি দিনে ৪০ থেকে ৫০ আউন্স পাচক রস (Gastric Juice) রপ্তানী করে। এই পাচক রসে 'হাইড্রোক্লোরিক' অ্যাসিড বেশি থাকে। এই অ্যাসিড বা অম্লের সাহায্যে পাকস্থলী আর এক ধরনের রস নিঃসরণ করতে পারে। এটাকে 'এনজাইম পেপসিন' (Enzyme Pepsin) বলা যেতে পারে। পেপসিন জমা-খাদ্যবস্তুর প্রোটিন-গুলি হজম করতে শুরু করে। আমরা যে মাংস বা মাছের ফালি খাই একমাত্র পেপসিনই ওগুলোকে হজম করতে পারে। পাকস্থলী থেকে পেপসিন না বেরোলে আমাদের কষ্টের সীমা থাকতো না। পাকস্থলীর গ্লান্ডস অন্য আরেকটি 'এনজাইম'ও নিঃসরণ করে। এই এনজাইম-এর সাহায্য না পেলে ঘন দুধ হজম করা পাকস্থলীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হত। এই 'এনজাইমটি' ঘন দুধকে হজমকারি দইয়ে বা ঘোলে পরিণত করে। এন-জাইমটির নাম হল Renine. Lipase নামে অন্য একটি এনজাইম খাদ্যবস্তুর ফ্যাটকে অর্থাৎ চর্বিকে হজম করার দায়িত্ব নেয়।

যে খাদ্য আমরা খাই, স্তরে স্তরে সেগুলি পাকস্থলীর মধ্যে জমা হতে থাকে। প্রথমে জমা হয় বাগদা চিংড়ি জাতীয় খাদ্যবস্তু, তারপরে মাংস, তারপরে আলু এবং তরকারি, পরের স্তরেতে অন্য সব হাল্কা খাবার। পাকস্থলীর প্রথম কাজ শুরু হয় বাগদা চিংড়িকে নিয়ে। কারণ এই খাদ্যবস্তুটি প্রথম স্তরে একেবারে পাকস্থলীর সঙ্গে সেঁটে থাকে। ঝাড়ন যেমন উঁচুতে-নীচুতে ওঠানামা করে ঘর পরিষ্কারে সাহায্য করে, তেমনি পাকস্থলীর মাংসল পেশি-গুলির মধ্যেও ওই ধরনের সংকোচন শুরু হয়। পেশীর এই কর্মতৎপরতায় জমা-খাদ্যবস্তুটি পাচক রসে মাখামাখি হয়ে যায়। ফলে খুব তাড়াতাড়ি এগুলি একটি পুরু মণ্ডে পরিণত হয়। পাকস্থলী এই মণ্ডকে আস্তে আস্তে ঠেলে গতিনিয়ন্ত্রক কল-এর (Pyloric Valve) দিকে পাঠিয়ে দেয়। এই গতিনিয়ন্ত্রক কলটি কয়েক ফুট লম্বা ক্ষুদ্র অন্ত্রের (Small Intestine) প্রথম অংশের অর্থাৎ গ্রহণীর (Duodenum)মধ্যে মুখ খুলে দেয়। এই মুখটি হচ্ছে মারাত্মক। যদি পাচক রস বেশি পরিমাণে 'গ্রহণীর' মধ্যে ঢুকে পড়ে, তা হলে এই রস 'গ্রহণীর' দেওয়ালটি খেয়ে পথ করে নিতে চেষ্টা করে। সেইজন্য চিকিৎসকরা এই স্থানটিকে 'দূষিত ক্ষত' সৃষ্টি হওয়ার মোক্ষম জায়গা বলে চিহ্নিত করেছেন।

সাধারণতঃ গতিনিয়ন্ত্রক কলটি 'গ্রহণীর' মধ্যে স্বাভাবিক পরিমাণে খাদ্য ঢেলে দেয়। ফলে 'ক্ষারধর্মী-গ্রহণীর' তেমন কোনো অসুবিধা হয় না।

পাকস্থলী আলুর মণ্ডকে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই শায়েস্তা করতে পারে। মাংস হজম করতে একটু বেশি সময় নেয়, তরিতরকারি হজম করতে আরো খানিকটা বেশি সময় নিয়ে থাকে। কিন্তু কতটা সময়? সাধারণতঃ এটা কতকটা নির্ভর করে আমাদের মেজাজের ওপর। আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে মাত্র ৪টি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে পাকস্থলী তার হজম করার কাজ শেষ করে ফেলতে পারে। অবশ্য খাদ্যবস্তুর মধ্যে শাক থাকলে ওটা হজম করতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাদ্য খেলে পাকস্থলী কিছুটা বেকায়দায় পড়ে যায়। আমরা যদি কেউ সকালবেলাতে লবণজারিত শুকনো মাংস, মাখন সংযুক্ত ডিম এবং মাখন টোস্ট এক সঙ্গে খাই, তাহলে তখন পাকস্থলীর অবস্থা ভীষণ কাহিল হয়ে পড়ে। কারণ এই চর্বিযুক্ত খাদ্য পেটে গিয়ে 'গ্রহণী'কে উত্তেজিত করে এক ধরনের হরমোন তৈরী করতে বাধ্য করে। এই হরমোন পাকস্থলীর পেশী সংকোচনের স্বাভাবিক মাত্রাকে কমিয়ে দেয়। বোধ করি নিজের নিরা-পত্তার জন্য এটা হয়ে থাকে। তখন ঐ ধরনের একগাদা চর্বি হজম করা চারটিখানি কথা নয়। এটা হজম করতে করতেই দুপুরের খাওয়ার সময়টি এসে যায়। ফলে তখন পাকস্থলীকে বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হয়।

ঠাণ্ডাতেও পাকস্থলী অনেকটা ঠাণ্ডা মেরে থাকে। আমরা যখন অনেকটা 'আইসক্রিম' খেয়ে নিই, তখন তাপমাত্রা স্বাভাবিক ৯৯° ফারেন-হাইট থেকে ২০° ফারেনহাইটে নেমে আসে। এ সময়ে কিছুক্ষণ পাকস্থলীটি চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়। পরে আবার স্বাভাবিক তাপ ফিরে পেলে কাজ আরম্ভ করে। অবশ্য এতে খুব একটা ক্ষতি হয় না। মোটের উপরে পাকস্থলী কোন সময়েই হকচকিয়ে যায় না।

সত্যিকথা বলতে কি, পাকস্থলী অন্যান্য সঙ্গীদের চেয়ে বেশ খানিকটা সময় রিল্যাক্স করতে পারে। লিভার, হার্ট, ফুসফুস, কিডনি যখন ২৪ ঘণ্টাই কাজে ব্যস্ত থাকে, তখন পাকস্থলী রাতে আমাদের শোওয়ার আগেই তার কাজ প্রায় শেষ করে ফেলে। সুতরাং আমাদের ঘুমনোর সময়টিতে পাকস্থলীও ঘুমনোর সময় পেয়ে যায়।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, পাকস্থলী যখন অন্য সব ধরনের প্রোটিনকেই হজম করে ফেলতে পারে, তখন নিজের প্রোটিনকে নিজে কেন, হজম করে না। হজম করতে পারে না তার কারণ, পাকস্থলীর 'সীমানাটা' এক ধরনের নিরাপত্তা-মূলক শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত থাকে। এই 'আবরণ'টিকে যদি সরিয়ে নেওয়া যায়, তা হলে তক্ষুণি পাকস্থলী তার নিজের দেহটিকেই খেয়ে নেবে।

আমাদের মেজাজের সংগে পাকস্থলীর সম্পর্কটা কিন্তু নিবিড়। যদি আমরা রেগে লাল হই, পাকস্থলীও লাল হয়। যখন আমরা ভয়ে ভীত হয়ে বিবর্ণ হই, পাকস্থলীও বিবর্ণ হয়। ফুটবল ম্যাচ দেখতে দেখতে আমরা যখন উত্তেজিত হই, পাকস্থলীর তখন সংকোচনের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায়। তখন প্রায় তিনগুণ রস বেশি নিঃসরণ করে। কোনো খাবার দেখে আমাদের লোভ হলে, পাকস্থলীও কাজ শুরু করে দেয়। তখন আমাদের পেটের মধ্যে চিনচিন ব্যথা অনুভূত হতে থাকে। এটা খিদের ব্যথা।

আমরা বিমর্ষ হলে, পাকস্থলীর পেশীর সংকোচন প্রায় থেমে থাকে। তখন পাচক-রস ক্ষরণ হয় না। এই সময়ে খিদে পায় না। তবু আমরা অভ্যাসবশতঃ খেতে বসি। এই সময়ে খাদ্য হজম করা পাকস্থলীর পক্ষে মুশকিল হয়। আমাদের পেট ফাঁপে। তাই বিমর্ষ অবস্থায় আমাদের না খাওয়াই উচিত।

আমাদের মানসিক পীড়ন (Mental Stress) হলেও সমস্যা সৃষ্টি হয়। এই সময়ে খেলে বেশী অ্যাসিড তৈরী হয়। এটি অনেক সময় 'দূষিত ক্ষত' সৃষ্টি করে। তাই মানসিক অশান্তির সময় আমাদের খাদ্যাভ্যাস পাল্টানো উচিত। এ সময়ে হাল্কা ধরনের অল্প কিছু খাবার যদি আমরা খাই তা হলে বাড়তি অ্যাসিড অর্থাৎ অম্ল আর তৈরী হতে পারবে না।

অনেক সময় আমাদের মধ্যে অল্পস্বল্প দূষিত ক্ষত সৃষ্টি হয় অথচ আমরা সেটি বুঝতে পারি না। পরীক্ষার সময় বা অন্য কোনো সময়ে যখন আমরা অতিরিক্ত চিন্তা করতে থাকি, তখন আমাদের মধ্যে অ্যাসিড বেশি তৈরী হতে থাকে। এই অ্যাসিড যে কোন একদিন হয়তো পাকস্থলীর শ্লেষ্মা 'আচ্ছাদক'কে ক্ষত করতে পারে। অনেকে তখন ক্ষণস্থায়ী তীব্র পেটের ব্যথা অনুভব করেন। মনের অশান্তি বা অতিরিক্ত চিন্তা দূর হলে, অ্যাসিড উৎপাদন বন্ধ হয়, তখন পাকস্থলী নিজেই 'শ্লেষ্মা-আচ্ছাদকের' উপর রস টেনে ক্ষতটিকে সারিয়ে দেয়। আমরা তাই বাইরে থেকে ক্ষতর কথা টেরই পাই না।

দূষিত ক্ষত আর ক্যানসার ছাড়া পাকস্থলী অন্য কোনো আঁচড় বা ক্ষতকে তেমন আমল দেয় না। মাছের কাঁটার আচড়ে পাকস্থলীর দেহ ক্ষত হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাকস্থলী নিজেই সেটিকে সারিয়ে তুলতে পারে অথচ এ ধরনের ক্ষত চামড়ার উপরে হলে সেই ক্ষত সারাতে আমাদের প্রায় এক সপ্তাহ লেগে যেত। পাকস্থলীর পাচক রসের ক্ষমতা সাংঘাতিক। পাচক রসের মধ্যে দূষিত মাংস পড়লে জীবাণুগুলি প্রায় সংগে সংগে ধ্বংস হয়ে যায়। বুঝুন, পাকস্থলীর শক্তি কত। অবশ্য কতগুলি জীবাণু আছে যেগুলিকে ধ্বংস করার শক্তি পাকস্থলীরও থাকে না।

কতকগুলি খাদ্য পাকস্থলীকে খুব উত্তেজিত করে। যেমন ধনুন, গোলমরিচ, সরষে ইত্যাদি। এগুলির ছোঁয়া পেয়ে পাকস্থলী আগুনে লাল হয়ে ওঠে। এছাড়া কফি, নিকোটিন এবং অ্যালকোহলের স্পর্শ পেলে পাকস্থলী থেকে প্রচুর অ্যাসিড ক্ষরণ হতে থাকে। সেইজন্য বিশেষ করে, দূষিত ক্ষতের রুগীর এসব জিনিস খাওয়া উচিত নয়। তবে যারা সুস্থ তাঁরা একেবারে সব নেশা ছেড়ে দেবেন একথা বললে বোধকরি কেউ-ই শুনবেন না। ঠিক আছে, নেশা করুন তবে মাত্রা ঠিক রেখে।

পাকস্থলী যখন তখন ওষুধ খাওয়া বরদাস্ত করতে পারে না। প্রায় সব ওষুধই পাকস্থলীকে তিতিবিরক্ত করে। এমন কি খুব বেশি 'অ্যাসপিরিন' খেলেও পাকস্থলীর মধ্যে সূক্ষ্ম রক্তপাত ঘটতে পারে। অবশ্য এটা খুব মারাত্মক নয়। তবে বারবার হতে থাকলে পাকস্থলীর ক্ষতি তো হতেই পারে।

অ্যাসিড অর্থাৎ অম্লের মাত্রা কমানোর জন্য অনেকে সোডা খান। এটা খুব বেশি বা ঘনঘন খাওয়া উচিত নয়। কারণ এই ক্ষারধর্মী সোডা শরীরের রক্তধারার সংগে খুব তাড়াতাড়ি মিশে যায়। বেশি খেলে ক্ষারধর্মী রোগ সৃষ্টি হতে পারে। অম্লরোগের চেয়ে এটা আরো খারাপ। এই রোগ হলে ভীতিজনকভাবে কিডনির কাজের বোঝা বেড়ে যায়।

অজীর্ণ হলে পেটের মধ্যে গুড়গুড় শব্দ শুরু হয়। এটা হলে পাকস্থলী আর কি করতে পারে? কেউ যখন হঠাৎ বেশি খেয়ে নেন অথবা মাত্রাতিরক্ত অ্যালকোহল খান, তখন বমি করিয়ে দিয়ে খানিকটা বোঝা কমানো ছাড়া পাকস্থলী অন্য আর কিছু করতে পারে না। অবশ্য কখন বমি করাতে হবে সে সম্বন্ধে ব্রেন ইঙ্গিত পাঠালে তবেই পাকস্থলী বমি করানোর কাজে লেগে পড়ে। এ ব্যাপারের নায়ক হচ্ছে ব্রেন বা মস্তিষ্ক।

মাত্রাতিরিক্ত পান করলে বা খেলে অনেক সময় বুকজ্বালা বা বুক ব্যথা করে। এটার কারণ হল, এই সময় পাকস্থলীর 'গতিনিয়ন্ত্রক কলটির' (Pyloric Valve) মুখ ঠিকমতো খোলে না। ফলে পাকস্থলী শূন্যগর্ভ হতে পারে না। এই সময়ে ভেতরে গ্যাসের বুদবুদ সৃষ্টি হয় এবং এই বুদবুদগুলি উপরদিকে উঠতে শুরু করে। পাকস্থলীর অস্বস্তিকর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে সঙ্গে নিয়ে এই বুদবুদ নিম্ন-অন্ননালী পর্যন্ত ধাওয়া করে, ফলে স্বভাবতই তখন বুকজ্বালা করে এবং ব্যথা দেখা দেয়। এটা সাংঘাতিক কিছু নয়।

পাকস্থলীর আর একটি বড় সাগরেদ আছে। নাম হল বৃহদন্ত্র। মল, লবণ আর গ্লুকোজ শোষণ করার কাজ করে এই অন্ত্রটি। বৃহৎ অন্ত্র থেকে এক ধরনের তৈলাক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণের ফলে মল পিচ্ছিল হয়। ফলে মলত্যাগ করার সুবিধে হয়।

যাই হোক একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত, যদি কখনো তীব্র পেটের ব্যথা এক ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয়, তা হলে সেই মুহূর্তে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

পরিশেষে বলবো, পাকস্থলী সম্বন্ধে একটু সজাগ থাকলে, পরিবর্তে পাকস্থলী সারা জীবন আমাদের দেবে একনিষ্ঠ সেবা এবং নিরাপত্তা।

প্রসঙ্গ : রক্তদান (২২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ব্লাড ব্যাংক বা পেশাদার রক্তবিক্রেতাদের কাছ থেকে রক্ত যোগাড় ক'রে অবস্থার সামাল দেওয়া যায়। অথচ, এত ভয় পাবার প্রকৃত কোনও যুক্তিই নেই। চিকিৎসার অন্যান্য ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, শুধু রক্তের অভাবে কত লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন; আর আমরা সুস্থ সবল মানুষ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে রয়েছি—আমাদের শরীরে রক্ত তৈরি হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে, আবার তৈরি হচ্ছে, ঐসব রোগীদের, আমাদেরই সমাজের মানুষদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সামান্য একটু চেষ্টা, যা আমাদের সাধ্যের মধ্যেই, তা-ও করছি না। এই লজ্জা দূর হোক্। নিবন্ধের শেষে সমস্ত বিজ্ঞানমনস্ক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আমাদের আবেদন—রক্তদান সম্পর্কে অহেতুক ভীত না হয়ে, বিনা দ্বিধায় এগিয়ে আসুন; কোনও সন্দেহ বা প্রশ্ন থাকলে চিকিৎসকদের কাছ থেকে সঠিক উত্তর জেনে নিন। একজন মানুষের সুস্থতা, আরেকটি অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তোলার পথে সহায়ক হোক্।

এবারের এশিয়াড

১৯ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ১৬ দিনব্যাপী বিশাল ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সমীক্ষা কম কথায় সম্ভব নয়। এক টোকিওয় অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমস ছাড়া এই ধরনের বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এশিয়া ভূখণ্ডে আগে হয় নি—যে প্রতিযোগিতায় ৩৩টি দেশের প্রায় সাড়ে চার হাজার প্রতিযোগীর সমাগম—একুশ রকমের (মেয়েদের হকি পৃথকভাবে ধরলে ২২ রকমের এবং ওয়াটার পোলো ও ডাইভিং আলাদাভাবে ধরলে ২৪ রকমের) খেলাধুলোয় ৬০৭টি পদকের জন্য লড়াই এবং বোম্বাইয়ের আরব সাগরে ইয়াটিং ও জয়পুরের রামগড় লেকে রোয়িং নিয়ে ১৮টি ক্রীড়াকেন্দ্র প্রায় দিনরাতের হরেক রকমের খেলাধুলোয় তার বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ করে লিখতে গেলে বেশ বড় আকারের হয়ে যায়। তা ছাড়া দৈনিক সংবাদপত্রে সব খবরই প্রকাশিত হয়েছে। (ক্রীড়ানুষ্ঠান যেমন বিশাল ও ব্যাপক তেমন তার প্রচারও হয়েছে ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে।) খেলাধুলোর এমন প্রচার আমাদের দেশের সংবাদপত্রে আগে হয় নি। আর মাসিক পত্রিকাতে সে সুযোগও নেই। তাই বিশেষ বিশেষ কয়েকটি বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতের মেয়ে এম. ডি. বালসাম্মা ৪০০ মিটার হার্ডল রেসে সোনা জেতার পর পদক হাতে দর্শকদের সামনে

নবম এশিয়ান গেমসে আমরা দেখলাম জাপানের ত্রিশ বছরের প্রাধান্য একটু খর্ব করে এশিয়ার খেলাধুলোয় চীন শীর্ষ স্থানটি দখল করে নিয়েছে। যদিও দুই দেশের অর্জিত পদকের সংখ্যা সমান তবু বেশি সোনার পদক জয়ের সুবাদে চীন পেয়েছে শীর্ষস্থান। অনেকটা অলিম্পিক গেমসে রুশ-মার্কিন প্রাধান্যের লড়াইয়ের মতো। সোভিয়েত ইউনিয়ন বহুকাল অলিম্পিক গেমস থেকে দূরে সরে ছিল। '৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যোগ দিয়ে বিশ্ব খেলাধুলোয় শীর্ষদেশ যুক্তরাষ্ট্রের শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াল এবং ক্রমে ক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের গরিমাও ম্লান করে দিল। চীনও অংশ নেয়নি প্রথম ছয়টি এশিয়ান গেমসে। '৭৪ সালে তেহরাণ এশিয়াডে প্রথম যোগ দিয়ে দখল করল দ্বিতীয় স্থান। জাপান মোট পদক পেয়েছিল ১৭৬টি, চীন ৮৯টি। ব্যাংককে পরের গেমসে ব্যবধান অনেক কমে গেল। জাপানের পদক সংখ্যা ১৭৮, চীনের ১৫১। এবার তো তালিকায় দেখা যাচ্ছে দুদেশেরই ১৫৩টি করে। আশা করা যায় চার বছর পরে দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে অনুষ্ঠিতব্য দশম এশিয়াতে শুধু সোনার হিসাবে নয়, তিন রকমের পদকের হিসাবে চীন বেশ পেছনে ফেলবে জাপানকে।

অন্যান্য বারের তুলনায় এবার ভারত বেশি পদক পেলেও ফল প্রত্যাশিত নয়। আয়োজনকারী দেশের প্রতিযোগীদের কিছুটা বাড়তি সুযোগ থাকে। সব ইভেন্টেই যোগ দেয়। প্রতিযোগীর সংখ্যাও থাকে বেশি। সেই হিসাবেই সংগ্রহ বেশি। চার বছব আগে ব্যাংকক এশিয়াডে ভারতের অ্যাথলিটরাই পেয়েছিল ৮টি সোনার পদকসহ ১৮টি পদক। দেশের মাটিতে এবং চার গুণ বড় অ্যাথলিট দলের এবারে সংগ্রহ ৪টি সোনা, ৯টি রুপো ও ৮টি ব্রোঞ্জ। দু'বছর ধরে

মানিক ব্যানার্জী

নিবিড় অনুশীলনের পর এই ফলাফল হতাশ ব্যঞ্জক। পদক না পেলেও উন্নতির কিছুটা স্বাক্ষর রেখেছে সাঁতারুরা। বিদেশীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দশটি ইভেন্টে জাতীয় রেকর্ড ম্লান করে নিয়েছে। বক্সারেরাও কিছুটা উন্নতি করেছে একটি সোনা, দু'টি রুপো ও তিনটি ব্রোঞ্জ পদক জিতে।

অ্যাথলেটিকস, সাঁতার, আর্চারি, সাইক্লিং, শুটিং, ওয়েটলিফটিং প্রভৃতি মিলিয়ে যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৮১টি গেমস রেকর্ড হয়েছে, একটি বিষয়ে একাধিক প্রতিযোগীর রেকর্ড ম্লান করা হিসাবের মধ্যে ধরলে আরও অন্তত কুড়ি-পঁচিশজন আগের রেকর্ড পার হয়ে গেছে। দু'টি তিনটি সোনার পদক তো অনেকেই গলায় পরেছে। চারটি, এমন কি পাঁচটি পদক পরারও নজির আছে। যেমন উত্তর কোরিয়ার শুটার গিলমান সো এবং জাপানের ষোড়শী রানার হিরোমী ইসোজাকি।

পিস্তল শুটিংয়ে উত্তর কোরিয়ার ২৯ বছর বয়সী প্রতিযোগী গিলমান সো পেয়েছে পাঁচটি সোনার পদক। একটি ৫০ মিটার ফ্রি পিস্তলে, একটি র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তলে, একটি এয়ার পিস্তলে, একটি ২৫ মিটার সেন্টার ফায়ার পিস্তলে এবং একটি দলগত ইভেন্টে। জাপানের ১৬ বছরের স্কুল ছাত্রী হিরোমী ইসোজাকি চারটি সোনার পদক পেয়েছে দৌড়ের কৃতিত্বে। ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে এবং ৪০০ ও ১৬০০ মিটার রিলে দৌড়ে।

পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড়ে সোনাবিজয়ী রবুয়ান পিট দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন

জিমন্যাস্টিকসের একটি বিষয়ে দশ পয়েন্টের মধ্যে দশ পয়েন্ট পাবার কৃতিত্ব সহ চীনা মেয়ে জিয়ান উ তিনটি সোনা পায় আনইভন বার, বিম ব্যালান্স ও দলগত প্রতিযোগিতায়। সাঁতারে তিনটি সোনার পদক পায় দক্ষিণ কোরিয়ার ১৫ বছরের স্কুল ছাত্রী ইয়ুন হি চোই। নতুন রেকর্ডের কৃতিত্বসহ সে বিজয়ী হয় ১০০ এবং ২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক এবং ২০০ মিটার মেডলি রিলেতে। উল্লেখ করার ঘটনা, ইয়ুন হি চোইয়ের দু'বছরের বড় বোন ইয়ুন জাং চোই ওই তিনটি ইভেন্টেই রুপো জেতায় দুই বোন দিল্লি থেকে নিয়ে গেছে ৬টি পদক। পারিবারিক ক্ষেত্রে এমন সাফল্য আছে পাকিস্তানের আভেরি দম্পতির, ভারতের উনাওয়ালা ভাইদের। বৈরাম আভেরি ও তাঁর সহধর্মিণী গসপি আভেরি পাকিস্তানকে প্রথম সোনার পদক দেন ইয়েটিং-এর এন্টারপ্রাইজ ইভেন্টে। ওই ইভেন্টেই রুপো জেতেন ভারতের জি ডি উনাওয়ালা ও ফলি উনাওয়ালা।

এশিয়ার ক্ষিপ্রতম ছেলে ও ক্ষিপ্রতমা মেয়ের সম্মান পেয়েছে যথাক্রমে মালয়েশিয়ার রাবুয়ান পিট ও ফিলিপিনসের লিডিয়া ডি ভেগা—১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। জলে ক্ষিপ্রতম সিঙ্গাপুরের ছেলে পেন সিয়ং অ্যান এবং জাপানের মেয়ে কায়রী ইয়ানাসে। ইয়ানাসেই এশিয়ার প্রথম মেয়ে, যে এক মিনিটেরও কম সময়ে ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতার কেটেছে।

হাইজাম্পে প্রায় বিশ্বমানে পেশছে গেছে চীনা ছাত্র জ্ জিয়ান হুয়া। সাংহাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই উনিশ বছরের ছাত্রটি হাই জাম্পে বিশ্ব রেকর্ডের লক্ষ্যে ২·৩৬ মিটার অতিক্রম করতে না পারলেও ২·৩৩ মিটার অতিক্রম করে এশিয়ার অ্যাথলেটিকসে নতুন নজির গড়েছে। শক্তির পরীক্ষায় সব চেয়ে সাধুবাদ আদায় করেছে ভারতের শটপুটার বাহাদুর সিং এবং জাপানের হ্যামার থ্রোয়ার শিগেনোবু মুরোফুসি। দু'জনের প্রায় একই ধরনের ভূমিকা। বাহাদুর সিং আট বছর আগে তেহরাণ এশিয়াডে রুপোর পদক জেতে ১৭·৯৪ মিটার দূরে লোহার বল ছুঁড়ে। চার বছর আগে ব্যাংকক এশিয়াডে সোনা জেতে ১৭·৬১ মিটার দূরত্বে। এবারেও সোনা জিতেছে নতুন গেমস রেকর্ড করে। লোহার বল ছুঁড়েছে ১৮·৫৩ মিটার দূরে।

অ্যাথলেটিকসের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় সোনা বিজয়িনী চীনের চেন-ইয়াং এন

অবশ্যই বাহাদুরের চেয়ে অনেক বেশি বাহাদুরি শিগেনোবু মুরোফুসির। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। পর পর চারটি এশিয়াডে সোনা জিতল। '৭০-এর ব্যাংকক এশিয়াডে হ্যামার ছুঁড়েছিল ৬৭·০৮ মিটার দূরে, '৭৪-এ তেহরাণে ছুঁড়েছিল ৬৬·৫৪ মিটার, '৭৮-এ ব্যাংককে ৬৮·২৬ মিটার এবং এবারের দূরত্ব ৭৩·০৪ মিটার। মান ধরে রাখাই শুধু নয়, ৩৭ বছর বয়সী একজন অ্যাথলীটের পক্ষে মান-এর এই উন্নতি প্রায় অবিশ্বাস্য। সঙ্গত কারণেই মুরোফুসি দিল্লি এশিয়াডে সেরা অ্যাথলীটের সম্মান পেয়েছে।

ভারতীয় মেয়ে এম. ডি. বালসাম্মার কৃতিত্ব উল্লেখের দাবী রাখে। এশিয়ান গেমস-এর রেকর্ড তালিকায় ভারতের কোনও মেয়ের নাম ছিল না। এই মেয়েটি প্রথম নাম তুলল ৪০০ মিটার হার্ডল রেসে ৫৮·৪৭ সেকেন্ড সময় করে।

উন্নতমানের শ্বাসরুদ্ধকারী বেশ কিছু খেলার জন্যও দিল্লি এশিয়াড স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যেমন বাস্কেটবল ফাইনালে তীব্র উত্তেজনার মধ্যে চীন-এর বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার ৮৫-৮৪ পয়েন্টে জয়। ওয়াটারপোলোর ফাইনালে জাপানের বিরুদ্ধে চীন-এর জয় ১১-১০ গোলে এবং তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক খেলায় সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ভারত দলের জয় ৮-৭ গোলে। এই খেলাধুলোতে সোনা ও রুপোর মধ্যে পার্থক্য ছিল এক চুল। ব্যাডমিন্টনের সিঙ্গলস ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার লিয়েম সুই কিং-এর কাছে প্রথম গেমে ০-১০ এবং দ্বিতীয় গেমে ৪-৮ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েও চীন-এর হ্যান জিয়ানের খেতাব জয় সংগ্রামী শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসী উঁচু মানের খেলার পরিচায়ক।

যেহেতু ব্যাডমিন্টন এবং টেবল টেনিসে এশিয়াই বিশ্বশ্রেষ্ঠ সেহেতু উঁচু মানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু যে খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়ার ভেরা ক্যাসলাভসকা, সোভিয়েত ইউনিয়নের ওলগা করবুট, রুমানিয়ার নাদিয়া কোমানিচি প্রভৃতি বিশ্ববন্দিতা সেই জিমন্যাস্টিকসে চীন, জাপান ও কোরিয়ার মেয়েরা ইন্দ্রপ্রস্থের ইনডোর স্টেডিয়াম মাতিয়ে তুলেছে শৈলী, সৌন্দর্য এবং দেহছন্দের চরম বিকাশে। ডাইভিংয়ের প্রতিযোগিতাও ছিল উঁচু দরের। যাঁরা স্টেডিয়ামে উপস্থিত থেকে দেখেছেন তাঁদের চেয়ে নিশ্চয়ই ভাল দেখেছেন টেলিভিশনের সামনে বসে থাকা দর্শক স্লো মোশান ছবিতে। শূন্যে দেহটি তুলে সংহত শক্তির প্রক্রিয়ায় একবার বাঁ দিকে এবং একবার ডান দিকে দেহ ঘুরিয়ে সামারসল্ট খাওয়া প্রচুর অনুশীলন এবং বহু সাধনার ব্যাপার।

ফুটবলে চীনের বিরুদ্ধে ভারতের উজ্জীবিত ক্রীড়াধারা দেখার পর মনে হয়েছিল ভারত হয়তো সৌদি আরবকে হারাতে পারবে। চীনের বিরুদ্ধে ভারত খেলেছে ঝড়ের গতিতে। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে যখন ভারতীয় দল এক-শূন্য গোলে পিছিয়ে। খেলা শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যে ভারত শুধু গোলই শোধ করে নি, মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে আরো একটি গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল, শেষ মুহূর্তে রক্ষণভাগের ত্রুটিতে ভারতকে খেলা শেষ করতে হয়েছে ২—২ গোলে। চুয়াত্তর সালে তেহরানে চীনের কাছে ১—৭ গোলের পরাজয়ের যে গ্লানি বা ব্যর্থতা তা মুছতে না পারলেও ভারত যে সেদিন চীনের বিরুদ্ধে ভালো খেলেছে সেটা সবাই স্বীকার করবে।

চীনের বিরুদ্ধে ভারত যা খেলেছে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে ভারতের খেলা দেখে মনে হয়েছে সৌদি আরবের খেলার ফাঁদে তারা যেন নিজেরা জড়িয়ে পড়েছে। সৌদির ছেলেরা ছোট ছোট পাসের সাহায্যে আক্রমণ রচনা করেছে। তাদের পায়েতেই বল ঘুরেছে বেশী। আর বল নিয়ে বেশিক্ষণ খেললেও ঢিমেতালে খেলার ফলেই তাদের পক্ষে ভারতীয় রক্ষণভাগে ফাটল ধরানো সম্ভব হয় নি। শ্লো প্যাটার্ন উইভিং ফুটবলের বদলা হিসেবে আশা করেছিলাম ভারতীয় খেলোয়াড়েরা কিছুটা দ্রুতলয়ে আক্রমণ করবে, চেষ্টা করবে উইং দিয়ে আক্রমণ রচনা করে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে ফাটল সৃষ্টি করতে। ভারত কিন্তু সে পথে এগোল না। বরং সৌদি আরবের খেলাকেই অনুকরণ করার চেষ্টা করল। আর দক্ষতার ঘাটতি বা ভুল পাসিং-এর ফলে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা বেশিক্ষণ পায়ে বল রাখতে পারে নি। প্রথমার্ধে ভারতীয়

এবারের এশিয়াডে নতুন ইভেন্ট হেপ্টাথোলনে প্রথম পুরস্কার বিজয়িনী চীনের পেতসু-ইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারিণীদের বিজয় মঞ্চে দেখা যাচ্ছে

খেলোয়াড়েরা শুধু মাঠে ছোটাছুটিই করেছে। আর সৌদি আরবের খেলোয়াড়েরা ছোট ছোট পাসে খেলায়, ভারতীয় খেলোয়াড়েরা ক্লোজ মার্কিং করতে গিয়ে পরিশ্রান্তও হয়ে পড়ে। সৌদির ছেলেরা কিন্তু বেশিক্ষণ পায়ে বল রেখেও গোল করতে পারে নি। কারণ গোল করতে হলে যেটা সবচেয়ে বড় কথা সেই গতি নিশানা ও জোরালো শট কোনটাই তাদের ছিল না। বল অধিকাংশ সময় মাঝ মাঠেই বেশী ঘোরাফেরা করেছে। আর সৌদি আরবকে যেমন কোন কঠিন শটের সম্মুখীন হতে হয় নি, তেমন ভাস্করকে মাত্র একবারই ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা বল ধরতে হয়েছে।

বাংলাদেশ ফুটবল দল বিশেষ সুবিধে করতে পারে নি। আর মালয়েশিয়ার যে দলটি এবারে খেলতে এসেছিল তাদের অধিকাংশ খেলোয়াড়েরা শুধু অল্প বয়স্কই নয়, আন্তর্জাতিক ফুটবলে এদের অভিজ্ঞতাও কম।

এবারে এশিয়ান গেমসে জাপান ও ইরাকের খেলা দেখে মনে হয়েছে দু'বছর আগের তুলনায় দু'টি দলই অনেক পরিমার্জিত। গত বছর মারডেকায় এই ইরানের কাছে জাপান হেরেছিল ২—০ গোলে। সেই দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই রয়েছে এবারের জাপান দলে। আক্রমণ ভাগে মাত্র একজন বা প্রয়োজনে দু'জন খেলোয়াড় রয়েছেন। আক্রমণকে জোরদার করা হচ্ছে পেছন থেকে। আর আক্রমণভাগের ওই এক বা দুই খেলোয়াড় দুই প্রান্তে ছুটে গিয়ে নিচে থেকে

উঠে আসা খেলোয়াড়দের আক্রমণ করতে সাহায্য করছে। সবচেয়ে ভালো লেগেছে দ্রুতগতি কাউন্টার অ্যাটাকগুলি। জাপান বিশ্বজয়ী ইতালির ধাঁচে খেলার চেষ্টা করেছে।

কুড়ি কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাওয়ার পরমুহূর্তে চাঁদরাম নেহরু স্টেডিয়ামে প্রবেশ করছেন

জাপানের তাকাসি নাগো পুরুষদের ৪০০ মিটার হার্ডল রেসে সোনা জিতছে

কুয়েতের এবারে বিশ্বকাপের মোট সাতজন খেলোয়াড় দিল্লীতে এসেছিলেন। তবে প্রথম এগারজনের মধ্যে নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন তিনজন। কুয়েতের খেলার ধরন অনেকটা পেশাদারী ঢং-এ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাটতে খেলোয়াড়েরা রাজী নন। আর খেলার রাশ ধরতেও তাঁরা কিছুটা অভ্যস্ত। নিজেদের প্রয়োজনে তাঁরাই খেলার গতি পরিবর্তন করেছেন।

সেমিফাইনালে চারটি দলের মধ্যে তিনটি ছিল আরব দেশের। কুয়েত, ইরাক ও সৌদি আরব ছাড়া আর যে দল সেমিফাইনালে উঠেছিল তারা হলো উত্তর কোরিয়া। গত বছর উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যুগ্মবিজয়ী হিসেবে ট্রফি লাভ করেছিল। এবার দক্ষিণ কোরিয়া কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারে নি। দক্ষিণ কোরিয়ার যে গলদ ইডেনে দেখেছিলাম এবারও দেখলাম দ্বিতীয়ার্ধে রক্ষণভাগে সেই বিপর্যস্ত ভাব। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইরান তিনটি শক্তিশালী দল একই গ্রুপে থাকায় তিনটি দলকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান ও জাপানের কাছে হেরেছে, অথচ শেষ দিনে জাপানের বিরুদ্ধে, দু'গোলে জিতলে তাদের সম্ভাবনা ছিল কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার। কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে গোল করে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়া পরাজিত হয়েছে, আর সেই সঙ্গে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়াকে।

দক্ষিণ কোরিয়ার মতো উত্তর কোরিয়ার খেলোয়াড়েরাও দ্রুতগতিতে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। আক্রমণভাগ, মিডফিল্ড ও ডিপ ডিফেন্সের যোগসাজসে প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ হানার সময় প্রায় সাত-আট জন খেলোয়াড় উঠে আসেন। তবে খেলার গতি পরিবর্তন বা পেশাদারী দৃষ্টিতে খেলাটিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল কিন্তু এখনও এরা আয়ত্ত করে উঠতে পারে নি।

দিল্লি এশিয়াডে হকির গ্রুপ লীগে ভারত হংকংকে হারায় ১০—০ গোলে, মালয়েশিয়াকে ৫—১ গোলে, বাংলাদেশকে ১২—০ গোলে এবং ওমানকে ১০—০ গোলে। সেমিফাইনালে জাপানকে ৭—২ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে।

অপর দিক থেকে ফাইনালে ওঠে পাকিস্তান

হ্যান্ডবল ফাইনালে চীন-জাপান প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জয়ী হয় চীন

সেমিফাইনালে মালয়েশিয়াকে ২—০ গোলে পরাজিত করে। তার আগে পাকিস্তান গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয় চীনকে ৬—০, দক্ষিণ কোরিয়াকে ১০—০ এবং জাপানকে ১২—১ গোলে হারিয়ে। ফাইনালে ভারত পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করে ১—০ গোলে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রতিনিয়ত চাপের মুখে ভেঙে পড়ে। গোলকিপারের নিদারুণ ব্যর্থতা এবং এলোমেলো রক্ষণপ্রচেষ্টার মধ্যে একটি একটি করে সাতটি গোল খায়। ফলে এবার নিয়ে এশিয়ান গেমস হকির সাতটি প্রতিযোগিতার মধ্যে ছয়বার পরাজিত হয় পাকিস্তানের কাছে। শুধু জিতেছিল ৬৬ সালে ব্যাংকক এশিয়াডের ফাইনালে।

১৯৫৮ সালে টোকিও এশিয়াড থেকে হকি প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সেবার ভারত কোনো খেলায় পরাজিত না হলেও গোল পার্থক্যে পরাভব স্বীকার করে পাকিস্তানের কাছে। আন্তর্জাতিক হকি ক্ষেত্রে সেটাই ভারতের প্রথম পরাভব স্বীকার। আন্তর্জাতিক হকিতে ওলট-পালট শুরু হয়েছে অনেক দিন আগে। এখন এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, প্রথম সারির পাঁচ-সাতটা দেশের মধ্যে খেলায় যে কোনও দেশ যে কোনও দেশের কাছে হারতে পারে। না হলে দিল্লি এশিয়াডের ফাইনালে যে ভারত ১—৭ গোলে হারল পাকিস্তানের কাছে মাত্র দশ দিন পরে সেই ভারত এসানডার প্রথম খেলায় কিভাবে পাকিস্তানকে ২—১ গোলে হারাল?

পদকের খতিয়ান

	সোনা	রুপো	ব্রোনজ	মোট
চীন	৬১	৫১	৪১	১৫৩
জাপান	৫৭	৫২	৪৪	১৫৩
দঃ কোরিয়া	২৮	২৮	৩৭	৯৩
উঃ কোরিয়া	১৭	১৯	২০	৫৬
ভারত	১৩	১৯	২৫	৫৭
ইন্দোনেশিয়া	৪	৪	৭	১৫
ইরান	৪	৪	৪	১২
পাকিস্তান	৩	৩	৫	১১
মঙ্গোলিয়া	৩	৩	১	৭
ফিলিপিনস	২	৩	৯	১৪
ইরাক	২	৩	৪	৯
থাইল্যান্ড	১	৫	৪	১০
কুয়েত	১	৩	৩	৭
মালয়েশিয়া	১	০	৩	৪
সিঙ্গাপুর	১	০	২	৩
সিরিয়া	১	১	১	৩
লেবানন	০	১	০	১
আফগানিস্তান	০	১	০	১
হংকং	০	০	১	১
ভিয়েতনাম	০	০	১	১
বাহরিন	০	০	১	১
কাতার	০	০	১	১
সৌদি আরব	০	০	১	১
মোট	১৯৯	২০০	২১৫	৬১৪
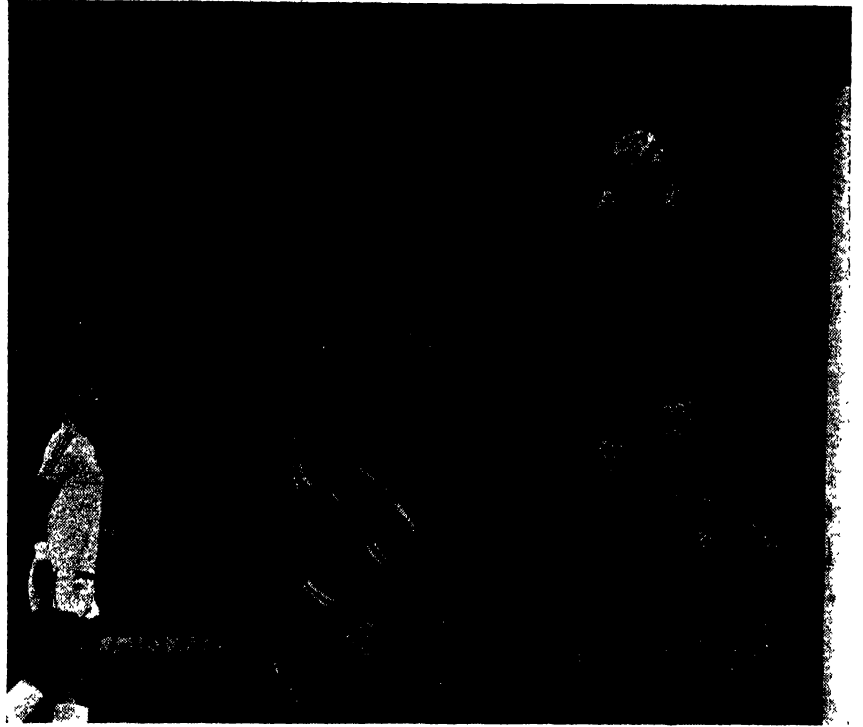
জিমন্যাস্টিকসে তিনটি সোনা ও তিনটি রুপো অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে। সাঁতারে অতিরিক্ত একটি রুপো দেওয়া হয়েছে। ব্যাডমিনটন, বকসিং এবং টেবল টেনিসের লুজিং সেমিফাইনালিস্টদের ব্রোনজ পদক দেওয়া হয়েছে।

মোট ৩৩টি দেশের মধ্যে পদক পায় নি বর্মা, বাংলাদেশ, লাওস, মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলংকা, ওমান, সংযুক্ত আরব আমীরশাহী, দক্ষিণ ইয়েমেন ও উত্তর ইয়েমেন।

ফুটবল কোয়ার্টার ফাইন্যালে চীন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার খেলায় একটি বিশেষ মুহূর্ত

ভারতের পদক

সোনা

১। চাঁদরাম (২০ কিলোমিটার হাঁটা)
২। বাহাদুর সিং (শটপাট)
৩। চারলস বরোমিও (ছেলেদের ৮০০ মিটার দৌড়)
৪। এম ভি বালসাম্মা (মেয়েদের ৪০০ মিটার হারডলস)
৫। মেয়েদের হকি (অধিঃ এলিজা নেলসন)
৬। সৎপাল সিং (কুস্তি—১০০ কেজি)
৭। কৌর সিং (বকসিং, হেভিওয়েট)
৮। রঘুবীর সিং, জি এম খাঁ, বিশাল সিং (ঘোড়সওয়ারি—দলগত)
৯। রঘুবীর সিং (ঘোড়সওয়ারি—ব্যক্তিগত)
১০। মেজর রুপি ব্রার (ঘোড়সওয়ারি—টেন্ট পেগিং)
১১। ফারুক তারাপোর, জরির করঞ্জিয়া (ইয়টিং—ফায়ারবল)
১২। লক্ষ্মণ সিং (গলফ—ব্যক্তিগত)
১৩। লক্ষ্মণ সিং (গলফ—দলগত)-এর নেতৃত্বে চারজন ভারতীয়

রুপো

১। গীতা জুৎসি (মেয়েদের ৮০০ মিটার দৌড়)
২। গোপাল সাইনি (ছেলেদের ৩,০০০ মিটার সিটপল চেজ)
৩। পি টি ঊষা (মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়)
৪। কে কে প্রেমচন্দ্রন (ছেলেদের ৪০০ মিটার দৌড়)
৫। মেরি ম্যাথুজ কুট্টান (মেয়েদের লং জ্যাম্প)
৬। পি টি ঊষা (মেয়েদের ২০০ মিটার দৌড়)
৭। কুলদীপ সিং (ছেলেদের ডিসকাস ছোঁড়া)
৮। গীতা জুৎসি (মেয়েদের ১৫০০ মিটার দৌড়)
৯। হামিদা বানু, বালসাম্মা, পদ্মিনী টমাস, রীতা সেন (মেয়েদের ৪×৪০০ মিটার রিলে দৌড়)
১০। ছেলেদের হকি (অধিঃ জাফর ইকবাল)
১১। কর্তার সিং (কুস্তি—৯০ কেজি)
১২। গ্রেওয়ার সিং (বকসিং—লাইট হেভিওয়েট)
১৩। রাজেন্দ্র পুনাডে (বকসিং—ওয়েলটার ওয়েট)
১৪। জি এম খাঁ (ঘোড়সওয়ারি—ব্যক্তিগত)
১৫। রণধীর সিং, কার্নি সিং, গুরবীর সিং, প্রণবকুমার রায় (ট্র্যাপ শুটিং—দলগত)
১৬। রাজীব মোহটা (গলফ—ব্যক্তিগত)
১৭। নন্দন বাল, বাসুদেবন (লন টেনিস—দলগত)
১৮। জি জি উনাওয়ালা, ফলি উনাওয়ালা (ইয়টিং—এনটারপ্রাইজ)
১৯। শারদ চৌহান (শুটিং—স্ট্যান্ডারড পিস্তল)

১৫। সৈয়দ মোদি, উদয় পাওয়ার, পার্থ গাঙ্গুলী, বিক্রম সিং, প্রদীপ গান্ধে, লিরয় ডিসা (ছেলেদের ব্যাডমিনটন—দলগত)
১৬। সৈয়দ মোদি (ব্যাডমিনটন—পুরুষ সিঙ্গলস)
১৭। লিরয় ডিসা ও প্রদীপ গান্ধে (ব্যাডমিনটন —পুরুষ ডাবলস)
১৮। লিরয় ডিসা ও কু'ওর ঠাকুর সিং ব্যাডমিনটন—মিকসড ডাবলস)
১৯। প্রহ্যাদ সিং (ঘোড়সওয়ারি—ব্যক্তিগত)
২০। রণধীর সিং (ট্র্যাপ শুটিং)
২১। সি এস প্রদীপক (ইয়টিং—ওকে ডিঙ্গি)
২২। পরভীন ওবেরয়, আমিন নায়েক, দীপেন্দ্র সিং (নৌবাইচ—কক্সডপেয়ারস)
২৩। যশলাল প্রধান (বকসিং—লাইট ওয়েট)
২৪। মাচাইয়া (বকসিং—ওয়েলটার ওয়েট)
২৫। মালুক সিং (বকসিং—লাইট মিডল ওয়েট)

সৌদি আরব এবং বাহারিয়নের মধ্যে হান্ডবল প্রতিযোগিতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তোলা চিত্র

ফটো : এন. আর. সাউ

ব্রোনজ

১। বলবিন্দর সিং (শটপাট)
২। পারভিন জলি (ছেলেদের ১১০ মিটার হারডলস)
৩। গুরতেজ সিং (জ্যাভলিন ছোঁড়া)
৪। এস বালসুব্রহ্মণ্যম (ছেলেদের ট্রিপল জাম্প)
৫। পদ্মিনী টমাস (মেয়েদের ৪০০ মিটার দৌড়)
৬। সুরেশ যাদব (ছেলেদের ১,৫০০ মিটার দৌড়)
৭। রাজকুমার (ছেলেদের ৫,০০০ মিটার দৌড়)
৮। সীতারাম (ম্যারাথন দৌড়)
৯। রাজিন্দর সিং (কুস্তি—১০০ কেজির ওপর)
১০। অশোককুমার (কুস্তি—৫৭ কেজি)
১১। জ্ঞান সিং চিমা (ভারোত্তলন—১০০ কেজি বিভাগ)
১২। তারা সিং (ভারোত্তলন—১১০ কেজি বিভাগ)
১৩। ওয়াটারপোলো
১৪। অমি ঘিয়া, অমিতা কুলকারনি, মধুমিতা গোস্বামী, কু'ওর ঠাকুর সিং (মেয়েদের ব্যাডমিনটন—দলগত)
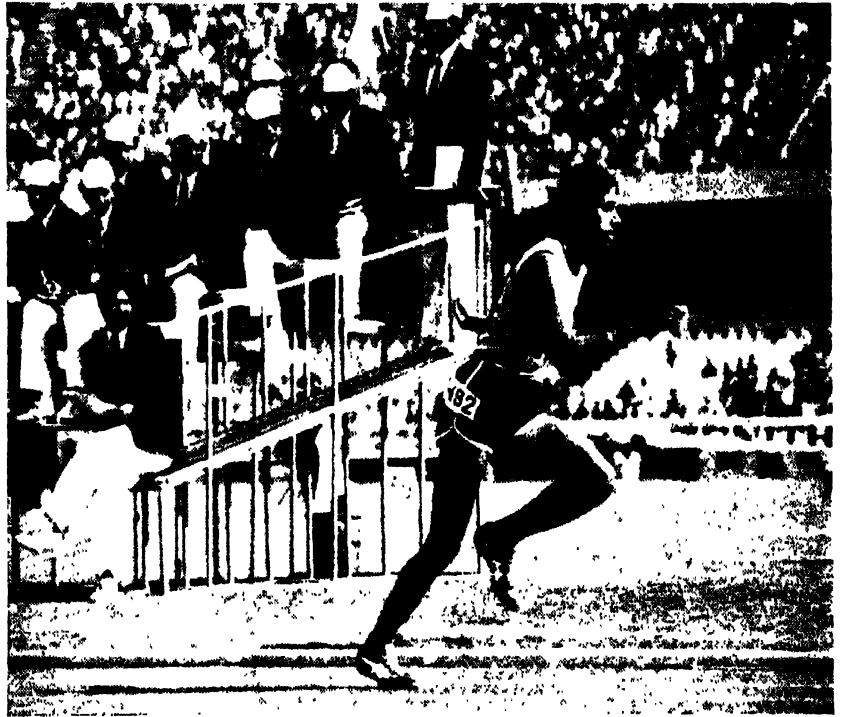
পশ্চিমবঙ্গের রীতা সেন এশিয়াডে আশানুরূপ ফল করতে পারেন নি। অবশ্য মেয়েদের ৪০০×৪ মিটার রিলে দৌড়ে রূপোজয়ীদের মধ্যে তিনি ছিলেন

বইপত্র

দুই দশক/দেবেশ রায়
অন্বেষা, ৮৯এ, এন. কে. ঘোষাল রোড, কলি-৪২। **বার টাকা**

অনেকদিন পরে দেবেশ রায়ের গল্পের বই এল। এর আগে, সন তারিখ মনে নেই, সারস্বত লাইব্রেরী থেকে বেরিয়েছিল 'দেবেশ রায়ের গল্প', নিরস্ত্রীকরণ কেন, কলকাতা ও গোপাল, দুপুর, আহ্নিকগতিও মাঝখানের দরজা ইত্যাদী স্মরণীয় গল্পের সঙ্কলন। তারপর বহুদিন দেবেশ রায়কে দু মলাটের ভিতর গল্পে পাইনি। ফলত বাঙলা গল্পের আঙ্গিক গদ্য এবং বিষয়, এই তিনের যে মূলগত পরিবর্তন ঘটে গেছে দেবেশ রায়ের হাতে তার চেহারাটা একসঙ্গে আমাদের পক্ষে ধরা সম্ভব হয়নি।

'দুই দশক', দেবেশ রায়ের সম্প্রতি প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ। বিগত দুই দশকের আটটি গল্পের সঙ্কলন। না, এই সঙ্কলনে নেই ভুলামাসানের পাকে বা পরিচয়ে প্রকাশিত সেই বানভাসি লোকটির গল্প (নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, অনেকদিন আগে পড়া), তবে আছে মানুষ রতন, রঞ্জুর রক্ত, মৃতজংশন ও বিপজ্জনক ঘাট, ধর্ণা, উচ্ছেদের পর ইত্যাদি অসাধারণ গল্পগুলি। যা প্রচলিত বাঙলা গল্পের আঙ্গিক ও গদ্য-রীতিকে রীতিমত আঘাত করতে সক্ষম। বিগত দুই দশকের সামাজিক তথা রাজনৈতিক টানা-পোড়েনের নিখুঁত এক দলিল এই গল্পগুলি। গভীর থেকে গভীরতর দিকে যাত্রা করে দেবেশ রায় দু'দশকের ভাঙাচোরা স্বদেশকে নিজস্ব ভঙ্গীতে চিন্ময় করে তুলেছেন এই গল্পগ্রন্থে।

তিস্তাপারাপারের যে ঘাট, সেই বার্নেশ জংশন এখন মৃত। পুরনো গতিময় জংশনের চিহ্নস্বরূপ প'ড়ে আছে রেলস্টেশনের ধ্বংসস্তূপ আর মরচে ধরা ইস্পাতের লাইন, গুমটি ঘর ইত্যাদি। এই বার্নেশ ঘাটে দাঁড়িয়ে ভাদুই তিস্তার ওপারে অনেকদিন আগে দেখা রেলওয়ে জংশন রেলগাড়ি আলো আর পাহাড়ি ভাষা সমেত অনেক মানুষের কথা ভাবে। সে এক এলোমেলো জীবনের কিশোর, জীবন্তজংশনের স্বপ্নদ্যানে মৃতজংশনে দাঁড়িয়ে।

দেবেশ রায়ের গল্পের প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি বাক্য জরুরী। গল্পটি (মৃতজংশন ও বিপজ্জনক ঘাট) দ্বিমাত্রিক, ভাদুই-এর স্বপ্নের পাশাপাশি রয়েছে দুরন্ত তিস্তা পার হওয়ার যুদ্ধ। বিপজ্জনক সেই চর, চরকে এড়িয়ে নৌকো ওপারে ভেড়ানো, এবং ভাদুই-এর স্বপ্ন পাশা-পাশি বয়ে যায় নিরন্তর সংগ্রামের স্বপ্নের মত।

এই গল্প গ্রন্থের আরো কয়েকটি গল্পের পটভূমি জলপাইগুড়ি ও তৎসংলগ্ন এলাকা। ফলত আঞ্চলিকতা উঠে এসেছে, উঠে এসেছে আঞ্চলিক কথ্যভাষা। 'মৃতজংশন ও বিপজ্জনক ঘাট' কী বাষট্টি সনের রাজনৈতিক স্বদেশের কথা স্মরণ করায় না! পাঠক স্মরণ করুন।

এরপর রঞ্জুর রক্ত। ১৯৬৪ সনে লেখেন দেবেশ রায়। রঞ্জু নামের দামাল ছেলেটির মুখ থেকে রক্ত ওঠে কুয়োপাড়ে দাঁড়িয়ে স্নানের সময়। তখন সে মুখ দিয়ে সূর্যের দিকে জল ছিটিয়ে রামধনু তৈরী করার চেষ্টায় ছিল। রঞ্জু দেখল যেন লাল রক্ত বলয়; সে জানত না এতক্ষণে সূর্যের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছি রক্তবিন্দু, সে আর বর্ণালীচক্রের ভিতরে নেই, রক্তবলয়ে তার অস্তিত্ব।

দেবেশ রায় এখানে নির্দয়। নির্দয়ভাবে তিনি স্বপ্নভঙ্গের কথা শোনান। আর কী আশ্চর্য গদ্যে, যা প্রতিমুহূর্তে হৃদয়তন্ত্রীতে ঘা মারে। রঞ্জুর রক্ত বমন প্রবাহের মুখোমুখি হয়ে যাই আমরা। রঞ্জুর গলা দিয়ে হু হু বন্যার মত রক্ত নেমে এল, মেঝেতে পড়ল যেখানে চড়ুইয়ের বাসা ভাঙা খড়কুটো পড়বে ঝরবে...। সেই নিঃসঙ্গ রক্ত প্রবাহ, যেন দাঙ্গায় ছিন্ন মুণ্ড হতে যে রক্তস্রোত সন্ধ্যে আইনের ভয়ে আত্মগোপনের জন্য ঝাঝরি খোঁজে সরীসৃপের মত, সেই মত।

যেন ধর্ষিতা রমণীর দুই উরুবাহী রক্তস্রোত যেভাবে পদতল খোঁজে আত্মগোপনের জন্য ভীত কুকুরের মত, সেই মত।

যেন সান্ধ্য আইনে নীরব নির্জন নগরে সহসা বন্দেমাতরম বা আল্লাহো আকবর ধ্বনি...

যেন কোন উঁচু গাছ কেটে ফেলায় আকাশী শূন্যতার মত স্বদেশ

যেন সধবার অঙ্গ বিচ্ছিন্ন একখানি শঙ্খবলয়িত নগ্ন হাত।

এ এক নির্দয় রক্তমোক্ষণের চিত্র যা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় এক ছিন্নবিচ্ছিন্ন স্বদেশের চেহারা।

ধর্ণা গল্পটি ১৯৬৭-তে লেখা হয়েছিল। বন্যার পর দুর্ভিক্ষ, দুর্ভিক্ষে রিলিফকিচেনের ইনচার্জ হয়ে গ্রামে যায় তুহিন। গ্রাম মানে সেই গ্রাম, যা এখনো চারপাশে। শাসনে শোষণে লাঞ্ছনায় পীড়নে আর অসম্মানে হাত পা ছড়িয়ে মৃত অথবা জীবিতের মত পড়ে আছে ফান্দাইত পাড়ার না খাউয়াইয়া অতীশ্বর। সে মধ্যরাতে রিলিফবাবুর কাছে শূন্য উদর নিয়ে ধর্ণা দিয়েছে, বন্যায় ডোবেনি, দুর্ভিক্ষে পড়েনি তবু ক্ষুধার্ত, কেননা বন্যা আর দুর্ভিক্ষ এ ভাঙাচোরা স্বদেশের দেহে নতুন কোন মাত্রা আর দিতে পরে না। মেধা আর অভিজ্ঞতা দুইয়ের সমমিশ্রণে এই গ্রন্থের সবক'টি গল্প উজ্জ্বল। এ গল্পটি তার এক রকম নিদর্শন।

ধর্ণা থেকে দেবেশ রায় চলে গেছেন ১৯৭০ এর 'জয়যাত্রায় যাও হে' গল্পে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাওয়ার সময়। দুই কম্যুনিস্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব বিষয়। কিন্তু উপরিতল তো দেবেশ রায় দ্যাখেন না। তিনি চলে গেছেন জমি-মাটি-মানুষের এক গভীর হাহাকারের দিকে, যা অতিমাত্রায় বাস্তব। শেষ অবধি স্পর্শ করে আমাকে।

এর পর 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' এবং 'মানুষরতন'। মানুষরতনের মত গল্প গত দুই দশকে খুব বেশী লেখা হয়েছে বলে জানি না। যখন মানুষের আয়ু খুব সীমিত হয়ে গেছিল, গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছিল লাশ, এখানে ওখানে বন্ধুর লাশ বন্ধু সনাক্ত করছে। সেই সময়কে তো এ জীবনে ভোলবার নয়। এখানে লেখকের ভূমিকা ভর্ৎসনার। সমগ্র গল্পে মানব-ইতিহাস যেভাবে আমাদের সামনে এখানে ব্যাখ্যাত, তাতে গল্প পাঠান্তে আমাদের মুখ লুকোতে হয়। গোপনে নিজেদের চেহারা দেখতে হয়। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সর্বক্ষণ তাঁর কলমে ঝরেছে। ফর্ম এবং কনটেন্ট দুইয়ের মিলন- এখানে লক্ষ্যণীয়। এই গল্প পড়া এক অভিজ্ঞতা।

দেবেশ রায়কে এই গল্প গ্রন্থে সম্পূর্ণ চেনা যায়। তাঁর জটিল অথচ চিন্ময় গদ্য বার বার পড়তে হয়। প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি নির্মাণ করেছেন অতি যত্নে। 'রাখিপূর্ণিমার রাত' গল্পটির কথাই ভাবা যাক না কেন? প্রথম অনুচ্ছেদটি! বা রঞ্জুর রক্ত গল্পের নানান অংশ!

ভূমি মাটির সঙ্গে জড়িত জীবন দেখায় তিনি খুবই ঘনিষ্ট। জলজ্যান্ত সমস্যাগুলি তাঁর কাছে অচেনা নয়। প্রসঙ্গত 'রাখিপূর্ণিমার রাত' গল্পটি উল্লেখ্য। মানুষের ভূমিক্ষুধার সঙ্গে এদেশীয় ভূমিবন্টনের বিচিত্র পদ্ধতি এখানে লক্ষ্যণীয়। এর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কও বিশ্লেষিত।

এবং শেষ গল্প 'উচ্ছেদের পর'। ভূঁই ছাড়া আধিয়ার—বর্গাদারের গল্প। জমি থেকে সে উচ্ছেদ হযে নতুন ভূমির সন্ধানে যাচ্ছে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে। তার চার দিকে আজন্ম পরিচিত ক্ষেত-খামার, তার সামনে সেই ঘর গেরস্থালি যা শূন্য হয়ে যাচ্ছে, আর কোনদিন এই ভিটে বাস্তুর বাতাস তাদের নিঃশ্বাসে পুষ্ট হবে না।

তাদের যাত্রা! এ যেন এক মহাযাত্রা। এই যাত্রাপথ দুঃখেকষ্টে আনন্দে-বেদনায় বর্ণময় এবং আদিম মানুষের ভূমি সন্ধানের কথা স্মরণ করায়। তাই শেষ পর্যন্ত লেখক নৈরাশ্যের ভিতরেও উচ্চারণ করেন যেন, ওপারের বনে ওদের এই যাওয়াটা, এখন—প্রত্যাবর্তনই।

অভিনন্দন জানাই সেই প্রকাশক-কে যিনি অ-সাহিত্যের বাণিজ্যিক আবহাওয়ায় দেবেশ রায়কে বেছে নিয়েছেন। সুরুচিপূর্ণ এই শোভন প্রকাশনে বাঙলা গল্পের পাঠক এবং তরুণ গল্পকাররা সমৃদ্ধ হবেন।

অমর মিত্র

বিভাগীয় সংবাদ

চব্বিশ পরগণা জেলা

মথুরাপুর-২—গত ৪ঠা জানুয়ারী মথুরাপুর ২নং ব্লকে সমষ্টি যুবকরণ, দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন এ রকম ২৯ জন তপশিলী যুবককে নিয়ে টেলারিং বৃত্তি প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করে রায়দিঘীতে। গত ৩রা জুলাই উক্ত প্রশিক্ষণ সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়। সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ২৬ জন যুবক। গত ১৩ই অক্টোবর মথুরাপুর-২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীপতিতপাবন গাঁতাইত উক্ত ২৬ জন শিক্ষার্থীকে প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন। স্থানীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এবং তপশিলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তর শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অর্থ সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছেন।

গত ৩০শে মার্চ মথুরাপুর ২নং সমষ্টি যুবকরণের উদ্যোগে দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন এ রকম তপশিলী যুবকদের নিয়ে চারটি বৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র—পাম্পসেট রিপেয়ারিং, তাঁত শিল্প, টাইপ রাইটিং ও মাদুর তৈরী আরম্ভ হয়। তা গত ২৯শে সেপ্টেম্বর সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে নিম্নরূপ শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ লাভ করেছেনঃ

বৃত্তি প্রশিক্ষণের নাম	স্থান	শিক্ষার্থীর সংখ্যা
পাম্পসেট রিপেয়ারিং	বরদানগর	১৪ জন
তাঁত শিল্প	কৈলাসনগর	১৪ জন
টাইপ রাইটিং	রায়দিঘী	২২ জন
মাদুর তৈয়ারী	গিলারছাট	১৪ জন

দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন এরূপ তপশিলী জাতীয় শিক্ষার্থীরা ৬ মাস যাবৎ প্রতি মাসেই ৩০ টাকা হিসাবে বৃত্তিলাভ করেছেন। স্থানীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এবং তপশিলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তর শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অর্থ সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

নদীয়া জেলা

কৃষ্ণনগর-২নং ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে এবং কৃষ্ণনগর ২নং ব্লক যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় গত ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ তিনদিন ব্যাপী এক যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

এই যুব উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক, দেশবন্ধু হাই স্কুল, ধুবুলিয়া, নদীয়া এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীআনন্দমোহন তরফদার, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, কৃষ্ণনগর-২, নদীয়া।

কৃষ্ণনগর-২নং পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক যুবকরণ যৌথ উদ্যোগে গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গত ৬ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮২। মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা-৩৭০, বালক-২১০, বালিকা বিভাগে-১৬০ জন। যুব উৎসবের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, স্বরচিত কবিতা ও গল্প, আবৃত্তি, গান, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা, লোকসংগীত, বিতর্ক, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে যুবক যুবতীদের মধ্যে বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়।

পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসুবল মার্ডি—সচিব, নদীয়া জিলা পরিষদ। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ব্লক যুব উৎসব কমিটি সভাপতি শ্রীশান্তিরঞ্জন দাস, সভাপতি, কৃষ্ণনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতি। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রীনির্মল দত্ত, আকাশবাণী সংবাদদাতা, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

দুটি নন্ রেসিডেনসিয়াল কোচিং ক্যাম্প গত ২৭শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল।

একটি ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির আর একটি কবাডি (বালক ও বালিকা) প্রশিক্ষণ শিবির। ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরে মোট ৫০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। কবাডি প্রশিক্ষণ শিবিরে বালক বিভাগে ৫০ জন ও বালিকা বিভাগে ৫০ জন অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রীশান্তিরঞ্জন দাস, সভাপতি, কৃষ্ণনগর-২নং পঞ্চায়েত সমিতি, প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন নদীয়া জিলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীপরিমল বাগচি এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে কৃষ্ণনগর-২নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীআনন্দমোহন তরফদার, নদীয়া জিলা যুব আধিকারিক শ্রীগোপেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

প্রশিক্ষণ শিবিরের ছাত্রদের সুমিত সুশৃংখল ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শনী দেখে যুবক যুবতীদের মধ্যে বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন কবাডিতে শ্রীপ্রদীপ তালুকদার—এন. আই. এস. এবং শ্রীদুলালচন্দ্র বিশ্বাস। ফুটবলের প্রশিক্ষক ছিলেন শ্রীশিশিরকুমার মণ্ডল ও শ্রীষষ্ঠী ঘোষ, কৃষ্ণনগর। সভার শেষে আমন্ত্রিত অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীসিতাংশুশেখর জানা, ব্লক যুব আধিকারিক, কৃষ্ণনগর-২নং ব্লক, ধুবুলিয়া, নদীয়া।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা

গোয়ালপোখর-২—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে গোয়ালপোখর-২ ব্লক যুবকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ খেলাধুলার প্রসারের নিমিত্ত ১৯৮২ বর্ষে রামকৃষ্ণপুর নবীন সমিতিকে খেলার মাঠ তৈরী করার জন্য ৩৫০০০·০০ টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়েছে। এতে স্থানীয় খেলোয়াড় ও যুবক-যুবতীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। উক্ত সমিতি এরই মধ্যে উপযুক্ত জমি কিনে প্রমাণ সাইজ খেলার মাঠ তৈরীর কাজে দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। একই বছরে গ্রামীণ ছেলেদের স্বাস্থ্য ও শরীর গঠনের জন্য এই বিভাগ হতে নিজামপুর আজাদ লাইব্রেরী ও ক্লাবকে জিমনাসিয়ামের জন্য উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম কেনা বাবদ ৬০০০·০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

এই ব্লকের ব্যবস্থাপনায় কৃতি ও উন্নতমানের খেলোয়াড় তৈরীর উদ্দেশ্যে ১৪ই জুন '৮২ স্থানীয় কানকি ফুটবল মাঠে একটি একমাসব্যাপী ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ। এতে প্রায় ১৯ বছরের কম ৩০ জন কিশোর অংশ নেয়। ব্লকের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যা থাকা সত্ত্বেও দূরদূরান্ত থেকে প্রতিটি কিশোর নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষক শ্রীশিবেন্দু ঘোষ অসীম ধৈর্য ও দক্ষতার সঙ্গে এই শিবির পরিচালনা করেন। প্রত্যেককে প্রশিক্ষণ শেষে মানপত্র বিতরণ করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি শ্রীঘোষ মহাশয় খেলাধুলায় উৎসাহ সৃষ্টি ও সাহায্য হিসাবে ব্লকের ২৭টি ক্লাবকে ফুটবল, ৪টি ক্লাব ও ২টি মহিলা সমিতিকে ক্যারমবোর্ড বিতরণ করেন।

গোয়ালপোখর-২ ব্লকের অন্তর্গত গ্রামাঞ্চলে অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিশেষ করে তপশিলী জাতির বেকার যুবকদের স্বনির্ভরশীল করার উদ্দেশ্যে হাতে-কলমে কাজ শেখানোর জন্য ১৭ই সেপ্টেম্বর '৮২ চাপোড়ে জাগৃতি সংঘের একটি গৃহে একটি সুন্দর ভাবগম্ভীর পরিবেশে ছয়-মাসব্যাপী একটি পাম্পসেট মেরামতির প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীটেগবাহাদুর থাপা এবং ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ১৫ জন বেকার তপসিল যুবক শিক্ষার্থীরূপে যোগদান করেছে। প্রত্যেককে মাসিক ৩০ টাকা করে হাত-খরচ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন একজন পঙ্গু (হ্যানডিক্রাফ্ট)। এই প্রকল্পের মোট বরাদ্দ প্রায় ১৫০০০·০০ টাকা। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অতিথিবৃন্দ যুবকল্যাণ দপ্তরের এই সাধু প্রচেষ্টাতে স্বাগত জানান এবং ব্লক যুব আধিকারিককে অনুরোধ করেন যাতে পরবর্তী সময়ে এই ব্লকে টাইপ রাইটিং ও মেয়েদের সীবন শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

যুব আধিকারিক শ্রীতপনকুমার সুর তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ শেষে সরকারী প্রান্তিক ঋণ দেওয়া হবে এবং ব্যাঙ্কের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ারও আশ্বাস দেন।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর '৮২ স্থানীয় কানকি ফুটবল মাঠে একমাসব্যাপী এক ভলিবল প্রশিক্ষণ

শিবিরের উদ্বোধন করেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীটেপবাহাদুর থাপা মহাশয়। এতে প্রায় ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়মিত অংশ নেয়। প্রশিক্ষক কারিক শ্রীটেগবাহাদুর থাপা মহাশয়। এতে প্রায় শ্রীআশিসকুমার গোপ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রশিক্ষণ দেন।

স্থানীয় প্রশিক্ষক তৈরীর উদ্দেশ্যে এই ব্লক থেকে ফুটবলের উপর প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য রামকৃষ্ণপুর নবীন সমিতির প্রাক্তন খেলোয়াড় শ্রীমহাদেবচন্দ্র রায় ও টুটিকাটা সিধোকানু ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড় শ্রীলপসা হেমব্রমকে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে অনুষ্ঠিত জেলা ফুটবল প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবিরে (৭ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবির) পাঠান হয়। অনুরূপ উদ্দেশ্যে ভলিবলের জন্য কানকি স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়দ্বয় শ্রীআশিষকুমার গোপ ও শ্রীস্বপন চক্রবর্তীকে রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত ৭ দিনের আবাসিক জেলা ভলিবল প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদানের জন্য পাঠান হয়। প্রত্যেককে প্রশিক্ষণ শেষে মানপত্র প্রদান করা হয়।

জনসাধারণের সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার সপক্ষে বামফ্রন্ট সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রতিফলনের জন্য সমাজ বিকাশের বাধা, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তীব্র সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং প্রসারের দায়িত্ব নেওয়ার উদ্দেশ্যে গোয়ালপোখর-২ ব্লকে উদ্যোগে ও ইসলামপুর মহকুমার তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ৫ই অক্টোবর '৮২ থেকে ৮ই অক্টোবর '৮২ পর্যন্ত যথাক্রমে কানকি, রামকৃষ্ণপুর, ঝিটকিয়া হাট, মর্জলিশপুর, মনোরা ও হাটওয়ার মাঠে হাজার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা ও তথ্যমূলক চিত্র প্রদর্শনী করা হয়।

বংশীহারী ব্লক (বুনিয়াদপুর)—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের কর্মসূচী অনুযায়ী স্থানীয় এলাকার কর্মহীন তরুণ ও তরুণীদের স্বনিযুক্তিতে নির্ভর করার উদ্দেশ্যে বংশীহারী ব্লকে ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় গত ১৬ই জুন ১৯৮২ থেকে তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত যুবক ও যুবতীদের জন্য ছয় মাসের ইংরাজী টাইপ রাইটিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন বংশীহারী ব্লকের ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ও তপশিলী জাতি কল্যাণ বিভাগের কর্মী শ্রীগৌতম পাল ও দেবব্রত ভৌমিক। এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মোট ছাত্রের সংখ্যা ২৪ জন। যুবক ২৩ জন ও যুবতী ১ জন। এই শিক্ষার্থীদের স্টাইপেন্ড প্রতি মাসে ত্রিশ টাকা করে প্রতি মাসে যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রশিক্ষণের শেষ দিনে ঐ ছাত্র-ছাত্রীকে মানপত্র দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষ হবে ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮২। এই শিবিরের প্রশিক্ষক ছিলেন শ্রীকমলেশ পাল।

গত ১৬ আগস্ট, ১৯৮২ থেকে ফুটবল ও ভলিবল কোচিং ক্যাম্প প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন ৪নং অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান শ্রীপ্রতাপ তোকদার ও শ্রীঅশোক তালুকদার মহাশয়। ফুটবল ও ভলিবল কোচিং ক্যাম্প হওয়াতে এই ৪নং শিবপুর অঞ্চলের ছেলেদের ভিতর আনন্দ ও উৎসাহ দেখা যায়। এই শিক্ষার্থীদের জন্য যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে এই বছরই প্রথম টিফিনের জন্য ৭৫০·০০ টাকা ধার্য করেন, ইহাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরও উৎসাহ বেড়ে যায়। ফুটবল কোচিং ক্যাম্পে ৫০ জন শিক্ষার্থী ও ভলিবল কোচিং ক্যাম্পে ৩০ জন শিক্ষার্থী ছিলেন। এই দুইটি প্রশিক্ষণ শিবির ১৫ই সেপ্টেম্বর শেষ হলো। সমাপ্তির দিন মাননীয় অশোক তালুকদার ও ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস খেলাধুলার সম্বন্ধে বক্তব্য রেখে কোচিং শিবিরের সাফল্য কামনা করেন এবং উপস্থিত সকলের সহযোগিতায় হয়েছে বলে বক্তব্য শেষ করেন। ফুটবল কোচ শ্রীবিমল চৌধুরী ও ভলিবল কোচ শ্রীঅনুপ সরকার। বুনিয়াদপুর ফুটবল সাব-কমিটিকে এ বছর যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে ২৫০০০·০০ টাকা দেওয়া হয় এবং সেই মাঠেই এ বছর কোচিং ক্যাম্প চলছিলো।

এ বছর প্রথম গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনুযায়ী এ বছর প্রথম গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বংশীহারী ব্লক যুবকরণের থেকে গত এপ্রিল, ১৯৮২তে অষ্টম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পুস্তক দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তক বিলি করার জন্য বহু দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রী অতি আগ্রহের সাথে যার যা প্রয়োজন তা মেটাতে না পারলেও প্রত্যেকে ৪ খানা ও ৫ খানা বই নিয়ে যায়। এ-ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসীরা খুবই আনন্দিত হয়েছেন। এই যুবকরণ থেকে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে প্রয়োজনীয় পুস্তক অনুদান দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলা

সুতি–১—যুবকল্যাণ বিভাগের সুতি–১নং ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে "গ্রামীণ ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিবির" সফলতার সংগে এগিয়ে চলেছে। এ পর্যন্ত পরিচালিত প্রশিক্ষণ শিবিরগুলির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ—

ফুটবল—উদ্বোধন হয় গত ২১শে এপ্রিল, '৮২ তারিখ বংশবাটী ফুটবল মাঠে। পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে বংশবাটী তরুণতীর্থ ক্লাব। প্রশিক্ষক ছিলেন ক্রীড়াবিদ্ শ্রীবিনয়কুমার সরকার, সহঃ শিক্ষক বংশবাটী হাইস্কুল। গত ২০শে মে এর পরিসমাপ্তি ঘটে, একমাস কাল এই প্রশিক্ষণ শিবির স্থানীয় যুবকদের মধ্যে উৎসাহের জোয়ার আনে।

জিমন্যাসটিকস্—গত ২০ জুলাই থেকে ১৮ আগস্ট এবং ১৯ আগস্ট থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২টি পর্যায়ে ২ মাসকাল জিমন্যাসটিকস্ প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয় জঙ্গীপুর (আহিরণ) ব্যারেজ মাঠে। প্রশিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন শ্রীদিলীপকুমার কর্মকার, স্টেট কোচ্ নব ভারত স্পোর্টিং ক্লাব মির্জাপুর। এ ছাড়াও শ্রীকরুণাময় দাস রাজ্য জিমন্যাসটিকস্ কাউন্সিলের সদস্য ও অতিথি প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ দেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে শ্রীদাস শিক্ষার্থীদের তত্ত্বমূলক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন।

খো-খো—গত ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখ থেকে ১৩ অক্টোবর তারিখ পর্যন্ত বংশবাটী তরুণতীর্থ ক্লাবের দায়িত্বে মহিলা খো-খো প্রশিক্ষণ শিবিরও পরিচালিত হোল বংশবাটী ময়দানে। প্রশিক্ষক ছিলেন কোচেস্ কোচিংপ্রাপ্ত শ্রীবিনয়কুমার সরকার, সহঃ শিক্ষক, বংশবাটী হাই স্কুল। এই প্রশিক্ষণ শিবির পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

বংশীহারী ব্লক যুবকরণে দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে

উপরোক্ত শিবিরগুলির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বংশবাটী গ্রাম প্রধান শ্রীউমাপতি মণ্ডল, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক বংশবাটী হাইস্কুল, শ্রীঅভয়পদ মজুমদার, সম্পাদক, বংশবাটী হাই-স্কুল, শ্রীকরুণাময় দাস, রাজ্য জিমন্যাসটিকস্ কাউন্সিল সদস্য, শ্রীসলিল রায় সহঃ প্রধান শিক্ষক জঙ্গীপুর ব্যারেজ প্রাথমিক স্কুল ও নিমাইচাঁদ দুবে প্রভৃতি ক্রীড়ামোদীগণ। তাঁরা তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিভাগীয় কর্মসূচীর প্রশংসাসহ এই সমস্ত শিবিরের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতারও উল্লেখ করেন।

এই প্রশিক্ষণ প্রকল্পাধীন ভলিবল প্রশিক্ষণ শিবিরও অনতিবিলম্বে শুরু হতে চলেছে।

এছাড়াও, সুতি—১নং ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় গত ১৬ জুন তারিখ থেকে ছয় মাসের জন্য তফশিলী জাতিভুক্ত মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্পাধীন সীবন শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীসুকুমার গনাই মহাশয়। এই প্রকল্প শিক্ষার্থী মহিলাদের মধ্যে বিশেষ আনন্দ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। চিত্রে প্রশিক্ষক শ্রীফুলচাঁদ দাস মহাশয় প্রশিক্ষণরতা শিক্ষার্থিনীদের তদারকি করছেন দেখা যাচ্ছে। এই প্রকল্পে শিক্ষার্থিনীদের মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তিও প্রদান করা হয়। আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই শিক্ষাকেন্দ্রের মেয়াদ আছে।

ভগবানগোলা-২—তপশিলী জাতি/উপজাতিদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য পাম্পসেট মেরামতী প্রশিক্ষণ শিবির গত ৩রা জুন '৮২ তারিখে আরম্ভ হয়ে ২রা অক্টোবর '৮২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। ২৫ জন শিক্ষার্থী শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিবির সমাপনান্তে শিক্ষার্থীদের প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়। মহঃ নজরুল ইসলাম সাহেব প্রশিক্ষক হিসাবে তাঁর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন।

শিবির চলাকালীন শিক্ষার্থীগণের একটি ছবি গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণরতঃ শিক্ষার্থীদের ছবিটি এই সমাচারের সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

জলপাইগুড়ী জেলা

আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় ১৫ই নভেম্বর থেকে যুবক-যুবতীদের জন্য বাংলা লিপি লিখন শিক্ষণ আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লক যুবকবণে শুরু করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার মিউনিসিপ্যালিটি ও আলিপুরদুয়ার ১নং অঞ্চল পঞ্চায়েত অন্তর্ভুক্ত ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মোট ৪২ জন যুবক-যুবতী আবেদন করেছিল। কিন্তু আপাতত শিক্ষণ নেওয়ার জন্য ৩২ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। বাকী ১০ জনের নাম প্যানেলভুক্ত করা হয়েছে। বাংলা লিপি লিখন যন্ত্রের সংখ্যা বাড়লেই প্যানেলভুক্ত আবেদনকারীগণকে শিক্ষণ নিতে দেওয়া হবে। প্রশিক্ষক শ্রীদেবীপ্রসাদ চৌধুরীর সহৃদয়তা ও অভিজ্ঞতা এই সমস্ত যুবক-যুবতীগণকে ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে বলে

সুতি-১ ব্লক যুবকরণে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অ্যাথলেটিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে

যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বেকার যুবকদের পাম্পসেট মেরামতীর কাজ শেখান হচ্ছে ভগবানগোলা-২নং ব্লক যুবকরণে

ডেবরা ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় সেলাই শিক্ষা চলছে

আশা পোষণ করেন এই ব্লকের যুব আধিকারিক শ্রীরামপদ সিকদার মহাশয়। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যারা বাংলা লিপি লিখন শিক্ষণ নিয়েছে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের ইতিমধ্যেই সরকারী বিভাগে চাকুরী হয়েছে। সাধারণ জাতি সম্পন্ন যুবক-যুবতীগণের জন্য যুবকল্যাণ দপ্তরের এই ধরনের শিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন উপস্থিত স্থানীয় শিক্ষক ও সাংবাদিক শ্রীপবিত্রভূষণ সরকার মহাশয়।

আলিপুরদুয়ার-১—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তর, আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লক যুবকরণ-এর উদ্যোগে ও পরিচালনায় শালকুমারহাটে গত ৫ অক্টোবর তারিখে শুরু করা হ'ল ১২ থেকে ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকগণের জন্য ভলিবল প্রশিক্ষণ শিবির। এতে মোট অংশগ্রহণ করেছে ৩৫ জন বালক। এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে গ্রামীণ খেলা "ভলিবল খেলা"র বহুল প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং উক্ত বয়স্ক ছেলেরা এই খেলার প্রতি বেশী আগ্রহী হবে। আধুনিক ভলিবলের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হতে পারবে; উপরন্তু এই বয়স থেকেই যাতে এই ধরনের গ্রামীণ ক্রীড়ার আধুনিক কৌশল ছোট ছোট ছেলেদের আয়ত্বে আসে তারই চেষ্টা করা হচ্ছে এতদ্বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবিরের পরিচালনার মাধ্যমে। এই শিবির চলে ১ মাসব্যাপী। এই ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত ছেলেরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। যুবকল্যাণ দপ্তর এই শিবিরের সমস্ত প্রকার ব্যয় ভার বহন করবেন।

মেদিনীপুর জেলা

ডেবরা—ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় গত ৫ই এপ্রিল তারিখ থেকে গোলগ্রাম-এ তপশিলী জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ৩০ জন যুবক-যুবতীকে নিয়ে ৬ মাসের জন্য এক টেলারিং প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন হয়। এই সব শিক্ষার্থীরা টেলারিং-এর কাজ শিখে, যাতে স্বনির্ভর হতে পারেন, শিক্ষার পর তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্থানীয় ব্লক যুব-আধিকারিক শ্রীনিশিকান্ত দে মহাশয় জানান। এ ব্যাপারে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তপশিলী উন্নয়ন পর্ষদের মেদিনীপুর শাখার ম্যানেজার শ্রী এস. সরকার। খুবই আনন্দের ব্যাপার শিক্ষার্থীরা এই ৬ মাসের মধ্যে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে কয়েকটি পোশাক বানানো খুব ভালভাবে শিখেছেন। শিক্ষার্থীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে জেলা যুব-আধিকারিক এই শিবিরটি আরো ২ মাস বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেন্দ্রের প্রশিক্ষক হিসাবে আছেন সেখ জামালউদ্দিন।

গত ১৮ই আগস্ট থেকে ১৫ বৎসর পর্যন্ত বালকদের এক মাস যাবৎ চারটি ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির যথাক্রমে, বালিচক হাইস্কুল মাঠ, লোয়াদা হাইস্কুল মাঠ, মাড়তলা হাইস্কুল মাঠ ও রাধামোহনপুর হাইস্কুল মাঠে খুবই উৎসাহের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ শিবিরের শিক্ষার্থীরা খুব মনোযোগের সঙ্গে প্রশিক্ষণ নেন। এরূপ শিক্ষণ শিবিরের সময়কাল যাতে আরো কিছুদিন বাড়ানো যায় তার জন্য সব শিক্ষার্থীবৃন্দ আবেদন রাখেন। ডিসেম্বর মাস থেকে আরো একটি ভলিবল শিবির এক মাসের জন্য চালানো হবে বলে স্থানীয় যুব-আধিকারিক জানান।

গত ১৯শে জুলাই বালিচক হাইস্কুলে বিপুল উৎসাহের মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞান আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল "মহাকাশ ও মানবজাতি"। মোট কুড়ি জন প্রতিযোগি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ছাত্রদের উৎসাহ দানের জন্য ব্লকের সভাপতি শ্রীশিবসাধন ভট্টাচার্য, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীকালিদাস রায় এবং বালিচক হাইস্কুলের শিক্ষকবৃন্দ এবং অন্যান্য স্কুলের কিছু শিক্ষকবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীউমাপ্রসন্ন লাহিড়ী, বিভাগীয় প্রধান, পদার্থবিদ্যা, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ, প্রধান শিক্ষক, বালিচক ভজহরি হাইস্কুল। উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন অর্জুনী হাইস্কুলের ছাত্র—শ্রীমান গৌতমকুমার ভৌমিক।

নন্দীগ্রাম-২—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের আর্থিক সহায়তায় এবং নন্দীগ্রাম ২নং ব্লক যুব অফিসের পরিচালনায় ব্লকের ৪টি স্থানে একযোগে ১ মাসের জন্য গ্রামীণ ক্রীড়া প্রশিক্ষণের ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। নিম্নে বিবরণ দেওয়া হলঃ—

প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র	শিক্ষার্থীর সংখ্যা
আমদাবাদ হাইস্কুল মাঠ	৪০
হানুভূঞ্যা পল্লী উন্নয়ন সংঘের মাঠ	৭১

মহিলাদের সেলাইয়ের কাজ শেখান হচ্ছে নন্দীগ্রাম-২নং ব্লক যুবকরণে

খোদামবাড়ী ইউনিয়ন

হাইস্কুল মাঠ	৩৫
নারায়ণচক হাইস্কুল মাঠ	৫৬

আমদাবাদ হাইস্কুল মাঠে উদ্বোধনের দিন (২৩ সেপ্টেম্বর) উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য শ্রীশ্যামচাঁদ ওঝা মহাশয় এবং ব্লক যুব-আধিকারিক শ্রীনিরঞ্জন পড়ুয়া মহাশয়।

সর্বশেষ দিনে নারায়ণচক হাইস্কুল মাঠে প্রসংশিকা প্রদান করেন স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীঅরুণকুমার চৌধুরী মহাশয়। চারটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ শেষে মোট ১৫৩ জনকে প্রসংশিকা প্রদান করা হয়।

বিশেষ আঙ্গিক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের একটি প্রকল্প টেলারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নন্দীগ্রাম ২নং ব্লকে গত ৫ মে হতে শুরু হয়েছে। এতে মোট ৩০ জন মহিলা শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছেন। এরা সবাই তপশিলী জাতির অন্তর্ভুক্ত। এরা মাসিক ৩০ টাকা হিসাবে ভাতা পাচ্ছেন। এই প্রশিক্ষণ ৬ মাস ধরে চলবে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রসংশিকা দেওয়া হবে।

গত ২১ অক্টোবর তারিখে নন্দীগ্রাম ২নং ব্লক যুব অফিস হতে ৫০টি সক্রিয় যুব সংস্থাকে খেলাধুলোর সাজসরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। ১২টি মহিলা সমিতি এবং ৩৮টি ছেলেদের ক্লাব এই সাহায্য লাভ করে। ৪টি ক্যারম বোর্ড, ২০টি ফুটবল, ১০টি ভলিবল, ১২টি রিংবল, ৬ ডজন স্কিপিং দড়ি বিতরণ করা হয়।

বিতরণ করেন ব্লক যুব-আধিকারিক শ্রীনিরঞ্জন পড়ুয়া।

কাঁথি-১—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে কাঁথি-১নং ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় এবং আনন্দমেলা ক্লাবের সহ-যোগিতায় ক্লাব প্রাঙ্গণে একমাসব্যাপী কবাডী প্রশিক্ষণ শিবির গত ১৫ই সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল। এই শিবিরের শিক্ষার্থীদের বয়সসীমা ছিল ১৪ বছর। প্রশিক্ষক ছিলেন শ্রীঅসিতবরণ ত্রিপাঠী। ১৪ই অক্টোবর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রীবসন্তকুমার শীট, প্রধান শিক্ষক, স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়। সভাপতি মহাশয় সকল শিক্ষার্থীকে প্রসংশাপত্র প্রদান করেন। ব্লক যুবকরণের পক্ষে এই শিবিরের উদ্দেশ্য এবং গ্রামাঞ্চলে খেলাধুলোর প্রসারকল্পে যুবকল্যাণ বিভাগের কর্মপন্থা, বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন শ্রীপ্রভাতকুমার সাহু।

পাঁশকুড়া-২—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের আর্থিক সহায়তায় ও পাঁশকুড়া ২নং ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে গঠিত কোলাঘাট হবি সায়েন্স সেন্টারের পরিচালনায় গত ২রা আগষ্ট '৮২ বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্ল রায়ের জন্মদিনকে "বিজ্ঞান দিবস" হিসাবে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। সকাল ৭টায় সারাভারত বিজ্ঞান সংস্থার সভাপতি শ্রীমণি দাসগুপ্ত হবি সেন্টার কার্যালয় প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলনের পর স্থানীয় বিজ্ঞানপ্রেমী পাঁচশত ছাত্রছাত্রী সুসজ্জিত ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ও পতাকাসহ স্থানীয় তিন কিলোমিটার রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন ও পথসভা করেন। এই পথসভায় বক্তব্য রাখেন সারাভারত বিজ্ঞান সংস্থার সভাপতি শ্রীমণি দাসগুপ্ত, স্থানীয় ব্লক যুব-আধিকারিক শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান, স্থানীয় শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী শ্রীতাপস রাজপন্ডিত ও ডেবরা হাইস্কুলের রেক্টর শ্রীনন্দদুলাল ভট্টাচার্য। এই পথ প্রদক্ষিণের ও পথসভার মূল উদ্দেশ্য ছিল এতদাঞ্চলে মানুষদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। মিছিলের শ্লোগানে কোন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বক্তব্য ছিল না, ছিল সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার বক্তব্য। দুপুর ২টায় কোলা ইউনিয়ন হাইস্কুল গৃহে এক মনোজ্ঞ সুন্দর পরিবেশে বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনের উপর এক পোষ্টার প্রদর্শনী ও আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনাচক্রে স্থানীয় বিজ্ঞানপ্রেমী বহু ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এতদাঞ্চলের সাধারণ মানুষগণ এই ধরনের অভিনব ও সুসজ্জিত মিছিল ও আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটিকে পালন করায় কোলাঘাট হবি সেন্টারের উদ্যোক্তাবৃন্দের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই আলোচনা চক্রে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমণি দাসগুপ্ত। শ্রীদাসগুপ্তের সভাপতিত্বের বক্তব্যে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীরা অনুপ্রাণিত হয়। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শ্রীনন্দদুলাল ভট্টাচার্য, শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান ও শ্রীতাপস রাজপন্ডিত। সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন শ্রীঅমিত দাস ও আশিষ সামন্ত।

হাওড়া জেলা

আমতা-১—যুবকল্যাণ বিভাগের পরিচালনায় এক মাসব্যাপী ফুটবল ও মহিলা কবাডি কোচিং ক্যাম্পের সমাপ্তি অনুষ্ঠান গত ৮ই অক্টোবর আমতা স্পোর্টিং মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমতা ১নং পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান কবি নিমাই মান্না এবং প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শিক্ষারতী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ধর ও বিশিষ্ট ক্রীড়া শিক্ষক শ্রীকান্তলাল পাত্র। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে এক প্রদর্শনী ফুটবল ও মহিলা কবাডি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। একমাস ব্যাপী এই কোচিং ক্যাম্পে ৭৫ জন শিক্ষার্থী যোগদান করেন। প্রখ্যাত এন. আই. এস. কোচ সমীরণ চৌধুরী, এরিয়ান ক্লাবের প্রথম ডিভিসনের খেলোয়াড় প্রদীপ মুখার্জী, সুকুমার মন্ডল, শ্রীমতী রেণু কুন্ডু, মাধবী দল প্রমুখ কোচ হিসাবে তাঁদের বক্তব্য রাখেন। সভাপতি কবি নিমাই মান্না শিক্ষার্থীদের প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলাধুলোর গুরুত্বের কথা বলেন। তিনি খেলার মাঠকে মহা-মিলনের ক্ষেত্র বলে অভিহিত করেন। অন্যান্যরাও বক্তব্য রাখেন। আমতা-১নং যুব-আধিকারিক শ্রীবিভূতিভূষণ বেজ সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

বর্ধমান জেলা

কেতুগ্রাম-১—পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুবকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে পরিচালিত পাম্পসেট তৈরী ও মেরামতি প্রশিক্ষণ শিবিরে মোট ২০ জন শিক্ষার্থী নিজেদের শিক্ষার মান উন্নত করবার সুযোগ পেয়েছেন। উক্ত শিক্ষণ শিবির ৭ই মে থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর এই চার মাস চলে। শিবির উদ্বোধন এবং সমাপ্তি দিবসে স্থানীয় জেলা-পরিষদ সদস্য শ্রী শ্রীমোহন ঠাকুর, পঞ্চায়েত সভাপতি শ্রীআনোয়ারুল আজিম এবং বিভিন্ন অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাতে যুব দপ্তরের আধিকারিক বিভিন্ন কর্মসূচীর উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যুব-আধিকারিক বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণের উপর এবং এই প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

ভাতার—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগেব উদ্যোগে ও ভাতার ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় ২১ দিনব্যাপী তিনটি ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হয়েছে। প্রত্যেক শিবিরে প্রায় ৫০ জন করে যুবক প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

প্রথম শিবিরটি হয় বড়বেলুন ফুটবল ময়দানে। গত ৪ঠা জুন এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন ভাতার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী শ্রীকুমার মন্ডল। সভায় উপস্থিত ছিলেন বড়বেলুন হাই-স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ। প্রশিক্ষণ শিবিরের শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শ্রীদিলীপকুমার যশ।

গত ১১ই জুন শ্রীকোত্তর ফুটবল ময়দানে দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ শিবির উদ্বোধন করেন জেলা যুব-আধিকারিক শ্রীস্বপনকুমার চক্রবর্তী। তিনি এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্দেশ্য এবং সফলতা কামনা করে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় দুই পঞ্চায়েত প্রধান এবং সদস্যগণও উপস্থিত ছিলেন। গত ৭ই জুলাই এই শিবিরের সমাপ্তি দিনে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সদর মহকুমার মহকুমা ক্রীড়া আধিকারিক শ্রী এন.কে. চ্যাটার্জী।

তৃতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরটি উদ্বোধন করেন ভাতার ব্লক যুব-আধিকারিক শ্রীতারকেশ্বর মন্ডল ৬ই জুন কানপুর ফুটবল ময়দানে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিভাগের প্রশিক্ষক শ্রীসুবোধচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় (এন. আই. এস. পাতিয়ালা)। প্রতিটি প্রশিক্ষণ শিবিরে স্থানীয় যুবকেরা প্রচুর উৎসাহ এবং উদ্দীপনার ভেতর দিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শিবির চলাকালীন ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীশংকর রায় এবং ভাতার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী শ্রীকুমার মন্ডল মহাশয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শনে যান এবং প্রশিক্ষণ শিবিরের যুবকদের উৎসাহ ও প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান।

পাঠকের ভাবনা

নাট্যকারকে ধন্যবাদ

সরকার আশ্রিত ও প্রশ্রিত পত্রিকাসমূহ সাধারণতঃ নিম্নমানের হয়, দলীয় বক্তব্যের রুচি-হীন প্রচার ছাড়া শিল্পসৌন্দর্যের প্রকাশ সে-সব জায়গায় থাকে না। এদিক থেকে 'যুবমানস' একটা ব্যতিক্রম। পত্রিকাটা মাঝে মাঝে আমি দেখে থাকি এবং তা মোটামুটি শোভনদর্শন ও সুরুচিপূর্ণ মূল্যবান বক্তব্যসম্পন্ন।

এবারের শারদীয়া সংখ্যাটাও বেশ ভাল লেগেছে। প্রচ্ছদ অতীব সুন্দর, লেখাগুলো মোটামুটি, কিন্তু চমকে দিয়েছে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক 'স্বর্গের সিঁড়ি'। গতবারে নাট্যকারের একাঙ্ক আমার খুব ভাল লেগেছিল কিন্তু এবারের নাটক পড়ে বিস্মিত ও অভিভূত হয়েছি। পরিণত বয়সেও দিগিন্দ্রচন্দ্র যে এমন সমৃদ্ধ নাটক লিখতে পারবেন তা কখনো ভাবি নি। নাটকের বিষয় আধুনিক, বক্তব্য চিরায়ত, গাঁথুনি বলিষ্ঠ, সংলাপ ঝকঝকে, চরিত্রায়ণ গভীর। আপনাদের, বিশেষ করে নাট্যকারকে, অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই।

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো বড্ড ছোট-মাপের এবং বিষয়বিচারেও খুব সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নি। নেপাল মজুমদারের লেখা আমি অত্যন্ত মনোযোগ ও শ্রদ্ধা সহকারে পড়ি, কিন্তু এত কম পরিসরে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন নি। অনেক ক্ষেত্রেই তাই হয়েছে। নাটক সম্পর্কিত লেখাগুলোও আমাকে হতাশ করেছে। আমি নাট্যসাহিত্যের অনুরাগী বলেই নাটক সম্পর্কিত লেখার ওপর (নাটকের ওপরে তো বটেই) আমার আকর্ষণ বেশী।

আপনাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করি।

অধ্যাপক দিলীপকুমার মিত্র
কলকাতা-৫৪

পাক্ষিক করা যায় না কি?

আমাদের 'মাখালতোড় সাধারণ পাঠাগার' ক্লাবের কাজে, মাস ছ'য়েক আগে ভরতপুর ২নং ব্লকের অন্তর্গত সালার যুবকল্যাণ অফিসে গিয়েই প্রথমে চমক খেলাম—টেবিলের মাঝে অতুল সৌন্দর্যে ভরা, সুঠাম ও সু-স্বাস্থ্যবান 'যুব-মানস'কে দেখে। এর আগে 'যুবমানসের' সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে নি। 'যুবমানস' পড়লাম কয়েকটি সংখ্যাই। আমার সাহিত্যপ্রিয় মন যেন নব আনন্দে—নব তৃপ্তিতে নেচে উঠল...।

পশ্চিমবাংলা সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের মাসিক মুখপত্র 'যুবমানস'—সত্যই চিত্তাকর্ষক ও গৌরবের। আমার মনে হয় 'যুবমানস' বাংলা সাহিত্যের ক্ষেতে শ্রেষ্ঠ ফসলের দাবী রাখতে পারে এবং শ্রেষ্ঠ ফসল হয়েই 'যুবমানস' আজ পাঠকের তৃষ্ণার্ত মনকে ভরিয়ে তোলার জন্য সম্পাদক, প্রকাশক, সম্পাদকীয় কর্মীবৃন্দ ও প্রিয় লেখকদের জানাই আমার উষ্ণ অভিনন্দন...।

সবশেষে যুবমানসের প্রতি অনুরোধ, নিয়মিত গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ, অনুবাদসাহিত্য, প্রতিবেদন, সমীক্ষা, চিঠিপত্র, পাঠকের ভাবনা, বিজ্ঞান, সাহিত্য সংবাদ, উভয় দিকই সংযোজন করে 'যুব-মানস'কে সর্বাঙ্গসুন্দর ও পাক্ষীক করে বার করা হোক—কিংবা সাপ্তাহিক!

এবং প্রশ্নঃ 'যুবমানস' কি গ্রাম্য সাহিত্যসেবী-দের লেখা, কথা প্রকাশ করে? জানি না, তবু কয়েকটি লেখা পাঠালাম। সম্পাদক মহাশয়কে সত্বর মতামত জানাতে অনুরোধ রইল।

রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, 'ত্রিবেণী' পত্রিকা
গ্রাম+পোঃ—মাখালতোড়
জেলা—মুর্শিদাবাদ

চাই গ্রামের লেখকদের অগ্রাধিকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র 'যুবমানস'-এর বেশ কতকগুলি সংখ্যা পড়িলাম। কিন্তু আমি যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহা ইহাতে দৃষ্ট হইল না বলিলেই হয়। আমি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, ইহা যখন যুব-কল্যাণ বিভাগের মুখ্য পত্রিকা, তখন ইহার সাহিত্য বিভাগে গ্রাম-বাংলার উপরেই বেশী ঝোঁক পরিলক্ষিত হইবে এবং গ্রাম-বাংলার কবি ও সাহিত্যিকদেরকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হইবে। কিন্তু ইহাতে তাহার কিছুমাত্রই পরিলক্ষিত হয় না। সরকারী বিভাগীয় পত্র-পত্রিকাসমূহেও যদি গ্রাম বাংলার কবি ও সাহিত্যিকদের রচনাসমূহ আহ্বান না করা হইয়া থাকে এবং প্রকাশেরও কোন ব্যবস্থাদি না থাকে তাহা হইলে স্বভাবতঃ ইহাই মনে হইবে যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ উৎসমুখে পাথর চাপা পড়িতেছে। কেন না, ইহারা কোন লিট্‌ল-ম্যাগাজিনে তো নিজেদের প্রতিভাকে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, তাহা ছাড়া, এমন কতক-গুলিও হইয়া থাকে যাহা নিজেদের মাধ্যমেও কোন লিট্‌ল-ম্যাগাজিনে প্রকাশ সম্ভব হয় না। অর্থ সমস্যাই ইহাদের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় যদি তাঁহাদের রচনাসমূহ কোন লিট্‌ল-ম্যাগাজিনে প্রকাশের সুযোগ না পায় তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিভা বিকাশের একমাত্র পথ সরকারী পত্র-পত্রিকাসমূহ। ইহাতেও যদি তাঁহাদেরকে সুযোগ না দেওয়া হয় তাহা হইলে পূর্বকথাই পর্যবসিত হয়। গত ডিসেম্বর ১৯৮১ সংখ্যায় কমলেশ মিত্র খ্যাতনামা সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহা হইতে এই কথাই প্রমাণিত হইবে যে গ্রাম-বাংলার কবি ও সাহিত্যিকগণ কোনদিন কলিকাতাও যাইতে পারিবে না আর তাঁহাদের কবি সাহিত্যিক হওয়াও হইবে না।

আমার অনুরোধ, সাহিত্য বিভাগকে আরও বেশী করিয়া সম্প্রসারিত করিয়া গ্রাম-বাংলার কবি ও সাহিত্যিকদের রচনার মর্যাদা দেওয়া হোক এবং তাঁহাদেরকে যুবমানসে অধিকতর সুযোগ দেওয়া হোক। গ্রাম-বাংলার কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা আহ্বান করা হোক যাহাতে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে। আমার অনুরোধ-সমূহ আপনার মানবিকতার নৈতিক আদর্শে বিবেচনার জন্য পাঠাইলাম।

......একথা মানিতেই হইবে যে, যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র 'যুবমানস'-এর কাগজ-গুলি অতি সুন্দর এবং পরিস্কার ও উজ্জ্বল মুদ্রণ। ইহার সুন্দর প্রচ্ছদ এবং কিছু কিছু কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধগুলির জন্য ইহা অন্যান্য লিট্‌ল-ম্যাগাজিনের তুলনায় অধিক আকর্ষণীয় ও আদৃত। মূল্যাল্পতাও আকর্ষণের অন্যতম কারণ। যুবমানসের এত সমারোহ থাকা সত্ত্বেও আমাকে শঙ্কিত মনে হয়। যাহাদের আনন্দে দেশ হয় আনন্দিত, যাহাদের সুখে দেশ হয় সুখী, সেই গ্রামের মানুষ আজও অবহেলিত, সেই গ্রাম-বাংলার কবি ও সাহিত্যিকরাও তেমনিভাবে অবহেলিত। তাই স্বতঃই আশঙ্কা জাগে; এই গ্রাম-বাংলার কবি ও সাহিত্যিকদের অগ্রগতির পথ কি মুক্ত হইবে না? অবহেলিত গ্রাম-বাংলার কবি-সাহিত্যিকেরা কি সকলেই মুখ বন্ধ করিয়া থাকিবে? তাঁহাদের রচনাগুলি কি কলিকাতা হইতে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাসমূহে স্থান পাইবে না? তাই এই আশঙ্কার নিবারণ করিতে গ্রাম-বাংলার কবি ও সাহিত্যিকদের হইয়া আমার সবিনয় অনুরোধ—সাহিত্য বিভাগকে আর সংকুচিত না রাখিয়া আরও সম্প্রসারিত করিয়া গ্রাম-বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের রচনা আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মর্যাদা দেওয়া হক। সেই সকল কবি-সাহিত্যিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হক।

আমিও এই গ্রাম-বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের দলেরই একজন। আপনার পত্রিকায় কি আমার স্থান হইবে? চাতকসদৃশ অনুমতির আশায় চাহিয়া রহিলাম।

শ্রীভবেশচন্দ্র মণ্ডল
রাজাপুর, চরকুঠিবাড়ী
ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ

প্রমোদ দাশগুপ্ত : অশ্রুতে শপথে বিদায়

(৪ পৃষ্ঠার পর)

বর্ণের মানুষ, ছুটে আসছেন, মৌনতায় উন্মুখর --সেই ছুটে আসা।

এ বাড়ির প্রতিটি ইঁট কাঠ লোহা পাথর যার উজ্জ্বল উপস্থিতিতে চঞ্চল হয়ে উঠত, এ বাড়ির প্রতিটি মানুষ যার নিরন্তর নিরিক্ষণের গর্বিত আস্বাদে বিন্দু বিন্দু করে নিজেদের পরিশুদ্ধ করেছেন, এ বাড়ির লনে রাখা যার ছবি সাতদিন ধরে ফুলে, মালায়, অশ্রুতে, শপথে, সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্তের মানুষের স্মৃতি চারণায়, বর্ণের বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছে, তিনি এলেন চীনের সুদৃশ্য কফিনে, চিরনিদ্রায় শায়িত, নিস্তব্ধ নিথর শরীরে। সেটা ৫ই ডিসেম্বরের সকাল। তখনও সর্বাঙ্গে জড়িয়ে খাঁটি বাঙ্গালীর ধবধবে সাদা ধুতি পাঞ্জাবী, আর সেই পরিচিত চশমা, কালো কোট। শুধু সদা জ্বলন্ত চুরুটের দেখা নেই।

পার্টিই জীবন, জীবনের অস্তিত্ব পার্টির জন্যই আর যেহেতু পার্টি-টি মেহনতী মানুষের, শ্রমিকের কৃষকের, ছাত্রের যুবক-যুবতীর, বুদ্ধি-জীবীর, তাই সকলেই উপস্থিত সেই করুণ বিদায়ের মুহূর্তে।

তাঁর নিশ্বাসে স্পন্দিত হয়েছে পার্টি আর পার্টির নিশ্বাসে নন্দিত হয়েছে তাঁর জীবন। একদিনে এ জিনিস হয় নি। ধীরে ধীরে, কঠোর পরিশ্রমে, নিরন্তর প্রয়াসে অর্জিত এ ফসল।

১৯১০ সালের ১৩ই জুলাই বর্তমানের বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কুঁয়োরপুর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে যার জন্ম, তিনি বারে বারে জন্মেছেন, নতুন থেকে নতুনতর জীবন দিয়েছেন খ্যাতি অখ্যাতি নিন্দাস্মৃতি সীমাহীন প্রাচীর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে গড়ে তুলেছেন এক সুশৃংখল মহীরুহ, যার মাধ্যমে তিনি নিরাপদে নিশ্বাস নিয়েছেন, অন্যদের নিতে শিখিয়েছেন।

এই শতাব্দীর চেয়ে দশ বছরের ছোট ছিলেন তিনি, অথচ শতাব্দীর নিশ্চিত গতি ধরতে পেরেছিলেন তৃতীয় দশক শেষ হওয়ার আগেই।

পিতামহের কাছ থেকে শৈশবেই শিখে নিয়েছেন স্বদেশী গান এবং তাঁর তত্ত্বাবধানেই নিয়মিত শরীর চর্চা, সাঁতার কাটা ও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ!

তখন অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার বরিশালের জননেতা শরৎ ঘোষ মঞ্চে মঞ্চে শৃংখল মুক্তির তরঙ্গ সৃষ্টিতে নিরলস চরকায় ঘর ঘর শব্দ তুলে মোটা খসখসে খদ্দর প্রতি-বাদের দীপ্তি ছড়াচ্ছে এখানে ওখানে। বাংলার দামাল যুবসমাজ মাতাল হয়ে উঠেছে ইংরেজের ফোঁটা ফোঁটা রক্তের আয়নায় মুক্তির নিদারুণ উল্লাসে—প্রমোদ দাশগুপ্ত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন অনুশীলন সমিতির সহযোদ্ধাদের সংগ্রামী ইশারায়।

যে মানুষ জীবনে চলার পথে সত্যকে আবিষ্কার করতে জানে, উন্নততর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারে, নিজস্ব সত্তার পূর্ণনির্মাণে নিয়ত কারিগর হয়; সেই পায় মহতের সম্মান। সেই খুঁজে পায় জীবনের মানে যে নিজের আদর্শে অচলায়তন থেকে অন্যকে আকৃষ্ট করতে জানে। প্রমোদ দাশগুপ্ত সেই অসাধারণ গুণের গুণে ছিলেন গুণী।

কারা প্রাচীরের অন্তরালে মার্কসবাদ অধ্যয়ন করেন তিনি; মার্কসবাদের আলোক-বর্তিকা স্পর্শ করে তাকে। বন্যার পর পলি মাটি যেমন উর্বর করে ক্ষেত খামার, স্তালিনের 'লেনিনবাদের ভিত্তি' তেমনি করেই তার বোধ মননের অঙ্গন উর্বর করল। তিনি বুঝতে পারলেন ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ দিয়ে শ্রমজীবী লক্ষ কোটি মানুষের শোষণ মুক্তির আন্দোলন সফল হতে পারে না, ভারতের শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের পূর্ণ মুক্তি আসতে পারে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে। সর্ব-ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে, শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের দৃঢ় মৈত্রী গড়ে, বিপ্লব সফল করার মধ্য দিয়ে। জন্মান্তর হল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সৈনিক, রূপে বৃটিশ শাসকদের কারাগারে নিক্ষিপ্ত এক সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত মানুষের মাঝে লুকিয়ে ছিল ভবিষ্যতের বীজ।

সেই বীজ কঠোর পরিশ্রম, নিরন্তর অধ্যবসায় আয়াস, আর মার্কসবাদের মৌল শিক্ষার দীপ্তির পথ ধরে সময়ের নাড়ী টিপে পা ফেলে ফেলে হয়েছিল ক্রম অগ্রসরমান, যার অনিবার্য পরি-ণতিতে আমরা পেয়ে যাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-(মার্কসবাদী)র পলিট ব্যুরোর সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান সুদক্ষ সংগঠক সুশৃংখল লক্ষ লক্ষ মানুষের সংগঠনের নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তকে। দীর্ঘ নিরন্তর পথ চলা তিলে তিলে তিতিক্ষায় সময় অসময়ে আদর্শে অবিচল কর্তব্যনিষ্ঠ ছয় দশকের পরিপূর্ণ একটি মানুষ। এই মানুষটি চলে গেলেন।

মুখ্যমন্ত্রী ব্রিগেডের ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের অশ্রুসিক্ত নয়নে চোখ মেলে বিহ্বল হয়ে বললেন : এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমরা সকলে এখানে সমবেত হয়েছি এত বড় জনসমাবেশ তার জন্যই। ৫ই ডিসেম্বর কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের শোক মিছিলে যে দৃশ্য দেখা গেছে, অতীতে কোন দিন তা দেখেছি বলে মনে পড়ে না, অন্ততঃ রাজনৈতিক জীবনে আমরা যা দেখেছি। তিনি তো আমাদের পার্টির প্রিয় নেতা বটেই, কিন্তু শুধু আমাদের পার্টির সদস্য দরদী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরাই তাতে যোগ দেন নি, রাজ-নীতি করুন বা না করুন, এ রকম অগণিত অসংখ্য মানুষও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমাদের সাথে শোকযাত্রায় যোগ দিয়েছেন। রাস্তার দুধারে, আনাচে কানাচে গলিতে ছাদে বারান্দায় অগণিত মানুষ উপস্থিত থেকে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। এই ধরনের মঞ্চও আমরা কখনও দেখি নি যে দল-মত নির্বিশেষে সবাই, এমন কি রাজনৈতিক দিক থেকে আমাদের বিরোধী যাঁরা তারাও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শোক ও শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন। এ রকম অভূতপূর্ব ঘটনা আগে দেখি নি। এর দ্বারা বোঝা যায় আমাদের সহযোদ্ধা ও নেতা হিসেবে আমাদের প্রিয়জন তো বটেই, তিনি সাধারণ মানুষেরও কত প্রিয় ছিলেন, তাঁকে কত শ্রদ্ধা করতেন জনগণ।

আক্ষরিক অর্থেই অভূতপূর্ব। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড আর কার শোকের ছায়া বহন করেছে? অতীতের ইতিহাস ও স্মৃতির গভীর অতল স্পর্শ করেও কেউ স্মরণ করতে পারলেন না সেই ঘটনা। অর্থাৎ জননেতা প্রমোদ দাশগুপ্তই প্রথম পেলেন সেই সম্মান। সারা জীবনে তিনি পেয়েছেন অগণন সম্মানের আর শ্রদ্ধার আর ভালবাসার অর্ঘ্য। তার সঙ্গে যুক্ত হল আর এক নতুন অগণ্য সম্মান।

১৭১ দিন আগে পশ্চিম বাংলার গ্রাম শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছিলেন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। ২০শে জুনের সেই সমাবেশ ছিল দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার গঠন করে পশ্চিম বাংলার সংগ্রামী মানুষ যে নজিরবিহীন চেতনার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তারই সম্মানে বিজয় উৎসবে। মুহুর্মুহু বাজি পটকা আর শ্লোগানে গম গম করছিল সেদিনের ময়দান। জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে সভাপতি প্রমোদ দাশগুপ্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন : বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসুন। স্বৈরতন্ত্র পরাজিত হয়েছে, গণতন্ত্রের জয়যাত্রা আরও গতিশীল হয়েছে, তা অব্যাহত রাখুন। বিজয় সংহত করে শত্রুকে কোণঠাসা করুন।

১৭১ দিন পর ১৬টি জেলার গ্রাম গ্রামান্তর থেকে ৭ই ডিসেম্বর আবার লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হলেন। নবান্নহীনতার দুঃস্বপ্ন দুচোখ জুড়ে, ডিসেম্বরের হীম লাগা সূর্য মাথায়, সকাল থেকে মানুষ এসেছেন। হাওড়া স্টেশন শিয়ালদহ স্টেশন ছাপিয়ে গেছে মানুষের ভীড়ে। মাথার ওপর ময়লা আকাশ কুয়াশার চাদরে ঢাকা, মানুষ আসছেন। কুয়াশা সরে বেরিয়ে এল সুনীল আকাশ, মানুষ আসছেন। বেলা বেড়ে যায় মানুষ আসছেন।

এদিকে বেলা একটাতেই শুরু হয়েছে ফুল-মালার অর্ঘ্য নিবেদন। পুষ্প ব্যবসায়ীরা হয়তো আগেই টের পেয়ে গিয়েছিলেন না হলে এতো ফুল কলকাতা কোথায় পেল? বেলা বেড়ে বেড়ে গোধুলীর মেঘ সীমানায় চলে এলো। প্রধানতম নেতা আবদুল্লাহ রসুলের সভাপতিত্বে চলছে মহতী শোকসভা। মানুষ আসছেন।

প্রথমে মনে হয়েছিল নদী, তারপর সমুদ্র, তারপর পাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে, পাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে, আর আর মানুষের মাথা। মেঘ ও মাটি পরস্পরে যেখানে চুপি চুপি কথা বলতে মিশে যায় সেখানেও মানুষের মাথা। মিছিলের শেষ নেই, বসে থাকা মানুষেরও শেষতম ব্যক্তিটিকে চিহ্নিত করার উপায় নেই। কারণ মানুষ আসছেন, আরও আসছেন।

মঞ্চে বসে আছেন বর্ষীয়ান জননেতা প্রফুল্ল সেন, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, সি পি আই (এম) সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ, সি পি আই (এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির নবনির্বাচিত সম্পাদক সরোজ মুখার্জী, সি পি আই সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাও, কং (ই) নেতা ডাঃ গোপালদাস নাগ, কং (এস) নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি, এস ইউ সি আই নেতা নীহার মুখার্জী, আর এস পি নেতা মাখন পাল, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা চিত্ত বসু, আর সি পি আই নেতা বিমলানন্দ মুখার্জী, পশ্চিমবঙ্গ এস এস পি নেতা বিমান মিত্র, ডি এস পি নেতা রবিশঙ্কর পান্ডে, গোর্খা লীগ নেত্রী রেণুলীনা সুব্বা, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা অরুণ বিশ্বাস, ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা মণীন্দ্রনাথ বসু, বি জে পি নেতা বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, ফরোয়ার্ড ব্লক (মাঃ)র নেতা রাম চ্যাটার্জি, বি বি সি নেতা সুনীল চৌধুরী প্রমুখ। এ ছাড়া অতুল্য ঘোষের শোকবার্তাও সভায় পাঠ করা হয়। সর্বদলীয় সভায় শোক প্রস্তাবটি পাঠ করলেন সরোজ মুখার্জী।

অন্য দিনের সঙ্গে এ দিনের কোন তুলনা হয় না। ব্রিগেড এমন সভা আগে তো দেখে নি। ই. এম. এস. রক্ত-গোলাপ দিলেন প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে, জ্যোতি বসুও তাঁকে অনুসরণ করলেন। তারপর একে একে দল-মত-নির্বিশেষে সকলেই এলেন নতশিরে, কেউ দিলেন মালা, কেউ বা ফুল, কেউ নিলেন বজ্রমুষ্ঠি তুলে শপথ, কেউ বা করলেন করজোড়ে প্রণাম। যাঁরা বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী—তাঁরা শপথ নিলেন দাশগুপ্তর অপূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার, আর যাঁরা তার আদর্শের বিরোধী শিবিরের লোক তাঁরা শান্তি কামনা করলেন তাঁর 'আত্মা'র।

ফুল আর মালার এই বিপুল সমাহার শুধু শোকসভায় ছিল তা নয়, ২৯শে নভেম্বরের পড়ন্ত বেলায় শুরু হয়েছিল প্রতিকৃতিতে পুষ্পদান। সেই পুষ্প কেওড়াতলা মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে শবদেহ তুলে দেওয়ার পর্যন্ত ছিল অব্যাহত।

২৬শে অক্টোবর হালকা শীতের মধুর সন্ধ্যায় বিমানবন্দরে যাঁরা প্রমোদ দাশগুপ্তকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই হাজির হয়েছিলেন ৫ই ডিসেম্বরের কুয়াশাঢাকা বিমান-বন্দরে। সাত দিনের সীমাহীন যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় নিয়ে আরও যাঁরা বিমানবন্দরে হাজির হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ, বি. টি. রণদিভে, জ্যোতি বসু, পি. রামমূর্তি, হরকিষেণ সিং সুরজিত, ই. বালানন্দন, সমর মুখার্জি, পি. সুন্দরাইয়া, ই. কে. নায়নার, নৃপেন চক্রবর্তী, সরোজ মুখার্জি, সুধাংশু দাশগুপ্ত প্রমুখ এবং অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ। শবদেহ বহন করে আনেন তাঁর পাঁচ দশকের সহযোদ্ধা এম. বাসবপুন্নিয়া ও নব প্রজন্মের তরুণ নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

সকাল ৯-১৫ মিনিটে চীন এয়ারলাইন্সের বি-২০২০ বিশেষ বিমানটি দমদম বিমানবন্দর স্পর্শ করে। বার্মা, বাংলাদেশ চট্টগ্রাম, বঙ্গোপ-সাগরের আকাশ দিয়ে মরদেহবাহী বিমান কলকাতায় আসে। মরদেহের সঙ্গে আসে চীনের পুষ্পমাল্য ও পুষ্পস্তবক। কুড়ি বছরে, এই প্রথম চীনের বিশেষ বিমান কলকাতার মাটি স্পর্শ করল। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার সংগ্রামী জনতার আত্মীক যোগ দীর্ঘকালের। বিশেষ চীনা বিমান কিন্তু কোন উপহার নিয়ে অবতরণ করল না, বহন করে আনলে পশ্চিম বাংলার মেহনতী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত রূপকার প্রমোদ দাশগুপ্তের মৃতদেহ। এ যে কি নির্মম ও মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক ঘটনা তা বোঝা যাবে প্রমোদবাবুর বহু পরিশ্রমের ফসল গণশক্তির নিজস্ব প্রতিবেদকের প্রতিবেদনে চোখ রাখলেঃ ২৬শে অক্টোবরের পর আজ ৫ই ডিসেম্বর। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ২৬শে অক্টোবর কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত চিকিৎসার জন্য দমদম বিমান বন্দর থেকে পিকিং যাত্রা করেন। রাত দশটা দুই মিনিটে বিমান কলকাতার মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ে যায়। বিমান ছাড়ার আগে দমদম বিমানবন্দরে তাঁকে জানানো হয় বিদায় অভ্যর্থনা। দমদম বিমানবন্দরে সেদিন কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন পার্টিনেতা, কর্মী, দরদী ও শুভাকাঙ্খীদের। রাত সাড়ে আটটা থেকে রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত চলে শুভেচ্ছা বিনিময়। কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত সেই সময় তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে সবার সাথে কথা বলছিলেন, রসিকতা করছিলেন। যাবার মুহূর্তে তাঁর যাত্রাপথে সবাই সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে। ধীর পদক্ষেপে দু' সারি নিশ্চল মূক পাথরের মূর্তির মাঝখান দিয়ে বিমান বন্দরের লাউঞ্জ থেকে এগুচ্ছেন। বিদায়ের অব্যক্ত এক বেদনা বুকের মধ্যে ছটফট করছে। দূরে দন্ডায়-মান বিমানের উদ্দেশে গাড়িটি যাত্রার মুহূর্তে স্লোগান ওঠে—কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত লাল সেলাম, কমরেড প্রমোদদা লাল সেলাম। বাইরের হিমেল কুয়াশার সাথে চাপা এক কাতর নিঃশ্বাস বিমানবন্দরের পরিবেশ বেদনার্ত হয়ে ওঠে। দশটা দু' মিনিটে বিমান আকাশে পাড়ি দেবার পরও সবাই অনেকক্ষণ বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে। বিদায় অভ্যর্থনায় এমন অস্ফুট ব্যথার 'যেতে নাহি দিব' ছবি দেখা যায় না। 'যেতে নাহি দিব' এ যে বিপুল মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তা শোকাহত অগণন মানুষের শবানুগমন না দেখলে বোঝাই যেত না। যাঁরা সেদিন সেই আক্ষরিক অর্থেই মৌন ও ঐতিহাসিক শোক মিছিলে ছিলেন—তাঁরা দীর্ঘকাল স্মৃতিতে ধরে রাখবেন এই ছবি; যাঁরা যেতে পারেন নি, তাঁরাও সমসাময়িক ইতিহাসের স্বাদ নেবেন দৈনিক পত্রিকার পাতায় পাতায়। সেদিন সংবাদপত্রে খবর ছিল এই একটিই।

৩-১৫ মিনিটে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে চলতে শুরু করেছিল শববাহী যান। সামনে ৭৩টি রক্ত-পতাকা কালো বর্ডার দিয়ে ঘিরে বহন করছেন পার্টির কর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে চলেছেন ১২৫ জন গণসংগীত শিল্পী যাঁদের কণ্ঠ মৃদু সুরে আন্তর্জাতিক সংগীত শুনিয়ে চলেছিল সমগ্র রাস্তা। তাঁদের পেছনে অসংখ্য কর্মীর হাতে অবনত রক্ত-পতাকা। তারপর বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ একটি লরীতে, তার পরের লরীতে সি পি আই (এম) পলিট ব্যুরো সদস্যবৃন্দ, ঠিক তার পরই শববাহী যান। তারপর বিভিন্ন বামপন্থী দলের অর্ধনমিত পতাকা, তারপর কিছু প্রবীণ অসুস্থ নেতার গাড়ি, তাঁদের পেছনে লক্ষ লক্ষ মানুষ।

লরীতে যেতে যেতে বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ বারবার বলছিলেন, এমন সুশৃংখল মৌন অগণন মানুষ শবানুগমন আর কখনও করে নি। স্মৃতির গভীরে ডুব দিলেন তাঁরা। কেউ বললেন, কারাগারের স্মৃতি, কেউ বললেন প্রমোদবাবুর শৃংখলাময় জীবনের কথা।

শৃংখলমুক্তির জন্য চাই সুশৃংখল বাহিনী। সেই বাহিনী দক্ষতার সঙ্গে তিনি গড়ে তুলেছেন।

বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের লরীতে ছিলেন লক্ষ্মী সেন, প্রশান্ত শূর, মাখন পাল, নিখিল দাস, যতীন চক্রবর্তী, অশোক ঘোষ, অমর চক্রবর্তী, রাম চ্যাটার্জি, নির্মল বসু, রবিশঙ্কর পান্ডে, বিমান মিত্র, ডাঃ রনেন সেন, বসন্ত সিংহ প্রমুখ। তাঁদের সকলের স্মৃতি ক্রমশঃ জীবন্ত করে তুলছিল প্রমোদ দাশগুপ্তকে। মাঝে মাঝে ম্লানমুখে প্রশান্ত শূর ঝুঁকে পড়ে দেখছেন রাস্তার দু' ধারের বাঁধভাঙ্গা মানুষ। তিনিই হাত তুলে দেখালেন বালিগঞ্জ পোস্ট অফিসের কাছে বিড়লা মন্দিরের ছাতে কালিঝুলি মাখা শত শত শ্রমিক নিঃশব্দে বসে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। বালিগঞ্জ সারকুলার রোড ও হাজরা রোডের সংযোগস্থলে হাজার হাজার মানুষ। ভীড় চঞ্চল অথচ অটুট শৃংখলা। মন্দিরের ওপর, মসজিদের ওপরও মানুষ। গাছের ডালে ডালে ঝুলছে মানুষ। গড়িয়াহাট আই. টি. আই.-এর ছাদ থেকে কয়েকজন শ্রমিক বজ্রমুষ্ঠিতে সেলাম জানাল প্রিয় নেতাকে। গড়চার বস্তির নিরন্ন মানুষও সেলাম জানাল তাদের শ্রদ্ধেয় নেতাকে।

আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে আচার্য জগদীশ বসু রোড ছুঁয়ে পার্ক স্ট্রীট ধরে সৈয়দ আমির আলি এভিন্যু হয়ে ওল্ড বালিগঞ্জ রোড ধরে গড়িয়াহাটা রোড। সেখান থেকে রাসবিহারী এভিন্যু—এই ছিল মিছিলের পথ। লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু শেষ দেখা দেখবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছেন। সুশৃংখল মিছিল ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

ব্রিগেডের জনসমুদ্রর সামনে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিই স্বীকার করলেনঃ প্রমোদ দাশগুপ্ত অনন্যসাধারণ দক্ষ সংগঠক ও জনগণের প্রিয় নেতা এবং এটাও সকলেরই মত, তিনি ছিলেন নিপীড়িত শোষিত মেহনতী মানুষের প্রতিনিধি।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁর স্মৃতির ভাবনায় মলিন মুহূর্তে সেই যাদুকরী প্রতিভার রহস্য উন্মোচন করে বললেনঃ কমিউনিস্ট হিসাবে আমরা জানি তত্ত্ব বাদ দিয়ে সংগঠন হয় না। কমরেড দাশগুপ্ত ছিলেন দক্ষ সংগঠক। তাঁর মত দক্ষ কোন একজনকে এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে

খুঁজে পাওয়া কঠিন। সারা জীবন ধরে সংগ্রাম করে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আয়ত্ত করে, অধ্যয়ন করে, তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন তরুণ বয়সেই। পার্টির মধ্যে বিরোধের সময়, বিশেষত ডান-বাম বিচ্যুতির বিরুদ্ধে, তিনি সঠিক পথ গ্রহণ করেছেন, সেই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন, একজন কমিউনিস্ট হিসাবে।

সারা ভারতে এখন রাজনৈতিক বিশ্বাস হননের দুঃসময় চলছে। নীতিহীনতা, আদর্শহীনতা এবং সাময়িক মোহের চরিতার্থতায় আত্মসমর্পণ গভীর রাজনৈতিক ব্যাভিচার জনমানসে বিশ্বাসহীনতার জন্ম দিচ্ছে। এমন কি কোথাও কোথাও অবিশ্বাস, সাম্রাজ্যবাদের কুটিল জালে জড়িয়ে বিচ্ছিন্নতা-বাদের ভূমি প্রসারিত করছে। এই নিদারুণ সংকটে দগ্ধ সময়ে, অটুট ছিলেন এক সরল অনাড়ম্বর কর্তব্যপরায়ণ নীতিনিষ্ঠ আদর্শবাদী মানুষ। তিনি প্রবল ভাঙ্গনের মাতাল হাওয়ার ভয়ংকর গা ঘিনঘিনে মুহূর্তে সংগঠনকে রক্ষা ও প্রসারিত করেছেন, মা যেমন রক্ষা করে আত্মজকে।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংশোধনবাদের যে জোয়ার বইছিল ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন তা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না, লেনিনের সহযোদ্ধা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতির রণনায়ক স্তালিনকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা ও তার অবদান মুছে ফেলে নতুন ইতিহাসে স্বনির্বাচিত রঙের প্রলেপ দেওয়ার এক প্রায় অবিশ্বাস্য চক্রান্ত শুরু হয়েছিল। প্রয়াত দাশগুপ্ত সেই কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মার্কসবাদে অসাধারণ দক্ষতা ও বাস্তব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে স্তালিনের অবিস্মরণীয় অবদানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ) আত্মপ্রকাশ করল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বদৃষ্টি নিয়ে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ) গঠন করা ও ব্যাপক গণভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ষাটের দশকের শেষ প্রান্তে এবং সত্তর দশকে, অতিবামপন্থী হঠকারী নকশালদের বিরুদ্ধেও তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক সংগ্রাম পরিচালনা করতে এগিয়ে এলেন তিনি।

সত্তর দশকের শুরুতেই পশ্চিম বাংলার বুকে বিরুদ্ধবাদী রাজনীতির ধ্বংসলীলায় উন্মত্ত শাসকশ্রেণীর হিংস্র দানবীয় আধা-ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাস ও আক্রমণ নামে, প্রয়াত দাশগুপ্তের হাজার হাজার পার্টিকর্মী পাড়া ছাড়া অথবা গৃহ ছাড়া, নিহত অথবা আহত, এই নিদারুণ সংকটের দিনে পার্টি ও গণসংগঠনগুলিকে রক্ষা করা ও গণভিত্তি ব্যাপকতর করার জন্য যে নিরন্তর সংগ্রাম পরিচালিত হয় তারও নেতৃত্ব করেন প্রয়াত দাশগুপ্ত। অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা ও সংকটের মুহূর্তেও আদর্শে অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে সমগ্র পার্টি ও দেশবাসীকে পরিচালনার যে অনন্য উদাহরণ তিনি নির্মাণ করলেন তা আর বিরুদ্ধপক্ষীয়দেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই ব্রিগেড শুনলো প্রবীণ জনতা নেতা প্রফুল্ল সেন থেকে শুরু করে ডাঃ গোপালদাস নাগ কিংবা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর মত বিরুদ্ধপক্ষীয় ব্যক্তিরাও বললেন শোষিত নিপীড়িত মানুষ তার প্রিয়জনকে হারাল।

প্রিয়জন হারাবার বেদনায় বামফ্রন্টযুক্ত সমস্ত দলই শোকাহত। যদিও মুখ্যত তিনি ছিলেন সি পি আই (এম)-এর শীর্ষস্থানীয় কর্ণধার, তথাপি সারা ভারতে প্রচণ্ড রাজনৈতিক ভাঙন-দল বদলের যুগে আদর্শ, নিষ্ঠা ও সততা কিভাবে ঐক্যসূত্র উপহার দেয় তা শিখিয়ে দিয়েছে পশ্চিম বাংলা। এক-দলীয় সরকারগুলি ভাঙতে ভাঙতে রূপান্তরিত হচ্ছে বহু দলীয়তে; আর ঠিক সেই সময়, এক আশ্চর্য বিনম্র প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের অটুট ইউনিয়ন। ছয় পার্টি ঐক্য প্রসারিত করে গ্রহণ করেছে আরও তিনটি পার্টিকে এম.এল.এ. কেনা-বেচার বিনিময়ে সরকার ধরে রাখার জন্য নয়, সংগ্রামের উৎস মুখ প্রসারিত করার রাজনৈতিক প্রয়োজনে। আন্তঃ-পার্টি ঐক্যও শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকা বহন করার অগ্নিমন্ত্র শুনিয়েছিলেন প্রয়াত দাশগুপ্ত। তাই তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হল বামফ্রন্টের চেয়ারম্যানের মর্যাদায় যার অপর নাম ঐক্য, সংগ্রামের ঐক্য।

যে ঐক্য ও সংগ্রামের অগ্নিমন্ত্র তিনি দশকের পর দশক ধরে রচনা করেছেন, গ্রহণ করেছেন এবং প্রয়োগ করতে তৎপর হয়েছেন তা যে সাফল্যের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছিল, তার বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ্য করলাম শেষ যাত্রায়, মাল্য অর্পণে, এবং ব্রিগেডের সীমানাহীন জনসমুদ্রে।

সন্ধ্যায়, আসন্ন বিষণ্ণতায়, ব্রিগেডের মুখ আরও ম্রিয়মান হয়ে গেল। ব্রিগেড সাধারণত যা দেখতে অভ্যস্ত সেই অগ্নিশলাকার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল যা দিক-দিগন্তে, গমগমে শ্লোগানে ঝনঝন করল যা বিশাল প্রান্তর, নতশির, সারিবদ্ধ মানুষ যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন ঠিক তেমনি নতশিরে ফিরে যাচ্ছেন। যৌথ নেতৃত্ব দিয়ে পূরণ করা হবে শূন্যস্থান, অপূর্ণ তাঁর সাধ ও স্বপ্ন পালন করা হবে এই সব অঙ্গীকারের বর্ণ-মালা পড়তে পড়তে অনুভব করলেন ব্রিগেডের মানুষঃ

'আমাদের চোখ থেকে
মুছে নিলে ভয়,
যেদিকে তাকাই
দেখি
স্পন্দমান তোমার হৃদয়।
এ পৃথিবী তোমার হৃদয়।

হয়ত শপথ নিয়ে বলে উঠলেন

"আমরা নিলাম তার ভার
যদি মদমত্ত কেউ
বাড়ায় মৃত্যুর থাবা
ক্ষমা নেই তার।"

১৯৭৩ সালে আমাদের দপ্তরের যাত্রা শুরু। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গের ৩২৭টি ব্লকে আমাদের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে পেরেছি। রাজ্যের প্রাণবন্ত যুবসমাজের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে। বর্তমানে যুবকল্যাণ বিভাগ যুবসমাজের জন্য নিম্নলিখিত কার্যসূচীগুলি রূপায়ণ করে চলেছে ঃ

বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প।
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্প।
তপসিলী জাতি ও উপজাতি যুবক-যুবতীদের জন্য বিশেষ-আঙ্গিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্প।
কমিউনিটি হল ও মুক্তাঙ্গন মঞ্চ স্থাপন।
প্রতি বছর ব্লক জেলা এবং রাজ্যস্তরে যুব উৎসবের আয়োজন।
খেলাধুলার সাজসরঞ্জাম বিতরণ ও আর্থিক সাহায্য দান।
গ্রামীণ ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিবির।
খেলার মাঠ ক্রয় ও উন্নতি সাধনে আর্থিক সাহায্য দান।
জিম্‌নাসিয়াম তৈরী ও জিম্‌নাস্টিকের সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য অর্থ সাহায্য।
স্বল্প খরচে বিশেষ বিশেষ স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ঃ

(ক) **স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য দান।**
(খ) **অ-ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য দান।**

পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যুব আবাস পরিচালনা।
বহুমুখী জেলা যুবকেন্দ্র প্রকল্প।
পাঠ্যপুস্তক ঋণ দান।
ব্লক তথ্যকেন্দ্র স্থাপন।
বিজ্ঞান আলোচনা চক্র প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন।
বিজ্ঞান ক্লাব গঠন ও আর্থিক সাহায্য দান।
ছাত্র সমবায় সমিতি গঠন ও আর্থিক সাহায্য দান (স্কুল-কলেজে)।
পর্বতারোহণ অভিযানে অনুদান, স্বল্প ভাড়ায় পর্বতারোহণের সাজসরঞ্জাম সরবরাহ এবং পর্বতারোহণ ও স্কি প্রশিক্ষণে বৃত্তি প্রদান।
বিভাগীয় মাসিক পত্রিকা "যুবমানস" প্রকাশনা।

আরও বিস্তারিত জানতে আপনি যে ব্লকে বাস করেন সেখানকার যুব আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

যুবকলাণ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

গ্রাহক হতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৭ টাকা। ষান্মাসিক চাঁদা সডাক ৩·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যার দাম ৪০ পয়সা।

বিশেষ সংখ্যার জন্য কোন অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না। পত্রিকা প্রেরণের জন্য ডাক ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করবে।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

সহ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয় বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলকাতা ৭০০০০১।

এজেন্সি নিতে হ'লে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০%
১৫০০-এর ঊর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০%
৫০০০ এর ঊর্ধ্বে	৪০%

১০টি সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

সহ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলকাতা ৭০০০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবি করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিক-গুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য বিজনেস ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

Regd. No. 32875/78

Postal Reg. WB/CC-15

এবারের এশিয়াডে বাঙলাদেশেব সঙ্গে হকি ম্যাচে ভারতের পক্ষে চতুর্থ গোল করার মুহূর্তে সঈদ

ভারত-মালয়েশিয়া ফুটবল ম্যাচে ভারতের গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলী একটি অসাধারণ গোল রক্ষা করছেন
ফোটো : এন. আর. সাউ